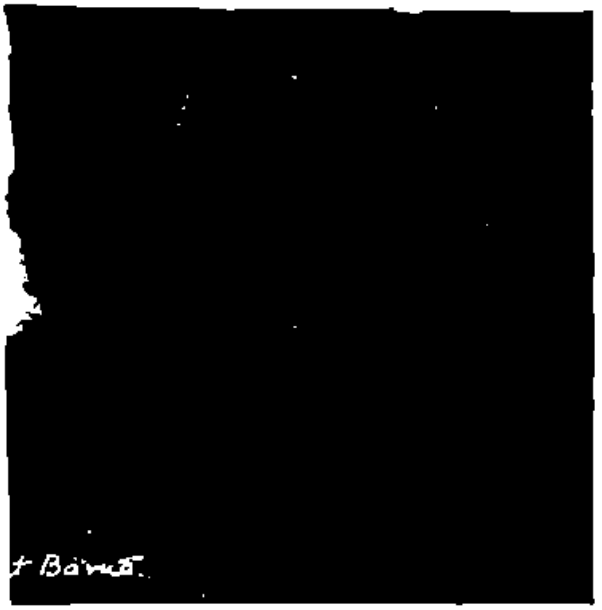

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
প্রতিষ্ঠিত

পৌষ ২৭ ১৩৫৬

৫২তম বর্ষ

হিমগিরি থেকে এল উত্তরে হাওয়া...

গ্রামে এখন তাড়াতাড়ি রুত করার সময়। শীতে মরণাপন্ন সূর্য ঠাকুর! মানুষ ডাকছে—'উঠ, উঠ, সূর্য ঠাকুর, ঝিকিমিকি দিয়া।' সূর্য ঠাকুর কুয়াশায় চাপা পড়ে আছেন। ডাক শুনেও উঠতে পারেন না। করুণভাবে নিজের অক্ষমতার কথা জানান—'উঠিতে পারি না আমি ইয়লের লাগিয়া।' কিন্তু আপনি নির্ভয়। কেননা আপনার আছে

বোরোলীন

অ্যাডেপ্‌সলানের আশ্চর্য উপাদানে তৈরী সেই ভেষজসমৃদ্ধ ক্রিম, যা শীতের দিনে হবে আপনার ত্বকের পরাভয়। গা দিয়ে খড়ি ওঠা, ত্বক ফাটা, ত্বক কুঁচকানো বন্ধ ক'রে আপনাকে দেবে অম্লান রূপলাবণ্য।

বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সূচীপত্র

দ্বিপঞ্চাশত্তম বর্ষ, প্রথম খণ্ড ; পৌষ—১৩৭১ জ্যৈষ্ঠ—১৩৭২

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

অজ্ঞাতবাস ও পাণ্ডবেশ্বর (ইতিহাস)—
অধ্যাপক দুর্গাচরণ সরকার ৩১৯

অজ্ঞানতায় (কবিতা)—অনিলকুমার মোদক ৩৪৮

অবসৃষ্ট (কবিতা)—অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য ৭৪১

আমি মনে করলেই (কবিতা)—
সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ৪৯

আচার্য্য শিরিষচন্দ্র (প্রবন্ধ)—
ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ১৭২

আশা (কবিতা)—অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য ... ২০১

আফ্রিকার দিনে (চিত্র)—মেষমল্লী ৩৭০, ৪৯৭

আসবে সেদিন (কবিতা)—মধুন দাশগুপ্ত ... ৬২৪

আজকের দিনে (ব্যঙ্গ চিত্র)—পৃথ্বী মেষমল্লী ৬২৯

আত্মানুসন্ধান (কবিতা)—অরুণেন্দু বক্সী ৬৩৪

ঈদের জোনাকিরা (কবিতা)—বিভা সরকার ৩১৬

ঈপ্সিত প্রতিভা (প্রবন্ধ)—
শ্রীবীরেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় ২১

উপলব্ধি (কবিতা)—অমরনাথ গুপ্ত ৪৪

উইলসন চাচিল—সুধীর গুপ্ত ২৪৮

ঋষি কবি ষতীন্দ্র বিমল (জীবনী)—
ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় ৫

এ. বি. সি. ডি (গল্প)—
শ্রীনির্মলকান্তি বসুমদার ৭

একটি সঙ্গীত (কবিতা)—
শ্রীশিশির মুখোপাধ্যায় ৮৮

এক দিন অন্তে (কবিতা)—
অনিলকুমার মোদক ৮৮

কবি (কবিতা)—শ্রীমোহিনীমোহন খাস্তগির ৮৮

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল স্মরণে (কবিতা)—
গোপালদাস ভাষাজীবী ৩৮

কুলদূর বৌদ্ধাদি (প্রবন্ধ)—আজা শাকতাদি ... ৩৯

কিশোর জগৎ— ১১০, ২২৫, ৩৭৩, ৪৭৭, ৬১৬ ৭২৪

পৌষ—
(ক) মহাকাশ অভিযানের কথা
(খ) দি গড্, একসাইল—
(গ) সমস্ত যাদের সন্তান পালন—
(ঘ) বাঁধা ও ইরাদি—

মাঘ—
(ক) উৎসব ও উচ্চ ঘনতা—
(খ) পুরাণ কাহিনী—
(গ) অসিতার টুইষ্ট—
(ঘ) ছুটির ঘন্টায়—
(ঙ) বাঁধা আর বেয়ালী—

ফাল্গুন—
কালো (গল্প)—পরশ বসু ২৪০

কোষ্ঠি বিচার (প্রবন্ধ)—জ্যোতি বাচস্পতি ২৪২, ৩৮৯
(ক) ভাষা ও আশা—
(খ) অসিতার টুইষ্ট—
(গ) ছুটির ঘন্টায়—
(ঘ) বাঁধা আর বেয়ালী

(৪) পুস্তক ইক্ষা—
(৫) রাজতন্ত্রের কথা—

চৈত্র—

কবি ও কবিতা (কবিতা)—সুধীর গুপ্ত ৪৪৭
কবির সন্ধ্যা (কবিতা)—আশুতোষ সান্যাল ৪৬৮

কিশোর জগৎ—

(ক) বিদ্যার পুরাতন——
(খ) বৌঠাকুরাণীর হাট—
(গ) অলিভার টুইষ্ট—
(ঘ) ছুটির ঘণ্টার—
(ঙ) বাবা আর বেয়ালি—

বৈশাখ—

(ক) সুনীতি ও দুর্নীতি—
(খ) অলিভার টুইষ্ট—
(গ) ছুটির ঘণ্টার
(ঘ) বাবা আর বেয়ালী

কৃষ্ণাঞ্জনা (কবিতা)—দুর্গাদাস সরকার ... ৭৪৫
খেয়ানৌকা—সম্পাদনা শ্রীপ্রমথ চট্টোপাধ্যায় ২৬৭, ৩৯৩, ৬১৮, ৫২২, ৭৭১
খেয়ালখুশী—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় ২৬৭, ৩১৩, ৬১৮, ৫২২, ৭৭১
খোলা জানালা ওধারে (কবিতা)—হাসিরাশি দেবী ... ৩৪৮
খাদ্য সমস্যার সমাধান (কবি)—পৃথ্বী বেদবর্ম্মা ২৫৯
গান কথা ও সুর—শ্রীমনুজ দে
গরলিপি—দেবা মুখোপাধ্যায় ... ৫০
গ্রন্থসৎ—উপাধ্যায় ৩৬, ৭৪৭
গ্রন্থসৎ—নিহিতার্থা ২৫১, ৩৮৯, ৬১৮, ৫১৯
গৌড়ী রেল (ইতিহাসে)—ভাগবৎপ্রসাদ বরাট ... ৬২৩
ঘুড়ির কথা ... ১২১
ঘোষ পাড়ার কথা (বিবরণ)—নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ... ৩৩৭
ছোট গল্প ও রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)—
শ্রীঅমিয়রতন চক্রবর্ত্তী ... ৭১০
জলে ডাঙ্গায়—এ্যাথাস্ ১২২, ৭০৯
টমাস হার্ডির উপন্যাস (প্রবন্ধ)—অরুণ বে ... ১৮৬
তুমি বে (কবিতা)—কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ... ৩৭
তিব্বতে জাপ্রয়ারী (প্রবন্ধ) কমলা দেবী ... ১৫১
তবু একদিন (কবিতা)—শিবেন্দ্র মোদকী ... ৩৯৯
তুমি আজও সাথ পাও (কবিতা)—
শ্রীসুধীরকুমার বাগচী ... ৬৭২
দক্ষিণভাঃ (ভ্রমণ)—কমল মুখোপাধ্যায় ২০২, ৩৩১, ৫৪৪, ৭১৫, ৩১৮
দেশের মাটি (গল্প)—তারক ভট্টাচার্য ... ২৭৫

দৈব উদ্ভবের আকাঙ্খা সফলতা (সংবাদ)—
শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৩০৪
দুই তীর্থ (ভ্রমণ)—অশোককুমার বরাট ৫৬১
ধর্ম্মতত্ত্ব (প্রবন্ধ)—শ্রীপ্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় ১
নিকার নদীর ধারে (গল্প)—রবিকুমার বসুমদার ২৩
নতুন বাড়ী (গল্প)—কবিতা চক্রবর্ত্তী ৪৪
নির্ব্বাণ (কবিতা)—চিত্রম ১০৩
নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী— ১৩৬
নতুন জীবন (গল্প)—স্নেহ মিত্র ... ১৬৪
নেতা (সংকট গান))—শ্রীজীব ভারতীর্থ ... ১৮৪
নেতাজী স্মরণ (কথা ও স্বরলিপি)—বিলীপকুমার রায় ... ১৮৩
নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন (বিবরণ)—
শ্রীবিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৭৪
নবীন প্রশস্তি (কবিতা)—অধিকাচরণ চৌধুরী ... ২৭৪
নববর্ষ (প্রবন্ধ)—তারাপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী ... ৪৪৮
নূতনের মাঝে পুরাতন (কবিতা)—সুধা সরকার ... ৪৪৮
নিশাচিকা (গল্প)—অতয় নন্দী ... ৫১০
প্রীতিলাভে সেই (কবিতা)—শ্রীকান্ত রায় ... ৪৪
প্রজাপতি মন (গল্প)—অজিত চট্টোপাধ্যায় ... ৪৫
প্রভুর কি ট্রাজেডী ? (প্রবন্ধ)—রূপকুমার চক্রবর্ত্তী ... ৮৫
পরিকল্পনা—সুনয়না সেনগুপ্ত ... ১০৩
প্রাচীন কবির লেখনীতে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা (প্রবন্ধ)—
ডাঃ দুর্গেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ... ১০৪
পট ও পটুয়া—শ্রীশ ১২৭, ৭৬৩
পূর্ব্বাভাস (গল্প)—পরমানন্দ মুখোপাধ্যায় ... ১৯০
পিপাসা (কবিতা)—অনিলকুমার ভট্টাচার্য্য ... ৭০৮
পরীক্ষা (গল্প)—শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায় ... ৩২৫
প্রার্থনা (কবিতা) - দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় ... ৩১৯
পালির ভাষা বিশ্লেষণ (প্রবন্ধ)—জ্যোতিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়— ৩৩১
পাগল কর (গল্প) —রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ৪০১
পল্লীর সাধনা (কবিতা)—
শ্রীগোপালদাস ভাষ্যতীর্থী ... ৭৪৫
প্রকৃতির আহ্বানে (কবিতা)—দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় ... ৪১৮
পরাজিতা প্রণয়িনী (গল্প)—বিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় ... ৪৪৬
পোষাক পরিচ্ছদে বাঙ্গালীর জাতীয়তা বোধ (প্রবন্ধ)—
শ্রীনলীনাক্ষ সিংহ ... ৭৫৪
প্রশ্ন (কবিতা)—সুধীরকৃষ্ণ সেনগুপ্ত ... ৪০৯
ফুলেরা সব গল্প আছে (কবিতা)—দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ৪৩৬
ভারতের শিল্প সংস্কার (প্রবন্ধ)—সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ১৫৩
ভালবাসি (কবিতা)—রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ... ২৫১
ভগ্নাংশ (গল্প)—নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত ... ৫৩৬

ভারতের ভাষা সমস্যা (প্রবন্ধ)—খগেন্দ্রনাথ সেন ... ৫৭১
ভারবাহী (গল্প)—অনিল মজুমদার ... ৪৮৬
ভয় থেকে তব অভয় মাঝে (প্রবন্ধ)—
স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য ... ৬৭৩
মেয়েদের কথা ৬৬৬, ৭২৮
(ক) রবীন্দ্রনাথের চোখে বিলাতের মেয়ে
(খ) প্রসূতি পরিচর্য্যা
(গ) রূপচর্চ্চা
(ঘ) কাদামাটির কারুশিল্প
(ঙ) এমব্রয়ডারি
(চ) রান্নাঘর
মাতৃভাষার দাবী (প্রবন্ধ)—অমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী ৪১৯
(ক) নারী জীবন বাদনা
(খ) প্রসূতি পরিচর্য্যা
(গ) রূপচর্চ্চা
(ঘ) কাদামাটি
(ঙ) ধনিকুশ সেলাই
(চ) রান্নাঘর
মন্ত্রযানের সঙ্গীতের সৃষ্টি ও প্রচার (প্রবন্ধ)—
শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৫২
যথারূপে বাংলা সাহিত্যে মেঘদূতবোধ (প্রবন্ধ)—
শ্রীপ্রমথকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৩১
মেয়েদের কথা ৮৮
(ক) সভ্যতা সঙ্কটে নারী ২১৫, ৩৬৯
(খ) যখন জাগল প্রেম
(ক) বয়স্পতির প্রতি উপদেশ
(খ) প্রসূতি পরিচর্য্যা ও শিশুমঙ্গল
(গ) রূপচর্চ্চা
(ঘ) হাতের কাজ
(ঙ) সূচিশিল্প
(চ) রান্নাঘর
(ক) নারীপ্রগতি,
(খ) প্রসূতি পরিচর্য্যা
(গ) রূপচর্চ্চা
(ঘ) কাদামাটির কারুশিল্প
(ঙ) সূচিশিল্প
(চ) রান্নাঘর
মাবলী (কবিতা)—সুদর্শন চক্রবর্ত্তী ... ৬৯২
মরুপথের নদী (গল্প)—মনথ রায় ... ৪৭২
মরুযাত্রা (গল্প)—অনিলকুমার মজুমদার ... ৭১৩
মধুমিতাকে (কবিতা)—
চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায় ... ৭২৪
মরশুমের মাস (কবিতা)—শ্রীপ্রবাল দত্ত ... ৭৩২
মরুদস্যুর (কবিতা)—শ্রীতারকপ্রসাদ ঘোষ ... ১৯
রবীন্দ্রচরিতে বঙ্কিমচন্দ্র (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩০৩
রবীন্দ্র চেতনায় পীঠস্থান (প্রবন্ধ)—
সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪২৯
রবীন্দ্র চিন্তায় আধুনিক সভ্যতা (প্রবন্ধ)—গৌরীহর মল্লিক ৪৫৩
রাবকুকের দর্শন (প্রবন্ধ)—শ্রীচিত্তরঞ্জন মজুমদার ৩৯৭
রোটেন—সুরমা মৈত্র ১২৩
বিষয়ের স্বরূপ (প্রবন্ধ)—
শ্রীমতী প্রতি দেবী
বিজ্ঞানের যোগবন্ধ ঘরে (গল্প)—
অধ্যাপিকা মায়ারুনা গোস্বামী ৬৯৯
বাদাংসি জীর্ণানি (উপন্যাস)—শক্তিপদ রাজগুরু ৩০
বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির কুফল (প্রবন্ধ)—
হরেকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
বিস্মরণীয় কবি মোহিতলাল (প্রবন্ধ)—
বিহিরকুমার রায় ৬৮
বিদায়ঞ্জি (কবিতা)—মুকুন্দবিহারী সি ৭২
বিচিত্র বিশ্ব (কবিতা)—
কর্ণদাস মুখোপাধ্যায়
ব্রহ্মবিদ্যা ও মুক্তিমন্ত্র (প্রবন্ধ)—
স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য
বাংলা সাহিত্যে ছিন্নপত্র (প্রবন্ধ)—সন্ধ্যা দেব
বঙ্কিমচন্দ্র (কবিতা)—জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী
বাস্তুবাদি (কবিতা)—অসিতবরণ চৌধুরী
বাংলা বিপ্লব প্রচেষ্টার লুপ্ত পাতা (বিবরণ)—
সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮
বাজ পক্ষের কথা—দেবশর্ম্মা বিরচিত ২৩৩, ৬২৪
ভক্তের হরিবর্ষণের (প্রবন্ধ)—
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ২৮৩
বাংলার চর্য্যাপদ (প্রবন্ধ)—
ডাঃ সুকুমারচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বাদশী মাঝ রাতের ঘর (নাটক)—লীলা বিশ্বাস
বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা (বিবরণ)—
সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বাহিরে ও ভিতরে (ধারাবাহিক)—
শ্রীবিমলকুমার রায় ... ৬৭৫
বসন্ত বৌরী (গল্প)—আশা পাকড়াশী ... ৬৭৭
বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম (প্রবন্ধ)—শ্রীবিধু রায়চৌ ... ৬৮০

বঙ্গের কবি প্রবীণ কাব্য (প্রবন্ধ)—
ডাঃ রমেশ গোস্বামী ... ৬৭১
বাজবন্ধ্য কথা— ... ৬৮৫
বিরহ (কবিতা)—প্রবীর ভট্টাচার্য্য ... ৪৪৪
পথ (কবিতা)—শ্যামলকুমার মিত্র ১১৬
শক্তি সংগ্রামে একজনের (প্রবন্ধ)—
নরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২৬
শাশুনী (গল্প)—ইন্দ্রনাথ মল্লিক ... ৭৪২
স্বামী বিবেকানন্দ (জীবন ও বাণী)—শ্রীকেদারনাথ মুখোঃ ... ১৭
স্বদেশী সঙ্গীতে বিজেন্দ্রলাল (প্রবন্ধ)—জ্যোতির্ময়ী দেবী ... ২৬
সাময়িকী ১০৫, ২১০, ৩৫৩, ৩৯৯, ৪৯১, ৬২৬, ৭৪৭
সাহিত্য সংবাদ ... ১৩৯
স্বভাব সন্ন্যাসী (কবিতা)—সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ১৭১
স্বভাব সুন্দর রামেন্দ্রসুন্দর (প্রবন্ধ)—অধিনীকুমার সেন ... ১১২
সভা (প্রবন্ধ)—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ... ২৬৯
স্বপ্নোক্তি (কবিতা)—শিশির মজুমদার ... ২৯৪
সহযাত্রী (গল্প)—বাসবী মুখোপাধ্যায় ... ৩৪০
সবুজের স্বপ্ন (কবিতা)—হরিসাধন দোলুই ... ৬৭৮
সঙ্গ দোষী (গল্প)—কেদারচন্দ্র গুপ্ত ... ৬৮৮
স্বরলিপি—কথা—শিশির মুখোপাধ্যায়
সুর—কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৭১
সংকটের সমাধান (প্রবন্ধ)—ভবানীপ্রসাদ রায়গুপ্ত ৪৪১
সমর সংলাপ (কবিতা)—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ৪৫৩
স্মৃতির ভাঁড় (কবিতা)—রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ... ৪৬৩
সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ে আড়ম্বরাদী (বিবরণ)—অমরেশ্বর ভাদুড়ী ৬৭৪
সাহিত্যিকগণ (শোক সংবাদ)—ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৬৮৪
স্বরলিপি—কথা ও সুর—গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৭১৭
সুধাংশুর রং (গল্প)—শ্রীসরোজ চক্রবর্ত্তী ৬৬৩
হাসি ও অশ্রুতত্ত্ব (প্রবন্ধ)—রাসবিহারী ভট্টাচার্য্য ৮২
হাত ছানি (গল্প)—দেবব্রত দেবগুপ্ত ১৪৩
হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ (প্রবন্ধ)—শিশির মাস ২৪২
হিন্দুধর্ম ও দর্শন (প্রবন্ধ)—
শ্রীকমলানন্দ ভট্টাচার্য ৬৩১
যাত্রা শেষে (কবিতা)—বিজয়চন্দ্র দাস ২১৪

পাঁচশালা সূচীপত্রের—চিত্রসূচী

পৌষ—একবর্ণ চিত্র—১
দ্বিবর্ণ চিত্র—২
একবর্ণ চিত্র—১
মাঘ—একবর্ণ চিত্র—১৪
বাইকলার চিত্র সরস্বতী—১
দ্বিবর্ণ চিত্র—২
ফাল্গুন—একবর্ণ চিত্র—১২
বাইকলার চিত্র—১ দ্বিবর্ণ চিত্র—২
চৈত্র—একবর্ণ চিত্র—১৩
বাইকলার চিত্র—১ দ্বিবর্ণ চিত্র—৩
বৈশাখ—একবর্ণ চিত্র—৪
বাইকলার চিত্র—১ দ্বিবর্ণ চিত্র—৩

বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের প্রতি

অগ্রহায়ণ মাসে যে সকল বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকের চাঁদার টাকা শেষ হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ১০ই আষাঢ়ের পূর্বে মনিঅর্ডার যোগে বাৎসরিক ১৫৲ টাকা অথবা ষাণ্মাসিক ৭·৫০ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন। টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করিবেন। ডাকবিভাগের নিয়মানুযায়ী ভি, পি,তে কাগজ পাঠাইতে হইলে, পূর্বাহ্নে আদেশপত্র পাওয়া প্রয়োজন। ভি, পি, খরচ পৃথক লাগিবে। যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইবেন তাঁহারা মনিঅর্ডার কুপনে 'নূতন গ্রাহক' কথাটি উল্লেখ করিবেন।

কর্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

ম্যাগ্‌নোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা।

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

পৌষ—১৩৭১

দ্বিতীয় খণ্ড | দ্বিপঞ্চাশত্তম বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

প্রাণ সাধনা

বিমলানন্দ স্বামী

প্রাণ সম্বন্ধে প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটা মোটামুটি ধারণা আছে! এই প্রাণ আছে বলিয়াই তো আমি বাঁচিয়া আছি, আমার বাড়ী, আমার টাকা, আমার স্ত্রী, আমার ছেলে ইত্যাদি বলিতে পারিতেছি। কিন্তু এই প্রাণ যখন এই দেহে থাকিবে না, তখন আর আমার বলিতে কিছুই থাকিবেনা, যাহা কিছু এতকাল আমার বলিয়া ভাবিয়াছি এই দেহ পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সকলই অপরের হইয়া যাইবে, আমার বলিতে কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। এমন কি যে দেহের জন্য এই 'আমার আমার' বোধ ছিল, সেই সযত্ন পালিত দেহটাই পুড়াইয়া ছারখার করিয়া দিবে। ভাবিলেও কি বুকটা কাঁপিয়া উঠে না? কিন্তু সত্য সত্যই চিরকাল তাহাই হইতেছে ও হইবে। ইহাই এই মর-জগতের চিরন্তন পরিণাম। সামান্য একটু চিন্তা করিলেই বোঝা যায় যে, যে দেহটাকে আমরা প্রতিনিয়তই 'আমি-আমি' বলিয়া সম্বোধন করি, বাস্তবিক সেটি প্রকৃত 'আমি' নয়। 'আমি-আমি' যে বলিতেছি, কিন্তু এই দেহের কোন্‌টা আমি? হাত? হাত দুইটি কাটিয়া দিলেও কি আমি থাকিনা যাই না? তবে কি পা? উহু, পাও নয়। পা কাটা মনুষ্য কি জগতে বিরল? এইভাবে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যেটিকেই বাদ দেওয়া যাক না, আমি ঠিকই থাকিয়া যাইতেছি। তবে আমাদের এই দেহে এমন কি জিনিষ আছে যেটিকে বাদ দিলে আর আমি থাকি না?

আচ্ছা, একটি মৃতদেহ দেখিলে কি মনে হয়? মনে হয় না কি যে তাহার হাত-পা, চোখ, মুখ সব কিছু থাকিয়াও কিছুই নাই? কেন? না, তাহার প্রাণই নাই! সুন্দর-শিশুর পরিত্যাগ করিয়া সেই অচিন পাখী কোন্ অচিন দেশে পলায়ন করিয়াছে! তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, প্রাণই আমার প্রকৃত 'আমি'। আবার এই প্রাণ তোমারও যাহা, আমারও তাহা। একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকারও যতটুকু প্রাণ, একটি হস্তীরও সেই ততটুকুই প্রাণ। কেবল আধার ভেদে শক্তির তারতম্য। এমন যে প্রাণ, সেই প্রাণকে আমরা কেহই চিনিবার চেষ্টা করি না। অথচ আমাদের স্ত্রী বা ছেলে মরিয়া যাইলে শোকে পাগল হই! ভাবিলেও কি হাসি পায় না? যাহার জন্য, যাহার বিয়োগ-বেদনায় অধীর হইয়া আমি ক্রন্দন করিতেছি সে তো ঐতো আমার সম্মুখেই পড়িয়া রহিয়াছে। তবে কিসের জন্য এ বিলাপ? না, উহার যে প্রাণ নাই, ওযে মৃত। আর তো ও কথা কহিবে না, হাসিবে না, উঠিয়া দাঁড়াইবে না! তাই কাঁদিতেছি—উহার প্রাণ নাই বলিয়া কাঁদিতেছি। কিন্তু যাহার জন্য আজ আমি কাঁদিয়া ভাসাইতেছি, সেই প্রাণের তো কোনদিন খোঁজ করি নাই, সে কে কেমন তাহা জানিবার জন্য তো বিন্দুমাত্রও আকুলতা মনে কোনদিন আসে নাই! তবে? আজ হবে কেন এত শোক করিতেছি? যাহাকে আমি চিনি না, জানি না, দেখি নাই কোনদিন আজ সেই অজ্ঞাত, অপরিচিত প্রাণের বিরহে কেন হবে নিজের মাথার চুল যন্ত্রণায় ছিঁড়িতেছি? কারণ আমরা মূর্খ, অজ্ঞান। শত ঠেকিয়াও আমাদের চৈতন্য হয় না। আমরা বিষয়-সম্পত্তির জন্য যতটা ভাবি, স্ত্রী-পুত্রের জন্য যতটা চিন্তা করি, তাহার সিকি ভাগও যদি এই অমূল্য প্রাণরত্নের জন্য ভাবিতাম, কে আমি-জানিবার চেষ্টা করিতাম, তবে বোধহয় আমাদের দুঃখের বৈতরণী পার হওয়া কিছুটা সহজ হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা আমরা করি না। এই আপাত-মনোহর ও পরিণামে দুঃখের নিলয় স্বরূপ কামিনী-কাঞ্চনের মোহিনী মায়ায় ভুলিয়া তাহাদের পায়ে নিজেদের উৎসর্গ করি ও পরিশেষে কঠোর যাতনা ভোগ করি। তবে কি আমাদের পরিত্রাণের কোনও উপায় নাই? চিরকালই এই জন্ম-মৃত্যুর হাতের পুতুল হইয়া ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে? না, তাহা নহে? উপায় নিশ্চয়ই আছে। সমস্যা থাকিলে তাহার সমাধানও নিশ্চয়ই আছে। কি সেই সমাধান? না, চাই সাধনা। বুদ্ধদেব, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণপরমহংস, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, ত্রৈলঙ্গস্বামী, রামকৃষ্ণদেব প্রভৃতি মহাপুরুষেরা নিজেদের জীবনে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের জীবন দর্শন বলিতেছে এই মায়াময় সংসারের নরক-যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে সাধনা চাই-ই চাই। নতুবা মুক্তি বা নির্বাণ সুদূরপরাহত। আর যতদিন এই মুক্তি লাভ না হইবে ততদিন চিরদুঃখের আকর এই জগতে গমনাগমন করিতেই হইবে। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই মানুষ—চুরাশী লক্ষ জনমের পর জীব এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করে। সেই মানুষ—যে মানুষ আজ বিজ্ঞানে বুদ্ধিবলে স্থলে জলে অন্তরীক্ষে অবাধে বিচরণ করিতেছে, কত অসম্ভবকে সম্ভব করিতেছে, সেই মানুষ হইয়া আমরা কেবল আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনেই পশুর মতন কাটাইয়া দিব এই স্বল্প কয়েকদিনের মহামূল্যবান জীবন? ধিক্ আমাদের! আমরা যে অমৃতের সন্তান তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, নতুবা যে প্রকৃতি আমাদের দাসী, সেই দাসীরই পদতলে নিজেদের সঁপিয়া দিয়াছি। কি পরিতাপের! সেই চিরআনন্দময়, চিরশান্তিময়, চিরমঙ্গলময় জগতের সন্ধান আমরা পাই না, যেজগতে শুধুই হাসি, কান্না নাই, দুঃখ নাই, নাই কোন অভাব-অভিযোগ, আর তাই আমরা এই অধঃপাতের কিনারায় আগাইয়া যাইতেছি। সেই সৎ-চিৎ-আনন্দের সংবাদ যেদিন আমরা পাইব, সেইদিন যেন আমরা একটা ভীষণ দুঃস্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইব। সেই তখনই বুঝিতে পারিব, কে কার পুত্র, কে কার পত্নী। সবই সেই একই মহাসমুদ্রের জল, একই অখণ্ড আত্মার বিভিন্ন প্রকাশ—মোহিনী মায়ার খেলা! আর সেই মহান্ উপলব্ধির জন্যই সাধনার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এই সাধনার প্রারম্ভে কামিনী-কাঞ্চনকে লাথি মারিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতে হইবে, নতুবা সাধনার পদে পদে বিঘ্ন অবশ্যম্ভাবী। যোগ-ভোগ একসঙ্গে হওয়া অসম্ভব।

মহাত্মা তুলসী দাস তাই বলিয়াছেন—

যাঁহা কাম, তাঁহা নহি রাম,

যাহা আছে, তাহা নাহি আছে।

যোগে এক নাহি মিলে রবিরজনী এক ঠাঁই।

দিনরাত্রি একসঙ্গে হওয়া যেমন সম্ভব নয়, যোগে ভোগও তেমনি। নদীর পরপারে যাইতে হইলেও কি এপারকে ত্যাগ করিতে হয় না? তারপর যোগ্য-গুরু অন্বেষণ করিয়া তাঁহার কাছে এই প্রাণের সাধনা শিক্ষা করিতে হইবে। গীতায় প্রাণকেই ভগবান বলা হইয়াছে—

প্রাণো হি ভগবানীশঃ প্রাণং বিষ্ণুঃ পিতামহঃ।
প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ॥

অর্থাৎ এই প্রাণই ভগবান, প্রাণই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, এই প্রাণকেই ধারণ করিয়া লোকসকল বাঁচিয়া আছে, আর এই জগতের সকল কিছুই প্রাণময়।

গীতায় আরও বলা হইয়াছে যে, এই প্রাণ, অমর, শাশ্বত (অর্থাৎ এই প্রাণ জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে এবং মহাপ্রলয়ের পরেও থাকিবে), সুতরাং এই প্রাণের আর বিনাশ নাই, আগুন ইহাকে পোড়াইতে পারে না, জল ইহাকে সিক্ত করিতে পারে না, শস্ত্র ছেদন করিতে পারে না। আবার ইহা একই সময়ে সকল স্থানেই আছে, অর্থাৎ এমন কোন জায়গাই নাই যেখানে এই প্রাণ নাই। ইনি বিরাটের চেয়েও বিরাট, আবার অণুর চেয়েও সূক্ষ্ম (অণোরণিয়ান্ মহতো মহীয়ান্) এই প্রাণকে জানিলেই বিশ্বের সবই জানা হইয়া যায়, পৃথক ভাবে আর জানিবার প্রয়োজন থাকে না।

যাক্, এখন সংক্ষেপে প্রাণের সাধনা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্।

গীতামুখে শ্রীভগবান বলিতেছেন—

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপান গতীরুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি। ৪।২৯

এখানে শ্রীভগবান যে প্রাণযজ্ঞের কথা বলিতেছেন, এইটিই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন পন্থা; যাহা স্বয়ং ভগবানই যুগে যুগে যখন যখনই মানুষ ইহার যথারীতি সাধন-প্রণালী ভুলিয়া যায় আর সদ্‌গুরুর একান্ত অভাব হয়, তখনই ইহার প্রকাশপথে অবতীর্ণ হন। ইহা তাঁহার প্রকাশিত রাজাধিরাজ যোগের শ্রেষ্ঠতম ক্রিয়া, ইহাই অন্তর প্রাণায়াম। ইহাকেই ভগবান কখনও স্বকর্ম্ম, কখন স্বধর্ম্ম, আবার কখনও বা স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম ও সহজ কর্ম্ম ইত্যাদিরূপে ক্ষেত্রভেদে প্রয়োগ করিয়াছেন। যাক্, এখন স্থূল বা বহির্ভাগে ইহার অর্থ কি দেখা যাক্।

ভগবান বলিয়াছেন—

"কেহ অপানে প্রাণের আহুতি দেন এবং প্রাণে অপানের আহুতি দেন। এইরূপ করিতে করিতে প্রাণবায়ুর গতি স্বতঃই রুদ্ধ হইয়া গেলে প্রাণায়াম-পরায়ণ হইয়া থাকেন এবং এইটি অভ্যাস হইলে" নিয়তাহার অর্থাৎ (এখানে গুরু উপদেশমত বিধিপূর্ব্বক বায়ুগ্রহণ করাকেই বুঝিতে হইবে। এবং সুলতঃ মিতভোজী ইহাও বুঝিতে হইবে। কেননা, প্রাণায়ামী হইতে হইলে এই দুইটিরই বিধি নিয়মের বিশেষ আবশ্যক আছে) নিয়মমত প্রাণবায়ুকে হৃদয়ে টানিয়া লইয়া ক্রিয়া বিশেষের সাহায্যে তাহার উপর প্রাণেরই হোম করিতে যাইবে। ইহার বিশেষ বিবরণ সদ্‌গুরুর উপদেশে লভ্য। তথাপি সাধারণতঃ প্রাণায়াম বিষয়ে নানা লোকের নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা ভঞ্জনার্থে এবং ইহার সাধন যে আবালবৃদ্ধ-বনিতার পরম উপকারী, তাহা বুঝাইবার জন্য এই অমৃতোপম সাধনের কিঞ্চিৎ আভাস দিতে চেষ্টা করা যাক্।

নাভিস্থানের নিম্ন হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত যে বায়ু আছে এবং ঐ স্থানটুকুর মধ্যেই যাহার ঊর্দ্ধাধঃগতি সর্ব্বদাই চলিতেছে, তাহাকে অপানবায়ু বলে। আর নাসিকার বহির্ভাগ হইতে বুকের ভিতর দিয়া নাভিস্থানের উপর পর্য্যন্ত যে বায়ুক্রিয়া ঐ স্থান মধ্যেই উপর নীচে চলাফেরা করে, তাহাকেই প্রাণবায়ু বলে। কিন্তু এ দুইটিই বহির্বায়ু। আর মেরুদণ্ডের হাড়ের ঠিক মধ্য দিয়া যে ছিদ্র আছে, তাহার ভিতর দিয়া অন্তরবায়ু সর্ব্বদাই প্রবাহিত হইতেছে। তাহার ঊর্দ্ধসীমা একেবারে মাথার ব্রহ্মরন্ধ্রের শেষকূট পর্য্যন্ত। গুহ্যদ্বারস্থ মূলাধারচক্রে বহির্বায়ু ও অন্তরবায়ু মিলিত হইবার জন্য একটি ছিদ্রপথ আছে। আবার নাসিকার ঊর্দ্ধ আজ্ঞাচক্রের মধ্যেও ঐরূপ অন্তর বাহ্য বায়ু মিলনের জন্য আর একটি ছিদ্রপথ আছে। যোগে আমাদের দরকার যে, এই বহির্বায়ুর গতি ক্রমে মৃদু করিয়া অন্তরবায়ুর সমুৎকর্ষ সাধন করিয়া সহস্রার মধ্যে যে স্থির প্রাণবায়ু আছে, এই গতিশীল অন্তরবায়ুকে তাহার সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া। ইহাতে

বহির্বায়ুর নিঃশ্বাস ও অন্তরবায়ুর উৎকর্ষ চেষ্টায় বহির্ভাবে যাহা আমাদিগকে মাত্র জগৎভাবের দিকেই মাতাইয়া রাখিয়াছে, তাহা বন্ধ হইয়া অন্তরভাব—ঈশ্বরানুভূতি তথা দেব দর্শন, দিব্য জ্ঞান, অমৃত আত্মজ্ঞান প্রভৃতি উৎপন্ন হইবে। ইহা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সত্য। যোগশাস্ত্রেও সিদ্ধান্ত আছে—

"চলে বাতে চলে চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ।

অর্থাৎ প্রাণবায়ু যেমন চলে বা চলে না, চিত্তও তেমনি চলে বা চলে না। অর্থাৎ বায়ুর জয়েই মন জয় হয়। মনই জগৎ সংসারের দৃশ্যতে অমৃত আনন্দময় আত্মাকে জীবভাবে ভাবিত করিয়াছে। নতেৎ আনন্দের সন্তানের আর নিরানন্দ কোথায়? যাক্, এখন প্রাণায়াম বিধান এই যে প্রাণবায়ুকে অধঃচালিত করিয়া বা টানিয়া লইয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে অপান-বায়ুকে ঊর্দ্ধে সংকোচ করিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিলে (কুম্ভক) ঐ বায়ু চলাফেরা করিতে না পারায় মূলাধার চক্রের অগ্নি মিলনের পথে বাধা দেওয়ায় ঐ পথের সংকোচতা বিদূরিত হইয়া প্রসারিত হয় এবং মেরুদণ্ড ব্রহ্মনাড়ীতে প্রবেশ করে এবং ক্রমে ক্রমে যোগাবস্থা ও পরাবস্থা, পরাগতি বা পরাস্থিতি পায়। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"ঊর্দ্ধশক্তিঃ নিপাতেন অধঃশক্তি নিযুক্তনাৎ।
মধ্যশক্তিঃ প্রবোধেন জায়তে পরমং পদম্।"

আর বিশেষ কথা এই যে, এই প্রাণ-সাধনা যোগী ভোগী রোগী—সকলের পক্ষেই বিশেষ আবশ্যকীয়, ইহাতে স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, বল, মানসিকতা, চিন্তাশীলতা, আয়ু, বিদ্যা ইত্যাদি বহু বিষয়ে উন্নতি হয় এবং মানুষ সর্ব্ববিষয়েই সুখী হইতে পারে। ওঁ তৎ সৎ।

মন-ময়-আমি

শ্রীগণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আমি একদিন
আমার স্বপনের প্রান্ত সীমানায়,
দেখিলাম জেগে
আমি মরে গেছি।
আমি ছাড়া আমার বিযুক্ত দেহ
অচল অকম্প
নিরবলম্ব পেশীতে
ধীরে ধীরে মহাশূন্যে মিলাল;
তেজ, ব্যোম, কীর্ত্তিতে
কোন শেষ সলীল বিস্তারে
অগাধ অনন্ত অস্তিত্বে।

আমি মুক্তদেহ, অবশেষে
শুধু একমন
তখনও আমাকে ছাড়েনি,
সে শুধু বলিল আমি আছি;
আবার এ দেহ পেলাম।
বার বার স্বপনের মাঝে জেগে
দেহ ত্যাগ;
আমার মনের স্বপনে ঘুমিয়ে
এ দেহ পেয়েছি।
ভূঃ ভুবঃ স্বঃ লোক হতে
ফিরে এনে।

অভাবনীয়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ছত্রিশ

কিন্তু অফিসার মহারাজ রোডে মটর মধুসূদন পাণ্ডুয়াং-এর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না। রাস্তায় মাঝপথে আর এক অফিসার আটকালেন।

"কোথায় যাবেন ?"

"আর বি আপ্তে রোড।"

"ওঃ! সেখানে এক বাঁশ জল।"

নমিতা জিজ্ঞাসা করল : "জল কি আরও বাড়ছে ?" তখন বেলা তিনটে।

অফিসার বললেন না। কথার দিকেই—thank God! তবে মনে তো হয় না যে, সন্ধ্যার আগে আপনারা আর, বি আপ্তে রোডে সাঁতার না দিয়ে পৌঁছতে পারবেন! ঐ দেখুন—দেখছেন ? ঝাঁসির রাণী বোধ হয় এ-যাত্রা বেঁচে গেলেন ত্রিশ ফুট উঁচুতে তাঁকে ঘোড়ায় চড়ান হয়েছিল বলে। আর ঐ দেখুন—দেখছেন ? শম্ভাজি পার্কের ঐ গাছে কী ঝুলছে ?"

নমিতা তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল : একটি সাত আট বছরের শিশু ফ্রক আচকে হেঁটমুণ্ড হ'য়ে ঝুলছে আর দুলছে।

অফিসার হাসলেন : "ম্যাডাম, বাড়ী যান। এখানে নানা ভাবে নানা ভাবে মানুষ ঝুলছে আমি গত দুঘণ্টায় তিন তিনটি শিশুকে নামিয়েছি। আপনি এ-দারুণ দৃশ্য সইতে পারবেন না—তাই বলছি বন্ধুদের খবর নিতে চান কাল নেবেন—কিম্বা সন্ধ্যার পরে—জল নেমে গেলে। এখন আমাদের কাজ করতে দিন।" ব'লেই উধাও—এক পুলিশের ট্রাকের পানে। সাধুজি করুণ হেসে নমিতাকে বললেন : "যখন কোনো দিকেই কূল-কিনারা পাওয়া গেল না তখন কুটীচক হওয়াই পন্থা না!"

ওরা ফিরল!

• • •

মহুভাইয়ের প্রবল জ্বর। একশ' চার ডিগ্রী। বিকারের ঘোরে কেবল বকছে "শোভনা প্রবীর···ওদিকে নয়···এদিকে···ওহো মেয়েটাকে তাড়িয়ে দিলাম···ধিক্··· সব ডুবে গেল···ও হো হো···

সাঁইত্রিশ

রমা সাধুজির পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে বলে : "বাবার এত বড় শাস্তি···তার উপরে পেটে ক্যান্সার"···কথাটা শেষ হয় চোখের জলে।

সাধুজি ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, "না মা, শাস্তি তিনি দেন না! প্রসাদ দেওয়াই তাঁর স্বভাব। তবে কি জানো ? আমরা মানুষ তো···তাই ভাবি আমাদের ছন্দেই তিনি চলেন—ভালো লোককে বকশিস দিয়ে আর মন্দ লোককে দণ্ড দিয়ে। আসল ব্যাপারটা ঠিক এ-ধরণের নীতিপাঠ নয়। তিনি জগৎ করবার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি নিয়ম কানুন করেছেন। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে, বিষ খেলে মরবে, স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করলে মোটামুটি সুস্থ থাকবে, দীর্ঘজীবী হবে, সুকর্ম করলে মনে শান্তি পাবে, দুষ্কর্ম করলে অশান্তি। লাখে পনর আনা মানুষ এই নিয়মগুলি মেনে বা ডিঙিয়ে চ'লে সুখী হয় বা দুঃখ পায়। কেমন ? এই হ'ল জাগতিক নিয়ম।

কিন্তু আর একটা শক্তি আছে—তাঁর করুণা। সে চলে তার নিজের নিয়ম মেনে। সে কখনও পাপীকে মারে তারই কর্মফলের ভাণ্ডার। কখনও ভক্তকে বাঁচায় অগ্নিপরীক্ষায়। পাপী যখন পাপ ক'রেই চলে—যখন বুঝেও বোঝে না যে, ভগবানের নিয়মকানুন না মানলে দুঃখ তাকে ভুগতেই হবে—তখন কখনো কখনো তাঁর এই করুণাকেই ধরতে হয় রুদ্রমূর্তি—বা চণ্ডীমূর্তি, যাই বলো। এরই নাম—অন্যায়ের চলতি পরিভাষায়—শাস্তি বা দণ্ড। কিন্তু তিনি এ-শাস্তিকে ঠিক শাস্তি ব'লে ধরেন না যে-কথা ভাগবতে বলেছে কালীদমন অধ্যায়ে। কালীয় বালগোপালকে ছোবল মেরে রক্ত বমি ক'রে যখন নেতিয়ে পড়ল তখন নাগপত্নীরা এসে ঠাকুরকে স্তব ক'রে বলল: 'ব্যস্ আর না। আমরা বুঝতে পেরেছি, আমাদের স্বামীও ঠেকে শিখেছেন যে তোমার ক্রোধও তোমার করুণারই রূপান্তর, "ক্রোধো হি তে অনুগ্রহ এব সম্মতঃ।" যখন মানুষ তার জীবনযাত্রায় শিবকে প্রেমের ছন্দে বরণ না ক'রে দূর ছেই করে—তখন শিবই আসেন রুদ্র হয়ে, দুর্গা চণ্ডী হয়ে, গোপাল চক্রধর হয়ে। কিন্তু শাস্তি দিতে নয়—তাঁর জগৎচক্রকে সামনের দিকে চালাতে। আমাদের তিনি সুবুদ্ধির দিয়েছেন দুর্বুদ্ধির সঙ্গে। তিনি চান বৈ কি—আমরা শুভবুদ্ধিকেই সারথি করি। কিন্তু আমাদের তিনি ইচ্ছার (ওরকে বাছাই করার) স্বাধীনতাও দিয়েছেন সেই সঙ্গে। নইলে পাপ পুণ্য ভক্তি অভক্তির কোনো মানেই থাকে না—বিশ্বলীলা হয়ে দাঁড়ায় একটা অবয়বস্তি—পুতুলনাচ। তাই নাস্তিক হবারও অধিকার আছে প্রত্যেকেরই···কেবল না স্তিক হ'লে তার ফলও ভুগতেই হবে—যানে, দাম দিতেই হবে—আজ না হোক কাল, এ জন্মে না হোক পরজন্মে। মনুভাইয়ের নাস্তিকতার ফল এ-জন্মেই ফলল—এও তাঁর করুণাই বটে। নইলে হয়ত তাকে আরও কত জন্ম ভুগতে হ'ত কে জানে?"

আলোক: কিন্তু এ সবই কি মেনে নেওয়ার যুক্তি নয়? যে মানতে না চায়?

সাধুজি: না বাবা, যুক্তি আমি দিতে চাই নি। কারণ আস্তিক বা ভক্ত মেনে নেয়—হয় মানার আনন্দে, না হয় দৃষ্টির প্রসাদে—যুক্তির নির্দেশে নয়। তাই শাস্ত্রে বলেছে—ভক্ত কেবল সেই হ'তে পারে যে ভক্ত হ'তেই জন্মেছে, যাকে তিনি পেয়ে বলেছেন 'ঘমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'। কিনা ঠাকুর যাকে বরণ করেন কেবল সেই তাঁর নাগাল পায়। এই জন্যেই তোমাদের কাছে আমি চাই—তোমরা মেনে নেবে, কেননা যাদের তিনি বরণ করেছেন আপন ব'লে তারা শুধু এই একটি দামই দিতে পারে: তাঁর বরণমালাকে বরণ করা—আনন্দের অঙ্গীকারে, প্রাণের প্রণামে। এইখানেই দেখতে পাবে দুটো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতি বা স্বভাবের বিপরীত রীতি, একদিকে শোভনা বা মনুভাই, অন্যদিকে রমা মৌরী। মৌরীর ভক্তি-বিশ্বাস এত কাছ থেকে দেখেও মনুভাই চাইল না সে-রঙে রঙিয়ে উঠতে। রমাকে সত্যিই স্নেহ করা সত্ত্বেও পারল না তার মতন সরল ছন্দে ভগবানকে মেনে নিতে—কেননা তাকে তিনি আগে থেকে বরণ করেন নি, আপন ক'রে টেনে নেন নি। কিন্তু—ব'লে রমার দিকে চেয়ে সস্নেহে—তুমি যা সহজেই সাড়া দিতে চাইলে ব'লে ঝুঁকতে পারলে আস্তিকতার দিকে—ঠিক যেমন মনুভাই সাড়া দিতে চাইল না ব'লে রয়ে গেল রোখালো নাস্তিক ভোগবাদী, ভোগবাদী থেকে দুর্বল, দুর্বল থেকে শেষে রৈণ। নাস্তিকতার কর্মফল অনেক সময় এই ভাবেই টেনে আনে বুদ্ধিভ্রংশ। তবু ঠাকুরের একটু করুণা সে পেয়েছিল তোমাকে ভালোবেসে। তাই মরতে মরতে বেঁচে গেল। কিন্তু এ-আলোচনা আজ থাক্ মা। আজ তুমি শুধু এই প্রার্থনাই করো একান্ত হ'য়ে যে, এখন থেকে দিনে দিনে যেন শুধু তাঁকেই আপন মনে করতে পারো—যাকে মেনে তুমি করুণা পেলে ব'লেই পাপ তোমার কাছে এল বর হয়ে, ঘটাল অঘটন। একবার ভাবো দেখি মা, কী অঘটনটাই ঘটল: দুই কুটিলা ষড় ক'রে তোমাকে পাকে ফেলতে এসে নিজেরাই পড়ল পাকে—যার ফলে তোমাকে খেদিয়ে দেওয়ার দরুণই তুমি বেঁচে গেল—যদি তোমাকে তাড়িয়ে দেওয়া না হ'ত তা হলে তুমি বন্যায় ভেসে যেতে। এই অঘটনটা ঘটালো তাঁর যে-করুণা তাকে যেন তুমি মনে প্রাণে বরণ করতে পারো—আরও আরও আরও। বরণ করা মানে—শোক পেলে প্রশ্রয় দিও না। যেটুকু দেখতে পেয়েছ তাঁর কৃপার নিদর্শন ভক্তদের মাঝে, সাধুদের মাঝে,

মহৎ মানুষের মাঝে, দয়া প্রীতি সহিষ্ণুতা মাধুর্য এই সব সাত্বিক গুণের মাঝে—সেইটুকু থেকেই যেন তাঁকে আরো আঁকড়ে ধরতে পারো এই সরল বিশ্বাসে যে যিনি আমাকে এমন প্রত্যক্ষভাবে কৃপাধন্য করেছেন তাঁর বিশ্বলীলা আমি বুঝতে না পারলেও তাঁর চরণে যদি শরণ নিতে পারি তাহলে যেটুকু বোঝা আমার দরকার সেটুকু তিনি বুঝিয়ে দেবেনই দেবেন। এক কথায়, বহু ভাগ্যবলে—'বহূনাং জন্মনাম্ অন্তে'—জ্ঞানের আলো পেয়ে যে ভক্ত হ'তে পেরেছে সে যেন নিজেকে ধন্যজ্ঞান করে তাঁর করুণার স্পর্শেই জ্ঞানভক্তি জেগেছে ব'লে—তর্কযুক্তি বিজ্ঞানকে যেন সে ডাক না দেয়—জ্ঞানভক্তি বিশ্বাসের তরফে একালতি করতে। সে যেন চায় কেবল একটি জিনিষ—তাঁর পায়ে শরণাগতি। ব্যস্। কারণ তাহলেই সে হবে কৃতার্থ—আপ্তকাম, শেষে তাঁর বাহন লীলাসাথী। এর পরে আর কী চাই মা? তিনি কি ভাগবতে বলেন নি—'আমাকে যে ভক্তি করে সে অমৃত হয়—'মন্নি ভক্তি র্হি ভূতানাম্ অমৃতত্বায় কল্পতে'?

আটত্রিশ

পরদিন সকালে মধুভাইয়ের জ্বর আরও বাড়ল, একশ পাঁচ ডিগ্রী। রমা আলোককে বলল: "তা হোক, আমি আছি। আপনি একটিবার মাসিমাদের খোঁজ নিয়ে আসুন যদি পারেন।"

মধুভাইকে আর একটা পেনিসিলিন ইঞ্জেকশন দিয়ে ওরা তিনজন বেরুল ফের মোটরে সকাল আটটায়। নমিতা সঙ্গে করে নিল কয়েকটি ধুতি, শাড়ী, ব্লাউস, ইত্যাদি।

সাধুজি আলোককে হেসে বললেন: "দেখলে বাবা, আমাদের সঙ্গে মেয়েদের প্রভেদ? ওরা যে আধের ভেবে চলে—তাই আকাশ ধ্যান করলেও মাটিকে ভোলে না।"

* * *

হোলকার পুল দিয়ে হুমাইলের জায়গায় হুমাইল ঘুরে নারায়ণ পেঠের উপান্তে পৌঁছতে প্রায় ঘণ্টা লেগে গেল। পথে যে দারুণ ভিড়—মিনিটে মিনিটে মোটর দাঁড় করাতে হয়। আবালবৃদ্ধবনিতার জটলা সর্বত্র। তার উপর ঘোড়ে ঘোড়ে মোতায়েন-করা পুলিশ, সৈনিক, ট্রাক, সাইকেল···কী নয়?

কিন্তু নারায়ণ গেট অবধি গাড়ি নিয়ে যাওয়া অসম্ভব, প্রায় হাঁটু পর্যন্ত পিঙ্গল পাঁকের সম্ভতি রেখে তবে রাক্ষসী বন্যা প্রস্থান করেছে। অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে চলতে হয়···যে পিছল!···রাস্তা থেকে জল স'রে গেছে বটে, কিন্তু যে-সব বাড়ি একটু নিচু জিতে দাঁড়িয়ে তাদের প্রাঙ্গণে জল এখনও থৈ থৈ করছে। বহু বাড়িরই ছাদ দেয়াল খসে গেছে, একটি বাড়িরও দোর দাঁড়িয়ে নেই। রাস্তার দু'ধারে স্তূপাকৃতি ইট কাঠ টিনের ছাদ, আবর্জনা, মরা কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর। এক একটা বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে শোনা যায় কান্না, কোনোটা মৃদু, কোনোটা প্রবল—হাহাকার। পুলিশ এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে টেনে টেনে বার করছে কাগজ বই ভাঙা আসবাবপত্র—দু এক জায়গায় মৃত শিশু। নমিতা কের শিউরে উঠে চোখ ফিরিয়ে চলে এসিয়ে।

আলোক বলে: তুই না এলেই পারতিস্ নমিতা! ফিরতে চাস্?

নমিতা চকিতে ব্লাউসের হাতায় চোখের জল মুছে পাংশু মুখে বলে: "না না চল, আমি পারব। ফিরে গিয়ে রমাকে মুখ দেখাতে হবে তো?"

সাধুজি হেসে বললেন: "এই তো চাই মা! অবলা হ'তে যাবে কী দুঃখে?—বীরবালা!"

উনচল্লিশ

ঈশ্বর বাড়ীর এ কী অবস্থা! আলোক শিউরে ওঠে। দু'দিন আগেও যে-বাড়িতে ওরা সাধুজির ভজনে দোয়ার দিয়েছে সবাই মিলে—ভক্তি মালতী ঈশ্বর আলোক নমিতা পাণ্ডুরাং—সে বাড়ির নিচের তলায় একটা দোরও দাঁড়িয়ে নেই। রোয়াকে শুধু একটা ভিজে কুকুর আর একটা রুগ্নো বেড়াল শুয়ে। ওধার ঘরগুলির সব কাগজ পত্র ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে—উঠানে, রাস্তায়, সিঁড়ির সামনে—কোথায় নয়? এখানে ওখানে ভাঙা টেবিল চেয়ার টুল কাৎ হয়ে প'ড়ে। ভিজে কাপড়ের কাগজের ছাইপাঁশের ও কাঠের যোগফলে গাঢ় উঠেছে এক দুর্গন্ধায়নক গন্ধ। নমিতা নাকে কাপড় দেয়।

* * *

তিনতলায় সাধুজিকে তাঁর আসনে বসিয়ে ওরা বসল তাঁকে ঘিরে।

মালতী জোর করে প্রফুল্ল হ'বার চেষ্টা করে, বলে: "গুরুদেব! শুধু আপনার এই ঘর দুটিতেই জল ঢোকে নি—হেডস্যার ঘর ব'লে।"

সাধুজি (হেসে): না মা—শুধু তিনতলার ঘর ব'লে। কিন্তু···ওখানে ছাদে সার সার কারা শুয়ে?

ধ্রুব: অনাথাশ্রমের শিশুরা। কাল ওরা প্রায় সারারাত 'ক্ষুধের ও ভয়ে কান্নাকাটি ক'রে আজ ভোর রাতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভাগ্যে তিনতলায় একটু শুকনো মুড়ি আর চিঁড়ে ছিল।

সাধুজি: এদের নিয়ে এলে কখন? কাল রাতেই?

ধ্রু: (ম্লান হেসে): নিয়ে আসিনি—টেনেহিঁচড়ে নিচ্ছি। কেবল একটি শিশুকে ধরা গেল না—মণি।

নমিতা (চমকে): মণি?—ভক্তিদির?

সাধুজি: আহা! ভক্তি কোথায়?

মালতী: সারারাত কেঁদে আজ সকালে ঘুমিয়ে পড়েছে—পাশের ঘরে।

নমিতা (চোখের জল মুছে মালতীকে): ভক্তিদি মণিকে তোমাদের জিম্মায় রেখে গেল না কেন?

মালতী: কেউ কি জানত এমন কাণ্ড হ'বে চোখের পাতা না ফেলতে? প্রথমে পনেরো ভাম ভাঙতেই এখানে রাস্তায় এক কোমর জল। তার পরেই খড়্গ-বাদলার বাঁধ ভেঙে দেখতে দেখতে পঁচিশ ফুট জল বেলা বারোটায়! যেন একটা সমুদ্র ঢুঁ মারল! ভক্তিদি তখন অনাথাশ্রমে। বেরুতে পারল না কোনো মতেই। শুনুন বলি—সে কাহিনী শোনবার মত বৈ কি!

চল্লিশ

মালতী (সাধুজিকে): জানেনই তো ভক্তিদি আমাদের সামনের এই অনাথাশ্রমে অমনি পড়ায়—ওরা মাস মাস কিছু দিতে চেয়েছিল কিন্তু ভক্তিদি নেয় নি, বলল:

"অনাথ শিশুদের যদি নারায়ণ ভাবি তবে তাদের সেবা করাই তো আমার সেবার পুরস্কার।"

সাধুজি (আর্দ্রকণ্ঠে): আহা! আহা!

মালতী: সত্যি গুরুদেব, শিষ্যার মতন শিষ্য পেয়েছেন বটে, কিন্তু গুরুন আরো—কেমন শিষ্য। গেলা পরিষ্কার ক'রে) এই অনাথ শিশুগুলির মধ্যে দুটি মারা যায় গত বছর কলেরায়। ভক্তিদি প্রাণপণে সেবা করেছিলো ওদের—কিন্তু বৃথা। এখন ওকে পড়াতে হয় মোটমাট বারোটি ছেলেকে—নয় থেকে বারো বছরের মধ্যে তাদের বয়স।

ওর কুটিরটি মুখা নদীর প্রায় পাশে। দুটি মাত্র ঘর। একটি দাই মণির তদারক করে ও যখন বাইরে যায়, কি অনাথাশ্রমে পড়াতে আসে।

ভক্তিদি স্বভাবে একটু চাপা মেয়ে লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই। বড় বেশি কারুর সঙ্গে মেশে না, গল্প গুজবেও নেই। ও আসে কেবল এখানেই রোজ সন্ধ্যায়—যখন আমরা ভজন করি: বাস্! বাকি সময়টা ও ধ্যান-জপেই কাটায়, পড়ে বা পড়ায়। মণির দেখা শুনো ওকে খুব বেশি করতে হ'ত না—ওকে বোতলে দুধ খাওয়ানো সুরু হওয়া থেকে। কিন্তু মণি বলতে ও অজ্ঞান—জানেনই তো। হবে না? ওর যত স্নেহ পরেছিল গিয়ে যে ঐ একরত্তি নয়নতারাটির 'পরে। তাই তো ওর নাম দিয়েছিল ও "নয়নমণি"।

কাল সকালে ও ঠিক দশটায় অনাথাশ্রমে গিয়েছিল যেমন রোজই যায়। ছেলেদের এগারোটা পর্যন্ত পড়িয়ে ও দোতলায় গিয়েছিল একটি রুগ্ন মেয়েকে দেখতে। কারুর সেবা করতে পেলে ও যেন আর কিছুই চায় না। সাধে কি সবাই ওকে এত ভালোবাসে?

ও গিয়ে দুঃখিনী মেয়েটির মাথা টিপে দিচ্ছে এমন সময়—সওয়া এগারোটায়—অনাথাশ্রমের উঠোনে হঠাৎ হু হু ক'রে জল ঢুকতে সুরু করে। ছেলেরা তখন উঠোনে খেলা করছিল। জল ঢুকল এমনি তোড়ে যে, ওরা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে আর কি!

ভক্তিদি চিৎকার শুনে হুড় হুড় ক'রে নিচে নেমে আসতে না আসতে উঠোনে হাঁটুজল! সঙ্গে সঙ্গে অনাথ আশ্রমের তিনটি চাকরাণী ও কুড়িটি বালিকা মেয়ে—না উনিশটি, কারণ একটি দোতলায় শয্যাশায়ী—চিৎকার করতে করতে ছুটে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল। ভক্তিদির বুকের মধ্যে ছাঁৎ ক'রে উঠল মণির কথাভেবে—আরো এই জন্যে যে, ওর কুটিরটি মুখার প্রায় পাড়েই। ওর বুকের মধ্যে আকুলি বিকুলি ক'রে উঠেছে ছুটে নিজের ঘরে ফিরে যেতে, কিন্তু হবি তো হ ঠিক সেই সময়েই

এল ওর অগ্নিপরীক্ষা—ছেলেরা 'মা মা মা!' ব'লে হাত বাড়িয়ে ওকে ডাক দিল তাদের বাঁচাতে।

ও বলল আমাকে: "দিদি, আমি রাস্তার দিকে ছুটে যাব—ঠিক এমনি সময়ে এই শিশু কয়েকটি কেঁদে উঠল—দুতিন জন কোনোমতে জল থেকে উঠে আমাকে আঁকড়ে ধরল দু'হাতে। আমার মনের মধ্যে বেজে উঠল গুরুদেবের একটি কথা: শুধু নিজেরটিকে ভালোবাসার নাম মায়া, সবাইকে ভালোবাসার নামই দয়া। একটা বন্ধ করে, অন্যটা মুক্তি দেয়। কিন্তু অবুঝ মন কি ছাই মানা মানে? শুধু বলে: "যাও এদের ছেড়ে নিজেরটিকে বাঁচাতে!" যখন আমি অনাথাশ্রমে আসি, মণি একটা কাঠের দোলনায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিল। ঘাইটার 'পরে তো আর বিশ্বাস রাখা যায় না। তাছাড়া, এখানেই যখন এত জল তখন আমার কুটিরের ঘরে জল নিশ্চয় আরো বেশি। আমার প্রতি স্নায়ু যেন ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল: "দেরি কোরো না, ছুটে যাও—মণিকে বাঁচাও।" আমার ঘর অনাথাশ্রম থেকে কাছেই, তখনি বেরুলে পৌঁছতে পারতাম বৈকি তিন-চার মিনিটের মধ্যেই—পনেরো ষোলো বৎসর বয়সে সাঁতার দিয়ে গঙ্গা পার হয়েছি। জলে আমার কী করবে?—রাস্তায় পঁচিশ ছেড়ে পঞ্চাশ ফুট জল হ'লেও ভয় ছিল না, আরো এই জন্যে যে, স্রোতের মুখটা ছিল এখান থেকে আমার বাড়ির দিকেই। কিন্তু এই-যে অসহায় শিশু কয়টি—যারা শুধু আমাকেই মা ব'লে আঁকড়ে ধরল—তাদের কোন্ প্রাণে বন্যা রাক্ষসীর মুখে তুলে দিয়ে নিজের ধনটিকে সামলাতে যাব? তবে বেশি ভাববার তখন সময় ছিল না। তাই বললাম মনে মনে: ঠাকুর, বল দাও, আমি দুর্বল। শুধু আমাকে পারতেই হবে যে, না পারলে নিজের চোখে ছোট হ'য়ে যাব।"

"বলতে না বলতে দিদি," বলল ভক্তিদি জল-ভরা চোখে, "মনে আমার বিপর্যয় বল এসে গেল। আমি স্পষ্ট শুনলাম গুরুদেবের স্বর: "পারবি পারবি পারবি—আর পারতেই হবে তোকে।" সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন অন্য মানুষ হ'য়ে গেলাম—সত্যি দিদি, শুধু যে ভয় পালিয়ে গেল তাই নয়, মনে হ'ল—আমি সব কিছু পারি। মুখে বলতে অনেক সময় লাগছে—কিন্তু ভয় পাওয়া, ঠাকুরকে ডাকা, গুরুদেবের স্বর শোনা, অভয় হওয়া, সবশেষে অভয় দেওয়া—এসবই পর পর ঘ'টে গেল যেন বিদ্যুৎবেগে। আমি ওদের 'কোনো ভয় নেই' ব'লেই গাছকোমর বেঁধে বার বার জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে টানতে টানতে এক এক ক'রে ওদের নিয়ে সিঁড়ির প্রথম পৈঠেয় পৌঁছে দিয়ে বললাম: 'যা—উপরতলায় ছুটে ওঠ্—নাম্‌বি নি আর—আমি এলাম ব'লে।'

"কিন্তু দেখতে দেখতে সিঁড়িতেও জল উঠল। তখন দেখি একটি খোঁড়া আট বছরের ছেলে, আর একটি দশ বছরের কানা ছেলে উঠোনের জলে ভেসে চলেছে বাইরের দিকে।

"আমি ক্লান্ত হ'লেও ফের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তখন উঠোনে দুব জল। স্রোতও প্রবল। তবু শেষ দু'জনকে হাঁপাতে হাঁপাতে কোনোমতে টেনে তুললাম। ওরা তখন ভয়ে প্রায় অজ্ঞান, কিন্তু দুই চড় মেরে ওদের সজাগ ক'রে ওদের হাত ধ'রে টানতে টানতে তুললাম সিঁড়ি বেয়ে উপরে। বাকি দশজন ততক্ষণে উপরে একতলার বারান্দায় হাঁপাচ্ছে। আর দাসীরা মেয়েদের সঙ্গে একজোটে কেবল আপ্রাণ চেঁচাচ্ছে: 'বাঁচাও বাঁচাও' ব'লে।

"আমি আগুন হয়ে উঠলাম। বললাম: 'তোদের লজ্জা করে না? এই শিশু কয়টিকে ছেড়ে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে এলি, একটিবারও মনে হ'ল না তোদের—এরা কত অসহায়? আমি যদি আজ না থাকতাম তবে এই বারোটি শিশুর মধ্যে একটিও কি বাঁচত?' ওরা তখন লজ্জা পেয়ে বলল: 'মাপ করবেন—ভয়ে আমাদের মাথার ঠিক ছিল না।'

"কিন্তু তখন বিতণ্ডার সময় ছিল না। কারণ এই কথা বলতে না বলতে—দেখ্ দেখ্ করতে করতে জল দোতলায় উঠে এল। ওরা তখন প্রথম আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। আমি এক এক ক'রে আগে শিশুদের তুললাম আমাদের আশ্রমের টিনের ছাদে।

"ছাদটা উঁচু ছিল। ওরা যখন চূড়ায় উঠে বসল, তখন আমরাও উঠলাম কোনোমত প্রকারে।"

একটু থেমে মালতী বলল: "এ সব আমরা অবশ্য ভক্তিদির কাছে পরে শুনেছিলাম—আগে বললাম শুধু ব্যাপারটা বোঝাতে।"

আলোক (ধ্রুবকে) : এসময়ে তোমরা কী করছিলে ?

ধ্রুব : করবার আর কী ছিল বল্ ? একতলা ছাপিয়ে দোতলায় জল উঠতেই আমরা তাড়াতাড়ি তিনতলায় উঠে এলাম। কিন্তু ছাদে এসেই হতভম্ব ! দেখি কি সাম্‌নেই ভক্তিদি পঞ্চত্রিশটি প্রাণীকে নিয়ে ওদের টিনের ছাদে ! আমাদের পাথরের বাড়ি, ভয় ছিল না—কিন্তু ওদের টিনের ছাদে এতগুলি মানুষের ভার—ভাবতে পারিস ? ভক্তিদিকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : "মণি কোথায় ?" সে চোখের জল আঁচলে মুছে ধরা গলায় বলল : "ঠাকুরের পায়ে। কিন্তু যে গেছে তার কথা থাক। এখন এদের বাঁচাবার কী হবে ? জল যে আরও উঠছে হু হু ক'রে !"

নমিতা (মালতীকে) : "মণিকে বাঁচাতে তোমরা কেউ গেলে না কেন ?"

মালতী : জল এত হঠাৎ উঠে এল হু হু ক'রে যে বেরুবার কথা মনেও হয় নি একবার। তাছাড়া আমরা ভেবেছিলাম জল ঠেলে উঠতে না উঠতে ভক্তিদি মণিকে নিয়ে আমাদের এখানেই ছুটে আসবে। ও যে তখন অনাথাশ্রমে—একথা ভুলেই গিয়েছিলাম। তাছাড়া বন্যাটা এমন তোড়ে এল ও চারদিকে এমন ভীষণ চিৎকার সুরু হ'ল যে আমরা প্রথমটা হকচকিয়ে গেলাম।

সাধুজি : যাক্। তার পর ?

ধ্রুব : ছাদে আসুন আগে। নইলে বোঝাতে পারব না। (সবাই উঠল। ধ্রুব সাধুজিকে ছাদে পাঁচিলের কাছে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে হাত বাড়িয়ে) : ছবিটা আগে মনে ছকে নিন। দেখছেন তো—ঐ সামনের ছাদ—ত্রিশ কিট দূরে ? মনে করুন : ওখানে ভক্তিদি, অনাথাশ্রমের তিনটি দাসী, কুড়িটি মেয়ে, আর বারোটা শিশু ব'সে—হ্যাঁ, ঐ সামনের টিনের ছাদে—আমাদের এই পাঁচিলের চেয়ে একটু উঁচুতে—দেখছেন তো ? আচ্ছা। এই তো গেল পয়লা নম্বর। নম্বর দুই—তাকান—আমাদের এই ছাদের দু' ফুট নিচেই রাস্তা হয়ে গেছে নদী—আর তাতে স্রোত ছুটেছে কল্‌কল্ ক'রে—একটা ছড়ি নামালে ছোঁওয়া যায়। তেসরা—এই অশথ গাছটি দেখছেন তো ?—এই ডালটি আমাদের ছাদে—আর ঐ ডালটি ওদের ছাদের ঠিক উপরে ? বন্যাকে যদি বলা যায় রাক্ষসী তবে এই গাছটিকে বলতে হয় দেবদূত। এই হ'ল ভূমিকা। এবার শুরুন ড্রামার ব্যাপার। (হাত নেড়ে উদ্দীপ্ত সুরে) ভক্তিদির প্রস্তাব শুনে মালতী আমার দিকে তাকাল। কী করা যায়—ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমার মাথায় বুদ্ধি গজালো—ঐ যে দেখছেন ঝুণ্ডলী-পাকানো মোটা দড়ি—ঐ দড়িই এল তারক হ'য়ে। আমাদের নানা মালপত্র বাঁধবার জন্যে এই দড়ি জমা করা থাকত ঐ ছোট কুঠুরিটিতে—ঐ লকড়িগুলোর পাশে। আমি একটা মোটা দড়ি হাতে ক'রে এনে ভক্তিদিকে দেখিয়ে বললাম, "এই দড়ি আমি ছুঁড়ে ফেলছি—তোমরা সবাই মিলে ক'ষে ধরো ওদিকে, আমরা ধরছি এদিকে। তারপর এই দড়ি বেয়ে ওদের এক এক ক'রে আসতে হবে ও-ছাদ থেকে এ-ছাদে—এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।" ভক্তিদি চেঁচিয়ে বলল : "আচ্ছা, দড়ি ছুড়ে দাও আমি ধরছি।"

ঠিক এই সময়ে ঐ বাঁ পাশে যে খাপরার বাড়ি দেখছেন—ছাদ নেই এখন—ওরই অপলকা ছাদটি ভেঙে পড়ল। এখন, এই ছাদে ব'সে ভয়ে কাঁপছিল দুটি ভাই বোন—মেয়েটির নাম উমা, বয়স উনিশ কুড়ি, ভাইটির নাম বরুণ, বয়স বছর পনেরো। দু'জনেই আমার প্রেসে কাজ করত। খাপরার ছাদটা ভেঙে যেতেই ওরা চিৎকার ক'রে সাঁতার দিয়ে কোনো মতে এসে ঐ যে নিচের ল্যাম্পপোষ্ট না ?—ওর দুধারের দুটো ডাণ্ডা চেপে ধরল।

দেখছেন তো—ল্যাম্পপোষ্টটার ডাণ্ডা দুটো আমাদের দোতলার জানলার একদম সামনে ? আমার মাথায় ফের একটা বুদ্ধি গজালো। আমি ভক্তিদিকে "একটু রোসো" ব'লেই নিচে নেমে গেলাম এক মোটা লকড়ি নিয়ে। এতক্ষণে আমার দোতলার প্রতি ঘরে জল প্রায় ছাদ পর্যন্ত উঠেছে—মাত্র হাত দুই বাকি। আমি করলাম কি, সাঁতার দিয়ে ঘরে ঢুকে খোলা জানলার কাছে পৌঁছে লকড়িটা বাড়িয়ে দিয়ে ল্যাম্পপোষ্টের গায়ে ঠেকান দিয়ে চেঁচিয়ে বললাম বরুণকে : "এই লাঠি বেয়ে ঝুলতে ঝুলতে এস—আমি টেনে নেব।"

"বরুণ লাঠি ধ'রে ঝুলে পড়তেই উমাও এল ঐ ভাবেই। আমি ঘরের মধ্যে ওদের টেনে খাটে দাঁড় করিয়ে দিলাম। তখন মনে রাখবেন ছবিটি : ঘরে জল উঠেছে বুক দু'ফুট—খাটের উপর দাঁড়িয়ে ওদের শুধু

মাথাটি জলের উপরে। এই অবস্থায় আমি বললাম: "এবার সাঁতার দিয়ে চলো বোয়ের পানে—কারণ খাট ছেড়ে দিলেই ডুব জল, সাঁতার দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ভাগ্যে ওরা সাঁতার জানত—তাই বেঁচে গেল। এই হ'ল আমার প্রথম পরিচয়োত্তার, গুরুদেব! (একটু থেমেই গম্ভীর হ'য়ে) যা হোক্, বরুণ আর উমাকে নিয়ে ছাদে উঠে আসতেই দেখি সে আর এক বিচিত্র কাণ্ড! বলে না truth is stranger than fiction? কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি গুরুদেব! কারণ যা দেখলাম তা অভাবনীয়—মালতী—(থেমে মালতীকে) এবার তুমিই বলো তোমার কাহিনী।

মালতী: উনি নিচে নেমে যেতেই আমার ভয় হ'ল—পাছে ঐ অনাথাশ্রমের ছাদটাও আমাদের পাশের খাপরার ছাদের মতন ধ্বসে পড়ে। কারণ দেখছেনই তো—সাদামাটা টিনের ছাদ—মড়মড় করছিল, এতগুলি প্রাণীর চাপে ভেঙে পড়তে কতক্ষণ? তাই বরুণ ও উমার ভাবনা ছেড়ে আমি দড়ি ছুড়লাম। কিন্তু তখন বাতাস উঠেছে—আর বেশ জোর বাতাস—দড়ি কিছুতেই অতদূর পৌঁছয় না—কেবলই জলে প'ড়ে যায়। তখন মাথায় এক ফন্দি এল। আমার ছেলেবেলায় গাছে চড়া অভ্যাস ছিল। কাশীর গঙ্গা কতবারই সাঁতরে পার হয়েছি, এখানেও সাঁতার শেখাই এক স্কুলের মেয়েদের, কাজেই দেহও অপটু নয়—তাই ভরসা ছিল যে, সামনের জলে প'ড়ে গেলেও সাঁতার দিয়ে ফিরে আসতে পারব আমাদের ছাদে। এই সব ভেবে মন স্থির ক'রে গুরুমন্ত্র জপ করতে করতে দড়ির এক প্রান্ত এই lightning conductor-এর গোড়ায় চৌকো পাথরটার সঙ্গে কষে বেঁধে খোলা প্রান্তটা কবজিতে ক'ষে বেঁধে গাছে উঠে এ-ডাল ও-ডাল ক'রে দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম ওপারের ছাদের উপরকার মুলন্ত ডালে। ভক্তিদি আমার কাণ্ড দেখে ভয়ে আপ্রাণ চাঁচাচ্ছে: "কি করো দিদি! মরবে যে—ফিরে যাও…" কিন্তু শুনছে কে? আমি ডাল থেকে লাফ দিয়ে নামলাম ঠিক ভক্তিদির পাশেই। বললাম, "এই আমি দড়ি ধরছি ভক্তিদি, তুমি দড়ি বেয়ে ঝুলে পড়ো।" ভক্তিদি বলল: "আমার গায়ে কি তোমার ম'ত জোর আছে ভাই?' আমি বললাম: "তুমি বলছ কী ভক্তিদি? এতদিন সাঁতার দিয়েও এটুকু জানো না যে, জলে শরীরের ভার কমে যায়? দড়ি ধ'রে ঝুললে তোমার কোমর অবধি জলে ডুবে থাকবে—তারপর দেখতে পাচ্ছ না—এ-দড়িটা নিচু হ'য়ে ঝুঁকে গিয়ে লেগেছে আমাদের ছাদের কার্নিশে? কাজেই তুমি সহজেই—হাতে হেঁটে আর পায়ে জল ঠেলে সড় সড় ক'রে পিছলে পৌঁছে যাবে—যদি শুধু দড়িটা না ছাড়ো।" ততক্ষণে জল আরও উঠেছে—আমাদের ছাদের কার্নিশ ডুবে গেছে।

বলতে বলতে দেখি কি—উনি ছাদে ফিরে এসেছেন। ওকে চেঁচিয়ে বললাম: "এদের পাঠাচ্ছি আমি—গ্রহণ করবার ভার তোমার।"

উনি খুশি হয়ে বললেন: "কুছ পরোয়া নেই, আমি এদিক্ থেকে ঠিক লুপে নেব, তুমি শুধু ওদিক থেকে এক এক ক'রে ওদের রওনা ক'রে দাও স্লিপ দিয়ে—জল আরও উঠছে।"

ততক্ষণে জল আরও একহাত উঠে ঠিক আমাদের ছাদে এক বিঘৎ গভীর হ'য়ে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। কাজেই ভক্তিদি দড়ি ধ'রে ঝুলে পড়তেই ওর প্রায় বুক পর্যন্ত জলে ডুবে গেল। ফলে ও সহজেই পৌঁছল, ওর পরে মেয়েরাও এক এক ক'রে এসে গেল ও ছাদ থেকে আমাদের ছাদে। কিন্তু মুশকিল হ'ল ঐ বারোটি শিশুকে নিয়ে। মাত্র দশ-বারো বৎসরের ছেলে তো—তাই প্রথমটায় ভরিয়ে উঠেছিল বৈ কি। কিন্তু একে একে মেয়েদেরও যেতে দেখে তারা চেঁচিয়ে উঠল "জয় কবানী!" ব'লে। মারাঠি ছেলে তো—শিবাজি জন্মেছিলেন এই দেশেই—বললাম ওদের দিলাপা দিয়ে। তাতে ওরা আরও উল্লিসিত হয়ে উঠল। জল হ'ল আশাতীত—এক এক ক'রে তিনটি দাসী, কুড়িটি মেয়ে ও বারোটি ছেলে পৌঁছে গেল আমাদের ছাদে আধ ঘণ্টার মধ্যে। আর বড় সময়েই পৌঁছেছিল কারণ দেখতেই তো পাচ্ছেন! জলের টিনের ছাদটা বাতাসে কি রকম দুলছে—আর কিছুক্ষণ ওরা থাকলে সে-ভারে নিশ্চয়ই ভেঙে পড়ত হুড়মুড় ক'রে। আর তখন কে বাঁচাতে ওদের বলুন?

ব্রত: সত্যি, গুরুদেব! আমার কেমন যেন ধাঁধা লেগে গেল যখন একে একে ওরা সব দড়ি বেয়ে ঝুলতে ঝুলতে ওদিক থেকে এদিকে আসতে লাগল পিছলে পিছলে

—পায়ে জল ঠেলে হাতে হেঁটে। (আলোকের দিকে চেয়ে হেসে) ব'ঘ তুই দেখতিস্ সে-দৃশ্য তাহলে হয়ত তোর আর সন্দেহ থাকত না যে শেক্সপীয়র মিথ্যে বলেন নি যখন তিনি হ্যামলেটে বলেছিলেন—

"There's a divinity that shapes our ends,
Rough hew them how we will."

(থেমে) আর এ-লাইন দুটি আমার আরও বেশি ক'রে মনে পড়েছিল কখন বলব? যখন ও:—অ্যাড্ভেঞ্চারের সেরা অ্যাড্ভেঞ্চারটিই বলতে ভুলে গেছি—মাথায় কি একটা ভাবনা ঘুরছে আজ? উল্টোপাল্টা কতরকম চিন্তার কুরুক্ষেত্র!—শোন্ বলি।

(থেমে দম নিয়ে) সবাই যখন চ'লে এল তখন শেষ ছেলেটি ঘড়ি ধ'রে ডুবতে ডুবতে হঠাৎ হাত ফস্কে জলে প'ড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মালতী ঝাঁপ দিল। কেবল ওকে ধন্যি বলি যে ঘড়িটা ছাড়ে নি। নৈলে ওরা বাঁচত না, স্রোতে ভেসে যেত।"

নমিতা (শিউরে উঠে) মাগো! ঝাঁপ দিল এ-স্রোতের জলে? ধন্যি!

মালতী (হেসে): ধন্যির এতে কী আছে শুনি—তখন আমার হাতে ঘড়ি ছিল? ঘড়ির ওবারটা উনি ধরে আছেন? বলি নি—আমি মেয়েদের সাঁতার শেখাই? আমাকে শেখাতে হয় কী ক'রে ডুবুডুবুদের বাঁচাতে হয়। তাছাড়া স্রোতটা ছিল আমাদের বাড়ি থেকে অনাথ আশ্রমের দিকে তাই আমি ঝাঁপ দিতেই ছেলেটা আমার কাছে ভেসে এল চিৎকার ক'রে। সত্যিকার বিপদ হয়েছিল তখন। কারণ আমি যদি একটিবার তার কোমর ধরতে পারতাম তাহলে সহজেই তাকে টেনে আনতে পারতাম—আরো এইজন্যে যে ঘড়ি ছিল আমার হাতে। কিন্তু সে ডুবে গিয়ে জলে হাবুডুবু খেতে খেতে আতঙ্কে আমার দুই পা চেপে ধরল। আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম, চেঁচিয়ে বললাম: "পা ছেড়ে দে, আমার কোমর ধর্।" কিন্তু ভয়ে সে এমনি চেপে ধরল আমার পা যে, আমি নিশ্চয়ই ডুবে যেতাম ঐ স্রোতে, যদি না উনি চেঁচিয়ে আমাকে বলতেন: "কোনো ভয় নেই, কেবল ঘড়ি ছেড়ো না।" বলতে বলতে ঘড়ি গুটিয়ে আমাদের দুজনকে কার্নিসের কাছে টেনে এনে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে আমার বাঁ হাত চেপে ধরলেন। তারপর ভক্তিদি আমার ডান হাত ধ'রে দুজনে মিলে আমাদের টেনে তুলল।

ধ্রুব (আলোকের দিকে তাকিয়ে হেসে) বল এবার—মনে হয় কি না যে, শেক্সপীয়র একটুও ভুল বলেন নি যখন তিনি বলেছিলেন, "মানুষ ভুলচুক ক'রে সব তছনছ করলে হবে কি, ঠাকুর যে আড়াল থেকে সব তাগুচুরকে মেরামত ক'রে দিশাহারাকে রওনা ক'রে দিচ্ছেন ধ্রুব-লক্ষ্যের পথে।"

আলোক (না হেসে গম্ভীর হ'য়ে): বিশ্বাসীর ওর বিশ্বাসে—তার উপর কথা চলে না। কিন্তু···(মালতীর দিকে চেয়ে) আজ আর তর্ক-যুক্তি নয় দিদি! আমার মন একেবারে টইটুম্বুর হ'য়ে গেছে। আমি বয়সে তোমার চেয়ে বড়, কিন্তু তোমাকে প্রণাম না ক'রে থাকতে পারছি না আজ।

মালতী (সশব্যস্ত) কী করেন, কী করেন দাদা! কিন্তু কে শোনে? আলোক গড় হয়ে প্রণাম করে ওকে।

ধ্রুব "কী পাগল!" বলতেই ফের চিপ্ ক'রে ওকে আর এক প্রণাম।

ধ্রুব (হেসে): এর মানে? স্ত্রী বীরবালা ব'লেই যে তার স্বামী পুংলিঙ্গে বীরবালক ব'নে যায় একথা তো পাণিনিতে নেই।"

নমিতা চুপ ক'রে সাধুজির পায়ের দিকে তাকিয়ে ছিল জল-ভরা চোখে, হঠাৎ চোখ তুলে হেসে বলল: "তা না থাকতে পারে ধ্রুবদা, কিন্তু সিংহী যে খরগোসের গলায় মালা দেয় না একথা স্বয়ংবরা-সংহিতার প্রথম পাতায়ই সোনার অক্ষরে লেখা আছে। সত্যি মালতী, তুমি তুমি···তুমি তাই···যা দেখালে আজ···" ব'লেই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

মালতী: তোমাদের মাথায় আজ কী পাগলামি ভর করেছে বলো তো? বিপদে মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়ায় ব'লেই আজও চন্দ্রসূর্য উঠছে। নইলে কি এ-জগৎকে উদ্ধার করতে নামতে ঠাকুরের টনক নড়ত, না তিনি তাঁর অন্তরঙ্গদের পাঠাতেন এ-পৃথিবীতে? (ব'লেই সাধুজির দিকে তাকিয়ে) না, গুরুদেব, এ আমার মেয়েলি উচ্ছ্বাস নয়। আমি সত্যি বলছি আপনাকে—আমার মনে প্রথমটায় খুবই ভয় এসেছিল। কিন্তু তার পরেই জাগল

বিকার—আপনার একটা কথা মনে ক'রে যে, রিপু আমাদের ছয়টা নয় সাতটা, আর এই শেষের রিপু "ভয়"কে জয় না করলে বৃথা তাঁর জয়গান। অমনি বল এসে গেল যে কোত্থেকে" ··

সাধুজি হেসে : সব বলই আসে কেবল সেই একজনার কাছ থেকে মা! সাধুসন্ত মুনিঋষিও যাঁর প্রসাদ পেয়ে অভয় হয়, তুমিও তাঁরই প্রসাদে পারলে মা··· মা (গাঢ়কণ্ঠে) মা কী বলব তোমাদের এরপরে? শুধু বলি যে এখানে গুরুকেই তোমরা গৌরব দিলে শিষ্য-শিষ্যা হয়ে।

ধ্রুব ও মালতী সাশ্রুনেত্রে—"কী যে বলেন গুরুদেব!" ব'লেই যুগপৎ তাঁকে প্রণাম করল। সাধুজি তাদের মাথায় হাত রেখে চোখ বুঁজে চুপ ক'রে রইলেন অনেকক্ষণ।··· ধীরে ধীরে তাঁর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল তাঁর দিব্য হাসি।

চেয়ে চেয়ে বললেন ধ্রুবকে : "বাবা, আমার মনে পড়ছে একটা গল্প, শোনো বলি।

"দেবতা আর অসুর মিলে পুরাকালে সমুদ্র মন্থন করেছিল অমৃতের লোভে। কিন্তু উলটো উৎপত্তি হ'ল—উঠল করাল কালকূট—মহামারণ বিষ। তখন প্রজাপতিরা শিবকে স্তব ক'রে প্রার্থনা করলেন : 'ত্রাহি মাং শরণাপন্নান্ ত্রৈলোক্যদহনাদ্ বিষাৎ—আমরা আপনার শরণাগত, এই দারুণ বিষের দাহ হ'তে আমাদের বাঁচান।' তখন করুণাময় সদাশিব পার্বতীকে সম্বোধন ক'রে বললেন : 'আহা, দেখ দেখ সতী! প্রাণ-ভয়ে জীব আমার কাছে অভয় চাইছে—এদের ত্রাণ না ক'রে কি আমি থাকতে পারি?

প্রাণৈঃ স্বৈঃ প্রাণিনঃ পান্তি সাধবঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ
পরমারাধনং তদ্ হি পুরুষস্যাখিলাত্মনঃ ॥

অর্থাৎ, সাধুরা ক্ষণভঙ্গুর প্রাণকে বিসর্জন দিয়েও পরকে রক্ষা করেন—আর এই রক্ষা করার নামই নিখিলহৃদয়বাসী পরমপুরুষের চরম আরাধনা। ' ব'লে আর্তদের রক্ষা করতে তিনি আকণ্ঠ বিষ পান করলেন—যার ফলে তাঁর কণ্ঠ কালো হয়ে গেল, নাম হ'ল তাঁর শিতিকণ্ঠ বা নীলকণ্ঠ। এই যে—এলো এসো মা লক্ষ্মী।"

একচল্লিশ

মালতী নমিতা ও ধ্রুব তিনজনেই উঠে দাঁড়ায়—ভক্তি ছুটে এসেই সাধুজির পায়ে লুটিয়ে পড়ে। তারপর হেসে পড়ে চাপা কান্নায়।···

সাধুজি তার মাথা কোলে টেনে নিয়ে চুপ ক'রে রইলেন ···শুধু ঠোঁট নড়ে···

• • • •

ভাবসমাধি ভাঙলে সাধুজি ভক্তির মাথাটি কোল থেকে তুলে ধরে গভীর স্নেহে তার জলভরা চোখের দিকে চেয়ে থাকেন। তার পর মৃদুস্বরে বলেন, ভাবমুখে : "এই-ই তো চাই মা—এই হ'ল সবচেয়ে বড় সাধনা, সবার বড় মুক্তি মেলে এই একটি মাত্র পথে—'আমি ও আমার' এই অজ্ঞান থেকে মুক্তি—যখন 'আমি আমি' না ব'লে জীব বলে 'তুহুঁ তুহুঁ'।"

• • • •

ভক্তি ধীরে ধীরে উঠে ব'সে মাথা নিচু ক'রে শুধু চেয়ে থাকে সাধুজির পায়ের দিকে! নিশ্চুপ···শুধু তার দু-চোখ থেকে টপ টপ ক'রে দুবিন্দু অশ্রু পড়ে তাঁর পায়ে। একটু বাদে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে কের তাঁর পায়ে মাথা রাখে।

• • • •

মালতীই প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে : "একটা কথা বলতে পারি কি গুরুদেব?"

সাধুজি (স্নিগ্ধ কণ্ঠে) : বলো মা।

মালতী (আঁচলে চোখ মুছে) : যতই বলিনা কেন, গুরুদেব, অবুঝ মন যে মেনেও মানতে চায় না···কেবলই —চৌকে—ঠাকুর যদি সত্যিই দয়াঘন প্রেমঘন দুঃখহারী হন তবে···তবে যে দয়াময়ীর কৃপায় পরত্রিশটি প্রাণী বাঁচল ···তার বুকে কেন তিনি এত বড় শেল হানলেন? এরও কি প্রয়োজন ছিল? তিনি কি ইচ্ছে করলে ওর···ওর অন্ধের নড়িটিকে বাঁচাতে পারতেন না?

সাধুজি (ভক্তির মাথায় হাত রেখে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তার জলভরা চোখে চোখ রেখে কোমলকণ্ঠে): কাঁদে না মা! জগতে লক্ষ লক্ষ মা জন্মেছে যারা পুত্র-শোকে জ্বলে পুড়ে মরেছে। কেবল এমন মা-র দেখা মেলে···বহুভাগ্যে যে দুঃখের আগুনে ঝল্‌কে উঠতে পেরেছে কাঁচা সোনার কান্তিতে। (ওর দু'টি হাত কোলে

টেনে এনে অস্ফুট কণ্ঠে) তোমাকে আর কী বলব বলো মা, যে···যে ভীক্ষা নিতে এসে ভীক্ষা দিয়ে যায়—তাকে বলে ঠাকুরের সাধনা।

ভক্তি (আকুল কণ্ঠে) : অমন কথা বলবেন না গুরুদেব! শুধু আমাকে আশীর্বাদ করুন—যেন···যেন সবই যেনে নিতে পারি তাঁর বিধান ব'লে···যেন চোখে অন্ধকার ছেয়ে এলেও ভুলে না যাই যে আলো জেগে আছে তার—মণির—শিয়রে।

সাধুজির চোখের জলে হঠাৎ ফুটে উঠল এক অপূর্ব হাসি. তিনি মুখ তুলে উপরের দিকে চেয়ে গদ্‌গদ কণ্ঠে ভাবনুতে বললেন : "ঠিক ম···ম···সময়েই এসেছ ঠাকুর··· শুধু তুমিই পারো তাকে আ···আশীর্বাদ করতে যার হৃদয়ে তো···তোমার নামের ধ্রুব ফুটে উঠেছে প্রেমের চাঁদ হয়ে··· যার আলোয় আধির অ···অ অবাবস্তা গেছে কেটে ··রা ···রা·· রাখো ঠাকুর ওর মাথায় হা···হা···।"

নিশ্চুপ···কেউ কথা কয় না···সাধুজির গাল বেয়ে দুই বিন্দু অশ্রু নামে ধীরে ধীরে।

হঠাৎ ওরা চমকে ওঠে···নিচে ঘন ঘন শূরধ্বনি··· "ধ্রুবজী···সাধুজী!"

বেয়ারিশ

আলোক ধ্রুবর সঙ্গে নিচে নেমে যায়। দোরের কাছে গিয়েই ওরা চমকে ওঠে। ধ্রুব বলে : "আপনি?—এ কী!"

অফিসারের কাঁধে মণি মেতিয়ে। আলোকের বুকে কে যেন হাতুড়ি মারে : "আহা! এ নিষ্ঠুর পরিহাসের কী দরকার ছিল—মৃত শিশুকে মা-র কোলে ফিরিয়ে দিয়ে। ঠাকুরের এ কী লীলা!"

অফিসার ধ্রুবকে একগাল হেসে বলে : "ভাগ্যে আপনি কাল রাত্রেই খবর দিয়েছিলেন! আমরা সব থানায় ঘাঁটিতে খবর দিয়েছিলাম ছোট্ট নৌকাটির বর্ণনা দিয়ে। কাল রাত দশটায় হোলকার ব্রিজের ওদিকে যে কবরস্থান আছে না? সেখানে যেতে হয়েছিল জলে ভেসে-আসা বহু মানুষ গরু আসবাবপত্র আটকে আছে খবর পেয়ে। সেখানে গিয়ে সে সব টেনে টেনে ট্রাকে তুলতে গিয়ে টর্চ ফেলে দেখি একটি ছোট্ট নৌকা—সোজা হয়েই আছে—আর তার মধ্যে শুয়ে এই শিশু! ভাবতে পারেন? ঘুমন্ত অবস্থায়—শুধু ঠোঁটের কোণায় এক ফালি হাসির আলো —যেন দেয়ালা করছে।"

ধ্রুব লাফিয়ে ওঠে : "বেঁচে আছে মণি!"

অফিসার (হেসে) : তবে আর বলছি কী: ছোট্ট নাটি ওর নৌকো হয়ে নিশ্চয় সোজা ছুটেছিল ঢেউয়ে ঢেউয়ে। কবরস্থানে একরাশ লতাপাতার মধ্যে প'ড়ে আটকে গিয়েছিল ব'লেই ওলটায় নি। (ব'লেই উৎফুল্ল হ'য়ে) আমরা তুলে নিয়ে এসে সেঁক দিলাম। দুধও খেল ও পরমানন্দে। আর আমরা কাগজে ছাপতে দিয়েছি অনাথাশ্রমে শিশুদের দড়ির ব্রিজ বেয়ে রক্ষা পাবার আর এই ছেলেটির দোলনায় নৌকোর বন্যা-বিহারের কাহিনী। যদিও জানি অনেকেই বিশ্বাস করবে না এ-হেন ঘটন—বলবে—news-paper stunt!

ধ্রুব আনন্দে অধীর হয়ে ঘুমন্ত শিশুকে বুকে টেনে নিয়ে চিৎকার ক'রে ডাকল : "ভক্তিদি! ও ভক্তিদি! দেখ দেখ কে এসেছে গো, কে এসেছে!"···

ছুটে নেমে এল ভক্তি,পিছনে মালতী—সবশেষে সাধুজি।

ভক্তি মণিকে দেখেই চিৎকার ক'রে বুকে টেনে নিল।

মালতী শিউরে উঠল আনন্দে : "এ কী! নিশ্বাস ফেলছে? ছেলে বেঁচে?"

অফিসার বলল : "ওর গায়ে আঁচড়টিও লাগে নি মা। তবে ভিতরে গিয়ে কেবল সেঁক দিন।"

ভক্তি মণিকে বুকে নিয়ে গড় হ'য়ে সাধুজিকে প্রণাম ক'রে হারাধনের মাথা ঠেকাল তাঁর পায়ে। সাধুজি তাকে বুকে তুলে গান ধ'রে দিলেন—চোখে জল, মুখে হাসি :

প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্র চরিত্রমখেদম্।
কেশবধৃত-মীন-শরীর জয় জগদীশ হরে···*
অনাথাশ্রমের মেয়েরা এসে যোগ দিল···
রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে গেল···
কংসার বেজে উঠল শত কণ্ঠে,
জয় জগদীশ হরে·····

---

* প্রলয়াম্বুধিজলে ডুবিল যখন ধরা সহসা
মীনরূপ ধরী হ'য়ে এলে দিতে ভরসা
ধরি' বেদ, বক্ষ, করে!
জয় জগদীশ হরে!

দুর্গেশ-নন্দিনী : বাঙলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'। শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস নয়, ইহা বাঙলা সাহিত্যেরই প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে। তার শতবর্ষ পূর্ণ হতে চলেছে ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে।

'দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের' উপর কি রকম অভিনন্দন লাভ করেছিল পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখায় তার কতকটা জানা যায়। শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছিলেন : "আমরা সেদিনের কথা ভুলিব না। দুর্গেশনন্দিনী বঙ্গ সমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এ জাতীয় উপন্যাস তো কেহ অগ্রে দেখে নাই।.....দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা সকল বিষয়ে বোধ হইল, কেন বঙ্কিমবাবু দেশের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন।"

উপন্যাসখানি প্রকাশের পূর্বেকার কাহিনী কিন্তু বড়ই নৈরাশ্যজনক। বঙ্কিমবাবু যখন কলেজে পড়েন, তখন কলিকাতায় বঙ্গ-সাহিত্য-লেখকগণকে উৎসাহ দেবার জন্য একটি সভা ছিল। সেই সভা প্রতি বৎসর শ্রেষ্ঠ বঙ্গীয় লেখককে পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করত। বঙ্কিমচন্দ্র পুরস্কারের আশায় 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসখানা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সভার চোখে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা পুরস্কারের যোগ্যবলে গণ্য হ'ল না। অন্য এক লেখকের রচনা পুরস্কৃত হ'ল। 'সেই পুরস্কৃত পুস্তকের নাম এখন আর কেউ জানতে পারেন না।'

উপন্যাসখানা প্রকাশের পরেও অনেকে ইহার বিরূপ সমালোচনা করেছেন। স্কট রচিত 'আইভানহো'র প্রভাব দেখতে পেয়ে তাঁরা নিরাশ হয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বলেছেন, তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের বহুকাল পরে আইভান হো' পড়েছেন। সাহিত্য সম্রাটের এ কথায় সন্দেহ করার বিন্দুমাত্র কারণ থাকতে পারে না। ৺অক্ষয় চন্দ্র সরকার এ বিষয়ে একটা মীমাংসায় উপনীত হয়েছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে বলেছিলেন :

বঙ্কিমবাবুর পরলোকগত বিখ্যাত অগ্রজ সঞ্জীববাবু বড়ই সুন্দর গল্প বলিতে পারিতেন এবং তিনি সর্বদা এইরূপ গল্প বলিয়া বালকাদির মনোরঞ্জন করিতে ভালবাসিতেন। গল্প বালকের জন্য কথিত হইলেও যুবা বৃদ্ধ সকলেরই তাহা শ্রবণযোগ্য হইত। হয়ত, সঞ্জীববাবু আইভান হো পড়িয়া বঙ্কিমবাবুর সম্মুখে এরূপ কোন কাহিনী কাহারও নিকট বিবৃত করিয়া থাকিবেন, আর ভাবুক ভ্রাতা বঙ্কিমচন্দ্র অজ্ঞাতসারে তাহাই পুস্তক মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া থাকিবেন।

এ বিষয় নিয়ে বাদানুবাদের দিন চলে গিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মত মৌলিক চিন্তাকুশল ঋষির পক্ষে অনুকরণের প্রশ্ন বাতুলের প্রলাপ মাত্র। কালীনাথ দত্ত যথার্থই বলেছিলেন, 'আমি তাঁহার Honesty unimpeachable বলিয়া বিশ্বাস করি।"

বঙ্গ সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীর তিনটি অমর নারী চরিত্র একশ বছর ধরে বাঙলা উপন্যাস পাঠকপাঠিকার হৃদয় অভিভূত করে বিরাজ করছে—বিমলা, আয়েষা, ও তিলোত্তমা। "এই তিনটি চরিত্রের মূল উপাদান—প্রণয়। যে মানসিক বৃত্তি ইহজগতে মানব-চরিত্রের সর্বপ্রধান নিয়ন্তা, যাহা লইয়া মানব জ্ঞানের সকলাবধি মৃত্যু পর্যন্ত চির-বিব্রত—বিমলা, আয়েষা ও তিলোত্তমা সেই যুবজনের প্রথম দৃষ্ট পরমারাধ্য প্রণয়ের মনোমোহিনী বহুরূপিণী ছবির তিনটি মাত্র রূপ লইয়া গঠিত। বিমলার সে ছবির স্থির মোহন শীতলভাব, আয়েষার তাহার উচ্ছ্বসিত, চঞ্চলোন্মুখ সুমধুর প্রশান্ত ভাব—আর তিলোত্তমার তাহা এতদুভয়ের উপাদানের সুন্দর সংমিশ্রণ প্রকাশিত হইয়াছে। বিমলা, প্রৌঢ়া

গৃহিণী—আয়েষা নিরাশ প্রণয়ী তরুণী, আর তিলোত্তমা অদূর বিরহ-মিলনময়ী নবীনা।' এই তিনটি চরিত্রের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ নিয়ে দেওয়া যাক্।

বিমলা : বিমলা অভিরাম স্বামীর কন্যা ও গড়মান্দারণের জায়গীরদার বীরেন্দ্র সিংহের ধর্মপত্নী। কিন্তু বীরেন্দ্রের মৃত্যুর আগে সে-কথা কেহ জানত না। বিমলা কাহিনী সর্বত্র সততঃ সক্রিয়শীলা। তিনিই নির্জন দেবমন্দিরে জগৎসিংহের সঙ্গে আলাপ করেন। জগৎসিংহকে গুপ্তদ্বার দিয়ে দুর্গমধ্যে তিলোত্তমার নিকট পৌঁছে দেওয়া তাঁরই কৃতিত্ব। কিন্তু তাঁর দোষেই পাঠান সেনাপতি কতলু খাঁ কর্তৃক দুর্গ অধিকৃত হয়। বীরেন্দ্র সিংহ নিহত হন। তিনিই আবার বীরেন্দ্রসিংহের হত্যার প্রতিশোধ নেন নৃত্য গীতে সুরায় কতলু খাঁকে মুগ্ধ করে আলিঙ্গন সময়ে তার বক্ষে শাণিত ছুরিকা প্রবেশ করিয়ে। বিমলা রসিকা, বিবেকবতী, ও প্রত্যুৎপন্নমতি কামিনী। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর যে চিত্র এঁকেছেন তা সত্যি সত্যি অভূতপূর্ব, বিস্ময়কর :—

"বিলাসভবন বিলাসদ্রব্যে বিভূষিত করিয়া বিলাসিনী মণ্ডলে বসিয়া ভোগপরায়ণ নবাব কতলু খাঁ। চতুর্দিকে ইন্দ্রিয়সুখকর ভোগেচ্ছা-প্ররোচক সামগ্রী সমূহ সুসজ্জিত রহিয়াছে। নবাবকে বেষ্টন করিয়া রমণীগণ কেহ নাচিতেছে, কেহ কটাক্ষ করিতেছে। সে অপরূপ লাবণ্যদিব্যোজ্জ্বল-শোভিতা বিলাসিনীবৃন্দের অনির্বচনীয়া বিলাসচেষ্টা পাঠককে একবার কল্পনা চক্ষে দেখিতে হইবে। যদি পাঠকগণ সুরুচির অনুরোধে যবনবিলাসীবৃন্দের ভোগবিলাস প্রত্যক্ষ করিতে অস্বীকৃত হয়েন, অন্ততঃ তাঁহাদিগকে এই রূপসীমণ্ডল মধ্যবর্ত্তিনী কুসুমবনে স্থলপদ্মিনীবৎ বিলাসিনীর বিলাসরঙ্গ প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। ঐ দেখুন পাঠক, রমণীর কিবা সুন্দর অঙ্গ-ভঙ্গী! কিবা রসাল মধুরালাপ। কিবা মনোমোহন কটাক্ষ ক্ষেপণ! রমণীর সম্মুখে সুবর্ণ সুরার পাত্র। সুন্দরী কতলু খাঁর পার্শ্বে বসিয়া হেমপাত্রে সুরা ঢালিতেছে। নবাব সম্মোহনভাবে অধীর হইয়া চল চল ভাবে সেই লাবণ্যময়ীর প্রতি ঘন ঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। কতলু খাঁ সেই রূপপানে উন্মত্ত। একে বিবিধ বিলাস দ্রব্যে মন বিমোহিত, তাহাতে আবার সম্মোহবর্দ্ধিনী তীব্র সুরার মাদকতা—কতলু খাঁ আজি অধীর ও প্রমত্ত। ও আবার কি? পাঠক, শুনিতেছ, বিলাসিনী কি দিব্যস্বরে কি বিলাসব্যঞ্জক মধুর ধ্বনি করিল? একে রূপের সুরা—সুরার সুরা হইতেও অধিকতর মাদক। শুনিয়া কতলু খাঁ ভাবিল, আহা, মরি মরি! কি সঙ্গীত রে! সঙ্গীতের কি অপূর্ব বাসনা-উদ্বেলক স্বরকম্পন সুর, তাল, লয়রে! কতলু খাঁর এখন আর কিছুই জীবিত নাই; কতলুখাঁর জীবিত আছে, কেবল ইন্দ্রিয় ভোগেচ্ছা ও তৎসাধনার্থ ভোগী ইন্দ্রিয়নিচয়। সঙ্গীতের তালে তালে সুন্দরী নাচিতেছে। কিবা সুন্দর নৃত্য-ভঙ্গী। কিবা সুন্দর অঙ্গ-গঠন! কতলু খাঁর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিতে লাগিল। সে অগ্নিতে ইন্ধন স্বরূপ ঘন ঘন সুরা সেবনে কতলু খাঁ ধৈর্য শূন্য হইয়া সুন্দরীকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। বিহ্বল চিত্তে বলিতে লাগিলেন;—তুমি কোথা প্রিয়তমে?'

পাঠক, এই রমণীকে কি চিনিতে পারিয়াছ? ওকি! সুন্দরীর দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছ কেন? চাহিয়া চাহিয়া কি মনে করিতে চেষ্টা করিতেছ? মনে করিতেছ, যেন ইহাকে আর কোথাও দেখিয়াছ? না? আচ্ছা আমিই বলিয়া দিতেছি। আর একবার চাহিয়া দেখ দেখি, ইহাকে বীরেন্দ্র সিংহের দুর্গের মধ্যে দেখিয়াছ কিনা? চাহিয়া দেখ দেখি সুন্দরী বিমলা কি না? ও কি? একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলে যে! দারুণ ঘৃণায় রোষে তোমার শরীর অস্থির হইয়া পড়িল যে! তুমি বুঝি মনে করিতেছ, বিমলা বড়ই বিশ্বাসঘাতিনী—ঘোর ভুলটা।.....

কিছু বুঝিতে পারিতেছ না? আচ্ছা, আমরা তোমাকে বুঝাইয়া দিব। ঐ যে বিমলার মনোমোহন বিলাস চেষ্টা, উহার মধ্যেই বিমলার আন্তরিক নির্লিপ্ত ভাব দেখিতে পাও কি? এই যে বিমলার বিলাস হাসি উহার মধ্যেই বিমলার অন্য রকমে কোন আনন্দ চিহ্ন দেখিতে পাও কি? এই যে বিমলার বিলাস কটাক্ষ—উহার মধ্যে বিমলার তীব্র দৃষ্টি দেখিতে পাও কি? আর—আর ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখ দেখি, বিমলার সুন্দর বসন মধ্যে কিছু খুঁজিয়া পাও কি না? পাইলে না? আমরা বলিয়া দিতেছি—উহার মধ্যে শাণিত ছুরিকা লুক্কায়িত আছে! যেমন মনোমোহন লাবণ্য লীলার মধ্যে দারুণ প্রতিহিংসা—তেমনি নেত্রসুখকর পরিচ্ছদ মধ্যে শাণিত

ছুরিকা। অবিশ্বাস করিলে? অনন্তর মনে করিলে? আচ্ছা, কিছুকাল অপেক্ষা কর। আর অপেক্ষা করিতে হইল না—ঐ দেখ! ঐ বিমলা আলিঙ্গনচ্ছলে কতলু খাঁর হৃদয়ে দারুণ ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল। ঐ শুন কতলু খাঁ বিকট চিৎকার করিয়া অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িল। ঐ দেখ! বক্ষ দেশ হইতে রুধির ধারা উৎসের ন্যায় ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল! আর ঐ দেখ! দুঃশাসন বক্ষ বিদীর্ণ রক্তসিন্ধু ভীম সেনের ন্যায় তৎপ্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি পাত করিয়া সানন্দচিত্তে বিমলা ছুটিয়া পলাইয়া গেল। এখন বিশ্বাস হইল? এখন বিমলাকে বুঝিলে! এখন সাধ্বী স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষার চেষ্টা দেখিলে? এখন রাজপুত রমণীর বৈর-নির্যাতন স্পৃহা দেখিলে?

বিমলা চতুরা, বিমলা বুদ্ধিমতী, চটুলা, রসালাপপটিয়সী প্রতি-হিংসাবৃত্তির মূর্তিমতী ছবি। কতলু খাঁর বক্ষে ছুরিকাঘাত করে চীৎকার করে সে জানিয়ে গেল—পিশাচী নই, শয়তানী নই, বীরেন্দ্র সিংহের বিধবা স্ত্রী। বঙ্কিমচন্দ্র বিমলাকে এমন মনোহারিণী অথচ সংহারিণী মূর্তি দিয়েছেন যে তাকেই উপন্যাসের নায়িকা বলেই মনে হয়! কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিমলা নায়িকা নয়।

তিলোত্তমা :—উপন্যাসের প্রকৃত নায়িকা দুর্গেশ-নন্দিনী বীরেন্দ্রসিংহ দুহিতা তিলোত্তমা। তিলোত্তমা অসামান্য লাবণ্যবতী, ধীরা, নবীনা অনুরাগিণী নায়িকা। এই তিনটি চরিত্রের মধ্যে তিলোত্তমা বয়সে সকলের চেয়ে ছোট। বঙ্কিমচন্দ্র এই তিনটি চরিত্রের তুলনামূলক চিত্র এঁকেছেন :—

কোন কোন তরুণীর সৌন্দর্য বাসন্তী মল্লিকার ন্যায়; নবস্ফুট, ব্রীড়াসংকুচিত, কোমল, নির্মল, পরিমলময়। তিলোত্তমার সৌন্দর্য সেইরূপ।

কোন রমণীর রূপ অপরাহ্ণের স্থলপদ্মের ন্যায়, নির্বাস, মুদিতোন্মুখ, শুষ্ক পল্লব। অথচ সুশোভিত, অধিক বিকসিত অধিক প্রভাবিশিষ্ট, মধু পরিপূর্ণ। বিমলা সেইরূপ সুন্দরী।

আয়েষার সৌন্দর্য নব রবিকরস্পৃষ্ট জলনলিনীর ন্যায়, সুবিকসিত, সুবাসিত, রস পরিপূর্ণ, রৌদ্রপ্রদীপ্ত—না সঙ্কুচিত, না বিশুষ্ক, অথচ প্রোজ্জ্বল, পূর্ণ দলরাজি হইতে রৌদ্র প্রতিফলিত হইতেছে, অথচ মুখে হাসি ধরে না।

বঙ্কিমচন্দ্র তিনটি মাত্র চিত্রে তিলোত্তমার চরিত্র পরিস্ফুট করেছেন। একটী জগৎসিংহের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে তার হৃদয়ে নবীন প্রেমের সঞ্চার চিত্রে;—একটি যুবরাজ জগৎসিংহের সঙ্গে কারাগারে সাক্ষাৎকার ও তৎকর্তৃক প্রত্যাখ্যানের চিত্রে—অপরটি তার প্রত্যাখ্যান-জনিত যন্ত্রণায় অভিভূত মূর্তিতে। জগৎসিংহের নিরনুরাগ সম্ভাষণে হতাশ হল তিলোত্তমা। তার হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হল, মাথা ঘুরতে লাগল, মূর্চ্ছা হল, আয়েষা এসে তার শুশ্রূষা করল। তার অনুজ্ঞাতেই দাসী স্কন্ধে ভর দিয়ে তিলোত্তমা বিদায় নিল জগৎসিংহের কক্ষ থেকে। আয়েষাই বুঝি প্রলেপ বুলিয়ে দিল তিলোত্তমার প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ের নির্মম ক্ষতে।

আয়েষা :—বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন :—যেমন উদ্যান মধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকার মধ্যে তেমনি আয়েষা।

বিমলা যখন দুর্গমধ্যে নিয়ে এলেন জগৎসিংহকে তখন তার দুজনেই ওসমানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করল পাঠান সেনাপতি ওসমান। বন্দী করে নিয়ে গেল নবাব কতলু খাঁর দুর্গে, জগৎসিংহ বীরেন্দ্রসিংহ, বিমলা ও তিলোত্তমাকে। বীরেন্দ্রসিংহকে হত্যা করল কতলু খাঁ। কতলু খাঁকে কি ভাবে হত্যা করল বিমলা সে চিত্র বর্ণিত হয়েছে আগে। বন্দী জগৎসিংহের সঙ্গে মৃত্যু কালে সন্ধি করেন কতলুখাঁ। কিন্তু তারও আগে কতলু খাঁর প্রাসাদে আয়েষা, ওসমান ও জগৎসিংহের প্রেমের ঘাত প্রতিঘাত-সংঘাত। ওসমান ভালবাসে আয়েষাকে, আয়েষা ভালোবাসে জগৎ সিংহকে, জগৎসিংহ ভালোবাসে তিলোত্তমাকে। অবশ্য সে ভালোবাসা সন্দেহদুষ্ট।

আয়েষা স্বর্গীয় দেবকন্যার মত বন্দী জগৎ সিংহের সেবা করে যাচ্ছে পিতার দুর্গমধ্যে। কিন্তু ওসমানের তা সহ্য হয়নি। একদিন রাতে ওসমান জগৎ সিংহের কক্ষে প্রবেশ করে আয়েষাকে প্রশ্ন করল, 'নবাবপুত্রি, এ উত্তম?'

'কি উত্তম ওসমান?

"নিশীথে একাকিনী বন্দী সহবাসে নবাবপুত্রীর পক্ষে উত্তম?

"এ নিশীথে একাকিনী কারাগারে মধ্যে আসিয়া এই বন্দীর সহিত আলাপ করা আমার ইচ্ছা। আমার কর্ম উত্তম কি অধম সে কথায় তোমার প্রয়োজন নাই।

'প্রয়োজন আছে কিনা, কাল প্রাতে নবাবের মুখে শুনিবে।'

'যখন পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তাহার উত্তর দিব ; তোমার চিন্তা নাই।'

'আর যদি আমিই জিজ্ঞাসা করি ?'

আয়েষা উত্তেজনায় তার মনের সংযম হারিয়ে ফেলল—উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, ওসমান্ যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমার উত্তর এই যে, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর। শোন ওসমান, আবার বলি এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর। —যাবজ্জীবন অন্য কেহ আমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। কাল যদি বধ্যভূমি ইহার শোণিতে আর্দ্র হয়, তথাপি দেখিবে, হৃদয় মন্দিরে ইহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্তকাল পর্যন্ত ইহার আরাধনা করিব। এই মুহূর্ত্তের পর যদি আর চিরদিন ইহার সঙ্গে দেখা না হয়, কাল যদি ইনি মুক্ত হইয়া শতমহিলার মধ্যবর্ত্তী হন, আয়েষার নামে ধিক্কার করেন ; তথাপি, আমি ইহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী দাসী রহিব।"

তারপর আয়েষার গলার স্বর পরিবর্তিত হল :—

ওসমান্, এ সকল কথা বলিয়া তোমাকে ক্লেশ দিতেছি, অপরাধ ক্ষমা কর।

পরে জগৎ সিংহের দিকে তাকিয়ে বলল :

"রাজপুত্র, তুমিও অপরাধ ক্ষমা কর। যদি ওসমান আজ আমাকে মনঃপীড়িত না করিতেন, তবে এ হৃদয়ের তাপ কখনও তোমার নিকট প্রকাশ পাইত না, কখনও মনুষ্য কর্ণগোচর হইত না।'

ওসমানকে লক্ষ্য করে আয়েষা আবার বলতে লাগল : ওসমান্, আবার বলি, যদি দোষ করিয়া থাকি দোষ মার্জ্জনা করিও। আমি তোমার পূর্বমত স্নেহপরায়ণা ভগিনী ; ভগিনী বলিয়া তুমি পূর্বস্নেহের লাঘব করিওনা। কপালের দোষে সন্তাপ সাগরে ঝাঁপ দিয়াছি। ভ্রাতৃস্নেহে নিরাশ করিয়া আমায় অতল জলে ডুবাইও না।

আর এক দৃশ্য। অভিরাম স্বামী জগৎসিংহের সঙ্গে তিলোত্তমার বিবাহের বন্দোবস্ত করেছিলেন তার মুক্তির পরে গড় মন্দারণে। আয়েষা সেই বিবাহে নিমন্ত্রিত হয়ে গেল। তিলোত্তমাকে বহুমূল্য অলংকার দিয়ে আশীর্বাদ করে ফিরে এল নিজের গৃহে। নিজের অন্তরের প্রবল আলোড়ন সংযত করে সংহত করে। কিন্তু ফিরে আসার পর তার মনের গভীরের কোণ যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল :—

"আয়েষা বাতায়নে বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। অঙ্গুলি হইতে একটি অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিলেন। সে অঙ্গুরীয় গরলাধার। একবার মনে করিতেছিলেন এই গরল পান করিয়া এখনই সকল তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারি। আবার ভাবিতেছিলেন, এই কার্যের জন্য কি বিধাতা আমাকে সংসারে পাঠাইয়া ছিলেন ? যদি এ যন্ত্রণা সহিতে না পারিলাম, তবে নারী জন্ম গ্রহণ করিলাম কেন ? জগৎসিংহ শুনিয়াই-বা কি বলিবেন ?"

একটা প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব তার চিত্তকে আলোড়িত করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত নিজের হৃদয়কে সংযত করল আয়েষা। গরলাধার অঙ্গুরীয় দুর্গপরিখা মধ্যে ছুঁড়ে ফেলল সে।

আয়েষার প্রেমকে বঙ্কিমচন্দ্র এক পরম পবিত্র স্বার্থলেশহীন প্রেমে পরিণত করেছেন। অনেকে বলতে পারেন বঙ্কিমচন্দ্র আয়েষার প্রতি অবহেলা করেছেন। সত্যি সত্যি আয়েষা বঙ্কিমচন্দ্রের 'কাব্যে উপেক্ষিতা।' কিন্তু আয়েষার মধ্যে মধ্যযুগের আরবীয়দের প্রেমের আদর্শও ত তিনি এঁকে থাকতে পারেন। বেদুইন কবি যেন ইদ্রিসের (১২০২ খৃঃ) একটি কবিতার অনুবাদ দেওয়া যাচ্ছে যা থেকে আয়েষার প্রেমের অর্থ কিছুটা পরিষ্কার হতে পারে। বেদুইনদের ধারণা ছিল যে প্রেম ইহজগতে দেহমিলনে পর্যবসিত না হয় পরকালে তা' অক্ষয় মিলনের সুখদান করে।

কত রূপ তার ?
কিন্তু রূপ তার অনেক গুণের একটি মাত্র গুণ।
তার গতি নইলে
দুনিয়ায় কি থাকে মুগ্ধ হবার মত ?
সে হচ্ছে চাঁদ।
এত সুন্দর চাঁদ।
আকাশের চাঁদকে যদি বল,
কি হতে চাও তুমি ?
চাঁদ বলবে, আমি হতে চাই
তার জ্যোতির্মণ্ডলের একটি মণ্ডল হ'তে।

যখন অর্ধচন্দ্র দেখা দেয় আকাশে
তার সামনে
তুমি দেখবে সে হচ্ছে তার প্রতিমূর্তি,
যেন দর্পণে সে নিজের মূর্তি দেখছে।
আমি একদিন রাতে তার সাথে বেরিয়েছি
যে-হাত নিবিড় করে কাছে আসতে দেয়।
আমার দেহের আগুন তার জলন্ত
কপোলকে জ্বালাল।
আমি তার গায়ে হাত বুলালাম।
কৃপণ যেমন করে তার গুপ্তধনে হাত বুলায়।
তার দেহের সর্বত্র।
আমার বাহু বন্ধনে তাকে বাঁধলাম,
এ হরিণীর পলায়নকে আমি ভয় পাই।
তবু তাকে চুম্বন আমি করিনি।
আমার অন্তর রইল ফিরে
অন্তরের জলন্ত অঙ্গার জড়িয়ে।
তুমি তাকে দেখে নিশ্চয় অবাক হবে
যার বুক জ্বলছে পিপাসায়।
কিন্তু তৃষ্ণার জল যার কণ্ঠ নালীতে আবদ্ধ।

আরেযাও হয়ত বেদুইন প্রেমের বিশ্বাসেই বুক বেঁধেছিল। সেই জন্যেই সে তিলোত্তমার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়নি। জগৎসিংহের অতি নিকটে গিয়েও দূরে ছিল; গরলাসুরীর মুখের কাছে নিয়েও তা শেষে পরিখাজলে নিক্ষেপ করল, বুক বাঁধল বিশ্বাসে। সে বিশ্বাস হয়ত বেদুইন কবিরই মত অমৃতলোকের বিশ্বাস।

বিরহিণীর উচ্ছ্বাস

গান

শ্রীচুণীলাল বসু

আসিবে ফিরিয়া কিগো
আমারি দুয়ারে প্রিয়।
আমারি হাতেরি মালা
আসিয়া নিওহে নিও।
অকূলে ভাসায়ে মোরে
কেমনে রহিলে দূরে।
তোমারি চরণে রেখে
বাঁচিতে আমারে দিও।
জীবনে পড়েছে ডাঁটা
তোমারি বিরহে স্বামী।
শয়নে স্বপনে দেখি
তোমারি মূরতি আমি।
মনেরি মন্দিরে আঁকা
তোমারি মূরতি বাঁকা।
তোমারি স্মৃতির মাঝে
ডুবিয়া থাকিতে দিও।

শেষ পর্যন্ত ক্যালকাটা মেল বোম্বাই পৌঁছুল। এল যেন ভয়ে ভয়ে, সন্তর্পণে চুপিসাড়ে। কেননা, টাইমটেবলের শাসন মানতে গেলে দুপুরের আগেই তার পৌঁছে যাবার কথা। তা সে করেনি। ঘণ্টা পাঁচেক দেরি করে সন্ধ্যের কিছু আগে এসে হাজিরা দিয়েছে।

এ ট্রেণটা কলকাতা থেকে সরাসরি মধ্যভারত পাড়ি দিয়ে আসে না। তার পাড়া বেড়ানো স্বভাব। হাওড়া স্টেশন থেকে কোনরকমে একবার বেরুতে পারলেই সে চুট লাগায় উত্তরে। আর্যাবর্তের পাড়ায় পাড়ায় টহল দিয়ে এলাহাবাদের বুড়ি ছুঁয়ে অবশেষে আসে বোম্বাই।

বোম্বাই বললে বোধহয় সঠিক হয় না। বলা উচিত ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস। ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনটার নাম।

আজ শুক্রবার। পরশু অর্থাৎ বুধবার রাত্রে হাওড়া থেকে এই ট্রেণেই উঠেছিল দীপেন। যথারীতি হাওড়া স্টেশনের বাইরে এসে ক্যালকাটা মেল উত্তরগামিনী হয়েছিল। তখন গতি ছিল তার দুরন্ত। তবলার ক্রত একটা লহরার মত বাঙলাদেশের সীমানা পার হয়ে গিয়েছিল নিমেষে। এলাহাবাদ পর্যন্ত এসেছিল প্রায় এক দৌড়ে। তারপর কি যে হয়েছিল; একটা গরুর গাড়ির আস্তা ক্যালকাটা মেলের চাকায় ভর করে বসেছিল যেন। মন্থর চিমে তেতালে থেমে থেমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে শুরু করেছিল সে। ফল হয়েছে এই, গাড়ি পাঁচ ঘণ্টা লেট।

কোথায় বঙ্গোপসাগরের কূলে পূব দিগন্তের সেই নগরী যার নাম কলকাতা! আর কোথায় শ মাইল পশ্চিমে আরব-সাগরের পটে কোথায় এই বোম্বাই!

পশ্চিম প্রান্তের এই শহরে দীপেনের এই প্রথম আসা। টাইম টেবলের নির্দেশমত ট্রেণটা যদি বোম্বাই পৌঁছুত বিশেষ দুশ্চিন্তা ছিল না। দিনের আলো থাকতে থাকতে এই বিশাল অচেনা নগরে একটা আস্তানা খুঁজে নেবার সুবিধেই হ'ত। কিন্তু ট্রেণ যখন পৌঁছুল সন্ধ্যারাত্রের আকাশ থেকে সন্ধ্যে নেমে আসতে শুরু করেছে।

যাই হোক, কুলীবাহিনী আগে থেকেই তুর্ণ লাগিয়ে রেখেছিল। ক্যালকাটা মেল প্ল্যাটফর্মে থামতে না থামতে কামরায় কামরায় তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দীপেনের সঙ্গে হাইবারের মাঝারি একখানা স্যুটকেশ আর হোল্ড-অলে সংক্ষিপ্ত একটি বিছানা। এটুকু অনায়াসেই হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু দীপেন কিছু বুঝবার বা বাধা দেবার আগেই একটা কুলী বাজপাখির মত প্রায় ছোঁ মেরেই সে দু'টো কাঁধে তুলে নিল। তারপর কামরা থেকে নেমে ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিধর, ট্যাক্সিমে যাইয়েগা সাব?'

সাব অর্থাৎ সাহেব। দীপেনের পরণে স্যুট—সাহেব সম্ভাষণটা কি তারই গৌরবে!

সম্ভাষণ নিয়ে কোনরকম দুর্ভাবনা বা কৌতূহল—কিছুই নেই দীপেনের। বিদ্যুৎ-চমকের মত দত্তসাহেবের মুখটা এই মুহূর্তে আরেকবার তার চেতনা আর অবচেতনার সকল দিক থেকে হেসে উঠল। অবশ্য পঁয়তাল্লিশ ঘণ্টা আগে হাওড়া স্টেশনে সে যখন বোম্বাইয়ের ট্রেণ ধরেছিল তখন থেকে প্রায় সর্বক্ষণই দত্তসাহেবের মুখ তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে।

ট্রেণটা ছেড়েছিল রাত ন'টায়। জানালার বাইরে বাঙলাদেশের ধানের ক্ষেত, মাঠ, খাল, দিগন্ত—সবই কৃষ্ণ-পক্ষের গাঢ় অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়ে ছিল। কোন কিছুর আকার বোঝা যাচ্ছিল না। সেই অস্পষ্ট নিরবয়ব দৃশ্য-গুলির দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে দত্তসাহেবের মুখ আর তাঁর কথাগুলিই নিয়ত ধ্যান করে গেছে সে। ভোর হয়েছিল বিহারে। যতদূর চোখ যায় সেখানে শুধু চড়াই আর উতরাই; টিলায় টিলায় মঠগুলি তরঙ্গিত। তা ছাড়া মাটির প্রকৃতিও গিয়েছিল অস্বাভাবিক রকম বদলে; সেই সঙ্গে রঙও। বাঙলাদেশের নরম শ্যামল মাটিতে গেরুয়া ছোপ ধরেছিল; ধাতব রুক্ষতা মিশতে শুরু করেছিল তাতে। আর মিশেছিল কাঠিন্য। ঝড়-বৃষ্টি-তুষারপাতে গ্রানাইট পাথরের স্তর ধ্বসিয়ে ভেঙে চুরমার করে পৃথিবীর প্রথম রূঢ় রুক্ষ আদিম যে মাটি পাওয়া গেছে, তার কিছু আভাস যেন বিহারের প্রান্তরগুলিতে ছড়িয়ে ছিল। মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো মকাইয়ের খেত, চাপড়া চাপড়া জনারের আবাদ, থেকে থেকে এক-আধটা শীর্ণ চেহারার খেজুর আর তালের গাছ। খেজুর গাছগুলোর গলা বড় বড় মাটির কলসীতে অলঙ্কৃত।

সময়টা আশ্বিনের মাঝামাঝি। বাঙলাদেশের আকাশে-বাতাসে তখনও শরতের জাদু মিশে ছিল। কিন্তু বিহারের প্রান্তরগুলিতে এরই মধ্যে হেমন্তের মহড়া শুরু হয়ে গেছে। অন্তহীন এক বিষাদ তাদের বেষ্টন করে আছে যেন। আশ্বিনমাস, তবু সেখানকার রোদে সোনালী আলোর ঢল ছিল না, বাতাসে ছিল না প্রগল্‌ভতা। সব কেমন যেন বিষণ্ণ, বিমর্ষ, ধূসর।

যাই হোক্ একটানা উত্তর প্রদেশ—উত্তর প্রদেশই বা কেন, মহারাষ্ট্রের ইটারসি পর্যন্ত জানালার বাইরে প্রায় একই দৃশ্য। অবশ্য ক্যালকাটা মেল মহারাষ্ট্রে পড়তে না পড়তেই মাটির রঙ আবার বদলাতে শুরু করেছিল। মাটি এখানে রীতিমত কালো।

বাঙলাদেশে যে মাটি শ্যামাঙ্গী কূলের বালা, গেরুয়া পরে বিহারে-উত্তরপ্রদেশে সে উদাসীনা ভৈরবী। মহারাষ্ট্রে সে-ই আবার কৃষ্ণাঙ্গী আদিবাসিনী।

গত পঁয়তাল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে দুটো রাত্রি আর প্রায় দুটো দিন পার হয়ে গেছে। এর মধ্যে জানালার বাইরের কোন কিছুই দীপেনকে মগ্ন, মুগ্ধ বা বিচলিত করতে পারেনি। দূরমনস্কের মত সে শুধু তাকিয়ে থেকেছে।

শুধু কি বাইরেটাই, তাদের রিজার্ভ করা ফার্স্ট ক্লাস কামরার বাকি তিনজন যাত্রীর মধ্যেও এমন কোন বিস্ময় ছিল না যা দীপেনকে আকর্ষণ করতে পারে। তিন জনের একজন হচ্ছেন বিপুলদেহ এক মাড়োয়ারী। ভদ্রলোক হাওড়া থেকে উঠেই বিছানা পেতে শুয়ে পড়েছিলেন। লিলুয়া পার হবার আগেই যুগপৎ তাঁর চোখ বুঁজে গেছে এবং নাসিকা বাদন শুরু হয়েছে। তারপর পুরো দুটো দিন তিনি ঘুমিয়েছেন। অবশ্য কথা-সেমিকোলনের ছেদের মত মাঝে মাঝে যতি পড়েছে। সারাদিনে নিতান্ত অনিচ্ছায় এক-আধবার উঠে স্নান করেছেন, মুখ ধুয়েছেন, খেয়েছেন। এই সব অনাবশ্যক কাজগুলি দ্রুত সমাধা করে আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন!

ঘুমোবার ঐশ্বরিক ক্ষমতা নিয়ে ভদ্রলোক বোধহয় পৃথিবীতে এসেছেন। দীপেন এক আধবার ভাবতে চেষ্টা করেছে, এর নামই কি যোগনিদ্রা!

দ্বিতীয় যাত্রীটি প্রৌঢ় এক সিন্ধী। আকারে মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের একেবারে বিপরীত। শীর্ণ পাকানো চেহারা; আধমাড়াই কলে ফেলে তাঁর শরীরের সবটুকু রস যেন নিঙড়ে বার করে নেওয়া হয়েছে। ভদ্রলোক যে একদা সুপুরুষ ছিলেন সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নেই। কিন্তু একদিনের সুগৌর দেহে এখন অসংখ্য কুঞ্চন, কপাল রেখাময়। এককালের ভাসা ভাসা চোখ এখন কুয়োর গভীরে লীন। হাড়ের ওপর মাংসের কোন স্তর নেই; একেবারে চিলে চামড়ার একটা খোলস পরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দু-দিন দু-রাত মাঝেয়াড়ীটি যেখানে অনন্ত নিদ্রায় ডুবে আছেন সেখানে দিল্লীটি একেবারে অতন্দ্র। একটা স্টেশন এসেছে; অমনি লাফ দিয়ে জানালার কাছে চলে গেছেন। বর্ধমান থেকে কিনেছেন সীতাভোগ আর মিহিদানা, আসানসোল থেকে সন্দেশ এবং পুরী, মোগলসরাই থেকে পেঁপে, বেনারস থেকে পেঁড়া, এলাহাবাদ থেকে পেয়ারা, ইটারসি থেকে কলা। যে ষ্টেশনেই গাড়ি থেমেছে কিছু-না-কিছু কিনেছেনই। কিনেই খেতে শুরু করে দিয়েছেন। আর খেতে খেতে নিবিড় পরিতৃপ্তিতে চোখ বুঁজে এসেছে তাঁর। অনেকটা স্বগতোক্তির মত কখনও বলেছেন, 'আঃ, বঙ্গালকা রসগুল্লা বহুত আচ্ছা।'

কখনও বলছেন, 'ইলাহাবাদকা অদ্ভুত (পেয়ারা) এক্সেলেন্ট।'

কখনও বা বলেছেন, 'বেনারসকা মাসৌর (বিখ্যাত) পেঁড়া বিলকুল বঢ়িয়া।'

স্টেশনে স্টেশনে তো কিনে খেয়েছেনই। কলকাতা থেকে প্রকাণ্ড বাস্কেট বোঝাই করে চপ-কাটলেট-পরোটা-রুটি-মাখন-জেলি এবং আরো কত কি যে এনেছিলেন! সে-সব এক সঙ্গে রাখলে পাঁচীস্তূপের মত একটা বিরাট কিছু হয়ে উঠতে পারত। যাই হোক, একান্ত অলৌকায় সেগুলোও ধ্বংস করেছেন ভদ্রলোক। তা ছাড়া ট্রেণের সঙ্গে যে ডাইনিং রুম আছে সেখানে গিয়ে দুপুরে লাঞ্চ এবং রাতে ডিনার সেরে এসেছেন।

ভদ্রলোকের জঠরে কার্ণেসের মত ভয়ানক কিছু ব্যাপার আছে বোধ হয়। সব সময় সেটা জ্বলছেই। যতই ইন্ধন জোগাও তার নির্বাণ নেই। দীপেনের এক এক বার সন্দেহ জেগেছে, ঐ ক্ষীণ দেহটির ভেতর এত বিপুল পরিমাণ খাদ্যের জায়গা হচ্ছে কোথায়? হাজার চিন্তা করেও রহস্যটার কোন কিনারা করতে পারে নি সে।

তৃতীয় যাত্রীটি একজন দীর্ঘদেহ শিখ। পুরোপুরি দু'টো দিন নিজের বার্থে শুয়ে শুয়েই কাটিয়ে দিয়েছেন তিনি। শুয়েই শুধু থেকেছেন, ঘুমোন নি। ধ্যান-জ্ঞান সমস্ত কিছু একখানা বইয়ের মধ্যে সঁপে দিয়ে তিনি শুধু পড়ে গেছেন। দীপেন লক্ষ্য করেছে, পড়তে পড়তে এই পঁয়তাল্লিশ ঘণ্টায় একবার ব্রেকফাস্ট আরেকবার ডিনার খেতে ভুলে গেছেন। দুই মহাটের মাঝখানে খানকয়েক ছাপা কাগজে সুধাতৃষ্ণাহর কি এমন মৃষ্টিযোগ আছে তা জানবার জন্য একবার মাত্র কৌতূহল হয়েছিল দীপেনের। গলা বাড়িয়ে বইয়ের নামটা পড়তে চেষ্টা করেছিল সে। মলাটের নগ্নদেহ এক বিদেশিনীর ফোটো; তার তলায় লেখা আছে 'দেহ'। মলাট দেখেই অনুমান করা গেছে, ভেতরে কি ধরণের কাঁকালো মহোৎসবের ব্যবস্থা রয়েছে।

তার কামরায় একজন নিদ্রারসিক, একজন উদররসিক। তৃতীয়জন ওসব সুপরসের কারবারী নন। তিনি তিন রসের সায়রে ডুব দিয়ে ছিলেন। একবার ব্রেকফাস্ট আরেকবার ডিনার খেতে ভুলে যাওয়া—এ তো সামান্য ব্যাপার। অনন্তকাল পৃথিবীর সব কিছু ভুলে গিয়ে ঐ রসে তিনি তলিয়ে থাকতে পারেন।.....

এই তিনজন সহযাত্রী আর জানালার বাইরের দৃশ্য মাঝে মাঝে দীপেনকে অন্যমনস্ক করে রেখেছিল। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? বারে বারে ঘুরে ঘুরে দত্তসাহেবের মুখটাই চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আর যতবার তাঁর মুখ মনে পড়েছে ততবারই নিজের অজ্ঞাতসারে ডান হাতখানা জামার পকেটে চলে গেছে। স্পর্শ দিয়ে সে অনুভব করেছে নীলা চৌধুরির ফোটোটা ঠিক জায়গাতেই আছে। ওটা যদি হারিয়েও যায়, দুর্ভাবনার কিছু নেই। স্যুটকেসের ভেতর, হোল্ড-অলে বিছানার মধ্যে আরো সাত আটখানা ফোটো আছে নীলার।

নীলা—সোনারপুরের নীলা চৌধুরি। জীবনে তাকে কোনদিনই দেখে নি দীপেন। ফোটো থেকে একটি শরীরিণী জীবন্ত মেয়ের কতটুকু রহস্যই বা আবিষ্কার করা সম্ভব! তবু তার ওপর ভরসা রেখেই আরবসাগরের পটে বিশাল মহানগর থেকে তাকে খুঁজে বার করতে হবে।

কুলীটা আবার বলে উঠল, 'কিধা সাব, ট্যাক্সিমে যাইয়েগা তো? জলদি বাতাইয়ে।' এবার সে কিছু অসহিষ্ণু। তার তাড়ার কারণটা অবোধ্য নয়। দীপেনকে পৌঁছে দিয়ে এসে অন্য মাল শিকার করতে ছুটবে সে।

দীপেন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'হাঁ, ট্যাক্সিস্ট্যাণ্ড চল।'

বলার শুধু অপেক্ষা। কুলীটা দশ হর্সপাওয়ারের একটা এঞ্জিনের মত স্টেশনের দিকে দৌড় লাগাল। অগত্যা কামরা থেকে নেমে দীপেনকে তার পিছু পিছু ছুটতে হ'ল।

ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস—পশ্চিম উপকূলের এই বৃহত্তম স্টেশনে ক্যালকাটা মেল থেকে ঢলের মত যাত্রী নেমেছে। মানুষের স্রোতের ওপর প্রায় ভাসতে ভাসতে গেটে এসে টিকিট জমা দিল দীপেন। তারপর কুলীটাকে অনুসরণ করে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে এসে পৌঁছুল।

হাওড়া স্টেশনের মত এখানে বাহুবলের ব্যাপার নেই। যেখে শক্তি থাকলেই সেখানে একে খেঁতলে ওকে গুঁতিয়ে তাকে ধাক্কা মেরে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ট্যাক্সি জোগাড় করা সম্ভব। কিন্তু এখানকার রীতি ভিন্ন। আগে এলে এখানে বাগে খায় না; বরং সোনা পাওয়া যায়। পিছে এলেও বাগে খায় না। এখনও সোনা মেলে; তবে দেরিতে। অর্থাৎ যে আগে আসবে সে-ই আগে ট্যাক্সি পাবে। পরে এলে পাবে। সে-জন্য সুশৃঙ্খল 'কিউ'র ব্যবস্থা আছে।

যে দেশে যে আচার। দীপেন 'কিউ'তে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর স্যুটকেশ হোল্ড-অল তার পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে তাড়া গুণে নিয়ে কুলীটা প্ল্যাটফর্মের দিকে ছুট লাগাল।

ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসের টিউব আলোগুলো ইতিমধ্যেই জ্বলে উঠেছে। লাল-নীল-সবুজ—নানারঙের অসংখ্য নওনের রঙমশাল দৃষ্টিকে যেন অন্ধ করে দেয়। সেদিকে নিমেষের বেশি চোখ রাখবে সাধ্য কার।

ওদিকে ক্যালকাটা মেলের যাত্রীরা বেরিয়ে যেতে না যেতে মুড়মুড় করে দূরপ্রান্তের আরেকটা ট্রেন এসে পড়ল। বোধ হয় দিল্লী থেকেই এল, নাকি পাঞ্জাব কিংবা দূরতর কোন সীমান্ত থেকে? কে জানে। এই ট্রেনটা আসতে না আসতেই কোথাকার একটা এক্সপ্রেস হুইসিল দিয়ে ছেড়ে দিল।

আসা-যাওয়ার আর বিরাম নেই। দূরবাহী ট্রেনগুলি পশ্চিম ভারতের এই মানুষেক্রে অবিরাম হানা দিচ্ছে। আর অস্ফুটে যেন গুঞ্জন করছে, 'আমাদের আসতে হয়। প্রাণের তাগিদেই বাঁচা-মরার জৈব তাগিদে নিয়ত তোমার কাছে আমাদের ঠেলে দেয়। না এসে যে পারি না।'

প্ল্যাটফর্মের দিক থেকে যাত্রীদের ফেনায়িত কলরব ভেসে আসছে সেই সঙ্গে আছে কুলীদের ছোটাছুটি, চিৎকার, ব্যস্ততা। নীলন আলোর সঙ্গে টিউব আলো একাকার হয়ে বিচিত্র বিভ্রমে ছড়িয়ে আছে।

এত কিছু আছে। কিন্তু সে-সব দীপেনের চেতনার বাইরের দিকটাকে আলতোভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে মাত্র। ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে গভীরে যেতে পারছে না। ভেতরের আকাশ-পাতাল জুড়ে শুধু রতসাহেব আর নীলা—সোনারপুরের নীলা চৌধুরি।

নীলা চৌধুরি! এই বিশাল নগরের অজানা সাগরে কোথায় অচেনা কিনুকটি লুকিয়ে আছে, কে বলবে। তাকে খুঁজে বার করতে হবে। হাওড়া স্টেশনে দীপেন যখন বোম্বাইয়ের ট্রেন ধরেছিল তখন থেকেই তার একটি মাত্র মন্ত্র—খোঁজো, খোঁজো আর খোঁজো। যেভাবেই হোক যেমন করেই হোক, নীলা চৌধুরিকে তার কিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অন্তত তার ঠিকানা বার করে রত-সাহেবকে একটা টেলিগ্রাম করতে হবে।

কতক্ষণ যে দীপেন নিজের মধ্যে হারিয়ে ছিল, খেয়াল নেই। আর কখন যে পায়ে পায়ে দীর্ঘ 'কিউ'র একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পড়েছিল, তা-ও লক্ষ্য করে নি।

যাই হোক, এতক্ষণে তার পালা এল। একটা ট্যাক্সি কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। পাঞ্জাবি ড্রাইভার বলল, 'কিয়া সোচতা বাবুসাব? জলদি কীজিয়ে—

চমকে স্যুটকেশ আর হোল্ড-অল নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল দীপেন।

স্টেশনের বাইরে এসে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, 'কিধর যাইয়েগা সাব?'

রতসাহেবের মুখ আরেকবার দীপেনের চোখের সামনে ভেসে উঠল। তিনি বলে দিয়েছিলেন, বোম্বাই পৌঁছুতে পৌঁছুতে বিকেল হয়ে যাবে। ট্রেন যদি লেট করে সন্ধ্যে কি রাত্তিরই হয়ত হবে। সে রাতটা স্টেশনের কাছাকাছি কোন একটা হোটেলে কাটিয়ে পরের দিন দীপেন যেন আন্ধেরী যায়।

ড্রাইভারের উদ্দেশে দীপেন বলল, হোটেলমে চলিয়ে। আচ্ছা সর্দারজী—'

স্টিয়ারিঙে হাত এবং সামনের দিকে চোখ রেখে ড্রাইভার বলল, 'জী, বাবুসাব—'

'এখানে বাঙালীদের হোটেল আছে?'

গাড়ির গতি কিঞ্চিৎ হ্রস করে ড্রাইভার এবার ঘাড় ফেরাল। তারপর চোখ দিয়ে যতখানি সম্ভব দীপেনকে বিশ্লেষণ করে নিল। দীপেনের পোশাকের বাহার চেহারা সব কিছু থেকে হয়ত বুঝতে চেষ্টা করল তার খাতিটি কোন স্তরের জীব। অবশেষে ঈষৎ দ্বিধান্বিত সুরে বলল, 'বঙ্গালী হোটেল তো দু-চারটে আছে। একটা আছে কলবাদেবীতে। একটা বোরি ব্রাণ্ডার-এর কাছে, আরেকটা মেরিন লাইনে। কোথেকে—'

'কী?'

'ও তো ভাল হবে না।' পাঞ্জাবী ড্রাইভার আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে লাগল।

'কেন?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল দীপেন।

'আপনার মত বাবুদের সে-সব জায়গায় তখলিফ হবে। হোটেলগুলো ভারি নোংরা। তার চাইতে যদি এক কাজ করেন—

'কী?'

'ক্রফোর্ড মার্কেটের কাছে একটা গুজরাটি হোটেল আছে। বেশ সাফা-উসা (পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন) খানা আউর রহনা (থাকা-খাওয়া) আট দশ টাকাতেই হয়ে যাবে। আপনি যদি বলেন সেখানেই নিয়ে যেতে পারি।'

দীপেনকে বিশ্লেষণ করে মোটামুটি তার একটা শ্রেণী ঠিক করে নিয়েছে ড্রাইভারটি। দামও বোধহয় কষে ফেলেছে। তার ধারণা দীপেন দৈনিক থাকা-খাওয়ার ব্যাপারে আটদশ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে সক্ষম।

যাই হোক, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না দীপেন। বোম্বাইতে আজ তার প্রথম আসা। বার শ মাইল দূরে পূর্ব প্রান্তের আরেক মহানগরীতে বসে এই শহর সম্বন্ধে হাজার কিংবদন্তী শুনেছে সে। হিন্দি ফিল্মের ছবির কল্যাণেও কিছু কিছু জেনেছে। জেনে এবং শুনে যুগপৎ তার আর শিহরণ বয়ে গেছে তার রক্তে।

জোচ্চুরি, চুরি, মারামারি, সুযোগ পেলেই নতুন আগন্তুকের সব কিছু ছিনিয়ে নেওয়া—এ-সব বিষয়ে বোম্বাই নাকি ভারতের শ্রেষ্ঠ পীঠ। এই গৌরবের ব্যাপারে হোটেলগুলোর ভূমিকা নাকি সর্বাধিক। আর হোটেলের সঙ্গে কোন কোন ট্যাক্সিওলার যোগসাজস আছে। ট্যাক্সিওলারা ভুলিয়ে ভালিয়ে নানা ছলে নানা ছলনায় এই শহরের নতুন আগন্তুকদের বিশেষ হোটেলে নিয়ে তোলে। তারপর—

যাই হোক, দীপেনের সঙ্গে প্রায় হাজারখানেক টাকা নগদ টাকা, দামী ঘড়ি, পকেটে পার্কার কলম, জামায় সোনার বোতাম—প্রলুব্ধ করার মত সমস্ত উপকরণই রয়েছে।

হরসাহেব বার বার বলে দিয়েছেন, বোম্বাই পৌঁছেই দীপেন যেন ব্যাঙ্কে একটা একাউন্ট খুলে ফেলে। নগদ টাকা কাছে রাখা নিরাপদ নয়। কিন্তু এখন শরৎ শেষের সন্ধ্যায় কোন ব্যাঙ্কের দরজা নিশ্চয়ই খোলা পাওয়া যাবে না। হাজার খানেক টাকা—দীপেনের মত মানুষের কাছে বিরাট কোন অঙ্কই নয়। ঘড়ি-আংটি-কলম, এ-রকম দু-তিন প্রস্থ আরো তার আছে। কিন্তু সামান্য ক'টি জিনিষের জন্য জীবন যদি বিপন্ন হয় সে বড় ভাবনার কথা। বিশেষ করে সেই জীবন যা তার একান্ত প্রিয় এবং কাম্য।

প্রায় শৈশব থেকেই জীবনটাকে একটা রঙীণ ছবির মত চকচকে লোভনীয় করে তুলেছে দীপেন। নীলা চৌধুরি তো উপলক্ষ্য মাত্র। নিজের কাছে নিজের জীবনটাকে আরো উজ্জ্বল আরো উপভোগ্য আরো আকর্ষণীয় করে তুলবার জন্যই তো এতদূরে এই বোম্বাইতে তার ছুটে আসা।

ড্রাইভার আবার বলে উঠল, 'তা হলে সিধি হোটেলেই নিয়ে যাই বাবুসাব?'

চকিত হয়ে তার দিকে ফিরল দীপেন। তীক্ষ্ণ চোখে একবার দেখে নিল। পাঞ্জাবি ড্রাইভারটির বেশ বয়স হয়েছে। গায়ের চামড়া শিথিল। পাগড়ীর তলায় চুল অবশ্য অদৃশ্য তবে দাড়ি কাঁচায় পাকায় মেশানো। পৃথিবীর তিনভাগ জল একভাগ স্থলের মত বেশির ভাগই তার সাদা। কিন্তু সব ছাপিয়ে যা নজরে পড়ছে তা হ'ল তার চোখ। চোখদুটি ভালমানুষি আর স্নেহের রসে যেন ভাসো ভাসো। না, হাজার চেষ্টা করেও তার মধ্য থেকে কোন খারাপ উদ্দেশ্য যখন আবিষ্কার করা গেল না তখন খানিকটা অনিশ্চিত সুরে দীপেন বলল, 'আপনার হোটেলটা কতদূর সর্দারজী?'

'এই তো কাছেই। ক্রকোর্ট মার্কিটের তাহিনা বাড়ু।'

'আপনি যখন ভাল বলছেন, সেখানেই চলুন।'

॥ দুই ॥

দীপেনকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে ট্যাক্সি চলে গেছে।

ড্রাইভার সর্দারজীর সঙ্গে এই হোটেলের অনেকদিনের জানাশোনা। যাবার আগে একরকম উপযাচক হয়েই ম্যানেজারকে সে অনুরোধ করে গেছে, বাবুজী অর্থাৎ দীপেন এ শহরে একেবারেই নবাগত। তার স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরামের প্রতি যেন একটু বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়।

এতটা কেউ করে না। প্রৌঢ় সর্দারজী যে স্নেহপরায়ণ ভালোমানুষ, সে সম্বন্ধে সংশয়ের আর অবকাশ নেই। তা ছাড়া এই লোকটিকে দীপেন খানিকটা সন্দেহও করেছিল। সে জন্য মনে মনে লজ্জা আর অনুশোচনার অন্ত নেই তার।

যাই হোক, সর্দারজী চলে যাবার পর অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে স্নান সেরে জামাকাপড় বদলে কিছু খেয়ে নিয়েছে দীপেন। পুরো দু দিন ট্রেণে কাটিয়ে যে অপরিসীম ক্লান্তি সারা দেহে মেখে এসেছিল সে, তার অনেকখানিই কেটে গেছে যেন।

হোটেলটা রীতিমত প্রকাণ্ডই; ছ-তলা বাড়ি। সব চাইতে উঁচুতে অর্থাৎ ছ-তলায় একখানা ঘর দেওয়া হয়েছে দীপেনকে। 'সিঙ্গল-সীটেড' রুম। অর্থাৎ ঘরখানা একা দীপেনরই; দ্বিতীয় কোন শরিকের উৎপাত সেখানে নেই।

ঘরখানার সামনের দিকে বিস্তৃত করিডর। সেখানে ইতস্তত অনেকগুলো বেতের মোড়া ছড়িয়ে রয়েছে। আপাতত তারই একটাতে বসে আছে দীপেন।

এখান থেকে সামনের সুবিশাল রাস্তাটা সোজা অনেকদূর পর্যন্ত চোখে পড়ে। রাস্তাটার কোথাও এতটুকু বাঁক বা খাঁজ নেই। একেবারে অবাধ সরলরেখার মতো সেটা প্রসারিত। একটু আগে এই পথেই ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস থেকে হোটেলে এসেছিল দীপেন।

সর্দারজী জানিয়ে গেছে বাঁ দিকের আকাশ-ছোঁয়া পাথরের টাওয়ারটাই ক্রকোর্ড মার্কেট। আর ডানদিকের চওড়া রাস্তাটা নাকি ধোবি তালাওএর দিকে ছুটে গেছে। শুধু ধোবি তালাও কেন, আজাদ ময়দান, ওভাল চার্চগেট পার হয়ে মেরিন ড্রাইভের দিকে সে উধাও।

সন্ধ্যের কিছু আগে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে নেমেছে দীপেন। তারপর হোটেলে এসেছে, স্নান করেছে, জামা কাপড় বদলেছে, খেয়েছে। অবশেষে করিডরের এই সোফায় শরীর সঁপে দিয়েছে। এতক্ষণে বেশ সমারোহ করেই তো রাত্রি নেমে যাবার কথা। কিন্তু সন্ধেটাই এখনও বিদায় নিয়ে উঠতে পারেনি। আসল কথা তাড়াতাড়ি গিয়ে রাত্রিটাকে যে ত্বরান্বিত করে আনবে, তেমন গরজই তার নেই। অতএব পশ্চিমের ভাসমান মেঘে দিনান্তের শেষ রক্তাভাটুকু যদিও আর নেই, তবু সব কিছু একেবারে অস্পষ্ট হয়ে যায় নি।

এখানকার নিয়মই বোধ হয় এই। শরতের শেষ প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের কূলে রাত্রি যত দ্রুত নামে আরব-সাগরের পটে তার আগমন ততই বিলম্বিত।

বাঙলা দেশে এ-সময় সোনালী রোদের ঢল নামিয়ে আর নীলাকাশে ভারহীন সাদা মেঘের ভেলা ভাসিয়ে শরৎকালটা তার শেষ খেলা খেলে যাচ্ছে। কিন্তু বিহার উত্তরপ্রদেশ আশ্বিন থাকতে থাকতেই এক পা এগিয়ে গিয়ে হেমন্তকে ডেকে এনেছে। কিন্তু এই মহারাষ্ট্রে বিপরীত রীতি। সে আবার এক পা পিছিয়ে বর্ষাটাকে ধ'রে রাখতে চেয়েছে। প্রাণ ধরে তাকে বিদায় দিতে পারেনি।

যদিও তার মুঠি থেকে প্রায় সবই বেরিয়ে গেছে তবু আকাশময় বর্ষার স্মৃতিটুকু এখনও ছড়ানো। যে মেঘের টুকরোগুলো দিগন্তে দিগন্তে হানা দিয়ে ফিরছে সেগুলো বাঙলাদেশের মতলঘু আর প্রগলভ নয়, রীতিমত মন্থর এবং জলবাহী।

যাই হোক, ইতিমধ্যেই রাস্তায় রাস্তায় মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মার্কারি বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে। দূরে দূরে উঁচু উঁচু বাড়ির মাথায় নীওনগুলো একবার জ্বলছে, পরক্ষণেই নিভছে আবার জ্বলছে, আবার নিভছে। আলোর আলোয় বোম্বাই যেন রাতের মোহিনী মায়া।

চোখের কাছে এত অজস্র মেলা সাজানো, তবু কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছিল না দীপেন। দৃষ্টিকে সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে সে শুধু ভাবছিল।

কাল এই সময়টা আর্যাবর্তের একটা স্টেশনে ছিল দীপেন। পরশুদিন ছিল কলকাতায়। আর আজ? একেবারে অন্য অক্ষাংশে, ভিন্ন দ্রাঘিমায়।

গত দু'টো দিন দীপেনের সমস্ত অস্তিত্বকে বেষ্টন করে ছিলেন দত্তসাহেব। দত্তসাহেবের কথা সে বহুবার ভেবেছে তত্তবারই দুরন্ত চমকের মত মনে পড়েছে নীলাকে—সোনাবপুরের নীলা চৌধুরিকে।

কিন্তু এই মুহূর্তে হোটেলের করিডোরে শরীর এলিয়ে দৃষ্টিকে দূরান্তে ছড়িয়ে দিয়ে নীলা বা দত্তসাহেব কারো কথাই ভাবতে পারছে না দীপেন। নিজের, একান্তভাবে নিজের কথাই বার বার মনে পড়ছে তার।

[ক্রমশঃ

অথ মৎস্য-মাংস কথা

শ্রীবাণী চক্রবর্তী এম-এ স্মৃতিতীর্থ

মাছ ভাত না খাইলে বাঙ্গালীর পেট ভরে না, আহারে পরিতৃপ্তি হয় না। বঙ্গদেশে অন্নব্যঞ্জনে মৎস্যের চাহিদা সর্বাধিক। কিন্তু বর্তমানে বাঙ্গালীর সেই চিরলোভনীয় মৎস্যে সংকট দেখা দিয়াছে। মাংস বিষয়েও একই সমস্যা। এখন মৎস্য সংগ্রহ একটা দুষ্কর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ বিষয়ে সকলের ভিন্ন অভিজ্ঞতা অবিদিত নহে। তবু এই সংকটের দিনেও বাঙ্গালীর মাছের প্রতি আকর্ষণ একটুও কমে নাই। এই আকর্ষণ বাঙ্গালীর চিরদিনের, চিরকালের।

এই মৎস্য ও মাংস ভক্ষণের শাস্ত্রীয় বিধি এই দেশে বহু পূর্বকাল হইতেই প্রচলিত আছে। আমাদের সমাজ স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন দ্বারা শাসিত। সেই স্মৃতি-শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায় যে বৃহস্পতি স্মৃতিতে আছে—"মৎস্যাদাশ্চ নরাঃ সর্বে", অর্থাৎ সকলেই মৎস্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন। তবে শাস্ত্রমতে পূর্বে নির্দেশ ছিল যে ইচ্ছানুসারে সর্বপ্রকার মৎস্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ এবং মাংসও বিশেষ কয়েকটি উদ্দেশ্যে ভক্ষণ করা যাইতে পারে। স্মৃতির সংহিতাযুগে প্রমাণ পাওয়া যায় যে মনুসংহিতার নির্দেশে মৎস্য ভক্ষক ভক্ত এবং সর্বপ্রকার মৎস্য ভোজন করিবে না। যে যাহার মাংস ভক্ষণ করে তাহাকে তাহার মাংসভোজী বলে, পরন্তু মৎস্যভোজীকে সর্বমাংসাদ বলা হয়। কিন্তু আবার মনুরই নির্দেশ আছে যে—

"পাঠীনরোহিতাবাদ্যৌ নিষ্কৌ হব্যকব্যয়োঃ।
রাজীবান্ সিংহতুণ্ডাংশ্চ সশল্কাংশ্চৈব সর্বশঃ।"

অর্থাৎ পাঠীন (বোয়াল), রোহিত, রাজীব (পদ্মবর্ণ মৎস্য), সিংহের ন্যায় মুখবিশিষ্ট মৎস্য, শল্কযুক্ত মৎস্য এবং আঁশ বিশিষ্ট যাবতীয় মৎস্য দেবতা ও পিতৃগণ উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া ভোজন করিতে পারা যায়। অতএব জানা যায় যে মনুর নির্দেশে অনিষিদ্ধ মৎস্য দেবতা ও পিতৃগণ উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া পরে ভোজন করিলে কোন দোষ হয় না।

আর মাংস ভোজন সম্বন্ধে মনু বলেন—যাহারা একাকী চড়িয়া বেড়ায় (যথা সর্প প্রভৃতি), যে সকল পশুপক্ষীর নাম বা জাতি পরিজ্ঞাত নহে এবং যাহারা ভক্ষ্য বলিয়া বিশেষরূপে নির্দিষ্ট নহে তাহারা এবং বানর প্রভৃতি পঞ্চনখ জীবমাত্রই অভক্ষ্য। আর পঞ্চনখযুক্ত জীবের মধ্যে—

"শ্বাবিধং শল্যকং গোধাং খড়্গকূর্মশশাংস্তথা।
ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষ্বাহুরনুষ্ট্রাংশ্চৈকতোবতঃ।"

অর্থাৎ শল্যক, শল্যক, গোসাপ, গণ্ডার, কূর্ম, শশক—এই কয়েকটি প্রাণী ভক্ষণীয় এবং একশৃঙ্গি ঘন্তবিশিষ্ট পশুর মধ্যে উষ্ট্র ভিন্ন পশুর মাংস ভক্ষ্য বলিয়া নির্দিষ্ট।

মনুসংহিতার টীকাকার মেধাতিথির মতে অনিষিদ্ধ মৎস্য, যেমন বোয়াল, রোহিত প্রভৃতি মৎস্য দৈব ও পিতৃ-কর্মে উৎসর্গ করিয়া শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে ভক্ষণ করিতে পারা যায়। আর রাজীব মৎস্য, সিংহের মত মুখবিশিষ্ট মৎস্য এবং আঁশযুক্ত মৎস্যগুলি সর্বপ্রকারে দৈব ও পিতৃকর্ম ব্যতীত অন্য সময়েও ভক্ষণ করিতে মেধাতিথি নির্দেশ দিয়াছেন। এই বিষয়ে দেখা যায় যে মনু অপেক্ষা মেধা-তিথি অনেকখানি উদার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। মাংস-ভক্ষণ বিষয়ে মেধাতিথি মনুর মতই স্বীকার করেন। মনু সংহিতার অপর টীকাকার গোবিন্দরাজও ইহা অনুমোদন করেন। কিন্তু টীকাকার কুল্লুকভট্ট এই মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে বোয়াল ও রোহিত মৎস্য শ্রাদ্ধে উৎসর্গ করা হইলে শ্রাদ্ধভোক্তা ব্রাহ্মণ ইহা ভোজন করিতে পারেন, কিন্তু শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি তাহা ভক্ষণ করিতে পারেন না। আর রাজীব প্রভৃতি মৎস্য দৈব ও পৈত্র্যকর্ম ব্যতীত অন্যত্রও যে ভক্ষণীয় তাহাতে কোন প্রমাণ নাই। কারণ অপর মুনিগণ রোহিত, বোয়াল, রাজীব প্রভৃতি মৎস্য

সমান গোষ্ঠীয় বলিয়া মনে করেন। আর মাংসভক্ষণ বিষয়ে কুল্লুকভট্ট মনুনির্দেশিত নীতিই অনুমোদন করিয়াছেন।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় পাওয়া যায় যে ইচ্ছানুসারে মৎস্য ভোজন করিলে তিন রাত্রি উপবাস কর্তব্য। ইহার টীকা মিতাক্ষরায় আছে—অকামতঃ মৎস্য মাংস ভোজনে অহোরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধি হয়। তবে মৎস্যগুলির মধ্যেও মনুর নির্দেশমত দৈব ও পিতৃকর্মে মৎস্যগুলি উৎসর্গ করা হইলে ভক্ষণ বিধেয়। মাংস ভক্ষণ বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

"প্রাণাত্যয়ে তথা শ্রাদ্ধে প্রোক্ষিতং দ্বিজকাম্যয়া।
দেবান্ পিতৃন্ সমভ্যর্চ্য খাদন্ মাংসং ন দোষভাক্।"

অর্থাৎ প্রাণসংশয় উপস্থিত হইলে (অর্থাৎ যখন মাংসভক্ষণ ব্যতিরেকে প্রাণরক্ষা হয় না) বিধি অনুসারে ইহা ভোজন করিবে। আবার শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া বিধিমত মাংস ভক্ষণ কর্তব্য, কারণ তখন ইহা অভক্ষণে দোষ হয়। আর প্রোক্ষিত পশু অর্থাৎ প্রোক্ষণসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত মাংস ভোজনে দোষ নাই এবং ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য সংগৃহীত মাংসের অবশিষ্ট ভক্ষণ করিলে ভক্ষণকারী দোষভাগী হয় না।

অতএব দেখা যায় স্মৃতি সংহিতাগুলির মধ্যে ইচ্ছানুসারে মৎস্য মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। কিন্তু পুরাণগুলি অন্বেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে বৃহদ্ধর্মপুরাণে মৎস্য মাংস ভক্ষণে ব্রাহ্মণের পক্ষে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে আছে যে কয়েকটি তিথি ব্যতীত এই ভক্ষণ শাস্ত্রসিদ্ধ।

"রবিবারে তথা সূর্যসংক্রান্ত্যাং দ্বাদশীতিথৌ।
পুণ্যাহেষু চ সর্বেষু মৎস্যমাংসং ন ভক্ষয়েৎ।

অর্থাৎ রবিবারে, সূর্যসংক্রান্তিতে, দ্বাদশীতিথিতে এবং সমস্ত পুণ্যাহে মৎস্য মাংস ভোজন করিবে না।

আবার বলা আছে—

"মৎস্যং মাংসং মধুঞ্চৈব মাষং নিম্বং তথার্দ্রকম্।
তৈলঞ্চ রবিবারেষু ন গৃহ্নীত কদাচন।"

অর্থাৎ মৎস্য, মাংস, মধু, মাষকলাই, নিম, আর্দ্রক এবং তৈল রবিবারে গ্রহণ করিবে না। কোন্ মৎস্য ভক্ষণীয় তাহাও ইহাতে নির্দেশ করা আছে। যথা—

"রোহিতং শকুলঞ্চৈব তথৈব শকরাদিকম্।
তদ্বর্ণং সশল্কঞ্চ মৎস্যং ভুঞ্জীত ব্রাহ্মণঃ।"

অর্থাৎ রোহিত, শকুল, শকর (শুঁটি) প্রভৃতি মৎস্য এবং সাদা ও আঁশযুক্ত মৎস্য ব্রাহ্মণ ভোজন করিবে।

স্মৃতিনিবন্ধযুগে দেখা যায় খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বঙ্গীয় ধর্মশাস্ত্র নিবন্ধকার ভবদেবভট্ট সর্বপ্রথম সকলবর্ণের লোকদেরই ইচ্ছানুসারে অনিষিদ্ধ মৎস্য ও মাংস ভক্ষণে শাস্ত্রীয়বিধি অনুমোদন করিয়াছেন। যদিও ভবদেবভট্ট ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্যতম কঠোর শাস্ত্র-সমালোচক ছিলেন, তথাপি তিনি বঙ্গদেশে প্রভূত মৎস্যের প্রচলন দেখিয়া ইহা ভক্ষণে অনুমতি দিয়াছেন: বঙ্গদেশে যে প্রভূত মৎস্যের প্রচলন ছিল তাহার প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে বঙ্গীয় অপর নিবন্ধকার জীমূতবাহন বাংলাদেশের তথাকথিত ইলিশ মৎস্যের তৈলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহারা মৎস্য-মাংস ভক্ষণে বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচার করেন, তাঁহাদের মত ভবদেবভট্ট যুক্তিতর্কের সাহায্যে খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন যে—

'অনিষিদ্ধ মৎস্যমাংসভক্ষণে তু দোষাভাবাৎ
প্রায়শ্চিত্তাভাবঃ'।

অর্থাৎ অনিষিদ্ধ মৎস্যমাংস ভক্ষণে দোষের অভাববশতঃ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। অতএব তাঁহার মতে সাধারণভাবে মৎস্য মাংস ভক্ষণে কোন দোষ হয় না।

কিন্তু পরবর্তী নিবন্ধকার শূলপাণি ইচ্ছানুসারে এই ভক্ষণ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তিনি নির্দেশ দিয়াছেন যে—

"বৃথা মাংসং ন ভোক্তব্যং ভোক্তব্যং শ্রাদ্ধকর্মণি।
অন্যথা ভক্ষয়ন্ বিপ্রঃ প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।"

কেবলমাত্র দেবতা ও পিতৃগণ উদ্দেশে প্রদত্ত মৎস্য ও মাংস ব্যতীত ইচ্ছানুসারে মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিলে দোষ হয়। এইজন্য তিনি এই বিষয়ে প্রায়শ্চিত্তেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। অপর নিবন্ধকার গোবিন্দানন্দও ইহা অনুমোদন করিয়াছেন।

তবে দেবল ও বৃহস্পতি বচনে পাওয়া যায়—রোগের নিমিত্ত, শ্রাদ্ধাদির অবশিষ্ট, হোমের অবশিষ্ট এবং ব্রাহ্মণের অনুরোধে—এই চারিস্থলে মাংস ভোজন করিলে দোষ হইবে না। শূলপাণি সিদ্ধান্ত করেন যে সাধারণভাবে মাংসভোজন, মদ্যপান ও স্ত্রীসম্ভোগ করিলে দোষ হয় না, পরন্তু ঐ সমস্ত কার্য পরিত্যাগ করিলে মহাফল হয়—মনু কর্তৃক এইরূপ উপদেশ কথিত হইলেও শূলপাণি এই

সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করেন যে পিতৃ ও দেবতার পূজাদিতে প্রদত্ত মাংস ভোজন করিলে দোষ হয় না, কিন্তু ঐ স্থলেই দোষ না করিয়া উহা পরিত্যাগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

তৎপরবর্তী নিবন্ধকার শ্রীনাথাচার্য চূড়ামণি ও গোবিন্দানন্দ এই সব ভোজনে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন। আর ষোড়শ শতাব্দীতে সামাজিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে প্রয়াসী হইয়া বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দন মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে আরও বেশী উদারনীতি প্রচার করিয়াছেন। বঙ্গদেশে প্রচুর মৎস্যের উৎপত্তি ও ব্যবহার দেখিয়া রঘুনন্দন হবিষ্যান্ন ব্যতীত সর্বত্র সর্বপ্রকার মৎস্য-ভক্ষণেই ব্রাহ্মণের অধিকার আছে বলিয়া শাস্ত্রীয় নির্দেশ দিয়াছেন। শ্রীনাথের গ্রন্থ আলোচনা করিলে আমরা দেখি যে শ্রীনাথ পর্বদিন ব্যতীত অন্যদিনে মৎস্য ভোজনে অনুমতি দিয়াছেন। তিনি বিষ্ণুপুরাণের দুইটি শ্লোক আলোচনা করিয়াছেন, যথা—

"চতুর্দশষ্টমী চৈব অমাবস্যাথ পূর্ণিমা।
পর্বণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তিরেব চ॥
স্ত্রীতৈলমাংসসম্ভোগী পর্বস্বেতেষু বৈ পুমান্।
বিন্মূত্রভোজনং নাম প্রযাতি নরকং মৃতঃ॥"

অর্থাৎ চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, পর্বদিন ও সূর্য সংক্রান্তিকালে স্ত্রী, তৈল ও মাংসসম্ভোগ করিলে লোকে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া নরকে গমন করে। শ্রীনাথের মতে এইসব তিথিগুলিতে নিষেধ থাকার ফলে তিনির অবসানে মৎস্য প্রভৃতির উপভোগ সম্বন্ধে কোন নিষেধ নাই। পর্বদিন বাদে অপর দিনেও যে ইহা ভক্ষণে কোন বাধা নাই তাহাও বুঝা যায়। রঘুনন্দনও ইহা অনুমোদন করেন। তিনি পঞ্চমাংস ভোজনের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রযোজ্য করেন। তাঁহার মতে দুর্গাপূজায় অষ্টমীর উপবাসের পারণের দিন রবিবার বা পিতৃমরণ প্রভৃতি অশৌচ হইলে মৎস্যমাংস ভোজন নিষিদ্ধ। আবার কার্তিকমাসে ইহা ভক্ষণীয় নহে। তবে রঘুনন্দন উদারমত প্রচার করেন যে সম্পূর্ণ কার্তিকমাস ধরিয়া এই নিষেধ পালন করিতে অসমর্থ হইলে অন্ততঃ পক্ষে এই মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচ দিন মৎস্য-মাংস ভোজন নিষিদ্ধ। অপরদিনে ইহা ভক্ষণ বিধেয়। এখানে রঘুনন্দন শাস্ত্রীয় নির্দেশের শিথিলতা অনুমোদন করিয়াছেন।

ইদানীন্তনকালে ছাগমাংসেরই প্রচলন দেখিয়া রঘুনন্দন নির্দেশ দিয়াছেন যে পঞ্চমাংস অর্থে ছাগমাংসেরই বোধ হইবে। তিনি বলেন—পূর্বে অগস্ত্যমুনি সকল পশুকে প্রোক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া বর্তমানে অরণ্যবাসীর পশু ভক্ষণে কোন দোষ হয় না। তবে এই পশু শব্দ কেবল পুংলিঙ্গে প্রযুক্ত হওয়ায় এখানে পুংলিঙ্গত্ব বিবক্ষিত। এই জন্য স্ত্রীপশু বধ করা উচিত নহে। অগস্ত্য-মুনি কেবল পুরুষ পশুকেই প্রোক্ষিত করিয়াছেন, স্ত্রীপশুকে নহে। কাজেই হরিণী, ছাগী প্রভৃতি স্ত্রীপশু অপ্রোক্ষিত বলিয়া তাহা অভক্ষ্য।

শুধুমাত্র বঙ্গদেশেই নহে, মিথিলা প্রদেশেও ব্রাহ্মণের মৎস্য মাংস ভক্ষণে অধিকার আছে। কারণ মৈথিল নিবন্ধকারগণও ব্রাহ্মণের মৎস্য ও মাংস ভক্ষণে শাস্ত্রীয়বিধি প্রবর্তিত করিয়াছেন। মিথিলার ধর্ম শাস্ত্র নিবন্ধকার চণ্ডেশ্বর ঠাকুর মৎস্যভক্ষণ সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়াছেন যে—'শল্কৈর্যুক্তা মৎস্যা ভক্ষ্যাঃ, ইতরেষ্বভক্ষ্যাঃ'। অর্থাৎ আঁশযুক্ত মৎস্য ভোজনীয়। আঁশ ব্যতীত অন্য প্রকার মৎস্য ভোজনের উপযুক্ত নহে। আবার মনুবচনে যে পাওয়া যায় বোয়াল ও রোহিত মৎস্য শ্রাদ্ধে প্রভৃতি করে দেয়, তাহাও চণ্ডেশ্বরের মতে ভক্ষণীয়। বৌধায়নের মতে যে ভক্ষণীয় মৎস্যগুলি পাওয়া যায়, সেইগুলিও চণ্ডেশ্বর ভোজন করিতে অনুমতি দিয়াছেন। মাংসভক্ষণেও তিনি শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিয়াছেন যে কেবলমাত্র মাংস বর্জন ব্রত ব্যতীত সকল সময়েই মাংস ভোজনীয়। ইহা ভক্ষণে যে দোষ হয় না তাহাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

মহাকাব্য আলোচনা করিলেও আমরা দেখি যে মহা-ভারতে মাংস অপেক্ষা মাছের ব্যবহার অনেক কম ছিল। মহাভারতের দ্রোণপর্বে ও শান্তিপর্বে আছে যে মান্ধাতা ব্রাহ্মণগণকে রোহিত মৎস্য দান করিয়াছিলেন। আবার পিতৃকৃত্যে মৎস্য ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধে মৎস্য দান করিলে পিতৃগণ দুই মাস পরিতৃপ্ত থাকেন বলিয়া মহাভারতে বর্ণিত আছে। যে সকল মৎস্যের আঁশ নাই তাহা ব্রাহ্মণের অখাদ্য বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। সুতরাং জানা যায় যে অন্য জাতিরা সমস্ত মৎস্যই আহার

করিতেন, ব্রাহ্মণগণও শুষ্ক অর্থাৎ আঁশযুক্ত মৎস্য ব্যবহার করিতেন।

মহাভারতের সমাজে মাংসের ব্যবহার প্রচুর ছিল এবং তাহা উৎকৃষ্ট খাদ্যরূপে বিবেচিত হইত। তবে মাংস ভক্ষণের নিন্দাও ইহাতে কীর্তিত হইয়াছে। নিন্দাচ্ছলে বলা হইয়াছে যে যিনি কোন প্রাণীর মাংস আহার করিয়া আপনার দেহের মাংস বৃদ্ধি করিতে চান, তিনি অতি ক্ষুদ্র ও নৃশংস। যাঁহারা মাংস খাওয়ার নিমিত্ত প্রাণীহত্যা করেন, তাঁহারাও অন্নাম্বরে নিহত হন। আবার মাংস ব্যবহারের উদাহরণও মহাভারতে অল্প নহে। তখনকার সমাজে প্রায় সকলেই মাংস খাইতেন। ব্রাহ্মণও ইহা ব্যবহার করিতেন। যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে বরাহ ও হরিণের মাংস দিয়াছিলেন। বনবাসকালে পাণ্ডবগণ ফলমূল এবং মাংস আহার করিতেন। মাংসই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন ছিল। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞে সংগৃহীত আহার্যের মধ্যে পশু-পক্ষী একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। তখন উৎসব প্রভৃতিতেও প্রচুর মাংসের আয়োজন করা হইত।

আবার রামায়ণে দেখা যায় অযোধ্যার রাজ পরিবারে আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার খাদ্য রুচি অনুসারে ব্যবহৃত হইত। রাম-লক্ষ্মণ প্রভৃতি মৃগয়ালব্ধ বরাহ, শশ, প্রষত, মহারুরু ও পক্ষীর মাংস ভক্ষণ করিতেন।

মহাভারতে আরও বলা আছে যে সারস্বত তাঁহার মাতা সরস্বতী নদী হইতে মৎস্য লইয়া মুনিগণকে দান করিয়াছিলেন। যখন বার বৎসর ক্রমাগত অনাবৃষ্টি চলিয়াছিল, তখন খাদ্যদ্রব্যের অভাবে মুনিগণ মৎস্য খাইয়া জীবন ধারণ করেন।

জন্মতিথি কৃত্য সম্বন্ধে বলা আছে, যে ব্যক্তি জন্মতিথি দিনে জীবন্ত মৎস্য জলাশয়ে ছাড়িয়া দেয় এবং কিছু মৎস্য ব্রাহ্মণকে দান করে, তাহার আয়ুর্বৃদ্ধি হয়।

এই সব আলোচনা হইতে দেখা যায় যে মৎস্য ও মাংসের প্রচলন বহুকাল পূর্ব হইতেই চলিত আছে। তবে সংহিতাযুগে বিশেষ উদ্দেশ্য ব্যতীত ইহা ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু নিবন্ধযুগে ভবদেবের হস্তে ইহা শাস্ত্রীয় অনুমোদন লাভ করে। আর সমাজসংস্কারক রঘুনন্দনের মতেও নিষিদ্ধ তিথি ব্যতীত ইহা ভক্ষণ করা শাস্ত্রসিদ্ধ। এমন কি তাঁহার মতে বেলা ১২টা পর্যন্ত চতুর্দশী ইত্যাদি নিষিদ্ধ তিথি থাকিলে তাহাদের অবসানে বেলা ১২টার পর ইহা ভক্ষণ করিলে দোষ হয় না। আবার কেহ কেহ যে মাংস ছাড়া মৎস্য ভক্ষণে নিষেধ করিয়াছেন, তাহাও রঘুনন্দন স্বীকার করেন নাই।

বাংলা সাহিত্যেও মৎস্য মাংসের অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন আমরা দেখি বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যে আছে—

"মৎস্যমাংস কুটিয়া খুইল ভাগভাগ।
রোহিত মৎস্য দিয়া রান্ধে কলতার আগ।
মাগুর মৎস্য দিয়া রান্ধে গিয়া গাচ গাচ।
সাজ কটু তৈলে রান্ধে খরস্রোত মাছ।
ভিতরে মরিচ-গুঁড়া বাহিরে জড়ায় সুতা।
তৈলে পাক করি রান্ধে চিঙ্গড়ির মাথা।
ভাজিল রোহিত আর চিতলের কোল।
কৈ মৎস্য দিয়া রান্ধে মরিচের ঝোল।

মাংসেতে দিবার জন্য ভাজে নারিকেল।
ছাল খসাইয়া রান্ধে বুচা খাসীর তেল।" ইত্যাদি।

দ্বিজ বংশীদাসের মনসামঙ্গল কাব্যেও পাওয়া যায়—

"কাতলের কোল ভাজে মাগুরের চাকি।
চিতলের কোল ভাজে রসবাস মাখি।
ইলিশ তলিত করে, বাটা ও ভাজনা।
শউলের খণ্ড ভাজে আর শউল-পোনা।
বড় বড় ইচা মৎস্য করিল তলিত।
বিঠা পুঠা ভাজিলেক তৈলের সহিত।"

এইরূপ বহু প্রকার মৎস্যের বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। তাছাড়া মাংস সম্বন্ধেও দেখা যায়—

"কাউঠার রান্ধে মাংস তৈল ভিষ দিয়া।
তলিত করিয়া তুলে ঘৃতেত ছাকিয়া।
কৈতরের বাচ্চা ভাজে, কাউঠার ছাতা।
ভাজিছে খাসীর তৈলে দিয়া তেজপাতা।
ঘনিয়া সলুপা বাটি বারচিনি যত।
মৃগ মাংস ঘৃত দিয়া ভাজিলেক কত।
রান্ধিছে পাঠার মাংস দিয়া ঘর ঝাল।
পিঠালী বাটিয়া দিল মরিচ বিশাল।"

ষোড়শ শতাব্দীতে রাঢ়দেশের কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—খুল্লনা চণ্ডীদেবীর আশীর্বাদ লাভ করিয়া স্বামীর তৃপ্তির উদ্দেশ্যে সর্বমঙ্গলাকে স্মরণ করিয়া রন্ধন করিলেন—

"ভাজে চিঙ্গলের কোল,　　রোহিত মৎস্যের ঝোল
মান বড়ি মরিচে বাসিত।
... ...
কিছু ভাজে রাই খড়া　　চিংড়ীর তোলে বড়া
খরসোলা পুঁটী দশ তোলে।"

আবার গর্ভবতীর সাধে "পোড়া মাছ জামিরের রস" দিয়া খাইবার প্রথা কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বর্ণিত আছে।

কবিবর ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যে বর্ণনা দিয়াছেন যে ভবানন্দ মজুমদারের পত্নী পদ্মমুখী অন্নদার পূজায় ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমিত্ত যে সমস্ত রন্ধন করিলেন তাহাতে—

"কাতলা ভেটুক কই কাল ভাজা ঝোল
শিক-পোড়া কুরি কাঁঠালের বীজে ঝোল।
কাল ঝোল ভাজা ঝাল্লে চিতল কলই
কই মাগুরের ঝোল, ভিন্ন ভাজে কই।

ইত্যাদি প্রকার বহু বর্ণনা পাওয়া যায়।

অতএব আমরা দেখি যে বাংলা সাহিত্যেও এই মৎস্য ও মাংসের বর্ণনা প্রচুর আছে। কথিত আছে নবাবী আমলে বড়িশা—বেলাসার সাবর্ণ চৌধুরী জমিদার রাজস্ব বাকীর দায়ে বন্দী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সোটা একটি খাসী বাঁধিয়া একাকী নিঃশেষ করিয়াছিলেন বলিয়া খাজনা-বাকীর দায় হইতে রেহাই পাইয়াছিলেন। আবার শোনা যায় এক বকস আলী মিঞা পাকী ৮ সের পোলাও কালিয়া স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার তৈল-চিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। উহা নাকি এখনও নিজামৎ প্রাসাদে সযত্নে রক্ষিত আছে।

অতএব মৎস্য মাংসের প্রতি বাঙ্গালীর এই যে আগ্রহ ও ব্যগ্রতা, না পাওয়ার জন্য দুঃখ ও ক্ষোভ—ইহা তো চিরস্বাভাবিক।

চেনা মুখ

শ্রীশক্তি মুখোপাধ্যায়

অন্ধকারে প্রদীপ জ্বেলে
যতোই খুঁজি তাকে
ততোই দূরে পালিয়ে বেড়ায়
শুধোই বলো কাকে!
ধরা দেবার ছলনা নেই
ধরতে গেলেই ফাঁকি
ডাকো বলে ডেকেছি তাই
আর কতকাল ডাকি!
সব ফুলে কি সুবাস থাকে
পূজায় তবু লাগল
বেরসিকের হৃদয়গুলো
নেই বা ভালো বাসল!

মন টানছে পিছন পানে
যেথায় পোড়া খুঁটি
মায়ার বাঁধন ছেঁড়ার ভয়ে
কাঁদছে হৃদয় দুটি।
এমন হলে তেমন হতো
বলছে যারা আজকে
ভাবছে তারা কেমন করে
পার হবে দিন কালকে।
ভালো লাগার ভালোবাসা
সবাই বলে অন্ধ
কাছে গেলেই চেনা মুখের
চক্ষু দুটি বন্ধ।

বউভাই

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহালয়ার দিন বেলা দশটার সময় আহিরীটোলার নতুন রাস্তায় সিগারেট কিনতে বেরিয়েছি। হঠাৎ দেখি ময়লা জামা কাপড় পরা ভবঘুরে গোছের একটি লোক রাস্তার যে দিকটা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ভেঙে চুরে ফুটপাথ বানিয়েছে সেই দিকের ফুটপাথে কংক্রীটের তৈরী নতুন চার-পাঁচ-তোলা বাড়ীগুলোর তলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখলেই মনে হয় কি যেন খুঁজছে।

দাড়ি গোঁফের ভিড় ঠেলেও মুখটা বেশ চেনা-চেনা বলে মনে হোল। দু'তিনবার তার দিকে চেয়ে দেখার পর সেই ভবঘুরে লোকটাই আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে খুব মৃদুস্বরে বলে, চিনতে পারো?

সেই মুহূর্তেই চিনলুম, এ আমাদের রবিন। এখন এই যেখানে ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ফুটপাথ বানিয়েছে, ঠিক এইখানেই দশ বারো বছর আগে রবীনদের পৈতৃক বসতবাড়ী ছিল। এদের বাড়ীখানা রাস্তায় গেছে, কিন্তু রাস্তার অপর পারে আমাদের পুরাতন বাড়ীটা 'বেটারমেন্ট কি'দিয়ে রেহাই পেয়েছে।

প্রচুর বিস্ময় এবং আকুল আগ্রহ নিয়ে তাকে নানা রকম প্রশ্ন করলুম, সে কিন্তু বিশেষ কোন উত্তর দিতে চায় না। শেষে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে এলুম বাড়ীতে, স্নান আহার করালুম, দুপুরে সে আমার বাইরের ঘরের তক্তপোষে শুয়ে উদাসভাবে কড়িকাঠের দিকে চেয়েই দুপুরটা কাটিয়ে দিলে।

বিকালে বেলা তিনটার সময় ছুটীর দিনের রীতি অনুসারে আমাদের বাড়ীতে আমার অতি অন্তরঙ্গ তিনজন বন্ধু এসে জুটলেন, মুরারি, শৈলেন ও বৈদ্যনাথ, এরা তিনজন, আমি, রবিন এবং আরও এই পাড়ার কয়েকজন ছিল, যারা এখন পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেছে, এই ক'জনে আমরা একসঙ্গে শৈশব থেকে এপাড়ায় বড় হয়েছি একসঙ্গে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে বই বগলে করে গিয়েছি, তারপর বিয়ে করে সংসারী হয়েছি। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়েছে, কেউ হয়েছে বিপত্নীক, কেউ দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছে, কেউ গেছে পরপারে, আর একমাত্র এই রবিনই প্রায় দশ বারো বছর ধরে ছিল নিরুদ্দেশ। বিকালে তাসখেলার উদ্দেশ্যে মুরারীরা এসে রবিকে দেখে পরম উৎসাহে তাদের কথা ভুলে গিয়ে গল্প শুরু করে দিলে।

কিন্তু কার সঙ্গে গল্প হবে! এমন গম্ভীর, এমন অন্যমনস্ক এতই উদাসীন এই রবিন যে এর সঙ্গে গল্প করা চলে না। আমাদের পাঁচজনের নানারূপ প্রশ্নের উত্তরে রবিন হয়ত একবার মাত্র একটা হাঁ কিম্বা না বলে জবাব দেয়, তারপর আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গল্পের ধারা গেল বদলে। কবে কোন লোক সন্ন্যাসী হয়ে কি সব অভিনয় বিদ্যা শিখেছিল, কে কিরকম করে হিমালয়ের কোন রহস্যময় কন্দরে ধ্যানস্থ ঋষির সাক্ষাৎ লাভ করে পিশাচসিদ্ধ হয়েছে; প্রমোদ চাটুজ্জে তার তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গে কি সব অদ্ভুত কাহিনী লিখে গেছেন এই সব কথা বেশ যেন আরবুরি কাহিনীর মত ধীরে ধীরে জমে উঠলো। আমরা চারজন আধবুড়ো লোক এই সব নিয়ে একেবারে ছেলে মানুষের মতো গল্প করতে লাগলুম, আর উদাসীন রবিন আপন মনেই সিগারেট খেতে লাগলো। এ সবের সঙ্গে তার কোন যোগই যেন নেই।

শেষে আমরা চারজনেই তাকে চেপে ধরলুম, তার জীবনের কাহিনী শোনবার জন্য। ছেলে, মেয়ে, বউ, কারখানার ভালো চাকরী এ সব ছেড়ে দিয়ে সে কেন

নিরুদ্দেশ হলো, অজ্ঞাতবাস করে সে কি পেলে এ সব শোনবার জন্ত আমরা তাকে বিশেষ পীড়াপীড়ি সুরু করে দিলুম।

শৈলেন একটু গোঁয়ার গোছের লোক। সে বল্লে, দেখ রবিন, তোর ঐ উদাসীন ভাবটা মূলতুবি রেখে আমাদের সঙ্গে আগে যেমন গল্প করতিস্, তেমনি করে কথা ক' দেখি। এখানে তোর চেনা হতে কেউ চায় না, যে তার জন্ত অমথা গম্ভীর হয়ে থাকতে হবে।

বৈদ্যনাথ এখনও এই বয়সেও নিয়মিতভাবে সিনেমা দেখে। সে বলে, রবিন, মানুষ নিরুদ্দেশ হয় অনেক কারণে। প্রথমতঃ পাওনাদারের তাড়ায়, দ্বিতীয়তঃ প্রেমের তাড়ায়, তৃতীয়তঃ পুলিশের শুতোয়, আর চতুর্থতঃ উন্মাদ হয়ে। তা তোমার ত বাবা কোনোটাই হয় নি, তাহলে তোমার এই অজ্ঞাতবাসের কারণ কি? তোমার কি এমন ভূতে পেয়েছিলো যে তুমি—

মুরারি বল্লে, ভূতেই যেন পেয়েছিল। রবিন নিরুদ্দেশ হওয়ার দু'একদিন পরেই আমি ওর দাদার কাছে শুনেছিলুম যে ও একটা কঙ্কাল নিয়ে রাত দুপুরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। এরপর রবিনের দিকে চেয়ে বল্লে, ব্যাপার কি হে রবিন্, তুমি কি সত্যি কঙ্কাল নিয়ে পালিয়েছিলে।

মুরারির স্মৃতিশক্তি খুব তীক্ষ্ণ; এবার সেই পুরাণো কথা আমাদের সকলেরই মনে পড়লো। রবীন কাউকে না জানিয়ে বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ হওয়ার পর শুনেছিলুম বটে যে, ওর ঘরে যে একটা কঙ্কাল ছিল, সেটা আর পাওয়া যায় নি। ব্যাপারটা অর্থহীন ও অপ্রাসঙ্গিক মনে করে আমরা সেটার দিকে কেউই তেমন নজর দিই নি।

বৈদ্যনাথ বল্লে, তা বটে, এ একটা অভিনব ব্যাপার। মেয়েমানুষ নিয়ে অনেককে বিলাপ করতে শুনেছি, কিন্তু কঙ্কাল নিয়ে—

রবিন মুখ তুলে চেয়ে দেখলে, তার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে। তার চাউনিতে বন্ধুরা সকলেই হঠাৎ থেমে গেল।

হাতের জলন্ত সিগারেটটা ছাইদানে না ফেলে ঘরের মেঝেয় সে ফেলে দিয়ে বেশ গম্ভীরভাবে উত্তর দিলে, হ্যাঁ, আমি কঙ্কাল নিয়েই নিরুদ্দেশ হয়েছিলুম। এই কঙ্কালকেই আমি ভালোবেসেছিলুম—আর সেই আমার ঘর ছাড়ার কারণ।

সভয়ে ছোট্ট করে বৈদ্যনাথ প্রশ্ন করলে, কি রকম?

রবিন বল্লে, এই কঙ্কাল আমায় ভালবাসতো, সে আমায় এখনও ভালোবাসে। এই কঙ্কালের মালিককে আমি জানতুম। আমিই তাকে কঙ্কাল করে তুলেছিলুম—

অবিশ্বাসের হাসি হেসে শৈলেন বল্লে—সে কি? আগ্রহ দেখিয়ে আমিও বল্লুম, বল ত ব্যাপারটা শুনি।

সে বল্লে, তবে শোন, আজ থেকে বারো বছর আগে এক নিশুতি রাতে আমি পাটনার এক পার্কে এক বেঞ্চের ওপোর চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে আমার এক অতি প্রিয়জনের কথা চিন্তা করছিলুম, এমন সময় এক স্বপ্ন দেখি। সেটা স্বপ্ন কি সত্য জানি না, আমার কাছে সেটা অতি সত্য বলেই মনে হয়। তখন আমার ওপোরে ছিল নির্মল নীল নৈশ আকাশ। অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র এবং সৌরজগৎ সমন্বিত বিরাট আকাশকে সকলেই বলে মহাশূন্য, সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ সংসারী হয়েও আমার মধ্যে ছিল সেদিন সেই মহাশূন্যতা। তোমরা জানতে আমার সব আছে, কিন্তু আমি জানতুম, আমি একেবারে শূন্য, নিঃস্ব, আমি ছিলুম আমার ছায়া মাত্র। এমন সময়, রাত তখন বোধ হয় দুটো কি তিনটে হবে, হঠাৎ আমার অতি পরিচিত প্রিয়জন আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়ায়, সহজ কণ্ঠে আমার নাম ধরে ডাকে, রবিন্।

অভাবনীয় আহ্বানে ত্রস্ত চকিত হয়ে বেঞ্চের ওপোর উঠে বসেছিলুম, বলেছিলুম, বউ ভাই? তুমি?

সে বলেছিল, হ্যাঁ আমি। একটু থেমে বলেছিল, বাড়ী যাও ভাই। এই ভাবে মন খারাপ করে নিজেকে আর তিলে তিলে নষ্ট কোরো না। ঘরে যাও।

অভিমান করে বলেছিলুম, ঘরে যাব? কিন্তু ঘর কোথায়? তোমার প্রেম যে আমায় ঘরছাড়া করেছে তা কি তুমি জানো না?

বউভাই একটু হেসেছিল। বলেছিল তুমি কি আমায় এখনও ভালোবাসো? তুমি ত ভালবাসতে আমার এই দেহটাকে। এ দেহে আর আছে কি, এ-ত এখন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

তার মুখের দিকে চেয়ে বলেছিলুম। স্মৃতি আছে।

সে বলেছিল, কিসের স্মৃতি? যে দেহটাকে তুমি দেখেছিলে, সে দেহ ত একটা ছিল না। শৈশব থেকে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে সে দেহ পরিবর্ত্তিত হয়েছে: তুমি আমার যৌবনটাকে ভালোবেসেছিলে, সবটাকে ত নয়।

বলেছিলুম না বউ-ভাই। তোমার সবটাকেই আমি ভালোবেসেছিলুম।

অল্প হেসে সে বলেছিল, সবটাকেই? তাহলে দেখ দেখি, সবটাই তোমার ভালো লাগে কিনা—

চেয়ে দেখি, ছোট্ট একটি সদ্যোজাত শিশু। রক্ত এবং শ্লেষ্মাবৃত তার দেহ। ধরণীর বায়ুপ্রবাহের প্রথম স্পর্শে সেই শিশুদেহ যেতে কম্পমান, বৃদ্ধা এক ধাত্রী উষ্ণোদকে সেই অতি ক্ষুদ্র দেহকে প্রক্ষালন করে রোরুদ্যমানা শিশুটিকে তার ভাগ্য, দুঃখময় জননীর অনুরবর্ত্তী এক শয্যার ঈষদুষ্ণে আচ্ছাদিত করে অতি ধীরে, অতি ধরে শায়িত করিয়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হোল। আর এক প্রৌঢ়া সামান্য পরিমাণ গরম দুধ এনে জননীকে এবং অন্তরীর অন্তরালে অন্তরায় মধু দিয়ে শিশুটির মুখে লাগিয়ে দিলে। বউভাই বেঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে স্থির অচঞ্চল কণ্ঠে বলেছিল—ঐ দেখ আমার জীবনের প্রারম্ভকাল। ঐ ছোট্ট আঁতুড়ের মেয়েটিকে তোমার সঙ্গিনী বলে ভালোবাসতে পারো কি?

কোনো উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বেই বউভাই বলেছিল, দিন যায়, এক, দুই, তিন করে তিনশ পঁয়ষট্টি দিন যাওয়ার পর চেয়ে দেখ ঐ এক বছরের ছোট্ট মেয়েটির দিকে। মলমূত্রে প্লাবিত অবস্থায় অসহায়ভাবে কাঁদছে। তার বিধবা মা তখন সংসারের কাজে ব্যস্ত। সবাই ওর মাকে ডাকাডাকি করছে, ঐ নোংরা মেয়েটাকে কেউ ছুঁতেই চায় না। নিজের বিষ্ঠা সে নিজেই মুখে দিয়েছে স্বহস্তে, এমনই অবোধ সে, এমনই বীভৎস, এই তোমার বউভাই। একটু থেমে সে বলেছিল, রবিন। ঐ নোংরা মেয়েটাকে তুমি ভালোবাসতে পারবে কি?

এর কিই বা উত্তর আছে, কি উত্তরই বা দেব? লাল শাড়ী পরা ছায়ামূর্ত্তি বউভাই বলেছিল, আমি চিরদিন ঠিক এই রকমই ছিলুম না। কেন তুমি আমার বিশেষ একটা মূর্ত্তির জন্য ব্যস্ত হচ্ছ ভাই। ঘরে যাও, সেখানে তোমার এখনও বিশেষ প্রয়োজন আছে। আর তোমার না থাকলেও আমার প্রয়োজন আছে বিশেষ। আমি এখন আকাশচারী, নিরালম্ব, বায়ুভুক, নিরাশ্রয়। কিন্তু তোমাকেও আমি এইরকম নিরাশ্রয়রূপে দেখতে চাই না। তুমি সুখে গৃহবাস কর, তোমার সুখেই আমি সুখী হব।

কিন্তু আমার মন যে তা চায় না। আমি তার দিকেই চেয়ে ছিলুম। বলেছিলুম, বউভাই, আমার পাশে এই বেঞ্চিতে বোসো। তবু খানিকক্ষণের জন্যও একসঙ্গে বসি।

বউভাই তার পূর্ব্বের সুরেই কথা বলতে লাগলো। বলে, আমার অপরিণত শিশু দেহকে তুমি দেখেছ, এবার শেষ অবস্থাকে একবার দেখ।

প্রাণহীন, নিঃসাড় নিস্পন্দ এক দেহ। মুখবিবর অল্প বিবৃত। চক্ষু কোটরগত, জিহ্বা পরিদৃশ্যমান। কয়েকজন বাহক এসে এই মৃতদেহটাকে বহন করে নিয়ে গেল। পুলিশের শবব্যবচ্ছেদাগার। লম্বা সাদা এপ্রণ-পরিহিত ডাক্তার, বড় বড় ছুরি, সহকারিণী নার্স এসে শবদেহ থেকে সমস্ত আচ্ছাদন অপসারণ করলে। উলঙ্গ বীভৎস দুই দিনের পচা নারীদেহ। চক্ষু কোটরে অন্তর্নিবিষ্ট, দেহ পূতিগন্ধময়, উদর বায়ুপূর্ণ, কুষ্মাকৃতি। ডাক্তার বৃহৎ ছুরিকায় উদর বিদীর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিভৎস এক দুর্গন্ধ! পাকস্থলীর সংলগ্ন অন্ত্রগুলি নিষ্কাসন করে, সেখানকার ক্লেদাক্ত, আতাম্র পূতিগন্ধময় কুৎসিত রসধারাকে কাচের পাত্রে রক্ষা করে ডাক্তার সেইগুলির বিশ্লেষণ শুরু করলেন। প্রমাণ হোল; অধিকেদ সেবনে হতভাগিনীর মৃত্যু। রিপোর্টের পরে সেই দীর্ঘোদর নারীদেহ অপর কতকগুলি স্ত্রী ও পুরুষের মৃতদেহের সহিত একত্রে এক প্রায়ান্ধকার মৃত্যুকক্ষে রক্ষিত হোল। একদিন, দুইদিন, তিনদিন, মৃতার কোনই দাবীদার নেই। কয়েকদিন পরে সেই মৃতদেহকে চালান করা হোল' ডাক্তারী শিক্ষার কলেজে। কয়দিনেই দেহটির বর্ণ হয়েছে মসীকৃষ্ণ। শরীরতত্ত্বের ছাত্রেরা ছুরিকায় দেহটিকে ক্ষত বিক্ষত করে—

'আর না, বউভাই, আর না। উঃ, তোমার এই অবস্থা'।'

অলক্ষ্য থেকে উত্তর এল, হ্যাঁ ভাই, এই অবস্থা। এই দেহ কি তুমি ভালোবাসো!

বাসি, তোমাকে ভালোবাসি। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমার এই দেহের শেষ পরিণতি কোথায়?'

হেসে বল্লে, 'এখন এটা বিক্রী হবে ছাত্রদের কাছে। রঘুবীর ডোমের তত্ত্বাবধানে আছে। কতকগুলো ধোয়া সাদা হাড়। তুমি কি সেই হাড়গুলোই ভালোবাসো?

হঠাৎ এক তরল, শুভ্র উদার হাস্যলহরীতে পাটনার নৈশ আকাশ পূর্ণ হয়ে উঠলো। অলক্ষ্য থেকে শব্দ এলো, যাও, এভাবে তোমার জীবনটাকে নষ্ট কোরো না, ঘরে যাও, সেখানে তোমার প্রয়োজন আছে।

দুই

এই বউভাইটি কে? মুরারি প্রশ্ন করলে।

মুরারির দিকে উদাস দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রবিন বল্লে, এই বউভাই যে কে তা এখন আর কি বলবো। আমার দিকে চেয়ে বল্লে, অমিয় বোধ হয় কিছু জানে। কি অমিয়, তোমার কিছু মনে পড়ে।

আমি বল্লুম, হ্যাঁ, কিছু মনে পড়ে বৈ কি। আচ্ছা, এ বোধ হয় তোমাদের বাড়ীর সেই ভাড়াটেদের বউ, তাই নয় কি?"

সে বল্লে, হ্যাঁ এ সেই ভাড়াটেদের বউই বটে। আমি যখন হরিদ্বপুরে পড়তুম, তখন এরা আমাদের বাড়ীতে ভাড়া আসে। গরীবের ঘরের মেয়ে, বাড়ী ছিল পাটনায়, এর বাবা অতি শৈশবেই মারা যায়, তার পর থেকে সে আমাদের গলগ্রহ। মামারা খুঁজে পেতে এক দ্বিতীয় পক্ষের বুড়ো বরের সঙ্গে ওর বিয়ে দেয়! বুড়োর ছিল নানা রকম পুরাতন রোগ, কিন্তু তখনও সে ই. আই. আর. হেড অফিসে চাকরী করতো। রিটায়ার করতে বোধ হয় তখন বছর তিনেক দেরী ছিল। বউভাইকে বিয়ে করার পর বুড়োর প্রথম পক্ষের ছেলে মেয়েরা বুড়োর সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ কাটিয়ে দিলে, বুড়ো আমাদের বাড়ীতে 'To Let' দেখে আমাদেরই একতালায় একখানা ঘর আর একটা রান্নাঘর ভাড়া করে এসে ওঠে। এই ছোট এদের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের প্রথম সূত্রপাত।

তারপর? প্রশ্ন করলে শৈলেন।

রবিন বল্লে তারপরের ইতিহাস একটু মামুলি, কিন্তু মামুলি হলেও চির নূতন। প্রথম বুড়ো তার বউকে খুব সাজাতো অল্প আয়ের হলেও ভালো জামা কাপড় কিনে দিত, নানা রকম স্নো, পাউডার, সেন্ট দিত, প্রায়ই সিনেমায় নিয়ে যেত, খুব আধুনিক হওয়ার চেষ্টাও করতো। আমার সঙ্গে বুড়ো তার বউকে ইন্‌ট্রোডিউস করে দিলে, বল্লে তোমরা সমবয়সী নাম ধরে ডাকবে। কিন্তু আমি নামধরে ডাকতে রাজী হলুম না, বল্লুম বউদি বলবো। সেদিন ঐ বউদিই বলেছিল, না ভাই, তুমি আমাকে বউদি বলার চেয়ে বউভাই বোলো। নামটা বুড়ো তখুনি পছন্দ করে নেয় এবং সেদিন থেকে আমি ওকে বউভাই বলেই ডাকতুম।

মুরারি আপন মনেই বল্লে, হবেই ত, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা। বৈদ্যনাথ এ কথায় কান না দিয়ে সাগ্রহে বলে তারপর? তারপর এরা কতদিন তোমার বাড়ীতে ছিল? সিনেমার কীট সে, এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে সে খুঁজছে এক রোমাঞ্চকর প্লট।

রবিন বল্লে এরা খুব বেশীদিন ছিল না, প্রায় বছর খানেক থাকার পরেই এরা আমাদের বাড়ী থেকে উঠে যায়।

—হঠাৎ?

রবিন বল্লো না, ঠিক হঠাৎ নয়। বুড়োর সঙ্গে আমাদের খুব ঝগড়া হয়েছিল। ব্যাপারটা হোল কি জানো, বুড়ো বউদিকে বিয়ে করার ঠিক পরেই তার প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক কাটিয়ে আমাদের বাড়ীতে ঘর ভাড়া করে পাটনা থেকে নতুন বিয়ের কনে বউকে নিয়ে থাকে। তখন বুড়োর মনে ছিল এক রকম ভাব, কিন্তু যতই দিন যেতে লাগলো ততই সে বুঝতে পারলে যে, বউভাইর সঙ্গে তার ঠিক খাপ খাচ্ছে না। বউভাইও প্রথম বুড়োকে খুব যত্ন করতো, আমরাও রসিকতা করে বলতুম হর-পার্ব্বতী। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই ভাব বদলাতে লাগলো। বয়স এবং মনোভাবের পার্থক্যের জন্য এই গরমিলটা বোধ হয় স্বাভাবিক। বউয়ের বয়স তখন কুড়ির মতন বুড়োর বয়স বাহান্ন কি আরও বেশী হবে। তিনবছর পরে পঞ্চান্ন বছর বয়সে রিটায়ার করবে তাই শুনেছিলুম, কিন্তু সেটা ত তার অফিসে দেওয়া বয়স,

হয়ত সম্ভাবনা আরও কিছু বেশীও হতে পারে। এর ওপোর বুড়ো প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তো। দু' একবার বুড়োর মেয়ে তাকে দেখতে এসেছিল—সে ছিল বউভাই এর চাইতে অনেক বছরের বড়। তার সঙ্গে বউভাই-এর ভাবও হয়েছিল, সে কিন্তু মনে মনে সৎমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারতো না। ওরা মনে করতো যে বউভাই এসে ওদের বাবাকে পর করে দিয়েছে। বুড়োও মাঝে মাঝে আমার কাছে বলেছে যে, একটা ছ্যাবলা মেয়েকে বিয়ে করে সে তার ছেলেমেয়েদের পর করে ফেলেছে। এইভাবে নানা ছোট খাটো খুটিনাটির মধ্যে দিয়ে ক্রমে ক্রমে উভয়েরই মনে ভাঙন ধরতে লাগলো, আর বোধ হয় সেই ভাঙন ধরার ব্যাপারে আমিও ছিলুম একটা বড় গোছের কারণ। বউভাই আমার সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠতা করতো, ততই মনে মনে সে বুড়োকে অশ্রদ্ধা করতো, আর বুড়োও, বউভাইয়ের ওপোর ততই চটতো।

সিগারেটের ছাইটা ঝেড়ে নিয়ে বৈদ্যনাথ বল্লে, তাই ত হয়।

মুরারি বল্লে, বুড়ো বয়সে বিয়ে করলো কেন, একটা রেখে নিলেই ত পারতো।

রবিন বল্লে, যাই হোক্ এই ভাবেই চল্‌তে লাগলো। এরও কিছুদিন পরে আমার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষার ফল বেরুলো। পরীক্ষায় প্রথম হয়েছি বলে সেই রাত্রিতেই আমার দাদা বাড়ী এসে আনন্দ করে মাংস এনে বউদিকে দিয়ে বল্লে, ভালো করে মাংস রান্না করে সকলকে খাওয়াও এবং ভাড়াটেদেরও দুজনকে নেমন্তন্ন খাইয়ে দাও।

পুরাতন কথাগুলো সব মনে পড়ে গেল। আমি বল্লুম, জান তোমার দাদার কাছে পরদিন সকালে আমিও সন্দেশ আর চা খেয়ে এসেছিলুম।

রবিন বল্লে হ্যাঁ! তা সে যাই হোক, সেদিন রাত্রে আমার বউদি, দাদার বড় মেয়ে আর বউভাই তিনজনে সবশেষে খেতে বসে সামনে বসে-থাকা আমার দিকে চেয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বলেছিলেন, এবার রবিনের জন্য একটি টুক্‌টুকে বউ আনতে হবে। পরীক্ষায় ও যে রকম পাস করেছে তাতে ওর দাদার কাছে শুনলাম যে, ও যেখানেই যাবে, সেখানেই মোটা মাইনের ভালো চাকরী পাবে। কাজেই ওর জন্য এখন আমরা নিশ্চিন্ত।

বউভাইয়ের দিকে চেয়ে দেখেছিলুম। মজা দেখলুম এই যে, বউভাই পরীক্ষার খবর শুনে বিকেল থেকে খুবই আনন্দ করে বউদির সঙ্গে এক সঙ্গে রান্না করার ব্যাপারে প্রাণ দিয়ে খাটছিল কিন্তু এই বিয়ের কথায় তেমন কোন আগ্রহ দেখাতে পারলে না। আপনমনেই আহার শেষ করে মুখ ধোয়ার জন্য কলতলায় চলে গেল।

অনেক রাত্রে বউভাই এসে আমার ঘরের দরজায় ঘা দিলে। উঠলুম। বউভাই আমার নাম ধরেই ডাকতো—বল্লে রবিন, তোমার দাদার ভয়ানক পেটের ব্যথা হচ্ছে, একবার দেখতে হবে।

ওদের ঘরে গেলুম। অবস্থা দেখে ডাক্তার আনলুম। বি কে পালের দোকান থেকে ওষুধ আনলুম। ওষুধ খাইয়ে পেটে গরম জলের সেক দিয়ে ভোর রাত্রে বুড়ো একটু শান্ত ধরে ঘুমোলে আমার দাদা-বউদি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো, আমিও উঠে আস্‌ছি, এমন সময়—

রবীনকে থাম্‌তে দেখে বৈদ্যনাথ বল্লে, এমন সময় কি?

এমন সময় বউভাই সিঁড়ির ধারে এসে হঠাৎ আমার হাতটা চেপে ধরে বল্লে, রবিন—

তার গলার শব্দে আমি চম্‌কে উঠেছিলুম। থর কাঁপ্‌ছে, হাতও কাঁপছিল। একটু থেমে বউভাই বল্লে, রবিন, দাদা-বউদি ছাড়া আর তোমার তেমন কেউ নেই। তুমি এখনও বিয়ে করনি। তোমার পরীক্ষা এমনভাবে হয়ে গেছে যে তোমার কোনদিন অন্নের জন্য ভাব্‌তে হবে না। আমারও কেউ নেই, বিয়ে হয়েছে বটে, এতদিন স্বামীর ঘর করেছিও বটে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত আমি কুমারী। আর তুমি আমারই সমবয়সী—

একটু থেমে রবিন বল্লে, এতটা বলার পর বউভাইয়ের হাত ঘামে ভিজে গেল, গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেল। অবাক্ হয়ে কাঠের পুতুলের মতো স্থির হয়ে আছি দেখে একটু অপেক্ষা করে বউভাই বলেছিল, আমি আর পারছি না। দুপুরে নাটক, নভেল পড়ে দেখেছি মন ভোলে না। ভালো পোষাক পরে সিনেমা দেখে তৃপ্তি পাই না, নিজেকে বিধবা মনে করে গঙ্গাস্নান, ঠাকুরপুজো, ব্রত নিয়ম এ সব করেও ধর্ম্মের ওপোর ঘৃণা হয়ে গেছে, এর ওপোর সতীনের ছেলে-

মেয়েরা সবাই আমাকে একটা আবর্জনা বলে মনে করে। তাই ভাবছি, যদি ছেলেমেয়েদের হাতে বাপকে ছেড়ে দিয়ে দুই বন্ধুতে কোন এক দূর দেশে, যেখানে আমাদের কোনো চেনা লোক নেই, যেখানকার নিয়ম-কানুন এ-দেশের মতো এত বাঁধা-ধরা নয়, যেদেশের বুড়োরা এদেশের মতো এত বে-আক্কেলী নয়, সেখানে চলে যাই—

সব শুনতে শুনতে হাত-পাগুলো সেদিন ঠকঠক করে কেঁপেছিল। বউভাইকে আমার ভালো লাগতো বটে, কিন্তু এরকম কথা ত কোনদিনই ভাবি নি।

এমন সময় বুড়ো তার নিজের ঘর থেকে উ-আ করে বউভাইকে ডাক দিলে, কোথা গেলে গো—

বউভাই আমার হাতের ওপোর অল্প চাপ দিয়ে দৌড়ে গিয়ে বুড়োর ঘরে ঢুকলো, আর আমিও আমার শোবার ঘরে চলে গেলুম।

বাকী রাতটুকু আর ঘুম হোল না। বউভাই যা বলেছে; তার কি উত্তর দেব ভেবে পাই না। নানা রকম এলোমেলো জটিল চিন্তায় সকাল হয়ে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে বুড়োর খবর নেওয়া উচিত বলে কেবলই মনে করি, কিন্তু ওদের ঘরে যাওয়ার জন্য পা আর ওঠে না। কেবলই মনে হয়, বউভাইয়ের মুখের দিকে কেমন করে চেয়ে দেখবো।

কিন্তু বউভাইকে যখন দেখলুম তখন মনে হোল; এ সে লোক নয়। যেমন আগের দিনে দেখেছি, এ সেই রকমই, তবে যেন আরও একটু বেশী সুন্দরী, আরও একটু বেশী হাস্যময়ী বলে মনে হচ্ছিল।

এর দু'চার দিন পর থেকে বউভাই কেমন যেন মরিয়া হয়ে উঠলো। যখন তখন একাই আমার ঘরে এসে আমার বিছানার ওপোর বসে আমার সঙ্গে অফুরন্ত গল্প করার চেষ্টা করতো। দু'চার দিন এই সব দেখার পর বউদি একদিন একটু আপত্তি করলেন। দাদা একদিন ইঙ্গিতে আমায় জানিয়ে দিলেন যে, এতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়। দাদার বড় মেয়ে একদিন কি একটা দেখে চেঁচাতে সুরু করে দিলে। বউভাইয়ের বাড়াবাড়িতে আমারও কেমন রাগ হয়ে গেল, বুড়ো একদিন সন্ধ্যার পর হঠাৎ রেগে উঠে বউভাইকে ধমক দিয়ে দু'ঘা বসিয়ে দিলে। তখন আমি আর থাকতে না পেরে বুড়োকে এক লাঠী নিয়ে তাড়া করলুম। তখন কিন্তু বউভাই-ই তার স্বামীকে ঘরের মধ্যে পুরে নিজে দরজায় দাঁড়িয়ে আমাকে এই মারামারি থেকে নিবৃত্ত করেছিল। সেদিন রাত্রে বাড়ী ফেরার পর দাদাকে বউদি কত কি সব লাগালে, দাদা বুড়োকে বল্লে, উঠে যান মশাই এ বাড়ী থেকে। বুড়োও রেগে ছিল, বল্লে তোমার বাড়ীতে আর এ-সন্ধ্যেও বাস করবো না। সেদিন বউভাইয়ের কয়েকটা কথায় আমিও এত বিরক্ত হয়ে পড়েছিলুম যে, আমিও মনে করলুম, যাক্ গেলে বাঁচি। বড়ই দুঃখ হয়েছিল, যার জন্য চুরী করি সেই বলে চোর!

এরপর আমাদের বাড়ীতে আর বউভাইয়ের সঙ্গে কোন বাক্যালাপ করি নি। তার ওপোর এমন একটা তীব্র অভিমান জমে উঠেছিল যে, কেবলই মনে হচ্ছিল—ও আমার কে?

কিন্তু ওরা উঠে যাওয়ার পর থেকে মনটা যেন কেমন হতে লাগলো। যাওয়ার সময় কোথায় কোন্ ঠিকানায় যে যাচ্ছে, রাগের মাথায় সে সব কথা জিজ্ঞাসাও করি নি। কিন্তু দু'একদিন পর থেকেই মনটা নিদারুণ খারাপ হতে লাগলো। কতদিন যে আনমনে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি, দুপাশের বাড়ীর জানালায় জানালায় চেয়ে দেখেছি, যদি কোথাও সেই সদাহাস্যময়ী বউভাইয়ের দর্শন মেলে! দু'চার দিন অকারণে টিফিনের সময় কেরানি প্রেসে ই, আই, রেলের হেড অফিসের পাশের ফুটপাথে ঘুরেছি। কেরাণী বাবুরা এই সময়টা দলে দলে ফুটপাথে এসে তেল-মুড়ি থেকে সুরু করে পেঁপের টুকরো, আখের টিকলী কিনে খায়, চো চো করে বিড়ি টানে। কেবলই মনে হোত যদি বুড়োর চেহারাটা নজরে পড়ে, কিন্তু কোন দিনই এগিয়ে অফিসের ভেতর ঢুকে দেখা করতে সাহস হয় নি। ওরা যেদিন চলে যায় সেদিন বুঝতে পারি নি বউভাই আমার কতখানি দখল করেছিল, কিন্তু চলে যাওয়ার পর থেকে প্রতিদিনই আমি বেশী করে উপলব্ধি করতে লাগলুম যে, বউভাই-এর সঙ্গে আমার মনের গ্রন্থি কতখানি দৃঢ়ভাবে বাঁধা হয়ে গেছে।

এইভাবে প্রায় একমাস কেটে গেল। ওরা আমাদের বাড়ীতে ছিল একবছরের ওপোর, উঠে গেছে প্রায় একমাস হোল, কিন্তু কেবলই মনে হোত কদিনই বা ছিল আর

কতকাল যেন উঠে গেছে। উপন্যাসে পড়েছিলুম, বিরহের দিনগুলো দীর্ঘ হয়, কিন্তু সেই দীর্ঘতা যে কি নিদারুণ ভাবে নিষ্ঠুর, তা সত্যকার উপলব্ধি হোল বউ-ভাইয়ের চলে যাওয়ার পর থেকে। এর পর হঠাৎ যেন একদিন ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। বুড়োর একটা জীবনবীমা ছিল। একদিন দেখি ডাক সিন্দে বীমা কোম্পানীর একখানা চিঠি আমাদের বাড়ীর চলনপথের ওপোর ফেলে দিয়ে গেছে। দাদা বল্লে—চুলোয় যাকগে চিঠি, কোথায় এখন বুড়োকে খুঁজে দিতে যাব। আমি কিন্তু চিঠিখানা সংগ্রহ করে রেখে দিলুম, আহা এটা যে একটা কর্তব্য, তাড়াতাড়ি দাবী করছে এই চিঠিখানা বুড়োর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। এ যে আমার সিভিক্ ডিউটি!

দুপুরে চিঠিখানা নিয়ে ইআই রেলের হেড্ অফিসে গেলুম। খোঁজ করে বুড়োকে বার করলুম। আমাকে দেখেই বুড়ো যেন একটু কেমন অপ্রস্তুত হোল। আমি তার কাছে গিয়ে যথাসম্ভব সহজভাবে বল্লুম দাদা, আপনার একখানা চিঠি এসেছে, এই নিন।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে বুড়ো বল্লে, সেকি, তোমাদের ঠিকানায় চিঠিটা গেল কেন? আমি ত কোম্পানীকে আমার নতুন ঠিকানা দিয়ে নোটীশ দিয়ে দিয়েছি। তা যাক্, এনেছ ভালো, রেখে যাও।

খুব সহজ শান্ত কণ্ঠে বল্লুম, ভালো আছেন ত?

সে সংক্ষেপে উত্তর দিলে, হ্যাঁ।

বউভাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করি না, বৈদ্যনাথ প্রশ্ন করলে।

না, অনেকবার সে কথা মনে এলো, কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হোল' না। এর পর বল্লুম আচ্ছা আপনি এখন কোথায় আছেন, মানে এমনধারা কেউ যদি খোঁজ করতে আসে কথাটা বলবার সময় কেমন যেন গলাটা অস্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিলো। বুড়ো আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে বল্লে, কে আর আসবে? আর যদি কেউ আসে তা'হলে অফিসে দেখা করতে বোলো, বাড়ীর ঠিকানার দরকার নেই।

রাগে লজ্জায় সরে গিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লুম। মনে মনে একশ'বার বল্লুম চুলোয় যাকগে, ওদের ঠিকানা আমার দরকার কি?

এরপর কেবলই মনে হতে লাগ্‌লো—হয়ত বুড়ো বউভাইকে খরচ দিয়ে খুব পেটাচ্ছে! বউভাই-এর আপনার বলতে কেউই নেই। মামারা বিয়ের পর থেকে তেমন কোন খবরই নেয় না। এক একবার মনে হোল সে যদি আমার সাহায্য চাইতো, তাহলে একখানা চিঠিও কি আমায় লিখ্‌তো না! আবার মনে হোল, খাম পোষ্টকার্ড সে পাবে কোথায়? যে বাড়ীতে গেছে, সে বাড়ীর কাউকে দিয়ে খাম পোষ্টকার্ড আনিয়ে নিয়ে কি সে লিখ্‌তে পারে না! কি জানি, হয়ত সুবিধে করতে পারছে না।

বাড়ীতে একদিন সাহস করে বউদিকে জিজ্ঞাসা করলুম, আমার কোন চিঠি এসেছে কি? বউদি সরল মনেই উত্তর দিলে, কই না ত। কিন্তু আমার যেন মনে হোল বউদি সত্য গোপন করছে।

দিন কয়েক ভেবে চিন্তে একদিন ঐ ইন্‌সিওর কোম্পানীর অফিসে গিয়ে হাজির হলুম। এদিক ওদিক কেবলই দেখ্‌তে লাগলুম, বুড়ো এখানে এসেছে কি না? আস্‌তেও ত পারে! কিন্তু আমার ভয় অমূলক। প্রিমিয়াম বিভাগে গিয়ে বুড়োর নাম এবং আমাদের বাড়ীর ঠিকানাটা বলে বল্লুম, মশাই, এই ভদ্রলোকের নতুন ঠিকানাটি কি একটু বলে দেবেন?

কোম্পানীর লোকগুলি ভালো, বিমুখ করলো না। এমনি করে বহু পরিশ্রমে বউভাইয়ের নতুন ঠিকানা আবিষ্কার করে দেখি, বেচুচ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীটের একটা পুরাতন ভাঙ্গা বাড়ীর একতলায় ওরা উঠে গেছে। খবর পেলুম, ওবাড়ীর পেছনের ঘরখানায় প্রায় একমাস হোল এক নতুন ভাড়াটে এসেছে, বাকী সমস্ত ভাড়াটেই বহু-দিনের পুরানো লোক।

একদিন মন-মরা গিয়ে ঐ পাড়াটা ভালো করে দেখ্‌লুম। দেখি, ওদের বাড়ীর সাম্‌নের দিকের একটা বাড়ীর একতলার পরে একখানা আলমারী নিয়ে সরস্বতী পাঠাগার নামে এক ছেলেখেলার লাইব্রেরী আছে। তাতে আছে কয়েকখানা দীনেন রায়ের বই আর পুরানো গল্প-লহরী পত্রিকার গোটা দশেক বাঁধানো সংখ্যা।

সেদিনেই একটাকা জমা আর চার আনা পয়সা চাঁদা দিয়ে সেই পাঠাগারের সভ্য হয়ে গেলুম। পাঠাগারের

সম্পাদক আমার চেয়ে বয়সে বোধ হয় ছোটই হবে, তার খাতায় আমার নাম ঠিকানা লিখতে গিয়ে সে অবাক্ হয়ে বল্লে, আপনার বাড়ী আহিরীটোলায়, আর আপনি আসবেন এতদূরে বই পড়তে।

মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়লুম, কিন্তু লজ্জা চাপা দিয়ে বল্লুম, হ্যাঁ, মানে গল্পলহরীর এই পুরাতন সংখ্যাগুলো অন্যত্র কোথাও পাইনি কিনা, তাই।

সে একটু গর্ব্বের হাসি হেসে বল্লে হ্যাঁ, এগুলো সমস্তই আমার কাকার কালেক্‌শান, তিনি আমাদের এই লাইব্রেরীকে এগুলো দান করেছেন।

পাঠাগার বিকেলে খোলে। রোজই বিকেলে এই হতভাগ্য পাঠাগারে গিয়ে বসে বসে গল্পলহরীর পাতা উল্টাই ও মধ্যে মধ্যে সামনের দিকে চেয়ে থাকি। এ যেন আমার এক নেশা হয়ে পড়লো। সমস্ত পাড়াটাই যেন আমার কত আপন, কত অন্তরঙ্গ। কিন্তু এতে ত মন ভরে না। শেষে ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। যে কটি ছেলে এ পাঠাগারে বই নিতে আসতো তাদের সঙ্গে ভাব করতে সুরু করলুম। বয়সে অনেক ছোট, তাতে কি আসে যায়, গরজ যে আমার। শেষে একটি ছেলেকে পেলুম যার বাড়ী ছিল বউভাইয়ের বাড়ীর ঠিক পেছনে। ছেলেটিকে সেই দিনই নিতান্ত আত্মীয় বলে মনে হোল'। ওকে পড়াশোনার কথা বলতে সুরু করলুম, ওর ক্লাসের বই নিয়ে ওকে পড়াতে সুরু করলুম। এর পর সে একদিন বল্লে, আমাদের বাড়ীতে আসুন না রবিদা, আমার মা আপনাকে ডেকেছে।

বল্লুম—বেশ ত চল।

সেদিন বিকেলে ওদের ঘরে যেতে ওর মা আমাকে খুব যত্ন করে বসালেন, চা তৈরী করে খাওয়ালেন, আর বল্লেন বাবা রবিন, তোমার কথা মৃণালের কাছে প্রায়ই শুনি। তুমি ত এই লাইব্রেরীতে রোজই আস, তা লাইব্রেরী থেকে ফেরার সময় যদি একবার করে এ বাড়ীতে এসে ওর পড়াটা একটু দেখিয়ে যাও।

সাগ্রহে বল্লুম, হ্যাঁ, তাতে আর অসুবিধে কি আছে ও আমার ছোট ভাইয়ের মতো। মৃণালের মা বল্লে, কর্ত্তা ত সামান্য চাকুরী করেন, ঘরভাড়া, স্কুলের মাহিনে, পাঁচটি প্রাণীর সংসার খরচ, এর ওপোর আমাদের অবস্থা এমন নয় যে, মাহিনে দিয়ে মাষ্টার রাখতে পারি, তবে তুমি যদি ভালোবেসে—

বাধা দিয়ে বলেছিলুম, সেকি কথা মাসিমা, এ সব আপনি কি বলছেন! সেদিন থেকে বিনা-বেতনের শিক্ষকরূপে সে বাড়ীতে বহাল হলুম।

বউভাই-এর বাড়ীর দিকের জানলা খুলে তিনদিন ধরে সারা বিকেল এমন কি সন্ধ্যের পর পর্য্যন্ত মৃণালকে পড়ালুম, কিন্তু ও বাড়ীর একতলার একটি বিশেষ ঘরের জানলা বন্ধই থাকতো, সেটা কোনদিনই আর খোলা অবস্থায় দেখলুম না। তিনদিন পরে একদিন এক গেলাস জল নিয়ে একটুখানি খেয়ে বাকীটা ফেলবার অছিলায় জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে এমন জোরে গলটা ফেলে দিলুম, যাতে করে সবটা গিয়ে পড়লো ও বাড়ীর সেই বন্ধ জানলার ওপোর। ফেলেই ব্যস্ত হয়ে মৃণালকে বল্লুম, এই যা, ওরা আবার কিছু মনে করবে না ত!

মৃণাল জানলাটা দেখে নিয়ে বলে, নাঃ ও ঘরে নতুন যারা ভাড়াটে এসেছে, তাদের বউ কিছুই বলবে না, কিন্তু কর্ত্তা বড় খিট্‌খিটে মেজাজের। কর্ত্তা বাড়ীতে থাকলে একটু রাগারাগি করবে! তা আমাদের সঙ্গে গোলমাল করতে সাহস পাবে না। এ-পাড়ায় আমাদের অনেক চেনা-শোনা কি না।

বল্লুম, তোমরা কি ওদের চেন না কি?

মৃণাল বলে, হ্যাঁ চিনি বই কি? মাঝে মাঝে দুপুরে ঐ বউটি জানলা খুলে মায়ের সঙ্গে কথা কয়। একদিন আপনার কথাও জিজ্ঞাসা করছিল—

আমার কথা? বুকের মধ্যে যেন মেসিন দিয়ে পাখর ভাঙা সুরু হয়েছিল।

ছাত্র বলে হ্যাঁ, এই ত কাল দুপুরেই মাসিমা জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনাদের সঙ্গে আমাদের আলাপ হোল কবে, কেমন করে ইত্যাদি।

মনের আনন্দ মনে গোপন রেখে বল্লুম, তোমার মাসিমা আমায় দেখলে কবে?

সে বলে, তা জানিনা, কিন্তু আপনার নাম মাসিমা জানে, বোধ হয় আপনাকে চেনেও।

বল্লুম, তাই নাকি, ওকে ডাকো ত, দেখি ও কেমন আমায় চেনে।

মৃণাল বলে, না রবিদা, এখন ডাক্‌বো না। এখন হয়ত বুড়ো এসে গেছে। বুড়ো আসবে বলে ঐ বউ সব জানলা টানলা বন্ধ করে বসে থাকে, বুড়ো কারুর সঙ্গে আলাপ করা মোটে পছন্দ করে না কিনা। নইলে দুপুর বেলা জানলা খুলে মাসিমা মায়ের সঙ্গে গল্প করে, এক একদিন ওপোরে অন্য ভাড়াটের ঘরেও আসে, কিন্তু সন্ধ্যেবেলা বুড়োর ভয়ে—

এর দু'দিন পরে আমি বল্লুম, মৃণাল তুমি স্কুল থেকে ফটার সময় আস?

সে বলে, চারটের পরেই।

তাকে বল্লুম—দেখ, কাল সন্ধ্যেবেলা আমার একটু কাজ আছে, আমি চারটের সময়ই এসে তোমাকে পড়িয়ে দেব, কেমন?

মৃণাল বলে, লাইব্রেরী যাবেন না?

লজ্জিত হয়ে বল্লুম, না এখন আর লাইব্রেরী যাওয়া হবে না। অন্য কাজ আছে।

পরদিন বেলা সাড়ে তিনটার পরই মৃণালদের বাড়ী এসে হাজির। মৃণাল তখনও স্কুল থেকে বাড়ী ফেরে নি। মৃণালের মা আমায় বসু করে বসালেন, বল্লেন, মৃণাল বলে গেছে যে আজ তুমি সকাল সকাল আসবে। এরপর মৃণালের মা আমার সঙ্গে এদিক ওদিক নানা কথা সুরু করলেন। আমি কিন্তু ক্রমাগতই পাশের বাড়ীর জানলার দিকে দেখ্‌ছিলুম। জানলাটা তখন খোলা ছিল, এবং আমার পরিচিত একটা পুরাতন শাড়ীর টুকরা পর্দার মত করে ঐ জানলায় যেন লাগানো ছিল। ও দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হচ্ছিল, যেন কতযুগ হোল সেই অতি পরিচিত মুখখানা দেখতে পাই নি। ঐ পুরানো ইটের বালিখসা দেওয়ালটা যেন আমার কত বড় ঐশ্বর্য্যকে আমারই কাছ থেকে গোপন করে রেখেছে।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বৈদ্যনাথ বল্লে, তারপর?

তারপর আমার দৃষ্টিকোণ থেকে মৃণালের মা যেন কি মনে করে বলেন, রবিন তোমাদের সঙ্গে ওবাড়ীর নতুন ভাড়াটেদের চেনা আছে, নয়?

এ রকম স্পষ্ট প্রশ্নে একটু বিব্রতবোধ করলুম। বল্লুম, হ্যাঁ, আছে বোধ হয়।

শুনেই তিনি কোন রকম ইতস্ততঃ না করে জানলার ধারে গিয়ে বউভাই-এর নাম ধরে ডাক্‌তে লাগলেন।

আমার বুকের ভেতর যে কি তোলপাড় সুরু হয়েছিল তা কি বল্‌বো। কেবলই মনে হচ্ছিল, কেমন করে মুখের ভাব থেকে ভেতরের আবেগটা গোপন করে রাখি।

পর্দা সরিয়ে বউভাই জানলায় দাঁড়িয়ে বলে, আমায় ডাক্‌ছেন দিদি।

যেন বহু বহু দীর্ঘ শতাব্দী পরে সেই কণ্ঠ আবার শুন্‌লুম। মৃণালের মা আমায় জানলার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বল্লেন, আমার এই ছেলেটাকে চেন কি না, দেখ ত ভালো করে?

বউভাই আমার দিকে চেয়ে একটু অপ্রতিভ হয়ে মুহূর্ত্তেই নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বলে, ও, রবিন বাবু! আপনি হঠাৎ এ বাড়ীতে—মানে-আপনি বুঝি এখানে মৃণালকে পড়ান।

তার সম্বোধন এবং কথাবলার কায়দায় আমি আকাশ থেকে পড়লুম, মুখে শুধু সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছিলুম, হ্যাঁ।

বউভাই মৃণালের মাকে বল্লে, আচ্ছা দিদি, অনেক কাজ রয়েছে, এখন তাহলে আসি। বলে কোন রকম অনুমতির অপেক্ষা না করেই জানলাটা বন্ধ করে চলে গেল।

মৃণালের মা আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন, তোমাদের সঙ্গে কোন ঝগড়া হয়েছিল না কি?

বল্লুম, কেন?

বল্লেন, ও যে রকম জোরে জোরে জান্‌লা বন্ধ করলে, তাতে মনে হয়—

কথা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই মৃণাল এসে ঘরে ঢুক্‌লো। সেদিন সামান্য পনের মিনিটে পড়ান শেষ করে অন্যমনস্কের মত সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে বড় রাস্তায় পড়েছি, একটি ফ্রক-পরা ছোট মেয়ে এসে বল্লে, রবিদা, একবার আসুন না আমার মাসীমা আপনাকে ডাক্‌ছে।

বল্লুম, মাসীমা, মাসীমা কে?

ঐ যে দেখুন না, বলে সে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

বউভাই যে বাড়ীতে রয়েছে, সেই বাড়ীর খোলা সদর

দরজা দিয়ে দেখি, ভেতরে উঠানের নানা আবর্জনার পেছনে, যেখানে দোতলার বারান্দাটা পাছে ভেঙে পড়ে সেই ভয়ে একখানা মজবুত বাঁশ চাড়া দেওয়া ছিল, সেইখানে সেই বাঁশটা ধরে বউঠাই দাঁড়িয়েছিল। চেয়ে দেখতেই সে আমায় ইশারায় ডাকলে।

ফ্রক-পরা মেয়েটির পেছন পেছন বাড়ীর মধ্যে ঢুকলুম। বউঠাই নিজের ঘরের মধ্যে চলে গেল, আমাকে ইঙ্গিত করে গেল ঘরে যেতে।

কেমন একটা ভ্যাপ্‌সা পচা গন্ধ ঘরের মধ্যে! ঘরের মেঝেটা একদা সিমেণ্ট করা ছিল বটে, কিন্তু কালক্রমে সমস্তই উঠে গেছে। ঘরের দেওয়ালে কিছুদিন পূর্ব্বেই চুণকাম করা হয়েছিল বলে মনে হোল, কিন্তু সেঁতানির জন্য দেওয়ালে নানারকম কালো কালো ছাপ পড়ে সারা দেওয়ালময় কেমন যেন রাক্ষস-খোক্কসের ছবি সব ফুটে উঠেছে। কাঠের কড়ি, কাঠের বরগা, কয়েকখানা বরগা বোধ হয় পড়ে গেছে, সেই জন্য সেগুলোর পাশে পাশে আলকাৎরা মাখানো মোটা টুকরো বাঁশ ঠেকানো আছে। এই ঘরের মধ্যে আমার পরিচিত, পুরাণো আসবাব-পত্র, সেই তক্তপোষ, সেই ক্যাম্বিশের আরাম কেদারা, সেই নতুন কিস্তিবন্দী করে কেনা সেলাইয়ের কল, সেই ভিনটে তোরঙ্গ, সেই জলের কুঁজো, সেই তালপাতার হাত-পাখাটা পর্য্যন্ত বেটার বাঁটটা আমি ছুরি দিয়ে চেঁছে গোল করে দিয়েছিলুম বলে বউঠাই আমাকে হাসিমুখে ধন্যবাদ জানিয়ে ছিল। জিনিষপত্র সবই ঠিক আছে, কেবল বউঠাই নিজে যেন বদ্‌লে গেছে। মুখের হাসি-হাসি ভাব আর তেমন নেই, এবং এই ছেড়মাসে সে যেন অনেক রোগা এবং বেশ একটু কালো হয়ে গেছে।

আমি ঘরে যেতেই বউঠাই আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিপাত করে বল্লে, মৃণালের সঙ্গে জোর করে আলাপ জমিয়ে এ-বাড়ীতে বিনা পয়সায় টিউসানি করা হচ্ছে কেন, আহিরী-টোলায় কি বিনা পয়সায় পড়াবার মত একটা ছাত্রও আর জোটে না?

বল্লুম বউঠাই, তুমি কি ধমক দেওয়ার জন্যই আমাকে ডেকেছো?

সে বল্লে, হ্যাঁ। সারা কলকাতা সহরে কি আর কোন মাইনেরী তোমার জুটলো না? ছিঃ, এ-রকম ছ্যাংলামুতি যে তোমার ছিল, তা ত জানতুম না।

বল্লুম, এ-সব কোথা থেকে শুনলে?

বল্লে, জানি, সব জানি। আর যার চোখে ধুলো দিতে চেষ্টা কর, দিও, কিন্তু যে তোমায় একদিন ভালোবেসেছে, তাকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা কোরো না।

বল্লুম, ফাঁকি ত আমি দিতে চাইনি বউঠাই, তুমিই আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছ।

এই কথায় সে যেন কেটে পড়লো। বল্লে, আমি তোমায় কি কি দিয়েছি, মিথ্যে কথা। একটু থেমে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বল্লে, আমি চেয়েছিলুম, ভাকাত, তুমি যে এ রকম চোর ছিঁচকে চোর, গাঁটকাটা তা ত জানতুম না। পুরুষ মানুষ, এ রকম কেন? যাও, তার চেয়ে হিজড়ে হয়ে যে-বাড়ীতে ছেলে হয়েছে সেই বাড়ীতে গিয়ে নাচন কোঁদন করগে। বলতে বলতেই সে তার আঁচলটা মুখে চাপা দিয়ে কেঁদে ফেল্‌লে।

আমি তার মুখের দিকে চেয়ে কি বল্‌বো ঠিক করতে পারছি না, সে হঠাৎ মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে বল্‌লে, পাশের বাড়ীর ছেলে পড়ানো ছেড়ে দাও। তুমি কি আমাকে স্বামী নিয়ে ঘর করতে দেবে না?

কেন?

আবার কেন? পাশের বাড়ী পড়াবার নাম করে এসে আমার জানলায় বাদুড়ি বাদুড়ি জল ঢালো কেন?

কে বল্‌লে?

বল্‌বে কে? তুমি যখন মৃণালকে পড়াও তখন যে আমি জানলা বন্ধ করে রাখি তা কি তুমি জানো না? তুমি ওকে যা বল তা কি আমি শুনতে পাই না মনে কর? পাজী, বদ্‌মায়েস, শয়তান তুমি, খবরদার, তুমি আমার পেছন পেছন এইভাবে ঘুরবে না, তা বলে দিচ্ছি। যাও চলে যাও। এ পাড়ায় আর খবরদার ঢুকবে না।

বুক কেটে কান্না এলো! যে আমায় এইভাবে অপমান করতে পারে, তারই জন্য আমি দিন রাত এত সাধনা করছি। ছিঃ।

আশ্চর্য্য বটে, শৈলেন আপন মনেই বলে উঠ্‌লো।

এখানেই ত ভুল করলে শৈলেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৈদ্যনাথ উত্তর করলে।

কিন্তু সেই ভুল যে আমিই করেছিলুম, রবি দত্ত উত্তর দিলে। বললে, এরপর আর কোন কথা বলার পূর্ব্বেই বউভাই বললে, বেরিয়ে যাও, সোজা চলে যাও, আর মনে কোরো, তোমার বউভাই মরে গেছে। সাপকে কাঁপিতে শোবার ক্ষমতা যদি না থাকে, তবে তাকে গর্ত্ত থেকে খুঁড়ে বার করেছ কেন? সে তোমায় নিশ্চয়ই ছোবল্‌াবে এবং তারপর নিজের বিষে নিজে জরজর হয়ে নিজেই নীল হয়ে মরে যাবে। চোখের জলে বউভাইয়ের মুখ এবং বুক পর্য্যন্ত ভিজে গিয়েছিল।

আমারও চোখ দিয়ে জল এসে গিয়েছিল। বন্ধুর, বউভাই, তুমি—

ছেড়ে উঠে বললে, আবার বউভাই? ঘরের কোণে একটা কাঁটা লাঠি করানো ছিল। সেই দিকে চেয়ে বললে, আর একটা বড় কাঁটা তোমার ঐ মুখে না পড়া পর্য্যন্ত কি তুমি এই ঘর থেকে বিদেয় হবে না? যাও, বেরিয়ে যাও বলছি। গজমাদন বইবার ক্ষমতা নেই—বিশল্যকরণী নিতে এসেছ, যাও বেরিয়ে যাও পাজী, ছুঁচো, হাংলা, উল্লুক কোথাকার।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। পেছন দিকে আর চেয়ে দেখি নি। তারপর একদিনও আর ও-পাড়ায় যাই নি। লাইব্রেরী থেকে ঠিকানা নিয়ে মৃণাল একদিন আমাদের বাড়ী এসেছিল। তাকে এক কথায় বলে দিয়েছিলুম যে, আর ও-পাড়ায় যাওয়ার সুবিধে আমার হবে না, এমন কি লাইব্রেরীর জমা-দেওয়া টাকাটা পর্য্যন্ত আর তোলা হয় নি। এর পর বোধহয় ছ'মাস রাস্তায় রাস্তায় পাগলের মত ঘুরেছি, দু'বেলা গঙ্গায় স্নান করেছি, দূর দূর দেশে চাকরীর জন্য অনেক দরখাস্ত করেছি, বন্ধুদের বাড়ী বাড়ী রাত্রি বারোটা, একটা পর্য্যন্ত তাস খেলে ক্লান্তদেহে ফিরেছি, শেষে দাদা যখন বিয়ের ঠিক করে মেয়ে দেখতে যেতে বলেন, তখন মেয়ে না দেখেই একেবারে চেলীর কাপড় পরে টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করতে গিয়েছি। এ ঘোল আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা।

বৈদ্যনাথ বলে, এর পর বউভাইয়ের কোন খবরই আর পাও নি?

পেয়েছিলুম, ঐ ঘটনার দিন পনেরো পরে একটা খামের চিঠি পেয়েছিলুম। তাতে লেখা ছিল, আমাকে ভুলে যেও, যা বলেছি তা ভুলে যেও, সেদিন পাগলা হয়ে কি করেছি জানি না। তুমি মনে কোরো যে আমি মরে গিয়েছি, প্রেতাত্মার পেছনে অনর্থক ছুটে লাভ নেই। মনে কোরো আমি নেই, আমি জন্মাই নি। আমি তোমাদের বাড়ীতে কখনও যাই নি, আমি তোমাকে চিনি না, তুমিও আমাকে চেন না। ইতি এক অজানা হতভাগিনী।

চং চং করে ঘড়িতে পাঁচটা বাজলো, মুন্সারিবাবু কৌটো থেকে একটা পান বার করে মুখে দিলেন। শৈলেন একটু নড়ে চড়ে বসলো, আর আমি আমার পুরাতন কানাঘুষো শোনা অনুমানগুলোর সঙ্গে এই কাহিনীটা মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলুম।

(তিন)

এর পর সংসার করেছি প্রায় বারো বছর, একটু ভেবে বলে হ্যাঁ, বারো বছরই হবে। এ, বি, সি, ইঞ্জিনীয়ারিং কার্য্যের প্রধান ফোরম্যান্ হয়েছি, তোমাদের আড্ডায় এসে তাস পিটেছি, তিনটে ছেলে মেয়ের বাপ্ হয়েছি, টাকা জমিয়েছি, বউকে নিয়ে সিনেমা দেখেছি, কাশী, গয়া, পুরীতে তীর্থ করেছি, প্লুরিসি রোগ সেরে যাওয়ার পর বুকের ঘোড়া-প্যাচ্ যেমন মাঝে মাঝে খচ্ খচ্ করে, সেইভাবে এক একবার খচ্ করা ছাড়া আর কিছুই টের পাইনি। এমন সময় ১৩৪৭ সালের ৬ই বৈশাখ বাড়ীতে এক চিঠি পেলুম। দীর্ঘ বারো বছর পরে বউভাইয়ের ছোট এক চিঠি, পাটনার গর্দ্দানীবাগ থেকে—লেখা, পুরা ঠিকানাও তার মধ্যে ছিল।

কি লিখেছে? শৈলেন প্রশ্ন করলে।

রবি দত্ত আস্তে আস্তে উত্তর দিলে, বলে, তাতে লিখেছিল, মরণের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি। দুনিয়ায় কেউ নেই আমার, চোখ দুটো চিরতরে বন্ধ হওয়ার পূর্ব্বে কি তোমায় একটিবার দেখতে পাবো না? চিঠির কোন উত্তর চাই না, গোটা মানুষটিকে একবার—একটিবার মাত্র দেখতে চাই।

তারপর? বৈদ্যনাথ প্রশ্ন করলে, তার চোখে জল এসে গিয়েছে।

রবি বলে, অফিস থেকে বাড়ীতে এসে চিঠিখানা খুলে

দেখলুম, পরের দিন সকালেই মালিকের কাছে দৌড়ে গেলুম, এক হপ্তা ছুটির জন্য। মালিক বল্লে, এক হপ্তা ছুটী কি করে হবে? একটা ছুট মিলের কতকগুলো কাজের খুব জরুরী অর্ডার ছিল, কাজটা পুরোপুরী আমারই তত্ত্বাবধানে ছিল, আমার সহকারী ফোরম্যান দশ দিন ধরে একজরী হয়ে বাড়ীতে পড়ে ছিল। ডাক্তার বলছিল—বোধহয় টাইফয়েড্ হবে, কাজেই তার দেওয়ার মতো অন্য কেউই আর ছিল না, অতএব আট্‌কে গেলুম। প্রায় পাঁচদিন ধরে দিনরাত ভবল্ শিফ্‌টে পরিশ্রম করে কাজ তুলে ষষ্ঠ দিনের দিন অর্থাৎ ১২ই বৈশাখ কলকাতা থেকে রাত্রের গাড়ীতে রওনা দিয়ে পরের দিন ভোর বেলা পাটনায় পৌছলুম। এর মধ্যে চিঠি লিখ্‌তে সাহস পাই নি। কারণ সে চিঠি লিখ্‌তে বারণ করে দিয়েছিল।

গর্দানীবাগে বাড়ীর ঠিকানা খোঁজ করে দেখি একটা ইট বারকরা দেওয়ালের ওপোর খোলার চাল দেওয়া বাড়ী, একটা বুড়ো বেহারী বাইরের রোয়াকে বসে দাঁতন করছে, আর একটা গোয়ালা বাড়ীর সামনে গাই দুইছে।

টাঙ্গা থেকে নেমে বউভাইয়ের খোঁজ করতে বুড়ো বেহারীটা দাঁতন করতে করতে বেহারী ভাষায় বল্লে, আপনি কি কলকাতা থেকে আসছেন?

আমি বল্লুম, হাঁ।

আপনার নাম কি?

রবি দত্ত।

লোকটা কেমন যেন ম্লান হয়ে বল্লে বৈঠিয়ে। দো রোজ আগাড়ি আয়া নেই কৈও?

বল্লুম, কেন? তার মানে?

লোটা থেকে জল নিয়ে মুখ ধুয়েধীরে সুস্থে বৃদ্ধ বেহারী কাপড়ে হাত মুছে আমার নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা উপেক্ষা করে আমার সুটকেশটা হাতে তুলে নিয়ে আমাকে বল্লে—অন্দর আইয়ে।

ভেতরে গেলুম। সে বল্লে, বাবু, আপনি সত্যি কথা বল্‌ছেন ত? আপনিই রবি দত্ত।

বল্লুম, হাঁরে বাবা, আমিই সেই। তখন সে তার কাঠের সিন্দুক খুলে খামে মোড়া একখানা বড় চিঠি বার করে আমার হাতে দিয়ে বল্লে 'বহু' এই চিঠি আপনাকে দেওয়ার জন্য দিয়ে গেছে।

বল্লুম, কোথায় গেছে?

লোকটা ওপোরে আকাশের দিকে হাত তুলে দেখিয়ে বল্লে স্বর্গে।

কবে? কি করে?

পড়ে দেখুন। ছোট্ট এই উত্তরটুকু দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

চোখে কাপ্‌সা দেখ্‌ছি, হাত কাঁপছে। তাড়াতাড়ি খামটা ছিঁড়তেই একখানা ভাঁজ করা সিল্কের রুমাল আর বড় একখানা ভাঁজ করা কাগজ পেলুম। এই রুমালটা বউভাই যখন আমাদের বাড়ীতে ছিল, তখন পূজার ষষ্ঠীর দিন সকালে লুকিয়ে 'আমার ক্ষুদ্র উপহার' বলে তার হাতে গুঁজে দিয়েছিলুম, সে আজ কতদিনের কথা। বউভাই সেখানা ফেরৎ দিয়ে গেল।

চিঠিটা এক নিশ্বাসে পড়ে ফেল্লুম। যেদিন তার বাড়ী থেকে সে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই দিন থেকে সুরু করে চিঠি লেখার দিন পর্যান্ত দীর্ঘ এক যুগের ইতিহাস, একটানা দুঃখের কাহিনী। সাংসারিক অভাব অভিযোগ, স্বামীর অসুস্থতা, স্বামীর চাকুরী থেকে বিদায়, মৃত্যু, নিদারুণ আর্থিক অভাব, একজন সহৃদয় লোকের চেষ্টায় এক বীমা কোম্পানীতে দালালীর কাজ, নানা পুরুষের নানারূপ কুৎসিত লুব্ধ দৃষ্টি, পদস্খলন, কলিকাতা হইতে বিদায়, পাটনায় নিজের জন্মস্থানে স্কুলে শিক্ষিকার জীবিকাগ্রহণ, অমূলক রোগ, রোগের তীব্র যন্ত্রণা, শেষে রোগশয্যা থেকেই শেষ চিঠি সে আমার কলকাতার ঠিকানায় পাঠিয়েছিল এই সব কাহিনী সে আমার চিঠির মধ্য দিয়ে জানিয়েছিল। শেষে লিখ্‌ছে, জানি তুমি আসবে না, এতকাল পরে একটা ক্ষুদ্র পতিতার জন্য কেউ নিজের সংসার ছেড়ে পয়সা খরচ করে দূর দেশে যায় না, বিশেষ করে তোমার মতো একজন পাকা হিসেবী লোক। কিন্তু তবু তোমায় লিখছি। এ লেখায় একটা আনন্দ আছে। মনে হচ্ছে, তুমি যেন সামনে বসে আছো, আর তোমার কাছে প্রাণ খুলে আত্মনিবেদন করার আনন্দ পাচ্ছি। যদি কোনোদিন এ চিঠি তোমার হাতে পড়ে, তাহলে আমার কথা মনে করে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলো, তারপর আমায় আবার ভুলে যেও। তোমার সেই এক ফোঁটা চোখের জলই আমার জন্মান্তরের দুঃখ করার

ক্ষমতা আমার দিবে। যদি জিজ্ঞাসা কর, কেন আমি আত্মহত্যা করছি, তাহলে আমিই তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো যে, কেন আমি বেঁচে থাকবো। দুনিয়ায় এমন কেউ নেই, যে আমাকে চায়। আমার দেহ আমায় নিদারুণ দুঃখ দিচ্ছে, এ রোগ সারবার নয়। হাতে একটিও পয়সা নেই, কেবল দু'ডরি আফিম আছে—আমার শেষদিনের বন্ধু। স্বামীর শ্রাদ্ধের পর এই দু'ডরি অনেক কষ্টে সংগ্রহ করেছিলুম কিন্তু হতভাগী হলেও প্রাণের মায়ায় এতদিন এটার ব্যবহার করতে পারি নি। এবার করবো, আজই করবো। পাড়েজী আমাকে মেয়ের মত যত্ন করে। তার বাড়ীতে এই কাজ করবো না—গঙ্গার তীরই আমার শ্রেষ্ঠ স্থান। তোমার বাড়ীতে এই চিঠি পাঠালুম না, কেন না নিরপরাধ তুমি, কেন এক পাগলীর আত্মহত্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়বে, কেন তোমার বউ আমায় না-জানি কতকগুলো অভিশাপ দেবে! তোমায় চিঠি লিখে কে হপ্তা অপেক্ষা করলুম, এর মধ্যেও যখন এলে না, তখন জানি তুমি আসবে না, তাই বিদায়, চির জনমের মত বিদায়। চির বিদায়। তোমার দেওয়া রুমালটা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে এতদিন যত্ন করে রেখেছিলুম, আজ তোমায় ফেরৎ দিয়ে গেলুম। যদি জন্মান্তরে তোমার সঙ্গে কখনও দেখা হয়, তাহলে রুমাল আমায় আবার দিও, সময় থাকতে দিও, ব্যবহার করার সুযোগ করে দিও, না হলে এই শেষ! আমাকে ভুলে যেও, স্ত্রীপুত্র নিয়ে ঘরকন্না কোরো, তোমার সুখ দেখলে মরে গিয়েও আমি সুখী হব। ইতি—

কথা শেষ করে রবিদত্ত অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। ঘরের সকলেই নির্বাক, নিস্পন্দ, কেবল দেওয়ালের ক্লক্ ঘড়িটাই টিক্ টিক্ করে চলছিল।

(চার)

তারপর? প্রশ্ন করলে বৈদ্যনাথ।

তারপর আমার সুটকেসটি হাতে করে পাড়েজীর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম। পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে গঙ্গার ধারে এসে উপস্থিত হলুম। পাটনায় গঙ্গায় একটানা স্রোত অনন্তকালধরে চলেছে। জলেরও শেষ নেই স্রোতেরও শেষ নেই, বোধহয় আমার দুঃখেরও শেষ নেই। পাঁচ সাত দিন একেবারে শূন্য মন নিয়ে পাটনার পথে পথেই ঘুরেছি। একদিন ধর্মশালায়, একদিন হোটেলে, দুদিন পার্কে পাগলের মতো কোথায় ঘুরেছি তা ঠিক মনেও নেই। সুটকেসটা হয়ত চুরি হয়ে গিয়েছিল কিম্বা হয়ত সেটা কোথাও ভুলে ফেলে এসেছিলুম। নগদ টাকাগুলোই কেবল পকেটে ছিল। এইভাবে কিছুদিন পরে এক রাত্রে গর্দানীবাগের পার্কে এক বেঞ্চিতে বসে বসে কত কথাই এলোমেলো ভাবছি, হঠাৎ সামনে দেখি বউভাই। সে কথা আগেই তোমাদের বলেছি।

এতক্ষণ আমি কেবলই শুনছিলুম, কোন কথাই বলি নি। এবার বলুম, আচ্ছা বউভাই ত মরে গেছে, তাহলে তুমি বাড়ী ফিরলে না কেন?

রবি বলে, বাড়ীর কথা মনে ছিল না। কারখানায় আগুন লেগে ব্যবসায়ীর লুকিয়ে রাখা নোটের বাণ্ডিলটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এইটা জেনার পর সে যেমন আর গদিঘরের মালপত্র কি সাইন-বোর্ডের অবস্থাটা কি হয়েছে তা অনুসন্ধান করার ধৈর্য্য রাখতে পারে না, আমারও ঠিক সেই অবস্থাই হয়েছিল। তবে তফাৎ হচ্ছে এই যে, আমার ঠিক জানা ছিল না যে বউভাইই আমার সঞ্চিত নোটের তাড়া। সে যে আমার জীবনের কতখানি, তা আমি ঠিক মত হৃদয়ঙ্গম উপলব্ধি করতে পারিনি তার জীবদ্দশায়, কিন্তু তার আফিম খেয়ে মরাটা আমার সকল সন্দেহের অতীত হয়ে গিয়েছিল।

মুরারি বলে, কিন্তু তোমার ছেলে বউ?

ভেবে দেখেছি, ওরা নিতান্তই বাইরের জিনিষ হয়ে ছিল। বউ ছিল আমার সংসাররূপ কারখানার সাইন-বোর্ড। ঐ সাইন-বোর্ডকে ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করেছি, ওর ওপোর বিজলীবাতির রোশনাই দিয়েছি, বিশেষ বিশেষ দিনে ওর ওপোর নানা রঙের সুন্দর ধ্বজা উড়িয়েছি, কিন্তু কোন দিন তাকে মূলধন বলে, আমার সর্ব্বস্ব বলে নিজেকে ভাবি নি। সে ছিল বড়লোকের মেয়ে, তার ছিল বিশেষ এক সত্তা, তার দাবী এবং অধিকার সে ষোল আনা আদায় করে তার কর্ত্তব্য সে করে গেছে নিয়ম মত, প্রথামত। তাই বেনা পাওনার সমস্ত-ছাড়িয়ে কোন দিন সে আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী হতে পারে নি। আর ছেলে মেয়েরা ত তারই ধান। স্ত্রী যেখানে অর্দ্ধাঙ্গিনী

হতে পারে নি, সেখানে ছেলে মেয়েরা ভাইপো ভাইঝির অপেক্ষা অধিক আত্মীয় হতে কখনও পারে না। এর ওপোর স্ত্রী মাঝে মাঝে শুনিয়ে দিতেন যে, তাঁর বাপের এ ক্ষমতা আছে যে, আমার সাহায্য ছাড়াও সে ভালো ভাবে থাকতে পারে, তার ছেলে মেয়েদের উচিতমত মানুষ করে তুলতে পারে। তাই স্ত্রীপুত্রের দায়িত্ব চিরদিনই অন্তরে স্থান পায় নি। ওরা দূরের এবং বাইরের জিনিষ হয়ে, পোষাকী হয়েই ছিল।

মুরারি বলে, তা নয় ভাই, স্ত্রী যে কতখানি, সেটা আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর তুমি বুঝতে পারবে।

বৈদ্যনাথ বলে—সে কথা যাক্, তারপর কি হোল'?

রবিন বলে, সেদিনের বাকী রাতটুকু সেই ছায়াকর বউভাইয়ের সঙ্গে কত রাজ্যের কথাই যে হোল সেই বাকী-পুরের পার্কে, তা কি আর মনে আছে, তবে এতদিনের মূর্খবদ্ধ মনটা যেন মনে হোল অমৃতের প্লাবন বয়ে গেল। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সমস্ত লাভ ক্ষতি, সমস্ত সুখ দুঃখ মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল।

তারপর? প্রশ্ন করলে বৈদ্যনাথ। ব্যাপারটা তাড়া-তাড়ি সবটা উপলব্ধি করার আগ্রহ তার অত্যধিক। তারপর যা সুরু হয়েছিল সেটাকেই রীতিমত ভাবে বলতে পারো কঙ্কালের প্রেম। পরদিন সকালেই খোঁজ করে রঘুবীর ডোমের আস্তানায় গিয়ে হাজির হলুম। বলবো কি, বউভাইয়ের কঙ্কালটা চোখের সামনে দেখতে পেয়ে কি এক অপূর্ব্ব আনন্দের শিহরণ যে উপলব্ধি করেছিলুম সেটা এতদিনেও ভুলতে পারছি না, যা দাম চাইলে পকেট থেকে তখুনি বার করে দিয়ে দিলুম। সে এক রীতিমত বোঝা—তখনও সেগুলোকে তার দিয়ে বেঁধে গোটা কঙ্কালটা তৈরী করা হয় নি। সেই খুচরো হাড়গুলোই বড় একটা থলের মধ্যে পুরে নিয়ে দাম দিয়ে চলে আসছি, তখন রঘুবীর বল্লে বাবু,, একটা পুথি নিয়ে যান নইলে পুলিশে গোলমাল করতে পারে।

এখনও পুলিশ, এখনও বাঁধন, এখনও ভয়? পুথি নিয়ে দুপুরের ট্রেণেই কলকাতায় রওনা দিলুম।

বাড়ী ফিরে প্রথমেই মেডিকেল কলেজের এক ডোমকে ডাকলুম। ওদেরই কাছ থেকে এক সের কিনে ওদের দিয়ে হাড়গুলোয় তার বাঁধিয়ে সেই সেরের ওপোর গোটা কঙ্কালটাকে ভালো করে সাজিয়ে আমার নিজের শয়নকক্ষে খাটিয়ে রাখলুম। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা ব্যস্ত হয়ে পড়লো, গৃহিণী নানা অভিযোগ করতে লাগলেন, দাদা বউদি নিতান্ত অসন্তুষ্ট হলেন—বয়েস তুই ইতিমধ্যে, বুড়ো বয়সে হাড়গোড় নিয়ে কি ডাক্তারী পড়বি না কি? কিন্তু আমি তখন চারিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সেই কঙ্কালের—প্রেমেই বিভোর। সে যে আমার বউভাইয়ের কঙ্কাল এতদিন পরে, এই সাধনার পথে যে আমার বউভাইকে আমি নিজস্ব করে পেয়েছি।

শ্রোতাদের মধ্যে দু'একজনের মুখের ভাব যেন কিরকম বিসদৃশ হয়ে উঠছিল। তাদের লক্ষ্য করে রবিন বল্লে, কখনও ভালোবেসেছ কি? যাকে ভালোবাসা যায়, তার পরিত্যক্ত সমস্ত জিনিষই যে বড় প্রিয়, তা কি জানো?

মুরারি বলে, হাঁ জানি। আমার বড় ছেলে ছিল পাচুঠাকুরের দোর ধরা। ছেলেবেলা থেকে তার মাথার চুল যখনই কাটা হোত, সেগুলো আমার মা সমস্তই একটা বিস্কুটের খালি টিনের মধ্যে রেখে দিতেন, বলতেন, পৈতের সময় ঠাকুরবাড়ী দিয়ে সেগুলো দিতে হবে। সেই ছেলে দু'বছর বয়সে মারা যায়। কিন্তু তার চুলগুলো এখনও আমরা কেউ ফেলতে পারি নি। আমার স্ত্রী সেই চুলের বাক্স নিয়ে বহুদিন নাড়াচাড়া করে—আর চোখের জল ফেলে, এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি। সেই কাটা চুলগুলো আমারও বড় কম ভালো লাগে না।

রবিন বলে, তবেই বুঝে দেখ। সে হোল কাটা চুল, এ আর একটা গোটা মানুষ যে আমার কাছে আসে, কথা কয়, সারারাত্রি ধরে আমাকে কত আশা আনন্দ দান করে।

এ এক অভিনব ভাবসমাধি বটে, কথাটা মুখ ফুটে না বল্লেও মনে মনে করেছিলুম।

বৈদ্যনাথ বলে, তারপর?

তারপর আমায় ঘর ছেড়ে বেরুতে হোল—রবিন বলতে লাগলো। প্রথম রাত্রে স্ত্রী বিরক্ত হয়ে আমার সেই কঙ্কালের ঘরে আর শুতে এলো না, আর আমিও ত তাই চাই। আলো নিবিয়ে দরজা বন্ধ করে কঙ্কালের সামনে দাঁড়িয়ে তার মাথার খুলিতে হাত দিয়ে ডাকলুম বউভাই।

তখন রাত্রি কত হবে? প্রশ্ন করলে বৈদ্যনাথ।

রাত প্রায় বারোটা, পাড়ার সমস্তই নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। ঘরের শুধু একটা মাত্র জানলা খোলা। সেই খোলা জানলা দিয়ে পাশের বস্তীর নিমগাছের ডাল পাতাগুলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আমার ঘরের মধ্যে চেয়ার, টেবিল, খাট সমস্তই যেন কার একটা অপ্রত্যাশিত আগমনে থরথর্ করছে, আমার বুকের মধ্যে প্রচণ্ড আশা সুযোগের আনন্দ—এবার বুঝি আমি আমার বউভাইকে নিজস্ব করে পেয়েছি। একেবারে নিজস্ব, নিতান্ত ভাবে নিজস্ব। কঙ্কালের হাড়সার হাতখানি ধরে ডাকলুম, বউভাই।

দুর্দান্ত সাহস, মুরারিবাবু উত্তর দিলে।

সাহস নয়, কিসের সাহস? রবিন বলে, সেটা কি কঙ্কাল, কঙ্কাল ত নয়। সে যে আমার আপন লোক, সে যে আমার বউভাই—যে আজীবন কাল আমারই ছিল, কিন্তু সমাজের বাঁধন যাকে আমার কাছে আসতে দেয় নি। আইনের ভয় এবং লোকলজ্জা যাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। আর মৃত্যু এসে সেই সমস্ত ব্যবধান দূর করে দিয়েছে। তাকে পরিপূর্ণভাবে আমার করে তুলেছে।

তারপর, বৈদ্যনাথ বিস্ফারিত নেত্রে কেবলি বলছে—তারপর।

কঙ্কালের হাতখানি হাতের মধ্যে নিয়ে ডাকলুম, বউভাই, আশ্চর্য্য, ভয় ত হোলই না, উপরন্তু মনে হোল, হাতটা কঙ্কালের নয়, রক্ত মাংসের তৈরী যেন জীবন্ত মানুষের হাত। সমস্ত কঙ্কাল কেঁপে উঠলো, খোলা জানলার অল্প আলো দিয়ে স্পষ্ট দেখলুম কঙ্কাল বউভাইয়ের অভ্যস্ত মূর্তি নিয়ে ফ্রেম থেকে স্বচ্ছন্দ গতিতে নেমে এসে ম্লান হাসি হেসে বল্লে, তুমি আমায় এত ভালোবাসো রবিন, এতটা কিন্তু আমিও জানতুম না।

বউভাই খাটে এসে বসলো। যেমন তোমরা বসে আছ, এমনি প্রত্যক্ষ, এমনি বাস্তব মূর্ত্তিতে আমার খাটে আমারই পাশে সে বসলো। নিজের একখানি হাত অপর হাতের ওপোর রেখে ধীরে ধীরে বল্লে, তবু কিন্তু মন ভরে না, এ পাওয়া পেয়েও যেন মনে হয় পাই নি। তুমি এবং আমি আমরা যেন অনেক-অনেক দূরে।

মনটা বড়ই বিষ হয়ে গেল। বল্লুম, বউভাই, আমায় নিয়ে যাও, তোমার কাছে করে নিয়ে যাও।

আমার দিকে মুখ তুলে চেয়ে বল্লে, পাগল? তুমি জানো না এই নিরালা অবস্থা কি ভীষণ—এর মধ্যে যেন অতিবড় শত্রুও না আসে। আর তাছাড়া নিয়তি না টানলে কোন শক্তির সাধ্য নেই, এই ভাবে দেহীদের অবস্থান্তর ঘটায়।

বল্লুম, বউভাই, তুমি এ সব শিখলে কোথা থেকে।

বল্লে "অভিজ্ঞতা দিয়ে। এ সমস্তই আমার অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান। যেদিন দেহ ছেড়ে বেরিয়েছি, সেই দিনই দৌড়ে আমি তোমার কাছে এসেছি, তারপর সে কি এক বিপুল, বিরাট মহাশূন্যের মধ্যে ভ্রমণ করেছি। প্রথম মনে হয়েছে আমি মুক্ত, কিন্তু পরে বুঝলুম আমি কি ভয়ানক রকম বদ্ধ, কি প্রচণ্ড রকম অসহায়। পুরাতন স্মৃতি সমস্তই আছে, দেহ মনের যাবতীয় ক্ষুধা সমস্তই বর্ত্তমান। অথচ স্নায়ুবৃত্তির যন্ত্রগুলো নেই। তুমি কি হাত পা কাটা রোগী দেখেছ। প্রায় পাঁচ ছ'মাস যাবৎ আমি ঐ নার্সের চাকুরী করেছি লোকের বাড়ীতে। একজন রোগীকে দেখেছি, তার পায়ে পচ ধরেছিল বলে ডাক্তার তার একখানা পা হাঁটুর তলা থেকে কেটে দিয়েছিল। সেই রোগীর বাড়ীতে তাকে শুশ্রূষা করতে গিয়ে দেখলুম, সেই রোগী মাঝে মাঝে আমাকে বলতো, তার কাটা পায়ের বুড়ো আঙুলটা চুলকে দিতে। পা-ই নেই, তা আবার পায়ের বুড়ো আঙুল, তাকে আবার চুলকোতে হবে! কিন্তু রোগী একেবারে ছট্‌ফট্ করতো, পায়ের আঙুল চুলকে দিচ্ছি না ব'লে আমায় গালাগালি দিত, তার পা নেই বলা সত্ত্বেও সে বলতো চুলোর যাক্ পা, তুমি আমার আঙুলটা চুলকে যাও। ডাক্তারকে বলতে, ডাক্তার বলে, ওরকম হয়, ও সব স্নায়ুর খেলা! যারই খেলা হোক রোগী কিন্তু ছট্‌ফট্ করতো। তখন আড়ালে গিয়ে কত হেসেছি, কিন্তু আজ আমার নিজের সেই অবস্থা। আর একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীকে দেখেছি। তার পেট থেকে নীচের অঙ্গ একেবারে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। তার স্মৃতি, বুদ্ধি, ইচ্ছা সমস্তই ছিল পুরোমাত্রায়, কিন্তু ক্ষমতা ছিল না একেবারে।

বড় লোকের ছেলের বয়স হবে ত্রিশের মতো, সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী স্ত্রী, স্ত্রীর হাত ধরে তাকে অবোরে কাঁদতে

দেখেছি, আর স্ত্রীকেও কাঁদতে দেখেছি। সন্তোষের আকর্ষণ যেন তার শতগুণ বেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু মানসিক বিকলতা! হৃদ্‌রোগে হার্ট ফেল করে মারা গেছেন—ডাক্তার বলে, ঐ রকমই হয়। তখন এ সব ঠিক মতো বুঝতে পারি নি, কিন্তু এখন সেই সমস্তই বেশ স্পষ্ট জলের মত বুঝতে পারছি, কিন্তু এ জীবনে হাটফেলও নেই, অন্য কোন প্রতিকারও নেই।

এমনিভাবে সারারাত গল্প করতুম। একদিন রাত্রে দুজনে বসে বসে কথা কইছি। বউঠাকুরাণী বলে, আমাদের এমনই বরাৎ। জন্মজন্মান্তর ধরে তোমার সঙ্গে আমার আশার মিলন এমনই ভাবে ব্যাহত হয়েছে। পূর্ব্ব জন্মের কথা তোমার কিছুই মনে নেই, আমার কিন্তু সবটাই মনে পড়েছে। তুমি ছিলে উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ সন্তান, ধনী জমীদারের একমাত্র পুত্র, আর আমার বাবা ছিল তোমাদেরই প্রজা নমঃশূদ্র। তোমার মহল দেখবার জন্য তুমি একবার বজরায় করে আমাদের গাঁয়ে এলে, আর আমি এলুম নদীর তীরে বিকেলে স্নান করতে। দুজনের চারি চক্ষের মিলন হয়েছিল। তুমি তোমার অভ্যাসমত ভদ্রতায় চোখ নামিয়ে নিলে, আর আমি সকলের অলক্ষ্যে তোমায় দেখ্‌তে দেখ্‌তে চলে এলুম। দুদিন পরে তুমি বজরা ভাসিয়ে চলে গেলে, আর দুমাস পরে বিয়ে করে আমি শ্বশুরবাড়ী চলে গেলুম। আমার স্বামী তোমার বাস্ কাছারীতে পাইকের কাজ করতো, সে আমায় নিয়ে গেল তোমারই রাজবাটির কাছে, তোমারই দেওয়া কুটিরে, রাত্রে থাকে তোমাকে দেখতুম, তুমি ঘোড়ায় চড়ে তোমার বাড়ীতে আস্‌ছো, কিম্বা বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছো। বুকের ভেতর থেকে কেমন একটা নিদারুণ হাহাকার জেগে উঠতো। এর পর তোমারই তৈরী এক ছলায় তোমার শত্রুপক্ষের হাতে আমার স্বামীর মৃত্যু হয়, তুমি একটা বড় গোছের মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়। কিন্তু সেই মোকদ্দমার মাঝখানেও তুমি আমাকে ভুল্‌তে পারো নি। তোমার পাইকবউয়ের সমস্ত ব্যবস্থাই তুমি করে দিয়েছিলে। আমি বুঝতুম, তুমি আমাকে সুনজরে দেখেছিলে, কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ আমার কোন দিনও হয় নি। অন্যান্য দুর্দ্দান্ত জমীদাররা এদেরে নীচ জাতীয় প্রজার বউদের ভোগ করতে দ্বিধা করতো না, কিন্তু তুমি ছিলে নিদারুণ চরিত্রবান! সে জন্যে তোমার নানারূপ অত্যাচারের কথা আমি লোকমুখে শুনতুম, কিন্তু নারীঘটিত দোষের কথা কখনও কারুর কাছে শুনিনি। আমার সেই নমঃশূদ্র জীবনের শেষপ্রান্তে আমি যখন নিদারুণ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় তোমারই দেওয়া সেই পর্ণকুটীরে শেষ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় পড়েছিলুম তখন সেই শেষ সময়ে তুমি স্বয়ং আমার ঘরে এসে ঢুকেছিলে। যে বৃদ্ধা আমার শুশ্রূষা করতো, তাকে তুমি আমার কথা জিজ্ঞাসা করে, যে শীতলার কবিরাজ আমার চিকিৎসা করছিল, তারই সাম্‌নে তুমি একবার মাত্র আমার সেই রোগবিকৃত কপালের ওপোর তোমার পদ্মহস্ত বুলিয়ে দিয়েছিলে। সেদিন যে আনন্দ শিহরণ ভোগ করেছিলুম তা আমার এখন মনে পড়েছে, কথা বলার চেষ্টাও করেছিলুম, কিন্তু আমার সেই বিকৃত ঠোঁট দুটো সামান্য স্পন্দিত হয়েছিল, তিলমাত্র কণ্ঠ স্বরও নিঃসৃত হয়নি হতভাগীর বাক্‌যন্ত্র থেকে। মনে মনে প্রার্থনাও করেছিলুম যেন জন্মান্তরে তোমায় পাই, কিন্তু প্রার্থনার আবেগ বোধ হয় তেমন ছিল না, তাই এ জন্মে তোমাকে পেয়েও পেলুম না।

আর একদিন রাত্রে বলে, আর একজন্মের কথা শোনো। সে জন্মে তুমি গুরুতর এক অপরাধে দণ্ডিত হয়ে আন্দামানে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনে নির্ব্বাসিত হয়ে গিয়েছিলে। আমিও আমার স্বামীর ব্যবহারে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিলুম, সেজন্য আমিও আন্দামানে নির্ব্বাসিত হই। সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী ঐ কুখ্যাত দ্বীপে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। আন্দামানের কয়েদীরা কিছুদিন জেলের মধ্যে বন্ধ থেকে পরে ঐ দ্বীপের মধ্যে অবাধে ঘুরতে পারতো। ঘোরবার অধিকার আমি কতোই পেয়েছিলুম। ঐ অবস্থায় ইচ্ছা করলে কয়েদীরা বিবাহাদিও করতে পারতো। আমি এক রাজপুত কয়েদীকে স্বেচ্ছায় বিবাহ করি, তারপর যখন তোমায় দেখি, তোমার সঙ্গে আলাপ হয়, তখন তোমার জন্য একেবারে পাগল হয়ে যাই। আমার সেই রাজপুত স্বামী এ জন্য যে আমার ওপোর কত অত্যাচার করেছে, তার ঠিক নেই, কিন্তু তোমার জন্য আমি তখন উন্মাদ। সেখানকার নিয়মে বিবাহ বিচ্ছেদের আইনও ছিল, কিন্তু সেই রাজপুত

কিছুতেই আমাকে ছাড়ে না,আর সে জন্যে তুমিও আমাকে তেমন করে কামনা কর নি। একদিন স্বামীর সঙ্গে তোমার বিশ্রী নিয়ে কলহ হতে হতে আমার সেই রাজপুত স্বামী একখানা বড় পাথর হাতে নিয়ে একেবারে পাগল হয়ে এসে আমার মাথায় এমন ভাবে মারতে থাকে যে মাথার খুলি ভেঙ্গে আমি সেইখানেই দেহত্যাগ করি। সেই ফাঁসেই আমার রাজপুত স্বামীর হয় ফাঁসী, আর সমস্ত কাহিনী শুনে সে জন্মে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। আমার মনে পড়ছে, সে জন্মে তুমি সেলুলার জেলের পেছনের সমুদ্রের ধারের বাঁধের ওপোর সারাদিন বসে বসে আপন মনে সমুদ্রের ঢেউ দেখতে, আর আমি হাওয়ার হাওয়ায় আলেয়ার মত গান গেয়ে তোমাকে আমার প্রাণের সমস্ত আকুতি নিবেদন করতুম। তুমি কখনও বুঝতে, কখনও বুঝতে না, শুধু উদাস হয়ে সারাদিন সমুদ্রের ঢেউ দেখে তোমার জীবন কাটিয়ে দিয়েছ। সে জন্মে আর আন্দামান থেকে তোমাকে ফিরতে হয় নি, সেই সুদূর সাগর দ্বীপেই তোমার সে জন্মের শেষ নিশ্বাস পড়েছিল।

প্রতি রাত্রেই এই শ্রেণীর কত গল্প, কত কাহিনী, কত সুখ দুঃখের আদানপ্রদান হোত, কিন্তু এর ফলে আমার বাড়ীর লোক বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়লো। দাদা বললেন, ওর মাথা খারাপ হয়েছে, স্ত্রী এবং বউদি সারারাত ধরে আমার বন্ধ ঘরের দরজায় কান পেতে শুনতো, আমি আপনা আপনি কথা কইছি। অফিস এসে কত করে ডাক্তার দেখাতে বললেন, চেঞ্জে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। অফিসে খবর দিতে আমাদের কারখানার মালিক বিশ্বাসই করলেন না, বললেন—হতেই পারে না। বরঞ্চ আগের তুলনায় এখন ও আরো ভালো করে কাজ করছে, খুব শক্ত শক্ত জিনিষও বিলেত-ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ারদের চাইতেও অতি সহজে করে দেয়। কিন্তু বাড়ীর লোক শুনতে চায় না। তারা অনেক চেষ্টা করলে বউভাইয়ের কথাটাকে ঘর থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য। সে আমি কিছুতেই দিলাম না। শেষে স্ত্রী বললে, থাক্ কথাল, আমি ঐ ঘরেই শোব। কিন্তু তাকে আমি কিছুতেই ঘরে ঢুকতে দিতে পারলুম না। বাড়ী থেকে বেরোবার সময় ছুটো বড় বড় তালা নিয়ে ঘরে লাগিয়ে যেতুম,পাছে ওরা কেউ আমার বউভাইয়ের কোনো রকম অনিষ্ট করে। এই সবে কাটলো প্রায় ছ'মাস।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজলো। শ্রোতারা সকলেই নির্বাক হয়ে বসে আছে।

পাঁচ

সকলকে নীরব দেখে খানিকক্ষণ পরে আমিই কথা কইলুম। বন্ধুরা, এটা আমি কানাঘুষা শুনেছিলুম বটে। তোমার দাদাও একদিন বলেছিলো তোমার অসুখতার কথা, কিন্তু কঙ্কালের কথা ত শুনি নি।

রবিন বললে, না, ও কথা ওরা কেউই কোনদিন বাইরে প্রকাশ করে নি। বউদির ভয়ানক ভয় ছিল যে, কঙ্কালের কথা বাইরে প্রকাশ পেলে পাছে কেউ আমাকে পিশাচসিদ্ধ বা ঐ রকম কিছু মনে করে খুন বা কোন রকম অনিষ্ট কিছু করে। তাই এ কথা তারা কাউকে প্রকাশ করে বলে নি।

মুরারী একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বললে, তারপর?

তারপর আমার সেই সুখের দিনগুলো শেষ হোল। প্রায় ছ'মাস এইভাবে বাড়ীতে থেকে কারখানার চাকরী বজায় রেখে চললো বটে, কিন্তু বউভাই বড়ই বিমর্ষ হয়ে পড়তে লাগলো, আর আমারও যেন জীবন দুর্বিষহ বলে বোধ হতে লাগলো। রোজ রাত্রে সে সামনে আসে, কাছে বসে, অথচ কোন স্পর্শানুভূতি নেই, এই অবাস্তব জীবন যেন মৃতের জীবন! এর ওপোর বাড়ীতে সারাদিনব্যাপী অশান্তি। ডাক্তারের উপদ্রব, নিকট আত্মীয়দের অনুযোগ, নানারূপ করা মামুলী এসব পরেতেই হবে, নচেৎ বউদির কান্না! বউদি আমাকে মায়ের মত ঘরে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছিল কিনা!

বৈদ্যনাথ বললে, তারপর কি করলি।

করবো আর কি? এদিকে বউভাইও প্রায়ই মুখ শুকিয়ে বসে থাকে, ভালোভাবে কথা কয় না যাকে মাঝে বলে, আমায় ছেড়ে দাও। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করবো, যেন সুস্থ করে তোমায় পাই।

তারপর প্রশ্ন করলে বৈদ্যনাথ।

পূজোর ছুটী পার হয়ে বড়দিনের ছুটী এসে পড়লো। বউভাইকে পাওয়ার পর থেকে আমি আর কোনরকম আড্ডা বা অন্য কোন কাজই করতুম না, অফিস আর ঘরই হয়েছিল আমার সমস্ত পৃথিবী, স্ত্রী ও ঘরের কথা, এমন কি ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে পর্যন্ত চেয়ে দেখবার সময় পাই

নি। মাইনের প্রায় সব টাকাটাই দাদাকে দিয়ে দিতুম, তিনিই সংসার চালাতেন। এম্‌নি ভাবে সংসার শূন্য সংসারী হয়ে দিন আমার কাটছিল।

এমন সময় বউভাই এক রাত্রে আমাকে বললে, চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বললে, আমাকে ছেড়ে দাও। আমার এই হাড়গুলো গঙ্গাতে কন্যার মতো ভাসিয়ে দিয়ে প্রেতশিলা তীর্থে পিণ্ড দিয়ে আমাকে মুক্ত কর, আর তুমি নিজে মুক্ত হয়ে এ জন্মের সাংসারিক কর্তব্য পালন করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, যাতে করে পরজন্মে আমরা সার্থকভাবে মিলতে পারি।

আমার কিন্তু মন সরে না, অথচ বউভাইয়ের আগ্রহ কম নয়। বউভাইয়ের গোঁ ছিল চিরকালই খুব প্রচণ্ড, সে যখন একবার এ কথা বলেছে, তখন সে এ কাজ না করিয়ে ছাড়বে না।

বল্লুম—পরজন্মে যদি মিলতে না পারি?

সে বলেছিল, নিশ্চয় পারবো, অবশ্যই মিলবো। এ যে দুজনেই দুজনকে আকর্ষণ করছে গো। নইলে এজন্মে তুমি ত আমাকে বউদি বলবে বলেছিলে, তখন এ-সব না জেনেও কেন আমি তোমায় বউভাই বলতে বলেছিলুম বল ত?

রহস্য করে বল্লুম, তবে যে তুমি আমার নাম ধরে ডাকো?

বললে, কেন ডাকবো না। সারা পৃথিবী জুড়ে সমস্ত আধুনিক মেয়েরা কি তাদের স্বামীদের নাম ধরে ডাকে না? আমি তোমার নাম ধরেই ডাকবো, জন্ম জন্ম ঐ নাম ধরেই যেন তোমায় ডাকতে পারি। একি আমাদের এক জন্মের সম্বন্ধ গো? দুটো আরশীকে সাম্‌না সাম্‌নি ধরলে যেমন তাদের প্রতিবিম্বের শেষ থাকে না, তেম্‌নি তোমাতে আমাতে সাম্‌না সাম্‌নি বসলে যে আমাদের হাজার হাজার পূর্বজন্মের লক্ষ লক্ষ ছবি পরস্পরের মুখের ওপোর স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে তা কি দেখতে পাও না? তুমি আমি দুজনে যে এক, আমি যে তোমার সত্যিকারের অর্দ্ধাঙ্গিনী, কেবল কোন্ লীলাময়ের বিচিত্র রহস্যজালে আবদ্ধ হয়ে সম্পূর্ণ কৃত্রিমভাবে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। নদীর দুধারের দুই গাছে বসা চখাচখি দেখেছ কি? আমরা যে তাই! পরজন্মে পৃথিবীর যে-কোণেই তুমি জন্মাও না কেন, আমি তোমায় ঠিক খুঁজে নেব, তা সে আন্দামানের সমুদ্র দ্বীপেই হোক, আর বরফ-ঢাকা এস্কিমোর দেশেই হোক্। যে লীলাময় আমাদের মনের গাঁটছড়া চিরস্থায়ী করে বেঁধে দিয়েছে, সে কি আমাদের পরস্পরের যোগসাধন না করিয়েই ছাড়বে ভেবেছো? তাও কি আবার হয় নাকি?

এর পর বাড়ীর কাউকে কোন কথা না জানিয়ে এক নিশীথ রাত্রে একটি ব্যাগে করে বউভাইয়ের সমস্ত হাড়-গুলো ভরে যা কিছু টাকা কড়ি ছিল সমস্ত নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। অফিসের গাড়ীখানা আগে থেকেই চেয়ে নিয়ে তাতে তেল-টেল দিয়ে ঠিক করে রেখেছিলুম। রাত্রি দেড়টার সময় সেই মোটর নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। হাওড়ার পুল পার হয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে সোজা রওনা দিই। বহুদিনের ইচ্ছে ছিল বউভাইয়ের সঙ্গে এক সঙ্গে মোটরে করে দূরদেশে বেড়াতে যাবো। আজকে চলেছি, ছাদ-খোলা ছোট গাড়ী, পায়ের তলায় এক্সেলারেটর, হাতে ষ্টিয়ারিং, স্থির, নিস্তব্ধ, নৈশ আবেষ্টনী, কেবল গাড়ীর এক-টানা শব্দ, মাথায় মুখে হু হু করে হাওয়া লাগছে। হাওড়ার পোল পার হয়ে হঠাৎ পাশে চেয়ে দেখি, বউভাই হাসি মুখে আমারই পাশে আমার গা-ঘেঁষে বসে আছে! তার মাথার চুল উড়ছে, শাড়ীর আঁচলটা হাওয়ায় ফন্ ফন্ করে উড়ছে, ঠিক যেন সেটা বিহঙ্গিনীর স্বচ্ছন্দ ডানা-কেতন।

বালি উত্তরপাড়া রিষড়া, শ্রীরামপুর এক একটা জায়গা আসছে, আর নিমেষে পেছিয়ে যাচ্ছে। এম্‌নি করে সমস্ত পৃথিবীকে পেছনে ফেলে উধাদের মতো এগিয়ে যেতে চাই সেই এক রহস্যপূর্ণ অজানা মিলনতীর্থে যেখানে মিলনের কোন শেষ নেই। আমাদের এই যাত্রার কোন শেষ যেন না থাকে, আমাদের এই উন্মত্ত গতিবেগ যেন কোনদিন বন্ধ না হয়।

রবিন, ধরা-গলায় বউভাই আমায় সম্বোধন করলে।

বউভাই, আমি তার কথার উত্তর দিলুম।

সে বললে, না, আজ আর বউভাই বলে ডেকো না। আজ আমার নাম ধরে ডাকো। তোমার মুখ দিয়ে আজ আমি আমার শ্রবণ ভরে আমার নিজের নামটাই শুনতে চাই। ডাকো, আমায় একবার বীণা বলে ডাকো।

ডাকলুম, বীণা, বীণা, বীণা।

সমস্ত আকাশ ভরে সেই বীণা নামের প্রতিধ্বনি যেন ফিরে এলো। সমস্ত নৈশভুবন পূর্ণ করে সেই একটিমাত্র শব্দই যেন ওঙ্কারের মত পরম পবিত্রতা বিকশিত করে আমাদের দিগন্তকে প্লাবিত করে সেই নামসমুদ্রের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণের মত করে আমাদের ভাসিয়ে রেখেছিল। সেই মিলনাভিষানের রাত্রি যে কোথা দিয়ে শেষ হোল, তা যেন টেরই পেলুম না।

সকালে এক সহরের কাছে এলে বীণা বললে, এবার কিছু খেয়ে নাও ভাই, আমায় এবার অল্পক্ষণের জন্য ছুটী দাও।

বল্লুম, না, ছুটি নয়। চল তোমাতে আমাতে এক সঙ্গে প্রাতরাশ করি।

ম্লান হেসে সে বললে, তাও কি হয়?

বল্লুম, তবে থাক, খেয়ে দরকার নেই।

সে বললে, বেশ চল, একসঙ্গেই খাবো।

হোটেলে গিয়ে দুপ্লেট খাবার, দু কাপ চা চাইলুম। হোটেলওয়ালা কিন্তু জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে রইলো।

বীণা আমার পাশে বসেই খেলে। এক অপূর্ব্ব তৃপ্তিতে সমস্ত মনটা ভরে উঠ্‌লো। বউঠাইয়ের সঙ্গে একসঙ্গে বসে আমার কোনদিনই খাওয়া হয় নি। সেই যেদিন পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার খবর বেরোয়, সেই সেদিনে বইদি ও বউঠাই একসঙ্গে আমার সামনে বসে খেয়েছিল বটে কিন্তু সেখানে আমি ছিলুম দর্শক মাত্র। এর পর সময় ও সুযোগ বুঝে আমি তাকে কোন কোনদিন নিজের হাতে পান খাইয়ে দিয়েছি বটে কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। দু'এক দিন সন্দেশও খাইয়েছিলুম কিন্তু একেবারে পাশাপাশি এভাবে একটেবিলে বসে এই প্রথম।

খাওয়া শেষ করে যখন হোটেলের বয়কে পয়সা দিতে গেলুম, তখন সে বলে, আর একটা প্লেট যে নিলেন, এ খাবারটা কে খাবে? গাড়ীতে বুঝি আর কেউ আছে, তা এঁর চা-টা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

ভালো করে হেসে দেখি, প্লেট যেমন-তেমনি পড়ে আছে। কোনো কথার জবাব না দিয়ে ঘাড় হেঁট করে বেরিয়ে এসে গাড়ীতে বসে ষ্টার্ট দিলুম, দোকানদার হয়ত আমাকে পাগল বলে মনে করে হেসেছিল।

গাড়ী ছাড়ার পর বীণাকে আবার দেখতে পেলুম। অনুযোগের সুরে বল্লুম, ও রকমটা কেন করলে?

সে বলে, উপায় নেই, শুধু তোমার খুসি করার জন্য—

বল্লুম, তাহলে না গেলেই পারতে। দোকানদার কি মনে করলে বলত?

সে বলে, আমার জন্য তোমার ত কত লোক কত কিছুই মনে করছে। আর আমার না গিয়ে কি উপায় আছে। যাকে ভালবাসি, তার জন্য যে সবই করতে হয়।

কিছু দূর যাওয়ারপর বল্লুম—বীণা, চল তোমাকে পাশে বসিয়ে এই গাড়ী নিয়ে সারা ভারত ঘুরে আসি, গয়া ত আছেই।

মুহূর্ত্তে তার মুখ মলিন হয়ে এলো। একটু ভেবে বললে, আচ্ছা ভাই। পাটনা কাশী এলাহাবাদ নানা বিচিত্র সহরের বিভিন্ন পরিবেশে প্রায় একসপ্তাহ ঘুরেছি। এর পর একদিন বউঠাই বললে, রবিন!

'কি'

আমায় কি মুক্তি দেবে না? আমি যে আর পারছি না ভাই। একটু থেমে বললে, এত কাছে এসে, একেবারে পাশে বসেও এত দূরে থাকতে যে আমি পারছি না! ভয়ের মত ছেড়ে দাও ভাই।

হঠাৎ একটা নতুন বুদ্ধি মনে এলো। বল্লুম, কোন চিন্তা নেই বীণা, চল এই গাড়ী নিয়ে একেবারে সশরীরে মহাপ্রস্থান করি। খুব জোরে চালিয়ে কোথাও ধাক্কা দিয়ে দিই, তারপর তোমায় আমায় একেবারে মিশে মিশে এক হয়ে যাই তোমার ঐ হাড়গুলোর সঙ্গে আমার এই হাড় একত্র হয়ে—

ভয়ে শুকিয়ে সে যেন একেবারে কেঁদে ফেললে—বললে, কখনও না। আমার মাথার দিব্য, এমন কাজ কখনও কোরো না। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করবো, চিরদিন অপেক্ষা করবো, কিন্তু এ ভাবে চেষ্টা করলে মিলন হবে না,—অনন্ত কাল ধরে হাওয়ায় হাওয়ায় নিরালম্ব হয়ে ঘুরতে হবে। তুমি আমায় সে দুঃখ আর দিও না রবি।

ম্লান হয়ে গেলুম। টাকা ফুরিয়ে এসেছে। দু'দিনের জন্য গাড়ী চেয়ে এনেছি, কাজেই অফিসে টেলিগ্রাম করেও

আর টাকা পাওয়া যাবে না। উল্টে যারা নিশ্চয়ই খোঁজাখুঁজি সুরু করেছে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লুম—বীণা, গাড়ীর বেয়াদ ফুরিয়েছে গাড়ী চালাবার পয়সা নেই, চল এবার শিবের মত তোমার ঐ কঙ্কালটা কাঁধে নিয়ে সারা ভারত ঘুরে আবার অভিনব পীঠস্থান তৈরী করে বেড়াই।

মিনতির সুরে সে বল্লে, না রবিন, আর আমায় আলিও না। তোমার জন্য অনেক করেছি। আর পারবো না, যা বলছি তাই করো। ঐ গঙ্গাতেই আমার শেষ কাজ করে দাও, তারপর আমি তোমার জন্য যতকাল প্রয়োজন হবে অপেক্ষা করবো, কিন্তু তোমার জীবন নষ্ট করো না, আমাকে মুক্তি দাও।

গাড়ীর মোড় ফেরালুম। তিনদিন পরে গয়া এসে পৌঁছলুম।

পৌষমাস। শীতের কুয়াশা ভেদ করে শেষ রাতে জনমানবের শয্যাত্যাগের পূর্বেই সেই বাক্সর ভরা বউভাই-এর দেহাবশেষ নিয়ে ফল্গুর দিকে যাত্রা করলুম। হাজার হাজার প্রেমিক স্বামীকে আমার চোখের সামনে দেখতে পেলুম, যারা খাটিয়ায় চড়িয়ে তাদের সোনার পুতুলকে শ্মশানে নিয়ে যায় দাহ করার জন্য! দেখলুম সাজাহানকে মমতাজের কফিনের পিছন পিছন ধীর পদক্ষেপে যমুনার দিকে চলেছে। দেখলাম গ্যালিলিও, দেবকুমার বিশু-খৃষ্টকে, নিজের গুরুভার ক্রশকে বহন করে ধীরে ধীরে মৃত্যুভূমির দিকে এগিয়ে চলেছে। মহাপ্রস্থানের পথে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ছিল কুকুর, কিন্তু শীতের রাতে গয়ার ফল্গু-পথে আমার সঙ্গে একটা কুকুরও ছিল না। বউভাইও কি আজ আমায় শেষবারের মত দেখা দেবেনা!

আকুল কণ্ঠে ডাকলুম, বউভাই, বীণা—

পাশে পাশে সাড়ী পরা মূর্তিটি হাঁটতে লাগলো। অত্যন্ত ধীর তার পদক্ষেপ। বাঁহাতখানি পাশে ঝুলছে, ডান হাতে নিজের আঁচলের প্রান্তটা তুলে ধরে নিজের চোখে চাপা দিয়ে সে নীরবে কাঁদছিল। তার ঐ কান্না দেখে আমি আর চলতে পারলুম না। বল্লুম, তবে থাক্ বীণা, তুমি কাঁদছো!

ব্যস্ত হয়ে চোখ থেকে আঁচল সরিয়ে সে বল্লে, না রবিন, তুমি আমায় এই অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি দাও, আমি তোমারই, আমি তোমারই কাছে থাকবো, তোমারই সঙ্গে আবার মিলিত হব, কিন্তু এগোতে আর পারি না, তুমি চল, থাকলে কেন?

যন্ত্রের মত পা দুটো যেন আমার অজান্তেই আবার চলতে লাগলো। মন্দিরের পাশেই ফল্গুর ঘাটের ধরজায় এসে উপস্থিত হলুম। কেউ কোথাও নেই কেবল এক দীর্ঘশ্মশ্রু সন্ন্যাসী ধুনি জ্বালিয়ে বসে বসে গাঁজা খাচ্ছিল। একবার আমার দিকে চেয়ে দেখলে, দেখে আপন মনেই বলে উঠ্‌লো—হরিনারায়ণ, হরিনারায়ণ।

ফল্গুনদীর ঘাটের ওপার যেখানে সুতোর মত কাটা আছে, সেখানে সেই জলের ধারে এসে দাঁড়ালুম। বাক্সটা খুললুম, কিন্তু হাড়গুলো আর জলে ফেলতে পারছি না। বীণা আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। তার মুখের দিকে চেয়ে আছি, আর তার দুচোখ দিয়ে জলের ধারা টপ্ টপ্ করে ফল্গুর ওপরে পড়ছে। হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল, কিন্তু আমার কেবলই মনে হচ্ছিল এত গুমোট কেন, এত গরম কেন?

একটু থেমে সে আমাদের লক্ষ্য করে বল্লে, নিজের হাতে নিজের হৃৎপিণ্ড কেউ ছিঁড়ে উৎসর্গ করেছে কি? তা করো থাকলে বুঝতে পারবে, এই কঙ্কাল হাড় সেই ফল্গুতে ফেলার মর্মকথা!

বউভাই কথা কইলে। বল্লে—আর দেরী কোরো না ভাই, এবার সব লোকজন এসে পড়বে যে!

আকাশের দিকে চেয়ে দেখলুম। বিস্তীর্ণ আকাশের বুকে উষার লালিমা রেখা দিয়েছে বীণার দিকে চেয়ে দেখলুম—তার জলভরা চোখ দুটো যেন আরও বেশী উজ্জ্বল, বেশী স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে।

হাড়ের বাক্সটার হাত দিয়ে কঙ্কালের হাতখানা আর একবার নিজের হাতে ধরে নিলুম। হঠাৎ যেন বীণা একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। যে কথা কোনদিন তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় নি সেই কথা বলে, সে একেবারে আমার ওপোর কাঁপিয়ে পড়লো। বল্লে, প্রিয়তম, প্রাণেশ্বর, জন্মে জন্মে তুমি আমার। জীবনে মরণে তুমি আমার। সুখে দুঃখে তুমি আমার, ভালোয় মন্দয় তুমি আমার—

তার এই গতিবেগ আমি রোধ করতে পারলুমনা।

অগ্নিপূর্ণ বাস্ত সমেত, তার বীণা জন্মের দেহাবশেষ সমেত, তার সেই আলিঙ্গিত ছায়মূর্তি সমেত একসঙ্গে একেবারে কন্যার সেই কুণ্ড মধ্যে পড়ে গেলুম।

দূরে আকাশের গায়ে তার অপসৃয়মান মূর্তিকে জল থেকেই দেখ্‌তে পেলুম। মহাশূন্যে বিলীয়মান হাতখানি নাড়তে নাড়তে সে যে বল্‌লে, আমার কানে এসে বোধ হয় সেই শব্দ পৌঁচেছিল। বল্‌লে, আবার দেখা হবে, নবজন্মে আবার মিলিত হব, প্রিয়তম, প্রাণেশ্বর, এখন বিদায়

—বি-দা-য়—

কুণ্ডের ধারের সন্ন্যাসীটা অভ্যাস মত চিৎকার করে উঠলো, হরিনারায়ণ, হরিনারায়ণ।

(ছয়)

ঘড়িতে টং টং করে আটটা বাজলো। শ্রোতাদের সকলেরই চোখে জল এসেছে, আর বিপত্নীক বৈষ্ণনাথের চোখের জলে বুকের জামাটা পুরো ভিজে গিয়েছিল। কারুর দিকে কোন রকম দৃষ্টি না দিয়েই রবিন বলে চল্‌লো। বল্‌লে, এর পর স্নান সেরে ভিজে কাপড়েই পায়ে হেঁটে রওনা দিলুম, প্রেতশিলার দিকে।

দীর্ঘ সাত মাইল পথ, কিন্তু সেই পথ যেন হাওয়ায় ভেসে চলে এসেছিলুম। কে যে রাস্তা চিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তা জানি না, কিন্তু যখন প্রেতশিলা পাহাড়ের তলায় এসে কুণ্ডে উপস্থিত হলুম। তখন সেখানে দু'চার জন লোক এসে গেছে। প্রেতশিলার কুণ্ডে এসে অবগাহন করে স্নান করলুম। স্নান করে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি— একজন পুরোহিত সামনে দাঁড়িয়ে আছে, বল্‌লে, পিণ্ড দেবেন?

বল্লুম, হ্যাঁ

উঁচু পাহাড়ের সাতশো সিঁড়ি অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হয়ে পাহাড়ের ওপোরে উঠ্‌লুম। পুরোহিত মন্ত্র পড়ে বল্‌লে, নাম আর গোত্র বলুন।

নাম ত বীণা, কিন্তু গোত্র ত জানি না। কে যেন মনের মণিকোঠা থেকে হেঁকে বল্‌লে, তোমার নিজের গোত্রই বল, সেই ত আসল গোত্র।

তাই বললুম। একবার, দুবার, তিনবার, পিণ্ডদানের আর শেষ নেই। আমাদের বাড়ী থেকে উঠে যাওয়ার কয়েকদিন পূর্ব্বে স্বহস্তে তাকে সন্দেশ খাইয়ে ছিলুম, সেই আমার শেষ খাওয়ান, আর সেই খাওয়ানো দেখেই দাদার মেয়ে চিৎকার করে উঠেছিল। তারপর দীর্ঘ দিন কেটে গেছে, এতদিন পরে আবার তার উদ্দেশ্যে পিণ্ড দিচ্ছি।

এর পর নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলুম। জ্ঞান হওয়ার পর দেখি, পুরোহিত আমার মাথায় জল দিচ্ছে, আর নৈবেদ্যের ডালাখানা নিয়ে বাতাস করছে। চোখ চেয়ে দেখ্‌তে পেলুম, কয়েকজন স্ত্রী ও পুরুষ আশে পাশে জমে গেছে। পুরোহিত বাঙ্গালী; বল্‌ছে বঙ্গপল্লীর টান, এমনই হয়। একজন বিধবা পাশে দাঁড়িয়েছিল, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে সে বল্‌লে, ভগবান!

সেই দিনই গয়া থেকে বেরিয়ে পড়ি। এর পর কে যে আমার পরিব্রাজক সাজিয়ে দিলে, তা জানি না, কিন্তু পায়ে হেঁটে সমগ্র ভারত ঘুরলুম। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম, ভারতের সমস্ত তীর্থই পর্য্যটন করলুম। কিন্তু শেষে বল্‌তে হয়—

'তবু ভরিল না চিত্ত
হেরিলাম কত মনোরম ধাম কত মনোরম তীর্থ!'

শেষে মনে হোল, আমাদের বাড়ীর সেই একতলার ঘরটা দেখবো, যেখানে বীণা বলেছিল, আমাকে বউদি বলে ডেকো না, বউভাই বলে ডাকবে। তাই আবার এতদিন পরে কলকাতায় ফিরে এলুম। কিন্তু সে ঘর এখন নেই, সেখানে বোধহয় যেন নতুন রাস্তার ফুটপাথ হয়ে গেছে।

রবি হঠাৎ নীরব হোল। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কেউ কোন কথাই কইল না।

• • •

রাত্রে আহারাদির পর তাকে বাইরের ঘরে বিছানা করে দিলুম। কিন্তু পরদিন সকালে আর তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। বাইরে বেরিয়ে দেখি, আগের দিন ফুটপাথের যেখানটাতে তাকে প্রথমে দেখেছিলুম, সেখানে সেই ফুটপাথের ওপোরে খড়ি দিয়ে সে স্পষ্ট করে লিখে গেছে, "Here lived Bina, my beloved Baubhai।"

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ও ভারতীয় বিজ্ঞান সভা

শ্রীনলিনাক্ষ সিংহ

সূচনা :—ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার ইতিহাসে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের অবদান যে কত মূল্যবান ও সময়োপযোগী তাহা একবাক্যে কি বিজ্ঞানী, কি সাহিত্যিক, কি ঐতিহাসিক সকলেই স্বীকার করিবেন। সেকালে এই বিজ্ঞান সভাকে মহেন্দ্র সরকারের বিজ্ঞান কলেজ বলা হইত। বস্তুতঃ সে আমলে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান এক এসিয়াটিক সোসাইটী ছাড়া ভারতবর্ষে আর কোথাও ছিল না, কিন্তু সেখানেও বিজ্ঞানের নানা শাখার পঠন পাঠনের ব্যবস্থা ছিল না। কেবলমাত্র মেডিকেল কলেজে ও কিছুটা হিন্দু কলেজে (অধুনা প্রেসিডেন্সি) ছিল। মহেন্দ্রলালের বাল্যের ও যৌবনের স্বপ্ন ১৮৭০ সালে কার্য্যে রূপায়িত হইল। ১৮৬৯ সালে তিনি তাহার সম্পাদনায় প্রচারিত ক্যালকাটা জার্ণাল অফ্ মেডিসিন (Calcutta journal of medicine) নামক পত্রিকায় তাঁহার বহুদিনের সংকল্পের আভাষ দিয়া ছিলেন এবং এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনার বিষয় লইয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া ও চলিতে থাকে। দেশবাসীও বিপুল উৎসাহে তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিল। তাহারই ফল স্বরূপ ১৮৭০ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান সংস্থাপিত হইল।

বাল্যজীবন : মহেন্দ্রলালের বাল্যজীবন বেশ সুখের ছিল না। খুব বাল্যকালেই তিনি প্রথমে পিতা ও পরে মাতাকে হারাইয়া বসেন। পিতৃমাতৃ স্নেহে বঞ্চিত হইয়া তাঁহাকে সেই বয়স হইতেই অসহায় ভাবেই অদৃষ্টের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হয়। আর্থিক অবস্থাও তেমন স্বচ্ছল ছিল না। দীন দুঃখী ছেলেদের যেমন ভাবে দিন কাটে, তাঁহারও তেমনি ভাবে নানা অসুবিধার মধ্যে দিন কাটিয়াছিল। শোনা যায় তিনি যেমন চঞ্চল তেমনি দুরন্ত ছিলেন—সারা দিন রোদে রোদে খেলা করিয়া বেড়াইতেন।

১৮৩৩ সালে ২রা নভেম্বর তারিখে হাওড়া জেলার পাইকপাড়া নামক গ্রামে এক দরিদ্র সদ্গোপ পরিবারে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল—সুতরাং দরিদ্র ঘরের শিশুর জন্ম বা অন্য কোন ব্যাপারেই চাঁকচক্য ছিল না। অন্ন-

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার

প্রাশনেও তেমন কোন উৎসব আয়োজন হয় নাই। প্রকৃতির নিয়মে তিনি বড় হইয়া উঠিলেন—কিন্তু দুরন্ত শিশু পাড়ার যত সব বকাটে ছেলেদের সঙ্গে গুলিডাণ্ডা, হাডুডুডু, লিংভাঙী, লুকোচুরি ইত্যাদি খেলায় মাতিয়া থাকিত। সকলেই ভাবিয়াছিল এ ছেলেটা মূর্খই হইবে। এই দেখিলে গায়ে জ্বর আসিত—তবে কেহ তাহাকে মূর্খ চাষা বলিলে সে রাগিয়া উঠিত, তাহাকে রীতিমত প্রহার করিয়া মা বাবা অভিভাবিকা দূরসম্পর্কীয় পিসিকে অভিমান করিয়া বলিত—এরা আমায় মূর্খ

বলিবে কেন—আমি খুব লেখাপড়া শিখিব, বড় হইয়া খুব বড় মাষ্টার হইব, কিম্বা বড় ডাক্তার হইব—তখন এদের অসুখ বিসুখ হইলে আমি দেখিতে আসিব না বা ঔষধও দিব না। সকলে শুনিয়া হাসিত—

একজন ইংরাজ কবি বলিয়াছেন—

"full many a gem of purest ray serene
The unfath, med corner of the ocan
dear etc.

এই অর্দ্ধ লক্ষিত বালকটীকে চিনিয়া ছিলেন তাঁহার এক মাতুল। শোনা যায় সাত বৎসর বয়সে মহেন্দ্রলাল তাঁহার বিধবা মাতার সহিত তাঁহার মাতুলালয় শাঁখারী-টোলায় আসেন। এই মাতুল মহাশয়ের প্রভূত চেষ্টায় ও আগ্রহে এই অতিশয় অসভ্য বালক তিন চার বৎসরের মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ফেলেন এবং তাঁহাকে অতঃপর কলিকাতা হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়—শোনা যায় তখন তাঁহার নাকি ১৭ বৎসর বয়স হইয়াছিল। যাহাই হউক কলিকাতা আসার পর হইতেই মহেন্দ্রলালের স্বভাব একেবারে বদল হইয়া যায়। "সংসর্গজাঃ দোষগুণাঃ" ভবভূতিঃ। মহাজনের এই অমূল্য উক্তির মূল্য মহেন্দ্রলাল রক্ষা করিয়াছিলেন—তিনি প্রতিবার পরীক্ষাতে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। হেয়ার স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া তিনি হিন্দু কলেজে পড়েন, এখানেও বেশ সুখ্যাতির সহিত পরীক্ষোত্তীর্ণ হন। ১৮৫৫ সালে তিনি মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন ও ১৮৬৩ সালে এই কলেজের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোচ্চ উপাধি-এম, ডি পাশ করেন। তিনি ছিলেন এখানকার দ্বিতীয় এম ডি উপাধিধারি ছাত্র। ডাঃ মধুসূদন বসু সর্ব-প্রথমে এই উপাধিতে ভূষিত হইয়া ছিলেন। ডাঃ সরকার মেডিকেল কলেজের একজন কৃতী ছাত্র, এখানেও তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হন।

কর্মজীবন :—মহেন্দ্রলালের কর্মজীবন বড় বৈচিত্র্যময়—লোহার তাটার পূর্ণ—কখন অমাবস্যার ভীষণ অন্ধকারে সব ছাইয়া ফেলিল-আবার পূর্ণিমার মধুর জোছনায় চারি দিক হাসিয়া উঠিল। এখানেই কৃতীর ওরে তাঁহার চরিত্রের যথার্থ, প্রকৃত মনুষ্যত্বের মহত্ব। পাশ করার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এলোপ্যাথি চিকিৎসায় সুনাম অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন-অর্থাগমও সেই অনুপাতে যথেষ্ট হইতে ছিল। বহু বন্ধু বান্ধব সাহেব মেমে তাঁহার বাটীর বসিবার ঘর ও চিকিৎসাগার ভরিয়া উঠিতেছিল। ক্রমে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই-তিনি তৎকালীন বৃটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েসন এবং ভারতবর্ষীয় শাখার Indian branch of the british medical association-এর অবৈতনিক কর্মসচিব honorary secretary এবং উহার মুখপত্র মাসিক পত্রিকা খানিরও সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। ইহাছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও তিনি একজন সদস্য ও মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি। প্রধান নির্বাচিত হইয়াছিলেন। Dean of the medical faculty। এই সময়ে এইরূপ সম্মান খুব কম ভারতীয়ের ভাগ্যে ঘটিত। তিনি এই সব পদমর্য্যাদা অশেষ যোগ্যতার সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা, বাগ্মিতা ও নির্ভীক আচরণে একদিকে যেমন লোকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিত অন্য দিকে তেমনি যথেষ্ট ভয়ও করিত।

তেজস্বিতা : তিনি কত যে তেজস্বী ও নির্ভীক ছিলেন তাহার পরিচয় বহু কার্য্যের মাধ্যমে বহুবার পাওয়া গিয়াছে। কাহারও তোষামোদ করার অভ্যাস তাঁহার চরিত্রে স্থান পায় নাই। স্বার্থের খাতিরে তিনি কখনও সত্য গোপন করেন নাই। অপ্রিয় সত্যও তিনি মুক্ত-কণ্ঠে ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি সত্যাশ্রয়ী, যাহা একবার সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহা কখনও কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করিতেন না। এই সময়ে ডঃ সরকারের জীবনে একটী প্রতিকূল ঘটনা ঘটিয়া যায় এবং তাঁহার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের বারংবার অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করিয়া তিনি সত্যের পথেই আপনাকে চালিত করেন এবং তাহার জন্য তাঁহাকে অশেষ ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল—ঘটনাটি এইরূপ—কলিকাতার সুবিখ্যাত ধনী পরিবারের একজন বিশিষ্ট নাগরিক ডাঃ রাজেন্দ্রলাল দত্ত হোমিওপ্যাথিমতে চিকিৎসা করিতেন। চিকিৎসা তাঁহার পেশা না হইলেও নেশা পর্য্যায়ে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তিনি অভিজাত ঘরের দুলাল হইলেও দীন দরিদ্রদের কুটীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং দীন দরিদ্র ধনী নির্বিশেষে বিনা পারিশ্রমিকে এমন কি ঔষধের মূল্য

না লইয়াই হাসি মুখে চিকিৎসা করিতেন। কোন কোন স্থলে রোগীর পথ্যাদিও সব রাসভাংই অকাতরে দান করিতেন। মহেন্দ্রলালের বহুমুখী প্রতিভাও অন্যান্য সদ্‌গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রে দীক্ষিত করিবার সুযোগ ও সুবিধা খুঁজিতেছিলেন, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মহেন্দ্রলালের মত প্রতিভাবান চিকিৎসকের হস্তে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ভার অর্পণ করিতে পারিলে এ দেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রসার লাভ ঘটিবে, দেশের ও দশের মঙ্গল হইবে। ভগবান রাজেন্দ্রলালের সে ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া ছিলেন।

এই সময় ডাঃ দত্ত ডাঃ সরকারকে মর্গান প্রণীত হোমিওপ্যাথি দর্শন (morgan's homeo philosophy) পড়িতে দিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন তিনি যেন ইহার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে নিজস্ব স্বাধীন অভিমত প্রকাশ করেন। ডাঃ সরকার এবং উক্ত বৃটিশ মেডিক্যেল এসোসিয়েশনের সভ্যবৃন্দ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। ডাঃ সরকারের ধারণা ছিল যে ইহা অসার টোটকা চিকিৎসা বা তৎকালীন প্রচলিত জলপড়ার মতই একটা অপদার্থ চিকিৎসা প্রণালী; চিকিৎসা হিসাবে ইহার প্রচলন মোটেই যুক্তিযুক্ত নহে, অথচ ইহার পূর্বে তিনি এই চিকিৎসার গুণাগুণ পরীক্ষা করেন নাই বা কোন পুস্তকও পাঠ করেন নাই এমনি একটা বিসদৃশ ভাব তাঁহার মনে আপনাপনি গজাইয়া উঠিয়াছিল।

যাহা হউক কোন পুস্তক সম্বন্ধে যথাযথ মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইলে তাহার বিষয়বস্তুর সম্যক পরিচয় না লইয়াই অথবা ভাসা ভাসা পড়িয়া তাহার পক্ষে বা বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করা তাঁহার চরিত্রবিরুদ্ধ, তাই এ পুস্তকখানি বারংবার আদ্যোপান্ত বেশ মনোযোগ সহকারেই পাঠ করিতে হইয়াছিল এবং তিনি যতই ইহা পাঠ করিতে লাগিলেন ততই মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। যে সত্য ইহার মধ্যে নিহিত ছিল তাহার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে তিনি কোন ক্রমেই পারিলেন না। তিনি সত্যাশ্রয়ী সহজাই তাঁহার মূলধন—তিনি সর্বস্ব ছাড়িতে পারেন কিন্তু সত্য ছাড়িতে পারেন না।

অবশেষে সত্যেরই জয় হইল তিনি গ্রন্থখানির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিলেন তাহাই তাঁহার কাল হইল—বৃটিশ এসোসিয়েশান চটিয়া গেল, বৃটিশ চালিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁহার দুর্বুদ্ধিতার জন্য তিরস্কার করিলেন—কিন্তু তিনি সংকল্পে অটল। তিনি ইহার পর ডাঃ রাজেন্দ্রলালের চিকিৎসা পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সাফল্যে মুগ্ধ হইয়া নিজেই এই নূতন পদ্ধতিতে চিকিৎসা সুরু করিলেন। আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব কাহারও অনুরোধ উপরোধে কর্ণপাত করিলেন না। বিজয়লক্ষ্মী তাঁহারই অঙ্কশায়িনী হইলেন। তিনি অচিরেই তাঁহার পূর্ব গৌরব ফিরাইয়া আনিলেন। পুরাতন পদ্ধতি মত চিকিৎসা ছাড়ার দুই এক বৎসর তাঁহাকে অর্থের অনটনে পড়িতে হইয়াছিল কিন্তু কালে সব ঠিক হয়ে গেল। আরও এক সময়ে আমরা মহেন্দ্রলালের তেজস্বিতার পরিচয় পাই। অতঃপর তিনি যখন বিজ্ঞান সভার কাযে পূর্ণোদ্যমে লাগিয়া গেলেন তখন সার রিচার্ড টেম্পল, তদানীন্তন বঙ্গদেশের গভর্নর তাঁহার বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের বাড়ীতে আসিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন—বন্ধু-বান্ধব ও এই প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য হিতৈষীরা তাঁহাকে সাহেবী পোষাক পরিয়া সাহেবকে আহ্বান করিতে অনুরোধ করিলেন—তিনি তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা না করিয়া বলিয়াছিলেন—আমি কেন একজন বিদেশীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এমন অধর্ম করিতে যাইব। আমার জাতীয় পোষাকে সজ্জিত দেখিয়া যদি সাহেব চটিয়া যায় যাউক, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাইবে আমি তাহার কাছে চাকরীর উমেদার নহি। আমি আমার দেশের দাবী তাঁহার নিকট উপস্থাপিত করিতে যাইতেছি আমাদের দাবী দাবী তিনি যদি অগ্রাহ্য করেন ত কক্ষন কিছু আসিয়া যায় না। আমরা দেশের লোক সমবেত হইয়া দেশের কার্য্য করিব। তাহারা সাহেবরা ত আমাদের পূজা পার্বণে বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে আহূত হইয়া তাহাদের জাতীয় পরিচ্ছদ ছাড়িয়া আমাদের দেশের বেশে বা ধুতি চাদর পরিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসেন না।

বলা বাহুল্য সার রিচার্ড টেম্পল (Sir Richard Temple) তাঁহাকে দেশীয় পরিচ্ছদে দেখিয়া খুশী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বিবিধগুণে মুগ্ধ হইয়া ১৮৭৯ সালে ত্রিশ হাজার টাকায় ২১০ নং বহুব্যয়সাধ্য পুরাতন বাড়ী-

খানি সরকার তরফ হইতে কিনিয়া দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। অবশ্য বাড়ীর দুই তিন হাজার সমিতিকে বহন করিতে হয়। অতঃপর তিনিই এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। সার রিচার্ড টেম্পলের কার্য্যকাল ফুরাইয়া গেলে সার এসলি ইডেন এই প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় সভাপতি হইয়াছিলেন।

বহুবাজারের এই বাড়ীখানি অতি পুরাতন। শোনা যায় পূর্ব্বে এখানে বহুবাজার ডাকঘর ছিল, তাহা উঠিয়া পাশের বাড়ীতে যায়। এই বাড়ীখানির ঘরগুলি জরাজীর্ণ হইলেও ইহার আশে পাশে অনেকখানি জায়গা পড়িয়া ছিল ইহা মাপে প্রায় সাড়ে তিন বিঘা বঙ্গ সরকারের অনুগ্রহে ডাঃ সরকারের স্মরিয়ে ত্রিশ হাজার টাকা লাগিয়া ছিল। বলা বাহুল্য এই টাকা ডাঃ সরকার দেশের ধনী জমিদার ও রাজেন্দ্রবর্গের নিকট প্রায়ই আপনার চিকিৎসার পারিতোষিক স্বরূপ আদায় করিয়াছিলেন। যাহা হউক এই বাড়ীতেই ডাঃ সরকার তাঁহার বন্ধু বান্ধবদের লইয়া বিজ্ঞান সাধনার কার্য্যে লাগিয়া গেলেন। তিনি নিজে কখন পদার্থ-বিজ্ঞান, কখন উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন—সেই সময় কলিকাতা সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ ফাদার লাফোঁ (Father Lafont) তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া ছিলেন—তিনি পদার্থ-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। তা ছাড়া একটী বড় টেলিস্কোপ যন্ত্রও তিনি ডাঃ সরকারকে উপহার দিয়াছিলেন। এত বড় টেলিস্কোপ (দুরবিন) (Telescope) তখনকার দিনে এদেশে ছিল না। উক্ত কালে এই টেলিস্কোপের কাচ (objective) অধ্যাপক রমনের গবেষণা কার্য্যে বহু সাহায্য করিয়া ছিল।

১৮৭৬ সালেই ভারতবর্ষের বিজ্ঞান সভা যথার্থ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তখন ইহার নাম রাখা হইয়াছিল (Indian Assiciation for the Culteivation of Science) এই নাম রাখা লইয়াও বন্ধুমহলে ও সভার সভ্য মহলে অনেক বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছিল। ডাঃ সরকার প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন—আমি নিজে চাষা—চাষ কাজ ভালবাসি—যেমন চাষ ভাল না হইলে ভাল শস্য পাওয়া যায় না তেমনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্র ভালভাবে কর্ষিত না হইলে বিজ্ঞানের প্রকৃত রূপ হৃদয়ঙ্গম হয় না।

প্রসঙ্গতঃ আরও বলিয়াছিলেন—আমি ছেলেবেলায় যখন নিউটন, গ্যালিলিও, আর্কিমেডিস্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞানীদের গল্প পড়িতাম বা শিক্ষক মহাশয়দের মুখে শুনিতাম তখন আনন্দে আমার প্রাণ ভরিয়া উঠিত—তখন আমি ভাবিতাম ভারতবর্ষে আমাদের জন্য—আমাদের পণ্ডিত, দার্শনিক ও বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাতি আছে, তাহারা ধনি প্রভৃতি বা এইসব অদ্ভুত রহস্যের সন্ধান পায় ও আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয় ত আমরাই বা পারিব না কেন? বিশ্বস্রষ্টার কাছে ত কিছু তারতম্য নাই, ভেদাভেদ নাই। আমি তখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম আমি বড় হইয়া একটা কিছু করিব, নিজের স্বল্প মেয়াদি জীবনে যতটা পারি বিজ্ঞান সাধনা করিব—ভবিষ্যৎ বংশধরগণের বা দেশবাসীর জন্য পথ সুগম করিয়া যাইব। মেডিকেল কলেজে পড়িবার সময়ও এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হইত—ছাত্রমহলে দরবার বসিত কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসিতে পারিতাম না। এই মহৎ কার্য্যের জন্য নাই প্রচুর অর্থ, স্থান ও উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষা। যাই হোক ভগবান আমার সে বাসনা অনেকাংশে পূরণ করিয়াছেন। আমি দেশের লোকের সহানুভূতি উৎসাহ ও প্রেরণা পাইয়াছি।

শোনা যায় তিনি পাথুরিয়াঘাটার স্বনামধন্য জমিদার কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের স্ত্রীর এক কঠিন রোগ নিরাময় করিয়া তাঁহার নিকট বিজ্ঞান সভার তহবিলে ৩২,০০০৲ টাকা দান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে কি এক কঠিন রোগের কবল হইতে রক্ষা করায় মহারাজা পারিতোষিক দিতে আসিলে তিনি নিজে কিছু না লইয়া বিজ্ঞান সভার গবেষণাগার নির্মাণ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন—মহারাজা তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন ও ১০,০০০৲ টাকা ব্যয়ে উহা নির্মাণ করাইয়া দেন—তখনই উক্ত পরীক্ষাগার (laboratory) ভিক্টোরিয়া প্রাইজ ল্যাবরেটরি নামে পরিচিত হইয়াছিল।

তাঁহার চিকিৎসা ও পাণ্ডিত্যে সবার উপর বিজ্ঞান সাধনায় মুগ্ধ হইয়া কুচবিহারের মহারাজা একবালীন ৩০,০০০৲, মহারাণী স্বর্ণময়ী ৮০০০৲ ঘারভাঙ্গার মহারাজা ৫০০০৲ কুমার ইন্দ্রনারায়ণ সিংহ ৫০০০৲ পাতিয়ালার

মহারাজা ৫০০০৲ ইহা ছাড়া বাংলাদেশের ধনী ও জমিদারগণ কেহ ১০০০৲ কেহ ২০০০৲ করিয়া এককালীন দান করিয়াছিলেন।

জাতীয়তাবোধ :—ডাঃ সরকারের জাতীয়তা বোধ কিরূপ প্রবল ছিল তাহা আমরা পূর্বেই কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। তিনি সাদা ধুতি, মের্জাই ও তাহার উপর সাদা আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে বিলাসোপযোগী চটী (তালতলার চটী ছুতা), এই বেশেই তিনি সর্বত্র যাতায়াত করিতেন। কি রোগীর বাড়ী, কি সরকারী মহল, কি বিজ্ঞান-সভার সভা বা অফিস গৃহ বা বক্তৃতা গৃহ—বা নিমন্ত্রণ বাড়ী। সাধারণ গরীব গৃহস্থ হইতে সুরু করিয়া ধনীর অট্টালিকায়ও তিনি এই সাদাসিদা পোষাকে হাজির হইতেন। সাহেব সুবোর নিমন্ত্রণে বড় একটা যাইতেন না—আর গেলেও ফল মূল মিষ্টান্ন ছাড়া হিন্দুর অভেদ্য কোন দ্রব্য স্পর্শ করিতেন না। ডিম মাংস কদাচিৎ খাইতেন। সিগারেট বা চুরুট মোটেই খাইতেন না। বাড়ীতে অম্বুরি তামাক খাইয়া তৃপ্তি পাইতেন। ১৮৮২ সালে মার্কুইস্ অফ রিপন (Marquess of Ripon, Governor General of India) এই প্রতিষ্ঠানের বক্তৃতা গৃহের (lectuse) ভিত্তি স্থাপনা কালেও তিনি এই জাতীয় পরিচ্ছদেই সভার অবৈতনিক কর্মসচিব হিসাবে যে মূল্যবান ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাহা বড়লাট সাহেবকে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং তিনি ইহার উন্নতিকল্পে এক হাজার টাকা আপনার নিজস্ব তহবিল হইতে দান করিয়াছিলেন এবং এই সময় হইতেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের পেট্রনের পদ সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে ইহাকেই মূলধন করিয়া ডাঃ সরকার অন্যান্য জনসাধারণের নিকট হইতে যাহা আদায় করিয়াছিলেন তাহা দ্বারা রিপন সাহেবের স্মৃতিকল্পে একটী পদের সৃষ্টি করেন। তাহা "Ripon professorship" নামে অভিহিত।

বিজ্ঞান সভার ক্রমোন্নতি :—বিজ্ঞান সভার বক্তৃতা গৃহ নির্মাণ উপলক্ষে দেশের ধনীগণের নিকট যাহা পাওয়া গিয়াছিল তাহার মোটামুটি বিবরণ এইরূপ :—১। রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ১০০০৲ স্বর্গীয় গণেশচন্দ্রচন্দ্র ১০০০৲ রাজা পিয়ারীমোহন মুখার্জী ৫০০৲, প্রসন্নকুমার ব্যানার্জী ১০০০৲ পিয়ারীমোহন রায় ১০০০৲ কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ ৫০০০৲ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১০০০৲ মহারাজা কুচবিহার ৪০০০৲ মার্কুইস্ অফ রিপন ১০০০৲ দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ৫০০০৲ কুমার শরৎ সিংহ ২০০০৲ ইত্যাদি।

কিন্তু এ বিষয়ে ডাঃ সরকারের আশা ফলবতী হয় নাই। তিনি অর্থের অনটনের জন্য প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারটী ভাল ভাল গ্রন্থ দ্বারা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষাগারের জন্য ভাল ভাল যন্ত্রপাতিও ক্রয় করিতে পারেন নাই। তাই তিনি আক্ষেপ করিয়া এক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন—যার! আমি এইরূপ ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপর্যাপ্ত। আমি ইহা না করিয়া যদি নিজ ব্যবসায়ে (চিকিৎসা ব্যবসায়ে) আরও নিবিড় ভাবে মনোযোগ করিতাম তাহা হইলে ইহার সহস্র গুণ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিতাম। এখন আয়ু সূর্য্য ঢলিয়া পড়িতেছে, এজন্মের আর সংশোধন হইবার সময় নাই। বলা বাহুল্য মহেন্দ্রলাল সরকার বিজ্ঞান সভার কার্যে নিবিড়ভাবে আত্মনিয়োগ করায় চিকিৎসা ব্যবসায়ে তেমন মন প্রাণ ঢালিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেন, বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান আমার ধ্যান, জ্ঞান, পুত্র, পরিবার। আমি ইহা ছাড়িয়া থাকিতে পারি না।

নূতন বক্তৃতা গৃহ :—এই সভাগৃহ নির্মিত হইলে এখানে পূর্বের ন্যায় বিজ্ঞানের নানা শাখার বিষয়বস্তু খুব সরলভাবে সাধারণের সমক্ষে পৌছাইয়া দেওয়া হইত—স্বর্গীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গণিত শাস্ত্রে এবং বিরাজ মোহন মজুমদার মহাশয় গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতির্বিদ্যায় বক্তৃতা দিতেন (astrophysics)। তাহা ছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়েও (বিশেষ ব্যবহারিক ভাষা) শিক্ষা দেওয়া হইত। কখন কখন সাধারণের বোধগম্য ভাষায় অনেক বিষয়েই বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া ডাঃ সরকার বিজ্ঞানের দীপ ঘরে ঘরে সর্বত্র জ্বালিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তবে তাঁহার মাঝে মাঝে ভয় হইত—হয়ত তাঁহার সকল চেষ্টা অর্থাভাবে বিফলতায় পর্যবসিত হইবে। তাই মাঝে মাঝে নিরাশ হইয়া বন্ধু-বান্ধবদের, বলিতেন আমার ভয় হইতেছে যে আমি যে দীপ জ্বালিয়া গেলাম হয়ত তৈলাভাবে তাহা নির্বাপিত হইয়া যাইবে।

বিজ্ঞান সভার মুখ্য উদ্দেশ্য :—যদিও প্রথমতঃ বিজ্ঞানের নানা বিষয় লইয়া পঠনপাঠন চলিয়া ছিল ডাঃ সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল গবেষণা, কিন্তু তখনকার দিনে কৃতবিদ্য লোকের একরূপই অভাব ছিল। তিনি নিজে এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিতেন কিন্তু সময়াভাবে তাহা সম্ভব হয় নাই। কারণ তাঁহার চিকিৎসা নৈপুণ্যের কথা সারা ভারতবর্ষেই প্রচারিত হইয়াছিল। কাজেই হিমালয় প্রদেশ হইতে সুরু করিয়া কুমারিকা পর্য্যন্ত লোকে তাঁহার শাঁখারীটোলার বাসভবনে ছুটিয়া আসিত এবং তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য অনেকস্থলেই যাইতে হইত। এই সকল কারণে শেষ বয়সে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল তিনি একবার হইমানের কোন গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা করিতে গিয়া ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া ছিলেন—শেষ বয়সে হাঁপানি রোগেও কষ্ট পাইয়াছিলেন।

১৮২৭।২৬ সালে কলিকাতায় একজন চিকিৎসক ডাঃ সরদীলাল সরকার রসায়ন শাস্ত্রে কতকটা গবেষণা করিয়া ছিলেন। ডাঃ সরকার তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে দেখা শোনা করিতে পারেন নাই। তাঁহার পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয় বিজ্ঞান সভার বাৎসরিক বিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, এ সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়।

রিপন প্রফেসারের পদ (Ripon professorship) ১৮৮০ সাল হইতে ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল মার্কুইস অফ রিপনের সহিত ডাঃ সরকারের পরিচয় হয় এবং এই পরিচিতিই ক্রমশঃ বন্ধুত্বে পরিণত হয়, রিপন সাহেব ভারতীয় বিজ্ঞান সভার প্রতিটী অনুষ্ঠানেই যোগদান করিতেন। এক সময়ে সরকারীভাবে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানকে কিছু অর্থ দিতে চাহিয়া ছিলেন কিন্তু ডাঃ সরকার বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা খর্ব করিতে চাহেন নাই। ইহা ভারতের জাতীয় সম্পদ, সরকারের বেড়াজালে ইহাকে আবৃত করিতে চাহেন নাই। যাহা হউক ভদ্রতার ও অমায়িক ব্যবহারে শুধু ডাঃ সরকার কেন প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যই খুব সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার এই বন্ধুত্বকে চির স্মরণীয় করিবার জন্য সকলে অর্থ সাহায্যও করিয়া ছিলেন। যদিও ডাঃ সরকার ও প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণের অক্লান্ত চেষ্টায় মাত্র ১৭০০০, টাকার মত অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল।

উত্তরকালে ইহার সুদ জড় করিয়া কোম্পানির কাগজ কেনা হয় ও তাহার সুদ হইতে দুই কি তিন বৎসর অন্তর ভারতবর্ষীয় যে কোন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে তাহার গবেষণা বিষয়ে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করা হইয়া থাকে এবং ৭৫০, টাকা পারিতোষিক হিসাবে দেওয়া হইয়া থাকে।

জয়কিষণ মুখার্জী মেডেল ফাণ্ড :—উত্তরপাড়ার সুবিখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় জয়কিষণ মুখোপাধ্যায়ের পত্নীর এক কঠিন রোগ আরোগ্য করার ফলে তিনি ডাঃ সরকারের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সহস্র শ্রেণী ভুক্ত হন ও যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন। উত্তরকালে স্বর্গীয় জয়কিষণ মুখার্জীর স্মৃতিকল্পে একটী ভাণ্ডার গড়িয়া উঠে—এই বিষয়ে জয়কিষণ মুখার্জীর সুযোগ্য পুত্র স্বর্গীয় রাজা পেয়ারীমোহনও এই ভাণ্ডারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এখন এই ভাণ্ডারের টাকার সুদ হইতে তিন বৎসর অন্তর কোন এক বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে তাঁহার মৌলিক গবেষণার পারিতোষিক হিসাবে ৩১৫৲ টাকার সুবর্ণ পদক উপহার দেওয়া হইয়া থাকে।

ক্যালকাটা জার্নাল অফ মেডিসিন :—ডাঃ সরকার এক সময়ে ব্রিটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েসনের পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু তাহা বিনাদোষে হস্তচ্যুত হওয়ায় অন্তরে বেশ একটু আঘাত পাইয়াছিলেন—তাই একটু অবসর পাইয়াই ১৮৬৭ সাল হইতে নিয়মিত ভাবে এই প্রথম পর্য্যায়ের মাসিক পত্রিকাখানি চালাইতে থাকেন। ইহাতে চিকিৎসা বিষয় ভিন্ন নানা বিষয়ের আলোচনা থাকিত ও বিজ্ঞান সভার কার্য্যাবলীর বিবরণ থাকিত। এই পত্রিকাখানি শীঘ্রই সর্বজন প্রিয় হইয়া উঠে।

শেষ জীবন :—ডাঃ সরকারের শেষ জীবনে খুব বেশী অশান্তি না ঘটিলেও খুব সুখে কাটে নাই—প্রথমে ম্যালেরিয়ার কবলে পড়িয়া তাঁহাকে বেশ কিছুকাল ভুগিতে হইয়াছিল—তাহার পর হাঁপানি রোগ দেখা দিয়া তাঁহাকে প্রায় অকর্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছিল। তবুও তিনি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের মায়া ছাড়িতে পারেন নাই। শরীর খুব খারাপ থাকিলেও গাড়ী করিয়া এখানে আসিতেন ও নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। তিনি বন্ধু-বান্ধবদের বলিতেন—এখানে আসিলে আমার আর কোন রোগব্যাধি থাকে না, আমি বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করি।

রোগীদের প্রতি টান :—এ অবস্থাতেও তিনি কখন কখন রোগী দেখিতে যাইতেন—একমাত্র পুত্র অমৃতলাল ও অন্যান্য নিকট-আত্মীয়ের নিষেধ সত্ত্বেও কখনও বা ইহাদের অজ্ঞাতে বা ইহাদিগকে লুকাইয়া বাহির হইয়া যাইতেন। ধরা পড়িলে খুব লজ্জিত ভাবে বলিতেন, রোগীর ব্যাকুল আহ্বান আমায় পাগল করিয়া তোলে—কে যেন আমায় আদেশ করে—ওরে যা যা আহা বেচারা বড় কষ্ট পাচ্ছে তুই গেলে তার সব রোগ পালিয়ে যাবে। সত্যই সে আমলে তাঁহার মত সুনিপুণ চিকিৎসক বাঙ্গলা দেশে কেন সারা ভারতবর্ষেও বিরল ছিল। তাঁহাকে দেখিলেই রোগীর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিত, রোগীর রোগ পলাইয়া যাইত। রোগীদের প্রতি এতদূর টান ছিল যে নিজের আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া তিনি রোগীর পাশে বসিয়া থাকিতেন, অনেক সময় রোগী পরীক্ষা করিয়া যথাযথ ঔষধ নির্ণয় করিতে পারেন নাই—বাড়ী আসিয়া নানারূপ পুস্তক ঘাঁটিয়া ঔষধ নির্বাচিত হইলে তিনি এমন কি মধ্যরাত্রেও রোগীর বাড়ী যাইয়া সুনির্বাচিত ঔষধ দিয়া আসিতেন।

ধর্ম-বিশ্বাস :—হিন্দুধর্মে মহেন্দ্রলালের প্রবল বিশ্বাস ছিল। তিনি অবসর পাইলেই ধর্মপুস্তক পড়িতেন। অনেকগুলি ব্রহ্ম সঙ্গীতও তিনি নিজে রচনা করিয়াছিলেন। অবসর সময়ে গুণগুণ করিয়া ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিতেন। শোনা যায় তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে ভূগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের নিকট যাইতেন। পরমহংস-দেবের গলায় কর্কট রোগ (cancer) দেখা দিলে তিনি চিকিৎসাও করিয়াছিলেন।

দরিদ্রের প্রতি দয়া :—দীন দরিদ্রে তাঁহার যথেষ্ট দয়া ছিল। চিকিৎসা ক্ষেত্রে তিনি কোন দরিদ্রের নিকট কখনও এক পয়সা লন নাই, বরং ঔষধ পথ্য হিসাবে তাহাকে অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেন। নিজের জন্মস্থানটীর প্রতি তাঁহার যথেষ্ট টান ছিল। দীনদরিদ্র বিধবারা তাঁহার নিকট হইতে নিয়মিত ভাবে মাসহারা পাইত। তাঁহার নিজের গ্রামের অধিবাসীদের নিকট তিনি কদাচিৎ পারি-শ্রমিক লইতেন। একবার পাইকপাড়ার কোন দরিদ্র পৃথুরোগের চিকিৎসা ব্যাপারে তাঁহাকে চার পাঁচ দিন গ্রামে থাকিতে হয়। তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট অর্থ-ক্ষতি হয় কিন্তু তবুও তিনি তাহাতে দুঃখিত হন নাই। বরং তাহাকে রোগমুক্ত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া খুবই আনন্দিত হইয়া-ছিলেন।

উপসংহার :—ডাঃ সরকারের মহাপ্রয়াণ ঘটে ১৯০৪ সালে ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে। ১৮৩৩সালের ২রা নভেম্বর তারিখে তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার চিতাভস্ম লইয়া একটী সুন্দর হস্তিদন্ত নির্মিত বাক্সে সংরক্ষিত হয় এবং তাঁহার শ্বেত পাথর নির্মিত মূর্তি তাঁহার গবেষণাগারে ও বক্তৃতা গৃহের মাঝামাঝি প্রবেশ দ্বারে রক্ষিত হইয়াছিল। চিতাভস্মের বাক্সটী তাঁহার প্রস্তর নির্মিত মূর্তির তলে রাখা হইয়াছিল। উত্তরকালে বিজ্ঞান সভার যাদবপুরে স্থানান্তরিত হইলে উহাও সেখানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

ডাঃ সরকার ছিলেন মহাপুরুষ। চিকিৎসাক্ষেত্রে কেহ তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। তিনি ওজস্বিনী ভাষায় যেমন লিখিতে পারিতেন তেমনি ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারিতেন। কেবলমাত্র ছাত্রসভাই বিজ্ঞান সভার বক্তৃতা মঞ্চে উপস্থিত হইত না—বহু উচ্চ-শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তিও তাঁহার হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনিতে আসিত। দৈনন্দিন জীবনেও তিনি যথেষ্ট মহত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন—দানে তিনি ছিলেন মুক্ত-হস্ত। কত যে দুস্থ পরিবার তাঁহার নিকট মাসিক সাহায্য পাইত তাহার ইয়ত্তা নাই। কত দীন দুঃখীর তিনি বিনা-পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করিতেন এবং প্রয়োজনানুসারে বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ এবং সময় সময় পথ্যাদির সকল ব্যয়ভার তিনি বহন করিতেন একথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার ৫১ নং শাঁখারীটোলায় একটী দাতব্য চিকিৎসালয়ও তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ভগবানেও তাঁহার প্রবল বিশ্বাস ছিল। তিনি ভগবৎ বিষয়ক অনেক গান ও কবিতা অবসর সময়ে রচনা করিয়া-ছিলেন।

উত্তরকালে তাঁহার স্মৃতিকল্পে একটি ভাণ্ডার খোলা হইয়াছিল। বিজ্ঞান সভার আজীবন সভ্যরূপে যে চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা ও অন্যান্য জনসাধারণের অর্থ মিলাইয়া তাঁহার নামে একটী অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা হয়। এই উদ্দেশ্যে যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল এবং

বিজ্ঞান সভার সাধারণ তহবিল হইতে কিছু অর্থ দিয়া প্রায় তেত্রিশ লক্ষ টাকা ও বিহারীলাল মিত্রের দান ১,৫২০০০ হাজার মিলাইয়া কোম্পানীর কাগজ কেনা হয়। তাহারই সুদ হইতে এই অধ্যাপকের মাসিক বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অনামধন্য প্রফেসার কে এস কৃষ্ণণ (Prof, K, S, Krishnan D, Sc) এই পদে সর্বপ্রথম নিযুক্ত হইয়া গবেষণা চালাইয়া ছিলেন। তিনি বলিতেন—আমি ডাঃ সরকারের প্রবন্ধাদি এবং বক্তৃতার বিষয়বস্তু ঘরে পড়িতেছি ততই শ্রদ্ধায় আমার অন্তর ভরিয়া উঠিতেছে। ডাঃ সরকার যে যুগের মানুষ ছিলেন তখন বিজ্ঞানের শৈশবাবস্থা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি সেই যুগের মানুষ হইয়াও কি অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তিনি তাঁহার কালের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিবিশেষ।

ডাঃ সরকারের মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র স্বর্গীয় অমৃতলাল সরকার, এল এম এস বিজ্ঞান সভার অবৈতনিক কর্মসচিব হইয়াছিলেন। তাঁহারই সময় এক শুভ লগ্নে সার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন তখন (Prof. C. V. Raman

চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ

তাঁহার বিজ্ঞানাগারে পদার্থ বিদ্যার গবেষণা করিবার জন্য আসেন এবং তাঁহারই গবেষণার ফলে ডাঃ মহেন্দ্রলালের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের নাম দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। ইনি ১৯০৭ সাল হইতে ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত পদার্থ বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে গবেষণা চালাইয়া প্রথমে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো (Fellow of the Royal Society of London—F.R.S.) নিযুক্ত হন। পরে নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়া (Nobel laureate) ডাঃ সরকারের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞান সভার নাম এত পরিচিত হইয়াছিল যে কেবলমাত্র ২১০ বহুবাজার বলিলেই ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভাকেই বুঝাইত। সেইজন্য প্রফেসর কৃষ্ণণ্ বলিতেন—Indian Science Associasion is better known by his number 210 Bowbazar than by its place—Calcutta or Bengal.

এখন ডাঃ সরকার জীবিত থাকিলে কি অপরিসীম আনন্দ পাইতেন তাহা সহজেই অনুমেয়। যে অর্থ কৃচ্ছ্রতার পড়িয়া ডাঃ সরকারকে বারংবার আক্ষেপ করিতে হইয়াছিল তাহা আজ আর নাই। ভারতের জাতীয় সরকার মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য করিয়া গবেষণার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। এখন পদার্থ বিজ্ঞানের সমস্ত বিষয়ের এবং রসায়ন শাস্ত্রের ও সর্ব বিষয়ে গবেষণা চলিতেছে!

এখন প্রতি বৎসরেই ২৩শে ফেব্রুয়ারী ডাঃ সরকারের স্মৃতি বাসর বলে এবং ভারতের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তাঁহার স্মৃতি রক্ষা পদের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া বিজ্ঞানের কোন না কোন বিষয়ের আলোচনা করেন।

প্রণতু ডাঃ মহেন্দ্রলাল!

হে মহামানব! সার্থক জনম তব
সার্থক জীবন, সার্থক সাধনা সব
সার্থক কামনা! তুচ্ছ করিয়া বিষয় বৈভব
তুচ্ছ করি পদ মর্যাদা, তুচ্ছ করি প্রভুত গৌরব
যে সত্যের পূজারী, সত্যের আলোক ধরিয়া বক্ষে
হীন বেশে, হাসি মুখে, চলেছিলে আপন লক্ষ্যে।
পারেনি টলাতে কেহ, লক্ষ্য ভ্রষ্ট হও নাই কভু
ক্ষুদ্র স্বার্থ তরে, হওনিক দাস, ছিলে চির প্রভু,
উন্নত শির তব, কভু তোষামোদে, হয় নাই নত
লোভ, মোহ, মাৎসর্য্যের বাধা শত শত
লঙ্ঘি অনায়াসে, ছুটেছিলে কর্তব্যের পথে
নির্ভীক সৈনিকের মত, চড়িয়া সিদ্ধির রথে,
বরমাল্য দিয়াছিলেন ভাগ্য দেবী, তব গলে
পুণ্যকার্য্য সাধিয়া তাই, হাসি মুখে গেছ চলে,
অমর ধামে, রাখিয়া অক্ষয় কীর্তি ধরাধামে
মন্ত্রমুগ্ধ দেশবাসী, কত শান্তি পাইতেছে তব নামে।

* এই কবিতাটী মহেন্দ্রলালের স্মৃতি সভায় পঠিত। ১৯২১

বাসন্তী মাঝরাতের স্বপ্ন *

* • • শ্রীমতী লীলা বিদ্যান্ত

পাত্র-পাত্রী

থিসিয়াস	এথেন্সের ডিউক।
ইজিয়াস	হারমিয়ার বাপ।
লাইসেণ্ডার, ডিমিট্রিয়াস	হারমিয়ার প্রণয়ী।
ফিলষ্ট্রেট	থিসিয়াসের উৎসব ম্যানেজার।
কুইন্স	মিস্ত্রী।
স্নাগ	ছুতোর।
বটম	তাঁতী।
ফ্লুট	কামারের হাপর মেরামত করনেওয়ালা।
স্নাউট	বাসন কালাই করে।
ষ্টারভেলিং	দর্জী
হিপোলাইটা	আমাজনদের রাণী। থিসিয়াসের বাগদত্তা।
হারমিয়া	ইজিয়াসের মেয়ে, লাইসেণ্ডারের প্রণয়িনী।
হেলেনা	ডিমিট্রিয়াসের প্রতি অনুরক্তা।

দৃশ্য—এথেন্স এবং তার উপকণ্ঠে এক বন।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

এথেন্স, থিসিয়াসের প্রাসাদের একটি কক্ষ। থিসিয়াস হিপোলাইটা, ফিলষ্ট্রেট এবং পরিচরবর্গের প্রবেশ।

থি। সুন্দরী হিপোলাইটা, আমাদের বিয়ের লগ্ন তো কাছে এল। চারটি আনন্দিত দিনের পরে উঠবে নূতন চাঁদ। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে বুড়ো চাঁদ বড়ো ধীরে ধীরে ক্ষীণ হচ্ছে, ও আমার বাসনাকে অকৃতার্থ ক'রে রাখছে, যেন সংসা অপরা বিধবা রাত্রী—এমন ধীর মন্থর গতিতে মরণের দিকে চলেছে যে যৌবনের উত্তরাধিকারকে অনেক দিন ধ'রে বঞ্চিত ক'রে রাখছে।

হিপো। চারটি দিন নিজেদের তাড়াতাড়ি রাতের মধ্যে ডুবিয়ে দেবে, চারটি রাত নিজের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে সময় কাটিয়ে দেবে, তার পরে নূতন চাঁদ রূপোর কিনারের মতো আকাশের বুকে বাঁকা হয়ে দেখা দেবে, সেই রাতে হবে আমাদের শুভ-পরিণয়।

থি। যাও ফিলষ্ট্রেট, এথেন্সের যৌবনকে আনন্দের অভিমুখে উন্মুক্ত ক'রে তোল, আনন্দের রক্তচপল প্রাণকে জাগিয়ে তোল, বিষাদকে পাঠিয়ে দাও তার শ্মশানের পথে, বিষাদের নীরস মুখ আমাদের এই উৎসবের দিনে যেন দেখা না দেয়। (ফিঃ প্রস্থান।)

হিপোলাইটা। আমি তরবারি নিয়ে তোমার প্রণয় যাচ্ঞা ক'রেছিলাম, তোমাকে যুদ্ধে হারিয়ে আমি তোমার প্রেম লাভ করেছি, কিন্তু তোমায় বিয়ে করব আমি আর এক সুরে। সমারোহে, সগৌরবে, প্রিয়জনের সমাগমে মুখর উৎসবে।

(ইজিয়াস, হারমিয়া, লাইসেণ্ডার ও ডিমিট্রিয়াসের প্রবেশ)

ই। শুভাশীর্বাদ, মহানুভব ডিউক থিসিয়াস!

ডি। ধন্যবাদ বৃদ্ধ ইজিয়াস, কী খবর আপনার?

ই। বড়ো আলাতনে প'ড়েই আমি এসেছি, আমার নালিশ আমারই সন্তান হারমিয়ার বিরুদ্ধে। সামনে এস,

* শেক্সপীয়রের "মিড্‌সামার নাইটস্ ড্রিম্" নাটকের সম্পূর্ণ অনুবাদ। নাটকটি লেখিকার বিনা অনুমতিতে অভিনয়ের জন্য ব্যবহার করা চলিবে না।

ডিমিট্রিয়াস। মহাপ্রভু, একে আমি সম্মতি দিয়েছি ওকে বিয়ে করবার। এদিকে এস লাইসেণ্ডার। প্রভু আমার, এ আমার মেয়ের প্রাণকে যাদু করেছে। তুমি —তুমি লাইসেণ্ডার—তুমি ওকে কবিতা উপহার দিয়েছ, তুমি ওর সাথে প্রীতি উপহার বিনিময় ক'রেছ, চাঁদনী রাতে তুমি ওর জানালায় দাঁড়িয়ে কপট সুরে কপট প্রেমের গান শুনিয়েছ। তোমার চুলের গুচ্ছ দিয়ে, আংটি দিয়ে, গহনা দিয়ে, খোসামোদ করে, এটা সেটা দিয়ে, বোকাকে ফুল দিয়ে, মিষ্টি পাঠিয়ে, প্রণয় দূত পাঠিয়ে, তুমি ওর কাঁচা প্রাণ জয় ক'রেছ। ছেলে-মানুষ তো এই সবেতেই ভোলে, তোমার শয়তানি দিয়ে তুমি আমার মেয়ের মন বিগড়ে দিয়েছ। তার বাধ্যতা যেটা আমার পাওনা, তাকে নিদারুণ এক ভাঁওতিতে পরিণত করেছ। আর মহান্ প্রভু আমার, যদি এমন হয় ও এইখানে আপনার সামনে ডিমিট্রিয়াসকে বিয়ে করতে রাজি না হয়, তা হ'লে আমি এথেন্সের চিরাচরিত পিতৃ অধিকার আপনার কাছে ভিক্ষা চাইছি, যেহেতু মেয়ে আমার, তাই তাকে যেমন খুশি বিয়ে দেবার অধিকারও আমার। আমি ওকে বিয়ে দেব হয় এই ভদ্রলোকের সঙ্গে, নয়তো মরণের সঙ্গে। আর তা হ'লে আমাদের আইন অনুসারে সে ব্যবস্থাও অবিলম্বেই করা হবে।

ডি। তোমার কী বলার আছে হারমিয়া? কথা শোন বাছা, তোমার কাছে তোমার বাপ তো দেবতুল্য হওয়া উচিত। তোমার দেহ, তোমার রূপ, তুমি ওঁর কাছ থেকেই পেয়েছ, হ্যাঁ যিনি তোমাকে সোনের পুতুলের মতোই নিজের ছাঁচে গড়ে তুলেছেন, তাই এটাও তাঁরই অধিকার যে তিনি তোমাকে রাখতেও পারেন, ভাঙতেও পারেন। আর ডিমিট্রিয়াস তো সব রকমেই যোগ্য।

হা। তেমনি লাইসেণ্ডারও অযোগ্য নয়।

ডি। সেদিক থেকে বিচার করলে তোমার কথা ঠিক—কিন্তু এই বেলায়, তোমার বাপের সম্মতি ওর প্রতি নেই। তাই অন্যজনকেই যোগ্যতর বলতে হবে।

হা। আমার বাপ যদি আমার চোখ দিয়ে দেখতেন!

ডি। বরং তোমারই উচিত তোমার বাপের বিচার-বুদ্ধি দিয়ে নিজের চোখকে শাসন করা।

হা। প্রভু, ক্ষমা করুন আমাকে। আমি জানি না—কোথা থেকে আমি এই সাহস পেয়েছি, কোথায় গেল আমার লজ্জা, যে এমন একটা বিষয় নিয়ে আমি আপনার সামনে আলোচনা করছি, কিন্তু আমায় জানিয়ে দিন, আমি যদি ডিমিট্রিয়াসকে বিয়ে না করি তাহলে আমার ভাগ্যে কী আছে।

ডি। হয় তোমাকে মরতে হবে, নয়তো চিরদিনের তরে সংসার ত্যাগ করতে হবে। তাই, সুন্দরী হারমিয়া, তোমার বাসনাকে যাচাই ক'রে দেখ। তোমার যৌবন, তোমার রক্তের উন্মাদনা—এসব বিচার করে দেখ। যদি তুমি বাপের কথা না শোন তাহ'লে তুমি পারবে কি সন্ন্যাসিনীর কঠোর বেশবাস পরতে, চিরদিনের তরে অন্ধকার ছায়াচ্ছন্ন মঠে বন্দিনী হ'য়ে থাকতে, সারাজীবন বন্ধ্যা সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করতে, হিমশীতল নিষ্ফল চাঁদের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তক্ষণে প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করে দিন কাটিয়ে দিতে? এমনি করে যারা যৌবনে যোগিনী হ'তে পারে, যারা সংযত করতে পারে যৌবনের চঞ্চল রক্তের দোলা, ভগবানের আশীর্বাদ তাদের ওপরে; কিন্তু সংসারিক দিক থেকে সেই গোলাপই বেশি সুখী, যার থেকে আতরের নির্যাস নিঙড়ে নেওয়া হয়েছে। যে গোলাপ নিজের সুরভি-হীন কাঁটার বৃন্তের ওপরে অবৈত আনন্দে দুলেছে, বেঁচেছে ও মরেছে, সে তো সুখী নয়।

হা। আমি তেমনি ক'রেই বাঁচব, তেমনি ক'রেই মরব, তবু যাকে ভালোবাসিনা তার প্রভুত্বের জোয়ালে আমার আত্মাকে বাঁধা পড়তে দেব না।

ডি—ভাববার সময় নাও; আসছে প্রতিপদের দিন, সেদিন আমার প্রিয়ার সাথে আমার চিরজীবনের সখ্যের বাঁধন বাঁধা হবে, সেদিন হয় তুমি তোমার বাপের মত অনুসারে ডিমিট্রিয়াসকে বিয়ে করবে, নয়ত তুমি বাপের ইচ্ছার অবাধ্য হবার অপরাধে মৃত্যুর জন্য তৈরী হবে, আর নয়ত' ডায়নার বেদীমূলে তোমাকে চিরকৌমার্য্যের কঠিন ব্রত নিতে হবে।

ডিমিট্রিয়াস। হারমিয়া-আমার, এমন একগুঁয়েমি কোরো না। লাইসেণ্ডার, আমার খাঁটি-দাবীর কাছে তোমার এই মিথ্যে খেয়াল ছেড়ে দাও।

লাইসেণ্ডার। তুমি ওর বাপের ভালোবাসা পেয়েছ,

ডিমিট্রিয়াস, আমাকে হারমিয়ার ভালোবাসা পেতে দাও। তুমি ওর বাপকে বিয়ে কর।

ই। বেজাদব লাইসেণ্ডার, সত্যি ওকে আমি ভালোবাসি আর যে জিনিষ আমার তাও আমি ভালোবেসে ওকেই দেব। যেহেতু মেয়ে আমার, তাই আমি ওর প্রতি আমার সমস্ত স্বত্ব ডিমিট্রিয়াসের প্রতিই ন্যস্ত করছি।

লা। প্রভু, আমার পরিবার ওরই তুল্য সম্ভ্রান্ত, আমার ধনসম্পদ ওরই সমান, আমার প্রেম ওর চেয়ে বেশী, আমার দাবী সবদিক থেকে ওর তুল্য তো বটেই যদি বেশী নাও হয়। আর এসব বড়াইয়ের কথা ছেড়ে দিয়ে সবচেয়ে বড় কথা এই যে সুন্দরী হারমিয়া আমাকেই ভালোবাসে, তবে আমি কেন নিজের অধিকার ছেড়ে দেব? তাছাড়া ডিমিট্রিয়াসের নামে আমার অভিযোগ —ও তো নেদারের মেয়ে হেলেনাকে প্রণয়-নিবেদন করেছিল। ও তার হৃদয় জয় ক'রেছে। আর সে—আহা বেচারা, এই হতভাগা বিশ্বাসঘাতকটাকে দেবতার মতো পুজো করে।

ডি। এতো আমিও স্বীকার করব যে এ কথাটা আমিও শুনেছি। আমি ভেবেছিলাম, ও-নিয়ে ডিমিট্রিয়াসের সঙ্গে কথা বলব। কিন্তু নিজের ব্যাপারে এত ব্যস্ত ছিলাম যে ভুলে গিয়েছি। যাক্, এস ডিমিট্রিয়াস, আপন ইজিয়াস, আমার সঙ্গে আসুন, আপনাদের দুজনকেই নির্জ্জনে আমার কিছু উপদেশ দেবার আছে। আর তুমি সুন্দরী হারমিয়া, তুমিও নিজের মনকে তৈরী কর, নিজের খেয়ালখুশীকে তোমার বাপের ইচ্ছা অনুসারে বদলে নিতে, নয়ত এথেন্সের আইন, যে আইন আমি কোন মতেই রদ করতে পারি না—তোমাকে মৃত্যু অথবা চির কৌমার্য্য ব্রতের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করবে। এসো হিপোলাইটা, তোমার জন্যে কী আনন্দের আয়োজন করি বলো তো প্রিয়া! ডিমিট্রিয়াস এস, ইজিয়াস চলুন, আমি আমার বিয়েতে আপনাদের ওপরে কিছু কাজের ভার দেব, আর আপনাদের নিজেদের বিষয়ে ও ধীরে সুস্থে একটু আপনাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করব।

ই। কর্ত্তব্য এবং ইচ্ছা, এই দুই নিয়েই আমরা আপনার অনুসরণ করব।　　প্রস্থান

লাইসেণ্ডার। কী-হ'ল প্রিয়া আমার, তোমার গালদুটি এমন করে শুকিয়ে উঠল কেন? ওখানে দুটি গোলাপের রক্তিমা এত তাড়াতাড়ি মিলিয়ে গেল কেন?

হা। বৃষ্টি বৃষ্টির অভাবে, কিন্তু ওদের আমি এখনি অজস্র ধারায় ভিজিয়ে দিতে পারি, আমার চোখের বন্যা দিয়ে।

লাই। হায়রে! যত বই পড়েছি, গল্পে ইতিহাসে যা শুনেছি—খাঁটি প্রেমের পথ সহজ নয়, হয়ত' জাতের বাধা—

হা। কী সর্ব্বনাশ—একজন এত উঁচু যে নীচুর সঙ্গে সে মিলতে পারে না।

লা। নয়ত' বয়সে একে অন্যের অযোগ্য;—

হা। হায়রে তারুণ্যের কাছে বেমানান রকমে বুড়ো।

লা। নয়ত' বন্ধুবান্ধবদের মতের অপেক্ষা—

হা। হায়রে নরক, অন্যের চোখদিয়ে নিজের প্রেমের পাত্রকে বেছে নেওয়া!

লা। আর নয়ত যদি মিলনে বাধা না রইল তো যুদ্ধ, মৃত্যু, ব্যাধি এসে প্রেমকে আক্রমণ করে। ধ্বনি যেমন ক্ষণিক, ছায়া যেমন চপল, স্বপ্ন যেমন নিমেষে মিলিয়ে যায়, কালো রাতের বুকে বিদ্যুৎ যেমন এক নিমেষের জন্যে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যকে প্রকাশিত ক'রে অন্ধকারের কালোমুখের বিরাট গহ্বরে অন্তর্ধান করে—মানুষ বলবার সময়টুকু পর্য্যন্ত পায়না যে "ঐ দেখ তো"—তেমনি ক'রেই সমস্ত ভালো জিনিষ এক নিমেষে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।

হা। যদি তাই হয়, যদি চিরদিন ধ'রেই খাঁটি প্রেমিকের পথে এমনি বাধা এসে থাকে, তাহ'লে এতো অদৃষ্টেরই মার। তা হ'লে আমাদেরও এই বিপদে ধৈর্য্য ধরতে হবে। যেমন ভাবনা, স্বপ্ন, দীর্ঘশ্বাস, কামনা আর চোখের জল অতৃপ্ত প্রেমের সাক্ষী, তেমনি এই দুর্দৈবকেও প্রেমের অনুচরী ব'লেই মেনে নিতে হবে।

লা। এমনি ক'রেই মনকে বোঝানো ভাল, তাই কথা শোন আমার হারমিয়া। আমার এক বিধবা পিসী আছেন। অনেক সম্পত্তির তিনি উত্তরাধিকারিণী। তিনি নিঃসন্তান, এথেন্স থেকে সাত ক্রোশ দূরে তাঁর বাড়ী। তিনি আমাকে নিজের একমাত্র সন্তানের মতোই দেখেন। সেখানে—হায়মিয়া আমার—আমি তোমায় বিয়ে করতে

পারি। সে ডাইসার এথেন্সের এই নিষ্ঠুর নিয়ম আমাদের অনুসরণ করতে পারবে না। যদি তুমি আমায় ভালোবাস তা হ'লে কাল রাতে তোমার বাপের ঘর থেকে চুপি চুপি চ'লে এস। সহরের একক্রোশ দূরে সেই যে বাগান আছে —যেখানে একদিন তুমি হেলেনার সাথে মে মাসের এক সুন্দর ভোর বেলার সৌন্দর্য্য দেখবার জন্য বেড়াতে গিয়েছিলে, যেখানে হেলেনাকে আমাকে দেখা হয়েছিল, সেখানে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।

হা। লাইসেণ্ডার, ঈশ্বরদেবের সবচেয়ে শক্তিমান যে অস্ত্র, সোনা দিয়ে মোড়া যে তীর তার সবচেয়ে ভালো, তেনাসের পায়রার যে সরলতা, যা দিয়ে দুটি আত্মার মিলন ঘটে—আর প্রেমের ঘটে সমৃদ্ধি, যখন কপট ট্রয়ের লোকেরা জাহাজে পাল তুলে চলে যাচ্ছে বলে দেখা গিয়েছিল তখন যে আগুনে কার্থেজের রাষ্ট্র পুড়ে মরেছিল। এতদিন ধ'রে মেয়েমানুষ যত প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ ক'রেছে, আর পুরুষ মানুষ তারও চেয়ে যত বেশী প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছে, সে সমস্তর দোহাই দিয়ে আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, যে জায়গা তুমি বলেছ, সেখানে আমি তোমার সংগে মিলব।

লা। কথা রেখো প্রিয়া, ঐ দেখ হেলেনা আসছে।

(হেলেনার প্রবেশ)

হা। তোমার ধন্যা শুভ হ'ক। সুন্দরী হেলেনা, কোথায় চ'লেছ ?

হে। আমায় সুন্দরী বলেছ, 'সুন্দরী' ফিরে নাও। ডিমিট্রিয়াস তোমার সৌন্দর্য্য ভালোবাসে। তোমার সৌন্দর্যই সার্থক। তোমার চোখ দুটি যেন মরকত মণি। যখন ফসলের চারাগুলো সবুজ হয়ে ওঠে, যখন হর্ষণের কোপে কোপে ফুল ফুটে ওঠে,তখন বুলবুলের শীষ রাখালদের কানে যেমন মধুর লাগে তোমার কথা তার চেয়েও মিষ্টি, সুহেলা। আচ্ছা, ব্যাধি তো ছোঁয়াচে। যদি রূপও তাই হ'ত তা হ'লে এখান থেকে যাবার আগে তোমার রূপের ছোঁয়াচ আমাকে লাগ্‌ত, আমার কানে ছোঁয়া লাগ্‌ত তোমার সুরের, আমার চোখে লাগ্‌ত তোমার চোখের খোঁজ, তোমার গলার গানের ছোঁয়াচ লাগ্‌ত আমার গলায়। এই সমস্ত পৃথিবীটা যদি আমার হ'ত,আর যদি তার বিনিময়ে পাওয়া যেত ডিমিট্রিয়াসকে, তা হ'লে দুনিয়াটা আমি তোমায় দিয়ে দিতুম ; আমায় শিখিয়ে দাও তুমি কেমন করে তাকাও—কোন মায়া দিয়ে তুমি জোগা দাও ডিমিট্রিয়াসের মনে।

হা। আমি তো ওর দিকে ভ্রূকুটি করি, তবু সে আমায় ভালোবাসে।

হে। হায়রে—তোমার ভ্রূকুটী যদি তার কলাবিদ্যাটা আমার হাসিকে শিখিয়ে দিত…

হা। আমি তাকে গাল দিই, তবু সে আমায় ভালোবাসে।

হে। হায়রে যদি আমার অনুনয় এমন প্রেম জাগিয়ে তুলতে পারত।

হা। যতই আমি ওকে ঘৃণা করি, ও ততই আমায় পিছু নেয়।

হে। আমি ওকে যত ভালোবাসি, ও তত আমায় ঘৃণা করে।

হা। ওর বোকামো হেলেনা, সে তো আমার দোষ নয়।

হে। তোমার এই রূপ ছাড়া, তোমার আর কোন দোষ নেই। তোমার এই দোষটা যদি আমার হ'ত।

হা। শান্ত হও ভাই, সে আর আমায় মুখ দেখতে পাবে না। আমি আর লাইসেণ্ডার এখান থেকে চলে যাচ্ছি। যখন লাইসেণ্ডারকে দেখিনি তখন এথেন্স আমার কাছে স্বর্গ ব'লে মনে হ'ত, আমার প্রিয়তমের মাঝে কোন মায়া আছে যে আমার একদিনের স্বর্গকে আজ নরক ব'লে মনে হচ্ছে।

লা। হেলেন, তোমাকে আমাদের মনের কথা বলব। কাল রাতে যখন চাঁদের রাণী জলের আয়নায় তার রূপোলি মুখ দেখবে, জ্যোৎস্না যখন ঘাসের ধারালো মাথার ওপরে তরল মুক্তো পরিয়ে দেবে, যে সময়ে প্রেমিকদের পালিয়ে যাবার খবর গোপন থাকে, তখন এথেন্সের গেট দিয়ে আমরা পালিয়ে যাব, ঠিক করেছি।

হা। আর সেই বনে আমরা মিলব যেখানে কতদিন গন্ধে ভরা প্রিমরোজ ফুলের বিছানায় শুয়ে তোমাতে আমাতে মনের কথা বলাবলি ক'রেছি। সেখান থেকে আমরা চোখ ফিরিয়ে নেব এথেন্স থেকে, আমরা খুঁজে নেব নূতন বন্ধু। অজানা সংগী। বিদায় বেলার সাথী আমার, আমাদের জন্যে প্রার্থনা করো। ভাগ্য যেন

প্রতীক্ষায়

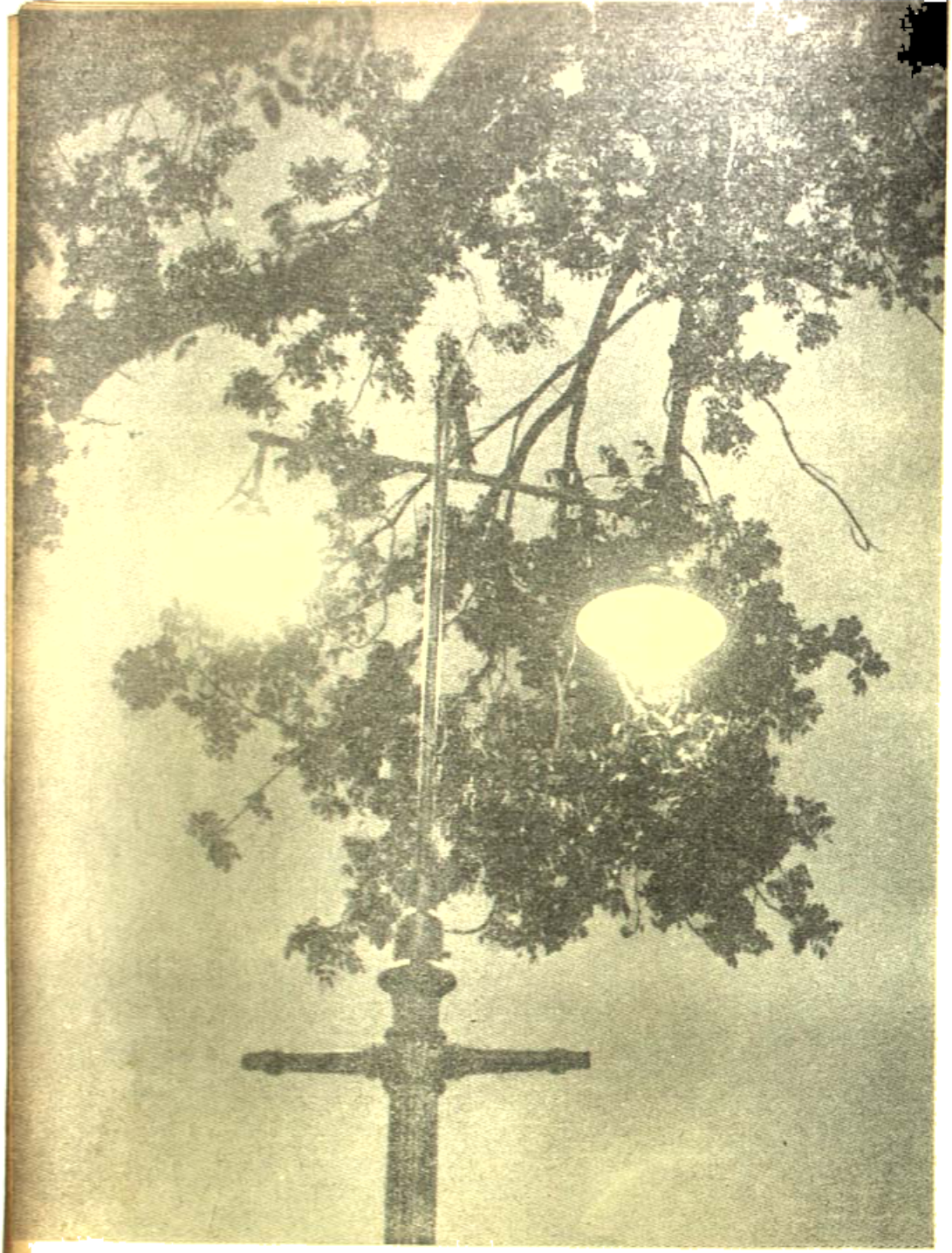

রাতের চক্ষু

ঘটে : দীপক চন্দ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

তোমায় ডিমিত্রিয়াসকে তোমায় দেব। কথা রেখ লাই-সেণ্ডার, এখনকার মত প্রেমিকের খাস থেকে আমরা আমাদের চোখকে বঞ্চিত করব, যতক্ষণ না কালকের গভীর রাত্রি এসে যায়।

লা। আমি কথা রাখব হারমিয়া, বিদায় হেলেনা। তুমি যেমন ডিমিত্রিয়াসকে ভালোবাস, প্রার্থনা করি, সেও যেন তোমায় তেমনি ভালোবাসে।　　প্রস্থান

হে। কেউবা আরেকজনের চেয়ে কতই সুখী হ'তে পারে। এথেন্সের মানুষ আমাকে ওরই মতো সুন্দরী ব'লে জানে; কিন্তু তাতে কী হবে? ডিমিত্রিয়াস তো তা ভাবে না। সবাই না মানে সে তো তা মানছে না। হারমিয়ার চোখের মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে সে যেমন ভুল করছে তেমনি ওর গুণে মুগ্ধ হ'য়ে আমিও ভুল করছি। যে জিনিষ মূল্যহীন, তুচ্ছ, নগণ্য তাকেও প্রেম পরম মূল্য দান করে। প্রেম তো চোখ দিয়ে দেখে না—মন দিয়ে দেখে, তাই তো পাখা বিহারী (মদনকে) কিউপিডকে বলা হয়েছে অন্ধ। প্রেমিকের মনে কোন বিচার বুদ্ধির ঠাঁই নেই। পাখা আর অন্ধতা দিয়ে এই বিবেচনাহীন ব্যাপারটিকেই বোঝানো হয়েছে। তাই তো প্রেমের দেবতাকে বলা হ'য়েছে শিশু, কারণ প্রেম প্রায়ই নির্বাচন করতে ভুল করে। যেমন দুষ্টু ছেলেরা খেলার সময় বার বার মিথ্যা কথা বলে, তেমনি কিশোর মদনকে সব লোকে মিথ্যাবাদী বলে নিন্দা করে। যতদিন ডিমিত্রিয়াস হারমিয়াকে দেখেনি ততদিন সে কেবলি প্রতিজ্ঞার শিলাবৃষ্টি ক'রেছে যে—সে কেবল আমারই, আর যেমনি এই শিলারাশি হারমিয়ার কাছ থেকে একটু আতপ স্পর্শ পেয়েছে অমনি গলে গেছে—ওর সেই প্রতিজ্ঞার শিলাবৃষ্টি গ'লে জল হ'য়ে গেছে।

আমি গিয়ে ওকে হারমিয়ার পালিয়ে যাওয়ার খবর দেব, তাহ'লে সে কাল রাতে হারমিয়াকে অনুসরণ ক'রে ঐ বনে যাবে। এই জন্যে আমি যদি ওর কাছে ধন্যবাদ পাই তবে তার জন্যে আমাকে বড় কঠিন মূল্যই দিতে হবে, কিন্তু এ ব্যাপারে আমার যে কষ্ট তার থেকে এটুকু লাভ হবে যে আমি ওর সঙ্গে সেই বনে যাব, আবার ফিরে আসব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(এথেন্স—কুইন্সের কুটির। কুইন্স, স্নাগ, বটম, ফ্লুট, স্নাউট ও ষ্টারভেলিং)

কু। আমাদের সব লোক হাজির?

ব। সব চেয়ে ভালো হয় যদি তুমি সবাইকে নাম ধ'রে কার কি পার্ট সেই হিসাবে ডেকে নাও।

কু। এই কাগজে সবার নাম লেখা আছে। এথেন্সের মধ্যে সবাই বলবে যে এরাই সব চেয়ে পার্ট করার যোগ্য। আমরা ডিউকের বিয়ের রাতে এই প্লে করব।

ব। পিটার, আগে বল এই প্লের গল্পটা কী, তার পরে এ্যাকটরদের নাম বল। এমনি ক'রে কাজ আরম্ভ হবে।

কু। বেশ, আমাদের প্লের নাম 'অতিশয় শোচনীয় কমেডি' এবং পিরামুস ও থিসবীর অতিশয় শোচনীয় মৃত্যু।

ব। এ খুব ভালো বই, আমি বলতে পারি এ খুব মজার বই। এবারে পিটার তুমি তোমার কাগজ দেখে সব এ্যাক্টরদের ডাক।

মশাইরা সব ফাঁক ফাঁক হয়ে দাঁড়ান।

কু। যেমন যেমন আমি ডাকব, তোমরা জবাব দেবে। নিক বটম—তাঁতী—

ব। আমি হাজির, বল আমার কীসের পার্ট, তারপর আগে চল।

কু। তুমি নিক বটম, পিরামুসের পার্ট করবে।

ব। পিরামুস কি এক প্রেমিক, না এক অত্যাচারী রাজা।

কু। এক প্রেমিক—যে প্রেমের জন্য বীরের মত নিজের প্রাণ দিয়েছে।

ব। এটা ভাল ক'রে করতে পারলে লোকদের বেশ খানিক কাঁদান যাবে। এই পার্ট যদি আমি করি তা হ'লে দর্শকরা যেন নিজের নিজের চোখ সামলান, আমি শোকের তুফান তুলব, একেবারে কান্নার বান ডাকিয়ে দেব, আচ্ছা আগে চল—তবু আমার সব চেয়ে ভাল লাগে অত্যাচারী রাজার পার্ট—আমি এরক্লিসের পার্ট চমৎকার করতে পারি, অথবা আচমকা ষ্টেজের ভেতরে একটা বেড়াল তাড়িয়ে নিয়ে আসা—যাতে হাসির চোটে সবাইকার পেট ফেটে যাবে।

ক্রুদ্ধ পাহাড়
কম্পিত থর থর
ভেঙেছে যার
বন্দীশালার।
সূর্য্যের রথ
দূর থেকে করে কলমল—
নির্ব্বোধ ভাগ্যকে
ক'রে দেয় অমল ধবল।

কী চমৎকার।—এবার অন্য প্রেমাস্পদের নাম বল। এটা হ'ল এরস্কিনের সুর—এক অত্যাচারী রাজার সুর। প্রেমিকের পার্ট একটু কাঁদুনে।

কু। স্নাগ্‌স্ ফ্লুট, কামারের হাপর মেরামত করনে-ওয়ালা।

ফ্লু। এই যে আমি পিটার কুইন্স।

কু। ফ্লুট, তুমি থিসবীর পার্ট করবে।

ফ্লু। থিসবী কি এক বীর যে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়?

কু। সেই মেয়ে যাকে পিরামুস ভালোবাসে।

ফ্লু। না, না, আমি মেয়ে মানুষের পার্ট করতে পারব না, আমার দাড়ি গজিয়েছে।

কু। তাতে কী হ'য়েছে। তুমি মুখোস প'রে পার্ট করবে। তুমি যতটা পার গলা সরু ক'রে কথা বলবে।

ব। যদি মুখ ঢাকা থাকে তা হ'লে আমাকে থিসবীর পার্ট দাও. আমি অদ্ভুত মিহি গলায় কথা বলব। ফিস্ ফিস্ ফিস্ ফিস্। "ওগো পিরামুস, প্রিয়তম, তোমার প্রিয়া থিসবী, তোমার প্রিয়তমা।"

কু। না, না, তোমাকে পিরামুস আর ফ্লুটকে থিসবীর পার্ট করতে হবে।

ব। আচ্ছা, আগে চল।

কু। রবিন ষ্টারভেলিং, দর্জী।

ষ্টার। এই যে পিটার।

কু। রবিন, তুমি থিসবীর মায়ের পার্ট করবে। টম স্নাউট, বাসন ঝালাই করনেওয়ালা।

স্না। এই যে পিটার।

কু। তুমি পিরামুসের বাপ। আমি হব থিসবীর বাপ। স্নাগ, তুমি করবে সিংহের পার্ট। আশা করি সব পার্ট দেওয়া হয়ে গেছে।

স্না। তুমি কি সিংহের পার্ট লিখেছ, তা হ'লে আমায় দাও, কারণ আমার মুখস্ত করতে একটু দেরী লাগে।

কু। ও তুমি তখনি তখনি করবে, ওতে শুধু ডাকা ছাড়া আর কিছু নেই।

ব। আমায় দাও সিংহের পার্ট। আমি এমন ডাকব যে যে কোন লোকের হৃদ্‌কম্প হবে। আমি এমন ডাকব যে, ডিউক বলবেন—ওকে আবার ডাকতে বল!

কু। তুমি যদি এমন ভয়ানক ভাবে ডাক তা হ'লে তুমি ডিউকের স্ত্রীকে, আর অন্য সব মেয়েদের ভয় পাইয়ে দেবে। তখন তারা সব চীৎকার করবে। আর তা হ'লেই আমাদের সবাইকে ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হবে।

সবাই। হাঁ তাহ'লে সব মায়ের বাছাকেই ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হবে।

বটম। বন্ধুগণ, আমি স্বীকার করছি যে যদি আপনারা মেয়েদের এমন ভয় পাইয়ে দেন যে তাদের মাথা খারাপ হ'য়ে যায় তাহ'লে তাদের আমাদের ফাঁসি না দেওয়ার মত বিচার বুদ্ধি আর থাকবে না। কিন্তু আমি আমার গলা এমন করে সাধব যে ঠিক একটা বাচ্চা ঘুঘুর মত ক'রে সিংহের ডাক ডাকব। আমি এমন ক'রে সিংহের ডাক ডাকব যে আপনারা ভাববেন যে একটা নাইটিঙ্গেল পাখী ডাকছে।

কু। না, না বটম, তোমাকে পিরামুসের ছাড়া আর কারো পার্ট দেওয়া হবে না, কারণ পিরামুস হচ্ছে একজন সুপুরুষ, একজন সত্যিকারের পুরুষ মানুষ, যে রকম নাকি বসন্ত কালে পথে ঘাটে দেখতে পাওয়া যায়,—একজন পরম সুন্দর ভদ্রচেহারার মানুষ; তাই তোমাকেই পিরামুসের পার্ট করতেই হবে।

ব। আচ্ছা আমি এ পার্টই করব। সবচেয়ে কোন দাড়ি পরলে আমায় মানাবে?

কু। যা তোমার খুশী।

ব। আমি হয় খেড়ো রংয়ের দাড়ি পরে এই পার্ট করব, নয়ত' তামাটে কমলা রংয়ের, নয়ত' পাকা গাল

রংয়ের, নয়ত' তোমার ফ্রেক ক্রীউন রংয়ের, যা নাকি একেবারে নিখুঁত হ'লদে।

কু। কতকগুলো ফ্রেক ক্রাউনেতে কোন দোষই নেই, তখন তোমাকে শুধু মুখেই প্রে করতে হবে। আচ্ছা মশাইরা, এই নিন আপনাদের পার্ট। আমার একান্ত অনুরোধ যে কাল রাতের মধ্যে আপনার সবাই পার্ট মুখস্থ ক'রে ফেলবেন, আর সবাই এখান থেকে এক মাইল দূরে ডিউকের বাগানে এসে আমার সংগে একত্র হবেন। সেখানে চাঁদের আলোয় আমরা রিহার্সাল দেব, কারণ আমরা যদি সহরের মাঝে একত্র হই তা হ'লে লোকে আমাদের বিরক্ত করবে আর আমাদের প্লের কথা সবাই জেনে যাবে, আর ইতিমধ্যে আমি একটা লিষ্ট ক'রে ফেলব যে আমাদের ড্রামার জন্যে কী কী জিনিষ চাই। আচ্ছা কেউ যেন আসতে ভুলবেন না।

ব। সেখানে আমরা বেশ লম্বা সময় ছেড়ে প্রাণ খুলে রিহার্সাল দিতে পারব। সবাই কষ্ট ক'রে মুখস্থ করবেন যেন ভুল না হয়। আচ্ছা—বিদায়।

কু। ডিউকের এক বাগানে আমরা মিলব।

ব। থ্যাঙ্ক, আর বলতে হবে না,—বেশি টানলে শেষকালে ধনুকের ছিলা ছিঁড়ে যাবে।

চারণের গান

গীতিচারণ শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়

চারণ আমি গান বেঁধেছি
রুদ্র-বীণার ঝঙ্কারে
প্রলয় নাচে মাতে ভোলা
যেই সুরেরই টঙ্কারে।
যে গান শুনে সাগর দোলে,
ঝড়ের গতি মেঘের কোলে,
কাল নাগিনীর নৃত্য খোলে
যেই সুরেরই চঙ্কারে।
(চারণ আমি গান বেঁধেছি রুদ্র-বীণার ঝঙ্কারে।)

সুর শুনেছি অনেক বটে
হাল্কা-রসের, প্রেম গানে,
দেশটাকে আজ ডুবিয়ে দিল,
ক্লীবতারই মাঝখানে।
ঝেড়ে ফেল ঐ প্রেমের ফাঁসী
হাস্‌বে জোরে কট্ট-হাসি
আমার সুরে সুর মেলালে
দূর হবে ভয় নিমেষে।
(চারণ আমি গান বেঁধেছি রুদ্র-বীণার ঝঙ্কারে।)

আধুনিক ইংরাজি উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের প্রভাব

অধ্যাপক কালীনাথ রায়

ইংরাজি সন ১৯২৬। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ তাঁর কেম্ব্রিজের বক্তৃতায় একটি চমকপ্রদ ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন যে ইংরাজি ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অথবা তার কাছাকাছি কোন একটি সময়ে মনুষ্য-প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে গেছে। ঘোষণাটি চমকপ্রদ, কিন্তু মোটেই অসত্য নয়। ঘোষণাটি একটি তথ্য পরিবেশনের অভ্যুক্তি মাত্র। মনুষ্য-প্রকৃতির পরিবর্তন হয়তো না ঘটতে পারে, কিন্তু এই 'প্রকৃতি' সম্পর্কে মানুষের ধারণার পরিবর্তন যুগে যুগে অবশ্যম্ভাবী। এই কথাটাই উল্‌ফ তাঁর শ্রোতাদের বিশেষ জোর দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন। মনুষ্যপ্রকৃতি সম্পর্কে ধারণার এইরকমই একটি পরিবর্তন বিংশ শতকের প্রথম দশকে সূচিত হয়েছিল। অধ্যাপক আইজাক্ তাঁর 'An Assessment of Twentieth century Literature' গ্রন্থে বলেছেন যে ভার্জিনিয়া উল্‌ফের তারিখ নিরূপণ নেহাৎ আচারী নয়। ইংরাজি ১৯১০ সনের ডিসেম্বর মাসে, উল্‌ফের দুই বন্ধু 'রোজার ফ্রাই এবং ডেস্‌মণ্ড ম্যাকার্থি'র উদ্যোগে লণ্ডনে একটি শিল্পপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই প্রথম লণ্ডনের শিল্পরসিকদের পরিচয় ঘটলো, 'ভ্যানগগ্', 'সিজানো' ও 'মাতিসি' প্রমুখ শিল্পীদের শিল্পের সঙ্গে। এই প্রদর্শনী মৃত্যু ঘোষণা করলো তৎকালীন 'ইম্প্রেসনিজমের' সমর্থকদের। কিন্তু এ শুধু ইম্প্রেসনিজমের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা নয়, 'ইম্প্রেসনিজমকে' অবিচ্ছিন্ন আর্টের করল থেকে মুক্ত করার এক সুষ্ঠু প্রচেষ্টা। আর্ট যে হাওয়া বাজি নয়, এই জীবনেরই যথাযথ প্রকাশ; তারই এক দীপ্ত ঘোষণা।

ভার্জিনিয়া উল্‌ফ এই পরিবর্তনের প্রথম সূচনা লক্ষ্য করেছিলেন, হার্ডির 'দি ওয়ে অফ্ অল্ ফ্লেস্' উপন্যাসে এবং যুগান্তকারী নাট্যকার বার্নার্ড শ'র বিভিন্ন নাটকের 'মধ্যে'। এই প্রসঙ্গে কিন্তু একটি কথা উল্লেখের প্রয়োজন আছে। যে পরিবর্তনের প্রকাশ বিংশশতাব্দীর প্রথম-দশকে ভার্জিনিয়া উল্‌ফের চোখে পড়েছে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ইংলণ্ডে নয়, নরওয়েতে এই পরিবর্তনের অংকুরোদ্গম হয়েছে! ইব্‌সেনের আবির্ভাব সারা ইউরোপীয় মহাদেশে এক যুগান্তকারী ঘটনা। নর ও নারীর সম্পর্কের নূতনতর ব্যাখ্যাপক হিসাবে ইব্‌সেনের প্রভাব ১৮৯০-এর আগে ইংলণ্ডে তত গভীর ভাবে অনুভূত হয়নি এ'কথা যেমন সত্য, তার চেয়ে অধিকতর সত্য হ'ল যে ইব্‌সেনের প্রভাব মনুষ্যপ্রকৃতির পরিবর্তনের এক আশু ভবিষ্যৎ নির্বাচন করে দিয়েছিল। নর ও নারীর যৌন সম্পর্কের নূতনতর চিন্তার উদ্ভাবনে ইব্‌সেন তাঁর 'A Doll's House' আগামী দিনের নারী সৃষ্টি করে গিয়েছেন। "I believe that before all else, I am a reasonable human being." নোরার এই উক্তি নারীকে শতাব্দীর বন্ধন থেকে মুক্ত করেছে। সম্ভবতঃ এই প্রথম নারী পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্ব রূপে নিজেকে প্রকাশ করলো। বার্নার্ড শ'র মত বুদ্ধিজীবীর পক্ষে এই প্রস্তাবকে উপেক্ষা করা অসম্ভব ছিল। 'শ' তাই ইব্‌সেনকেই তাঁর গুরু বলে স্বীকার করে নিলেন। সে আর এক ইতিহাস। সে আলোচনা আমরা এখানে করবো না, কিন্তু ভার্জিনিয়া উল্‌ফের চোখে এই পরিবর্তনই যে পড়েছে তাতে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই। এ'ছাড়া উল্লেখযোগ্য হ'ল ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে চেখভের ছোটগল্পের ইংরাজি অনুবাদ, বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসের অনুবাদ ইংলণ্ডে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হ'ল। অনুবাদক হ'লেন সে সময়কার প্রভাব-শালী লেখক কনস্টেন্স গার্নেট।

এই সময় কিন্তু ভিক্টোরিয়ার আর একটি মানসিক বিপ্লব ঘটে গেছে। মনীষী 'সিগমণ্ড ফ্রয়েড্' তাঁর মনস্তত্ত্বের ভিত্তি-

প্রভাব স্থাপন করেছেন। যদিও তখন ইংলণ্ডে ফ্রয়েডের কোনও প্রকাশ ঘটেনি, তবু কার্ল যুঙ এর (karl jung) সাহচর্যে ফ্রয়েড ১৯০৯ সনে আমেরিকায় যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার শব্দ ইংলণ্ডের আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হ'তে সুরু হয়েছে। একটা মানসিক বিপ্লব যে আশু ও অনিবার্য্য সে বিষয়ে ইংলণ্ডের বুদ্ধিজীবীদের মনে আর কোনও সন্দেহ তখন নেই। একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় ইংলণ্ডের বুদ্ধিজীবী সমাজ তখন একমত হয়েছেন, সেই তত্ত্ব হলো ব্যক্তিস্বরূপের তত্ত্ব 'Individual sensibility 'Individual Reaction'। একটি ঘটনা কিন্তু আমাদের কাছে আশ্চর্য বলে মনে হয়েছে। অর্থনীতির জগতে যে সময় ব্যক্তিচেতনা ক্রমশঃ সমাজচেতনার কাছে আত্মসমর্পণ করছে, ফিউডাল-যুগের অবসান ঘটছে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাবে, সাহিত্য ও শিল্পের জগতে নর ও নারীর সম্পর্ক তখনও নিরূপিত হচ্ছে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমে। অর্থের জগতে ব্যক্তির এই প্রতিষ্ঠা কি সাম্যবাদের প্রথমস্তরে একনায়কত্বের ইংগিত দিয়েছে? এর বিশ্লেষণ বিশুদ্ধ মার্কসবাদীরা করবেন। আমাদের কাছে এ ঘটনা কিন্তু অদ্ভুত বলে মনে হয়েছে। অর্থ যদি সকল স্তরে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নিরূপণের মানদণ্ড হয়ে থাকে তবে এই বিপরীত ঘটনা ঘটবে কেন? আমরা স্বীকার করে নেব যে অর্থ সকল স্তরে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিরূপণ করেনা, মনস্তত্ত্বের দ্বারাই অর্থের নীতি নির্ধারিত হয়ে থাকে। অর্থনীতির নিত্যনূতন তত্ত্ব যতই সাম্যবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করুক না কেন, মানসিক জগতে মানুষ যতক্ষণ না একনায়কত্বের মোহমুক্ত হচ্ছে ততক্ষণ সহযোগিতার সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

অধ্যাপক আইজাক তাঁর 'An Assessment of Twentieth century literature' গ্রন্থে ১৮৯০ সনে প্রকাশিত উইলিয়ম জেম্‌সের 'principle of psychology' গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি করেছেন। সম্ভবতঃ ভার্জিনিয়া উল্‌ফও এই সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। উদ্ধৃতিটি আমরা হুবহু তুলে দিচ্ছি।

"Consciousness does not appear to itself, chopped up in bits.....It is nothing jointed, it follows.....Let us Call it in the stream of thought, of Consciousness, or of subjective life."

এখানে যে চেতনাপ্রবাহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ইংরাজী উপন্যাসে তার ব্যবহার ১৯১৮ সনে প্রথম 'মে সিনক্লেয়ার' ডরোথী রিচার্ডসনের উপন্যাস পড়ার পর করেছিলেন। চেতনাপ্রবাহধর্মী উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ হ'লো যে এই ধরণের উপন্যাসে পাঠক এবং উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে ব্যবধানের কোনও বাধা নেই। উপন্যাস পড়ার সময় পাঠক এই চরিত্রগুলির চিন্তা ভাবনার সঙ্গে নিজেকে একীভূত করে ফেলে, ঔপন্যাসিকের মাধ্যম সেখানে অনিবার্য্যভাবেই অনুপস্থিত. তার প্রয়োজন কোনও সময়ই অনুভূত হয়না। 'জেমস জয়েস' 'ডরোথী রিচার্ডসন' ও ভার্জিনিয়া উল্‌ফের উপন্যাস এই চেতনা-প্রবাহধর্মী।

কিন্তু সে আলোচনার আগে আমরা কিছু অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করবো। সপ্তদশ শতাব্দীর স্যামুয়েল রিচার্ডসনকেই প্রথম মনস্তাত্ত্বিক ইংরাজ ঔপন্যাসিক হিসাবে দাবী করা হয়ে থাকে। এই দাবী নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ রিচার্ডসনের প্রায় ৫১ বছর বয়সের সময় তাঁর 'পামেলা' প্রকাশিত হ'ল। ইংরাজি উপন্যাসের আকাশে এ এক নতুন অরুণোদয়। 'পামেলার' পর রিচার্ডসন 'ক্লারিসাহারলো' প্রকাশ করলেন। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের সংখ্যায় আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন ঘটলো। আধুনিক যুগে 'পামেলা' অথবা 'ক্লারিসাহারলোর' টেকনিক হয়তো অচল হয়ে গেছে, সে কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। দুটি উপন্যাসেই চিঠির আদান-প্রদানের পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে। উপন্যাসের বিষয়বস্তু মেলোড্রামা ধর্মী। তবু ইংরাজি উপন্যাস 'পামেলা' ও ক্লারিসাহারলোর কাছে ঋণী, সেই সঙ্গে স্যামুয়েল রিচার্ডসনের কাছেও, কারণ নায়ক ও নায়িকার যৌন আকর্ষণ প্রসূত মানসিক দ্বন্দ্বের সূচনা ঘটেছে এই দুটি উপন্যাসেই প্রথম। রিচার্ডসনকে তাই মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের জনয়িতা বললে সম্ভবতঃ অত্যুক্তি হবেনা। এর পরে তাঁরই ধারা অনুসরণ করেছেন 'টোবিয়াস্ স্মলেট' ও 'এজওয়ার্থ', এর পরিণতি ঘটেছে উনবিংশ শতাব্দীতে ভিক্টোরিয়ান যুগের চার্লস ডিকেন্সের মধ্যে। উপন্যাসের

টেকনিক তখন উন্নত হয়েছে, রচনাশৈলীও অনেক মার্জিত হয়েছে, তবু বিচার্ডসনের অবদান কোনও সময়ই উপেক্ষিত হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'লরেন্স স্টার্ন' ট্রিস্টাম শ্যান্ডি (Tristram Shandy) বলে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন, আর রোমান্টিক যুগে 'জেন অষ্টেন' 'এমা' লিখলেন। অধ্যাপক 'আইজাক' এই দুটি উপন্যাসের মধ্যে চেতনা প্রবাহের অংকুর প্রত্যক্ষ করেছেন। সে অংকুরের নিঃসন্দেহে তখন শৈশবকাল, কিন্তু সে শিশু একটি নিশ্চিত-মহীরুহের রূপ নেবার প্রতীক্ষায় ছিল। সে আশা ব্যর্থ হয়নি। পরবর্তী যুগে, অর্থাৎ আধুনিককালে এই চেতনা-প্রবাহী উপন্যাস সম্পূর্ণভাবে মনঃসমীক্ষার নূতন বিজ্ঞানকে ভিত্তি করেই লেখা হয়েছে। উইলিয়ম্ জেমস্ এর 'Principle of Psychology' সম্ভবতঃ এর প্রথম উৎস, আর জেম্স্ জয়েসের 'ইউলিসিস (Ulysse's) এরই এক পূর্ণাঙ্গ পরিণতি।

ডরোথী রিচার্ডসনই প্রথম ঔপন্যাসিক, যিনি চেতনা-প্রবাহকে তাঁর উপন্যাসে বাস্তবরূপ দিয়েছেন। ১৯১৫ সনে প্রকাশিত পয়েন্টেড্ রুফ্ড (Pointed Roof) যা সুরু হ'ল, ১৯৩৫ সনে বারোটি গ্রন্থ সমষ্টি 'পিল্‌গ্রিমেজ' নাম নিয়ে তার শেষ হ'ল। তবু 'পিল্‌গ্রিমেজ' সাধারণ উপন্যাস বলতে আমরা যা বুঝি তা নয়। এর 'প্লট' নেই, এতে 'ট্রাজেডি' নেই, এতে কোনও প্রেমোপাখ্যানও নেই, এতে কোনও সংঘাত নেই। শুধু 'মিরিয়াম হেণ্ডারসনের' একটি ক্রম-বিবর্তনী জীবন আছে—যা চেতনাপ্রবাহকে অবলম্বন করে ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে। চলার পথে বাইরের পৃথিবীর আঘাত-প্রতিঘাতে তার নানা উত্তেজনাকর অনুভূতি ঘটেছে, অনেক অভিজ্ঞতা সে অর্জন করেছে, সে অভিজ্ঞতা এই পরিবর্তনশীল পৃথিবী ও তার বিচিত্র মানুষের সম্পর্কে। মিরিয়ামের জীবন যেন অজস্র পরমাণুর অবিশ্রান্ত ধারা।

ভার্জিনিয়া উল্‌ফের 'টু দি লাইট হাউস' এই চেতনা-প্রবাহমূলক উপন্যাসের আর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। 'পিল্‌গ্রিমেজের' যেমন মিরিয়াম হেণ্ডারসন, 'লাইট হাউসের' তেমনই 'মিসেস্ র‍্যামসে' (Mrs. Ramsay)। মিসেস্ র‍্যামসে, তাঁর স্বামী এবং সন্তানেরা এই নিয়ে যে পরিবার—তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছাড়াও আলোক ছটি নানা অর্থের প্রতীক। আগে বলা হয়েছে যে 'জেমস জয়েসের' 'ইউলিসিস্' হলো এই চেতনাপ্রবাহের এক পূর্ণাঙ্গ পরিণতি। উপন্যাসটি পড়ার চেষ্টা করে আমরা দেখেছি যে প্রথম পাঠে এ শুধু দুর্বোধ্য নয়, একটা কুহেলিকাও বটে। তবু চেতনাপ্রবাহের মূল লক্ষণের কথা স্মরণ রাখলে এই উপন্যাসটি বোঝা অনেক সহজ হয়ে ওঠে।

'ইউলিসিসের' যে চরিত্র আমাদের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে সে হ'ল মেরিয়ান ব্লুমের চরিত্রটি। মেরিয়ান ব্লুম যেন চেতনা প্রবাহের সার্থক প্রতীক। তার চরিত্রের ক্রমবিবর্তন শুধু তাকেই নয়, পাঠককেও চেতনা প্রবাহের ধারায় চিন্তার গোলক ধাঁধায় সঙ্গে নিয়ে যায়, আর লিওপোল্ড ব্লুম যখন ডাবলিনের রাস্তা ধরে চলেছে, নানা চিন্তা ফুলঝুরির আগুনের ঝিলিকের মত তার মস্তিষ্কে প্রবেশ করছে। যে দৃশ্য তার চোখে পড়ছে, যে গন্ধ তার নাকে আসছে, তাই তার মস্তিষ্কে 'আইডিয়ার' সৃষ্টি করছে, সে 'আইডিয়া' নানা অভিজ্ঞতার অনুষঙ্গের (Association) মধ্যে দিয়ে আবার নতুন চিন্তার জট পাকাচ্ছে, এই চিন্তার ঘূর্ণিপাক থেকে ব্লুমের মুক্তি নেই। আমরা জিজ্ঞাসা করি 'ইউলিসিসের' পাঠকেরই কি আছে?

ইউলিসিস উপন্যাসটি হ'ল স্বামী, স্ত্রী ও পুত্রের প্রায় চব্বিশটি ঘণ্টার মালতামালী। এরই মধ্যে জয়েসের মনের গতি কেমেরা কাজ করে চলেছে। এই কেমেরার চোখে যা ধরা পড়েছে তাকে বাঁধা ধরা সীমার মধ্যে সীমায়িত করা যাবে না। ইউলিসিসের কাল আমাদের প্রাত্যহিক কাল নয়, এ দেশকাল। এর মধ্যে যে বস্তু অথবা চরিত্র রয়েছে তাদের চারিদিকে জড়িয়ে রয়েছে সূক্ষ্ম একটি রেশমী আবরণ। তার মধ্যে দিয়ে যা দেখা যাচ্ছে, তা যেন প্রতীকী অনুষঙ্গের একটি বীভৎসমালা—ইউলিসিস উপন্যাসের গদ্য কিছুই এই অনুষঙ্গের ঠাস বুনুনী দিয়ে গাঁথা। কিন্তু এই আবরণের মসৃণতা ও সূক্ষ্মতা পাঠকের মনেও এক ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করে, সে যেন স্ব ইচ্ছায় নিজের চারিদিকে আর একটি সূক্ষ্ম জাল বুনতে সুরু করে। তাই আগে বলেছি যে চেতনা প্রবাহী উপন্যাসে পাঠক ও উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে ব্যবধানের কোনও বাধা নেই, বা থাকলেও তা কোন সময় অনুভূত হয়না। ইউলিসিস্ উপন্যাসের স্থান কাল পাত্র সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠলে তার

জবাব দেওয়া দুরূহ। এই উপন্যাস পাঠের বিশ্বাসের প্রাথমিক ধারা হলো যে—ব্যক্তিধর্মকে সম্পূর্ণভাবে আনুষঙ্গিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। চেতনাপ্রবাহী উপন্যাস পাঠের পূর্বে এই কথাটিই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। মূল বইটি থেকে একটি উদ্ধৃতি বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করছি। সে উদ্ধৃতি আমাদের বক্তব্য কিছুটা সহজ করবে।

"On the door step he felt in his hip-pocket for the latch-key. Not there. In the trousers I left off. Must get it. Potato I have, Creaky wardrobe. No use disturbing her. She turned over sleepeily that time. He pulled the hall door after him very quitely, more till the foot leaf dropped gently over threshold, a limplid looked shut. All right till I come back any how."

অথবা যখন লিওপোল্ড ব্লুম একটি মৃতদেহ সৎকার কাজে উপস্থিত হবার জন্য একটি গাড়ী করে চলেছে, লেখক তার চিন্তার বর্ণনা করছেন—

"As they turned into Berkley street, a street organ near the Basin sent over after them a rollicking rattling song of the halls. Has any body seen kelly ? Kay ee double ell wy. Dead march from 'saul'. He is as bad as old Antonio. He left me on my ownio. Prontte ! Eeeles street. My house down there. Big place, ward for incurables there. Very encouraging. Our Ladiy's Hospice for the dying. Dead house handy underneath. Where old Mrs. Riorden dead. They look terrible the women. Her feeding cup and rubling her with the spoon. Then the screen round her bed for her to die. Nice young student that was dresssd, that bite that bee gave me He's gone over to the lying in hospital they told me, from one extreme to the other."

এখানে আমরা ব্লুমের মনের মধ্যে ঢুকতে পেরেছি. আর উপন্যাসের চরিত্রের ভাবনা এবং পাঠকের চিন্তার মধ্যে প্রাচীরের কোনও বাধা নেই। সেই সঙ্গে ভাষাটি লক্ষণীয়। যেন স্বটঘাণ্ডের ভাষা। মনে রাখা লেখকের লেখনীর আগে এবং পিছনে কোনও চিন্তা নেই ! তবে এ উৎকৃষ্ট ধারক। যা এর পরিসীমার মধ্যে এসেছে তাকেই এ আঁচড়ের মধ্যে ধরে রেখেছে। কিন্তু তাকে পাঠকের কাছে তুলে ধরার, কি পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোনও দায়িত্ব নিতে সে নারাজ। কিন্তু এই পরিচিতি তখনই সম্ভব, যখন পাঠক ও উপন্যাসের চরিত্রটি একই ব্যক্তি বলে পাঠকের মনে হবে। জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস' তা সম্ভব করেছে বলেই একটি সার্থক চেতনাপ্রবাহী উপন্যাস হতে পেরেছে।

আর যে দুটি উপন্যাস আধুনিক কালে পাঠক সমাজে অসাধারণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে পেরেছে, সে দুটি হ'ল লরেন্সের 'সনস্ লাভারস্' এবং 'লেডি চাটার্লির লাভার'। মনোবিজ্ঞানী ঔপন্যাসিক হিসাবে লরেন্স সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে 'ইউলিসিসের' লেখক এবং 'লেডি চাটার্লির' লেখকের মধ্যে পার্থক্যটা আসমান জমীন। অনেক কৃতি সমালোচক এ কথা স্বীকার করে বলেছেন যে জেমস জয়েস আর লরেন্সের স্থান যথাক্রমে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসলোকের উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুতে। কথাটি অত্যুক্তি নয়, নয় এই কারণে যে জয়েস যে চেতনাপ্রবাহের ধারা বেয়ে উপন্যাস লিখেছেন তা অনুষঙ্গের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে পাঠকের মনকে আবিষ্ট করে, আর লরেন্সের সৃষ্টির কামনা জৈব, তার চিন্তা আদিম। এ পাঠকের চিন্তায় কোনও বীভৎসমালার সৃষ্টি করেনা, অত্যন্ত কঠিন সত্যকে বুদ্ধির আলোকে প্রদীপ্ত করে তোলে। লরেন্সের কৃতিত্ব এখানেই, আর জয়েসের সঙ্গে তার মূলগত পার্থক্য এখানে। তবে ঔপন্যাসিক লরেন্সকে শুধু মাত্র এই জৈবকামনা ও আদিম চিন্তার স্রষ্টা হিসাবে যদি আমরা মনে রাখি তবে তাঁর প্রতি অবিচার করবো। এরই সঙ্গে সব সময়ই একটি অধ্যাত্ম চেতনা তাকে বারবার মানসিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত করেছে বিবেকের বিচারে পীড়িত করেছে, তাই দেহের সঙ্গে দেহাতীতের সম্পর্ক নিরূপণে, ইন্দ্রিয় সুখের সঙ্গে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির এক সামঞ্জস্য বিধানে ঔপন্যাসিক লরেন্স তাঁর সারা জীবন কাটিয়ে গেলেন। তবে একটি কাজ তিনি তাঁর সারা জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন সে হ'ল মানব সমাজকে একটি লজ্জা দুষ্টি থেকে মুক্তি দেওয়া।

নর ও নারীর যৌন সম্পর্ক যে একটি পবিত্র সম্পর্ক, এবং বোধকরি সবাপেক্ষা নিবিড়তম সম্পর্ক তারই প্রমাণে লরেন্স তাঁর সারা জীবন কাটিয়ে গেছেন। ফলে, কোথাও কোথাও অনতর্ক মুহূর্তে তার স্থূল ইঙ্গিত, ইঙ্গিত কেন, স্পষ্ট প্রকাশই বলব, পাঠকের নীতিবাদী মনকে নির্মমভাবে আঘাত করেছে। কিন্তু লরেন্সের উদ্দেশ্য যে অসাধু নয়, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। যখন দেখেছি যে স্থূল বাসনা ও কামনার ঊর্ধ্বে একটি অতীন্দ্রিয় আত্মাসচেতনা তার মনকে বারবার পঙ্কিল আর্তে থেকে পংকজের মত ফুটিয়ে তুলেছে। তার 'সন্স্ এণ্ড লাভারস্' এমনই একটি উপন্যাস যার প্রকৃত মূল্যায়নে বিতর্কের ঝড় বয়ে যেতে পারে, কিন্তু একটি মূল্য যে তাকে দিতে হবে এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকতে পারে না।

'সন্স্ এণ্ড লাভারস্'এর বিতর্কের স্থল হ'ল পল আর তার মা মিসেস্ মরেলের সম্পর্ক নিরূপণে। 'ইডিপাস কমপ্লেক্সের' এর চেয়ে স্পষ্ট ও স্পষ্টিত অভিব্যক্তি আর কোনও উপন্যাসে হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই, ফলে মনস্তত্ত্বের গবেষণার দিক থেকে এর মূল্য কিছু বেড়ে গেছে, বুদ্ধির কিছু সমর্থনও এলাভ করতে পেরেছে, এ যেমন সত্য, তেমনই নীতির দিক থেকেও এ অনেকখানি নীচে নেমে গেছে এবং হৃদয়ের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে এও তেমনই সত্য। মা ও ছেলের সম্পর্ক নিরূপণের এই বিশেষ একটি দৃষ্টিকোণ সকল সময় সমর্থনযোগ্য কিনা বিতর্কের বিষয় হলো তাই।

কিন্তু পল চরিত্রের যে দিকটি আমাদের মুগ্ধ করেছে সে হল তার দুই বিপরীতমুখী শক্তির দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার দিকটি। দুটি নারী তার জীবনে এসেছে। ক্লারা ও মিরিয়াম। ক্লারা কামনাময়ী আর মিরিয়াম অতীন্দ্রিয়া। দেহও দেহাতীতের এই দ্বন্দ্বে পল আত্মহারা হয়েছে। পথ খুঁজে পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি, তাই পল এই জীবন যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় খুঁজেছে তার আর্টের সাধনার মধ্যে। এই উপসংহার উপন্যাসের পক্ষে হয়তো অপরিহার্য ছিল, কিন্তু জিজ্ঞাসু-পাঠকের প্রশ্নের কোনও উত্তর এতে পাওয়া যায়নি।

অশ্লীলতার অভিযোগে লরেন্সের ইউলিসিস প্রকাশ একদা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। লরেন্সের 'লেডি চাটার্লিও' অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে বারবার। আদালতের কাঠগড়ায় তাকে দেশে ও বিদেশে দাঁড়াতে হয়েছে অভিযোগের উত্তর দিতে। সাক্ষী দিয়েছে সাহিত্যের অধ্যাপক, গীর্জার পাদ্রি, সাধারণ মানুষ, বিবাহিত ও অবিবাহিত নারী ও পুরুষ, শ্রমিক ও কৃষক। বিচারকের রায়ে 'লেডী চাটার্লি' সসম্মানে মুক্তি পেয়েছে তার স্বদেশে আবার বিদেশে বহু জায়গায় তাকে এখনও বন্দী জীবন যাপন করতে হচ্ছে। এমনই একটি বিচারের সময়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করবো। একদা এক প্রভাতে লণ্ডনের বিচারালয়ের সামনে এসে দাঁড়ালো বয়স্ক এক কৃষক। তার অনেকদিনের সাধ সে আজ পূর্ণ করবে। লেডী চাটার্লির চাক্ষুষ দর্শন লাভ করবে সে। তাকে বোঝানো হলো যে লেডী চাটার্লীর মানবিক কোনও অবয়ব নেই—এ একটি বই মাত্র। সে বিশ্বাস করবে না কিছুতেই, অবশেষে অনেক বুঝিয়ে তাকে নিরস্ত করা হলো। 'লেডী চাটার্লী' শ্লীল কি অশ্লীল সে প্রশ্ন আর আমরা এখানে তুলবোনা। তবে লেডী চাটার্লীর বহু-নিন্দিত আচরণের ব্যাখ্যা হিসাবে আমরা আধুনিক কালের একজন বিখ্যাত মনো-বিজ্ঞানীর একটি উদ্ধৃতি করবো।

"The mind is viewed as a dynamic tension system and behaviour is to be regarded as an attempt to relieve tension and re-establish equilibrium—Lewin"

পল্ ও অকর্মণ্য স্বামীর যৌন ব্যর্থতা যে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করেছিল, তাই চাটার্লিকে একটি নিন্দনীয় আচরণে বাধ্য করেছে।

'লেডী চাটার্লিস লাভার' উপন্যাসের শ্লীলতা ও অশ্লীলতা নির্ণয়ের ভার আমরা ভবিষ্যৎ পাঠক সমাজের হাতে তুলে দিলাম, কিন্তু লরেন্সের আর একটি উপন্যাস যার কিছু আলোচনার এখানে প্রয়োজন আছে, সেটি হ'ল 'ওমেন ইন লাভ্'। দেহ ও দেহাতীতের যে সমস্যা লরেন্সের সন্স্ এণ্ড লাভারস্'এ পলের জীবনে সংকটের সৃষ্টি করেছিল, ওমেন ইন লাভে তারই সুষ্ঠু পরিণতি দেখাবার চেষ্টা লরেন্স করছেন। কামনার আতিশয্য যেমন ক্লারাকে পলের সঙ্গে মেলাতে পারেনি, 'ওমেন ইন লাভ' এ জিরাল্ডের পাশবিক যৌন লিপ্সাও তেমনি শুভ্-

রানের কাছ থেকে তাকে ক্রমে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে দৈহিক সান্নিধ্য সত্ত্বেও জীবনে শান্তি খুঁজবার চেষ্টা করেছে সে আত্মহত্যার মধ্যে। আর সুস্থ, সুন্দর ও সংযত কামনা যে নর ও নারীর জীবনে পরিপূর্ণতা আনতে পারে তার উদাহরণ হল উরসুলা ও বার্কিন।

একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, যুদ্ধোত্তর ক্ষত বিক্ষত ও বিধ্বস্ত সমাজের চিত্র নিয়ে যে উপন্যাসগুলি লেখা হল তাদের এক বিশেষ নামে অভিহিত করা যায়। সে নাম হ'ল 'অবক্ষয়ী উপন্যাস'। এই উপন্যাসগুলিতে পাপের পংকিল আবর্তে মগ্নবিত্ত সমাজের নৈতিক জীবন যে ধীরে ধীরে কি ভাবে ভেঙ্গে পড়েছে তারই পরিচয় আছে। আর সেই সর্বনাশা ভাঙনের মূল কারণ হ'ল মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক বিপর্যয় এরই একরূপ পরিচয় আছে লরেন্সের উপন্যাসে কিন্তু তথ্যের পরিচয় করিয়ে দিয়ে লরেন্স তত্ত্বে প্রবেশ করেছেন, আর সে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই হ'ল তাঁর জীবনের ব্রত। লরেন্সের মতে নরও নারীর সুস্থ যৌন আকর্ষণ হ'ল তার নৈতিক কামনা, এর সংযত ভোগ হ'ল মানুষের জীবনের চরিতার্থতা। লরেন্সের উদ্দেশ্য কতটা সার্থক হয়েছে সে বিচার ভবিষ্যৎ কাল করবে, কিন্তু তার যে আন্তরিকতার অভাব ছিলনা সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

যে যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজের কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, সম্ভবতঃ সেই কথা স্মরণ করেই আলডুস হাক্সলে একবার রহস্যচ্ছলে বলেছিলেন যে মানুষের সভ্যতার গতিকে এবার স্তব্ধ করা উচিত। এ রহস্যে বেদনা মেশানো আছে, পরপর দুটি মহাযুদ্ধের আঘাতে মানুষের যে নৈতিক জীবন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল তাকে জোড়া দেওয়া আজও সম্ভব হয়নি। এই ক্ষতবিক্ষত জীবন নিয়ে মানুষ আর এক বেপরোয়া খেলায় মেতেছে। এতে বুদ্ধির বিকাশ ঘটছে বলে যারা উল্লসিত হন আমরা তাঁদের সঙ্গে একমত নই।

মানুষের মনের ভাব আজ কোন কোন ক্ষেত্রে উপায়হীন, কোন কোন ক্ষেত্রে বেপরোয়া। যেখানে সে উপায়হীন সেখানে কর্মবিমুখ জীবনযাত্রা তাকে উন্নতির পথে উদাসীন করে রেখেছে, আর যেখানে সে বেপরোয়া সেখানে আত্মঘাতী মারণাস্ত্র আবিষ্কারের নেশায় সে মত্ত হয়ে আছে। এই দুটোর কোনটাই সুস্থ জীবনের লক্ষণ নয়। একটা সর্বগ্রাসী তমিস্রা মানুষের জীবনকে রোগগ্রস্ত করেছে। এই 'ফিয়ার কমপ্লেক্সের' কালোছায়ায় কোনও সার্থক সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি হতে পারেনা।

তবু মানুষের শাশ্বত শক্তির ওপর বিশ্বাস হারানোকে আমরা পাপ ব'লে মনে করি। আর তা মনে করি বলেই বিশ্বাস করি, যে ক্লেদাক্ত জীবনের অবসান একদিন ঘটবে। আমেরিকান ঔপন্যাসিক হেমিংওয়ের 'ওল্ডম্যান এণ্ড দি সী'তে একটি বৃদ্ধের অধ্যবসায় ও প্রাণশক্তি জয়লাভ করেছে পশুশক্তির বিরুদ্ধে, তার 'ফেয়ার ওয়েল টু আর্মস্' উপন্যাসে যুদ্ধোন্মাদনাকে পরাজিত করে জীবন পিপাসা জয়ী হয়েছে। রুশীয় ঔপন্যাসিক 'এমিল জোলার' 'জার্মিনালের' শেষ পরিচ্ছেদ ক্লেদাক্ত জীবনের নারকীয় অধ্যায়ের অবসানে নতুন প্রভাত ঘোষণা করেছে। সেই প্রভাতের আলো মানুষকে দুরারোগ্য 'ফিয়ার কমপ্লেক্স' থেকে মুক্তি দেবার আশ্বাস দেয়। অনেক আবর্জনা সত্ত্বেও জীবনের প্রতিটি রাত্রির শেষে উষার আলোয় পৃথিবীকে বিচিত্র ও সুন্দর বলে মনে হয়, সে অনুভূতি একজন খনকের অনুভূতির মত মাটির নীচে অন্ধকার অন্তস্তলে কর্মরত সারাদিনের পরিশ্রান্ত দেহ ও মন নিয়ে সে যখন উপরে এসে আকাশের দিকে চায়।

বিধ্বংসী যুদ্ধের প্রচণ্ড আঘাত মানুষের সভ্যতা তথা সংস্কৃতির ওপর যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল, যুদ্ধোত্তরকালেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত সেই ক্ষতমুখ থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়নি। কখনও সে ক্ষতে বিষ প্রবেশ করে দুষ্টি ঘটেছে, কখনও বা নিরাময়ী প্রলেপে কিছু আরোগ্যের আশ্বাস দিয়েছে। যে আকাশের দিকে চেয়ে মানুষ তার মনের ঔদার্য কামনা করেছে, সে আকাশই ধূসর হয়ে উঠেছে কলকারখানা ও চিমনীর ধোঁয়ায়। যুদ্ধকালীন অবস্থায় মানুষের পশুনিনাদে কাব্য ও সাহিত্যের যে কণ্ঠ সাময়িকভাবে নীরব হয়েছিল, যুদ্ধোত্তরকালে দেশে ও বিদেশে আবার তা শোনা গেল। সমারসেট মম, কম্পটন ম্যাকেঞ্জি, ফ্রাঙ্ক সুইনারটন এরা প্রাক্‌যুদ্ধকালীন লেখক। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাদের আবার নতুনকরে ভাবতে শেখালে। এদের লেখনী অনেক সংযত হল এবং যুদ্ধকালীন আলোড়নের সঙ্গে ভবিষ্যতের শান্তির এক সেতুবন্ধ রচনার প্রয়াস পেল।

ইংলণ্ডের পাঠক সমাজ আবার অতীতের দিকে ফিরে তাকালো। যা ক্লাসিকের পর্যায়ে পড়েছিল এবং প্রথাগারের উপরের তাকে স্থান লাভ করেছিল, আবার তার চাহিদা বাড়লো। চার্লস্ ডিকেন্স, ব্রন্টি ভগিনীদ্বয় এবং জেন অষ্টিনের মূলত সংস্করণ প্রকাশিত হলো।

বস্তুবাদী পৃথিবীর সংঘাত থেকে মানুষ মুক্তি কামনা করলো। উপন্যাস গীতিধর্মী হলো। এলিজাবেথ মায়ারস্ তাঁর "এ ওয়েল ফুল অফ্ লীভস্" (A well full of leaves) এবং ক্রীষ্টোফার (christopher) (১৯৪৬) প্রকাশ করলেন। আর ইংলণ্ডের বাইরে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে 'সিদ্ধার্থ' এবং ১৯৪৭ এ আন্দ্রেজিদের "ষ্ট্রেট ইজ্ দি গেট" (strait is the gate) নোবেল পুরস্কার পেল। সর্বনাশা যুদ্ধের প্রলয়ের বিভীষিকা মানুষকে ঈশ্বর বিশ্বাস করতে শেখালে। এরই মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো 'মরালিটি প্লে' Everyman এর পুনরাবির্ভাব। ইংলণ্ডে ও আমেরিকার নাটকটি আবার জনপ্রিয়তা অর্জন করলো। অন্ততঃ এর থেকে বোঝা গেল যে বিশ্বের সাধারণ মানুষ আবার নৈতিক নিষ্ঠা কামনা করছে।

ভার্জিনিয়া উল্‌ফ চেতনা প্রবাহী উপন্যাস লেখার এক সিদ্ধহস্ত লেখিকা; যুদ্ধের সময় তাঁর মৃত্যু ইংলণ্ডে উপন্যাসজগতে একটি বিরাট শূন্যের সৃষ্টি করেছে। তাঁরই সময়ে তাঁর অনুসরণে এলিজাবেথ টেলর At Mrs Sippincot's এবং 'pauadian' উপন্যাস দুটিতে চেতনা প্রবাহের সার্থক ব্যবহার করেছেন। উল্‌ফের মৃত্যুর পর উল্লেখযোগ্য নারী ঔপন্যাসিক বলতে একমাত্র এলিজাবেথ বোয়েনের নাম করা যেতে পারে।

রাজনীতির কূটচক্র আবার বিশ্বকে একটি প্রলয়ের মুখে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। একটি শিশু তার জন্মের পর থেকেই তার পিতা ও মাতার মুখে আশঙ্কার ছায়া দেখছে। মানসিক জটিলতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য শৈশব থেকেই তার বিশ্বাসের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিচ্ছে। যুদ্ধোত্তর কালে এই শিশু মনস্তত্ত্ব উপন্যাসের অন্যতম বিষয় বস্তু হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ আমি Rumer Godden এবং The Rivers উপন্যাসটির নাম করছো। অবশ্য তার আগে শিশুমনস্তত্ত্ব নিয়ে যে উপন্যাস লেখা হয়নি তা নয়, ভিক্টোরিয়ান যুগে চার্লস ডিকেন্সের 'অলিভার টুইষ্ট' অথবা 'ডেভিড কপারফিল্ড' তো এই ধরণেরই উপন্যাস। আর হার্ডির জুড দি অবস্কিওর'এ 'ফাদার টাইম' তো একটি মর্মস্পর্শী চরিত্র। হার্ডির পাঠক মাত্রেরই কানে সেই করুণ সুরটি ধ্বনিত হবে "I have done it, because we are too merry" তবে মনস্তত্ত্বের নিত্যনূতন আবিষ্কারের ফলে বর্তমান শিশু মনস্তত্ত্বের ধারা এবং তার সমীক্ষার পরিবর্তন ঘটেছে তা অবশ্যস্বীকার্য।

অবক্ষয়ের গ্লানি, সংশয়ের দৃষ্টি মানুষের মনকে আবার পীড়িত করে তুলছে। সমস্যার সংখ্যাধিক্য ও অভিনবত্ব মানুষের মনের জটিলতা বাড়িয়ে তুলেছে। তবু আমরা আশা করি যে এর থেকে আমরা মুক্তি পাবো। মানুষের বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয়ের দাবীও স্বীকৃত হবে। উপন্যাস বাস্তবধর্মী হবে এবং জীবনকেও যথাযথ প্রকাশ ক'রবে একটি সুস্থ বিশ্বাসকে ভিত্তি করে। সে বিশ্বাস যদি ঈশ্বরকে নাও হয় আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু মানুষের ওপর মানুষের পারস্পরিক বিশ্বাসের মর্যাদা যেন ক্ষুণ্ণ না হয় এই আমরা কামনা করি।

প্রবন্ধটি লেখার সময় যে সব বইএর সাহায্য নিতে হয়েছে তার তালিকা দেওয়া হ'ল।

১। The English Novel by Walter Allen

২। A History of English Literature by Legouis and Cazamian.

৩। A History of English Literature by Compton Rickett.

৪। The Literature of the Victorian Era by Hugh Walker.

৫। An outline of psychology—William Mcdonall.

৬। Principles of psychology—William James.

দক্ষিণী অ্যাং

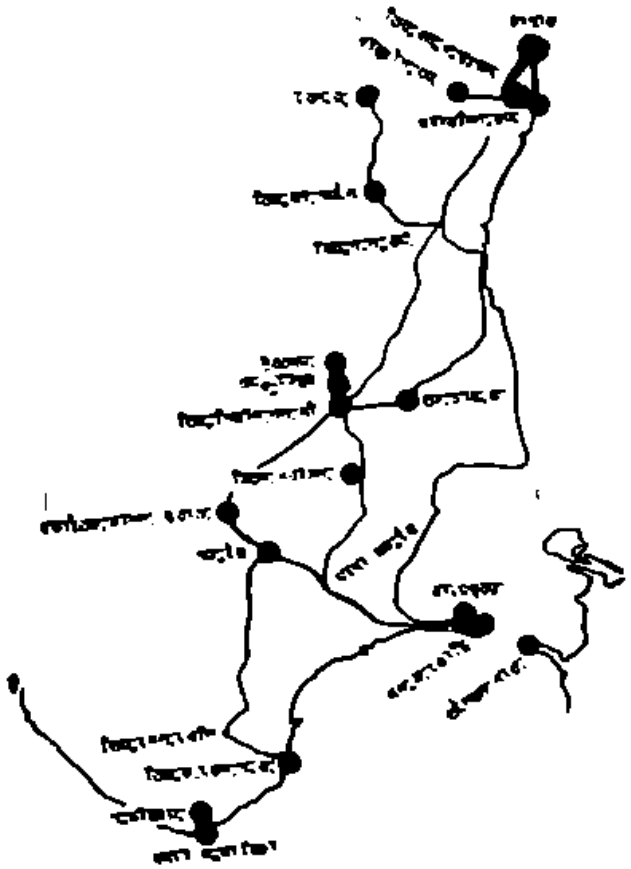

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

: ইঙ্‌গে—ইঙ্‌গে ম্যাড্রাস্ আরম্বি কিরতু !

দুজন যাত্রী সোল্লাসে বলে উঠলেন।

কলকাতা থেকে ৯৮৮ মাইল দূরে—

হাওড়া—মাদ্রাজ মেল্ ট্রেনটা দুড়দুড় করে বেরিয়ে গেলো একটা ছোট স্টেশনকে উপেক্ষা করে।

মেল্ এখানে থামে না। কারণ, 'তড়া' কোনও বিশেষ স্টেশন নয়।

গাড়ীর মাদ্রাজী যাত্রীদের কাছে কিন্তু স্টেশনটির একটি বিশেষত্ব আছে। এই তড়ার পর থেকেই শুরু হলো মাদ্রাজ প্রদেশের সীমানা। তাই তুজন অমন করে চেঁচিয়ে উঠলেন : ইঙ্‌গে—ইঙ্‌গে ম্যাড্রাস্ আরম্বি কিরতু !—এখান থেকে,—এখান থেকে ম্যাড্রাস্ আরম্ভ হলো ! ওঁরা নিশ্চয় বহুদিন প্রবাসে ছিলেন। অনেকদিনের না-দেখা পিতৃপিতামহের বাসভূমির সীমানায় পৌঁছতেই তাই এই উল্লাস।

মাদ্রাজী যাত্রীদের মধ্যে জিনিসপত্র গুছিয়ে নেওয়ার তাড়া পড়ে গেলো। যদিও মাদ্রাজ পৌঁছনোর তখনও চুয়াল্লিশ মাইল বাকী।

ঘরমুখো হলে সব প্রাণীরই যে কি ব্যস্ততা ! কি চাঞ্চল্য !

ঘণ্টা দেড়েক পরে ট্রেন্ পৌঁছলো মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল্ স্টেশনে। তখন সকাল সাড়ে সাতটা।

অনেক দিনের কল্পনায় দেখা মাদ্রাজ আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ালো। স্নায়ুতে স্নায়ুতে কি যেন এক আশ্চর্য অনুভূতি, এক শিহরণ বইলো !

সে শিহরণ মাদ্রাজ নগরীর সঙ্গে আশু পরিচয়ের সম্ভাবনায়,—দ্রবিড় ভূমিতে প্রথম পদক্ষেপের।

স্টেশনের সম্মুখে মাদ্রাজ জেনারেল্ হসপিটাল্। বাঁ দিকে Wall tax Road,—অল্পবিস্তর সাধারণ ভদ্রলোকদের

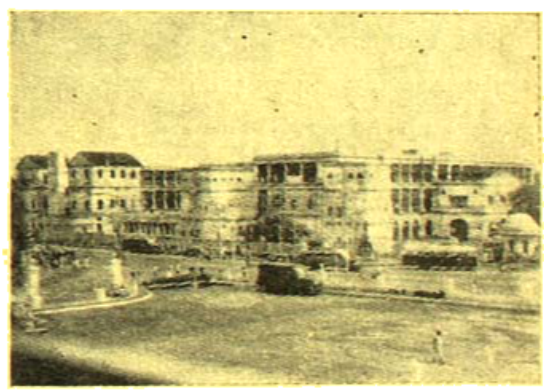

জেনারেল্ হসপিটাল্—মাদ্রাজ

ও বহিরাগতদের আশ্রয়ের ঘাঁটি। হোটেল-পাড়া বলা যেতে পারে। ডানদিকের গা ঘেঁষে রয়েছে নর্থ বিচার।

জলধারাটি কোকরেল খাল বলে পরিচিত। তার ওপরের সাঁকোটা পেরিয়ে, ডানদিকে একটু হাঁটলেই যে এলাকা, তার নাম পার্ক টাউন। স্টেশনের সামনে থেকে শুরু হয়েছে মাদ্রাজ শহরের দীর্ঘতম রাজপথ,—পুনমলি হাই রোড্। পথটি পার্ক টাউন ভেদ করে সোজা পশ্চিমে এগমুর, • বেরপরি ইত্যাদি হয়ে চলে গেছে শহরতলির পুনমলি (পুনৈ মল্লি) পর্যন্ত। যেখানে সপ্তদশ শতাব্দীতে ছিল এই অঞ্চলের শাসক নায়কবংশের বাস, আর পরবর্তীকালে বৃটিশ সেনার গ্রীষ্মাবাস।

পুনমলি হাই রোড্-এর ওপর, পার্ক টাউন অঞ্চলে, মাদ্রাজের দ্বিতীয় হোটেল-পাড়া।

ওখানেরই এক লজিঙ্ হাউস্-এ আশ্রয় ঠিক হলো। ছোটখাটো লজিঙ্ হাউসটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খাবারের ব্যবস্থা খুবই ভাল। মাদ্রাজ প্রদেশের অখ্যাত সব মফঃস্বল শহরেও লজিঙ্ হাউসগুলির পরিচ্ছন্নতা এবং জল সরবরাহের ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। তুলনার কথা উঠলে বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, দেশীয় হোটেল ও যাত্রী-নিবাস চালানোয় দক্ষিণাপথ উত্তর ভারতের চেয়ে অনেক বেশী নিপুণ। বিশেষ করে, মালাবার উপকূলের উডুপির ব্যবসায়ীরা।

আর সুখ্যাতি করতে হয় মাদ্রাজ রাজ্যের রোড্‌ওয়েজ বা পরিবহন ব্যবস্থার এবং বৈদ্যুতিকীকরণের।

লজিঙ্ হাউস্-এর এক এজেন্ট্ আমায় স্টেশন থেকে পাকড়াও করে নিয়ে গিয়েছিলেন। কুলি বা অটো-রিক্‌শওলার সঙ্গে কথা বলা ও দর দস্তুর করার ভার তখন পর্যন্ত কোন অসুবিধা হয়নি।

লোকটি চলে যেতেই বুঝতে পারলাম, কোথায় এসেছি। হোটেল-এর বয়রা হিন্দী বা উর্দু কোনটাই জানেনা; ইংরেজীর তো প্রশ্নই ওঠেনা। কলকাতায় কিন্তু শুনেছিলাম মাদ্রাজ মুলুকে ইংরেজীর ছড়াছড়ি,—কুলি, বন্ধুর, রিক্‌শওলা, হোটেল বয্ সবাই নাকি ইংরেজীর তুবড়ি ছোটায়!

প্রকৃত চিত্র অর্থাৎ আসল পরিস্থিতি কিন্তু ভিন্ন। খাস মাদ্রাজ শহরের অনেক হোটেল-এ সামান্য ইংরেজী জানা চাকর বাকর থাকলেও, মফঃস্বল শহরে ওরা একেবারেই দুষ্প্রাপ্য। তবে, বড় বড় শহরগুলোর সমাজের তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর নাগরিকরাও কিছু কিছু ইংরেজী বলতে পারেন।

ঐ শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে কৃশ্চিয়ান্‌দের সংখ্যা যথেষ্ট থাকায় এবং তাঁরা বিদেশীদের বিশেষ সংস্পর্শকামী হওয়ায় ও ধর্মকর্মে চার্চ্‌এর যাজকদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে, কিছু না কিছু কথা ইংরেজী অবশ্যই তাঁদের আয়ত্তাধীন। এই কারণেই, মনে হয় সমাজের সর্বশ্রেণীতে ইংরেজী জানা লোকের আধিক্য। বস্তুতঃ, এঁদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজী লিখতে পড়তে পারেন না। রিক্‌শ চালনা ইত্যাদিতে নিযুক্ত অনেকেই ex-servicemen বা প্রাক্তন সৈন্য হওয়ায়, ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী বলতে পারে।

যাই হোক, ভাগ্যক্রমে আমাদের লজিঙ্ হাউস-এ ইংরেজী জানা একজন কৃশ্চিয়ান্ বয্ ছিল।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম এবং কলকাতা থেকে এ পর্যন্ত একটানা দুদিনের ট্রেণ যাত্রার জমে ওঠা মালিন্য মুক্তির কাজে বাজলো বেলা সাড়ে দশটা।

অতঃপর এক রাউন্ড কফি পানান্তে বেরিয়ে পড়লাম • এল্‌কমপুর স্টেশন-এর উদ্দেশ্যে, তথাকথিত শাপ্‌পাড়ুর খোঁজে।

এল্‌কম্‌পুর্ মাদ্রাজ শহরের দ্বিতীয় রেলস্টেশন আমাদের শিয়ালদহের মত। মাদ্রাজ শহরের দক্ষিণে ভারতভূমির যেখানেই যেতে হোক না কেন, তার গেট্‌ওয়ে বা দ্বারস্বরূপ এই এল্‌কম্‌পুর্,—মিটার গেজ রেলপথের টার্মিনাস্।

• ব' অক্ষরটি অন্তস্থ ব। উচ্চারণ 'ওঅ'। এই রচনার সর্বত্র অন্তস্থ ব বোঝাতে ব' লেখা হয়েছে।

তমিল ভাষায় র এবং ল দুটি। দ্বিতীয় রটির উচ্চারণ র+হ এর মত। দ্বিতীয় লটির উচ্চারণ অনেকটা ড় এর মত। অক্ষর দুটি বোঝাবার জন্য র' ও ল' লেখা হয়েছে।

• কথাটির অর্থ আহার।

† ইংরেজী মাধ্যমে স্থানটি এগ্‌মোর নামে পরিচিত। এই রচনায় উল্লিখিত স্থানগুলির নাম, তমিল্ লিপিতে লিখিত নামের অনুসরণে করা হয়েছে।

আরও দক্ষিণে পা'ড়ি দেওয়ার সম্বন্ধে গোটা কয়েক জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে নিয়ে স্টেশনের কাছাকাছি একটা Brahmin's Hotel-এ ঢুকে পড়লাম।

উত্তর ভারতে আগের দিনে রেল স্টেশনে 'হিন্দু চা' হাঁক দিয়ে চা বিক্রির প্রথা ছিল। স্বাধীনতার পর ওই 'হিন্দু চা' ইত্যাদি বলার রীতি তুলে দেওয়া হয়েছে। মাদ্রাজ প্রদেশের সর্বত্র কিন্তু এখনও Brahmin's Hotelই শুধু নয়, Brahmin's Lunch Home, Brahmin's Coffeeclub ধরণের ঘোষণা দিয়ে ব্যবসা চলছে। পরিবর্তে Vegetarian এবং non-vegetarian করলেই যেন ভাল হয়।

মাদ্রাজে আমিষআহার পেতেহলে যেতে হবে মিলিটারি হোটেল-এ। মিলিটারি হোটেল মানে কিন্তু সৈনিকদের হোটেল নয়। ওর অর্থ, আমিষ আহারের আয়োজনযুক্ত হোটেল। আর নয়তো যেতে হবে রেলওয়ে কেটারিঙ্-এ। তাও শুধু ইউরোপীয়ান স্টাইল্-এর কেটারিঙ্ রুম হলে তবেই মিলবে,—দেশীয় হলে নয়।

আমার হোটেলওয়ালার নাম পাড়ু চমৎকার।

বিশুদ্ধ নিরামিষ সব আহার্য। দু রকমের full meal আছে। Half meal বা plate meal নামে সস্তার আর এক রকম ব্যবস্থাও রয়েছে। কুল মীল্-এ খাবার ব্যবস্থা ভালই ছিল। ভাল অর্থে, আহার্যের মান সম্বন্ধে বলছি, দাম আনুপাতিক পরিমাণ সম্বন্ধে নয়। সাতাশি নয়া পয়সাতে পাওয়া গেল পায়সম্, তুবরৈ, পরুপু, বট্‌চারি করি*, রসম্, উরু*কায়্, পাপড়ম্, মোর্, ইরিস্ ও খানিকটা নেয়্। • তমিল্‌ক এই শব্দগুলির অর্থ যথাক্রমে,—ভাত, দাল, দালের সঙ্গে আনাজ ও তেঁতুল দিয়ে পাক করা এক রকম, মটরের তরকারি, তেঁতুলের সঙ্গে লঙ্কা ও মসলা দিয়ে ফোটানো জল, আচার, পাপর, ঘোল, দই ও খানিকটা ঘি। পুলি* ও ভরিয়ল্ অর্থাৎ তেঁতুল ও দই আহার্যের প্রস্তুতিতে বিশিষ্ট স্থানাধিকারী। তেঁতুল প্রায় প্রতিটি পাকেই ব্যবহার করা হয়। ঘিয়ের ব্যবহার কিন্তু নেই বললেই চলে। খাবার যেমনই হোক না কেন, পরিবেশনকারীদের পরিচ্ছন্নতা ও বাসন-পত্রের অবস্থা তৃপ্তিকারক। সবই বাদাম তেলে রাঁধা। কেরল প্রদেশ সংলগ্ন তিরুনেল্‌বেলি ও কন্যাকুমারিকা জেলা ছাড়া মাদ্রাজ রাজ্যের সর্বত্রই রান্নায় অথবা তিল তেলের রান্না। ঐ জেলা দুটিতে নারকেল তেলের পাক প্রচলিত।

আহার শেষে হোটেল থেকে বেরিয়ে দেখি দরজার পাশেই পানের দোকান। এক অভিনব ভাঁতিয়া আকারে খিলি দেখে পরখ করবার ইচ্ছা হলো। কিন্তু,—এ দেশে পানের যে কি নাম তাতো জানা নেই!

আমায় দোকানের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দোকানদার প্রশ্ন করলেন: এন্ন স্বামী?

বুঝতে পারলাম না। ভাবলাম ইংরেজীতে বলবো নাকি?—পানওলার সঙ্গে ইংরেজী বলতে যাওয়া হাস্যকর। অতএব, ইশারায় দেখালাম আমি কোন্ বস্তুর প্রার্থী।

দোকানদার একটা পাতা (পান) হাতে তুলে বললেন: বেত্‌তি বৈআ?

একটা পানের খিলিতে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলাম।

: কিল্‌লিআ?

আমি ইঙ্গিতে সমর্থন জানালাম। দোকানদার এক খিলি পান দিলেন।

বেত্‌তিলৈ-এর অর্থ পান, আর সাদা পান হলো কিল্‌লি। কোন কোন অঞ্চলে বিড়া।

যে পথ দিয়ে এসেছিলাম সেই পথেই ফুটপাথ ধরে এগোতে লাগলাম। সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল একখানা অটো-রিক্‌শ। হাতের ইশারায় তাকে থামিয়ে রাস্তাটা পার হতে গেলাম। যেখানটায় রাস্তা পার হচ্ছিলাম ঠিক সেখানেই ছিলেন এক ট্রাফিক পুলিস। পরণে খাকী হাফ্-প্যান্ট, সাদা শিন্-এর পঞ্জাবী, মাথায় সোলার হ্যাট ও পায়ে চটি। হাতে ছিল তাঁর অপরূপ এক বস্তু যা প্রথমে লক্ষ্য করিনি। নজরে পড়লো রাস্তাটা তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই। তাঁর কাছাকাছি গিয়ে পড়ামাত্র তিনি আমার মুখের সামনে চট্ করে

• ইংরেজী মাধ্যমে শব্দটি 'তামিল' বলে চলিত। অনেকে কিছুটা শুদ্ধ করে 'তমিল' লেখেন। আসলে কথাটি অনেকটা 'তমিল্‌ক' ধরণের। শেষ অক্ষরটি ল নয় ল ও র-এর মিশ্রিত উচ্চারণের একটি অক্ষর।

তুলে ধরলেন একটা গোলাকার চাঁদ,—তাতে লেখা। STOP। ঐ STOP লেখা চাঁদ দেখিয়ে মাদ্রাজ শহরের অনেক জায়গাই যান-বাহন নিয়ন্ত্রণ করেন ট্র্যাফিক্ পুলিস। আমার পক্ষে সে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা!

পুলিস মশাই চাঁদ নামাতেই দৌড়ে গিয়ে অটো-রিক্‌শটায় চেপে সোজা হোটেল।

বেলা পড়ে এলে বেরিয়ে পড়লাম 'মেরিনা'র উদ্দেশে। মেরিনা—উত্তরে ফোর্ট সেণ্ট্ জর্জ্ হতে দক্ষিণে স্যান্ থোম্ পল্লী পর্যন্ত প্রায় তিন মাইল সুসজ্জিত সাগর সৈকতের বিলিতী নাম। স্রষ্টা—বৃটিশ গভর্ণর Sir M. E. Grant Duff। এত সুন্দর এবং এরকম একটানা সৈকত ভারতবর্ষের আর কোথাও নেই। সারা পৃথিবীতে এটি দ্বিতীয় স্থানাধিকারী। মেরিনাই মাদ্রাজ শহরের মুখ্য প্রাকৃতিক দ্রষ্টব্য। ফোর্ট অঞ্চলের মেরিনায় ঘুরে বেড়ানোর বা গাড়ী হাকানোর লোক যথেষ্ট দেখা গেলেও জটলা বা ভিড় বলতে ট্রিপ্লিকেন্ অঞ্চলেই দেখা যায়। রোদ পড়ন্ত হলেই সেখানে হয় জনসমাবেশ। সমুদ্রতীরে আরও একটি জায়গায় জন সমাবেশ হয়। সে জায়গাটি হাইকোর্ট বীচ্ বা হাইকোর্ট-এর কাছের সৈকত।

তবে, ট্রিপ্লিকেনেই হয় সবচেয়ে জমজমাট। মধ্য-বিত্তদের বসতি এই ট্রিপ্লিকেন্। তাই এখানের সৈকতের জমায়তও বিচিত্র!

বেদ, উপনিষদ্ হতে হালের চিত্র-তারকার আলোচনা,—শঙ্কর, রামানুজ, ভিক্কবল্লভ হতে কাদের বউ পালিয়েছে

সাগর সৈকত—মাদ্রাজ

হার সরস ব্যাখ্যান,—জ্যোতিষশাস্ত্র ও অফিসের প্রসঙ্গ,—রাজনীতি ও হোমিওপ্যাথি, সব মিলিয়ে এখানের আকাশ এক বিচিত্র বৈকালিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

ট্রিপ্লিকেন্ নামটি তিরু-অল্লি-কেনি (পবিত্র শালুকের জলাশয়) কথাটির ইংরেজী রূপান্তর।

ট্রিপ্লিকেন্-এর পার্থসারথি মন্দির মাদ্রাজ শহরের প্রাচীনতম দেবস্থান। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে জনৈক পল্লব-রাজ এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মন্দিরের সামনে তেপ্পকুলম্। তেপ্পকুলম্কে সাধারণতঃ পবিত্র পুষ্করিণী বলা হলেও এর প্রকৃত অর্থ জল-বিহারের পুষ্করিণী। দেবালয় সংলগ্ন এই জলাশয়ে বৎসরের কোনও এক সময়ে, পক্ষাধিককাল ধরে, তেপ্পম্ অর্থাৎ ভেলায় চেপে বিগ্রহ জল-বিহার করেন। তাই তেপ্পম্ চলাচলের কুলম্ (জলাশয় এই অর্থে তেপ্পকুলম্)।

বিরাট এক গোপুরম্ মন্দিরটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

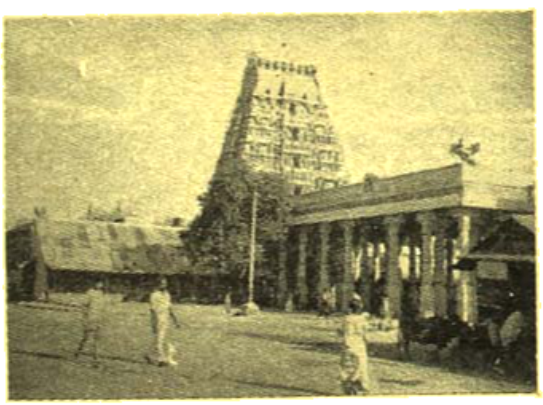

পার্থসারথি মন্দির—মাদ্রাজ

গোপুরম্-শীর্ষে ভাস্কর্যের মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে মহাভারতের নানা উপাখ্যান।

মন্দিরের বিগ্রহ পার্থসারথি,—কৃষ্ণ। প্রস্তরময় রূপ। এ কৃষ্ণের সঙ্গে উত্তরভারতের, বিশেষ করে বাঙলা, উত্তর-প্রদেশ বা গুজরাটের কৃষ্ণমূর্তিগুলির কোনও মিল নেই। সেই সুললিত, নারীসুলভ কমনীয় আকৃতির কৃষ্ণ এখানে বড়ই রুক্ষ! অনেকটা যেন গান্ধারশিল্পের গুম্ফধারী বুদ্ধের অনুরূপ। অবশ্য, রণক্ষেত্রে রথচালক পার্থসারথির এরূপ রুক্ষমূর্তি হওয়াটাই স্বাভাবিক।

দেবস্থানটিতে প্রত্যহই প্রচুর দর্শনার্থীর সমাগম হয়। বিগ্রহের ধাতু নির্মিত একটি অনুকৃতি আছেন। তিনি মাঝে মাঝে উৎসবাদি উপলক্ষে নগর পরিক্রমা করতে যান এবং তেপ্‌পকুলমন্‌-এ জল-বিহার করেন। মূল বিগ্রহ মন্দিরেই থাকেন।

দক্ষিণাপথে প্রায় প্রতি মন্দিরেই রাখা হয় দেবতার দুটি মূর্তি। একটি অচল ও অপরটি চলাচল।

মেরিনা হয়ে, পার্থসারথি দেখে ফিরতে সন্ধ্যা হলো। আঁধারের অঙ্গবাস জড়িয়ে, বৈদ্যুতিক আলোকমালার অলঙ্কারে সেজে, একফালি চাঁদের টিকলি দুলিয়ে, তারার চন্দন বিন্দুতে কপাল ভরিয়ে, নতুন বর্ণে নতুন রূপে আগন্তুকদের সম্মুখীন হলো সুন্দরী নগরী মাদ্রাজ।

দিনের চকলা রাত্রিসমাগমে হয়ে উঠল কিছু মন্থরা।

লজ্‌-এ ফিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে দেখতে গেলাম মূর মার্কেট। বাজারটি কলকাতার হগ্‌ মার্কেট্‌-এর এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। হরেক রকম জিনিসের, মনোহারি সামগ্রীর আড়ত। বিলিতি বস্তুর বেশ প্রাচুর্য।

বাজার থেকে বেরোতেই চোখে পড়লো এক শোভা-যাত্রা। ফুল ও রাংতার নানা অলঙ্করণে সাজানো একটা মঞ্চ বয়ে নিয়ে চলেছেন আটজন। সঙ্গে জন পঞ্চাশ পদযাত্রী। চলেছে অশ্বত্থ পেট্রোম্যাক্স্‌। বাজছে মৃদঙ্গ, বাজছে নাদেস্বরম্‌। 'নাদেস্বরম্‌' দক্ষিণ ভারতের দুটি জাতীয় বাজনা।

মূর মার্কেট থেকে গেলাম রাতের জর্জ টাউন, নেতাজী সুভাষ রোড ও প্যারীজ কর্নার দেখতে। প্যারীজ কর্নার মাদ্রাজের অনেকগুলি বাস্‌ রুট-এর টার্মিনাস্‌।

কলকাতার বাম্বার লরি, কিলবার্ণ কোম্পানী ইত্যাদির মত প্যারী কোম্পানী মাদ্রাজের এক প্রখ্যাত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। এঁদের সবগুলি কলকারখানার সদর দপ্তরটি শহরের একপ্রান্তে ডেয়ার হাউস নামে একটি বাড়ীতে অবস্থিত। ওই বাড়ীটির সম্মুখে গিয়ে বাসগুলি থেমে যায় এবং ওই অঞ্চলটিকেই বলা হয় প্যারীজ কর্নার।

নেতাজী সুভাষ রোড, ব্রডওয়ে ও এস্‌প্ল্যানেড্‌ সমেত সারা জর্জ টাউনটাই ঝলমল করছিল আলোয় আলোয়। বৈদ্যুতিক আলোর বন্যেই পর্যাপ্তি,—বিজ্ঞাপনও চমৎকার। এই জর্জ টাউন অঞ্চলই আদি মাদ্রাজ।

আজকের দিনের বেলার লক্ষ মানুষের কলরোল, পণ্য সম্ভারের লেন দেন, যানবাহনের ছুটাছুটি,—এক কথায় কর্মচাঞ্চল্যে প্রাণময়ী যে মাদ্রাজ,—তার উৎপত্তি এই জর্জ টাউন হতেই। সওয়া তিন শ' বছর পূর্বে এই শহরের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

মাদ্রাজ পত্তনম্‌ বা মাদ্রাজ পটম্‌ ছিল করোমণ্ডল উপকূলের এক অখ্যাত ছোট গ্রাম,—জেলেদের বসতি। সংলগ্ন গ্রাম ছিল তণ্ডৈয়ার্‌, এলুরপুর, মরিলপুর, তিরু অল্‌লি-কেণি, ইত্যাদি। মাদ্রাজ পটম্‌-এর সঙ্গে ওদের জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান মাদ্রাজ শহরের। ওরা হয়ে গেছে মাদ্রাজ শহরের এক একটি পল্লী মাত্র।

তবে, কলকাতা যেমন সুতানুটি, গোবিন্দপুরের নাম মুছে ফেলেছে তা করতে পারেনি মাদ্রাজ। উক্ত গ্রামগুলির নাম আজও বেঁচে রয়েছে।

মাদ্রাজ শহরের দেশীয় নাম—শেন্‌নৈ পটম্‌ বা শেন্‌নৈ পত্তনম্‌। আর মাদ্রাজ প্রদেশের—তমিলনাড়ু।

১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকের প্রতিষ্ঠান ইষ্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসার উদ্দেশ্যে অন্ধ্র রাজ্যের মসুলিপটম্‌-এ পদার্পণ করে এবং একটি এজেন্সী অফিস খোলে। কয়েক বছর পরে নেল্‌লুরের কাছে অরম্‌ গামম্‌-এ স্থাপন করে এক সাব-এজেন্সী।

প্রথম কয়েক বছর অরম্‌ গামম্‌ কেন্দ্রের ব্যবসা খুবই ভাল চলে। কিন্তু পরে স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে খাজনা নিয়ে গোলযোগ বাধায় ব্যবসাটি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। মসুলিপটম্‌-এর ব্যবসার অবস্থাও ইতিমধ্যে চূড়ান্ত খারাপ হয়ে ওঠে। অরম্‌ গামম্‌ কেন্দ্রের কর্ণধার ছিলেন ফ্রান্সিস্‌ ডে। তাঁর ওপর তখন কোম্পানীর বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের উপযুক্ত এক নতুন স্থান নির্বাচনের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ আসে।

ফ্রান্সিস্‌ ডে এসে উপস্থিত হন অরম্‌গামম্‌ হতে আরও দক্ষিণে, মাদ্রাজ পটম্‌-এ। স্থানীয় ভূস্বামী পুনৈ মল্লির

বেঙ্কটাদ্রি নায়কের কাছ থেকে ফ্রান্সিস্ উপযুক্ত দরবার মাদ্রাজ পট্টন্-এর ইজারা বন্দোবস্ত করে নেন। তাদের সেই বাসস্থানকে পাকা করে নেওয়ার জন্য ছোটেন চন্দ্রগিরিতে।

চন্দ্রগিরি বর্তমানে বেলিগুন্টা হতে কাট্পাড়ির পথে অন্ধ্র-মাদ্রাজ সীমান্তের একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম মাত্র। তখন কিন্তু ছিল চন্দ্রগিরির গুরুত্ব ও প্রসিদ্ধি। কারণ, এখানেই বাস করতেন এ অঞ্চলের ভূপতি, দ্বিতীয় রঙ্গ। ইনি ছিলেন হৃত-গৌরব বিজয়নগর রাজগণের এক উত্তরাধিকারী। ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সিস্ তে এঁরই কাছ থেকে মাদ্রাজ পট্টন্-এর পাকা অধিকার বন্দোবস্ত করে নেন। ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক ইউরোপীয় ভদ্রলোক লিখেছেন :

'There is no little interest in the thought that it was the Raja of Chandragiri that delivered the deed of possession to Mr. Francis Day.

The Raja was an obscure representative of a magnificient Indian Empire of the past; Mr. Francis Day was an obscure representative of a magnificient Indian Empire that was yet to be; and the document that the Raja handed over to Mr. Francis Day was in reality a patent of empire, transferred from Vijianagar to Great Britain, It was at Chandragiri that the British Empire in India was begotton, it was at Madras that the British Eampire was born.

মাদ্রাজই ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্য স্থাপনের মূল কেন্দ্র,—সুরাট নয়, হুগলী নয়, পলাশীও নয়।

যদিও ইংরেজ বণিক্ মসুলিপটন্-এ প্রথম বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করেছিল এবং মাদ্রাজের বহুপূর্বেই তারা সুরাটে উপস্থিত হয়েছিল কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই শুধু ফ্যাক্টরী স্থাপনের অনুমতিই তারা পেয়েছিল। তাদের প্রথম ভূস্বামিত্ব লাভ ঘটেছিল মাদ্রাজেই। কালক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষ তারা করতলগত করেছিল। ভারতবর্ষের অধিকারী হয়ে বৃটিশ রাজ্য হয়েছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যে উন্নীত। তাই উক্ত ইংরেজ ভদ্রলোকের উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ।

পাট্টা লাভের পর মাদ্রাজপটন্-এর দমুদ্রতীরে স্থাপিত হলো কোম্পানীর অফিস ও কর্মচারীদের বসতি। ব্যবসা চললো বিলিতী কাপড় আমদানীর, আর ভারতীয় মসলা ও অন্যান্য কাঁচা মাল রপ্তানির।

তারই সঙ্গে আরম্ভ হলো তাদের বসতিটির fortification,—এক দুর্গের নির্মাণ।

ফোর্টকে ঘিরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগলো এক নগর। সাগরপারের শ্বেতমানুষরা দেখাতে লাগলো নতুন প্রণালীর জীবনযাত্রা, ভোগবিলাস,—নতুন নতুন ভাবধারা! এদেশের লোকদের জাতিভেদ বোধের মত সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি তাদের নেই। তবে, গায়ের রঙ বিচারে সাদা আর কালো মানুষের মধ্যে পার্থক্য বিধানটা বোধহয় তাদের ঈশ্বর সমর্থিত বলেই, তাদের স্বদেশীয় ও এতদ্দেশীয় জনগণের মধ্যে একটা সীমারেখা টেনে সৃষ্টি হলো White Town এবং Black Town নামে বাসিন্দাদের দুই পৃথক্ অংশ। একটা প্রাচীর দিয়ে কালা ও ধলাদের বসবাসের সীমানা চিহ্নিত হলো।

শুধু তাই নয়, ধলারা হলো Gentlemen, আর কালাদের আখ্যা হলো Gentoos।

আজকের জর্জ টাউন এলাকাই সেদিনের সেই ব্ল্যাক্ টাউন। হোয়াইট টাউন পাকা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল। ব্ল্যাক্ টাউন-এ ছিল মাটির দেওয়াল। ১৭৩৬ সালে ফরাসীরা যখন ইংরেজদের হাত থেকে মাদ্রাজ কেড়ে নেয় তখন তারা শুধু ওই কাঁচা দেওয়ালটিই নয়, কাল আদমীদের বসতিটি পর্যন্ত ধ্বংস করে ফেলে। তিন বছর পরে এক সন্ধির ফলে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী ফরাসীদের কাছ থেকে মাদ্রাজ ফিরে পায়। তখন তারা কাল আদমীদের পাড়াটিকে একটি পাকা দেওয়াল দিয়ে সুরক্ষিত করার কথা ভাবতে থাকে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে ঐ মর্মে প্রস্তাব পেশ করে। কোম্পানীর ইংলণ্ডস্থিত ডাইরেক্টররা কিন্তু প্রথমে প্রস্তাবটি একেবারেই গ্রহণ করতে চান না। শেষে রাজী হন যে, দেওয়াল তৈরী করা যেতে পারে কিন্তু তার ব্যয়ভার বহন করতে হবে

কালো আবহাওয়ার। তাই তাদের ওপর Wall Tax বসাবার আদেশ হয়। দেশীয় লোকদের প্রতিবাদের ফলে ও অন্যান্য নানা কারণে শেষ পর্যন্ত অবশ্য আদেশটি কার্যকরী হয়নি। ব্ল্যাক টাউন-এর পশ্চিম দিকের সীমা-রেখাটিই বর্তমান Wall Tax Road :—মাদ্রাজ সেন্ট্রাল স্টেশনের গা ঘেঁষে যেখানে গড়ে উঠেছে হোটেল-পাড়া। পুরনো মাদ্রাজের আর ইংরেজ শাসককুলের বণিক্-বুদ্ধির পরিচয় বহন করছে Wall Tax Road।

মাদ্রাজ শহরের মাঝ দিয়ে এঁকে বেঁকে বইছে কুভম্ নদী। অধুনা মোহানায় চড়া পড়ায় শুধু বর্ষাতেই জলস্ফীতি হলে সমুদ্রের সঙ্গে কুভমের সংযোগ ঘটে ও জলে প্রবাহ আসে। বাকী সময় এটি প্রায় মজা নদী।

কুভম্ যেখানে সমুদ্রে মিশেছে তার দক্ষিণে ছিল ভিরু-অল্লি-কেণি গ্রাম ও উত্তরে মাদ্রাজ পটম্। কুভম্-এর মোহনার কাছে, দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে কুভম্-এর সীমারেখায় পরিবৃত হয়ে গড়ে উঠে ছিল ফোর্ট সেণ্ট জর্জ বা হোয়াইট্ টাউন। ব্ল্যাক টাউন ছিল হোয়াইট্ টাউন এর উত্তরে।

শ্বেতকায়দের সংখ্যা বাড়তে থাকায় হোয়াইট টাউনকে সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন দেখা দিলো। তাই কুভম্-এর গতিপথ কিছুটা দক্ষিণে সরিয়ে দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে শহরকে বাড়ানো হলো। পূর্বদিকে সমুদ্র বেশ কিছুটা সরে গিয়ে ব্রিটানিয়ার সন্তানদের জন্য আরও বাসভূমির ব্যবস্থা করে দিলো।

কিন্তু তাতে তখন আর কোম্পানীর তৃষ্ণার নিবৃত্তি হলো না।

মাদ্রাজ পটম্ অধিকারের বিশ বছরের মধ্যেই কোম্পানী গোলকোণ্ডার নবাবের এক প্রতিনিধির কাছ থেকে নাম মাত্র খাজনায় ভিরু-অল্লি-কেণির সনদ ব্যবস্থা করে নিলো। কয়েক বছর পরে গোলকোণ্ডার নবাব বংশের রাজত্ব শেষ হলে ভিরু-অল্লি-কেণি হলো সম্পূর্ণ-রূপে কোম্পানীর কুক্ষীগত।

তারপর গভর্ণর Elihu yale-এর চেষ্টায় কোম্পানী, সম্রাট্ আওরংজেবের কাছ থেকে তণ্ডৈয়ার, পরুর বাকম্ এবং এলুরুপুর্ গ্রাম তিনটির সত্ত্বাধিকার লাভ করলো।

আওরংজেবের উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হলো মুত্তুগন্ বাকম্। গোলমাল বাধলো বেংপিরি নিয়ে।

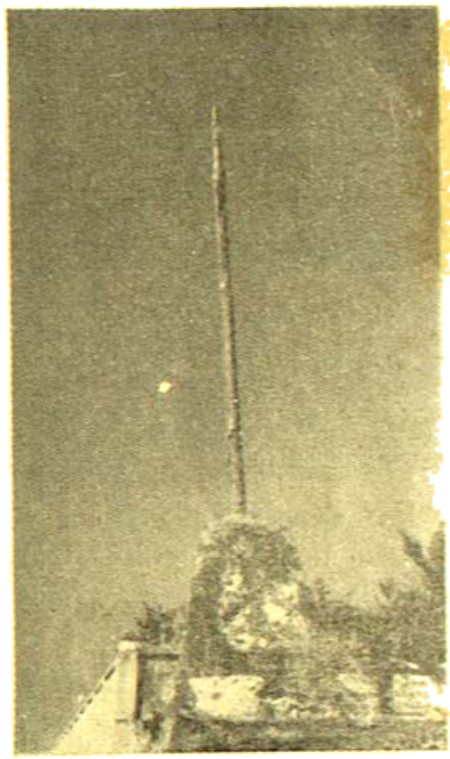

সেণ্ট্ টমাস্ যেখানে প্রথম ভারতের মাটিতে পদার্পণ করেন—মাদ্রাজ

অনেক চেষ্টার পর আর্কাট্-এর নবাব মোহম্মদ সৈয়দের কাছ থেকে ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে বেংপিরি মাদ্রাজের অঙ্গীকৃত হলো।

স্যান্ থোম্ বা মইলাপুর অঞ্চলই সবশেষে কোম্পানীর হাতে আসে। এখন স্যান্থোম্ বলতে মইলাপুরেরই একাংশকে বোঝায়। সে সময় কিন্তু মইলাপুর ও স্যান্-থোম্-এর স্বাতন্ত্র্য ছিল।

মইলাপুর্ অতি প্রাচীন গ্রাম। স্যান্ থোম্ ছিল তারই সংলগ্ন সমুদ্রকূলবর্তী পর্তুগীজ বসতি। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে যীশুর সেণ্ট টমাস্ মাদ্রাজ হতে ন' মাইল দূরে, বর্তমান Mount of Saint Thomas-নামক স্থানে নিহত হন। তাঁকে সমাহিত করা হয় মইলাপুর-এর সমুদ্রতীরে। পর্তুগীজরা ভারতে এসে মইলাপুর-এ সেণ্ট টমাস্-এর ওই

সেন্টথোম কার্থ—মাদ্রাজ

সমাধিটি খুঁজে বার করে এবং সমাধিস্থলে একটি মঠ স্থাপন করে। কালক্রমে, মঠটিকে ঘিরে যে পর্তুগীজ বসতি গড়ে ওঠে তারই নাম—স্যান্ থোম্।

ইংরেজদের উপস্থিতির বহু পূর্বে পর্তুগীজরা একটি দুর্গ ও প্রাকার দিয়ে নিজেদের ঐ বসতিটিকে মহিলপুর্-এর বাকী অংশ থেকে পৃথক্ করে। মহিলপুরে তাই স্যান্ থোম্ ছিল যেন ইংরেজদের হোয়াইট টাউন।

স্যান্ থোম্ সমেত সমগ্র মহিলপুর্-এর জন্য ইংরেজদের বহুদিন ধৈর্য ধরতে হয়েছিল। পর্তুগীজদের কাছ থেকে এক সময় গোলকোণ্ডার নবাব জায়গাটি কেড়ে নেন। করাদীরা নবাবের কাছ থেকে নেয় মহিলপুর-এর কর্তৃত্ব। দু' বছর পরে ডাচ্দের সহায়তায় নবাব করাদীদের কাছ থেকে মহিলপুর্ পুনরুদ্ধার করেন। ইংরেজদের কূট-পরামর্শে নবাব স্যান্ থোম্-এর দুর্গটি ভূমিসাৎ করে দেন ও মহিলপুর্ নীলামের আদেশ দেন।

ইংরেজরা আসেন নীলামে মহিলপুর্ কিনে নিতে, কিন্তু নবাবের কর্মচারীদের উৎকোচ দিয়ে তাদের সহায়তায় এক মুসলিম ধনী মহিলপুর্ এর ইজারা ব্যবস্থা করে নেন। পরবর্তীকালে, এটি পুনৈমল্লির হিন্দু স্বামীর হস্তগত হয়। পর্তুগীজরা আবার এর পাট্টা লাভ করে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে অওরংজেব গোল-কোণ্ডার নবাবদের উচ্ছেদ সাধন করেন। মহিলপুর্ হতে পর্তুগীজদের বিতাড়িত না করলেও অওরংজেব তাদের এক মুসলিম সুবাদারের কর্তৃত্বাধীন করে রাখেন। অওরংজেবের মৃত্যুর পর আর্কাট-এর নবাব স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মহিলপুর্ তাঁর অধিকারে আসে। পান্-ডিচ্চেরি (পণ্ডিচেরি) হতে ছুটে আসেন ডুপ্লে,—স্যান্-থোম্-এর আশায়। কিন্তু ইংরেজরা তার আগেই আর্কাট-এর নবাবকে প্রভাবিত করে স্যান্ থোম্ তথা মহিল-পুর্ অধিকার করে বসেন।

এই ভাবে বর্তমান মাদ্রাজ শহরের কলেবর রচনা সম্পূর্ণ হয়।

এ সবই ইতিহাসের কথা।

সে দিনগুলি কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। শুধু মাঝে মাঝে ইতিহাসের অন্বেষণকারীদের আকর্ষণের ফলে উদ্ধার মত অন্ধকার চিরে বেরিয়ে আসে মাত্র।

রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গিয়েছিল মাদ্রাজের ইতিবৃত্ত ঘাঁটতে ঘাঁটতে। দুচোখ ভরে নেমে এসেছিল ঘুমের দেশের হাতছানি। আলোর সুইচটা টিপে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। চললাম সুপ্তি লোকে।—

ভাবসী রাত্রিও চললো। চললো আলোকের অভিসারে। নির্দিষ্ট ক্ষণে, নির্দিষ্ট স্থানে, সে হবে আলো-কের অনুসারিনী,—অঙ্গীভূতা।

শেষ রাত হতে বৃষ্টি নামলো।

ভোর হতেই কিন্তু বৃষ্টি থেমে গেলো। আকাশ হয়ে উঠলো পরিষ্কার, সূর্যকরোজ্জ্বল!

মাদ্রাজ রাজ্যের বহু স্থানেই বৃষ্টির এই চমৎকারিত্ব। বিশেষ করে, সমুদ্রোপকূলবর্তী জায়গাগুলিতে।

রুম্-বয্ বথ্মুথম্ এলো।

বথ্মুথম্ ক্রশ্চান, রোমান্ ক্যাথলিক।

ইংরেজীতে প্রশ্ন করলো: Want anything sir?

তাকে অবাক্ করে দিয়ে বললাম: আম্। ইরুন্দু মেন্দু বড়ে, ওর কাফি, কোকুম্ শর্করৈ কোডু। এক-গাল হেসে বথ্মুথম্ চেঁচিয়ে উঠলো: তমিলরু তেরিয়ুম্-আ? তমিলরু জানেন?

বললাম: তেরিয়াদে।—জানি না।

বথ্মুথম্ হাসতে লাগলো। সে বুঝতে পেরেছে যে, ঐ টুকুই আমার দৌড়। ধরে ফেলেছে যে, কারও কাছ থেকে শিখে এসেছি।

ব্যাপারটাও তাই।

আগের দিন ইংরেজীতে লেখা তমিলদের ভাষা শিক্ষার একটা বইও অবশ্য যোগাড় করে এনেছিলাম। তবে, তার কিছু আয়ত্ত হওয়া তো দূরের কথা, বিন্দু-বিসর্গও বোধগম্য হয়নি।

প্রাতরাশ সেরে ছুটলাম রেট্ ট্রান্সপোর্ট-এর অফিসে। প্রতি রবিবারে সরকারী স্পেশাল্ বাস্ টুরিষ্টদের নিয়ে যায় মহাবলিপুরম্।

নির্দিষ্ট তারিখের দুদিন মাত্র বাকী ছিল। তবু বরাভয়ে বাদন পেয়ে গেলাম।

পরের প্রোগ্রাম ছিল মাম্বলম্ যাওয়া।

মাদ্রাজ বীচ্ ষ্টেশন থেকে পশ্চিম কিলোমিটার দূরের তাম্বরম্ পর্যন্ত ইলেকট্রিক্ ট্রেন্ চলে। বীচ হতে মাম্বলম্ সপ্তম ষ্টেশন। এই মাম্বলম্ অঞ্চলেই সর্বাধিক বাঙ্গালীর বাস।

মাদ্রাজের ছায়া-চিত্র শিল্পে কিছুসংখ্যক বাঙ্গালী আছেন। এঁদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী—শ্রীযুক্ত হরি চন্দ। ইনি ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় মেক্-আপ্ আর্টিষ্ট বা রূপ-সজ্জাকর। শুধু হরিবাবু নামেই তিনি পরিচিত।

হরিবাবুর বক্তব্যের একটি প্রধান প্রত্যক্ষ করলাম। তখন নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান নিয়ে একটি ছবি তৈরী হচ্ছিল। হরিবাবুর বৈঠকখানায় বসে তাঁর সঙ্গে কথা কইছি এমন সময়ে নলরাজের ভূমিকায় অভিনয়কারী ব্যক্তিটি এসে উপস্থিত হলেন। খুব সুঠাম চেহারা ভদ্রলোকটির।

হরিবাবু তাঁকে নিয়ে বাড়ীর ভিতরে নিজের লেবরেটরীতে গেলেন। মাত্র দশমিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন যে বীভৎস লোকটিকে নিয়ে, তাঁকে দেখে বোঝবার উপায় ছিল না যে, তিনিই খানিক আগে দেখা সেই ভদ্রলোকটি। নলরাজ চলে গেলে প্রায় বেশ ঘণ্টা ধরে নানা আলোচনা হলো হরিবাবুর সঙ্গে। পরিচয় হলো চিত্রশিল্পে সংশ্লিষ্ট আর একজন গুণী ব্যক্তি শ্রীনিমাই ঘোষের সঙ্গে।

মাদ্রাজের বাঙ্গালীরা শুধু যে, ছায়া-চিত্র শিল্পে বা সরকারী চাকরিতেই আছেন তা নয়। অধ্যাপনায়, চিকিৎসা ক্ষেত্রে, ললিতকলায় এবং ব্যবসাক্ষেত্রেও বাঙ্গালী আছেন। সুধীজন মধ্যে ডঃ বিমানবিহারী দে এবং ললিতকলায় শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর নাম সুখ্যাত। *

বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের মধ্যে এমন সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বর্তমান যাঁরা মাদ্রাজে বেশ পুরানো। বাঙ্গালী পরিচালিত দুএকটি ছোট শিল্পও আছে।

ওলটেরার পেট্-এ রাজনারায়ণ বসু নামে এক ভদ্রলোক এই শতাব্দীর প্রথম দশকে চিরুণীর কারখানা খুলেছিলেন। ঐ কারখানার উৎপাদনের বিশেষ প্রসিদ্ধি হয়েছিল।

মাম্বলম্ থেকে ফিরে বাকী দিনটায় দেখা হলো গৌড়ীয় মঠ, ফোর্ট সেণ্ট্ জর্জ, লাইট হাউস, মাউণ্ট রোড অঞ্চল (অর্থাৎ কলকাতার চৌরঙ্গী এলাকা) এবং ফুলের বাজার। রামকৃষ্ণ মিশন ও গৌড়ীয় মঠ ছাড়া মাদ্রাজে কলকাতার সুপরিচিত আর একটি ধর্মীয় সংস্থা রয়েছে—ব্রাহ্ম সমাজ।

পরদিন সকালে দেখতে গেলাম মযিলপুর-এর কপালীশ্বর কোয়িল্। কোয়িল্ অর্থে মন্দির। কপালীশ্বর শিব। কিংবদন্তী আছে যে, শিবকে পাওয়ার জন্য দেবী পার্বতী এখানে ময়িল্-এর রূপ ধরে তপস্যা করেছিলেন।

ময়িল্ কথাটির অর্থ ময়ূর। তাই স্থানটির নাম হয়েছে ময়িলপুর্।

অনেকে বলেন যে, এখানে এক সময় ময়ূরের প্রাদুর্ভাব ছিল। সেইজন্যই নাম হয়েছে ময়িলপুর।

প্রসিদ্ধ তিরু-কুরল্ গ্রন্থের রচয়িতা তিরুবল্লুভ ছিলেন ময়িলপুর্-এর অধিবাসী।

তিরুকুরল্ প্রত্যেক তমিলজ গৃহস্থের অবশ্য পাঠ্য এক নীতিমালা। তিরুবল্লুভ-এর একটি উপদেশ, 'ওল্লুকুম্ বিণ্ণুম্পম্ তরলান্, ওল্লুকুম্ উয়িরিন্মু ওম্পল্, পড়ুম্'। অর্থাৎ, নিয়মানুবর্তিতাই জীবনকে মূল্যবান্ করে তোলে। ময়িলপুর্-এ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্যালয়।

মাদ্রাজে মিশনের কর্মকাণ্ডের তুলনা নেই। অনেক-

* ডঃ দে স্বর্গত হয়েছেন।

* মাদ্রাজ স্কুল অফ আর্টস্-এর অধ্যক্ষ ভাস্কর দেবীপ্রসাদ অবসর গ্রহণ করে ক্রোমপেট-এ বাস করছেন।

গুলি স্কুল, একটি কলেজ এবং দাতব্য চিকিৎসালয়াদি পরিচালনা করেন মিশন তথা রামকৃষ্ণ মঠ। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোম, বিবেকানন্দ কলেজ, সারদা বিদ্যালয় ও বয়েজ হাইস্কুল।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে পরমহংসদেবের অন্যতম শিষ্যা রামকৃষ্ণানন্দজী কর্তৃক Castle Kernan বা Ice House-এ এই প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত। মঠের গ্রন্থ প্রকাশন বিভাগটি উল্লেখযোগ্য। ১৯০৮ সালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের Universe and Man নামক গ্রন্থের প্রকাশ হতে এযাবৎ প্রায় দু'শ-এরও বেশী পুস্তক প্রকাশ করেছেন মঠ।

বেদান্ত-কেশরী (ইংরেজী), শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়ম্ (তমিলক) ও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভা (তেলুগু) নামে তিনখানি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয় এই প্রতিষ্ঠান থেকে।

১৯২১ সালে স্থাপিত রামকৃষ্ণ দাতব্য চিকিৎসালয়টির কাজ শ্রদ্ধা ও প্রশংসার যোগ্য। ১৯৫৬ সালে কিঞ্চিদধিক ১২১২০০ জন রোগীর চিকিৎসা হয়েছিল এই চিকিৎসালয়ে। বর্তমানের সংখ্যা নিশ্চয় আরও বেশী।

ময়িলপুর থেকে সোজা রওনা হওয়া গেলো তিরুবোট্টিয়ুর। জায়গাটি মাদ্রাজ হতে পাঁচ মাইল উত্তরে। ওখানের ত্যাগরাজ শিব অতি প্রসিদ্ধ। তাঁর মন্দিরটি সুপ্রাচীন।

দুপুরটা কেটে গেলো মাদ্রাজ সম্বন্ধে আরও কিছু জ্ঞাতব্য আহরণে।

মাদ্রাজ নামটির উৎপত্তি প্রসঙ্গে জানা গেলো,—

(ক) মাদারেসন নামে তেলেগুদের এক গ্রাম হতে মাদ্রাস হয়েছে।

(খ) পর্তুগীজ গির্জা Medre-de-Dens হতে নামটির উদ্ভব ঘটেছে।

পৌরাণিক সূত্র ভিত্তি করলে, যযাতি পুত্র মদ্রক হতে মদ্ররাজ্য বা মাদ্রাজ নামটির উৎপত্তি এরূপ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে।

মাদ্রাজের দেশীয় নাম শেন্নৈপটম্ নামটি অনেক তেলুগু রাজার নাম হতে উদ্ভূত।

বর্তমানের তমিলক প্রভাবিত মাদ্রাজ পুরাকালে ছিল তেলুগু প্রধান।

তমিলক ভাষা মাদ্রাজ রাজ্যের মাতৃভাষা।

দক্ষিণাপথের অন্যান্য রাজ্যের বিভিন্ন ভাষা-ভাষীদের অনেকেই কিন্তু এই ভাষা কিছু কিছু বলতে পারেন। যাঁরা বলতে না পারেন তাঁরাও প্রায়শঃই বুঝতে পারেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে খৃষ্টপূর্ব ৩৫০০ বছর হতে তমিলক ভাষা ভারতে প্রচলিত রয়েছে। বর্তমানে মাত্র দক্ষিণাপথেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লেও অতি প্রাচীনকালে উত্তর ভারতেও তমিলক-এর প্রসার ছিল। বেলুচিস্থানের ব্রাহুই উপজাতি আজও তমিলক ভাষাভাষী।

মাদ্রাজের মানুষ সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয়, তাঁরা ভারতের অন্যান্য উপকূলবাসীদেরই মত। কষ্টসহিষ্ণু হলেও, শিক্ষিত ব্যক্তিদের বাঙ্গালীদের অনুরূপ মস্তিষ্কের শ্রমেই প্রবণতা,—দৈহিক শ্রমে নয়। শিক্ষার তৃষ্ণা বাঙ্গলা দেশেরই মত এবং শিক্ষিত সমাজের চাকরির প্রতি প্রবল মোহ।

আধুনিক জীবন যাপনের সব উপকরণের পর্যাপ্তি সত্ত্বেও শহরবাসী মাদ্রাজীদের জীবন যাত্রায় অন্যান্য রাজ্যের শহরবাসীদের তুলনায় কৃত্রিমতা কম। ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ধর্মীয় আচরণ অনেক ক্ষেত্রেই উৎকট এবং দৃষ্টিকটু হলেও স্বীকার করতেই হবে যে, হিন্দু জীবনের সনাতন রীতি-নীতির শুদ্ধ প্রবাহ আজও তমিলক নাড়ুতেই বেঁচে আছে।

বিকালের দিকে কতকগুলো জরুরী কাজ সেরে ফেলা গেলো। কারণ আগামী দিনটা পুরো কেটে যাবে মহাবলিপুরম্ যাওয়া আসায়। আর পরের দিনই—শুভ্ বাই মাদ্রাস্!

[ক্রমশঃ

পরিচয়

চারুলতা রায়চৌধুরী

মা দেখ, দেখ—আমি কতগুলি প্রাইজ পেয়েছি, বোলে—ছয়, সাত বছরের ছেলে প্রদীপ যখন ঘরে প্রবেশ কোরে সুমিতার গলা-জড়িয়ে ধরল সে তখন ছেলের জন্য জলখাবার প্রস্তুত কোরতে ব্যস্ত। তপ্ত কড়া নীচে নামিয়ে ছেলেকে বুকে টেনে নিয়ে সে বোললে,—দেখছ তো বাবা, ভাল কোরে লেখাপড়া কোরলে কি রকম ভাল ভাল জিনিস লাভ হয়। মন দিয়ে কাজ কোরলে সব কাজেই পুরস্কার পাওয়া যায়। তুমি তাই কোরবে কেমন ?

প্রদীপ বোললে,—হ্যাঁ মা। তারপর নিজের মনে কি যেন একটা ভেবে নিয়ে বোললে,—তুমি তো কত ভাল কোরে কাজ কর, তোমাকে তবে কেউ পুরস্কার দেয় না কেন ?

সুমিতা একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বোললে, তেমন ভাল কোরে কোরতে পারিনা বোলেই হয়তো পুরস্কার পাই না। জান মানিক, ছেলে যদি সব রকমে খুব ভাল হয় সেইটেই হয় মার সবার থেকে বড় পুরস্কার। আমার পুরস্কার হবে তুমি, কেমন, পারবে তো ?

প্রদীপ—ধেৎ! আমি যে মানুষ, মানুষ বুঝি আবার পুরস্কার হয় ?

মা হেসে বোললেন,—আচ্ছা, আমার পুরস্কারের ব্যবস্থা পরে হবে, এখন তুমি চট্‌পট্‌ খেয়ে নাও তো দেখি।

সুমিতা তার ছেলেকে নিয়ে থাকত সহরতলির ছোট একটি বাড়ীতে। এই বাড়ীখানি তার বাবা তার নামে লিখে দিয়েছিলেন। ছোট বড় মিলিয়ে বাড়ীতে পাঁচখানি ঘর। তার তিনখানি সে ভাড়া দিয়েছিল মধ্যবয়স্কা এক ভদ্রমহিলাকে। তাঁকে বাড়ীর মধ্যে পাওয়ায় সুমিতার যথেষ্ট সুবিধা হয়েছিল। মানুষটি ছিলেন অতি মাত্রায় রাশভারি। তাঁর হেফাজতে থাকলে রূপযৌবনের লোভে দুষ্ট লোকে তার প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ কোরতে সাহস কোরবে না এই ছিল তার ধারণা। সুযোগ বুঝে সে তাঁর সঙ্গে মাসী সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছিল। এ বাড়ী থেকে যা উপায় হ'ত এবং পাড়া প্রতিবাসীর সেলাইএর কাজ কোরে যা সকয় হ'ত, তাই দিয়ে কোন রকমে সে দিন গুজরান কোরে নিত। স্কুলে থাকতে সূচিকার্যটি সে ভালভাবেই শিখে নিয়েছিল। তার নামে কিছু টাকাও ব্যাঙ্কে রাখা-ছিল, কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজন না হলে তাতে সে হস্তক্ষেপ কোরত না। প্রদীপ বড় হলে তার লেখাপড়ার জন্য অনেক খরচ আছে সেইজন্য ঐ সঞ্চয়টুকু সে গচ্ছিত রেখে-ছিল। পাছে লোকে কিছু বলে বা অপ্রিয় প্রশ্ন করে তাই কারারও সঙ্গে সে বিশেষ মেলামেশা কোরত না। কিন্তু কেউ তার কাছে এলে সুমিষ্ট ব্যবহারে আপ্যায়িত কোরে সে তাদের মনটিকে জয় কোরে নিত। এই কারণে সকলেই তার প্রতি সদয় ছিল। পরণে তার নকশাপাড় শাড়ী। এয়োতির চিহ্ন স্বরূপ মাথায় সিঁদুর বা হাতের লোহা ছিল না। পরিচিত লোক মাত্রেই তাই স্থির কোরে নিয়েছিল সে পতিহীনা। এত অল্প বয়সে এরূপ দুরদৃষ্টের জন্য তার প্রতি করুণা ছিল সকলের এবং তার বিপক্ষে কাহাকেও কিছু বোলতে শোনা যেত না।

প্রদীপের বয়স আর একটু বাড়লে একদিন রাত্রে শয্যায় শুয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে সে জিজ্ঞাসা কোরলে —মা সকলের বাবা আছে, আমার বাবা নেই কেন ?

মা এই আকস্মিক প্রশ্নে চমকে উঠে বোললে, তোমার মা তো আছে সোনা।

ছেলে বোললে, বাবে, মা তো সকলেরই থাকে।

মাবাবা কিন্তু সকলের থাকে না। ঐ দেখ ও-বাড়ীর শ্যামলের বাবা নেই।

প্রদীপ একটু চুপ কোরে থেকে বোললে,—বাবা বাবা তো ছিলেন। ওর বাবার নাম ও সকলকে বোলতে পারে।

মা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বোলে ফেললেন,—তোমারও বাবা ছিলেন নিশ্চয়।

প্রদীপ—তবে আমার বাবার নাম বলো।

মা—রাত্ হয়েছে এখন চুপটি কোরে শুয়ে ঘুমও দিবিনি। কাল স্কুলে যেতে হ'বে না বুঝি? বোকা ছেলে, জান না হিন্দু মেয়েদের স্বামীর নাম মুখে আনতে নেই।

প্রদীপ নিশ্চিন্তভাবে কথাটাকে মেনে নিলে কিনা বলা কঠিন, তবে তখনকার মত "ওঃ" বোলে পাশ ফিরে শুল।

দিন কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। সুখে হ'ক, দুঃখে হ'ক কেটে চলে। নানা সঙ্কটের পাশ কাটিয়ে সুমিতার দিনও এগিয়ে চলল। প্রদীপ আর কয়েকবার বাপের সম্বন্ধে প্রশ্ন কোরেছে কিন্তু উপযুক্ত উত্তর পায়নি। দুঃখের মধ্যে দিয়ে যাদের জীবনের পথে অগ্রসর হ'তে হয়, তাদের বোধশক্তি হয় অতি তীক্ষ্ণ। সেই শক্তির প্রভাবে প্রদীপ বুঝেছিল তার বাবার সম্বন্ধে তার মার কোথাও একটা গোপন ব্যথা আছে—তাই এ সম্বন্ধে প্রশ্ন কোরে তাঁর বেদনাকে বাড়াতে তার ইচ্ছা হ'ল না। মার প্রতি তার ভালবাসা এবং ভক্তি দুই ছিল অতি গভীর।

প্রদীপ যখন বাল্যকালকে বিদায় দিয়ে কৈশোরে পৌঁছল তখন থেকে তার একটি, দুটি কোরে বন্ধু সংগ্রহ হতে সুরু হ'ল। এদের মধ্যে রঞ্জিৎ ও সমীরের সঙ্গে তার ভাব জমেছিল বেশী। স্কুলের পালা শেষ কোরে কলেজে যখন গেল তখনও এই তিনজনের ছাড়াছাড়ি হয়নি। মাঝে মাঝে সে তাদের বাড়ীতে নিয়ে এসে মায়ের হাতের রান্না খাইয়ে দিত। তাদের আসবে যোগ দেবার জন্য মাকে আহ্বান জানালে তিনি বোলতেন, আর ত্রিমূর্তি একসঙ্গে হয়েছে তাদের মাঝখানে গিয়ে রসভঙ্গ করি এমন বেরসিক আমি হতে গেলাম কেন?

ছেলেরা হাসত, বোলত না কিছু।

কলেজ ছাড়ার পর এদের গ্রন্থি হ'ল শিথিল। সমীর কাজের সন্ধান পেয়ে পরদেশে চলে গেল। রঞ্জিতের সুপারিশ ছিল। বড় কম্পানিতে প্রবেশ করার ছাড়পত্র সে যোগাড় কোরে নিলে। প্রবীরের পাঠাবস্থা আর কয়েক বছর চলল। আই, এ, এস পরীক্ষা দিয়ে সে ভালভাবেই উত্তীর্ণ হ'ল এবং সরকারী চাকরীতে বাহাল হয়ে গেল। এতদিনে মার সকল কষ্ট ও পরিশ্রম সার্থক হল। তিনি সস্নেহে ছেলেকে আদর কোরে বোললেন,—ঘরে একটি বৌ আনতে পারলেই এবার আমার ছুটি।

প্রদীপ হেসে বোললে,—ছুটি চাইলেই অমন ছুটি পাওয়া যায় কিনা। কে দিচ্ছে তোমায় ছুটি!

ইতিমধ্যে তাদের নানা সুখ দুঃখে জড়ান ছোট বাড়ীটি সম্পূর্ণ তাদের নিজের আয়ত্তের মধ্যে এল। সুমিতার পাতান মাসী পৃথিবী ছাড়ার সময় নিকট হয়েছে বুঝে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। কাশী বিশ্বেশ্বরের চরণে শেষ নিঃশ্বাস ফেলবেন এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। সব ঘরগুলিকে নিজের কোরে পাওয়ায় সুমিতাদের বিশেষ সুবিধা হল। ছেলে এখন আর ছোটটি নয়। কাজ উপলক্ষে নানা রকমের লোক তার কাছে আসা যাওয়া কোরবে। দুখানি ঘরে আর কুলান সম্ভব নয়। উপরে দুএকটি ঘর ওঠান প্রয়োজন হবে হয়তো কিন্তু সে এখন নয়।

সন্ধ্যার অবসরে রঞ্জিৎ প্রায় আসত এবং প্রদীপকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। অনেক সময় সুমিতাকে ডাকত তাদের সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসার জন্য। বোলত, কি মা তুমি সারাক্ষণ ঘরে বসে থাক। একটা ভাল ছবি হচ্ছে, চল তোমাকে দেখিয়ে আনি।

সুমিতা উত্তর দেয়,—নারে বাবা, ওসব আমার ধাতে সয় না। জানিস তো আমি চিরকেলে কুনো মানুষ। তোরা দুই বন্ধুতে যা। ছবি শেষ হলেই ফিরে আসিস, দেরী করিস না, তাহ'লেই হ'ল।

বাড়ী ফিরে খাবার জায়গায় বসে মার সঙ্গে তার নানা গল্প হত। কোথায় কার সঙ্গে আলাপ হল। কোন নিমন্ত্রণ বাড়ীতে কোন মেয়ে কি ভঙ্গীতে কথা বলছিল। কে কি রকম বেশভূষা কোরেছিল ইত্যাদি নানা কথা।

একদিন বেড়িয়ে এসে পেছন থেকে প্রদীপ মার গলা জড়িয়ে ধরল। সুমিতা তার হাত ধরে সামনে টেনে এনে

বোললে,—আর বোস। কিছু একটা বলবার আছে বুঝতে পেরেছি। তা বল শুনি।

প্রদীপ—কিছু বলবার না থাকলে বুঝি মার কাছে আসতে নেই ?

সুমিতা—আমার সব কিছু তোকে জড়িয়ে তা তো জানিস ? তাই তুই কিছু বলবার আগেই তোর মনের কথা আমি খানিকটা টের পেয়ে যাই। এইবার যা বোলতে এসেছিস বল শুনি।

প্রদীপ—তেমন কিছু নয়। একটি মেয়ের সঙ্গে আজ পরিচয় হ'ল, তার কথা তোমায় শোনাতে চেয়েছিলাম ! অপর সাধারণ মেয়েদের মত একটুও নয়। অতি সহজ, সরল ভাব। বেশবিন্যাসের মধ্যেও নিজেকে সজ্জিত করবার অতিরিক্ত চেষ্টা কোথাও নেই অথচ দেখলেই বোলতে ইচ্ছা করে—বাঃ, সুন্দর।

সুমিতা—তোর কথা শুনে মেয়েটিকে দেখতে ইচ্ছা কোরছে যে। একদিন নিয়ে আসতে পারিস না ?

প্রদীপ—আমার সঙ্গেই তো শুধু একটি দিনের পরিচয়। এখন আমার কথা বলি কি কোরে ?

সুমিতা—কি নাম ?

প্রদীপ—অপর্ণা। বিশেষ পরিচিতজনেরা "অপু" বোলে ডাকে।

সুমিতা—কার মেয়ে ?

প্রদীপ—সে সব তো জানিনা।

সুমিতা—বেশ ছেলে তো তুই। মেয়েটিকে ভাল লাগল, অথচ তার কোন খোঁজ খবর নিলি নে ?

প্রদীপ—নিতে হয় বুঝি ? আচ্ছা আবার যখন দেখা হবে তখন সব জেনে নেব।

সুমিতা ছেলের মাথায় হাত রেখে শুধু একটু হাসলে।

আর কিছুদিন পরে প্রদীপের অফিস থেকে আসতে দেরী হচ্ছে দেখে মার মনটা যখন অস্থির হয়ে উঠেছে, দরজায় ঘা পড়ল। বাইরে থেকে প্রদীপের গলা শোনা গেল—মা শিগ গির দরজা খোল,দেখ কাকে নিয়ে এসেছি।

কথা শেষ হবার আগেই দরজা খুলে গেল। প্রদীপ বোললে—মা এই অপর্ণা—অনেকদিন থেকে তোমার কাছে আসতে চাইছিলেন তাই আজ তোমায় না জানিয়েই নিয়ে এলাম্।

সুমিতা—বেশ কোরেছিস। বোস মা বোস। প্রদীপের মুখে তোমার কথা কত যে শুনেছি। তোমরা দুটিতে বোসে গল্প কর, আমি চট্ কোরে তোমাদের জন্য চা কোরে আনি।

অপর্ণা—আপনি ব্যস্ত হবেন না, চা আমরা খেয়ে এসেছি। আজ শুধু গল্প কোরে যাব। চা খাওয়াটা পাওনা রইল পরে হবে। প্রদীপবাবুর কাছে আপনার কথা শুনে ভারি ইচ্ছা হচ্ছিল আপনার কাছে আসতে। আজ আমি খানিকটা জোর কোরেই ওর সঙ্গ নিয়েছি।

সুমিতা—ঐ দেখ আমার ছেলের কাণ্ড ! ও ভাবে ওর মার কথা শোনবার জন্য বিশ্বসংসার বুঝি উন্মুখ হ'য়ে আছে।

অপর্ণা—বিয়ের কথা জানিনা আমি কিন্তু ছিলাম। না জানিয়ে আসায় যদি অন্যায় হয়ে থাকে তাহ'লে সে দোষ আমার।

সুমিতা—কিন্তু দোষ করনি মা। তোমাকে দেখে বড় তৃপ্তি পেলাম্। আবার যখন ইচ্ছা হবে এস।

সেদিন অপর্ণাকে বাড়ী পৌঁছে প্রদীপ যখন বাড়ী ফিরে এল সুমিতা বোললে—বেশ মেয়েটি, বড় ভাল লাগল। যেমনি সহজ তেমনি নম্র।

প্রদীপ—আমি ভুল বলিনি তো ? ব্যাস্ তাহ'লেই হ'ল।

অপর্ণার সঙ্গে পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হবার পর একদিন রাত্রে খেতে বসে প্রদীপ বোললে, মা বৌ করবার মেয়ে খুঁজে পেয়েছি। তোমার মত পেলেই কথাটাকে পাকা কোরে ফেলি।

সুমিতা বোললে—বিয়ে একপক্ষের মতে হয় না, তা জানিস তো ? কন্যাপক্ষের মত নিয়েছিস্ ?

প্রদীপ—কন্যাপক্ষের কথা জানিনা, কন্যার মত আছে।

সুমিতা—শুধু তাতেই কি অতবড় কাজটা হয় রে ? মেয়ের মা, বাবার মত নিতে হবে যে।

প্রদীপ—মা নেই। মেয়েটি বলে সে যাকে পছন্দ কোরে বিয়ে কোরবে তার বাবার তাতে অমত হবেনা। তিনি বলেন ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট বড় হয়ে এবং উপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে নিজের জীবন সঙ্গী যখন বেছে নেয়, বিশেষ কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালে তাদের প্রতি

অন্যায় করা হয়। এতে কোরে অনেক জীবন নষ্ট হয়ে যায়। আচ্ছা মা মেয়েটি কে—তাতো কই জিজ্ঞাসা কোরলে না?

সুমিতা—সেটা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন আছে কি? সে তো আঁচে বুঝে নিয়েছি।

প্রদীপ—উঁহু, ভুল বুঝেছ বোলে মনে হচ্ছে যে। অপর্ণা কিন্তু নয়। তবে তার বিশেষ বন্ধু, বাড়ীর কাছেই থাকে। দেখতে যেমন মিষ্টি, স্বভাবটিও তেমনি। তুমি দেখলেই ভালবেসে ফেলবে এ আমি ঠিক বোলতে পারি। নাম সুস্মিতা। তোমার নামের সঙ্গে মিল আছে তাই নামটিও আমার ভাল লাগে। বাবার আবিষ্কৃতা কন্যা, নাম তাঁরই দেওয়া। এবার আর পরিচয় নিতে ভুল করিনি মা। নাড়ী-নক্ষত্রের খবর নিয়ে এসেছি। ঠাকুর্দার নাম ছিল প্রফুল্ল চাটার্জি। সম্পদ এবং বংশ দুই ছিল উচ্চস্তরের। বাবার নাম প্রতুল চাটার্জি প্রখ্যাত আইন ব্যবসায়ী।

সুমিতা বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল। চমকে উঠে বোললে,—কি নাম বল্‌লি?

প্রদীপ মায়ের এই ভাবান্তর লক্ষ্য কোরে অবাক হয়ে উত্তর কোরল—প্রফুল্ল চাটার্জির ছেলে প্রতুল চাটার্জি। তোমার জানা কাউকে আবিষ্কার কোরে ফেললাম নাকি?

মুহূর্তের জন্য সুমিতার মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। এক নিমেষে কে যেন সমস্ত রক্ত শুষে বার কোরে নিলে। নিজেকে সম্বরণ কোরে নেবার জন্য সে একটুক্ষণ চুপ কোরে রইল, তারপর স্থির অথচ দৃঢ় স্বরে বোললে,—এ বিয়ে হতে পারে না প্রদীপ, আমার মত নেই।

প্রদীপ এ উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিল না তাই সে অত্যন্ত আশ্চর্য্য এবং ক্ষুণ্ণ হয়ে বোললে,—কেন মা তুমি আপত্তি কোরছ—আমি তো বুঝতে পারছি না। তুমি তো সুস্মিতাকে একেবারেই জান না।

উদ্গত-অশ্রু রোধ কোরে সুমিতা বোললে,—বাবা প্রদীপ, তুই যে মেয়েকে পছন্দ কোরেছিস্ তাকে বরণ কোরে ঘরে আনতে পারব না এই কথা বলার বাধা যে আমার কত, তা একমাত্র অন্তর্যামী জানেন। মুখে বোলে আমি তা তোকে বোঝাতে পারব না। কেন যে অমত কোরছে সে প্রশ্নের উত্তর পরে দেব। তার আগে আমার জীবন কাহিনী তোমাকে কিছুটা শোনাব। তুমি বড় হয়েছ, জানবার অধিকার তোমার আছে।

এই বোলে খানিক নীরব থেকে সে যেন শক্তি সঞ্চয় কোরে নিলে, তারপর সুরু কোরলে বোলতে কতকটা যেন আপন মনেই। অতীতকে সে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে এমনিতর ভাব।

"যাকে বলে জন্মদুঃখী, আমি ছিলাম তাই। আমাকে জন্ম দেবার অল্পক্ষণ পরেই আমার মা ইহলোক ছেড়ে চলে যান। বাবা ছিলেন অবস্থাপন্ন লোক। তাঁর গৃহ-শূন্য থাকবে এটা তাঁর শুভানুধ্যায়ীদের মনঃপূত হ'ল না। তাঁরা তাঁকে পুনর্দার দারপরিগ্রহের পরামর্শ দিলেন। ছোট সুমিতাকে দেখার লোকের অভাবছিল—সুতরাং কথাটাকে অগ্রাহ্য করা গেল না। অনতিবিলম্বে নতুন বধূ ঘরে এলেন। আমার বয়স তখন বছর তিনের বেশী হ'বে না। সুসজ্জিতা নতুন মাকে দেখে কৌতূহল হওয়ায় আমি তাঁর অলঙ্কারগুলি নেড়েচেড়ে দেখছিলাম। অপরের অলক্ষিতে নতুন বধূ আমায় এমন করে ঠেলে দিলেন যে টাল সামলাতে না পেরে আমি পড়ে গেলাম এবং সেই সঙ্গে তার স্বরে কান্না সুরু কোরে দিলাম। এই হ'ল মা ও মেয়ের পরিচয়ের সূত্রপাত। নবপরিণীতা বধূ স্বপত্নী-কন্যাকে কোনমতেই সহ্য কোরতে পারলেন না। নিজের সন্তান আবির্ভাবের পর এই বিদ্রোহভাব আরও শতগুণ বেড়ে গেল। তার একটি প্রধান কারণ লোকমত অনুদারে আমি ছিলাম সুরূপা এবং তাঁর গর্ভজাত সন্তানেরা ছিলেন তদ্বিপরীত। অতি অনাদর সত্ত্বেও বয়সের সঙ্গে আমার রূপের জলুস আরও ফুটে উঠল। আমার সংমার কাছে এটা আমার প্রচণ্ড দোষ বোলে গণ্য হ'ল সুতরাং, আমার প্রতি তাঁর আক্রোশও সেই অনুপাতে বেড়ে চলল। যাবতীয় পরিশ্রমের কাজ তিনি আমাকে দিয়ে করিয়ে নিতেন। তাঁর মতে অতবড় মেয়ে যার ঘরে বেশী চাকরদাসী তাদের প্রয়োজন কি? মিথ্যে অর্থ নষ্ট বই তো নয়। কাজ কোরলে মানুষের শরীর ভালই থাকে। কেউ প্রশংসা কোরে যদি বোলত, "আহা, মেয়ে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাকরুণ। যার ঘরে যাবে আলো কোরে যেবে।" আমার বিমাতা তৎক্ষণাৎ জ্বলে উঠে বোলতেন, "হাঁ গো ঐ রূপের গরবেই মেয়ে

কেটে পড়ছেন। ওর যে কত তা মা গঙ্গাই জানেন।

প্রথম দিকে এই নিয়ে আমি বাবার কাছে কান্নাকাটি করেছিলাম—কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই বুঝতে পারলাম এতে হিতে বিপরীত হয়। বাবা আমার পক্ষ নিয়ে কিছু বোলতে গেলে তাঁকে তো গঞ্জনা সইতে হতই, উপরন্তু পরোক্ষে আমার উদ্দেশ্যেও মধুবর্ষণ হত কম নয়। এ যেন পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রাণ আমার উতলা হয়ে উঠল। একদিন সাহস সঞ্চয় কোরে বাবাকে গিয়ে বোললাম,—আমাকে কোন স্কুলের বোর্ডিংএ ভর্তি কোরে দাও। এখানে ভাল কোরে পাঠ মুখস্থ কোরতে পারি না বোলে শিক্ষয়িত্রীদের কাছে বকুনি খাই। কিন্তু কি কোরে কোরব? সময় হয় না যে। আর বোলতে পারলাম না, চোখ দিয়ে হু হু কোরে জল গড়িয়ে পড়ল।

তাঁর এই হতভাগ্য কন্যাটির জন্য বাবার বুক ব্যথায় কাতর ছিল, অথচ এর প্রতীকারের উপায় তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাই মেয়ের এই প্রস্তাবে তিনি সহজেই রাজি হলেন এবং অনতিবিলম্বে সব বন্দোবস্ত ঠিক কোরে সহরের এক বোর্ডিং স্কুলে রেখে এলেন। বিনা বেতনের চাকরানীটি চলে যাওয়ায় সংসার খুসী হলেন না, কিন্তু চক্ষুশূল চোখের আড়ালে চলে যাওয়ায় কতকটা সান্ত্বনা পেলেন। ছুটিছাটাতে বাড়ী এলে সাদর অভ্যর্থনা আমার জন্য অপেক্ষা কোরত না। নিজের বাড়ীতে স্থান দিয়ে আমাকে যথেষ্ট কৃপা করা হচ্ছে, এইটেই নানা রকমে বুঝিয়ে দেওয়া হত।

এই আবহাওয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সরিয়ে নেবার জন্য প্রাণ যখন আমার হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিল সেই সময় এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা আমার জীবনটাকে অন্য এক সমস্যার মধ্যে ফেলে দিলে। এক ধনীর সন্তান আমার প্রতি মুগ্ধ হয়ে আমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব কোরলেন। বোর্ডিংএ থাকাকালীন এক বন্ধুর বাড়ীতে আমি এই যুবকটির দেখা পাই। সংসারের রীতি নীতি সম্বন্ধে আমি তখন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। হিংসার কবল থেকে পালাবার এই পথটি পেয়ে আমি সাগ্রহে তাকে গ্রহণ কোরলাম। একদিন তিনি আমাকে একটি মন্দিরে নিয়ে গিয়ে আমার সঙ্গে মালা বদল কোরে বোললেন,—এই হয়ে গেল আমাদের বিয়ে, আজ থেকে তুমি আমার স্ত্রী। আমি তখন মুক্তির আনন্দে বিভোর। সেই তখায় নির্ভর কোরে সম্পূর্ণভাবে যন্ত্রিতের হাতে দিলাম নিজেকে সমর্পণ কোরে। হিতাহিত বিবেচনা করবার মত বয়স তখন আমার ছিল না।

শুনেছি এখবর যখন ছেলের বাবামার কাছে পৌছল তাঁরা একেবারে বেঁকে বসলেন, বোললেন—এ বিয়ে হতেই পারে না। সমান ঘর না হলে বিয়ে চলে না।

ছেলে যখন বোললে,—আমি যে দেবতা সাক্ষী কোরে তাকে স্ত্রী বোলে গ্রহণ কোরেছি,—বাপ উত্তর দিলেন,—মালা বদল কোরলেই বিয়ে হয়না। তোমার বিচারে সেটা যদি হয়ে থাকে তাহলে তোমার এবং তোমার স্ত্রীর ভার তোমাকেই গ্রহণ কোরতে হবে। আমার কাছে থেকে এক কপর্দক পাবে না সেটা মনে রেখ।

নিজে উপার্জ্জন করবার মত শিক্ষা বা শক্তি তাঁর তখনও হয়নি, তাই তিনি ভয় পেয়ে নিজের গণ্ডীতে ফিরে গেলেন। আমি রইলাম মুস্কিলে পড়ে।

ছুটিতে বাড়ী যখন ফিরলাম আমার শরীরে তখন মাতৃত্বের সমস্ত লক্ষণ দেখা দিয়েছে। বিমাতা আমাকে দেখে গালে হাত দিয়ে বোলে উঠলেন—ওমা, এ যে একেবারে কেলেঙ্কারী! আমি তখনই জানতাম এ মেয়ে কতবড় শয়তানী। ও পাপীয়সীকে এখনই বাড়ী থেকে দূর কর। ওর জন্য আমরা কুল মান হারাব নাকি? আমার আয়ো চারটি আছে না? কি লজ্জার কথা, লোকের কাছে যে মুখ দেখাবার জো রইল না ইত্যাদি কত কিছু।

বাবা বুঝলেন ও বাড়ীতে আমার আর স্থান হ'বে না। পল্লীগ্রামে দূর সম্পর্কের এক গরীব আত্মীয়ার কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে ফেললেন। যথাসময় আমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল। বাবা অনাথ আশ্রমে দিয়ে দিতে চাইলেন। শৈশবে মাতৃহারা হওয়া যে কতবড় দুর্ভাগ্য তা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছিলাম। তাই মা হয়ে সন্তানকে মাতৃহীন কোরতে মন আমার কোন মতে সায় দিল না। বুকে তুলে নিলাম তোকে এবং সেই সঙ্গে মাথায় নিলাম কলঙ্কের বোঝা। তারপর সংসারের ঘাতপ্রতিঘাত থেকে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য চলল আমার সংগ্রাম।

বাবা লুকিয়ে আমায় কিছু কিছু কোরে অর্থ সাহায্য কোরতেন। তাই দিয়ে কোন রকমে আমার দিনপাত

হ'ত। পরের ঘরে পরিশ্রম কোরে উপার্জ্জন কোরব সে উপায় ছিল না। আমার রূপযৌবন ছিল তার অন্তরায়। বহুদিন আমাকে অনাহারে কাটাতে হয়েছে। তোর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে সহ্য করার জন্য বহুদিন কোরেছি। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর দেওা এই বাড়ীটি আমি পাই এবং সেই সঙ্গে সামান্য কিছু অর্থ। এই বাড়ীতে আসার পর আমার কষ্টের অনেক লাঘব হ'ল এবং আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবসর পেলাম। এর পরের ঘটনা তুমি কতকটা জান। তখন থেকে আমার একমাত্র চিন্তা হ'ল তোমাকে উপযুক্ত কোরে গোড়ে তোলা। কতখানি কৃতকার্য্য হয়েছি তাপরে বিচার কোরবে। আমি মা, সে তার আমার নয়।

এইবার তুমি যে প্রশ্ন কোরেছ, কেন এ বিয়েতে আমার মত নেই, সেই কথার জবাব দেব। সেই সঙ্গে দেব তোমার পিতৃপরিচয়, যে বিষয় অনেকবার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও কোন সদুত্তর আমি দিতে পারিনি। সুস্মিতা যার মেয়ে তুমিও তাঁরই সন্তান। সুস্মিতা তোমার ছোট বোন!

চিত্র ও শ্রীচৈতন্য

শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়

অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণ চৈতন্যবিহার।
চিত্র তাঁর চিত্রতপ চিত্র ব্যবহার॥

—(চৈতন্য চরিতামৃত),

কোন জাতির সংস্কৃতি বা সৃষ্টি তখনই প্রকাশ পায় যখন তার মূল কাঠামোর গড়ন একটা সম্পূর্ণতা লাভ করে। বনচারী মানুষের কাছে স্থাপত্য আশা করা যায় না। ক্রমে ক্রমে প্রয়োজনবোধ থেকে একটি একটি নতুন জিনিষ মানুষ আবিষ্কার করে তার স্বাচ্ছন্দ্যের তরে। নিজের দেহকে আবৃত করতে সুরু করা থেকে, ঘরবাড়ীতে বাস, রান্নাবান্না, কৃষি ইত্যাদি করতে থাকে। বাইরের প্রয়োজন মেটাবার জিনিষগুলি আবিষ্কার করে তখন সে চায় মনের খোরাক পেতে। পাখীর কাকলি, প্রবহমান নদীর কলোল, ঝরাপাতার মর্ম্মর, অবাক্-করা অন্ধকার রাত্রির শেষে সুন্দর উষার অপূর্ব অরুণোদয় প্রভৃতি প্রাকৃতিক কাব্য দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে মানুষ সুরু করে তার স্বরচিত কাব্য, গাইতে থাকে গান, আঁকতে থাকে ছবি। শুধু মাত্র আশ্রয়ের ছায়াটুকু পাওয়ায় কাঠে পাথরে গড়েই সে তৃপ্ত থাকতে পারেনা; ঘরের দেওয়ালে বাহার করে আঁকে ছবি, কারুকার্য্য দেয় যোগ করে। এমনি করে মানুষের সভ্যতার উষায় কোনকালে আমাদের দেশের মানুষ গড়ে তুলেছিল তার শিল্প বা কলা—তার সৃষ্টির একটি দিক, তা বলা যায় না। মানুষ সভ্য হতে সুরু করে আস্তে আস্তে কলার বিকাশ হতে যে বিপুল সময় লাগতে পারে তার ধারণা করা কঠিন। কিন্তু একটা আন্দাজ নয়, এমন করে আমাদের দেশে চৌষট্টিটি কলাবিদ্যা জন্মেছিল। শিবতন্ত্রে যে সকলের নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে প্রধান বলে গণ্য চারটি—সঙ্গীত, কাব্য, চিত্র ও তক্ষণ। কামশাস্ত্রে কলাগুলিকে চৌষট্টি যোগ বলা হয়েছে।

বিশ্বের এই বিরাট সৃষ্টিকে 'দেবস্য কাব্যম্'—আর এই বিরাট কাব্যকল্পনার কর্ত্তাকে বিশ্বকর্ম্মা বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে বিশ্বকর্ম্মার সূক্তে 'বিশ্বকর্ম্মা বিদধা আবিহায়া' বিশ্বকর্ম্মাকে বৃহন্মনা ও বৃহৎ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দেবকাব্যের এই কবিকে শিল্পাচার্য বলে পূজাও করা হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে শিল্পের ধারণাটি অতি প্রাচীন। মৎস্যপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে বিশ্বকর্ম্মা, শিল্প, শিল্পশালা, চিত্রকর প্রভৃতির অনেক আলোচনা পাওয়া যায়। বিশ্বকর্ম্মপুরাণ বলে একটি উপপুরাণও আছে। বিদ্যারণ্য রচিত বিখ্যাত 'পঞ্চদশী' গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদই 'চিত্রদীপ'। 'যথা চিত্রপটে দৃষ্টম্'—যেমন চিত্রপটে দেখা যায়—এই বলে 'চিত্রদীপ' পরিচ্ছেদটি আরম্ভ করা হয়েছে এবং চিত্রের সঙ্গে এই

বিশ্বজগতের তুলনা করে ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা করা হয়েছে। ময়শিল্প, মানসার প্রভৃতি প্রাচীন বাস্তুশাস্ত্রে চিত্রতোরণ প্রভৃতির কথা রয়েছে। প্রাচীন 'বিশ্বকর্মীয়' গ্রন্থে নির্দিষ্ট হয়েছে 'শিল্পী চিত্রবিনির্মাণং'—চিত্র নির্মাণ করবে শিল্পী।

নবম শতাব্দীর কাশ্মীর-সভাকবি দামোদর গুপ্তের 'কুট্টনীমত' নামক গ্রন্থে অতি প্রাচীন "চিত্রসূত্রের" উল্লেখ পাওয়া যায়। সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থাদিতে বহু জায়গায় চিত্রের নানাকথা পাওয়া যায়। হরিবংশে বাণতুহিতার ভগ্নে চিত্রলেখাকে বৃষ্ণিবংশে এমন সব প্রতিকৃতি আঁকতে দেখা যায়—যা থেকে উষা স্বপ্নে দৃষ্ট অনিরুদ্ধকে চিনে নিতে পারেন! ফল হল উষাহরণের পালা। বাংলার কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বিরচিত মনসামঙ্গল পুঁথিতে একথা পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গেই বাংলা দেশের মাটিতে বাণরাজার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধের উপাখ্যান প্রচলিত। অধুনা পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় গঙ্গারামপুরের নিকটে বাণগড় বলে স্থানটি, কাছের বাণেশ্বর শিবের মন্দির, আর উষাহরণের রাঙা দ্রষ্টব্য স্থান—কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে উল্লেখ করা গেল।

ভবভূতির উত্তররামচরিতের প্রথমাঙ্কে দেখা যায় সীতাদেবীর চিত্তবিনোদনের জন্যে লক্ষ্মণ রামচরিতের চিত্রাবলী আঁকিয়েছেন। সে চিত্র এতই সুন্দর যে রাম ও সীতা উহাতেই অভিভূত হয়ে পড়েন। বাংলাদেশে প্রাচীন রামায়ণের চিত্রপুঁথিগুলি হয়তো ভবভূতি থেকেই উদ্দীপনা লাভ করেছে। এই রামায়ণ চিত্রের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় আকবর বাদশার করানো মহাভারতের সংক্ষিপ্ত পারসী—অনুবাদ 'রাজমনামার'। এই বইটি বহু অর্থব্যয়ে তিনি পারসিক চিত্রকরদের দিয়ে চিত্রিত করান। ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের বহু নিদর্শনের মতই হায় চিত্রশিল্পকলা আজ প্রায় অবলুপ্ত।

মোগল-রাজপুত চিত্রকলার জন্মের পূর্বে ভারতের চিত্রশিল্পের অবস্থা কি ছিল তার চাক্ষুষ রূপ আজ নেই বললেই হয়। প্রাচীন বৈদিক শিল্পের ঐতিহ্য নিয়ে সংস্কৃত-অক্ষর-খোদিত পাথরের দুটি যুপস্তম্ভ মথুরার নিকটে কিছুদিন পূর্বে পাওয়া গেছে বলে জানা যায়। উড়িষ্যার কপিলেশ্বর মন্দিরের প্রাচীচিত্রই বোধহয় ভিত্তিচিত্রের প্রাচীনতম নিদর্শন। গত ছ'সাত বছরে প্রাক্-মোগল-রাজপুত ভারতীয় চিত্রকলার (১—১৬শ শতাব্দী) কিছু কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। মহেঞ্জোদারো হরপ্পার এবং বৌদ্ধযুগের চিত্রকলাও শিল্প ভারতের শিল্প-ইতিহাসের অক্ষয় কীর্তি। ভারতবর্ষ থেকে বিভিন্ন দেশে সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতের শিল্পও ছিয়েছে পাড়ি। শিল্পাচার্য নন্দলাল চীনের সুদূর তাংহাউ, কাইফং ও পিকিং প্রভৃতি স্থানে বিশেষ করে বাংলার শিল্পকে আবিষ্কার করেছেন। পাঁচশ থেকে চারশ বছর আগে তৈরী কাইকাডের একটি প্যাগোডায় শিল্পাচার্য বাংলাদেশের কীর্তনকে আবিষ্কার

"নীলাচলের পথে শ্রীচৈতন্য"

করেন ১৯২৬ সালে। কীর্তনীয়াদের কোমরে চাদর বাঁধা, কোঁচা ঝোলানো, কারও গায়ে চাদর মাথায় ঝুঁটি, খোল-করতাল কীর্তন চলেছে। এর আলোকচিত্রও তোলা হয়েছিল।

এই কীর্তন বাংলার বৈষ্ণব-আন্দোলনে নবরূপ লাভ করে বাংলার নিজস্ব সঙ্গীতদেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে। তেমনই এই বৈষ্ণব-আন্দোলন বাংলার সাহিত্যলক্ষ্মীকে কুসুমসজ্জায় সুশোভিত করেছে। তেমনই করেছে তার চিত্রশিল্পকে প্রাণবন্ত ও সুষমামণ্ডিত। বৈষ্ণবশিল্পের শ্রেষ্ঠ রূপের জীবন্ত প্রতিমা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যবিগ্রহ। কবিকর্ণপুর 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে একটি ভক্তি-কল্পবৃক্ষের ছবি এঁকেছেন।

আশ্চর্যম্ ইহ কল্পোবহিমুকুটমণির্যধাখ্যো মুনীন্দ্রঃ
শ্রীমদ্বৈতপ্ররোহস্থিরুনবিধিতঃ স্কন্ধ এবোদ্ধুতঃ।
শ্রীমদ্বক্রেশ্বরাদ্যা রসমধুরপুষঃ কল্পশাখাস্বরূপাঃ
বিস্তারো ভক্তিযোগঃ কুসুমমথফলং প্রেমনিষ্টৈতবদ্বৎ।

—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এক অদ্ভুত কল্পবৃক্ষ, যহিমুকুটমণিঃমুনিশ্রেষ্ঠ মাধবেন্দ্রপুরী এই কল্পবৃক্ষের মূল, শ্রীল অদ্বৈত এর প্ররোহ, অবধূত নিত্যানন্দ এর স্কন্ধ, বক্রেশ্বরাদি পণ্ডিতগণ এর মূল শাখা, এই কল্পবৃক্ষের সর্বাঙ্গ মধুররসে পরিপূর্ণ, ভক্তিযোগ এর কুসুম—আর অচৈতন্য কৃষ্ণপ্রেমই এর ফল।

রবীন্দ্রনাথের কথায় "ব্যক্তিসত্তার ভেতর দিয়ে বিশ্বসত্তাকে প্রকাশ করাই" যদি আর্ট হয় বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষের আস্বাদন, দেহের মধ্যে যেহাতীতের স্পর্শ, রূপের মধ্যে অরূপের দর্শন—এই যদি হয় আর্টের মূল কথা, তবে এই কল্পবৃক্ষটি শিল্পবস্তু হিসেবে নিঃসন্দেহে অতি উচ্চাঙ্গের। অধ্যাত্ম-সাধনার মূলেও তো সেই কথা; বহুর মধ্যে একের সন্ধান। ভারতীয় চিত্রকলার নবযুগের উদ্বোধনে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ তাই এই পটভূমিতে শিল্প-অধ্যাত্মের যোগ করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই বৈষ্ণব-সাহিত্যের ছায়ায় অবনীন্দ্রনাথ আঁকলেন কৃষ্ণলীলা। ১৯০৫ সালে ঘরোয়ার চিত্রশালায় আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার সম্ভবতঃ প্রথম প্রদর্শনীতে এগুলি প্রথম আত্ম-প্রকাশ করে। সম্ভবতঃ এরই প্রেরণায় আচার্য নন্দলালের চৈতন্যচিত্রিত।

চৈতন্য-চিত্র বোধহয় চৈতন্যের সময় থেকেই বাংলায় আঁকা হয়েছে। ঝাড়িখণ্ডের পাটবাড়ীতে একটি অতি প্রাচীন চিত্র আছে—'শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সঙ্কীর্তন'। কোনো পত্রিকায় এই ছবির প্রতিলিপি প্রকাশ করে ছবিটিকে চারশ বছরের প্রাচীন বলে উল্লেখ করা হয়। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বাংলার বহুজায়গায় চৈতন্যচিত্রের অনুসন্ধান করে অবশেষে মহারাজা নন্দকুমারের পিতৃপুরুষের কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর একটি তৈলচিত্রের সন্ধান পান। চিত্রে চৈতন্য, রায় রামানন্দ, সার্বভৌম, নিত্যানন্দপ্রভু, পাঠরত গদাধর পণ্ডিত, গোবিন্দ ও কাশীশ্বর প্রভৃতি আছেন। রাজা প্রতাপরুদ্রকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে দেখা যায়। ছবিটি শ্রীগৌরাঙ্গের বৃন্দাবন-যাত্রার পথে সাক্ষিগোপাল দর্শনান্তে স্বপ্নের নায়ক ব্রাহ্মণের গৃহে বকুলতলার দৃশ্য অংশ করায়। ১৯০০ সালে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে এই ছবিটির একটি প্রতিলিপি প্রকাশ করেন। তাঁরই 'Chaitanya and his age' ও 'Chaitanya and his companians' গ্রন্থদ্বয়েও কিছু ছবি পাওয়া যায়। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ সারদাচরণ মিত্র মহাশয় ১৯১ বঙ্গাব্দে তাঁর 'উৎকলে শ্রীচৈতন্য' গ্রন্থে 'জগন্নাথদেবদর্শনার্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভক্তগমন' এই ছবিটি ছাপান।

বলা বাহুল্য গগনেন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন মজুমদার এবং আরও অনেকে শ্রীচৈতন্য ও তাঁর জীবনের কিছু কিছু ছবি এঁকেছেন। শ্রীচৈতন্যের সম্পূর্ণ জীবনকে অবলম্বন করে কর্ণপুরকল্পিত কল্পতরুর সম্যক্ চিত্রায়ন এ-পর্যন্ত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। শিল্পের মধ্য দিয়ে সত্য শিব ও সুন্দরের সাধনায়, অনিন্দ্যছন্দের এষণায়, সীমার মধ্যে অসীমের প্রেরণায়, অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানের ধারণায় শিল্পযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়েছেন শিল্পী দীপেন বসু ঠিক এই শিল্পবস্তুটিতেই। নবীন শিল্পী ভারতাশিল্পশালীর সব পাড়াতেই আনাগোনা করেছে। সব বাড়ীর লক্ষ্মীই এ-চিরকুমার সরস্বতীপুত্রকে আদর করে বসিয়েছে। ফুটে উঠেছে এ-ঘরানা ও-ঘরানার রূপ। তারপর সে শুনেছে পল্লীপ্রান্তের খোলা মাঠের গান। টেনেছে তাকে খোলা পথের টান। বেরিয়ে পড়েছে পথে, যে পথে কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত রঙ্গ-গৌরাঙ্গ ছুটেছিল। চৈতন্য-কল্প বৃক্ষের রূপ ফুটে উঠেছিল তার চোখে। তার ভাবরস উথলে উঠেছিল তার বুকে। তাই সেই খোলা পথে যখন সে শুনল বাণী—'প্রাণা শরীরী নবযৌবনিষ্বনা বাণী ত্বমাহুয় চলা স্বমন্দিরম্।—এখন তুমি গৃহে ফিরে যাও। ফিরে এসে বাঁধল নিজের ঘর, এ হল ওড়া পাখীর বাঁধা নীড়। আপন স্বকীয়তার নীড় এ পাখার স্থায়িত্ব করেছে। এই আপন নীড়ে বসা পাখীর ধ্যান রূপ নিয়েছিল চৈতন্য জীবনালেখ্যের ছয়চল্লিশখানি ছবিতে। মাসাধিক আগে কলকাতার চারুকলা ভবনে প্রদর্শিত হয়েছিল সেই চিত্র-চৈতন্যচরিত।

রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অফ কালচারের সম্পাদক স্বামী রঙ্গনাথানন্দ প্রদর্শনীটির উদ্বোধনী ভাষণে বিখ্যাত

"শিশু নিমাই দর্শনে নরনারীর আনন্দ"
ছুখানি ছবির শিল্পী—দীপেন বসু

আমেরিকান কলা সমালোচক অডেনকে (Auden) উদ্ধৃত করে বলেন যে, "জীবনের ভালমন্দ দুই শিল্পবস্তু হতে পারে। কিন্তু শুধু ছাপার দিকটিই আঁকলে বড়ই বৈষম্যপ্রকাশ পায়। জীবনের আলোর দিক, মহত্বের দিক, উচ্চ ভাবের দিক—এসবের চিত্রণের ক্ষেত্রে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবনাপেক্ষা আর কি সুন্দরতর বিষয়বস্তু থাকতে পারে। আমাদের মনুষ্যসত্তাকে বৃহত্তর করতে হৃদয় এবং নন্দনাবেগের স্পর্শ প্রয়োজন। এ জিনিষ যুগে যুগে আমরা যে কেবল চিত্রশিল্পী বা ভাস্করদের কাছেই পেয়েছি তা নয়, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মত পুরুষ যাঁদের জীবনই শিল্পময়—তাঁদের কাছেও বার বার পেয়েছি।"

অন্নপরিসরে সেই রসসত্যের প্রসাদে সৃষ্ট রসোত্তীর্ণ ছয়চল্লিশটি ছবির সমালোচনার সাহস রাখিনা। ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতিরূপ সৃষ্টি করা কখনোই শিল্পের কাজ নয়—বিশেষ করে ভারতীয় শিল্পের। দেহরূপের অতীত যে অনির্বচনীয় সত্তা বা রস তাকে ফুটিয়ে তোলাই শিল্পের কাজ। 'অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরম্' রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত অকৃষ্ণাঙ্গ এ অচিন্ত্য কৃষ্ণতত্ত্ব বর্ণিকাভঙ্গে প্রকাশ করা সাধন সাপেক্ষ। শিল্প ভাবোদ্দীপক। শিল্পী দর্শকের মনে সকল ভাবেরই উদ্দীপনা করতে পারেন। সেই উদ্দীপিত ভাবরসের বিচারই শিল্পকৃতির বিচার। নিমাইয়ের রাধাভাব চিত্রটির সামনে দাঁড়িয়ে দর্শক দেখুন নিজের মনে তুলিয়ে, মন কোথায়। যদি প্রদর্শনী গৃহ তখন দেবালয়ে রূপান্তরিত না হয়ে থাকে তবে শিল্প নিরর্থক। এ চিত্রে চৈতন্য ছাড়া আর কে আছে? সহজ কথায় সম্ভাব্য বস্তু আর একটিমাত্র গাছ। তিনটি পাতা পড়ে আছে বৃন্তচ্যুত হয়ে। রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত চৈতন্যের কৃষ্ণবিরহ যদি এই বৃন্তচ্যুত পত্রত্রয়ে ফুটে না থাকে তবে কিসের শিল্পকৃতি? এখানে তো চৈতন্য 'হা' কৃষ্ণ বলছেন না। বৃন্তচ্যুত পত্রত্রয়ের মৌন ভাষা—'ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দাতে।' যখন 'হরিদাসের কুটীরে সনাতন ও শ্রীচৈতন্য' চিত্রের ভাঙা বেড়া আর মৃত্যুর মোহনমূর্তি ক্রোড়ে 'শ্রীচৈতন্যের নৃত্য' ছবি দুটি দেখলে 'জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে' যে দেব, যে দয়িত, যে জগবেকবন্ধু দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর হাতছানি যদি না দেখি তবে কিসের শিল্পকৃতি? এর পর ওজাস কি টেম্পারা, পট কি রঙ্গসূত্র, প্রাচীন কি আধুনিক ইত্যাদি ভেদবিচার আর মনে নেবনা; কেননা এ সব থেকেও এসবের ঊর্দ্ধে যে রস তাই এ-শিল্পসম্ভারকে মহনীয় ও সার্থক করেছে। এই মহৎ শিল্পসম্ভার সম্পূর্ণ করে রসিক সুজনকে পরিবেশন করে সুকৃতী শিল্পী প্রেমপক্ষ লাভ করে আপনার রচা নীড় ছেড়ে চিরতরে উড়ে গেছে—সে নীড় আজ শূন্য—নীড়ঃ শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ। তাঁর মৃত্যুদিনে (২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭১) চারুকলা ভবনের বার্ষিক প্রদর্শনীতে সে-পাখীর গাওয়া শেষ গান 'মীরাবাঈ' উপস্থাপিত হয়েছে। সে কুহকী আজ চিরন্তকুহক। বুঝি বা আরবার সে অশরীরী বাণী শুনেছিল :

প্রাহা শরীরী নবমেঘনিস্বনা
বাণী তমাহূয় চল স্বমন্দিরম্।

মহারাজা নন্দকুমারের চিঠি

কমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক বছর আগে কৃষ্ণঘাটার রাজবাড়ীতে মহারাজা নন্দকুমারের বড় মেয়ে সন্তানীর বংশধর কুমার দেবেন্দ্রনাথ রায় মশাই-এর হেফাজতে দু'খানি নন্দকুমারের লেখা চিঠি দেখেছিলাম। তার মধ্যে একখানি সম্পূর্ণ থাকলেও অনেক যায়গায় লেখা ঘষে গিয়েছিল, আর অন্য চিঠি খানির নীচের অংশ ছেঁড়া ছিল। দুখানি চিঠিই নন্দকুমার তাঁর একমাত্র পুত্র রাজা গুরুদাস রায় গৌড়পতি বাহাদুরকে লিখেছিলেন। একখানির তারিখ ছিল ১৫ই পৌষ, সন ১১৭৮ সাল এবং দ্বিতীয় খানির তারিখ ছিল ২০শে পৌষ, সন ১১৮৮ সাল। চিঠি দুখানির মধ্যে বর্তমানে প্রথম চিঠিখানি নন্দকুমারের বংশধরের কাছে ছিল, দ্বিতীয় ছেঁড়া চিঠিখানি পরে আর দেখা যায়নি। অনেক কাল আগে স্বর্গত সত্যচরণ শাস্ত্রী মশাই তাঁর লেখা মহারাজ নন্দকুমারের জীবনীতে এই ছেঁড়া চিঠির উল্লেখ করেছিলেন। সেকালের ঐতিহাসিকদের অনেকেই নন্দকুমারের চিঠি দুখানি দেখেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে মহারাজা নন্দকুমারের দৌহিত্র বংশধরদের কাছে মাত্র একখানি চিঠিই থেকে যায়। অন্য চিঠিখানির সঙ্গে আরও কিছু পুরনো আমলের ঐতিহাসিক দলিলপত্র নষ্ট হ'য়ে যায়। কৃষ্ণঘাটার রাজসেরেস্তার দফাকেজখানায় যে দু চারজন কর্মচারী সে সময়ে কাজ করতেন, মহাফেজখানার কাগজপত্র সংরক্ষণ সম্বন্ধে তাঁদের কোনও ধারণাই ছিল না। পুরানো কাগজপত্র পোকায় কাটলে সেসব তখন পুড়িয়ে ফেলা হতো।

১৯৬৬-৬৭ সালে ভারতীয় ঐতিহাসিক রেকর্ড কমিশনের বঙ্গ ও আসাম বিভাগীয় সার্ভে কার্যের সম্পাদক ব্যাটনার ঐতিহাসিক ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ কৃষ্ণঘাটা রাজবাড়ীতে ঐতিহাসিক দলিলপত্র দেখতে আসেন। সে সময়ে ডঃ সিংহকে নন্দকুমারের লেখা একখানি চিঠিই দেখানো হয়। নন্দকুমারের লেখা সন ১১৭৮ সালের ২০শে পৌষ তারিখের চিঠি খানির কোনও খোঁজই পাওয়া যায় না। তা ছাড়া রাজা গুরুদাস রায়কে লেখা আরও একখানি প্রাচীন দলিল ছিল, যাতে বজবজ গ্রামের জনৈকা চারু বেওয়া ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় নিজেকে রাজা গুরুদাসের কাছে বিক্রয় ক'রে দাসখত লিখে দিচ্ছে। সেই দাসখতের কাগজখানও সে সময়ে দেখা যায়নি। রাণী ভবানীর মহারাজা নন্দকুমারকে দেওয়া দানপত্র খানি অবিশ্যি তখনও ছিল এবং বর্তমান রাজবংশধর কুমার গৌরী শঙ্কর রায় সম্প্রতি সেই রাণী ভবানীর দলিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকারকে দান করেছেন। নন্দকুমারের লেখা যে চিঠিখানা আজও আছে তার বহু লাইনের লেখা মুছে যাওয়ার জন্যে চিঠির পাঠোদ্ধার করা যায় না। চিঠিখানি কোথা থেকে তিনি গুরুদাসকে লিখেছিলেন তারও কোনও উল্লেখ নেই। ১৭৬৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর নবাব মীরজাফর কলকাতা থেকে নন্দকুমারের সঙ্গে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন এবং মুর্শিদাবাদে ফিরে আসার পর তাঁর অসুখ বেড়ে যায়। ১৭৬৫ সালের ১৭ই জানুয়ারী তাঁর "নুর-এ-চশম্" লর্ড ক্লাইভের হাতে পাঁচ লাখ টাকার সোনা ও জহরত রেখে মীরজাফর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। সে সময়ে তাঁর মাহেব-দেওয়ান ছিলেন মহারাজা নন্দকুমার। মীরজাফরের ছেলে নজমউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের মসনদে বসলেন। ইংরেজ কোম্পানী নবাব সাদিক আলি খাঁ ওরফে মীরণ সাহেবের ছ'বছরের ছেলের মসনদ পাওয়ার দাবী নাকচ্ ক'রে দিলেন। অবিশ্যি এই দাবী নাকচ করার জন্যে ইংরেজ কাউন্সিলের সদস্যদের মোট ১,৪০,০০০ পাউণ্ড ঘুষ লাগলো। মহারাজা নন্দকুমার রায় রায়ান উপাধি নিয়ে নবাব নজমদ্দৌলার দেওয়ান-এ-খালসা হলেন। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানীর কর্তাদের সঙ্গে তখন তাঁর গোলমাল থেকে উঠেছে। ১৭৬৫ সালের ১৮ই মার্চ তিনি মুর্শিদাবাদ ছেড়ে

কল্‌কাতায় যান্। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর বড় জামাই লালা জগৎচন্দ্র, কুঞ্জঘাটার বর্ত্তমান রাজবংশের আদিপুরুষ।

ইতিমধ্যে ওয়ারেন হেষ্টিংস্ মুর্শিদাবাদ থেকে কল্‌কাতাতে খাল্‌সা বা খাজনাখানা উঠিয়ে আনলেন। ১৭৬৫ সালে খাজনাখানা থেকে নবাব নজম্ উদ্দৌলাকে দেওয়া হ'তো বার্ষিক মোট ৫৩ লক্ষ টাকা, ১৭৬ সালে সে টাকা কমিয়ে ৪১ লক্ষ করা হলো। আবার নজম উদ্দৌলার মৃত্যুর পরে তাঁর ভাই সৈফ-উদ্দৌলা নবাব হলে ১৭৭১ সালে এই টাকা কমিয়ে বার্ষিক ৩২ লক্ষ করা হলো। কিন্তু তখনও মহারাজা নন্দকুমার নবাব সৈফ উদ্দৌলার দেওয়ান-এ-খালসা। ইংরেজ কোম্পানীর একটি দল বিশেষ করে কাউন্সিলের সদস্য ওয়ারেন হেষ্টিংসের সঙ্গে তখন থেকেই নন্দকুমারের ঝগড়া পেকে উঠে। নন্দকুমার কলকাতা পৌঁছালে তাঁর বড় জামাই এর সঙ্গে তাঁকে নজরবন্দী ক'রে রাখা হয়। তাঁর বাড়ীতে সশস্ত্র সৈন্যের পাহারা বসানো হয়। পরে লর্ড ক্লাইভের হুকুমে পাহারা উঠিয়ে দিলে তাঁর বন্দীত্ব ঘুচেছিল। এ সম্পর্কে কলকাতা কাউন্সিলের সদস্য মিঃ জন এলটোন্ মহারাজার জন্মে তদ্বির করেছিলেন। নজম উদ্দৌলা নবাব হওয়ার সময় এই জনষ্টোন্ সাহেব মহারাজা নন্দকুমারের কাছ্‌থেকে ২৭,৬৫০ পাউণ্ড ঘুষ খেয়েছিলেন। সেই কারণে ইংরেজ কোম্পানীর কিছু কিছু বড় কর্ম্মচারী ও কাউন্সিলের সদস্যদের কেউ কেউ নন্দকুমারকে প্রীতির চক্ষে দেখতেন।

নন্দকুমারের পত্রখানি কল্‌কাতা থেকে ভদ্রপুরে রাজা শুকবাসকে লেখা হয়। পরে নন্দকুমারের দৌহিত্র রাজা মহানন্দ যখন ভদ্রপুরথেকে সমস্ত মালপত্র সমেত নন্দকুমারের বিধবা রাণী ক্ষেমঙ্করী ও শুকবাসের বিধবা রাণী জগদম্বা কুঞ্জঘাটায় নিয়ে আসেন, সেই সময় থেকে নন্দকুমারের চিঠিগুলি দৌহিত্র বংশের হাতে আসে। এই চিঠিখানি অনেকে ১৩ই পৌষ সন ১১৭৮ সালের লেখা বলেন। কিন্তু ডঃ সিংহের অনুমিত অনুসারে চিঠিখানি ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে লেখা এবং তার কারণ স্বরূপে তিনি বলেন যে চিঠিতে উল্লিখিত কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের সকলেই সে সময় মুর্শিদাবাদে ছিলেন। নিম্ন চিঠিখানি দেওয়া হলো :—

নন্দকুমারের বর্ত্তমান পত্র

(এই অংশের লেখা অস্পষ্ট)

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণং

প্রাণ প্রতিমেষু। পরম শুভাশীর্ব্বাদ শিবক বিশেষ।

তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা বাসনা করণক অত্র কুশল পরন্তঃ। ১১ পৌষ রাত্রের পত্র ২০ পৌষ রাত্রে পাইয়া সমাচার জানিলাম। সিপাহিদিগে মেস্ত্র গ্রাহাম ১ ও মেস্ত্র লরেন্স ও মেস্ত্র ডিগরু ইহারা সেগল সাহেবের নিকট আসিয়াছিল।...শ্রীরাম জগৎচন্দ্র থাকিয়া আপনার মতলব মাফিক...। শ্রীযুত বড় সাহেবকে লিখাইয়াছে।...মেস্ত্র আন্দরসন ও মকাবিলা বুঝিয়া যে কারণ তাহার সহায় ... সেগল সাহেব তোমাকে কহিয়াছেন...বিষয় তাহা তিন দফাতে দিতেছি।...তাহার দুষমনকে নিরস্ত করিব।... একতিয়ার হওনের নিমিত্ত...তদ্বির করা গেল।... ইহা কহিলে কিরূপে চাইবেক বরং তহকীর করিব যেন টাকা কর্জ্জ মাফিক না দিলে আমি ইহা কোথা চাইতে দিব। সুদ রোজ বরোজ ছুটিতেছে এক দফায় যেহের বাণী করিয়া টাকা দেন তবে ক্রম রক্ষা পায়। আর যদি তাহাও কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ করেন তবে দুই দফাতে যেবাক টাকা তাকিদ পাঠান তাহার মধ্যে এ পত্রের... সম্বলিত মবলগ ৩০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকার হুণ্ডী রাতে যেরাতে এথা পাঠাইবে। শীঘ্র যেখানে পঁহুতে এমত করিবে যেন টাকার হুণ্ডী পাঁচ সাত রোজে এথা আসিয়া দাখিল হয় এমন তরদ্দদ করিবে। বাকা'থ লোকসান না হয়...মহাজনের সুদের পৌঁছুটে হাত্রা করিবে। হুণ্ডীর হুণ্ডী সমেত...লিখিবা। ওঁকে প্রধান সাহেব এথা পাঠাইবে অন্য শ্রীযুত মেস্ত্র মেলটিন ও সাহেব লিখিলেন তাঁহাকে সাহেব অবশ্য পাঠাইবেন।...হুখাকার তোষদান যেওয়া লিখিবে আপনার মঙ্গল সমাচার লিখিয়া পত্রম... করিবে।

এই চিঠিতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে কয়জন কর্ম্মচারীর নাম উল্লেখ আছে, তাঁদের মধ্যে গ্রাহাম, লরেন্স ডেকার্স (ডিগরু), এণ্ডারসন (আন্দরসন) ও মিডলটন (মেলটিন) সকলেই ১১৭৯-৭২ সালে মুর্শিদাবাদে থাকতেন। লরেন্স ও গ্রাহাম ছিলেন ১১৭৯-৭২ সালে মুর্শিদাবাদের রেভিনিউ কাউন্সিল (Controlling Council of Revenue) এর সদস্য। তা ছাড়া ডেকার্স, লরেন্স ও গ্রাহাম তিনজনেই সার্কিট কমিটির সদস্য ছিলেন। ডেভিড এণ্ডারসন ছিলেন পার্সিয়ান আফিসের কর্ম্মচারী এবং দেওয়ানী সিপাহীদের পে-মাষ্টার। ব্যাখানিলে মিডলটন ছিলেন মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারে কোম্পানীর প্রতিনিধি এবং মতিঝিলে কোম্পানীর রেসিডেন্ট। মিঃ এণ্ডারসন মতিঝিলে রেসিডেন্টের সহকারী হিসাবেও কাজ করতেন। নজমউদ্দৌলা মসনদে বসার সময় যে একলাখ চল্লিশ হাজার পাউণ্ড কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের ঘুষ দেন, তার মধ্যে রেসিডেন্ট মিডলটনের ভাগে পড়েছিল ১৭,২৯১ পাউণ্ড। পরে তিনি পাটনা কুঠির প্রধান হয়েছিলেন এবং রোহিলা যুদ্ধের সময়

সংসৈন্যে ছিলেন। মিডল্টন ছিলেন হেষ্টিংসের দলের লোক এবং বিলাতে ওঁহাদের হেষ্টিংসের বিচারের সময় ফাথানিয়েল মিডল্টন তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। সে সময়ে সার্কিট কমিটির সদস্যদের মধ্যেও একজন মিটলটন ছিলেন। কাজেই নন্দকুমারের পত্রে লিখিত 'মদলটিন' কোন মিডল্টনকে বুঝাবে, সেটা ঠিক করা যায় না। ডেভিড এণ্ডারসন পরবর্ত্তী কালে কোম্পানীর রেজেনিউ কমিটির সদস্য হয়েছিলেন। এই চিঠিতে উল্লিখিত বেগম সাহেবা বলতে অবিশ্যি মণি বেগমকে বুঝায়।

নন্দকুমারের এই চিঠিতে তাঁর বড় জামাই লালা জগৎচন্দ্র সম্পর্কে কিছু বিরুদ্ধ অভিমত দিয়েছেন। কারণ তখন থেকেই জগৎচন্দ্র মহারাজার শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। এই সম্পর্কে নন্দকুমারের ২৯ পৌষের খত নীচে দেওয়া যাচ্ছে :—

সন ১১৭৮ সাল
২৯ পৌষের খত

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণং

প্রাণপ্রতিমেষু পরমেশ্বরীকৃপাপাত্রেষু শিবক বিশেষ :—

তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা বাসনা করনক অত্র কুশল পরম : ২৫ তারিখের পত্র ২ রোজ রাত্রে পাইয়া সমাচার জানিলাম শ্রীযুক্ত ছেতরত আলি খাঁ এবং এখানে আইসনের সম্বাদ যে লিখিয়াছিলে এতক্ষণতক পহুছেন নাই পহুছিলেই জানা যাইবেক শ্রীযুত রায় জগচ্চন্দ্রর বিষ রোজের পর বাটি হইতে আসিয়াছেন যেমত ২ কুচেষ্টা পাইতেছেন তাহা জানাই গেল তিনি যদ্যপি ২ ছাউন কলত কার্য্যের দ্বারাতেই বুঝিবেন স্পষ্ট হইয়া আপনারি মন্দ করিতেছেন সে সকল লোকেও অবশ্য বুঝিবেক তুমি শ্রীযুত মেস্ত্র মেকলটিন সাহেবের নিকট যাতায়াত করিবে এক খত তাঁহাকে লিখিলাম দিয়া নিরালা সকল কহিবে ও শুনিবে যখন যেরূপ যথোপযুক্ত হয় তাহার মত করিবে তিঁহ চিত্তে জানেন যে আমার কথা ক্রমেই ইনি কার্য্য করিতেছেন সুন্দররূপ তাঁহার সহিত মিলিবে কোন বিপএ উদ্বিগ্ন নহিবে শ্রীযুত লালা সুবংশ রায়ও সমং জানাইয়াছেন ক্রিহার স্থানে বিস্তারিত জাত হইয়া কার্য্য করিবে শ্রীযুত লালা ডোমন রায় ও যে লিখিয়াছেন কীলখানার দারোগা শ্রীযুত হাজি মুস্তফাও তাঁহার সহিত বিপক্ষতা করিতেছেন এবং কটুকথা কহিয়াছেন এ কেবত দ্বারা ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ হইল এতাবৎ আমি এক খত হাজি মুস্তাফাকে লিখিলাম এবং তাহার বিষয় মেস্ত্র মেকলটিন সাহেবকেও এক খত আলাহিদা লিখিলাম কহিবে পহুচাইয়া দেন হাজি মুস্তাফাকে তুমি সাক্ষাতে ডাকিয়া কহিবে ক্রিহ আমারিদের বেয়াদবির মধ্যে ইহার সহিত অসদ্ব্যবহার না করেন দুই জনকে মিলজুল করিয়া দিবে শ্রীযুত কালীনাথ রায় আজিহক পহুচিয়াই থাকিবেন শ্রীশ্রী৺ ঠাকুরাণি হটাস্থর বিষয় মন্দিরে স্থাপন করাইবে তাহার সঙ্গে আ আওর সকলের গিয়াছে পহুচিয়া দেখাইবে তুমি আপনার লইবে সাত মন ভাল গঙ্গাজলি গঙ্গের কারণ মধ্যে এক পত্র লিখা গিয়াছে শ্রীঈশ্বর নাথের পলওয়ারে কালীনাথ রায় গিয়াছেন সেই পলওয়ারে পাঠাইয়া দিবে। ধড়াঘাতে নিজ মঙ্গলাদি বার্ত্তা লিখিয়া তুষ্ট রাখিবে কিমধিকং ইতি তারিখ ২৯শে পৌষ রবিবার রাত্রেই ডাকে বাহি হইল।

সবিশেষ পত্রার্থে জ্ঞাত হইবে ১১ মাঘে রটন্তি চতুর্দ্দশীতে শ্রীশ্রী৺ দুই প্রতিমার স্থাপনা করাইবে তাহার পরে শ্রীযুত দিননাথ রায়কে এখা পাঠাইবে ফিরত আলি খাঁ এখা পহুচে নাকি হাবিল হইলে তাঁহার চলন থাকিক ব্যাবহার হবেক শ্রীযুত মিস্তর মেকলটিন সাহেবকে যে খত এ পত্রের মধ্যে লিখিয়া পাঠাইতেছি তাহাতে গোদ্ধ না দিয়া মজুর করিয়া পাঠাইলাম পাঠ করিয়া গোদ্ধ দিয়া বন্ধ করিয়া তাহাকে দিয়া তথাকার রোজনাম লিখিবা আপনার মঙ্গলবার্ত্তা লিখিয়া দিবা। রাখিবা কিমধিক ইতি।

নন্দকুমারের এই দ্বিতীয় পত্রে যে সমস্ত লোকের নাম উল্লেখ আছে, তাদের অনেকে তাঁর নিজস্ব কর্ম্মচারী বা আত্মীয় কুটুম্ব। লালা সুবংশ রায় বা লালা ডোমন রায় তাঁর বড় জামাই লালা জগচ্চন্দ্র রায়ের কুটুম্ব। নন্দকুমারের তিন মেয়ের মধ্যে বড় সম্বানী ও ছোট কিষুমণীর বিয়ে মৈদাবাদে হয়েছিল। জগচ্চন্দ্র কুলঘাট রাজপরিবারের স্থাপয়িতা এবং তাঁর ছেলে মহানন্দ পরে রাজা উপাধি পেয়ে নবাব সরকারে দেওয়ানী ক'রতেন। ছোট মেয়ের স্বামী রাধাচরণ রায়; তাঁর বংশধরেরা এত খ্যাতি লাভ করেন নি। এই চিঠিতে লালা জগৎচন্দ্রের সম্পর্কে নন্দকুমার তাঁর মনোভাব আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। নবাবী পিলখানার দারোগা হিসাবে যে হাজি মোস্তফার নাম করা হয়েছে তিনিই সয়ের-উল-মুতাক্ষরীণ নামে পারসী ভাষায় লিখিত নবাবী আমলের ইতিহাসের ইংরাজী অনুবাদক হাজি মোস্তফা বলে অনেকে মনে করেন মহারাজা নন্দকুমারের চিঠি নিয়েই আলোচনা এখানে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

বিদ্যা ও বিনয়

শ্রীজ্ঞান

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং—বিদ্যার সঙ্গে বিনয়ের যে একটা যোগসূত্র আছে সে কথা আজকাল অনেকেই মনে রাখেন না। তার কারণ বোধ হয় আজকাল সত্যকার বিদ্যার্জন অনেকের ভাগ্যেই ঘটে না। বিংশ শতাব্দীর এই মধ্য-ভাগে—এই অত্যাধুনিক যুগে, বিশেষ করে আমাদের দেশে বিদ্যার্জন হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণরূপে পুথিগত। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে যতটুকু দরকার শুধু ততটুকুই কোনও রকমে মুখস্থ করে, পরীক্ষাগৃহে প্রশ্নপত্রে লিখে, পাশ করতে পারলেই আজকালকার বেশীর ভাগ ছাত্রই নিজেদের বিদ্বান বলে মনে করে। কিন্তু কতটুকু সত্যকার বিদ্যা যে তাদের লাভ হল তা তারা একবারও ভেবে দেখে না। তার কারণ, পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেটটাই তাদের দরকার—বিদ্যা লাভ হল কি না হল, তাতে কিছু যায় আসে না।

লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে বিদ্যায়তনগুলিতে ছাত্র সংখ্যাও অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেছে। কিন্তু এই বিরাট ছাত্রগোষ্ঠীর মধ্যে কতজন সত্যিকার বিদ্যার্জনের জন্যে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে? বেশীর ভাগেরই উদ্দেশ্য কোনও রকমে পরীক্ষা-উত্তীর্ণ সার্টিফিকেট লাভ করে চাকরী যোগাড় করা। এ জন্য অবশ্য তাদের সম্পূর্ণরূপে দায়ী করা যায় না। এই বাস্তব যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে গিয়ে এবং উপার্জনের তাগিদে আজকালকার বেশীর ভাগ ছাত্র আর বিদ্যার্জনের জন্য সাধনা করে না—করে অর্থের জন্য, তাই বিদ্যা হয়ে পড়েছে অর্থকরী। আর এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বিদ্যার্জন করার ফলে যে সকল গুণ বিদ্যার্থীরা লাভ করত অতীতে, তা থেকে এখনকার ছাত্ররা বঞ্চিত হচ্ছে সর্বতোভাবে। বিদ্যার সঙ্গে আগে ছাত্ররা শিষ্টতা, শালীনতা প্রভৃতি অনেক কিছুই শিক্ষা করত। তাই তারা হত বিনীত—বিদ্যা তাদের শিক্ষা দিত বিনয়। কিন্তু আজকালকার শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্ররা তথাকথিতরূপে শিক্ষিত বলে পরিচিত হলেও, শিক্ষার সদ্‌গুণগুলি থেকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হচ্ছে। তাই ছাত্রসমাজের মধ্যে এখন বিনয়ী ছাত্রের সাক্ষাৎ খুব কমই মেলে। শিষ্টতা, ভদ্রতা প্রভৃতি গুণগুলি যেন এখনকার ছাত্রসমাজের মধ্য থেকে বিদায় নিয়েছে। বেশীর ভাগ ছাত্রই হয়ে পড়েছে অশান্ত, অশিষ্ট, দুর্বিনীত। তারপর রাজনৈতিক দলগুলির অশুভ প্রভাবে বহু ছাত্র নীতিভ্রষ্ট, কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়ছে। আজকালকার ছাত্র সমাজের এই অবস্থার পরিবর্তন কবে হবে জানি না। তবে ছাত্র সমাজের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হবে তখনই, যখন তারা সত্যকার শিক্ষার সুফলগুলি লাভ করে শান্ত, শিষ্ট ও বিনয়ী হয়ে উঠবে।

আশা করি তোমরা সকলেই বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে বিনয়ী হবারও চেষ্টা করবে। বিনয় মানুষের একটা মহৎ গুণই শুধু নয়, সত্যকার শিক্ষিত মানুষের সুশিক্ষার পরিচয়ও। এ কথাটা তোমরা মনে রাখবার চেষ্টা কর।

• • •

আলেকজান্দার ডুমা

রচিত

দী কাউণ্ট অব্ মণ্টি ক্রিষ্টো

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কম্পার চুড়াতে জেরার্ড যেন উন্মাদ হলো···সে ছুটলো স্ত্রীর ঘরে···স্ত্রী মনের আনন্দে ঘরে বসে আছে। জেরার্ড এসেই সগর্জ্জনে বললে,—যে বিষ তুমি চালাচ্ছো, সে বিষ কোথায় আছে···বলো মাদাম্?

মাদাম্ ভয়ে আকুল-কণ্ঠে বললে,—বিষ!···কি তুমি বলছো!···তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না!

সে কথায় কর্ণপাত না করে জেরার্ড বললে,—কোথায় সে বিষ লুকিয়ে রেখেছো, বলো···যে বিষে চার-চারজন মানুষের প্রাণ নিয়েছো!

জেরার্ডের উন্মাদ-মূর্ত্তি দেখে মাদাম্ উঠে দাঁড়ালো··· স্খলিত-কণ্ঠে বললে,—কিন্তু···কিন্তু···

জেরার্ড হুঙ্কার তুলে বললে,—না, না···তুমি সাধু সাজলে চলবে না!···বলো, কোথায় সে বিষ?···আশা করি, এ খুনের সাজা থেকে নিস্তার পাবে বলে তুমি নিজের জন্যও সে বিষ কিছু আলাদা করিয়ে রেখেছো!···তোমাকে ফাঁসি-কাঠে ঝুলিয়ে ছেলের আর নিজের অপমান করতে আমি চাই না···কিন্তু আমি বিচার চাই ··বিচার!···

দু'হাত জোড় করে বাষ্পকম্পিত-কণ্ঠে মাদাম্ বললে, —আমাকে ক্ষমা করো!···আমি বাঁচতে চাই···বাঁচতে চাই!···

জেরার্ড সগর্জ্জনে বললে,—না, সাজা তোমাকে পেতেই হবে!···আমি এখনি আসছি···এসে যেন দেখি—এ খুনের বিচার শেষ হয়েছে···নাহলে, নিজের হাতে তোমাকে গ্রেপ্তার করে আমি পুলিশের হাতে তুলে দেবো!

এমনি শাসিয়ে জেরার্ড বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল··· ফিরলো রাতে···ফিরে আসতেই মাদাম্ বললে,—বিচার শেষ!···

এ কথার সঙ্গে সঙ্গে মাদামের বিষ-জর্জ্জর দেহ মৃত্যুর কোলে ঢুলে পড়লো। জেরার্ড ঘর থেকে বেরুলো··· কোথায়···আমার ছেলে কোথায়?···

ভৃত্য বললে,—মাদাম্ তাঁকে আধঘণ্টা আগে নিজের কাছে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

জেরার্ড ফিরে এলো স্ত্রীর ঘরে···এসে দেখে—ছেলে এডোয়ার্ডের দেহ প্রাণহীন···মেঝেয় পড়ে আছে···তার বুকের উপর একখানা চিঠি!···মাদামের হাতে-লেখা চিঠি ···চিঠিতে লেখা রয়েছে—

···তুমি জানো, যত বড় আমি হই—আমি কুমাতা নই ···ছেলের কল্যাণ চেয়েছি চিরদিন! যা আমি করেছি, সে সবই ছেলের ভালোর জন্যই! কাজেই ছেলেকে এখানে অসহায় ফেলে রেখে যেতে পারবো না বলে তাকেও আমি আমার সঙ্গে নিয়ে চললুম!···

চিঠি পড়ে টলতে টলতে জেরার্ড এলো কাউণ্টের কাছে···কাউণ্টকে জেরার্ড খুলে বললে তার নিদারুণ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের বিবরণ!

কাহিনী শুনে কাউণ্ট বললে,—বাবু, আমার কাছে তোমার যে ঋণ ছিল, তা শোধ হয়েছে!···আমি তোমাকে মার্জ্জনা করছি···এবং আজ থেকে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো, তিনিও যেন তোমাকে ক্ষমা করেন।

এ কথা শুনে জেরার্ড অবাক! সে বললে,—কিন্তু তুমি কে?···আমি তোমার কী অনিষ্ট করেছি?

নিশ্বাস ফেলে কাউণ্ট বললেন,—তুমি অবিচার করে আমাকে যাবজ্জীবন নির্জ্জন কারাকক্ষে নিক্ষেপ করেছিলে ···স্বাধীনতা, ভালোবাসা, সুখ—সব কিছু থেকে আমাকে

বঞ্চিত করেছিলে—বিনাদোষে!···চিনতে পারছো না আমাকে?···আমিই সেই এডমণ্ড দাঙ্তে!

পরিচয় পেয়ে কাউণ্টকে এক রকম টেনে নিয়েই জেরার্ড এলো নিজের গৃহে···স্ত্রীর ঘরে!···ঘরের মেঝের পড়ে রয়েছে স্ত্রীর আর এডোয়ার্ডের প্রাণহীন দেহ!

এ দৃশ্য দেখে কাউণ্ট বললে,—এ কি!···ছেলেকেও মেরেছে!···এতটা আমি চিন্তা করিনি!

জেরার্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে···অবিচল তার দৃষ্টি মৃতদেহের উপর নিবদ্ধ! হঠাৎ তার মুখের শিরা ফুলে উঠলো···চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে···তার মাথার মধ্যে আগুনের প্রবাহ!···ক্ষোভে দুঃখে আচমকা হা-হা অট্টহাস্য করে উঠলো জেরার্ড···কাউণ্ট স্পষ্ট বুঝতে পারলেন—সে বদ্ধ পাগল···উন্মাদ হয়ে গেছে!

বাকী এখন ড্যাঙ্গ্লার্স···

কাউণ্ট এবারে এলেন ড্যাঙ্গ্লার্সের কাছে···এসে বললেন,—আমাদের রীতিমত দুর্ব্বৎসর চলেছে কার্ণান্স্···আমার বহু বিপদ গিয়েছে···প্রচুর শোক-দুঃখ পেয়েছি!···

কার্ণান্স্ বললে—কিন্তু শোক বলুন, দুঃখ বলুন, আর বিপদই বলুন—যদি টাকা থাকে প্রচুর, তাহলে শোক-দুঃখ গায়ে লাগে না···সহ্য হয়!

কাউণ্ট বললেন,—টাকায় যদি সান্ত্বনা মেলে, তাহলে বটে···হ্যাঁ···আমি কোটিপতি মানুষ, কিন্তু টাকার টান্ পড়েছে আপাততঃ!···আপনার কাছে আমার পাওনা ষাট লক্ষ টাকার মধ্যে আমি দশলক্ষ মাত্র নিয়েছি···আমার বাকী পঞ্চাশলক্ষ টাকা এখনি চাই!···বিশেষ প্রয়োজন!···

—কিন্তু···

ড্যাঙ্গ্লার্সের কথা বেধে গেল।

কাউণ্ট বললেন,—কি, পারবে না?···

—না, না, তা নয়!···আমি এখনি দিচ্ছি!

ড্যাঙ্গ্লার্সকে তখনি দিতে হলো কাউণ্টকে কব্জুরে নগদ পঞ্চাশলক্ষ টাকা!

এত টাকা নিমেষে বেরিয়ে যাবার ফলে, ড্যাঙ্গ্লার্সের অবস্থা হলো খুবই বিপন্ন···তার ব্যাঙ্ক ফেল্ হয়ে গেল!··· পাওনাদারের দল বার-বার তাগিদ দেয়···ড্যাঙ্গ্লার্স কাকেও টাকা দিতে পারে না···শেষে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে অপমান থেকে নিস্তার পাবার জন্য ড্যাঙ্গ্লার্স দেশ ছেড়ে পালালো ইতালীতে।

কিন্তু সেখানেও নিস্তার নেই! কাউণ্ট তার পিছু নিয়ে চললেন ইতালীতে এবং সেখানে গিয়ে ক'জন দস্যু-বাটপাড়কে বখশিশ্ দিয়ে হাত করে ড্যাঙ্গ্লার্সকে পাকড়ে এক অন্ধকূপ-কারাগারে তালাবন্ধ করে রাখলেন। অসীম যন্ত্রণায় অনাহারে কারাগারে বন্দী-দশায় ক'দিন কাটালো ড্যাঙ্গ্লার্স!

কদিন পরে কারা-কক্ষে মৃতপ্রায় ড্যাঙ্গ্লার্সের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন কাউণ্ট···তাকে বললেন,—জীবনে যে সব গর্হিত-অন্যায় কাজ করেছো, তার জন্য মনে অনুতাপ হচ্ছে, ড্যাঙ্গ্লার্স?

ক্ষীণকণ্ঠে ড্যাঙ্গ্লার্স বললে,—হ্যাঁ···সত্যিই খুব অনুতাপ হচ্ছে!

মৃদু হেসে কাউণ্ট বললেন,—তাহলে তোমাকে ক্ষমা করলুম!

সবিস্ময়ে ড্যাঙ্গ্লার্স বললে,—কিন্তু···তুমি কে··· জানতে পারি?

কাউণ্ট বললেন,—আমি!··· যার জীবনকে পায়ে চেপে পিষে থেঁৎলে তোমরা এত উন্নতি করেছো···মিথ্যা অপবাদ দিয়ে যার বাবাকে গারদে পাঠিয়ে অনাহারে শুকিয়ে মেরেছো···আমি হলুম সেই নিতান্ত অভাগা-জন!··· চিনতে পারছো?···

এ কথা শুনে কাউণ্টের আপাদমস্তক লক্ষ্য করে ড্যাঙ্গ্লার্স শিউরে উঠলো··· সচকিত-কণ্ঠে বললে,—তুমি···তুমি ···তুমি···

অবিচলিত-কণ্ঠে কাউণ্ট বললেন,—তোমাকেও তাই অন্ধকূপে ফেলে অনাহারে শুকিয়ে মারবার জন্য এ ব্যবস্থা করেছি!···এখন বুঝেছো—আমিই সেই এডমণ্ড দাঙ্তে!

ড্যাঙ্গ্লার্স কাউণ্টের পায়ে লুটিয়ে পড়ে আর্ত-কণ্ঠে আবেদন জানিয়ে বললে,—আমাকে ক্ষমা করো, দাঙ্তে!

কাউণ্ট বললেন,—ওঠো ড্যাঙ্গ্লার্স···ভয় নেই!··· তোমাকে মুক্তি দেবো এ কারাগার থেকে!

তারপর···

ম্যাক্সিমিলিয়ান্ আর ভ্যালেন্টিন্···তাদের কথা।

কদিন থেকে অজ্ঞান-অচৈতন্য ভ্যালেন্টিনের দেহ তুলে এনে ঔষধ-পথ্যে তার মূর্চ্ছা ভাঙিয়ে তাকে আরোগ্য করার দিকে কাউণ্ট একান্তভাবে নজর দিলেন। ভ্যালেন্টিন আরোগ্যলাভ করলে, ম্যাক্স মিলিয়ান্ আর ভ্যালেন্টিনকে নিয়ে কাউণ্ট এলেন মল্টি ক্রিষ্টো দ্বীপে···সেখানে এসে সাদরে মহা-সমারোহে তাদের বিবাহ দিলেন।

বিবাহের পর নব-দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করে কাউণ্ট বললেন,—আমি না থাকলে তোমরা দুজনে বেঘোরে প্রাণ হারাতে !···এখানে আমার অগাধ ঐশ্বর্য্য···তোমরা দুজনে তার একচ্ছত্র মালিক হয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করো !··· ভগবান তোমাদের দীর্ঘজীবী করুন।···আমি এখন বিদায় নেবো !···

কাউণ্ট শেষ পর্য্যন্ত সত্যিই চলে গেলেন, দ্বীপ থেকে যাবার সময় ম্যাক্স মিলিয়ান্ আর ভ্যালেন্টিনের নামে চিঠি লিখে গেলেন ! সে চিঠিতে কাউণ্ট লিখেছেন—

···বিবাহের উৎসব শেষ করেই তোমরা এ দ্বীপ থেকে দেশে ফিরতে পারবে—সে ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলুম।··· দেশে ফিরে গেলে মাঁশিয়ে নোর্ত্তিয়ার তোমাদের দুজনকে শুভাশীর্ব্বাদ জানাবেন বলে অধীর-আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন।

তোমরা আমার মঙ্গলকাঙ্ক্ষী - শেষ জীবনে অনেক মন্দ কাজ করেছি হয়তো···এমন কি, অনেক সময় সজ্ঞানে ভগবানের বিধানও অন্যায়ভাবে অমান্য করে বসেছি···কিন্তু পরে উপলব্ধি করেছি···সে সবই মিথ্যা···নিছক অনাচার ···আত্ম-তৃপ্তির অসার অপলাপ মাত্র ! তাই আজ একান্ত সহজ হয়েই অনুরোধ জানাচ্ছি, সে সব পাপ-মোচনের উদ্দেশ্যে তোমরা দুজনে ভগবানের কাছে আমার জন্য যাবে মাঝে শুধু এই প্রার্থনা জানিও যে তিনি যেন সুবিচার করেন···আমাকে ক্ষমা করেন।

তোমরা দীর্ঘজীবী হও···সুখী হও ···তোমাদের জীবন যেন আগাগোড়া সার্থক-সুন্দর হয়ে ওঠে—এই আমার একমাত্র কামনা।

ইতি
তোমাদের চির-শুভাকাঙ্ক্ষী
এডমণ্ড দান্তে
কাউণ্ট অফ্ মল্টি ক্রিষ্টো

——

মার্টিন ক্রবিশার

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

তোমরা ক্রবিশার উপসাগরের কথা নিশ্চয় শুনেছ। একজন দুঃসাহসী নাবিকের নাম হতে এই উপসাগরের নাম হয়েছে। সেই কথাই তোমাদের নিকট সংক্ষেপে বলছি।

সে আজ অনেক বছর আগের কথা। রাণী এলিজাবেথ তখন ইংলণ্ডের রাণী। মার্টিন ক্রবিশার নামে একজন নাবিক ঠিক করলেন—আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে এশিয়ার পথ তিনি আবিষ্কার করবেন। তখন ইংলণ্ডের নাবিকদের মনে আবিষ্কারের নেশা লেগেছিল। সে এক উদ্দীপনার দিন।

ক্রবিশারও মেতে উঠলেন সেই নেশায়। তিনি ইংলণ্ডের রাণীর অনুমতি নিয়ে প্রস্তুত হলেন সমুদ্র-যাত্রায়। দুখানা জাহাজ ঠিক করা হল। সাজ সাজ রব পড়ে গেল। মালপত্র তোলা হল। শেষে শুভদিন দেখে ক্রবিশার রওনা হলেন। রাণী স্বয়ং রুমাল উড়িয়ে ক্রবিশারকে অভিনন্দন জানালেন। ক্রবিশারের জাহাজ টেমস নদীর উপর দিয়ে হেসে দুলে চলল। শেষে তারা এসে পড়ল আটলান্টিক মহাসাগরে।

যে দিকে চাও কেবল নীল জলরাশি। তার না আছে তল, না আছে সীমা। দিনরাত্রি সাগরের বুক চিরে জাহাজ চলছে। এভাবে তারা চলল বহুদিন। ক্রমে এত শীত যে হাত পা সব আড়ষ্ট হয়ে আসছে। তথাপি ক্রবিশারের থামবার নাম নেই। তিনি এগুচ্ছেন। শীত দেখে নাবিকরা আরো ভয় পেয়ে গেল। আরো যদি শীত বাড়ে—তবেই মুস্কিল। শীতে ওরা জমাট হয়ে যেতে পারে। তারা আর এগুতে চাইল না। কিন্তু ক্রবিশার কারুর কথা শুনলেন না। তিনি এগিয়ে চললেন। একেই সকলে শীতে কাহিল, তার উপর এলো ঝড়। ঝড় এলো খুব বেগে। ক্রবিশার মনে করলেন এখনি জাহাজ দুটি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। নাবিকরা ভীষণ ভয় খেয়ে গেল। কিন্তু সে যাত্রাও ভগবান্ তাদের রক্ষা করে দিলেন।

কিন্তু বিপদ কাটল না, হঠাৎ কোথা থেকে কুয়াশা এলো। তাদের জাহাজ দুটিকে ঢেকে দিল। চোখে কিছু দেখা যায় না। এখন ক্রবিশারের মনে হল—যদি জাহাজে জাহাজে ধাক্কাধাক্কি লাগে তবেই সর্ব্বনাশ। সেজন্য টিন পিটাতে লাগলেন। কিন্তু সে বাদ্যও তাদের কাছে কেটে গেল। কুয়াশা দূর হল। কুয়াশা দূর হতেই তাঁরা দেখলেন, সামনেই গ্রীণল্যাণ্ডের উপকূল। তাঁরা একটা তীরে এসে উঠলেন। কিন্তু একি যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল বরফ আর বরফ। বরফের শেষ নেই। চারিদিকে নীরবতা। এ যেন মৃত্যুপুরী। এখানে আর জল নয়। যেদিকে চাও শুধু বরফ আর বরফ। এ যে বরফের দেশ!

নাবিকেরা অবাক হয়ে দেখছে। সব সাদা। সাদায় সাদায় ভরে গেছে। গাছপালা নেই। জনমানুষ নেই। কেবল বরফ। এমন সময় তারা একটা ভীষণ শব্দ শুনল। মনে হল এক সঙ্গে কেউ হাজার কামান দাগছে। এ শব্দ কিসের? সকলেই হয়ে অস্থির। শেষে ক্রবিশার অনুসন্ধান করে জানলেন, উত্তর দিকে, অনেক দূরে—একটা বরফের পর্ব্বত ভেঙে নীচে বরফের সমুদ্রে পড়েছে। তখন নাবিকদের ভয় দূর হল।

জাহাজ আবার চলল। এবার বরফের ভিতর দিয়ে কিছুদিন চলল। এরপর ক্রবিশার একটা প্রণালী দেখতে পেলেন। ক্রবিশার ভাবলেন, এই পথ দিয়ে তারা প্রশান্ত মহাসাগরে পড়তে পারবে। সকলেই বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। নাবিকরা খুশি মনে জাহাজ চালিয়ে দিল। অনেকদূর যাওয়ার পর, তাঁদের খেয়াল হ'ল—এটা প্রণালী নয়। সমুদ্রের একটা প্রশস্ত বাহু স্থলভাগের ভিতর প্রবেশ করেছে। কাজেই ক্রবিশারকে ফিরে আসতে হল। এই উপকূলের এক জায়গায় তিনি এস্কিমোদের দেখা পেলেন। তারা হরিণের চামড়ার নৌকো করে সমুদ্রে বেড়াচ্ছে। তাদের চুল খুব কালো। মুখ গোল। নাক চেপ্টা, গায়ে সিল মাছের চামড়ার পোষাক। এদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ক্রবিশার পাঁচ জন নাবিক পাঠালেন। কিন্তু তারা আর ফিরল না। এস্কিমোরা তাদের ধরে নিয়ে গেছে। ক্রবিশার এতে খুব চটে গেলেন। তিনিও একজন এস্কিমোকে ধরে নিয়ে জাহাজে তুললেন। তারপর তিনি ইংলণ্ডে ফিরে এলেন। ইংলণ্ডের লোকেরা তাঁকে রাজকীয় সম্মান দিলেন। তিনি আসবার সময়, জাহাজে করে অনেক চামড়া ও কালো পাথর এনেছিলেন। স্যাকরা পাথর পরীক্ষা করে বললেন, এতে সোনা আছে। এরপরও ক্রবিশার আর দুইবার সেখানে গিয়েছিলেন। কোন বারই তিনি কৃতকার্য্য হতে পারেন নি, ক্রবিশার যে প্রণালীতে গিয়েছিলেন—তাহা প্রণালী নয় উপসাগর। কাজেই তিনি নিজের নামে উপসাগরের নাম রাখলেন ক্রবিশার উপসাগর। এখনও সেই নামেই আছে। তোমরা বড় হলে তাঁর জীবনী পড়ো। বেশ আনন্দ পাবে।

——

চিত্রগুপ্ত

এবারে শোনো—রহস্যময় বিজ্ঞানের আরেকটি আশ্চর্য্যময় কারসাজির কথা। বিজ্ঞানের কারসাজি হলেও এ খেলায় কলা-কৌশল নিতান্তই সহজ-সরল এবং সাজ-সরঞ্জামও যা দরকার—তাও অল্প আর খুবই ঘরোয়া-সামগ্রী। কাজেই এ খেলা দেখানোর জন্য তোমাদের কাকেও মোটা খরচ বা কোনো রকম হাঙ্গামা ভোগ করতে হবে না—বরং ছুটির দিনে দিব্যি আনন্দে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের আসরে বিচিত্র মজার এই খেলাটি দেখিয়ে সবাইকে রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে তোমরা অনায়াসেই। শুধু কসরতী দেখিয়ে তাক্ লাগানো নয়; উপরন্তু, এ খেলা দেখিয়ে আসরের প্রত্যেককেই তোমরা খুব সোজা উপায়ে বিজ্ঞানের রহস্যময় একটি অভিনব তথ্যেরও সুস্পষ্ট পরিচয় দিতে পারবে।

এ খেলাটি দেখাতে হলে, টুকিটাকি যে দুয়েকটি সাজ-

সরঞ্জাম প্রয়োজন, আগাততঃ, তার হদিশ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এ খেলা দেখানোর জন্য চাই—নীচের ১নং ছবিতে মাথায় চাকনী-সমেত যেমন ধরণের টিনের ক্যানেস্তা দেখছো, ঠিক তেমনি-ছাঁদের ছোট বা বড় সাইজের একটি টিনের-তৈরী পাত্র। সচরাচর মোটর-গাড়ীর ইঞ্জিনে দেবার উপযোগী তেল (Engine oil for Automobiles) রাখার জন্য যে-ধরণের টিনের তৈরী ক্যানেস্তা বা পাত্র ব্যবহার করা হয়, ঠিক তেমনি ছাঁদের সামগ্রী জোগাড়

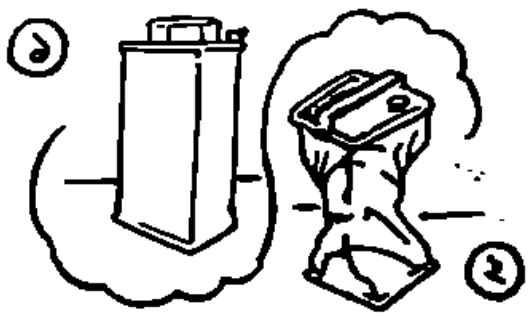

করলেই চলবে। তবে সে পাত্রটিতে যেন এক কৌটা তেল সঞ্চিত না থাকে—একেবারে খালি তেল-শূন্য হওয়া দরকার। কারণ, খেলা দেখানোর সময়, পাত্রটিতে জল ভরে নিতে হবে এবং জল ভর্ত্তি সেই পাত্রটিকে জলন্ত-উনানের আঁচে বসিয়ে রেখে রীতিমত উত্তপ্ত ও ফুটন্ত করে নিতে হবে। কাজেই পাত্রটি তেল ভর্ত্তি—এমন কি তেলের ছিটে-ফোঁটা হয়ে গেলেও, আসরে দর্শকদের সামনে খেলা দেখানোর সময়, শুধু যে অল্প-বিস্তর অসুবিধা ঘটবার সম্ভাবনা তাই নয়, তেল থাকার ফলে, একটু অসাবধান হলেই অগ্নিদগ্ধ হবারও আশঙ্কা রয়েছে। কাজেই এ বিষয়ে গোড়া থেকেই বিশেষ হুঁশিয়ার হওয়া প্রয়োজন।

টিনের পাত্রটি জোগাড় হবার পর, কয়েক পেয়ালা জল তেলে কেটির প্রায় অর্দ্ধেকাংশ ভরে তুলতে হবে। এবারে ঐ জল ভর্ত্তি টিনের পাত্রটিকে কিছুক্ষণ জলন্ত-উনানের আঁচে বসিয়ে রেখে, পাত্রের জলটুকু আগাগোড়া রীতিমত তপ্ত-ফুটন্ত করে নাও। এমনিভাবে জল ফুটনোর ফলে, টিনের পাত্রের ভিতরকার বাতাস যখন অধিকাংশই গরম বাষ্পের চাপে বাইরে বেরিয়ে আসবে, তখন খুব সাবধানে উনানের উপর থেকে ফুটন্ত জলভর্ত্তি পাত্রটিকে ঘরের মেঝেতে নামিয়ে রেখে, পাত্রের মুখের চাকনাটীকে পাকাপোক্তভাবে এঁটে দাও অর্থাৎ, পাত্রের ভিতরকার উত্তপ্ত-বাষ্প যেন কোনো ফাঁকে এতটুকু না বাইরে বেরিয়ে যায়। তবে হুঁশিয়ার, এ কাজের সময় অসাবধানতার ফলে, জলন্ত উনানের আগুনের আঁচে কিম্বা উত্তপ্ত টিনের পাত্রের ছোঁয়াচ লেগে তোমাদের কারো দেহে যেন কোনো রকম ছ্যাঁকা না লাগে—সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখো সর্ব্বদা।

এবারে ফুটন্ত-জলভর্ত্তি ঐ চাকনী-আঁটা উত্তপ্ত টিনের পাত্রটির উপরে ঘটি, মগ বা বালতির সাহায্যে বেশ কয়েক বার ঠাণ্ডা জল ঢেলে যাও—তাহলেই দেখবে—বিজ্ঞানের রহস্যময় বিচিত্র-বিধানে উপরের ১নং ছবিতে দেখানো মুটাম সুন্দর টিনের পাত্রটি ক্রমশঃ নিজে নিজেই আগাগোড়া দুমড়ে-তেবড়ে বেঁকে নিয়ে ২নং ছবির ছাঁদের বেয়াড়া-বিশ্রী আকার ধারণ করেছে—কোনো মানুষের গায়ের জোরে মুগুর বা হাতুড়ী পেটারও প্রয়োজন হয়নি এতটুকু।

এমনটি কেন হয়, জানো?—শোনো তাহলে—এর আসল রহস্যের কথা।

অর্থাৎ, এমনটি ঘটবার কারণ হলো—চাকনী-বন্ধ উত্তপ্ত টিনের পাত্রের ভিতরকার ফুটন্ত জল থেকে যে গরম বাষ্প ওঠে, বাইরে থেকে ক্রমাগত ঠাণ্ডা জল ছিটানোর সংস্পর্শে এসে, সেটুকু সহজেই জমে (Condensed) যায়। তার ফলে, টিনের ভিতরে বাতাসের তাপমাত্রা হ্রাস (Low Pressure of air) পায়—কিন্তু টিনের পাত্রের বহির্ভাগে বাতাসের তাপমাত্রা তখন অনেক বেশী পরিমাণে থাকে বলেই, বাইরের বাতাসের গুরু চাপে মুটাম সুন্দর টিনের পাত্রটি ক্রমশঃ নিজে নিজেই বেঁকে দুমড়ে তুবড়ে গিয়ে বেয়াড়া কুশ্রী রূপধারণ করে।

এই হলো—বিজ্ঞানের বিচিত্র রহস্যময় লীলার আসল মর্ম্ম। এবারের আজব মজার খেলাটি থেকে এই তথ্যেরই সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে।

—

মনোহর মৈত্র

২। আস্তাবলে ঘোড়া রাখার হেঁয়ালী ঃ

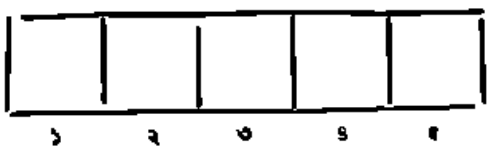

উপরে সরল-রেখা (straight Line) দিয়ে রচিত যে পাঁচটি চৌকোণা-ঘর দেখছো, সেগুলি হলো কোনো এক ঘোড়াওয়ালার ঘোড়া রাখার আস্তাবল (stable)। আস্তাবলের এই পাঁচটি ঘরে রাখা হতো ঘোড়াওয়ালার পাঁচটি ঘোড়া···অর্থাৎ, প্রত্যেকটি ঘরে ছিল একটি করে ঘোড়া রাখবার ব্যবস্থা। এতদিন এই ব্যবস্থা মতোই তাঁর পাঁচটি ঘোড়াকে সযত্নে আস্তাবলে রেখে আসছিলেন। সম্প্রতি তিনি আরো পাঁচটি নতুন ঘোড়া কিনেছেন··· কাজেই তাঁর আস্তাবলে ঘোড়ার সংখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে—মোট দশটি। কিন্তু মুস্কিল বাধলো আস্তাবলের মাত্র পাঁচটি ঘরে, দশটি ঘোড়াকে রাখার ব্যবস্থা করতে গিয়ে··· কারণ পূর্বেই বলেছি যে আস্তাবলের প্রত্যেকটি ঘরে মাত্র একটি করে ঘোড়া রাখার জায়গা আছে···তার বেশী আর এতটুকু স্থান নেই সেখানে। কাজেই বাড়তি ঘোড়া পাঁচটিকে আস্তাবলে ঠাঁই দিতে গিয়ে ঘোড়াওয়ালা পড়লেন ভীষণ ফাঁপরে।···এ সমস্যার সমাধান তিনি আসলে অনেক আঁকজোক-হিসাব কষেও কিছুতেই করতে পারলেন না··· তবে মগজের দুই-বুদ্ধি খাটিয়ে তাঁরই আস্তাবলের এক ছোকরা সহিস শেষ পর্যন্ত কাগজে-কলমে লিখে দেখিয়ে দিলে—কি উপায়ে সংজেই উপরের নক্সার ঐ একরত্তি আস্তাবলের-ঘরে দশটি ঘোড়াকে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা যাবে। তোমরা তো চেষ্টা করে—তোমাদের কেউ যদি পারো সেই উপায়টি সঠিকভাবে আমাদের দপ্তরে লিখে পাঠাতে।

তবে খেয়াল রেখো—আস্তাবলের পাঁচটি ঘরের কোনোটিতে যেন একের বেশী দুই না থাকে আগে।

কল্যাণী মুখোপাধ্যায়

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

২। তিন অক্ষরে নাম মোর
সর্ব্ব গৃহে রই,
আদি আর মধ্য মিলে
বিষাক্ত জীব হই।
মধ্য আর অন্ত মিলে
সুখাদ্য বুঝাই,
আদি আর অন্ত মিলে
শুধু···নাই, নাই!

রচনা : শাশ্বত গোস্বামী (যাদবপুর)

৩।
গাছেতে জন্ম মোর—
খেতে কালে-মিষ্টি···
প্রথমাক্ষ দিলে ছেড়ে—
তাও লাগে মিষ্টি!
শেষার্দ্ধ বাদ দিলে—
শিরে লাগে নানা···
কি যে বস্তু, বলো দেখি—
বুদ্ধি যাবে জানা!

রচনা : চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালি'র উত্তর :

১। জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ

বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল-জলধি-তরঙ্গ।
তব শুভ-নামে জাগে, তব শুভ-আশীষ মাগে,
গাহে তব জয়-গাথা।

২। জাবরুল
৩। মসজ

গতমাসের তিনটি প্রাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছেন :

মৃদু মিত্র (কলিকাতা), টিনি ও রনি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), হাবলু, টাবলু, পুতুল ও সুষমা (হাওড়া), পুপু ও তুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), সত্যেন, সরজু, মুরারি, সুনীল ও অমিয় (তিলাই), বুলু ও বিলু ভাদুড়ী (কলিকাতা), অচ্চি, ছোটন ও পাপু ঠাকুর (বোলপুর), পূর্ণিমা ও দীপা মণ্ডল, অনীতা ও অনিমা পাল এবং ভাস্কর মণ্ডল (বিদ্যাধরপুর), জহরলাল কর (আম্বেদপুর), ধীরেন্দ্রনাথ মোদক (বাঁশবেড়িয়া), নবকুমার শাসমল (চেতুয়ারাজনগর), সুকৃতিকুমার, সুনীতিকুমার, মনোরমা, গৌরীবালা ও মদনমোহন মিশ্র (রাণপুর), রঞ্জনা ও পিনাকী বসু (লক্ষ্ণৌ), নন্দকিশোর, দেবব্রত, তপতী, তাপসী ও সমীরকুমার গোস্বামী (তেলাইগোড়া), রাণা, বাবা, আপী, টুকটুক ও মিঠু সেন (কলিকাতা), আদু, দুদু ও সুবু (ওকরাবাড়ী), ক্ষমা, সীমা, দীপালী, অপর্ণা, রীতা ও জয়ন্ত প্রদীপ বাগচী (কোচ), চন্দা দেবী ও নারায়ণ-প্রসাদ জালান (হাওড়া), গোকুল ও রেবা বসু (নাগপুর)।

গত মাসের ছুটি প্রাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছেন ঃ

রনি ও রীতু দাসগুপ্ত (কলিকাতা), বাপ্পা ও শিবাজী রায় (কলিকাতা), বাপি, বুতাম ও পিন্টু (বোম্বাই), মিঠু ও বুবু গুপ্ত (কলিকাতা), শর্মিষ্ঠা ও শঙ্খমিত্রা রায় (কলিকাতা), দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্যাঙ্গালোর), রাণা ও টুনা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), শ্যামাদাস দেবশর্মা (উত্তরপাড়া), বিনয়েন্দ্রকুমার ও বিনয়েন্দ্রকুমার সিংহ (হাওড়া), নরেন্দ্রনাথ ঘোষ (হুগলী),

গতমাসের একটি প্রাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছেন :

বিশ্বনাথ ও দেবকী সিংহ (গয়া), শুভা, সোমা, বাবলা ও কল্পনা (কলিকাতা) নিশানাথ ও উষানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা)।

শিশুদের প্রতি

মুক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্গ কেমন জীবনে তা হয়নি দেখা কভু ;
পারিজাতের পাপড়িগুলি চিনতে পারি তবু।
শিশুরা সব আকাশ-ছোঁয়া বিরাট হিয়া ল'য়ে—
ওষ্ঠ-পুটে স্বর্গ-সুধা আনলো বেয়ে ব'য়ে।
বৃন্ত খ'সে পড়লো এসে, এই ধরণীর বুকে ;
স্বর্গ ভুলি' মর্ত্য-ধূলি মাখতে এলো সুখে।
তেমনি আছে কোমল দেহ, সেই অমলিন হাসি ;
তেমনি আছে সুবাস বুকে, হয়নি আজো বাসি।

(২)

ওরে, তোদের স্নিগ্ধ-সরল প্রাণের ছোঁয়া লেগে—
মরুর বুকে, তরুর স্মৃতি উঠলো যে মোর জেগে।
মধ্যদিনে পড়লো মনে উষার রাঙা স্মৃতি ;
ফুলের বনে মেহুর হাসি, মধুর কল-গীতি।
(তোদের) চিত্ত-দীপে ভাঙা প্রদীপ দেনারে মোর জ্বেলে ;
সরলতার তরল-স্নেহ একটু দেনা ঢেলে।
প্রাণখোলা ওই সরল হাসি একটুখানি পেলে—
ছাড়তে রাজী যা আছে মোর সকলি অবহেলে।
(তোদের) চিত্ত-দীপে ভাঙা প্রদীপ দেনারে মোর জ্বেলে ;
কে চায় বল পুঁতির মালা, মোতির মালা ফেলে ?

ঘুড়ির কথা

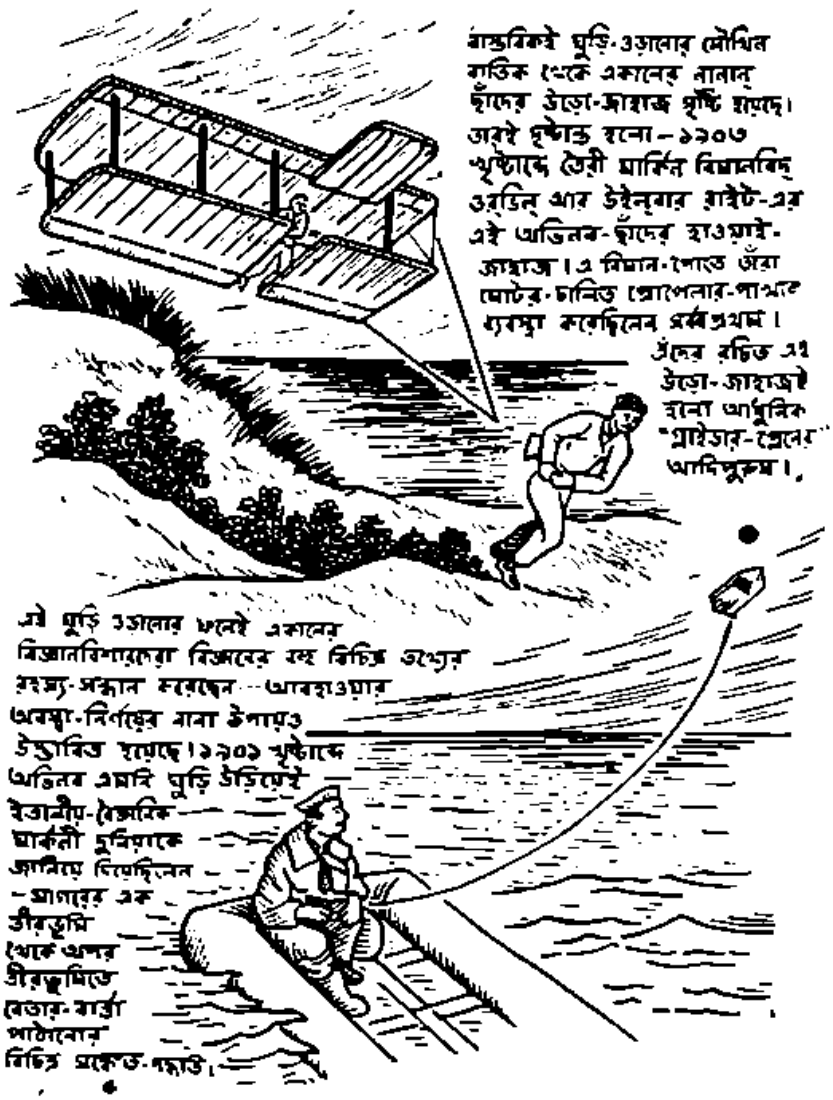

বাস্তবিকই ঘুড়ি-ওড়ানোর মৌখিন রাত্তিক থেকে একালের নানান্ ছাঁদের উড়ো-জাহাজ সৃষ্টি হয়েছে। তারই দৃষ্টান্ত হলো—১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তৈরী মার্কিন বিমানবিদ্ ওরভিল্ আর উইলবার রাইট-এর এই আদিনব-ছাঁদের হাওয়াই-জাহাজ। এ বিমান-পোতে ওঁরা মোটর-চালিত প্রোপেলার-পাখার ব্যবস্থা করেছিলেন প্রথমতম।

ওঁদের রচিত এই উড়ো-জাহাজই হলো আধুনিক "প্লাইডার-প্লেনের" আদিপুরুষ।

এই ঘুড়ি ওড়ানোর ফলেই একালের বিজ্ঞানবিশারদেরা বিজ্ঞানের বহু বিচিত্র তথ্যের রহস্য-সন্ধান করেছেন—আবহাওয়ার অবস্থা-নির্ণয়ের নানা উপায়ও উদ্ভাবিত হয়েছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আদিনব এমনি ঘুড়ি উড়িয়েই ইতালীয়-বৈজ্ঞানিক মার্কনী দুনিয়াকে জানিয়ে দিয়েছিলেন —আগামের এক তীরভূমি থেকে অপর তীরভূমিতে বেতার-বার্তা পাঠানোর বিচিত্র প্রকৌশল-পদ্ধতি।

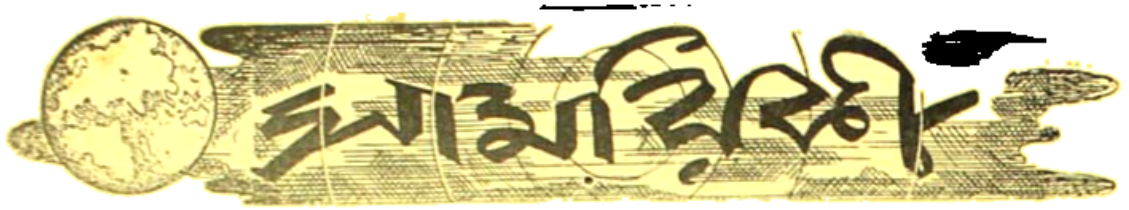

ভারতের সমস্যা—

প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর পরলোকগমনের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন সমস্যা না হওয়ায় এবং সকলে সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী করায় ভারতবাসীর একটা বড় সমস্যার সমাধান হইয়াছে বটে, কিন্তু আজ ভারতের সমস্যার শেষ নাই। বর্তমানের সর্বপ্রধান সমস্যা খাদ্যসমস্যা, সে বিষয়ে আমরা গত মাসে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। আজ প্রধান সমস্যা পাকিস্তান সমস্যা। ১৭ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্বে ইংরাজ যখন ভারত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তখন ভারতকে দুই খণ্ডে ভাগ করিয়া দিয়া যায়। সকলে মনে করিয়াছিল, হিন্দু ও মুসলমান দুইটি বড় বড় জাতি পাশাপাশি দুটি পৃথক রাজ্যে বন্ধুভাবে বাস করিবে ও নিজনিজ সমস্যার সমাধান করিবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারত পাকিস্তানের সহিত তাহার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু পাকিস্তান বিবাদ বাধাইয়া রাখিয়া দিয়াছে। ভারতবর্ষে মুসলমান অধিবাসীরা সুখে ও শান্তিতে বাস করিতেছে—কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাহাদের এলাকা হইতে প্রায় সমস্ত হিন্দুকে ভারতবর্ষে তাড়াইয়া দিয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুরা সেখানে থাকিয়া যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বার বার নানাভাবে তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়া তাহাদের তাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। গত ১৯৬৪ সালের ১২ মাসে বহু লক্ষ হিন্দু পূর্ব-পাকিস্তান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাছাড়া পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ভারতের নিকট হইতে তাহাদের প্রাপ্য টাকা গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু ভারতকে তাহার পাওনা টাকা দেয় নাই। পাকিস্তানের কাছে ভারতের আজও বহু কোটি টাকা পাওনা আছে। ভারত শান্তিতে থাকিতে চায়—সে জন্য জহরলাল নেহরু ভারতের বহু আর্থিক ও অন্যবিধ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও কখনও পাকিস্তান আক্রমণ করে নাই। কিন্তু পাকিস্তানী দুষ্কৃতকারীরা এই ১৭ বৎসরে হাজার হাজার বার ভারত আক্রমণ করিয়া ভারতের সম্পত্তি লুঠ করিয়াছে। আজও তাহা শেষ হয় নাই। সুবিধা পাইলেই পাকিস্তানীরা ভারতের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া ভারতীয়দের ধন সম্পত্তি লুঠ করিয়া লইয়া যায়। কাশ্মীর ভারতের অংশ ছিল—কাজেই দেশবিভাগের পর কাশ্মীর ভারতের অংশরূপেই থাকা ঠিক করিয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে জহরলালের ভুল বুঝার জন্যে কাশ্মীরের একটি অঞ্চল পাকিস্তানীদের হাতে থাকিয়া যায়। রাষ্ট্রসংঘের মধ্যস্থতায় তখন উত্তর কাশ্মীরের মধ্যে একটি সীমা রেখা স্থির হয় এবং আজ পর্যন্ত আলাপ আলোচনা দ্বারা সে সীমা রেখা নির্দিষ্ট হয় নাই। পাকিস্তানী কাশ্মীরীরা প্রায়ই ভারতীয় কাশ্মীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সম্পত্তি লুঠ করিয়া লইয়া গিয়া থাকে। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামের মধ্যেও কোন সীমারেখা আজও নির্দিষ্ট না হওয়ায় সীমান্তবাসীদিগকে সর্বদা ভয়ে ভয়ে দিন কাটাইতে হইয়া থাকে। ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় সর্বদা সীমান্তে অত্যাচার অনাচার লাগিয়া আছে। কবে ভারত পাকিস্তান সমস্যার মীমাংসা হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। তাহার উপর গত কয়েক বৎসর ধরিয়া চীন কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হইয়াছে। চীনারা তিব্বতের মধ্য দিয়া আসিয়া ভারতের উত্তর সীমান্তে কয়েক হাজার বর্গ মাইল স্থান অধিকার করিয়া লইয়া বসিয়া আছে। প্রথম আক্রমণের পর ভারতীয়রা চীনাদের তাড়াইয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু চীনারা একেবারে পিছাইয়া না গিয়া হিমালয় পর্বতের বনজঙ্গলে ও পাহাড়ে লুকাইয়া থাকিয়া মধ্যে মধ্যে ভারতের উপর হামলা চালাইতেছে। সে জন্য ভারতকে তাহাদের বাধা প্রদানের জন্য সর্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হয় এবং অথবা এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বৎসরে কোটি কোটি টাকা

ব্যয় করিতে হয়। তিব্বত হইতে দালাই লামাকে তাড়াইয়া দিয়া চীনারা তিব্বত দখল করিয়াছিল। দালাই লামা গত কয় বৎসর ধরিয়া ভারতে বাস করিতেছেন—তিব্বতে শান্তি স্থাপিত হয় নাই—সেখানে চীনাদিগকে গত কয় বৎসর প্রায় সর্বদাই তিব্বতবাসীদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছে। পশ্চিম প্রান্তে কাশ্মীর সমস্যা, উত্তরে চীন সমস্যা—তাহার উপর পূর্ব প্রান্তেও আদিবাসী সমস্যা ভারতকে সর্বদা বিব্রত করিতেছে। আসামের সমস্যা সমাধানের জন্য একটি নূতন রাজ্য গঠন করিতে হইয়াছে—তাহা হইল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এলাকা—কিন্তু তাহাতেও শান্তি হয় নাই—একটি নাগা রাজ্য নূতন করিয়া গঠনের চেষ্টা করিতেছে। নাগা অধ্যুষিত অঞ্চলকে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করার প্রয়োজন হইয়াছে, সে বিষয়ে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। পূর্ববঙ্গবাসী পাকিস্তানীরা আসাম অঞ্চলে সদা সর্বদা গোলমাল করিতেছে—তাহার উপর সীমান্ত সমস্যা। মণিপুর ও ত্রিপুরা স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হইয়া ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া শান্তিতে আছে। কিন্তু পাকিস্তানীরা সুবিধা পাইলেই বেআইনিভাবে আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর প্রভৃতিতে প্রবেশ করে ও সেখানে তাহাদের সংখ্যা বাড়াইয়া সর্বত্র পাকিস্তান সৃষ্টির চেষ্টা করে। ভারতের এ এক চিরন্তন সমস্যা হইয়াছে। ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল পাহাড় ও জঙ্গল পূর্ণ—ত্রিপুরা ও মণিপুর রাজ্যে ক্রমে পাহাড় কাটিয়া ও জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া মনুষ্যবাসের ও চাষের উপযুক্ত করা হইতেছে—আসাম রাজ্য ত পাহাড় ও জঙ্গলের দেশ—তাহা কাহারও অবিদিত নাই—কি করিয়া ঐ সকল অনুন্নত স্থানগুলি উন্নত করা যায়—ভারতের রাষ্ট্র পরিচালকগণ সেই সব সমস্যা লইয়াই বিব্রত। তাহার উপর বিপ্লব দমনে যদি অযথা অধিক অর্থ ব্যয় করিতে হয়, তাহাহইলে কোন দিনই সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে না। এই সকল ত ভারতের বাহিরের সমস্যা—যুদ্ধ বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা ঐ সকল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। তাহার উপর ভারতের ভিতরের সমস্যাও কম নহে। গত ১৯৫১ ও ১৯৬১ সালের লোক গণনায় দেখা যাইতেছে—ভারতে মৃত্যুর হার কমিতেছে ও জন্মের হার প্রবল বেগে বাড়িয়া যাইতেছে। নানাবিধ নূতন চিকিৎসা

প্রেসিডেন্ট রাধাকৃষ্ণণ, শ্রীমতী কে. দেবী রাজলক্ষ্মীকে ভারত নাট্যম নৃত্যের জন্য ১৯৬৯ সালের সঙ্গীত নাটক এ্যাকাডেমী পুরস্কার দিচ্ছেন।

ব্যবস্থার দ্বারা মৃত্যুর হার কমিয়া যাইতেছে—মানুষ দীর্ঘজীবী হইতেছে—উহা অবশ্যই আনন্দের সংবাদ। কিন্তু যে হারে জন্ম বাড়িতেছে, তাহাতে সাধারণ মানুষকে সুখ সুবিধা দান ক্রমেই কঠিন হইয়া পড়িতেছে। খাদ্যের পরই বাসগৃহ সমস্যা—এখন আর মানুষ বনে জঙ্গলে বা পাহাড় পর্বতে বাস করিতে চাহে না। সকলের জন্য উপযুক্ত বাস গৃহ প্রয়োজন। ভারত প্রচণ্ড গ্রীষ্ম ও দারুণ শীতের দেশ—গরমে ও শীতে গৃহহীন বহু লোক পথে মারা যাইতেছে সেজন্য যতটা সম্ভব অধিক সংখ্যায় নূতন গৃহ নির্মাণ করা হইতেছে ও সাধারণ মানুষ যাহাতে উপযুক্ত বাসগৃহে স্থান লাভ করে, সে জন্য চেষ্টার অন্ত নাই। বাসগৃহের পরই যানবাহন ও পথ সমস্যা। স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের পরিচালকগণ গত ১৭ বৎসরে বহু পথ তৈয়ার করিয়াছে—বহু নদনদী খাল ও বিলের উপর সেতু নির্মাণ করিয়াছে, বহু সহস্র মাইল রেলপথ নির্মাণ করিয়াছে এবং নানাপ্রকারের নূতন যানবাহন সৃষ্টি করিয়াছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ও বিলাতের বি—বি—সি'র ভারতীয় সার্ভিসের শ্রীভাতিয়া। ৩রা ডিসেম্বর শ্রীশাস্ত্রী লণ্ডন বিমান-বন্দরে পৌঁছিলে এই সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

বর্তমানে ভারতে ইলেকট্রিকের সাহায্যে বহু স্থানে রেল চলিতেছে এবং বাস, মোটর গাড়ী, লরী, ট্যাক্সি, রিক্সা প্রভৃতি নূতন নূতন যান চালাইয়া মানুষের যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইতেছে—কিন্তু লোকসংখ্যার অনুপাতে সকল ব্যবস্থাই আজ অপ্রচুর বলিয়া মনে হয়। পথে বাহির হইলে মানুষের দুঃখের সীমা থাকে না। যতই নূতন নূতন ব্যবস্থা করা হউক না কেন, জন্মের হার না কমাইলে ভারতের বর্তমান আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের অন্য উপায় নাই। সে জন্য সরকার পক্ষ হইতে পরিবার নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু করিয়া জন্মের হার কমাইবার চেষ্টা চলিতেছে।

এই সমস্যা সমূল দেশে প্রতি নাগরিককে বিশেষ সাবধানতার সহিত সর্বদা পদক্ষেপ করিতে হইবে। শুধু সরকারের উপর সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। প্রতিটি মানুষ যদি তাহার নিজ কর্তব্য সুচারুভাবে পালন করে, তবেই আমরা সহজে সকল সমস্যা হইতে পরিত্রাণের উপায় লাভ করিব। আজিকার মানুষ বিপথগামী হইয়াছে—সে নিজের কর্তব্য পালনে অবহিত না হইয়া শুধু পরের উপর দোষারোপ করিতে ব্যস্ত। মানুষকে আজ সে পথ ত্যাগ করিয়া নিজের কথা চিন্তা করিতে হইবে এবং চিন্তার পর কর্তব্য স্থির করিয়া কর্তব্য কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। বর্তমান যুগের মানুষের সমস্যাও যেমন অধিক, তাহার সমাধানের উপায়ও তাহা অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। শুধু পথ বাহিয়া লওয়ার মত বুদ্ধি ও শক্তি লাভ করা প্রয়োজন।

সামরিক শক্তি শান্ত্র সম্মত—

গত ১৯শে ডিসেম্বর নাসিরাবাদে এক সামরিক অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেন—ভারত যদি শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়' তবে তাহার বিরুদ্ধে ভারতকে সামরিক শক্তি অবশ্যই প্রয়োগ করিতে হইবে। ভারতীয় নীতি—কাহাকেও আঘাত বা হত্যা করার পক্ষপাতী নহে—তবে আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ করা ভারতীয় শাস্ত্রের বিরোধী নহে। সে জন্য বর্তমানে ভারতকে সকল প্রকার সামরিক শক্তি লক্ষ্য ও সংগ্রহ করিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় মনোযোগী হইতে হইয়াছে।

বরাহনগরে অবসর ভবন—

গত ১৭ই ডিসেম্বর সকাল ১টার সময় কলিকাতার উত্তরে বরাহনগরে গঙ্গাতীরে সরকার প্রদত্ত ১০ বিঘা জমির উপর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন অবসর-ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন। কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ ঐ উৎসবে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। তথায় ৬০ বৎসরের অধিকবয়স্ক নিরাশ্রয় বৃদ্ধদিগকে থাকিতে দেওয়া হইবে। সেন মহাশয় অবসর ভবনের প্রতিষ্ঠাতা আশ্রিবাদদের খ্যাতনামা দেশসেবক শ্রীসন্তুনাথ মুখোপাধ্যায়ের কার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তথায় অবসর ভবন নির্মাণ করা হইবে। অতুল্যবাবু ঐরূপ ভবননির্মাণের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন। সভায় বহু লোক সমাগম হইয়াছিল। মহাপ্রাণ সন্তুনাথ বহুদিন ধরিয়া অবসর ভবন স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

আণবিক আক্রমণে ভারতকে সাহায্য—

গত ১৪ই ডিসেম্বর বিলাতের কমন্স সভায় বৃটীশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইলসন ঘোষণা করেন যে চীন যদি ভারতকে আণবিক বোমা দ্বারা আক্রমণ করে, তাহা হইলে বৃটীশ কর্তৃপক্ষ ভারতকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য সাহায্য করিবে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে এখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যোগী হইয়াছেন।

জনসভায় প্রধান মন্ত্রী—

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী গত ২১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বোলপুরে পৌঁছিয়া ভাক বাংলোর মাঠে এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন—ভারত সর্বদা পাকিস্তানের সহিত মিটমাট করিতে প্রস্তুত। ভারত চীনের সহিতও আপোষে সম্মত—কিন্তু ঐ দুইটি দেশ কোন সম্মানজনক সর্তে আপোষ করিতে সম্মত নহে। আজ ভারতের ইহাই সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা।

ঐ দিন রাত্রিতে বিশ্বভারতীর কর্মীদের এক সভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী নাগাভূমির সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন—নাগাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া ভারত অযথা রক্তক্ষয় করিবে না। সে নাগাদের সহিত যে-কোন প্রকারে হউক আপোষ করিবে ও নাগারা যাহাতে সুখে ও শান্তিতে থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিবে।

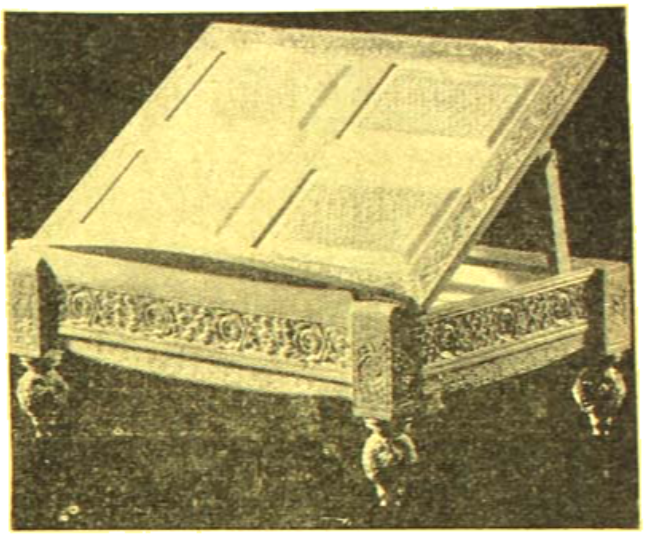

বাইবেল রাখার এই হস্তিদন্ত নির্মিত আধারটি মহামান্য পোপ ৬ষ্ঠ পলের ভারতাগমন উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ তাঁকে উপহার দেন। নির্মিতা প্রসিদ্ধ হস্তিদন্ত-শিল্পী ভগবতীম সেন। তিনি রাণী এলিজাবেথের জন্য হস্তিদন্ত নির্মিত একটি কুতব মিনার ও মিসেস কেনেডির জন্য একটি হস্তিদন্ত নির্মিত আলোর আধার নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

ভারতে রুশ সামরিক সাহায্য—

গত ২২শে ডিসেম্বর দিল্লীর লোকসভায় প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী শ্রীওয়াই বি-চ্যবন ঘোষণা করেন যে রুশদেশ হইতে ভারতে বহু সামরিক সাজ-সরঞ্জাম আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং শীঘ্রই প্রচুর পরিমাণে সামরিক সাহায্য আসিয়া পৌঁছিবে। শ্রীচ্যবনের পূর্বে উপ-প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী ডি-ডি-এস রাজু বলেন যে—রুশিয়া ভারতকে যে সকল সামরিক সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া ছিল—তাহা পূর্ণভাবে দান করিবে এবং তাহার একটা বড় অংশ ভারতে আসিয়াছে ও অন্য অংশগুলি ক্রমে পাঠানো হইতেছে। ভারতের আজ চীনা ও পাকিস্তানী আক্রমণের বিরুদ্ধে রণসজ্জার জন্য বাহিরের সাহায্য গ্রহণ করার প্রয়োজন হইয়াছে।

ভারতে তৈলশিল্পের প্রসার—

গত ২০শে ডিসেম্বর গৌহাটী তৈল শোধনাগার হইতে

শিলিগুড়ি পর্যন্ত ২৬০ মাইল পাইপ লাইনের উদ্বোধন হওয়ায় ভারতে তৈল শিল্পের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। কেন্দ্রীয় তৈল ও রসায়ন বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীঃ-তি আলাগেসন শিলিগুড়ি আসিয়া আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে যোগদান করেন। বোম্বাই হইতে পুনা হইয়া সোলাপুর পর্যন্ত আড়াই হাজার কিলোমিটার তৈল পাইপ-লাইন নির্মিত হইতেছে—তাহার জন্য ব্যয় হইবে ১০।৬২ কোটি টাকা। কোচিন হইতে কয়ম্বাটোর ও সালেমেও পাইপ লাইন দিয়া তেল পাঠানো হইবে। এই ভাবে সর্বপ্রকারে দেশকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা চলিতেছে।

কাশ্মীর ভারতের অঙ্গরাজ্য—

জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যসরকার ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন, যেন সত্বর ভারতীয় সংবিধানের ৩৭৬ ও ৩৭৭ ধারা প্রয়োগ করিয়া রাষ্ট্রপতি কাশ্মীরকে ভারতের অঙ্গ রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করেন। সে জন্য রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানের ৩৭০ ধারা অনুসারে ঘোষণা করিতে হইবে। পাকিস্তানীরা কাশ্মীর আক্রমণের উদ্যোগ আরম্ভ করিয়াছে, এ সময়ে সর্বপ্রকার সাহায্য দিয়া কাশ্মীরকে রক্ষা করিতে হইবে। কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসাদিক ২০শে ডিসেম্বর দিল্লীতে আসিয়া সর্বপ্রকার ব্যবস্থায় অবহিত হইয়াছেন।

কেন্দ্রের প্রতি দপ্তরে তদন্ত শেষ—

দিল্লীর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর বিশেষ পুলিশ বিভাগ নানা প্রকার দুর্নীতির অভিযোগ সম্বন্ধে ৭টি কেন্দ্রীয় বিভাগের বিরুদ্ধে তদন্ত শেষ করিয়াছে। বিভাগগুলি—(১) শ্রম মন্ত্রণালয় ও উহার বিভিন্ন বিভাগ (২) আয়কর সহ রাজস্ব বিভাগ (৩) কেন্দ্রীয় আবগারী ও শ্রম বিভাগ (৪) রেলের মাল বুকিং বিভাগ (৫) পূর্ত বিভাগ। তদন্তের ফলে অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হইলে অপরাধীদের শাস্তির বিধান হইবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর নন্দ এই তদন্তের ব্যবস্থা করিয়া সর্বসাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

শোক সংবাদ—

প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীদীপেন বসু গত শুক্রবার ২৪এ অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ সাল, আকস্মিকভাবে সেরিব্রাল থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করেন। তিনি ১৯২০ সালে আহিরিটোলার বিখ্যাত বসু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বি-এ পাশ করিয়া চাকুরী জীবনে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। কুচবিহারের দেওয়ান ৺কালিকাদাস দত্ত মহাশয়ের পুত্রবধূ ও চারুচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতৃবধূ ৺দীপান্বিতা দেবী ছিলেন সিদ্ধা সাধিকা। তিনি 'গোপালের মা' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহারই প্রেরণায় দীপেন বসু চাকুরী ছাড়িয়া শিল্প সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি শিল্পক্ষেত্রে স্বয়ংসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু শ্রদ্ধা ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় ভারতীয় প্রাচীন ও অবনীন্দ্রনাথোত্তর নব্যশিল্পশৈলীর উপর তিনি বিশেষ অধিকার লাভ করেন এবং বাঙলার নিজস্ব শৈলীর সহিত অন্যান্য প্রান্তীয় রীতির সমন্বয়ে একটি নূতন রীতির সৃষ্টি করেন। ইহারই প্রকাশ দেখা যায় চারুকলা ভবনে অনুষ্ঠিত তাঁহার চৈতন্য-জীবনালেখ্যের মধ্যে। শিল্প চর্চার ক্ষেত্রে নবীনেরা তাঁহার নিকট হইতে অবশ্যই উদ্দীপনা ও বিশ্লেষণার ইঙ্গিত লাভ করিবে। তিনি অত্যন্ত সরল ও সুন্দর স্বভাবের মানুষ ছিলেন। সরল জীবন ও উচ্চ চিন্তাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে শিল্পজগৎও সেই সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

দুর্গেশনন্দিনী

শ্রীসুধীর গুপ্ত

সরলাসুন্দরীর শেষে দুর্গ-পরিখার
গভীর গম্ভীর তলে করি' বিসর্জন
আত্মবলও অভ্রময়ী আয়েষা যখন
দেখালো অপূর্ব ভাবে, প্রেম-মূর্তি তা'র
ভুলিবার শক্তি কা'রও রহিল কি আর!—
প্রতিভার যাদু-স্পর্শ দুর্লভই এমন।
বঙ্গ-উপন্যাসে-সৃষ্ট সেই শুভক্ষণ
শতাব্দ-অন্তেও করে রোমাঞ্চ সঞ্চার।
'বন্দী মোর প্রাণেশ্বর'—কণ্ঠে আয়েষার
বঙ্গ-নারী-জাগৃতির শুভ শঙ্খ-নাদ;—
অহিন্দু—হিন্দুর ত্রাস্ত সংস্কার বিবাদ
ভুলাবার প্রাণ-মন্ত্র,—সে কি ভুলিবার!
কী অমিত সৃষ্টি, শক্তি প্রাণ-প্রতিষ্ঠার!—
'দুর্গেশনন্দিনী' দিলো কথামৃত-স্বাদ।*

* বাংলার প্রথম সার্থক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' গ্রন্থ রচনার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে।

গ্রহ-জগৎ

মিহিরাচার্য্য

গত মাসে রবির শুভত্বের কিছু কিছু আলোচনা করেছি। এইবার রবি লগ্ন থেকে বারোটি ঘরে থাকলে কি ফল হয়, তাই বলব। অবশ্য এ ফল হুবহু মিলবে না, কারণ অন্যান্য গ্রহের শুভ এবং অশুভ দৃষ্টি সহঅবস্থান, সম্পর্ক প্রভৃতি লিখিত ফলের হ্রাসবৃদ্ধির তারতম্য ঘটাবে।

রবি যদি প্রথম ঘরে থাকেন অর্থাৎ যে ঘরে আপনার লগ্ন সেই ঘরেই থাকেন। এই প্রসঙ্গে বলি, যদি কারো মিলিয়ে দেখবার ইচ্ছে হয়, তিনি নিজের কোষ্ঠী-ঠিকুজির ছকটি বের করে কোন ঘরে 'লং' লেখা আছে দেখবেন। তারপর সেই ঘরকে এক নম্বর ঘরে বাঁ দিক দিয়ে গুনবেন। যত নম্বর ঘরে 'র' দেখতে পাবেন লগ্ন থেকে তত নম্বর ঘরেই আপনার রবি আছেন জানবেন।

প্রথম, অর্থাৎ 'লং' লেখা ঘরে রবি থাকলে জাতক উচ্চাভিলাষী স্বাধীনচেতা, উদার ও প্রাণখোলা হন—তাঁর নৈতিক চরিত্রও বেশ বলবান্ হয়। বুধগ্রহ যাঁর এই ঘরে থাকে, অর্থাৎ রবির ঘরে, তিনি যে কোন ব্যাপার সহজেই বুঝে নিতে পারেন। এই চট্ করে বুঝে নেওয়ার বুদ্ধি রবি বুধযুক্ত হলে হয়।

প্রথম ঘরে রবি থেকে যদি কোন গ্রহের, তা সে শুভই হোক, আর অশুভই হোক, কুদৃষ্টি না পায় ত, তিনি যে কোন কাজের দায়িত্ব নিয়ে তা সুসম্পন্ন করতে পারেন। কুদৃষ্টি, সুদৃষ্টি বিচার পাশ্চাত্য মতে করলে অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে ফল অতি উত্তম মেলে।

প্রথম ঘরে রবি থাকলে উচ্চ ক্ষমতালাভের আকাঙ্ক্ষা, লোভনীয় স্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধক শক্তি দান করেন। প্রথম ঘরে রবি থেকে কারো যদি বিংশোত্তরী মতে রবির দশা পড়ে ত, তাঁর সে সময় কর্ম্মের প্রসার ও স্থায়িত্ব, উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহায়তা, সরকারী আনুকূল্য, সম্মান ও সাফল্য প্রভৃতি সহজে সম্ভব হবে কিন্তু ঐ রবি যদি কুদৃষ্টি পায়—ধরুন, উদাহরণ স্বরূপ যদি মংগলের কুদৃষ্টি পায় তো তিনি অল্পেই রেগে উঠবেন, হঠকারী হবেন এবং স্বাস্থ্য ও ভাল যাবে না। সর্দ্দি-গর্দ্দি, জ্বর, দুর্ঘটনা প্রভৃতি ঘটার সম্ভাবনা। যদি শনি কুদৃষ্টি দেয় রবিকে, তাহলে অপবাদ, অসম্মান, অসাফল্য তাঁকে ছন্নছাড়া করে দেবে। বৃহস্পতির কুদৃষ্টি পেলে ঘন ঘন লোকসানের জালে জড়িয়ে পড়তে হবে। গুরুজনের বিরাগ-ভাজন হয়ে লুকিয়ে বেড়াতে হবে।

শুক্রের কুদৃষ্টি পেলে স্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বেগ বাড়বে—অস্থাবর সম্পত্তি বিনষ্ট হতে থাকবে। সমাজে অপবাদ ঘটবে—পরিচিতের স্নেহ-শ্রদ্ধা হারাতে হবে।

চন্দ্রের কুদৃষ্টি পেলে তিনি কখনই জীবনে উন্নতির পথে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারবেন না। যখনই কোন সুযোগ সামনে আসবে, সেটি কাজে লাগাতে কিছুতেই পারবেন না এবং পরবর্ত্তী জীবনে প্রায়ই আফশোষ করে কাটাবেন। অনেকগুলি কোষ্ঠী মিলিয়ে দেখা গেছে, প্রথম ঘরে অর্থাৎ লগ্নে রবি যাঁদের চন্দ্রের কুদৃষ্টি পায়, তাঁরা প্রায়ই 'ট্রেন ফেল' করেন।

লগ্ন থেকে দ্বিতীয় ঘরে রবি থাকলে জাতক পিতৃ প্রদত্ত টাকা ভোগ করে। মঙ্গলের কুদৃষ্টি পেলে সে টাকা নয়-ছয় করে নষ্ট করে। অপব্যয় করে পরে কষ্ট পাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

দ্বিতীয় ঘর থেকে পুরুষের ডান চোখ আর মেয়েদের

যা চোখের বিচার হয়। সুতরাং দ্বিতীয় ঘরের রবি যদি শুভগ্রহের দৃষ্টি পায়, তাহলে তার দৃষ্টি শক্তি খুব জোরালো এবং স্থায়ী হবে। তেমনি কুগ্রহের কুদৃষ্টি পেলে দৃষ্টিশক্তি ক্ষুণ্ণ পাবে, অল্পবয়সে চশমা নিতে হতে পারে। শনি গ্রহের কুদৃষ্টি পেলে জাতক খুব হিসেবী ও কৃপণ হয় এবং সুদে টাকা খাটিয়ে বেশ কিছু অর্থ নিশ্চয়ই অর্জন করেন। কুদৃষ্টি পেলে চুরি, প্রবঞ্চনা প্রভৃতিতে ঘন ঘন লোকসান সইতে হয় যতই সাবধান হোন না কেন, তবু কোন না কোন ফাঁক দিয়ে লোকসান অনিবার্য্য। অবশ্য সেই সঙ্গে শুভগ্রহের শুভ দৃষ্টির যদি পাওয়া যায় তো লাভ-লোকসানে সমন্বয় ঘটে। ঐ দ্বিতীয়ে রবি যদি বুধের কুদৃষ্টি পায় কিম্বা বুধ যদি ঐ ঘরেই থাকে তা, জাতক বক্তা হিসেবেই গণ্য হন। তর্কশাস্ত্রেও এঁদের বুৎপত্তি থাকে।

ঐ দ্বিতীয়ে রবি যদি বৃহস্পতির কুদৃষ্টি পান কিম্বা ঐ একই ঘরে থাকেন, তাহলে সে ব্যক্তি সরকারী কাজে বিশেষ সম্মানিত পায়—আর্থিক সঙ্কটও মনোমত হয়। কিন্তু কুদৃষ্টি পেলে দার্ম্ভিক হয় এবং প্রচলিত নিয়মের বিরোধিতা করে, সরকারের সঙ্গে মামলা কোরে বা আয়কর ফাঁকি দিয়ে অভিযুক্ত হোয়ে বিশেষ ক্লেশ পায় ও জরিমানা দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আগামী সংখ্যায় লগ্ন থেকে তৃতীয়ে ও চতুর্থে রবি স্থিতির ফল বলার ইচ্ছে রইলো।

— —

দ্বাদশ রাশিফল

মেষ রাশি

১১ তারিখ পর্য্যন্ত মানসিক জড়তা থাকবে। কোন কিছুতেই যেন উৎসাহ পাবেন না। তারপর আর্থিক দিকে অল্প সুবিধা দেখা দেবে। স্ত্রীলোকের সাহায্য পাবেন। পেশাজীবীরা যশ পাবেন, ব্যবসায়ীদের অর্থাগম হবে। দ্বাত্রাদিতে কোঁষ্ঠ থাকলে মাসের প্রথম দুদিন ছাড়া লোক-সানের সম্ভাবনা। অনূঢ়া মেয়েদের বিয়ের সুযোগ নেই। চাকুরে মেয়েরা ৪ঠার পর সুযোগ পাবেন।

বৃষ রাশি

মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হবে। উৎকণ্ঠা দেখা দেবে। আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা সম্ভব হবে না। ২০ তারিখের পর পেশাজীবীদের আয় বৃদ্ধি। ব্যবসায়ীরা আবদ্ধ টাকা ফিরে পাবার সংকেত দেখতে পাবেন। ৪ঠা পর উত্তেজনা বশে বা ঋণ দিয়ে ঠকে যেতে পারেন। মেয়েদের কর্মলাভের সম্ভাবনা কম। চাকুরে মেয়েদের বদলীর ভীতি দেখা দেবে।

মিথুন রাশি

পরীক্ষার্থী ছেলে মেয়েদের এ মাসে ভাল ফল পাবার সম্ভাবনা। দ্বাত্রাদিতে সামান্য লাভ হতে পারে। ব্যবসায়ীরা লাভের অঙ্ক দেখে খুশি হবেন। পেশাজীবীরা নতুন লোকের সংস্পর্শে আসবেন। ২৩শে নাগাদ নানা ব্যাপারে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, এমন কী স্ত্রীর সঙ্গেও। চাকুরে মেয়েদের সমালোচনা হতে পারে। অনূঢ়াদের কারো কারো রেজেষ্ট্রী বিয়ের সম্ভাবনা।

কর্কট রাশি

মাসের শেষাশেষি নানা উটকো ঝঞ্ঝাটে খরচ হতে পারে। চাকুরে ব্যক্তিদের অনেক আশা দেখা দেবে কিন্তু কোনটাই সফল হবে না। ৩ তারিখের পর অসৎ উপায়ে কিছু অযাচিত লাভ হাতে আসতে পারে। ব্যবসায়ীরা অনায়াসে টাকার কিনারা করতে পারেন। পেশাজীবীরা এমাসে পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোক মক্কেল বা রোগীর সংস্পর্শে আসতে পারেন। চাকুরে মেয়েদের তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে। অনূঢ়াদের বিয়ের কথাবার্ত্তার যোগ তেমন জোরালো নয়।

সিংহ রাশি

বেকার ব্যক্তিরা এ মাসে কর্মে নিযুক্ত হতে পারেন। মেয়েদের চাকরীর সম্ভাবনা আছে। প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় সাফল্যের সম্ভাবনা কম। ব্যবসায়ীরা এ মাসের শেষদিকে অর্থকষ্টে পড়তে পারেন—পেশাজীবীদের আয় কমে আসতে পারে। মাসের প্রথম দিকে ঠিকাদারদের সুযোগ সুবিধা আছে। স্ত্রীর রক্তপাত ঘটতে পারে। কর্মে ঘরণী হয়ে ২০ তারিখের পর কেউ কেউ মনোমত কাজ ও রুচিমত পারিপার্শ্বিকে যুক্ত হতে পারেন।

কন্যারাশি

কর্মে পরিবর্তন হতে পারে এবং তা উন্নতিসূচক। ছোটখাট ভ্রমণ, বন্ধুসংসর্গ, চিঠিপত্রে ইষ্ট খবরাখবর প্রভৃতির ইংগিত দেখা যায়। ১৯ তারিখের পর কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠার উন্নতির সূচনা হতে পারে। প্রথমের দিকে জুয়া বা ঐ প্রকারের কোন উপায়ে লাভ হতে পারে। ২৪শে তারিখের পর হঠাৎ কাজকর্মে ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের মন্দা দেখা দেবে। মেয়েদের সকল বৃদ্ধি পাবে। অনুচাদের মাসের প্রথমের দিকে ফল ভাল।

তুলা রাশি

পুরো মাসটি বেশ মানসিক শান্তি যাবে। সেলস্-ম্যানদের ভ্রমণে লাভ হবার সম্ভাবনা। খরচ ক্রমশঃই বেড়ে যাবার সম্ভাবনা। পিতার রোগ বৃদ্ধি পেতে পারে। মাসের প্রথমের দিকে কিছু অর্থ প্রাপ্তির কারণে হানি হতে পারে। ব্যবসায়ীরা যাঁরা বিদ্যুৎ-যন্ত্রাদি প্রভৃতির ব্যবসা করেন তারা, সরকার সংশ্লিষ্ট কাজে যুক্ত হবেন। পেশাজীবীরা, বিশেষ করে ডাক্তারদের পশার বৃদ্ধি পাবে। মেয়েদের ফল মোটামুটি।

বৃশ্চিক রাশি

স্ত্রীর সঙ্গে খরচপত্তর নিয়ে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হবে। ১৭।১৮ তারিখে শ্লেষ্মাসম্ভূত রোগে ভোগার সম্ভাবনা। ছেলে-মেয়েরা দুর্বিনীত হবে। বেকার ছেলে-মেয়েরা কর্মলাভে খুশি হবেন। কলা বিভাগের ছাত্রীদের নানা-রকমের অসুবিধা ভুগতে হবে। যাদের ভূসম্পত্তির বিনিময়ে সরকারের কাছে টাকা পাওয়ার কথা তাঁরা সে টাকা এ মাসে পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা সরকারী ভয়ে ব্যবসায় নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেন। পেশাজীবীদের নাম ও রোজগার দুইই বাড়বে। চাকুরে মেয়েদের উন্নতি দেখা যায়।

ধনু রাশি

কাজকর্মে এ মাসে বেশ ভাল ফলই পাবেন। মাসের প্রথম সপ্তাহে শরীরটা সামান্য গণ্ডগোল করতে পারে। ব্যবসায়ীদের বেশ ভাল এবং নতুন সুযোগ দেখা দিতে পারে। পেশাজীবীদের পশার বৃদ্ধি হবে, কিন্তু নানা কারণে মানসিক অসন্তুষ্টি লেগে থাকবে। মাসের শেষাশেষি স্ত্রীর সঙ্গে মতদ্বৈধ দেখা দেবে। মেয়েদের প্রথমের দিকে ভাল, শেষদিকে খারাপ।

মকর রাশি

৪ তারিখের পর থেকে আর্থিক ও কর্ম সম্বন্ধে যোগা-যোগ ভালই। ১৬ তারিখের মধ্যে কোন দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যাবেন। সকলের স্বাস্থ্য ভালই। সাংসারিক শৃঙ্খলা বেশ ভালই থাকবে, ভ্রমণে বিঘ্ন ঘটতে পারে মাসের শেষের দিকে। পথে-ঘাটে কোন প্রয়োজনীয় বস্তু হারিয়ে ফেলতে পারেন। ব্যবসায়ীদের কাজকর্মে ভাঁটা পড়বে। পেশাজীবীদের মন্দ যাবে না। মেয়েদের শ্রীবৃদ্ধি হবে, কাজ-কর্মে সুনাম পাবেন। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ায় সুযোগ-সুবিধা দেখা যায়।

কুম্ভ রাশি

ভূসম্পত্তির কারণে সামান্য লাভে যোগ হতে পারে। কনিষ্ঠার উন্নতির সম্ভাবনা। স্ত্রীর পীড়ার যোগ বর্তমান। বিশেষ করে মাসের মাঝামাঝি। চাকুরে ব্যক্তিদের পদ-বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ছেলে-মেয়েরা মাসের শেষদিকে বিনীত ব্যবহার ও আদেশ পালনে তৎপর হবে। ব্যবসায়ীরা নানাপ্রকার সুযোগ পাবেন। স্ত্রীলোকদের বিশেষ শুভ। পেশাজীবীরা পশার বৃদ্ধিতে আনন্দ পাবেন।

মীন রাশি

আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে হিমসিম খেতে হবে। লৌকিকতা, উটকো খরচ আপনার মনের ভারসাম্য নষ্ট করবে। ২০ তারিখের পর পুত্র কন্যাদের কেউ রাগা-রাগি করে নিরুদ্দেশ হতে পারে। মাসের প্রথম সপ্তাহে দু'তাদিতে লাভ হবে। ব্যবসায়ীরা টাকা পয়সা করে বিভ্রান্ত হবেন। চিঠিপত্রের জবাব পেতে দেরী হবে। যাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মন কষাকষি লেগে থাকে, তাঁদের সাময়িকভাবে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। পেশা-জীবীদের মাঝামাঝি ফল।

দ্বাদশ লগ্নের ফলাফল

মেষ :

এ মাসে বিনা পরিশ্রমে হঠাৎ লাভের যোগ আপনাকে পেয়ে বসবে। চেষ্টা করবেন কিন্তু তাদৃশ ফললাভ সম্ভব হবে না। ২০ তারিখের পর আর্থিক দায়িত্ব

কাঁধে চাপতে পারে। কোন কাজ হাতের মুঠোয় এসে হচ্ছে না দেখে ক্ষুব্ধ হবেন।

স্ত্রীর সহযোগিতা খুবই কার্যকরী হবে এবং তাঁর নিপুণতা আপনাকে অনেক সান্ত্বনা দেবে। কনিষ্ঠ কনিষ্ঠারা আপনাকে সহানুভূতি দেখাবে।

বৃষ :

বেকার ব্যক্তিরা হঠাৎ চাকুরী বা কাজকর্ম পেয়ে খুশি হবেন। ভূসম্পত্তি সম্বন্ধে কোন উদ্বেগ থাকলেও এ মাসে তা নিরসন হবে। স্ত্রী যদি ছাত্রী হন, তাহলে শুভফল পেতে পারেন। মাসের শেষের দিকে অর্থ সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা দেখা দিতে পারে। স্ত্রীর জন্যে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। ভূষণ ও বাসনে অনুরাগ দেখা দেবে।

মিথুন :

মাসের প্রথমের দিকে শরীরের গণ্ডগোল দেখা দেবে। মাসের শেষের দিকে মানসিক শান্তি নষ্ট হবে। অর্থের দিক দিয়ে কিঞ্চিৎ লাভ বিনা আয়াসে ঘটতে পারে। পুত্র-কন্যাদের লেখাপড়ায় হঠাৎ বাধার সৃষ্টি হতে পারে। ভ্রাতৃ-কলহের সম্ভাবনা।

কর্কট :

এ মাসের শেষের দিকে মানসিক শান্তি পাবেন। মনে হবে, ঘাড় থেকে যেন ভারী বোঝা নেমে গেল। মাসের প্রথম দিকে কোন কারণে প্রবঞ্চিত হতে পারেন। দূর দেশ থেকে, কারো খেয়ার অপেক্ষায় থাকলে তা সফল হবে না। স্ত্রীর বাক্যবাণ পীড়া দেবে।

সিংহ :

মাসের প্রথম দিকে দ্যূতক্রীড়ায় কিছু অর্থাগম হতে পারে—বিশেষ করে ৬ই তারিখে। ৯ তারিখের পর বেকারদের কর্মলাভ সম্ভাবনা। অস্থায়ী চাকুরেরা বিচারালয়ে বহাল হবেন। অবাঙ্গালীর সাহায্যে উন্নতির আশা। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক নয়।

কন্যা :

মাসের শেষের দিকে মানসিক অশান্তি বাড়বে। প্রথমের দিকে অতিরিক্ত অর্থার্জনের সংকেত দেখা যায়। কিন্তু তা স্থায়ী বা স্থায়ী হবার সম্ভাবনা নেই। স্ত্রীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হবে। পুত্র-কন্যাদের ফল ভাল। কনিষ্ঠা ভগিনীর সম্ভবস্থলে বিবাহ হওয়ার সংকেত আছে

তুলা :

মাসটি পুরোপুরি ভালই যাবে। বিদেশ থেকে কোন ব্যক্তি সংসারের ভার হয়ে শুভাগমন করতে পারেন। সকলের তেমন যোগাযোগ নেই। স্ত্রী সন্দেহের চোখে স্বামীকে দেখতে পারেন। পুত্র-কন্যাদের বিদ্যার্জনে বিঘ্ন নেই। যানবাহনের দালালীতে প্রাপ্তি হতে পারে।

বৃশ্চিক :

সাংসারিক পরিস্থিতি বেশ শৃঙ্খলাপূর্ণ থাকবে। বিলাসব্যসনে অনুরাগ বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক যোগাযোগ বেশ ভাল, যদিও সকলের সম্ভাবনা নেই। ছেলে মেয়েদের ব্যবহার বেশ যুক্তিপূর্ণ ও গ্রাহ্য হবে না। স্ত্রীর খরচের মাত্রা বাড়াবেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিদেশ যাত্রা সম্ভব হতে পারে। চাকুরীতে উন্নতি।

ধনু :

সম্ভবস্থলে সন্ততি যোগ। ভ্রাতৃকারণে ব্যয়বৃদ্ধি। সন্তান কারণে উদ্বেগ। প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে উৎকণ্ঠার অবসান। ভূসম্পত্তি থেকে সুযোগ সুবিধা লাভ। আত্মীয় কুটুম্বের সহায়তায় লাভ।

মকর :

সকল ও লাভের সম্ভাবনা আছে অগ্রহায়ণের অর্ধাবস্থার পর। সংসারে অশান্তি বৃদ্ধি, সন্তানের রোগ। স্ত্রীর মনে অকারণে উত্তেজনা। বন্ধুবান্ধবদের সহিত মনো-মালিন্য। কর্মে উন্নতি—উর্দ্ধতন কর্মচারীর সুনজর।

কুম্ভ :

সম্ভব স্থলে বিবাহ ও ভাগ্যবৃদ্ধি। সাংসারিক শৃঙ্খলা। সহকারী কর্মে লাভ। অতিরিক্ত ব্যয়। সম্ভবস্থলে স্ত্রীর চাকুরী লাভের সম্ভাবনা। বয়স্থ ব্যক্তিদের কোমরে বাত-ব্যাধি বৃদ্ধি। লটারী ব্যাপারে উদ্বেগ।

মীন :

স্বাস্থ্য ক্ষেম। অর্থাগমে শত্রুতা—রক্তপাতের সম্ভাবনা। কর্মের ব্যাপারে বিপত্তি ও গুপ্তশত্রুতা। চিত্ত চাঞ্চল্য। মানসিক বিরতা। স্ত্রীর সহিত অ-বনিবনা। চিঠি পত্রে দুঃসংবাদ। ভৃত্যের কারণে অশান্তি। স্নেহকারণে উদ্বেগ।

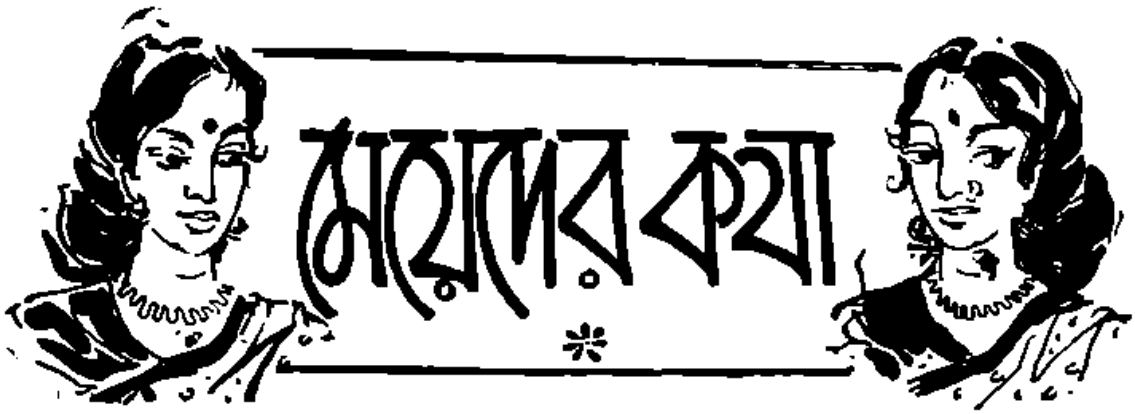

আইন ব্যবসায়ে নারী

শ্রীমতী ইন্দুলেখা সান্যাল

ভারতের নারীগণ জীবনের সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যে চ'লেছে তাতে সন্দেহ করবার কিছু নেই। নীতিশাস্ত্রের মিথ্যা দোহাই দিয়ে নারীকে আর শুধু গর্ভধারণ শিশুপালন আর গৃহস্থালীর কার্যে আবদ্ধ করে রাখতে পারা যাচ্ছে না। ভারতের নারী শিক্ষা প্রসারে, রুগীর সেবায় ও চিকিৎসাক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই বহুদূর এগিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে আইনের ক্ষেত্রেও নারীর স্থান একেবারে সামান্য নয়। প্রতি বৎসরই ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রীরা আইনের পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন। আইনের ক্ষেত্রেও তাঁরা যে সাফল্য অর্জন করেছেন তারও অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

কিন্তু তবু এ ব্যবসায়ে নবাগতাকে অনেক ধৈর্যের পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হতে হবে। তা একেবারে দুরতিক্রম্য না হলেও কম দুর্ভোগের নয়। মহুলিকার কথাই আমাকে বলতে হচ্ছে। মহুলিকা আমাদের ক্লাসেই পড়ত। আমাদের সঙ্গেই বি, এ পাশ করেছে, কলেজে নৃত্যে, গানে, অভিনয়, আধুনিকতায় হার মানাতে পারে এমন লোক কেউ ছিলনা। মহুলিকা ছিল আমাদের কলেজের ছাত্রীদলের মধ্যমণি ছাত্রকুলের মকীরাণী। বি, এ পাশ করার পরই তার পক্ষে কোন আই-এ-এস তরুণ বা উদীয়মান ডাক্তার বা ইনজিনিয়ারের গৃহিণী হয়ে সহজ সুখের জীবন যাপন করা কঠিন ছিল না। কিন্তু মহুলিকাকে ঘিরে কয়টি উপযুক্ত পাত্রও ঘুরেছিল। কিন্তু মহুলিকা সবাইকেই মুগ্ধ করেছে কিন্তু নিজে মুগ্ধ হয়নি।

বি-এ পাশ করে আমরা যখন এম-এ পড়তে গেলুম, মহুলিকা ল' কলেজে ভর্তি হয়ে গেল। তিন বছরের কোর্স। মহুলিকা সবাইকে হার মানিয়ে ল'তে সেকেণ্ড ক্লাস পেয়ে একেবারে কোর্টে গিয়ে যোগদান করল। এক প্রৌঢ় উকীলের জুনিয়ার হল সে। ক্রিমিন্যাল কোর্টের উকীল। খুব নাম আছে। টাকা পয়সা প্রচুর আছে। ঘরে দর্জাল গৃহিণী আছে—এক পাল বয়স্থ ছেলে মেয়ে আছে। তারি পাশে বসে মহুলিকাকে দিবা-রাত্র কাজ করতে হয়, কেস বুঝতে হয়, অপরাধীদের অনুষ্ঠিত অনেক শ্লীলতাবিহীন ঘটনার বিবরণ শুনতে হয়, লিখতে হয়, বিশ্লেষণ করতে হয়, তারপর কেস নিয়ে প্রৌঢ় সিনিয়ারের সঙ্গে আলোচনা করতে হয়। উকীল বাবুর দর্জাল স্ত্রীর আবার বড় সন্দেহ রোগ। কর্তারউপর তাঁর কড়া নজর। তিনি সময়ে অসময়ে আড়ি পেতে শুনেন—মহুলিকার সঙ্গে তার কী ধরণের আলাপ হয়। সদ্ বিষয়ে আলাপ করবার মত মামলাই তার নেই। তাকে নিত্য কুকথার আলোচনাই করতে হয়। উকীল গিন্নী জ্বলে পুড়ে মরেন। তাঁর পক্ষে ধৈর্য রক্ষা কঠিন হয়। একদিন মহুলিকার সামনেই এমন সব কথা বললেন—উকীল বাবুকে তাতে মহুলিকার মনে ভীষণ

লাগল। এত কুকথা আলোচনা করতে যে মঞ্জুলিকা একটু লজ্জা, একটু সঙ্কোচ বোধ করেনি। উকীল গিন্নীর একটু ইঙ্গিতেই ভীষণ আঘাত পেল। সে উকীলবাবুর জুনিয়ারশিপ ছেড়ে দেবার চেষ্টা করল, আর কিছু দিনের মধ্যেই ক্রিমিন্যাল কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটারের এসিস্টেণ্টের পদ লাভ করল। তাকে এখন অনেক কেস পরিচালনা করতে হয়। পাব্লিক প্রসিকিউটার সাহেব অনুপস্থিত হলে বড় কেসেও তাকে উপস্থিত থাকতে হয়। ক্রিমিন্যাল কোর্টগুলিতে বেশ কেসের আজকাল ভিড় বড় বেশী। জজ সাহেব বুড়ো। তাঁর মুখে কোন কথা আটকায় না। ভয়ঙ্করতম অপরাধকে মঞ্জুলিকা নির্বিকার চিত্তে আলোচনা করে। তার এ ক্রটির নিয়ে আড়ালে আবডালে কোর্টের কর্মচারীদের মধ্যে বেশ রসান্বিত আলোচনা চলে থাকে। স্বয়ং জজ সাহেবও তাদের থেকে ভিন্ন নন, মঞ্জুলিকার এ সম্বন্ধে আছে। এসব চাপা খবর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। সে দিন একটা বিকৃতরুচি নারীর কেস আসে কোর্টে, সে তার স্বামীকে ধর্ষণ কার্যে সহায়তা করত। মঞ্জুলিকা কেসটা নিয়ে এমন সওয়াল করতে লাগল—শুনে সকলে থ' হয়ে গেল। আর সে খবর রটে গিয়ে এমন হল যে কলেজের সব ছেলে এসে কোর্টে হাজির হল, ভিড় করল রক-বাজ বেকারের দল। জজ সাহেব সবাইকে দূর করে দিতে বললেন। পুলিশেরা কনুই আর লাঠির খোঁচায় লোক সরাতে লাগল। কিন্তু উপায় নেই। সারা কোর্ট লোকে লোকারণ্য। বাধ্য হয়ে জজ সাহেব এসে দাঁড়ালেন, বললেন, আমি অনুরোধ করছি—আপনারা এখন যান, কোর্টকে কাজ করতে দিন। জনতা চলে যেতে রাজী হল তবে এক সর্তে, তারা আসামী চিন্তাহরণ দাসকে দেখতে চায়। পুলিশ একটা উঁচু জায়গায় চিন্তাহরণকে নিয়ে দাঁড় করাল। একটা চীৎকার চেঁচামেচি সুরু হল। সেটা উল্লাসের কি ধিক্কারের বুঝতে পারা গেল না। পুলিশ চিন্তাহরণকে কোর্টের ভিতরে নিয়ে গেল। জনতা কিন্তু স্থান ছাড়ল না। তারা আর এক আবার পেশ করল মামলা পরিচালিকা পাব্লিক প্রসিকিউটার শ্রীমঞ্জুলিকা গুপ্তরায়কেও তারা না দেখে যাবে না—জনতা নাছোড়। জজ সাহেব অনুরোধ করলেন মঞ্জুলিকাকে জনতার সামনে গিয়ে একবার দাঁড়াতে। কিন্তু মঞ্জুলিকা নারাজ। সে কেন যাবে? এদিকে জনতার চীৎকার, টিট্‌কারী, শিষ। মঞ্জুলিকার মনে হতে লাগল সে আজ মস্ত বড় অপরাধী—জনতার কাছে তার আর সেই অপরাধীর সমান আসন—উভয়েই সমান কৌতূহল উদ্দীপক। শেষ পর্যন্ত জজ সাহেবের অনুরোধে মঞ্জুলিকাকে জনতার সামনে দাঁড়াতে হল। তার সুন্দর লিপষ্টিক মাখা ঠোঁটের উপর একটা কেমন বিদ্রূপ ফুটে উঠল। তাকে দেখেও জনতা একটা কলরবে মুখর হয়ে উঠল। তার অর্থ কিছুই বোঝা গেল না।

এর পরে জনতা অবশ্যই কোর্ট খালি করে চলে গিয়েছিল। কিন্তু কোর্টের কাজ চালনা করা মঞ্জুলিকার পক্ষে সেদিন আর সম্ভব হয়নি। তারপর দিন থেকে তাকে আর কোর্টে যেতে দেখা গেল না।

আইন ব্যবসায়ে নারীকে নিরুৎসাহ করার উদ্দেশ্যেই এ গল্পটি বলা হল না। আইনের ক্ষেত্রে নারীর অবাধ চলাচলকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে দেশের মানুষকে যে আরও সুসভ্য করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আজ নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

উত্তরবঙ্গের মেয়েলি প্রবাদ

কুমারী ইন্দ্রাণী চৌধুরী

জগতের সকল দেশে, সকল সমাজে এবং সকল কালে যেরূপ প্রবাদ বাক্যের প্রচলন আছে, উত্তরবঙ্গের বেলাতেও তাহার তাহার অন্যথা হয় নাই। উত্তরবঙ্গের ঘরে ঘরে আজিও নানাবিধ প্রবাদ বাক্য মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে উদ্ভূত হইয়া আপনার বেগে সরল ভাষায় জনসাধারণে প্রচারিত হইয়াছিল। এই সকল প্রবাদবাক্যের রচয়িতা কে বা কাহারা তাহা জানিবার উপায় নাই। পুরুষপরম্পরায় এই সকল প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে; পিতা হইতে পুত্রে, মাতা হইতে কন্যায়, এইভাবে ক্রমান্বয়ের ধারায় প্রবাদগুলি মুখে মুখে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

'ডাক' ও 'খনার' বচন বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সমধিক প্রচলিত। কিন্তু উত্তরবঙ্গের এই প্রবাদগুলি জনসাধারণের

মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচিতি লাভ করে নাই। ইহার কারণ প্রবাদগুলি উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত। তথাকথিত অশিক্ষিত রাজবংশী পরিবারেই ইহার প্রচলন। অধুনা রাজবংশীগণ কৃষিজীবী। কাজেই তাঁহাদের প্রবাদ বাক্যে কৃষি ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিরই আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কোন কোনটিতে গ্রাম্যলোকের সরল বিশ্বাস বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য।

জলপাইগুড়ি জেলার পল্লী অঞ্চলের রাজবংশীর বালক-বালিকাগণ সন্ধ্যার অবসর মুহূর্তে বৃদ্ধা পিতামহী বা মাতামহীর নিকট বসিয়া নানাবিধ গল্পের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল কৃষি বিষয়ক প্রবাদগুলিও শিক্ষা করিয়া থাকে। নীচে এই প্রবাদগুলি রাজবংশীর গ্রাম্য কথ্য ভাষাতে এবং আধুনিক বাংলা ভাষাতে প্রকাশ করা হইল।

১। "শুনেক্, যেই মাসে পতিবতের চামড়া কাচিদাওর নাখাতি সিধা হয়া উটিবে, সেই মাসে খুপ আকাল হবে। আর যেই মাসে চামড়া হাসুয়াদাওর নাখাতি উটিবে ঐডা মাসত জিয়াতের দাম পড়িবে।"

—শোন্ যে মাসে প্রতিপদ তিথিতে চাঁদ ধানকাটা কাচি দায়ের মত সোজা হইয়া উঠিবে, সে মাসে জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। আর যে মাসে প্রতিপদের চাঁদ পাটকাটা হাসুয়া দায়ের মত কাত হইয়া উঠিবে, সে মাসে খাদ্য শস্যের মূল্য নিম্নগামী হইবে।

২। "ছিপকমীর দিন যদি পছিয়া যাও বয়, সেই সন ভাদই ধানত পাতে না পড়িবে।"

—শ্রীপঞ্চমীর দিন, অর্থাৎ সরস্বতী পূজার দিন যদি পশ্চিম দিক হইতে শুষ্ক বাতাস বহিতে থাকে, তবে সে বৎসর আউশ ধানের অধিকাংশের ভিতরই চাউল থাকিবে না।

৩। "ভাদরের পছিয়াই তিল কালাই বুনেক। ভাদর মাসে পছিয়া বইলে খুপ খর হবে। সেলা তিল কালাই কেলেবা নাগে।"

—ভাদ্র মাসে পশ্চিমের বাতাস বহিলে খুব খরা হইবে; তখন তিল, কলাই বুনিতে হয়।

৪। 'ভাদই এর রূপাকে আর হেউতির রূপাক। ভাদই ডাউহা বন্দী ধরিলে কাটিয়া পুকিতে পারিবে। হেউতি ধানের নারা শুকিবা নাকে সেলায় কাটিবেন। মাতেন-তে কানা ধান পাতে না পড়িবে।"

আউশ ধানে সামান্য রং ধরিলেই কাঁচা অবস্থায় কাটিয়া স্তূপ করিয়া রাখিবে। ধান সেই অবস্থাতেই পাকিবে। কিন্তু আমন ধানের গাছ সম্পূর্ণ শুকাইলেই কাটিবে অন্যথায় কাঁচা ধান স্তূপে জমাট থাকিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে!

৫। 'ধানের গোলাত যদি শুয়া ধরে ঐ সন ধানের দাম চড়িবে—আকাল হোবে।"

—নূতন ধান গোলায় তুলিবার পর যদি দেখা যায় ধানে কালো কালো শুঁড়ওয়ালা পোকা ধরিয়াছে। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে বৎসর ধানের দাম খুব বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে।

বৃদ্ধা পিতামহী বা মাতামহী পক্ষী চরিত্রেও অভিজ্ঞা। বিভিন্ন সময়ে পাখীর বিভিন্ন ডাকের সঙ্গে দেশের মঙ্গল অমঙ্গলের দিশাও তাঁহারা পান। নাতিনাতনীদের তিনি শিখাইতেছেন—

৬। "দেক্, ভাট্ কাওয়াটা খুব কান্দেছে। বাড়িভাত্ বিয়বান্ দেখিচে। এইডা কাউহা এইনং ডাকিলে বাড়িভাত কাবহুন হয়।"

—দেখ দাঁড়কাকটা কর্কশ স্বরে ডাকিতেছে। বাড়িতে অমঙ্গল দেখিয়াছে। এই কাক এই রকম কর্কশ স্বরে ডাকিলে বাড়িতে কাহারও না কাহারও অমঙ্গল হবেই।

৭। "ওই দেক্, পাতি কাউহাডা কুল কুলাচ্ছে। লোদোর আসিবে। মুখে মুখে যদি খুপ কুল কুলায় তালে তার তার সাক্সিনিয়া লোদর আসিবে।"

—ওই দেখ, পাতিকাকটা ধীরে ধীরে ডাকিতেছে। বাড়ীতে কুটুম্ব আসিবে। আর যদি দুইটা পাতিকাক মুখোমুখি হইয়া ধীরে ধীরে ডাকে তবে জানিবে বিবাহের প্রস্তাব লইয়া কুটুম্ব আসিবে।

৮ "ভাদর মাসে কুকয়া পাখি ডাকিলে খরখরে; পানি হব না হয়।"

—ভাদ্র মাসে বড় চিল ডাকিলে বৃষ্টি হবে না। সব কিছু শুকাইয়া যাইবে।

৯। "হেওয়াত জল দুবার চক্ দেখিলে ফটিং জল পাখি ডাকিয়া বেড়ায়। সেখায় নগত জল হবে!"

—আকাশে বৃষ্টি হইবার লক্ষণ দেখা দিলে ফটিক জল

(চাতক) পাখী ডাকিতে থাকে। তখন অল্প সময়ের ভিতরেই বৃষ্টি হয়।

১০। "কাল পেঁচা দিনভর না ডাকে। আড়ি করিয়া গাওটাড় ডাকিলে খুব বেশার দেখা দিবে।

—কালপেঁচা দিনে ডাকে না। রাত্রে যদি কোন গ্রামে ডাকে সে গ্রামে খুব ব্যাধি পীড়া দেখা দিবে।

এই রকম অজস্র প্রবাদবাক্য উত্তরবঙ্গের জন-সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে তাহার সংখ্যা করে কে? উত্তরবঙ্গ সকল দিক হইতেই অবহেলিত, কি প্রশাসনিক দিক হইতে, কি অর্থনৈতিক দিক হইতে আবার সাংস্কৃতিক দিক হইতেও। উত্তরবঙ্গের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ অতুলনীয় হইলেও আজ পর্য্যন্তও ইহার যথাযথ আলোচনা আরম্ভ হয় নাই। সুধীজনের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিবার জন্য এই সামান্য প্রয়াস মাত্র।

——

প্রসূতি-পরিচর্য্যা ও শিশুমঙ্গল

কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম.বি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৮

প্রসূতি-অবস্থায় মহিলাদের সচরাচর যেসব অসুবিধার কারণ দেখা দেয়, সেগুলির মধ্যে প্রাতঃকালে গা-বমি-বমি করার কথা আগেই বলা হয়েছে। গর্ভধারণের প্রায় তিনমাস পরে প্রসূতিদের অনেকেরই আর এমন অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। তবে সকল ক্ষেত্রেই যে প্রসূতিদের প্রাতঃকালেই বমন-ভাব পরিলক্ষিত হয়, এমন নয়…অনেক ক্ষেত্রে সারা দিনে-রাতে অন্য সময়েও এমন অসুবিধা ঘটে। এই ধরণের অসুবিধা ঘটলে, প্রসূতিদের পক্ষে, সুচিকিৎসক বা নিপুণা-ধাত্রীর পরামর্শমতো যথোচিত ব্যায়াম ও বিশ্রাম নিয়মিতভাবে অনুসরণ করা প্রয়োজন। অধিক ব্যায়াম, পরিশ্রম, গুরুভোজন বা রাত্রি-জাগরণ করা এ সব প্রসূতিদের পক্ষে আদৌ মঙ্গলকর নয়। তার পরিবর্তে বরং দিনে-রাতে নিয়মিতভাবে পরিমিত ব্যায়াম, পরিশ্রম, আহার, সকাল-সকাল সন্ধ্যাগ্রহণান্তে বিশ্রাম ও সুনিদ্রার অভ্যাস করতে পারলে প্রসূতি এবং গর্ভস্থ-সন্তান—উভয়েরই যথেষ্ট স্বাস্থোন্নতি ঘটবে…বিপদের সম্ভাবনাও হ্রাস পাবে। বিশ্রাম-মানসে শয্যাগ্রহণকালে বালিশে মাথা রেখে, পায়ের নীচেও বালিশ দিয়ে, পা দুটিকে কোমরের চেয়ে ঈষৎ উঁচুতে রক্ষা করে শয়নই প্রসূতির পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক হবে। তাছাড়া ইতিপূর্ব্বেই বলেছি—প্রত্যহ নিয়মিতভাবে কোষ্ঠ-পরিষ্কার রাখার দিকে সকল প্রসূতিরই সবিশেষ নজর নেওয়া আবশ্যক এবং নিতান্ত-আবশ্যক না হলে, সচরাচর কোনো রকম জোলাপ সেবন করা বাঞ্ছনীয় নয়। পুষ্টিকর-সহজ-পাচ্য খাদ্য গ্রহণের দিকেও প্রসূতিদের রীতিমত দৃষ্টিদান করা দরকার। পূর্ব্বেই বলেছি—প্রসূতিদের পক্ষে, চর্ব্বি জাতীয় উপাদান বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। তাছাড়া প্রসূতি-অবস্থায় মাছ মাংসও কম খাওয়া বিধেয়। এ অবস্থায় বরং শর্করা বা চিনি-জাতীয় (Glucose) খাদ্য এবং ননী-বিহীন বা মাটা-তোলা দুধ, ছানা প্রভৃতি 'প্রোটিন' (Protin) জাতীয় উপাদান গ্রহণ করাই ভালো। প্রতি বারে অল্প-অল্প করে প্রত্যহ তিন বারের জায়গায় অন্ততঃপক্ষে ছয়বার দুধ খাওয়া সমীচীন। বহু আধুনিক সুচিকিৎসক-ধাত্রীর মতে, প্রসূতি-অবস্থায় জলের বদলে দুধ পান করাই অনেক বেশী উপকারী। প্রসূতির শারীরিক-সুস্থতা এবং পরিপাক-শক্তির অবস্থা বিবেচনা করে সুনিপুণ চিকিৎসক বা ধাত্রীর পরামর্শানুসারে যথোচিতভাবে তাঁর দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকায় ননী-বিহীন বা মাটা-তোলা দুধের পরিবর্তে ননীযুক্ত বা মাটাশুদ্ধ দুধ দেওয়া যেতে পারে। ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ বহু পাশ্চাত্য-চিকিৎসকই আজকাল প্রসূতিদের, প্রাতে একপেয়ালা গরম-পাৎসা চা ও বিস্কুট সেবনের পর কিছুক্ষণ শয্যায় শুয়ে বিশ্রামগ্রহণান্তে দৈনন্দিন কর্ম্মসূচী আরম্ভ করার সুপরামর্শ দিয়ে থাকেন। প্রসূতির প্রাত্যহিক খাদ্য-তালিকায় তাঁরা পর্য্যাপ্ত টাট্‌কা মিষ্ট-ফল, কিস্‌মিস্, খেজুর সুমিষ্ট-ডুমুর প্রভৃতির সুব্যবস্থা করার বিশেষ পক্ষপাতী। এছাড়া প্রসূতিকে চোকর-ওয়ালা আটার রুটি, শাক-সব্জী, স্যালাড, ওটমিল (Oatmeal) বা গমের পায়েস প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য দিতেও তাঁরা সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁদের মতে, যতদিন পর্য্যন্ত প্রসূতির কোষ্ঠকাঠিন্য বিদূরিত

না হয়, ততদিন মাংসাদি খাদ্যগ্রহণ একান্তপক্ষেই বর্জন করা উচিত এবং পরে কোষ্ঠকাঠিন্যের অসুবিধা দূর হলে, শারীরিক ও পরিপাকশক্তির অবস্থা বিবেচনা করে প্রসূতিকে ক্রমশঃ 'লিভার' বা 'মেটে', 'ব্রেন' বা 'ঘিলু' (মস্তিষ্ক), অণ্ডাশয় এবং টাটকা মাছ, মাছের ডিম প্রভৃতি জান্তব অন্নতন্ত্র-সহযোগে যথোচিত পুষ্টিকর আমিষ-জাতীয় খাদ্যাদি দান করা যেতে পারে। অভিজ্ঞ ধাত্রীবিদ্যাবিশারদের মতে, শারীরিক গোলযোগ এবং দুর্ব্বলতাই হলো—প্রসূতিদের বমন-উপসর্গের অন্যতম কারণ···তাই দুয়েকদিন শয্যাগ্রহণান্তে সম্পূর্ণ বিশ্রাম উপভোগের ফলে, স্নায়বিক সুস্থতা-অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে এ অসুবিধা সচরাচর ক্রমেই বিদূরিত হয়ে যায়। তবে এ সব ব্যবস্থা সত্ত্বেও কোনো প্রসূতির যদি বমন-উপসর্গ তিরোহিত না হয়, তাহলে সে সব ক্ষেত্রে অবিলম্বে সুচিকিৎসক বা অভিজ্ঞা ধাত্রীর পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক।

বমন-উপসর্গ ছাড়াও, প্রসূতি-অবস্থায় আরেকটি মারাত্মক অসুবিধা হলো—অকালে গর্ভপাত। সচরাচর স্বাভাবিক-অবস্থায় প্রসূতিদের প্রতিমাসে যে সময়ে মাসিক ঋতু দেখা দেয়, সেই সময়টিতেই গর্ভপাতের যথেষ্ট আশঙ্কা ও সম্ভাবনা থাকে। এই কারণেই এ সময়ে প্রসূতিদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন এবং সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করা প্রয়োজন—ইতিপূর্ব্বেই সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। দুর্ভাগ্যক্রমে কোনো প্রসূতির যদি গর্ভাবস্থায় অকালে ঋতু রক্তক্ষরণ হয়, তাহলে অবিলম্বে শয্যায় চিৎ হয়ে শুয়ে সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সুচিকিৎসকের পরামর্শ ও সহায়তা নেবেন। এ অবস্থায় সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণকালে বিছানায় পায়ের দিকের অংশটিকে মাথার দিকের অংশের চেয়ে অন্ততঃপক্ষে ছয় ইঞ্চি উঁচু করে রাখতে হবে—নিতান্ত অসম্ভব হলে, প্রসূতির দেহের নিম্নাংশে উরুদেশের তলায় মোটা বালিশ সাজিয়ে রেখে—মাথার দিক নীচু এবং পায়ের দিকে উঁচু করে দেওয়া আবশ্যক। এই অবস্থায় প্রসূতিকে শয্যায় আগাগোড়া চিৎ হয়ে শুয়ে সম্পূর্ণ স্থিরভাবে বিশ্রাম নিতে হবে—যতক্ষণ পর্য্যন্ত অভিজ্ঞ চিকিৎসক বা ধাত্রী এসে তাঁর যথোচিত সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থাভার গ্রহণ না করেন। কারণ সামান্য অসাবধানতার ফলে, প্রসূতির পক্ষে, এ উপসর্গটি শেষ পর্য্যন্ত হয়তো রীতিমতই সঙ্গীন, এমন কি, মারাত্মক জীবন-সংশয়কর বিপদও হয়ে দাঁড়াতে পারে।

প্রসূতি-অবস্থায় আরেকটি অসুবিধাজনক উপসর্গ হলো - অনিদ্রা। প্রসূতি-অবস্থায় অপরিমিত আহার, অস্বাস্থ্য, অস্বাচ্ছন্দ্য, অজ্ঞতা, অযত্ন, আলস্য, অবহেলা বা অসাবধানতার ফলে বহু মহিলাই অনিদ্রার অল্প-বিস্তর অসুবিধা ভোগ করে থাকেন। তাঁদের পক্ষে, এ উপসর্গের উপদ্রব থেকে রেহাই পেতে হলে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে যথাসময়ে শান্ত-মনে শয্যাগ্রহণ করা কর্ত্তব্য—অহেতুক অধিক-রাত্রি জাগরণের ফলে, প্রসূতির শুধু যে স্বাস্থ্যহানি ঘটে তাই নয়, নিদ্রাও প্রগাঢ়, সুখপ্রদ এবং শান্তিময় হয় না। তার চেয়ে বরং প্রসূতি যদি রাত্রে সকাল-সকাল শয্যা গ্রহণ করেন, তাহলেই আর সুনিদ্রার বিশেষ কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না। প্রসূতি অবস্থায় সুনিদ্রা একান্ত আবশ্যক। কারণ, প্রসূতি-অবস্থায় দেহের আভ্যন্তরিক স্নায়ু-বন্ধাদির উপর সবিশেষ চাপ বা ভার পড়ে···সে ভারে শরীর পীড়িত অসুস্থ হয়ে ওঠে সহজেই···পর্য্যাপ্ত বিশ্রাম ও নিদ্রার ফলেই দেহাভ্যন্তরের সে গুরুভার তবু কিছুটা লাঘব হবার সুযোগ পায়। সেই কারণেই প্রসূতিদের পক্ষে নিদ্রা ও বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন আছে। প্রসূতিদের পক্ষে সুনিদ্রা লাভের প্রকৃষ্ট উপায় হলো—প্রত্যহ রাত্রে নিয়মিত সময়ে পরিপাটি স্বাচ্ছন্দ্যকর বিছানায় শয্যাগ্রহণের পূর্ব্বে ঠাণ্ডা জলে হাত-মুখ-পা ধুয়ে শান্ত মনে নিদ্রার সুব্যবস্থা করা। গুরু ভোজন, অধিক-রাত্রি জাগরণ বা অতিরিক্ত পরিশ্রম, বিলাস উত্তেজনাদির ফলে, অনেক সময়েই প্রসূতিদের সুনিদ্রা-বিশ্রামের যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটে এবং যথোচিত বিশ্রামের অভাবে শারীরিক ক্লেশ-অস্বাচ্ছন্দ্য অসুস্থতারও উদ্ভব হয়। অনেক ক্ষেত্রে অনিদ্রার দুর্ভোগ অসুবিধা থেকে নিস্তার পাবার আশায় কোনো কোনো অতি আধুনিকা প্রসূতি নানা রকম ঘুমের ঔষধাদিও সেবন করে থাকেন। তার ফলে, তাঁরা অনেক সময় অহেতুক নিজেদের নানান্ সঙ্গীন বিপদ ডেকে নিয়ে আসেন। সুচিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ঘুমের ওষুধ সেবন করা প্রসূতিদের পক্ষে আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। এ সব ঔষধ সেবনের পরিবর্ত্তে নিয়মিতভাবে উপরোক্ত

ব্যবস্থাগুলি অনুসরণ করলে প্রসূতিরা অনায়াসেই প্রচুর উপকার পেতে পারবেন। লোকে কথায় বলে—'বাঁকা-পথে এগিয়ে বিপদে পড়ার চেয়ে, সোজা-পথে চলে শাস্তি পাওয়া ঢের ভালো।' প্রসূতিদের ক্ষেত্রেও—এ প্রবাদ বাক্যটি বিশেষভাবে মনে রাখা ভালো।

প্রসূতি অবস্থায় অনেক মহিলাদের অম্ল বিস্তর অম্ল-রোগের অসুবিধায় কষ্টভোগ করতে হয়। তার কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে তাঁরা নানা কারণে নিজেদের আহারাদির বিষয়ে তেমন বিশেষ সচেতন নন, কিম্বা যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করেন না। সচরাচর গুরুপাক ও অপুষ্টিকর আজেবাজে দৌখিন-মুখরোচক অতিরিক্ত কাল-টক-মশলাদার খাদ্যাদি আহারের ফলে, হজমের গণ্ডগোলে পাকাশয়ের পীড়ার জন্যই অম্ল-রোগের উপসর্গ-অসুবিধা দেখা দেয়। এটি অবশ্য এমন কিছু সঙ্গীন বিপদের বিষয় নয়—আহারাদির সম্বন্ধে একটু সতর্ক থাকলেই প্রসূতির পক্ষে এ ধরণের দুর্ভোগ থেকে রেহাই পাওয়া নিতান্তই সহজ ব্যাপার। প্রসূতিদের অম্ল-রোগ সারানোর সোজা উপায়—অল্প একটু গরম জলে এক চিমটা বাইকার্বনেট্ অব্ সোডা (Soda Bicarb) মিশিয়ে পান করলেই অচিরে এ উপসর্গের অসুবিধা দূর হয়ে যাবে।

স্থান-ভাবে এবারে এখানেই এ প্রসঙ্গ মুলতুবী রাখতে হলো। আগামী সংখ্যায় প্রসূতি-অবস্থায় সচরাচর আরো যে সব অসুবিধা-উপসর্গ ভোগ করতে হয়, সেগুলির মোটামুটি হদিশ দেবার ইচ্ছা রইলো। (ক্রমশঃ)

সুপর্ণা দেবী

ইতিপূর্বে মহিলাদের মুখের খুঁত ত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে যে সব ব্যায়াম পদ্ধতির কথা আলোচনা করেছি, এবারেও সেই ধরণের আরেকটি বিশেষ ধরণের ব্যায়াম-চর্চ্চার পরিচয় দিই।

অনেকের ধারণা নাকের গড়নে দোষ থাকলে অস্ত্রোপচার ছাড়া নাকি সে খুঁৎ সংশোধন করা সম্ভব নয়। এ ধারণা কিন্তু ভুল। একালের রূপচর্চ্চা-বিশেষজ্ঞেরা বলেন নিয়মিতভাবে বিশেষ ধরণের ব্যায়াম অনুশীলনের ফলে, নাকের গড়নের দোষ ত্রুটি অচিরেই শুধু সংশোধনই নয়, শ্রীও সুন্দরও করে তোলা যায়। আপাততঃ, সেই ধরণেরই বিশেষ একটি ব্যায়াম-পদ্ধতির হদিশ দিচ্ছি।

যে সব মহিলাদের নাকের উপর দিক মুখে মিশে

থাকে এবং ভগাটি বড়ির মতো বর্তুলাকৃতি হয়, তাঁদের পক্ষে এ ব্যায়ামটি বিশেষ উপযোগী হবে—আধুনিক রূপচর্চা-বিশেষজ্ঞেরা এমনি অভিমত প্রকাশ করেন। এ ব্যায়ামের অনুশীলন পদ্ধতিটি হলো—উপরের ছবিতে দেখানো ভঙ্গীতে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জনী—এই দুই আঙুলে নাকের ডগার দিক মৃদু চাপ দিয়ে ঠেলে ধরে ধীরে ধীরে নরমভাবে ঘষে ঘষে আঙুল দুটিকে ক্রমশঃ দু'পাশের গালের উপর পর্যন্ত টেনে আনবেন। তারপর নাকের ডগার দিকে ধীরে ধীরে দুই আঙুলের মৃদু চাপ দিয়ে মোচড় দেবেন। কয়েকবার এই ভঙ্গীটি অনুশীলন করবার পর, আঙুল দুটিকে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ব্যায়ামটি মুখের যে অংশ থেকে সর্বপ্রথম শুরু করেছিলেন—বরাবর সেই অংশে। তারপর সেখান থেকে আবার পুনরানুবৃত্তি করবেন—ব্যায়ামের প্রথমোক্ত ভঙ্গীটি। এমনিভাবে অন্ততঃপক্ষে, প্রায় দশ মিনিটকাল ব্যায়ামের এই বিশেষ ভঙ্গীটিকে বার বার অনুশীলন করতে হবে।

অতঃপর, দুই হাতের মধ্যমাঙ্গুলীর সাহায্যে উপরের ছবিতে দেখানো ভঙ্গী অনুযায়ী নাকের দুই পাশ মৃদু চাপ দিয়ে ঠেলে ধরে ধীরে ধীরে উপর দিক থেকে নীচে এবং নীচের দিক থেকে উপরে ঈষৎ জোরে জোরে ঘর্ষণ করবেন। প্রথমোল্লিখিত ভঙ্গীর মতো ব্যায়ামের এই দ্বিতীয় ভঙ্গীটিও অন্ততঃপক্ষে দশ মিনিটকাল নিয়মিতভাবে অনুশীলন করতে হবে।

সুন্দর সুঠাম মুখশ্রী গঠন ও রূপ চর্চ্চার উদ্দেশ্যে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে বিশেষ ধরণের এ সব ব্যায়াম অনুশীলন ছাড়াও, পুষ্টিকর এবং সহজপাচ্য খাদ্য-গ্রহণের দিকেও সযত্ন দৃষ্টিদান করা একান্ত আবশ্যক। কারণ, দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনে যথোচিত ব্যায়াম অনুশীলন এবং সহজপাচ্য পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের সম্পর্ক যে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত—সে কথা সম্ভবতঃ সকলেরই জানা আছে। কাজেই এ বিষয়ে বিশদালোচনা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন।

আগামী সংখ্যায় রূপচর্চ্চার আরো কয়েকটি অপরিহার্য্য প্রসঙ্গ আলোচনার চেষ্টা করবো।

কাদা-মাটির কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

৩

ইতিপূর্বে যেমন ছবিশ বিঘেছি, মোটামুটি তেমনি পদ্ধতিতে কারুশিল্প রচনার উপযোগী কাদামাটির তাল তৈরী করে নেবার পর, মৃৎশিল্পীর যেমনপূর্বতো ছাঁচে ছোটবড় ঘট, পুতুল, মূর্তি প্রভৃতি বিবিধ ধরণের দোখিন সামগ্রী অথবা সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপকরণাদি বানানোর কাজে হাত দিতে হবে।

সচরাচর একই ছাঁচের একজোড়া খেলনা, পুতুল, ঘট, ফুলদানী প্রভৃতি মাটির জিনিষপত্র বানাতে হলে, পেশাদার মৃৎশিল্পীরা অনেকক্ষেত্রে বিশেষধরণের দুটি ছাঁচ বা moulds ব্যবহার করেন। এই ছাঁচ দুটির মধ্যে একটি ব্যবহৃত হয়—শিল্পসামগ্রীর সুমুখের অংশ গঠনের জন্য এবং অপরটিকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে—শিল্পসামগ্রীর পিছনের দিকের অংশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে।

পরপৃষ্ঠার ছবিতে মাটির পুতুলের ছাঁচের নমুনাটি দেখলেই তার সুস্পষ্ট পরিচয় মিলবে। এধরণের ছাঁচের সাহায্যে মৃৎশিল্প-সামগ্রী রচনার সময়, শিল্পীরা সচরাচর প্রয়োজনমতো কাদামাটির তাল দিয়ে, সেটিকে ময়দার 'লেচির' মতো হাতে পাকিয়ে সমান করে নিয়ে প্রত্যেকটি ছাঁচের ভিতরকার খোপে খোপে পৃথকভাবে ঘষে বসিয়ে, হাতের আঙুলের চাপ দিয়ে ঠেলে-ঠেলে পরিপাটিভাবে নক্সার আগাগোড়া ছাপ তুলে রাখেন। এমনি উপায়ে

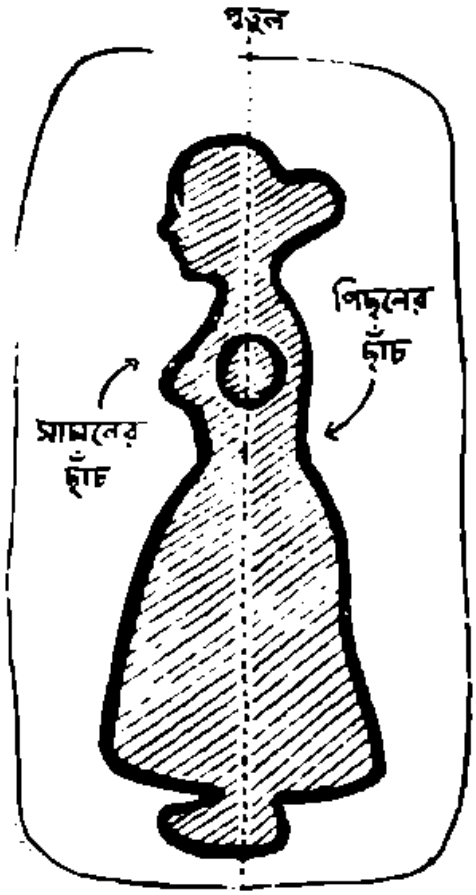

কাদামাটির পৃথক দুটি নরম-তালের উপর নক্সার সম্পূর্ণ ছাপ মুদ্রিত করে তোলার পর, সযত্নে প্রত্যেকটি ছাঁচ থেকে নক্সা-ছাপা কাদামাটির আলাদা আলাদা অংশ দুটিকে নিয়ে, শিল্পসামগ্রীর সেই দুই পৃথক অংশকে তাঁরা যথাযথ-ভাবে একত্রে মিলিয়ে জুড়ে দেন···তাহলেই সোজা উপায়ে তৈরী করা যায় ঐ মাটির পুতুলটি। তারপর কাদামাটির তৈরী সেই গোটা-পুতুলটিকে আগাগোড়া রোদে শুকিয়ে অথবা কিছুক্ষণ আগুনের চুল্লীতে (Klin) রেখে পুড়িয়ে নিলেই অনায়াসে অল্প সময়ের মধ্যেই পাথর-পোক্তভাবে তৈরী একই ছাঁদের অনেকগুলি মৃৎশিল্পসামগ্রী রচনার মোটামুটি নিয়ম। তবে শিক্ষার্থীদের পক্ষে, এ-ধরণের ছাঁচতোলা খুব সহজসাধ্য কাজ নয়। উপরন্তু প্রকৃত কলারসিকদের কাছে, এভাবে ছাঁচতৈরী মৃৎশিল্প-সামগ্রীর কদর, হাতেগড়া কাদামাটির জিনিষপত্রের চেয়ে অনেক কম। তাছাড়া, ছাঁচতৈরীর অন্তত, গোড়াতেই কাদামাটির সাহায্যে হাতেগড়ে মূলনক্সার ছাঁদে আসল একটি মৃৎশিল্পসামগ্রী রচনা করা আবশ্যক। কারণ, আসল বস্তুটি তৈরী না হ'লে, সেটি অবিকলছাঁচ···অর্থাৎ, সামনের ও পিছনের দিকের পৃথক-অংশ দুটির হুবহু নকল ছাঁদ বানানো সম্ভব হবে কেমন করে! কাজেই মৃৎ-শিল্পীকে সর্ব্বাগ্রে নিজের হাতে কাদামাটির তাল দিয়ে শিল্পসামগ্রী গড়বার কলাকৌশলটুকু নিপুণভাবে আয়ত্ত করে নিতে হবে। সে কলাকৌশল কি উপায়ে সহজেই আয়ত্ত করা যায়, আপাততঃ তারই মোটামুটি হদিশ দিই।

অর্থাৎ, আকারহীন কাদামাটির নরমতাল থেকে সাধারণতঃ, চোখে যে সব জিনিষ দেখা যায় কিম্বা শিল্পীর মনে কাল্পনিক আকার ধারণ করে, তার নিখুঁত পরিপাটি রূপটিকে যথাযথভাবে বাস্তবছাঁদে ফুটিয়ে তুলতে হলে, শিক্ষার্থীদের পক্ষে গোড়াতেই নিয়মিতভাবে নিতান্ত সহজ-সরল কয়েকটি মৃৎশিল্পসামগ্রী রচনার অভ্যাস অনুশীলন করা প্রয়োজন। কাদামাটির কারুশিল্পসামগ্রী রচনার কাজে দক্ষতাঅর্জ্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের গোড়ার দিকে কয়েকদিন নিয়মিতভাবে খানিকটা নরমমাটির তাল নিয়ে সেটিকে সযত্নে দুই হাতের তালুর মধ্যে রেখে কিছুক্ষণ মৃদু চাপ দিয়ে ঘুরিয়ে গোলাকার মার্ব্বেল কিম্বা বলের মতো ছাঁদে রূপদানের অভ্যাস করা দরকার। এছাড়া কাদামাটির তাল নিয়ে কখনো সেটিকে সমতল জমি, কাঠের পাটা বা বাঁ-হাতের তালুর উপর রেখে, ডানহাতের তালুর সাহায্যে লুচি বেলার ভঙ্গীতে মৃদু চাপ দিয়ে গড়িয়ে পাশবালিশ অথবা পাম্বয়ার মতো ছাঁদের সামগ্রী, কখনো বা মাটির তালটিকে ঘিরে আঙুলের সাহায্যে টিপে-টুপে দেশলাইয়ের বাক্স কিম্বা বরফী-সন্দেশের মতো চৌ কাণা-আকারের সামগ্রী, কখনো হাতের তালুর চাপ দিয়ে আবার নৈবেদ্যের চাল সাজানো কিম্বা মিশরের পিরামিডের মতো ত্রি-কাণ ছাঁদের সামগ্রী, কখনো বা টালি, ইট, থালার মতো চ্যাপ্টা আকারের সামগ্রী বানিয়ে তোলার সহজ-সরল কলাকৌশলগুলি নিয়মিত অনুশীলনের ফলে, নিপুণভাবে আয়ত্ত করে নিতে হবে। কিছুদিন নিয়মিত-ভাবে কাদামাটির তাল দিয়ে বিবিধ ছাঁদের সহজসরল কারুশিল্পসামগ্রী রচনার এ সব কলাকৌশল অভ্যাস করতে পারলে, শিক্ষার্থীর শিল্পচেতনা, কারুসৃষ্টি প্রতিভা, হাতের কারিগরী-নৈপুণ্য আর অভিজ্ঞতা যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে

সেকথা বলাই বাহুল্য। এমনিভাবে ক্রমশঃ কাহারাটির কারুশিল্পের মূল কলাকৌশলগুলির খুঁটিনাটির সঙ্গে সুপরিচিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, শিক্ষার্থীরা তখন অনায়াসেই নিজের হাতে নয়নমাটির তাল থেকে ডিম, আপেল, আম, আঙুর, কলা, বেগুন, আলু, পটল, কুমড়ো, লাউ,চৌম্যাচৌ,ঝিঙা প্রভৃতি বিবিধ ধরণের আরো উন্নততর সহজ সরল এবং সৌষ্ঠবিন সুন্দর টুকিটাকি মৃৎশিল্প সামগ্রী গড়ে তুলতে পারবেন। তবে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের এ সব মৃৎশিল্প সামগ্রী রচনার কলা-কৌশল রপ্ত করতে হলে, কাদা-মাটি ছাড়াও, শিক্ষার্থীদের আরো কয়েকটি বিশেষ ধরণের সাজ-সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি হাতিয়ার সংগ্রহ করা দরকার। এগুলির সহায়তা না পেলে, শিক্ষার্থীদের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে মৃৎশিল্প সামগ্রী গড়ে তোলার প্রচুর অসুবিধা দেখা দিতে পারে। কাজেই আগামী সংখ্যায় এ বিষয়ে মোটামুটি হদিশ দেবার চেষ্টা করবো। এবারের মতো প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে শিক্ষার্থীদের শুধু এইটুকুই জানিয়ে রাখি যে উপরোক্ত বিশেষ ধরণের সাজ-সরঞ্জামগুলি জোগাড় করা নিতান্তই সহজসাধ্য ব্যাপার এবং সেগুলি সংগ্রহের জন্য খুব বেশী অর্থব্যয়েরও আশঙ্কা নেই···এমন কি, হাট-বাজারের দোকান থেকে কেনবার অসুবিধা ঘটলে, শিক্ষার্থীরা অনায়াসেই ঘরে বসে এ সব সামগ্রী সংগ্রহের সুব্যবস্থা করে নিতে পারবেন। [ক্রমশঃ

সৌদামিনী দেবী

সূতী, রেশমী বা পশমী কাপড়ের উপর নিত্য নতুন-নতুন ছাঁদের সৌষ্ঠবিন-সুন্দর বিচিত্র-অভিনব নক্সাদার সূচী-শিল্পের কাজ করে অলঙ্করণের দিকে বেশীর ভাগ মহিলারই আজকাল বিশেষ আগ্রহ-অনুরাগ দেখা যায়। তাই এবারে বড়দিনের সাদর-সম্ভাষণ হিসাবে সৌষ্ঠবিন এম্‌ব্রয়ডারী সূচী-শিল্পের উপযোগী সহজসাধ্য একটি নতুন-ধরণের নক্সা-নমুনা তাঁদের উপহার দিচ্ছি।

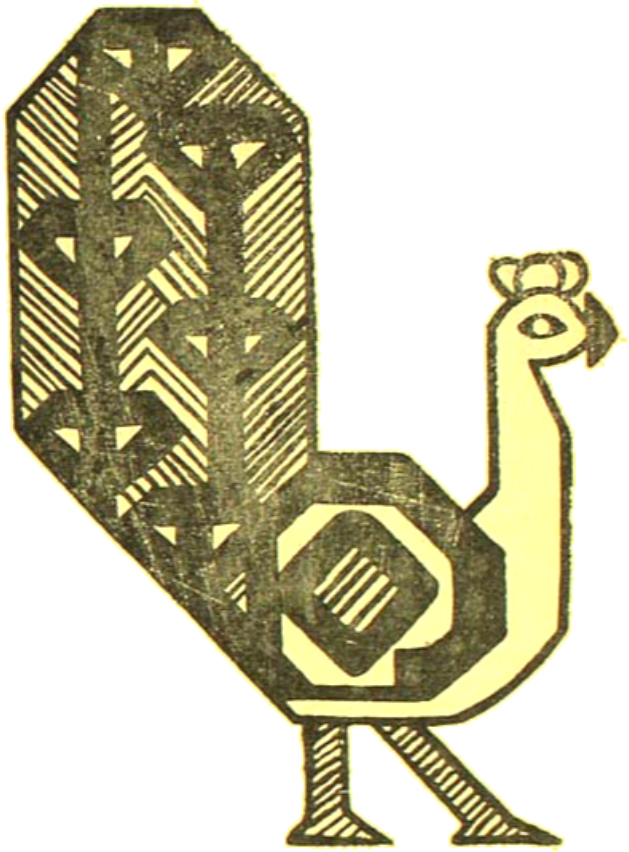

ভারতীয় পক্ষী-কুলের মধ্যে সৌন্দর্য্যে সকলের সেরা বর্ণচ্ছটার মনোরম পেখমধারী-ময়ূরকেই সম্প্রতি বিশিষ্ট প্রতীক হিসাবে আমাদের দেশে সসম্মানে গৌরবান্বিত করা হয়েছে। কাজেই সূচী-শিল্পে অনুরাগিণী অনেকেরই হয়তো ভারতীয় পক্ষী-কুলের প্রতীক-চিহ্ন হিসাবে আল্পনারিক ছাঁদে রচিত উপরের ছবিতে দেখানো পেখমধারী-ময়ূরের নক্সা-নমুনাটিকে রঙীন সুতোর সাহায্যে এম্‌ব্রয়-ডারী-সেলাইয়ের কাজ করে সূতী, রেশমী বা পশমী কাপড়ের বুকে রূপদান করার সখ হতে পারে—এমনি ধারণা-বশেই এ নক্সাটি তাঁদের সামনে পেশ করছি।

সূচী-শিল্পীর ব্যক্তিগত রুচি এবং পছন্দ অনুযায়ে সূতী, রেশমী কিংবা পশমী কাপড়ের উপরে যাননসই রঙের সুতোর সাহায্যে এম্‌ব্রয়ডারী-সেলাইয়ের রীতিতে

পেখমধারী-ময়ূরের এই আলঙ্কারিক নক্সা-নমুনাটিকে অনায়াসেই পরিপাটিরূপে ফুটিয়ে তোলা যাবে। তবে মোটামুটিভাবে বলে রাখা যেতে পারে যে—কাপড়ের জমীর রঙ যদি গাঢ়-ধরণের হয়, তাহলে ময়ূরের নক্সাটিকে এম্‌ব্রয়ডারীর জন্য মানানসই-ধরণের হালকা বা ফিকে রঙের সুতো ব্যবহার করবেন এবং কাপড়ের জমীর রঙ যদি হালকা বা ফিকে ধরণের হয় তো সেক্ষেত্রে সূচী-শিল্পের সুতোগুলি বেছে নেবেন—মানানসই গাঢ়-বর্ণের।

দৃষ্টান্ত হিসাবে, আপাততঃ ধরে নেওয়া যাক যে কাপড়ের জমীর রঙ বেছে নেওয়া হয়েছে—হালকা বা ফিকা গোলাপী রঙের (Light pink colour)। এক্ষেত্রে নীলাভ-সবুজ রঙের সুতো, গাঢ় ময়ূরকণ্ঠি-রঙের সুতো, হালকা বা ফিকা হলদে রঙের সুতো, ঈষৎ-গাঢ় স্বর্ণাভ-রঙের সুতো, মরাল-শুভ্র শাদা রঙের সুতো এবং গাঢ়-নীল (Navy Blue, Ultra marine, Prussian Blue) রঙের সুতো এবং বাদামী লাল (Light Red or Brown) রঙের সুতো।

বাদামী-লাল রঙের সুতোয় রচনা করতে হবে—ময়ূরের পদদ্বয় এবং চঞ্চু। ময়ূরের দেহের বহির্ভাগের মোটা কালো রেখা রচনা করবেন—গাঢ় নীল রঙের সুতোয়; এবং দেহের ভিতরাংশের মিহি রেখা চিহ্নিত ঘরগুলির জন্য ব্যবহার করবেন—ময়ূরকণ্ঠি রঙের সুতো। পেখমের পালখের ভিতরটুকু ভরাট করতে হবে—স্বর্ণাভ রঙের সুতো দিয়ে এবং তার কেন্দ্রস্থলটি এম্‌ব্রয়ডারী করবেন—হালকা বা ফিকা হলদে রঙের সুতোয় এবং বাইরের রেখাগুলি রচিত করতে হবে—গাঢ় নীল অথবা ময়ূরকণ্ঠি রঙের সুতোর সাহায্যে। ময়ূরের গ্রীবাদেশের জন্য ব্যবহার করবেন—ময়ূরকণ্ঠি রঙের সুতো···পিঠের ডানা ও পেটের অংশ রচনা করবেন—হালকা বা ফিকা নীলাভ সবুজ রঙের সুতোয়। ময়ূরের আঁখি রেখা রচিত করতে হবে—হালকা বা ফিকা হলদে রঙের সুতো দিয়ে ·· আঁখিতারার জন্য ব্যবহার করবেন—বাদামী লাল অথবা গাঢ় নীল রঙের সুতো···আঁখিতারার দু'পাশের শাদা অংশ রচনার জন্য বেছে নেবেন—মরালশুভ্র শাদা রঙের সুতো। ময়ূরের মাথার ঝুঁটি এম্‌ব্রয়ডারী করবেন—হালকা বা ফিকা হলদে অথবা স্বর্ণাভ রঙের সুতোয়। প্রয়োজনবোধে, ময়ূরের পেখমের পালখের মাঝে মাঝে মরালশুভ্র শাদা রঙের সুতোর কয়েকটি বিন্দু, গ্রীবাদেশের ও পিঠের পালকের স্থানে স্থানে মিহি রেখার সুকৌশলে হালকা বা ফিকে নীলাভ সবুজ রঙের সুতোর সুন্দর কয়েকটি রেখা এম্‌ব্রয়ডারী করে দিতে পারেন তো সূচী-শিল্পের নক্সাটি আরো মনোরম শ্রী ধারণ করবে।

এই হলো—উপরের নক্সা নমুনায় প্রদর্শিত পেখমধারী ময়ূরের আলঙ্কারিক চিত্রটিকে এম্‌ব্রয়ডারী সূচী শিল্পের কাজ করে ফুটিয়ে তোলার মোটামুটি পদ্ধতি। তবে এ ধরণের রঙীণ কাপড় ও সুতোর পরিবর্তে সূচীশিল্পের ব্যক্তিগত অভিরুচি মতো মানানসই ধরণের বিভিন্ন রঙের কাপড় ও সুতো ব্যবহার করা যেতে পারে।

সুধীরা হালদার

এবারে একটি সুস্বাদু সহজপাচ্য অভিনব-ধরণের দক্ষিণ-ভারতীয় খাবার রান্নার কথা বলছি। বিচিত্র উপাদেয় আমিষ-জাতীয় এই খাবারটির নাম—"চিঙ্‌ড়ী-টোম্যাটোর ঝোল"। বাড়ীতে কোনো উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে কিম্বা ছুটির দিনে প্রিয়জনদের পাতে সাদরে পরিবেশনের পক্ষে, শুধু মুখরোচকই নয়, উপরন্তু নূতনত্বের দিক দিয়েও দক্ষিণ-ভারতীয় এই খাবারটি পরম উপভোগ্য এবং উপযোগী হবে বলেই আমাদের ধারণা।

প্রায় পাঁচ-ছয়জনের আহারের উপযোগী "চিঙড়ী-টোম্যাটোর ঝোল" রান্না করতে হলে, যে সব উপকরণ প্রয়োজন—গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে

রাখি। অর্থাৎ এ খাবারটি রান্নার জন্য চাই—আধসের ভালো চিংড়ী মাছ, আধগোছা কচি ধনেশাক, তিনটি পুরুষ্টু-রসালো বড় সাইজের টোম্যাটো, তিনটি বড় সাইজের পেঁয়াজ, দু'কোয়া রসুন, একটুকরো আদা, আধখানা নারিকেল, চায়ের চামচের এক-চামচ গুঁড়ো-লঙ্কা, চায়ের চামচের দু'চামচ নুন-গুঁড়ো, ছয়টি তেজপাতা, বড় চামচের চার-চামচ ঘী এবং আন্দাজমতো পরিমাণে খানিকটা গুঁড়ো-হুন। মনমতো এ সব উপকরণ সংগ্রহ হবার পর, রান্নার কাজে হাত দেবার আগে—চিংড়ী-মাছগুলিকে মুণ্ডু ছাড়িয়ে খোলা ছাড়িয়ে কুটে নিয়ে, জলে ধুয়ে সাফ্ করে, সেগুলিকে আগাগোড়া নুন মাখিয়ে পরিষ্কার একটি পাত্রে আলাদা সরিয়ে রাখুন। তারপর টোম্যাটোগুলিকে পরিপাটিভাবে ছাড়িয়ে নিন এবং সেগুলি থেকে আগাগোড়া বীচি বাদ দিয়ে হাতের সাহায্যে বেশ ভালো করে ঠেসে-চটকে 'মণ্ড' (Pulp) বানিয়ে ফেলুন। এবারে বেশ মিহি-ছাঁদে কচি ধনে-শাক কুচিয়ে নিয়ে, শাকের কুচোগুলিকে ঐ টোম্যাটোর মণ্ডেতে মিশিয়ে দিন। অতঃপর, নারিকেলটিকে কুরে নিয়ে সেটি থেকে চায়ের পেয়ালার এক-পেয়ালা পরিমাণ 'রস' বা 'দুধ' (Cocoanut-Milk) বার করে রাখুন এবং আদা, পেঁয়াজ আর রসুন কুটে বেশ মিহি-ধরণের টুকরো বানিয়ে নিন।

এ সব আয়োজন-পর্ব্ব সারা হলে, উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সে পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে ঘী গরম করে নুন-মাখানো চিংড়ী-মাছগুলিকে ছেড়ে তার সঙ্গে রান্নার মশলা মিশিয়ে খুন্তির সাহায্যে নাড়াচাড়া করে প্রায় মিনিট পাঁচেককাল আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে ভেজে নিন। এভাবে ভাজার ফলে, চিংড়ী-মাছের রঙ বেশ বাদামী-ধরণের হলে, রন্ধন-পাত্রে টোম্যাটোর মণ্ডটুকু মিশিয়ে দিন এবং মুখে ঢাক্না, ঢেকাবী বা ঢাকনী চাপা দিয়ে মিশ্রণটিকে কিছুক্ষণ উনানের ঢিমে-আঁচে বসিয়ে রেখে খাবারটিকে সুসিদ্ধ করে নিন।

খাবারটি সুসিদ্ধ হবার পর, রন্ধন-পাত্রে নারিকেলের রস বা দুধটুকু মিশিয়ে দিন এবং পুনরায় রন্ধন-পাত্রের মুখ ঢাকনী চাপা দিয়ে বন্ধ রেখে মিশ্রণটিকে অল্পক্ষণ উনানের মিহি-আঁচে বসিয়ে ফুটিয়ে নিন। তাহলে ইদক্ষিণ-ভারতীয় প্রথায় 'চিংড়ী-টোম্যাটোর কোল' রান্নার কাজ শেষ হবে।

এবারে ঈষৎ থকথকে ঝোল থাকতে থাকতেই রন্ধন পাত্রটিকে উনানের উপর থেকে নামিয়ে, পরিষ্কার একটি গামলা বা ডেকচিতে সদ্য রান্না করা খাবারটিকে প্রিয়জনদের পাতে পরিবেশনের উদ্দেশ্যে যত্নে তুলে রাখুন।

দক্ষিণ-ভারতীয় প্রথায় 'চিংড়ী-টোম্যাটোর কোল' রান্নার এই হলো মোটামুটি নিয়ম।

আগামী সংখ্যায় অভিনব নূতন আরেকটি ভারতীয় খাবারের রন্ধন প্রণালীর পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

সেক্সপীয়ার

শ্যাম রায়

যে ভুল করেছ তুমি আক্ষেপ করোনা সে প্রমাদে
গোলাপে কাঁটা থাকে, জ্বালানী ঝরণাতেও কাদা
মেঘ, আর গ্রহণে কলঙ্ক দেয় সূর্য্য আর চাঁদে
ঘৃণিত কীটেরা রহে সুমধুর কুঁড়ি মধ্যে বাঁধা।
মনুষ্য মাত্রেই ভুল করে এবং আমিও তেমনি
তোমার অনধিকার যাতায়াত নহে কিছু তুলা
আমাকে বঞ্চনা করে তোমার ভুলের সংশোধনী
তোমার পাপ ক্ষমা করি, নেই তার ক্ষমাই মূল্য।
কারণ তোমাতে সচেতন হয় ইন্দ্রিয়পরতা
(ওদিকে বিরোধী পক্ষ সমর্থন জানায় তোমার)
আমার বিপক্ষ চলে বিচার তৎপরতা
অন্তর বিপ্লব বহে প্রেম-ঘৃণাভরা অনিবার
আমি তার সহায়কে পরিণত হয়েছি নিশ্চয়
মধুর চোরটি আমায় দিয়েছে কচির বিপর্য্যয়।

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

চিত্র-প্রদর্শনীর অভিনব আয়োজন ছাড়াও, সেকালে কলিকাতার বিলাতী-সমাজে সাহিত্য-সংবাদ চর্চা, খেলাধুলা এবং আরো নানা ধরণের কৃষ্টিকলা-অনুশীলনের যে সব বিচিত্র ব্যবস্থা ছিল—প্রাচীন পুঁথি-পত্রে তারও প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। এমনি সব টুকরো-টুকরো খবরা-খবর থেকে সেকালের সৌখিন-বিলাসী সাহেবসুবোরা কি ধরণের আমোদ-প্রমোদ আর কৃষ্টিকলার চর্চায় মেতে তাঁদের হাতে-গড়া কলিকাতা শহরে প্রবাস-জীবন যাপন করতেন, তার সুস্পষ্ট মনোরম প্রমাণ মেলে। বলা বাহুল্য, একালের মতো সেকালেও সারা বাংলাদেশে কলিকাতাই ছিল—রাজনীতি, সমাজ-নীতি, কৃষ্টিকলানুশীলন—সব বিষয়েই অগ্রণী এবং কলিকাতায় যে বিষয় প্রচলিত হতো, সেটির প্রভাব মফঃস্বলে ছড়িয়ে পড়তে বেশী সময় লাগতো না। এ কথা—কি শিক্ষা, কি সংস্কৃতি, আচার ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, আমোদ-প্রমোদ, সকল বিষয়েই নজরে পড়ে।

* * *

(ক্যালকাটা গেজেট, ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৩০)

BENGAL SUBSCRIPTION, READING AND BILLIARD ROOMS

Several of the subscribers having expressed a wish to subscribe to the Reading Rooms only, and other for Billiards, it has been recommended, and therefore deemed advisable, to alter the Rates of Subscription, and substitute the following from the Ist Instant :

	Per month seperate.
Subscription to the Reading Rooms	4
Ditto ditto Billiard Room	2
Ditto to both	5

In Carrying this arrangement into effect, none can be admitted but Subscribers or their Friends, non-Residents of Calcutta, he latter to be regularly introduced by a Subscriber, and his name entered in a book kept for the purpose. And to prevent the

admission of indiscriminate Society, and with a view of keeping the Rooms more select, it is requested that any person wishing to become a Subscriber, will send in a written application to that effect.

LIST OF PERIODICALS AND NEWSPAPERS TAKEN IN

Blackwood Magazine.	London Literary Gazette.
Edinburgh Review,	Calcutta Magazine,
Quarterly Review.	Hurkaru.
Westminister ditto	John Bull,
Sporting Magazine.	Government Gazette.
New Monthly ditto.	India Gazette.
Athenæum.	Oriental Observer.
Oriental Herald.	Bengal Herald.
Asiatic Journal.	Literary Gazette.
United Service Journal.	

• • •

(ক্যালকাটা গেজেট, ২৮শে মার্চ, ১৮৩১)

CALCUTTA LIBRARY

Notice is hereby given that Books are lent out to Monthly Subscribers Subject, of Course, to the Regulation provided for Books spoiled or mislaid at the rate of 8 Rupees a month to be paid in advance.

• • • •

সংবাদ সাহিত্য চর্চ্চা ছাড়াও, সেকালের বিলাসী সৌখিন সমাজে জীব জন্তু সম্বন্ধেও রীতিমত আগ্রহ অনুরাগ ছিল। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে গঙ্গার কূলে চানক নামে প্রখ্যাত গ্রামাঞ্চলের (আধুনিক ব্যারাকপুর সদরতলী অঞ্চল) ইংরাজ শাসনকর্ত্তার উদ্যান-বাটিকার সুপ্রশস্ত আঙ্গিনায় কোম্পানীর বিলাতী সাহেবদের উৎসাহ প্রচেষ্টায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিচিত্র একটি চিড়িয়াখানা বা পশুশালা (Zoo Gardens)। এখানে সযত্নে পুষে রাখা হতো—নানা রকমের পশু পাখী। এ সব জীবজন্তু দেখতে চানকের চিড়িয়াখানায় তখন ছিল রীতিমত জন সমাগম। একালের সুবিখ্যাত আলিপুরের চিড়িয়াখানাটির তখনও পত্তন হয়নি···সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আরো অনেক বছর পরে। কাজেই চানকের প্রাচীন চিড়িয়াখানাটিকে —অনায়াসেই আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রথম পশুশালা বলা যেতে পারে। সেকালে চানকের এই চিড়িয়াখানাটি কি ধরণের ছিল—প্রাচীন সংবাদপত্রে তার যে বিচিত্র কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ পাওয়া যায়, একালের অনুসন্ধিৎসু পাঠকপাঠিকাদের অবগতির উদ্দেশ্যে সে পরিচয় নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

• • •

(সমাচার দর্পণ, ২৪শে আগষ্ট, ১৮২১)

"চানক।—মোকাম চানকে ৺শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের যে বাগান আছে তাহাতে নানাদেশীয় নানা-বিধ পক্ষী ও জন্তু আছে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ না হয় এমন লোক নাই যেহেতুক সকল দেশে সকল নাই। ঐ বাগানে হরিণ আছে তাহার মধ্যে এতদ্দেশীয় দুই তিন

প্রকার আছে ও অন্য ২ দেশীয় নীলগা (নীলগাই) নামে একপ্রকার হরিণ আছে সে ঘোটকের মত উচ্চ ও অতি দুর্দ্ধর্ষ ও অতিশয় শৃঙ্গবিশিষ্ট। এবং শ্বেতবর্ণ একপ্রকার হরিণ আছে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ। চট্টগ্রাম নিকটস্থ পার্ব্বতীয় চারি পাঁচ গরু আছে তাহারদিগকে দেখিলে গরু বোধ হয় না—সে গরু অত্যুচ্চ ও কৃষ্ণবর্ণ ও বৃহৎ শৃঙ্গ অদ্ভুতাকার দেখা যায়। এবং ইংলণ্ডীয় এক বলদ আছে তাহার শরীর অতিশয় সুখস্পর্শ। ব্যাঘ্র চারি পাঁচ প্রকারের হয় বারটা আছে—তাহার মধ্যে এক স্থানে এক কৃষ্ণবর্ণ ব্যাঘ্র আছে। আর এক স্থানে এই দেশীয়, বৃহৎ তিনটা ব্যাঘ্র থাকে। অন্য এক স্থানে এক ব্যাঘ্র আছে তাহার গায়ে গোল ২ চক্রাকৃতি চিহ্ন।

এক স্থানে সিংহের স্ত্রী পুরুষ দুই আছে তাহার বয়স দেড় বৎসর সে পাণ্ডুবর্ণ নির্দ্দল শরীর তাহার লাঙ্গুল গোলাঙ্গুলাকৃতি কিন্তু অতিশান্তস্বভাবা। আহারাদি দেয় তাহারদের কথানুসারে সে চলে। ছোট ২ চারি পাঁচ ব্যাঘ্র আছে তাহার মধ্যে একটা ব্যাঘ্র সে খোলাদা ও মনুষ্যের দ্বেষ করে না ও সে মনুষ্যের মত খাটে শয়ন করে ও লোক নিযুক্ত আছে তাহাকে বাতাস করে। এবং শুনা যায় যে শ্রীশ্রীযুত যখন সীকার দেখেন তখন ঐ ব্যাঘ্র সীকার করে। দুই তিনটা ভল্লুক আছে তাহারা খাটে শয়ন করে তাহারদের শরীরে বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া রাখে।

কাঙ্গরু নামে নবহল্লণ্ডীয় এক জন্তু—সে দুই প্রকারে চারিটা আছে তাহার মধ্যে এক স্থানে ছোট জাতি একটা ও অন্য স্থানে বড় জাতি তিনটা আছে। তাহার সম্মুখের দুই পা অতিক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল ও পশ্চাতের দুই পা বড় ও সবল সেই পায়ে লম্ফ দিয়া চলে সে পায়ে তিনটা নখ। সেই জন্তুর একটা বাচ্চা আছে লোকে কহে যে সে বাচ্চা গর্ভ হইতে নির্গত হয় ও ইচ্ছামত গর্ভে প্রবিষ্ট হয় সে কথা কিছু নয়। কিন্তু তাহার বক্ষঃস্থল অবধি তলপেট পর্য্যন্ত একটা থৈলীর মত আছে তাহার স্তনও সে থৈলিতে আবৃত ঐ বাচ্চা সেই থৈলীর মধ্যে থাকিয়া স্তন পান করে—কখন ২ ইচ্ছা মত বাহির হইয়া থাকে। যে হউক সে অতি-আশ্চর্য্য বটে এমত কোন জন্তুর নাই।

আর দুই তিনটা জন্তু উটের মতো আকৃতি কিন্তু ছোট ও শরীর সমান। আর এক গাওয়ের বাচ্চা আসিয়াছে তাহার ওজন প্রকাশরূপে অদ্যাপি উঠে নাই। কিন্তু নমুনা হইয়াছে সে অতিশান্ত অনায়াসে লোকেরা তাহার শরীরে হস্ত দেয় তাহার শরীরে লোম নাই ও অতিকঠিন শরীর। আর গর্দ্দভের আকার এক বড় ঘোড়া আছে সে পীতবর্ণ ও দেখিতে অতিসুন্দর। লোকে কহে যে ঐ ঘোড়া এক দিনের মধ্যে পঞ্চাশ ক্রোশ চলিতে পারে কিন্তু কেহ অদ্যাপি তাহার উপরে সওয়ার হয় নাই। এবং তিন চারি দেশীয় চারি পাঁচ ভল্লুক ও দুই তিন প্রকার বানর ও দুই তিন প্রকার বিড়াল আছে। এবং কাশ্মীর দেশের দুইটা ছাগল আছে তাহার লোম অতি কোমল তাহাতে শাল বয়ন। এবং এক বৃহৎ পক্ষী আছে তাহার গলা অতিদীর্ঘ ও ঘোড়ার পায়ের মত তাহার পা—সে লোককে পদাঘাত করিয়া মারে আর নবহল্লণ্ডীয় এক প্রকার হংস আছে সে নীলবর্ণ ও তাহার ওষ্ঠ রক্তবর্ণ ও সে অতিমনোহর আর নূতন ২ অনেক ২ প্রকার পক্ষী আছে তাহার নাম সকল জানা নাই।"

•

ক্রমশঃ

আধুনিক শিক্ষার জের

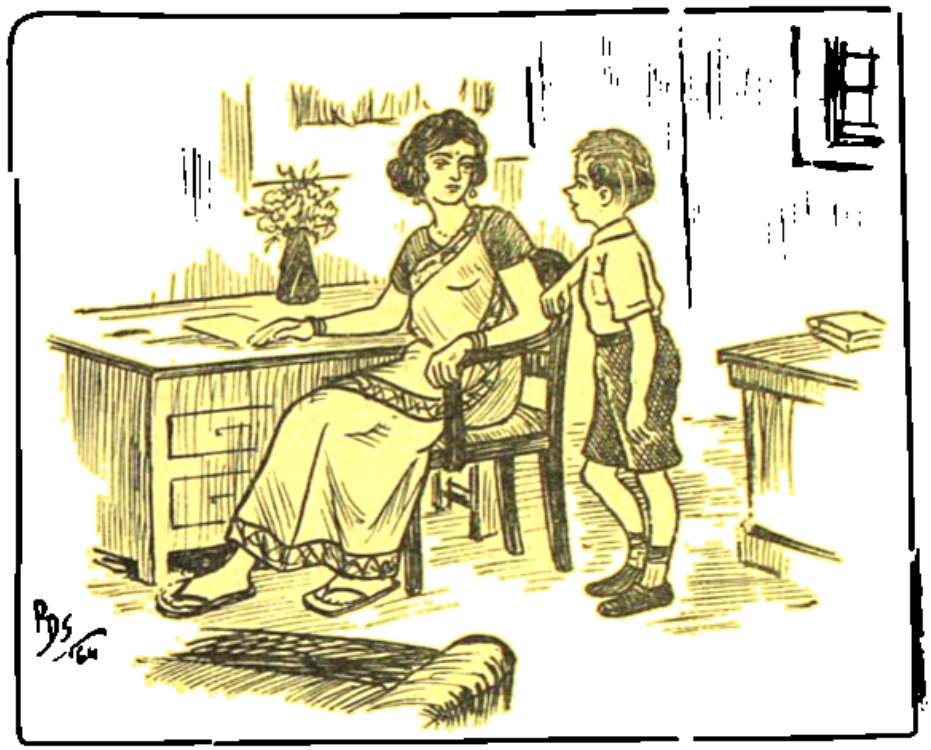

স্কুল-ফেরৎ ছেলে—কাল রাত্তিরে আমার 'হোম্-টাস্কের' খাতায় যে অঙ্কগুলো তুমি কষে দিলে মা, ইস্কুলের 'স্যর্' (মাষ্টার-মশাই) দেখে বললেন—সেগুলো সব ভুল হয়েছে!

আধুনিকা-মাতা—তাই নাকি?···

স্কুল-ফেরৎ ছেলে—হ্যাঁ!···তা আমি কিন্তু মা, আসল-কথাটা খুলে বলিনি তাঁকে!

আধুনিকা-মাতা—তাহলে?···কি বললি তুই, তাঁকে?

স্কুল-ফেরৎ ছেলে—বলেছি, অঙ্কগুলো সব বাবাই কষে দিয়েছে আগাগোড়া!···কেমন?···ঠিক বলিনি মা?···

পিল্লা—পূষ্পা দেবশর্মা

পাট ও পাঠ

শ্রীশ—

॥ চিত্র ও উৎসব ॥

উৎসবের উল্লাস ও আনন্দ সর্বকালেই সকল মানুষকে অভিভূত করে থাকে। উৎসব অনুষ্ঠান তাই জনজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ রূপেই পরিগণিত হয়ে আসছে। উৎসব অবশ্য নানা রকমের হয়, যেমন—ধর্মীয়, সামাজিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রনৈতিক, ইত্যাদি। আধুনিক কালে ক্রীড়া-উৎসব, যেমন অলিম্পিক প্রভৃতি, ও অন্যান্য নানা রকমের উৎসবের প্রচলন হয়েছে, শুধু একটি মাত্র দেশের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই নয়—বিশ্ব-বিস্তৃত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের মধ্যে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালের এই অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে, অতি দ্রুতগতি যানবাহনের কল্যাণে, দেশ মহাদেশের দূরত্ব আজ অতি সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে, পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের দুস্তর ব্যবধানও আজ সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। মানুষ মানুষকে জানবার জন্যে, বোঝবার জন্যে, দেখবার জন্যে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ধেয়ে চলেছে—এসেছে একটা একতা বোধের মনোভাব মানব গোষ্ঠীর মধ্যে। ধর্মে, আদর্শে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, মতবাদে, বেশ-ভূষায়, এমন কি সম্পূর্ণ ভিন্ন আবহাওয়ায় লালিত এই বিশাল বিভক্ত মানব সমাজের মধ্যে এই একতা বোধের ও ভাব বিনিময়ের সদিচ্ছা ও প্রেরণা যে আজ জাগ্রত হয়েছে, তার জন্য এই সব আন্তর্জাতিক উৎসবগুলিই যে বিশেষ করে দায়ী তা আজ অনস্বীকার্য। উৎসবের আনন্দের মধ্যে দিয়ে ভাব, ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতির আদান প্রদান মানুষকে মানুষের প্রতি আরও আকৃষ্ট করে তুলেছে।

এই সব আন্তর্জাতিক উৎসবের মধ্যে অধুনা যুক্ত হয়েছে চলচ্চিত্র উৎসব। প্রমোদ শিল্পের মধ্যে চলচ্চিত্র যে আজ সর্বোচ্চে এবং জনমনে তার প্রভাব যে কত গভীর ও সুদূর প্রসারী তা চলচ্চিত্র দর্শকদের অজানা নয়। তাই এরূপ একটি প্রভাবশালী প্রমোদ শিল্পের আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে প্রদর্শন উৎসব যে একান্ত কাম্য তাতে কোনও সন্দেহই নেই। দিকে দিকে, দেশে দেশে তাই আজ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে চলচ্চিত্ররসিকদের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভাব বিনিময়ের সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করছেই শুধু নয়, বিশ্ববাসির মধ্যে একতা বোধ জাগ্রত করবার বলিষ্ঠ প্রচেষ্টাও করছে।

বিশ্বের কয়েকটি দেশ প্রতি বৎসরই এই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। চলচ্চিত্র শিল্পে ভারতও অগ্রসরমান দেশগুলির অন্যতমই শুধু নয়, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম চলচ্চিত্র নির্মাণকারী দেশ বলে পরিগণিতও। তাই অতীতে দু'বার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ভারতে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তৃতীয় উৎসবটি আগামী জানুয়ারী মাসের ৮ তারিখ থেকে ফেব্রুয়ারী মাসের ৪ তারিখ পর্যন্ত ভারতের প্রেক্ষাগৃহগুলিতে অনুষ্ঠিত হয়ে ভারতীয় দর্শকদের আনন্দবর্ধন করবে।

এই উৎসবটিতে যোগদানেচ্ছু দেশগুলি হচ্ছে:—অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ব্রাজিল, বৃটেন, বুলগেরিয়া, কানাডা, সিলোন, কলম্বিয়া, কিউবা, চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ফেডারেল রিপাব্লিক অফ জার্মানী, জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাব্লিক, হাঙ্গেরী, হংকং, ইতালী, জাপান, মালয়াশিয়া, মরক্কো, নেদারল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড, নাইজিরিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, সুইডেন, সিরিয়ান আরব রিপাব্লিক, টারকি, ইউনাইটেড আরব রিপাব্লিক, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, যাগোশ্লাভিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়া।

এই উৎসবের ডিরেকটর শ্রী পি, সি গুপ্ত আসন্ন উৎসব সম্পর্কে যে জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করেছেন তার থেকে জানা যায় যে কাহিনীচিত্রের বিচারক-মণ্ডলীতে আছেন: সত্যজিৎ রায় (সভাপতি), মাসাম কাওয়াকিতা (জাপান) আঁদ্রে ভাইদা (পোলাণ্ড), বিশারেদ কালা-

ভোজত্ (রাশিয়া), গুর্জ গাদুল্ (ফ্রান্স), শ্রীমতী মার্গারা (সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র), খাদ্য আহরণের আস্বাদ (ভারত), আল্বার্তো লাত্তুয়াদা (ইতালী), এ, এন, ত্রনসেল (চেকোশ্লোভাকিয়া), লিওসে আণ্ডারসন্ (যুক্তরাজ্য) এবং অক্টোরিয়াস্ পার্ল (মেক্সিকো)।

শ্রীগুপ্ত আরও জানিয়েছেন যে হলিউডের শ্রীমতী মার্লি ম্যাকুলেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উৎসবে যোগদান করবেন। আর উৎসব উপলক্ষে যে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে, তাতে অংশ গ্রহণের জন্য বৃটেন থেকে আসছেন টনি রিচার্ডসন্।

খবরাখবর ঃ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রাজদ্রোহী" হচ্ছে বি, কে, প্রোডাকসন্সের নূতন চিত্র। ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে এই চিত্রের শুভ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়েছে। বিপুল ব্যয়ে নির্মীয়মাণ এই চিত্রটি পরিচালনা করছেন নীরেন লাহিড়ী ও সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন ওস্তাদ আলী আকবর খান। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করবেন উত্তমকুমার ও অঞ্জনা ভৌমিক।

• • •

তারু মুখার্জি প্রোডাকসন্সের তৃতীয় চিত্রটি হচ্ছে "রাধা-ধাজা" নামের একটি হাসির ছবি। জানুয়ারি মাসে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে ছবির দৃশ্য গ্রহণ শুরু হবে। প্রধান দুটি চরিত্রে বোম্বাইয়ের অসীমকুমার ও পরবীণ চৌধুরী অভিনয় করবেন এবং সুর রচনায় থাকবেন মান্না দে। বোম্বাইয়ের নামকরা কণ্ঠশিল্পীদের গান এই ছবিটির একটি বৈশিষ্ট্য হবে।

• • •

চিত্র-প্রযোজক কানন দেবী এবং পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্য "অভয়া-শ্রীকান্ত" নামে একটি চিত্র নির্মাণ করছেন। এই ছবিতে শ্রীকান্তর ভূমিকার জন্য বসন্ত চৌধুরীকে নির্বাচিত করা হয়েছে এবং অভয়ার চরিত্রে অবতীর্ণা হবেন মালা সিংহ। সঙ্গীতে সুরারোপ করবেন পবিত্র চট্টোপাধ্যায়।

• • •

'বিচিত্র ফিল্মস' দীপক চৌধুরীর "লজিতা প্রসঙ্গ" উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করছেন। চিত্রটির নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন সুচিত্রা সেন এবং সম্ভবতঃ অজয় কর এটি পরিচালনা করবেন।

• • •

একটি কমেডি ছবি তৈরী হচ্ছে যার নাম দেওয়া হয়েছে "নায়িকা চাই।" মালতী ফিল্মসের এই প্রথম ছবিটি পরিচালনা করবেন রবীন বসু। এর কাহিনী রচনা করেছেন গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ।

• • •

অসিত সেন পরিচালিত ও মহেন্দ্র গুপ্ত প্রযোজিত গিল্ড ফিল্মস-এর "তৃষ্ণা" ছবিটি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে। একটি বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে এই চিত্রটি নির্মিত হয়েছে এবং মুখ্য ভূমিকা দুটিতে রূপ দিয়েছেন বিশ্বজিৎ ও শর্মিলা বিশ্বাস। অন্যান্য চরিত্রে অংশ নিয়েছেন : কণা গুহঠাকুরতা, শেখর চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষাল, কুমারী সর্বাণী প্রভৃতি। 'তৃষ্ণা'র সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন শ্যামল মিত্র।

• • •

উত্তমকুমারের পরবর্তী চিত্রটি হচ্ছে "সপ্তপদী"র হিন্দী রূপ। উত্তমকুমার স্বয়ং এর নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন।

• • •

নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত "উত্তরফাল্গুনী" উপন্যাসের ভিত্তিতে তৈরী চারুচিত্রের প্রথম হিন্দী ছবিটির আভ্যন্তরীন দৃশ্য গ্রহণের কাজ সুরু হয়ে গেছে। ইষ্টম্যানকালার রঞ্জিত এই বায়বহুল ছবিটি প্রযোজনা ও পরিচালনায় রয়েছেন যথাক্রমে অসিত চৌধুরী ও অসিত সেন। ছবিটির এখনও হিন্দী নামকরণ করা হয়নি।

নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন সুচিত্রা সেন। বোম্বাইয়ের অভিনেতা অশোককুমার ও ধর্মেন্দ্র এই ছবির শুটিংয়ে অংশগ্রহণের জন্য কলকাতায় আসবেন আশা করা যায়। ইতিমধ্যে বোম্বাইয়ের মেহবুব ষ্টুডিওতে এই ছবির একখানি গান লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে রেকর্ড করা হয়ে গেছে।

• • •

রাধারাণী পিক্‌চার্সের দ্বিতীয় চিত্রটির নাম হচ্ছে "নতুন জীবন"। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করবেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়।

অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায় ও অনুপকুমারকে এই চিত্রের মুখ্য তিনটি ভূমিকায় দেখা যাবে।

• • •

সমরেশ বসুর উপন্যাস "অপরিচিতা"কে ভিত্তি করে প্রযোজক-পরিচালক সলিল দত্ত একখানি ছবি তৈরী করবেন।

উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরীকে এই চিত্রের প্রধান দু'টি ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে।

• • •

নীলাবরণ গুপ্ত রচিত "তাপসী" নাটকটিকে চিত্রে রূপদানের আয়োজন করেছেন শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স। ছবিখানি পরিচালনা করবেন অগ্রদূতগোষ্ঠী।

মঞ্জু দে, কমল মিত্র, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে এর মুখ্য চরিত্রগুলিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে। সঙ্গীতে সুরারোপ করবেন গোপেন মল্লিক।

• • •

লুই ফিশার রচিত গান্ধীজীর জীবনী অবলম্বনে একখানি চলচ্চিত্র নির্মিত হবে বলে স্থির হয়েছে। বিখ্যাত বৃটিশ চিত্রাভিনেতা রিচার্ড এ্যাটেন্‌বরো চিত্রখানি পরিচালনা করিবেন এবং মার্কিণ চিত্র পরিচালক জোসেফ, ই, লেভানেও এর সঙ্গে যুক্ত থাকবেন।

মিঃ এ্যাটেন্‌বরো এবং মতিলাল কোঠারি নামক জনৈক ভারতীয়ের যুগ্ম প্রয়াসে নব-প্রতিষ্ঠিত-ইণ্ডো:-বৃটিশ ফিল্মস লিমিটেড্ আগামী বৎসর এই চলচ্চিত্রের চিত্র গ্রহণ কার্য আরম্ভ করবেন।

এক অনুষ্ঠানে এ্যাটেন্‌বরো এই চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্কল্প ঘোষণা করে বলেন যে, ইহা ১৯৬৬ সালের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য চিত্র বলে পরিগণিত হইবে। ১৯৬৬ সালের ২রা অক্টোবর গান্ধীজীর ৯৬ তম জন্মদিবসে ছবিখানি মুক্তিলাভ করবে। এই উপলক্ষে এ্যাটেন্‌বরো সর্ব প্রকার সহায়তা দানের জন্য নেহরু ও লর্ড মাউন্টব্যাটেনের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি জানান যে, এই ছবির জন্য অন্ততঃ ৯ মাস প্রস্তুতি এবং ৯ মাস চিত্র গ্রহণ প্রয়োজন হবে।

চলচ্চিত্রখানি হইবে ৭০ মিটার পর্দায় উপযোগী রঙীণ ছবি। চিত্রটিতে মহাত্মা গান্ধীর জীবনসঙ্গিনী কস্তুরবা গান্ধী ছাড়াও বিশ্বের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির চরিত্র রূপায়িত হবে।

গান্ধীজীর ভূমিকায় কে অভিনয় করবেন তা এখনও স্থির হয়নি। এই চরিত্রের জন্য এখন বিশিষ্ট অভিনেতার বাছাই চলছে। বহু ভারতীয় শিল্পীও এই চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পাবেন।

মিঃ এ্যাটেন্‌বরো ছবিখানির চিত্রগ্রহণ আরম্ভ করিবেন ভারতে।

• • •

চিত্রাভিনেতা উইলিয়াম বেন্‌ডিক্স্ পরলোক গমন করেছেন। নিমোনিয়া রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৫৮ হয়েছিল।

পাসোয়ান, মুষ্টিযোদ্ধা প্রভৃতি ধরনের চরিত্রে তাঁকে বিশেষভাবে ছবির পর্দায় দেখা যেত। চিত্রামোদী-মহলে তিনি 'টাক গাই' নামে পরিচিত ছিলেন।

সূর্যস্নান

মহিম ঘোষ

মধুর সমুদ্রে সবে স্নান শেষ হ'লো
এবার ইশারা চিনে উজানে প্রবাহ ঠেলে চলো।
দেখো চেয়ে তারার আঁধার
চিরে উঁকি দিল জ্যোতিরাজ নিয়ে আনন্দ সম্ভার।

কতদিন এ আকাশ আনন্দে কেঁদেছে মুখ ঢেকে
সাতটি অশ্বের আগমনে, তবু রেখেছিল এঁকে
যন্ত্রণার তীব্রিক আলপনা—
আবৃত মনের পাতে যেন মাকড়ের জাল বোনা।

সে কাহার ভাগীদার আমরা দুজন—
কৃষ্ণচূড়া-ডালে যেন পাপিয়ার নিঃসঙ্গ কূজন;
মর্মাহত মানব-মানবী;—
কালের প্রচ্ছদ তলে ধূমম্লান অঙ্কিত ছবি।

কত রাজাধিরাজের হতআয়ু বিগত যৌবন
চরণচক্রের ঘায়ে শেষ চিহ্ন রাখে কতক্ষণ!
রূপালি জ্যোৎস্নার ঢেউ বহুপূর্বে তার
নিজ আধিপত্য করে চুপি চুপি অবাধে বিস্তার।

আনন্দিত এ জীবন অসমাপ্ত ছিল এতকাল,
পুরাণো রাজার স্মৃতি হয়েছিল উদগ্র কাঙাল
আমাদের দুজনের বুকে;—
দিনের পেচকসম অনিচ্ছায় ছিল গর্তে ঢুকে।

তাই আজ স্নান শেষে সুরু হ'লো নতুন জীবন,
মধুর ঐশ্বর্যে পুষ্ট আমাদের মন।
রাত্রির বিষাদক্লিষ্ট সরোবর হ'তে
দিনের প্রশান্ত কোলে ঝাঁপ দিল তরুণ আলোতে।

কেশ ও
মস্তিষ্কের
পরম হিতকারী

মনোরম গন্ধযুক্ত "ভৃঙ্গল" আয়ুর্বেদীয় মতে প্রস্তুত মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল। ইহা ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে।

ভৃঙ্গল
সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ
কেশ তৈল

নতুন সুদৃশ্য ছোট শিশি প্রচলিত হইয়াছে বড় শিশিও শীঘ্রই পাওয়া যাইবে।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

সম্পাদনা : শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ডুরাণ্ড কাপ :

মোহনবাগান ক্লাব ১৯৬৯ সালের ডুরাণ্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ২-০ গোলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে পরাজিত করেছে। এই নিয়ে মোহনবাগান পঞ্চমবার ডুরাণ্ড কাপ পেল। ইতিপূর্বে মোহনবাগান ক্লাব ডুরাণ্ড কাপ পেয়েছে ১৯১৩, ১৯৪২-১৯৪০ (ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে যুগ্মবিজয়ী) এবং ১৯৬৩ সালে। প্রথমার্ধের খেলার পঞ্চম মিনিটে মোহনবাগানের অরুণময় প্রথম গোলটি দেন। দ্বিতীয় গোলটি করেন অশোক চ্যাটার্জি, দ্বিতীয়ার্ধের খেলায়। ইস্টবেঙ্গল দলের সেন্টার ফরওয়ার্ড অমীয় মৌলিক প্রথমার্ধের খেলায় পেনাল্টি থেকে এবং দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় প্রথম মিনিটে মাত্র কয়েক গজ দূরে ফাঁকা গোল পেয়েও গোল দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ হাত-ছাড়া করেন।

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য, ভারতবর্ষের মাটিতে প্রথম ফুটবল প্রতিযোগিতা এই ডুরাণ্ড, সূচনা ১৮৮৮ সালে। ১৯২৩ সাল পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতায় একমাত্র মিলিটারী দলেরই যোগদানের অধিকার ছিল। ১৯২৪ সালে বিশেষ আমন্ত্রণ পেয়ে মোহনবাগান ক্লাব ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের প্রথম যোগদান। ১৯২৪ সালের ডুরাণ্ড কাপের খেলায় মোহনবাগান সেমি-ফাইনালে শক্তিশালী সেরউড, ফরেস্টার্স মিলিটারী দলের কাছে পরাজিত হয়। বে-সামরিক দলের মধ্যে প্রথম ডুরাণ্ড কাপের ফাইনালে খেলেছিল ইস্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে, ১৯২৭ সালে এবং ভারতীয় ও বে-সামরিক দলের মধ্যে প্রথম ডুরাণ্ড কাপ জয়ী হয়েছিল ক'লকাতার মহমেডান স্পোর্টিং, ১৯৪০ সালে। যুদ্ধের জন্যে ১৯৪১ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ডুরাণ্ড কাপের খেলা বন্ধ ছিল। পুনরায় ১৯৫০ সাল থেকে খেলা আরম্ভ হয়েছে। ১৯৭০ সাল থেকে ভারতীয় দলই ডুরাণ্ড কাপ জয়ী হয়েছে। ক'লকাতা থেকে ডুরাণ্ড কাপ পেয়েছে মাত্র দুটি দল—মোহনবাগান ৫ বার এবং ইস্টবেঙ্গল ৪ বার।

অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্থান :

মেলবোর্ণ মাঠে অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্থানের টেষ্ট ক্রিকেট খেলা ড্র গেছে। খেলাটি চারদিনের ছিল। চতুর্থ অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে ৩২৬ রানের মাথায় পাকিস্থানের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে খেলার ফলাফলের জন্যে প্রয়োজনীয় ১৬৬ রান তুলতে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা যখন আরম্ভ করে তখন হাতে ২২৭ মিনিট খেলার সময় ছিল। কিন্তু ৭১ মিনিটের খেলায় যখন অস্ট্রেলিয়ার ৮৮ রান (২ উইকেটে) ওঠে তখন জোর বৃষ্টি নামে। ফলে সেই যে খেলোয়াড়রা মাঠ ত্যাগ করলেন, তাঁরা

পুনরায় মাঠে ফিরলেন না। বৃষ্টিই খেলাটা ভণ্ডুল করলো। পাকিস্থানের অধিনায়ক হানিফ মহম্মদ প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরী (১০৪ রান) করেন এবং দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৭ রাণের জন্যে সেঞ্চুরী করতে না পারায় উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার গৌরব থেকে তিনি বঞ্চিত হন।

প্রথম দিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি পাকিস্থানের নাদিমকে বোল্ড ক'রে টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর নিজস্ব একশত উইকেট পূর্ণ করেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্থান : ২৮৭ রান (হানিফ মহম্মদ ১০৪ এবং সৈয়দ আমেদ ৮০ রান। ম্যাকেঞ্জি ৫৬ রানে ৩, নীল হ ক ৬৯ রানে ৩ এবং ডেভিড সিনকক্ ৬৭ রানে ৩ উইকেট পান) ও ৩২৬ রান (হানিফ মহম্মদ ৯৩ এবং ইনতিখাব আলম ৬১ রান। ম্যাকেঞ্জি ৭৪ রানে ৪ এবং হক ৭২ রানে ৪ উইকেট পান)।

অষ্ট্রেলিয়া : ৪৪৮ রান (বব্ কাউপার ৮৩, টম ভিভার্স ৮৮, বেরী শেকার্ড ৫৫ এবং ব্রায়ান বৃথ ৫৭ রান। আরিফ বাট ৮৯ রানে রানে ৬ উইকেট পান) ও ৮৮ রান (২ উইকেটে। শেকার্ড নটআউট ৪৩ রান)

ইংল্যাণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা :

ডার্বানে ইংল্যাণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম বে-সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইংল্যাণ্ড এক ইনিংস ও ১০৩ রানে জয়লাভ করে। ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসে ৫৮৫ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। কেন ব্যারিংটন ১৩৮ এবং জিম পার্কস ১০৮ রান ক'রে শেষ পর্য্যন্ত নট আউট থেকে যান। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংস ১৫৫ এবং দ্বিতীয় ইনিংস ২২৬ রানের মাথায় শেষ হয়। প্রথম ইনিংসে ডেভিড এ্যালেন ৪১ রানে ৫টা এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ফ্রেডী টিটমাস ৬৩ রানে ৫টা উইকেট পান।

বিশ্ব বিলিয়ার্ডস :

নিউজিল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত ১৯৬৯ সালের বিশ্ব অপেশাদার বিলিয়ার্ডস প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের উইলসন জোন্স অপরাজিত অবস্থায় প্রথম এবং মাইকেল ফেরাইরা (জয় ৭ ও হার ২) তৃতীয় স্থান লাভ করেছেন। তাঁরা উভয়েই মহারাষ্ট্রের অধিবাসী। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জোন্স এই নিয়ে অপেশাদার বিশ্ব বিলিয়ার্ডস প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয়বার খেতাব পেলেন, প্রথম পান ১৯২৮ সালে। ১৯৬৯ সালের প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয়স্থান পেয়েছেন ইংল্যাণ্ডের জ্যাক কার্পেন্টার (জয় ৮ ও হার ১)। প্রতিযোগিতায় দশজন খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করেছিলেন—নিউজিল্যাণ্ডের তিনজন, ভারতবর্ষের দুজন, ইংল্যাণ্ডের দু'জন এবং একজন ক'রে অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পাকিস্থানের।

ভারতবর্ষ বনাম সিংহল :

বাঙ্গালোরে ভারতবর্ষ-সিংহলের বেসরকারী প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষ এক ইনিংস ও ৪৬ রানে সিংহলকে পরাজিত করে। নির্দ্দিষ্ট চতুর্থ দিন পর্য্যন্ত খেলাটি গড়ায়নি, তৃতীয়দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময়ের ২০ মিনিট আগে খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারতবর্ষ : ৫০৮ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। হনুমন্ত সিং নটআউট ১১১, দিলীপ সরদেশাই ১২৬, আব্বাস আলী বেগ ৯৬, এম এল জয়সীমা ৭২ এবং দলের অধিনায়ক পাতৌদির নবাব ৫২ রান)।

সিংহল : ২০৫ রান (এল পুন্নাইয়া ৬৮ রান। চন্দ্রশেখর ৫৬ রানে ৫ উইকেট) ও ২৫৭ রান (জয়সিংঘে ৬৩ রান। সুব্রতি ৯১ রানে ৫ এবং চন্দ্রশেখর ৮১ রানে ৫ উইকেট পান)।

মহিলাদের জাতীয় হকি :

১৯৬৯ সালের মহিলাদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় মহীশূর দলকে শেষ পর্য্যন্ত বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। মহীশূর বনাম মহারাষ্ট্র দলের ফাইনাল খেলাটি দু'দিন গোলশূন্য অবস্থায় ড্র যায়। নির্দ্দিষ্ট তৃতীয় দিনের ফাইনাল খেলায় মহারাষ্ট্র যোগদান থেকে বিরত থাকে। এই নিয়ে মহীশূর দল উপর্যুপরি পাঁচ বছর মহিলাদের জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়ানশীপ পেল।

সাহিত্য সংবাদ

সে এলো জীবনে : রাইমোহন সাহা

স্বেতবক্ষিখ্যাত শ্রীরাইমোহন সাহার আর একখানি সামাজিক উপন্যাস সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। বই খানিতে লেখক বিংশ শতাব্দীর কলুষিতসমাজ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এক নবযুগের সূচনার ইঙ্গিত দিয়াছেন। সমাজের পিচ্ছিল পথে চলিতে সামান্য ভুল-ত্রুটিই হয়তো এক মহার্ঘ নারীজীবনকে পঙ্কে নিমজ্জিত করিতে পারে। তাহারই প্রতিকার মানসে লেখক দুইটি চরিত্র সৃষ্টি করিয়া এই উপন্যাসে এক নবপথের সন্ধান দিয়াছেন।

নায়িকা রেবার জন্ম এক আন্তর্জাতিক কৃষ্টির মিলনে। তাই দেখি একদিকে সে জাপানী প্রাণধারায় চঞ্চল ও উদ্দাম, অন্যদিকে বাঙ্গালী হিন্দুর মহিমময়ী স্নিগ্ধরূপে পরিপূর্ণা। চঞ্চল ও উদ্দাম মনোবৃত্তি একদিন তাহার পদস্খলনের কারণ হয়। সে অনুভব করে সে এই সামান্য ভুল এক নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ অনাগত ভবিষ্যৎ জীবনের সমাধি রচনার কারণরূপে উপস্থিত; অন্যথায় লোক-সমাজ হইতে তাহার নিজেকেই সরিয়া হইবে চিরবিদায়। এই দমবন্ধকরা জীবন-সন্ধিক্ষণে তাহার সমস্ত সমস্যার সমাধান করিল স্বল্পভাষী, অতি সাধারণ এক কেরাণী নায়ক মৃণাল! বিবর্তনের পদক্ষেপের সাথে সাথে সঙ্গী হিসাবে চলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তাই স্বল্পভাষী অতি-সাধারণ এই কেরাণী যেন হঠাৎ বিপ্লবের মূর্তিমান দীপ-শিখারূপে সমাজে নূতন জীবনীশক্তির সঞ্চার করিল।

একথা অনস্বীকার্য যে, লেখকের প্রতিপাদ্য তত্ত্বটি আজিও রক্ষণশীল বিশ্বসমাজে গ্রহণীয় হয় নাই। তথাপি বইটির বিষয়বস্তু বিশ্বসমাজের সমক্ষে নূতন চিন্তাধারা উপস্থাপিত করিয়াছে।

[প্রকাশক—সাহিত্য কেন্দ্র এ' ১৩১, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২ মূল্য ২.০০ মাত্র]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

হাসির গল্প : অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

সোলটি হাসির গল্প আলোচ্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। সবগুলি বিশিষ্ট পত্রিকাগুলিতে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়। কয়েকটি গল্প ভাষান্তরিত হয়ে গুজরাটি, ইংরাজী ও হিন্দী পত্রিকায় বাহির হয়েছে। প্রবীণ সাহিত্যিকের লেখনীর আনুকূল্যে মানবচরিত্রের নানাদিকটা দেখবার সুযোগ পাওয়া গেল। হিউমারের সঙ্গে রসগ্রাহিতা দেখিয়ে গ্রন্থকার স্বীয় প্রতিভাকে বিশেষভাবে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। গল্পগুলির প্রত্যেকটি উপভোগ্য। সত্যযুগ, মামা ভাগনে, অকিঞ্চনের দাদা, তিনি ও তাঁহার স্ত্রী, গোলকধাম, একখিলি পান প্রভৃতি আমাদের মনে রঙ ধরিয়েছে। রসিকসমাজে গ্রন্থখানির খুব সমাদর হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

[ক্যালকাটা পাবলিসার্স। ১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯]

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ৩০।১২।৬৪ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দেবী সরস্বতী

শিল্পী : সতীন সাহা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

মাঘ—১৩৭১

দ্বিতীয় খণ্ড | দ্বিপঞ্চাশত্তম বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

ব্রহ্মবিদ্যা ও মুক্তিরহস্য

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

আমি কে? আমি কি? জগৎ কি? বিশ্ব-প্রকৃতি কি? কি করে তার সৃষ্টি হয়েছে—এ প্রশ্ন সুদূর অতীত কাল থেকে যুগে যুগে মানুষের মনকে আলোড়িত করেছে। ভারতের ঋষিগণই পৃথিবীর মানুষদের সর্বপ্রথমে শুনিয়েছেন জগৎ-সৃষ্টির আদিরহস্য। ঐতরেয়োপনিষৎ এর ঋষি জানালেন—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ।

স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি।

স ইমাল্লোকানসৃজত।"

অর্থাৎ এ জগৎ আগে ছিল এক আত্মারূপে অবস্থিত। অন্য কিছুরই স্ফুরণ ছিল না, পরে সে আত্মা এইরূপ ইক্ষা (দৃষ্টি) করলেন—লোক সমূহকে সৃষ্টি করব কি? পরে তিনি লোক সমূহকে সৃষ্টি করলেন।'

বৃহদারণ্যকের ঋষি জানালেন—'ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ' এই জগৎই প্রথমে ব্রহ্মস্বরূপ ছিল। 'এতৎ সর্বং ব্রহ্ম সর্বং ঋষিবং ব্রহ্ম।'

সমস্ত বিশ্ব চরাচরই ব্রহ্ম একথা নিশ্চিত। ছান্দোগ্যোপনিষদের ঋষি গাইলেন—

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবা দ্বিতীয়ম্।

তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি।

প্রকাশিত হবার পূর্বে একমেবাদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে বিরাজিত ছিল। সেই ব্রহ্ম আমি বহু হব, আমার বহুরূপে সৃষ্টি হবে' এই ইচ্ছা করেছিলেন।

জগৎ-এর কারণ ব্রহ্ম—তো জানা গেল। কিন্তু ব্রহ্ম কি। তার স্বরূপ কি তা বিভিন্ন ঋষি ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্ন উপনিষদে। কঠোপনিষদের ঋষি বুঝালেন :

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবম্।
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥

ব্রহ্ম শব্দরহিত, স্পর্শরহিত, রূপরহিত, অক্ষয়রহিত, রস-বিরহিত, গন্ধ বিরহিত, তিনি অনাদি, অনন্ত, মহৎ থেকেও মহৎ, ধ্রুব। তাঁকে জানলে সাধক মৃত্যু থেকে মুক্ত হয়, অমরত্ব লাভ করে।

ঋগ্বেদ ধ্যান নিমগ্ন হয়ে জানলেন—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি॥

—ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ, সেই আনন্দস্বরূপ থেকেই সমস্ত ভূতবর্গ জন্মাচ্ছে, আনন্দদ্বারাই ভূতসকল জীবিত আছে। আর সেই আনন্দেই পুনরাবর্তিত হচ্ছে—আনন্দেই লীন হচ্ছে। ব্রহ্মেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের শক্তি বিধৃত। সেই শক্তিতেই জগৎ প্রকাশিত, সেই শক্তিতেই পরিপালিত, সেই শক্তিতেই সংহার প্রাপ্ত হয়।

মহাভারতের শান্তিপর্বে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য জনকরাজকে যে ব্রহ্মোপদেশ দান করেছিলেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষিকে বললেন :—

অব্যক্তং প্রকৃতিং প্রাহুঃ পুরুষেতি চ নির্গুণম্।
তথৈব মিশ্রং পুরুষং বরুণং প্রকৃতিং তথা।
জ্ঞানং তু প্রকৃতিং প্রাহুর্জ্ঞেয়ং নিষ্কলমেব চ।
অজশ্চ ক্ষেত্র পুরুষস্তস্মান্নিষ্কল উচ্যতে।
কলপা অকলপাঃ প্রোক্তঃ কোঽন্যো পুরুষ উচ্যতে।
তপস্তু প্রকৃতিং প্রাহুরকলপা নিষ্কলঃ স্মৃতঃ॥
তথৈবাবেদ্যমব্যক্তং বেদ্যঃ পুরুষ উচ্যতে।
চলাচলমিতি প্রোক্তং তস্মা তদপি মে শৃণু।
চলাং তু প্রকৃতিং প্রাহুঃ কারণং ক্ষয়সর্গয়োঃ।
আক্ষেপঃ সর্গয়োঃ কর্তা নিষ্কলঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।
অতৈব বেদ্যমব্যক্তমবেদ্যঃ পুরুষস্মৃতঃ।
অজাবুভৌ ধ্রুবৌ চৈব অক্ষয়ৌ চাপ্যুভাবপি॥
অজৌ নিত্যাবুভৌ প্রাহুরব্যাকৃতগতিনিশ্চয়াৎ।
অক্ষরাত্ত্বাৎ প্রমননে অজমব্যক্তবেদনম্।
অক্ষয়ং পুরুষং প্রাহুঃ ক্ষয়ো হস্য ন বিদ্যতে।

অব্যক্তকে প্রকৃতি বলে জানবে। নির্গুণ আত্মাই প্রকৃতিস্থ হয়ে পুরুষ নামে অভিহিত হন। এরূপ পুরুষকে বলা হয় মিশ্র। আর প্রকৃতিকে বলা হয় বরুণ। প্রকৃতিকে জ্ঞান নামে, আর আত্মাকে নিষ্কলপূর্ণ অর্থাৎ পূর্ণ নামে অভিহিত করা হয়। পুরুষ অজ এবং ক্ষ উভয়রূপ হওয়াতেই পূর্ণ। তপা বলে কাকে, অতপা বলে কাকে, জীবের স্বরূপ কি—তাই বলা হবে এক্ষণে। প্রকৃতিকেই তপা বলে—এবং নিষ্কল ব্রহ্মকেই বলে অতপা। অব্যক্তা প্রকৃতিই হচ্ছে অবেদ্য আর পুরুষই হচ্ছেন বেদ্য। সর্গ ও ক্ষয়ের কারণ। প্রকৃতিকেই বলে চলা, আর প্রলয় ও সৃষ্টির কর্তা যে পুরুষ তাকেই অচল বলে অভিহিত করা হয়। আবার প্রকৃতিকেই বেদ্য বলা হয়। আর পুরুষকে বলে অবেদ্য। উভয়ই অজ, উভয়েই ধ্রুব, অক্ষয়, অবিনাশী, —অজ এবং নিত্য। পুরুষকেই অক্ষয় বলা হয়, কারণ তার ক্ষয় নেই।

ঋষিগণ যে শুধু ব্রহ্মকে বুঝেই নিরস্ত ছিলেন তা নয়। এই সংসার চক্র থেকে কিভাবে মানুষ মুক্ত হতে পারে সে রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টাও করেছেন তাঁরা। মন্ত্রোপনিষদ এর ঋষি বলেছেন—

ইচ্ছামাত্রমবিদ্যেয়ং তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে।

ইচ্ছা মাত্রই হচ্ছে অবিদ্যা। অবিদ্যার নাশই মোক্ষ। চরকসংহিতার ঋষি বলেছেন—

যোগে মোক্ষে চ সর্বাসাং বেদনানামবর্তনম্
মোক্ষো নিবৃত্তিনিঃশেষো যোগো মোক্ষপ্রবর্তকঃ॥

নিঃশেষ রূপে বেদনার নিবৃত্তি অবস্থাকেই মোক্ষ বলা হয়। সেই মুক্তিলাভ জীবদ্দশাতেই সম্ভব। ইহ সংসারে ইহ শরীরে মোক্ষলাভ করাকেই বলে জীবন্মুক্তি। গৌড়পাদ ঋষি জীবন্মুক্তের অবস্থা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন :—

যদা ন লীয়তে চিত্তং ন চ বিক্ষিপ্যতে পুনঃ।
অনক্ষিনমনাভাসং নিষ্পন্নং ব্রহ্ম তৎ তদা।

জীবন্মুক্তের চিত্ত লীন হয় না; বিক্ষিপ্তও হয় না, নিস্পন্দ থাকে, আর তাতে কোন কিছুর আভাস বা আকৃতি থাকে না—তখন তা' ব্রহ্ম নিষ্পন্ন হয়। গুহানিহিত ব্রহ্মকে যে জীব জানে, সে জীবিতাবস্থাতেই অবিদ্যার গ্রন্থি ছিন্ন করে। ব্রহ্মকে জেনে জীব ব্রহ্মত্ব লাভ করে। 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম ইব ভবতি।' কিন্তু "যিনি ব্রহ্মভূত, দেহেন্দ্রিয়াদি যাঁহার উপশান্ত হইয়াছে, ব্রহ্মানন্দময়, সুখী, স্বস্বরূপ ও মহামৌনী তিনিই বিদেহ মুক্ত।" এই ভাবে মুক্ত জীবকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে—জীবন্মুক্ত ও বিদেহমুক্ত। শংকর প্রভৃতি আচার্যগণ জীবন্মুক্তিকে স্বীকার করেছেন। কিন্তু রামানুজ প্রভৃতি আচার্যগণ জীবন্মুক্তি সম্ভবপর নয়—এ মতবাদ প্রচার করেছেন। কারণ তাঁদের মতে এই দেহ অবিদ্যা থেকে উদ্ভূত। দেহ যতক্ষণ বর্তমান অবিদ্যাও ততক্ষণ উপস্থিত। তাই অবিদ্যা থাকতে অর্থাৎ জীবিতাবস্থায় মুক্তি সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শাস্ত্রে মুক্তপুরুষের বহু লক্ষণ কীর্তিত হয়েছে। ব্রহ্ম-বিদ্যায় মোক্ষ প্রাপ্ত মানুষ সর্বব্যাপ্তি লাভ করেন। ঋষি ভরদ্বাজ তাঁর অবস্থা বর্ণনা করে বলেছেন :—

অহং পরস্তাদহমধস্তাদহমস্তরিক্ষং তদু মে পিতাভূৎ।
অহং সূর্যমুভয়তো দদর্শাহং দেবানাং পরমং গুহা যৎ।

• • •

অর্থাৎ আমি রয়েছি ঊর্ধ্বলোকে—আমি রয়েছি ভূলোকে, অন্তরীক্ষ আমার পিতাভূত। আমি সূর্যকে দেখেছি উভয় দিক থেকে, দেবতাদের যা পরম গুহা—আমিই তা'।

অনুরূপ অনুভূতি লাভ করেছিলেন আর এক মুক্ত ঋষি। তিনি বলেছেন :—

মধীয়ং মন্থে ভুবন দি সর্বং ময়ি লোকা ময়ি
দিবশ্চতস্রঃ।
মধীয়ং মন্থে নিমিষদ্ যদেজতি তদর্পাপে ঔষধয়শ্চ সর্বাঃ।

স্থাবর জঙ্গম, অচল সচল জীব নির্জীব সকলে সেই তুরীয় দিকে অবিরত এগিয়ে চলেছে 'ঋতস্যৈষ পন্থা' বেয়ে। একদিন সকলেই সেই পরম গতি পরম ব্রহ্মে লীন হয়ে পরম মুক্তি লাভ করবেন। পরম কারণ পরম গতি পরমশিব, পরম পুরুষকে আজ সেই আশাতেই সকল ভূতের মোক্ষও মঙ্গলের প্রার্থনায় কোটি কোটি প্রণিপাত।

স্বভাব সন্ন্যাসী

শ্রীসুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়

তোমায় কোথায় স্থান জগৎ ঈশ্বর
পট ছবি প্রতিমায় খুঁজি
খুঁজি তীর্থে মন্দিরে মন্দিরে ;
তবু এ অশান্ত মন অস্থির
তুমি নাই সাগর পাহাড়ে।

বৈরাগ্যের কপট ছায়া নামে
নামে ভুল অজ্ঞান বিবেক ;
তুমি যে মনের প্রভু বুঝি নাই
সংসারে তোমারি অভিষেক।

নিত্য যদি সুখাসনে
যদি হই স্বভাব সন্ন্যাসী
হয় প্রেম ভালবাসা দানে
আত্মজ্ঞানে প্রগাঢ়
বিশ্বাসী।

মানব জীবনে সেই
উৎকর্ষ সাধন
সেই শান্তি সেই সুখ
জ্ঞান উন্মেষণ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(দীপেনের কথা)

নিজের সম্বন্ধে কিছু ভাবতে গেলে প্রথমেই বাবার কথা মনে পড়ে যায় দীপেনের। প্রতিমার যেমন চালচিত্র, গানের যেমন বাজনা, তার জীবনে তেমনি বাবা।

বাবা অর্থাৎ সুধাময় লাহিড়ী আজ আর জীবিত নেই। বছর ছয়েক আগে হার্টের অসুখে মারা গেছেন। সে যাই হোক, মৃত্যুর পরও দীপেনের চেতনা আর অবচেতনার যুক্ত অংশে রয়েছে—তার প্রত্যহের প্রতি মুহূর্তের সকল দিকে যিনি ব্যাপ্ত হয়ে আছেন তিনি সুধাময়। দীপেনের জীবনে এমন কোন দিনই আবিষ্কার করা যাবে না যেখানে তার বাবার ছায়া নেই।

ছেলেবেলায় দীপেনের সমস্ত অস্তিত্বটাই যখন একটা কাদার মত আকারহীন ছিল সেই তখন থেকেই তার চাহিদা—ওঠাবসা-রুচি-আবেগ-উচ্ছ্বাস—সমস্ত কিছু নিজের হাতে রূপ দিয়েছেন সুধাময়। বার শ' মাইল পাড়ি দিয়ে একটি মেয়ের সন্ধানে আজ সে যে বোম্বাই এসেছে তার পেছনেও বাবার অদৃশ্য অঙ্গুলি-সঙ্কেত অনুভব করছে দীপেন।

জাদুকর—না, উপমাটা বোধহয় ঠিক হ'ল না বলা যায়, সর্বব্যাপী এক ঈশ্বরের মত দীপেনের জীবনের সকল কেন্দ্রে বসে তাকে নিয়ত চালনা করছেন সুধাময়।

সুধাময় ছিলেন মার্চেন্ট অফিসের আড়াই হাজারী মনসবদার। অর্থাৎ রিটায়ার করার আগে মাইনে হয়েছিল তাঁর দু হাজার পাঁচ শ টাকা। অথচ জীবন শুরু করেছিলেন বাষট্টি টাকার অতি নগণ্য এক কেরাণী হিসেবে। উচ্চাশা ছিল প্রচণ্ড—প্রায় আকাশ-ছোঁয়া। সেই সঙ্গে অধ্যবসায়, শাণিত ক্ষুরধার মত বুদ্ধি এবং প্রাপ্ত-সুযোগের চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার—এইসব দুর্লভ গুণ মিশেছিল। সুযোগ সব সময় নাক দিয়ে হাতের মুঠোয় এসে ধরা দেয় না। সুধাময় লাহিড়ী সুযোগ তৈরী করে নিতে জানতেন। ফল হয়েছিল এই, অখ্যাত অজ্ঞাত স্তিমিত কেরাণী থেকে চাকরি জীবনের উচ্চচূড়ে উঠে আসতে পেরেছিলেন। অবশ্যই তাঁর এই ঊর্ধ্বগতি সর্বদা অনায়াস নয়। কিন্তু সে ভিন্ন ইতিহাস।

নিজের সমস্ত জীবন ছেঁকে একটিমাত্র নির্যাসই বার করে এনেছিলেন সুধাময় লাহিড়ী। তার নাম কেরিয়ার। কেরিয়ার তাঁর জপমন্ত্র; তাঁর সারাৎসার। তিনি একটি কথাই বুঝতেন, যে কোন মূল্যে যে কোন উপায়ে উজ্জ্বল কেরিয়ার তৈরি করতে হবে। বোধহয় ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তার স্বপ্ন দেখতেন।

সংসারটি ছিল তাঁর মোটামুটি সংক্ষিপ্তই। স্বামী-স্ত্রী

এবং তি-টি ছেলে। নীরেন-হীরেন আর দীপেন—তিন ছেলের মধ্যে দীপেন সব চাইতে ছোট।

ছেলেবেলাতেই তিন ছেলের কানে মন্ত্র পড়ে দিয়েছিলেন সুধাময়, ভাল করে লেখাপড়া শেখ। ম্যাট্রিকুলেশনে স্কলারসিপ পেতে হবে। অন্তত ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ করা চাই—তার সঙ্গে দু-তিনটে লেটার। বি, এ, এম এ-তে ফার্ষ্ট ক্লাস পাওয়া চাই। তা না হ'লে হাই-সেকেণ্ড ক্লাস। আমার উচ্চাশা কিছু বেশি। তোমাদের ভেতর থেকে কেউ আই, এ, এস কমপীট করবে, তা আমি দেখতে চাই। অন্তত একটা আই, সি, এস। সে যাই হোক, এবার চাকরি বাকরির কথাই ধরো। সরকারি অফিসে যদি ঢোক তা হলে গেজেটেড অফিসার হতেই হবে। যদি মার্চেণ্ট অফিসে ঢুকতে চাও হাজার টাকা মাইনে না হ'লে চলবে না। এর কমে হ'লে স্টাটাস মেনটেন করা অসম্ভব; সমাজে কোন প্রতিষ্ঠাই পাবে না। কেউ যদি বিজনেসে নামতে চাও আমার মতে কণ্ট্রাক্টরি ব্যবসাই বেস্ট। তাকে ফার্ষ্ট ক্লাস কণ্ট্রাক্টর হতে হবে। আমি চাই চল্লিশ বছরের মধ্যেই তোমাদের প্রত্যেকের পার্সোনাল গাড়ি এবং বাড়ি হোক। সেদিকে লক্ষ্য রেখে তোমাদের এগুতে হবে। মনে রেখো, জীবনের সার কথা হচ্ছে কেরিয়ার।

অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মত কেরিয়ার নামে মাছের চোখটি ছেলেদের সামনে সেই শৈশবেই তুলে ধরেছিলেন, সুধাময় লাহিড়ী। ছেলেরা ছিল অনুগত একান্ত বাধ্য। বাবার সমস্ত শিক্ষা, শিরোধার্য করে নিয়েছিল। তাঁর যাবতীয় উপদেশ এবং নির্দেশ পরম নিষ্ঠায় তিন ভাই অনুসরণ করে গেছে।

লোভনীয় চাকরি, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, ঝকমকে সুখের জীবন—এ-সবের মাঝেই ছেলেদের মন গড়ে দিয়েছিলেন সুধাময়। অনাবশ্যক আর সমস্ত কিছু কেটে ছেঁটে বাদ দিয়েছিলেন।

জীবন নাকি বিচিত্র এক মিশ্ররাগের খেয়া। সাতটি তারে সে শুধু সেতার নয়, তার হাজার তার। একেক তারে তার একেক রাগিণী। সুধাময় লাহিড়ী ছেলেদের জীবন থেকে আর সব তার ছিঁড়ে একটি মাত্র করে বেঁধে দিয়েছিলেন। সেই একটি তারে সর্বক্ষণই ঝঙ্কার উঠত, 'কেরিয়ার, কেরিয়ার, কেরিয়ার—'

ছেলেবেলা থেকেই নিজের পছন্দের ছাঁচে ছেলেদের ঢালাই করে দিয়েছিলেন সুধাময়। তার ফল হয়েছে প্রত্যাশিত। দীপেনের দাদা নীরেন এম, এস, সি-তে ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়ে কণ্ট্রাক্টরিতে নেমেছে। রণে এবং প্রণয়ে কোন নীতিই নাকি দুর্নীতি নয়; সম্ভবত কেরিয়ারের ব্যাপারেও। কাজেই কণ্ট্রাক্টরি ব্যবসাতে নেমে প্রথম কিছুদিন সাঁতার-না-জানা মানুষের মত অথৈ সমুদ্রে ছটফট করছে নীরেন। হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে অবশেষে ভেসে আসতে শিখেছে সে। সুধাময়ের আদর্শ অবশ্য লাইট হাউসের মত তার সামনেই ছিল।

প্রথম কণ্ট্রাক্টটা জোগাড় করতে নীরেন কী-কী পন্থার আশ্রয় নিয়েছিল, সব হুবহু মনে আছে দীপেনের। প্রথম প্রথম ভেতরে ঢুকবার জন্ম অন্ধের মত হাতড়ে বেড়াচ্ছিল নীরেন। কিন্তু না, কোথাও একটা দরজা খোলা পাচ্ছিল না সে। খুঁজে খুঁজে নীরেন যখন ক্লান্ত, হতাশ, সেই সময় আলোর একটা রেখা চোখে পড়েছিল। যে অফিসারটি একটু অনুগ্রহ করলে তার ভাগ্যের সিংদরজাটা খুলে যেতে পারে তাঁকে সন্তুষ্ট করা দরকার। অনেক ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত অফিসারটির বাড়ি টিউশানি নিয়েছিল সে। অফিসারের দু'টি ছেলেকে পড়াতে হবে। মাইনে ঠিক হয়েছিল চল্লিশ টাকা।

ঐ ঠিক হওয়া পর্যন্তই। নইলে মাসান্তে মাইনে দেবার ব্যাপারে অফিসারটি আদৌ উৎসাহ বোধ করতেন না। আর মাইনে পাওয়া নিয়ে নীরেনেরও বিশেষ দুশ্চিন্তা ছিল না। আসল কথা, টিউশানিটা ছিল তার ফাঁদ কিংবা টোপ। চল্লিশ টাকার হাজার গুণ একটা শিকারের জন্ম অপার ধৈর্য, সহিষ্ণুতা আর অধ্যবসায় নিয়ে সে প্রতীক্ষা করছিল।

নীরেনের ছাত্র দুটি ছিল মারাত্মক—যেমন চালাক তেমনি দুরন্ত। এমন শয়তান ছেলে দু-তারেতে দেখা যায় না। তারা নিজেরাই নিজেদের তুলনা। পড়াতে গিয়ে কোনদিনই ছেলে দুটিকে বাড়িতে পাওয়া যেত না। তাদের মা ছিলেন খুবই কড়া। বারোমাস দিনরাত প্রকাণ্ড খাটের অনন্তশয্যায় শুয়ে থাকতেন। তাঁর কি অসুখ,

নীরেন জানত না, জানার বিশেষ কৌতূহলও ছিল না। নীরেনকে দেখলেই হাতের তর দিয়ে অতিকষ্টে তিনি উঠে বসতেন। তারপর পৃথিবীর সবটুকু বিস্ময় গলায় ঢেলে দিয়ে ডুবন সরু গলায় চেঁচাতেন, 'ঐ আপদ দু'টো কি একদণ্ড বাড়ি থাকে! আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে ভাই, সিনেমা হলের কাছেই ওদের পাবেন। একটু ধরে এনে পড়াতে বসেন।'

আপদ দু'টো যে কারা সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নেই। যাই হোক, অফিসারের বাড়ির কাছাকাছি একটা সিনেমা হল ছিল। বড় ছেলেটির আস্তানা সেখানে। একপাল বন্ধু নিয়ে সবসময় আড্ডা দিচ্ছে সে। ক্লাস নাইনের ছাত্র কিন্তু এর ভেতরে পাঠ্য বই ক'খানি ছাড়া কোন বিষয়ই আর অসম্পূর্ণ নেই। সিগারেট ফোঁকা, মেয়ে ছেলে সিস মারা, সিনেমার লাইন দেওয়া—এ-সবের তালিম অনেক আগেই নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। এখন সেগুলো প্রয়োগ করে দেখার পালা চলছিল।

ছোট ছেলেটি অবশ্য সিনেমা হলের দিকে যেত না। তার ঘাঁটি ছিল একটু দূরের একটা গলিতে। দিনরাত সে গুলী খেলত। এই খেলাটার কি যেন একটা সাঙ্কেতিক পরিভাষা আছে। গলির ভেতর থেকে সর্বক্ষণই চিৎকার উঠত, 'উড্ডু কীপ—নট ইস্টেট, নট নড়ন চড়ন—টেকাস সই—'

'নট ঠেকাস্নি, ইক ঠেকাস্নি কচি ছিপটি হাওস টকাত—'

যাই হোক, ছেলে দু'টি নীরেনকে দেখলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করত। নীরেনও ট্রাউজার গুটিয়ে তাদের পেছনে ধাওয়া করত, ডগ-রেসের মত একটা ব্যাপার শুরু হয়ে যেত ওরা যে দু'টি ছেলেমাত্র নয়; নীরেনের ভাগ্য।

প্রায় আধ ঘণ্টা লাগল বড়টাকে ধরতে। সেটাকে বাড়িতে তালা বন্ধ করে নীরেন ছুটত ছোটটার পেছনে। ছোটটাকে ধরতে অবশ্য অত সময় লাগত না। মিনিট দশ পনেরর ভেতরেই ছোঁ মেরে তার চুলের ঝুঁটি ধরে ফেলত।

দু'টোকে বাড়ি এনে ঘণ্টাখানেক বসে বসে হাপাত নীরেন। তারপর পড়াশোনা আরম্ভ হত।

তিনটে বাস নিদারুণ পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের পুরস্কার অবশেষে পাওয়া গিয়েছিল। কণ্ট্রাক্টটা পেয়েছিল নীরেন এবং সেই সূত্রেই ভাগ্যের সিংহদরজাটা খুলে গিয়েছিল।

সুধাময় লাহিড়ীর একান্ত বাসনা ছিল চল্লিশ বছরের মধ্যেই প্রত্যেক ছেলের বাড়ি-গাড়ি হোক। বাসনা বললে যথার্থ হয় না। বাসনার ছদ্মবেশে তা ছিল আদেশ। সে আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে নীরেন। বয়েসটা চল্লিশের সীমান্তে, পৌঁছবার অনেক আগেই কলকাতার দক্ষিণে অভিজাত পাড়ায় তিন তলা বাড়ি করেছিল সে। কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে বিলিতি মোটর কিনেছিল।

মেজ ভাই হীরেন গভর্ণমেণ্ট কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় অর্থনীতিতে সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল। হীরেন সম্বন্ধে জনরব, পরীক্ষার আগে এবং পরে একজামিনারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাঁদের স্ত্রী এবং মেয়েদের মার্কেটিং-এ বাহন হ'ত সে, লাইন দিয়ে থিয়েটার-সিনেমার টিকিট কিনে এনে দিত, পিকনিকে কিংবা বেড়াবার সময় সঙ্গী হ'ত। ছোট ছোট মেয়ে বা নাতি-নাতনিদের দল নিয়ে হুল্লোড় করত। এই ভাবেই ফার্স্ট হবার পথটা নাকি অনেকখানিই সুগম করে ফেলেছিল সে।

হীরেন যদিও ইকনমিক্সের অধ্যাপক, অর্থনীতির সমস্ত দুরূহ তত্ত্ব তা'র আয়ত্তে—তথাপি বড় ভাই নীরেনের মত টাকা শিকার করে ঘরে তোলার কৌশলটা তেমন জানা ছিল না তার। অবশ্য গভর্ণমেণ্ট কলেজে অধ্যাপনা করে মাইনে পায় শ' পাঁচেক টাকার মত। আর বেনামে ছাত্রপাঠ্য 'সিম্পল সাকসেস' লেখে। সে-সব পড়ে ছাত্রদের কতখানি সাকসেস হয়, তারাই জানে। তবে হীরেনের হয়েছে। মাসের শেষে প্রকাশকরা হাজার খানেক টাকার একখানা চেক বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায়।

তা ছাড়া গভর্ণমেণ্ট কলেজের চাকুরে হিসেবে হীরেন সেজেটেড অফিসার। সেদিক থেকে সুধাময় লাহিড়ীর প্রত্যাশা পূরণ করেছে সে।

অবশ্য চল্লিশের সীমার মধ্যে বাড়ি করে উঠতে পারে নি হীরেন। গাড়িও না। তবে কলকাতার পূব সীমান্তে জমি কিনে রেখেছে এবং ব্যাঙ্কে জমার খাতায় তার নামে যে স্ফীত অঙ্কটা রয়েছে তা দিয়ে অনায়াসেই

একখানা চমৎকার বাড়ি আর গাড়ি হয়ে যেতে পারে।

অবশেষে দীপেনের কথা।

নীরেন-ধীরেন-দীপেন - তিন ভাইয়ের মধ্যে দীপেনের ওপর সুধাময় লাহিড়ীর প্রভাব সর্বাধিক ; অপরিমীমই বলা যায়। ছেলেবেলায় নিজের হাতে খাত কেটে ছেলের জীবনটাকে সেই যে তিনি বইয়ে দিয়েছিলেন সেই একই স্রোতে একই খাতে সেটা বয়ে চলেছে। সরল মানসাঙ্কের মত তার ভবিষ্যতের প্রতিটি স্তর আগে থেকেই স্থিরীকৃত। সমস্ত জীবনটাই তাঁর ছক-কাটা, মাপজোক করা।

বি-এ, পড়তে পড়তেই দীপেন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, অনার্সে সে যদি ফার্স্ট ক্লাস পায়, আই, এ, এস, পরীক্ষায় কমপীট করবে। আই, এ, এস, হতে পারলে জাস্টিস মৈত্রর মেয়ে এণাক্ষীর কানে বিয়ের কথা গুঞ্জন করা যেতে পারে। যদি আই, এ, এস না হওয়া যায় তা হ'লে আই, পি, এস, আই-এফ, এস—অন্তত একটা ডব্লু, বি, সি, এস হওয়া দরকার।

আই, পি, এস বা আই, এফ, এস হতে পারলে ব্যারিষ্টার সোমের বোন রাখি সোমের দুয়ারে হানা দেওয়া যেতে পারে। আর নিতান্তই যদি ডব্লু, বি, সি, এস হয় একাউন্টস্ অফিসার অরুণ বাগচীর শালী তরলার দিকেই চোখ ফেরাতে হবে।

প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল তার হিসেব করা। কিন্তু না, আই, এ, এস-আই, এফ, এস-আই, পি, এস-ডব্লু, বি, সি, এস—কিছুই হতে পারে নি দীপেন। এমন কি বি, এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত পায় নি। মাঝারি রকমের একটা সেকেণ্ড ক্লাস নিয়ে অগত্যা এম, এ-তে ভর্তি হয়েছিল। কেন না বি, এ-র রেজাল্ট দেখে কমপীটিটিভ পরীক্ষায় বসতে সাহস হয় নি তার। ডব্লু, বি, সি, এস-টা বাদ দিলে বাকিগুলো সর্বভারতীয় পরীক্ষা। সারা দেশের চমক-লাগানো সেরা ছেলেরা যেখানে প্রতিযোগিতায় নামবে সেখানে দীপ্তিহীন মাঝারি মাপের এক সেকেণ্ড ক্লাসের জায়গা কোথায়? ডব্লু, বি, সি, এস-ও তো সহজ নয়। বাঙলা দেশের শ্রেষ্ঠ ছেলেরা তার জন্য কোমর বাঁধে। যাই হোক, এক কাঁকে সেকেণ্ড ক্লাস এম, এ-র ছাপে আরো তিন পঞ্চাস্তরের সঙ্গে চালাই হয়ে ইউনিভার্সিটির বাইরে বেরিয়ে এসেছিল দীপেন।

তারপর?

তারপর কেউ বলেছিল রীসার্চ করতে। ডি, লিট, অবশ্য পারে না। তবে ডি, ফিল, তো খানিক জমা দিলেই সিনেমার টিকিট পাওয়ার মত নগদ নগদ হাতে এসে যায়। নইলে বাঙলাদেশে বছরে শ-খানেক করে ডি, ফিল বেরুচ্ছে কেমন করে! নামের সঙ্গে ডি, ফিলের পেংমটা থাকলে কতখানি চতুর্বর্গ লাভ হয়, কে জানে। তবে কলেজের মাষ্টার হয়ে ঢোকার পারাপারির কড়িটা নাকি ওর মধ্যেই আছে।

একজন সৎ পরামর্শ দিয়েছিল, 'তোমার বাবার তো অনেক টাকা। যাও না, বছরে বছর দুই তিন কাটিয়ে এস। তাতে লাইফটা কিছু এনজয় করতে পারবে। একেবারে ফ্রী-মিক্সিংএর দেশ হে। আমাদের বঙ্গললনা-দের তো দেখেছ! একেকটি লজ্জাবতী-লতা। ছুঁতে গেলেই এঁরা গুটিয়ে যান। একেবারে হটন্।'

পরামর্শদাতা এ-দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে বিরক্ত নাসিকাটিকে একবার কুঁচকেই আবার নতুন উৎসাহে আরম্ভ করেছিল, 'আর ওদেশে? ওদেশের মেয়েরা হচ্ছে শ্রাবনের মত। তোমাকে দেখামাত্রই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এয়ারপোর্টে নামলেই দেখবে অপরার ঝাঁক এসে তোমাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেছে। তারপর ড্রিঙ্ক, ড্যান্স, ফুর্তি, কার্তা। সুখের জীবন দু-দিন বৈ তো নয়। আর এ-সবের ফাঁকে ফাঁকে যদি সময় পাও আর খেয়াল থাকে, নাইট ক্লাস করে একটা ডিগ্রী-টিগ্রীও আনতে পার। বিলিতি একটা পুচ্ছ যদি থাকে দাঁড়কাক হলেও লোকে মযুর ভাবে। চাকরি-বাকরির তাতে সুবিধেই হয়। কিন্তু কাকে কি বলছি! তোমার ও-সবে কি দরকার! তোমার বাবার ব্যাঙ্ক ভর্তি অতেল টাকা, এক দাদা অত বড় কণ্ট্রাক্টর, আরেক দাদা প্রফেসর। কোন ন্যুসেন্স নেই তো হে—দুটো দিন প্রেমসে ফুর্তি-টুর্তি করে নাও। ও সুযোগ ছেড়ো না।'

দীপেনের বনিয়াদ এত মজবুত যে চারদিকের ঝাঁক ঝাঁক প্রস্তাব এবং পরামর্শ—কোন কিছুই তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে নি। তা সম্ভবও ছিল না। কেন না সুধাময়

লাহিড়ী নিজের হাতে তাঁর ছেলেদের নিয়তি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। অতএব তেইশ বছরের একটা জীবন আর সেকেণ্ড ক্লাস এম, এ-র একখানা ডিগ্রী নিয়ে কী করা প্রয়োজন—সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা ছিল না দীপেনের।

দুরাকাঙ্ক্ষীরা যতই পরামর্শ দিক, দীপেন বুঝেছিল হীনাচ করে এডুকেশান লাইনে ঢোকার মেজাজ তার নয়। 'জীবন দু-দিন বৈ তো নয়, অতএব সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আনন্দের ভাণ্ডারটি লুট করে এস'—বলে যারা প্রেরণা দিয়েছিল আর চোখের সামনে মোহময় ছবি এঁকেছিল, দু-চারদিনের মধ্যেই তারা টের পেয়ে গেল এমন একখানা সৎ পরামর্শ নিতান্তই অপাত্রে পড়েছে।

আসল কথা যে-সব মনসা দিয়ে সুধাময় লাহিড়ী দীপেনের স্বভাব গড়ে দিয়েছেন তার ভেতর ফুর্তি করে টাকা ওড়াবার মত লাহ এবং উত্তেজক বারুদ নেই। নিতান্ত শীতল কঠিন ধাতুতে তা তৈরী! কাজেই অত সহজে তা উত্তপ্ত হয় না।

ফুর্তি করার মত মন বা রুচি—কোনটাই নয় দীপেনের। সে সব তার বাবার আদর্শ-বিরুদ্ধ। সুতরাং চারপাশ থেকে নিতান্ত নিরুৎসাহ হয়ে পরামর্শদাতারা একে একে খসে পড়েছে। আর দীপেন করেছে কি, সোজা মার্চেণ্ট অফিসের আপার ডিভিসন কেরানীর সিংহাসনে গিয়ে বসে পড়েছে।

মাত্র একটি বছরই কেরানীর আসনে বসেছিল। সুধাময় লাহিড়ীর সেই মহাগুপ্তি, সুযোগ নিজে থেকে আসে না, তাকে তৈরি করে নিতে হয়'—চাকরিতে ঢুকে মুহূর্তের জন্যও সেটা বিস্মৃত হয় নি দীপেন। সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ করে সে প্রতীক্ষায় ছিল কখন কোন ছদ্মবেশে সুযোগ আসবে, কে বলতে পারে এবং সেটা কাজে লাগাতে না পারলে কোনদিনই ওপরে ওঠা সম্ভব না। সুধাময় লাহিড়ীর নির্দেশ আছে চাকরি করলে অন্তত হাজার টাকার ওপর মাইনে চাই।

যাই হোক, সুযোগ এসে গিয়েছিল। ব্যাপারটা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি অভাবনীয়। একদিন অফিসে যেতেই বেয়ারা এসে জানিয়েছিল, বড় সাহেব তাকে তলব করেছেন।

বড় সাহেব অর্থাৎ জেনারেল ম্যানেজার মিষ্টার দত্ত তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। প্রথমটা কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে দীপেনের। অবিশ্বাস্য কেননা, চাকরির যে পথে একজন আড়াই শ'টাকা মাইনের নিম্নস্তর কেরাণীর ঘোরাফেরা, সেখানে বড় সাহেবের মত বৃহৎ গ্রহের দেখা মেলে না। তাঁর কক্ষপথ আলাদা, সৌরলোক ভিন্ন।

কেরাণীরা যে সেউড়ি পেরিয়ে অফিসে ঢোকে বড় সাহেব সেখান দিয়ে আসেন না। তাঁর সদর আলাদা, তাঁর লিফট্ আলাদা। শোনা যায় লিফট্ থেকে নেমে তাঁর শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কামরা পর্যন্ত দামী জয়পুরী কার্পেট পাতা। সেটা মাড়িয়ে মাড়িয়ে নিঃশব্দে তিনি চলাফেরা করেন। কেরানীরা যেখানে বসে সেখানে কার্পেট নেই, এমন কি পাখার ব্যবস্থা নেই। এজমালি পাখার তলায় বসে সবাই গরমে ঘামে। অথবা শীতকালে ভেলা পাকিয়ে থাকে। শীত-গ্রীষ্ম-সুখ-দুঃখ—সবাই তারা এক-সঙ্গে ভাগজোক করে নেয়। দত্তসাহেবের কিন্তু ভাগীদার কেউ নেই। ছয় ঋতু আর বারোটা মাস সবই তাঁর একার একান্ত নিজস্ব। শোক-দুঃখ-আনন্দ—কোন কিছুর অংশ নেবার জন্য কারুকে তিনি ডাকেন না। মোট কথা, দত্তসাহেবের জগৎ আর দীপেনদের জগৎ—দুয়ের মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান। কোন মতেই সেই দূরত্ব ঘুচি ঘুচবার নয়।

কাজেই দত্ত সাহেবের সঙ্গে দেখা হওয়াটা রীতিমত দুর্লভ ঘটনা। এক বছরের চাকরি জীবনে ক'বার তাঁকে দেখেছে দীপেন? বার চারেকের বেশি অবশ্যই না।

প্রত্যহের সংস্পর্শে না এলেও দু-তলা সুবিশাল অফিস বাড়িটায় দত্তসাহেবের উপস্থিতি প্রতি মুহূর্তেই যেন অনুভব করা যায়। অফিসে হাজার দেড়েক কেরাণীর প্রত্যেকের হাতে-পায়ে যেন সুতো বাঁধা আছে। পুতুলনাচের খেলোয়াড়ের মত অদৃশ্যে থেকে সুতোগুলো নিয়ত টেনে চলেছেন দত্তসাহেব। সেই টানে এতগুলি মানুষ চলে-ফেরে-ওঠে-বসে।

যাই হোক, দেড় হাজার কেরাণীর জনতা থেকে বিশেষ-ভাবে দীপেনকেই ডেকে পাঠিয়েছেন দত্তসাহেব। চাকরিতে ঢোকার প্রথম দিন থেকেই তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের জন্য অন্তর লালায়িত ছিল দীপেন। কিন্তু সে সুযোগ সে নয় তবে দত্তসাহেব তাকে চিনলেন কেমন করে?

সংশয়ের দৃষ্টিতে বেয়ারাটার দিকে তাকিয়েছিল দীপেন। বিমূঢ় সুরে জিজ্ঞেস করেছিল, বড় সাহেব—মানে জেনারেল ম্যানেজার আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?'

'জী হাঁ।' বেয়ারাটা সবিনয়ে ঘাড় কাত করেছিল।

'ঠিক জানো, আমাকেই ডেকেছেন?'

'জী হাঁ। আপনিই তো দাশগুপ্ত সাব?'

'হাঁ। আচ্ছা চল!'

দত্তসাহেবের কামরার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল দীপেন। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল তার। এই ডেকে পাঠানোর মধ্যে নিঃসংশয়ে অপ্রত্যাশিত চমক রয়েছে। কিন্তু কেন ডেকেছেন? কেন? মাসটা ছিল জানুয়ারি। অর্থাৎ হিসেব অনুযায়ী শীত নেমে গিয়েছিল। কলকাতার ওপর দিয়ে উত্তুরে বাতাস শাঁই শাঁই করে তার ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিল। এত শীতেও কপালে কণা কণা ঘাম জমেছিল দীপেনের। এর নামই কি সংযুক্তি?

যাই হোক, বেয়ারাটা সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিল। দরজা খুলে দিয়ে বলেছিল, 'অন্দর যাইয়ে—'

ভেতরে ঢুকেই সুবিস্তৃত একখানা হল্-ঘর চোখে পড়েছিল। দোকার আর সুদৃশ্য টেবিলে ঘরখানা সুসজ্জিত। হল ঘরটার দরজায় আরেকটি বেয়ারা অপেক্ষা করছিল। সে তাকে বলেছিল, 'মেরা সাথ আইয়ে।'

দ্বিতীয় বেয়ারাটি তাকে অপেক্ষাকৃত ছোট একখানা ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। এই ঘরটা আগেরটার চাইতে আরো বেশি সাজানো। ডিস্টেমপার-করা দেওয়ালে কাংড়া আর রাজপুত চিত্রকলার অনেক দুষ্প্রাপ্য নমুনা রয়েছে। দীপেন আগেই শুনেছিল, এটা বোর্ডরুম। এখানে বসেই ডিরেক্টাররা কোম্পানির ভাগ্য নির্ধারণ করে থাকেন।

দ্বিতীয় বেয়ারাটি বোর্ড রুমের শেষ প্রান্তে পৌঁছে তৃতীয় আরেকজনের কাছে দীপেনকে হস্তান্তরিত করেছিল। ঘরের মধ্যে তার পিছু পিছু চলতে চলতে এক সময় চলা শেষ হয়েছিল। তৃতীয় বেয়ারাটি বোর্ডরুমের ডান পাশে একখানা বিশাল কামরায় তাকে পৌঁছে দিয়েছিল। ঘরখানা অ্যামিডির প্যারাবোলার মত।

জানুয়ারির বাতাস বাইরে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এ-ঘরে ঢোকার ছাড়পত্র পায়নি। সমস্ত জানালা আর দরজা বন্ধ। শীতের হাওয়া রুদ্ধ দ্বারে মাঝে মাঝে করাঘাত হেনে চুপিসাড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল।

সেই ঘরে দাঁড়িয়ে কে বলবে, বাইরে জানুয়ারির শীত প্রমত্ত হয়ে আছে! তাপ-নিয়ন্ত্রণের কৌশলে ঘরখানা আশ্চর্য গরম। সুখপ্রদ এক উত্তাপ অথৈ আরামের মধ্যে দীপেনকে টেনে নিয়েছিল যেন।

সে ঘরের দেওয়াল বা সীলিং—কিছুই দেখা যায় না। বার্নিশ-করা চকচকে কাঠে সমস্ত ঘরখানা মোড়া। এক-দিকের দেওয়ালে কার্ডবোর্ডের প্রকাণ্ড ওয়াল-ম্যাপ। বিপরীত প্রান্তের যে দেওয়াল, তার ভেতরে কোন অদৃশ্য স্থান থেকে যেন উজ্জ্বল অথচ লীলায়িত আলো ঘরময় ছড়িয়ে ছিল। সমস্ত পরিবেশটা কেমন যেন অবাস্তব, অবিশ্বাস্য আর স্বপ্নময় মনে হয়েছিল দীপেনের।

যাই হোক, ঘরের দূর প্রান্তে প্রকাণ্ড একখানা সেক্রেটারিয়েট টেবল্। তার ওপারে দত্তসাহেব বসে ছিলেন। এক বছরের চাকরি জীবনে এর আগে আর বার চারেক মাত্র তাঁকে দেখেছে দীপেন। তা-ও দূর থেকে দেখা। হয়ত গাড়ি থেকে নামছেন কি গাড়িতে উঠছেন, সেই সময় চোখে পড়েছে। চকিতের সেই দেখার মধ্যে বিশ্লেষণের সুযোগ ছিল না। এত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আজই তার প্রথম আসা।

সেই হঠাৎ চকিতের দেখা গুলোর মধ্যে দীপের চেতনায় দত্তসাহেব যে ছাপটা রেখে গেছেন সেটা খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু আজ তাঁর কামরায় ঢুকেই দীপেন অনুভব করল, তাঁর সমস্ত অবয়ব ঘিরে শঙ্খের দেওয়ালের মত কি যেন একটা আছে। এর নামই কি ব্যক্তিত্ব? হয়তো বা। দীপেনের মনে হয়েছিল, সেই দুর্ভেদ্য ঘবনিকাটার কোথাও এমন একটু ফাঁক নেই যার ভেতর দিয়ে দত্তসাহেবের কাছাকাছিও পৌঁছানো যায়।

ব্যক্তিত্ব যাই থাক, দত্তসাহেব যে আশ্চর্য সুদর্শন সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নেই। প্রাচীন রোমানদের মত গুরু শরীর। ঘোড়া জুর তলা থেকে তীক্ষ্ণ নাক নেমে এসেছে। চোখের দৃষ্টি প্রখর এবং দূরগামী, মনে হয়, বুকের অন্তর পর্যন্ত দেখতে পায়। দৃষ্টি যে এত ভাষাময় আর প্রকাশক্ষম হতে পারে কে জানত! বয়স চল্লিশোর্ধ্বে কিন্তু পঞ্চাশের অনেক নীচে। এই বয়ঃ একটা অভিজ্ঞের

তিনিই যে ঈশ্বর এবং এর সমস্ত দায়িত্ব যে তাঁরই ওপর, সে কথা বিদ্রূপ কপালের গভীর কয়েকটি রেখায় যেন খোদাই করা রয়েছে।

যাই হোক, হস্তদাহেব টেবিলের ওপর ঝুঁকে ফাইলের মধ্যে ধ্যান-জ্ঞান সঁপে দিয়েছিলেন। এদিকে বেয়ারাটা কামরার ভেতর দীপেনকে পৌঁছে দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

কতক্ষণ যে সংমোহিতের মত দাঁড়িয়ে ছিল দীপেন খেয়াল নেই। সে পিছোতেও পারছিল না, আবার এগিয়ে যেতেও সাহস পাচ্ছিল না।

একসময় যেন ঘরে দ্বিতীয় একজনের উপস্থিতি টের পেয়েছিলেন হস্তদাহেব। চোখ তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই অনিশ্চিতস্বরে দীপেন বলেছিল, 'মে আই কাম ইন্ স্যার?'

হস্তদাহেব বলেছিলেন, 'ইউ আর অলরেডি ইন্—'

থতমত খেয়ে গিয়েছিল দীপেন। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যই। পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে যতখানি সম্ভব স্বাভাবিক সুরে বলেছিল, আপনি আমাকে ডেকেছেন স্যার। আমার নাম দীপেন লাহিড়ী।'

'আই সী, আই সী। য়েস ইউ আর দীপেন লাহিড়ী। আসুন।'

দীপেন কাছে যেতেই সামনের একখানা চেয়ার দেখিয়ে হস্তদাহেব বলেছিলেন, 'বসুন—'

হস্তদাহেবের প্রায়-সুরহীন গম্ভীর গলায় আমন্ত্রণের যে রেশটুকু ছিল আড়াই শ' টাকার একজন কেরানীর উৎসাহিত হবার পক্ষে তা যথেষ্ট। দীপেন কিন্তু তখনও পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারে নি। কেননা হস্তদাহেবের এই ডেকে পাঠানোর পেছনে কী উদ্দেশ্য রয়েছে, তখনও সেটা পরিষ্কার নয়।

হস্তদাহেবের চেহারা-মুখ-গলার স্বর—সব কিছু একবার মনে মনে বিশ্লেষণ করে নিল দীপেন। কিন্তু না, কোথাও তাঁর উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট রেখায় ফুটে নেই। যাই হোক, আস্তে আস্তে পা ফেলে হস্তদাহেবের প্রায় মুখোমুখি সামনের সেই চেয়ারটিতে গিয়ে বসেছিল দীপেন। যদিও বাইরের দিকে স্বচ্ছন্দ আর সাবলীল থাকতে চেয়েছে সে, ভেতরে ভেতরে ভয়ানক আড়ষ্ট বোধ করছিল।

দীপেন বসতেই হস্তদাহেব আবার বলে উঠেছিলেন, আপনি তো এষ্টাব্লিশমেণ্ট সেকসনে আছেন, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে দীপেন উত্তর দিয়েছিল।

'কতদিন আপনি কাজ করছেন?'

'আজ্ঞে, একবছর।'

'মাত্র!'

দীপেন জবাব দেয় নি। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার হস্তদাহেবের দিকে তাকিয়ে পরমুহূর্তেই চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। হস্তদাহেবের চোখে চোখ রাখা অসম্ভব।

হস্তদাহেব আবার বলেছিলেন, 'মাত্র একবছর চাকরি করছেন কিন্তু এরই ভেতর আপনার খ্যাতি আমার কানে এসেছে।'

কী কানে এসেছে হস্তদাহেবের? কী? বুকের ভেতর সচল হৃৎপিণ্ডটা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল যেন। উদ্‌ভ্রান্ত দিশেহারার মত আরেকবার তাদের অফিসের সর্বময় ঈশ্বরটির দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল দীপেন।

একটু কি চিন্তা করে হস্তদাহেব বলেছিলেন, 'ইউ আর এ ব্রাইট স্মার্ট ইয়ং ম্যান। খোলাখুলিই তা হ'লে বলি। আমার অফিসের অন্য যে-সব কেরানী আছে তারা একেকটি জুথুবু জরদ্গব। পান খেয়ে যেখানে-সেখানে পিক ফেলছে, হা-হা করে হাসছে, চিৎকার ছাড়া কথা বলে না। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, বড় বড় নখ, নোংরা জামাকাপড়। হরিবল্! এদের মধ্যে ইউ আর কমপ্লীটলি ডিফারেণ্ট।'

এ জগতে বড় সাহেবের প্রশংসা একান্ত দুর্লভ। কারো ওপর প্রসন্ন হ'লেও মুখ ফুটে সেটুকু উচ্চারণ করা তাঁদের রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রমের মত হস্তদাহেব তা করেছেন।

হস্তদাহেবের প্রসন্নতা এবং ডেকে পাঠানোর উদ্দেশ্য কিছুটা যেন ধরা যাচ্ছিল। অফিসে ঢোকার প্রথম দিন থেকেই দীপেন স্যুট-টাইয়ে ঝকমকে হয়ে আসত। তার প্যাণ্ট যা জামার ক্রীজ নির্ভুল, চুল নিপুণ হাতে ব্যাক ব্রাশ করা। মুখ নিখুঁত নিরঙ্গুশভাবে কামানো। সে পান খেত না, চেঁচিয়ে কথা বলত না। বিপুল কেরানী সমুদ্রে দীপেন সত্যই সে বিশিষ্ট।

যাই হোক, এতক্ষণে দীপেনের বুকের আবদ্ধ বাতাস সহজ নিঃশ্বাসে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল যেন।

দত্তসাহেব আবার বলেছিলেন, 'এই রকমটাই আমি চাই। দিস স্মার্টনেস, দিস ব্রাইটনেস। শুধু কি তাই, আমি অ্যাটেনডান্সের খাতা দেখেছি। একটা দিনও আপনার লেট নেই। আর ওরা? যখন খুশি আসছে, যাচ্ছে। ও যেন দোকানে এসে খাতা লেখা! বাট দিস ইজ ওয়েল অরগ্যানাইজড। সে যাক, আপনার ব্যাপারে আমি খুশী, ভেরি মাচ প্লীজড্। আমার অফিসের সবস্ত ষ্টাফ যদি আপনার মত হ'ত!'

কিছুক্ষণের সান্নিধ্যেই আবিষ্কার করা গিয়েছিল দত্তসাহেব আর যা-ই হোন, ধূর্ত নন। চতুরালি দিয়ে মনোভাব ঢেকে রাখার কৌশল তাঁর আয়ত্তে নেই। সঙ্গত কারণ পেলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেও জানেন এবং এক টানে প্রাণের কোন কোন দুয়ার খুলেও দিতে পারেন।

যাই হোক, অভাবনীয় সৌভাগ্যে একেবারে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল দীপেন। প্রশংসা কাকে বলে, মুখর করে তোলে। আবার কাকে বলে বোবা করে দেয় মূক। নিঃশব্দে দত্তসাহেবের প্রসন্নতা মাথা পেতে নিয়েছিল দীপেন।

তারপর খানিকটা চুপচাপ। এতক্ষণ একতরফাই কথা বলে গেছেন দত্তসাহেব। নির্বাক শ্রোতার মত সামনে বসে থেকেছে দীপেন।

এবারও দত্তসাহেব আরম্ভ করেছিলেন। নীরবতা ভেঙে বলেছিলেন, 'আপনাকে একটা বিশেষ দরকারে ডাকিয়ে পাঠিয়েছি মিষ্টার লাহিড়ী।'

মুখে কিছু বলেনি দীপেন। জিজ্ঞাসু উৎসুক চোখ তুলে দত্তসাহেবের দিকে তাকিয়েছিল শুধু।

দত্তসাহেব বলেছিলেন, 'আমার পার্সোনাল অ্যাসিষ্টান্টটি দু-দিন ধরে আসছে না। আজ সে রেজিগনেশন সাবমিট করেছে। যে ক'দিন নতুন লোক অ্যাপয়েন্টেড না হচ্ছে আপনি আমার পি এ-র কাজটা যদি করেন—

অফিসের সর্বময় ঈশ্বরটির কাছাকাছি থাকার দুর্লভ এই সুযোগ ছাড়তে মি দীপেন। ব্যগ্র সুরে বলেছিল, 'নিশ্চয়ই স্যার, এতো আমার পরম সৌভাগ্য।'

'তা হ'লে কা'ল থেকে সোজা আমার কম্পার্টমেন্টেই চলে আসবেন।'

[ক্রমশঃ

বাংলা সাহিত্যে ছিন্নপত্র

সন্ধ্যা সেন

কবিতা গল্প উপন্যাস যদি কুলীন সাহিত্য হয়, প্রবন্ধ তবে অন্ত্যজ অর্থাৎ নামেমাত্র সাহিত্য। আর রম্য-রচনার স্থান বোধহয় কুলীন আর অন্ত্যজের মাঝামাঝি। প্রবন্ধের কাজ—উদ্দেশ্য পরিবেশন করা, রম্যরচনা উদ্দেশ্যহীন খেয়ালের সৃষ্টি। এই সাহিত্যিক গুণের জন্যই রম্যরচনা প্রবন্ধের ঊর্ধ্বে স্থানলাভের অধিকারী। লেখক-মনের খাসদরবারী এলোমেলো কথাগুলি যে পাঠকের কর্ণগোচর করে; আর এলোমেলো বলেই গীতি-কবিতার অনেক নীচে এর স্থান। অথচ আত্মধর্মে এ গীতি কবিতারই সমীক্ষা। এলোমেলো ভাবের জাল থেকেই প্রাণের রস আহরণ করে এক একটি গীতিকবিতা নিটোল ফুলের মত ফুটে ওঠে; রম্যরচনা সেখানে অনেক অবান্তর, অনেক অসংলগ্ন অপ্রাসঙ্গিক ভাব নিয়ে লেখকের নেপথ্যচারী মনটির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেয়। গল্পউপন্যাসের বিষয়বস্তুও রম্য রচনায় ঠাঁই পায়—অভাব শুধু পরিচিত form-টার।

রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' পত্রের ভাণ নয়—এ পত্র সাহিত্যই। এর রম্যগুণের জন্য সাহিত্যিক বিভাগে একে রম্যরচনার শ্রেণীভুক্ত করা চলে।

'ছিন্নপত্রে'র রচনা সময় হিসেব করে দেখলে এর ভাষা এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। ১৮৮৫ থেকে ১৮৯৬ পর্যন্ত দশবছরের চিঠিপত্র গ্রথিত হয়েছে এখানে, কিন্তু ১৯০০ থেকে সুরু করে সর্বাধুনিক গদ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেও কোনো অংশেই একে পশ্চাদবর্তী বলে মনে করার উপায় নেই। যে সময়ে রবীন্দ্রনাথ একহাতে সাধারণ পাঠকের দরবারে 'বউঠাকুরাণীর হাট' বা বিসর্জন পরিবেশন করছেন, সে সময়েই তাঁর অন্যহাত সাধারণ্যের ওপর মহলে অতুলনীয় ভাষায় এক অবিস্মরণীয় কাব্যময় সৃষ্টির দ্বারা বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির পথ খুলে দিচ্ছে—এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। "ছিন্নপত্র" প্রথম লোকচক্ষুগোচর হোলো ১৩১৯এ। তাই এর ভাষার বৈপ্লবিক সম্ভাবনা পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায়। এমন ঝরঝরে কথ্যভাষার তুলনা মেলা ভার। সাহিত্যের বাহন হিসাবে কথ্যভাষা তখনও বহু বিলম্বিত। সবুজপত্রের যুগে রবীন্দ্রনাথের গদ্যে হয়ত তার লেগেছে বেশী; বুদ্ধির তীক্ষ্ণ ঝলকে চোখ ধাঁধিয়েছেন ছত্রে ছত্রে;—কিন্তু সুললিত শব্দ ঝঙ্কারে, সাবলীল ছন্দে মুখের ভাষার সংযত মার্জিত রূপান্তরে ছিন্নপত্রের গদ্য এখনও বাংলাসাহিত্যে আদর্শ স্থানীয়।

যে তারুণ্য ও স্নিগ্ধ হাস্যরস Belles letters এর প্রাণ, ছিন্নপত্রের ছত্রে ছত্রে তার অফুরন্ত সম্ভার। কাব্যমূল্যে এ অতুলনীয়। এক দিকে "মানসী" "সোনারতরী" "চিত্রা" অন্যদিকে গল্পগুচ্ছের বহু গল্পের সম্ভাবনার বেদনা এই পত্রগুচ্ছের বিভিন্ন অংশে ধরা পড়েছে। পৃথিবীর সঙ্গে কবির জন্মজন্মান্তরের যোগ, বহু আমি ক্ষুদ্র আমির উপলব্ধি সূত্রে জীবন দেবতার প্রথম আগমন সমস্তই এখানে সংঘটিত হয়ে তাঁর কাব্য যে শুধুমাত্র সাময়িক ভাবাকুলতার অভিব্যক্তি মাত্র নয়, জীবনসত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ তারই স্বাক্ষর বহন করছে।

"আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্ব্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবেমাত্র মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্য্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাঢ় হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিলনা; বৃহৎ সমুদ্র দিন-রাত্রি দুলছে, এবং অবোধ মাতার মত আপনার নবজাত ক্ষুদ্র কৃমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে—তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে সূর্য্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মত একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠে-

ছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়-গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্গত হোতো।

এ অনুভূতি তাঁর 'সমুদ্রের প্রতি', 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি কবিতার ভূমিকা। পরবর্তীকালে কবি তাঁর স্বধর্ম ব্যাখ্যা-কল্পে এই সব অংশ উদ্ধৃত করেই তাঁর অন্তর প্রকৃতিকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন।

("আমরা হঠাৎ দেখতে পাই আমরা আমাদের সুখ-দুঃখের চেয়ে বড়, আমরা প্রতিদিনের তুচ্ছ বন্ধন থেকে মুক্ত।...গানের সুরের দ্বারা গানের কথাগুলি যেমন অমরতাপ্রাপ্ত হয়, তেমনি প্রাত্যহিক সংসারটা অন্তরের চিরানন্দ রাগিণীর দ্বারা চিরমহিমা লাভ করে, আমাদের সমস্ত স্নেহ প্রীতির সম্বন্ধ একটি বিনম্র ধর্মোপলব্ধির ভাবে জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে, দুঃখবেদনার দুঃখত্ব যে চলে যায় তা নয়, কিন্তু সে যেন আমাদের নিজত্বের সঙ্কীর্ণসীমা অতিক্রম করে এমন সুবৃহৎ আকাশে ব্যাপ্ত হয় যে সেখানে সে একটা সৌন্দর্যবিকীরণ করতে থাকে। এবার বোটে থাকতে আমি অন্তর্যামী নামক একটি কবিতা লিখেছি, তাতে আমি আমার অন্তর-জীবনের কথা অনেকটা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি।")

"কে আমাকে গভীর গম্ভীরভাবে সমস্ত জিনিষ দেখতে বলছে...বাইরের সঙ্গে আমার সমস্ত সূক্ষ্ম এবং প্রবলতম যোগসূত্রগুলিকে প্রতিদিন সজাগ সচেতন করে তুলছে।... আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্মপাই সে কখনই আমার ধর্ম হয়ে ওঠেনা। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে নিজের ভিতর থেকে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা।...নিজের ভিতর-কার এই সৃজন ব্যাপারের অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায়, তখন এই বাহ্যজগৎ অনন্ত বিশ্ব চরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি। নিজের প্রবহমান জীবনকে যখন নিজের বাহিরে নিখিলের সঙ্গে যুক্ত করে দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই।...অনন্ত জগৎ-প্রাণের সঙ্গে আমার এই যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধেরই প্রত্যক্ষ ভাষা এই সমস্ত বর্ণগন্ধগীত।"

ইত্যাদি বহুমূল্য ইঙ্গিত ছিন্নপত্রের জায়গায় জায়গায় ছড়ানো রয়েছে—যেগুলো বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বোঝা অসম্ভব। অনেক অলিখিত কবিতার অঙ্কুর এখানে রয়ে গেছে; কত বিচিত্র অনুভূতিসমৃদ্ধ বহুমূল্য চিত্রকল্প যেগুলো নিজেরাই স্বতন্ত্র কবিতার বিষয়।

"কেবল নীল আকাশ আর ধূসর পৃথিবী—আর তারই মাঝখানে একটা শ্রীহীন, সুষমাহীন অসীমদঙ্গা, মনে হয় যেন একটা সোনার চেলী-পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে।...যুগ-যুগান্তরকাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লান নেত্রে মৌনমুখে প্রান্তরে প্রদক্ষিণ করে আসছে। তার বর যদি কোথাও নেই, তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে! কোন অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পতিগৃহ।"

কাব্য ও দর্শনগত মূল্য ছাড়াও এর একটা স্বতন্ত্র মূল্য রয়েছে। সেটা হোলো মানুষ রবীন্দ্রনাথের পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট প্রতিভার নেপথ্যবিহারী সত্তাটির প্রতি সাধারণের আগ্রহ ও কৌতূহল মাত্রাতিরিক্ত হবেই। "কি করে যে যেমন ভাবে"—কবি তেমন কিনা এ সংবাদ প্রত্যক্ষভাবে পাওয়ার উপায় কতটুকুই বা? অপ্রত্যক্ষ তথ্যের উপর নির্ভর করা ছাড়া গতি নেই, সে তথ্যও তাঁর বিরাট বহুমুখী প্রতিভার তুলনায় অপ্রতুল। তাঁর আত্মকথা এ বিষয়ে সন্ধিনে অসমর্থ। জীবনের যে অংশ তাঁর কবি জীবনের অন্তে প্রয়োজনীয় পরিপ্রেক্ষিত সেটুকু শুধু সেখানে উপস্থিত। যে অংশে শুধু মানবিক সুখদুঃখ আশানিরাশার আন্দোলন—রবীন্দ্রনাথ নির্মমভাবে তা বাদ দিয়ে গেছেন। তার ব্যক্তিসত্তা যেখানে পিতা, স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু সে অংশটা অন্তরালে রেখে তার কবিস্বরূপকে বোঝবার উপায় নেই। কবিসত্তা মানবসত্তাকে গৌণ করলেও নিঃশেষ করতে পারে না, বরং এই বিবিধ মানব সম্পর্ক থেকেই রস আহরণ করে সে রসবান হয়ে ওঠে। কবির সেই 'unofficial আটপৌরে সত্তাটিকে পাওয়ার একমাত্র উপায় "ছিন্নপত্রে" তাঁর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্পর্কের লোককে লেখা চিঠিগুলি।

'ছিন্নপত্রে'র একান্ত ব্যক্তিগত অংশগুলি যদিও

কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে, তবুও মানুষ রবীন্দ্রনাথের বিকাশমান ব্যক্তিত্বের কত চলমান ছবি এখানে দেখতে পাওয়া যায়। একদিকে কর্তব্যে অটল রবীন্দ্রনাথ শান্ত হয়ে নিজের কাজ করে যাওয়াকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করছেন,—অন্যদিকে প্রখর অন্তর্গত বেদনে অস্থির হয়ে কামনা করছেন বেদুইন জীবনের "অকৃত-বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা।" অতিথি সৎকারে ব্যতিব্যস্ত, ভদ্রতার খাতিরে অন্যায় কুসুমের প্রতিবাদে অসমর্থ অসহায় রবীন্দ্রনাথের কত কৌতূহলকর চিত্র এখানে, পরিবারবৎসল, সন্তানবৎসল, রবীন্দ্রনাথের অন্তরের মধুর অধীর ব্যাকুলতা, প্রজাবৎসল, জীববৎসল রবীন্দ্রনাথ পশুত্বের নিষ্ঠুরতায় নিরামিষ আহারে কৃতসংকল্প। আত্মবিজ্ঞপ্তিবিরোধী রবীন্দ্রনাথ, সবার উপরে জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ যিনি অসংখ্য অসামঞ্জস্য অস্তিত্বের অসংখ্য বিরোধকে এক দুর্লভ সূক্ষ্ম সূত্রে গ্রথিত করে নিজের রূপদানে সমর্থ,শতবিপর্যয়েও সে জীবনের বীণা পুরোপুরি বেসুরো হয়ে যায় না।

মহৎ কবির কবিতা শুধু নয়, তাঁর জীবনীও বিরাট সাহিত্যিক গবেষণার বস্তু। সেখানে কবির স্বাক্ষরিত সত্য হিসাবে চিঠিগুলির মূল্য অনস্বীকার্য। ছিন্নপত্রের চিঠিগুলি একদিকে যেমন তাঁর কবিত্বের ইতিহাস, অন্যদিকে তেমনই তাঁর ব্যক্তিত্বের মূল্যময় ইঙ্গিত বহন করছে। কবি জীবনীর উপাদান সংগ্রহে তাঁর অন্যান্য চিঠিপত্রের সঙ্গে 'ছিন্নপত্র'ও "জীবনস্মৃতি"র পরিপূরক হিসাবে গণ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র

জ্যোতির্ময়ী দেবী

অদৃশ্য সঙ্কেতে ওরা কহে হে বিরাট
নেমে এসো সিংহাসন হতে
কে বলে সম্রাট।
যুগধর্ম সাহিত্যের বিচার শালায়
ওই ফাঁসী কাঠ
মোরা করেছি নির্মাণ। করিব বিচার তব।
রোহিণীরে বিনাদোষে করিয়াছ বধ
উন্মাদিনী হয় শৈবলিনী
বিষদানে মারিয়াছ কুন্দ কমলিনী
কুন্দনন্দিনীরে—
সবারে করেছে হত্যা ইচ্ছাসনে বসে
তব নিষ্ঠুর লেখনী।
কপালকুণ্ডলা মরে কাপালিক রোষে।
দলনী মরিল বৃথা।
ব্যর্থ হয় মুগ্ধ প্রেম হায় আয়েষার
প্রেমের দাওনি মূল্য ইচ্ছামত
করেছ বিচার!
এ যুগের সাহিত্যের বিচার মন্দিরে
করিব বিচার মোরা তোমার এবারে।

* * *

মৃদু ওষ্ঠ স্মিতহেসে প্রসন্ন আনন
শুনিল কি এ যুগের কণ্ঠ আবাহন?
মৌন ওষ্ঠাধর হতে যেন মোরা শুনিলাম
কহিলে কি কালের কঙ্কণা ওরা
সুখে দুঃখে বেদনায় মরিয়া বাঁচিয়া
লভিল সেদিন পরিণাম।
তবু আজো কেন বাঁচে তারা
তোমাদের মনে
মরণের পার হতে ফিরে ক্ষণে ক্ষণে!
তোমরা লইয়া তবে যাও সব এ যুগের তীরে
গড়িও নূতন করে তাদের প্রতিমা!
দানিও অভয়।
(তোমাদের হাতে আহা! যদি বেঁচে রয়!)
ছাড়িলাম সিংহাসন হের হায় তবু
টানে পাঠকের মন।
অতিক্রম করিয়াছি জানি আমি সাহিত্যের
যুগ কাল সীমা।
অমর হইয়া সেথা রহিব হয়ত।
নাহিবে চূর্ণিতে তারে চক্রের পেষণে
তোমাদের যুগকাল রথ!

তিরিশে জানুআরী

কমলা দেবী

দিনটা ছিল গান্ধীজীর মৃত্যু দিবস—

সকাল থেকেই ভাবছি কোথায় যাই কোথায় যাই, বোনেরাও কেউ নেই সবাই শ্বশুরবাড়ী। রাহুও চলে গেছে বাপের বাড়ী। আমি মানা করেছিলাম, কিন্তু ও কি করবে, যাওয়া আবার শুধু যাওয়া নয়, মা বলবেন নতুন বৌ বাপের বাড়ী যাচ্ছে অন্তত একটা মাসতো থাকবে। ওর বাবার মুখটা দেখলাম বেশ খুশী খুশী—যাই হ'ক বারোক-পুরেই যাব ঠিক করে ফেললাম।

মাকে বললাম, মা যাবে নাকি? যদি যাও ছেড় ঘণ্টার মধ্যে তৈরী হয়ে নিতে হবে, মানে সাড়ে দশটা।

"তোর কি মাথা খারাপ—সৃষ্টি সংসারের কাজ তচনচ হয়ে রয়েছে ছেড় ঘণ্টায় কি হবে, ছেড়টার আগে সব সেরে বেরুতে পারবো না বাবা—।"

"তবে আর কি হবে, তোমার ঠাকুরকে বল, যা রান্না হয়েছে আমাকে দুটি দিয়ে দিতে—

খাওয়া দাওয়া সেরে ক্যামেরাটা খুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

রাস্তা থেকে কিছু লেবু নিয়ে নিলাম। ঠিক সাড়ে বারটায় ওখানে গিয়ে পৌঁছলাম। এর আগে কোনদিন তেমন খেয়াল হয়নি গান্ধীঘাট দেখতে যাবার—সেকেণ্ড গেটটা থেকেই ভারি সুন্দর লাগল, হাঁ। উপযুক্ত জায়গা বটে—সার্থক হয়েছে ওঁর মনের রুচির সঙ্গে, যিনি সারা জীবন শুনিয়ে গেছেন শান্তির বাণী—তাঁর অন্তিম নিবাসের কিছুটা ছড়িয়ে আছে—এখানকার আকাশে বাতাসে।

কত পবিত্র এ বাতাস, কত মাহাত্ম্য এ মাটির।

গিয়ে বেদীতে প্রণাম করলাম, বন্দেমাতরম্—

রাশীকৃত ফুলে ঢাকা বেদী—সকালেই গিয়েছিলেন আমাদের মহামান্য মন্ত্রী মহাশয় মহাশয়ারা—তাঁরাই এই পুষ্প অর্পণ করেছেন। দেখলাম সুন্দর প্যাণ্ডেল করা হয়েছিল—তখন খোলা হচ্ছে।

ঘাটে নেমে গিয়ে জলের ধারে দাঁড়ালাম, মা গঙ্গা এখানটায় একটু অশান্ত রূপ নিয়েছিলেন দেখলাম। ছলাক্ ছলাক্ করে ছোট ছোট ঢেউএর ধাক্কা লাগছে সিঁড়ির গায়ে। বহু লোক এসেছে দল বেঁধে বেঁধে, আমিই কেবল একা। এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে কয়েকখানা ছবি নিলাম, তারপর ডান দিকের ফাঁকা জমিটায় নেমে গেলাম—নতুন নতুন গাছ বসান হয়েছে—ইটবাহারি পাটিল দিয়ে ঘেরা—ওখানেই খানিকক্ষণ বসলাম।

খানিকটা তফাতে দুটি তরুণতরুণী গা ঘেঁসাঘেঁসি করে বসে আছে বেশ হাসিখুশি দুজনে। হঠাৎ দেখি ওরা উঠে গিয়ে আরও একটু দূরে একটা গাছের আড়ালে বসল, বোধহয় ভাবল ওদের কথাবার্তা আমার কানকে ফাঁকি দেবেনা মাত্র এইটুকুর ব্যবধানে।

ডান দিকের একেবারে শেষ সীমানায় দেখানটা অনেক খানি ধস নেমেছে, কাঁটা তারের বেড়'র পাশটায় কুড়ি পঁচিশখানা নৌকা একজায়গায় জড়ো হয়ে জটলা করছে, তার মাঝী মাল্লারা—তাদের জিজ্ঞাসাকরে জানলাম মাছের ব্যবসায়ী তারা—ঘর সংসার পাবে, গুরের ছবি তুলব বলতে খুব খুশি হলো—সার বেঁধে দাঁড়াল নৌকার ওপর।

কিছুক্ষণ পর দেখি একদল মেয়ে এল হৈ হৈ করতে করতে, মনে হল কোন স্কুল কিংবা কলেজের ছাত্রী হবে, খানিকক্ষণ বোসল দলবদ্ধ হয়ে খানিকটা হৈ হুল্লোড় করল, তারপর উঠে একখানা খেয়া নৌকা ডেকে ঝপাঝপ তাতে উঠে পড়ল, দেখলাম কোন পরোয়া নেই—বেশ ঘরওয়াড়।

সেখান থেকে ওরা উঠে চলে গেল সেখানটায় দেখি একচুপড়ি হয়ে বাদামের খোসা পড়ে আছে—

"বাবু যাবেন নাকি ?"

পিছনে তাকিয়ে দেখি একজন মাঝি আমাকে বলছে—

"না মাঝি, তুমি যাও অন্য যাত্রি দেখ—"

"চলেন না বাবু, চলেন না—সেই অবধি ছাখছি একলা বইসাছেন আপনাগোর ঘরা থাকলে যেমনি কইবেন অমনি ফিরবো, ওঠেন বাবু ওঠেন—"

"তুমি দেখছি বাবা ছাড়বেনা—তবে চল—"

মাঝি একগাল হেসে ফেলল।

নৌকা ছাড়ল, আমি বললাম দেখ বেশীদূর যেওনা, কাছাকাছি খানিকটা ঘুরেই ফিরে আসবে।

"আপনি যা বলেন বাবু—"

মাঝিরা ছিল দুজন—ওদের দুটো লেবু দিলাম—আমি একটা ছাড়ালাম -যে আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছিল শুনলাম সেই হ'ল সর্দার। ওদের অনেক গল্প শুনলাম, সর্দারের জীবনের কাহিনী শুনলাম, ছোট বয়সে বাবা মারা গেছে—ঠাকুরদার সঙ্গে নদীতে পাড়ী দিয়েছে বার বছর বয়স থেকে আর এই তিপান্ন বছর বয়স হ'ল। ঘরে সাত ছেলে মেয়ে পরিবার পুতবৌ, দুই নাতী নাতনী। বেটাদের আর একাজে নামতে দেইনি বাবু—জীবন ভোর ঘর ছাড়াই রইতে হয়।

কদিন ঘরে থাকতি পাই বাবু—

অতক্ষণ একা থাকার মাঝিদের সঙ্গ পেয়ে অনেক খানি আনন্দ পেলাম—মার গঙ্গা থেকে ঘাটটা ভারি চমৎকার লাগছিল, দেখতে দেখতে জল যেন কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

বললাম—ও ভাই এবার তোমার নাও ফেরাও—

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘাটে এসে নামলাম—ওদের দাম মিটিয়ে দিয়ে—দেখলাম ওরাও আজকাল বেশ ভদ্রতা-শিখেছে—বলল—"আচ্ছা বাবু নমস্কার—"তখন সবে সোয়াতিনটে—ভাবলাম আর একটু বসি—

—দুজন ভদ্রমহিলা সঙ্গে একটি পনেরো ষোলো বছরের মেয়ে—তারা একটু এদিক ওদিক ঘুরেফিরে ঘাটে এসে একে একে সব সিঁড়িটা নামল, একেবারে জলের ধারে একটা সৈঁতার বসে পড়ল মেয়েটি, ভদ্রমহিলা দুজন হা হা করে উঠলেন—

"বহুল ওখানে বসিস না বসিসনা, এ জায়গাটা ভাল নয় ভীষণ কারেন্ট—একবার পড়লে আর রক্ষে নেই—"

মেয়েটি হি হি করে হেসে উঠল আব্দারের সুরে বলল—

"পড়লেই হ'ল ? চালাকি নাকি ?"

একজন মহিলা বলে উঠলেন—নাঃ এমেয়ের সববিষয় গোয়ারতুমি—কই উঠলি বহুল—অঘটন ঘটতে কতক্ষণ গা—"

ওঁদের ওই আতঙ্কবাণী শুনে আমার মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল—চোখের সামনে ভেসে উঠল কচি কচি দুটি মুখ—

আহা কি সুন্দর ফুটফুটে দুটি মেয়ে লিপি আর লেখা।

—ঠিক মনে নেই বোধ হয়—১৯৫৪, নবেম্বর হবে, আমাদের পাড়ায় নতুনবাড়ী খানায় ভাড়া এলেন এক ভদ্রলোক, কয়েকমাস পরেই স্ত্রী মারা গেলেন। ভদ্রলোককে দেখেছি একেবারে মুষড়ে পড়েছিলেন। ওই ছোট ছোট দুটি মেয়ে লিপি, লেখা, আর বুড়ো মাকে নিয়ে ছিলেন তিনি। একদিন শুনলাম লিপি, লেখা, মামার বাড়ী গেছে ওদের মামার বিয়ে—ওদের মা মারাগেছে তখনও একবছর পূর্ণহয়নি।

সেই মামারবাড়ী এই ব্যারাকপুরে, এই গান্ধীঘাট থেকে শুনেছি খুব কাছেই বাড়ী। মামার বিয়ে আগের দিন হয়ে গেছে। বর কনে আসার অপেক্ষায় সবাই ব্যস্ত, সেই ফাঁকে ছোট ছোট কজন ছেলেমেয়ে মতলব করল, চলনা গঙ্গায় চান করে আসি। বড়দের না জানিয়ে বেরিয়ে পড়ল দলটি, ওদের মধ্যে বয়স এগার বছরের বেশী কেউ ছিলনা। উল্লাসে নাচতে নাচতে সবাই মিলে এসে ঘাটে নামল। ওদিকে বর কনে এসে গেল শঙ্খ-ধ্বনিতে উলুর ধ্বনিতে বাড়ী সরগরম—আর এঁদিকে পিছলে অগাধজলেই ঝুপকরে পড়ে গেল ছ-বছরের লেখা—আঁ আঁ দি-দি—

"লেখা লেখা", আট বছরের লিপি কাঁপিয়ে পড়ল ছোট বোন লেখাকে বাঁচাতে, আহ্নীর বোধ হয় একটিকে নিয়ে আশ মিটতো না তাই কোলে টেনে নিলেন দুটিকেই।

সঙ্গীরা একটু অপেক্ষাকরে যখন দেখল ওরা আর উঠলনা তখন ভয়পেয়ে জলথেকে উঠে পালিয়ে এল ওপরের চাতালে—

বেশখানিকক্ষণ পরে বাড়ীতে খোঁজ খোঁজ রব পড়ল, বাড়ীর আশপাশে খানিকটা খোঁজাখুঁজির পর খেয়াল হ'ল গঙ্গায় যায়নি তো বাচ্চাগুলো—

ঘটনাটা ঘটেছিল প্রায় এগারটায়, বড়রা জানতে পারল বারটায়, তারপর জল তোলপাড় করে এখানকার ব্যারাকের বেশ কজন সাহসী যুবকের সাহায্যে বেলা চারটায় তোলা হল চির নিদ্রায় মগ্ন ফুলের মত ফুট ফুটে দুটি শিশুকে—

বালিগঞ্জের বাসায় ওদের বাবার কাছে আনা হয়েছিল তাই দেখেছিলাম।

সে মুখ দুখানি আজও ভুলতে পারিনি—

দারা শরীর শিউরে উঠল আর একবার—

কখন রোদ পড়ে গেছে খেয়াল করিনি, ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে হু হু করে, জল থেকে তিন চার ধাপ ওপরে বাঁধিকের কোলে কখন বসে পড়েছি মনে নেই, বন্ধুরা চলে গেছে তাও দেখিনি—,

ওপরেও জনসংকুল—অনেক হাল্কা হয়ে গেছে—

আমি উঠে পড়লাম—

কয়েক ঘণ্টা আগে যখন এসেছিলাম মন কত হাল্কা কত উৎসুক ছিল আর এখন যেন ভারি পাথর হয়ে গেছে নিজের দেহটাকেই টেনে তুলতে পারছিনা—

—যাবার আগে আর একবার প্রণাম করলাম পূর্ণ জাহ্নবীর দিকে চেয়ে, আশ্চর্য! আজ আট বছর পরেও দেখতে পেলাম ওই অথৈই জলের ভেতরথেকে ভেসে উঠল পদ্মের মত মুখগুলো লিপি, লেখার, চোখের পাতাটা ভিজে উঠল কেন?

আমার মনতো কোনদিন এমন দুর্বল ছিলনা—।

এর জন্যে বলার কি থাকতে পারে—? দুনিয়ার দরবারে কিসেরি বা অভিযোগ? কিছুই না—

মানুষের বোঝার অগাধ লীলাময়ী পৃথিবীর লীলাখেলা যদি মানুষ বুঝতো—যদি থাকতো কিছু করণীয় তবে হয়তো স্তব্ধ হয়ে যেত ক্ষণেকের তরে পৃথিবী, স্তব্ধ হ'ত সমুদ্র আর বিলীন হয়ে যেত আকাশের রং। কি অপরাধে অপরাধী ওই নিষ্পাপ সুকোমল শিশু দুটি—?

যার ফলে পেলনা জীবনের কোন স্বাদ পেলনা দেখতে প্রকৃতির শোভা। পৃথিবীর আলো।

নিভিয়ে দিল নব-উদ্দীপ্ত প্রদীপের শিখা—

নিষ্ঠুর নিয়তির অমোঘ বিচার বলে—

একখানা কেরি নৌকা যাচ্ছিল একটু দূর দিয়ে, সেই নৌকার কোন মাঝি বোধহয় গেয়ে উঠল, পতিত উদ্ধারিণী গঙ্গে তোমার নাম ছিল প্রচার।

ভারতের শিল্প সংস্কার

শ্রীসোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

শিল্প এবং বাণিজ্যজগতে সুপরিকল্পিত হারে উৎপাদন না করিলে যে কোন মালেরই চাহিদা ও যোগানের সাম্য রক্ষা করা যায় না এবং তাহার ফলে বাজারে অনেক সময় মন্দার সৃষ্টি হয়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের এই যে বৈষম্য তাহাকে রদ করিবার জন্যই শিল্পসংস্কারের প্রয়োজন এবং এই সংস্কারের প্রতি ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় ১৯৩০ সালের মন্দার সময়।

শিল্প সংস্কার বলিতে সহজে বুঝায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যবসা পরিচালন, উৎপাদন পদ্ধতির সংশোধন এবং তাহার নির্দিষ্ট মান নির্ধারণ। ক্ষেত্র বিশেষে কতকগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পসংস্থাকে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহাদের আর্থিক অপচয় বন্ধ করা; অথবা কোন অপ্রয়োজনীয় সংস্থাকে বন্ধ করা; অথবা বিভিন্ন উৎপাদন সংস্থাগুলির মূল্য, উৎপাদন হার এবং বাজার নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একটি বিক্রয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করাও শিল্পসংস্কারের উদ্দেশ্য। তাহা ছাড়া পুরাণ যন্ত্রপাতিকে বাদ দেওয়া,

বাড়তি সম্পত্তিকে বিনষ্ট করা, শ্রমিকের শ্রমনৈপুণ্য বৃদ্ধি এবং শ্রম সংরক্ষণসাধন এবং আনুষঙ্গিক খরচ কমাইয়া শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি করা এবং ঐরূপে তাহার জীবনযাত্রার মান উন্নয়নও শিল্প সংস্কারের সাহায্যে সম্ভব। শিল্পসংস্কারের ফলে আর্থিক এবং বাণিজ্যিক পুনর্গঠনও সম্ভব হয়।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে জেনেভাতে যে অর্থনৈতিক সম্মেলন হয় তাহাতে শিল্প-সংস্কারের বর্ণনা এইরূপে দেওয়া হয়: "বস্তু বা শ্রমের সংরক্ষণ অপচয়ের জন্য যে কৌশল এবং প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন, শিল্প-সংস্কার তাহাই নির্ণয় করে। শিল্প সংস্কার বলিতে বুঝায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ, কাঁচামাল ও উৎপাদন বস্তুর মান নির্ধারণ, উৎপাদন ব্যবস্থার সরলীকরণ এবং যানবাহন ও বাজার ব্যবস্থার উন্নতিসাধন। ("Rationalization refers to all those methods of technique and of organization designed to secure the minimum waste of either material or effort. They include scientific management, standerdization of materials and products, simplification of processes and improvements in the systems of transport and market";)

শিল্প-সংস্কারের যে প্রতিক্রিয়া শ্রমিকের উপর আমরা দেখি তাহা তিন প্রকারের: (১) জীবিকার উপর (২) মজুরীর উপর এবং ৩ শ্রমের উপর।

আমরা জানি যে শিল্প-সংস্কারের একটি উদ্দেশ্য উৎপাদন মূল্য হ্রাস করা। উৎপাদন মূল্য হ্রাস করিতে গেলে শ্রমিকের মজুরী কমানো প্রয়োজন কারণ শ্রমিকের মজুরী উৎপাদন মূল্যের অন্তর্ভুক্ত। শ্রমিকের মজুরী হ্রাস আবার দুই প্রকারে সম্ভব যেমন (১) শ্রমনৈপুণ্য বর্ধিত করিয়া কিছু শ্রমিক ছাঁটাই করিয়া এবং (২) প্রত্যক্ষভাবে মজুরী হ্রাস করিয়া। কিন্তু মজুরীর হ্রাস প্রত্যক্ষভাবে করা মোটেই সম্ভব নয় কারণ তাহাতে শ্রমিক মালিকের মধ্যে সংঘাতের পরিবর্তে অসন্তোষের সূচনা হয়। এই কারণে শ্রম-নৈপুণ্য বর্ধিত করিয়া (উন্নততর যন্ত্রপাতির সাহায্যে) প্রচলিত উৎপাদনের হার বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয় এবং উৎপাদনের হার বর্ধিত হইলে উৎপাদন মূল্যও কমিয়া যায়।

বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রপাতির বর্ধিত হারে ব্যবহার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। উৎপাদন ক্ষমতা বর্ধিত হইলে পড়তা-মূল্য কমিয়া যায় এবং মজুরী বৃদ্ধি করে। বর্ধিত হারে মজুরী ক্রয় ক্ষমতা ও চাহিদা বর্ধিত করে এবং চাহিদা বৃদ্ধির ফলে এইরূপে উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অতএব আমরা দেখিতে পাই যে পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্তে আমরা যদি বিদ্যুৎচালিত নূতন যন্ত্রপাতির ব্যবহার করি তবে তাহাতে উৎপাদনও বৃদ্ধি পায় এবং শ্রমিকের মজুরীর হারও বর্ধিত হইয়া তাহার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে।

কিন্তু যদি শিল্পজাত কোনও বস্তুর চাহিদা বিশেষভাবে প্রয়োজনমত পরিবর্তনশীল না হয় (elastic) তবে শিল্প-সংস্কার অতি অল্পকালের মধ্যেই বেকার সমস্যার সৃষ্টি করে। অবশ্য এই বেকার সমস্যা তীব্রভাবে অনুভূত নাও হইতে পারে কারণ শিল্প সংস্কারের মধ্যেই কতকগুলি মূল-বস্তুর (capital goods) যেমন যন্ত্রপাতি—চাহিদা নিহিত থাকে এবং শ্রমিক ঐ মূলবস্তুর উৎপাদনে নিযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু ভারতের বস্ত্র শিল্প বা পাট শিল্পের সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে এই যুক্তি প্রযোজ্য নয়। ভারতের ক্ষেত্রে এই ভারসাম্য রক্ষিত হয় নাই কারণ সংস্কারের প্রয়োজনীয় মূলবস্তু বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী করা হইয়াছে।

নিয়োগের (employment) ক্ষেত্রে সাম্য রক্ষা করা যাইবে না বলিয়া ভারতবর্ষ যে তাহার শিল্প সংস্কার মোটেই করিবে না এই যুক্তি মোটেই সমর্থ-যোগ্য নয়। ভারতের আজ শিল্প সংস্কারের বিশেষভাবে প্রয়োজন এবং এই সংস্কারের উপযোগী যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানাও আজ এদেশে গড়িয়া তুলিতে হইবে। যদি শিল্প সংস্কারের সহিত সমহারে মূলবস্তু উৎপাদন করা যায় তবে আর আমাদের সংস্কারজনিত বেকার সমস্যার আশঙ্কা থাকে না। ইহা ছাড়া আমাদের আরও মনে রাখা প্রয়োজন যে ভারতীয় কুটীরজাত শিল্পের অনিয়ন্ত্রিত সংস্কারের প্রতিক্রিয়া তাঁত শিল্পের উপর এবং সেই হেতু গ্রাম্য নিয়োগের উপরও দেখা দিতে পারে যদিও তাহা আমাদের বর্তমান অর্থনীতির পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে। কিন্তু ভারতবর্ষে যদি সুনিয়ন্ত্রিত-ভাবে শিল্প সংস্কার করা যায় তবে অনায়াসেই নূতন নূতন কর্মের সংস্থান হয়। আধুনিক ব্যবস্থা যদি আমরা অবলম্বন না করি তবে কোনকালেই আমাদের জাতীয় উন্নতি হইবে না। উন্নতি বলিতে আমরা বুঝি অপেক্ষাকৃত অল্পপড়তা-

মূল্যে অধিকতর উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদন এবং তাহার ফলে ঐ দ্রব্যের বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি এবং ইহাতে অধিকতর কর্মের সংস্থান।

ভারতীয় তুলাজাত শিল্প সংস্কার হইলে যে বেকার সমস্যার উদ্ভব হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হয় তাহা অতিরঞ্জিত কারণ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য বর্ধমান জনসংখ্যা এবং সেই হেতু ক্রমাগত বেকার যুবকের সংখ্যা বৃদ্ধি এই উপলক্ষ্যে বিবেচনা করা হয় নাই। কিন্তু আমাদের এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে যুদ্ধের সময় ও তাহার পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্র (U. K.), জার্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রসমূহে যুদ্ধজনিত কারণে যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ভারতকে তাহার বিদেশী বাজার রক্ষিত না করিয়া কেবল রক্ষা করিবার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার করিতে হইবে। তাহা যদি আমরা না করি তবে বিদেশী বাজার আমাদের হাতছাড়া হইবে এবং ফলে আমাদের দেশে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হইবে। ভারতীয় তুলাজাত শিল্পকে কেবলমাত্র আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে নিযুক্ত করিলেই তাহাকে রক্ষা করা যাইবে না। কারণ হস্তচালিত তাঁতশিল্পের প্রসারও আমাদের মধ্যে ক্রমশঃ বর্ধিত হইবে।

ভারতের চটকল শিল্পের ক্ষেত্রেও তুলাজাত শিল্পের যুক্তি প্রযোজ্য। আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং শিল্প কৌশল এবং সম্ভাবনে পাট সহজলভ্য হেতু পাকিস্থানে চটকল শিল্পের উন্নতির বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং এই কারণেই ভারতের চটকল (Jute Mill) শিল্পের সংস্কার আজ অপরিহার্য। তাহা ছাড়া জাপান, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও এই শিল্পের অগ্রগতি আমাদের দেশে শিল্প সংস্কারের যেন বাধ্যতামূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। চটকল শিল্পের সংস্কার হইলে যাহারা বেকার বা উদ্বৃত্ত হইবেন তাহাদিগকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বহু অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় চাকুরী দেওয়া যাইবে।

শিল্পসংস্কারের ফলে আমাদের দেশে উদ্বৃত্ত বেকারদের সহ বেশী সংখ্যক সম্ভব কর্মে নিয়োগ করিতে হইবে। তাহা ছাড়া যাহারা নিজেদের পেশায় চাকুরী না পাইবেন তাহাদিকে পুনরায় রাষ্ট্রের সহিত সংযোগিতা করিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং যেখানে চাকুরী বা শিক্ষাদান সম্ভব হইবে না সেখানে বেকারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

শিল্প সংস্কারের ব্যাপারে শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধির প্রয়োজন। শ্রমিককে যে সংস্কার জনিত বাড়তি মজুরী দেওয়া যায় তাহাও সংস্কারের ফলে উৎপাদনজনিত যে বাড়তি মুনাফা হয় তাহার অনুপাতে বিশেষভাবে বর্ধিত হয় না। শিল্পপতি অবশ্য এই বলিয়া অভিযোগ করিতে পারেন যে যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণের ফলে শ্রমিকের অতিরিক্ত পরিশ্রম হয় না এবং সেই হেতু তাহার বাড়তি মজুরী পাওয়ার প্রশ্নও উঠিতে পারে না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শ্রমিকের কর্মে মনোবিনিবেশের উদ্দেশ্যে শিল্পসংস্কারের ফলে মজুরীর হার বর্ধিত করাই বিধেয়।

শিল্প-সংস্কারের সার্থকতা আনিতে গেলে প্রয়োজন সংস্কার-জনিত বর্ধিত আয়ের সঠিক বণ্টন (fair distribution) আমাদের দেশের শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে। শিল্প সংস্কারের প্রকৃত অর্থ উৎপাদন-জনিত (শ্রম, কাঁচামাল, বিদ্যুৎশক্তি) ব্যাপারে খরচ কমাইয়া প্রতিষ্ঠানের খরচ কমান এবং শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি। কিন্তু ভারতবর্ষে শিল্প সংস্কারের নামে কেবল যন্ত্রপাতি বদল করাই হয়। অথচ ভারতে আজ জনসংখ্যা যে হারে বর্ধিত হইতেছে এবং বেকার সমস্যা ভীষণ আকারধারণ করিতেছে তাহাতে ভূমির উপর চাপ কমাইয়া শিল্প মারফৎ লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা প্রয়োজন। এই অতিরিক্ত নিয়োগের ব্যবস্থা পুরাতন কলকব্জা ও পদ্ধতির দ্বারা মোটেই সম্ভব নয়—বাড়তি কর্মসংস্থান করিতে গেলে প্রয়োজন দেশের শিল্প সংস্কার। পাশ্চাত্যের সহিত প্রগতির সাম্য রক্ষা করিতে গেলে এবং দেশের বেকার সমস্যার আশু সমাধান করিতে গেলে সরকারী সংযোগিতায় ভারতের শিল্প সংস্কারই যে বিশেষভাবে সহায়ক হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

হাতছানি

শেখরচন্দ্র সেনগুপ্ত

বিরাট ট্রেনটি এগিয়ে চলেছে হুঁসিয়ে হুঁসিয়ে। যেন একটু দ্বিধা ভঙ্গীতে। জানলা দিয়ে দেখলে মনে হয়, এই পৃথিবীতে বুঝি একমাত্র এইটাই মুখর। বিলাসপুরের উপত্যকাকে কে যেন গাঢ় কালো তুলিতে এঁকে তুলেছে অতি সন্তর্পণে। কিছুক্ষণ আগেও ওটা ধূসর ছিল। ঠোস ঠোস ক'রে লড়াই ক'রে চলেছিল উন্মত্ত বাতাসের সাথে। সাদা বালুর রাস্তা, ম্লান রঙের মেসকুইট আর নন্দার ঝোপ, আরও হালকা ধরণের ছোট খাটো ঝোপ ঝাড়—সমস্ত কিছুই যেন হাঁপানি রুগির বুকের মতো উঠছিল নামছিল। কিন্তু এখনকার আকাশে সেই প্রত্যাশা নেই। স্তব্ধ পাথরে গড়া প্রাগৈতিহাসিক চেতনা নিয়ে ওটা এখন নিথর। বাতাস নেই। দূরের গাছগুলো হারিয়ে গেছে। কিছুই নেই। শুধু জমাট বাঁধা অন্ধকার।

বিরাট ট্রেনটার একটি নির্দিষ্ট কামরায় তিনটি প্রাণী। দুটি পুরুষ এবং একটি যুবতী। আর কেউ নেই। হয়তো রিজার্ভ করা হয়েছে ওদের জন্য। ওরা নির্বাক। আশ্চর্য রকম স্তব্ধ। বিশ্বাস হ'তে চায়না, কোন মানুষ, এ রকম পরিবেশে মৌনতার জাল বুনে চলতে পারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

নারীটিকে প্রথম দর্শনে তেমন সুন্দরী বলে মনে না হওয়াই স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক শীর্ণ। হাতের রগগুলো ভয়ানক ভাবে প্রকটিত। শ্বাস নেবার সাথে সাথে গলার দু' পাশে কালো শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠতে থাকে। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করলে কেমন যেন একটু মোহগ্রস্ত হ'য়ে পড়াও আশ্চর্যের হবে না। কারণ, ওর চোখ দুটোতে একটা দীপ্তি। ম্লান স্নিগ্ধ চাঁদের যে দীপ্তি সেই দীপ্তি! ঠোঁট দুটোতে অস্বাভাবিক রক্তিমতা। কিন্তু তাতে চটকদারীর বালাই নেই একটুও। তাই সহানুভূতি জাগা এমন কিছু নয়। গায়ে তার নীল কাশ্মীরী কাপড়ের সালোয়ার-পাঞ্জাবী। কোমরে চকচকে বেলটের বাঁধনো। আর তাতে কয়েকটি সুন্দর রূপোর বোতাম চিকচিক করছে। পোশাকের আভিজাত্যে আর দৃষ্টির নম্রদয়তায় বেশ একটা মর্যাদা পুরাধাত্রার পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ওর নাম কৃষ্ণা কাপুর। ভ্রাইভার পশুপতি কাপুরের একমাত্র মেয়ে।

সুদূর চণ্ডিগড় থেকে রুটি আর জলের সন্ধানে আসানসোলে এসে পৌঁছেছিল পশুপতি কাপুর। তারপর কুলটী, বার্ণপুর আর, ধানবাদ লাইনে সোহা লক্কর বোঝাই ক'রে তার ট্রাক ছুটে চলতো উল্কার গতিতে। সেই উল্কার একদিন পতন হলো। দেখী বোতলটা ছিটকে পড়লো হাতথেকে। বিরাট বাদশাহী মেস্কাজের বট গাছটার সাথে সংঘর্ষ হলো প্রচণ্ড। নিমেষে ষ্টিয়ারিংটা ভেঙ্গে ঢুকে গেল বুকের ভিতর খানিকটা। গাড়ীটা ঘায়ে গর্জনে, মুখ থুবড়ে অদ্ভুত ভাবে জাঁকড়ে রইলো গাছটাকে। সামান্য কয়েক ফোঁটা রক্ত বুঝি করেছিলো! বাকিটা বের হবার সুযোগ পায়নি। জমাট বেঁধে গেছে পশুপতির বুক, বাদশাহী গাছ আর ভাঙ্গা ষ্টিয়ারিং-এর খোপে খোপে।

কৃষ্ণা শুনলো। কাঁদলো সামান্য। তার জানা ছিল, এমন কিছু একটা সম্ভব। আরও জানতো, পশুপতি কাপুরের রক্তের উন্মাদনা তারও শিরায়—শিরায় বইছে। তাই সাপের মতো ঢেউ তার যৌবন। সমস্ত বিষণ্ণতা আর রিক্ততাকে তুচ্ছ ক'রে নেমে এলো পথে। তারপর অনেক ঢেউ আর পাক। সেই ঢেউ আর পাক আর

ঢেউ—এরই ঘূর্ণিচক্রে ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে পুরীর সমুদ্রতীরে।

নীল সমুদ্র তখন তার দৃষ্টিতে ক্রমশঃ রঙিন হয়ে উঠেছে আঠারো পাঞ্জাবী তরুণীর হৃদ্‌পিণ্ডটা জ্বলতে জ্বলতে প্রায় অঙ্গার হতে চলেছে। সাপের যতটুকু বিষ সঞ্চিত ছিল, তার সবটুকুই ঢেলে দিয়েছে এখানে সেখানে, উঁচুতে নীচুতে। সর্বাঙ্গে তখন তার এক আশ্চর্য শিথিলতা। ভাবলেশহীন দৃষ্টি। সামনে সমুদ্র। চুল তার উড়ছে। ঠোঁট তার কাঁপছে। তবু স্বপ্ন সে দেখছে না।

স্বপ্ন বোধহয় দেখছেনা এখনও। পাঞ্জাবী দুহিতা তার সম্বল হারিয়ে ফেলেছে অকালে। তাই এখন এই মাত্র আঠারোর বাঁধনেই প্রথম দর্শনে তেমন সুন্দরী বলে মনে হয় না। অস্বাভাবিক শীর্ণা। হাতের রগ গুলি অস্বাভাবিক ভাবে প্রকটিত। শ্বাস নেবার সাথে সাথে গলার দুপাশের রগগুলো ফুলে ফুলে উঠতে থাকে। কিন্তু—কিন্তু, অনেকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করলে কিছুটা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়াও আশ্চর্যের হবেনা।…কৃষ্ণা স্পষ্টই বুঝতে পারে, ওর হৃদ্‌পিণ্ডে কারা যেন এক বিরাট আন্দোলন পরিচালনা করে চলেছে। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, অনাচার আর অত্যাচারের ফলে ওদের জন্ম। যে-কোন মুহূর্তে এক রক্তাক্ত বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যেতে পারে।

সেই আসন্ন বিপ্লবকে প্রতিরোধ করবার ক্ষীণ প্রচেষ্টায় কৃষ্ণা কাপুর পুরীর "সু-হোটেল"-এ গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। আর সেখানেই সাক্ষাৎ হলো, এই দু'জন স্বগোত্রীয় যুবকের সাথে—কৃষ্ণ মোহন আপত্তি আর, কৃষ্ণেন্দু দাশগুপ্ত।

কৃষ্ণা কাপুর শুনলো, এবং অনুভব করতে পারলো,—এরা দু' জন ঠিক তারই মতো ঘুণাক্ষরের রক্তাক্ত বিপ্লবের আশঙ্কায় এখানে ছুটে এসেছে। ওদের চোখে মুখেও সেই পাণ্ডুরতা! সেই ভাবলেশহীন স্তব্ধতা!

কৃষ্ণা কাপুর একটা স্বস্তি অনুভব করতে পেরেছিল ওদের দেখে। নির্বিঘ্নে হাত বাড়িয়ে দিল। তিন প্রাণ এক হয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে আশ্রয় নিলো।

পিছনের পৃথিবীর খবরটা যে ঠিক এখন কি তা ওরা কেউ জানতো না।

জানতে চেষ্টাও করত না। সকলেরই দৃষ্টি ছিল সামনের দিকে প্রসারিত। ঢেউগুলো কেনিল সমুদ্রের ডাল-পালাগুলো ক্রমাগত ছুটে আসছিল তাদেরই দিকে। ফেনায়িত শুভ্রতার মাঝে সময় সময় ওরা একটু রক্তাভ ছটাও দেখতে পেত। আর তাই দেখতে পেলেই চমকে উঠতো একসাথে। পরস্পরের মুখের দিকে চাইতো ত্রস্তার্ত দৃষ্টিতে। কিন্তু কোন রা' নেই। দু'টি যুবক এবং একটি যুবতী। সেখানে আর কেউ নেই। তবু ওরা স্তব্ধ। আশ্চর্য রকম নিথর। বিশ্বাস হতে চায়না, কোন মানুষ এ-রকম পরিবেশে মৌনতার জাল বুনে চলতে পারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

ওদের দৃষ্টির সামনে দিগন্ত কখনও সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে; কখনও হয় প্রসারিত। সময় সময় ঢেউগুলো সূক্ষ্মাগ্র পাহাড়ের চূড়ার মতো ঊর্ধ্বে উদ্যত হয়ে উঠছে। নিষ্ঠুর তীব্রতায় ছুটে আসছে। এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে প্রাণপণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত যোদ্ধার মতো ওদের পদ চুম্বন করেই মিলিয়ে যাচ্ছে সাদা বালুর রাজত্বে।

যখন আপ্রাণ সংগ্রাম করা সত্ত্বেও কোনও সৈন্যদল পরাজিত হয়, কিংবা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝড়ের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে কূলে এসে নৌকা ডুবে যায়, তখন নিষ্ঠীকতম এবং অত্যন্ত সহনশীল মানুষের মনেও যে-ধরণের গভীর ঔদাসীন্য ও হতাশার সৃষ্টি হয়, কৃষ্ণমোহন আপত্তি ঠিক সেই ধরণের ঔদাসীন্য আর হতাশায় অভিভূত হ'য়ে মড়ার মতো হ'য়ে শুয়ে পড়েছিল বালুবেলার উপর।

তারও চারপাশে তখন অন্ধকার জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। সমুদ্রের গর্জন হ'য়ে উঠেছে আরও তীব্র, আরও তীক্ষ্ণ। বিবর্ণ উত্তর আকাশে একফালি চাঁদের আলোটা স্তিমিত। কিন্তু ওর রূপই শতধা বিভক্ত হ'য়ে সমুদ্রের কত তোলপাড়ের সৃষ্টি করেছে! (যদিও কৃষ্ণমোহন আপত্তি শুয়ে শুয়ে তা দেখতে পারছে না; শুধু অনুভব করতে পারছে)।

কৃষ্ণমোহন পরাজিত।

পাথরের হাড়গুলোই আজ শুধু হাতিয়ে হাতিয়ে গোনা যায়। এতদিনে কি এর সমস্তগুলিই কাজরা হয়ে যায় নি? কত তার বয়স? অনেক অনেক। বহু বহু বছর সে এই পৃথিবীতে বেঁচে আছে। অনেক দেখেছে। আর

দেখতে চায়না। এবার বিদায় নেবার পালা। স্বপ্নেই যুগে আপত্তি যে কত ছুটে বেরিয়েছে! মাসের পর মাস। সাদা চামড়ার লোকদের চোখে ধুলো দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছে। কখনও পাহাড়-কন্দরে বেগে নেমে এসেছে নাচতে। সমুদ্রের গর্ভ শুকতে শুকতে অনাহারে কাটিয়ে দিয়েছে দিনের পর দিন। জনাকতক ভক্ত পেলেই হাত পা ছুঁড়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করেছে। নানা ভঙ্গিতে সে-ভাষা উচ্চারিত। ভালোময়ী তপ্ত কণ্ঠস্বর। নিতান্ত সাধারণও আবেগের জোয়ারে অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক আর যুক্তিনিষ্ঠ বলে মনে হয়েছে। ঘনকা বাতাসের মতো হাততালির বৃষ্টি এসে পড়েছে তার ঘাড়ে, পিঠে, বুকে-মাথায়। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি তুলতে তুলতে রক্তাক্ত দেহ নিয়ে লুটিয়ে পড়েছে বহুবার। বহুবার পেলের দরজা খুলেছে আর বন্ধ হয়েছে। কিন্তু···কিন্তু···।

কৃষ্ণমোহন আপত্তির চোখ দুটো জানা করছিল সেই বিবর্ণ চাঁদের দিকে তাকিয়ে। একটা প্রতিহিংসায় ওটাকে হাঁচড়ে-কাচড়ে টেনে নামিয়ে আনতে ইচ্ছা হয়। ঘৃণায় থুথু ছিটিয়ে দিতে ইচ্ছা হয় ঐ সমুদ্রের বুকে। পৃথিবীটা গোল আর জগৎটা শূন্য! তাই সোজা পথে চললে ঘুরে ফিরে সেই একই পরিণতি! ক্ষুব্ধিত—রক্তাক্ত বিস্ময়ের আপত্তি। এই জানা, এই ঘৃণা। কৃষ্ণমোহন আপত্তি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতে পারছিল। ওর লম্বাটে ধারালো চকচকে মুখখানা ক্রমশঃ বিকৃত হয়ে আসছিল। কিছু একটা ক'রে হয়তো বসতো, অথবা চিৎকার ক'রে উঠতো সহসা। কিন্তু তা হলো না। কারণ, তার আগেই কৃষ্ণা কাপুর নিচু হ'য়ে ওর কপালে তার হাতখানা এনে রাখে। ঘিম হ'য়ে আসে আপত্তির সমস্ত বিদ্রোহী চেতনা। চোখ দুটো বুঁজে আসে আবেশে। এ' স্পর্শ সে পায়নি। কোনদিনই পায়নি।

'···এমন স্পর্শ যদি আমাকে দিলেই, এমন শান্ত যদি আমাকে করলেই, এমন গভীর প্রশান্তিতে যদি ভরেই উঠলাম,—তা' হলে হে সমুদ্রের উন্মাদ দেবতা, আমি তোমার দিব্যি দিয়ে প্রশ্ন করছি,—কেন কেন তা' আমার কেলে আসা দিনগুলির এক মুহূর্তকেও আলোকিত করেনি? কেন-কেন-কেন?···'

কৃষ্ণা কাপুরের ও-পাশে আর একটি নীলদেহ। পুরীর সমুদ্র তারও পদচুম্বন করে চলেছে অহরহ। বাবুইয়ের বাসার মতো কুঁকড়ো হ'য়ে এসেছে দেহটা। গালের উপর হাত দিয়ে যতদূর সাধ্য নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে যেন। তবু, ওরই মধ্যে মুখখানা খুঁজে নিলে চমকে উঠতে হয়। তাতে অনেক প্রতিশ্রুতি আঁকা ছিল। সূক্ষ্ম গোপ রেখা। বুদ্ধি-দীপ্ত। রোড়া ভ্রূর নীচে যে দৃষ্টি, তাতে কবিত্বের ছোঁয়াচ লেগে আছে বহু বছর ধরে। বুঝা যায়, স্বপ্ন ও দেখছিল। অনেক-অনেক স্বপ্নের জালই বুনে চলতো কৃষ্ণেন্দু দাশগুপ্ত। কিন্তু সেই স্বপ্নের দোঁয়াটে আকাশ কোনদিন সূর্যের মুখ দেখতে পেলো না।

স্কুলের চৌকাঠে পা দিয়েই কবিতা ধরেছিল দাশগুপ্ত। কলেজে গিয়ে এলো ছোটগল্পের নেশা। তারপর, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ পত্র পেয়েই উপন্যাসে পর্যন্ত হাত দিল। কিন্তু, রাতের পর রাত কাবার ক'রে দেওয়া সেই ছেঁড়া পাতাগুলোর মর্যাদা কেউ দিল না। ভাঙা জানলা দিয়ে ঘরকা বাতাস আসে। উড়িয়ে ঘরময় ক'রে দেয় অসংলগ্ন পাতাগুলোকে। আধপোড়া সিগারেটের তামাক আর ছাইয়ের গাদায় মুখ গুঁজে তার স্বপ্নের রাজত্বে জেগে থাকে কৃষ্ণেন্দু। তবু, কেউ ছাপলো না। কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনের পাতায় সামান্য একটু চমকের সৃষ্টি করতে পেরেছিল, এই মাত্র। না হলে, শ'-এর মতো মনোবল দাশগুপ্তের কোনদিনই নেই। তাই গণ্ডীর বাইরে বের হবার সুযোগ সে আর পায়নি। সুযোগের অপেক্ষায় বসে থেকেছে। নিজ সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে নি। তাই স্বপ্ন দেখতে দেখতেই ফুরিয়ে গেল সব। ছেঁড়া পাতা উড়লো। পোড়া ছাই আর তামাকে মাখামাখি হ'য়ে বিবর্ণ ক'রে তুললো শিশু মুখ-খানাকে। তারপর, সহসা এক শুমোট সন্ধ্যায় সে প্রত্যক্ষ করতে পারলো, অনুভব করতে পারলো—তার রক্ত-শিরায় বিদ্রোহী প্রচণ্ডতা। কয়েক ঝলক রক্তে সদ্য সমাপ্ত এক উপন্যাসকে নূতন সম্মানে সম্মানিত ক'রে দিয়ে গেল। নিজেকে কীটসের মর্যাদায় ছুঁড়ে দিয়ে চোখ বুঁজতে চেষ্টা করলো কৃষ্ণেন্দু। ছাত্ররা আর বন্ধুরা এলো। ওরা ওকে ভালোবাসতো; শ্রদ্ধাও করতো।

তাই একদিন ওদেরই সমবেত প্রচেষ্টায় সে এসে আশ্রয় নিতে পারলো পুরীর এই 'ব্লু-হোটেলে।'

আপত্তির ঘামে ভেজা চকচকে কপালের উপর কৃষ্ণার হিম স্পর্শ। কৃষ্ণেন্দু কিছুটা চঞ্চলতা অনুভব করলো। চোখ দুটো জ্বালা ক'রে উঠলো সহসা। চোখ বুজে সে যন্ত্রণা হজম করবার চেষ্টা করলো কিছুক্ষণ। সমুদ্র দেখতে সে এসেছে, সমুদ্রই দেখবে। আরো কবিতা, আরো গল্প। তারপর কয়েক ঘণ্টা পরে তার একটি সোনালী নাম চক চক ক'রে বেড়াবে পাতায় পাতায়। বিস্ময়ে আপ্লুত হ'য়ে যাবেন ভাবীকাল।

রাত্রের সমুদ্রটা ভয়ঙ্কর। প্লেটের মত রঙ। কিন্তু দিনের শুরুতেই ওটা আবার খোলস পাল্টাবে। মরকতের মতো সবুজ হ'য়ে আসবে যেন। গায়ে রেখা দিয়ে আঁকা-বাঁকা রেখা, আর ফেনাগুলোকে দেখাবে যেন ভেঙেপড়া তুষারের স্তূপ।

ম্লান আলোয় তিনজনকেই আবছা রহস্যময় দেখাতো। ওরা সমুদ্রের ধারে আসতো দু'বার। একবার দিনের প্রারম্ভে। আর একবার এই দিনান্তে। বাকী সময়টা কাটিয়ে দিতে "ব্লু হোটেলে"র আওতায়।

আপত্তি তার ঘরের সাদা দেয়ালটার গায়ে কি যেন খুঁজে বেড়াত। অনেক কিছু যেন আঁকা রয়েছে ওখানে। সাফল্য আর ব্যর্থতা, আক্রমণ আর পলায়ন, গুপ্ত হত্যা আর শেলে গমন—সমস্ত কিছুই ছায়া ছবির মতো ভেসে উঠছে দেয়ালের গায়ে একের পর এক।

কৃষ্ণা কাপুর উল দিয়ে সোয়েটার বুনে চলতো সেই সময়। অনেক সময় মনোমুগ্ধকর টেবিল কুথও সেলাই করতো ঝুঁকে পড়ে। লতা-পাতা, ফুলে-ফলে ভরা বিচিত্র সমস্ত নক্সা। সৌন্দর্য বিলাসীরা ভালো পয়সা দিয়ে নিয়ে যায় ও গুলোকে।

—"আমার হাতের কাজ দিল্লীতে একজন উপমন্ত্রী কিনে নিয়ে গেছেন তাঁর টেবিল সাজানোর জন্য।"

ব্লু হোটেলের মোটা সমর্থপুরী কি-টাকে ঘরে মধ্যে মধ্যে গল্প শুনায় কৃষ্ণা কাপুর।

—"কত টাকা পেলেন?"

—টাকা আমি চাইনি; জোর ক'রে দিয়ে গেলেন কিছু।"—ঠোঁট উল্টিয়ে জবাব দিত কাপুর।

—"কত?"

—"পাঁচ শ।"

—"পাঁচ শ!"

সমর্থপুরী কি-র ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে আসতো অনেকটা।

সুযোগ বুঝে মিস্ কাপুর আরো চেপে ধরতো তাকে। তারপর শুরু হ'য়ে যেত তার গল্প। আষাঢ়ের নালার মতো তার গতি—উচ্ছৃঙ্খলতা। ভারতীয় নারীর গর্ব নাকি সে! স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রতীক। কত বড় বড় কার্মের সেরা সুন্দরী 'সেলস্ গার্ল' হয়ে কাজ করেছে বছরের পর বছর। তার রূপের আভায় আর কথার চাতুর্যে কোম্পানী লাভে ফেঁপে উঠেছে। আরও নতুন নতুন জায়গা থেকে ডাক এসেছে। কোন বুকে কোপও খেয়েছে। বোম্বের কোন এক বিখ্যাত বেগমের পারসোন্যাল এসিসট্যাণ্ট ছিল সেবা তিন বছর। তারপর! তারপর, কিন্তু.....

তারপরের খবর বলতে আর প্রবৃত্তি হতো না কৃষ্ণা কাপুরের।

একবার আড় চোখে তাকিয়ে নিতো সমর্থপুরী কির দিকে। কোলা ব্যাঙের মত হাঁ করছে গিলছে যেন সব। কৃষ্ণা কাপুর ক্ষুণ্ণ হতো। তার জীবন—নাটোর এইটুকুই রচিত হ'য়ে থাক। আর নয়। বাকী দিকটা থাক অন্ধকারে। সেখানে আলো ফেলতে ভয় হয়। কি এক ভয়ানক বিভীষিকা গ্রাস করতে ছুটে আসবে তখন। প্রাণপণে চিৎকার ক'রে উঠতে ইচ্ছা হয় তখন।....

কৃষ্ণা কাপুরের মনে হচ্ছে, এক জায়গায় সে বেশী দিন আবদ্ধ থাকতে পারে না। হাঁপিয়ে উঠে মন। নূতনের হাতছানি দেখতে পায়।

অমন ভাব হয় কৃষ্ণমোহন আপত্তিরও। সমস্ত জীবন স্থান থেকে স্থানান্তরে ছুটে বেরিয়েছে। এখন থেমে পড়া তাই আর তার পক্ষে—সম্ভব নয়।

ঘাসগুপ্ত কিন্তু স্থিতিশীল। তবে কেউ ওকে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইলে, প্রতিবাদ সে করবে না। সব কিছুই যেন তার পরিচিত। একান্ত ঘরোয়া।

তিনটি মাস।

এই দীর্ঘ সময় দুটি যুবক আর একটি যুবতী পুরীর

সমুদ্রের ধারে ধারে হেঁটে বেড়িয়েছে। সকালে আর সন্ধ্যায়। নরম বিজ্ঞা বালুর উপর কত অগভীর চিহ্ন এঁকে দিয়েছে নিত্য। কত ঢেউ গুণেছে। কত দিবি। কেটেছে সেই মহাশক্তির নামে।

সমুদ্র-স্নাত 'ব্লু-হোটেল'-এ ওরা যখন তিনজনে এসে উঠেছিল, তখন কেউ কাউকে চিনতনা। কিন্তু সমুদ্র যে কখন তাদের বিচ্ছিন্ন ধারণা গুলোকে সযত্ন মাকড়সার জাল দিয়ে বুনে ফেলেছে, তা ওরা টেরও পায়নি। একটা অনুভূতি ইক্ষ থেকে উক্ষতর হ'য়ে উঠছিল। দুটি যুবক এবং একটি যুবতী। এক আশ্চর্য আলোয় অন্তর্হিত হ'য়ে ওরা পরস্পর মিলে আর একটা নূতন জগৎ সৃষ্টি করতে চাইলো। এখানে কোন ভাবপ্রকাশের বাচালতা নেই। নিছক স্তব্ধতা। মহাশূন্যতা। সেই মহাশূন্যতার মধ্যেই ওরা প্রতিনিয়ত অনুভব করতে পারতো, তারা পরস্পরের নিকট আত্মীয়। বন্ধু। সে বন্ধুত্বের বাঁধন এক বিচিত্র লৌহ বাঁধন—সাধারণ জীবনে এ বস্তু কোথাও দেখা যায় না।

কৃষ্ণমোহন আপত্তি আর কৃষ্ণেন্দু দাশগুপ্ত—যেন দুটো পৃথক স্রোতধারা। কিন্তু ওদের মধ্যে যে যোগসূত্রটা এতদিন বর্তমান ছিল, তা যেন নিপুণ হাতে কেটে দিলো কৃষ্ণা কাপুর। পৃথক হলেও, পরস্পরের সান্নিধ্য অনুভব করতে শিখলো ওরা। মানব বিদ্বেষের ভয়ঙ্কর ভাবটা আস্তে আস্তে কেটে যেতে লাগলো সমুদ্রের সতেজ স্পর্শ পেয়ে পেয়ে।

একদিন দেয়ালে টাঙ্গানো আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে অস্পষ্ট স্বরে চিৎকার ক'রে উঠলো কৃষ্ণমোহন আপত্তি, "কি আশ্চর্য! আমি ভালো হয়ে গেছি।···আমার বুকের হাড়গুলো আর আগের মতো গোণা যাচ্ছেনা।"

কৃষ্ণা একটা ওভার কোট সেলাই করছিল, আপত্তির কথা শুনে চমকে উঠলো। উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ওর মুখখানা। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে আপত্তির কাঁধের উপর নিজের মুখখানা এনে ন্যস্ত করে, শান্ত, ধীর স্বরে বলে উঠে, "সত্যি তুমি ভালো হয়ে গেছো।"

"কৃষ্ণমোহন আপত্তি বোধ হয় রোগ মুক্তি পেয়ে গেল।"—জানলা দিয়ে বাইরের বিরাট আকাশটার দিকে তাকিয়ে সাথে সাথে দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল কৃষ্ণেন্দু দাশগুপ্তের। ভালো হলো। সত্যি এটা সুন্দর। আপত্তি আবার সংগ্রাম করতে পারবে। এবারের সফল-সংগ্রাম। সেই সফলতার বাণী এসে পৌঁছবে তার কানে। তাই শুনতে শুনতে দেও একদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠতে পারবে সহসা: "কি আশ্চর্য! আমি ভালো হয়ে গেছি!···আমার বুকের হাড়গুলো আর আগের মতো গোণা যাচ্ছে না!"

সেদিন তিনজনে অনেক রাত পর্যন্ত সমুদ্রের ধারে বসে ছিল। অনেকক্ষণ ধরে সমুদ্রের গর্জন শুনলো। শুনতে শুনতে হঠাৎ কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠলো আপত্তি। হাত-পাগুলো অস্থির ভাবে ছুঁড়তে লাগলো। আকাশের এক চিলতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ ক'রে চললো। তারপর হঠাৎ চাপা গর্জন করে উঠলো, "বলো না কৃষ্ণা, ভালো আমি হইনি। হবোও না কোনদিন।"

কৃষ্ণেন্দু আরও গুটিয়ে নিলো নিজেকে। আপত্তি কি পাগল হ'য়ে গেছে? না হলে, মধ্যে মধ্যে এ রকম প্রলাপ বকে কেন? অথচ, এই সময়টাই তো প্রতিভা বিকাশের শ্রেষ্ঠ সময়। সাহিত্য সৃষ্টি আর, কল্পনার দৌড় এখনই তো সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে যাবে। এই পৈশাচিক শান্তি আর এই আবেগশূন্য শান্তি—দুইয়ের সংযোগে তিলে তিলে এখন গড়ে উঠবে এক প্রদীপ্ত অনুভূতি। এই অনুভূতিকে কাজে লাগাতে হবে। কাঁচের প্রতিচ্ছবি প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হতে থাকবে। কিন্তু আপত্তি কেন এত অস্থির! আর কৃষ্ণারই বা চোখ দুটো কেন দিন দিন স্তিমিত হয়ে আসছে? কেন অনবরত চোখের জলে ভিজে যাচ্ছে স্বামী ভেলভেটের কাপড়টা!···

আপত্তি আর থাকতে চাইলোনা।

কৃষ্ণাও মুক্তি চাইলো সমুদ্রের আহ্বান থেকে।

কৃষ্ণেন্দু স্থির। তার বলবার অনেক কিছু ছিল। কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না। শুধু ওদের মুখের দিকে অসহায় ভাবে তাকিয়ে থাকে। আর নিজের নির্জন ঘরে রাশি রাশি লেখা পাতাগুলোকে আত্মতৃপ্তির সঙ্গে জড়িয়ে ধরে থাকে।

কৃষ্ণা বললো: "সমুদ্র দেখলাম আপত্তি। এ আর নয়। এবার দেখবো মরুভূমি।"

—"মরুভূমি!"—আঁৎকে উঠলো কৃষ্ণেন্দু বারেকের জন্য।

—"হাঁ, মরুভূমি," আপত্তির চাপা সুর শ্রুত হয়, "আমরা রাজপুতনায় যাবো।···স্বদেশী করবার সময় বার দুয়েকের জন্ত গিয়েছিলাম বিলাসপুরে। বালু। শুধু বালু আর বালু। এখানকার মতো ভিজা নয়। শক্ত, শুষ্ক, সাদা, সীমাহীন বালুর রাজত্ব।"

কৃষ্ণার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। খপ্ করে সে চেপে ধরলো কৃষ্ণেন্দুর একখানা লোমশ হাত। আবেগ-কম্পিত সুরে বলে উঠলো, "চমৎকার। চলো। তাই চলো।"

কৃষ্ণেন্দু চোখ বুজলো। বাবুইয়ের বাসার মতো আবার বেঁকে এলো শরীরটা। শুধু জোড়া ভ্রূর নীচে আর একটি নূতন স্বপ্ন :

'···সে এক নূতন রাজ্য। নূতন আবেষ্টন। বালু। শুধু বালু আর বালু। এখানকার মতো—ভিজা নরম নয়। শক্ত, শুষ্ক, সাদা, সীমাহীন বালুর রাজত্ব।"···

কৃষ্ণা নীচু হ'য়ে স্পর্শ করলো কৃষ্ণেন্দুকে। মৃদু হেসে উৎসাহিত করলো তাকে। এক ঝলক গরমকা বাতাস এলো গোঁ গোঁ শব্দে। চুলগুলো অসংখ্য জীবন্ত সাপের মত আছড়ে পড়লো সমস্ত শিঠময়!

ঢেউগুলো আসছিল। সীমাহীন। ক্লান্তিহীন। হাঁটুতে আর পাতাতে হিমস্পর্শ। দোহাগ-চুম্বন। বিশাল সমুদ্রের গাম্ভীর্য নেই একটুও। বোঁ বোঁ শব্দে ঘূর্ণীগুলো হুড়োহুড়ি ক'রে এগিয়ে আসে। পিছিয়ে যায়। যেন একটা উৎসব। আর সেই উৎসবের ফুল এরা তিনজনে —দুটি যুবক এবং একটি যুবতী। ভাবতে ভালো লাগে।···

পুরীর সমুদ্রের মোহ এড়িয়ে তাই একদিন ওরা রওনা হয়ে গেল বিলাসপুরের মরুভূমির উদ্দেশ্যে। আর এক মহাসূক্ষ্মতার, মহা-অনিশ্চয়তার মধ্যে নিজেদের ছুঁড়ে দিলো ওরা···

বিরাট ট্রেনটি এগিয়ে চলেছে ফুঁসিয়ে ফুঁসিয়ে। যেন একটু গর্বিত ভঙ্গীতে। জানলা দিয়ে দেখলে মনে হয়, এই পৃথিবীতে বুঝি একমাত্র এইটেই মুখর। প্রাণ-চঞ্চল। বিলাসপুরের মৃদুল উপত্যকাকে কে যেন গাঢ় কালো তুলিতে এঁকে তুলেছে সন্তর্পণে কিছুক্ষণ আগেও ওটা ধূসর ছিল। কোন কোন শব্দে লড়াই ক'রে চলছিল উন্মত্ত বাতাসের সাথে। সাদা বালুর রাজত্ব, ঘন রঙের মেসকুইট আর মনসার ঝোপ, আরও হালকা ধরণের ছোট-খাটো ঝোপ-ঝাড়—সমস্ত কিছুই যেন হাপানি রুগির বুকের মত উঠছিল নামছিল। কিন্তু এখনকার আকাশে সেই প্রত্যাশা নেই। শুষ্ক শাখের গড়া প্রাগৈতি-হাসিক চেতনা নিয়ে ওটা এখন নিথর। বাতাস নেই। দূরের গাছগুলো হারিয়ে গেছে। কিছুই নেই। শুধু জমাট বাধা অন্ধকার"···

বাস্তববাদী

শ্রীঅসিতবরণ চৌধুরী

ভগবান থাকে যদি, থাক তার আপন রাজত্বে···
নিভীক পথিক মোরা দুর্গমের পেয়েছি ঠিকানা,—
মোক্ষ সুখ চাই নাকো—আকুল জিগীষা নেই তবে—
পৃথিবীর তপ্ত সুখ ভোগ করি হারায়ে নিশানা।

প্রিয়ার পেলব দেহ পেষণ বাসর নিপীড়নে
উপভুক্ত উগ্রসুখে নিপীড়িত উগ্র সম্ভোগ।
দুরন্ত দুরন্ত নাচে জননীর স্নেহের বেষ্টনে।
সন্তান পিয়াসা আনে রুদ্ধ বক্ষে ব্যাকুল বিক্ষোভ।
'কি পেয়েছি কি দিয়েছি'—হিসাবী এ মনোবৃত্তি নিয়ে
আমরা চলিনি পথ—সুন্দরের নিরন্ত পথিক।
রক্তরস পান করি জীবনের মুখে মুখ দিয়ে।
ভাবিনি ভীরুতা নিয়ে যা করিনু ঠিক কি বেঠিক।

রক্তহীন দুঃস্বপ্নের আশা হীন অন্ধ বিভীষিকা
মোদের ললাটে আঁকে বাস্তবের ভয়াবহ টীকা।

স্বভাব-সুন্দর রামেন্দ্রসুন্দর

৺অশ্বিনীকুমার সেন

স্বভাব-সুন্দর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সহিত আমার চাক্ষুষ আলাপ হইবার পূর্বেই পত্র ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল। প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে আমি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়া প্রবেশিকা ফী ২৲ টাকা মনিঅর্ডার যোগে প্রেরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই পরিষদের অধিবেশনে পাঠ করিবার অভিপ্রায়ে "সংসারের সৌজন্যের মূলতত্ত্ব ও প্রয়োজনীয়তা"—শীর্ষক একটি প্রবন্ধ সম্পাদকের বরাবর পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। মনিঅর্ডারের প্রাপ্তি স্বীকার পত্রী পাইলাম—পরিষদের কর্তৃপক্ষ আমি পরিষদের সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছি এ সংবাদ দিলেন, কিন্তু দিলেননা শুধু আমার প্রবন্ধের কোন সংবাদ। এই জন্য একে একে আমি তিন খানি চিঠি লিখিলাম। কিন্তু উত্তর নাই। রামেন্দ্র-সুন্দর তখন পরিষদের সম্পাদক, তাই অবশেষে তাঁহার বাসা ৮ নং উইলিয়ম্ লেনের ঠিকানায় তাঁহার নিকট পত্র লিখিলাম। পরিষদের ব্যবহারে আমি একটু বিরক্ত হইয়াছিলাম, সুতরাং রামেন্দ্রবাবুর নিকট যে চিঠি লিখিয়াছিলাম তাহাতে সেই ভাবব্যঞ্জক দুই একটি কথা ছিল। নির্দিষ্ট সময় চলিয়া গেল, রামেন্দ্রবাবুও কোন উত্তর দিলেননা। তখন আমার মন স্বভাবতই কিছু উষ্ণ হইয়া উঠিল। মনে ভাবিলাম—'ইহাদের ধারাই বুঝি এই'—

সেদিন এই অন্যায় অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, তাহার ঠিক দুইদিন পরেই একখানি অপরিচিত হস্তাক্ষরে লিখিত চিঠি পাইলাম। কৌতূহলী হইয়া চিঠি খানা খুলিতেই উপরে দেখিলাম-'স্নেহো' আর নীচে দেখিলাম—'ভবদীয় শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।'—আগ্রহ সহকারে চিঠি-খানি পড়িতে গেলাম, কিন্তু সহজে পড়িতে পারিলামনা, কারণ স্বভাবসুন্দর রামেন্দ্রসুন্দরের হস্তাক্ষর 'সুন্দর' ছিলনা। যাহা হউক, চিঠিখানি পড়িতে গিয়া প্রথমেই পাঠ দেখিলাম—'সুহৃদরেষু।' দেখিয়া বড় বিস্মিত বড় অপ্রস্তুত হইলাম। বিস্মিত হইবার কারণ, রামেন্দ্রসুন্দরের মত এমন একজন দেশমান্য ব্যক্তি সম্পূর্ণ অপরিচিত আমাকে, একেবারেই পাঠে লিখিলেন—'সুহৃদরেষু'—আর অপ্রস্তুত হইলাম, আমি এমন লোককেই প্রথম পত্র লিখিয়াছিলাম উদ্ধতভাবে। চিঠিতে পড়িলাম—"আমি ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছি। আপনার পত্র কলিকাতা হইতে এখানে আসিয়াছে—সেইজন্যই উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। পরিষদ কার্য্যালয়ে প্রবন্ধ পাঠাইয়া ও পরে তিনখানি চিঠি লিখিয়াও তাহার উত্তর পাননাই সংবাদে লজ্জিত ও দুঃখিত হইলাম। যাহার ত্রুটীতেই আপনি মনঃকষ্ট পাইয়া থাকেন সমস্ত অপরাধ আমারই, কারণ পরিষদের ভৃত্যবর্গের মধ্যে আমার দায়িত্বই সকলের চেয়ে বেশী। পরিষদ আপনাদেরই, সুতরাং আমাদের ত্রুটীও আপনাদের কাছে অবশ্য মার্জ্জনীয়। আমি কার্য্যালয়ে চিঠি লিখিলাম—প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা আমি কলিকাতায় যাইয়া করিব। মহাশয়ের কুশল সংবাদ পাইলে সুখী হইব। আমার পত্নীর অসুখ হইয়া পড়িতেছে—পরিবারের আর আর সকলেই কুশলে আছেন।'—

পত্রের ছত্রে ছত্রে রামেন্দ্রসুন্দরের বিনয়, দীনভাব, দায়িত্বজ্ঞান, ত্রুটীস্বীকারের প্রণালী, অপরিচিতের প্রতি অকপট আত্মীয়তা ও সর্ব্বোপরি পরিষদের প্রতি তাঁহার বিপুল ভক্তির অভিব্যক্তি দেখিয়া, আমার অন্তরে তাঁহার উদ্দেশে একটি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব জাগিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে নিজকে বড়ক্ষুদ্র—বড় ছোট বোধ হইতে লাগিল—কেবলই ভাবিতে লাগিলাম—হায়! কাহার সহিত কি ব্যবহার করিয়াছি!

ইহার পর কলিকাতায় গিয়া রামেন্দ্রবাবু লিখিলেন—'আপনার প্রবন্ধ পরিষদের ভাদ্রমাসের অধিবেশনে পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছে। আপনি নিজে, উপস্থিত হইয়া প্রবন্ধ

পাঠ করিলে সুখী হইব। শুধু প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্যই নহে—রামেন্দ্রবাবুকে দেখিবার জন্যও আমার একটা আন্তরিক আগ্রহ হইয়াছিল, তাই পরিষদের অধিবেশনের দিনই সকালের গাড়ীতে আমি বাড়ী হইতে রওনা হইয়া বিকালে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান সুরেশচন্দ্র উপস্থিত ছিল—তাহাকে সঙ্গে লইয়াই একেবারে সভার অধিবেশনের নির্দ্দিষ্টস্থান ১৬৬ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট জাতীয় শিক্ষা মন্দিরে গিয়া পৌঁছিলাম। দ্বারে শ্রীযুক্ত রাধাকমল সিংহ মহাশয় ছিলেন, তিনি আমাকে দ্বিতলে রামেন্দ্রবাবুর নিকট লইয়া গিয়া বলিলেন—'এই যে অশ্বিনীবাবু।' রামেন্দ্রবাবু জানালের উপর বসিয়াছিলেন, তিনি সহাস্য বদনে উঠিয়া দাঁড়াইয়া—'আপনি এসেছেন, বড় সুখী হলুম।' বলিয়াই আমার হাত ধরিয়া নিজের কাছে বসাইলেন।

ক্রমে দু'একজন করিয়া লোক আসিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা বড় বেশী নয়। তাই রামেন্দ্রবাবুকে একটু বিপন্নবোধ হইল—তিনি বলিতে লাগিলেন—'তাইত, অশ্বিনীবাবু খুলনা সেনহাটী হইতে আসিলেন, কিন্তু Quoram অভাবে যদি আজ পরিষদের অধিবেশন না হয়, তবেত বড় লজ্জা বড় কষ্টের কথা হইবে।'—যাহা হউক Quoram হইল—রামেন্দ্রবাবু সুস্থির হইয়া বসিলেন। নূতন পর্য্যায়ের বঙ্গদর্শন-সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, আমি আমার প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। তখন রামেন্দ্রবাবু উঠিয়া বলিলেন—'প্রবন্ধ লেখক অশ্বিনীবাবু আজ আমাদিগকে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শুনাইলেন, সে জন্য আমি পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি প্রবন্ধটিকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াই আপন কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই—সেই দূর খুলনা সেনহাটী হইতে কষ্ট স্বীকার করিয়া, এখানে আসিয়া নিজে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমাদিগকে আনন্দ প্রদান করিয়াছেন, সে জন্যও আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। দেশের খাঁটি ইতিহাস লিখিতে হইলে যে পল্লীজননীর অঙ্কলক্ষ্মী হইতে তাহার উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে এ বিষয়ে আর এখন মতদ্বৈধ নাই। অশ্বিনীবাবু তাহা বুঝিয়াছেন বলিয়াই সরকারী গেজেটিয়ার বা বিদেশী লেখকের প্রদত্ত বিবরণের উপর নির্ভর না করিয়া নিপুণহস্তে পল্লীর নিভৃত কক্ষ হইতে টুকরা মাল মশলা সংগ্রহ করিয়া, তাঁহার উপাদেয় প্রবন্ধ প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমাদের আবদার, তিনি যেন মধ্যে মধ্যে তাঁহার পল্লীর অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে 'তাজা' জিনিষ উপহার দিয়া সহরবাসী আমাদিগকে তুষ্ট করিতে কৃপণতা না করেন। এখন ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহাকে আমার কিছু বলিবার আছে—"তিনি যেহার যে ক্ষেত্রকে বরণ করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে প্রবেশ সহজসাধ্য নহে। কবি ও ঔপন্যাসিকেরা নিরঙ্কুশ, কিন্তু ঐতিহাসিকের বিশেষতঃ বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের পথ সুগম নহে। একে কল্পনা বলে মুক্তপক্ষ বিহগের ন্যায় আপন মনে যথেচ্ছ উড়িয়া যাওয়ার অধিকারী, অপরে বাস্তব ঘটনার চাপে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য—কেহ কাহার পথ অবলম্বন করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাকে বড় সাবধানতার সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। সমালোচকের কঠিন ভ্রুকুটি, স্তাবকের অন্যায় প্রশংসা, সর্ব্বত্রই তাঁহাকে ঐতিহাসিকের যোগ্য সংযম ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করিয়া, অকুতোভয়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে। ইহা করিতে পারিলেই তাঁহার সাধনার সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী।" রামেন্দ্রসুন্দর ইহা বলিয়া উপবেশন করিলেন, কিন্তু তাঁহার উৎসাহবাণী—উপদেশ বাক্য, আমার অন্তর বাহির একেবারে পূর্ণ করিয়া দিল—আমি উদ্বেলিত হৃদয়ে হৃদিস্থ মহাত্মার এই আদেশবাণী অনুসারেই কার্য্য করিব সঙ্কল্প করিলাম।

সভার শেষভাগে রামেন্দ্রবাবু বলিলেন—'আপনার এ প্রবন্ধ পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।' প্রবন্ধ যখন কার্য্যালয়ে পাঠান হয়, তাহার পরে সে বিষয়ে আরো কিছু নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা অন্য কাগজে লিখিয়া আনিয়া প্রবন্ধের সঙ্গেই পাঠ করিয়াছিলাম। এখন প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে শুনিয়া, প্রবন্ধটি পরিবর্দ্ধিতাকারে নূতন করিয়া লিখিয়া দেওয়া উচিত মনে হওয়ায়, প্রবন্ধটি আনিবার জন্য পরদিন রামেন্দ্রবাবুর বাসায় গিয়াছিলাম। তিনি তখন পরিষদের কার্য্যেই বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু আমি সেখানে যাওয়া মাত্রই তিনি এমন সদয়তা, সরলতা ও প্রীতিভরে আমাকে গ্রহণ করিলেন যে, আমি মুগ্ধ না হইয়াই পারিলাম না! আমি

তাঁহাকে প্রবন্ধের কথা জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি নিতান্ত কুণ্ঠার সহিত বলিলেন—'প্রবন্ধটি ত আমার কাছে নাই, তাহা সহকারী সম্পাদক হেম্বাবুর নিকট পাইবেন। হেম্বাবুর ঠিকানা জানেননা বোধ হয়? তিনি ৫০নং কার্ণিভ্যাল মিশন লেনে থাকেন। আপনি অনর্থক এখানে আসিয়া কষ্ট পাইলেন, এজন্য আমি লজ্জিত হইতেছি।'

আমি বলিলাম—আমি আসিয়াছি আমার নিজের কাজে, তাহাতে আপনার লজ্জিত হইবার কি আছে? প্রবন্ধ না পাইলেও আপনার দর্শন লাভই যে আমার পরম লাভ।'—বলিতেই রামেন্দ্রবাবু বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—'আমি নিতান্ত অকিঞ্চন, আমাকে এত বাড়াইতেছেন কেন?' তাই কথাবার্ত্তার সুযোগে আমি অতি দম্ভর্পণে বলিলাম—'প্রবন্ধের সংবাদ পরিষদ কার্য্যালয় হইতে না পাইয়া, আমি বড় অসহিষ্ণু হইয়া আপনাকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, সে পত্রের জন্য আমি বড় অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইয়াছি।' রামেন্দ্রবাবু বলিলেন—'না, না, তাহাতে আপনার অনুতপ্ত হইবার কি আছে? আপনি যাহা করিয়াছেন ও অবস্থায় পড়িলে আমিও তাহাই করিতাম। পরিষদ আপনাদের, তাহার কার্য্য পরিচালনার ভার আপনারাই আমাদের উপর দিয়াছেন। আমরা যদি সে কার্য্যে তৎপর না হই—তাহাতে ত্রুটি দেখাই, তবে আপনারাই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবেন—তবেই না আমরা ভাল কাজ করিতে পারিব। এজন্য আপনার লজ্জিত না হইয়া বরং কর্ত্তব্য কাজ করিয়াছেন বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা উচিত।' রামেন্দ্রসুন্দরের এই কথা শুনিয়া আমি ভাবিলাম—'ইনি কি বলেন—আসিলাম ত্রুটি স্বীকার করিতে, কিন্তু ইনি করেন প্রশংসা—আর ভাবিলাম, নিজের ত্রুটিকে এমন বড় ও অপরের ত্রুটিকে এত ছোট করিয়া দেখিতে পারেন বলিয়াই ত ইহারা এত বড় এত মহৎ এত উদার, আর আমরা তাহা পারিনা বলিয়াইত-এত ক্ষুদ্র সংকীর্ণ এত অসহিষ্ণু।'

ইহার কয়েক মাস পরে কাশীমবাজার রাজবাড়ীতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। সেখানে যাইয়া 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদক শৈলেশবাবুর সহিত রামেন্দ্রসুন্দরের নিকট যাইতেই তিনি বলিলেন—"এই যে আপনি এসেছেন।' সেখানে সম্মিলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি রবিবাবু ও প্রধান প্রধান সাহিত্যসেবী উপস্থিত ছিলেন। রামেন্দ্রবাবুর আত্মীয়তার কিছু সময়ের জন্য তাঁহাদের মধ্যে থাকিবার অধিকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম! তাঁহারা দল বাঁধিয়া রাজবাড়ীর স্থানগুলি দেখিবার জন্য বাহির হইলেন। আমিও তাহাদের সহিত —'রামেন্দ্র সঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে'—চলিলাম। কাশী নরেশ চৈৎ সিংহের দরজা ও অন্যান্য অনেক স্থান দেখিলাম—আমার যা কিছু জিজ্ঞাস্য রামেন্দ্রসুন্দরকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। প্রথমে তিনি আমাদের সঙ্গী প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নিখিলবাবুকে দেখাইয়া—"আমাকে কেন? সঙ্গে 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' আমাদের সঙ্গে আছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করুন"—বলিয়া অতি স্নেহে ও আহ্লাদ সহকারে আমাকে প্রতি দর্শনীয় বস্তু সম্বন্ধীয় খুটিনাটি সব কথা বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। সমস্ত দেখিয়া চলিয়া আসিবার সময় তিনি হাসিয়া বলিলেন—'যাহা দেখিয়া বা শুনিয়া গেলেন তাহার একটা বিবরণ আপনার নিকট চাই।'

কাশীমবাজার হইতে বাড়ী আসিবার কিছুদিন পরে 'প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনী' লিখিয়া রামেন্দ্রবাবুকে পাঠাইয়া ছিলাম। তিনি লিখিয়াছিলেন 'ইহা পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। কিন্তু তা' হয় নাই। আমিও প্রথমবারের অভিজ্ঞতায় আর প্রবন্ধের খোঁজও লই নাই। তারপর মাত্র আর দুইবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে—সে দুই বারই সামান্য দুই একটি কুশল প্রশ্ন ব্যতীত তাঁহার সহিত আর কোন কথা হয় নাই। কিন্তু না হউক—প্রথমবার কলিকাতায় ও দ্বিতীয়বার কাশীমবাজারে তাঁহার নিকট হইতে যাহা পাইয়াছি, তাহার জন্য চিরদিনই তাঁহার উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি প্রদান করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিব।

নতুন জীবন

শ্রীমেঘু মিত্র

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকতেই মিনা আজ আশ্রয় নিল বিছানায়। এক পাশে মেঝে বুলা তখন ঘুমোচ্ছে অঘোরে। ওর প্রশান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে মিনার কেমন জানি ঈর্ষা হয় মনে, কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে বুলা। কোন রকম ভার দায়িত্ব চিন্তা ভাবনা স্পর্শ করতে সাহস করেনি ওকে। সেও যদি বুলার মত নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোতে পারত মন্দ হত না। সংসারের এত খাটাখাটনির পর সুখ নিদ্রা দরকার বৈকি! নইলে নতুন করে খাটবার শক্তি পাবে কোত্থেকে। সত্যি আজ ঘুমোতেই হবে তাকে। কিন্তু কই ঘুম তো আসছে না! শুধু এপাশ আর ওপাশ করেই সময় চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, শুয়ে শুয়ে বই পড়লে নাকি খুব শিগগির ঘুম নামে চোখের পাতায়। দেখাই যাক না পরখ করে।

বিছানা থেকে উঠে গিয়ে আলমারি খুলে একটা গল্পের বই নিয়ে এল মিনা। তারপর শুয়ে শুয়ে পড়তে লাগল বইখানা। কয়েক পাতা উল্টোবার পর ওর খেয়াল হয় তাই ত ঘুম তো আসছে না! এতগুলো পাতা পড়ে ফেললাম তবু দেখা নেই ঘুমের! কি আশ্চর্য! অথচ ওপাড়ার বাণী বই হাতে নিয়ে শুতে না শুতে কেমন ঘুমিয়ে পড়ে নিঃশব্দে, কতবার গেছি ওদের বাড়ী। কোনদিন দুপুরে ঘুমত ও আর আমি বই পড়ছি শুয়ে শুয়ে। হঠাৎ ওর নাক ডাকার মৃদু শব্দ কানে আসতেই পাশে চেয়ে দেখি হাত থেকে পড়ে গেছে বই কখন। ওর সেদিকে খেয়াল নেই। দিব্যি ঘুমের নাম্নে পাড়ি জমিয়েছে অচিন দেশে। তবে তার কেন ঘুম আসে না! আচ্ছা আর কিছুটা পড়ি। ঘুম নিশ্চয়ই আসবে এবার। বই পড়তে পড়তে একটা জায়গায় এসে তার চোখ থমকে যেতে যায়। মন হোঁচট খায় যেন চিন্তার ইটের সঙ্গে।

বইটার এক জায়গায় পটলদার মত এক চরিত্রের উপস্থিতি অনুভব করে বিস্ময় জাগে একটু, আরো কিছুটা পড়ল মিনা এরপর। না আর পটলদাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। চকিতে দেখা দিয়েই কোথায় যেন মিলিয়ে গেল ও। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে চিরকুটটার কথা। ওটা যাবার সময় পটলদা লিখেছিল তাকে। কয়েক লাইন মাত্র লেখা। অথচ মনে হয় কত দিনের স্মৃতি লুকিয়ে আছে ওর মধ্যে। চিরকুটটার কথা মনে হতেই পটলদা যেন ভেসে ওঠে চোখের সামনে।

মাথার বালিশের পাশে গল্পের বইটা রেখে মিনা উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে, সুটকেশ খুলে বার করল চিরকুটটা। কাগজটার আগের রং আর নেই। কেমন যেন হলদেটে রং ধরেছে। লেখাটাও আবছা আবছা লাগে। এক নজরে দেখলেই বেশ বোঝা যায় একটা দুটো করে অনেক বসন্ত পার হয়ে এসেছে এই চিরকুটটা। মিনা অতি সাবধানে শুয়ে শুয়ে ভাঁজ খুলে মেলে ধরে চোখের সামনে। আর ঠিক সেই সময় বিমান ঝোড়ো বাতাসের মত হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল ভেজান দরজা ঠেলে। কি একটা অফিসের দরকারী কাগজ ভুলে ফেলে গিয়েছিল ঘরে। কাজের সময় মনে পড়তে এখন নিতে এসেছিল সেটা।

ঘরে ঢুকেই বিমান দেখতে পায় মিনার হাতে একটা ধূসর বিবর্ণ চিরকুট। অথচ মনোযোগ দিয়ে মিনা পড়ছে সেটা। কৌতূহল জাগে বিমানের মনে, তাই ত এতখানি নিবিষ্ট চিত্তে কি পড়ছে মিনা। গোপন কিছু হলে চাইলেই কি আর পাওয়া যাবে! অনেক কথার পর হতে দেবেই না শেষ পর্যন্ত। তাই অতর্কিতে চিলের মত ছোঁ মেরে তুলে নেয় চিরকুটটা মিনার হাত থেকে।

মিনা তো অবাক্! কে এই তার দুপুরবেলা তার ঘরে ঢুকে তার হাত থেকে চিঠি নিতে সাহস করে! ঘুরে দাঁড়াতেই সে দেখতে পায় বিমানকে। পড়ছে ওটা। পড়া সারা হতেই মুখ তুলে বলল, 'এ নাম ঠিকানাহীন চিঠি

কার? মনে হচ্ছে বহুদিনের পুরনো।' ইচ্ছে করলে মিনা সোপন করতে পারত সব কিছু। মিথ্যে একটা কাহিনী খাড়া করে আসল ঘটনাটা চাপা দিতে পারত অনায়াসে। কিন্তু তা করল না এ সময়। তাছাড়া সে রকম প্রবৃত্তিও হল না তার। সংক্ষেপে মিনা সমস্ত বলল ওকে। যাতে হাজারো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে না হয়।

আর কিছু জিজ্ঞেস করবার প্রয়োজনও মনে করল না বিমান। চিরকুটটা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে জানলা দিয়ে ফেলে দিল বাইরে। হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ল টুকরোগুলো এধার ওধার। অনেকদিন বাক্স বন্দী হয়ে থাকার পর আজ মুক্তি পেয়ে যেন ছুটাছুটি শুরু করে দিয়েছে আপন খেয়ালে। অফিসের জরুরী কাগজটা বুক পকেটে সযত্নে রেখে বলল বিমান, 'রাগ করলে মিনা'? কোন কথা বলল না সে। জানলা দিয়ে সে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে খুঁজছিল চিরকুটের টুকরোগুলোকে। তখন বিমান মিনার কাছে এসে ওর একটা হাত ধরে বলল, 'তোমার আমার মধ্যে কোন কিছুর ব্যবধান হইতে পারি না মিনা। ওই চিরকুটটা দেখে ক্ষণিক মনে হচ্ছিল তুমি যেন কত দূরে চলে গেছ আমাকে ছেড়ে। আমাদের মাঝে যেন দুস্তর প্রাচীরের ব্যবধান সৃষ্টি হতে চলেছে, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমার ফেলে আসা অতীতকে আমাদের মাঝখান থেকে সরিয়ে দিলাম এমন নির্মম হাতে। দুঃখ করো না মিনা। অতীতকে আঁকড়ে থাকলে যে বর্তমানকে মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসা যায় না, নয় কি? কথাগুলো মিনার কানে ঢুকল কিনা কে জানে? নির্বিকার ভাবে মিনা শুধু বলল, 'দেরী হয়ে যাচ্ছে, তোমার। অফিস যাওতো এখন। পার তো আজ একটু সকাল সকাল ফিরো, বুঝলে।' মনের কত কথার ব্যাণ্ডেজে ঢেকে রাখে মিনা। ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দেয় না তার মনোবেদনা। এছাড়া তার উপায় ছিল না কিছু।

পটলরা যেদিন তাদের বাড়ী প্রথম আসে সেদিনের কথা মিনার স্পষ্ট মনে পড়ে এখনো। কি যেন দরকারে সেদিন দুপুরে বাবার ঘরের কাছে এসে দেখে আঠারো উনিশ বছরের এক ছোকরাকে বাবা কি যেন জিজ্ঞেস করছেন। অন্য দিনের মত চট করে ঢুকতে পারল না আজ। ভেতর থেকে কে যেন বাধা দেয় তাকে। ছোকরাকে দেখা অবধি যুগপৎ আনন্দ ও লজ্জা বাড়িয়ে তোলে তাকে। ঘরে না ঢুকে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনতে থাকে ওদের। অস্পষ্ট যেটুকু কথা তার কানে এল—তাতে মিনা বুঝতে পারে যে আগন্তুক কর্মপ্রার্থী। খাওয়া খাওয়া ও সামান্য মাইনের বিনিময়ে সে চাকরের কাজ করতেও প্রস্তুত। কিসে কি সাংঘাতিক জিনিষ! যার জন্যে মানুষ মান সম্মান বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না এতটুকু। বড়লোকের মেয়ে মিনার সে ধারণা ছিল না এতদিন। আজ এই মুহূর্তে সেটা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করল সে। ছোকরাটি বেরোবার আগে নামটাও বলল তার বাবাকে। পটল রায়, চেহারা দেখে ও নাম শুনে মিনার মনে হয় ভদ্রলোকের ছেলে। তবে চাকরের কাজ করতে এল কেন এখানে! তবে কি মা বাবার সাথে ঝগড়া করে পালিয়ে এসেছে ঘর থেকে? হয়ত তাই, কিংবা পেটের দায় তাকে বাধ্য করেছে এ পথ বেছে নিতে। কথাবার্তা শেষে ছোকরাটি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দরজার পাশে মিনাকে দেখে থতমত খায় হয়ত, চলতে চলতে নিজেকে সামলে নিয়ে গেট খুলে পথে নামে। ছোকরাটির গমন পথের দিকে তাকিয়ে মিনা বোঝে—নিজের জিনিষ পত্র আনতে গেল সে এখন। এসে পড়বে একটু পরেই।

টিনের তোবড়ানো সুটকেশ আর ছেঁড়া রং ওঠা বিবর্ণ একটা শতরঞ্চি মোড়া বিছানা পত্র নিয়ে পটল রায় যখন তাদের বাড়ী পৌঁছল তখন সন্ধ্যে হতে আর একটু বাকী। সূর্য অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে তাদের এই শহরটা থেকে। কেবল দিনান্তের ক্ষীণ অস্পষ্ট আলো চারদিকে ছড়িয়েছিল তখনো। ঘরের ভেতর অবশ্য তখনি সাঁঝের আঁধার নেমে এসেছে। আর লাইট জ্বলে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার দূর করতে। বাইরে দিনের আবছা আলো ও ঘরের বৈদ্যুতিক আলোর সঙ্গমস্থলে আলোছায়ার কোলাকুলি। আর ঠিক জানলার বাইরেই ওরা পরস্পরকে যেন জড়িয়ে ধরেছে কি এক আনন্দে। একটু পরে বাইরের ক্ষীণালোক ঘরের আলোর সাথে নিজেকে মিলিয়ে মিশিয়ে দেবে তা অনেকের হয়ত নজরেই পড়বে না। এর আগে মিলায়ও চোখে পড়েনি এসব। আজ কি

জানি কেন প্রতিদিনের এ দৃশ্য নজর এড়ায় না মিনার। বারান্দার ওপর বেডিং আর টিনের সুটকেশটা নামিয়ে রেখে পটল হাওয়ায় এদিক ওদিক। তার চোখ এঘরের ভাউকে যেন খুঁজছে। স্টেশনেট থেকে এতটা পথ বিছানা বাক্স বয়ে আনতে কম কষ্ট হয়নি তার। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে তাই। রুমালের অভাবে জামার প্রান্ত তাপ দিয়ে মুখটা মেছে ভলে ভলে। সামনেই ফুলের বাগান। বাতাসে ফুলের মনমাতানো গন্ধ ভেসে আসছে। নীড়ে ফেরা পাখীদের কাকলিতে চারদিক মুখরিত। ঘর থেকে মিনা লক্ষ্য করছিল সব।

পটল রায়কে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মাকে ডেকে আনল মিনা। মিনার মা নীলিমা দেবী বারান্দায় এসে বললেন, 'এত দেরী করলে যে! তোমার বিকেল চারটের সময় আসার কথা ছিল না?' 'হ্যাঁ', পরিষ্কার জবাব, 'তবে গোছ গাছ করে বলে করে আসতে দেরী হয়ে গেল। তাছাড়া আমি যেখানে কাজ করতাম সেখান থেকে আপনাদের বাড়ী অনেকটা পথ। সুটকেস বিছানা নিয়ে হেঁটে আসতে দেরী হয়ে গেল তাই।'

রিক্সায় এলে না কেন? তাহলে দেরী হত না শুধু শুধু। আমরা নাহয় ভাড়া মিটিয়ে দিতাম।'

এরপর পটল আর কি বলবে! তার বলারই বা কি আছে। তাই মাথা নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল অপরাধীর মত। মা'র রূঢ় কর্কশ সম্ভাষণে মিনা চটে ওঠে মনে মনে। তবে মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহসে কুলোয় না। গুমোট পরিস্থিতিটা হাল্কা করার জন্যে বলে মিনা, 'ও কোন ঘরে থাকবে মা?' 'সে তোর ভাবতে হবে না। তুই নিজের কাজে যা। যা-হয় একটা ব্যবস্থা করব'খন।' কথা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেই ভাল হোত দেখছি। আর কিছু না হোক, অন্তত দাঁড়িয়ে থাকা যেত এখানে। আর অযথা ক্যাট্‌ক্যাটে কথাও শুনতে হোত না। প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিনা নিজের পড়ার ঘরে গিয়ে ঢোকে। চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর বই খুলে ধরে বটে চোখের সামনে, কিন্তু মন বসে না পড়ায়। মা কি পটলদার সাথে ঝগড়া আরম্ভ করল নাকি এখন! তবে কি মা'র ওকে পছন্দ নয়! ধুলো পায়ে বিদায় করতে চায়! মা যেন কি রকম! কি দরকার ছিল এখনি অমন করে ওকে ফেরা করার! ও তো কোন দোষ করেনি। আজ ভাগ্যের বিড়ম্বনায় ও না হয় নীচু কাজ করতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু তাই বলে ভদ্র ঘরের ছেলের সাথে ওরকম ভাবে ব্যবহার করতে হবে? চাকরের কাজ করতে এসেছে বলে সে তো আর মান সম্মান বিকিয়ে দেয়নি তাদের কাছে! সততা আছে তার, খাটবে খাবে। নিজের উপায় করা অর্থে নিজের পেট চালাবে সে। বসে বসে তো তাদের অন্ন ধ্বংস করতে আসেনি। তবে কেন মা পটলদার ওপর প্রথম থেকে রোষ ঝাড়ানি শুরু করল! তাছাড়া বাড়ীতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এরকম কথায় কথায় খুঁত ধরলে যা বকলে ও কি বেশিদিন থাকবে এখানে! মানুষের সহ্যের তো একটা সীমা আছে!

দু-চার দিন পর নীলিমা দেবীর চোখ এড়িয়ে মিনা আলাপ করেছে পটলদার সাথে, কাজে কর্মে সাহায্য করেছে তাকে। মা একগাদা কাজ চাপালে কৌশলে সে কাজের বোঝা কমিয়ে দিয়েছে অদ্ভুত ভাবে। কাউকে এতটুকু জানতে দেয়নি। বাড়ীর সবার খাওয়া দাওয়া সারা হলে তবে পটল খেতে পায়। তাও সবদিন ভাল ভাত তরকারী প্রয়োজনমতও থাকে না। পাতে যা পায় মুখ বুঁজে তাই খেয়ে উঠে পড়ে। যা কাড়ে না খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে।

মিনার নজর এড়ায় না তা। নিজের চোখে দেখে কষ্ট হয় তার। দেখতে পায়ে না এক এক সময় শুকনো ভাত নুন লঙ্কা দিয়ে গিলে গিলে খাওয়া, তাই মাঝে মাঝে সবার অলক্ষ্যে সে লুকিয়ে লুকিয়ে ভালমন্দ এটা ওটা এনে খাওয়ায় পটলদাকে। এতে পটল কিন্তু ভয় পেয়ে যায়। বলে, 'আমার জন্যে এসব ঝামেলা কর কেন মিনা। কেউ যদি দেখে ফেলে তখন! আমার চাকরীটা তো সঙ্গে সঙ্গে যাবেই উপরন্তু তোমাকে পাঁচ কথা শুনতে হবে এজন্যে। লুকিয়ে চুরিয়ে আর এসব এনো না, কেমন।' 'সব তো বুঝি পটলদা কিন্তু মন যে মানে না, আমরা ভালমন্দ খাব ছড়াব আর তুমি খাবে ডাল চচ্চড়ি ভাত! তাও আবপেটা! চোখের সামনে এসব দেখে কি করে হাত গুটিয়ে থাকি বল!' 'চাকরের কপালে এর বেশী জোটে না, বুঝলে। এই যা খেতে পাই তাই

যথেষ্ট আমার পক্ষে। তুমি যদি এটা ওটা খাইয়ে দোও ঘরিয়ে হাও তখন দুস্তিলে পড়ব আমি। স্বভাবটাকে নিজের আয়ত্বে রাখতে পারব না তখন। কাঁক পেলে এটা ওটা চুরি করে নোলার তৃপ্তি সাধনে তৎপর হয়ে উঠব। জানো তো তোমের ঘরদিন গৃহস্থের একদিন, আর সেই একদিন ধরা পড়ে চাকরীটা ঘুচিয়ে শ্রীঘরে গিয়ে উঠতে হবে।' এমন ভবিষ্যতের আশঙ্কা মিনার এককান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। 'আচ্ছা আচ্ছা সে যখন হবে তখন হবে—এখন তো ওটা খেয়ে নাও।' আজ রান্না হয়েছে মাংস, মাছের কালিয়া। অথচ পটলের পাতে তার ছিটেফোঁটাও পড়েনি। সে কেবল শাক চচ্চড়ি ছাড়া আর কিছু পায়নি ভাতের সঙ্গে। মিনা তাই রান্নাঘর থেকে লুকিয়ে একবাটি মাংস এনেছে পটলদার জন্যে। পটলদা না খেলে যেন সে তৃপ্তি পাবে না।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরে মিনা দেখে পটলদা তখন হয় কাঁটা দিচ্ছে। খুব জলতেষ্টা পেয়েছিল মিনার। জানলার ধারে একটা চেয়ারে বসে বলল সে, 'পটলদা, জল খাওয়াবে?' মিনার দিকে তাকিয়ে পটল বলল, 'একটু দাঁড়াও, হয়টা কাঁটা দিয়ে নিই।' মিনার যেজাজ ভাল ছিল না তখন। ভূগোলের ক্লাসে পড়া না পারার মনটা তার তিরিক্ষে। এ সময় পটলের সামান্য কথায় চটে ওঠে মিনা। বলে, 'হেঁচার গলা শুকিয়ে কাঠ, আর তুমি বলছ অপেক্ষা করতে! তোমার কি একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই পটলদা? যাও কাঁটা ফেলে একটি এক গ্লাস জল নিয়ে এস। জল খাবার আগে কাঁটার হাতখানা একবার ধুয়ে নিও।' মিনার তিরিক্ষে মেজাজ ভাল লাগল না পটলের। ইচ্ছে হচ্ছিল মুখের ওপর সাফ বলে দেয় পারবে না দিতে। স্কুল থেকে এসে আমার রাধা কিনে নিয়েছে আর কি! স্কুলে আর যেন কেউ পড়ে না! কিন্তু নিজের বর্তমান অবস্থার কথা ভেবে মুখে কিছু বলতে সাহস করল না। জল কথা শুনিয়ে শেষে চাকরীটা খোয়াবে নাকি! চাকরী গেলে পেট চলবে কি করে! আজ তার আপন বলতে কেউ নেই। ছোটবেলায় মা বাবা মারা যায়, চোখেও দেখেনি সে তাদের। জ্ঞান হওয়া অবধি দেখছে মামার কাছে রয়েছে সে। হাত সেখানে বেশীদিন থাকতে পারল কই! মামা মামীর অমানুষিক অত্যাচারে শেষ আশ্রয়টুকুও বাধ্য হয়ে ছাড়তে হল তাকে। দিন কয়েক রাস্তার কলের জল খেয়ে আর নীল আকাশের তলায় রাস্তার ওপর শুয়ে কাটাতে হয়েছে তাকে। সে সময় একটুকরো বাসী রুটিও কেউ খেতে দেয়নি, শেষ পর্যন্ত অনেক কাকুতি মিনতি করে ওই রেষ্টুরেন্টটাতে সামান্য বয়ের কাজ পায়। মাইনে নাম মাত্র, তাছাড়া খাওয়া আর থাকা। ওখানে তার কেটেছে অনেক বছর, এখন আগের তুলনায় দোকানে খদ্দের বেড়েছে বিস্তর। সঙ্গে সঙ্গে খাটুনিও বাড়ে তার, সেই সকাল থেকে রাত এগারোটা-বারোটা পর্যন্ত খাটতে হয় এক নাগাড়ে। নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ মেলেনা ওই সময়। এত খাটা-খাটনি সইবে কেন দেহে! তাই সর্দি-জ্বরে কাবু করে ফেলে মাঝে মাঝে। জ্বর হলেও ছুটি নেই। জ্বরে ধুঁকতে ধুঁকতে কাজ করে যেতে হয়। বিছানা নিলে খাবে কি? উপোস দিয়ে মরবে নাকি! তা মরণ হলেও তো ভাল ছিল তার। তা হয় কই! যাহোক অল্প কম খাটুনির কাজ খুঁজতে লাগল সেই থেকে। প্রতিদিন দোকানে খদ্দের আসবার আগে সে খবরের কাগজের কর্মখালির বিজ্ঞাপনগুলো পড়ে ফেলত আগাগোড়া, তাতেও বিশেষ সুবিধে হয়নি তার। শেষে একদিন এই কাজটার জন্যে বিজ্ঞাপন তার সন্ধানী চোখে ধরা পড়ে। রেষ্টুরেন্টের কাজ ছেড়ে তাই আজ সে বড়লোকের বাড়ীতে চাকরগিরি করছে। মোটের ওপর ভালই আছে এখানে। এখন বড়লোকের মেয়ের মুখের ওপর কথা বলে শেষ সম্বল চাকরের চাকরীটা খোয়াবে নাকি! তার ওপর মিনা বড় ভাল মেয়ে। তার জন্যে কুঁজি নিয়েও কত কি করে, এই বাজারে চাকরের জন্যে কারো একটা মাথা ব্যথা দেখা যায় না। সত্যি এ তার অসীম সৌভাগ্য ছাড়া আর কিছু না। আপাততঃ মেগে গেছে বটে তার ওপর—কিন্তু ও রাগ জল হতে বেশী সময় লাগবে না। আর বিলম্ব না করে কাঁটা ফেলে সে জল আনতে ছোটে।

চক্ চক্ করে পুরো এক গ্লাস জল খেয়ে গ্লাসটা পটলের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল মিনা, 'আঃ বাঁচলাম, পটলদা তোমার জয় হোক।' এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পেলো পটলের ওর কথায়। সত্যি, মিনার মনটা খুব সরল। কোন ঘোর প্যাঁচ নেই ওর মনে। তবে মধ্যে মধ্যে মিনার

আচার আচরণ কি রকম অস্বাভাবিক ঠেকে, তখন তার ধারণা কি রকম যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। মিনা ডাকল, 'পটলদা শুনে যাও,' কাঁটা খুয়ে পটল সঙ্গে সঙ্গে মিনার কাছে হাজির। খালি হুকুমের অপেক্ষা। 'আচ্ছা পটলদা, এখানে এসে অবধি তুমি বাইরে বেরিয়েছ কোনদিন?' 'না।' 'আচ্ছা তোমার কি বাইরে মুক্ত বাতাসে একটু বেড়াতেও ইচ্ছে করে না! খালি কাজ আর কাজ! কি তুমি পটলদা! আজ সন্ধ্যের সময় সমস্ত কাজ ফেলে বাইরে থেকে বেড়িয়ে আসবে বুঝলে?' 'আজ্ঞা।' কাঁটা তুলে নিয়ে ফের সে আপন কাজে মন দেয়। মনে মনে ভাবে, চাকরের আবার বেড়ানোর বিলাসিতা! মুখে কাঁটা, রাগের চোটে মনে মনে নিজের মুখে নিজেই কাঁটা মারে। তবু মনিবের মেয়ে যখন বলেছে না শুনে উপায় নেই। বিশেষ করে সে যখন মিনার অনুগ্রহপ্রার্থী।

চাকরের কাজ করলেও পটলের মনে লেখাপড়া শিখবার আগ্রহ বেশ প্রবল। কিন্তু সুযোগ আর সময়ের অভাবে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি এতদিন। এখন পটল মিনার ঘরে কাঁট দিতে ঢুকে লুকিয়ে চুরিয়ে ওর বই পড়ে। কিছু বোঝে, আবার কিছু বোঝে না। তবু তার পড়া চাই, বার বার পড়তে পড়তে কোন কোন বই তার মুখস্থ হয়ে গেছে প্রায়। ক্লাশ টেন-এ পড়ে মিনা, ওর অর্ধেক বই এর মধ্যে পড়ে ফেলেছে পটল। মাঝে মাঝে ভাবে যদি পরীক্ষা দেবার সুযোগটা মিলত তবে হায়ারসেকেণ্ডারীটা অন্তত পাশ করতে পারত।

একদিন অবশ্য পটল ধরা পড়ে গেল মিনার কাছে, পড়তে পড়তে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে। তাই মিনার নিঃশব্দ আগমন টের পায়নি। পা টিপে টিপে মিনা পটলের পিছনে এসে দেখে সে তার ভূগোল বই পড়ছে মনোযোগ দিয়ে। হঠাৎ কি খেয়াল হতে মুখ ঘুরোতেই পটল দেখতে পায় মিনাকে তার পেছনে। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। কোন বাড়ীতে চুরি করতে এসে আচমকা ধরা পড়লে চোরের যেমন অবস্থা হয়, মিনার কাছে ধরা পড়ে পটলের ঠিক সেই রকম অবস্থা তখন। মুখ কাঁচুমাচু করে অপরাধীর মত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মিনার সামনে। ঘর ছেড়ে চলে যাবার সাহস পর্যন্ত হয়না তার। পটল দুরু দুরু বক্ষে ভাবে আজ তার রক্ষে নেই। নির্ঘাৎ এ খবর ওর মা'র কানে উঠবে। আর এর একমাত্র পরিণতি বরখাস্ত। আবার তাকে ভিখিরীর জীবনযাপন করতে হবে। নিজের অন্ধকারময় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে শিউরে ওঠে পটল।

তাকে অবাক করে দিয়ে মিনা বলল, 'কতদূর অবধি লেখাপড়া করেছ পটলদা?' 'স্কুলে যাবার সৌভাগ্য কোনদিন হয়নি আমার।' ঘড়ে প্রাণ আসে পটলের এতক্ষণে। 'তবে মামা বাড়ী থাকতে মামাতো ভাইবোনদের বই পড়েছি ছেড়ে চিঠে। আর এখানে এসে চুরি করে করে তোমার বই পড়ে শিখেছি যেটুকু, সেটুকুই আমার বিদ্যা। এর বেশী আর কিছু জানিনা।' 'পটলদা তোমার যখন লেখাপড়া শিখবার এতই আগ্রহ, তখন খুশীমত এই ঘরে এসে আমার বই পড়বে, তবে লক্ষ্য রাখবে মা'র চোখে যেন না পড়ে এসব, বাবা অবশ্য ছোটখাট বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না, নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে সব সময়, খালি ভয় মাকে। আর হ্যাঁ আজকে খবরের কাগজে দেখলাম কোথাকার এক কারখানায় লোক নিচ্ছে। তুমি কপাল ঠুকে এপ্লাই করে দাও। হয়ে যেতেও পারে, চাকরীর ব্যাপারে জোর করে কিছু বলা যায় না।' 'আমার যে কোন কোয়ালিফিকেশন নেই। কি দেখে আমাকে নেবে?' 'কোয়ালিফিকেশন বলতে ক্লাশ এইট পাশ হলেই চলবে।' 'আমার তো তাও নেই!' 'স্কুলের একটা পাশ সার্টিফিকেট তো, ও আমি যাহোক করে জোগাড় করতে পারব, সে বিষয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে। প্রথম দেড় বছর এপ্রেন্টিস থাকতে হবে। তখন ষাট টাকার মত মাইনে দেবে। শিক্ষানবিশীর কাল শেষ হলে একশ থেকে দেড়শ টাকার মত মাইনে হবে। আমার মনে হয় এ কাজটা তোমার হয়ে যাবে, আর লোকের বাড়ী চাকরের কাজ করার চেয়ে এ চাকরী শতগুণে শ্রেয়। তাছাড়া এতে ভবিষ্যত আছে তোমার।' মিনার মুখে এসব শুনে আশার আনন্দে পটলের চোখ চিক্ চিক্ করে ওঠে।

মানুষ ভাবে এক—হয় আর, ওই দিন থেকে নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে পটল যে স্বপ্নের জাল বুনে চলেছিল তা বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাসে ছিন্নভিন্ন হল এক সময়। পড়ার ঘরে পটল ও মিনার মধ্যে কি নিয়ে জানি তর্ক চলছিল সেদিন। বাইরের দিকে তাদের কারোর

নজর ছিল না আগে। কি ধরকারে মিনার মা নীলিমা দেবী সেখানে এসে এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে ফেটে পড়েন রাগে। ঘরে ঢুকে পটলকে যা নয় তাই বলে তিরস্কার করেন প্রথমে। শেষে যাবার সময় বললেন, আর কখনো যদি দেখি এই ঘরে ঢুকে মিনার সঙ্গে আড্ডা মারছিস তবে পিঠের চামড়া তুলে নেবো, যা বেরো ঘর থেকে। ডাকর হয়ে আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে আসিস, তোর সাহস তো কম না!' মরমে মরে যায় মিনা, চুপ করেও থাকতে পারে না আর। বলে, 'শুধু শুধু কি বলছ মা ওকে? ওর কোন দোষ নেই। ওকে ডেকে এনেছি আমি, যা বলবার আমাকে বল।' জ্বলে উঠলেন নীলিমা দেবী। 'তুই থাম তো মিনু, ফের যদি ওর সঙ্গে কথা বলতে দেখি কোনদিন, তবে তোকে আর আস্ত রাখব না।' কথাগুলো বলে আর দাঁড়ালেন না তিনি। দুমদাম করে পা ফেলে নিজের ঘরে গিয়ে দড়াম করে বন্ধ করে দিলেন কপাট।

ওই দিন রাতে খাওয়া দাওয়ার পর মিনা মাকে লুকিয়ে চুপি চুপি পটলের ঘরে এসে দেখে সে বসে আছে চুপচাপ। বিনা কারণ বুঝখানি দেখেই বোঝা যায় নীলিমা দেবীর কড়া ব্যবহারে কতখানি আঘাত পেয়েছে সে। এরপর পটলদা কি আর তাদের বাড়ীতে থাকবে? মনে হয়তো না। যাকগে এসময় ওসব চিন্তা করে লাভ নেই। পটলদা রাগ করে খায়নি এখনো। ওর খাবারটা নিয়ে আসিগে, নিঃশব্দ পায় চলে যায় মিনা রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে।

রান্নাঘরে এসময় কাউকে না দেখে চুপি চুপি ঢুকে পড়ে মিনা চোরের মত। থালায় ভরে ভাত মাছ তরকারী আঁচল চাপা দিয়ে নিয়ে এসে পটলের পাশের নামিয়ে রাখে মিনা। বলে 'পটলদা খেয়ে নাও। রাত হয়েছে বেশ।' বিরক্ত হয় পটল। বলে, 'কেন এসব হাঙ্গামা করতে গেলে বলতো? তোমার মা দেখতে পেলে রক্ষে রাখবেন ভেবেছ আমাদের? এখন থেকে শিগগির পালাও তুমি। কষ্ট করে বয়ে এনেছ যখন খেতে চেষ্টা করব।' 'উঃ তুমি যেন কি! তাড়াতে পারলে বাঁচো।' 'আবার কথা বাড়াচ্ছো? তোমার কি একটু ভয়ডর নেই মিনা!' 'যাচ্ছি। খেয়ো কিন্তু, নইলে আড়ি হয়ে যাবে বলে রাখছি।'

পরদিন সকাল, জানলা দিয়ে রোদ ঢুকে পড়েছে পটলের ঘরে। সকলের অলক্ষে মিনা পটলের ঘরের সামনে এসে থামে। দরজা ভেজানো দেখে ভাবে পটলদা বোধহয় ঘুমোচ্ছে এখনো। জাগিয়ে দিতে হয়, নইলে মা দেখলে বকাবকি শুরু করবে। মা'র যা মেজাজ! একটু ঠেলতেই খুলে যায় দরজা, একটা নেংটি ইঁদুর লাফ দিয়ে চৌকাঠ পেরিয়ে তার পাশ দিয়ে কোথায় পালায় যেন। তাড়া নড়-বড়ে খাটটার দিকে নজর পড়তে মিনা বিস্মিত হয় বেশ, খাট খালি। পটলদার বিছানা-পত্তর, বাক্স, জামাকাপড় কিছু নেই। ওগুলো হাওয়া হয়ে গেল নাকি? আর পটলদাই বা কোথায়? ওকে তো দেখছি না! তবে কি চলে গেল ওকে না জানিয়ে? সেই সময় খাটের ওপর চিল চাপা একটুকরো কাগজ মিনার চোখে পড়ল হঠাৎ, সে কাগজটা হাতে নিয়ে দেখে তাতে মাত্র কয়েক লাইন লেখা। হাতের লেখাটা যে পটলদার একবার দেখার পর সে বিষয়ে সন্দেহ রইল না মোটে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে চিঠি টুকু। 'আমি স্বেচ্ছায় চলে যাচ্ছি। কারোর ওপর রাগ করে নয়। আমাকে ভুলে যেও।' পত্রের নীচে নিজের নামটুকু পর্যন্ত লেখেনি পটলদা। পাছে সে বিপদে পড়ে। চিরকুটটা হাতে পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মিনা। তাকে দেখে মনে হয় না প্রাণ আছে তার দেহে।

এরপর একটি একটি করে দশটি বছর কেটেছে তার চোখের সামনে দিয়ে। পরিবর্তন হয়েছে অনেক কিছুর। কিন্তু মিনার মনের কোন পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। বিয়ের পর কোলে এসেছে কন্যা সন্তান। সুদর্শন স্বামীর ভালবাসাও পেয়েছে ও পাচ্ছে অকুণ্ঠভাবে। কিন্তু তবু কেন জানি সে ভুলতে পারেনি পটলদাকে।

আচমকা ঘুলা কেঁদে উঠতেই মিনার স্মৃতির সুতো ছিঁড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে কোলে তুলে নেয় ঘুলাকে। আদরে আদরে ভরিয়ে তোলে তাকে।

সেদিন অফিস বেরোচ্ছে বিমান এমন সময় মিনার তাকে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, 'কিছু বলবে?' মুচকি হেসে মিনা বলল, 'পেছনে ডাকলাম বলে রাগ করলে নাতো!' 'কি যে বলো তার ঠিক নেই। খামোকা রাগ করা আমার স্বভাব নয়। তা কি বলবে যেন মনে হচ্ছে। চটপট বলে ফেলো দিকি। অফিসের সময় হয়ে যাচ্ছে।'

'আচ্ছা থাক পরে বলব। তুমি এখন অফিস যাও।' 'অমনি গোসা হয়ে গেল। না আর পারব না তোমাকে নিয়ে।' মিনার কাছে এসে একখানা হাত ধরে বলল, 'কি বলবে বল? এই বল না।' 'না কিছু না এমনি।' 'বলবে না তো? আচ্ছা···,' চলে যাচ্ছিল বিমান রাগ করে। মিনা দৌড়ে গিয়ে ওর একটা হাত ধরে বলল, 'এই অফিস ফেরত চানাচুর এনো ত।' 'ও হরি, এই কথা তোমার!' হেসেই বাঁচে না বিমান। 'তা আগে বললেই হত! আমি ভাবলাম কিনা কি। এবার ছাড়' হাত-ঘড়ির দিকে এক পলক চেয়ে দ্রুত পায়ে গলির মোড়ে অদৃশ্য হয়ে যায় বিমান। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মিনা সেই দিকে।

কতক্ষণ ওইভাবে দাঁড়িয়েছিল তা আদৌ খেয়াল ছিল না মিনার। একসময় পথচারীদের গলা কানে আসতেই সম্বিত ফিরে আসে তার। সামনে রাস্তার দিকে নজর পড়তে মিনা কেমন অবাক হয়ে যায়। মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোয় না। শুধু বোবা চোখে তাকিয়ে থাকে তাদের পানে। পটলদা না? হ্যাঁ—সে রকমই তো মনে হচ্ছে। ওঃ! কত পরিবর্তন হয়েছে পটলদার! চেনাই যায় না! পরণে দামী ট্রাউজার আর হাওয়াই সার্ট। হাতে রিস্টওয়াচ। চুল বাঁকে ব্রাশ করা নয় শুধু—ঢেউও খেলানো। চেহারায় বেশ চেকনাই এসেছে। মাংসও লেগেছে গায়ে মন্দ না। আগের পটলদার সঙ্গে এখনকার পটলদার কোন মিলই নেই। একেবারে আকাশ পাতাল তফাৎ সব দিক দিয়ে। কিন্তু সঙ্গে ওই মেয়েটি কে! মাথায় আবার সিঁদুর! তবে কি পটলদার বউ! এর মধ্যে পটলদা বিয়েও চুকিয়ে ফেলেছে তাহলে! ওঃ কতদিন পরে দেখা! আর কোনদিন যে পটলদার দেখা পাবে এ সে আশাই করেনি!

মিনা আর থাকতে পারে না। গেট খুলে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়। ওর সর্বশরীর তখন অধীর আনন্দে থরথর করে কাঁপছে। গলা দিয়ে স্বর বেরোতে চাইছে না। তবু কোন রকমে ডাকল মিনা, 'পটলদা শোন'। নারী কণ্ঠে নিজের নাম শুনে ঘুরে দাঁড়ায় পটল। অবশ্য নতুন জীবনে এবেশ করে পটল তার ছেলেবেলার নাম অনেক আগেই পাল্টে ফেলেছিল। পটলের স্ত্রী নীলা এই নাম জানত না। চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তে তাই সে বলল, 'কি হল দাঁড়ালে কেন?' মানিময় অতীত জীবনকে মাটি চাপা দিতে পটল মিথ্যার আশ্রয় নেয় এখন। বলে, 'দেখছো মেয়েটা যেন কাকে ডাকছে। আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।' নীলা বলে ওঠে, 'তাতে তোমার কি! তোমাকে তো আর ডাকছে না! তুমি দাঁড়ালে কেন?' 'না মানে,' ঢোক গেলে পটল। 'আমরা ছাড়া এদিকে তো আর কেউ নেই এখন! অথচ ও এদিক পানে চেয়েই কাকে ডাকছে যেন!' 'বয়ক্কগে তাতে তোমার কি? তোমাকে তো আর ডাকেনি?' 'না না আমাকে ডাকতে যাবে কেন! আমাকে ও চেনেই না।'

ওদের কথাবার্তা অদূরে দণ্ডায়মান মিনার কানেও আসছিল আবছা আবছা। তাতে পটলদার মনোভাব পরিষ্কার হয়ে যায় তার কাছে। নিজের অতীত জীবনকে ভুলবার ভঙ্গে পটলদা তাকে চিনেও না চেনার ভাণ করছে। অবশ্য সেজন্যে পটলদাকে পুরো দোষ দেওয়া যায় কি? মনে হয় না। কেন না ও যদি এখন ধরা দেয় তার কাছে, তবে কথায় কথায় নিশ্চয় ফেলে-আসা জীবনের কথা কাহিনী বেরিয়ে পড়বে আস্তে আস্তে। তাতে ওর স্ত্রী আঘাত পাবে হয়ত মনে মনে। মুখে কিছু বলুক আর নাই বলুক, তাছাড়া ওদের নতুন জীবনে চিড় ধরে যদি তাতে! তখন! পরিচয় না দিয়ে ঠিকই করেছে পটলদা।

কি জানি কেন ওর কাছে এসে পড়েছিল মিনার। হয়ত নীলার সন্দেহ দূর করতে পটলকে আস্ত হয়েছিল বাধ্য হয়ে, কোন রকমে বলল মিনা, 'মাপ করবেন, আমার ভুল হয়ে গেছে,চোখে একটু কম দেখি কিনা!' পটল বুঝতে পারে সব। চিনতে পারে মিনাকে। তবু কেন জানি না, নীলার সামনে মিনার কাছে ধরা দিতে পারে না। ভেতর থেকে কেউ যেন মানা করে তাকে। নীলা বলল, 'চোখে যদি কম দেখেন তবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাকে খুঁজছেন? মোটর চাপা পড়বেন যে! ঘরে যান।' 'যাচ্ছি।' তবু যেতে পারে না মিনা। তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। ওরা আর দাঁড়ায় না। পথের বাঁকে হারিয়ে যায়। মিনার গাল বেয়ে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে রাস্তায়।

আচার্য্য শিরীষচন্দ্র

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

সাময়িকী সম্পাদনে অনেক বর্ষ অতীত হইল। সময় গিয়াছে, এখন কোন সাময়িকীর সন্ধান পাইলে তাহার জীবনকালের রূপ দেখিবার আগ্রহ হয়। কারণ সে এক ধরণের ইতিহাস। আর ইতিহাস বর্ত্তমানকেই উজ্জ্বলতর করে। তাই স্বভাবতঃই আমরা শুধু বর্ত্তমানে সন্তুষ্ট না থাকিয়া অতীতের অন্ধকারে প্রবেশ করিয়াও কিছু আলো খুঁজিতে চাই।

হঠাৎ কেমন করিয়া ১৩২৯ সালের (বঙ্গাব্দ) এক নিরুদ্দিষ্ট 'পথিকে'র দেখা পাইলাম। 'পথিক' একটি সাহিত্য পত্রিকা। 'পথিক'কে আশীর্ব্বাদ করিয়া দেখিলাম রায়চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, "পূর্ব্বকালে ভারতে পথিকের বড় আদর ছিল। 'পারিবারিক প্রবন্ধে' আবার স্বর্গীয় আচার্য্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে "একটি কপর্দ্দকসঙ্গে না লইয়া, তখন ভারতের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে বেড়াইতে পারা যাইত।··· জগতে সকলেই পথিক। সূর্য্যচন্দ্রগ্রহ-উপগ্রহ, জীবজন্তু সকলেই পথিক।···আমরা মানুষ আমরাও অনন্তপথের পথিক···ভারত এখন পথিক—ধর্ম্মপথের পথিক।" ভারত আজও পথিক। নবজন্ম লাভ করিয়া নব উদ্যমে সে পথ-পরিক্রমা শুরু করিয়াছে। সাহিত্য পত্রিকা 'পথিক' বহুদিন পথ ছাড়িয়া সরিয়া গিয়াছে।' পথিকের সম্পাদক সেদিন লিখিয়াছিলেন, "বঙ্গদর্শন' মায়ের মরাল-কুন্তলে ফুঁদের গোড়ে গড়িয়া দিয়াছিল, পথিকের সে কোসাড় কই? 'ভারতী' মা'র মণিবন্ধে কমলের কাঁকণ ফুঁদিয়া দিয়াছিল, পথিকের প্রতি কমলার সে কৃপা কই? 'বান্ধব' মার কটিতটে অপরাজিতার শ্যাম নীলাম্বরশাটি পরাইয়া দিয়াছিল, পথিকের তেমন ভাগ্য কই? 'নবজীবন' রাঙ্গাজবা দিয়া ষোড়শোপচারে মায়ের আরাধনা করিয়াছিল পথিকের তেমন সাধনা কই? যাই হোক,—পথিক পথের ধারের দূর্ব্বা তুলিয়া দূর্ব্বাদলে মা'র পদপূজা করিবে। ঘাসফুলের নরম শুভ্র-পঙ্কজ গাঁথিয়া মার পায়ে পরাইয়া দিবে।···পথিক বেড়াইবে,—যেথায় ষড়্রিপুর ফুল আপনি ফুটে, ষড়্রিপুর বাঁধন আপনি টুটে; যেথায় ভাবের ষট্‌পদেরা আপনি ছুটে, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীগুরুসঙ্গ আপনি জুটে।"

'পথিকে'কে যিনি এই প্রবর্ত্তনা দিয়াছিলেন তিনি আজও জন-বিরল হইতে দূরে নিঃশব্দে পথ চলিতেছেন। "পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়, পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়।" সুদীর্ঘ পথের দুধারের দেবালয়গুলির সেই নিঃসঙ্গ পূজারীর কথাই কিছু বলিব। সেদিনের সে 'পথিকে'র সম্পাদক ছিলেন শ্রীশিরীষচন্দ্র কামদেবি। চব্বিশ পরগণা জেলার প্রসিদ্ধ শ্রীপাট খড়দহ গ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিত কামদেবের বংশোদ্ভূত কামদেবি মুখোপাধ্যায়। খড়দহ গ্রামের ইতিহাস আছে, ঐতিহ্য আছে। কবিরামের 'দিগ্বিজয়-প্রকাশে' খড়দহের উল্লেখ আছে। প্রায় চারি শত বৎসরের প্রাচীন শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউর মন্দিরের সন্নিকটে প্রভু নিত্যানন্দ বাস করিয়া গিয়াছেন। তাই কামদেবি গাহিয়াছেন,

"শ্রীপাট খড়দহ নিত্যানন্দ গেহ
পদরজে যার রঞ্জিত এ ধাম।
অর্দ্ধাঙ্গিনী তাঁর 'বসু' 'জাহ্নবা'র
সম্মুখে সমাধি রূপে হরিনাম।"

বঙ্গবাসীর ন্যায় খড়দহবাসীও শুধু কৃষ্ণে সংন্যস্তধী নহে, তত্ত্বেও বস্তিতন্বী। খড়দহের জমিদার প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয় দ্বাদশ শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া লক্ষ শালগ্রাম শিলার পূজা করেন ও নবদ্বীপের কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহোদয়ের পৌত্র রামতোষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে খড়দহে আহ্বান করেন। প্রাণকৃষ্ণের উৎসাহে রামতোষণের পরিশ্রমে সঙ্কলিত হয় 'প্রাণতোষিণী' বঙ্গের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। কামদেবের ত্রয়োদশ অবতন পুরুষ ভুবনচন্দ্র

বিদ্যানিধি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জগমোহন তর্কালঙ্কার, গিরীশ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রাদি বিষয়ে তর্কালোচনা করিতেন। একবার বারাণসী হইতে আগত এক পণ্ডিতকে একমাত্র গীতাগ্রন্থে নিরস্ত করিয়া চমৎকৃত করেন। ইঁহারই পুত্র শ্রীশিরীষচন্দ্র কাব্যদেবি (মুখোপাধ্যায়) ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। খড়দহে ও পরে বারাকপুর গভর্ণমেণ্ট স্কুলে পাঠান্তে বৃত্তিলাভ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতে থাকেন। তিনি কৈশোরেই 'বালিকা' নামীয় এক হস্তলিখিত পত্রিকার সম্পাদনা করেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি স্যর জগদীশ বসু ও পি, সি, রায়ের নিকট বিজ্ঞান, বিখ্যাত অধ্যাপকত্রয় টনি, রো ও পার্সিভালের নিকট ইংরাজী ও পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নিকট সংস্কৃত ভাষা পাঠ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে 'হ্যামলেট' অভিনেতা হিসাবে তাঁহার সুনাম ছিল। তিনি সহপাঠিগণের নিকট 'কবি' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এম্, এ, পরীক্ষায় অবতীর্ণ না হইয়া তিনি কোনও এটর্ণী সংস্থায় যোগ দেন, কিন্তু তাঁহার মনোগঠন তাঁহাকে সেখানে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। ১৯০১ সালে তিনি হাওড়া জেলার আন্দুল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে (অধুনা মহীয়াড়ী কুণ্ডু চৌধুরী ইন্‌ষ্টিটিউশন্) প্রধান শিক্ষকরূপে যোগ দেন। এই বিদ্যালয়টি (প্রতিষ্ঠিত ১৮৩৪ খৃঃ) এবং এই স্থানটিও ঐতিহ্যমণ্ডিত। এই সারস্বতপীঠের অনতিদূরে পুণ্যতোয়া সরস্বতীনদী প্রবাহিতা। সরস্বতীর সেই অবিশ্রান্ত স্রোতোধারার মত এই নব সারস্বত-ব্রতীর সারস্বতযজ্ঞের সেদিনের প্রজ্জ্বলিত অগ্নি বহুকাল ধরিয়া অনির্ব্বাণ থাকিয়াছে। এ বিদ্যালয় "সিপাহী বিদ্রোহ" দেখিয়াছিল। এখন দেখিল বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন। প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের মাতাইলেন, গান লিখিলেন, ছাত্রেরা গাহিল, বিলাতী পণ্যের বহ্ন্যুৎসব হইল। বিলাতের কাগজে অজ্ঞাত পল্লীর নাম উঠিল, বিদেশী শাসকের অগ্নিচক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সে কত ঘটনা, কত উত্তেজনা—আধার কত না শান্ত সমাহিত, মৌন, সুদীর্ঘ সাধনা।

এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ৺দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং ছাত্র ছিলেন তাঁহার ভ্রাতা স্যার

আচার্য্য শিরীষচন্দ্র

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পিতা ৺ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। (এসকল ইতিহাস 'ভারতবর্ষ' ২২শ বর্ষ ১ম খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে।) কাজেই নূতন প্রধান শিক্ষকের আহ্বানে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে স্যার আশুতোষ এ বিদ্যালয়ে আসিতে সানন্দে সম্মত হইলেন ও তদবধি নবীন প্রধান শিক্ষক প্রবীণ উপাচার্য্যের স্নেহপাশে আবদ্ধ হইলেন। আসিলেন তদীয় অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র, স্যার সি, ভি, রমন, ডক্টর ভাণ্ডারকর, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কৃপেন্দ্রনাথ দত্ত, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার, রাধাবিনোদ পাল ও অন্যান্য বহু মনীষী। শিক্ষাব্রতে উৎসর্গীকৃত জীবনের পঞ্চাশটি বৎসর, একে একে অতিক্রান্ত হইল। সে ইতিহাস অমূল্য সম্পদপূর্ণ, আজও লিখিত হয় নাই। শিক্ষা ও শিক্ষণ যে কিরূপ সাধনা হইতে পারে, তাহার এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল আছে, কিন্তু আমাদের জানা নাই। অনেক শিক্ষক বলিয়া থাকেন, "যাহা করি তাহা করিও না, যাহা বলি তাহা কর"। কিন্তু ইহা উত্তম নহে। আচার্য্যের কার্য্য—আচরণ করিয়া শিক্ষা দেওয়া। 'আপনি আচরি' ধর্ম্ম

অপরে শিখায়।' সেক্সপীয়রের প্রতিধ্বনি পাই, It's a good divine who follows his own instructions," ইহাই এই শিক্ষাব্রতের নিকট অন্তেবাসীর উপর ধরিয়া অবিশ্রান্ত চালাইয়া পাইয়া আসিতেছে। শিক্ষাই তাঁহার আদর্শ ছিল, শিখন উপলক্ষ মাত্র—"I am taught best by teaching." সংসারের সহিত সংস্রব ছিল না। যে কোনও ছাত্র অপেক্ষা তিনি নিত্য অধিক পাঠ করিতেন। বিদ্যালয়ের ও স্বগৃহের বিপুল গ্রন্থ-সম্ভার তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ছাত্রেরা ব্যাখ্যা শুনে নাই, ব্যাখ্যাতা হইতে দেখিয়াছে—ঋষেণীয়া সেই বাণী, "অনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ সংদধামি।" বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সেক্সপীয়র অভিনয় করিয়াছে, ভট্টি-ভবভূতি-কালিদাস শুনিয়াছে, সন্নিকটে আসীন হইয়া উপনিষদ লিখিয়াছে, আবার সায়েন্স 'ডিগ্রিও শুনিয়াছে :

"চতুর্বিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসেৎ।
জটী মুণ্ডী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।

—কারণ পুস্তক ও পাঠ্যতালিকার বিদ্যা 'ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে।' তাই এই শিক্ষাব্রতীর শিক্ষাধারার গতি ছিল ভিন্ন। তথাপি তাঁহার কর্মধারা পঠন-পাঠনেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

স্থানীয় জনকল্যাণমূলক সংস্থা ও উদ্যোগে তিনি সকল সময়েই অগ্রণী হইতেন। 'দক্ষিণ নবদ্বীপ' আখ্যাপ্রাপ্ত আন্দুল ও পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের অতীত ইতিহাস তাঁহাকে আকর্ষণ করিত। ফলে তত্রত্য অবলুপ্ত প্রায় ত্রিশটির অন্যতম টোলের অধ্যাপক সিদ্ধতান্ত্রিক পণ্ডিত ভৈরবীচরণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সিদ্ধ পঞ্চমুণ্ডাসন আবিষ্কার করেন। সুপ্রসিদ্ধ সাধক-কবি প্রেমিকমহারাজের (মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য) সংস্পর্শেও তিনি আসেন। তাঁহার রচিত প্রেমিকবন্দনা গাহিয়া 'আন্দুল কালী-কীর্তন সমিতি' কালী-কীর্তন গাহিয়া থাকেন। বিখ্যাত ইংরাজ তত্ত্বানুরাগী কলিকাতা হাইকোর্টের বৃত্তপূর্ব জজ স্যার জন উডরফ্ তন্ত্র-গ্রন্থ সন্ধানে অটলবিহারী ঘোষ মহাশয়ের সহিত আন্দুল রাজবাটিতে উপস্থিত হইলে স্থানীয় ইংরাজী বিদ্যালয়ের এই প্রধান শিক্ষক মহাশয়কেই তাঁহার সহিত আলাপাদি করিতে হয়। নবীন শিক্ষক যান-পূর্তা দিয়া সাহেব তান্ত্রিককে আপ্যায়িত করিয়া দেওয়ালে প্রলম্বিত নৃত্যশীলা আনন্দময়ী মহাকালীর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের

"A dancing shape, an Image gay,
To haunt, to startle, and way-lay."

—এই পংক্তিদ্বয় উদ্ধৃত করিলে উডরফ্ সাহেব তন্ত্রানুরাগী ইংরাজী-শিক্ষকের সহিত চিরবন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে 'প্রাণতোষিণী' তন্ত্র-সংগ্রহে উডরফ্ সাহেব ষড়দলের বিন্যাস বসিতেও শিখাইয়াছিলেন। শিরীষচন্দ্র বঙ্কিম-স্মৃতিবিজড়িত আন্দুলের কিছু প্রাচীন ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করেন ও প্রতি কোনও অধ্যাপক-গবেষককে এ বিষয়ে তথ্যাদি দিয়া সাহায্য করেন। লোকব্যবহার ভিন্নও লোকচক্ষুর অন্তরালে গভীর নিশীথে বিদ্যালয়-ভবনে সাধকদিগের আগমন ও চক্রাদির কথাও জানা যায়। জনৈক অনুরাগী লিখিয়াছেন,

"মহানিশা-কালে কত—হে সাধক—ধ্যানমগ্ন চিতে
বসেছিলে যোগাসনে 'পঞ্চমুণ্ডী'—বেদীর উপরে,
লভিলে সিদ্ধির বাণী সুপ্রসন্না শ্রীদেবীর বরে।"

জনারণ্যের কোলাহলের বাহিরে এই সুদীর্ঘ সাধক-শিক্ষক-জীবনের ইতিহাস একটি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নহে।

নরেন্দ্রনাথ দত্তের সহিতও আন্দুলের যোগ ছিল একাধিক সূত্রে। শিরীষচন্দ্র সে সকল কথা জানিয়া ছিলেন। পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী তলায় ও পরে স্টার থিয়েটারে তিনি তাঁহার ভাষণ শোনেন ও তাঁহাদের কিছু কথা হয়। ১৯০২ সালে স্বামীজী দেহরক্ষা করিলে আন্দুল বিদ্যালয়ে একটি মহতী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়; তথায় প্রদত্ত ভাষণের অনুলিপিতে পূর্ব সাক্ষাৎকারের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত যে পরিচয় ঘনীভূত হইবার সুযোগ পায় নাই তাহা সংহত-রূপ লাভ করিয়াছে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতায়। গিরিশচন্দ্র 'বিল্ব-মঙ্গল' লিখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখাইতে পারেন নাই। বিবেকানন্দের সহিতও অসম্পূর্ণ এই আলোচনা শিরীষচন্দ্রের সহিত সম্পূর্ণ করিয়া গিরিশচন্দ্র আনন্দিত হইলেন। নবীনে প্রবীণে শঙ্করাচার্যের

জীবনের কয় আলোচনা হইল। গিরিশচন্দ্র বলিয়া থাকেন, শিরীষচন্দ্র ও তদীয় অগ্রজ ৺যতীশ-ভ্রাতে অবিনাশবাবু মহাকবির নূতন পাণ্ডুলিপি পড়িয়া শোনান; সমালোচনা হয়, গিরিশচন্দ্র স্বয়ং আলোচনায় যোগদান করেন, পাণ্ডুলিপি প্রেসে যায়। মৃত্যুর প্রাক্কালে গিরিশচন্দ্র ইঁহাদের খড়দহের 'রাম-দক্ষণ' বলিয়া উল্লেখ করেন।

অগ্রজ ৺যতীশচন্দ্র বিদ্যার্থব শ্রীঅরবিন্দের সহিতও গোপন ও ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন। তিনি 'বন্দে-মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন ও সাহিত্যাদি পত্রিকায় লিখিতেন। দুই ভ্রাতায় ১৩১৮ বঙ্গাব্দে 'রবীন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথ' লিখিয়াছিলেন। শিরীষচন্দ্র সাক্ষাৎপরিচয় ও গিরিশচন্দ্রের সান্নিধ্যে বিবেকানন্দকে বুঝিয়াছিলেন ও অগ্রজের মধ্যস্থতায় শ্রীঅরবিন্দকে জানিয়াছিলেন। তাই তিনি আশীর কোঠায় প্রবেশ করিয়া 'The two Towers of the Orient'—এ বিবেকানন্দ অরবিন্দজড়িত তাৎকালিক রাজচিত্র রোমন্থন করিলেন। বলিলেন, "May these rambles in the realm of the Renaissance India, still growing from strength to strength, "Through flood' through fire," approximating the toured' hori Zon being built up by selfless men of genius and sous of women of faith, named or unnamed here, yet nameable, be a pilgrimage keeping you Company, O Reader।

দুই ভাইই বঙ্কিমভক্ত—কপালকুণ্ডলা—আনন্দমঠের বঙ্কিম, বর্ষভব-কৃষ্ণচরিত্রের বঙ্কিম। তাই সুরেশ সমাজপতি সঙ্কলিত 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গে' দেখি যতীশচন্দ্রের 'বঙ্কিম-স্মরণ-বার্ষিকী'। 'পাকযন্ত্রে'র পুরাণো খণ্ডে খণ্ডে দেখি শিরীষ-চন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা-কাব্য'। ১৩১৮ সালের 'রবীন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথে'র কথাও অনেকেই জানেন না। কিন্তু ৩৬৬ সালে আদিত্য ওহাদেদার 'রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার ধারা'র ১৩২৩ সালের 'সাহিত্য' হইতে যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ধরিয়াছেন। রবীন্দ্রবিয়োগে শিরীষচন্দ্রের 'রবি-সভাজন'কে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, মূলাঙ্ক না দেখিয়া, লক্ষ মুদ্রার সামগ্রী বলিয়া উল্লেখ করেন। তাই বোধহয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ রবীন্দ্রচর্চ্চার গ্রন্থপঞ্জীতে (গ্রন্থাগার: বৈশাখ ১৩৬৮) ক্ষুণ্ণ হইলেও 'রবি-সভাজনে'র উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হ'ন নাই। শিরীষচন্দ্রের তত্ত্বাভি-লাষের বহিঃপ্রকাশ তাঁহার অপ্রকাশিত 'তত্ত্ব-চিন্তা'য় পাওয়া যায়। সাধন-সমর-আশ্রমের "পূজায়" 'তত্ত্ব-পদ্ধতি ও স্মৃতি-পদ্ধতি,' 'বেদান্তত্ত্ব ও তন্ত্রসাধন', 'আদ্যাশক্তির অপূর্ব্ব রূপ ও স্বরূপ' প্রভৃতি প্রবন্ধ সুধীজনের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। ছাত্রদের কথাও তিনি সম্পূর্ণ ভোলেন নাই। তাই যখন ছাত্রপাঠ্য মোট বই বাজার ছাইয়া ফেলে নাই, তখন ১৯১৩ সালে 'English poetry for the young'এ annotated miscellaneous English poems প্রকাশিত করেন। 'কৈশোর-কল্পলে'র কবিতা-বলী লিখিয়া কিশোরদের হাতে তুলিয়া দেন। তাহাতেও উপনিষদের ধ্বনি—

"পিতামাতা গুরু, শিক্ষাদাতা গুরু
ত্রিদেব মাঝার মণি।
অতিথিও যিনি, সাধু সন্ন্যাসিনী—
নারায়ণ নারায়ণী।"

ছাত্রদের জন্য ইংরাজী কিশোর কবিতার অনুবাদও করিয়া দিয়াছেন—ব্রাউনিং, টেনিসন, হার্ট্, হেরিক, শেক্সপীয়র, কোলরিজ, ওয়র্ডসওয়ার্থ, কীট্স্ প্রভৃতি হইতে। 'গ্রে'র 'এলিজি' অনবদ্য গদ্য কলেবরে অনূদিত হইয়া যেন নবতর-রূপেই আবির্ভূত হইয়াছে। পুরাতন হ্যামলেট অভিনেতা 'হ্যামলেট'কেও ভুলিতে পারেন নাই। ভাবুকভাবে হ্যাম-লেটের মুখে বাণী দিয়াছেন:

"হও তুমি স্বর্গকায়া কোন,
কিম্বা কোন পিশাচ পাতকী!—
এনে থাক' স্বর্গ হ'তে সাথে সুপবন
কিম্বা কলাবাত নরকের;—
অভিসন্ধি তব—
হয় হোক্ অসাধু বা সৎ,—
এমনই সংশয়ময় ধরিয়া আকার,—
হও আগুসার,—
যাহে প্রাণ চায়—সম্বোধি তোমায়!"

এমন শিক্ষাগুরুর প্রধান-শিক্ষকতাকালের পঞ্চাশদ্বর্ষ-পূর্ত্তিতে ত্রিপুরুষ ছাত্রসঙ্ঘ তাই আচার্য্য শিরীষচন্দ্রের সুবর্ণ-জয়ন্তী অনুষ্ঠান উপলক্ষে বলিয়াছিল:

"কিং বর্ণনীয়ন্তব বা গুণাস্তি মনোহরিণো যো সদসা ময়া সঃ।" তাই সে বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে মন্থর-মূর্ত্তি। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পর জীবনকালে মর্ম্মর-মূর্ত্তি হইতে এতদ্বিধ আর কাহারও দেখি নাই। তাহারও দুই বৎসর পরে (১৯১৩ খৃঃ) অষ্টত্রিংশ বয়সে বিদ্যালয়ের কর্ম্মভার ত্যাগ করার সময়ে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় যথার্থই এই আচার্য্যকে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল বলিয়াছিলেন "India ages but never grows old." ভিন্নবিভিন্নবর্ষে এখনও তাঁহাকে দেখিলে এই কথাই মনে হয়। শরীরের বার্দ্ধক্য মনকে জরাগ্রস্ত করিতে পারে নাই। বহু মহতী সভায় অসংখ্য জিজ্ঞাসু ভক্ত-হৃদয় তাঁহার মধুস্রাবী ভগবদালোচনায় পরিতৃপ্ত হইয়াছে। স্বগৃহে এখনও শাক্ত-বৈষ্ণব, আস্তিক-নাস্তিক, বৃদ্ধ-যুবা, স্ত্রী-পুরুষ, ছাত্র ও সুধী-মণ্ডলী তাঁহার সান্নিধ্যলাভে আনন্দিত হ'ন।

'নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ।' তদীয়া জননী ৺জগন্মোহিনী দেবী সিদ্ধা শক্তিসাধিকা ছিলেন। তাঁহারই প্রেরণায় ও নির্দ্দেশে তিনি সাধকজীবনে প্রবেশ করেন ও এখনও, বৃদ্ধ হইয়াও, মাতৃভক্ত শিশুর মত আনন্দময় জীবনযাপন করিতেছেন। সে কথারও সবিস্তার আলোচনার এখানে পরিসর নাই। এই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের পরিচয় অনেকেই পান নাই। কেননা অর্থোপার্জ্জন বা আত্মপ্রতিষ্ঠার সচেষ্ট না হইয়া তিনি সুদূর পল্লীতে নীরবে শিক্ষা-শিক্ষণব্রতে মগ্ন হইয়া থাকিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ রচনাও অপ্রকাশিতই থাকিয়া গিয়াছে। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ এই শিবতুল্য আচার্য্যকে কৃতার্থ ছাত্রসঙ্ঘ প্রণতি জানাইয়া যথার্থই বলিয়া থাকে :

"কুলপথকৃতরক্ষে কৌলকল্পায়বল্ল —
প্রবলফলকলাপং কৌলিনীহেষ্টচিত্ত।
বিবুধকুলপতে তে দেব যাচে শিরীষ-
মৃদুলচরণযুগ্মং ক্ষম্যতাং নোঽপরাধঃ।"

শব

শ্রীশ্যামলকুমার বিশ্বাস

অসাড় নিষ্প্রাণ দেহটা পড়ে আছে একপাশে
কিছু ফুল ওর উপর ছড়ানো,
কিছুক্ষণ পরেই সাজানো চিতার উপর,
হবে ওকে শোয়ানো।
ও যখন ছিল শিশু, দেহটা ছিল এতটুকু ;
তখন পিতা-মাতার স্নেহতে—
উঠলো বড় হয়ে, কোনরকমে রইলো বেঁচে
নিষ্ঠুর এই পৃথিবীতে।

যখন ওই দেহটা হারিয়ে যেত
প্রেয়সীর তপ্ত আলিঙ্গনে,
জাগাতে চেষ্টা করতো নিজেকে সমাজের
মাঝে, অতি সঙ্গোপনে।
কিন্তু পারলো না, আস্তে আস্তে
বয়স ঘাটে পড়লো যবে,
ছেড়ে চলে গেল ও, এই পৃথিবীকে,
দেহটা পরিণত হলো শবে।

বাসন্তী মাঝরাতের স্বপ্ন

* • • শ্রীমতী লীলা বিদ্যান্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

এথেন্সের কাছে এক বন

ভিন্ন দিক দিয়ে এক পরী—আর পাকের প্রবেশ

পা। কোথায় চ'লেছ, পরী ?

(গান)

পরী। পাহাড়ের ওপর দিয়ে
উপত্যকার মাঝ দিয়ে
ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে
কাঁটা বনের ভেতর দিয়ে
বাগানের ওপর দিয়ে
বেড়ার ওধার দিয়ে
বন্যার ভেতর দিয়ে
আগুনের মাঝখান দিয়ে
আমি চলে যাই
সবখানে আমি উড়ে বেড়াই
চাঁদের চেয়েও আমি বেগে চলি,
পরীরাণীর আমি অনুচরী
সবুজ মাঠে যেখানে সে বেড়ায়
তাকে আমি শিশির-সিক্ত করি।
লম্বা কাউস্লিপ ফুল পরীরাণীর ঘরাতেই
বেঁচে আছে।
ওদের সোনালি উত্তরীয়ের মাঝে
দেখতে পাওয়া যায়
ফোঁটার মত সব চিহ্ন
ওগুলো হ'ল লাল রবী—
ঐ দাগগুলোর মাঝে রয়েছে—
পরীদের মুখের প্রতিচ্ছবি।
যাই ওখান থেকে নিয়ে আসি
শিশিরবিন্দু, ফুলেদের কানে দুলিয়ে দিই—
মুক্তোর দুল, বিদায় পরীদের ভাঁড়—
চ'লে যাই আমি এবার
আমাদের পরীরাণী
আসবে এখানে এখনি
নিয়ে তার সাথী-সঙ্গিনী।

পা। এখানে তো পরীদের রাজা আজ তার উৎসব করবে। দেখো যেন রাণীর সংগে তার দেখা না হয়। ওবারণ যে বেজায় চ'টে আছে। রাণীর কাছে যে ছেলেটি আছে, যাকে এক ইণ্ডিয়ার রাজার কাছ থেকে ওরা চুরি ক'রে এনেছে—অমন সুন্দর ছেলে আর হয় না; পরীরাজ ওবারণ বনে বাদাড়ে ঘুরবার সময় সেই ছেলেটিকে নিজের অনুচর ক'রে পেতে চায়। কিন্তু রাণী তার সেই প্রিয় ছেলেটিকে কিছুতেই দেবে না। রাণী তার মাথায় ফুলের মুকুট পরিয়ে দেয়, তাকে নিয়ে সে একাই সমস্ত আনন্দটা ভোগ করে—এই রাগে ওরা দুজনে আর বনে বাগানে স্বচ্ছ ঝরণার ধারে, কি তারার আলোর আল্পনা-আঁকা উজ্জ্বল নীলাম্বরের পারে যেতে না। ওরা একে অন্যকে এড়িয়ে চলে, এই দেখে ওদের সব পরীরা ওক বীচির ঢাকনার মধ্যে ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে আছে।

পা। হয় আমি তোমার রূপ গুণ একেবারেই ভুল করছি, নয়ত' তুমিই সেই দুষ্টু শয়তান পরী—যাকে লোকে ব'লে রবিন, ভালো মানুষটি। তুমিই কি সে নও—যে গাঁয়ের মেয়েদের ভয় দেখায়, দুধ থেকে মাখন তুলে নেয়।

কখনো বা মাখন তোলার পাত্রের মধ্যে খেলা ক'রে বেড়ায়, যাতে ক'রে বউটি বৃথাই মথানী চালাতে চালাতে

হয়রাণ হ'য়ে পড়ে। আবার কখনো তুমি মন্ত্র থেকে তার নেশাটা নিয়ে নাও। তুমিই তো রাতের পথিকদের পথ ভুলিয়ে নিয়ে যাও, আর তাদের দুর্গতি দেখে হাস। যারা তোমায় দুষ্টু পরী আর মিষ্টি পাক ব'লে আদর ক'রে ডাকে তুমি তাদের কাজ ক'রে দাও, ভালা তাদের প্রতি প্রসন্ন হয়, তুমিই তো সে?

প।—ঠিক ব'লেছ তুমি, আমি সেই রাতজাগা দুষ্টু পরী। আমি মজার মজার কথা ব'লে ওবারণকে হাসাই। আমি যৌবনবতী মেয়ে ঘোড়ার ডাক ডেকে। বীণ খেয়ে খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়াগুলোকে পথ ভোলাই, কখনো বা আমি গাঁয়ে মেয়েমানুষের পায়খানার ঠিক আগুনে-ঝলসানো কাঁকড়ার রূপ ধ'রে লুকিয়ে থাকি যখন সে তার পায়ে চুমুক দেয়। তখন আমি তার ঠোঁটে ফরফর করে উঠি। আর তার গলার নীচেকার শুকনো ঝুলেপড়া চামড়ার ওপরে মশটা ঢেলে ফেলে দিই। যখন বিছের মতো দেখতে বুড়ী পিসী তার সবচেয়ে দুঃখের গল্প বলতে থাকে, তখন কখনো সে আমায় একটা তিনফুট উঁচু টুল ব'লে ভুল ক'রে বসতে যায়, আর আমি তার ভারী পাছার তাক থেকে স্লিপ করে যাই, আর সে ধপাস করে মাটিতে প'ড়ে যায় আর চীৎকার করে ওঠে—ওরে বিশ্বাসঘাতক—আর তার কাসির দমক এসে যায়—তখন সমস্ত শ্রোতারা পাছা চাপড়ে হাসতে থাকে। তাদের আমোদ বেড়ে ওঠে তারা ফিরে কেটে বলে—এমন মজার অকাজে তাদের সময় আর কখনো কাটেনি। আচ্ছা জায়গা ছাড়ো পরী, ঐ যে আসছে ওবারণ।

প। আর এদিকে যে আসছে আমাদের রাণী, ভগবান করুন ওবারণ এখান থেকে চ'লে যায়।

(এদিক থেকে সদলে ওবারণ, অন্যদিক থেকে সদলে রাণীর প্রবেশ।)

ও। গরবিণী টিটানিয়া—চাঁদের আলোয় আজ আমাদের অশুভ মিলন।

টি। আরে হিংসুটে ওবারণ, পরীরা চল এখান থেকে, আমি ওর শয্যা আর সংগ দুইই ত্যাগ ক'রেছি। আর ওর সংগে থাকব না।

ও। দাঁড়াও খামখেয়ালী বজ্জাত মেয়ে, আমি না তোমার স্বামী।

টি। তাহ'লে আমিও তোমার স্বামিনী। কিন্তু আমি জানি কখন তুমি পরীদেশ থেকে পালিয়ে এসেজন-দেবতার রূপধরে সারাদিন ধ'রে বনের শীষের বাঁশি বাজিয়েছ—আর বিলাসিনী ফিলিডাকে প্রেমের গান শুনিয়েছ, ইণ্ডিয়ার সুদূর মালভূমি থেকে এখানে কেন এসেছ? কেন? ঐ যে গাছবন্দানী মেয়ে তোমার বুটজুতো পরা প্রেয়সী, তোমার রণরঙ্গিণী বিজি প্রণয়িণী থিসিয়াসের সঙ্গে যে তার বিয়ে, তাদের বাসরশয্যা যাতে সুখসমৃদ্ধিতে ভ'রে ওঠে, এই জন্যেই না তুমি এসেছ?

ও। লজ্জা নেই তোমার টিটানিয়া? হিপোলাইটাকে নিয়ে আমাকে এই খোঁটা দিচ্ছ, যখন তুমি জান যে থিসিয়াসের সঙ্গে তোমার প্রেমের কথাটা আমি জানি। পেরিজিনিয়া—যাকে থিসিয়াস ধর্ষণ করেছিল, তুমি রাতের আলো আঁধারিতে থিসিয়াসকে তার কাছ থেকে দূরে নিয়ে আসনি? সুন্দরী এগলের সঙ্গে তুমি তাকে দিয়ে প্রতিশ্রুতি ভংগ করাওনি, আরি আদনী আর এ্যানটি-ওপার বেলাতেও ঠিক তাই করনি?

টি। এসব তোমার হিংসুটেপনার বানানো কথা। মাঘ বসন্তের পর থেকে যখনি আমরা পাহাড়ের উপত্যকায়, বনে মাঠে, ছড়িতে ঝাঁঝানো ঝরণার ধারে, ঘাসের ভিতর দিয়ে বয়ে-আসা ছোট নদীর ধারে অথবা সমুদ্রতীরের বেলাভূমিতে হাওয়ার শাঁখ দেবার সংগে সংগে গোল হয়ে নেচেছি, তখনি তুমি তোমার ঝগড়া-ঝাটি দিয়ে আমাদের আনন্দ মাটি করেছ, তাই হাওয়ারা সব আমাদের কাছে তাদের বাঁশি বাজানো ব্যর্থ হতে দেখে যেন প্রতিশোধ নেবার জন্যে সমুদ্র থেকে বিষবাষ্প টেনে নিয়েছে, সেই বাষ্প বৃষ্টি হ'য়ে পৃথিবীতে ঝ'রে পড়ছে—আর তাইতে প্রত্যেকটি বেগবতী নদী এমন ফুলে উঠেছে যে তারা তাদের দুই তীর একেবারে বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছে। বলদগুলো বৃথাই ক্ষেতে জোয়াল টেনেছে। কৃষকের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা ব্যর্থ হয়েছে, সবুজ ফসল বেড়ে উঠে তাতে শীষ ধরবার আগেই প'চে নষ্ট হয়েছে। জলে ভোবা মাঠে ছাগল ভেড়ার আস্তানা শূন্য পড়ে আছে। মড়কের ফলে কাকগুলো ছাগল ভেড়ার মড়া খেয়ে খেয়ে একেবারে মোটা হ'য়ে উঠেছে। আর নটা পাথরের টুকরো নিয়ে 'মরিস' খেলার মাঠ কাদায় চাপা পড়ে আছে। বন্যা

উপবনে সুন্দর বনপথগুলি লোকজনাভাবে জঙ্গলে ঢাকা প'ড়ে গিয়ে পথের চিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেছে। এদেশে মানুষগুলো শীতের আনন্দ উপভোগ করতে পারছে না। কোন রাতেই কেউ ধর্ম-সংগীত আর প্রার্থনা-সংগীত দিয়ে ক্রীস্‌মাস্ যাপন করছে না। তাইতে বরফের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চন্দ্রিকা রাগে বিরস মুখে হাওয়ায় হাওয়ায় জলকণা ছড়িয়ে দিচ্ছে। এর ফলে বাতের রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। আব-হাওয়ার এই ব্যতিক্রমের জন্যে আমরা দেখছি যে ঋতুগুলো সব ওলট পালট হ'য়ে গেছে। তাজা লাল গোলাপের কোলে ক'রে পড়েছে বুড়ো সাদামাথাওয়ালা বরফ। কে যেন ঠাট্টা করে বুড়ো শীর্ণ বনদেবতার গালে আর বুকে ঢাকা সাদামাথায় বসন্তের সুগন্ধি সুন্দর ফুলের মুকুট পরিয়ে দিয়েছে। বসন্ত, গ্রীষ্ম, শিশু শরৎ, রুক্ষ শীত তাদের অত্যন্ত পালা বদল ক'রে দিয়েছে। ঋতুগুলোর সময় অতিক্রম করে যাওয়ার জন্যে হতবুদ্ধি জগৎ বুঝতেই পারছে না—কোন্‌টা কোন্ ঋতু। এই অমঙ্গল পরম্পরা আমাদের মনোমালিন্য, আমাদের ঝগড়া থেকেই জন্ম নিয়েছে, আমরাই এর জন্মদাতা, এর কারণ।

ও। তাহ'লে ঝগড়া তুমিই মিটিয়ে ফেল, এ তো তোমারই হাতে। টিটানিয়া কেন তার ওয়ারণের কথা শুনছে না। আমি তো শুধু তোমার সেই পোষা ছেলেটিকে নিজের অনুচর ক'রে নিতে চাইছি।

টি। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক, সমস্ত পরীরাজ্যের বিনিময়েও আমি সে ছেলে তোমাকে দেব না। ওর মা ছিল আমার ভক্ত উপাসিকা—। ইণ্ডিয়ার সুরভি বাতাসে রাতের বেলায় কতদিন সে আমার পাশে ব'সে গল্প ক'রে কাটিয়েছে। সে আমার সংগে সমুদ্রের বুকে রঙ্গদে বালুর ওপরে বসেছে, আমরা দুজনে সমুদ্রের বুকে বাণিজ্যের জাহাজ ব'সে ব'সে দেখেছি, এলোমেলো হাওয়াতে যখন জাহাজের পালগুলো ফুলে উঠ্‌ত, তখন তাই দেখে আমরা হেসেছি, মনে হ'য়েছে যেন হাওয়া দিয়ে ওদের গর্ভ হয়েছে বলে ওদের পেট বড় হ'য়ে উঠেছে। তখন ঐ ছেলেটির মা সমুদ্রের তীরে তীরে লঘু চরণ পাতে এগিয়ে যেত আমার জন্য এটা সেটা নিয়ে আসবার জন্যে। আবার সে ফিরে আস্‌ত, যেন সেও এক সমুদ্র যাত্রা থেকে বাণিজ্যের বেসাতি নিয়ে ফিরত। এই ছোট্ট ভদ্রলোকটি তখন তার গর্ভে ছিল। তাই তাকেও হাওয়াতে ফুলে-ওঠা পালগুলোর মতোই লাগ্‌ত। কিন্তু সে মানুষ, তাই মরণের অধীন, এই ছেলেটি হবার সময় সে মারা যায়। তারই স্মৃতি মনে ক'রে এই ছেলেটিকে আমি পালন করেছি। তারই স্মৃতির খাতিরে একে আমি কাউকে দেব না।

ও। এ বনে তুমি কদিন থাকবে?

টি। সম্ভবতঃ থিসিয়াসের বিয়ের দিন পর্যন্ত। তুমি যদি আমাদের দলে পুরো হ'য়ে নাচতে চাও এবং চাঁদের আলোয় আমাদের উৎসব দেখতে চাও, তা হ'লে আমাদের সংগে এস, যদি না চাও আমার যেতে দাও, আমিও তোমার কাছে ঘেঁসব না।

ও। আমার ঐ ছেলেটিকে দাও, আমি তোমার সংগে আসব।

টি। তোমার পরীরাজ্যের বিনিময়েও নয়। চল এ সব পরীরা সব, যদি আমি আর বেশিক্ষণ এখানে থাকি তো আবার আমাদের ঝগড়া হ'য়ে যাবে।

(সদলে টিটানিয়ার প্রস্থান)

ও। আচ্ছা যাও, তোমার এই অপমানের জন্যে শিক্ষা না দিয়ে আমি এই বনের বাইরে যেতে দেব না। লক্ষ্মী পাক, এস তো এদিকে। মনে আছে তোমার, একদিন যখন আমি একটা টিলার ওপরে ব'সেছিলাম, তখন ডল্‌ফিনের পিঠে চ'ড়ে এক মধুর কণ্ঠা গান গাইছিল। তার গান এমন মধুর, এমন সুচ্ছন্দ যে অশান্ত সমুদ্র তার গান শুনে শান্ত হ'য়েছিল, আর কতকগুলো তারা তার গান শুনবার জন্যে তাদের কক্ষ থেকে নামল হ'য়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল?

প। মনে আছে আমার।

ও। সে সময়ে আমি দেখেছিলাম, কিন্তু তুমি দেখতে পাওনি, ঠাণ্ডা চাঁদ আর এই পৃথিবীর মাঝখান দিয়ে উড়ে চ'লেছিল রণ সাজে সেজে তরুণ কামদেব। পশ্চিম-দেশীয়া এক সুন্দরী উপাসিকা রাজ্ঞীর প্রতি সে নিজের লক্ষ্য স্থির ক'রেছিল। কামদেব এমন নিপুণ হাতে তার প্রণয়শর ছুঁড়েছিল যে তাতে একশ হাজার প্রাণ বিদ্ধ হ'তে পারত। কিন্তু আমি দেখ্‌লাম, তরুণ কামদেবের সেই অব্যর্থ সফল চাঁদের কুমারী কিরণে ঠাণ্ডা হ'য়ে

গেল, উপাধিকা রাজ্ঞী এগিয়ে গেলেন বাসনা-মুক্ত মনে তার কুমারী মনের ধ্যানে নিময় হ'য়ে। কিন্তু আমি দেখ্‌লাম কামদেবের তীর কোনখানে গিয়ে পড়ল। সে একটি পশ্চিমী ছোট্ট ফুলের ওপরে গিয়ে পড়্‌ল। ফুলটি আগে ছিল দুধের মতো সাদা, কিন্তু এখন প্রেমের পরাঘাতে সেটা হ'য়ে উঠ্‌ল রক্তের মতো রাঙা। কুমারীরা ঐ ফুলের নাম রেখেছে "অবসরের প্রেম"। আমায় সেই ফুল এনে দাও। একদা আমি একদিন তোমায় দেখিয়েছিলাম। এই ফুলের রস ঘুমন্ত অবস্থায় যার চোখের পাতায় নিঙড়ে দেবে, সে জেগে উঠে সামনে যাকে দেখ্‌তে পাবে, তারই প্রেমে পাগল হবে। এই ওষধি আমায় এনে দাও। আর তুমি তাড়াতাড়ি চ'লে এস, যতক্ষণে ঐ চাঁদ এক ক্রোশ পথও না পেরিয়ে যায়।

পা। আমি তো চল্লিশ মিনিটে সারা পৃথিবীর বৃত্ত ঘুরে আসতে পারি।

ও। এই ফুল পেলে পরে আমি দেখ্‌তে থাকব কখন টিটানিয়া ঘুমোয়, তখন ওর চোখে আমি এই রস নিঙড়ে দেব। জেগে উঠে নিজের পাশে যাকেই ও দেখ্‌বে, তাই সে একটা সিংহ হ'ক, ভালুক হ'ক, চিতাবাঘ হ'ক, ষাঁড় হ'ক, উৎপেতে বাঁদর হ'ক, বাস্তবাগীশ হনুমান হ'ক, টিটানিয়া সেটাকে ভালোবেসে তার পিছে পিছে ছুটবে। আমি আবার অন্য একটা ওষধি দিয়ে এই মন্ত্র ফিরেও নিতে পারি, কিন্তু এই মন্ত্রের ঘোর কাটিয়ে দেবার আগে আমি ওর সেই ছেলেটিকে আদায় ক'রে ছাড়্‌ব। কিন্তু এ কারা এদিকে আসছে? আমায় তো কেউ দেখ্‌তে পাবে না, আমি ওদের কথা শুনব।

(ডিমিট্রিয়াসের পিছে পিছে হেলেনার প্রবেশ)

ডি। আমি তোমায় ভালোবাসি না, আমার পিছে পিছে এস না। কোথায় লাইসেণ্ডার, কোথায় বা হারমিয়া —একটাকে ত' আমি মেরে ফেল্‌ব। অন্যজন তো আমাকে মেরে ফেলছে। তুমি আমায় বলেছিলে তারা পালিয়ে এই বনে এসেছে, তাই আমি এখানে এসেছি, তাই আমি এই বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিন্তু আমার হারমিয়াকে তো দেখতে পাচ্ছি না। চ'লে যাও এখান থেকে, আর আমার সঙ্গে এস না।

হে। তুমি যে আমায় টেনে নিয়ে চ'লেছ ওগো কঠিন চুম্বক। তবু তুমি যাকে টান্‌ছ সে তো সাধারণ লোহা নয়। কারণ আমার মন হীরের মতোই দৃঢ়নিষ্ঠ। তোমার আকর্ষণের শক্তি দিয়ে নাও, তাহ'লে আর আমি তোমার অনুসরণ করব না।

ডি। আমি কি তোমায় কোন প্রশ্রয় দিচ্ছি। আমি কি তোমার সংগে একটা ভাল কথা বলেছি, বরং আমি কি সোজা ব'লে দিইনি যে আমি তোমায় ভালোবাসিনা। ভালোবাসতে পারি না।

হে। তবু আমি তোমায় এত ভালোবাসি। আমি তোমার সেবা স্প্যানিয়েল। ওগো ডিমিট্রিয়াস, তুমি যতই আমায় মারবে, আমি ততই তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়্‌ব। আমায় তোমার স্প্যানিয়েলের মতো করেই রাখ, আমায় তাড়িয়ে দাও, আমায় মার, আমায় অবহেলা কর, আমার যৌবন খুলে দাও, শুধু এটুকু অধিকার আমায় দাও, যদিও আমি তোমার যোগ্য নই,—আমি যেন তোমার অনুসরণ করতে পাই। তোমার প্রেমে এর চেয়ে সামান্যতম দাবী আমি আর কী করতে পারি? কিন্তু আমার পক্ষে এইটুকুই পরম সৌভাগ্য ব'লে আমি মনে করব যে তুমি যেমন ব্যবহার তোমার কুকুরের সংগে কর; সেটুকু করুণা আমার প্রতিও দেখাও।

ডি। আমার আত্মার বিবেককে এত বেশি করে জাগিয়ে তুল না। কারণ যখন আমি তোমার দিকে তাকাই, আমার সারা-মন বিতৃষ্ণায় বিমুখ হ'য়ে ওঠে।

হে। আর আমার মন তখন ব্যাকুল হয়, যখন আমি তোমায় দেখ্‌তে না পাই।

ডি। তোমার কি লজ্জা সরম কিছু নেই যে এমন ক'রে সহর ছেড়ে চ'লে এসেছ—আর যে তোমায় ভালো-বাসেনা—তার হাতে আত্ম-সমর্পণ করছ। অন্ধকার রাতের সুযোগ আর নির্জ্জন বনভূমির প্রলোভনকে তোমার কৌমার্য্যের অমূল্য সম্পদ নিয়ে কেন বিশ্বাস করছ?

হে। তোমার ধর্ম্মে আমার আস্থা। তুমি আমায় রাতের ভয় দেখাচ্ছ? কিন্তু আমি যখন তোমার মুখ দেখ্‌তে পাই, তখন সে আর আমার কাছে রাত নয়। তাই আমি মনে করছি, আমি রাতের রাজ্যে নেই, আর এই বন আমার কাছে জগতে যত সংগ আছে তাই দিয়ে ভরা। কারণ আমি মনে করি তুমিই আমার সমস্ত জগৎ। তা

হ'লে কী ক'রে বলা যেতে পারে যে আমি একা, যখন আমার দেখাশোনার জন্যে সমস্ত জগৎ আমার কাছে রয়েছে।

ডি। আমি তোমার কাছ থেকে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে কোপেকাড়ে গা ঢাকা দেব, আর তোমাকে বুনো জন্তু-জানোয়ারের দয়ার ওপরে ফেলে রেখে যাব।

হে। সবচেয়ে যে জন্তু হিংস্র তারও প্রাণ তোমার মত কঠিন নয়। তোমার ইচ্ছে হয় তুমি দৌড়ে পালাও। তা হ'লে গল্পটা উল্টো হ'লে দাঁড়ায় যে—এপোলো পালাচ্ছে আর ডাফ্‌নি তাকে ধরবার জন্যে পিছু তাড়া ক'রেছে। ঘুঘু পাখী ত্রিঙ্কিনের (ঈগল-সিংহের) পিছে ধাওয়া ক'রেছে। ভীরু হরিণী বাঘকে ধরবার জন্যে দ্রুতগতি দৌড়ুচ্ছে,—কিন্তু এমন ক'রে দৌড়ানো তো বৃথা যখন সাহস পালাচ্ছে—আর ভীরুতা তাকে ধরবার জন্য পিছে পিছে ছুটছে।

ডি। আমি আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করব না। আমি চললাম, তবু যদি তুমি আমাকে অনুসরণ কর তাহ'লে এতটা বিশ্বাস আমার কোরো না, যে আমি এই বনের মধ্যে তোমার ক্ষতি করব না।

হে। হ্যাঁ, মন্দিরে, নগরে, মাঠে—যেখানেই আমি থাকি না কেন, তুমি সর্বত্রই আমার ক্ষতি করছ। ধিক্ ডিমিত্রিয়াস! আমার প্রতি তোমার এই অবিচারের ফলে আমাদের সমস্ত জাতের ওপরে তুমি কলংক আরোপ করছ, পুরুষরা যেমন পারে তেমন ক'রে আমরা তো প্রেমের জন্য লড়াই করতে পারি না। তোমরাই আমাদের কাছে প্রণয় নিবেদন করবে বলে তো বিধাতা আমাদের তৈরী করেন নি। আমি তোমার অনুসরণ করব। আমার পরম দুর্ভাগ্যকে আমি চরম সৌভাগ্যে পরিণত ক'রে নেব। যে হাতখানা আমি সবচেয়ে ভালোবাসি—তার কাছ থেকেই আমি মৃত্যুকে গ্রহণ করব।

(ডিমি, ও হেঃ প্রস্থান)

ওবারণ। ওগো পরী, আমার শুভকামনা তোমার প্রতি। এই বন থেকে বেরবার আগেই ঐ লোকটা তোমার প্রণয় ভিক্ষা করবে, আর তুমি ওর কাছ থেকে পালাতে চাইবে।

(পাকের পুনঃ প্রবেশ)

ও। সে ফুল এনেছ? স্বাগত, পথচারী।

পা। হ্যাঁ, এই যে সেই ফুল।

ও। আমাকে দাও, আমি একটা ফুলবাগানের কথা জানি যেখানে অকৃপণ ফুল আর ঘোল-খাওয়া ভায়োলেট জন্মায়, যেখানটা সতেজ বকুলতায় মাথার ওপরে একেবারে ছেয়ে গেছে, যেখানে মিষ্টি মসনাভি সুগন্ধি গোলাপ আর ইগলেনটাইন ফুলে ছেয়ে আছে। সেখানে রাতের কতকটা সময় টিটানিয়া ঘুমোয়। নাচ আর উৎসবের মাঝে এই সৌগন্ধে আচ্ছন্ন হ'য়ে সে ঘুমিয়ে পড়ে, সেখানে সাপ তার পাতলা সাদা খোলস ছাড়ে,—একটা ঘরের পাতার মত চওড়া—সেই খোলস একটা পরীকে জড়িয়ে নেবার পক্ষে যথেষ্ট। এই রস দিয়ে আমি ওর চোখ রাঙিয়ে দেব, যাতে ওর মন অদ্ভুত যত সব খেয়ালে ভরপুর হ'য়ে উঠবে। এর খানিকটা তুমি নাও। এই বনে খুঁজে বেড়োগে একটি সুন্দরী এথেন্সের মেয়ে একটা বিমুখ-চিত্ত ছেলেকে ভালোবাসে। ছেলেটার চোখে এই রস দিয়ে দাও। কিন্তু যখন তুমি দেবে তখন যেন তার কাছেই ঐ মেয়েটি থাকে। যেন সে জেগে উঠে ওকেই দেখতে পায়। এথেন্সের পোষাক দেখলেই তুমি লোকটিকে চিনতে পারবে। আর একটু খেয়াল কোরো যেন ছেলেটা মেয়েটির প্রতি বেশী অনুরক্ত হ'য়ে ওঠে, আর সেই তুলনায় ওর প্রতি মেয়েটির অনুরাগ যেন একটু কম থাকে।

পা। কোন চিন্তা করবেন না, আপনার গোলাম আপনার আদেশ পালন করবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বন। টিটানিয়া আর পরীরা।)

টি। এসো আমরা গোল হ'য়ে নাচি আর পরীমেলের গান গাই। তার পরে এক মিনিটের তিন ভাগের একভাগ সময়ের জন্য সবাই এখান থেকে নিজের নিজের কাজে চলে যাও; কেউবা কস্তুরী গোলাপের কুঁড়ি থেকে পোকা মেরে ফেল, কেউ বা বাদুড়ের চামড়া টাকা পাখা কেড়ে নিয়ে এস, তাই দিয়ে আমার ছোট্ট পরীদের কোট তৈরী হবে। কেউবা গোলমেলে পেচাগুলোকে দূরে খেদিয়ে

রাখো, যে গুলো আমাদের এই নানা রকম-বেরকমের পরীদের দেখে প্রতি রাতে অবাক হ'য়ে তাকতে থাকে। এবার আমায় গান গেয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও, তারপরে নিজের নিজের কাজে যাও, আর আমায় বিশ্রাম করতে দাও।

(For Drama only)

[আমরা ছোট ছোট পরী
বেড়াই বনে বনে
আমরা গোলাপ কুঁড়ির পোকা মারি
দেখ্‌তে পাই যেখানে।
আমরা বাদুড়ের পাখা
চামড়ার ঢাকা—
কেড়ে আনি
তাই দিয়ে হবে ছোট্ট পরীদের কোট
আমরা তাড়িয়ে রাখি
পেঁচা গুলোকে প্রতিরাতে
এরা আমাদের রকমারী—
পরীদের দেখে—
প্রতিরাতে চায় অবাক চোখে
আর গোলমাল ক'রে ডাকে।]

গান

১ম পরী—ওরে সাপ,
গায়ে গোল গোল দাগ
জিব্‌গুলো দুভাগ।
আর কাঁটাওলা শজারু,
তোমরা কেউ কাছে এসো না।
উভচর টিকটিকি আর
অন্ধ সাপ—ওকে দিয়ো না সন্তাপ
পরী রাণীর কাছে এস না!

(কোরাস্)

ঘুম পাড়ানি মাসী পিসী—
গাও ঘুমের গান
মোদের সুরে সুর মিলিয়ে
দেব তোমায় পান।
বাটা ভরা পান দেব
গালভরা সুপারি
ঘুম পাড়ানি মাসী পিসী—
এসো মোদের বাড়ী—।
কোন ক্ষতি, কোন ভয়, কোন ভয়
আমাদের সুন্দরী রাণীর কাছে এস না।
ঘুম পাড়ানি, গান গেয়ে
নিই বিদায়, তোমার রাত্রি
যেন সুখে কেটে যায়।

(গান—২)

২য় পরী—তাঁত বোনা মাকড়সা
এখানে এস না—।
লম্বা পা-ওলা তাঁতী
এখান থেকে চ'লে যাও।
কালো গুবরে পোকা
এদিকে এসো না—
পোকা-মাকড় আর শামুক
কাছে ঘেঁষো না।

(কোরাস্)

ঘুম পাড়ানি মাসী-পিসী—ইত্যাদি।

১ম পরী—চলে এসো এবারে সব হ'য়েছে ঠিক
একজন একটু দূরে থেকে পাহারা দিক।

(পরীরা চলে যাবে, টিটানিয়া ঘুমোবে।)

ওবারণের প্রবেশ

ও—তুমি জেগে উঠে যখন তাকাবে—

(টিটানিয়ার চোখে রস নিংড়ে দেবে)

তখন যাকে দেখ্‌বে, তাকেই নিজের প্রিয়তম ব'লে জেনো। তাকেই ভালোবেসে তারই জন্যে আকুল হয়ো, চাই সে একটা বাঁদর, বেড়াল, চিতাবাঘ, ভালুক, খাড়া খাড়া লোমওয়ালা শূয়র—যাই হ'ক না কেন—জেগে উঠে যাকেই দেখবে তাকেই প্রিয়তম ব'লে ভাব্‌বে, যখন কোন একটা বিশ্রী জানোয়ার তোমার পাশে থাকবে, তখনি যেন তুমি জেগে ওঠ।

(লাইসেণ্ডার ও হারমিয়ার প্রবেশ)

লা। প্রিয়া, বনে ঘুরে ঘুরে তুমি ক্লান্তিতে কেঁদে পড়ছ, আর সত্যি কথা বল্‌তে আমিও পথ ভুলে গেছি। হারমিয়া, তোমার যদি মত থাকে তো এস আমরা

একটু বিশ্রাম করি, আর দিনের আলোর জন্যে প্রতীক্ষা ক'রে থাকি।

হা। তাই হ'ক, তুমি নিজের শোবার জায়গা খুঁজে নাও, আমি তো এই ফুলের ওপরেই শোব।

না। একই ঘাসের চাপড়া আমাদের দুজনার মাথার বালিশ হবে, দুটি বুকে একই প্রাণ, একই বিছানা, আর একই সত্য।

হা। না লাইসেণ্ডার—লক্ষ্মীটি, কথা রাখো আমার, এখনো একটু দূরেই শোও, আমার এত কাছে শুয়ো না।

না। প্রিয়া, আমার পবিত্র মনের কথাটি তুমি বুঝে নাও, প্রেম তো প্রেমের ভাষা সহজেই বুঝতে পারে। আমি বলেছি যে আমার প্রাণ তোমার প্রাণের সাথে বাঁধা, তাই আমাদের দুটি প্রাণ মিলে একটিই হৃদয়। আমাদের দুটি বুক একটি প্রতিশ্রুতির বাঁধনে বাঁধা, তাই আমাদের দুটি বুকের মাঝে একই সত্য; তা হ'লে তোমার বিছানার পাশে আমাকে জায়গা দিতে দ্বিধা কোরো না, কারণ, হারমিয়া, তেমন ক'রে শুয়ে থেকেও আমি তোমার প্রতি কোন মিথ্যাচরণ করব না।

হা। লাইসেণ্ডার তারি সুন্দর হেঁয়ালি দিয়ে কথা বলতে পারে। যদি হারমিয়া ব'লে থাকে যে লাইসেণ্ডার মিথ্যাচরণ করতে পারে, তা'হলে আমার স্পর্দ্ধা আর আমার অসৌজন্যের যত খুশী নিন্দা কোরো, কিন্তু লক্ষ্মীটি, ভালোবাসা আর সুরুচির খাতিরে তুমি আর একটু দূরে শোও, তুমি এটুকু দূরে থাক যেন সমাজের রীতি অনুসারে বলা যায় যে এইটুকু দূরত্ব একজন চরিত্রবান যুবক আর পবিত্র কুমারীর মধ্যে থাকা উচিত। প্রিয় সাথী আমার, তোমাকে শুভরাত্রি জানাই, তোমার জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত যেন তোমার প্রেম অটুট থাকে।

না। তাই হ'ক, তাই হ'ক। তোমার এই প্রার্থনা পূর্ণ হ'ক। যখন আমি প্রেমে বিশ্বাসঘাতকতা করব, তখন যেন আমার প্রাণ চ'লে যায়। এইখানে আমি শুলাম, ঘুম তোমার সব ক্লান্তি দূর ক'রে দিক্।

হা। এই শুভ কামনার অর্দ্ধেক, যে এই শুভকামনা জানাচ্ছে, তার চোখে নেমে আসুক।

(পাকের প্রবেশ)

পা। আমি তো সারা বন ঘুরলাম, কিন্তু কোন এথেন্সের লোক তো দেখতে পেলাম না, যার চোখে আমি এই ফুলের প্রভাব নিঙড়ে দিয়ে তার প্রাণকে প্রেমের উন্মাদনায় অশান্ত ক'রে তুলব। চারদিকে রাতের নিস্তব্ধতা! এখানে কে শুয়ে? হাঁ এথেন্সের পোষাকই পরে আছে বটে, এর কথাই আমাদের রাজা ব'লেছেন। এই এথেন্সের এক মেয়েকে ভালবেসে; আরে, এদিকে মেয়েটিও এই ঠাণ্ডা, নোংরা মাটিতে একেবারে ঘুমে অচেতন হ'য়ে আছে। আহা, কী সুন্দর মেয়ে! ঐ বেরসিক অভদ্র লোকটার কাছে বেঘোরে শুতে সাহস পায়নি। ওরে পাখি, এই মন্ত্রের সমস্ত তেজ আমি তোর চোখে নিঙড়ে দিচ্ছি। যখন তুই জাগবি, তখন প্রেম যেন তোর চোখের ঘুম কেড়ে নেয়। আমি চ'লে গেলে তুই জেগে উঠিস্। আমাকে এবার ওবারণের কাছে যেতে হবে।

[প্রস্থান

(ডিমিত্রিয়াস ও হেলেনার দৌড়তে দৌড়তে প্রবেশ)

হে। দাঁড়াও ডিমিত্রিয়াস, যদি তুমি আমাকে মেরেও ফেল, তবু দাঁড়াও।

ডি। চ'লে যাও, এমন ক'রে আমাকে জ্বালাতন কোরো না।

হে। তুমি কি এই অন্ধকারে আমাকে একলা ফেলে যাবে?

ডি। তোমার নিজের খুশীতে থাকতে চাও, আমি চল্লাম।

[প্রস্থান

হে। হায়, এই প্রেমের ধারে ছুটে-ছুটে আমি হাঁপিয়ে প'ড়েছি। আমি যতই ওর কাছে আবেদন জানাচ্ছি, ততই আমি নিজের সম্ভ্রম নষ্ট করছি। এই বনে যেখানেই এখন শুয়ে থাক্ না কেন হারমিয়াই সুখী। ওর সুন্দর চোখ দুটি বন্ধ, ওর চোখ দুটি এমন উজ্জ্বল কী ক'রে হ'ল? চোখের জলে ধুয়ে তো হয়নি, তাই যদি হ'ত, তা হ'লে আমার চোখ তো ওর চেয়ে বেশী ক'রেই চোখের জলে ধোওয়া হ'য়েছে। না, না, আমি একটা ঘুনো ভালুকের মতোই কুচ্ছিৎ—কারণ যে জানোয়ারগুলো আমার সামনে পড়ছে, তারাও আমাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তাই ডিমিত্রিয়াস যে আমার কাছ থেকে এমন ক'রে পালাচ্ছে

যেমন লোক দৈত্যদানবের কাছ থেকে পালায়, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। আমার কোন শয়তান, প্রতারক আগে আমার নিজের চোখের সংগে হারমিয়ার তারার মত উজ্জ্বল দুটি চোখের তুলনা করতে প্ররোচিত ক'রেছে। মাটিতে কে শুয়ে? লাইসেণ্ডার? মরে গেছে না ঘুমোচ্ছে? রক্ত কোন রক্ত, কোন আঘাতের চিহ্ন তো দেখতে পাচ্ছি না। লাইসেণ্ডার, মশাই, যদি বেঁচে থাকেন তো জাগুন।

লা। তোমার মত সুন্দরীর জন্যে আমি আগুনের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে আসব। (জাগরে) তোমার চেহারা কী শুচ্ছ! প্রকৃতি যে কোন কৌশলে তোমাকে তৈরী ক'রেছে? আমি যে তোমার বুকের ওপর দিয়ে তোমার সুন্দর মনটিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ডিমিট্রিয়াস কোথায়? আমার উচিত তলোয়ারের ডগায় ঐ হতভাগা-টাকে মেরে ফেলা।

হে। একথা বোলো না লাইসেণ্ডার, একথা বোলো না। যদিও সে তোমার হারমিয়াকে ভালোবাসে—তবু তাতে কী হ'য়েছে, হারমিয়া তো তোমাকেই ভালোবাসে। তোমার তো তাতেই খুশী থাকা উচিত।

লা। হারমিয়াকে নিয়ে খুশী থাকব? না, না, যে একঘেয়ে মুহূর্তগুলো আমি ওর সংগে কাটিয়েছি তা মনে ক'রে আমার অনুতাপ হ'চ্ছে। হারমিয়াকে নয়, আমি হেলেনাকে ভালবাসি। একটা নেড়কাকের বদলে একটি পায়রা পেতে কে না চায়? মানুষের খেয়াল যুক্তি দিয়ে বদলে যায়। আমিও তেমনি ভেবে দেখলাম হারমিয়ার চেয়ে তুমি ঢের ঢের ভালো। অল্প বয়সে মানুষের বুদ্ধিটা কাঁচা থাকে, তাই আমারও এতদিন বয়স অল্প ছিল ব'লে বুদ্ধিটা ঠিক পাকেনি। এই মাত্র আমার বুদ্ধি তার পরি-ণতির সীমানাকে ছুঁয়েছে, তাই আমার খেয়ালকে আমার যুক্তি এসে বদলে দিয়েছে। আর সেই সুযুক্তিই আমাকে তোমার চোখ দুটির কাছে এনে পৌঁছে দিয়েছে। তোমার ঐ দুখানি চোখ যেন প্রেমের সবচেয়েসেরা কাব্য—যেখানে আমি প্রেমের কাহিনী পড়তে পাচ্ছি।

হে। হায়রে এমন বিশ্রী ঠাট্টা সহ্য করবার জন্যে কেন যে আমার জন্ম হ'য়েছিল? আমি তোমার কী ক'রেছি যে তুমি আমাকে এমন করে বিদ্রূপ করছ? ডিমিট্রিয়াস তো কোনদিন আমার দিকে ফিরে তাকায় নি। তাতেও কি যথেষ্ট হয়নি, আবার আমি কুৎসিৎ ব'লে তুমিও আমাকে বিদ্রূপ করবে? সত্যি বলছি তুমি আমার সংগে অন্যায় ব্যবহার করছ, এ তোমার সত্যি ভারি অন্যায় যে তুমি এরকম বিদ্রূপ করে আমার কাছে প্রণয় নিবেদন করছ। কিন্তু তোমার মঙ্গল হ'ক, আমি এ কথা বলবই যে আমার ধারণা ছিল তুমি একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক। হায়রে, একটি মেয়েকে একজন অবহেলা করছে ব'লে আর একজন তাকে বিদ্রূপ করবে? [প্রস্থান

লা। হেলেনা হারমিয়াকে দেখতে পাচ্ছে না। হারমিয়া, ঐখানে ঘুমিয়ে থাক, আর কখনো লাইসেণ্ডারের কাছে এসো না। যেমন খুব মিষ্টি জিনিষ বেশি খেলে মানুষের তার প্রতি একটা বিতৃষ্ণা আসে, যেমন মানুষ যে কুসংস্কার থেকে মুক্তি পায় সেই কুসংস্কার যে একদিন তাকে ভুলিয়েছিল, এই জন্যে তার প্রতি তার একটা বিদ্বেষ জন্মায়, তেমনি হারমিয়া তুমি আমার অতি-ভোজনের বিতৃষ্ণা। আমার কেবলে আদা কুসংস্কার, তোমায় যেন সবাই ঘৃণা করে আর আমি যেন সবার চেয়ে বেশি তোমায় ঘৃণা করি। আমি আমার প্রেমের সমস্ত শক্তি নিয়ে হেলেনার পূজো করব, আমি হব হেলেনের নাইট্।

প্রস্থান

হা। (চমকে উঠে) আমাকে বাঁচাও লাইসেণ্ডার, আমাকে বাঁচাও। আমার বুক বেয়ে একটা সাপ উঠছে, এটাকে আমার গা থেকে তুলে ফেলবার জন্যে তুমি যা পার কর। একী দুঃস্বপ্ন লাইসেণ্ডার, দেখ আমি কী রকম ভয়ে কাঁপছি। আমি দেখলাম যেন একটা সাপ আমার হৃৎ-পিণ্ড কামড়ে খেয়ে ফেলছে, আর তুমি ব'সে ব'সে হাসি-মুখে তাই দেখছ। লাইসেণ্ডার? সে কি, তুমি চ'লে গেছ? সে কি আমার ডাকের বাইরে চ'লে গেছ? কোন সাড়া নেই তোমার? হায়রে, তুমি কোথায়? ভয়ে যে আমার হাত পা অসাড় হ'য়ে আসছে। ও তা হ'লে তুমি এখানে নেই! আচ্ছা, তবে আমি হয় মরণকে, নয় তোমাকে এখনি খুঁজে বার করব। (ক্রমশঃ)

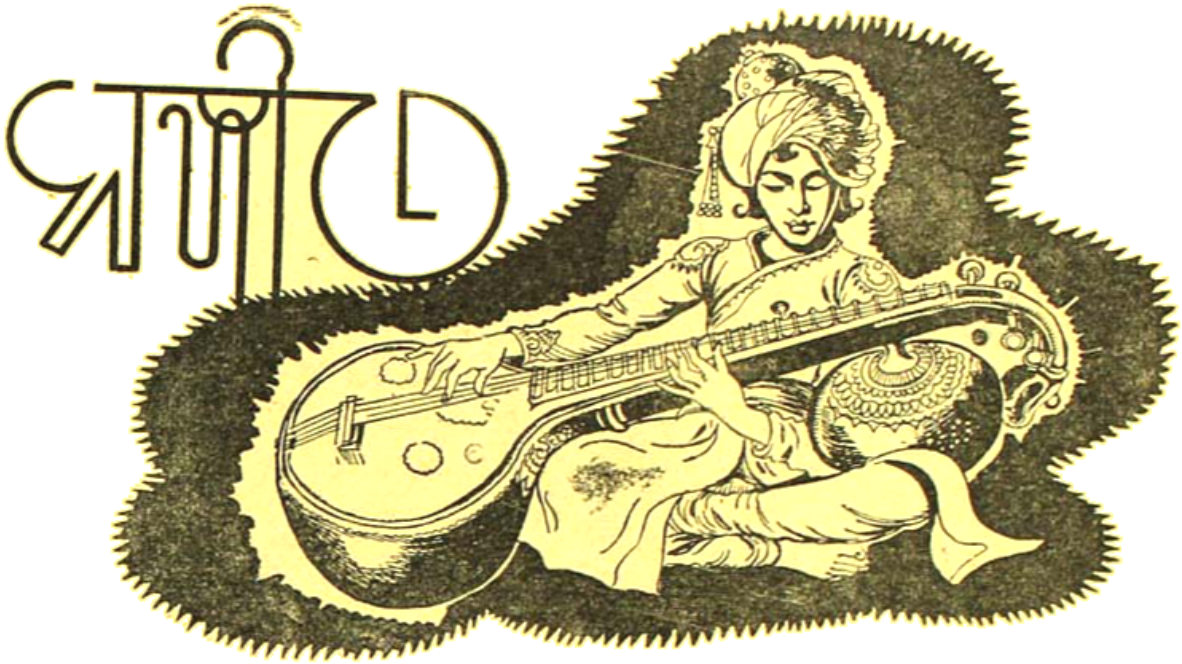

নেতা

শ্রীশ্রীজীবন্যাসতীর্থ

হে সুভাষচন্দ্র বীর! মেঘমন্দ্রগর্জনম্।
শ্রাবয় স্বমন্ত্র সর্বসুপ্তগর্বভঞ্জনম্॥
সাধুচিত্ত! সাধুবৃত্ত! বন্ধুদুঃখমোচনম্।
ত্বাং স্মরামি শুদ্ধবোধমঞ্জুকুন্দলোচনম্।
হে বরেণ্য! হে শরণ্য! বিশ্বধন্য! হে মহন্!
ত্বং বিরাজ রুদ্ররাজশৌর্যবীর্যধারহন্।
শুভ্রজাতি-শাসনান্ত-বাসনাং ব আহরন্।
দেশিসৈন্যচিত্তদৈন্যনাশমাশু সাধয়ন্।
যঃ স্বতন্ত্রযোদ্ধৃসঙ্ঘমুদ্ধধার কীর্তিমান্।
মানবাতিহারণার্তি-ভারতেন্দু মূর্তিমান্।
হে বরেণ্য……
দিগ্‌বিদিক্ষু যো বুবুক্ষুসিংহতুল্যবিক্রমম্।
দর্শয়ন্ স হর্ষমাপ ধর্ষণেঽপি ন ক্ষমম্।
ঊর্ধ্বনিম্নবন্ধুরাধ্ব-সিন্ধুমধ্যগাহনম্।
জন্মভূমি-মর্মচুম্বি কর্ম তেঽভিমোহনম্।
হে বরেণ্য……
দিগ্‌দিগন্তকম্পকারি-নেতৃনামধারিণম্।
বিস্ময়াভিভূতবিশ্ব-নিত্যচিত্তহারিণম্।
ত্যাগভক্তি বীর্যশক্তি ধৈর্যমুদ্বহন্তিনম্।
তং নমামি ভীমকল্পভীষণত্বনাশিনম্।
হে বরেণ্য……
শ্রীমহাত্মগান্ধিগণ-দেশসূনুগৌরবম্।
বৃদ্ধিমেতু ভাতু সিদ্ধিমাত্মশক্তিসৌরভম্।
অস্তু ভাতু ভারতীয়রাষ্ট্রবাসিমঙ্গলম্।
জীবতাজ্ঞ বীরনেতৃভাবরূপমুজ্জ্বলম্।
হে বরেণ্য……

"বঙ্গ আমার জননী আমার" সুরে শ্রীদিলীপকুমার রায় এ গানটি ১১. ১২. ৬৪ (২৬ অগ্রহায়ণ) তারিখে গেয়েছিলেন বহু শ্রো তা'র সামনে নিউ দিল্লীর একটি বিখ্যাত প্রেক্ষাগৃহে নেতাজীর স্মারক সভায়। শ্রীশ্রীজীবন্যাসতীর্থ দিলীপ-কুমারের অনুরোধেই এ গানটি বাঁধেন।

নেতাজী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

হে মহাপ্রাণ! ধনজনমান বিলাসবিত্তান দলিয়া পায়
দুর্গত ভরে ত্যজি' সুখসাধ বলিলে অগাধ অধিতাতায়।
স্বদেশে বিদেশে ভস্মভূমির স্বাধীনতা-ব্রত বরি' মহান্
লভিলে উপাধি—"দেশের নেতাজী"—হবে না ক্ষুণ্ণ
সে-মহিমা ম্লান।
শৈশব হ'তে শুনেছিলে তুমি গীতার শঙ্খ নিরবসান:
তাই তব শিরে দেবতার আলো দুহুঁট পরালো দীপ্যমান।
বহু সাধনার করে সফল রচিল কিমুক যারা ধরায়,
তুচ্ছিয়া মধুর মেলার নূপুর ওঠে দুলে মরীচিকামায়ায়,
তোমার অভয় মনের কোথা সিদ্ধি না দেখি' তারা শুধায়:
ছাড়ি' সংসার কেন অকালে অকালমরণ চাহিলে হায়!
শৈশব হ'তে.....দীপ্যমান।
সরলানের সুধাস্বাদের কী জানে কৃপণ মূঢ়মতি?
জানে কি বিলাসী—তুমি' কারে বলি ধায় কাঁটাবনে
রাঙাসতী?
অন্নপসারী বণিক, কি জানে—অমৃতস্বপন বলে কারে?
কেন আবাল্য বৈরাগী হয় ঘরছাড়া—কার অভিসারে?
শৈশব হ'তে.....দীপ্যমান।
গাহিলে গগনগীতার গহনমন্ত্রে হে বীর, অদ্ভুতোত্তর:
"চাই অনীকিনী অসুরের জিনি' ধর্মযুদ্ধে দিবিজয়।"
স্বপনে স্বপনে জপিলে: "ভরিব সপ্তসিন্ধু রক্তভূফান,
করিব আর্ত ভারের মায়ের মুক্তির তরে আত্মদান।"
শৈশব হ'তে.....দীপ্যমান।
হৃদয়ে তোমার উঠেছিল জেগে প্রেম অচিনের অভিযানে,
পায়ো নি ঘুমাতে তাই তুমি প্রেমী, কনককামনা উপাধানে।
শুনেছে তোমার প্রেমবাণী যারা—শুনেছে বৈরবাণী তারা:
"প্রেমের বেদনারক্ত বলকে পাবে পথহিংসা পথহারা।"
শৈশব হ'তে.....দীপ্যমান।

(বঙ্গ আমার জননী আমার—সুরে গেয়)

সা	সা	রা	|	গা	গা	মা	‖	রগা	রগমা	মা	|
হে	ম	হা		-	প্রা	ণ		ব	ন	জ	
হে	-	ম্		ভা	-	ব		চন্	-	দ্র	

মা	মা	-1	|	পা	পা	পা	|	পা	পা	মা	‖
				বি	লা	স		বি	ভা	ন	
				মে	-	ব		ম	ন্	দ্র	

মা	মা	-1	|	পা	পা	মা	‖	ধা	ধা	ধা	|
				ম	ন	ত্র		গ	রু	জ	
				ন	ন্	-		ন	ন্	-	

ধা	-1	ধা	|	সা	-1	র্সা	‖	পা	পা	পা	|
দু	রু	গ		ত	ত	রে		ভা	ঞ্জি	ন্	
প্রা	-	ব		ন	-	ন্		ব	-	ন্	

পমা	মা	মা	|	পা	পা	মা	‖	রগা	রগমা	মা	|
ক্ষ	ণি	লে		অ	গা	ধ		অ	মি	তা	
দৃ	প্	ত		গ	রু	ব		ত	-	জ	

মা	মা	মা	|	পা	পা	পমা	‖	ধা	-1	ধা	|
স্ব	দে	শে		বি	দে	শে		জ	ন্	য	
সা	-	ন্		চি	-	ত্ত		সা	-	ন্	

গা	গা	গা	‖	ধা	ধা	ণপা	‖	পা	ধা	পা	‖	র্সা	-1	-1	‖
স্বা	ধী	ন		ত্রা	ত্র	ত		ব	ত্রি	ম		হা	ন্	-	
ব	ন্	ধ		দুঃ	-	খ		মো	-	চ		ন	ম্	-	

র্সা	র্সা	র্সা	‖	সা	র্রা	সা	‖	ণা	ণা	ণা	‖	ধা	ধা	ধা	‖
ল	ভি	লে		উ	পা	ধি		হে	শে	র		নে	ত'	ভী	
স্বাং	-	শ্ব		রা	-	মি		ত	-	ষ্ক		যো	-	ধ	

পমা	মা	মা	‖	পা	ধা	ধণা	‖	পধা	পধা	ণা	‖	গা	-1	-1	‖
হ	বে	না		ক	ভু	সে		ম	হি	মা		ম্লা	ন্	-	
ম	-	ভ্র		ক	-	ষ্ক		লে	-	চ		ন	ম্		

গা	-1	গা	‖	গা	গা	পপা	‖	ধা	ধা	ধা	‖	ধা	ধা	পমা	‖
শৈ	-	শ		ব	হ	তে		শু	নে	ছি		লে	তু	মি	
হে		ব		রে	-	ণ্য		হে	-	শ		র	-	ণা	

পা	পা	পা	‖	পা	-1	পগা	‖	মা	মা	মা	‖	পরা	-1	-1	‖
গী	তা	র		শ	ং	খ		নি	র	ব		সা	-	ন	
বি	-	শ		ধ	-	ন্ত		হে	-	ম		হ	ন্	-	

সা	-1	সা	‖	রা	রা	রা	‖	গা	গা	গরা	‖	মা	মা	মা	‖
তা	ই	ত		ব	শি	রে		দে	ব	তা		ও	আ	গো	
ত্ত	ং	বি		রা	-	জ		ক্ত	-	ভ্র		ধা	-	ত্ত	

পা	পা	পমা	‖	ধা	ধা	ধণা	‖	পধা	ণা	ণা	‖	ণা	-1	-1	‖
মু	কু	ট		প	রা	লো		কী	-	প্য		মা	ন্	-	
শো	-	র্য		রী	-	র্য		মা	-	ব		হ	ন্		

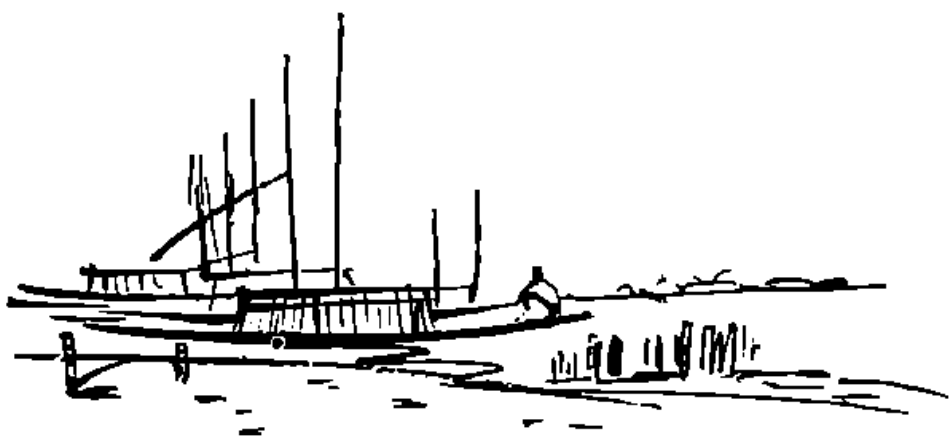

বাংলায় বিপ্লব-প্রচেষ্টার লুপ্ত পাতা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সাহেব ঠেঙ্গান

শ্রীধরানাথ ভট্টাচার্য্য ও ডাঃ আশু বসু

"That in India the British Government has found the centres of active disaffection located in the Maharatha country and in Lower Bengal, is a phenomenon which can be to a large extent accumulated for by reference Anglo-Indian history." (Indian Unrest—By Valentine Chirol Introduction by Alfrd C. Lyall. p-ix)

শ্রদ্ধেয় ধরানাথ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে শ্রদ্ধেয় বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর প্রথম পরিচয় হচ্ছে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অন্যত্র বলা হয়েছে উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের সূচনাতে —"পুলিশ,গোয়েন্দাদের এবং ফিরিঙ্গীদের অত্যাচারে এদেশের নাগরিক জীবনের শান্তি, স্বাধীনতা ও সম্মান বিপন্ন হয়ে পড়েছিল।" ('স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য' —ডাঃ শ্রীসৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পুস্তকে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা দেখা যায়—পৃ-১১৫)। এই নিয়ে তখনকার পত্র-পত্রিকাতেও ঐ অত্যাচারের সম্যক প্রতিবিধানের নির্দ্দেশ পাওয়া যেত। এই কাজে 'আত্মোন্নতি সমিতি' যে অনতিবিলম্বে কার্য্যকরী দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন তার প্রমাণ অনেক পাওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় ধরানাথ কথা প্রসঙ্গে সেদিন বলেছিলেন '১৯০০ ১৯০১ সাল হবে, একদিন তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে কালীঘাটে যাওয়ার জন্য কলিকাতায় ধর্ম্মতলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ এক ফিরিঙ্গী এসে তাঁর পিতাকে অতর্কিতে ধাক্কা মারে ও গালিগালাজ করে। ধরানাথের বয়স তখন ১৪।১৫ বৎসর হবে, হাতেও কিছু ছিল না তাঁর। ক্রোধের জ্বালায় বালক ধরানাথের দেহ মন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু নিজের সাময়িক নিরুপায় অবস্থার কথা ভেবে তাঁর মনের ক্ষোভ মনেই থেকে গিয়েছিল। যৌবন ও কৈশোরের সন্ধিক্ষণে অবস্থিত এই তরুণের প্রজ্বলিত মন পিতৃ-অপমান প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনের জন্য অহোরাত্র চিন্তাকুল হয়ে পড়ে। শেষে নিজ মনেই তার সমাধান হয় এইভাবে যে ঐ ধর্ম্মতলা অঞ্চলে ভবিষ্যতে তিনি যখনই যাবেন, অস্ত্রশস্ত্রজাতীয় একটা কিছু, যথা চাবুক, ছোরা, ছল, নিদেন একটি বড় ইটের টুকরা তাঁকে নিজের কাছে রাখতেই হবে এবং যখনই তাঁর পিতাকে অপমানকারী ফিরিঙ্গীজাতীয় লোককে দেখতে পাবেন, সুযোগ বুঝে, উত্তম মধ্যম ঘা-কতক তাকে বসিয়ে দেবেন।' এইভাবে দু'এক বছর অতীত হয়। পরে একদিন বহু আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ পেয়ে একটি ফিরিঙ্গীকে আক্রমণ করেছেন, এমন সময় দেখেন তাঁরই মত আর একটি তরুণ কোথা হ'তে ঝড়ের বেগে এসে হাজির হয়েছেন তাঁর সাহায্যার্থে। আজীবন বিপ্লবী শ্রদ্ধেয় ধরানাথ ও বিপিনদার মধ্যে আলাপ পরিচয়ের এই হচ্ছে প্রথম সূত্রপাত। তারপর সম আদর্শপথের পথিক জেনে ঐ দুটি নব্য-যুবকের মধ্যে গড়ে উঠেছিল যে গভীর স্নেহ-ভালবাসার বন্ধন তার পরিচয় পাওয়া গেল সেইদিন (৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬২ সাল) যখন শ্রদ্ধাভাজন ধরানাথের কাছে বর্ত্তমান লেখককে হাজির হতে হয়েছিল বিপিনদার জীবন কাহিনীর কিছু শোনার জন্য। কার্য্যব্যপদেশে হরিপালে পৌঁছাতে সেইদিন একটু দেরি হয়েছিল। বেলা ৩টা হবে, তাড়াতাড়ি বাস থেকে নেমে দেখা গেল, সেই অশীতিপর যুবক, কর্ম্মযোগী ধরানাথ বসে আছেন হরিপাল লাইব্রেরীর সিঁড়িতে, ধূলার উপরে, ব্যস্ত সমস্ত চিত্তে।.....বল্লেন—বিপিনের কথা শুনতে চাও?.....জাননা তোমরা? জানবেই বা কেমন করে, সে কি কিছু বলেছে কাউকে? বলতে বলতে গলাটা তার হয়ে এল, ঐ কঠোর, ইস্পাত হৃদয়ও

একটু যেন আলোড়িত হ'ল। তারপর বলেন, বিপিন ছিল 'আত্মোন্নতির' প্রাণ, আর বাংলার সমগ্র বিপ্লব প্রচেষ্টার একজন প্রকৃত সংগঠক। স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রনির্ঘোষ তার ভিতর দিয়েই আজীবন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে —"...Fleshless and bloodless skeletons of the deadbody of the Past India that you are,—why do you not quickly reduce yourself into dust and disappear in the air?.. You merge yourselves in the void and disappear and let new India arise in your place. Let her arise —out of the peasants cottage, grasping the plough, out of the huts of the fisherman, the cobbler and sweeper. Let her spring from the grocer's shop, from beside the oven of the frither seller. Let her emanate from the factory, from marts and from markets. Let her emerge from the groves and forests from hills and mountains." (Swami Vivekananda's works, Pt vii, Mayavati Memorial Edition, Page—309.) ধরানাথ বলতে লাগলেন—'কি ছিল না সে, আর বাংলার বিপ্লব প্রতিষ্ঠার জন্য কি করেনি সে? আমাদের দেশে বহুদিন ধরে যে একটা সনাতন দলাদলির প্রথা চলে এসেছে, বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যেও সেটা বাদ পড়ে নি। কিন্তু বিপিনকে আজীবন দেখা গেছে, সকল সময়ই সে ছিল ঐ দলাদলির বহু উর্দ্ধে। আর এইটিই ছিল তার জীবনের বৈশিষ্ট্য। তাই কাকোরী, মেছুয়াবাজার, দক্ষিণেশ্বর ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারেই ছিল আমাদের তথা বিপিনের লোক। সত্য-দল নির্বিশেষে বিপিনকে সকলেই শ্রদ্ধা করত, মানত এবং প্রায় সকল কাজেই তার সঙ্গে পরামর্শ করে কাজে হাত দিত, অথবা তার পরামর্শ নিত।'

হরিণাভির ডাঃ আশু দাসের প্রসঙ্গে বললেন,—সে তো ছিল বিপিন ও আমারই লোক। সে যে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিল তাও তো আমাদেরই পরামর্শে। সে থাকত শ্রীরামপুরে। পরে বলীর পরামর্শে হরিণাভিতে আস্তানা গাড়ে। ক্রমে 'আত্মোন্নতির' কাজ সম্পূর্ণ গুপ্ত সমিতিতে পর্যবসিত হলে, বলীর নির্দেশে 'ডাঃ আশু' যাবতীয় বৈপ্লবিক কাজেই আমাদের সহায়তা করেছে। এই সম্পর্কে বিপ্লবী ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের উক্তিও উল্লেখযোগ্য তিনি লিখেছেন—"আশু দাস ও আমার মেডিকেল কলেজে যাবার উদ্দেশ্য ছিল যে, পাঞ্জাবে, ইংরেজ সৈন্য সংগ্রহের ভূমিতে, আমরা ডাক্তারির ছলে গিয়ে পাঞ্জাবী ভাইদের দেশের কাজে টানব।" ('বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি'- ডাঃ যাদুগোপাল মুখো-পাধ্যায়, পৃ ২৮)। ঐ দিনে কথা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় ধরা-নাথের কাছে আর একটি বিষয় উত্থাপিত করা হয়।—বালেশ্বরের 'গোপাল-বিষাণ' বিপ্লবী বীর যতীন্দ্রনাথের (যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘা-যতীন) সঙ্গে আত্ম-গোপন করে থাকার সময়, ধলার শিশুদল নিয়ে খেলার ছলে বুদ্ধাভ্যাস করতে গিয়ে বিপ্লবী 'নীরেনের' পায়ে অতর্কিতে একটি গুলি বিঁধেছিল। এই সময় 'ইউ-নিভার্সাল এম্পোরিয়ামের' স্বত্বাধিকার বসু কলকাতায় এসে এম্ এন্ রায় ইত্যাদির সঙ্গে দেখা করে ঔষধ পত্র সমেত যে ডাক্তারকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর নাম ছিল ডাঃ আশু দাস। (এই তথ্য বালেশ্বরের বীর যোদ্ধাদের মধ্যে একমাত্র অবশিষ্ট জীবিত সদস্য শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী শ্রীনলিনী করের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে শোনা ৪।১০।৬২ তারিখে)।... বিপ্লবী ধরানাথ যাদা দিয়ে বলেন—"আরে সে তো আমাদেরই নরেন ভট্টাচার্য্য।

ধরানাথ সেদিন এই প্রসঙ্গে আরো বলেছিলেন—১৯১৭ সালে আশু ইঙ্গ-ভার্ণান যুদ্ধে মেডিকেল সার্ভিসে যোগ দিয়েছিল এবং শেষে ক্যাপ্টেনের পদে অধিষ্ঠিত হয়। এইভাবেই তখন তার গ্রেপ্তার এড়িয়ে যায়। হাঁ, বিপিন ঠিকই বলেছিল—"১৯২১ সালে একদিন আমাদের সকল বন্ধুদের সহিত পরামর্শ করিয়া সরকারী চাকুরী হইতে ইস্তফা দিয়া নিখিল ভারত কংগ্রেসে তিনি যোগ দেন। তাহার পর তিনি কয়েকবার কারাদণ্ড ভোগ করেন।" ('পত্র'—আশুতোষ সংখ্যা পৃ—১৮)।

গল্প

পূর্ব্বাপর

পরমানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রামের মেয়ে নমিতা।

এত সুন্দর! হিমাংশুর মন বলে, কৈ এমনতো দেখিনি! তার সপ্রশংস চোখে অগাধ বিস্ময় সঞ্চিত হয় নমিতাকে দেখে।

সেই কোন ছেলেবেলায় মা-বাবার সাথে একবার মাত্র মেশের বাড়ীতে এসেছিল হিমাংশু। আর এসেছে আজকে—বছর দশেক পর।

সেদিনের ছোট হিমাংশুর খেলার সাথী হয়েছিল ছোট নমিতা; আরও তিন-চারটি ছেলে মেয়ে জুটেছিল। কিন্তু সবাইকে ছাড়িয়ে হিমাংশুর ওপর কর্তৃত্বের ভার নমিতাই তুলে নিয়েছিল নিঃসঙ্কোচে।—না জানে গাছে উঠতে, না চেনে একটা লতা! এই অজ ছেলেটাকে মানুষ করে তুলতে—দলের উপযুক্ত করে তুলতে, একমাত্র নমিতাই পারে।

এই ভানপিটে মেয়েটাকে ভয় করে চলে দলের সকলেই, তাই হিমাংশুর ওপর নমিতার দাবী মনে মনে সহজভাবেই মেনে নিল সাথীরা।

পাঠ নিতে গিয়ে বার বার তিরস্কৃত হয়েছে নমিতার কাছে হিমাংশু। নমিতার একটা কথা কেবলই তীব্র আঘাত হানত হিমাংশুকে—'আমি মেয়ে হয়ে যা পারি, তুমি পুরুষ হয়ে তা পারনা, ছিঃ!' তাই হিমাংশু তার পুরুষত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছে আপ্রাণ। কি দুপুরের কাঠফাটা রোদ্দুর, কি রাত্রির নিঃসীম অন্ধকার,—নমিতার ডাক এলেই বের হয়ে পড়েছে হিমাংশু বাড়ী ছেড়ে। বাড়ী ফিরে মায়ের হাতে মারনা। কিন্তু তাও সে সহ্য করেছে মুখ বুজে। এক ফোঁটা জলও তার চোখের পাতা সিক্ত করতে পারেনি। তার চোখের তারায় তখন নমিতার মুখটা নেচে বেড়িয়েছে। মনে মনে বলেছে—কেমন হয়েছে, আর কাপুরুষ বলতে পারবে! পাঠ শেষ করে সকলের অজান্তে কখন যে হিমাংশুই একসময় দল-পতি হয়ে বসে আছে কেউ জানতেও পারে নি। হিমাংশু এখন যা বলে, দলের প্রত্যেকে মেনে নেয় তা। হিমাংশুকে নিয়ে নমিতার গর্ব্বের শেষ নেই। সেই-ই তো সব কিছু শিখিয়েছে হিমাংশুকে। এক এক দিন অন্যান্য খেলার সাথীরা অনুপস্থিত হলেও নমিতা কিন্তু হিমাংশুর সঙ্গে আছে ছায়ার মত।

মা-মরা মেয়ে নমিতা। দাদা-বৌদির সংসারে মানুষ। কেউ একটা বড় খোঁজও রাখত না তার। ঝোপ-ঝাড়, আমতলা-তেঁতুলতলা, পুকুর পাড় থেকে আঁস্তাকুড় সর্ব্বত্র ছিল তার অবাধ গতি। এর ফলে একটু দুর্নিবার বন্য স্বভাব তাকে পেয়ে বসেছিল। কালি গা, একমাথা জটাধরা রুক্ষ চুল, হাতে সরু সরু দুগাছি করে লাল রঙের কাঁচের চুড়ি। একটি কাল অথবা নীল রঙের প্যান্ট—ঘুড়ির পরিবর্তে তার মুখজোড়া পাক দিয়ে পেটের সঙ্গে আটকান। এই বেশেই তাকে দিনের পর দিন দেখা গেলেও তার দৌরাত্ম্যির মধ্যে এক-ঘেয়েমি ছিল না মোটেই। কার যে কখন কি ভাবে সর্ব্বনাশ ঘটাবে, তার জন্য তটস্থ হয়ে থাকতো পাড়া-পড়শীরা। বেশ কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো কিন্তু পুতুলের জন্যই যেন গোলমাল হয়ে গেল সব।

স্পষ্ট মনে আছে হিমাংশুর। হাডু-ডু-ডু খেলা চলছে। হিমাংশু ঘোড় নিয়ে বসে আছে এক পাশে। হাডু-ডু-ডুতে পুতুল চিরকালই বেশ শক্ত খেলী। দম তার যেন ফুরোতে চায় না। কিন্তু সে দিন এমন ভাবে ঘোড় হয়ে গেল, নমিতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মনে হলো সেটা যেন ইচ্ছাকৃত। হিমাংশুর সঙ্গে বসে গল্প করতে পারবে, সেই জন্যই সে ঘোড় নিল। এর পূর্ব্বেও এমন ঘটনা ঘটেছে নমিতার

চোখে। তাহলে পুতুল নমিতাকে সরিয়ে হিমাংশুর পাশে আসতে চাইছে!—এত সাহস! এ কথা মনে উদয় হওয়া-মাত্র রণং দেহী মূর্তিতে নমিতা ছুটে গিয়ে পুতুলের চুলের মুঠি চেপে ধরলো,—এই রাক্ষুসী, তোর সাহসতো কম নয়!

চিৎকার করে উঠলো পুতুল,—ছেড়েদে আমায়, ছেড়ে দে বলছি। আমি তোর কি করেছি?

—কি করেছি! এই দেখ কি করেছিস—ফটাফট এলোপাথাড়ি কয়েকটা চড় বসিয়ে দিল পুতুলের গালে।

—এই নমিতা, ওকে মারছিস্ কেন? হিমাংশু এসে নমিতার হাত চেপে ধরে।

—হিমাংশু আমায় ছেড়েদে, ওকে মজা দেখাচ্ছি।

—না।

—ছেড়েদে, ছেড়েদে আমায়।

—না।

—ছাড়বি না?—ঠাস্ করে একটা চড় হিমাংশুর গালে এসে পড়লো।

—তুই আমায় মারলি নমিতা!

—বেশ করেছি।

—বেশ করেছি! তবে এই নে—বেশ কয়েকটা কিল-চড় নমিতার গালে পিঠে হিমাংশু বসিয়ে দিল।—চল বাড়ী চল। পুতুল কাঁদছিল বলে। তাকে টেনে নিয়ে চ'লে গেল হিমাংশু।

নমিতা কিন্তু কাঁদল না। শক্ত পাথরের মত মাটি আঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চলভাবে। তার চোখে তখন প্রতিহিংসার জ্বালা।

সেই কোন সকাল থেকে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে, তা যেন আর থামে না! বিরক্তি ধরে গেছে হিমাংশুর, ঘরের মধ্যে একা বসে থেকে থেকে। অন্যদিন হলে এই বৃষ্টির মধ্যেও নমিতা অন্ততঃ আট-দশবার আসতো। কিন্তু গত কাল বিকেলে ঝগড়া হয়ে যাওয়ায় নমিতার সারাদিন আর দেখা নেই। মরতে কেন যে হিমাংশু ঝগড়া মেটাতে গিয়ে মেরে বসল! না হলে তো এমন হতো না! নিজেকে নিজেরই কাছে দোষী সাব্যস্ত করলো। সন্ধ্যা হয়ে গেছে এক সময়, খেয়াল নেই হিমাংশুর।

—এই হিমাংশু!

একটা বোরার পেখে মাথায় দিয়ে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে পুতুল।

—কি রে?

—শিগ্‌গির আয়! সায়রের মাঠে কৈমাছের গাদি লেগেছে।

আর বলতে হলো না হিমাংশুকে, বুঝে নিয়েছে। সারাদিন বাড়ীতে বন্দী থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিল। এ মুক্তির ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে!

নমিতাও গিয়েছিল মাছ ধরতে। কিন্তু মাছ আর তার ধরা হয় নি। পুতুল আর হিমাংশুকে মাছ ধরতে দেখে চোখে আবার জ্বলে উঠলো প্রতিহিংসার আগুন। মাত্র নয় বছরের ছোট মেয়ে হলে কি হবে, শয়তানীতে তার জুড়ি ছিল না। হিমাংশুদের বাড়ী এসে জানিয়ে দিল, হিমাংশু সায়রের মাঠে মাছ ধরছে পুতুলদের সঙ্গে। একটু আগে মাছ মনে করে আল-কেউটের মাথা চেপে ধরে ছিল; একটুর জন্য বেঁচে গেছে।

বাড়ী ফেরার পর যে চরম লাঞ্ছনা পেয়েছিল হিমাংশু তা সহ্য হলো না। পরদিন হতে জ্বর দেখা দিল। একটানা ছয় সাত দিন জ্বর ভোগের পর সুস্থ হলো হিমাংশু। হিমাংশুর মা হিমাংশুর দৌরাত্ম্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পূর্বেই চিঠি দিয়েছিলেন, এবার ছেলের অসুখ শুনে হিমাংশুর বাবা দেখতে এসে হিমাংশুকে তাঁর চাকুরীস্থলে নিয়ে গেলেন। সেই হিমাংশুর শেষবারের মত দেশের বাড়ীতে আসা।

ধান-চালের সময় মা দেশের বাড়ীতে প্রত্যেক বছরই এসেছেন, কিন্তু তাকে আর কোন দিনই আনেন নি।

দিন চলে গেছে একে একে। একটার পর একটা বছর কেটে গেছে। হিমাংশুর মন হতে গ্রামের স্মৃতি দিকে দিকে হতে হতে একেবারেই প্রায় মুছে গিয়েছিল এক সময়। আজ আবার নতুন করে, একটু একটু করে মনে পড়ছে তা। কিন্তু সেদিনের মত তো সহজ হতে পারছে না! আজ সে অনেক বড় হয়ে গেছে বলেই কী? কোথায় সেই বার বছরের এক দুরন্ত কিশোর, আর কোথায় সহরের পরিবেশে বেড়ে ওঠা—বাইশ বছরের বলিষ্ঠ বি, এ পাশ এক মার্জিত রুচি যুবক!

যে যতই মার্জিত হোক, বড় হোক, কেউ কি পারে ছেলে বেলার স্মৃতিকে অস্বীকার করতে? হিমাংশুও পারেনি। তাই আজ তার গ্রাম সম্বন্ধে প্রচণ্ড কৌতূহল।

বাড়ীতে পৌঁছে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেই ছুটে এসেছে তার বেলার সাথী নমিতার কাছে। সেই ছোট হিমাংশুর মত। কিন্তু বাস্তবের সামনা সামনি দাঁড়িয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল হিমাংশু।—সামনে এক পূর্ণবয়স্কা যুবতী।

সংকোচের সঙ্গেই প্রশ্ন করল, এটা তো নমিতাদের বাড়ী, তাই না?

—হ্যাঁ। অবাক চোখ তুলে যুবতী চেয়ে রয়েছে হিমাংশুর মুখের দিকে।

হিমাংশু লজ্জিত হলো আরও বেশী। মৃদুস্বরে বলল, নমিতাকে একটু ডেকে দেবেন! বলবেন, হিমাংশু এসেছে।

—হিমাংশু যে এসেছে সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু মশাই তোমার বুদ্ধিকে নমস্কার, গ্রামের মেয়েরা অপরিচিত পুরুষের সামনে কখনও বের হয় না, এটুকুও আর মাথায় এলো না!

—দেখুন, আপনি ভুল করছেন, নমিতা আমার খেলার সাথী ছিল, খুবই পরিচিতা সে, তাই—

—কি রকম পরিচিতা তা তো দেখতেই পাচ্ছি!

—কার সঙ্গে কথা বলছিস্ না?—কি আবার দেখতে পেলি? হাতে একতাল গোবর নিয়ে সাদা থান পরিহিতা কলাসনায় এক বয়স্কা মহিলা এগিয়ে এলেন। হিমাংশুকে দেখে একটু অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে চলে যেতে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লেন।

—হিমাংশু ঠাকুরপো না?

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনার তো ঠিক—

—চিনতে পারলে না! ওমা, আমি বৌদি,—তুমি ছোট তখন, কাঁচা আম দিয়ে খাবে—নুন-লঙ্কার জন্য কত বায়না আমার কাছে—।

—আপনি বৌদি! আমি একেবারে বুঝতে পারিনি।

—কি করে পারবে! ছেলে বেলায় সেই অসুক নিয়ে গেলে, তারপর তো আর গাঁয়ে এলেই না। তোমরা যখন আসছিলে তখন আমি ঘাটে ছিনু। নতির মা বলল, চক্কোত্তিদের মেজকর্তা এলো।

চলো চলো বাড়ীতে বসবে চলো। তাই তো বলি, ঠাকুরের পাট করতে এসে ঠাকুরঝি কার সঙ্গে কথা কইছে! তোমার তো পাট হয়ে গেছে দেখছি। তুমি নিয়ে যাও, আমি গোবরটুকু সেরে—একটা ডুব দিয়েই আসছি। তুমি ঠাকুরঝির সঙ্গে যাও ভাই, আমি এই বলে। বৌদি চলে গেলেন গোয়ালের দিকে।

—তাহলে তুমিই নমিতা? বৌদি ঠাকুরঝি বলছিলেন?

—বুদ্ধির ঘট এবার খুলছে। কৌতুকের হাসি নমিতার ঠোঁটে।

—ইস্, তুমি কি সাংঘাতিক, আমায় একটুও বুঝতেই দাওনি।

—বুঝতে তো এবার পেরেছ মনে হচ্ছে। তা অমন হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছো? লজ্জার রং নমিতার গালে ছড়াল।

—তোমায় দেখছি। তোমার কত পরিবর্তন হয়ে গেছে। কত বড় হয়ে গেছ!

—ওমা, সেই রকমই থাকবো নাকি! থাকলে বেশ হত না? আর একবার চড়-চাপড় দিয়ে হাতের সুখ করে নাও!

উত্তরে কি একটা হিমাংশু বলতে যাচ্ছিল, বাধা পড়ল।

—কৈ গো, তোমরা সব গল্প দাঁড়িয়েই দাঁড়িয়েই শেষ করে ফেলবে নাকি? আমার ভাগে কিছু রাখো। বৌদি এসে দাঁড়ালেন।

সহরে জীবনের বাঁধা রুটীন থেকে এসে গ্রাম্য জীবনের মধ্যে হিমাংশু ছেড়ে দিল নিজেকে। অপূর্ব্ব মুক্তির স্বাদ। অনাবিল আনন্দঘেরা গ্রাম্যজীবনের মধুময় মুহূর্তগুলো। সে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে পেরে শিহরিত হলো থেকে থেকে। এখানের জল-মাটি-আকাশ-বাতাস-গাছপালার মধ্যে শুনতে পেল এক নতুন সুর। সেই সুরমূর্ছনায় সে হারালো নিজেকে। ভুলে গেল তার সহরে সত্তাকে। এক নব চেতনার রূপ মাধুর্য্যে অবগাহন করল তার কাঁচা-সবুজ-মন। তার কবি হৃদয় গ্রাম্য পরিবেশে সক্রিয় হয়ে

শীতের সকাল

ফটো : অপেন ঘোষ

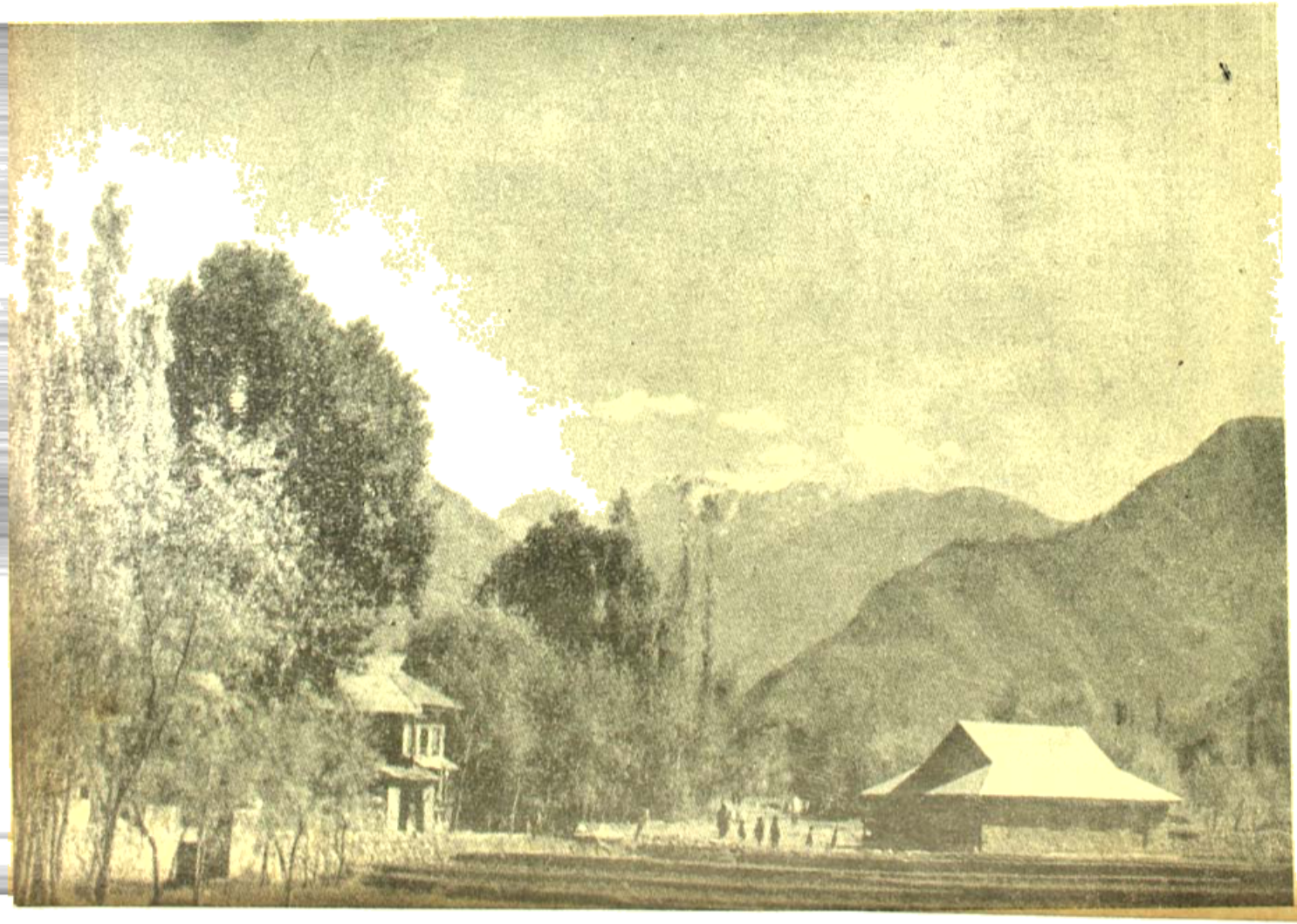

প্রশান্ত পরিবেশ
(কাশ্মীর উপত্যকা)

ফটো :
অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

উঠলো। সৃষ্টির নব প্রেরণায় একটার পর একটা কবিতা দিয়ে ভরিয়ে তুললো তার কবিতার খাতা।

কখনও বাগানে, কখনও পুকুর পাড়ে, কখনও মাঠে সেই ছেলেবেলার মতই হিমাংশু ঘুরে বেড়াতে লাগল রাত্রি দিন। সেদিন ছিল দৈহিক খেলা, আজ কবি হৃদয়ে পল্লীর জীবন বেদ অন্তরের গভীর অনুভূতির মাধ্যমে উপলব্ধি করার প্রয়াস।

পার্থক্য আছে আর এক জায়গায়। যে সাথীরা ছিল তার নিত্য-সঙ্গী, তাদের একজনও আজ আর হিমাংশুর পাশে নেই।

কি করেই বা থাকবে? শক্তি, ভোগ্য, সাধন—এরা সংসারের প্রয়োজনে গ্রাম ছেড়ে সহরের উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েছে, কিছু অর্থ উপার্জ্জনের আশায়। পটল, জীবন, খেঁদারা-তো এরই মধ্যে ঘোর সংসারী হয়ে পড়েছে। দিন কয়েক আগে দেখা হয়েছিল হিমাংশুর সঙ্গে পটলের। হিমাংশু বাড়ী ফিরছিল গোঁসাই পাড়া হয়ে। বড় তেঁতুল গাছটার তলায় একটা সরুর গাড়ীর ওপর ছেলে কোলে নিয়ে বসে ছিল পটল। হিমাংশু চিনতে পারেনি মোটেই। পটলই প্রথম কথা বলল,—কতদূর যাওয়া হয়েছিল? দাঁড়িয়ে পড়ল হিমাংশু। ঠোঁট আর কপালের কুঞ্চনে হিমাংশু আঘ্রাণ চেষ্টা করে প্রশ্নকারীর পরিচয় মন-দুয়ারে ফুটিয়ে তুলতে। ব্যর্থ হয় হিমাংশু। স্মৃতি তাকে কোন সাহায্যই করে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ছেলে কোলে নিয়ে গাড়ী থেকে উঠে এসে হিমাংশুর সামনে দাঁড়ায় পটল।—কি, চিন্তে পারলে না? কি করেই বা পারবে। কতদিন দেখা নেই! নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিয়ে পটল কষ্কষে দাঁত মেলে বিষণ্ণভাবে হাসে। পরে বলে,—আমি পটল।

হিমাংশুর মনের আনাচার জংধরা কপাট খুলে যায় এবার। স্মৃতির অন্ধকার ঘরে এক ঝলকে বাইরের আলো প্রবেশের সাথে সাথে দৃষ্টিগোচর হয় দশটা বসন্তের হাতে গড়া এক কিশোর—পটল যার নাম।···ছানা শুদ্ধ একটা শালিখ পাখীর বাসা ভেঙে এনে হিমাংশুর হাতে দিচ্ছে···।

—তুমি ক'দিনই এসেছ গাঁয়ে শুনেছি, কিন্তু কাজের চাপে আর দেখা করার ফুরসৎ পাইনি।

সেদিন দুই বন্ধুর বহু কথাই হয়েছিল। নতুন কথা যত না হয়েছিল, তার চেয়ে বেশী হয়েছিল স্মৃতিরোমন্থন। নতুন কথার মধ্যে বহু জনের কাছ হতে বহুভাবে শোনা সেই একই কথা—সংসারে অনটন···।

দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে শীর্ণকায় মানুষগুলোর বেঁচে থাকার কি আকুলতা;—নগ্নরূপের প্রকাশ ঘটায় নিজেদের হেয় জ্ঞানে। অবাক হয়ে ভাবে হিমাংশু, সত্যই কি এরা মানুষ নামে পরিচিত পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান জীব! তা হলে এরা নিজেদের দুর্ব্বল ভেবে সহজ সরল-সুন্দর জীবনযাত্রার গতিপথ চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়েছে কেন? কেন? নিজেদের সর্ব্বনাশ তো করেছেই, আবার পাশবিক ক্ষুধা চরিতার্থ করার পরিপ্রেক্ষিতে একটি সম্ভাব্য শক্তিমান বীজকে নষ্টকরে সমাজে দিনের পর দিন আগাছার সৃষ্টিতে বাধা দিকন করে চলেছে নিজেদের মূর্খামির ফলে। যার ফলে সেই একই ভাবে সর্ব্বনাশ করে চলেছে সমাজ জীবনের। এর কি কোন প্রতিকার নেই? মানুষগুলো কি? আশ্চর্য্য! এর সমাধানের কথাও তো এরা কোন দিন মুহূর্তের জন্যও ভাবে না! নিজেরাই যদি উদ্যোগী না হয়, বাইরে থেকে অপরে আর কতদূর কি করতে পারে! সেই কথাই হিমাংশু সেদিন পটলকে বোঝাতে চেয়েছিল।—অত বড় বড় কথা ভাবতে পারি না ভাই। বেশতো কেটে যাচ্ছে!

—বেশতো কেটে যাচ্ছে মানে? তুমি বলো একে বেশ কেটে যাওয়া!

—তা নয়তো কি। এই ভাবে আমাদের বাপ-ঠাকুরদা কাটিয়ে গেছে, আমাদেরও কেটে যাবে।

—তবু তোমরা···

কিছু একটা উত্তেজিত ভাবে হিমাংশু বলতে যাচ্ছিল, পটলের নব আগুক সেই সময় পরিত্রাহিভাবে হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে ওঠায় একটু বিরক্ত ভাবেই থেমে যেতে হলো হিমাংশুকে। পটল মেয়েলী চংএ বহু উপায় অবলম্বন করেও যখন শান্ত করতে পারল না, তখন বলল, ছেলেটার দুধ খাওয়ার সময় হয়েছে; যাই ভাই। আবার যেদিন আসবে এদিকে, দেখা করে যেও।

পটল চলে যাওয়ার পরও তেঁতুলতলায় স্তব্ধ ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল হিমাংশু। আদর্শবাদী যুবকের তখন চোখ ফেটে জল আসবার উপক্রম হয়েছে,—কি অদ্ভুত

পরিবর্তন পটলের দেহের, মনের।—কি সাংঘাতিক অপচয় ভারতের যুবশক্তির!

গভীর স্নেহের সঙ্গেই এ সমস্ত কথা সহরে তার এক সম্পাদক দাদার কাছে লিখেছিল হিমাংশু।

পটলের কথা—সেই চিন্তাধারার ভিত্তিতে গ্রামের আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার কথা, তার কুফলের কথা নমিতাকে একে একে বুঝিয়ে বলেছিল এক সময়। নমিতা বলেছিল, দেখ হিমাংশু, ও সমস্ত নিয়ে মাথা ঘামিও না, দুঃখ ছাড়া আর কিছু পাবে না। তুমিতো গল্প-কবিতা লেখো, বরং যতদিন এখানে আছো ভাল করে গাঁকে, গাঁয়ের মানুষকে জেনে নাও, পরে একটা ভাল করে বই লিখো, যাতে গাঁয়ের লোকদের সত্যিকার জীবন কথা থাকবে। সেই বই পড়ে যদি সমাজের সব লোক গাঁয়ের উন্নতির জন্য নজর দেয় তাহলে তুমি যা চাইছো সেটা হবে অতি সহজেই। তুমি যে ভাবে দুদিনের জন্যে গ্রামে এসে হঠাৎ গাঁয়ের সংস্কার করতে চাইছো তা অসম্ভব ভাবনা। আর তা তোমার একার পক্ষে সম্ভবও নয়।

নমিতার কথাগুলো গভীর ভাবে দাগ কেটেছে হিমাংশুর মনে। সত্যই তো, সে একা কি করবে! বহু হাজার বছরের জমাট বাঁধা অন্ধকার দূর করার মত শক্তিই বা তার কতটুকু! নমিতার কথাই ঠিক। উপন্যাসই লিখবে সে। যে বই পড়ে সূর্য্যাস্তেজদীপ্ত একদল যুবক আমাদের সভ্য সমাজের ভিত্তি গ্রাম—তারই সংস্কারের কাজে বেরিয়ে পড়বে। বিষময় এক পঙ্কিল জীবন যাত্রা হতে গ্রামকে করবে উদ্ধার। এক মহান কাজে ব্রতী হলো হিমাংশু। তার সার্থক সৃষ্টির রসদ যোগাড়ে মনোনিবেশ করলো অতঃপর। তার কাজে নমিতাও সাহায্য করতে লাগল সাধ্যমত। সারাদিন এখানে সেখানে কাটিয়ে হিমাংশু সন্ধ্যার মুহূর্তটিতে এসে বসে নমিতাদের দাওয়ায়। অতীত দিনের মতই পাঠ দেওয়া নেওয়া চলে দুজনের মধ্যে। হিমাংশুকে গ্রাম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে নমিতা।

কত নতুন শব্দ শিখলো হিমাংশু, জানলো তার অর্থ। যেগুলো তাদের সহরে সমাজে অচল। হয়তো অভিধান খুঁজলে পাওয়া যাবে। কিন্তু সে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করলে সহরে সমাজে হতে হবে নিন্দনীয়। কিন্তু তারও ছাড়পত্র আছে। গল্প-উপন্যাসে চল আছে এর। আজকাল দু-চারটি করে চোখেও পড়ে কোন কোন বিশেষ লেখকের রচনায়। হিমাংশুও তাই সেই সমস্ত শব্দ ও গ্রামের ছোটখাটো ঘটনা তার গল্পের উপাদান হিসাবে অতি উৎসাহ ভরে সংগ্রহ করে যায়।

নতুন কথা, নতুন ঘটনা মুঠো মুঠো সংগ্রহ করতে গিয়ে নমিতার মনের সমুদ্র হতে হিমাংশু মুঠো ভরে তুলে আনলো গভীর ভালবাসা। হিমাংশু হঠাৎই একদিন আর এক রত্ন—আর এক জীবনের পেল সন্ধান।

এরজন্য নমিতা বা হিমাংশু কেউই প্রস্তুত ছিল না। দৈব সংঘাত ছাড়া আর কি!

হিমাংশু সেদিনও এসেছিল সন্ধ্যার প্রাক্কালে নমিতাদের বাড়ী। গল্পে গল্পে সন্ধ্যা হয়েছে, রাত্রি—ফিকে হতে ঘন, ঘন হতে ঘনতর। শীতকাল, তার ওপর পল্লীগ্রাম। তাই মনে হচ্ছে রাত্রি যেন কত গভীর। সারা গ্রামখানাকে যেন গ্রাস করেছে মৃত্যুর শীতলতা। হিমাংশুর হাতে বাঁধা ঘড়ির কাঁটা দুটি সবেমাত্র নয়টার ঘর স্পর্শ করে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, ঠিক সেই সময়ই……

নমিতার বাবা-দাদা অনেকক্ষণ পূর্বে রাত্রের খাওয়া সেরে জমিতে ফসল আগলাতে চলে গেছেন। বৌদি বললেন, আর রাত করে কি হবে, চল আমরাও খেয়ে নিইগে।

—চল যাচ্ছি। নমিতা বলল। বৌদি হ্যারিকেন নিয়ে চলে গেল রান্নাঘরে।

একটা মাদুরের ওপর বসে হিমাংশু আর নমিতা। মাত্র হাত দুয়েকের ব্যবধান। মাদুরটা চওড়ার দিকে যেখানে খুঁটির গায়ে শেষ হয়েছে, তার প্রান্তে জ্বলছে ছোট একটা কেরোসিনের কুপি। মৃদু বাতাসের আঘাতে স্থির হতে পারছে না তার শিখা, সাপের ছোবল দেওয়ার মত ডাইনে-বাঁয়ে হেলে পড়ছে বার-বার। কাঁপছে, থর থর করে কেরোসিন কুপির শিখাটা। আর কাঁপছে দুজোড়া প্রেমমদির চোখ। হিমাংশু আর নমিতা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ-ই হারিয়ে ফেলেছে নিজেদের। এমন তো কোনদিন হয় না। এক ঘন আকাশে আবেশিত হয়ে ওঠে দুটি মন।

মুহূর্ত কয়েক পরই সামলে নেয় হিমাংশু নিজেকে। উঠে দাঁড়িয়ে বলে, চলি।

মনে হয় যেন কতদূর থেকে ভেসে এলো শব্দটা নমিতার কানে। নমিতাও উঠে পড়ে কুপিটা হাতে নিয়ে। বলে, আবার এসো।

রান্নাঘর হতে নমিতার বৌদি ডাক দেয়,—এসো ঠাকুরঝি, দিয়েচি।

—যাই।

—আমিও যাই। কিন্তু তবুও হিমাংশু যেতে পারে না। নমিতার কাজল কাল-চোখের দুর্নিবার আকর্ষণ তাকে যেতে দেয় না।

নমিতারও একই অবস্থা। হিমাংশুর চোখে চোখ রেখে এক আনন্দের আবেগে হারায় নিজেকে। ঘন হয়ে আসে হিমাংশুর শ্বাস। রক্তে জোয়ারের বান ডাকে। বুকের মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্বের প্রবল ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়ে তার সংযমের বাঁধে ভাঙন ধরায়।

নমিতার কাঁধে আলতো ভাবে বাঁ হাতটা রেখে হিমাংশু বলে, তাহলে যাই, কেমন!

হিমাংশুর সে স্পর্শে থর থর করে কেঁপে ওঠে নমিতার সারা দেহ। কুমারী কন্যার লজ্জা-ভীরু-মনের সঙ্কোচ ঢাকতে বুঝি সময় বুঝে নিভে যায় কেরোসিনের কুপিটা বাতাসের মৃদু আঘাতে।

আর সেই মুহূর্তে হিমাংশুর গভীর ভালবাসা প্রকাশ-পথ খুঁজে পায়। তার বুকের মাঝে টেনে নেয় নমিতাকে গভীর আবেগে। বাইশের প্রেম জোয়ারে সিক্ত হয় বোড়শীর দেহলতা। চুম্বনে চুম্বনে ভরে যায় নমিতার কপোল, চিবুক, অধর···। অনুভব করে সে বুকের মাঝে এক যন্ত্রণার আনন্দ। অবশেষে এক দীর্ঘস্থায়ী চুম্বনে হাঁপিয়ে ওঠে নমিতা। সামান্য চেষ্টায় সরিয়ে নেয় নিজেকে। রান্নাঘরের দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়ায়।

এক অজানা ভয় আর আনন্দের তীব্রতায় থর-থর কাঁপছে তার দেহ-মন। প্রিয়-পরশে এত উত্তেজনা, এত আনন্দ—এতো জানা ছিল না। নমিতার গালে,—অনুভবে এখনও ধরা রয়েছে হিমাংশুর উষ্ণশ্বাস। নমিতা ভাবে, তার ভালবাসা স্বীকৃতি পেয়েছে হিমাংশুর কাছ হতে। বহুদিন ধরে বহুভাবে সাজিয়েও যা প্রকাশ করতে পারেনি নমিতা, হিমাংশু তা কত সহজে প্রকাশ করে দিল।

হিমাংশুর মন তখন আতঙ্ক আর গ্লানির রেখে ছেয়ে গেছে।—ছিঃ! ছিঃ! এ কি করলো সে! নমিতার কাছে নিজেকে সে এত ছোট করে ফেলল? ও কি ভাবছে! দিনের আলোয় আর তো মুখ দেখান যাবে না। ক্ষণিকের দুর্বলতায় বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এক কুমারী মেয়ের পেলব মনে একি আঘাত হানল আজ সে। নমিতা যে তাকে প্রেমিকরূপে ভালবাসে, এ স্থির প্রত্যয় তার মনে দানা বাঁধল কি ভাবে? ধোকার ভুলও তো হতে পারে! নিশ্চয়ই নমিতা রাগ করেছে; কিন্তু···

নমিতা সামলে নিয়েছে নিজেকে এরই মধ্যে। মেয়েদের প্রতি প্রকৃতির এ এক অসীম দান। যে কোন পরিস্থিতিতে নিজেদের তারা সামলে নিতে পারে অতি সহজেই। হিমাংশুকে শুকনো গলায় বলল,—কি হলো? শুধু একটা মাত্র প্রশ্ন।

—কিছু না।

—চল তোমায় এগিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে আসি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে, কাল আবার এসো।

—আসবো? তুমি রাগ করনি?

রাগ করার মতন তো কিছু হয়নি!

—সত্যি বলছো? হিমাংশু এগিয়ে গিয়ে নমিতার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে মৃদু চাপ দেয়।

—দুষ্টু। সাহস তো খু-উ ব বেড়েছে দেখছি। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে হিমাংশুর গালে ছোট্ট একটা টোকা দেয় নমিতা।

—কাল এসো। দরজা বন্ধ করতে করতে বলে।

হিমাংশুর মন হতে ঘন মেঘ কেটে গিয়ে দেখা দেয় পূর্ণিমার চাঁদ। সেখানে রয়েছে জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ দ্যুতিতে ভরা নমিতার পানপাতা মুখখানি।

টমাস হার্ডির উপন্যাস

অরুণ দে

সুখের থেকে দুঃখ অল্পস্থায়ী। দুঃখ যত তিক্ততা নিয়েই আসুক, মানুষ স্বভাব-ধর্মেই তাকে ভুলে যায়। তার তীব্রতা দিনে দিনে ম্লান হয়ে যায়। সুখের স্মৃতিগুলি আমরা দুঃখের দিন থেকে অনেক বেশি মনে রাখি।

তবু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে দুঃখ জীবনের ভয়াবহ সত্য। সে নিষ্ঠুর, সে কুটিল কিংবা ভয়ঙ্কর সুন্দর। অনেক দার্শনিক আছেন যাঁরা মনে করেন, জীবন দুঃখেরই ইতিবৃত্ত। সুখ মুহূর্তের জন্য ছলনা করে যায় মাত্র, আসলে দুঃখের ভুলেই জীবনের মানাপাথা।

টমাস হার্ডির উপন্যাসে যে বিশিষ্ট জীবনদর্শন আত্ম-প্রকাশ করেছে তা হল এই দুঃখবাদ। মানুষের জীবন-যন্ত্রণা—তার অসহায় করুণ পরিণতিই হার্ডির অধিকাংশ উপন্যাসের বিষয়বস্তু। মানব জীবনের প্রতি হার্ডির দৃষ্টি-ভঙ্গি হতাশা ও বিষণ্ণতায় পূর্ণ। তিনি মনে করেন মানুষ নিয়তির হাতের পুতুল। নিয়তির হৃদয়হীন লীলাখেলার ফলে শৌর্য, বীর্য ও সম্পদের অধিকারী হয়েও মানুষ দুঃখের অতল গহ্বরের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং করুণ পরিণতির সম্মুখীন হচ্ছে। তাই দেখি হার্ডির মানস-সন্তান হেকার্ড, জুড, ক্লিম প্রভৃতি চরিত্র স্বেচ্ছাচারী নিয়তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে পর্যুদস্ত হয়ে শোচনীয় ব্যর্থতায় আর্তনাদ করেছে। নিজের যোগ্যতাবলে ক্যাস্টারব্রীজের মেয়রের পদে উন্নীত হয়েও তার নায়ক অদৃষ্ট অজানা শক্তির ক্রূর হাসিতে বেদনাময় পরিণতি লাভ করল। টেস (Tess) প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাসনায় শেষ পর্যন্ত আইনের ক্রোধা-নলে দগ্ধ হল।

নিয়তির অমোঘ বিধানে মানুষের অসহায় করুণ পরিণতির চিত্র হার্ডির উপন্যাসে অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনায়, উদাত্ত কল্পনায় এবং সুপতি-সুলভ সংহতিতে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে এপিকের দিগন্তপ্রসারী মহিমার মধ্যে গীতি কাব্যের ভোতনা ও কল্পনার নির্ঝরিণী প্রবাহিত। উপন্যাসের ক্ষেত্রে উচ্চ স্তরের ট্রাজিডি রচনায় আজও তিনি অদ্বিতীয় প্রতিভা। জীবনের কারুণ্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন বলে আমরা যেন এমন ধারণা না করি যে হার্ডি জীবন-বিমুখ শিল্পী। তিনি দুঃখবাদী হলেও জীবন-রস-রসিকতাই তাঁর উপন্যাসে বিধৃত। জীবনের বাথাতুর অসহায় অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ—হার্ডির গভীর জীবনবোধ ও মানব প্রেমেরই পরোক্ষ প্রকাশ।

জীবনের আনন্দধারার পরিবর্তে—জীবন যন্ত্রণার প্রকাশে হার্ডির অধিকতর উৎসাহের পশ্চাতে তাঁর ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতা ও অনুভূতির প্রতিচ্ছায়া রয়েছে।

তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের পটভূমি হল ওয়েসেক্সের গ্রামাঞ্চল। এই পল্লীবাসীদের জীবনে দুঃখের অভাব ছিল না। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও পরনির্ভরশীলতার ফলে তারা সামাজিক ও প্রাকৃতিক অত্যাচারে নিয়ত পর্যুদস্ত হত। হতাশা ও ব্যথায় জর্জরিত সেই ওয়েসেক্সের গ্রামবাসী নিজেদের ভাগ্যকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারত না। দিনের পর দিন এই গ্রামবাসীদের দুঃখ-দুর্দশার দর্শক হওয়ার ফলে হার্ডির স্পর্শকাতর মনে হয়ত হতাশা ও যন্ত্রণাই জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে প্রতিভাত হয়েছিল।

হার্ডির বিষণ্ণ দৃষ্টির পশ্চাতে যুগপ্রভাবের কথাও অস্বীকার করা চলে না। যে যুগে হার্ডি জন্মেছিলেন সে যুগ অস্থিরচিত্ততার যুগ। অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ধর্মীয় আদর্শবাদ তখন ভাঙনের মুখে। শিল্প বিপ্লবের ফলে শুধু কৃষি নির্ভরতারই নয়, মানুষের চিন্তাজগতেও বিরাট পরিবর্তন হয়েছিল। পুরাতন বিশ্বাসগুলি ভেঙে পড়ছিল অথচ নতুন কোন আদর্শ তখন দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগে, সংশয় ও অনিশ্চয়-তার আবহাওয়ায় মানুষের মন ছিল মেঘাচ্ছন্ন। শিল্পীরাও সেই যুগ-আবহাওয়ার প্রভাব এড়াতে পারেন নি। তাঁদের

মধ্যে একদল পুরাতন বিশ্বাসকে আঁকড়ে রইলেন। অপরদল কোন রকম সান্ত্বনার আশ্রয় খুঁজে পেলেন না। ইংরাজী সাহিত্যে সেই যুগোপে সর্বপ্রথম সচেতনভাবে নিরাশাবাদ প্রবেশ করল। বিষণ্ণ কুয়াশায় আবৃত হল চিন্তাজগৎ। জিবাল্ড, টমসন ও হার্ডির লেখায় বিষণ্ণতা ও দুঃখবাদ আত্মপ্রকাশ করল।

কাব্যধর্মিতা হার্ডির উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর উপন্যাসের বহু স্থানে কবি হৃদয়ের ছাপ সুস্পষ্ট। প্রকৃতি হার্ডির উপন্যাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন কোন উপন্যাসে প্রকৃতিকে পটভূমিকারূপে দেখতে পাই। কিন্তু হার্ডির উপন্যাসে প্রকৃতি শুধু পটভূমিকা নয়, সময়ে সময়ে উপন্যাসের অন্যান্য কুশীলবের মত প্রকৃতিও একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে এবং কাহিনীর গতিবেগের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে। জনশূন্য, বিশাল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন Egdon Heath প্রান্তর "The Return of the Native" উপন্যাসের চরিত্রগুলির জীবনে আধিপত্য বিস্তার করেছে। সেই প্রান্তরের বিষণ্ণতা ও বৃহত্ত্ব যেন মানবজীবনে অনুপ্রবেশ করেছে। "Under the Greenwood Tree" যারা বাস করত তাদের জীবনে যে প্রকৃতির প্রভাব উপেক্ষণীয় নয় তা উপন্যাসটির নামকরণ থেকেই অনুমান করা যায়। "The woodlanders" বৃক্ষি বনপ্রকৃতির মানবীয় প্রতিমূর্তি। কৃষক, মেষপালক, মালী প্রভৃতি যে সব চরিত্র হার্ডি সৃষ্টি করেছেন তারা প্রকৃতিরই অংশ বলে মনে হয়। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে তাদের অস্তিত্বের অনেকটাই লোপ পায়। প্রকৃতি বর্ণনায় হার্ডি যে চিত্রধর্মিতার পরিচয় দিয়েছেন উপন্যাস সাহিত্যে তা সুলভ নয়।

মানুষের মনের সঙ্গে প্রকৃতির যোগাযোগের যে কবিত্বময় অনুভূতির ইতিবৃত্ত হার্ডি তাঁর উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করেছেন তা ওয়ার্ডসওয়ার্থকে মনে করিয়ে দেয়। অবশ্য ওয়ার্ডসওয়ার্থের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে হার্ডির দৃষ্টিভঙ্গির একটা মূলগত প্রভেদ আছে। হার্ডি বিশ্বাস করতেন না যে প্রকৃতির কোন "holy plan" কিংবা মঙ্গলময় প্রভাব আছে। প্রকৃতিদেবীর নিষ্ঠুরা ও অনিষ্টপরায়ণা মূর্তিই হার্ডির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

প্রকৃতির বাহ্যিক রূপ, বর্ণ, শব্দ প্রভৃতি বর্ণনায়ই হার্ডির কবিত্বশক্তি সীমাবদ্ধ নয়, উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনায়ও সেই কবিত্বের সুর ধ্বনিত। এ বিষয়ে Bathshebaএর সঙ্গে Troyএর প্রথম মিলনরাত্রির বর্ণনাটি স্মরণীয়। জীবনের নরম মনগুলিকে ফুটিয়ে তোলার সময় এবং মানুষের অবগুণ্ঠিত হৃদয় রহস্য প্রকাশের কালে হার্ডির লেখনী কাব্যানুপ্রেরিত শক্তিতে উজ্জ্বল।

চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে হার্ডি কিন্তু বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি। ডিকেন্সের মত তিনি অজস্র বিভিন্নধর্মা-সমন্বিত চরিত্রসৃষ্টি করেন নি। এ ব্যাপারে তাঁর রচনাশক্তি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবর্তিত হয়েছে। ওয়েসেক্সের গ্রামাঞ্চলের প্রতি হার্ডির বিশেষ আকর্ষণ এবং তাঁর নিয়তিমূলক দুঃখবাদী জীবনদর্শনই তাঁর চরিত্রগুলির বৈচিত্র্যের অভাবের অন্যতম কারণ। ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে সমগ্র মানবজাতির জীবনলীলাই তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। নিয়তির অপ্রতিবিধেয় প্রভাবের চিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি ব্যক্তির চারিত্রিক বিকাশকে অনেক জায়গায় খর্ব করে ফেলেছেন। তিনি যে সব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্যে কেমন যেন একটা নৈকট্য ও জ্ঞাতিত্ব আছে। কয়েকটি শ্রেণীতে চরিত্রগুলিকে ভাগ করা যায়। নিঃস্বার্থপরতা ও কোমল হৃদয়ের প্রতিভূ হলেন—জন লাওডে, ডিগোরী কেন, গেব্রিয়াল ওক প্রভৃতি চরিত্র। ক্ষমাশীলতা, অনুরক্তি ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি হিসাবে মার্টি, টেস, এলিজাবেথ কেন প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। এই ভাবে আরও কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ করে সহজেই দেখান যায় যে হার্ডির উপন্যাসে একই চরিত্র বিভিন্ন নামে বার বার ফিরে এসেছে। তবে নিজের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে হার্ডির চরিত্রগুলি জীবন-উজ্জ্বল। বিশেষ করে কৃষক-সুলভ সরল চরিত্রগুলির সৃষ্টিতে তিনি যথেষ্ট লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। আদিম মানবীয় প্রবৃত্তির তাড়নায় পর্যুদস্ত চরিত্রগুলিও আমাদের মনে রেখাপাত করে। এখানে বলে রাখি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের "নারীমেধ" গল্পগ্রন্থে হার্ডির "Tess" উপন্যাসের ছায়াপাত ঘটেছে।

ফরাসী সাহিত্য থেকে যে দার্শনিক বস্তুবাদ ইংরাজী কথাসাহিত্যে অনুপ্রবেশ করেছিল, টমাস হার্ডি তার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। এমন কাব্যধর্মী, জীবনবোধের গভীরতায় মহিমান্বিত, উদাত্ত কল্পনাশ্রয়ী এবং গীতিকাব্যের ব্যঞ্জনাময় উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে দুর্লভ। আধুনিক কালের সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণধর্মী, আঙ্গিক-সর্বস্ব ও মস্তিষ্ক প্রধান উপন্যাসের পাশে যখন হার্ডির উপন্যাস পড়ি তখন মনে হয় যুবি কোন প্রসাধন-লিপ্তা, যৌবন প্রকাশে উৎসুক সুন্দরীর পাশে এক সহজাত লাবণ্যমণ্ডিত সৌন্দর্যময়ী দাঁড়িয়ে আছেন। সে নারী রূপসী নয় কিন্তু অপরূপা।

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

জীব-জন্তু সম্বন্ধে আগ্রহ-অনুরাগ ছাড়াও কোম্পানীর আমলে কলিকাতা শহরের বিলাসী-নাগরিক দেশী ও বিলাতী সমাজের লোকজনদের আরো যে সব বিচিত্র আমোদ-প্রমোদ আর উৎসব-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল, সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো—ইউরোপীয় কেতায় সাড়ম্বরে বড়দিনের পাল-পার্বণ পালন করার রীতি অনুসরণ। শুধু বড়দিনের উৎসবই নয়, ইংরাজ-বণিকদের হাতে-গড়া প্রাচীন কলিকাতা শহরে সেকালে ব্যবসা-বাণিজ্য বিলাস-ব্যসন, আমোদ-প্রমোদ, বিদ্যা, বিভব এবং বিত্তসঞ্চয়সূত্রে দেশ-বিদেশ থেকে নানা জাতির, নানা ধর্মের, নানা শ্রেণী ও নানা বর্ণের যে সব নর-নারী এই আজব মহা-মিলন তীর্থে এসে একত্রে জমায়েৎ হতেন, তাঁদের ছোট-বড় বিবিধ অনুষ্ঠানে তৎকালীন সমাজ সম্প্রদায়ের ছেলে-বুড়ো সকলেই সেই সব হুজুগ দেখার অভিনব নেশায় মেতে উঠে আনন্দ উপভোগের উদ্দেশ্যে সাগ্রহে যোগদান করতেন—এটিই ছিল তখনকার আমলের চিরাচরিত প্রথা। তবে প্রাচীন হলেও, সে প্রথা কিন্তু আজও বজায় রয়েছে আমাদের একালের কলিকাতা শহরবাসীদের অভিনব আগ্রহ-অনুরাগের ফলে। সেকালে বড়দিনের উৎসব কিভাবে প্রতিপালিত হতো—নীচে উদ্ধৃত বিবরণটিতে তার স্পষ্ট পরিচয় মিলবে।

* *

(৺হরিসাধন মুখোপাধ্যায় রচিত গ্রন্থ হইতে)

সেকালের নববর্ষের উৎসব

আজকাল নববর্ষের দিনে গড়ের মাঠে কুচ-কাওয়াজ, সৈন্যপ্রদর্শনী ও উপাধি বিতরণ হইয়া থাকে। সেকালে অর্থাৎ ১৩০ বৎসর (সাম্প্রতিক বার্ষিক-অঙ্কের হিসাবে প্রায় ১৮০ বৎসর) পূর্বে কিরূপভাবে উৎসব হইত—তাহা দেখুন।

"গত মঙ্গলবার ইংলণ্ডেশ্বরের জন্মদিন উপলক্ষে, ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ হইতে তাঁহার সম্মানার্থে প্রভাত-প্রারম্ভে তোপধ্বনি হইয়াছিল। অপরাহ্নে লর্ড কর্ণওয়ালিস, থিয়েটারগৃহে একটী নাচ ও সান্ধ্য-ভোজনের আয়োজন করিয়াছিলেন। অনেক পদস্থ সাহেব, এই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। মিসেস চ্যাপম্যান, প্রথমে নৃত্য সূচনা করেন। রাত্রি এগারটা পর্যন্ত সাহেবী-নাচ চলিয়াছিল। রাত্রি বারটার সময়, নিমন্ত্রিত অতিথিগণ ভোজনাগারে গিয়া আহারাদি শেষ করেন। তাহার পর তাঁহারা

পুনরায় থিয়েটার-হলে ফিরিয়া আসেন, এইবার বাইনাচ প্রভৃতি আরম্ভ হয়। এ দেশীয় নৃত্য-কলা দেখিয়া, সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাত্রি চারিটার সময় এই নৃত্য শেষ হয়।

তখনকার দিনে নববর্ষ উৎসবে সমস্ত রাত্র-ব্যাপী বল-ডোজ হইত। এই ভোজ-সভায়—এ দেশীয় নৃত্যকলাও প্রচলিত ছিল। বাইনাচ প্রভৃতি দেখিয়া, সেকালের সাহেবেরা নাসিকা কুঞ্চন করিতেন না।

* * *

বড়দিনের উৎসবের মতো অত বেশী কৌলীন্য-আড়ম্বর করে প্রতিপালিত না হলেও, সারা বছরের নানা সময়ে নানান্ উপলক্ষ্যে সেকালের যৌবন-বিলাসী সাহেব-বিবিদের চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে নিত্যই নাচ-গান আমোদ-প্রমোদের নানা রকমের যে সব অভিনব-আসর জমত—একালের অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল-নিবারণের জন্য অধুনা-দুর্লভ একখানি ঐতিহাসিক বাঙলা গ্রন্থ হইতে তার কিঞ্চিৎ চিত্তাকর্ষক বিবরণ নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

* * *

(৺হরিসাধন মুখোপাধ্যায় রচিত গ্রন্থ হইতে)

সেকালের ক্যাপিল-ড্রেসবল

"ক্যাপিল-ড্রেসবল" ইংরাজ সমাজের একটা আরামদায়ক আনন্দ। সেকালেও ইহার প্রচলন ছিল। ইংরাজ নরনারীগণ কৃত্রিম বেশ পরিয়া কোন লোক বা শ্রেণী বিশেষের অভিনয় দেখাইতেন। একটি ছদ্মবেশধারী নৃত্যের (Masquarde) সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটী প্রকাশ হয় (The Calcutta gazette)। "গত সোমবার রাত্রের মস্কারেড" অতি সুন্দরভাবে হইয়া গিয়াছে। গৃহ-সজ্জা ও আলোকের বন্দোবস্ত অতি সুন্দর। নিম্নলিখিত অংশগ্রহণকারীগুলিই অতি সুন্দর হইয়াছিল। (১) দুইটী ফিন্সী, (২) ফরাসী বাবু ও বিবি, (৩) একজন বাঙালী ভদ্রলোক ও তাঁহার স্ত্রী, (৪) তিনজন তাহাজী গোরা, (৫) এক সুন্দরী গোয়ালিনী, (৬) এক নাগা-সন্ন্যাসী (খুব ভাল হইয়াছিল), (৭) এক ইহুদী, (৮) এক পাহারাওয়ালা, (৯) একজন যোগী (Jogee), (১০) একজন গোরা, (১১) এক মেথরাণী (A Metterany) (খুব ভাল হইয়াছিল), (১২) একজন সুবাদার, (১৩) একজন মুন্সী। ইহা ব্যতীত অনেক মোগল, পাঠান ও পারসীর ভূমিকা। পাঠক ইহা হইতে দেখিতে পাইবেন, সেকালের সাহেবেরা ছদ্ম-আনন্দ-নৃত্যে, যোগী, নাগা, ফকির, মেথরাণী, সুবেদার, মুন্সী প্রভৃতির ভূমিকা অভিনয়ে আনন্দ উপভোগ করিতেন।

* * *

(৺হরিসাধন মুখোপাধ্যায় রচিত ইতিহাস গ্রন্থ হইতে)

লাট সাহেবের বল

সেকালে বল ও সপার (নাচ ও রাত্রে ভোজনের) নিমন্ত্রণ উৎসব লাট-সাহেবের বাড়ীতে হইত না। তখন বর্ত্তমান লাট-প্রাসাদের অস্তিত্ব মাত্র ছিল না। নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটী তাহার প্রমাণ—"যে সমস্ত ভদ্রমহোদয়গণ ইংলণ্ডেশ্বরের ও কোম্পানী বাহাদুরের সেন বিভাগে ও সিভিল বিভাগে নিযুক্ত আছেন, গবর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস্ তাঁহাদিগকে ১৮ই জানুয়ারী (১৭৯৩) থিয়েটার গৃহে বল ও সপারের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ঐ দিন ইংলণ্ডেশ্বরের জন্মতিথি, এইজন্যই এই ভোজের ও আমোদের আয়োজন।" Calcutta Gazette, 10.1.1793)

*

নাচ-গানের আসরে আমোদ-প্রমোদের মজলিস্ জমিয়ে তোলা ছাড়াও কোম্পানীর আমলের গোড়ার যুগে কলিকাতা শহরের তৎকালীন সম্ভ্রান্ত বিলাতী পল্লী লাল-বাজার অঞ্চলে যৌবন সাহেব-বিবিদের চিত্ত-বিনোদনের আরেকটি রীতি ছিল—ইউরোপীয় কেতায় সাজানো হোটেল সরাইখানায় বসে নিশ্চিন্ত আরামে বিলাসী বন্ধু-বান্ধবদের দলে যোগ দিয়ে মনের স্ফূর্তিতে পান-ভোজন, রসালাপ, কৌতুক-পরিহাস, নৃত্য-গীত-বাদ্য-সঙ্গীত উপ-

ভোগ করে পরমানন্দে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দলগুলি ঘরে থেকে ভারত প্রবাসের সুদীর্ঘ দৈনন্দিন অবকাশের মুহূর্তগুলি রঙীণ স্বপ্নের নেশায় বিভোর হয়ে দিব্যি আয়েশে কাটিয়ে দেওয়া। প্রসঙ্গক্রমে, অধুনা-দুর্লভ ঐতিহাসিক গ্রন্থ থেকে নীচে যে ছত্রটি সঙ্কলিত করে দেওয়া গেলো, সেটি থেকে সেকালের বিলাতী হোটেল বা সরাইখানার মোটা-মুটি পরিচয় মিলবে।

• •

[৺হরিসাধন মুখোপাধ্যায় রচিত গ্রন্থ হইতে]

হারমোনিক ট্যাভার্ণ

এই "হারমোনিক-ট্যাভার্ণ" একটি ঐতিহাসিক জিনিস। নবাব সেরাজউদ্দৌলা যখন কলিকাতা আক্রমণ করেন, তখন হইতে ইহা বর্ত্তমান ছিল। লালবাজারেই এই "ট্যাভার্ণ" বা সাধারণ বিশ্রামাগার প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেকালের বল নাচ, এসেম্‌ব্লি ও অভিনয় প্রভৃতি এই "হারমোনিকেই" হইত। সেকালের অনেক বড় বড় ইংরাজ—যাঁহারা অতীত যুগের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহাদের নাম রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই বিশ্রাম সুখ-সম্ভোগার্থে এখানে আসিতেন। সন্ধ্যার পর অসংখ্য বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত হারমোনিকের কক্ষগুলি বড়ই সুন্দর দৃশ্যের বিকাশ করিত। তখন টাউন হল বা সাধারণের সভা করিবার জন্য কোন প্রকাণ্ড স্থান ছিল না। এই "হারমোনিকে"ই তখন সাধারণের জমায়েত হইবার প্রধান আড্ডা ছিল। আমরা পুরাতন গেজেটের (The Calcutta Gazette) ১৭৮৪ খ্রীঃ অব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের এক বিজ্ঞাপনী হইতে জানিতে পারি—"গত সোমবার কলিকাতাবাসী জনসাধারণ ও গণনীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই হারমোনিক ট্যাভার্ণে সমবেত হইয়া বিদায়প্রাপ্ত গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেবকে একটী অভিনন্দন দিবার জন্য মহাসভা করেন। তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এই অভিনন্দন পত্র, সর্ব্বজন স্বাক্ষরিত হয়। ২৬০টী স্বাক্ষর সম্বলিত এই অভিনন্দন পত্র পরদিন মধ্যাহ্নে গভর্ণর সাহেবকে দেওয়া হয়।" হেষ্টিংস বহুদিন এদেশে ছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে বিদায় গ্রহণকালে তাঁহাকে বড়ই ব্যথিত হইতে হইয়াছিল।

• • •

(কলিকাতা গেজেট, ৬ই মে, ১৭৮৪)

কলিকাতার প্রথম সাহেবী-হোটেল

হারমোনিক ট্যাভার্ণের প্রধান পাচক, ট্রেণ হোম, কলিকাতাবাসী ভদ্র নরনারীকে জানাইতেছে যে—সে ব্যক্তি কসাইটোলা বাজারে একটী হোটেল খুলিয়াছে। ভদ্রলোকের উপযোগী ডিনার, সপার, ব্রেকফাষ্ট ইত্যাদি সবই সুন্দররূপে সরবরাহ করা হয়। সকল রকমের বিস্কুটও পাওয়া যায়। হাঁস, মুরগী, পায়রা প্রভৃতিও নিত্য পাওয়া যায়।

• • •

সুসজ্জিত সৌখিন হোটেল বা সরাইখানায় বসে মদগুল হয়ে আড্ডা জমিয়ে তোলা ছাড়াও, সেকালের বিলাসী-বিত্তশালী সাহেব-বিবিরা প্রায়ই বাঠে-ঘাটে বেরিয়ে পড়ে বনভোজন, শীকার, নৌকা-বিহার, খেলা-ধূলা প্রভৃতি আরো নানান্ মনোরম উপায়ে অভিনব আমোদ-প্রমোদে মেতে তাঁদের প্রবাস-জীবনের অবসর মুহূর্তগুলির যথাযথ সদ্ব্যবহার করতেন। তাঁদের সেই সব অভিনব উপায়গুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হলো —ঘোড়দৌড়ের বাজী, বেলুন ওড়ানো, শীকার-অভিযান নৌকা-বিহার, বিদেশ-ভ্রমণ, ক্রিকেট খেলা প্রভৃতি বিবিধ ধরণের প্রমোদ-অনুষ্ঠান।

একালের মতো খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে কলিকাতার দেশী ও বিলাতী সমাজে বিলাসী-সৌখিন লোকজনদের অনেকেরই ঘোড়দৌড়ের মজা উপভোগের দিকে বিশেষ আগ্রহ-উৎসাহ ছিল—পুরাতন পুঁথিপত্রের পাতায় তারও প্রচুর নজীর পাওয়া যায়।

• • •

(৺হরিসাধন মুখোপাধ্যায় রচিত গ্রন্থ হইতে)

ঘোড়দৌড়ের মাঠ

ঘোড়দৌড় কলিকাতায় অনেকদিন হইতে প্রচলিত।

১৭৮০ খৃঃ অব্দে "হিকিস্-গেজেটে" এই ঘোড়দৌড়ের প্রথম বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলের শেষ ভাগে। ইহার পর ১৭৯৪ পর্যন্ত যে সমস্ত ঘোড়দৌড় হইয়াছিল, তাহার বিবরণ পাঠক পূর্বে দেখিয়াছেন। ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে "ওল্ড ষ্টাবেল" প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। আগে গার্ডেনরিচের বা বর্তমান মেটিয়াবুরুজের উপাকণ্ঠভাগে, আবড়া-বারুদখানায় ঘোড়দৌড়ের মাঠ ছিল। বারুদখানা নামের কারণ, এখানে কোম্পানীর একটি ম্যাগাজিন বা বারুদাগার ছিল। বর্তমান ঘোড়দৌড়ের মাঠ ১৮১৯ খ্রীঃঅব্দে খোলা হয়। এতদ্ভিন্ন বারাসতেও ঘোড়দৌড় হইত।

•

সেকালের ঘোড়দৌড়

১২ই ডিসেম্বর (১৭৮৩) খৃঃ যে ঘোড়দৌড়ের ইস্তাহার বাহির হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই—"আগামী ৮ই, ৯ই ও ১০ই জানুয়ারীর বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার ঘোড়দৌড় হইবে। এজন্য প্রাতরাশ ও সঙ্গীতের আয়োজন করা হইয়াছে। ঘোড়দৌড়ের পর শুক্রবার "বল ও সপার" (Ball and supp) হইবে। যাঁহারা ঘোড়া ছুটাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ঘোড়াসম্বন্ধে সমস্ত আবশ্যকীয় তথ্য সম্পাদকের নিকট জানিতে পারেন।

সম্ভবতঃ এই ঘোড়দৌড়, কলিকাতার নিকটবর্তী কোন স্থানে হইয়াছিল। সেই সময়ে বারাসতেও ঘোড়দৌড় হইত। বর্তমান ঘোড়দৌড়ের মাঠ, তখন সম্পূর্ণরূপে জঙ্গল-বিমুক্ত হয় নাই। কিন্তু স্যার জন শোর (পরে লর্ড টেন্‌মাউথের) এর আমলে, কলিকাতার মাঠে ঘোড়দৌড়ের বন্দোবস্ত দেখা যায়।

• • •

(৺হরিসাধন মুখোপাধ্যায় রচিত গ্রন্থ হইতে)

বারাসতে ঘোড়দৌড়

তখনকার দিনে বর্তমান ঘোড়দৌড়ের-মাঠ জঙ্গলে আবৃত ছিল। তাহা বলিয়া সাহেবদের প্রধান আমোদ ঘোড়দৌড় বন্ধ থাকিত না। ঐ সময়ের একটী বিজ্ঞাপন (তৎকালীন ইংরাজী সংবাদপত্র "The Calcutta Gazette" এ প্রকাশিত) হইতে জানা যায়—"যে বলি আবহাওয়া ভাল থাকে, তাহা হইলে বারাসতের মাঠে ঘোড়দৌড় হইবে। সময় অপরাহ্ণ। সেলবী সাহেব উপস্থিত ভদ্রমহোদয়দের জন্য খানার ও টিফিনের বন্দোবস্ত করিবেন।"

• •

[ক্রমশঃ

আশা

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

পায়ে চলার এই যে' পথ, ভবিষ্যৎ : এর পাশে
লুকিয়ে আছে অন্ধকারে কোন বিদেশের কন্যা সে'—
হাতছানি তা'র নজর পথে রূপ ছড়িয়ে যায় কোথায় :
যায় কোথায়, যায় কোথায়—অনন্তকাল রূপকথার
বিহোর যত রাজকুমার মন-চেতনার তেপান্তর
পেরিয়ে যায়, পায়না তা'র পলক-দেখা নীলাম্বর।

পায়ে চলার এই যে পথ, ভবিষ্যৎ : এর পাশে
কোন বিদেশের রাজকন্যার হাতছানি
যেয় উচ্ছ্বাসে
ভরিয়ে বুক—বর্তমানের লক্ষ কোটি রাজকুমার
আলোর মালা সাজিয়ে যায় বিচিত্র
এক রূপকথায়।

দক্ষিণ ভ্যাং

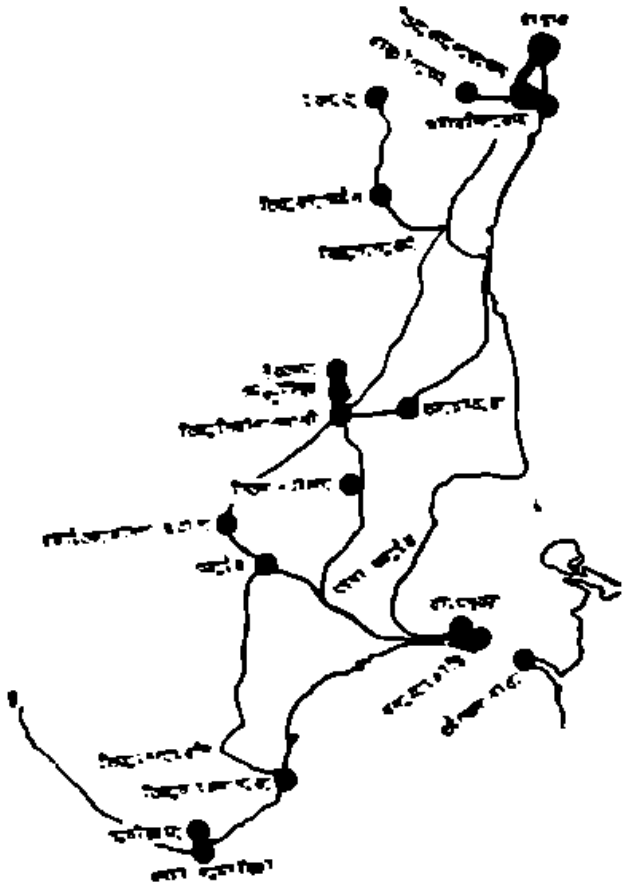

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

। ২ ।

মাদ্রাস্ সেণ্ট্রাল্ ওয়াই, এম্. সি, এ,র সামনেথেকে সকাল আটটায় সরকারী বাস্ ছাড়লো শ্রীরঙ্গমপুরম্-এর উদ্দেশে।

পথে ত্রিচ-কল -কুম্বকোনম্ বা দক্ষীণার্দ্ধ। ওখানে ঘণ্টা দুই-এর জন্য যাত্রা বিরতি হবে, পাখীদের খাওয়া দেখার জন্য।

বাস্-এর যাত্রীদের মধ্যে বেশীর ভাগই দক্ষিণ দেশীয়। কয়েকজন স্থানীয় গুজরাটীও ছিলেন। মাদ্রাজ শহরে উত্তর ভারতাগত বাসিন্দাদের মধ্যে গুজরাটীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিকাংশই ব্যবসায়ী। অধুনা এঁদের অনেক রকমের ব্যবসায়ে লিপ্ত দেখা গেলেও পূর্বে মাদ্রাজে খাদ্য শস্যের বাণিজ্যেই এঁদের প্রধান স্থান ছিল।

শুধু মাদ্রাজ শহরেই নয়, মাদ্রাজ প্রদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মদুরৈ (মাদুরা)-তেও এঁদের সংখ্যা যথেষ্ট। তমিল্ ভূমির সঙ্গে গুজরাটের যোগসূত্র অনেক দিনের।

তমিল প্রদেশে সুদীর্ঘ-কাল রাজত্বকারী• চোল রাজগণের পূর্বপুরুষরা গুজরাটের চৌল হতে এসেছিলেন বলে অনেকের ধারণা।

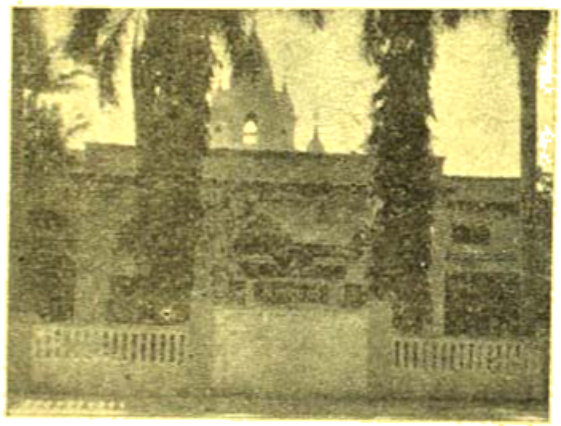

গৌড়ীয় মঠ—মাদ্রাজ

মিনিট চল্লিশ চৌড়ের পর কফি ও টিফিন-এর জন্য বাস্ এক জায়গায় থামলো।

একটা চালা ঘরে কাফে।

সবাই তাড়াতাড়ি ছ 'উপাহার' সেরে নিলেন। আমার সঙ্গে একই আসনে যাত্রী ছিলেন শ্রীশিবরাম মূর্তি। বয়স ষাটের ওপর। কাফের বাইরে বাস্-এর কাছে দাঁড়িয়ে কফি খাচ্ছিলেন। বাসের ইঞ্জিন গর্জন করে উঠতেই চেঁচিয়ে এক মিনিট রুকতে অনুরোধ করলেন।

কণ্ডাক্টর কিন্তু বাস্ ছেড়ে দিলো।

বৃদ্ধ অগত্যা কফি ফেলে বাসে উঠলেন।

• বাংলায় কথাটি 'চোল' রূপে পরিচিত।

ব্রাহ্ম-সমাজ—মাদ্রাজ

ত্যাগরাজ কোয়িল্—তিরুভোট্টিয়ুর্

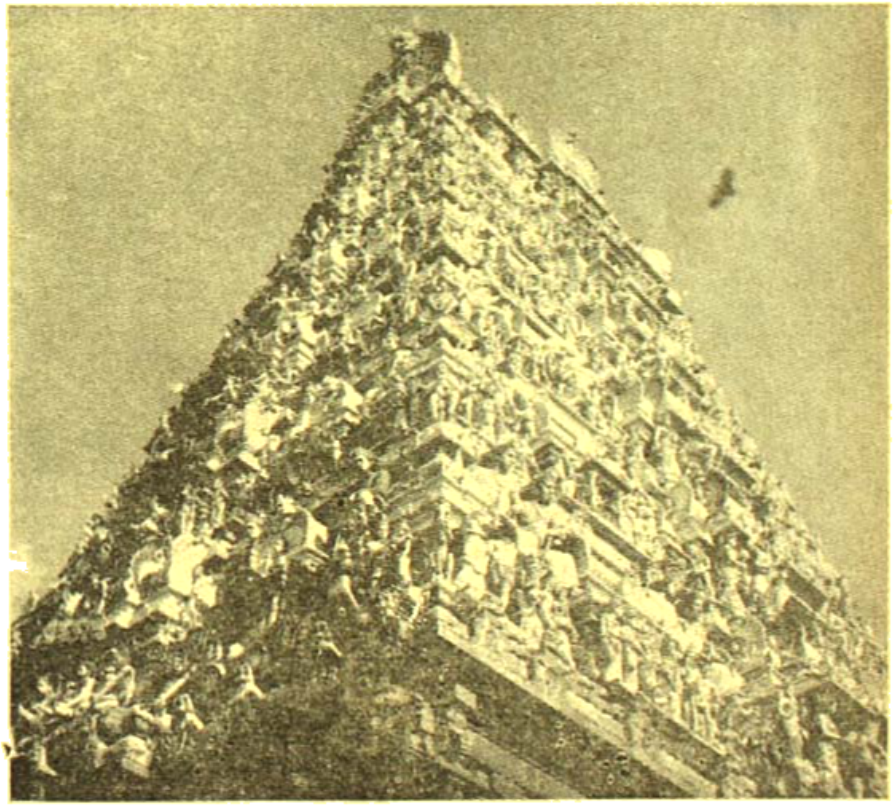

কপালীশ্বর মন্দিরের গোপুরম্
মাদ্রাজ

একজন স্থানীয় ভাষায় সহানুভূতি জানালেন। ইংরেজীতে মন্তব্য করলেন: These state bus conductors are so heartless!

বৃদ্ধ বললেন: অরসন্ এবরবরলি, কুটিগলং অবরবরলি। আমাকে বহিরাগত জেনে ভাষান্তরিত করে শোনালেন: As the king, so are the subjects :— যথা রাজা তথা প্রজা।

এর পর বাস থামলো চেঙ্গলপেট্-এ।

এটি একটি রেলওয়ে জংশন। মাদ্রাজ হতে দূরত্ব পয়ত্রিশ মাইল।

এখান থেকে মহাবলিপুরম্-এর দূরত্ব আঠার মাইল এবং আমাদের প্রথম উল্লিখিত স্থান তিরুকল্কুনরম্ বা পক্ষীতীর্থ মাত্র ন' মাইল।

মাদ্রাজ হতে চেঙ্গলপেট্ হয়ে মহাবলিপুরম্ তিপ্পান্ন মাইল। সমুদ্রের ধার দিয়ে অপর একটি পথে মহাবলিপুরম্ মাদ্রাজ হতে ছত্রিশ মাইল মাত্র।

বেলা সওয়া দশটায় এলো তিরুকল্কুনরম্। স্থানটি গণ্ডগ্রামের মত। মাদ্রাজের সান্নিধ্য হেতু কোনও

তিরুকল্কুনরম্

সামগ্রীরই দুষ্প্রাপ্যতা নেই। বিদ্যুৎ সরবরাহ আছে। তিরুকল্কুনরম্ কথাটির অর্থ হলো—পবিত্র চিলের পাহাড়।

তির অর্থে পবিত্র, কুল্ক অর্থ চিল, আর কুনরম্—পাহাড়।

স্কন্দ পুরাণে আছে,—পক্ষীতীর্থ* মহোদধির এক যোজন (ন' মাইল) পশ্চিমে অবস্থিত।

মহাবলিপুরম্ অর্থাৎ সমুদ্রকূল হতে পক্ষীতীর্থ ন' মাইল পশ্চিমে হওয়ায় উক্ত বিবৃতির সমর্থন পাওয়া যায়। পক্ষীতীর্থের পাহাড়টি বেদগিরীশ্বর শিবের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। পৌরাণিক কাহিনীতে প্রকাশ, পুরাকালে কৈলাস পর্বতের তিনটি শিখর দক্ষিণাপথে স্থানান্তরিত হয়েছিল। তারই একটি এই তিরুকল্কুনরম্ এর বেদগিরি।

তিরুকল্কুনরম্-এর অপর নাম রুদ্র কোটি।

কোটি রুদ্র এখানে বেদগিরীশ্বরের অর্চনা করেছিলেন। তাই রুদ্র কোটি।

স্থানটির আর এক নাম আদি নারায়ণপুরম্।

এক সময়ে কতকগুলি দৈত্যের পরাক্রমে ভীত দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা তাঁদের সাহায্য করতে পারেন না। দেবতারা তখন বিষ্ণুর সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

দৈত্যগুলি পরম শৈব হওয়ায় বিষ্ণু বুঝতে পারলেন যে, ওদের ধর্মচ্যুত না করতে পারলে পরাজিত করা অসম্ভব। তাই তিনি বুদ্ধরূপ পরিগ্রহ করে, তাদের শিবানুরক্তি হতে বিরাগ ও বুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট করলেন।

স্বধর্মচ্যুত দৈত্যগণকে দেবতারা তখন অতি সহজেই পরাস্ত করলেন।

চাতুরীর দ্বারা দৈত্যদের বিনাশ সাধন করে যে অন্যায় করেছিলেন তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বিষ্ণু এই স্থলে কঠোর তপস্যা করেছিলেন।

আদিনারায়ণপুরম্ নামটি ঐ কাহিনীজাত।

তিরুকল্কুনরম্-এর বেদগিরি নামটি সুবিদিত। পাহাড়টি চারভাগে বিভক্ত এবং ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব নামে অভিহিত। সর্বোচ্চ শীর্ষে অধিষ্ঠান করছেন বেদগিরীশ্বর শিব।

এই অনুক্রমের অর্থ—পাহাড়গুলি বা বেদসমূহের সোপান অতিক্রম করে তবেই শীর্ষস্থানে পৌঁছনো যায়,—শিবজ্ঞান বা ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ হয়।

পাহাড়ের উপরের জলাশয়টির নাম * পক্ষীতীর্থম্। আর আর এক নাম—সম্পাতিতীর্থম্।

---

* তামিল ভাষায় তীর্থ শব্দটির অর্থ পবিত্র জল।

জলাশয়টির জলের গুণ সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতি আছে। শোনা যায়, সুরগুরু নামে এক রাজার যষ্ঠী ও মষ্ঠীর কুসুম এই পুষ্করিণীতে স্নানের ফলে কুষ্ঠ মুক্ত হয়েছিলেন।

বেদগিরীশ্বরের মন্দিরের এক শ' ফিট্ নীচে একটি মণ্ডপ। মণ্ডপটি এক অখণ্ড শিলা হতে রচিত। তাই নাম হয়েছে ওরুকল্লমণ্ডপম্ (ওরু অর্থে এক। কল্—শিলা)। কয়েকটি স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপি হতে জানা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীতে পল্লবরাজ প্রথম নরসিংহ বর্মণ এটি নির্মাণ করেছিলেন।

কিন্তু পাহাড়ের নীচে, বর্তমানে ষ্ট্রং-রুম্ হিসাবে ব্যবহৃত গুহাটির একটি শিলালেখে ব্যক্ত হয়েছে যে, চোলরাজ প্রথম আদিত্য বেদগিরীশ্বর মন্দিরের সংস্কার সাধন করেছিলেন এবং রাজা স্বয়ং-শিষ্য এই মন্দির-অনুকূলে বহু কৃষিসম্পদ দান করেছিলেন। উক্ত আদিত্য এবং স্বয়ং-শিষ্য পল্লবরাজ নরসিংহ বর্মণের বহু পূর্ববর্তী কালীন। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বেদগিরীশ্বর মন্দিরটি সপ্তম শতাব্দীর নয়, পরন্তু আরও প্রাচীন।

পাহাড়ের নীচের মন্দিরটিও সুপ্রাচীন।

এই দেবালয়টির কতকগুলি প্রস্তর চিত্রণ থেকে প্রতাপশালী চোলরাজ সুরগুরুর বিষয় জানা যায়। সুরগুরুর বিশাল হস্তী বাহিনী ছিল। একটি উটের প্রতিকৃতি হতে অনুমিত হয় যে, তাঁর সেনাবাহিনীতে উটও ছিল। তামিল ভূমির আর কোথাও উটের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় নি।

একটি চিত্রণে চিত্রিত হয়েছে এক বিস্ময়কর কাহিনী: নিজের অজ্ঞাতসারে সুরগুরু এক গাভীর মৃত্যু ঘটান। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি ঘটনাস্থলেই নিজের বধে স্থির হয়ে আত্মহত্যা করতে মনস্থ করেন।

শাস্তি গ্রহণের পূর্বমুহূর্তে মৃতা গাভীর দেহ হতে সুন্দরী এক কন্যা আবির্ভূতা হয়ে রাজাকে বললেন, 'মহারাজ' আপনি কোনও পাপ করেননি। বরং আপনি আমার শাপমুক্তির সহায়ক হয়েছেন।

আমি তিলোত্তমা। শিবের অনুচর নন্দী বৃষকে গাভীর বেশ ধরে প্রলুব্ধ করতে যাওয়ায় আমার ঐ দশা ঘটেছিল।'

তিলোত্তমার স্বীকারোক্তিমাত্র গো-হত্যা জনিত পাপ রাজার দেহ থেকে একটি কাকের আকারে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বেদগিরির দক্ষিণ-পশ্চিমের ছোট পাহাড়টিতে গিয়ে পড়লো।

ঐ পাহাড়টির তখন থেকে নাম হয়েছে—কাক্কৈ কুন্রম্ অর্থাৎ কাক-পর্বত।

আশে পাশের সব পাহাড়গুলিতেই প্রচুর গাছপালা থাকলেও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কাক্কৈ কুন্রমে গাছ জন্মায় না।

সুরগুরু ছিলেন মহাবলিপুরম্-এর নরপতি।

তিরুকল্লুকুন্রম্-এর অদূরবর্তী কোটটে মঙ্গলম্-এর কাছে ছিল তাঁর প্রাসাদ। বর্তমান কোটটে মঙ্গলম্-এর সন্নিহিত ভঙ্গল্ ও নাশি মেডু নামে দুটি মাটির ঢিবির নীচে সুরগুরুর রাজপ্রাসাদ সমাহিত হয়েছে বলে জনশ্রুতি আছে।

তিরুকল্লুকুন্রম্-এ যতগুলি পবিত্র জলাশয় বা তীর্থম্ আছে তার মধ্যে শ্রীসম্পন্ন হলো—শঙ্খ-তীর্থম্। যে আশ্চর্যজনক ব্যাপার পুষ্করিণীটির মহিমা বাড়িয়েছে তা হলো এই যে, এর বদ্ধ জলে প্রতি বার বৎসরে একটি শাঁখ জন্মায়। শাঁখ অর্থে সাধারণ জলাশয়ের শামুক নয়,—আসল সামুদ্রিক শঙ্খ।

ওই শাঁখ দিয়ে বেদগিরীশ্বরের অভিষেক হয়।

মার্কণ্ডেয় মুনি পক্ষীতীর্থে এসে বেদগিরীশ্বরের অর্চনা করেছিলেন।

দেবতার অভিষেকের সময় শাঁখ না পাওয়ায় মুনিবরকে সংশ্লিষ্ট জলাশয়টিতে যোগবলে একটি শাঁখ উৎপন্ন করে তাই দিয়ে অভিষেক করতে হয়েছিল। তারপর থেকেই পুষ্করিণীটিতে প্রতি বার বৎসরে একটি করে শাঁখ জন্মায়।

বেদগিরিতে ওঠবার জন্য আছে চমৎকার সোপান।

শ' চারেক সিঁড়ি ভেঙ্গে পাচশ' ফিট্ ওপরে পাখী নামার জায়গায় পৌঁছলাম।

সেদিন বেশ জনসমাগম হয়েছিল। বেলা সওয়া এগারোটার সময়, উঁচুতে, দুটি পাখীকে চক্রাকারে উড়তে দেখা গেলো। এক ব্রাহ্মণ তাঁর নিজের পাক করা

আহার্য এবং জল নিয়ে এক শিলাস্তূপে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সাড়ে এগারোটায় হঠাৎকোথা পাখী দুটি নীচে নামলো।

পাখীর আগমন—তিরুকল্‌কুনরম্

এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে ব্রাহ্মণের হাত থেকে খাবার ও জল খেয়ে আবার উড়ে গেলো।

বিহঙ্গ যুগল সাধুত্বের চিহ্ন ভাতীয়। গায়ের রঙ সাদা, ঠোঁট হলুদবর্ণ। অতি শান্ত আচরণ।

প্রবাদ আছে যে, ওরা বিশ্বনাথ-ক্ষেত্র বারাণসীর গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করে,—তারপর রামেশ্বরে গিয়ে শিবের আরাধনা করে,—বেঙ্গিরিতে গ্রহণ করে আহার, এবং রাত্রি যাপন করে চিদম্বরম্-এ। স্থানগুলির প্রত্যেকটিই শৈবতীর্থ।

পাখী দুটির এরূপ অসম্ভব দীর্ঘ পথ পরিক্রমণ প্রসঙ্গে একটি বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের কয়েকটি সংবাদপত্রে ঘটনাটি পরিবেশিত হয়েছিল :

'গত ১৭ই জুন সকাল প্রায় ন'টার সময়ে মধুরৈ (মাদুরা)-এর মীনাক্ষি মন্দিরে দুটি সাদা চিল দেখা যায়। তারা মন্দিরের জলাশয়ে স্নান করে প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে ঘাটের সিঁড়িতে বসে থাকে। সাড়ে দশটার সময় কৌতূহলী মন্দির কর্তৃপক্ষ তাদের ফটোগ্রাফ নেন। কিছুক্ষণ পরে পাখী দুটি মন্দিরে ঢুকলে তাদের ধরা হয়। উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে অনেকেই বলেন যে, এই পাখী দুটিকেই তাঁরা তিরুকল্‌কুনরম্-এ দেখেছেন।

মীনাক্ষি মন্দিরের ট্রাষ্টি তিরুকল্‌কুনরম্ দেবস্থান কমিটির মুখ্য সচিবের কাছে পাখী দুটির ফটো পাঠিয়ে জানতে চান যে, এই পাখী দুটিই তাঁদের ওখানে প্রসাদ অনুগ্রহণ করতে আসা পাখী দুটি কিনা।

তিরুকল্‌কুনরম্ এর কর্তৃপক্ষ জানান যে, ঐ পাখী দু'টি অভিন্ন।

পৌরাণিক মতে পাখী দুটি সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগেও বিদ্যমান ছিল।

কলি বা বর্তমান যুগের অতিক্রান্ত ৫০৬৭ বছরের প্রতিদিনই ঐ পাখী দুটি তিরুকল্‌কুনরম্‌এ আসে এবং কলির বাকী ৪২৬৯৩৬ বছরও আসবে।

সত্যযুগে ওদের নাম ছিল চণ্ড ও প্রচণ্ড। শাল্মলী দেশের বৃহদ্রথ নামে এক ব্রাহ্মণ ওদের সৃষ্টি করেছিলেন, —পক্ষী জগতের নেতৃত্ব করবার জন্য। কিন্তু পরিবর্তে ওরা আত্মিক উন্নতির দিকে আগ্রহশীল হয়ে পড়ে এবং রুদ্রকোটিতে এসে শিবোপাসনায় রত হয়।

ত্রেতাযুগে ওরাই ছিল রামায়ণে বর্ণিত সম্পাতি ও জটায়ু। দুজনে একদিন সূর্যের দিকে ধাবমান হলে হংস মুনির শাপে পঙ্গু হয়ে বিন্ধ্যগিরি ও মলয় পর্বতে পড়ে যায়। পড়ে সীতা উদ্ধারে রামচন্দ্রকে সাহায্য করে শাপমুক্ত হয়।

দ্বাপরে ওরা ছিল শত্রুগুপ্ত ও মহাগুপ্ত নামে দু' ভাই। এক সময়ে দুজনে রুদ্রকোটিতে কঠোর তপস্যায় রত হয়েছিল। একজন ছিল শিবের ভক্ত, আর অপরজন শক্তির। শিব বড় না শক্তি বড়—এই নিয়ে দুজনের মধ্যে একদিন প্রবল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলো। শিব আবির্ভূত হয়ে ওদের বললেন যে, ঐ দ্বন্দ্ব নিরর্থক। কারণ, তিনি ও তাঁর শক্তি অভিন্ন। শত্রুগুপ্ত ও মহাগুপ্ত কিন্তু তাতে ক্ষান্ত হলো না। শিব তখন তাদের পক্ষীরূপে রূপান্তরিত করে দিলেন।

কলির প্রারম্ভে পুষ ও বিহত নামে দু'ভাই সংসারে বীতরাগ হয়ে মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য বনে গিয়ে শিবের তপস্যা করতে থাকে। শিব তাদের বলেন যে, তাদের এখনও আধ্যাত্মিক মোক্ষ লাভের সময় হয়নি। আরও এক জন্ম তাদের অপেক্ষা করতে হবে। দু'ভাই সে কথায় কান না দিয়ে আধ্যাত্মিক মোক্ষের জন্য অধীরতা দেখায়। সেই কারণে, দেবাধিদেব তাদের দুটি চিলের আকারে রূপান্তরিত করে দেন। মোক্ষের সময় না আসা পর্যন্ত ওই পক্ষীরূপে

* তিরুকল্‌কুনরম্ থেকে মধুরৈএর দূরত্ব রেলপথে ৩১৭ মাইল।

ওদের তীর্থ পর্যটন করে ফিরতে হবে। তাই ওরা প্রত্যহ পরিক্রম করে—বারাণসী, বেদগিরি, চিদম্বরম্ ও রামেশ্বরম্।

পাখীর খাওয়া দেখা হয়ে যেতেই নীচে নামবার তাড়া পড়ে গেলো। বেলা সাড়ে বারোটায় পৌঁছলাম মহাবলিপুরম্।

। ৩ ।

বাস্ হতে নামতেই দেখা একদল কুদে সুন্দরীর সঙ্গে। সকলেরই বয়স দশের নীচে। বেশীর ভাগই পরেছে জ্যাকেট ও লম্বা পাবাডৈ। তামিল্‌ ভাষায় ঘাগরাকে বলে পাবাডৈ। ফ্রক্-এর ব্যবহার এ অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে খুবই কম।

মাথায় ওদের ফুলের বাহার। হরবোলার মত কথায় মুখরা হয়ে পথ চলছে। সবাই রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের ছাত্রী। এসেছে মাদ্রাজ হতে।

মহাবলিপুরম্।

দৈত্যরাজ বলির সঙ্গে নামটি সম্পর্কিত বলা হয়। মতান্তরে, স্থানটির সঠিক নাম মমল্ল পুরম্। পল্লবরাজ মমল্ল (১ম নরসিংহ বর্মণ) বা মহামল্ল স্থানটির

শঙ্খ-চক্র-বংশীধৃত-বিষ্ণুমূর্তি—মহাবলিপুরম্

কালভুক্তাবশিষ্ট স্থাপত্যাদির অধিকাংশেরই প্রতিষ্ঠাতা। প্রথমোক্ত মতে; মমল্ল মহাবলিপুরম্-এর জীর্ণোদ্ধার মাত্র করেছিলেন,—আসলে এ স্থান পৌরাণিক বলিরাজের সময়ান্বিত।

পল্লবদের রাজধানী ছিল মহাবলিপুরম্ থেকে চল্লিশ মাইল দূরবর্তী কাঞ্চীপুরম্।

পল্লবরা উত্তরাগত জানা গেলেও সঠিক কোথা হতে এসেছিলেন তা অজ্ঞাত। এঁদের প্রথম প্রকাশ হয়েছিল অন্ধ্র প্রদেশের কৃষ্ণা জেলাতে। আনুমানিক ৩য় শতকে বলা হয় যে, নাগবংশীয় এই পল্লবরা প্রথমে অন্ধ্রের সাতবাহন রাজাদের অধীনে উপশাসক ছিলেন।

এঁরা ছিলেন সুনিপুণ ব্যবসায়ী ও সুদক্ষ নাবিক। প্রতিবেশী তঞ্জাবুর-এর চোল্‌র, মদুরৈ-এর পাণ্ড্যি (পাণ্ডা) এবং বাতাপির (বাদামির) চলুক্যরাজাদের সঙ্গে এঁদের যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকতো। শেষ পর্যন্ত চোল্‌ল রাজের কাছে পরাজয়ের ফলে এই বংশের রাজত্বের অবসান ঘটে।

পল্লব বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি প্রথম নরসিংহ বা মমল্ল, চলুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাস্ত করে, বাদামি অধিকার করেছিলেন। দু' বার সিংহল অভিযান করে তিনি সিংহল রাজকে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন।

এই মমল্লই মমল্লপুরম্ বা মহাবলিপুরম্ নগর ও বন্দরের প্রতিষ্ঠা অথবা সংস্কারক।

মহাবলিপুরম্-এর অধিকাংশ স্থাপত্যাদি যদিও মমল্ল-কৃত কিন্তু কয়েকটি গুহা-মন্দির মমল্লের বহু পূর্ববর্তী সময়ের, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—কোটি কল্ মণ্ডপম্।

মমল্লের সময়ে নির্মিত স্থাপত্যাদির মধ্যে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর রথ বিশেষ আকর্ষণীয়। অনেকের মতে পাথরের তৈরী রথগুলি বা কথাকৃতি মন্দিরগুলির সঙ্গে পঞ্চ-পাণ্ডবের কোনও সম্পর্কই নেই। মমল্ল ছিলেন পরম শৈব। তিনি ওই রথগুলি নির্মাণ করিয়েছিলেন শিব, পার্বতী, * পিল্লৈয়ার্, স্কন্দস্বামী এক্ শিবভক্তের উদ্দেশ্যে। রথগুলির সংলগ্ন বাহনমূর্তিগুলি হতেই এ ধারণার উৎপত্তি।

* পিল্লৈয়ার্—গণেশ। স্কন্দস্বামী—কার্তিক।

গরুপাণ্ডবের রথ—মহাবলিপুরম্

দ্রৌপদীর রথটি আকারে সবচেয়ে ছোট। রথটির চূড়ার আকৃতি চালা-ঘরের অনুরূপ।

যুধিষ্ঠিরের রথটি বৃহত্তর।

দ্রৌপদীর রথের সন্নিহিত ও একই ভিত্তিতে স্থাপিত অপর রথটি অর্জুনের।

অর্জুনের পরের রথটি ভীমের। তারপর নকুল ও সহদেবের।

বাস্ হতে নেমে দক্ষিণে পঞ্চ পাণ্ডবের রথ এবং পূর্বে সমুদ্র দৈকতে যাবার মাঝে পথে পড়ে একটি সুবিশাল প্রস্তর আলেখ্য—'অর্জুনের তপস্যা'। এটি 'গঙ্গাবতরণ' নামেও অভিহিত।

অনেকগুলি পৌরাণিক উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে শিলা চিত্রণটিতে। যে মূর্তিটি একপায়ে দাঁড়িয়ে, সেটি তপস্যারত অর্জুন এবং তাঁর সম্মুখের মূর্তিটি শিব রূপে পরিচিত। পাশুপত অস্ত্র লাভের পূর্বে অর্জুন যে তপস্যা করেছিলেন সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আলেখ্যটি রচিত।

মাত্র এই একটি প্রতিকৃতির জন্যই কেন যে সমগ্র চিত্রণটিকে অর্জুনের তপস্যা বলা হয় তা দুর্বোধ্য।

প্রত্নতাত্ত্বিক A. H. Longhwrst-এর মতে আলেখ্যটি যে ছোট পাহাড়ের গায়ে রচিত হয়েছে, তার শীর্ষদেশে একটি জলাধার ছিল। আলেখ্যটির মাঝামাঝি ফাটলের মত যে নালীপথ আছে সেই পথে, জলাধারে সংগৃহীত গঙ্গার জল উৎসারিতে প্রবাহিত করা হতো। অর্থাৎ, কৃত্রিম গঙ্গার প্রদর্শনী হতো।

গঙ্গ বতরণ আলে খ্যর একাংশ—মহাবলিপুরম্

আলেখ্যে প্রদর্শিত মানুষ, বানর, বরাহ, কূর্ম, মৃগ, সিংহ, হস্তী ইত্যাদি সকলেই যেন ছুটছে গঙ্গার আরাধনা করতে। এই কল্পনার ভিত্তিতে, 'চিত্রণটিকে বলা হয় 'গঙ্গাবতরণ।'

'আর এক সম্প্রদায়ের মতে চিত্রটি বিষ্ণুর 'পরদেবতা

গো-দোহন—মহাবলিপুরম্

পরমার্থ' বিষয়ক। শিব এক সময়ে বিষ্ণুকে দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করেন। তারই আখ্যা হয়—পরদেবতা পরমার্থ'। ওই 'ঘোষণাটি শোনবার জন্যই সমগ্র জীবকুল ছুটছে। বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ বলে তাঁকে একটি মন্দির মধ্যে ও শিবকে উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখানো হয়েছে।

আলেখ্যটির উদ্দেশ্য বোধহয় শৈবদের বৈষ্ণব মতে আনবার সময় বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা।'

'অর্জুনের তপস্যা' হতে একটু এগোলেই কৃষ্ণ-মণ্ডপ।

এই মণ্ডপের 'গাভী-দোহন' প্রস্তর-চিত্রটিকে বলা যায় মহাবলিপুরম্-এর শ্রেষ্ঠ কারুকৃতি। কর্কশ পাথরের বুকে বৎসকে স্নেহ-লেহনরতা গাভীর পেলব মূর্তিটির রচনা সমালোচনার কোনও অবকাশই রাখেনি।

কৃষ্ণ-মণ্ডপের পিছনে পাহাড়ের ওপর বিশেষ দ্রষ্টব্য—রথ ও বরাহ-মণ্ডপ।

পঞ্চ-পাণ্ডবের রথ দেখে বাস্ স্ট্যাণ্ড্-এর দিকে ফেরবার পথে, একটি পাহাড়ের চূড়ায় লাইট হাউস।

ঐ একই পাহাড়ে রয়েছে মহিষাসুরমর্দিনী মণ্ডপ। মণ্ডপগুলির মধ্যে এটিই সবচেয়ে সুন্দর।

বাস্ স্ট্যাণ্ড্ থেকে পূর্বদিকে দু'ফার্লঙ্ দূরে সমুদ্র এবং জল-শয়ান মন্দির।

জলশয়ান মন্দির—মহাবলিপুরম্

মন্দিরটির গঠন ব্রহ্মদেশীয় প্যাগোডা ধরণের। বর্তমানে একটি মাত্র মন্দিরের অস্তিত্ব দেখা গেলেও অতীতে এরূপ সাতটি মন্দির ছিল। বিদেশীরা তাই মহাবলিপুরম্কে বলতেন—Seven pagodas।

দু'টি মন্দির সমুদ্রগর্ভে স্থান পেয়েছে।

জল-শয়ান মন্দিরটি দ্বিতীয় নরসিংহ বর্মণ্ (রাজ সিংহ)-এর রাজত্বকালে (৬৯০-৭১৫ খৃঃ অঃ) নির্মিত।

জল-শয়ান মন্দিরের কাছে ইতস্ততঃ ছায়ার সৃষ্টি করেছে কাসুয়ারিনা গাছের দল। বাংলার ঝাউয়ের আকৃতি বলি 'ঝাউ'।

দুপুরের রোদে বঙ্গোপসাগরের মূর্তি হয়ে উঠেছে অনন্ত নীল। মন্দিরের পায়ের কাছে সমুদ্র শত তরঙ্গে আছড়ে পড়ে যেন মন্দির অভ্যন্তরের শায়িত বিষ্ণুর বন্দনা করছে।

তাই দেখবার জন্য আমরা জল পর্যন্ত ভিড় করে দাঁড়িয়েছিলাম মন্দিরের আশে-পাশে।

মন্দিরের উত্তরে, সমুদ্র যেখানে খাড়ির মত, সেখানে দুটি অর্ধ-নগ্না বিদেশিনী শ্বেতাঙ্গী মেতে উঠেছিলেন স্নানে। তাঁদের উদ্দামতা দেখিয়ে তাঁরা সমুদ্রকে হার মানাতে চাইছিলেন কিনা জানি না তবে, উচ্ছল বারিধির রূপ দর্শনার্থীদের দৃষ্টিকে যে তাঁরা শোভনীয়ভাবে বিঘ্নিত করছিলেন তা সুনিশ্চিত। আমার নিজস্ব ধারণায় এটি অমার্জনীয় অপরাধ।

খানিক পরে একটি ভারতীয় মহিলাও অনুরূপ বেশে জলে নামলেন!

বিভ্রান্ত দৃষ্টি কয়েকজন দর্শকের পিছনে বছর বারো তেরোর ঘোর কৃষ্ণবর্ণা এক মাদ্রাজি দুহিতা দাঁড়িয়েছিল। মাথায় তার ডাব ভর্তি ঝুড়ি। বিস্ময়ভরা চোখে 'ম্যাম্' সাহেবদের উন্মাদনা দেখছিল।

ভারতীয় মহিলাটিকে জলে নামতে দেখে মুগ্ধ-নয়ন একটি বছর কুড়ির কিশোরবয়সী যুবক তার বন্ধুর উদ্দেশে বললো: দেখো, কিতনা মার্ডন হৈ!

আমার পিছনে কে একজন তাঁর সঙ্গীকে আহ্বান জানালেন: বাহ।—এসো।

ঝুড়ি মাথায় মেয়েটা চেঁচিয়ে উঠলো: ডেঙ্কায়! ডেঙ্কায় সামি, ডেঙ্কায় ঐয়া? ডাব! ডাব চাই বাবু?

বাসস্ট্যাণ্ড্-এর পথ ধরলাম। [ক্রমশঃ

নেহরুজীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন—

দুর্গাপুর কংগ্রেসে যে কয়টি প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহার মধ্যে পরলোকগত নেতা জহরলাল নেহরুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অন্যতম প্রধান প্রস্তাব। দীর্ঘ ৫৫ বৎসর পরে কংগ্রেসের বর্তমান ৬৯তম অধিবেশন জহরলালের অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হইল। সে জন্য তাঁহার নেতৃত্বের কথা স্বীকার করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য এক সুদীর্ঘ প্রস্তাব রচিত হইয়াছিল। নেহরুজী বর্তমান যুগের কংগ্রেস নেতাদের সকলের গুরু ছিলেন—১৯৪৮ সালে মহাত্মা গান্ধীর পরলোকগমনের পর হইতে—এমন কি গান্ধীজীর জীবিতকালেও নেহরুজী ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন। তাঁহার অভাবে কংগ্রেস নেতারা প্রতি পদক্ষেপে তাঁহার অভাব অনুভব করিতেছেন। সে কথা দুর্গাপুর-কংগ্রেসে বিশেষভাবে সকলকে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

কংগ্রেস-সেবীদের কর্তব্য—

দুর্গাপুর কংগ্রেসে কংগ্রেস-সেবীদের কর্তব্য বিষয়ে এক সুদীর্ঘ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের নেতা তথা নিখিল ভারত কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ শ্রীঅতুল্য ঘোষ সে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া কংগ্রেসে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—কংগ্রেসকর্মীদের বিপ্লবী মনোভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। দারিদ্র্য ও মানুষে মানুষে পার্থক্য দূর করার কাজে যাহারা বাধা দিবে তাহাদের সহিত কংগ্রেসীদের সংঘর্ষ অনিবার্য। কংগ্রেসে শ্রমের অমর্যাদা দূর করিতে চায়। আজিকার দিনে প্রয়োজন, কেউ ছোট নয়—এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের সহিত কংগ্রেসের যে পার্থক্য আছে, তাহা দূর করিয়া সকলকে একযোগে কাজ করিতে হইবে। মন্ত্রীরাও কংগ্রেস-সেবী—কাজেই মন্ত্রীদিগকে সাধারণ কর্মীদের সহিত একযোগে কাজ করিতে হইবে। মন্ত্রীরা যেন নিজেদের কংগ্রেস কর্মী অপেক্ষা উচ্চতর জীব বলিয়া মনে না করেন। কংগ্রেসে এ প্রস্তাব নানা কারণে বিশেষ অভিনব ও উল্লেখযোগ্য।

চীন ও পাকিস্তানের চক্রান্ত—

চীন সরকার ভারতের বামপন্থী কম্যুনিষ্টদের সকল প্রকারে সাহায্যদান করিয়া ভারতে গণ-বিদ্রোহ সৃষ্টির যে চেষ্টা করিতেছিল, তাহা ধরা পড়ায় গত ৩০শে ডিসেম্বর এক সঙ্গে ভারতের বহু স্থানে বহু সংখ্যক বামপন্থী ভারতীয় কম্যুনিষ্ট নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ঐ দিনই কাশ্মীরের জম্মু হইতে খবর পাওয়া যায় যে পাকিস্তানীরা অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য করিয়া কাশ্মীরের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিতে যাইয়া ধরা পড়িয়াছে। চীন ও পাকিস্তান সকল দিক দিয়া কাশ্মীরকে বিব্রত করার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ভারত সরকারের তৎপরতার জন্য তাহাদের কার্য সফল হয় না। ওদিকে চীনা ফৌজ ভুটানের মধ্যে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করায় ভারতীয় সৈন্যদলকে ভুটানে তাহাতে বাধা দিতে হইতেছে। যুদ্ধ ঘোষণা হয় নাই বটে, কিন্তু আজ ভারতকে যুদ্ধের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

চাল ও গমের দাম বৃদ্ধি—

গত ১লা জানুয়ারী হইতে পশ্চিমবঙ্গে চাল ও গমের দাম বাড়িয়া যথাক্রমে কিলো প্রতি ৮০ পয়সা ও ৫০ পয়সা করা হইয়াছে। শুধু বিদেশ হইতে আমদানী করা গমের দামই বাড়িয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আটা-ময়দা ও সুজির দামও বাড়িয়াছে—তাহাদের দাম হইল কিলো প্রতি ৪৫, ৭২ ও ৭৮ পয়সা। এই ভাবে সব জিনিষের দাম বাড়িতেছে।

দুর্গাপুরে প্রাণ ভাগ্রুল্য—

৩১শে ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীএস. কে. পাতিল দুর্গাপুর কংগ্রেস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। ঐ প্রদর্শনীতে ভারতের অর্থনীতির অগ্রগতি দেখানো হইয়াছে। ঐ দিন তিনি দুর্গাপুর রেল ষ্টেশন

হইতে ১ মাইল দূরে কংগ্রেস মণ্ডপের নিকট একটি নূতন ফ্লাগ ষ্টেশনের উদ্বোধন করেন—ঐ ষ্টেশনের নাম হইয়াছে বিধানচন্দ্র। স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের কথা—ঐ ভাবে সকলের মনে জাগ্রত রাখা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ের মন্ত্রী শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ ঐ দিন প্রদর্শনীর নেহরু-মণ্ডপের দ্বার উদ্ঘাটন করেন এবং শ্রীমতুলা ঘোষ খাদি ও গান্ধী মণ্ডপের উদ্বোধন করেন, কংগ্রেস অধিবেশন বসিবার এক সপ্তাহ পূর্ব হইতে এই সকল প্রদর্শনী প্রভৃতি খোলার ব্যবস্থা হয়।

মুখ্যমন্ত্রীদের দুর্নীতির তদন্ত—

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রাপ্ত দুর্নীতি সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছেন। উড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজু পট্টনায়ক ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন মিত্র সম্বন্ধে তদন্ত শেষ হইয়াছে। ফল শীঘ্রই জানা যাইবে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায়এর বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত চলিতেছে। আবার মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি শ্রীশাস্ত্রী পরীক্ষা করিতেছেন। চারিদিকে দুর্নীতির অভিযোগ—কাজেই মুখ্যমন্ত্রীদিগকে এখন সাবধানতার সহিত কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইতেছে। এই সকলের ফলে দেশ হইতে দুর্নীতি কমিয়া গেলে দেশ অবশ্যই লাভবান হইবে।

কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ আটক—

গত একমাসের অধিককাল সারা ভারতে বহু বামপন্থী কম্যুনিষ্ট নেতাকে গ্রেপ্তার ও আটক করা হইয়াছে। ১৯৬১ সালে চীনা আক্রমণের সময় হইতে একদল বামপন্থী কম্যুনিষ্ট চীনাদের কাছে ভারতের বহু গোপন কাগজপত্র প্রদান করিতেছিল। এতদিনে সে সব রাষ্ট্রবিরোধী কাজ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া ভারত সরকার সারা ভারতে কয়েক হাজার রাষ্ট্রদ্রোহী কম্যুনিষ্টকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। কেন যে ইতিপূর্বে তাহাদের গ্রেপ্তার করা হয় নাই, তাহা বুঝা যায় না। ভারতের রাষ্ট্রনীতি কঠোর না হইলে বহু আভ্যন্তরীণ শত্রু ভারতের ক্ষতি সাধন করিতে থাকিবে। কম্যুনিষ্ট ভারতীয়রা ছাড়াও একদল পাকিস্তানী গুপ্তচর সর্বদা ভারতের ক্ষতি সাধন করিয়া থাকে। তাহাদের সম্বন্ধেও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা আশু প্রয়োজন।

ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপুঞ্জ ত্যাগ—

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ রাষ্ট্রপুঞ্জকে জানাইয়াছিলেন—মালয়েশিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জে স্থান পাইলে ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যপদ ত্যাগ করিবে। ১লা জানুয়ারী মালয়েশিয়াকে রাষ্ট্রপুঞ্জে গ্রহণ করার পরই ইন্দোনেশিয়া তাহার কথামত কাজ করিয়াছে—সে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছে। বর্তমান যুগের ইতিহাসে এ ঘটনা অভাবনীয়। রাষ্ট্রপুঞ্জ এখন এক সমস্যার সম্মুখীন হইল। শুধু মালয়েশিয়া সমস্যা ইন্দোনেশিয়াকে বিব্রত করে নাই—রাষ্ট্রপুঞ্জ ত্যাগ করার ফলে ইন্দোনেশিয়া আরও কিছু সুবিধা পাইবে বলিয়া আশা করে। নিরাপত্তা পরিষদকে এখন এ সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন—

গত ২রা জানুয়ারী পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ তাঁহার বিরোধী শ্রীমতী ফতিমা জিন্নাহকে ভোটে পরাজিত করিয়া পুনরায় পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন। আয়ুব খাঁ ৪৯৬১৩ ভোট ও শ্রীমতী জিন্না ২৮৩৪৩ ভোট পাইয়াছেন। পাকিস্তানের রাজনীতির আগামী ৫ বৎসরে আর কোনরূপ পরিবর্তনের সম্ভাবনা নাই। ভারতের সহিত পাকিস্তানের বিবাদও সহজে মিটিবে না—কারণ আয়ুব খাঁ এই বিবাদ জিয়াইয়া রাখিয়া তাঁহার প্রভুত্ব বজায় রাখিতে চান। তিনি কাশ্মীর সমস্যারও কোনরূপ আপোষে সম্মত নহেন—কাজেই ভারতকে এই সীমান্ত রক্ষার জন্য বহু কোটি টাকা অপব্যয় করিতে হইবে।

নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত—

শ্রীভাভাই পেটেল ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্য। তিনি সম্প্রতি জাপানের তাইপে সহরে এশিয়ান কম্যুনিষ্ট বিরোধী লীগের সভায় যোগদান করিতে গিয়াছিলেন—তিনি ফিরিয়া আসিয়া ২৮শে ডিসেম্বর দিল্লীতে বলিয়াছেন—আশ্চর্যের কথা ভারত সরকার তাইপেতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বিমান দুর্ঘটনা সম্বন্ধে কোন তদন্ত করেন নাই। সে দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এখনও তথায় জীবিত

আছেন। প্রমাণসমূহও অধিকৃত আছে। যাহাতে সত্বর সে বিষয়ে তুটনা সম্বন্ধে তদন্ত হয় সে জন্য তিনি ভারত-সরকারের নিকট দাবী জানাইয়াছেন।

বেসরকারী শিল্পের ভূমিকা—

গত ২৩শে ডিসেম্বর সোমবার দিল্লী হইতে শান্তি-নিকেতনে যাইবার পথে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী কলিকাতায় আসিয়া এসোসিয়েটেড চেম্বার অফ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজের বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন—ঐ প্রতিষ্ঠান ভারতের শিল্পপতি ও বণিকদের সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। শ্রীশাস্ত্রী তাঁহাদের বলেন—আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে জন সাধারণের জীবন সত্তার সর্ব-নিম্ন মান স্থির করিয়া দেওয়া পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনার উদ্দেশ্য—সে বিষয়ের বেসরকারী শিল্পের বিশেষ ভূমিকা আছে ও শিল্পপতিদিগকে তাহা সাফল্য মণ্ডিত করিতে হইবে। বৎসরে এই এক দিন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শিল্পপতিদের সহিত প্রত্যক্ষভাবে মিলিত হইয়া থাকেন।

ভারত চীন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত—

গত ৩রা জানুয়ারী ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীযশোয়ান্ত-রাও চ্যবন জয়পুরে যাইয়া একটি বক্তৃতায় বলেন—চীন ভারতে আক্রমণের যতই চেষ্টা করুক না কেন, বর্তমানে ভারত চীনের আক্রমণে বাধা দিবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছে। ভারতের সামরিক সাজসজ্জা—শুধু চীন কেন, যে কোন শত্রুর আক্রমণে বাধা দিতে পারিবে। গত ২ বৎসরে ভারতবর্ষ নিজেকে সকল প্রকার সামরিক সজ্জায় সজ্জিত করিয়াছে। তাহার সুদীর্ঘ পাকিস্তান সীমান্ত দিয়া এখন আর কোন পাকিস্তানী প্রবেশ করিতে পারে না। নেপাল, ভুটান, সিকিম প্রভৃতি সীমান্তে এবং ভারতের উত্তর, উত্তরপূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বর্তমানে এমনভাবে সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে যে বাহিরের কোন শত্রু সহসা ভারতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তবে এ জন্য ভারতকে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইতেছে।

প্রধানমন্ত্রীর সতর্কবাণী—

গত ২৭শে ডিসেম্বর বারাণসীতে যাইয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী জেলা পরিষদের এক সম্বর্ধনার উত্তরে ভাষণ দান কালে বলেন—দুর্নীতি লইয়া বেশী হৈ চৈ করা উচিত নহে—কারণ তাহাতে জাতির মনোবল কমিয়া যাইবে। তবে দেশ হইতে দুর্নীতি ও ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করার জন্য আমাদের প্রত্যেককে চেষ্টা করিতে হইবে। আমি সম্প্রতি বিদেশ ভ্রমণকালে লক্ষ্য করিয়াছি—পৃথিবীর কোন দেশই দুর্নীতিমুক্ত নহে। সমাজ হইতে দুর্নীতি একেবারে দূর করা কখনই সম্ভব নহে—তবে দেশবাসী প্রত্যেকে চেষ্টা করিলে দুর্নীতির পরিমাণ অনেক কমিয়া যাইবে এবং তাহার ফলে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে সুখ ও শান্তি বৃদ্ধি পাইবে। মোটের উপর বর্তমান সময়ে প্রত্যেক দেশবাসীকে দুর্নীতি দমনে সচেষ্ট হইতে হইবে।

আন্দামানের বিপদ—

আন্দামান কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীকে, আর, গণেশ গত ৫ই জানুয়ারী দিল্লীতে যাইয়া বলিয়াছেন—ইন্দো-নেশিয়রা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করিতেছে। চীনারাও মাছ ধরিবার ও ঝিনুক কুড়াইবার অজুহাতে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নানা স্থানে গমনাগমন করিতেছে। এ সকল দেখিয়া তাহাদের অনু-প্রবেশের দুরভিসন্ধি বুঝা যায়। সুখের কথা, ভারত সরকার ঐ সকল জনবিরল দ্বীপে পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্বাস্তু-দিগকে লইয়া গিয়া বসবাসের সুবিধা করিয়া দিতে মনোযোগী হইয়াছেন। সে সকল স্থানে কৃষি ও বাণিজ্যের প্রচুর সুযোগ আছে। উদ্বাস্তুরা তথায় গমন করিলে নানা দিক দিয়া লাভবান হইবেন।

রাঁচী-রাউরকেলা নূতন রেল—

গত ২৭শে ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় রেল দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ রামসুভগ সিং রাঁচীতে একটি বোতাম টিপিয়া রাঁচী হইতে রাউরকেলা ১৬৮ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি নূতন রেলপথের উদ্বোধন করেন। উৎসবে বিহারের পরিবহন মন্ত্রী শ্রীরাঘবেন্দ্রনারায়ণ সিং সভাপতিত্ব করেন। পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ এই নূতন লাইন নির্মাণ করিয়া ইহার পরিচালন ভার দক্ষিণ-পূর্ব রেলের উপর অর্পণ করিয়াছেন। এই নূতন রেল হওয়ায় ঐ অঞ্চলের যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধা হইবে এবং শিল্প বাণিজ্য বাড়িয়া যাইবে। দেশে যখন সর্বত্র উন্নতির কাজ চলিতেছে, তখন রেল কর্তৃপক্ষও

নূতন রেল নির্মাণে তৎপর। ইহা দেশবাসীর পক্ষে আনন্দ ও আশার কথা।

গৌহাটীতে নূতন তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র –

২৭শে ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের বেতার ও তথ্যমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গৌহাটীতে যাইয়া একটি নূতন তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন করিয়াছেন। ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঐ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। উহার ফলে আসামে বিদ্যুৎ সরবরাহ বহু পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। ভাষণ দান কালে শ্রীমতী গান্ধী বলেন—"আমার পিতা জহরলাল নেহরু আসামের উন্নতি বিধানের জন্য সর্বদা চিন্তা করিতেন—কারণ আসাম ভারতের সীমান্তে অবস্থিত এক অনুন্নত দেশ। কাজেই আসামের আজ এই উন্নতি দেখিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত। আসামে ভারতের নানা রাজ্যের বহু লোক আসিয়া বাস করিতেছেন—আমি তাঁহাদের সকলকে একযোগে আসামের উন্নতির জন্য কাজ করিতে আহ্বান জানাইতেছি।"

বিহার হইতে অ-বিহারী বিতাড়ন—

বিহার সরকার সম্প্রতি এক নূতন আদেশ জারি করিয়া খনিসমূহের মালিকদিগকে খনিতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সকল শ্রেণীর শ্রমিক নিয়োগের সময় শুধু বিহারীদিগকে নিয়োগ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। সকল খনি মালিককে তিন টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজে স্বাক্ষর করিয়া প্রতিশ্রুতি দিতে হইতেছে যে তাহারা বিহারী ছাড়া অন্য দেশীয় শ্রমিকদের কোন কাজ দিবেন না। বিহারের খনি অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের কাছে; কাজেই পশ্চিমবঙ্গের বহু লোক ঐ সকল খনিতে কাজ করে। তাহাদের ক্রমে ক্রমে তাড়াইয়া দেওয়াই বিহার সরকারের উদ্দেশ্য। অথচ পশ্চিম বাংলায় বহু সংখ্যক বিহারী শ্রমিক কাজ করে—সে জন্য বাঙ্গালীকে বেকার থাকিতে হয়। বিহার সরকার এ বিষয়ে চিন্তা না করিয়া কেন এরূপ আদেশ জারি করিয়াছেন, তাহা বুঝা কঠিন।

টি-এস-ইলিয়ট—

বৃটেনের অন্যতম প্রখ্যাত সাহিত্যিক, কবি, সমালোচক ও নাট্যকার টি-এস-ইলিয়ট গত ৪ঠা জানুয়ারী রাত্রিতে লণ্ডনে তাঁহার বাসভবনে ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি আমেরিকা হইতে আসিয়া ইংলণ্ডে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ইংলণ্ড ও আমেরিকার সরকার সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করিয়াছিল। তাঁহার সাহিত্য তাঁহাকে অমরত্ব দান করিবে এবং তাঁহার রচনা তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তাঁহার মত জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি চিরকাল সকল দেশে আদৃত হইয়া থাকেন।

আবার চীনা আক্রমণের সম্ভাবনা—

গত ২৩শে ডিসেম্বর হইতে প্রায় প্রত্যহ চীনা সৈন্যরা সিকিম রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করিতেছে। সুবিধা পাইলে চীনারা সীমান্তের যে কোন পথ দিয়া সিকিমের মধ্যে প্রবেশ করে—নানা রূপ উৎপাত করে ও পরে তাড়া খাইয়া পলাইয়া যায়। এ কারণে সিকিম সীমান্ত বিপন্ন অবস্থায় আছে। ভারতের সহিত সিকিমের বন্ধুত্ব থাকায় ভারতের সাহায্য লইয়া সিকিম সরকার চীনা প্রতিরোধে সমর্থ হয়। ভারতীয় সৈন্যগণ ঐ অঞ্চলে যে কোন বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত আছে—কাজেই চীনারা সহজে ঐ অঞ্চলে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ভারতের পক্ষ হইতে বহু বার চীনা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবাদ জানানো হইয়াছে—কিন্তু চীনা কর্তৃপক্ষ কোন শুনেন না।

সহরাঞ্চলের সম্পত্তি হইতে কর—

গত ৩রা জানুয়ারী দিল্লীতে পরিকল্পনা কমিশনের এক সভা হয়, কি করিয়া পরিকল্পনার জন্য অতিরিক্ত তিন হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করা হইবে, তাহাই সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী ও কমিশনের সহ-সভাপতি শ্রীঅশোক মেটা উভয়েই এ বিষয়ে একমত যে সহরাঞ্চলের সম্পত্তি হইতে অধিক রাজস্ব আদায় করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সকল রাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করা হইবে। সভায় কয়েকজন রাজ্যমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। যাহাতে কর দাতারা ফাঁকি দিতে না পারে সে বিষয়েও সরকারকে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। মোটের উপর ধনীদের নিকট হইতেই অধিক রাজস্ব আদায়ের সিদ্ধান্তে সকলে একমত হইয়াছেন।

কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের ভাতাবৃদ্ধি—

দাস কমিশনের নির্দেশ মানিয়া লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার

৬ঠা জানুয়ারী ঘোষণা করিয়াছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় ২১ লক্ষ কর্মচারীর মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি করা হইবে। ক্ষেত্র অনুসারে প্রত্যেকের মাসিক মাহে ৭ টাকা হইতে ৪০ টাকা পর্যন্ত ভাতা বাড়িবে এবং ১৯৬৬ সালের ১লা অক্টোবর হইতে বর্ধিত ভাতা দেওয়া হইবে। সামরিক বাহিনীর হিসাব না ধরিয়া ও কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বর্ধিত ভাতা দিবার জন্য বৎসরে ৩১ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত সকলের ভাল বলা যায়। সকল খাদ্য দ্রব্যের মূল্য যে হারে বাড়িয়া গিয়াছে তাহার তুলনায় এই বর্ধিত ভাতা কিছুই নহে। তথাপি শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত নূতন মন্ত্রিসভা যে বর্ধিত কর্মীদের জন্য কিছু করিলেন, ইহাই সকলের পক্ষে আশ্বাসের কথা।

সরকারী মাছের ব্যবসা—

দ্বিতীয় ২৫ জানুয়ারীর খবরে জানা যায় ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক যোগে কলিকাতার একটি মাছের ব্যবসার জন্য কর্পোরেশন গঠন করিবেন। জানুয়ারীতেই কর্পোরেশনের কাজ আরম্ভ হইবে, তবে পুরা ব্যবসা ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ ভাগ হইতে চলিবে। কর্পোরেশনের হাতে টাকা দেওয়া হইবে এবং তাহারা হিমঘর ও রিফ্রিজারেসন তাল রাখিবেন। প্রয়োজন মত কর্পোরেশন হইতে বিভিন্ন সমবায় সমিতিকে অর্থ দাদন করা হইবে। আপাততঃ ৮টী রাজ্য ও পাকিস্তান হইতে মাছ আনিয়া কলিকাতা কেন্দ্র হইতে তাহা বিক্রয় করা হইবে। ক্রমে বাংলার মফঃস্বল সহরগুলিতেও মৎস্য বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হইবে। দেখা যাউক, নূতন ব্যবসার ফল কি হয়।

হিসাব বহির্ভূত ধনসম্পদ—

একদল মানুষ অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছে, আর একদল অতিরিক্ত লাভ করিয়া প্রচুর টাকা জমাইতেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দের চেষ্টায় সারা ভারতে ধনীদের গৃহ তল্লাস করিয়া হিসাব বহির্ভূত অর্থের সন্ধান করা হইতেছে। ৬ঠা জানুয়ারী কেন্দ্রীয় সরকার এক অর্ডিনান্স জারী করিয়া—অনুসন্ধানের ফলে প্রাপ্ত সকল বেআইনি অর্থ—সোনা রূপা টাকা সম্পত্তি—সমস্ত সরকার কর্তৃক গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, যাহারা আয়কর ফাঁকি দিয়াছে তাহাদের ঐ টাকা হইতে আয়কর কাটিয়া লওয়া হইবে। বাকী সমস্ত সম্পত্তি সরকার আটক করিবেন। এই ব্যবস্থা কঠোরতার সহিত গৃহীত হইলে দেশ উপকৃত হইবে। কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় সহরে বহু ধনীর টাকা ঐ ভাবে আটক করা হইয়াছে। আমরা সরকারের এই প্রচেষ্টার প্রশংসা করি ও সাধারণ মানুষকে এ বিষয়ে সরকারকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করি।

যাত্রা শেষ

শ্রীবিজয়চন্দ্র দাশ বি-এল্

অনাদি কালের স্রোতে ভাসিয়া লীলায়
পিপাসিত আত্মা মোর জন্ম জন্ম ধরে
চলিয়াছে কোন্ দেশে,
নাহি জানি হায়!
অনন্ত রহস্যময় গভীর আঁধারে!—

চলিয়াছে অবিরাম,—কভু হায় গতি,
নাহি থামে বিশ্রামে
কালের বেলায়;

শুনিয়াছি, যাত্রা শেষে আলোকের জ্যোতিঃ
শাশ্বত উজ্জ্বল চির বিরাজে তথায়!

সেইখানে যাত্রা মোর হবে সমাপন,
সেই যে গন্তব্য পথ অনাদি আত্মার;
তবু নাহি জানি হায়, কোন্ সে কারণ
মায়ার কুহকে আমি ভাসি বারবার!
কতবার লক্ষ্য ভুলে উন্মাদ পরাণ
ছুটে যায় অন্যপথে হারাইয়া জ্ঞান।

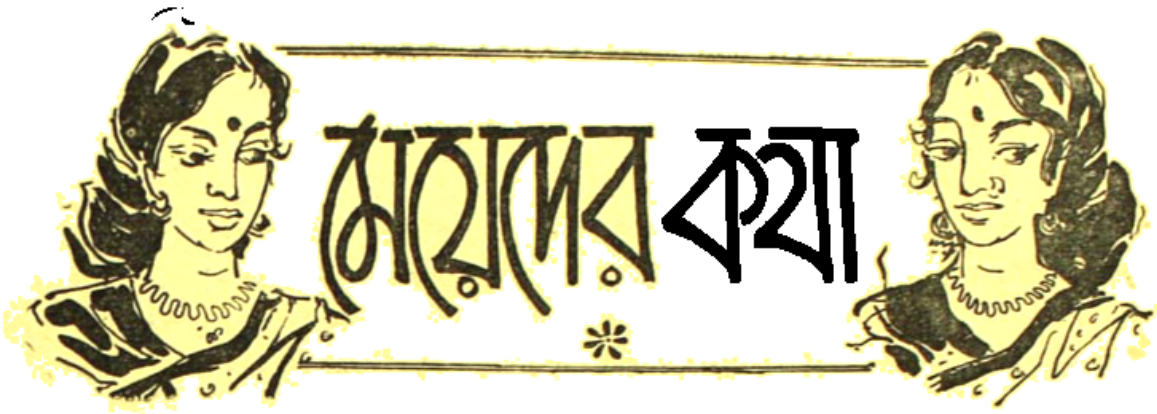

নব-দম্পতির প্রতি উপদেশ

কমলা ভট্টাচার্য

বাঁশীর এমন সুর আছে যা অশ্ব-অশ্বিনীকে উত্তেজিত করে তুলে, প্রয়োচিত করে তাদের মিলনে। দর্শনশাস্ত্রের যত বিভিন্ন মত, যত সুন্দর ভাব রয়েছে তাদের কোনটিই বিবাহ-বিষয়ক মতবাদের চেয়ে অধিক পঠনীয় নয়—কারণ তা' নব-দম্পতিকে জীবনপথের আলো দেখায়—তাদের একাত্ম হতে সাহায্য করে। তাদের অনেকখানিই অনেকের জানা পড়া আছে, কিন্তু আজকে যাদের বিয়ে হয়েছে তাদের স্মৃতিকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে মুখ্য উপদেশগুলি নিম্নে নিবদ্ধ করা হল।

সলোন উপদেশ করেছিলেন : কনে বরের পাশে শয়ন করবার আগে একটা সুগন্ধি, সুস্বাদু ফল চিবিয়ে নিতে হবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মুখের সৌন্দর্য্য আর কণ্ঠের মাধুর্য যেন প্রথম থেকে প্রকাশিত থাকে।

একদেশে কনের মাথায় ঘোমটা পরিয়ে তার উপরে এক রকমের কাঁটাগাছ বসিয়ে দেওয়া হয়। সেই কাঁটা-গাছের ফল ভারী মিষ্টি। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বর যদি কনের প্রাথমিক রুক্ষতায় বিরক্ত না হয়, পরে সে দয়িতার মৃদু-মধুর সাহায্য লাভ করবে। যারা তরুণী ভার্যার প্রগলভতা সহ্য করতে রাজী নয়, তারা যেন সেই শ্রেণীর চাষী যারা আঙ্গুর পাকে নি বলে ক্ষেত ছেড়ে দেয় অপরকে। আর এক শ্রেণীর পুরুষ আছে যারা স্ত্রীর প্রাথমিক উৎপাত সহ্য করে পরে তাকে ত্যাগ করে—সে যেন মৌমাছির হুলকে সহ্য করে তার মধু পরিত্যাগ করার মত।

প্রথম প্রথম নব দম্পতিকে খুব সাবধানে মতদ্বৈধ আর বিবাদ এড়িয়ে যেতে হবে। জোড়া দেওয়া পাত্রের অংশগুলি প্রথমে অল্প আঘাতেই আলগা হয়ে যায়। কিন্তু কালে যখন জোড়া শক্ত ভাবে লাগে, তখন শত আঘাতেও কিছু হয় না।

তুষ আর খরঘোষের লোভে আগুন জ্বলে খুব তাড়াতাড়ি। কিন্তু শক্ত কিছু পদার্থ না ধরতে পেলে সে আগুন নিভে যায় তখুনি। নব-দম্পতির দৈহিক আকর্ষণে যে প্রেমের আগুন জ্বলে তা রূপ ধরে নিতে যায়—যদি না সেই প্রেম যুক্তি আর চরিত্রের দৃঢ়তার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিষ দিয়ে মাছ মারা সোজা—কিন্তু সেই মাছ খাওয়া যায় না। যে সব নারী কামে ঔষধ দিয়ে বা যাদু-মন্ত্রের দ্বারা স্বামী বশীভূত করে তাদের নিস্তেজ করে ফেলে তারা অচিরেই দেখতে পাবে তাদের বিয়ে হয়েছে মস্তিষ্কবিহীন মূর্খের সঙ্গে। যে-সব নারী মূর্খ স্বামীর উপর প্রভুত্ব করতে ভালবাসে তারা হচ্ছে তাদের মত, যারা অন্ধকে বরং পরিচালনা করবে কিন্তু যে দেখতে পায়, যে পথ জানে তার সঙ্গে কখনও চলতে ভালোবাসে না। এ সকল নারী দুর্ভাগা।

যে সব পুরুষ শক্তির অভাবে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসতে পারে না, তারা তাদের ঘোড়াকে নীচু হতে শেখায়—লেঠ্ লেঠ্ বলে। ঠিক তেমনি ভাবে ভাল পরিবারে জাত

ধনবতী পত্নীকে অবহেলা করে তাদের ঠিক অকর্মণ্য স্বামীরা তারা নিজেদের একটুও উন্নত করতে উৎসাহ পায় না।

চাঁদ যখন সূর্য থেকে দূরে থাকে তখনই তার জ্যোৎস্না বেশী ফুটে উঠে। কিন্তু যখন সে সূর্যের কাছে আসে সে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। দাসী নারীর অবস্থা তার বিপরীত। সে স্বামীর সান্নিধ্যে উজ্জ্বল, স্বামীর অনুপস্থিতিতে সেও অনুপস্থিত।

সূর্য-পবনের প্রতিযোগিতায় পবনের পরাজয় হয়। পবন জোর করে কোট খুলতে চেয়েছিল একটি লোকের কিন্তু সূর্য তার তীক্ষ্ণ তেজ দিয়ে ধীরে ধীরে বাধ্য করল তাকে কোট খুলে ফেলতে। অনেক স্বামীর বেলাতেও ঠিক তেমনি। যে সব স্বামী স্ত্রীর ব্যয়-বাহুল্যের অত্যাদ সংযত করতে নিরোধের মত ভৎর্সনা বা বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেয়, সে পবনের মতই নিষ্ফল হয়। কিন্তু যে স্বামী সূর্যের মত ধীরে ধীরে যুক্তি-যুক্ত প্রয়োচনা প্রয়োগ করে তার সাফল্য সুনিশ্চিত।

দর্পণ সে স্বর্ণখচিতই হোক আর যাই হোক, যদি তাতে ঠিক প্রতিকৃতি প্রতিফলিত না হয়, তার কোন মূল্য নেই। তেমনি রত্নভূষিত ধনবতী নারীর মূল্য ঠিক তেমনি সামান্য যদি তার মধ্যে স্বামীর ভাবের প্রতিফলন না ঘটে। তার স্বামী যখন আনন্দিত তখন যদি সে মলানমুখো, আর স্বামী যখন বিষণ্ণ তখন যদি সে উৎফুল্লচিত্তে নেচে বেড়ায়, তবে সে রত্নখচিত দর্পণের মতই নিরর্থক।

যে সব পুরুষ নিজেদের স্ত্রীর সঙ্গে বসে খায় না, তাকে একা একা খেতে শিক্ষা দেয়,—স্ত্রীর সাহচর্যে যারা উৎফুল্ল না হয়, আনন্দ আর উল্লাসে সম্মিলিত না হয়,—তারা কেবল স্ত্রীদের স্বামী ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য প্রযোচিত করে থাকে।

দেশের রাজা যদি সঙ্গীত প্রিয় হয় তবে দেশে অনেক সঙ্গীতজ্ঞের উদ্ভব হয়। তিনি যদি পাণ্ডিত্য ভালোবাসেন, পণ্ডিতের সংখ্যা বেড়ে যায়, দেহ-চর্চায় যদি তাঁর মনোযোগ থাকে, তবে অনেক ব্যায়াম-বীরের জন্ম হয় দেশে। তেমনি স্বামী যদি আকৃতিগত সৌন্দর্যের দুর্বলতা প্রকাশ করে তবে স্ত্রীর সাজ-সজ্জাপ্রীতি বেড়ে যায়, স্বামী যদি শুধু ভোগপরায়ণ হয়, তবে স্ত্রী উদ্ভ্রান্ত কামনার দাসী হয়ে উঠে। কিন্তু স্বামী যদি শিব ও সুন্দরের পূজারী হয়—তবে স্ত্রী প্রজ্ঞায় ও শালীনতায় শ্রীমতী হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নেই।

শ্যাটার এক সুন্দরীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তুমি কখনও কোন পুরুষকে প্রার্থনা করেছো? সে উত্তর দিয়েছিল—'না, তবে একটি পুরুষ আমার কাছে প্রার্থনা করেছে।' এইরূপ ব্যবহারই বিবাহিতা নারীর পক্ষে সমীচীন।

কোন স্ত্রী তার নিজস্ব বন্ধুর (স্বামীর সঙ্গে তার নেই এমন বন্ধুর) দল যেন না বাড়ায়। স্ত্রীর সকল বন্ধুই হবে তার স্বামীরও বন্ধু। শুধু তাই নয়, স্ত্রীর দেবতা হবে স্বামীরও দেবতা।

যে রাষ্ট্রে 'এ আমার—এ তোমার' ভাব নেই সেই রাষ্ট্রের লোকেরা সুখী হয়ে থাকে—প্লাটো এ কথা বলেছেন। পরিবারের পক্ষে এই কথা সব চেয়ে বেশী খাটে। চিকিৎসকেরা বলেন ডান হাতে যদি চোট লাগে বাম হাত ক্লিষ্ট হয়। স্বামীর আর স্ত্রীর সম্পর্কও তেমনি হবে। একজনের দেহে বা মনে আঘাত লাগলে অন্যজন পীড়িত হবে। একজনের আনন্দে অন্যজন পুলকিত হবে। প্রকৃতি দম্পতির দেহকে মিলিত করে। উভয়ের দেহের অংশ নিয়ে সে সৃষ্টি করে নূতন শিশু যে কারোর একার নয়। বিষয় সম্পদও দম্পতির এমন হবে যা একা কারোর নয়,—সর্বথা উভয়ের বলেই গণ্য হবে।

লিবিয়াতে বিয়ের পরে বরে স্বামীর ঘরে পৌঁছে শাশুড়ীর কাছে প্রার্থনা করে একটা পাত্র। বরের মা বলেন 'না, কোন পাত্র নেই'। এ করা হয় প্রথম থেকেই নববধূ যেন বুঝতে পারে, শাশুড়ীর চরিত্র হচ্ছে বিমাতার মত—যাতে পরে যদি কোন বিবাদের কারণ ঘটে সে যেন ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত না হয়। নববধূকে প্রথম থেকেই শাশুড়ীর প্রতি সহনশীল হতে হবে। তার প্রতি যেন শাশুড়ীর ঈর্ষা না জাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তার স্বামী যেন তার মায়ের প্রতি স্নেহ-ভক্তি বিন্দুমাত্র হ্রাস না করেও তার নিজের প্রতি আকৃষ্ট ও প্রেমপরায়ণ হয়—তাকে তেমনি সাবধানে চলতে হবে।

নবদম্পতির পক্ষে নিজেদের মধ্যে কলহ ও মতভেদ বর্জন করে চলা অবশ্য কর্তব্য। বিশেষ করে তারা যখন ফুলশয্যায় তখন যেন কোন বিরোধ না ঘটে। গ্রীস দেশের

এক গর্ভযন্ত্রণা কাতর নারীকে যখন তার পরিচারিকা বিছানায় শোয়াতে চেয়েছিল সে বলেছিল—'যে যন্ত্রণার সূত্রপাত হয়েছে এ বিছানায়, তার শান্তি কি করে হবে এই বিছানাতেই ?' দম্পতির শয্যাতে যে সব বিদ্বেষ, ভৎর্সনা ও দুর্ভাবনার জন্ম হয়, তার শান্তি একেবারে অসম্ভব না হলেও খুবই কঠিন।

প্রায় দুই হাজার বছর আগে গ্রীক মনীষী প্লুটার্ক দম্পতির উদ্দেশ্যে এসব উপদেশ রেখে গেছেন। আজকের দিনের দম্পতির পক্ষেও এসকল উপদেশ বহুমূল্য। এ-সমূহের সঙ্গে নবদম্পতিকে সর্বদা মনে রাখতে হবে—দম্পতিকে নিয়েই পরিবারের সৃষ্টি—পরিবার নিয়েই সমাজ। দম্পতির শান্তির উপরই সমাজের সমূহ কল্যাণ নির্ভর করছে। তাই প্রত্যেক নব-দম্পতির কর্তব্য হচ্ছে প্রেম, সত্য, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা দ্বারা নিজের জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, যে শান্তি চন্দ্রালোকের মত সারা সমাজদেহ স্নিগ্ধ করে রাখবে।

প্রসূতি-পরিচর্য্যা ও শিশুমঙ্গল

কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম,বি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রসূতি-অবস্থায় মহিলাদের কারো কারো মাথা ঘোরার উপসর্গ দেখা যায়। এ উপসর্গের উপশম করবার সহজ উপায় হলো, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে দুই পায়ের ভিতরের ফাঁকে রাখা। তাহলে মাথায় রক্ত চলাচলের ফলে মাথা ঘোরা কমে যাবে। তাছাড়া মাথা ঘোরার উপসর্গ দেখা দিলে প্রসূতিকে কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থেকে বিশ্রাম গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু মাথা ঘোরার ফলে প্রসূতি যদি চোখে কাপসা দেখেন, তাহলে পরীক্ষার জন্য অবিলম্বে ডাক্তারের সহায়তা গ্রহণ এবং পরীক্ষাগারে প্রস্রাব ও নিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া দরকার।

প্রসূতি-অবস্থায় অনেক প্রসূতির আবার পায়ে খিল ধরার উপসর্গ দেখা যায়। এমন অবস্থায় প্রসূতির পেশী সংবাহনে বা মার্জনায় খিলধরা সেরে যায়। গরম ও ঠাণ্ডা জলের সেঁক দিলেও বেশ সুফল মেলে। কিন্তু শিরা স্ফীতি হলে কদাচ মার্জনা বা সংবাহন করা উচিত নয়। এছাড়া প্রসূতির পা, হাত, মুখ ফুলে বা স্ফীত হয়ে উঠলে, অথবা সময় নষ্ট না করে তৎক্ষণাৎ ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন। তবে পায়ের শিরা-স্ফীতিতে পা উঁচু করে শোয়া ও বসার কথা মনে রাখা উচিত। অর্থাৎ প্রসূতিকে শয্যায় শুইয়ে রেখে—তাঁর খাটের পায়ার দিক উঁচু করে দিতে হয়। অনেক সময় (Crepe Bandage) "ক্রেপ্ ব্যান্ডেজ" (অর্থাৎ সঙ্কোচন-বিকোচনশীল) দিয়ে বেঁধেও কিছু উপকার হয়।

গর্ভাবস্থায় জরায়ুর ও মূত্রাশয়ের উপর চাপ পড়বার ফলে, অনেক প্রসূতির বারবার প্রস্রাবের বেগ আসে। এভাব গর্ভাবস্থার দ্বিতীয় মাসে এবং প্রসূতি-অবস্থার একেবারে শেষের দিকে দেখা দেয়। ভয়ের কারণ না হলেও, কোনো প্রসূতির যদি এসব উপসর্গ দেখা যায়···অর্থাৎ পা ফোলে, প্রস্রাব করার সময় ব্যথা, জ্বালা অনুভব বা মুখ ফোলে ··তাহলে অবিলম্বে প্রস্রাব পরীক্ষা করানো ও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার। প্রতিদিন /২ /৪০ সের প্রস্রাব হয় কিনা, লক্ষ্য রাখা দরকার। এমন উপসর্গ দেখা দিলে প্রসূতি প্রচুর জল খেলে, প্রস্রাব নিয়মিত হবে।

প্রসূতি-অবস্থায় কোনো কোনো মহিলার অর্শ রোগেরও উপসর্গ দেখা দেয়। সাধারণতঃ, মলদ্বারের শিরাস্ফীতিকে অর্শ বলে। অর্শরোগ থেকে রেহাই পেতে হলে পায়খানা খোলসা রাখা আবশ্যক। তাছাড়া বিছানায় শয্যা গ্রহণ করে অর্শের উপর ঠাণ্ডা জলের সেক দিলে যথেষ্ট আরাম হয়—বিশেষভাবে, মলত্যাগের পরে। কোনো কারণে শক্ত বা কঠিন মল যাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা ও খাদ্য পানীয়াদি সেই মত গ্রহণ বা পরিবর্তন করার জন্য সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক।

এছাড়া প্রসূতি অবস্থায় অনেক মহিলার স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় থেকে শ্লেষ্মার মত স্রাব নির্গত হতে দেখা

যায় এবং এ স্রাব নির্গমন প্রসূতি-অবস্থার শেষের দিকে বেশ বাড়ে। যদি রক্তমিশ্রিত স্রাব অথবা যন্ত্রণা বা অন্য কোনও উপসর্গ দেখা দেয়, তাহলে অবিলম্বে শয্যাগ্রহণ করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

কোনো কারণে প্রসূতি-অবস্থাকালে গর্ভপাতের সম্ভাবনা বা লক্ষণ দেখা দিলে, তৎক্ষণাৎ শয্যাগ্রহণ করে অভিজ্ঞ ধাত্রী ও ডাক্তার ডাকা চাই। কোমরে ও পেটে ঘন ঘন ব্যথা এবং রক্তস্রাব, প্রসূতির গর্ভপাতেরই পূর্ব্বাভাস সূচিত করে। এ উপসর্গ দেখা দিলে গরম খাদ্য বা উত্তেজক পানীয় বর্জ্জন করা একান্ত আবশ্যক।

প্রসূতি অবস্থাকালে জননেন্দ্রিয় প্রভৃতির কণ্ডূয়ন বা চুলকানি দেখা দিলে খেতসার বা শর্করা জাতীয় খাদ্য যথাসম্ভব কমিয়ে দিতে হবে। জলে সামান্য সোডা (Soda-Bicarb) বা পোটাশিয়াম পারম্যাংগেনেট (Potassium Permanganate) মিশিয়ে, সেই জল দিয়ে ধুলে বা কোমর পর্য্যন্ত ডুবিয়ে স্নান করলে যথেষ্ট উপকার হয়। তাছাড়া এক পাইট জলে চায়ের চামচের এক চামচ পরিমাণ সোডিবাইকার্ব্ব মিশিয়ে সেই মিশ্রণটিকে পরিষ্কার তুলার সাহায্যে চুলকানির উপর প্রলেপিত করলে উপকার পাওয়া যায়। জলে ফিকে লাল রং হয় এমন পরিমাণে পোটাশিয়াম পারম্যাংগেনেট অর্থাৎ এক গ্রেণ আন্দাজ, একপাইট জলে মিশিয়ে, সেই জলে (Sitz bath) প্রসূতির কোমর পর্য্যন্ত ডুবিয়ে রাখলেও উপকার হবে। এছাড়া প্রসূতির প্রস্রাব পরীক্ষা করানো, কোষ্ঠ সাফ রাখা এবং চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত কোন ঔষধপত্র না খেওয়া—এগুলিও অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য। উপরন্তু, প্রসূতির আরো কয়েকটি উপসর্গ—অর্থাৎ, রক্তস্রাব, প্রস্রাবের গোলমাল মাথাধরা বা ঘোরা, পেটেব্যথা বা যন্ত্রণা, হাত, পা, মুখ ফোলা, হঠাৎ চোখে কাপসা দেখা, জ্বর, কোষ্ঠকাঠিন্য বা কোষ্ঠবদ্ধতা, পেশীর আক্ষেপ, বার বার কাঁই সর্দ্দি, শরীরের ওজন হঠাৎ বাড়া বা কমা, সন্তানের নড়াচড়া বন্ধ হলে, বা পেটে কোনও অস্বস্তি বা হঠাৎ ভার বোধ হলে অনর্থক সময় নষ্ট না করে, যত শীঘ্র সম্ভব সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করা একান্ত প্রয়োজন। এই সব কারণেই, প্রত্যেক প্রসূতির উচিত গর্ভাবস্থায় ডাক্তারী-পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সবিশেষ সচেতন থাকা। যদিও শতকরা ছিয়ানব্বই থেকে সাতানব্বই (৯৬%-৯৭%) জন প্রসূতিই প্রসব কালে বিশেষ কোনও কষ্টই পাননা, তবুও মনে রাখা চাই যে সময়ে পরীক্ষার ফলে বাকী তিন জন প্রসূতির ভবিষ্যৎ যে কোনও প্রসবকালীন বিপদ থেকে এড়ানো সম্ভব হতে পারে। উপযুক্ত পরীক্ষার অভাবে অন্যদিকে সময়ে সাবধান হবার সুযোগ গ্রহণের সুস্পষ্ট কোনও ধারণা না থাকলে প্রসূতি ও গর্ভস্থ সন্তানের শুধু বিপদ ডেকে আনা হবে। অজ্ঞানতা ও অবহেলা-অযত্নের ফলে। প্রসূতির প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা তো থাকবেই…উপরন্তু গর্ভস্থ সন্তানও হয় মৃত, না হয় বিকলাঙ্গ অথবা কয় অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়ে সংসারের নানা অশান্তি সৃষ্টি করবে। আমাদের দেশেতো বটেই, এমন কি বিলাতেও অনেক প্রসূতি সময়ে পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে চান না, আর একজন শিক্ষিত ধাত্রী বা চিকিৎসকের অধীন থাকার কথাও বিশেষ' চিন্তা করেন না। কাজেই এ সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে কয়েকটি কথা বলে রাখা একান্ত আবশ্যক। আপাততঃ, তারই কিছু-কিছু হদিশ দিয়ে রাখি।

প্রথমতঃ পরীক্ষার ফলে—টক্‌সিমিয়া অফ্ প্রেগ্‌-ন্যান্সি বা গর্ভাধানজনিত রক্তের বিষক্রিয়া রোগের আক্রমণ হতে সময়ে সাবধান হওয়া যায়। অন্যথায় এ রোগ আক্রমণ করলে গর্ভস্থ সন্তান ও প্রসূতির জীবন সংশয় হয়।

প্রথম প্রথম মাসে একবার অথবা দুমাস অন্তর পরীক্ষার পক্ষপাতী অনেকে, তবে শেষ দুমাস, ঘন ঘন পরীক্ষা করা হয়, যেমন পনের দিন অন্তর ও পরে শেষের দিকে প্রতি সপ্তাহে। প্রথম পরীক্ষার সময় বস্তীর অস্থির বা সরাকৃতি ভাঙের (pelvis) মাপ নেওয়া হয়। ওজন নিয়ে রক্তচাপ, প্রসূতির সব কিছুর একটা মোটামুটি পরীক্ষার ফল লিপি-বদ্ধ করে রাখাই নিয়ম। পরে যাতে প্রতি বারের পরীক্ষার ফলও নিয়মিত মিলিয়ে দেখার জন্য লিখে রাখা হয়। এ পরীক্ষার ফলে (১) গর্ভে সন্তানের অবস্থান, (২) প্রসূতির বস্তীর অস্থির কোন গঠনজনিত দোষ ত্রুটি থাকলে ধরা পড়ে ও সময়ে সাবধানতার ফলে প্রসব সহজসাধ্য হয়।

গর্ভস্থ সন্তান সহজে প্রসব হতে হলে, বস্তীর গঠন ঠিক হওয়া চাই। আবার অন্যদিকে যদি সন্তানের অবস্থান ঠিক না থাকে তাহলেও প্রসব কালে বিপদ দেখা দেয় ও তার জন্যে সময়ে প্রস্তুত হতে হয়। অবস্থান যদি ঠিক না থাকে যথা মাথা নীচের দিকে ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক (Universal flexion) হাত পা মোড়া ওটান অবস্থায় না থেকে হাত পা ছড়ান, বা মাথা সটান বা উপরে কিম্বা পাশে থাকে, তাহলে এই পরীক্ষার ফলে ধরা পড়ে ও তাহা সময়ে ঠিক করে নেওয়া যায় যাতে প্রসব সহজ-সাধ্য হয়।

যেখানে বস্তীর অস্থির গঠন দোষে সন্তান প্রসবের বিপদ বোঝা যায়, সেখানেও সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা হতে পারে—যাতে মাতা ও সন্তান উভয়ের প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব হয়। আমরা এসব নিয়ে চিন্তা করতে অভ্যস্ত না হওয়ায় প্রসূতিকে শেষ অবস্থায় হাসপাতালে অথবা নার্সিং হোমে নিয়ে যাই ও বিপদ ঘটিলে নিজেকে অদৃষ্টের—না হয় চিকিৎসক আর নার্সদের দোষ দিয়ে থাকি। সুতরাং মাতৃমঙ্গল চাহিলে ও সুস্থ সন্তানের মাতাপিতা হতে হলে সুস্থমনের ও সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এ বিষয়ে প্রতি গৃহে শিক্ষণ-ব্যবস্থা প্রচলন হওয়া দরকার। এ ব্যাপারে মাতা, পিতা এবং সংসারের সকলেরই দায়িত্ব সমান···এবং যৌথ-পরিবারের কর্ত্তা ও গৃহিণীদের এ সম্বন্ধে কুসংস্কারমুক্ত হয়ে ওঠা আবশ্যক। [ক্রমশঃ]

সুপর্ণা দেবী

সচরাচর দেখা যায় যে, সুঠামী-রমণীদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের দেহের বেয়াড়া-গঠনের ফলে যথেষ্ট লজ্জা এবং নানা রকমের কষ্ট দুর্ভোগ অনুভব করেন। এমন কি, এ সব কারণে অনেক সময় তাঁদের মধ্যে কারো কারো আবার বিবিধ ধরণের মানসিক ব্যাধিরও উপসর্গ দেখা যায়। কাজেই এ সব অবাঞ্ছনীয় অসুবিধা অশান্তির উপদ্রব থেকে রেহাই পেতে হলে, সুঠামী মহিলাদের প্রতিদিন নিয়মিত-ভাবে কিছুক্ষণ কয়েকটি সহজসাধ্য ও নিতান্ত ঘরোয়া-ধরণের ব্যায়াম পদ্ধতি অনুশীলন করা প্রয়োজন—একালের বহু অভিজ্ঞ বিচক্ষণ রূপচর্চ্চাবিশারদেই এমন অভিমত প্রকাশ করে থাকেন। কারণ, তাঁরা বলেন—রূপসী-রমণীর দেহটি হবে পল্লবের মতো পেলব সুঠাম। দেহটি বেয়াড়া ভারী বা ভঙ্গদেশ স্থূল-বর্ত্তুল হলে, রমণীর রূপ-যৌবনের আদৌ কোনো শ্রী-সৌন্দর্য্য বা মূল্য থাকে না। সুতরাং যে সব মহিলা তাঁদের রূপ যৌবন এবং দৈহিক গঠন-লালিত্য বরাবর সুন্দর সুঠাম-সুশ্রী রাখতে চান, তাঁদের কর্ত্তব্য—দেহ যেন অনাবশ্যক ধরণের ভারী, স্থূল ও মেদ-বহুল হয়ে না ওঠে—সেদিকে সদা সযত্ন দৃষ্টিদান করা।

আধুনিক রূপচর্চ্চা-বিশারদদের মতে—সুন্দর সুঠাম দেহ ও মনোরম যৌবন লালিত্যের অধিকারিণী মহিলাদের কোমর এবং জঘন—এই দুইয়ের গড়নে নিবিড় সামঞ্জস্য থাকা একান্ত আবশ্যক। এ সামঞ্জস্য রক্ষার সর্ব্বোত্তম ও

সহজ সরল উপায় হলো—নিয়ম নিয়মিতভাবে কোমর ও জঘনদেশের ব্যায়াম পরিচর্য্যা করা। সে ব্যায়াম পরিচর্য্যার ফলে, দেহের ছাঁদ ভালো এবং সুঠাম সুন্দর হয়ে ওঠে এবং তলপেট আর উদরদেশের স্নায়ু পেশীগুলি সুস্থ সবল সুনিয়ন্ত্রিত থাকে বলেই দেহ সহজেই বেয়াড়া বেঢপ অসুন্দর দেখায় না। জঘন, উদরদেশ এবং কোমরকে সরসভাবে গড়ে তোলার জন্য একালের অভিজ্ঞ বিচক্ষণ রূপচর্চ্চা বিশারদবৃন্দ যে সব অভিনব ব্যায়াম পরিচর্য্যার বিধি-নিয়ম অনুশীলনের ব্যবস্থাদি প্রবর্তন করেছেন, আপাততঃ তারই কিছু মোটামুটি হদিশ দিয়ে রাখছি—তবে এ বিধি-নিয়ম পালনের সময় গোড়াতেই নজর রাখা প্রয়োজন—দাঁড়ানো, বসা এবং চলে বেড়ানোর ভঙ্গীর দিকে।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে একটু বেশী বয়স হলেই, সুস্থদেহী-মহিলাদের উদরদেশ ও তলপেট মেদবহুল, ভারী ও স্থূল হয়ে ওঠে এবং ক্রমেই ঝুলে পড়ে। তাছাড়া জঘনদেশও মেদে স্ফীত ও কদর্য্য কুশ্রী হয়ে ওঠে। এমনটি হবার কারণ—বসা দাঁড়ানো আর চলা ফেরার সময় যথোচিত বিধি-নিয়ম না মেনে যথেচ্ছভাবে আহার-বিহার, বিশ্রাম ও বিচরণ করা। দিনের পর দিন একাদিক্রমে এমনিভাবে অনাবশ্যক ঘটবার ফলে, অনাবশ্যক মেদ স্ফীতি দেখা দেয় এবং রূপসীর দেহ-শ্রী উত্তরোত্তর স্থূল ভারাক্রান্ত ও অঙ্গ-মাধুরী বিপর্য্যস্ত করে তোলে। অর্থাৎ, বেয়াড়া ও অস্বাভাবিক ধরণে হেলে-দুলে চলা এবং যেন তেনভাবে বসা-দাঁড়ানোর অভ্যাসে মহিলাদের জঘনদেশ ক্রমশঃ মেদবহুল, বিশাল ও বিশ্রী ছাঁদের হয়ে ওঠে এবং একবার এমনিভাবে দেহশ্রী নষ্ট হলে, সে ত্রুটি মোচন করা রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই আধুনিক রূপচর্চ্চা-বিশারদদের মতে, ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের দেহের···বিশেষভাবে উদর, তলপেট ও জঘনদেশের ছাঁদের মনোহারিত্ব গঠনের দিকে সযত্ন দৃষ্টিদান করা একান্ত আবশ্যক। কারণ, কৈশোর ও যৌবনকালে সুঠাম সুন্দর জঘন ও উদরদেশের ছাঁদের উপরই নারীর দৈহিক রূপশ্রী সৌষ্ঠবের মনোহারিত্ব নির্ভর করে অনেকখানি।

অনেকের ধারণা, সন্তান প্রসবের ফলেই নারীর দেহশ্রী সৌষ্ঠবের এমনি সব ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে। একালের অভিজ্ঞ বিচক্ষণ রূপচর্চ্চা বিশেষজ্ঞেরা কিন্তু অভিমত প্রকাশ করেন যে এহেন ধারণা পোষণ করা ভুল। দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁরা প্রাচ্য প্রতীচ্যের অতীত ও বর্ত্তমান যুগের বহু সুপ্রসিদ্ধা রূপসী নারীর উল্লেখ করেন—যাঁরা একাধিক সন্তানের জননী হয়েও নিজেদের সুঠাম সুন্দর দেহশ্রী-লালিত্যের মনোহারিত্ব বরাবরই অটুট অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এই সব আধুনিক বিশেষজ্ঞেরা বলেন নারীর উদর ও জঘনদেশের গঠন যাতে আগাগোড়া সুঠাম-সুন্দর সুষমায় থাকে, সেজন্য প্রত্যহ নিয়মিতভাবে বিশেষ ধরণের কয়েকটি ব্যায়াম অনুশীলন করা প্রয়োজন। এ সব ব্যায়াম চর্চ্চার ফলে, তলপেটের অস্থি, পেশী ও স্নায়ু সুস্থ সবল হয়ে ওঠে এবং উদর ও জঘনদেশ কখনো মেদ বহুল, স্থূল ও অসুন্দর করে তোলে না।

রূপচর্চ্চাবিশারদদের মতে, সাধারণতঃ মেয়েদের দাঁড়ানোর ভঙ্গীর উপরই জঘনদেশের গঠন সৌষ্ঠব নির্ভর করে। কোনো কোনো মহিলার কদভ্যাস থাকে—নিজের দেহকে খুব বেশী ঝুঁকিয়ে চলার···এ ত্রুটির ফলে, তাঁদের জঘনদেশের গঠনে বিকৃতি ঘটে···অর্থাৎ, এভাবে চলাফেরার দোষে দেহ সামনের দিকে হেলে পড়ার জন্য জঘনদেশ উর্দ্ধগতি লাভ করে ক্রমেই শুধু যে বিশ্রী বেমানান ছাঁদের হয়ে দাঁড়ায় তাই নয়, মহিলাদের বক্ষদেশের গঠন-শোভা নষ্ট এবং পাকস্থলী ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে। এ ক্ষতির সম্ভাবনা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে রূপচর্চ্চা বিশেষজ্ঞেরা পরামর্শ দান করেন—যে দাঁড়ানোর সময় মেয়েদের সর্ব্বদা নজর রাখা আবশ্যক—তলপেটের অস্থি যেন তলপেটের খাঁজে খাঁজে আশ্রয়লাভ করে···বক্ষোদেশ যেন সদা সরল সোজা ভঙ্গীতে থাকে এবং ঘাড় ও পা যেন সর্ব্বদা সমরেখায় অবস্থান করে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁরা আরো বলেন যে—এক পায়ে দেহের ভার রেখে কদাচ দাঁড়াবেন না। কারণ, এভাবে দাঁড়ানোর দোষে—জঘন ও কাঁধের 'ব্যালান্স' (Balance) বা সমতা নষ্ট হয়। যখনি কোথাও দাঁড়াবেন, দুই পা এক করেই দাঁড়াবেন এবং সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখবেন যে দেহের কোনো অংশই যেন বেয়াড়া ভঙ্গীতে আধো বেঁকে বা ঝুঁকে না থাকে। পরামর্শদানের সঙ্গে সঙ্গে নারীর জঘনদেশ সুঠাম-সুন্দর ও সুশ্রী ছাঁদের করে তোলার জন্য বিচক্ষণ রূপচর্চ্চাবিশারদবৃন্দ বিশেষ ধরণের যে সব সহজ সরল ব্যায়াম অনুশীলনের পদ্ধতি

অনুসরণ করতে উপদেশ দিয়ে থাকেন, আপাততঃ, তারই কয়েকটি ভঙ্গীর কথা চিত্র সহযোগে নীচে উল্লেখ করা হলো।

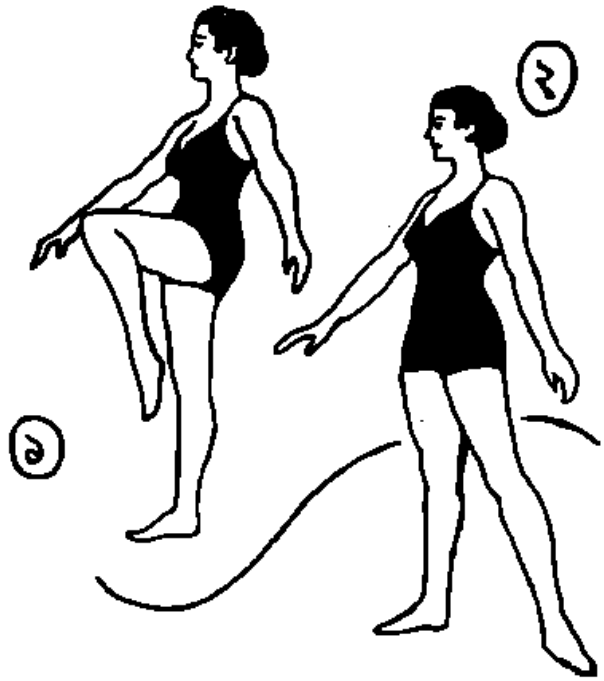

উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, অবিকল তেমনি ভঙ্গীতে ব্যায়ামের পদ্ধতিটি কয়েকবার অভ্যাস করা দরকার। অর্থাৎ, জঘনদেশের উপর দুই পাশে দুই হাত রেখে আঙুলগুলিকে সুপ্রসারিত করে দিন। তারপর পায়ের সম্মুখের অংশের উপর মাত্র দেহের ভার রেখে কয়েকবার ঘরের চারিদিকে ঘুরে বেড়ান। এভাবে ঘুরে বেড়ানোর সময় এক-পা শূন্যে তুলে রেখে অপর-পা জমিতে ভর করে রাখবেন। যে-পা জমিতে রাখবেন, সেই পায়ের সামনের অংশটুকু মাত্র জমি ছুঁয়ে থাকবে। তবে নজর রাখবেন—সে-পায়ের গোড়ালিটি যেন আদৌ জমি স্পর্শ না করে। যে-পা শূন্যে তুলে রাখবেন হাঁটুটিকে বরাবর সিধা-অবস্থায় রেখে সেই পা তুলতে হবে দেহের পিছন-দিকে···উপরের ১নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে অবিকল তেমনি ভঙ্গীতে। এক-পায়ের ডগায় ভর দিয়ে যখন জমি স্পর্শ করবেন, তখন সেই পায়ের উপর সারা দেহের ভার রেখে অন্ততঃপক্ষে, দশ-বারো সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এই হলো জঘনদেশ সুঠাম-সুন্দর করে তোলার উপযোগী বিশেষ ব্যায়াম-ভঙ্গীর সহজ-সরল পদ্ধতি।

বার কয়েক ব্যায়ামের ১নং ভঙ্গীটি অভ্যাস-অনুশীলনের পর, উপরের ছবির নমুনামতো ২নং দ্বিতীয় ব্যায়াম-ভঙ্গী অনুসরণ করবেন, দ্বিতীয় ব্যায়াম-ভঙ্গী অনুশীলনের বিধি-নিয়ম হলো—সামনে একখানি চেয়ার রেখে উপরের ২নং ছবির ভঙ্গীতে ডান হাতে সেটিকে ধরে হাঁটু মুড়ে ধীরে ধীরে বাম-পদটিকে ধীরে ধীরে জমি থেকে ঈষৎ উর্দ্ধে তুলুন এবং জঘনদেশের সঙ্গে সমরেখায় স্থাপন করুন। এবারে সুষ্ঠুভাবে দেহের ভারসাম্য যথাযথ ভাবে বজায় রেখে চেয়ারটিকে ছেড়ে দিয়ে ২নং ছবির ভঙ্গীতে বাঁ-দিকে একপাক দ্রুতভাবে ঘুরুন। তারপর অনুরূপভাবে বাঁ-হাতে চেয়ারটিকে ধরে, ডান-পায়ের হাঁটুটিকে উর্দ্ধে গুটিয়ে নিয়ে আগেরবারের মতোই দ্রুতগতিতে একপাক ডানদিকে ঘুরবেন। এমনিভাবে একবার বাঁ-দিকে এবং অন্যবার ডানদিকে ক্রমাগত ঘোরাঘুরি করে অন্ততঃপক্ষে দশ-বারো বার ২নং ব্যায়াম-ভঙ্গীটি অনুশীলন করতে হবে। এই হলো ২নং ব্যায়াম-ভঙ্গীটি অনুশীলনের মোটামুটি নিয়ম।

স্থানাভাবের কারণ আপাততঃ ব্যায়ামের অন্য আরো কয়েকটি ভঙ্গীর ছবি দেওয়া সম্ভব হলো না। আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরো কয়েকটি বিশেষ-ধরণের ব্যায়াম-ভঙ্গীর সচিত্র-আলোচনা করার বাসনা রইলো।

———

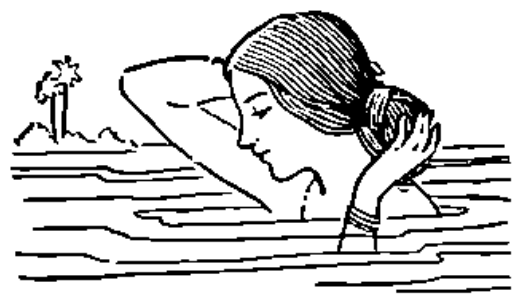

হাতের কাজ

কাদা-মাটির কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

ইতিপূর্বেই বলেছি, কাদা-মাটির বিবিধ কারুশিল্পসামগ্রী রচনার কাজে হাত-পাকানোর সময়, শিক্ষার্থীদের পক্ষে, গোড়ার দিকে কিছুদিন সরল ছাঁদের সৌখিন খেলনা-পুতুল প্রভৃতি কিম্বা টুকিটাকি ধরণের ঘরসংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বানিয়ে প্রত্যক্ষভাবে ঠেকে-শিখে এ সম্বন্ধে বেশ খানিকটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং যথাযথ উপায়ে কলাকৌশল হাতিয়ার ইত্যাদি ব্যবহারের বিধিনিয়মগুলি মোটামুটি রপ্ত করে নেওয়া দরকার। কারণ নিয়মিত অনুশীলনের ফলে এ বিষয়ে অনুশিক্ষুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং কলা-নৈপুণ্য আহরণ করতে না পারলে, শিক্ষার্থীদের উচ্চমপ্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত শুধু যে অসাফল্য আর আর্থিক লোকসানে পর্যবসিত হবে তাই নয়, উপরন্তু, দেখা যাবে—তাঁদের আত্মবিশ্বাসটুকুও আগাগোড়া বরবাদ হয়ে গেছে এবং শিল্প-বস্তুটিও হয়তো পরিণতিতে নিতান্তই 'শিব গড়তে বাঁদরের রূপধারণ' করে বসেছে। কাজেই এ কথা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের গোড়া থেকেই এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হওয়া আবশ্যক এবং এদিকে যথোচিত নজর রাখলে, তাঁরা যে অচিরেই—অসামান্য প্রতিভার না হলেও, মোটামুটি কলা-কুশলতার পরিচয় দিতে পারবেন—সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

কাদা-মাটির সাহায্যে শিক্ষার্থীরা এমনি সব সহজ-সরল ছাঁদের সৌখিন বা নিত্য প্রয়োজনীয় মৃৎশিল্প সামগ্রী রচনা করবেন, ইতিপূর্বেই তার কিছু মোটামুটি হদিস দিয়ে রেখেছি। তাহলেও, বক্তব্য-বিষয়টুকু আরো সুস্পষ্ট-রূপে বোঝানোর সুবিধার জন্য আপাতত: কয়েকটি সহজ-সরল ছাঁদের সৌখিন খেলনা-পুতুল আর ঘর-সংসারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী রচনার প্রসঙ্গ আলোচনা করছি।

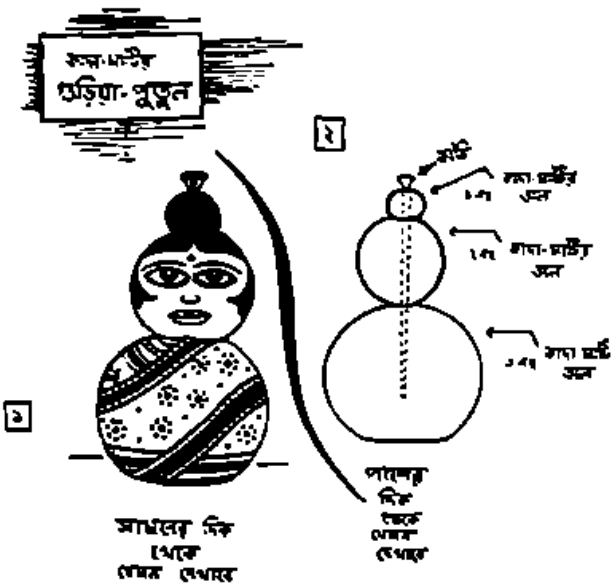

ধরুন, উপরের ছবিতে 'ঝুঁটি-বাঁধা গুড়িয়া পুতুলের' যে বিচিত্র-সৌখিন নক্সা-নমুনাটি দেখানো হয়েছে, কাদা-মাটির সাহায্যে তেমনি ছাঁদের অভিনব একটি ছোটদের খেলবার কিম্বা বড়দের ঘর-সাজানোর উপযোগী পুতুল গড়ে তোলার ফরমাশ এসেছে। এধরণের মাটির পুতুল গড়ে তুলতে হলে—প্রথমেই মাটির খানিকটা তাল নিয়ে দুই হাতের তালুর মধ্যে রেখে মৃদু চাপ দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেটিকে কিছুক্ষণ গোল করে পাকিয়ে সেটিকে আগাগোড়া একটি বলের আকারে রূপদান করুন। গোলাকার এই বলটি থেকেই দিব্যি পরিপাটি ছাঁদে বানানো সম্ভব হবে উপরের নক্সায় দেখানো 'ঝুঁটিবাঁধা গুড়িয়া-পুতুলের' মুণ্ডদেশ' বা 'মাথার অংশটি'। এবারে, উপরোক্ত 'মুণ্ডদেশ' বা 'মাথার অংশ' রচনার জন্য যতটা কাদামাটি ব্যবহার করেছিলেন, তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত অল্পপরিমাণে আরো খানিকটা মাটির তাল নিয়ে, ইতিপূর্বে যে পদ্ধতিতে গোলাকার বল বানিয়েছিলেন, অবিকল তেমনি উপায়ে উপরের ছবির নমুনা অনুসারে আরেকটি ছোট সাইজের 'গোল মুণ্ড' বা 'খোঁপার গোলক' তৈরী

করুন। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সারা হলে, পুনরায় বেশ বড় এবং লম্বা ছাঁদের একটি কাদামাটির তাল হাতে তুলে নিয়ে, সেটিকে হাতের আঙুলের সাহায্যে টিপে টিপে উপরের ছবিতে দেখানো 'গুড়িয়া-পুতুলের' দেহাংশের ছাঁদে অর্থাৎ ক্রমশঃ গলার সরু জায়গা থেকে ঘাঘরার তলদেশের চওড়া ছাঁদের প্রান্তসীমা পর্যন্ত অংশটুকু বানিয়ে ফেলতে হবে। তাহলেই কাদামাটির সাহায্যে দিব্যি সহজ উপায়েই লোক-কলার আদর্শ অনুযায়ে সৌখিন ছাঁদের 'গুড়িয়া-পুতুলের' আনুষ্ঠানিক মূর্তির দেহের তিনটি অংশ অর্থাৎ, 'মুণ্ডি বা খোপা,' 'মুণ্ডদেশ' এবং 'দেহাংশপরিচ্ছদ' গড়ে তোলার কাজ চুকবে।

এবারে একটি শক্ত মজবুত কাঁটার লম্বা কাঠি অথবা ঐধরণের সরু গোলাকৃতি কোনো বাঁশের চাঁচোরি কিম্বা কাঠের টুকরো দিয়ে উপরের ২নং ছবিতে দেখানো নমুনার ভঙ্গীতে 'গুড়িয়া-পুতুলের' মূর্তির তিনটি অংশকে—অর্থাৎ, 'মুঁটি' বা 'খোপা' 'মুণ্ডদেশ' আর 'গলা থেকে ঘাঘরা প্রান্ত-সীমা' পর্যন্ত টুকরোগুলিকে পরপর বেশ পরিপাটি এবং পাকাপোক্তভাবে একত্রে গেঁথে জোড়া লাগিয়ে দিন। তাহলেই দেখবেন—কেমন সহজসরল উপায়ে দিব্যি সুন্দরসুঠাম বিচিত্র ছাঁদের একটি 'গুড়িয়া-পুতুল' তৈরী হয়ে গেছে। এইভাবে ছাড়াও অন্য আরো একটি পদ্ধতিতে এমন পুতুল বানানো যায়—সে পদ্ধতির হদিশ আগামী সংখ্যায় বলবো। এমনিভাবে পুতুলটি আগাগোড়া গড়ে তোলার পর, সেটিকে সরাসরি রৌদ্রতাপের পরিবর্তে সযত্নে ছায়াশীতল কোনো পরিচ্ছন্ন স্থানে খানিকক্ষণ উন্মুক্ত বাতাসে রেখে আগাগোড়া ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে।

কাদা-মাটির তৈরী পুতুলটিকে এমনিভাবে আগাগোড়া শুকিয়ে খটখটে করে নেবার পর, রঙ-তুলির সাহায্যে সেটিতে পরিপাটিভাবে নাক, মুখ, চোখ, কেশদাম, অলঙ্কার-পরিচ্ছদ এঁকে তুললেই খুব সোজা উপায়ে অপরূপ সৌখিন একটি মৃৎশিল্প সামগ্রী রচিত হয়ে উঠবে। তবে কাদা-মাটির এই পুতুলটিকে যদি আরো পাকা-মজবুত করে তুলতে হয়, তাহলে সেটিকে আগাগোড়া শুকিয়ে নেবার পর এবং রং-তুলির প্রলেপ দেবার আগেই উপযুক্ত একটি 'Klin' বা 'ভাটি-চুল্লীতে' কিছুক্ষণ আগুনের মৃদু-আঁচে রেখে ভালোভাবে পুড়িয়ে নেওয়া প্রয়োজন। এভাবে পোড়ানোর পালা শেষ হলে, পুতুলটিকে রং-তুলি দিয়ে সুচিত্রিত করে নিতে হবে।

স্থানাভাবে এবারে এ বিষয়ে আর বিশদভাবে আলোচনা সম্ভবপর হলো না। পরবর্তী সংখ্যায় কাদা-মাটির কাজ-শিল্প সম্বন্ধে অন্যান্য হদিশ দেবার চেষ্টা করবো।

[ক্রমশঃ

সূচী-শিল্পের নক্সা

সৌদামিনী দেবী

সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্মের অবসরে যে সব মহিলা নিজেদের হাতে নানা ধরণের সৌখিন ও নিত্য-প্রয়োজনীয় সূচী শিল্প সামগ্রী রচনার অনুরাগী, তাঁদের সুবিধার জন্য নীচে একটি নতুন ধরণের সহজ সরল ফুল পাতার নক্সা নমুনা প্রকাশ করা হলো।

উপরের ফুল পাতার নক্সাটিকে অনায়াসেই রঙীন সুতো দিয়ে সূচীশিল্পের কাজ করে স্কার্ট, ফ্রক, রুমাল, নিকারবোকার, হাওয়াই সার্ট এবং মহিলাদের ব্লাউস, স্কার্ফ, শাল প্রভৃতি অলঙ্করণের জন্য ব্যবহার করা চলবে। তাছাড়া প্রয়োজন হলে, এ নক্সাটিকে বালিশের ওয়াড়, সোফা কৌচের ঢাকা, ক্যুশন-কভার, টি-কোজি,

ট্রে-কভার, চশমা রাখবার কেস প্রভৃতি অনেকরকমের উদ্দেশ্যেও কাজে লাগানো যেতে পারে। ফুল পাতার এই সহজ নক্সাটি হালকা এবং গাঢ়—উভয় রঙের রঙীন সুতো, রেশমী এবং পশমী কাপড়েই ফুটিয়ে তোলার উপযোগী। তবে সূচী-শিল্পীর ব্যক্তিগত ও প্রয়োজন অনুযায়ী, এ নক্সাটি হালকা রঙের কাপড়ের উপর ফুটিয়ে তোলার জন্য পছন্দমতো গাঢ়-রঙের সুতো এবং গাঢ়-রঙের কাপড়ে সূচীকার্যের উদ্দেশ্যে মানানসই ধরণের হালকা-রঙের সুতো ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত হবে। কাজেই এ বাঁধা-ধরা নির্দেশ দেওয়া সম্ভবতীত নয়···সূচীশিল্পী নিজেই এ বিষয়ে কোন্ সূত্রে কতো-প্রয়োজন বিচার-সিদ্ধান্ত করে নিলেই কাজের সুবিধা হবে সবিশেষ। তবু মোটামুটিভাবে এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়ে রাখছি—শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য।

অর্থাৎ, ধরে নেওয়া যাক, নক্সাটি ফুটিয়ে তোলা হবে—গাঢ়-নীল (navy blue) রঙের কাপড়ের উপর। এক্ষেত্রে ফুলের বাহিরের অংশ বা পাপড়ি রচনার জন্য ব্যবহার করবেন হালকা হলুদ, গোলাপী কমলা, কিকে-লাল, আশমানী অথবা শাদা রঙের সুতো, ফুলের ভিতরের অংশ অর্থাৎ রেণুর ভাগটী রচিত করতে হবে—কিকে-লাল, কমলা, শাদা অথবা হলদে রঙের সুতোর সাহায্যে। পাতা এবং ফুলের ডাঁটার জন্য বেছে নেবেন মানানসই ধরণের হালকা-সবুজ রঙের সুতো। ফুলের কুঁড়ি রচনার জন্য ব্যবহার করবেন উপরোক্ত মানানসই-ধরণের ফুলের রঙের মতো রঙীন সুতো। ফুলের পাপড়ির রেখাগুলি টানতে হবে মানানসই ধরণের রঙীন সুতোয়, আর পাতার শিরাগুলি রচিত করবেন মানানসই ধরণের সবুজ রঙের সুতো দিয়ে।

এই হলো, এবারের সূচী-শিল্পের নক্সা নমুনাটিকে পরিপাটি ছাঁদে ফুটিয়ে তোলার মোটামুটি নির্দেশ। বারান্তরে এই ধরণের আরো কয়েকটি নতুন নক্সা-নমুনার ইঙ্গিত দেবার ইচ্ছা রইলো।

——

সুধীরা হালদার

শীতের মরশুমে বাজারে আজকাল ভালো বাঁধাকপি পাওয়া যাচ্ছে—এবারে তাই বাঁধাকপির সাহায্যে অভিনব মুখরোচক বিভিন্ন একধরণের নিরামিষ-জাতীয় মহারাষ্ট্রীয় খাবার তৈরীর কথা বলছি। এ খাবারটির নাম—'বাঁধা-কপির কোশিম্বির'।

মহারাষ্ট্রীয় প্রথায় অন্ততঃপক্ষে চার-পাঁচজন আত্মীয় বন্ধু বা অতিথিঅভ্যাগতদের জন্য বাঁধাকপির কোশিম্বির খাবারটি রান্না করতে হলে যে সব উপকরণের প্রয়োজন গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ এ খাবার রান্নার জন্য চাই—মাঝারি সাইজের ভালো একটি বাঁধাকপি, একটি নারিকেল, বড় চামচের এক চামচ মুগের ডাল, চায়ের চামচের দুই-চামচ ঘী, দুটি পাতি-লেবুর রস, চায়ের চামচের সিকি চামচ গুঁড়ো-হলুদ, চায়ের চামচের আধ চামচ গুঁড়ো লঙ্কা, চায়ের চামচের এক-চামচ ধনিয়ার দানা, চায়ের চামচের আধ-চামচ গুঁড়ো-জীরা, এক-চিমটে হিং, আর আন্দাজমতো পরিমাণে অল্প একটু গুঁড়ো-নুন।

ফর্দমতো এ সব উপকরণ গোগাড় হবার পর, রান্নার কাজ সুরু করতে হবে। সে কাজ সুরু করার আগে, বাঁধাকপিটিকে আগাগোড়া বেশ পরিপাটিভাবে জল দিয়ে ধুয়ে সাফ্ করে নেবার পর, মিহি ছাঁদে কুচিয়ে নিতে হবে। এ কাজের আগেই কিন্তু মুগের ডালটুকু অন্ততঃপক্ষে ঘণ্টা দুয়েক জলে ডুবিয়ে বেশ ভালোভাবে ভিজিয়ে নরম করে নিয়ে মোটা-ধরণে বেটে নেবেন এবং কুরুণীর সাহায্যে নারিকেলটিকে মিহি-ছাঁদে কুরে কেলবেন। এমনিভাবে কোশিম্বির খাবার তৈরীর প্রাথমিক-পর্বটুকু মুটামুটিভাবে সেরে ফেলে, উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সেই পাত্রে ঘী গরম করে নিয়ে রান্নার মশলাগুলিকে—অর্থাৎ, হলুদ, লঙ্কা, ধনিয়া, জীরা আর হিং প্রভৃতি উপকরণাদি আগাগোড়া ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে। এ সব মশলা ভাজবার সময়, ধনিয়ার দানাগুলি ফেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কোশিম্বির রান্নার বাকী উপকরণগুলিকে রন্ধন-পাত্রের গরম ঘীয়ে মিশিয়ে দিয়ে আরো কিছুক্ষণ ভালোভাবে পাক করে নিন। তাহলেই, মহারাষ্ট্রীয় প্রথায় 'বাঁধাকপির কোশিম্বির' খাবার তৈরীর কাজ শেষ হবে। অতঃপর রন্ধন-পাত্রটিকে উনানের আঁচের উপর থেকে নামিয়ে রেখে, সদ্য-পাক করা খাবারটিকে সযত্নে অন্য একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পাত্রে তুলে রেখে খানিকক্ষণ শীতল হাওয়ায় জুড়োতে দিন। সদ্য-পাককরা কোশিম্বির খাবারটিকে আগাগোড়া যথাযথভাবে ঠাণ্ডা বা জুড়িয়ে নেবার পর, সযত্নে আত্মীয়-বন্ধুদের পাতে পরিবেষণ করুন। নতুন ধরণের এই মহারাষ্ট্র দেশীয় খাবারটির সুস্বাদ গ্রহণ করে তাঁরা শুধু যে প্রীত সন্তুষ্ট হবেন, তাই নয়, উপরন্তু সকলেই আপনার হাতের রান্নার তারিফ করবেন—সে সম্বন্ধে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

উৎসব ও উচ্ছৃঙ্খলতা

শ্রীজ্ঞান

সর্বদেশে সর্বকালে নানা রকম উৎসবের প্রচলন আছে। এর মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে ধর্মীয় উৎসব। যে সব দেশে ঈশ্বর ও ধর্মের চর্চা বেশী হয়, সেই সব দেশে ধর্মীয় উৎসবেরও ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। আমাদের দেশ প্রাচীনতম দেশগুলির অন্যতম শুধুই নয়, ধর্ম নিয়ে এ দেশে যত চর্চা হয়েছে অন্য কোনও দেশেই বোধ হয় তত হয়নি। আবার শুধু চর্চাতে নয়, এখানে নানা ধর্মের উদ্ভব, প্রবর্তন ও প্রচলনও সম্ভব হয়ে একটি ধর্ম সমন্বয়ের সৃষ্টিও হয়েছে। তাই দেখা যায় যে আমাদের এই বিরাট দেশে নানা ধর্মের প্রচলন থাকার জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসবেরও প্রচলন আছে এবং এই উৎসবগুলি যুগ যুগ ধরে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তবে সুপ্রাচীন হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য ভারতে বেশী বলেই হিন্দু ধর্মের উৎসবগুলিই বেশী অনুষ্ঠিত হয়। আর এই সব অনুষ্ঠানগুলির বেশীর ভাগই হয় কোনও দেবদেবীর পূজা সংক্রান্ত। আমাদের এই বাংলাদেশের সব চেয়ে বড় উৎসব হচ্ছে দুর্গা পূজা। চার দিন ব্যাপী এই দুর্গা পূজার উৎসব অনুষ্ঠান এখন প্রায় আমাদের জাতীয় উৎসবের পর্যায়ে গিয়ে পড়েছে। এই দুর্গা পূজার পরই সবচেয়ে বড় উৎসব হচ্ছে সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠান। এই সরস্বতী পূজা ধরতে গেলে এক রকম ছাত্রদেরই উৎসব। জ্ঞান ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর পূজা বিদ্যার্থীরাই যে বেশী করে করবে তাতে সন্দেহ নেই এবং সেটাই স্বাভাবিক। তাই দেখা যায় কিশোর-কিশোরীরাই এই পূজার বেশীর ভাগ উদ্যোক্তা। অবশ্য অভিভাবকদের সকল শ্রেণীর সকল বয়সের নরনারীর সহযোগিতা এই পূজা অনুষ্ঠানের পিছনে আছে বলেই দেবী সরস্বতীর সমারোহ পূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রাচুর্য, ঘটনা ও আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত দেবী সরস্বতীর পূজা অনুষ্ঠান আমাদের দেশে এক বিশেষ উৎসবে পরিণতি হয়েছে।

এই যে উৎসব— এর মূল হচ্ছে ধর্মই শুধু নয়, এর প্রধান কথাটি হচ্ছে শ্রী ও সুন্দরতা, সংস্কৃতি ও শিক্ষা। বাগ্দেবী সরস্বতীর পূজা করা মানে হচ্ছে তাঁর কাছ থেকে বিদ্যা, বিনয়, শিক্ষা, সুন্দরতা ও সর্বোপরি জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভের প্রার্থনা করা। কিন্তু আজকালকার বিদ্যার্থীরা বা ছাত্র-ছাত্রীরা কয়জন কায়মনোবাক্যে বিদ্যা ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর কাছে এই প্রার্থনা করে থাকে? বেশীর ভাগেরই প্রার্থনা হচ্ছে 'কোনও রকমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে দিও মা'—তাই নয় কি? কিন্তু এই 'কোনও রকমে' পরীক্ষায় পাশ করে তারা কি শিক্ষা, কি স্বাধীনতা, আর কি জ্ঞান অর্জন করবে? দেবীও কি এই মনোবৃত্তি নিয়ে যারা প্রার্থনা করে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন?

এ ছাড়া ইদানিং আরও কিছু ঘটছে যাতে করে মনে হয় দেবী সরস্বতীর শ্রীমণ্ডিত পূজা অনুষ্ঠান এক বিশ্রী উৎসবে পরিণতির হতে চলেছে। এই সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠান যে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, জ্ঞান ও বিদ্যাদায়িনী দেবীর কাছে সকলের এক মহৎ প্রার্থনা, এটা যেন ক্রমশঃ সকলে ভুলে যাচ্ছে—সবার ওপরে যাথা চাড়া দিয়ে উঠছে এক উন্মত্ত আনন্দের মহাকলরোল! কোথায় সেই পূজা-মণ্ডপের শুচিস্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশ, আর কোথায় সেই বিসর্জনের আনন্দ-বেদনা মিশ্রিত সুগম্ভীর দৃশ্য! দিকে দিকে আজ শুধু চোখে পড়ে উচ্ছৃঙ্খল তপ্ত আবহাওয়ায় যাঁড় ভাঙ্গা উল্লাসের উৎকট উদ্দাম তাণ্ডব। বিশেষ করে সরস্বতী প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় রাজপথে সহস্র চক্ষুর সম্মুখে যে নৃত্য, বাদ্য ও হট্টগোলের সৃষ্টি করা হয়, তা বোধ হয় কোনও সভ্য দেশের কোনও অনুষ্ঠানেই সংঘটিত হয় না, পূজা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কথা তো বাদই দিলাম।

দেবীর পূজা—ঠাকুরের পূজা, ভগবানের আরাধনা, তা সেই মতই হওয়া উচিত—তাই নয় কি? উৎসব যদি শুধু উল্লাস আর বিলাস, আলো আর বাদ্য দিয়েই করতে হয় তাহলে অন্য কোনও উৎসব করলেই হয়—দেবীর পূজাকে সেই পর্যায়ে নামিয়ে না আনাই সমীচীন নয় কি? তোমরা, যারা এ সব বিষয়ে চিন্তা করতে শিখছ, যারা সত্যকার বিদ্যালাভে আগ্রহী, যারা শ্রী ও শালীনতার পূজারী, যারা সংস্কার ও সংস্কৃতিতে আস্থাবান, যারা সদাচারী, ভক্তিমান ও সত্যবান তাদেরকাছে আমার অনুরোধ—পূজার নামে এই হট্টগোল, উৎসবের নামে এই উচ্ছৃঙ্খলতা তোমরা বন্ধ কর। সুষ্ঠুভাবে, সুকরভাবে, শ্রীমণ্ডিত হয়ে দেবীর আরাধনা কর, দেবী প্রসন্না হবেন এবং দেবীর বরে তোমরাও শিক্ষায়-দীক্ষায়, জ্ঞানে-গরিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে আমাদের গর্বের বস্তু হয়ে উঠবে।

আগামী সরস্বতী পূজা তোমরা সুষ্ঠুভাবে পালন করে দেখিয়ে দাও যে তোমাদের বুদ্ধি বিকৃতি ঘটে নি, সত্য-সুন্দরের পূজা করতে তোমরা ভুলে যাওনি, শিক্ষা-শালীনতা সংস্কার-সংস্কৃতি তোমাদের মধ্য থেকে লোপ পায় নি। তোমরা দেখিয়ে দাও—তরুণের শক্তি, আর তরুণের স্বপ্নকে সম্বল করে ভুলে যেতে বসা আবহাওয়া ফিরিয়ে আন, ব্যভিচারকে কর নির্বাসিত—প্রশ্রয় দিও না উৎসবের নামে এই উচ্ছৃঙ্খলতাকে।

পুরাণ কাহিনী

শ্রীসবিতারাণী দেবী

আঠারখানা মহাপুরাণের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ খুব প্রাচীন। মনুষ্য সমাজের কল্যাণকর নানা উপদেশে সকল পুরাণই সমৃদ্ধ। বিষ্ণুপুরাণেও এইরকম অনেক উপাখ্যান আছে। বিষ্ণুপুরাণের একটা উপাখ্যান তোমাদের বলছি।

এই উপাখ্যানের শেষে লেখা আছে "যে এই উপাখ্যান পড়ে বা শোনে তার নানারকম কল্যাণ হয়।" এই উপাখ্যানটি পড়ে বা শুনে তোমাদের সকলের যেন কল্যাণ হয় সকল রকমে। প্রাচীন ঋষির আশীর্বাদ যেন তোমাদের উপর বর্ষিত হয়।

চন্দ্র আর সূর্যবংশ ভারতের দুই প্রাচীন রাজবংশ। চন্দ্রবংশে শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করেন পাণ্ডবেরা—যাঁদের কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে মহাভারত।

এই চন্দ্রবংশে পুরূরবা নামে একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁর পাঁচটি পৌত্রের মধ্যে একজনের নাম রম্ভি। মহারাজ রম্ভিকে নিয়ে এই উপাখ্যান রচিত।

রম্ভি যেমন ছিলেন সুপুরুষ, তেমনি ছিলেন শক্তি-শালী। তাঁর ছিল পাঁচশ' ছেলে।

দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের বিবাদ ছিল অনেকদিনের। দেবতারা নানাভাবে অসুরদের ঠকিয়েছেন—তাদের বুদ্ধির সাথে অসুরেরা এঁটে উঠতে পারত না। অসুরেরা সবচেয়ে বেশী ঠকেছিল অমৃতপানে বঞ্চিত হয়ে। অমৃত পান করে দেবতারা হলেন অমর—বেড়ে গেল তাঁদের শক্তি অনেকগুণ।

যুদ্ধে দেবতারা আহত হলেও মরে না—কিন্তু অসুরেরা আহত হয় আর মরে যায়। তাইেই এমন শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করা অসুরদের পক্ষে হল কঠিন।

তবু অসুরেরা নাছোড়বান্দা।

স্বর্গরাজ্যের উপর লোভ তাদের বরাবরই আছে। কিন্তু লোভ থাকলেই তো আর সবকিছু লাভ করা যায় না! সুবিধা পেলেই অসুরেরা আক্রমণ করত স্বর্গরাজ্য। যুদ্ধ হত অমর দেবতাদের সাথে, জয়ী হত কখন দেবতারা কখন অসুরেরা। তাড়িয়ে দিত দেবতাদের স্বর্গ থেকে। কিন্তু

বেশীদিন ভোগ করতে পারত না স্বর্গসুখ। আবার তারা পরাজিত হত দেবতাদের কাছে। কতক মরে যেত, কতক যা পালিয়ে যেত তাদের রাজ্যে—পাতালপুরীতে।

একবার এই রকম একটা যুদ্ধ চলছিল স্বর্গের অধিকার নিয়ে দুই দলে—সুরে আর অসুরে।

দেবতারা অমর হলেও বলে তারা অসুরদের সাথে যুদ্ধ করে করে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। বল পেয়ে তাঁরা গেলেন ব্রহ্মার কাছে।

জিজ্ঞাসা করলেন ব্রহ্মা কে—আমাদের এই যুদ্ধে কোন্ দল জিতবে?

পিতামহ ব্রহ্মা বল্লেন—"চন্দ্রবংশের মহারাজ রজি যে দলের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করবেন, সেই দল জিতবে।"

অসুরদের কাছে এ খবর গোপন রইল না। তারা আগেই ছুটে গেল পৃথিবীতে মহারাজ রজির রাজধানীতে।

বলল তারা রজিকে—"মহারাজ, আমাদের হয়ে যুদ্ধ করুন দেবতাদের বিপক্ষে।

রজি সব শুনে বল্লেন—"আমি তোমাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করতে রাজী আছি একটি সর্তে—"

"কি সর্ত মহারাজ" ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল তারা।

"যুদ্ধ জয়ের পর আমি হব স্বর্গের রাজা।"

"না মহারাজ, এতে আমরা রাজী হতে পারি না, যুদ্ধে জয়ী হলে প্রহ্লাদ হবেন স্বর্গের রাজা—তারজন্যই আমাদের এত চেষ্টা। আমরা একরকম বলে অন্যরকম করতে পারব না—ফাঁকি দিয়ে জিততে চাই না আমরা। রজি রাজী হলেন না, অসুরেরা ফিরে গেল।

তারপরই এলেন বলবল নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র। অনুরোধ করলেন—তাঁদের হয়ে অসুরের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে।

রজি তাঁর সর্তের কথা ইন্দ্রকে বললেন। দেবরাজ তখুনি রাজী হয়ে তাঁকে সাথে করে ফিরে এলেন স্বর্গে।

আরম্ভ হল নূতন করে যুদ্ধ। সে ভীষণ যুদ্ধে অসুরেরা হল পরাজিত। বেশীরভাগ মারা গেল তাদের; যারা বাঁচল তারা পালিয়ে গেল পাতালপুরীতে।

আনন্দের কোলাহলে মুখরিত হল নিরানন্দ স্বর্গ। নাচে, গানে, উৎসবের আনন্দে সকলে আত্মহারা। কি করে যে মহারাজ রজিকে খুশী করা যায় তা ভেবে ইন্দ্র পাগল।

এইভাবে কেটে গেল কয়েকদিন।

মহারাজ রজি একদিন ডেকে বললেন দেবরাজ ইন্দ্রকে—"আমার সর্ত অনুযায়ে আজ থেকেই আমি স্বর্গের রাজা হব ঠিক করেছি। তোমরা তার ব্যবস্থা কর।"

এই কথা শুনে দেবরাজ মুকুট খুলে রজির পায়ের কাছে রেখে হাত জোড় করে বললেন—"অসুরের ভয়ে আমরা খুব বিপন্ন হয়েছিলেন মহারাজ, আপনি সেই ভয় থেকে আমাদের ত্রাণ করেছেন। শাস্ত্রে যে পঞ্চবিধ পিতার উল্লেখ আছে—ভয় থেকে ত্রাণকর্তাকেও তাদের মধ্যে গণ্য করা হয়। কাজেই সে হিসাবে আপনি আমার পিতা। নিজে স্বর্গের রাজা হলে যে গৌরব আপনি লাভ করবেন—তার চেয়েও কি অনেক বেশী সম্মান আপনি লাভ করবেন না ত্রিলোকাধিপতি দেবরাজের পিতা বলে?"

দেবরাজের কথা শুনে রজি হেসে বললেন—শত্রুপক্ষের তীক্ষ্ণধার বাণের আঘাত সহ্য করেও জয়লাভ করা যায়, কিন্তু নিজ পক্ষের এরকম তোষামোদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতেই হবে। এই বলে তিনি ইন্দ্রের মাথায় মুকুট পরিয়ে দিলেন।

স্বর্গের রাজত্ব আর গ্রহণ করা হল না, ফিরে গেলেন তিনি নিজের রাজধানীতে।

ইন্দ্রই রইলেন তাঁর স্বর্গরাজ্যে রাজা হয়ে।

* * *

অনেকদিন কেটে গেল। রজি মারা গেলেন। রাজা হলেন তাঁর বড় ছেলে।

রজিকে ফাঁকি দিয়ে ইন্দ্র স্বর্গের রাজা থাকতে পেরে তাঁর অহঙ্কার বেড়ে গেল—ভাবলেন তাঁর মতন বুদ্ধিমান্ বুঝি আর কেউ নেই। কিন্তু ইন্দ্র বুঝলেন না, অন্যকে ফাঁকি দিলে নিজেকেও ফাঁকিতে পড়তে হয়।

কিছুদিন পরে নারদ মুনি ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির ইন্দ্রের সভায়।

ইন্দ্রের কথাবার্তায় নারদ মুনি সব বুঝলেন। তিনি ভাবলেন একটু শিক্ষা দিতে হবে ইন্দ্রকে।

হরিনাম করতে করতে তিনি রওনা হলেন পৃথিবীর দিকে রজির রাজধানীতে।

রজির ছেলেরা তাঁকে খুব সমাদর করে বসালেন। নারদ বল্লেন—অসুরদের সাথে মহারাজ রজির যুদ্ধ। আর

কেমন করে দেবরাজ ইন্দ্র নিজের কথা ঘোষণা করে—মহারাজকে ঠকিয়ে নিয়ে নিজের রাজত্ব বজায় রেখেছেন।

সব শেষে বললেন মুনিবালক—বলতে কি তোমাদেরই তো আজ স্বর্গের রাজা হওয়ার কথা। তোমাদের বাবার রাজ্য পাওনা—তোমরা কেন ছাড়বে?

"ঠিকই তো—কেন ছাড়বো আমরা—স্বর্গ রাজ্যের অধিকারে।"

"দূত পাঠাবো আজই দেবরাজের কাছে।"

"হুঁ, তাই বলি—মুনি বলেন—"আর যদি দেবরাজ রাজী না হন—কেড়ে নাও বল করে—ছাড়বে কেন?"

তাই হল। দূত পাঠান হল দেবরাজের কাছে।

ইন্দ্র রাজী হলেন না রজির ছেলেদের কথায়। কেইবা রাজী হয় নিজের অধিকার ছাড়তে?

দল গিয়ে এল। রজির ছেলেরা আক্রমণ করল স্বর্গ-মর্ত্যেরও উপরে এল সাহায্য করতে।

যুদ্ধ সুরু হল। হেরে গেল রজির ছেলেরা। দেবরাজ পরাজিত হয়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

স্বর্গের রাজা হলেন মহারাজ রজির পাঁচশ' ছেলেই।

* * *

কেটে গেল অনেক বছর। দেবরাজ ঘুরতে ঘুরতে এলেন গুরু বৃহস্পতির আশ্রমে। প্রার্থনা করলেন একটা উপায় করতে।

বৃহস্পতি বললেন তুমি কুটিলবুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে রজিকে ঠকিয়ে দিয়ে রাজা হয়েছিলে, সে পাপের ফল তোমাকে ভুগতেই হবে। নিজের বুদ্ধির অহংকারে নিজের সর্বনাশ তুমি ডেকে এনেছ। তার জন্যই তোমার আজ এই অবস্থা। পাপের ফল না ভুগে কেউ রেহাই পায় না। আর রজির ছেলেরা প্রত্যেকেই মহাবীর এবং সত্যবাদী। যতদিন তাদের মধ্যে একতা বজায় থাকবে, ধর্ম রক্ষা করে চলবে তারা, ততদিন তাদের তাড়িয়ে দিতে কেউ পারবে না। তুমি তোমার পাপের ফল ভোগ করতে থাক, আর আমিও চেষ্টা করি তাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ ঘটাতে।

ছোট একটা সংসারে দু'জন কর্তা হলে কত অসুবিধা ঘটে, আর পাঁচশ' ভাই একটা রাজ্যের রাজা! ক্রমে ভাইদের মধ্যে নানা ভাবে ঘটতে লাগল মতের অমিল। নিজের স্বার্থের জন্য ন্যায় অন্যায়ের বিচার করবার ক্ষমতাও তাদের নষ্ট হয়ে গেল। পাপ ঢুকল তাদের মনে। বড় ভাই সকলকে হত্যা করে একাই রাজা হওয়ার মন্ত্রি আঁটতে লাগল।

পাপই হয়েছিল ইন্দ্রের পতনের কারণ, আবার সেই পাপেই পতন হল রজির ছেলেদেরও।

সুযোগ বুঝে বৃহস্পতির উপদেশে ইন্দ্র আক্রমণ করলেন রজির ছেলেদের।

ইন্দ্রের হাতে পরাজিত হল তারা সহজেই। মারা গেল বেশীরভাগ যুদ্ধক্ষেত্রেই। যারা বাঁচল তারা পালিয়ে গেল তাদের নিজেদের রাজ্যে।

দেবতাদের স্বর্গ ফিরে এল তাদের হাতে। ইন্দ্র আবার রাজা হয়ে বসলেন স্বর্গরাজ্য পাপ থেকে মুক্ত হয়ে।

পাপের ফল দেবরাজকেও ভোগ করতে হয়, মানুষ তো ছার। তোমরাও কখনও পাপ কাজ কর না। সব সময় সত্যপথে চলবে—দেখবে ফল ভাল হবেই।

——

চার্লস্ ডিকেন্স্

রচিত

অলিভার্ টুইষ্ট্

সৌম্য গুপ্ত

[পৃথিবীর সেরা সাহিত্যিকদের মধ্যে ঊনবিংশ-শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ-কথাশিল্পী চার্লস্ ডিকেন্সের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত 'অলিভার্ টুইষ্ট্', 'ডেভিড্ কপারফিল্ড্', 'নিকোলাস্ নিকল্‌বি' উপন্যাস তিনখানি শুধু ইংরাজী-সাহিত্যেরই নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেরও অমূল্য সম্পদ। আজ থেকে একশো বছর আগে লেখ

এই তিনখানি উপন্যাসে মানব-প্রেমিক ডিকেন্স্ দীন-দুঃখী অসহায় অনাথ বালকদের অভাব-অভিযোগে, পীড়ন-দুরবস্থা, ব্যথা বেদনার যে নিখুঁত বাস্তব চিত্র এঁকেছিলেন, তাই দেখে তখনকার দিনের শিক্ষিত চিন্তাশীল ইংরাজেরা সমাজের দুঃখ-দুর্দশার গ্লানি মোচন, অনাচার দূরীকরণ এবং সংস্কার-সাধন সম্বন্ধে রীতিমত অবহিত হন। অর্থাৎ, ডিকেন্সের নিপুণ সাহিত্য সৃষ্টির ফলেই, ইংরাজজাতির, তথা সারা দুনিয়ার সুসভ্য মানুষের সামাজিক ইতিহাসের ধারা বদলে গিয়েছিল—এমন বললেও অত্যুক্তি হবে না।

খৃষ্টীয় উনবিংশ-শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংলণ্ডের এক দরিদ্র পরিবারে চার্লস্ ডিকেন্সের জন্ম···তাঁর শৈশবকাল কেটেছিল নিতান্তই দুঃখ দুর্দশায়—মাতা-পিতার স্নেহ-বঞ্চিত হয়ে অসহায় অনাথ অবস্থাতে। বয়স বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নিজের চেষ্টায়, একনিষ্ঠ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে, ক্রমশঃ তিনি নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট সহ্যের লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে ওঠেন এবং সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। সেকালের সাহিত্যিকদের রীতি ছিল—অভিজাত সমাজের বিলাসী সৌখিন অসাধারণ মানব চরিত্র, আর বিলাস আড়ম্বরের অসার ঘটনাবলী অবলম্বনে কাব্য-কাহিনী রচনা করা···কিন্তু তাঁদের সেই মামুলী-পন্থা অনুসরণ না করে, চার্লস্ ডিকেন্সই সর্বপ্রথম সমাজের দীন-দুঃখী সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টির কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই কারণেই, কুশলী ঔপন্যাসিক চার্লস্ ডিকেন্সের নাম বিশ্ব-সাহিত্যে চিরস্মরণীয়।

প্রায় একশো বছর আগেকার কথা।

ইংলণ্ডের ছোট একটি মফঃস্বল শহরের এক অনাথ আশ্রমে একদিন সন্ধ্যায় দুঃস্থা অসহায়া আসন্ন-প্রসবা এক মহিলা এসে আশ্রয় নিলেন এবং সেই রাত্রেই সেখানে তাঁর কোলে জন্ম নিলো—নব-ফোটা ফুলের মতো সুন্দর ফুট-ফুটে একটি শিশু। শিশুটিকে জন্ম দিয়েই অভাগিনী মা অসীম ক্লান্তিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে চিরদিনের জন্য পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। মা-হারা অসহায় অনাথ নব-জাত এই দুধের শিশুটির লালন পালনের দায়িত্ব কর্তাটি ঘাড়ে চাপার ফলে, আশ্রমের দাই আর কর্তাব্যক্তিদের হাড় জ্বলে উঠলো···কোথা থেকে এই আপদ এসে জুটলো! এখন এই বাচ্চাটাকে খাওয়াও···পরাও··· মানুষ করো···যত রাজ্যের হাঙ্গামা!

তাঁদের রাগের কারণ-তখনকার দিনে আতুর-অনাথদের নামে মোটা মোটা টাকা চাঁদা আদায় করে অনেকেই বেশ ফুর্তি এঁটে এমনি অনাথ-আশ্রম খুলতো এবং এই চাঁদার টাকায় নিজেরা বিবি আরামে খাওয়া-পরা, আমোদ-আহ্লাদ চালাতো···অনাথ আতুরের সেবা করা দূরের কথা, তারা দু'চারদিনের বেশী এখানে থাকতে চাইলে, তাদের মেরে তাড়িয়ে দিতো।

সদ্যোজাত শিশুদের লালন-পালনের জন্য অন্য সব আশ্রমের মতো এখানেও একটি আলাদা শাখা বিভাগ ছিল ···মা-হারা এই অনাথ শিশুকে আশ্রমের কর্তা ব্যাম্বল্ সেই বিভাগে সঁপে দিলেন। এ বিভাগের পরিচালিকা ছিলেন—নিষ্ঠুর-নিদুর মধ্যবয়সী এক মহিলা···নাম তাঁর মিসেস্ মান। আশ্রমের অনাথ শিশুদের আহারের বরাদ্দ খোরাক যা লেখা থাকতো, তা তাদের বরাতে জুটতো না··· দিনে-রাতে তারা খেতে পেতো শুধু তিনবেলা এক বাটি করে জোলো বিস্বাদ সুরুয়া···আর বরাদ্দের টাকাটা পুরো-পুরি খেতো আশ্রমের কর্তা ব্যাম্বল্ আর শিশু বিভাগের পরিচালিকা মিসেস্ মানের পকেটে। এমন সামান্য আহারের ব্যবস্থায় ছোট ছেলেমেয়েরা তো বাঁচতে পারে না কাজেই তাদের মধ্যে অনেকেই প্রয়োজনমতো আহারের অভাবে নিতান্ত অকালেই মারা যেতো···তবে যেহেতু যাদের পরমায়ুর জোর, তারাই কেবল কোনোমতে টিঁকে থাকতো। এদেরই মতো, মা-হারা অভাগা নবজাত শিশুটিও বোধহয় শুধু এই পরমায়ুর জোরেই আশ্রমের জোলো বিস্বাদ সুরুয়া খেয়ে কোনোমতে ন' বছর টিঁকে রইলো। আশ্রমের লোকেরা এই অনাথ শিশুর নাম রাখলো—অলিভার্ টুইষ্ট্।

শিশু বিভাগের পরিচালিকার নিষ্ঠুর অবহেলা অত্যাচার সয়ে অলিভার্ যখন সবেমাত্র ন' বছর বয়সে পদার্পণ করেছে, এমন সময় আশ্রমের কর্তা ব্যাম্বল্ একদিন এসে কাজ-কর্ম শিখিয়ে মানুষ করে তোলার অছিলায় তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে রাখলেন নিজের তত্ত্বাবধানে···অন্য সব অনাথ কিশোরদের দলে। এতদিন শিশু বিভাগে নিদারুণ ক্ষিদের জ্বালা আর দুঃসহ পীড়ন সহ্য করার পর, আশ্রমের

কর্তার অনুগ্রহে অন্ন ও কিশোরদের দলে স্থানোন্নতি হবার সুযোগ পেয়ে অলিভারের মনে ধারণা জন্মেছিল যে এবারে হয় তো তার বরাত ফিরবে। কিন্তু দু'চারদিন সেখানে বসবাস করতেই, তার সে ধারণা গেল মিলিয়ে···সে দেখলো —শিশু বিভাগে এত বছর সে যেমন কষ্ট-দুর্দশা ভোগ করে এসেছে, এখানেও ঠিক তেমনি ব্যবস্থা। শেষে ক্ষিদের জ্বালায় তার সঙ্গী আশ্রমেরই আরো ক'জন অনাথ কিশোরদের সঙ্গে পরামর্শ করে অলিভার্ একদিন মরিয়া হয়ে খাবার সময় রাঁধুনি মশাইয়ের কাছে এক হাতা বাড়তি-সুরুয়া চেয়ে বসলো···সঙ্গে সঙ্গে বাধলো বিপর্যয় কাণ্ড! রাঁধুনি মশাই সরাসরি গিয়ে অলিভারের এই বেয়াড়া আবদার আর আস্পর্দার খবর পৌঁছে দিলেন আশ্রমের কর্তা ব্যাম্বলের কানে। অলিভারের বেয়াড়াপণার পরিচয় পেয়ে ব্যাম্বল্ তাকে শায়েস্তা করার জন্য সারারাত অনাহারে শুকিয়ে রাখলেন।

এমনিভাবে নিতান্ত তুচ্ছ কারণে নির্মম শাস্তির দুর্ভোগ বরণ করে কিশোর অলিভারের দিন কাটতে লাগলো অনাথ আশ্রমে নিতান্তই অসহায় অবস্থায়। কিছুদিন যাবেই হঠাৎ কোঁকের মাথায় অলিভার্ আবার একটি কাণ্ড বাধিয়ে বসলো। অনাথ-আশ্রমের কিশোর-সঙ্গীদের মধ্যে কয়েকজন ছিল যেমন দিস্যুটে তেমনি অভদ্র পাজী··· ন'মাস্ ছ'মাসে-মাত্তোর প্রায়ই তারা ঝগড়া-ঝুনঝুটি বাধিয়ে শান্ত-সরল-ভদ্র অলিভারের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলতো। একদিন তারা ফন্দী এঁটে অলিভারের মায়ের নামে মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে মা-হারা ছেলেকে ক্ষেপিয়ে দিলে। আশৈশব মাকে কোনোদিন চোখে না দেখলেও···স্নেহ-মমতার এতটুকু পরশ না পেলেও, অলিভার্ মনে মনে তাঁকে খুবই ভক্তি করতো। কাজেই মায়ের নামে কুৎসা-কলঙ্ক রটানোর ফলে, রাগে-অপমানে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠে অলিভার তার সেই অভদ্র-পাজী সঙ্গীদের দলের সর্দারের টুঁটি টিপে ধরলো···দুজনের হাতাহাতি আর মারামারির সোরগোল শুনে আশ্রমের লোকজন, এমন কি, তাদের কর্ত্তা ব্যাম্বল্ স্বয়ং সেখানে এসে হাজির···এসেই তিনি অলিভারকে একরাশ গালিগালাজের পর, করে ঘা কয়েক বেত্রপ্রহার করলেন। ব্যাপারটার নিষ্পত্তি কিন্তু এত অল্পতেই হলো না, পরের দিনই ব্যাম্বল্ নগদ পাঁচ পাউণ্ড দাম নিয়ে শোয়ারবেরী নামে শহরের এক-নির্মম-কন্দীবাজ কফিনওয়ালার কাছে অলিভারকে চিরদিনের মতো বিক্রী করে দিলে শোয়ারবেরী অলিভারকে নিয়ে এলো তার দোকানে···কফিন-তৈরীর কাজে তার সাকরেদ বানিয়ে তোলবার মতলবে। সেখানে কদিন নির্মম পীড়ন-অত্যাচার সয়ে অলিভার শেষে অতিষ্ঠ হয়ে শোয়ারবেরীর চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে নিশুতি-রাতের অন্ধকারে একাই পাড়ি জমালো সুদূর লণ্ডনের পথে।

অজানা-অচেনা পথ···তাছাড়া লণ্ডন শহরের শুধু নামই শুনে এসেছে সে এতকাল··· সেখানকার কারো কোনো ঠিক-ঠিকানাটুকুরও ধারণা নেই অলিভারের! কাজেই কোনোমতে পথের লোকজনের কাছে টুকিটাকি হদিশ সংগ্রহ করে সে একাই হাঁটতে হাঁটতে লণ্ডনের পানে এগিয়ে চললো!

সুদীর্ঘ পথ···চলতে চলতে পথ যেন আর ফুরোতেই চায় না। তবু অলিভারের চলার বিরাম নেই···যেমন করেই হোক, লণ্ডন শহরে তাকে পৌঁছুতেই হবে—নাহলে নিষ্কৃতি মিলবে না! (ক্রমশঃ)

চিত্রগুপ্ত

এবারে যে মজার খেলাটির কথা বলছি, সেটির আজব কারসাজি দেখিয়ে তোমরা তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের সহজেই রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে। তবে সে কারসাজি দেখাতে হলে, গোড়াতেই জোগাড় করা দরকার সামান্য কয়েকটি সাজ-সরঞ্জাম এবং সেই সঙ্গে শিখে নেওয়া আবশ্যক খেলার কিছু কায়দা-কৌশল। খেলার সাজ-সরঞ্জাম নিতান্তই টুকিটাকি ঘরোয়া-সামগ্রী··

অর্থাৎ, পাৎলা-মিহি ধরণের একটি ধাতু-নির্মিত সিকি, আধুলি বা পয়সা, একটি কাঁচের গেলাস আর উৎকৃষ্ট কাগজ পাকিয়ে-তৈরী একটি লম্বা-কাঁপা নল কিম্বা একখণ্ড মজবুত খড়—এই জিনিষগুলি জোগাড় হলেই চলবে। আপাততঃ শোনো—এ খেলা দেখানোর সহজ-সরল খুঁটিনাটি কায়দা-কানুনগুলি।

আসরে দর্শকদের সামনে এ খেলার কসরতটী দেখানোর সময়, ঘরের মেঝে কিম্বা সমতল একটি টেবিলের উপরে কাগজের তৈরী কাঁপা-নল কিম্বা লম্বা-খড়, কাঁচের গেলাস আর ধাতু-নির্মিত সিকি, আধুলি বা পয়সা পাশাপাশি সাজিয়ে রেখে, তাঁদের সবাইকে সাদর-আহ্বান জানিয়ে বলো যে—টেবিলে সাজানো ঐ কাঁচের গেলাস আর ধাতু-নির্মিত সিকি, আধুলি বা পয়সা কোনোটিকে আদৌ হাত দিয়ে স্পর্শ না করে, অথচ কি অভিনব-উপায়ে তাঁরা সহজে এবং অনায়াসে ধাতু-নির্মিত মুদ্রাটিকে টেবিল থেকে তুলে সরিয়ে এনে কাঁচের গেলাসের ভিতরে বসিয়ে রাখতে পারেন! তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দর্শকদের মধ্যে অনেকেই হয়তো সাগ্রহে-কৌতূহলভরে এ কসরতী দেখানোর জন্য টেবিলের কাছে এগিয়ে আসবেন—কিন্তু আসল কলা-কৌশলের সঠিক পরিচয় জানা নেই বলে খানিকক্ষণ নানান্ চেষ্টার পর, তাঁরা শেষ পর্যন্ত নিতান্তই নাজেহাল হয়ে বিচক্ষণ খেলোয়াড়-মশাইয়ের কাছে নতি স্বীকার করবেন। এমনিভাবে একে-একে আসরের সবাই যখন নিরুপায় হয়ে হার মানবেন, তখন তোমরা স্বচ্ছন্দ-ভঙ্গীতে সরাসরি টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে কাগজের কাঁপা-নল অথবা মজবুত-লম্বা খড়টিকে হাতে তুলে নেবে এবং পাশের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, অবিকল তেমনি উপায়ে কাগজের তৈরী ঐ কাঁপা নল কিম্বা লম্বা-খড়ের একটি প্রান্তে মুখ লাগিয়ে, নলটিকে টেবিলের বা মেঝের বুকে পাশাপাশি-সাজানো ধাতু-নির্মিত মুদ্রাটির ঠিক হাতাহাতি জায়গায় বেশ ভালোভাবে চাপ দিয়ে বসিয়ে রেখে সজোরে অবিরাম নিশ্বাস গ্রহণ (Inhale) করো। তাহলেই দেখবে—কাঁপা নলের বা লম্বা-খড়ের ভিতর দিয়ে অবিরাম তোমার সজোরে নিশ্বাস গ্রহণের ফলে, বা তাদের আকর্ষণে air-Suction) টেবিলের উপরের ঐ ধাতু-নির্মিত মুদ্রাটি ক্রমেই উর্দ্ধে উঠে নলের অথবা খড়ের নীচের প্রান্তে সটান্ লেঁটে থাকবে এবং সেই মুদ্রাটি এভাবে নলের বা খড়ের নীচের প্রান্তে লেঁটে থাকাকালে খুব সহজে ও অনায়াসেই সেটিকে টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে কাঁচের গেলাসের ভিতরে নামিয়ে রাখারও পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা মিলবে। এমনি সোজা উপায়ে তোমরা অক্লেশে এবং আদৌ হাত দিয়ে স্পর্শ না করেই শুধু ঐ কাঁপা-নল কিম্বা লম্বা-খড়ের সাহায্যে ঘরের মেঝেতে অথবা টেবিলের উপরে সজোরে ধাতু-নির্মিত মুদ্রাটিকে তুলে উঠিয়ে এনে কাঁচের গেলাসের মধ্যে সরিয়ে বসাতে পারবে। এবারের আজব-মজার খেলাটির—এই হলো আসল রহস্য। এমনটি সম্ভব হয়—বিজ্ঞানের বিচিত্র নিয়মে···বাতাসের আকর্ষণের বা 'Air Suction'এর ফলে।

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি বিচিত্র-নতুন মজার খেলার পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

ক্রমশঃ

মনোহর মৈত্র

১। ত্রিভুজের ভেঁয়ালী ঃ

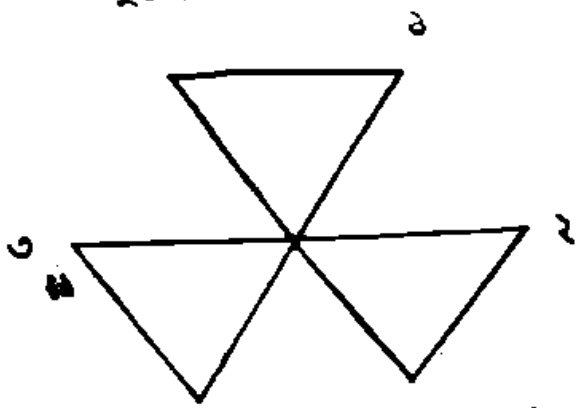

উপরের ছবিতে দেখতে পাচ্ছো—তিনটি ত্রিভুজ সাজানো রয়েছে অতিসহজ কায়দায়। ছবিতে দেখানো ঐ তিনটি ত্রিভুজের সঙ্গে হাতে তিনটি সরল-রেখা (Straight Line) এঁকে এবং যোগ দিয়ে যদি উপর-নীচে ও পাশাপাশি থাকে-থাকে সাজানো ছোট তেরোটি ত্রিভুজ বানাতে পারো তো বুঝবো, তুমি সত্যিই খুব বুদ্ধিমান হিসেবে হয়ে উঠেছো দিনে-দিনে। তাহলে তো তোমাকে—এই ভেঁয়ালির সঠিক উত্তর দিতে পারো কিনা?

'কিশোর-ভারতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

২। এমন একটি বিষয়ের নাম করো যে তার নাম উচ্চারণ কিংবা এতটুকু শব্দ করলেই সেটি আপনা-আপনি ভেঙেচুরে টুকরো-টুকরো হয়ে যায় নিমেষের মধ্যেই।...বলো তো দেখি, সেটি কি?

রচনা : সমিত ঘোষাল (কলিকাতা)

৩। নীচের নামগুলিতে লুকানো রয়েছে—আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিখ্যাত শহরের নাম। নীচেকার নাম গুলির মধ্যে থেকে এক একটি করে অক্ষর খুঁজে বাছাই করে নিয়ে সঠিকভাবে সাজিয়ে বলাও তো দেখি আমেরিকার সেই বিখ্যাত শহরের নামটি।

রচনা : বীরেন্দ্রনাথ ঘোষক (রাণাঘাট)

গতমাসের 'ধাঁধার উত্তর :

১।

ম ন ষ টি

২। বিদ্যুৎ
৩। ঘাসফড়িং

গতমাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

কুনু মিত্র (কলিকাতা), হাবলু, টাবলু, সুমা ও পুতুল (হাওড়া), টিনি ও রনি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), গৌরাঙ্গ ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), অচ্চি, ছোটন ও পাপু ঠাকুর (বোলপুর), বুটন ও পুতু মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), রনি ও রুনু দাশগুপ্ত (কলিকাতা), সন্তোষ, সঞ্জয়, মুরারি ও সুনীল (ভিলাই), শর্মিষ্ঠা ও সন্দীপ্তা রায় (কলিকাতা), দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (বারাসাত), বাপ্পা ও শিবাজী রায় (কলিকাতা), মাসি, বুতাম ও মিঠু (বোম্বাই), বুবু ও মিঠু গুপ্ত (কলিকাতা)।

গত মাসের ছুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

মধু চট্টোপাধ্যায় (বোম্বাই), রাণা ও বুনা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), পরিমল দাশগুপ্ত (ওঁয়ান), সতীশ ও নিপু (লক্ষ্ণৌ), বিজয়েন্দ্র ও বিনয়েন্দ্র সিংহ (হাওড়া), শ্যামাদাস দেবশর্মা (উত্তরপাড়া), বিশ্বনাথ ও দেবকী সিংহ (গয়া), ভবনাথ ও উমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), রতু ও মুনটু দেবশর্মা (জগদল), মিনতি রেখা, দিলীপ, গোকুল, বকু, ছকু ও রেখা ঘোষ এবং জ্যোৎস্না ও কালী সিংহ (নাগপুর), দীপালি, কাজল, গীতা, চন্দ্রিমা, তন্ময় প্রদীপ বাগচী ও শিল্পা পাল (কোচি), অশোক, গৌতম, কল্পনা ও নীতা (কলিকাতা), সধীর-কুমার মাইতি (শ্রীকৃষ্ণপুর), শ্যামপ্রসাদ দাস, অরুণদেব, শুকদেব, পূজা প্রতিমা, অনিমা ও অর্চনা (কয়া টি), বাপী, রুমা ও পার্থ হাজরা (আড়ুই), গোপা, রেপি, রামি, রাধা ও গোবিন্দ চটে পাধ্যায় (চন্দননগর), নিমাইচন্দ্র নন্দী ও সুনীলকুমার মুদি (ওমরাবপুর)।

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

কাকলী, মেঘলা, রমিত, পল্টু, শিবাজী ও অরিন্দম সেন (পাটনা), বাচ্চু সরকার (কলিকাতা), মুনমুন বন্দ্যোপাধ্যায় (বারাবণী), অমিয়, অমৃত, অতি, প্রশান্ত (কলিকাতা), শ্যামাপ্রসাদ ও উমাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় (হুগলী), সুকৃতিকুমার, সুনীতিকুমার, মনোরমা, গৌরী-বালা ও মদনমোহন মিশ্র (রাণাঘাট)।

বাদ্যযন্ত্রের কথা

দেবশর্ম্মা লিখিত

মানব-সভ্যতার আদিম যুগে প্রচলিত ছিল গাছের গুঁড়ির মধ্যভাগ কুরে এমনিভাবে ফাঁপা গর্ত্ত বানিয়ে, সেই ফাঁপা কাঠের গুঁড়ির দু'পাশে কাঠের মুগুর বা ডান্ডার আঘাত দিয়ে ঢাক-ঢোলের মতো গুম্‌গুম্ শব্দে বাদ্যধ্বনি সৃষ্টি করা। এই রীতি অনুসরণ করেই পরবর্ত্তীকালে মানুষ ক্রমশঃ বানাতে শিখলো নানা ছাঁদের নানা রকম ঢাক, ঢোল, মাদল প্রভৃতি বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র।

প্রাচীন গ্রীস-রাজ্যের সুসভ্য-কলাবিদ্‌ অধিবাসীরা চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে সুমধুর সঙ্গীতালাপ করতেন এমনি ধরণের নলাকৃতি-বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে বিচিত্র সুর-লহরী সৃষ্টির মাধ্যমে। সেকালের এই সব বাঁশী রচনা করা হতো বিচিত্র ছাঁদে:: অর্থাৎ, একটি ফাঁপা-নলের মুখের দিকে অন্য দুটি লম্বা-ফাঁপা এবং ছোট-ছোট নল জুড়ে, বাঁশীর নিম্নের দিকের নলের প্রান্তে মুখ দিয়ে ফুঁ দিলে সঙ্গীতের সুর ফুটিয়ে তোলা যেতো। এমনি উপায়েই উদ্ভাবিত হয়েছিল বাঁশীর সুরে সঙ্গীত-সৃষ্টির অভিনব পন্থা।

মধ্য-যুগের ইউরোপীয় সুসভ্য-সমাজে ক্রমশঃ প্রচলিত হয়েছিল এমনি ধরণের অভিনব তার-যন্ত্র। সেকালে রাজা রাজড়ার সভায় আর অভিজাত-ধনীদের বিনোদ-আসরে এই ধরণের তার-যন্ত্র বাজিয়ে সঙ্গীতালাপ পরিবেশন করতেন সুনিপুণ গীত-বাদ্য-শিল্পীর দল। এভাবে সঙ্গীতালাপে জনগণের আনন্দ বিধান করাই ছিল তাঁদের পেশা। এমনি ছাঁদের তার-যন্ত্রই ম্যান্ডোলিন প্রভৃতি আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের আদি-সংস্করণ।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

শ্রীদিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ২৬শে ডিসেম্বর হইতে ২৮শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন দিন উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব রাজধানী কটক সহরে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ১৩তম অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমার পক্ষে ইতিপূর্ব্বে আর এইরূপ কোন সম্মেলনে যোগদান করিবার সুযোগ হয় নাই। কাজেই তিন দিন ব্যাপী বিরাট সম্মিলন নানা কারণে আমার পক্ষে শিক্ষাপ্রদ ও আনন্দদায়ক হইয়াছে।

আমরা কলিকাতা হইতে কলিকাতার বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৫০ জনেরও অধিক সদস্য গত ২৩শে ডিসেম্বর বুধবার রাত্রিতে পুরী এক্সপ্রেসের দুইখানি বগি রিজার্ভ করিয়া কটক অভিমুখে যাত্রা করি এবং পরদিন বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা নাগাদ কটক যাইয়া উপস্থিত হই। আমাদের দলে যাহারা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীসুরেন নিয়োগী, শ্রীকেশব মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র শর্ম্মা, শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ষ্টেশন হইতে আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া কটকে Christ Church Collegiate School ভবনে লইয়া যাওয়া হয় ও সেখানেই আমরা চারিরাত্রি অতিবাহিত করি। বিরাট School ভবনে আমাদের থাকার কোন অসুবিধাই ছিলনা। তাছাড়া কটকে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের আহ্বায়ক ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের আন্তরিকতা ও আদরযত্নের জন্য আমাদের কোন অসুবিধাই হয় নাই। তবে কটক সহরে জল সরবরাহের ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রচুর, সেজন্য আমাদিগকে সর্ব্বদা সাবধান হইয়া জলের ব্যবহার করিতে হইয়াছিল।

কাছেই Union Club এর মাঠে এক সুদৃশ্য মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় সম্মেলনের সভা বসিয়াছিল এবং পাশের Club গৃহে অভ্যর্থনা সমিতির ব্যবস্থায় কয়দিন ধরিয়া সকল সময়েই সকলকে (সকাল, দুপুর, অপরাহ্ণ ও নৈশ) আহারাদির দ্বারা আপ্যায়িত করা হইত। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় চারশত জন প্রতিনিধি এইবার কটকে সমবেত হন। তাছাড়া ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সাহিত্যিক, সাহিত্য-রসিক এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিও কটকের অধিবেশনে আমন্ত্রিত হন।

এবারকার সম্মেলনে যিনি সকলের পুরোভাগে থাকিয়া সকলের শ্রদ্ধা ও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন তিনি হইলেন বাংলা তথা ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান দেশ-গৌরব ভাষাতত্ত্বাধ্যাপক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার বিদ্যা ও জ্ঞানের খ্যাতি ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া এমন কি সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তিনিই ছিলেন এবারকার সম্মেলনের মূল সভাপতি। ৭২ বৎসরের বৃদ্ধ সুনীতিকুমার তাঁহার অটুট স্বাস্থ্য লইয়া এখনও অহোরাত্র জ্ঞান চর্চ্চায় নিরত থাকেন। মাসাধিককাল পূর্ব্বে তাঁহার পত্নী বিয়োগ হইয়াছে, সেই কারণে কটকে সম্মেলনে তাঁহার যোগদান সম্পর্কে বহুস্থানে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি যথা সময়ে কটকে উপস্থিত হইয়া যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন তাহা সকল দিক দিয়া তাঁহার মত পণ্ডিতেরই যোগ্য হইয়াছে।

তিনি হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়াও সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব ও বিরাট অবদানের কথা বিস্মৃত না হইতে সকলকে অনুরোধ করেন। প্রত্যেক রাষ্ট্রে নিজস্ব মাতৃভাষা ছাড়াও যাহাতে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য উপযুক্তভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয় তাহার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি সকলকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। সারা পৃথিবীর সাহিত্যসাধনার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙ্গালীর শিক্ষা ও সাহিত্য যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার

করিয়াছে তাহা যাহাতে নিষ্ফলা না হয়, তিনি বর্ত্তমান-যুগের বাঙ্গালীদিগকে সে বিষয়ে সর্ব্বদা সজাগ থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন।

আচার্য্য সুনীতিকুমার মনে প্রাণে বাঙ্গালী এবং তিনি ৫০ বৎসরেরও অধিককাল তাঁহার কর্ম্মজীবনে সেই বাঙ্গালীত্ব রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। সত্যি কথা বলিতে কি আজকের এই মেকির যুগে সুনীতিকুমারের মত একজন খাঁটি, নিষ্ঠাবান, উপবীতধারী ব্রাহ্মণকে এই সম্মেলনের মূল সভাপতি করায় এই সম্মেলনের গৌরব যে অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

২৪শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ২-৩০ মিনিটের সময় নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মূল অধিবেশন আরম্ভ হয়। শ্রীসুনীলকুমার পালিত ১২ বৎসর পূর্ব্বে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কটক অধিবেশনের কথা উল্লেখ করিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখ্যা দ্বারা এক অতি সুন্দর বক্তৃতা দেন। তাঁহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীললিতকুমার দাশগুপ্ত তাঁহার মুদ্রিত ভাষণ পাঠ করেন।

ললিতবাবু তাঁহার ভাষণে উড়িষ্যায় বাঙ্গালীদের বাস-স্থাপনের ইতিহাস সুদীর্ঘভাবে বিবৃত করেন, তিনি বলেন: —

"উৎকলে বাঙ্গালীদের প্রথম বসবাস প্রাক্-চৈতন্য যুগে। সে সময়ে বাংলা ও উৎকলের যোগাযোগের রাস্তা ছিল অত্যন্ত দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল. ব্যবসায়ের জন্য ব্যবসায়ীরা আসতেন জলপথে, তাই আজও দেখা যায় ওড়িশার নদী ও সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলে প্রচুর বৈশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙ্গালীর বাস। এরাই ওড়িশার আদি বাঙ্গালী বাসিন্দা। ক্রমে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে এঁদের কতকাংশ ওড়িশার অভ্যন্তরভাগেও বসতি স্থাপন করেন। পরে অবশ্য এই সংযোগকে সহজ ও সুগম করেন রাজা সুখময় রায়, "জগন্নাথ রোড ফাণ্ড" তাঁর অক্ষয়কীর্ত্তি।

দ্বিতীয় পর্বে উৎকলভূমিতে চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম প্রচারের সময়। তাঁর প্রেমলীলাকে অবলম্বন করে বহু বাঙ্গালী এদেশে আগমন করেন। উৎকলভূমিকে তাঁরাও নিজেদের মাতৃভূমি করে নিয়েছেন।

তৃতীয় পর্বে বহুসংখ্যক বাঙ্গালীর আগমন ঘটে টোডর-মলের ভূমিরাজস্ব বিধান উপলক্ষে। তখন অগণিত বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী এদেশে চাকরী নিয়ে আসেন। এই তিন পর্বে যে সমস্ত বাঙ্গালী পরিবার ওড়িশায় এসেছিলেন তাঁরাই প্রধানত এদেশের প্রাচীনতম বাঙ্গালী বাসিন্দা। উনিশ শতকের চতুর্থ দশক হতে এর পরবর্তী যুগ আরম্ভ হয়। তখন ইংরাজ শাসনের সুত্র অবলম্বন করে বহু বাঙ্গালী এদেশে আসেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, ব্যবসায়ী, আইনবিদ্ ও ঠিকাদার শ্রেণীর লোক।

নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি শ্রীবেরেশ দাস, আই, সি, এস গত কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রত্যেক অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া একটি করিয়া সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া থাকেন। এবারও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

এবারও তিনি তাঁহার অভিভাষণে বহু মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। বাংলা এবং উড়িষ্যার মিলনের অতীত ইতিহাসের তিনি একটা দিক উদ্ধার করিয়া বলেন: —

"শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধর্ম্মের প্লাবন বাংলা ও উড়িষ্যার প্রাচীন বন্ধনকে নূতন কীর্ত্তিতে মণ্ডিত, নূতন কীর্ত্তনে ধ্বনিত করে তুলল। উড়িষ্যার মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেবের প্রধান মন্ত্রী রাজা রামানন্দ রায়কে গোদাবরী তীরে শ্রীচৈতন্য দেখে আলিঙ্গন করে অশ্রুপাত করতে আরম্ভ করেন। তা দেখে ব্রাহ্মণরা আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করেন:—

'এই না ব্রাহ্মণ তেজঃ দেখি সূর্য্যসম
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন।"

এই আনন্দাশ্রুপাত ভারতে নবযুগের পুলকিত প্রকাশকে প্রেম ও সাম্যের অঝোর ধারায় সিঞ্চিত করেছিল।

শুধু ভক্তির বন্ধনে নয়, ভাষার শিক্ষাতেও শ্রীচৈতন্য এই দুই দেশের মধ্যে একটি নূতন আদর্শের স্থাপন করেছিলেন। নিখিল ভারতীয় একটি সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষ থেকে সেই কথাটি আজ বিশেষ করে আমাদের মনে রাখতে হবে।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সাহিত্য শাখার সভানেত্রী শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা দেবী তাঁহার লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। বাংলা সাহিত্য জগতে তিনি সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয়া ও সর্ব্বজন-স্নেহধন্যা। তাঁহার ছোট গল্প বিশেষ করিয়া উপন্যাসগুলি তাঁহার অসামান্য শক্তিরই পরিচয় বহন করে।

তিনি তাঁহার ভাষণে নারী সুলভ বিনয় ও নম্রতা সহকারে নিজের অক্ষমতার কথা বর্ণনা করিলেও তাঁহার ভাষণে

বহুজন উপন্যাস সাহিত্যকে লইয়া চোরাবালি ভাষার কেরামতীর মনোহারি প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিয়াছেন :

"আজকের কথা-সাহিত্য নিয়ে অনেক অভিযোগ উঠছে : কোনো মহলে থেকে অভিযোগ উঠছে, চলতি সাহিত্যে যা কিছু হচ্ছে তার সবটাই বিষাক্ত বাষ্পে পূর্ণ। ওই বাষ্পের ধাক্কায়েই দেশের সুকুমারমতি তরুণ-তরুণীরা রসাতলের অতল গহ্বরের দিকে দ্রুত ধাবিত হয়ে চলেছে··· কোনোখান থেকে অভিযোগ উঠছে—শুধু তরুণ-তরুণী কেন, দেশে যতকিছু অন্যায়, অনাচার, অবনতি, দুর্নীতি, ভেজাল, কালোবাজার, সব কিছুর জন্যেই দায়ী বর্তমানের এই মাথামুণ্ডহীন পাপপুণ্যের অতীতহীন 'আধুনিক সাহিত্য।'···আর কদাচিৎ মাথাঠাণ্ডা দলের সবটাই নস্যাৎ করে দিয়ে বলছেন, আদৌ না হলেও চলবে, কারণ প্রতিনিয়তই প্রশ্নই নেই। বর্তমানে 'সাহিত্য' বলে যা চলছে, তা' আদৌ সাহিত্যই হচ্ছেনা। যা হচ্ছে তা' স্রেফ কিচ্ছু না।'

অবশ্য এই নস্যাৎ বাণীটি যে কেবল মাত্র আধুনিক লেখকদের সম্পর্কেই প্রয়োগ করা হচ্ছে, একথা জোর করে বলা শক্ত। অন্ততঃ শেষোক্তটি যে পুরোপুরি ভিত্তিহীন নয়, সেটা পরিহাসের বিষয় হলেও সত্য।

প্রতিষ্ঠিতদের যে মাকে মাকে দুধের সঙ্গে জল এবং জলের সঙ্গে বাতাসা মেশানোর কৌশল আয়ত্ব না করে উপায় থাকছে না, তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন।···

আর একটি অভিযোগ সিনেমার উপর।

সিনেমাই নাকি সাহিত্যের সর্বনাশ ঘটাচ্ছে। তা : ভাল সাহিত্যিকরা নাকি 'সিনেমা সদৃশ' গল্প লিখে কলমের জাত নষ্ট করছেন।

অভিযোগ আরো নানা প্রকার।

নবীন প্রবীণ সকলের উপর। অর্থাৎ চলতি বাংলা সাহিত্যের উপরই।

কিন্তু কেবল মাত্রই কি অভিযোগ ?

অভিনন্দনও কি নেই ? আশাবাদে বিশ্বাসী কোনো গোষ্ঠি কি একেবারেই অনুপস্থিত, যে বিশ্বাস থেকে শুধু অভিযোগই ওঠে না, অভিনন্দনও আসে ?

আছে অবশ্যই।

আর সেখানে সত্য মিথ্যার যাচাই হচ্ছে। আসল নকলের মূল্যও ধার্য হচ্ছে।

আমি নৈরাশ্যবাদী নই। আমার মনে হয় না, বর্তমান বাংলা সাহিত্যে যা কিছু হচ্ছে, তা' কিচ্ছু হচ্ছেনা। অথবা। যা কিছু হচ্ছে, তা সমস্তই একেবারে সর্বনেশে কাণ্ড হচ্ছে।"

সংবাদ-সাহিত্য শাখার সভাপতি আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকারও তাঁহার ভাষণে নূতন কথাই শুনাইয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে সংবাদপত্রের যুগ বেশী পুরাতন নহে। সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রগুলির আমলেও নিছক সাহিত্যই পরিবেশন করা হইত। বর্তমান যুগের দৈনিক পত্রগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ের সংবাদকে নূতন রূপ দান করা হইতেছে, সে জন্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, সন্তোষ ঘোষ প্রভৃতি খ্যাতনামা কথা সাহিত্যিকদের হাতে সংবাদপত্র নিত্য নূতন রূপ ধারণ করিয়া পাঠক সমাজকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছে।

তাঁহার ভাষণে শ্রীঅশোক কুমার সরকার বলেন—সংবাদপত্র কেবল সদসাময়িক রাজনীতির দর্পণ মাত্র নয়। সংবাদ এবং সাহিত্যের মধ্যে স্পষ্ট কোন সীমারেখা টানা যায় কি না, এ-নিয়ে অবশ্য বিদগ্ধজন মহলে মতভেদ আছে এবং তর্কটি অনেককালের পুরাণো। একপক্ষ বলেন, সংবাদপত্র প্রায় দিনপঞ্জী, দেশবিদেশের প্রাত্যহিক ঘটনাবলীর বিবরণ মাত্র, আর সাহিত্যের লক্ষ্য কালাতীত ধ্রুব সত্য, তার উপজীব্য হল শাশ্বত মানবজীবনের অমৃতকথা, সাহিত্যশাস্ত্রীদের কঠোর বিচারে সংবাদপত্রের বিষয় ও বক্তব্য একান্তই সাময়িক ; সাহিত্যের ভাবনা চিরায়ত একটি বাস্তবের হুবহু চিত্রই হচ্ছে, অন্যটি বাস্তব এবং কল্পনার সংমিশ্রণ অথবা বিশুদ্ধ কল্পনার সামগ্রী।

শিশু-সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীসুধীরকুমার সরকারও তাঁহার এক সুলিখিত ভাষণ পাঠ করেন।

এবারকার সম্মেলনে সভাপতিগণ ছাড়াও কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম উজ্জ্বলরত্ন ডঃ নীহাররঞ্জন রায় সমাজ ও সংস্কৃতি শাখার সভাপতি; অভিভাষণে, চারুকলা শাখার সভাপতি শ্রীঅশোক কুমার মিত্র তাঁহার ভাষণে, কবিসম্রাট শ্রীনরেন দেব ও রাধারাণী দেবী তাঁহাদের ভাষণে, গান্ধীবাদী ও নৃতত্ত্বের অধ্যাপক শ্রীনির্মল কুমার বসু তাঁহার ভাষণে, খ্যাতিমান লেখক শ্রীপ্রবোধ কুমার সান্যাল ও শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির উপস্থিতি ও ভাষণ এবারকার সম্মেলনকে বিশেষ গৌরব দান করিয়াছে।

যাহা হউক কটকে তিনদিন ধরিয়া সম্মেলনের মধ্য-দিয়া যে বিদ্যাচর্চা, জ্ঞান ও আনন্দ পরিবেশন করা হইয়াছে তাহা সম্মেলনের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কলিকাতার কাছে বলিয়া এবার কটকে পশ্চিমবঙ্গ হইতে বহু সংখ্যক প্রতিনিধির সমাগম হইয়াছিল। উড়িষ্যার নূতন রাজধানী ভুবনেশ্বর, সুপ্রাচীন ইতিহাসের স্বাক্ষর-সমন্বিত কোনারকের সূর্যমন্দির এবং আচার্য শঙ্কর ও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের ও কর্মের স্বাক্ষ্য বহন-কারী ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান পুরীধামের আকর্ষণ বহুলোককে কটক সম্মেলনে লইয়া গিয়াছিল। অধিকাংশ প্রতিনিধি উড়িষ্যার এই তিনটি ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান দর্শন না করিয়া কটক হইতে ফিরিতে পারেন নাই।

পরবর্তী অধিবেশন আসামের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক-সৌন্দর্যমণ্ডিত শিলং-সহরে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। সকলে সে অধিবেশনের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিবেন।

॥ নবীন প্রশস্তি ॥

শ্রীঅম্বিকাচরণ চৌধুরী

কবিবর,
ভারতের পূর্ব প্রান্ত হতে,—
কবে তুমি শুনাইলে অপূর্ব সংগীতে
মহাভারতের বাণী, করিলে প্রচার,
প্রেমের অমেয়মন্ত্রে পূর্ণ অবতার
শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত। জাতি ধর্ম ভেদ—
পরিপূর্ণ শতাব্দীর জড়ত্বের ক্লেদ,
বিপ্লবে, বিগ্রহে শত বিচ্ছিন্ন ভারতে—
সাম্যের পবিত্র ধারা মন্দাকিনী স্রোতে
এনেছিলে হর্ষে বহি। গৌড়জন হরে,
বিতরিতে কাব্য সুধা যুগ যুগ ধরে।
তারপর একে একে কত বর্ষ গত
কালের মন্দিরে তব বাজে অবিরত
তোমার প্রাণের বীণা। ভদ্রাতুর আঁখি—
নিরুদ্ধ আঁধারে মেলি আজো মোরা দেখি,
কবির জীবন স্বপ্ন—আসিন্ধু গাম্ভীর—
এক ধর্ম—এক রাষ্ট্র, স্বাধীন উদার।
নহ শুধু কবি, নব যুগ স্রষ্টা তুমি,
ধন্য মোরা, ধন্য তব প্রিয় জন্মভূমি।
সেদিন আহ্বান তব শুনি নাই কেহ,
পরাইনি জয়মাল্য করি সমারোহ
প্রীতির চন্দন পুষ্পে, স্নেহে সমাদরে।
বঙ্গের অঙ্গনে হব স্মৃতি পূজা তরে
শুভ সম্মিলন আজি। শ্রদ্ধানত শির
কৃতাঞ্জলি ভক্তি অর্ঘ্য স্বদেশবাসীর
লহ নমস্কার। শুধু এই আশীর্বাদ
যাচি মোরা,—জীবনের জয় সংবাদ
বাজুক ভারতে পুনঃ। সাধনা তোমার—
পূর্ণ হোক্—তৃপ্তি হোক—
স্বর্গত আত্মার।

* কবিবর ৺নবীনচন্দ্র সেনের জন্ম শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে কবির সমাধিস্থলে পঠিত।

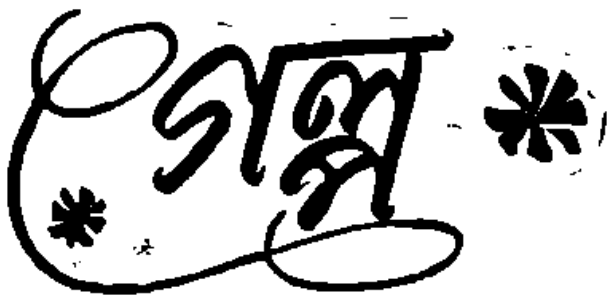

কালো

শরৎ ধর

জীবনের এত বড় বিয়োগান্ত ইতিহাসের পাতায় আপনাকে অমর করে রাখবার কোন ইচ্ছেই কালোর কল্পনায় কোন দুর্বল মুহূর্তেও ঠাঁই পায় নি, কিন্তু তবু তাকে নিতান্ত ভাগ্যদোষেই সেই নিরারুণ ট্রাজেডীর সঙ্গেই জড়িয়ে পড়তে হ'ল।

আর পাঁচটা সাধারণ ছেলের মতই লাফালাফি, ঝাঁপা-ঝাঁপি, মারামারি করে এবং তার জন্যে বাড়ীতে মারধোর খেয়ে তার ছেলেবেলা কেটেছে। তারপর স্কুলে ভর্তি হয়ে পাশ-কেল করে ফুটবল ক্রিকেটের মাঠে চেঁচিয়ে চিয়ে তার কৈশোরও এক রকম কেটে গেছে। কিন্তু প্রথম যৌবনের একদিনে এক বন্ধুর বাড়ীতে আড্ডা মারতে গিয়ে যখন সে সন্ধ্যার সামনে পড়ল এবং বন্ধুর মধ্যস্থতায় পরিচয়ও হল, সেদিন তার নমস্কারের বিনিময়ে সন্ধ্যা তার মুখের দিকে বিমূঢ়ের মত বিস্মিত দৃষ্টিতে শুধু চেয়েই রইল।

তার রূপ দেখে আগে যে কেউ কখনও সমালোচনা করে নি এমন নয়, উপরন্তু আড়ালে আবডালে, এমন কি সামনা সামনিও অনেকে অনেক মতামত পাশ করেছিল। কিন্তু কালো সে ধরণের কোন কথাই কোনদিন গ্রাহ্য করে নি এবং তার জন্যে দোষও কাউকে দেয়নি। কেউ কিছু বললে হেসে বলত, কেউ মেয়ে দেবে না এই তো? কিন্তু দেখবি আসবে অনেকেই, বলে দিলুম। পুরুষের আবার রূপ কিসের রে?

এহেন কালো সেদিন সন্ধ্যাকেও কোন দোষ দিতে পারে নি। কিন্তু তার আগের সেই অনমনীয় মনোভাব-টাতে সন্ধ্যার সেই বিস্মিত দৃষ্টির শাণিত একটা কিছুর আঘাতে যেন প্রকাণ্ড একটা চিড় খেয়ে গেল। সেদিন সে শুধু গভীর লজ্জায়, ঘৃণায় এবং নিজের ওপর একটা প্রবল বিতৃষ্ণায় নিজের সেই অত্যন্ত রোগা, কালো, ভাঙ্গা, নাক-সর্ব্বস্ব মুখে বড় বড় ভাঙা ভাঙা বসন্তের স্মৃতি রেখে যাওয়া দেহটাকে নিয়ে এই অপরূপ সুন্দরী মেয়েটার কাছ থেকে যেন ছুটেই পালাতে চেয়েছে। কিন্তু তাও না পেরে সন্ধ্যার সেই দৃষ্টির সামনে নিজেকে একান্ত অসহায়ের মত দাঁড় করিয়ে মনে মনে ভগবানের কাছে আকুল কণ্ঠে শুধু প্রার্থনা জানিয়েছে, হে ভগবান, এ দেহ তুমিই দিয়েছ। এ কোন্ পাপের সাজা আমি জানিনা, জানতেও চাই না। শুধু এইটুকু কর, নিজের সম্বন্ধে এতবড়ো সত্যোপলব্ধি যেন কখনো বিস্মৃত না হই!

এর পর থেকেই কালো হঠাৎ আপনাকে আপনার মধ্যে সঙ্কুচিত করে ফেলল। আগে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বাড়ীর বাইরে ছাড়াও তাদের বাড়ীতে গিয়েও গল্পগুজব করত। কিন্তু এরপর সে নিজের আত্মীয়স্বজনদের বাড়ীতে যাওয়াও ছেড়ে দিলে। এমনকি তাদের কাউকে এ-ফুটপাথে দেখলে সে ও-ফুটপাথ দিয়ে সরে পড়ত। এমনি একদিন হঠাৎ শোনা গেল, কালো কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

নিজের বাড়ীতে বা বাড়ীর বাইরেও খারাপ ছেলে না হলেও ভাল ছেলে বলে কালোর কোন খ্যাতি ছিল না। এমন অবস্থায় বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ হলে সে পালানোর পেছনে যে উদ্দেশ্যই থাক না কেন, সংসার-অভিজ্ঞ বুদ্ধিমান কোন লোকের পক্ষে সেটাকে সহজভাবে গ্রহণ করা চলে না। কালোর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম কিছু হয়নি। কেউ নাক কুঁচকে বললে, দেখতে যেমন, স্বভাবও তেমনি।... কেউ বিজ্ঞের মত বললে, আরে আমি তখনই ভেবেছি, ও-রকম শুম মেরে আছে যখন, তখন মনে মনে সে এই

মতলবই ভাঁজছে। কেউ কেউ ঠোঁট উল্টোল। মন্তব্য করার সঙ্গে সঙ্গে কালোর বন্ধুদেরও শাল দিতে ছাড়লে না, ছোটলোকদের সঙ্গে মিশলে ওই হয়। গেছে আপদ গেছে। তার চেয়ে দেখ কিছু নিয়ে সটকেছে কিনা। আবার অনেকে বললে, আরে বাবা, এখন আমরা আকৃষ্টার দেখছি। ভেবো না, দেখবে দু'দিন পরে বাছাধন বাপের সুপুত্তুর হয়ে সুড়সুড় করে ঘরে ঢুকবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু এদের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ার কোন লক্ষণই আশাও দেখা গেল না, অথচ কালোর নিরুদ্দেশ হওয়ার পর অনেকদিন কেটে গেল। লোকেও ক্রমশ তার কথা ভুলতে আরম্ভ করল এবং তাদের সব রকমের সমালোচনাই একদিন প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য হারিয়ে আকর্ষণহীন হয়ে পড়ল। নিতান্ত আত্মীয় স্বজনেরা মাঝে মধ্যে সেই অপদার্থটার কথা তুললেও আর পাঁচটা কথার মধ্যে সেটা চাপা পড়ে যায়।

এদিকে সেই অপদার্থ কালো জীবনের উঁচু নীচু অনেক পথ হেঁটে অবশেষে এক আত্মীয়হীন বৃদ্ধ ডাক্তারের কাছে আশ্রয় পেল। বৃদ্ধ ডাক্তারের স্নেহ মমতার মধ্যে সে আবার নতুন করে লেখাপড়া শুরু করল এবং ডাক্তারীও পাশ করল ভালভাবে। পরীক্ষার ফল বের হওয়ার দিন সে ভগবানের কাছে দ্বিতীয়বার প্রার্থনা জানিয়েছিল, ভগবান। নিজের দুঃখে দুঃখিত আমি নই। কিন্তু এ দুঃখ যেন আর কখনও কাউকেও না পেতে হয়। আমার মত হতভাগা ত্রিসংসারে আর যেন কেউ না জন্মায়!

এরপরে সে যাতে অঙ্গ-বিকৃতির আশঙ্কা দেখা দেয়, সেই সব রোগের পেছনে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রমে নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করে দিল। এর ফলে একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসেবে অল্পদিনের মধ্যেই তার নাম ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। তখন সেই আশ্রয়দাতা বৃদ্ধ ডাক্তার নিজে ডাক্তারি ছেড়ে দিয়ে কালোকে নতুন করে ডিস্‌পেন্‌সারী করে দিলেন এবং মৃত্যুকালে কালোকেই তাঁর যথাসর্বস্ব দিয়ে গেলেন।

এরপরও কেটে গেছে অনেকদিন।

একদিন সন্ধ্যেবেলা নিজের ডিস্‌পেন্‌সারীতে বসে কালো মাইক্রোস্কোপে কী একটা পরীক্ষা করছিল, এমন সময় হঠাৎ হুইংডোর ঠেলে হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। কালো মুখ তুলে বললে, বসুন।

তারপর জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাতেই বৃদ্ধ বললেন, আপনাকে এখুনি একবার আমার বাড়ী যেতে হবে ডাক্তারবাবু!

তাঁর উদ্বেগাকুল কণ্ঠস্বরে কালো একটু বিস্মিত হয়েই বলল, কী হয়েছে!

আমার বৌমার অসুখ—ডাক্তারবাবু, সারাশরীরে একেবারে, কোন জায়গাই বাদ নেই। সব বড় বড় চাকা চাকা হয়ে বেরিয়েছে। একেবারে বেসামাল হয়ে পড়ে আছে, ডাক্তারবাবু! বৃদ্ধের কণ্ঠ করুণ মিনতিতে আবেগরুদ্ধ হয়ে গেল।

কালোর মানসপটে তার নিজের মুখখানা একবার ভেসে উঠল। বাইরেকার জগৎ সে বিস্মৃত হয়ে পড়ল। কিন্তু পরক্ষণেই তার চোয়াল দুটো দৃঢ় হয়ে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে কম্পাউণ্ডারকে প্রয়োজনীয় অষুধ-পত্র ব্যাগে ভরতে বলে ড্রাইভারকে গাড়ীটা ঠিক করতে বলল। তারপর বৃদ্ধকে আহ্বান জানিয়ে বলল, চলুন।

কিন্তু রোগিণীকে দেখেই কালো চমকে উঠল। এ সেই, যে তাকে তার নিজের সম্বন্ধেই এক অতি বড় সত্য উপলব্ধি করিয়েছিল। এবং—এবং যে তার এই উন্নতির মূলে। সেই সন্ধ্যা। কিন্তু···কালো মুহূর্তের মধ্যে মনস্থির করে ফেলল। এ সন্ধ্যা নয়, কেউ নয়। এখন এ শুধু একজন মরণাপন্ন রোগিণী, এবং সে ডাক্তার। রোগিণীর ঘরের দরজায় অনেকেই ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল। সেদিকে তাকিয়ে কালো গম্ভীর স্বরে বলল, আপনারা বাইরে যান। ওভাবে ভীড় করলে রোগিণীর ক্ষতি হবে। তারপর সেই বৃদ্ধের দিকে ফিরে কিছু বলে রোগিণীকে ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগল।

পুরো এক সপ্তাহ ধরে রোগের সঙ্গে অবিরাম প্রাণপণ যুদ্ধ করে অবশেষে সে সন্ধ্যার জ্ঞান ফিরিয়ে আনল। এ কদিনে অসংখ্য রোগী তার ফিরে গেছে, অসংখ্য 'কল' বাইরার এসেছে, রোগীদের যন্ত্রণা-কাতর পাণ্ডুর মুখগুলোর কথা স্মরণ করে তার হৃদয় ব্যথায় বেদনায় মূর্চ্ছিত হয়ে মরেছে, তবু মুহূর্তের জন্যও সে

রোগিণীকে ছেড়ে যেতে পারে নি। আজ এক সপ্তাহ পরে রোগিণী যখন অত্যন্ত দুর্বল হলেও সজ্ঞানে চোখ মেলে চাইল, তার পরক্ষণেই কালো ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

সারাদিন অন্যান্য রোগীদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে, নিজের ডিস্‌পেন্‌সারীতে রোগী দেখে আবার সে সেদিন সন্ধ্যার কিছু পরে রোগিণীর কাছে ফিরে গেল। ক্ষিপ্র হাতে ক্ষতগুলো ধুইয়ে পরিষ্কার করে দেওয়ার সময় তার দিকে চেয়ে সন্ধ্যা হঠাৎ বলল, আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে, ডাক্তারবাবু! আপনি কি···

হাতটা কেঁপে গেল কালোর। কিন্তু তক্ষুণি সামলে নিয়ে বলল, না, কই। আপনাকে এর আগে আর কোথাও দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না। কিন্তু এখন সেই কথাটিকা বলবেন না।

কিন্তু সন্ধ্যা তার দিকে তেমনিভাবেই তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, ডাক্তারবাবু আমি ভাল হ'ব ত' ?

কালোর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই সে মৃদু হেসে বলল, দেখুন, আমি একজন ডাক্তার। আর ডাক্তারেরা কোনদিন আশা ছাড়ে না।

কথা শুনে সন্ধ্যা শ্রান্তভাবে চোখ বুঁজল। তার সেই শীর্ণ, পাণ্ডুর, অসহায় মুখের পানে তাকিয়ে কালো মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, এই সুন্দর রূপকে সে কিছুতেই বিকৃত হতে দেবে না। তার যতদূর সাধ্য, যতটুকু বিদ্যে-বুদ্ধি, সবই প্রয়োগ করেই সে একে রক্ষা করার চেষ্টা করবে।

সুদীর্ঘ তিনমাস পরে সন্ধ্যা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল বটে, কিন্তু তার মুখের দাগ সব মিলিয়ে গেল না। এই সর্বপ্রথম, সর্বশেষ চেষ্টা করেও কালো বিফল হ'ল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা নিজের ডিস্‌পেন্‌সারীতে বসে সে নিজের এই বিফলতার কথাই ভাবছিল, অন্য কোন বড় ডাক্তারের পরামর্শ সে নেবে কিনা। এমন সময় সুইং-ডোর ঠেলে সেখানে ঢুকল সন্ধ্যা। বিনা অনুরোধেই একটা চেয়ার অধিকার করে তেমনি বিনা ভূমিকাতেই হঠাৎ সে কালোর মুখের দিকে তাকিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করল, আমার এ দাগ সারতে আর কতদিন লাগবে ডাক্তারবাবু ?

ক্ষণকাল কী চিন্তা করে সন্ধ্যার মুখের দিকে তাকিয়ে কালো ধীরস্বরে বলল, দেখুন, আপনার এ দাগ বেশ ডিপ্‌। কাজেই···

একটু উত্তেজিত হয়েই তাকে বাধা দিল সন্ধ্যা। বলল, ওসব বাজে কথা শুনতে চাই না। বলুন, আমার এ দাগ সারবে কিনা ?

তার কথার ধরণে একটু বিস্মিত হয়ে কালো বলল, তার মানে !

আরও উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সন্ধ্যা বলল—তার মানে আপনার ফাঁকি ধরা পড়ে গেছে। ভেবে-ছিলেন, চেনা না দিলেই বুঝি চেনা যায় না! কিন্তু আমার চোখকে আপনি ফাঁকি দিতে পারেন নি, আপনি—

বাধা দিয়ে ব্যস্ত কণ্ঠে কালো বলল, কী বলছেন আপনি সন্ধ্যা দেবী। আপনি ঠিক···

ক্রোধে, ঘৃণায় দু'চোখে অগ্নিবর্ষণ করে তীব্র ব্যঙ্গের সুরে সন্ধ্যা বলল, কি বলছি, বুঝতে পারছেন না, না ? আয়নায় নিজের মুখখানা দেখুন একবার, তাহলেই বুঝবেন ! বলেই সে যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে।

আর তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কালো। এতবড় অভিযোগের একটা উত্তর তার মুখে যোগাল না। কিন্তু সে সন্ধ্যারও কোন দোষ দেখতে পেল না। সন্ধ্যার দুর্গতির কথা ভেবে তার প্রতি করুণায়, মমতায়, সমবেদনায় তার চোখ দুটোই শুধু জলে ভরে উঠল।

পরদিন আরও অনেক রোগী এবং রোগীদের আত্মীয়-স্বজনদের মত সন্ধ্যার স্বস্তর মশায়ও ডাক্তারবাবুর খোঁজে এসে দেখেন—ডিস্‌পেন্‌সারীর দরজায় তালা ঝুলছে।

কালো আবার কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

মিহিরাচার্য্য

গতমাসে লগ্ন থেকে রবিস্থিতির ফল বলেছি প্রথম ও দ্বিতীয় ঘরের। এমাসে তৃতীয় ও চতুর্থ ঘরের পরিস্থিতি কি কি নির্দ্দেশ করে তাই বলব।

রবি লগ্ন থেকে তৃতীয়ে : তৃতীয় ঘরটিকে উপচয় স্থান বলা হয়। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, অপচয় কথাটির বিপরীত অর্থ নির্দ্দেশ করে ঐ উপচয় কথাটি—অর্থাৎ কিনা বৃদ্ধি বোঝায়।

যাঁর রবি লগ্ন থেকে তৃতীয় ঘরে থাকে, তিনি নানা প্রকারে বৃদ্ধি সুখ ভোগ করেন, উদার, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সাহসের এবং আবিষ্কারের মনোবৃত্তি পেয়ে থাকেন। তিনি যেমন অপর ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত, তেমনি তাঁর প্রয়োজনে অপর ব্যক্তিরাও তাঁকে মনপ্রাণে সাহায্য করে। জাতক সাহসী হন, দুঃসাহসিক চেষ্টায়ও তাঁর অদম্য উৎসাহ প্রকাশ পায়। তৃতীয় স্থান কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনী নির্দ্দেশ করে। রবির দশা-অন্তর্দ্দশায় জাতকের ভ্রাতা ভগিনী জন্মায় এবং পরিণতকালে ঐ রবির দশা ঘুরে এলে তার ভ্রাতা ভগিনীদের মন্তব্যমত উন্নতি প্রধান করে। তৃতীয় ঘর নির্দ্দেশ করে জাতকের গলা, বাহু ও কান। প্রায়ই দেখা যায় এই সব জাতকের গলা, বাহু বা কানে তিল অথবা আঁচিল প্রকাশ পায়। তৃতীয়ে রবি যাঁদের বলবান থাকে, কাজেকর্ম্মে তাঁদিকে বারবার ছোটখাট ভ্রমণ করতে হয় এবং জনসাধারণের প্রীতি-ভালবাসাও তিনি পেয়ে থাকেন। সম্পাদক বা প্রকাশক হবার যোগ্যতাও এদের দেখা যায়। কিন্তু ওপরে যেগুলি সুফল বললাম, সেগুলি অন্য শুভগ্রহের শুভদৃষ্টি পেলে তবেই ফলবে। কিন্তু শনির যদি কুদৃষ্টি পায় ঐ তৃতীয় ঘরের রবি, তাহলে নানা ভ্রান্তি তাঁকে বিপর্য্যস্ত করবে এবং কোন কাজেই তাঁর সাফল্য আসবে না। কিন্তু বৃহস্পতির যদি সুদৃষ্টি পায় রবি, তাহলে ওপরে-লেখা ফলগুলি তো হবেই, তাছাড়া আত্মীয়স্বজন তাকে সাহায্য করবার সময় অযাচিতভাবে এগিয়ে আসবে। বুধ যদি শুভ দৃষ্টি করে, ব্যবসার জন্যে ছোট খাট ভ্রমণে তিনি লাভবান হবেন। শুক্র যদি শুভদৃষ্টি করে, তাহলে তিনি সৌন্দর্য্যশোভা উপভোগের জন্য ছোটখাট ভ্রমণে আকৃষ্ট হবেন। তৃতীয় ঘরের রবি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে মংগলের কুদৃষ্টি পায় তো, একগুঁয়েমি ও জিদের বশে তিনি প্রতিবেশী বা আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হবেন। এমন কি মামলা মোকদ্দমা হওয়াও বিচিত্র নয়। শুধু এদের সঙ্গে কেন, মায়ের পেটের ভাই-বোনের সঙ্গেও ঐ রকমের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। চন্দ্র এবং বুধ যদি ঐ রবির ওপর কুদৃষ্টি হানে—তবে তাঁর বদনাম রটতে দেরী হয় না। চিঠিপত্রে লেখা কোন ব্যাপার নিয়ে অপবাদ—এমন কি আদালত পর্য্যন্ত গড়াতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বৃহস্পতির সুদৃষ্টি থাকলে সব চেয়ে ভাল ফল হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে রবি তৃতীয় ঘরে বৃহস্পতির শুভদৃষ্টি পেলে জাতক সুখ-শান্তি, মহত্বে বিশ্বাসী হয়। কিছু ভাবলে ভীষণ চটে যায়,—কখনও কখনও কারো মুখ দেখে বেরিয়ে এমনটা ঘটেছে বলে বিশ্বাস করে। মনে মনে দেবতাকে নমস্কার করা, মন্দির দেখলেই চোখ বুজে ভক্তি প্রকাশ, এও তৃতীয়ে রবির বৃহস্পতির শুভদৃষ্টি পাওয়ার লক্ষণ।

লগ্ন থেকে চতুর্থ ঘরে যাঁর রবি থাকে তাঁর বিদ্যার্জ্জন মোটামুটী ভালই হয় এবং ঐ সঙ্গে নবম বা ভাগ্যস্থান যদি

কাল থাকে তাঁর আরো উচ্চশিক্ষা এবং শিক্ষার কারণে বিদেশ ভ্রমণ প্রভৃতি হয়। লগ্ন থেকে চতুর্থ ঘরে রবি প্রায়ই উচ্চাশা প্রদান করে এবং সাফল্যও দেয়। এই সব জাতকেরা প্রায়ই শেষজীবনে সম্মানলাভ, জনপ্রিয়তা প্রভৃতি এমন কি ইলেকশনেও সহজে জয়লাভ করে। যদি মঙ্গলের সুদৃষ্টি পায়, চতুর্থে রবি ভূসম্পত্তির অধিকারী হতে সাহায্য করে, তেমনি কুদৃষ্টি পেলে তাও খোয়া যায়। শুক্র যদি সুদৃষ্টি দেন—কলাবিদ্যায় নিপুণ ও গাড়ী ঘোড়া, আসবাব পত্র, জহরৎ প্রভৃতির মালিক হয় সে। অতিজাতার দেখা গেছে, বহু গ্রহদৃষ্টির এই যোগ বর্তমান। চন্দ্র যদি সুদৃষ্টি দেয়, মাতৃসুখ দীর্ঘকাল বর্তমান থাকে, অন্যথায় মাতৃসুখ বিনষ্টের সম্ভাবনা। শনির সুদৃষ্টি জাতককে ধনি বা ধনিজ পদার্থে লাভবান হতে সাহায্য করে, কিন্তু শনির অশুভদৃষ্টি থাকলে জাতক সারাজীবন ব্যাধিগ্রস্ত ও নানা অসুবিধায় অসুখী হন। কোনদিনই তাঁর কোন কাজ সুশৃঙ্খলে বা বিনা বিঘ্নে সম্পূর্ণ হয় না। আসছে বারে পঞ্চম ও ষষ্ঠ রবিস্থিতি বলার ইচ্ছা রইলো।

——

মাঘ মাসের রাশিফল

মেষ রাশি

অশ্বিনী জাত ব্যক্তিং মধ্যবয়স। অর্থব্যয় কুটুম্ববিবাদ স্বজনহানি প্রভৃতি। কটুবাক্য প্রয়োগে বিপত্তি। ভরণীর স্বাস্থ্যহানি, স্থানান্তর গমন, দন্তপীড়া, মাসের মাঝামাঝি সময় কিঞ্চিৎ শুভ। কৃত্তিকার নানা প্রকারের বিপদ। ২২শে তারিখের পর থেকে কিছুটা বিঘ্নের উপশম ও উন্নতি। সাংসারিক ব্যাপারে শুভ। মাসের প্রথমে আর্থিক ব্যাপারে প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা।

বৃষ রাশি

কৃত্তিকার মাঘের প্রথম সপ্তাহের দিকে প্রচুর উন্নতি পদবৃদ্ধির সম্ভাবনা। রোহিণী নক্ষত্রের মাসের প্রারম্ভে নানা সুখ। ২২ তারিখের পর ভাগ্যবৃদ্ধি। মাসের শেষদিকে সন্ততি পীড়ায় উদ্বেগ। মৃগশিরার ভোগসুখ, মাসের শেষদিকে ধনবৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মস্থলে উন্নতির সূচনা। ২০ তারিখে কোন সুখবরপ্রাপ্তির আশা। সন্তানের উন্নতিতে বিঘ্ন প্রভৃতি।

মিথুন রাশি

মৃগশিরা নক্ষত্রের ব্যয়বৃদ্ধি, ক্ষতি, অনিদ্রা ও অস্থিরতা। আর্দ্রা নক্ষত্রের বিলাস ব্যসনে ব্যয়। বড় মানুষীয়ানায় ক্লেশ ও বিপদ্। পুনর্বসুর মাসের শেষ দিকে শুভ। নানা কাজকর্মের চেষ্টা ও আংশিক সাফল্য। সামাজিকতায় সম্মান বৃদ্ধি। স্ত্রীর দ্বারা সাংসারিক পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি। নানা প্রকারে আনন্দ প্রাপ্তি, মানসিক সুখ প্রভৃতি।

কর্কট রাশি

পুনর্বসুর মাসের শেষ দিকে সাংসারিক উন্নতি ও শৃঙ্খলা। কিন্তু রোগ ভোগের সম্ভাবনা দেখা যায়। পুষ্যার নানা প্রকার বিঘ্ন। ৫৩।৫৪ বছর বয়সের ব্যক্তিদের আকস্মিক অসুস্থতা। ৭।৮।৯ প্রভৃতি তারিখগুলিতে নানা প্রকারে ভয়। অশ্লেষার পত্নীপীড়া, ধনহানি। সন্ততি-সুখ। পারিবারিক কলহে অশান্তির অভাব পাওয়া যায়।

সিংহ রাশি

মঘা নক্ষত্রের মাসের প্রথম সপ্তাহে যশঃপ্রাপ্তি, লাভ, প্রতিযোগিতায় সম্মান বৃদ্ধি প্রভৃতির সম্ভাবনা। পূর্ব-ফল্গুনীর মাসের প্রথমার্দ্ধে মন্তব্যলে সন্তান লাভ। সুখবৃদ্ধি—মন্তব্যলে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সুবিধা। উত্তর-ফল্গুনীর ধনবৃদ্ধি, প্রতিযোগিতায় সাফল্য। চাকুরীতে সুনাম ও উর্দ্ধতন কর্মকর্তার প্রীতি ও অনুগ্রহলাভ।

কন্যা রাশি

উত্তরফল্গুনীর পুত্র প্রীতি ও সুখ। কিঞ্চিৎ ধনহানির সম্ভাবনা। হস্তার মাসের প্রথমে সুনাম বৃদ্ধি ও নানা প্রকারে আনন্দ লাভ। ভ্রমণাদি সুখ ঘটারও আভাষ দেখা যায়। চিত্রার দুর্বুদ্ধির কারণে শারীরিক ক্ষতি-বৃদ্ধি। মামলা মোকদ্দমায় জেল বৃদ্ধি হতে পারে। পথে কোন প্রকার দুর্ঘটনা ঘটারও ইঙ্গিত আছে।

তুলা রাশি

চিত্রার ছোটখাট ভ্রমণে বিঘ্ন ও বাধা। স্বাস্থ্যহানি। ভাগ্যহানির ভীতি। পুত্রকন্যার উন্নতি। স্ত্রীর কারণে পারিবারিক বিশৃঙ্খলা। স্বাতীর রক্তপাত, স্ত্রীর শারীরিক ক্লেশ। ব্যবসায় বুদ্ধিতে লোকসানের ভীতি—পদবৃদ্ধির

আশায় বাধা। বিশাখার নানা প্রকারে উন্নতি। পুত্র কন্যার বিদ্যার্জনে সুযোগ সুবিধা। ধননিয়োগে বিলম্ব ও বিপরীতভাব।

বৃশ্চিক রাশি

বিশাখার নানা প্রকার পরিবর্ত্তনচিন্তায় উদ্বিগ্নতা। মানসিক স্থৈর্য্যাভাব। জ্যেষ্ঠার লাভ, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য। পত্নী প্রীতি ও তৎকারণে প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির আভাব। অনুরাধার গৃহপ্রতিষ্ঠা, সাংসারিক শৃঙ্খলা, পারিবারিক প্রীতি, সামাজিক মর্য্যাদাবৃদ্ধি, কর্ম্মস্থানে উন্নতি। মাসের শেষের দিকে সামান্য শরীর ক্লেশ, কুটুম্ববৃদ্ধির সম্ভাবনা।

ধনু রাশি

মূলার ব্যবসায় নিয়োগের ইচ্ছা। কর্ম্মস্থানে গুপ্ত-শত্রুতার ইঙ্গিত। ক্ষতিকারক কার্য্যে প্রবৃত্তি। পূর্ব্বাষাঢ়ার মানসিক সুখ, ধনবৃদ্ধি, ভাগ্যবলের উল্লেখ। কন্যার সম্বন্ধে সুসংবাদ, নানা প্রতিভার বিকাশ। উত্তরাষাঢ়ার পদবৃদ্ধি, ভাগ্যবলে ধন প্রাপ্তির সম্ভাবনা, সঙ্কল্পের স্পৃহা ও কিঞ্চিৎ সাফল্য, কুটুম্ববৃদ্ধি।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ়ার নানা অসুবিধা। কর্ম্মস্থলে অপবাদ ও অপ্রীতি। পত্নীর স্বাস্থ্যক্লেশ। শ্রবণার ভূসম্পত্তির কারণে দুশ্চিন্তা ও কলহ। মাসের প্রথমে সন্তান পীড়া, প্রণয়ে বিঘ্ন। ধনিষ্ঠার বিদেশ যাত্রায় বিঘ্ন, পরিকল্পনায় পশ্চাদপসরণ। ধন সঙ্কল্পে সঙ্কল্প। লাভ হবার নিশ্চিত সম্ভাবনায় আশাহীন হওয়ার ভীতি ও উদ্বেগ।

কুম্ভ রাশি

ধনিষ্ঠার দুর্ঘটনা। আরব্ধ কর্ম্ম শেষ হতে বিলম্ব। ১৩ তারিখে নানাপ্রকার উদ্বেগ ও পরিশ্রমে ব্যর্থ মনোরথ। শতভিষার শুভ। সাংসারিক শৃঙ্খলা, পদমর্য্যাদা লাভের আশা—গৃহসুখ বৃদ্ধির আশা। পূর্ব্বভাদ্রপদের স্ত্রীর কারণে সামাজিক মর্য্যাদা-বোধ বৃদ্ধি। সামান্য লাভের আশা। চিঠিপত্রে সুসংবাদের সম্ভাবনা।

মীন রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদের ছোটখাট ভ্রমণের দ্বারা কিছু ধন লাভ। সহজে ও সুশৃঙ্খলে প্রায় অধিকাংশ কর্ম্মসম্পন্ন। কিঞ্চিৎ সঙ্কল্পের আশা। উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের শুভকার্য্যে দান ও ব্যয় বৃদ্ধি। পত্নী ও গৃহসুখ, কর্ম্মে দায়িত্ববৃদ্ধি বা পদোন্নতি। রেবতীর লাভ, ব্যবসা বৃদ্ধি। নিকটস্থ আত্মীয়ের দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। সর্ব্ব প্রকারের কর্ম্মেই সাফল্য ও জনপ্রিয়তা।

দ্বাদশ লগ্নের ফলাফল

মেষ :

নানা প্রকারের চিন্তা এ মাসে আপনাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে। সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত থাকলে যা করার নয়, সেই প্রকারের দায়িত্ব নিতে হবে। ধনলাভ মধ্যম-প্রকার। পত্নীসুখ বৃদ্ধি পাবে। উন্নতির সম্ভাবনা আছে। সকলে কিন্তু বিঘ্ন দেখা যাচ্ছে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা-ভগিনীর উন্নতি হতে পারে। পেশাজীবীদের শুভ—ব্যবসায়ীদের মধ্যম। যানবাহন ও দাহ্য পদার্থ ব্যবসায়ীদের অশুভ। স্ত্রীলোকদের দন্তব স্থলে গর্ভসঞ্চার ও আর্ত্তবপীড়া।

বৃষ :

বিলাস ব্যসন, আহার বিহারে একটু বাড়াবাড়ি দেখা দেবে—ফলে শারীরিক ক্লেশ দেখা দিতে পারে। কাজ কর্ম্মের জন্য কিছু কিছু ভ্রমণ দেখা যায়। পদ বৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা দেখা যায়। এমাসে কিছু সঙ্কল্পের আশা আছে। চাকুরে মেয়েরা উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের সুনজরে পড়ে গুছিয়ে নিতে পারেন। পেশাজীবীদের কাজ বাড়বে, কিন্তু তাদের অর্থাগম হবে না। ডাক্তারেরা বিচিত্র প্রকারের রোগ ও রুগীর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করবেন—বিশেষকরে সন্তান-চিকিৎসার ব্যাপারে। ব্যবসায়ীদের মধ্যম ফল ও উদ্বেগ।

মিথুন :

প্রথমের দিকে শরীরটা একটু খারাপ যেতে পারে, পরে ঠিক হয়ে যাবে। অদ্ভুত ও উদ্ভট সব খরচের কেরে পড়ে মানসিক স্থৈর্য্য নষ্ট হবে। মাসের মাঝামাঝি ছোট ভাই-ভগিনীদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। আসবাবপত্র কেনার ব্যাপারে প্রীতি বাড়বে। পত্নীর সহযোগিতায় আনন্দ পাবেন, কিন্তু কোন না কোন কারণে পরিপূর্ণ মানসিক শান্তি পাবেন না। চাকুরে মেয়েদের মোটামুটি ফল। অনূঢ়াদের যাঁরা বোধেশেখে কিম্বা ভাদ্রে কিম্বা পৌষে জন্মেছেন তাদের বিয়ের সম্ভাবনা। পেশাজীবী বা ব্যবসায়ীদের তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।

কর্কট :

২০ তারিখে শারীরিক কোন বিপদ ঘটার সম্ভাবনা। তাই ভঙ্গে সতর্ক থাকা উচিত। বিশেষ কোরে যাঁরা কৃষ্ণ পক্ষে জন্মেছেন এবং জন্মকালীন রাহু যাঁদের অশুভ ফলদাতা। সাংসারিক সুখ ও আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা এ মাসে দেখা যায়। মাসের প্রথমে ২০ তারিখের মধ্যে ব্যবসায়ীদের সামান্য লাভ যোগ। লাভ অর্থে এখানে বিনা আয়াসে অর্থাৎ সহজে লাভ। মেয়েদের বিবাহ সম্ভব। চাকুরে মেয়েরা চরিত্রে অপবাদ পেতে পারেন। কর্মে উন্নতি হবে। পেশাজীবীরা সম্মান ও অর্থ দুই-ই পেতে পারেন।

সিংহ :

উন্নতির আশা হঠাৎ আটকে গিয়ে পেছিয়ে যেতে পারে। ১৭ই কিছু লোকসান হয়ে যেতে পারে। ২০শে কোন প্রতিযোগীর কাছে হেরে গিয়ে মনঃকষ্ট পেতে পারেন। যদি ভাদ্র মাসের অমাবস্যায় জন্মে থাকেন—কোথাও যাবার সময় কোন দুর্ঘটনার পথে আটকে যেতে পারেন। ভাগ্যবল আপনাকে বারবার প্রবঞ্চিত করবে। স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। অনূঢ়া যাঁরা ভাদ্র বা পৌষের অমাবস্যায় জন্মেছেন তাদের বিয়ের সম্ভাবনা দেখা যায়। পেশাজীবীদের ও ব্যবসায়ীদের শুভ। যাঁদের বাড়ী ভাড়া খাটে, তাঁরা কিন্তু ভাল ফল পাবেন না।

কন্যা :

আশ্বিনের অমাবস্যায় জন্মে থাকলে রোগ ভোগের আশঙ্কা দেখা যায়। কিন্তু তাতে ভয়ের কোন কারণ নেই। নবমে রাহু বিয়ের সৃষ্টি করলেও একেবারে অসাধ্য দেবে না। কিছু কিছু শত্রুতা দেখা দেবে। ছেলে মেয়েরা বাধ্য ও বিনীত ব্যবহার করবে। অনূঢ়াদের বিয়ের যোগ তেমন জোরালো নয়। চাকুরে মেয়েরা সহকর্মীদের সহানুভূতি ও হৃদ্যতায় আকৃষ্ট হবেন। পেশাজীবীদের তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। ব্যবসায়ীরা হাত গুটিয়ে নিস্পৃহ হয়ে থাকবেন। অথবা অর্থনিয়োগে আশঙ্কিত হবেন।

তুলা :

বিলাসদ্রব্য, বস্ত্র প্রভৃতির ব্যবসায়ীরা বেশ দু'পয়সা কামাবার সুযোগ পাবেন। অপরদিকে অন্য ব্যবসায়ীদের ধনাগম ও নিয়োজিত অর্থ আটক হয়ে থাকার সম্ভাবনা। সহধর্মিণী এমাসে সহকর্মিণীর মত নানা বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করবে। ইমারতের জিনিষ পত্রের ব্যবসা যাঁরা করেন, তাঁরা শঙ্কিত হবেন। ছেলে মেয়েরা (যদি রাহু অশুভ ফলদায়ী হয়) দুর্বিনীত ব্যবহারে আপনাকে নাজেহাল করবে। চাকুরে মেয়েরা পদস্থ কর্মচারীদের কাছে নিজেদের উন্নতির ভবিষ্য ও মেলামেশার সুযোগ পাবেন। ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী উভয়েরই শুভ। অনুচারী যারা কার্তিকে জন্মেছেন, তারা বিয়ের পিঁড়িতে বসার সুযোগ পেতে পারেন।

বৃশ্চিক :

এ মাসে নানা ব্যাপারে পরিবর্তন হতে পারে। যাঁরা ভাড়া বাড়ীতে বাস করেন, তাঁদের বাড়ীওয়ালার সঙ্গে মনান্তর ও মতান্তর দুই-ই হতে পারে। কাজকর্মের পরিবর্তন হওয়া অস্বাভাবিক নয়, বিশেষ করে যাদের বদলীর চাকরী। স্ত্রীর সঙ্গে নানা ব্যাপারে কথা কাটাকাটি হবার ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। শরীরও আপনার তেমন ভাল যাবে না। চাকুরে মেয়েদের মধ্যমফল। অনূঢ়াদের বিয়ের যোগ তেমন দেখা যায় না। ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।

ধনু :

গত মাসের চেয়ে এ মাসটা ভাল যাবে। মাঝে মাঝে শরীরটা গণ্ডগোল করবে। ধনলাভ হবে—সকল স্পৃহা বাড়বে। চাকুরে হলে ভাগ্যবলে পদোন্নতি করে নিতে পারেন। কর্মের ব্যাপারে শত্রুতার আভাষ আছে, কিন্তু তা কার্যকর হবে না। কনিষ্ঠ ভ্রাতা-ভগিনীর উন্নতির সংবাদ পাবেন। চিঠিপত্রের জবাব তাড়াতাড়ি পাবেন। অনূঢ়াদের বিবাহ হবার যোগাযোগ আছে। চাকুরে মেয়েরা উচ্চপদস্থ কর্মীদের সঙ্গে মেলামেশায় নিজের কাজ গুছিয়ে নিতে পারেন—কেউ কেউ ঘুটঘিতা করে বসতে পারেন। পেশাজীবীরা মধ্যম সম্মান ও উত্তম অর্থলাভ করবেন। ব্যবসায়ীদের মধ্যম ফল।

মকর :

সকলে প্রবৃত্তি হবে। ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা বাড়বে। মিতব্যয়িতার ঝোঁক দেখা দেবে। এ মাসে কোন কুটুম্বের আগমন ঘটবে সংসারে। আপনার নিজের রক্তচাপের

আধিক্য দেখা দেবে। স্ত্রীর শরীর মোটামুটি মন্দ যাবে না। ছেলেমেয়েদের জন্যে ব্যয়বৃদ্ধি হবে। সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি হবে। প্রতিযোগিতায় জয় লাভের আশা নেই। মেয়েদের মধ্যমফল। চাকুরে মেয়েদের তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য নেই। পেশাজীবীদের আয় অস্থির। ব্যবসায়ীদের দুশ্চিন্তা।

কুম্ভ :

শরীর ভালই যাবে। আত্মসুখের জন্য ব্যয়বৃদ্ধি হবে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সমভিব্যাহারে কোথাও বেড়াতে যাবার পরিকল্পনা দেখা দিতে পারে। সন্তবস্থলে ভ্রমণের সময় অনূঢ়া কন্যার জন্য পাত্রের সমস্যা মিটে যেতে পারে। বিদেশে অগ্নিভয়ে ভীত হতে পারেন। চাকুরে ব্যক্তি ও মেয়েরা অকস্মাৎ কোন সুসংবাদ পেয়ে খুশি হবেন। অনূঢ়াদের বিয়ের সম্ভাবনা। পেশাজীবী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যম ফল।

মীন :

ভ্রাতা-ভগিনীর জন্য ব্যয় হবে। পরীক্ষায় বা কর্মে কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠারা সাফল্য অর্জন করবে। সুনাম অর্জন করবেন। স্ত্রীলোক কুটুম্বেরা সাহায্য করবে। শরীর ভালই যাবে। শরীর কখনও কখনও একটু আধটু খারাপ যেতে পারে। পুত্র-কন্যারা সাফল্য লাভ করবে। চাকুরীতে পদোন্নতি বাধাগ্রস্ত হবে, কিম্বা দূষিত থাকবে নানা ওজর আপত্তিতে। স্ত্রীলোকদের সুনাম হবে, পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করবেন। ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ, আষাঢ় প্রভৃতি মাসে জন্মেছেন যে অনূঢ়ারা তাঁদের এ মাসে কনে-চন্দন আঁকার আশা আছে। পেশাজীবীদের মধ্যম প্রকারের ফল। ব্যবসায়ীদের সমান লাভ।

——

কোষ্ঠীর বিচার

জ্যোতি বাচস্পতি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এই আত্মকারক বা ভাগ্য-নিয়ন্তা বা Ruling Planet নিয়ে আমি অনেক পরীক্ষা করেছি, তাতে আমার যা ধারণা হয়েছে তা নীচে লিখছি।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা এই যে, যে কোন গ্রহ স্থিতি দ্বারা বা প্রেক্ষা দ্বারা যে কোন ক্ষেত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ করে সেই গ্রহই আত্মকারক। এ্যালেন লিও লিখেছেন, "লগ্নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রেক্ষা যে গ্রহের তারও গুরুত্ব আছে।" শুধু লগ্নের সঙ্গে নয়—লগ্ন, দশম, সপ্তম, চতুর্থ—যে কোন কেন্দ্র-বিন্দুর সঙ্গে যে গ্রহ ঘনিষ্ঠ প্রেক্ষা করে, তারই প্রভাব জাতকের জীবনে খুব বেশী অভিব্যক্ত হয়ে থাকে।

যেখানে চার পাঁচটি গ্রহ স্থিতি বা প্রেক্ষার দ্বারা একই কেন্দ্র বা ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রেক্ষা করে, সেখানে প্রথম শিক্ষার্থীর একটু গোলমাল ঠেকতে পারে। বিশেষ ক'রে যেখানে তিন ভিন্ন প্রেক্ষা দিয়ে অনেকগুলি গ্রহ ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ করে সে ক্ষেত্রে কোন্ গ্রহের প্রেক্ষা সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ তা ঠিক করা একটু কঠিন হয়; কিন্তু যদি প্রত্যেক প্রেক্ষার দীপ্তাংশ জানা থাকে তাহ'লে সামান্য একটু অনুপাত কষলেই, কোন্ গ্রহের প্রেক্ষা সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ তা নির্ণয় করা মোটেই দুঃসাধ্য হবে না। ভবিষ্যতে উদাহরণ দিয়ে আত্মকারকের এই ব্যাপারটি বিশদ করবার ইচ্ছা রইল।

কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয়

কোষ্ঠীর বিচার শেখবার আগে এমন কতকগুলি বিষয় জানা চাই, যা না জানলে কোষ্ঠীর বিচার কোন মতেই ভাল ক'রে করা যাবে না। রাশি, গ্রহ এবং নক্ষত্রের মধ্যে কি সম্বন্ধ আছে তার কতক কতক আগে বলা হয়েছে, এখানে আর কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ের কথা বলব।

পাশ্চাত্য জ্যোতিষগ্রন্থগুলিতে গ্রহ ও রাশিগুলি প্রতিরূপক দিয়ে দেখান হয়—এই প্রতিরূপকের ব্যবহারে অনেক হিসাবে খুব সুবিধা-জনক। নীচে প্রত্যেক গ্রহ ও রাশির প্রতিরূপক দেওয়া গেল :—

গ্রহ	প্রতিরূপক
রবি	☉
চন্দ্র	☽
মঙ্গল	♂
বুধ	☿
বৃহস্পতি	♃
শুক্র	♀
শনি	♄
রাহু	☊
কেতু	☋
প্রজাপতি (Uranus)	♅
বরুণ (Neptune)	♆
রুদ্র (Pluto)	♇

প্রাচ্য রীতিতে প্রত্যেক গ্রহের নামের আদ্যক্ষর দিয়ে নির্দেশ করতে হয়। যেমন রবির জায়গায় "র" মঙ্গলের জায়গায় "ম" বরুণের জায়গায় "ব" রুদ্রের জায়গায় "রু" ইত্যাদি।

রাশি	প্রতিরূপক
মেষ	♈
বৃষ	♉
মিথুন	♊
কর্কট	♋
সিংহ	♌
কন্যা	♍
তুলা	♎
বৃশ্চিক	♏
ধনু	♐
মকর	♑
কুম্ভ	♒
মীন	♓

প্রাচ্য রীতিতে লেখার মধ্যে রাশি বোঝবার জন্য কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করবার প্রথা নেই, কিন্তু স্পষ্ট লেখবার সময়, অঙ্ক দিয়ে রাশি বোঝানো হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বুধ মেষের ২৩ অংশ ৩১ কলায় আছে। এটা যদি পাশ্চাত্য মতে লিখে দেখান হয়; তাহলে লিখতে হবে ☿ ২৩° ৩১', এবং প্রাচ্য মতে লিখতে গেলে, লিখতে হবে—বু ০।২৩।৩১, এর মানে এই যে, বুধ রাশি চক্রের গোড়া থেকে ০ রাশি ২৩ অংশ ৩১ কলা দূরে আছে এ কথা আগেই বলা হয়েছে।

ফলিত জ্যোতিষে রাশি ও গ্রহের অর্থ

রাশি, নক্ষত্র, গ্রহ ও ভাবের গাণিতিক ধারণা কি, এবং গ্রহ ও ভাবের সংস্থান কি করে লিপিবদ্ধ করা হয় তা জানবার পর, ফলিত জ্যোতিষের দিক থেকে এদের অর্থ বা সার্থকতা কি তা বোঝা প্রয়োজন। কিন্তু তা বুঝতে হলে, গোড়াতে আমরা কি এবং পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্বের ব্যাপারটাই বা কি, তা একটু তলিয়ে বুঝে নেখতে হবে।

পৃথিবীকে বাইরের দিক থেকে দেখলে, তার মধ্যে দুটি জিনিষ পাওয়া যায়, এক জড় পদার্থ আর এক জড় শক্তি; এবং বাইরে দুটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়াও আমাদের নজরে পড়ে, এক সৃষ্টি আর এক ধ্বংস। চৈতন্যের সঙ্গে বাহ্য জগতের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কতকগুলি ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি হয় ও প্রত্যেকের নিজস্ব—এই অনুভূতিগুলিকেই নিয়েই তার নিজের অন্তর্জগৎ। অনুভূতিগুলি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে। (১) দুঃখকর (২) সুখকর; এই দু'রকম অনুভূতি ছাড়াও আর এক রকমের অনুভূতি পাওয়া যায়, যাকে দুঃখকর বা সুখকর কিছুই বলা যায় না, যা শান্ত সাম্যভাব বলে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ফলিত জ্যোতিষে, সাধারণতঃ রাশিগুলি নির্দেশ করে বহির্জগৎ বা জড় পদার্থ ও জড় শক্তিকে, আর গ্রহগুলি অন্তর্জগৎ বা অনুভূতিগুলিকে। রাশি এবং গ্রহ এ উভয়ের সঙ্গেই সৃষ্টি ও ধ্বংস বা উৎপত্তি ও বিলয়ের সম্বন্ধ আছে।

রাশি ও তত্ত্ব—

বহির্জগতে জড় পদার্থের চারটি অবস্থা দেখতে পাওয়া যায় এবং সেই হিসাবে তাদের কঠিন, তরল, বায়বীয় ও বৈদ্যুতিক আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। ফলিত জ্যোতিষে জড় পদার্থের এই চার রকম অবস্থাকে যথাক্রমে পৃথ্বী, জল

বায়ু ও অগ্নি এই চার তত্ত্ব বলে উল্লেখ করা হয়। তত্ত্ব বলতে বোঝায় সেই বস্তুর ভাব—অর্থাৎ পৃথ্বী শব্দের অর্থ এখানে পৃথিবী বা মাটি নয়, তার অর্থ হচ্ছে পৃথ্বী বা ভাব অর্থাৎ কাঠিন্য। তেমনি জল মানে তারল্য, বায়ু মানে বায়বীয়তা এবং অগ্নি মানে তেজোময়তা।

জড় পদার্থের এই চার অবস্থার মধ্যে তেজোময়তাই হচ্ছে সূক্ষ্মতম, বায়বীয়তা, তারল্য ও কাঠিন্য পর পর ক্রমশঃ স্থূলতর অবস্থা, ফলিত জ্যোতিষে বারটি রাশিকে জড় পদার্থের এই চারিটি অবস্থা ভেদে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে, যথা:—

মেষ, সিংহ ও ধনু অগ্নি বা তেজোময়তা জ্ঞাপক
বৃষ, কন্যা ও মকর পৃথ্বী বা কাঠিন্য জ্ঞাপক
মিথুন, তুলা ও কুম্ভ বায়ু ও বায়বীয়তা জ্ঞাপক
কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন জল বা তারল্য জ্ঞাপক

রাশি ও শক্তি—

জড় পদার্থের যেমন চারটি অবস্থা, জড়শক্তির অবস্থা তেমনি তিনটি (১) ক্রিয়াশীল (২) সুপ্ত বা অব্যক্ত (৩) মিশ্র বা পূর্ণ ক্রিয়াশীলও নয় এবং একেবারে সুপ্তও নয়। প্রত্যেক জড় পদার্থ এই তিন রকম শক্তির একটি না একটিকে আশ্রয় করে আছে। সেই হিসাবে ফলিত জ্যোতিষে রাশিগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করে নাম দেওয়া হয়েছে চর, স্থির ও দ্বিস্বভাব বা ঘাত্মক, যথা—

মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর চর বা ক্রিয়াশীল
বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ স্থির বা সুপ্ত
মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীন মিশ্র বা দ্বিস্বভাব

এখন আমরা যদি মেষ থেকে বরাবর গুণে যাই, তাহলে পদার্থ অনুসারে রাশিগুলি যথাক্রমে অগ্নি, পৃথ্বী, বায়ু, জল এবং শক্তি অনুসারে চর, স্থির, দ্বিস্বভাব পরপর এইভাবে পাব। অর্থাৎ মেষ হবে অগ্নি, বৃষ হবে পৃথ্বী, মিথুন হবে বায়ু, কর্কট হবে জল, ফের সিংহ হবে অগ্নি, কন্যা হবে পৃথ্বী এই রকম চলবে মীন পর্যন্ত। তেমনি আবার মেষ হবে চর, বৃষ হবে স্থির, মিথুন হবে দ্বিস্বভাব, ফের কর্কট চর, সিংহ স্থির ইত্যাদি।

সৃষ্টি প্রলয় এবং রাশি—

উপরে যে চার রকম পদার্থ বা তত্ত্বের কথা বলা হল, তার মধ্যে অগ্নি ও জল মুখ্যতঃ সৃষ্টি-জ্ঞাপক কেন না, উত্তাপ ও আর্দ্রতা ভিন্ন কোন রকমের জীব-সৃষ্টি সম্ভব নয়; এবং পৃথ্বী ও বায়ু প্রধানতঃ ধ্বংস-জ্ঞাপক কেন না, কঠিন পদার্থের উপর কোন জৈব সৃষ্টি অসম্ভব এবং বায়ুর ধর্ম, শোষণ বা জীব ধ্বংসের প্রধান কারণ।* দু'রকম সৃষ্টি কারক পদার্থের মধ্যে অগ্নির কাজ প্রত্যক্ষ এবং জলের কাজ পরোক্ষ। জল বা আর্দ্র ক্ষেত্রের উপর উত্তাপ ও আলোক প্রত্যক্ষভাবে জীবের সৃষ্টি করে। তেমনি ধ্বংসকারক পদার্থ দুটির মধ্যে বায়ুর কাজ প্রত্যক্ষ এবং পৃথিবীর কাজ পরোক্ষ। বায়ু শোষণ দ্বারা প্রত্যক্ষ-ভাবে ধ্বংস করে, পৃথ্বী কাঠিন্যের দ্বারা তার নিজের উপর জীব সৃষ্টিতে বাধা দেয়। জ্যোতির্বিদেরা এই প্রত্যক্ষ রাশিগুলির ওজ, বিষম, পুরুষ, দিবা প্রভৃতি নাম দিয়েছেন আর পরোক্ষ রাশিগুলিকে আখ্যাত করেছেন যুগ্ম, সম, স্ত্রী, রাত্রি প্রভৃতি নামে। অতএব রাশির শ্রেণী বিভাগ—

(১) মেষ, সিংহ, ধনু এই তিনটি রাশি অগ্নিরাশি বলে এরা সৃষ্টি জ্ঞাপক এবং প্রত্যক্ষ, ওজ বা বিষম রাশি।

(২) কর্কট, বৃশ্চিক, মীন এই তিনটি রাশি জলরাশি বলে এরাও সৃষ্টি জ্ঞাপক কিন্তু পরোক্ষ, যুগ্ম বা সমরাশি।

(৩) তুলা, কুম্ভ, মিথুন এই তিনটি রাশি বায়ুরাশি বলে এরা ধ্বংস জ্ঞাপক এবং প্রত্যক্ষ, ওজ বা বিষমরাশি।

(৪) মকর, বৃষ, কন্যা এই তিনটি রাশি পৃথ্বীরাশি বলে এরাও ধ্বংস জ্ঞাপক কিন্তু পরোক্ষ, যুগ্ম বা সমরাশি।

যদি রাশি চক্রটি লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, সৃষ্টি কারক এবং ধ্বংসকারক রাশিগুলি পরস্পরের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত। অর্থাৎ পরস্পর থেকে সপ্তমস্থ রাশির একটি হবে সৃষ্টি কারক আর একটি ধ্বংস কারক। প্রত্যক্ষ সৃষ্টি কারক রাশির বিপরীত রাশিটী হবে প্রত্যক্ষ ধ্বংস কারক এবং পরোক্ষ সৃষ্টি জ্ঞাপক রাশির বিপরীত পরোক্ষ ধ্বংস জ্ঞাপক। পরস্পরের বিপরীত রাশিগুলিকে এক এক জোড়া করে যদি সাজানো যায় তাহলে এই রকম হবে—

(১) মেষ—প্রত্যক্ষ, সৃষ্টি জ্ঞাপক, অগ্নি, চর
তুলা—প্রত্যক্ষ, ধ্বংস জ্ঞাপক, বায়ু, চর

---

* এই ব্যাপারের বিস্তৃত ব্যাখ্যা মৎপ্রণীত "ফলিত জ্যোতিষের মূলসূত্রে" দেওয়া হয়েছে।

(২) বৃষ—পরোক্ষ, ধ্বংস জ্ঞাপক, পৃথ্বী, স্থির
বৃশ্চিক—পরোক্ষ, সৃষ্টি জ্ঞাপক, জল, স্থির

(৩) মিথুন—প্রত্যক্ষ, ধ্বংস জ্ঞাপক, বায়ু, দ্বিস্বভাব
ধনু—প্রত্যক্ষ, সৃষ্টি জ্ঞাপক, অগ্নি, দ্বিস্বভাব

(৪) কর্কট—পরোক্ষ, সৃষ্টি জ্ঞাপক, জল, চর
মকর—পরোক্ষ, ধ্বংস জ্ঞাপক, পৃথ্বী, চর

(৫) সিংহ—প্রত্যক্ষ, সৃষ্টি জ্ঞাপক, অগ্নি, স্থির
কুম্ভ—প্রত্যক্ষ, ধ্বংস জ্ঞাপক, বায়ু, স্থির

(৬) কন্যা—পরোক্ষ, ধ্বংস জ্ঞাপক, পৃথ্বী, দ্বিস্বভাব
মীন—পরোক্ষ, সৃষ্টি জ্ঞাপক, জল, দ্বিস্বভাব

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যে কোন প্রত্যক্ষ রাশির বিপরীতে (অর্থাৎ সপ্তম) রাশিও প্রত্যক্ষ এবং যে কোন পরোক্ষ রাশির বিপরীত (অর্থাৎ সপ্তম) রাশিও পরোক্ষ।

অগ্নি রাশির বিপরীত রাশি বায়ু এবং পৃথ্বী রাশির বিপরীত রাশি জল। তাছাড়া চর রাশির বিপরীত রাশি চর, স্থিরের বিপরীত স্থির এবং দ্বিস্বভাবের বিপরীত দ্বিস্বভাব। অর্থাৎ গুণ হিসাবে পরস্পরের বিপরীত রাশি বিষম ধর্মী কিন্তু ক্রিয়া হিসাবে পরস্পরের বিপরীত রাশি সমান ধর্মী। (ক্রমশঃ

খোলা জানালার ওধারে

হাসিরাশি দেবী

এখনি ক'রোনা বন্ধ ওদিকের ঐ জানালাটা,
যেদিকের খোলা পথে আলোর স্তম্ভটা দেখা যায়,—
আলোর ছায়ায় মিশে একধারে র'য়েছে দাঁড়িয়ে
কঠিন কংক্রিটে-গাঁথা ; এ পাশে ও পাশে বাউ বন,—
পাতা আর ডাল নেড়ে ফেলে দীর্ঘশ্বাস
সমুদ্রের স্বপ্ন ব'য়ে ! বহুদূরে তার
যে সমুদ্র গেছে স'রে স'রে
বুকে নিয়ে ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস,—
সে উচ্ছ্বাসে ভাষা নেই। তবু তার অনুভূতি নিয়ে
এখনও স্তম্ভটা আছে ওখানে দাঁড়িয়ে।

ওখানে জ্বলেনা দীপ,
জানায়না কেউ কোনদিন
গোধূলি বেলার শেষে
ধীরে ধীরে এসে এই পথে।
জানায় না মৃদু সম্ভাষণে
উচ্চারি সন্ধ্যার মন্ত্রে
করেনাক' কল্যাণ কামনা
আগামী রাত্রির !
মঙ্গল শঙ্খের সুরে কল্যাণীরা করেনা বোধন
কোন' শুভ লগনের ! আঁকেনা আলপনা কেউ
ছড়ায়না ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে—পথের দু'পাশে।
তবুও ওদেরই ভাবি। ভাবি ঐ আলোর স্তম্ভটা
কল্পনার মরুতীরে ব'সে
আপন উদ্ধত গর্বে—বিভীষিকাময়
দেখেনাক'—নাম !

এখনি ক'রোনা বন্ধ ওদিকের ঐ জানালাটা
যেখানে আকাশ ছিল নীল,—আর সোনালী রোদ্দুরে
ভরপুর যেদিকে মেঘের দল
ধীরে ধীরে উড়ে চ'লে যেত
পূব থেকে পশ্চিমের পথে.
নামত' জলের ধারা বোশেখের দাবদাহ শেষে !
তবু ঐ মাটি আর বালুকণা আঁকড়ে আঁকড়ে
ও আজও দাঁড়িয়ে আছে
আকাশের দিকে চোখ মেলে।
যদিও সে চোখে দৃষ্টি নাই,—
যদিও সে মুখে নাই ভাষা,—
তবুও অনেক দিন,—অনেক রাতের সাক্ষী—সে-ই,
র'য়ে আছে—কালের খাতায়।

ঋষি-কবি যতীন্দ্রবিমল

ডক্টর শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ এবং নালন্দা রিসার্চ ইন্সটিউটের প্রাক্তন অধ্যক্ষ।

"ঋষি" (ক) ঋষি হলেন তিনিই—যিনি সত্যদ্রষ্টা, সত্যকে সাক্ষাৎ ভাবে দর্শন করেন নিজের জীবনে। "কবি" (ক) "কবি" হলেন তিনিই—যিনি সত্য প্রকাশক—সেই সত্যকে মধুর ভাবে প্রকাশ করেন নিজের রচনায়। আমাদের সকলের পরমাদরের ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ছিলেন একই ভাবে "ঋষি" এবং "কবি" একাধারে।

কি সত্য তিনি আজীবন দর্শন এবং প্রকাশ করিয়াছিলেন? তাহা হইল "মাতৃ-তত্ত্ব"। আজন্ম-মাতৃসাধক যতীন্দ্রবিমল এই মাতৃরূপই সর্বত্রই সর্বদাই দর্শন করিয়াছিলেন; এই মাতৃরূপেই সকলকে পূজা করিয়াছিলেন। পরম জননীর এই প্রিয়তম সন্তান মাতৃনাম উচ্চারণ করিতে করিতেই শেষ নিঃশ্বাসও ত্যাগ করিলেন। কি পূর্ণ, পবিত্র তাঁর জীবন আদ্যোপান্ত!

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ-ডি ডিগ্রিলাভ করিয়া যতীন্দ্রবিমল সুদীর্ঘ ১০ বৎসর কাল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এবং সুবিখ্যাত ইণ্ডিয়া অফিস্ লাইব্রেরীতে কার্য করেন। ১৯৩৮ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিধাতার নির্দেশ আশীর্বাদের ফলে, তিনি বিবাহ করেন পরম বিদুষী, দার্শনিক-প্রবরা, ব্রহ্মবাদিনী ডক্টর রমাকে এবং আরম্ভ হয় তাঁহাদের উভয়ের সম্মিলিত অপূর্ব সারস্বত এবং তপস্যা-সাধনা। এই আদর্শ দম্পতী বিদ্বৎ সমাজে এবং জনসাধারণের নিকট পরম-সমাদরে পরিচিত ছিলেন "বসিষ্ঠ অরুন্ধতী" "যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী" "মণ্ডনমিশ্র উভয়-ভারতী" প্রভৃতি নামে। তাঁহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৯৪৩ সালে স্থাপিত হয় তাঁহাদের সুবিখ্যাত প্রাচ্য-গবেষণাগার 'প্রাচ্য-বাণী'। আজ ইহার গ্রন্থাগার, গ্রন্থ-প্রকাশন বিভাগ, নাট্য-বিভাগ, চতুষ্পাঠী-বিভাগ প্রভৃতি জন সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

ডঃ যতীন্দ্রবিমল ছিলেন ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ প্রাচ্যতত্ত্ব-গবেষক। তাঁহার এক শতাধিক গবেষণা গ্রন্থ সর্বদিক হইতেই সংস্কৃত সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। এরূপে তাঁহার "সংস্কৃত সাহিত্যে নারীর দান" (৭ খণ্ড), "সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানের দান" (৫ খণ্ড), "সংস্কৃতে দূতকাব্য-সংগ্রহ" (৫ খণ্ড), "সংস্কৃত কোষকাব্য সংগ্রহ" (৫ খণ্ড) প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্বোধ্য হস্ত লিখিত পুঁথির ভিত্তিতে বিরচিত হইয়া অমূল্য, মৌলিক গবেষণার আদর্শ দৃষ্টান্ত রূপে বিরাজ করিতেছে।

কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ ডঃ যতীন্দ্রবিমলের অনুপম প্রতিভার শেষ এইখানেই হয় নাই—তাহা অধিকতর সৌন্দর্যে, মাধুর্যে, ঐশ্বর্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল তাঁহার অভিনব সংস্কৃত নাটক, কবিতা এবং সঙ্গীতে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি পঁচিশটি অপূর্ব সংস্কৃত নাটক এবং দ্বিসহস্রাধিক সংস্কৃত কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিয়া সর্বজনবন্দ্য হন। প্রধানতঃ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সাধক-সাধিকার পুণ্য-জীবনী অবলম্বনে, অথচ সম্পূর্ণ নূতন ভাবে, তিনি এই সকল নাটক রচনা করেন—সখা, রাধা, যশোধরা, বিষ্ণুপ্রিয়া, সারদামণি, রামানুজ, হরিদাস, রঘুনাথ, গোরক্ষনাথ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, মহাত্মা গান্ধী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতির পবিত্র জীবন তাঁহার লেখনীতে নূতনভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ইহা ব্যতীত, সম্পূর্ণ আধুনিক বিষয়েও তিনি সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়া অশেষ যশোভাগী হইয়াছিলেন। যেমন, ১৯৫৯ সালে All-India Radio-র আমন্ত্রণে তিনি 'Drama Festival'র জন্য ভারতের নদী-পরিকল্পনা বিষয়ে একটি অভিনব সংস্কৃত নাটক "মহিমময় ভারতম্" রচনা করেন। ইহাতে নদী-মাতৃক ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত যে ভাবে নদ-নদী বিষয়ে পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহা অতি সুললিত সংস্কৃত কবিতা ও সঙ্গীতের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

তাঁহার সংস্কৃত নাটক "মিলন-তীর্থ-ভারতম্"ও যুগে যুগে ঐক্যসাধক ভারতবর্ষের মিলন-প্রচেষ্টার একটি সুন্দর মধুর চিত্র।

ভাষার সারল্য এবং সাবলীলতা, ভাবের গাম্ভীর্য ও নিপুণতা, আঙ্গিকের নৈপুণ্য এবং অভিনবত্ব, কবিতার সৌন্দর্য এবং মধুরতা, সঙ্গীতের ঐশ্বর্য এবং আবেগময়তা ভবে এই সকল আধুনিক সংস্কৃত নাটক সত্যই সংস্কৃত সাহিত্যের এক একটি মণিমঞ্জুষা বিশেষ এবং প্রাচীন সংস্কৃত নাটকসমূহের পাশে স্থান লাভ করিবার যোগ্য। তাঁহার সংস্কৃত কবিতা ও সঙ্গীত সমূহও ভাষার ঝঙ্কার এবং ভাবের ঐশ্বর্যে সুসমৃদ্ধ অপূর্ব সৃষ্টি। সত্যই, নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যকার এবং কবিগণের প্রেরণা উৎসসাধক ছিলেন সর্বজনবন্দ্য ডঃ যতীন্দ্রবিমল আধুনিক যুগেও।

জননী যশোধরা গোপার পুণ্য জীবনী অবলম্বনে যতীন্দ্রবিমল কর্তৃক বিরচিত পালি নাটক "বিশ্ব সুন্দরী পটিবিপ্পনম্" সমগ্র পালি সাহিত্যের একমাত্র নাটক। ১৯৬০ সালে ইহা "প্রাচ্যবাণী" কর্তৃক রেডিওযোগে অভিনীত হইয়া প্রচুর যশ অর্জন করে।

স্বভূমী প্রতিভার যতীন্দ্রবিমল কেবল ভারতের সংস্কৃতিকেই এইভাবে ভারতের সার্বজনীন শ্রেষ্ঠ ভাষা সংস্কৃতের মাধ্যমে সত্য প্রচার করেননি, বিদেশের সংস্কৃতিকেও সেই একই মনোরম ভাবে পরিস্ফুট করিয়া ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা চলে, মহাকবি শেক্সপীয়ারের চতুঃশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 'মার্চেন্ট অফ্ ভেনিস' এবং "ওথেলো" নাটকের এবং শেক্সপীয়ারের সনেটের অতি অপূর্ব সংস্কৃত-রূপায়ন। সম্পূর্ণ বিদেশী ভাবধারাও কিরূপে সংস্কৃতের মাধ্যমে জীবন্ত, অনন্য ভাবে প্রকাশ করা যায় তাহার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত এই নাটকগুলি। সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, এই সংস্কৃত রূপান্তরে মূলের রস ও ক্ষুণ্ণ হয়ই নি, বরং বহুগুণে বর্ধিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শেক্সপীয়ারের নাটকের এই সর্বপ্রথম সংস্কৃত রূপায়ন যে ভারতের নব নাট্যান্দোলন, তথা, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি অনুপম, অভিনব, অমূল্য অবিনশ্বর দান, তাহা নিঃসন্দেহ।

অক্লান্তকর্মী যতীন্দ্রবিমল কেবল এইভাবে সংস্কৃত নাটকাদি রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সেই সঙ্গে জনসাধারণের নিকট তাহা সুবোধ্য ও প্রিয় করিবার জন্যও আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেন। সেজন্য ভারতবর্ষের নানা স্থানে এবং বাহিরেও তিনি স্বরচিত সংস্কৃত নাটকাভিনয়ের সুব্যবস্থা করেন। একণে বিগত ৭।৮ বৎসর ধরিয়া তাঁহার সুবিখ্যাত "প্রাচ্যবাণী সংস্কৃত পালি নাট্যসঙ্ঘ" প্রতি বৎসর ২৫।৩০ বার বিভিন্ন স্থানে এই সকল সংস্কৃত নাটক অভিনয় করিয়া বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পণ্ডিচেরী, বাঙ্গালোর, গোরক্ষপুর, বারাণসী, বৃন্দাবন, নৈনীতাল, পুরী, পাটনা, পুরুলিয়া, বার্নপুর, চিত্তরঞ্জন, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে এই সকল সংস্কৃত নাটক সহস্র সহস্র দর্শকের সম্মুখে অভিনীত হইয়া প্রভূত প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

প্রবেশ সংস্কৃত পণ্ডিতমহাশয়গণের সেবা ও পূজাই ছিল যতীন্দ্রবিমলের সুদক্ষ জীবনের মহাব্রত। আজ যে পশ্চিমবঙ্গের নানাভাবে অনাদৃত পণ্ডিতমহাশয়গণ বহুলাংশে আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ যতীন্দ্রবিমলেরই সাধু প্রচেষ্টায়। বঙ্গ বিভাগের পরে, পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু পণ্ডিতমহাশয়গণের পুনর্বাসনের জন্য যতীন্দ্রবিমল যাহা করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা কোনদিনও বিস্মৃত হইবেন না সুনিশ্চিত।

পশ্চিমবঙ্গে একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করাই ছিল যতীন্দ্রবিমলের জীবনের স্বপ্ন। ইহার জন্য তিনি সুদীর্ঘ ৩০ বৎসরকাল ধরিয়া নিরবচ্ছিন্ন, নিরলসভাবে সাধনা করেন। আজ তাঁহার স্বপ্ন সার্থক হইতে চলিয়াছে। কিন্তু হায়, যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া হোতা আজ চলিয়া গেলেন। যাঁহাকে এই সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্যরূপে পাইয়া সকলেই পরমান্বিত, পরমোপকৃত, পরমধন্য হইতেন, তিনিই আর নাই। আমরা আশাকরি সরকার এই সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম "যতীন্দ্রবিমল সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়" রাখিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইবেন।

বিদুষীপ্রবরা, সুপ্রসিদ্ধ লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের সর্বজনবন্দ্যা অধ্যক্ষা ডাঃ রমা যতীন্দ্রবিমলের একমাত্র যোগ্যা উত্তরাধিকারিণী। তিনিও তুল্য জ্ঞানশক্তিমতী, তুল্য ভারতীয় আদর্শে শিক্ষিতা, তুল্য বিদ্যাত। নব-সংস্কৃত

বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাচ্যবাণী, পণ্ডিতসমাজ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনিই যতীন্দ্রবিমলের অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করিবেন, এই ভরসাই আমরা রাখি।

সকলের উপর, আমরা দেখিয়াছি "মানুষ" যতীন্দ্র-বিমলকে। সুধা দিয়া নির্মিত সেই মানুষ -আগা গোড়া চিন্তায় সুধা, বাক্যে সুধা, কর্মে সুধা। অগাধ পাণ্ডিত্য, উচ্চ পদ, অশেষ ধন মান—মানুষের জীবনে যাহা কাম্য, তাহার কোন কিছুরই অভাব ছিলনা তাঁহার জীবনে। ইহাদের মধ্যে যে কোন একটিই মানুষকে প্রায়ই দাম্ভিক, কর্কশ করিয়া তোলে। কিন্তু যতীন্দ্রবিমল ছিলেন বিনয়ের অবতার—সর্বদাই "তৃণাদপি সুনীচ।" জীবনে তিনি কোন দিনও ক্রোধান্বিত হননি, জীবনে তিনি কোন দিন কাহাকেও একটিও কর্কশ কথা বলেন নি। তাঁহার সদাহাস্যমণ্ডিত, উজ্জ্বল আনন, যিনিই দেখিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার নিজের মত সরল মধুর অমায়িক ব্যবহারে আপামর জনসাধারণ আজীবন পরম তৃপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার ছিল সত্যই আক্ষরিক অর্থেই "বসুধৈব কুটুম্বকম্।"

এই সাধুবাবার, ঋষি সাধককে আজ আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করি। তাঁহার সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, তাঁহার প্রাণপ্রতিম "প্রাচ্য বাণী"কে বাঁচাইয়া রাখাই হইবে আজ সমগ্র দেশবাসীর মহা কর্তব্য।

ভালবাসি

শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

চেনা এ পৃথিবী,
সেই চেনা পথে আসি
আলো ছায়া রাঙা সবুজ বনানী
শুরু সাথে পাখী দেয় হাত ছানি
উষার আলোয়
কুহু গান ভালোবাসি।

হাসি ভালোবাসি
ভালবাসি আলো
জোছনায় চাঁদ দেও
লাগে ভালো।
ভালবাসি মোর ছোট গ্রামখানি
রাখালের মিঠে বাঁশী

হিন্দু-সংস্কৃতির স্বরূপ ও বর্তমান হিন্দু সমাজ

শ্রীশিশির দাশ

মানুষ যখন সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখরে লাভ করে নাই—যখন তারা পর্বত-গহ্বরে বাস করতো, নরনারী গাত্রের লোম ভিন্ন অন্য বসনও পরিধান করতো না, বন্য পশুর রক্তাপ্লুত মাংস ভিন্ন অন্য আহারও জানত না, পশু-হনন ও যুদ্ধের জন্য পাথরে পাথর ঠুকে প্রস্তরের অস্ত্র নির্মাণ করতো—লৌহের ব্যবহার পর্যন্ত জানা ছিল না, সেদিনকার মানুষের আশা-ভরসা, চিন্তা, কল্পনা, বিশ্বাস ও উপাসনার প্রথম নিদর্শন এই ভারতবর্ষেই পাওয়া গিয়েছে—সেটি হলো ঋগ্বেদ সংহিতা। মানব সভ্যতার এই প্রথম পদক্ষেপের সময়, হিন্দু আর্যগণ প্রকৃতির অনন্ত গৌরব দেখে—তাঁরা তাহাই উপাসনা করতেন। চাষাদি অল্প অল্প সভ্য ব্যবসায় শিক্ষা করে চতুর্দিকের শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাঁরা যুদ্ধও করতো—তখন তারা কিরূপ আশা-ভরসা করতো, কিরূপ চিন্তা ও কল্পনা করতো, কিরূপ বিশ্বাস ও উপাসনা করতো—সে সব কথাই আমরা ঋগ্বেদ থেকে জানতে পারি। এই ঋগ্বেদ সংহিতাই মানব সভ্যতার প্রথম নিদর্শন এবং মানব জাতির সর্বপ্রথম গ্রন্থ। এই ঋগ্বেদ রূপ অঙ্কুর থেকেই বিশাল হিন্দুধর্মের উৎপত্তি। সমগ্র জগতে একমাত্র আর্য-হিন্দুজাতি ছাড়া অন্য কোন জাতিই বলতে পারে না যে, সহস্র সহস্র বৎসরের মানসিক বিকাশ ও ধর্মের বিকাশ তাঁদের নিজেদের জাতীয় ইতিহাসে আছে। সুতরাং হিন্দুধর্মের এই ক্রমিক বিকাশ, ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়। ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতেরাও ধর্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনের উন্নতির কথা আনন্দের সঙ্গেই লিপিবদ্ধ করে গেছেন—সেদিক থেকেও আমাদের যেরূপ সুবিধা অর্থাৎ একটা ঐতিহাসিক ধারা অক্ষুণ্ণ আছে, সেরূপ আর অন্য কোন জাতির নেই। জগতের সমস্ত প্রধান প্রধান ধর্মই কতকগুলি বিশিষ্ট গ্রন্থকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করেন, এবং সেই সকল গ্রন্থই হলো তাঁদের নিজ নিজ ধর্মের ভিত্তি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণের মতে ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে হিন্দুদিগের বেদই সর্বপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বেকার জগতের প্রথম ধর্মগ্রন্থ অর্থাৎ হিন্দুদিগের সর্বপ্রথম ধর্মশাস্ত্র বেদই আদিম মানব সভ্যতার একমাত্র নিদর্শন।

সমগ্র বেদ দুভাগে বিভক্ত—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। এই জ্ঞানকাণ্ডের সার ভাগের নামই বেদান্ত বা উপনিষদ্। ভারতের সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়—দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, কিম্বা সৌর, শাক্ত, গাণপত্য, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত সকল সম্প্রদায়ই নিজ নিজ মতানুসারে ব্যাখ্যা করলেও, বেদের উপনিষদ্-ভাগকে সকলেই স্বীকার করেন। কারণ, কোন ব্যক্তি-বিশেষের মতবাদের উপর উহা প্রতিষ্ঠিত নয়—সনাতন সত্যসমূহের উপরই স্থাপিত। স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন—"বেদান্তই একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম। এমন কি, আধুনিক বিজ্ঞান যে সকল সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছেন, বেদান্ত বহু শতাব্দী পূর্বেই সেই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, কেবল আধুনিক বিজ্ঞানে সেগুলি জড়শক্তি রূপে উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র।" হিন্দুধর্ম যে ভারতে সহস্র সহস্র বৎসর ধরে বিরাজমান, তার প্রধান কারণ, হিন্দুর ধর্ম চিরন্তন ও সজীব ধর্ম—আমাদের জাতীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি বা উৎকর্ষ লাভ করেছে—নূতন ভাবে আমাদের নূতন নূতন সামাজিক বা রাজনৈতিক অভাব পূরণ করেছে—আমাদের সুখ-দুঃখে, স্বাধীনতায় অধীনতায়, শিক্ষায় ও মূর্খতায় আমাদের সহচর ও সহায় হয়েছে। হিন্দুধর্ম যদি গতি কিম্বা উন্নতি রহিতই হতো, তা'হলে এই ধর্মের সঙ্গে আমাদের স্থির হয়েই দাঁড়িয়ে থাকতে হতো—নতুবা বহু সহস্র পূর্বেকার এই পুরাতন বন্ধুকে বিদায় দিয়েই অগ্রসর হতে হতো। কিন্তু

হিন্দুধর্মের প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যায়, হিন্দুধর্ম গতি-রহিত বা উন্নতি-রহিত নয়—আমাদের উন্নতির সঙ্গেই উন্নতি লাভ করবে—জাতীয় জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হবে—সর্বোপরি আমাদের পুরাতন সহচর—চিরকাল আমাদের সঙ্গেই থাকবে। কারণ, হিন্দুধর্ম সজীব ও উৎকর্ষশীল, মৃত জড় পদার্থ নহে। সুতরাং হিন্দুধর্মই ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের ধর্ম।

যে জাতি ধর্ম ও দর্শনের চিন্তায় বহুশত বৎসর ধরে নিজদিগকে নিয়োজিত করেছে—সে জাতির মধ্যে অনেক ধর্মশাস্ত্র এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবাদের বিভিন্নতা যথেষ্ট থাকলেও, এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের মূলতঃ কোন বিরোধ নাই। শৈব একথা বলে না যে বৈষ্ণবেরা অধঃপাতে যাক—কিম্বা বৈষ্ণবেরাও বলে না যে শৈবরা অধঃপাতে যাক্। বরং একে অন্যকে বলে—আমি আমার পথে চলি এবং তুমি তোমার পথে চলো—পরিণামে আমরা একস্থানেই পৌঁছিব। ভারতের সকল সম্প্রদায়েরই ঐ একই কথা। সর্বপ্রকার নীতি ও ধর্মবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি একত্ব—ইহাই ভারতীয় দর্শনের সিদ্ধান্ত। সুতরাং ধর্ম নিয়ে পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়—নিজ ধর্মে স্থির থেকে অপরাপর ধর্মমতকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখাই ধার্মিকের রীতি। বস্তুতঃ আমাদের ধর্ম কাহাকেও বাদ দিতে চায় না, সকলকেই নিজের কোলে টেনে নিয়ে কোল দিতে চায়। অথচ ভারতের ন্যায় এই অসাম্প্রদায়িক দেশে যদি কেহ জোর করে এসে আমাদের বহুদিনের সংকল্পিত বিষয়সমূহ আমাদিগকে পরিত্যাগ করতে বলে—আরও শুনে আমরাও যদি সেই মতানুসারেই আমাদের কার্য প্রণালীর পরিবর্তন করি, তাহ'লে আহম্মক ত আমরাই—অন্য কেহ নয়। সুতরাং অন্য দেশ থেকে সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ আমরা পাই, তার অধিকাংশই ঐ ধরণের। স্বামী বিবেকানন্দ বার বার বলে গেছেন—"আমাদের দেশের বাইরে কি পরধর্ম-দ্বেষ বর্তমান, তা আপনারা কিছুই জানেন না। পরধর্ম-দ্বেষ অনেক স্থানে এরূপ প্রবল যে, অনেক সময় আমার মনে হয়ে—হয়ত বিদেশে আমাকে হাড় ক'খানা দিয়েই যেতে হবে। ধর্মের জন্য অন্য একজনকে মেরে ফেলা এত তুচ্ছ কথা যে—আজ না হউক, কালই এই মহামূল্য পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে এরূপ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হতে পারে।" তাই তিনি ঘোষণাও করে গেলেন—"হে আমার স্বদেশবাসীগণ আমি তোমাদিগকে বলিয়া রাখি যে, আমি-জগতে যে সকল জাতি দেখিয়াছি, সেই বিভিন্ন জাতি-সমূহের তুলনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি—যে আমাদের জাতিই মোটের উপর অন্যান্য সকল জাতি অপেক্ষা অধিকতর নীতিপরায়ণ ও ধার্মিক, এবং আমাদের সামাজিক বিধানগুলিই—তাহাদের উদ্দেশ্য ও কার্য-প্রণালী বিচার করিলে দেখাযায়—মানব জাতিকে সুখী করিবার সর্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত।...আমার আদর্শ জাতীয় পথে সমাজের উন্নতি,বিস্তৃতি ও পরিণতি।" ভারত-বর্ষকে জানতে হলে—শুধু প্রদেশে প্রদেশে বিভিন্নতার বিচার বা মাথা ও নাসিকার মাপ নইলেই চলবেনা। ভারতের ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বিবরণ, ইতিহাস বা তাদের নানা বিশেষত্ব এবং নানা মত ও সম্প্রদায়ের যোগাযোগ, প্রভাব-প্রতিপত্তি-প্রসার ও সঙ্কোচের জীবন্ত ইতিহাসও জানা দরকার। এখানে অর্থাৎ ভারতবর্ষে কোন সংস্কৃতিই অন্য সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে নাই—নানা সংস্কৃতির যোগা-যোগেই আমাদের হিন্দু-সংস্কৃতি। তাই হিন্দু অর্থই ভারতীয়।

হিন্দুর জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তিই ধর্ম।—নানা বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নিয়েও হিন্দুর ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে যে পরম ঐক্য ও জীবন আছে—তা এক ও অখণ্ড। হিন্দুর ধর্ম ও সংস্কৃতির মতো ভারতবর্ষ নানা প্রদেশে বিভিন্ন হলেও এক।—একই সন্ধ্যাগায়ত্রী সারা ভারতে সকলেই দিনে তিনবার জপ করেন—একই বিষ্ণু, শিব ও শক্তি নানারূপে ভারতের সর্বত্রই পূজিত হন—একই রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও পুরাণ ভারতের সকল প্রদেশেই পঠিত হয়—সারা ভারতে একই গীতগোবিন্দের গান—একই গয়াতীর্থে সকলেরই মুখ্য পিতৃকৃত্য—একই দশকর্ম ভারতের সর্বত্রই চলে। শ্রীরাম-শ্রীকৃষ্ণ সারা ভারতেই পূজিত হন। স্নান করার সময় এখনও সকল হিন্দুই—যে যেখানে স্নান করেন, সারা ভারতের পবিত্র নদ-নদী ও তীর্থ সকলকে আবাহন না করে পারেন না। সন্ধ্যা-পূজা

করতে বসেও কোশাহলে—গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী সরস্বতী সিন্ধু-কাবেরী সকলকেই সন্নিহিত হতে বলি। ক্রিয়াদির ঘটস্থাপনার সময়ও স্বর্গে, মর্তে, পাতালে গঙ্গাদি সব নদ-নদী, সকল পুণ্য সরোবর, প্রস্রবণ এবং যেখানেযে পুণ্যতীর্থ আছে সমস্তই ঘটে সন্নিহিত হউক বলে প্রার্থনা করা হয়। সারাজীবন এমনিভাবে অখণ্ড মায়ের কোলে ধর্ম-কর্ম, ক্রিয়া-অনুষ্ঠানাদি এবং লীলা-খেলা সমাপ্ত করি। মৃত্যুর পর যে শেষ স্নান হয়-সেখানেও ঐ একই কথা। সারা ভারতের পুণ্যজলেই মায়ের সন্তানের দেহকে স্নান করাতে হয়—গঙ্গাদি সমস্ত তীর্থ, পবিত্র সব নদ-নদী, পুণ্য সব গিরি প্রস্রবণ পদ্মসরোবর বরাহ পিণ্ডারক প্রভৃতি সকল তীর্থের পবিত্র ধারায় মায়ের সন্তানের দেহ ধন্য হোক বলেই প্রার্থনা করা হয়।—মৃত্যুর পরেও সেই অখণ্ড ভারতেরই মহাস্নান। কত মহান হিন্দুত্বের এই অভেদ ও ঐক্যের সাধনা। হিন্দুত্বের এই অভেদ শুধু কথার কথাই নয়—তা সকল হিন্দুরই সাধনার ধন। জীবনে, মরণে, সকল ক্রিয়া-কর্ম-অনুষ্ঠানে, হিন্দুর একত্ব এবং অখণ্ড ঐক্যের সাধনাই ধ্বনিত হয়েছে।

যে দেবতার অর্চনাই আমরা করিনা কেন—চারি ধামের অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম সারা ভারতের চৌরাশি তীর্থের পুণ্য সলিলে ইষ্টদেবতার অভিষেক না হলে তা পূর্ণ হয়না। তান্ত্রিকেরা তো সমস্ত ভারতবর্ষকে একই জগন্মাতার পুণ্যদেহ মনে করে ৫২ পীঠে তাঁর ৫২ অঙ্গ নিয়েছেন। এই সকল পীঠস্থানের মধ্যে হিংলাজ বেলুচি-স্থানে এবং কামরূপ আসামে—কুমারিকা হতে আসামুখী সবইত দেবীর অঙ্গ। সেই দেবীর দেহ কি আমরা খণ্ডিত করতে পারি? তন্ত্র বলেন, ৫২ পীঠ তো আমাদেরই দেহে—নিজের দেহকে আমরা কি খণ্ডিত করতে পারি? একই শিব একই বিষ্ণু ভারতের চারদিকে চৌরাশি ক্ষেত্রে বিরাজিত—তাকে খণ্ডিত করি কেমন করে? সুতরাং হিন্দুর ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাধনার স্বরূপ উপলব্ধি না করে—নবযুগের জয়ধ্বনি করে যাঁরা অজ্ঞতার বশে শ্রেণীভেদ, প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে মাতৃঘাতী পরশুরামের মত ভারতজননীর দেহকে পর্যন্ত খণ্ডিত করে যে মহাপাপের অনুষ্ঠান করেছে—সে পাপের সাক্ষাৎ পাপী ইংরেজ হলেও—ভারতবাসী কেবল তা সহ্যই করে নাই বরং সেই মহাপাপকেই সে প্রশ্রয় দিয়েছে। সে মহাপাপে শুধু বাংলা নয়, পাঞ্জাব নয়, সমগ্র ভারতেরই মনুষ্যত্ব, এমন কি, মানুষের দেহাভ্যন্তরস্থ মন্দিরে যে দেবতা বিরাজ করেন, সেই দেবতাকে পর্যন্ত ক্ষুণ্ণবিক্ষত করা হয়েছে। সে মহাপাপকে এখন ভুলতে চাইলেই ত আর পরিত্রাণ নাই—বিধাতা তো ভুলবেন না। মাতৃঘাতী পরশুরামের পরশু বহু তপস্যার পর খসে গিয়েছিল—কারণ তা ঘটেছিল পিতৃ-আজ্ঞায়। ভারতবাসী তাঁর জননী জন্মভূমিকে বিখণ্ডিত করে, মাতৃভূমির বুকে অপমান ও অবজ্ঞার তীক্ষ্ণ শেল বিদ্ধ করেছে, তাঁর সন্তান-ধর্ম ত্যাগ করেছে। সে তাঁর জাতি ধর্মের আশ্রয়ভূমি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করেছে। কিন্তু সে জন্য তার যেন কোন চৈতন্যই নাই—কোন অনুশোচনাও নাই—এই ভাবে সে আজ আত্মহত্যা করেছে তার আজ্ঞায়? এই মহাপাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে—জাতীয় সঙ্কট সম্বন্ধে সচেতন হয়ে—হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মের আদর্শ ধারণ করে, হিন্দুর সমাজ সংস্কার ও সংগঠন ব্রতীও—প্রতিটি হিন্দুর প্রকৃত পরিচয় না জানা পর্য্যন্ত, ভারতের প্রকৃত কল্যাণ-সাধন মোটেই সম্ভব নয়।

জাতীয় অস্তিত্ব বজায় রেখে, হিন্দুকে জীবন্ত জাতি রূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে হলে—অনতিবিলম্বেই হিন্দু-সন্তানদিগকে রাজনীতি, ও ধর্মনীতি এবং সর্বনীতির সার গীতার আদর্শ অনুসরণ করে পৌরুষের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তাই আর কালক্ষেপ না করে, হিন্দুর সমাজ সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য হিন্দুত্বে বিশ্বাসী জাতীয়তাবাদী নেতা ও কর্মিগণের অবিলম্বেই কর্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হওয়া প্রয়োজন। বাংলার বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বার বার বলে গেছেন—"হিন্দুসমাজকে বাঁচবার জন্য চাই ব্রহ্মতেজ—বীর্য্যবান ধর্মের সঞ্জীবতা।" অতলে-তলিয়ে-যাওয়া হিন্দু সমাজকে টেনে তুলে, তিনি স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করে গেছেন—"বন্ধুগণ এখন আমাদের আনন্দে ক্রন্দন করিবার পর্যন্ত সময় নাই। আমরা যথেষ্ট কাঁদিয়াছি। এখন আর আমাদের কোমল ভাব অবলম্বন করিবার সময় নহে। এইরূপে কোমলতার সাধন করিতে করিতে আমরা এখন জীবন্মৃত হইয়া পড়িয়াছি—আমরা তূলারাশির ন্যায় কোমল হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের দেশের পক্ষে এখন প্রয়োজন—

লৌহবৎ দৃঢ়মাংসপেশী ও স্নায়ু সম্পন্ন হওয়া ;—এমন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন হওয়া যে, কেহই যেন উহা প্রতিরোধে সমর্থ না হয়—।" কিন্তু এজন্য প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা সাধন, তাই স্বামীজি বলে গেছেন—"নিজের উপর বিশ্বাস সম্পন্ন হও—সেই বিশ্বাস বলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও ও বীর্যবান হও। ইহাই এক্ষণে আমাদের আবশ্যক। আমরা কোটি কোটি লোক, সহস্র বর্ষ ধরে যে কোন মুষ্টিমেয় বিদেশী লোক আমাদের ভূলুণ্ঠিত দেহকে পদদলিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছে, তাহাদেরই পদানত হইয়াছি কেন ? কারণ উহাদের নিজেদের উপর বিশ্বাস আছে—আমাদের তাহা নাই।" বাংলার বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বাণী স্মরণ করে আজ বাঙ্গালীই আগে চলুক—ভারতের জাতীয়ধর্ম ও ভারতবর্ষকে রক্ষা করুক।

ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনে চেতনাহীন হয়ে কোন জাতিই জাতি হিসাবে বাঁচতে পারেনা। সুতরাং ধর্মনীতি বা সমাজনীতি যদি পথভ্রষ্ট হয়, তাহলে রাজনীতিও পথভ্রষ্ট হতে বাধ্য—কারণ, ধর্মনীতি ও রাজনীতি দু'টি বিভিন্ন নীতি হলেও একটি অপরটির সহায়ক।—সমাজ সুসংগঠিত হলেই একের প্রতি অন্যের সমবেদনা জন্মায় এবং জাতির নৈতিক শক্তি বাড়ে। কাজেই কুসংস্কারমুক্ত সুদৃঢ় সমাজ সংগঠিত করে শক্তির অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা অন্য কোন প্রকার জাতীয় উন্নতিই সম্ভব নয়। আজ আমরা শতধাবিচ্ছিন্ন স্বজাতিকে ভুলে—পথে পথে আন্তর্জাতিকতার মন্ত্র জপ করি।—রামধুন গান গাই।—সাম্য, মৈত্রী, অহিংসের স্লোগানগুলি জপমন্ত্র মাত্র সার করে—হিংসা, প্রবঞ্চনা, কালোবাজার প্রভৃতি কত দুষ্কৃতিই না করি। অথচ আদর্শবাদী আমরা—একমাত্র রাজনীতি বা অর্থনীতিক সমস্যা ছাড়া অন্য কোন সমস্যার দিকে মন দিতে নারাজ হয়েই কি গোড়ায় গলদ রেখে আগায় জল ঢালছিনা ? তাবলে বিস্মিত হতে হয় যে, হিন্দুসমাজে জন্মগ্রহণ করে নেতৃত্বের আসনে বসে যারা কথায় কথায় ব্যক্তি স্বার্থ ও সমষ্টি স্বার্থ এক করে চলার পরামর্শ দিয়ে থাকেন—তাঁরা ব্যক্তি এবং সমষ্টি অর্থে কি বোঝেন, অথবা কাদের নিয়ে তাঁদের এই সমষ্টি কিম্বা তাঁদের সমষ্টির দৌড় কি আপন সমাজকে ত্যাগ করে ? নানা মত ও পথের টানা-হেঁচড়ায় এদিকে সেদিকে ছুটাছুটি করে আজ যেন হিন্দু জাতি ধীরে ধীরে কোন এক অবাঞ্ছিতরূপে পরিবর্তিত হয়ে—তার জাতীয়-সংহতি, সমাজ বন্ধন, নীতি ধর্ম সব কিছুই ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলতেই প্রয়াসী। কিন্তু এমনিভাবে চলতে দিলে হিন্দুর নাম ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পাতায় রক্ষিত হবে কি ?

সাম্য, মৈত্রী, প্রেম ও অহিংসার নামে যে ঘোর তামসিকতা আজ হিন্দু সমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে—হিন্দুজাতির সত্তের ও সবল মনোবৃত্তি অনুশীলনের পরাঙ্মুখতাও বুঝি তারই প্রতিক্রিয়া।—এ যেন অবসাদগ্রস্ত পৌরুষহীন জাতির নিস্তেজ মনের একটা শোচনীয় বিকাশ, হিংস্র পশুরাজ সিংহ-অত্যন্ত হিংস্র কালসর্প—অতীব তীক্ষ্ণ ত্রিশূলভীর-শাণিত কৃপাণ-চক্র, এই সবের প্রতীক ধারিণী জগন্মাতা দুর্গা, কালী, চণ্ডী যে হিন্দুর পরম আরাধ্য—আজ সে জাতির এরূপ শোচনীয় পরিণাম কেন ?—যেদিন থেকে আমরা বেদ-বিরুদ্ধ বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করেছি, সেদিন থেকেই আমাদের আত্মিক মৃত্যু আরম্ভ হয়ে গেছে, বৌদ্ধধর্ম এসে আমাদিগকে উত্তরাধিকার স্বরূপ এই অবনতির ভাগী করেছে। বৌদ্ধ অহিংসা ও মৈত্রী এবং বৈষ্ণব প্রেমের মধ্যে জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করার মত সবল মনোবৃত্তি নাই। একই কারণে গান্ধীজির প্রবর্তিত অহিংস-নীতিও জাতির পক্ষে কল্যাণজনক হয় নাই। বাস্তবপক্ষে, অহিংসায় পুরুষত্ব প্রকাশ করেনা বা শক্তি, প্রীতি ও প্রতিযোগিতার জন্ম দেয় না—দানবের মনেও ভীতির সঞ্চার করেনা। তাছাড়া, আত্মরক্ষা ও আত্ম-প্রসারের পথ নির্দেশ—এমন কি, ক্ষুধার অন্নও অহিংসায় যোগায়না। অহিংসা যদি পৌরুষেয়ই হবে, তাহলে শক্তিশালী জাতি মাত্রেই এত সৈন্য-সামন্ত ও অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত থেকে কি নিজেদের কাপুরুষত্বের পরিচয় দিচ্ছে ?—অত্যাচার, অবিচার, অন্যায়ই হলো হিংস্র বা পাশবিক হিংসা। কিন্তু অত্যাচার অবিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে প্রতিবিধান তাহাই মানবীয় এবং শক্তিমানের ধর্ম ইহাই সুদর্শনচক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনের বা গীতার মতবাদ।

আজ বহুদিন ধরেই দেশ আমাদের প্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নতি, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি বহুবিধ সংস্কারের নামেই

আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এই সমস্ত সংস্কার-ধর্মী নেতৃত্ব সম্বন্ধে কিছু না বলেও—একথা খুবই স্পষ্ট যে বহুদিনব্যাপী এই সমস্ত আন্দোলনের ফলে সমগ্র দেশ ও জাতির কোন স্থায়ী কল্যাণই সাধন হয় নাই। বক্তৃতামঞ্চ হতেও অজস্র বক্তৃতাই শোনা যায়—শুধু একে অপরের নিন্দাবাদ, আর কটূক্তি বর্ষণ। তাতে সমাজের কোন বাস্তব উপকার হয়েছে কি? শুধু নিন্দাবাদ আর গালিবর্ষণ করেই কাজ হয়না—আদর্শের প্রতি বিশ্বাস এক কথা, আর আদর্শানুযায়ী পরিচালিত হওয়া আর এক কথা। সর্বাগ্রেই আমাদিগকে আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব সকল রক্ষা করতে হবে—আবার একথাও সত্য যে, অপরাপর জাতির কাছ থেকেও আমাদের অনেক বিষয় শিক্ষা করবারও আছে, এবং সেগুলি যেন তথাকথিত আধুনিক কার্বন-প্রণালীর বিচারশূন্য অনুকরণই না হয়। স্বভাবতঃই প্রশ্ন আসে আমাদের জাতীয় আদর্শ কি এবং সেই আদর্শে পৌঁছিবার কার্যকরী পন্থাই বা কি? অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যতের জন্ম—অতএব যতদূর সম্ভব পশ্চাতের দিকে দৃষ্টি রেখে অর্থাৎ অতীতের ভারতবর্ষ যে গৌরব অর্জন করেছিল বর্তমান ভারতবর্ষকে তদপেক্ষাও উচ্চতর করে গড়ে তোলবার চেষ্টাই করতে হবে। জাতিকে উন্নত করে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন লোকশক্তির গঠন—কারণ, মানব সমাজের যা কিছু উন্নতি সব মানুষের শক্তিতেই সম্ভব হয়েছে। তাই ভারতের জাতীয় উন্নতির জন্য হিন্দুর সমাজ সংস্কার ও সংগঠনের দ্বারাই সেই লোকশক্তির গঠন সম্ভব। বস্তুতঃ হিন্দু জাতিকে বাদ দিলে, ভারতের আধুনিক সভ্যতারই বা কতটুকু অবশিষ্ট থাকে? সুতরাং হিন্দু সমাজের ভিত শক্ত না করে—ছত্রিশ জাতিতে বিভক্ত হয়ে প্রগতি আর উন্নতির নামে অর্থনৈতিক শ্রেণীহীন সমাজের ধুয়া তুলে, লম্বা লম্বা কথার জোড়াতালি দেওয়া শূন্যে নির্মিত তাসের প্রাসাদ কতক্ষণ টিকতে পারে? পদতলে শতধাবিচ্ছিন্ন হিন্দু সমাজের অসংবদ্ধ ভিত্তিমূলের উপর দলাদলি আর বাদ-ইজমের ঘোড়দৌড়ে আমাদের জাতীয় জীবন আজ পঙ্গু অর্থাৎ অযোগ্য জাতির ভিত্তিমূল সুদৃঢ় নয় বলেই—কত শত স্বপ্নের তাজমহল, গড়তে না গড়তেই মৃদু-বাত্যাঘাতে ধূলায় লুটিয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবী কি চায়? চায় আত্মরক্ষা—আত্মপ্রসার—জাতীয় উন্নতি। চায়—সংগ্রাম। সংগ্রামই জীবন—সৃষ্টি শব্দটিই সংগ্রামের নিত্য সহচর অর্থাৎ সৃষ্টির মূল রহস্য শান্তিই নয়—তার নিষ্ঠুর নিষ্প্রাণ রূপ। শান্তির সেই শীতল বুলিতে অপরকে ঘুম পাড়িয়ে নিজেদের কার্যসিদ্ধ করবার কৌশলে কৌশলী বিদেশী রাজনীতিবিদ্‌দের হাতের পুতুল হয়ে, আমরা কি সত্য ছেড়ে মিথ্যাকে নিয়ে বিপথগামী—ধর্ম ছেড়ে অধার্মিক—সম্প্রদায় ছেড়ে অসাম্প্রদায়িক হয়ে যাই নি? অথচ সম্প্রদায়বদ্ধ—সমাজবদ্ধ—সংঘবদ্ধ হয়েই প্রকৃতির প্রত্যেকটি চেতন-অচেতন পদার্থ পৃথিবীর বুকে আপন আপন অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। বৃক্ষ-লতা-গুল্মাদি পর্যন্ত নিজ নিজ জাতিগত পার্থক্য নিয়ে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দলবদ্ধভাবে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসার করে চলেছে। কিন্তু হিন্দুজাতি আমরা 'সাম্প্রদায়িক' ঐক্যের কথা প্রচার করতে গিয়ে 'সাম্প্রদায়িক' কথাটা স্বীকার করি—অথচ অন্য সময় 'সাম্প্রদায়িক' শব্দটি শুনলেই আঁৎকে উঠি; আর মানব সমাজ - সাম্যবাদ বিশ্বশান্তি—প্রেম-অহিংসা প্রভৃতি বড় বড় বুলির ধ্বংসনে নেহাৎ সুবোধ এবং তাকিক বালকে পরিণত হয়ে যাই। এমনি ভাবেই হিন্দুর ধর্ম ভাঙ্গছে—সমাজ ভাঙ্গছে—স্বজাতিকে বহুধা-বিচ্ছিন্ন রেখে, আপনকে পর করছে—ভাইকে ভাই ঘৃণা করতে শিখছে এবং নানা মতবাদে বিভ্রান্ত হয়ে, জাতীয় শক্তির আধারকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে—হিন্দুজাতি যেন অসাম্প্রদায়িক একটা সৃষ্টিছাড়া পদার্থে পরিণত হতে চলেছে। সকল ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার অর্থ কি নিজ ধর্ম রক্ষার্থে দাঁড়ানো থাকা বা নিজ ধর্মের প্রতি আস্থা না রাখা অথবা স্বজাতি ও স্বসমাজ সংগঠনে যোগদান না করা? প্রত্যেক জাতিকে আলিঙ্গন দেবো—তাঁদের সুখ-দুঃখে সমবেদনা জানিয়ে সাহায্যার্থে এগিয়ে যাবো—খুব ভালো কথা। কিন্তু এই ভাবে বহু জাতির সঙ্গে চলবার পূর্বে নিজের জাতিকে সুসংগঠিত করে—স্বজাতির জীবনে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে, তা' কখনই সম্ভব নয়।

ভারতবর্ষের হিন্দু জাতি আজ অগণিত বিভাগে বিভক্ত। এই বিভাগের সংখ্যাগুলিকে কেহ একত্রিত করে নাই কিম্বা তার প্রয়োজনও বোধ করে নাই। কিন্তু ইংরেজ সরকার তা করেছে—১৯০১ সালে, লোক গণনার সময়

ইংরেজ-রাজকর্মচারীগণ হিন্দুজাতির তালিকা প্রস্তুত করে, প্রতিটি তালিকায় অন্তর্গত জনসংখ্যার একটি হিসাব প্রস্তুত করেন। আমাদের প্রয়োজনের দিক থেকে এই হিসাবের কোন মূল্য না থাকলেও—ইংরেজ সরকার এমনিভাবে ভারতবর্ষের জাতিবিভাগকে পাকা করে রাখলেন। পরবর্তী লোকগণনার সময় আবার দেখা গেল, ইংরেজ সরকার রাজকীয় কার্য পরিচালনার সুবিধার জন্য ডিপ্রেস্ড (অধঃপতিত) নামে হিন্দুদের মধ্যে আর একটি শ্রেণী আবিষ্কার করলেন। যে সকল হিন্দু নিজদিগকে এই বিশেষ শ্রেণী বলে প্রমাণ করতে পারবে, তাঁরা সরকার থেকে নানারূপ সুযোগসুবিধা পাবে—এই হলো বিধান। সর্বপ্রথমে জাতিভেদ প্রথার ছিল—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র অর্থাৎ পতিত। তখনকার এই জাতিভেদ প্রথায় ব্রাহ্মণের সুবিধা ছিল বলে, ব্রাহ্মণেরাই জাতিভেদ ছাড়তে চাইতেন না। আর এখন জাতিভেদ প্রথায় অধঃপতিত বা অনুন্নত-তপশীলীদেরই লাভ, তাই অন্য সকলে জাতিভেদ ছাড়তে চাইলেও—অনুন্নত-তপশীলীরাই এই ভেদ লুপ্ত হতে দিবে না। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে, বর্তমান স্বাধীন ভারতে এখনও উন্নতি ও প্রগতির নামে, ইংরেজ সৃষ্ট এই বিভেদ-সৃষ্টিকারী প্রথা বহাল তবিয়তেই বিদ্যমান—জাতিতে, জাতিতে, প্রদেশে প্রদেশে, বিভেদ সৃষ্টি করে হিন্দুর অস্তিত্ব-ধ্বংসকারী বৃটিশ কূট-নীতি; স্বাধীন ভারত সরকারও যেন বেশ নিষ্ঠার সঙ্গেই তা অনুসরণ করে চলেছেন। তাই যাঁরা বিশাল হিন্দু সমাজের এই বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার কথা না ভেবে, মানব সমাজ গঠনের পরিকল্পনায় মশগুল, তাঁদের সেই পরিকল্পনা কি মূলাহীন অলীক কল্পনাই নয়? যতদিন হিন্দুজাতির মধ্যে নানা বিভেদ বর্তমান থাকবে, ততদিন হিন্দু জাতির মধ্যে প্রকৃত আন্তরিকতা থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং হিন্দু সমাজের বিভেদ নির্মূল করে—এক হিন্দু জাতি গঠনে মনঃসংযোগ করা এখন হিন্দু মাত্রেরই প্রধান কর্তব্য এবং হিন্দুর একত্ব প্রতিষ্ঠার উপরই ভারত-বর্ষের যথার্থ কল্যাণ নির্ভর করে।

হিন্দুশাস্ত্রে আছে, সত্যযুগে কোন জাতিভেদপ্রথাই ছিলনা। মহাভারতে দেখা যায়, সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করে ক্রমান্বয়ে তারা বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়েছে। ধর্মের সহায়তায় শূদ্রও দ্বিজ হয়—আবার ধর্ম হতে বিচ্যুত হলে ব্রাহ্মণও শূদ্র হয়—উৎপত্তি, বিদ্যা, বংশ, সংস্কার তার কারণ নয়। স্বামী বিবেকানন্দের মতে-'জাতিভেদ সম্বন্ধে যত প্রকার ব্যাখ্যা আছে, তন্মধ্যে মহাভারতের ব্যাখ্যাই একমাত্র সত্য এবং যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা।' জন্মের দ্বারা যে ব্রাহ্মণ হয় সেকথা বুদ্ধমুনিও মানেন না; তাঁর মতে—'গুণ, চরিত্র, আচারই ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পরিচয়।' ভবিষ্য-পুরাণ বেশ স্পষ্টভাবেই দেখিয়েছেন যে, জাতিতে জাতিতে ও সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে যথার্থত কোন ভেদ নাই এবং ভবিষ্যপুরাণ মতে—'জন্মের দ্বারা নহে, চরিত্র, আচার ও তপস্যাতেই যথার্থ উচ্চতা বা নীচতা।' পুরাণিকার বলেন—"জাতি জাতি যে কর, তবে মুনি ঋষিদের উৎপত্তির কথাই বিচার করা যাক্। কৈবর্তীর গর্ভে ব্যাসের জন্ম, চণ্ডাল কন্যার গর্ভে পরাশর, শুকীর গর্ভে শুকদেব, উলূকীর গর্ভে কণাদের জন্ম, মৃগীর গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গ, গণিকার গর্ভে বশিষ্ঠ, মুনিশ্রেষ্ঠ মন্দপাল নাবিকার সন্তান, মাণ্ডকীর গর্ভে মাণ্ডব্য। এই ভাবেই অনেকে বিপ্রত্ব লাভ করেছেন। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুণকর্মবিভাগ অনুসারে যে বর্ণভেদের কথা বলেছেন, তা যদি ভারতে প্রতিষ্ঠিত থাকত—তা'হলে জাতিভেদের দ্বারা ভারতের উপকারই হতো এবং সমাজে প্রাণের স্পন্দনই বজায় থাকত। মনুও এইরূপ একটা সরলতার কথাই বলে গেছেন। বস্তুতঃ গুণকর্মবিভাগ অনুসারে জাতির ব্যবস্থা না থাকাতে, সকলেরই নৈতিক আদর্শ ক্রমান্বয়ে হীনতায় নেমে এসেছে।

শাস্ত্রে গুণকর্মানুসারে জাতি বিভাগের কথা থাকলেও—এই বিভাগটিই এখন জাতিগত। অথচ শাস্ত্রীয় বিচারেই দেখা যায়, বাহ্যবিধির উপর প্রতিষ্ঠিত এই জাতিভেদ নিতান্তই মিথ্যা। হিন্দুজাতি তার হিন্দুত্ব ভুলে গিয়ে নিজেদের সম্বন্ধে চিন্তা করার শক্তি ও প্রবৃত্তির বিলুপ্তি ঘটিয়েছে বলেই এই লৌকিক জাতিভেদ প্রথা এখনও টিকে আছে। সুতরাং আমাদের পক্ষে এখন একমাত্র ভাববার বিষয় হলো—ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ এবং বৈদিক ও অবৈদিক সমস্যা দূর করে হিন্দুজাতিকে একত্বে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা, এই প্রশ্নের উপরই নির্ভর করে ভারতের জাতীয় অস্তিত্ব অথবা বিলোপ। এই সত্য উপলব্ধি করেই সম্ভবতঃ গান্ধীজীও বলেছিলেন—"হিন্দু

মুসলমানের একতার অভাবে হিন্দুধর্ম ধ্বংস হবেনা—ধর্ম্মের ও চরকা না চললেও হিন্দুধর্ম ধ্বংস হবেনা—কিন্তু হিন্দুর ভিতরের গলদ দূর না হলে হিন্দুজাতি ধ্বংস হবে। সমাজ কলঙ্ক দূর করতে না পারলে জাতীয় জীবনের বিপদ জাল কেটে ওঠা মুস্কিল হবে, আস্তে আস্তে যাত্রা পথের সমস্ত দুর্বলতা ও পাপই মাথা উঁচু করে এসে সমাজকে বলবে—মুক্তি পেতে চাওতো আমাদেরবোঝা মুক্ত করে দাও। সীতা উদ্ধার করতে হলে অহল্যা উদ্ধার না করলে চলবেনা।" তাই বলতেও লজ্জা বোধ হয় যে, আমরা হিন্দু মুসলমানের একতার জন্য লালায়িত হয়েছি, অথচ আমাদের এ বোধ এখনও জন্মে নাই যে, আমরা মুখেও বলি সব হিন্দু এক। এই বাস্তব সত্যকে অবহেলা করার প্রায়শ্চিত্তই কি আজ আমাদের করতে হচ্ছেনা?

বহুযুগ ধরে দেশের প্রায় পনের আনা লোকের নামই তো হয়ে গিয়েছে—ইতর, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য ইত্যাদি। তাঁরা এখনও অস্পৃশ্য অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন হয়েই আছে। অথচ আমাদের এমন সাহস নাই যে, এই বিভেদ দূর করে জাতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠার জন্য হস্ত প্রসারণ করি। তুমি "উচ্চ" এবং সে 'নীচ'—এটুকু কথার পাপপঙ্কে জাতিকে ডুবিয়ে রেখে ভারতীয় জাতি গঠন কখনও সম্ভব নয়। সুতরাং ভারতীয় সমাজ গঠন না ক'রে 'মানব-সমাজ' গঠনের কল্পনা অলীককল্পনা ছাড়া আর কি হতে পারে? এক কথায়, দেশ অর্থে দেশের লোক—তাঁদের সমষ্টিকেইত বলে জাতি। যাদের নিয়ে ভারতবর্ষের জাতি—সেই বিরাট হিন্দুজাতি সংগঠনের অভাবে আজও শতধা বিচ্ছিন্ন। জাতীয় স্তোত্র 'বন্দেমাতরম্' মহামন্ত্রও আজ দ্বিখণ্ডিত—ভারতবর্ষও দ্বিধা বিভক্ত। জাতীয় দুর্দিন এমনি করেই আসে। ভারত বিভাগের পূর্ব হতে শুরু করে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করার পরেও হিন্দুজাতির কি এক বিরাট অংশকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচাবার সরল পন্থা থাকা সত্ত্বেও প্রতিপদে ভুল করার প্রধান কারণ এই সমাজ কলঙ্কের দুর্বলতা। কাজেই সীতারূপ স্বাধীনতা উদ্ধার করা গেলেও—অহল্যারূপ সমাজ ত উদ্ধার করা হয়নি, তাই অহল্যা-রূপ দুঃস্থ সমাজের অভিসম্পাত ও পাপরাশি আমাদের সর্ব-প্রকার উন্নতির পথে মাথা উঁচু করে এসে বাধার সৃষ্টি করছে—তার মুক্তি চাচ্ছে; তবু কি ভুল আমাদের ভাঙ্গবেনা!

উইন্‌ষ্টন্ চার্চিল

শ্রীসুধীর গুপ্ত

বৃটিশের স্বর্ণ তরী—সমুদ্ধ-সম্ভার
দোর্দণ্ড-প্রতিভা-দৃপ্ত উদ্যম-উল্লাসে
সাম্রাজ্যের বন্দরের তীরে নিয়ে আসে
যে-নির্ভীক ভীম-কান্ত মহাকর্ণধার,
বলিষ্ঠ প্রত্যয়-দীপ্ত যে-শক্তি দুর্বার
তমিস্রা-স্তম্ভিত—ভীত বন্যা-ত্রস্ত ত্রাসে
জনতারে শান্ত করে আশ্বাসে-বিশ্বাসে,
সে প্রত্যয়—প্রতিভা যে চির-বন্দনার।

সমর-সাহিত্য-স্রষ্টা অমর আত্মারে
দ্বিয়-ত্রিয়—দশ-ও বিংশ-শতাব্দের
বিভ্রান্ত-বিক্ষোভে বলো
কে ভুলিতে পারে!
এ শক্তি যে শান্তি-মূল প্রচণ্ড বলের;
স্থাপিতে সাহায্য করে শুভ্র অহিংসারে;
পূজ্য তাই এ প্রতিভা
জগৎ বিশ্বের।

খাদ্য-সমস্যার সমাধান

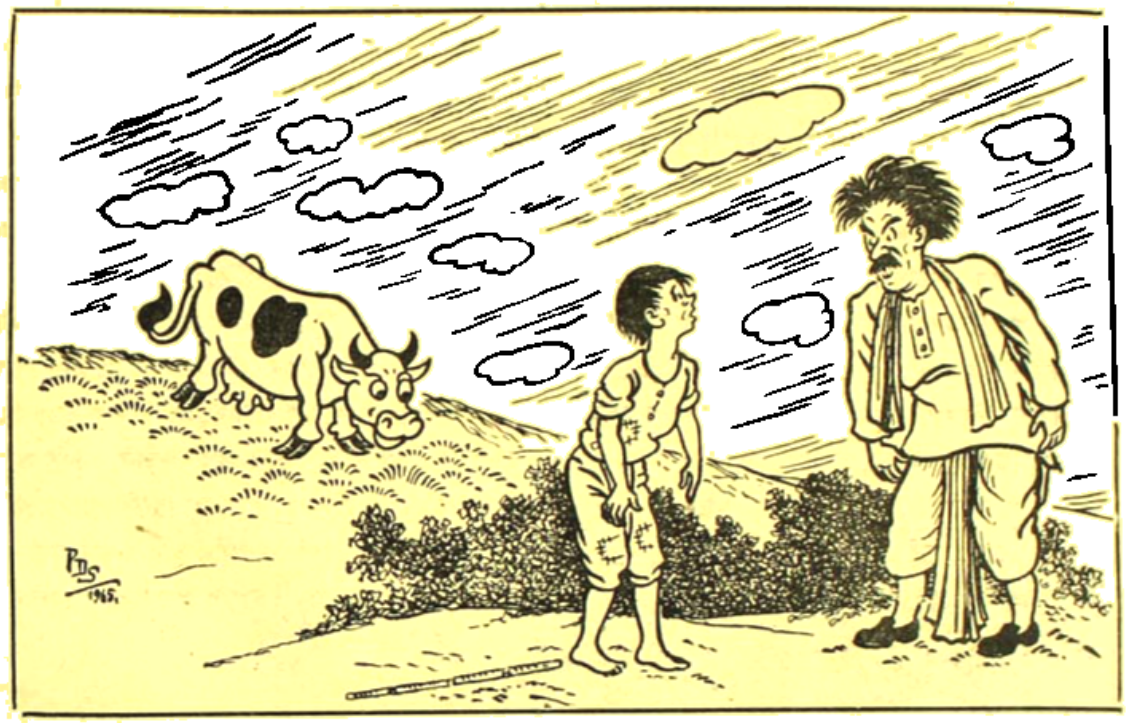

সমস্ত-গৃহস্থ : হাঁ হাঁ হাঁ·· করো কি···করো কি···সর্বনাশ করলে দেখছি !

স্তম্ভিত-গোপালক :·· ক্যানে ?···

সমস্ত-গৃহস্থ : দিন-কাল চলেছে কেমন···খেয়াল নেই এতটুকু !···চাল··· চিনি···গম···তেল···মাছ···দুধ·· সবই তো আজকাল দুর্মূল্য-দুষ্প্রাপ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে···সম্বল তো মাত্র ঐ মাঠের ঘাস-দুর্বো ক'টা···সেগুলোও যদি শেষ পর্যন্ত গরুর পেটে যায় তো বাঁচবে এবারে কি খেয়ে বাছাধন ?···আক্কেল হলো না এতদিনেও ?

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্মা

পাট ও পাঠ

শ্রীশ—

॥ উৎসব শেষে ॥

ভারতের তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের কলিকাতার অনুষ্ঠান সম্প্রতি শেষ হয়েছে। বিয়াল্লিশটি কাহিনী-চিত্র ও চৌত্রিশটি অল্পদৈর্ঘ্যের প্রামাণ্য চিত্র এক সপ্তাহ ধরে কলিকাতার ছয়টি চিত্র-প্রদর্শন গৃহে প্রদর্শিত হয়। তাছাড়া আরও কয়েকটি সিনেমা গৃহে প্রাতঃকালেও বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

সময়ের জন্য সিনেমা গৃহের সামনে দর্শকদের টিকিটের জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে আগে কখনও দেখা যায় নি। উৎসবে প্রদর্শিত চিত্রগুলির মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য না থাকলেও, দর্শক সাধারণের এই অভূতপূর্ব উৎসাহই এইবারকার চিত্রোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলা চলে। তবে এই উৎসাহ বা আগ্রহ বেশীর ভাগই হুজুগের। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, যাতে বিভিন্ন দেশের ছবি দেখান হচ্ছে এবং তা সেন্সার না করেই, সুতরাং তা নিশ্চয়ই এক অপূর্ব দ্রষ্টব্য বিষয়—এই ধারণার বশবর্তী হয়েই অনেকে, এবং তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই চলচ্চিত্র অনভিজ্ঞ, এই উৎসবের টিকিট সংগ্রহে আগ্রহী হয়ে পড়াতেই এরকম অদ্ভুত ভীড়ের সৃষ্টি হয়েছিল এবং তার ফলস্বরূপ অনেক অভিজ্ঞ চিত্ররসিক দর্শক টিকট সংগ্রহে সমর্থ হন নি। আর উৎকট আগ্রহ নিয়ে ও বহু কষ্ট সহ্য করে অতি

চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত বৃটিশ চিত্র "গানস্ এ্যাট বাটাসী"-র একটি দৃশ্য।

এবারকার এই উৎসবের একটি বিশেষত্ব, যা সাধারণে লক্ষ্য করেছেন, তা হল উৎসবের চিত্রগুলি দেখবার জন্য দর্শকসাধারণের অভূতপূর্ব আগ্রহ ও উৎসাহ। এর পূর্বের অনুষ্ঠিত উৎসব দুইটিতে কিন্তু এরকম আগ্রহ লক্ষিত হয় নি। চলচ্চিত্র দেখবার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা বা ততোধিক সাধারণ কয়েকটি চিত্র দেখবার পর ঐ সব হুজুগে দর্শকের মনের অবস্থা কি হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। আশা হয় ভবিষ্যতে এই ধরণের দর্শকরা হুজুগে না মেতে বুকে হেঁটে সিনেমার টিকিটের জন্যে লাইন দেবেন।

উৎসবে প্রদর্শিত কয়েকটি চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করলে

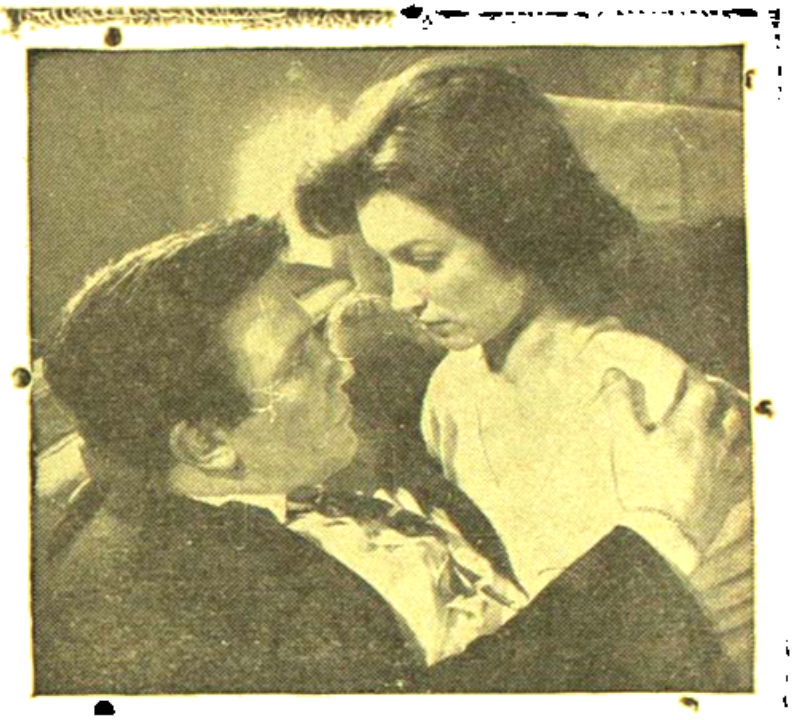

"স্যাটারডে নাইট্ অ্যাণ্ড সান্‌ডে মর্ণিং" চিত্রের একটি দৃশ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ছবিটিও উৎসবের আকর্ষণ ছিল।

*

বোঝা যায় অন্যান্য বারের তুলনায় এইবারকার চিত্রগুলির ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা মান যেন নিম্নগামী। এর কারণ বিশ্লেষণ করা অবশ্য খুবই কঠিন। তবে কয়েকটি প্রামাণ্য ও কাহিনী চিত্র যে চিত্তাকর্ষক হয়েছে এ কথা স্বীকার করতেই হবে। এর মধ্যে ডাচ্ নাগরীকদের প্রাত্যহিক জীবন নিয়ে তোলা "দি হিউম্যান্ ডাচ্" নামক প্রামাণ্য চিত্রটি সত্যই অপূর্ব্ব হয়েছে বলা চলে। লুকায়িত ক্যামেরার চোখে ওলন্দাজ নাগরীকদের জীবন যাত্রা তাঁদের অজান্তে অতি সুন্দর ভাবে ধরা পড়েছে, যা দেখে সর্ব্বদেশের দর্শকমাত্রেই প্রীত হবেন। কাহিনী চিত্রের মধ্যে সত্যকার উন্নত চিত্র বোধহয় একটিও ছিল না। অবশ্য মাত্র সাতদিনের মধ্যে উৎসবে প্রদর্শিত সব কয়টি চিত্র দেখবার সৌভাগ্য ও সামর্থ্য বোধ হয় সাধারণ কারুর পক্ষেই হয়ে ওঠে নি। তবে যে চিত্রগুলির খুব নাম ডাক শোনা গিয়েছিল সেগুলি দেখে অনেক চিত্ররসিকই হতাশ হয়েছেন। পোলাণ্ডের ছবির বিশেষ সুনাম আছে। পোলিশ চিত্র "কাফে ক্রম্ দি পাষ্ট" অনেকেরই ভাল লেগেছে। একবারও ফ্ল্যাশ্-ব্যাক্ না করে পাত্র পাত্রীর কথাবার্তার মধ্য দিয়েই অপূর্ব্ব কৌশলে পরিচালক বিগত দিনের ঘটনাগুলিকে দর্শক চক্ষে তুলে ধরেছেন। জাপানী চিত্রেরও বিশেষ সুনাম আছে বাজারে। কিন্তু তাঁদের নাম করা দীর্ঘ ছবি "লাইফ অফ্ ওহারু" অনেকের কাছেই একঘেঁয়ে ও বিরক্তিকর লেগেছে। "হারিকিরি" চিত্রটিও বিরক্তিকর সংলাপবহুল ও বীভৎস রসের বলে অনেকেরই ভাল লাগে নি। অবশ্য "ওকাসন্" ও "সেভেন সামুরাই" চিত্র দু'টি বিশেষ ভাল না হলেও অনেকেরই ভাল লেগেছে। বিশেষ করে "সেভেন সামুরাই"-এর গ্রামবাসী ও সামুরাইদের দস্যুদের হাত থেকে গ্রাম রক্ষার জন্য যুদ্ধের দৃশ্যগুলির বাস্তবানুগ চিত্রগ্রহণ সত্যই প্রশংসার যোগ্য। "ওকাসন্" চিত্রের সর্ব্বকালের সর্ব্বসহা জননীর চরিত্র অনেককেই তৃপ্তি দিয়েছে। সুদীর্ঘ ইতালিয়ান্ চিত্র "ব্যাড্ডেকার"-এ প্রথমদিকে দ্বীপের দৃশ্য ও কয়েকটি নর-নারীর মানসিক বিপর্য্যয়কে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হলেও শেষের দিকে ছবিটি কেমন যেন বিরক্তিকর ও একঘেয়ে হয়ে পড়েছে। বৃটিশ চিত্র "স্যাটারডে নাইট্ সান্‌ডে মর্ণিং" ও তেমন সুবিধার হয় নি বলেই অনেকের মত। কিন্তু বিশ্বখ্যাত পরিচালক ইংগেমার বের্গম্যান্-এর বিশেষ নাম করা ছবি "উইণ্টার লাইট"-কে অনেকেই ভাল বলেছেন, মনে হয় খ্যাতনামা পরিচালকের ছবি বলেই বোধ হয়। গীর্জার ধর্ম্মানুষ্ঠান, প্রৌঢ় ধর্ম্মযাজক ও তার প্রণয়িনীর অন্তর্দ্বন্দ্ব, যাজকের আত্মবিশ্বাসের ও ঈশ্বর বিশ্বাসের অভাব, চীনের বোমা ফাটানর

এখানে শ্রীউমেশ মল্লিক ও শ্রীমতী ল্যানেট্ বেনেট্‌কে দেখা যাচ্ছে।

বিলাতে একমাত্র বাঙ্গালী তথা ভারতীয় চিত্র-নাট্য লেখক ও প্রযোজক শ্রীউমেশ মল্লিক কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁর সিরাজদ্দৌলা ও লর্ড-ক্লাইভকে কেন্দ্র করে রচিত চিত্র-নাট্য "Treason and Triumpet"-কে সত্তর হাজার টাকায় বিক্রী করে দিয়েছিলেন। এবারে বিলাতী নিউজ এজেন্সী N. A. F. E. N.এর খবরে প্রকাশ যে উমেশ মল্লিক তাঁর কুখ্যাত খাঁন ও নূরজাহানকে কেন্দ্র করে লেখা আর একটি চিত্র-নাট্য "The Empress and the Envoy"-কে প্রায় দুই লক্ষ টাকায় বিলাতের A R G O বিশ্ব প্রতিষ্ঠানকে বিক্রী করে দিয়েছেন। এ ছবির সংলাপ রচয়িতা হলেন ল্যানেট্ বেনেট্। মাত্র ছয় মাসে শ্রীমল্লিক তাঁর রচিত তিনটি চিত্র-নাট্য দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকায় বিক্রী করে দিয়েছেন।

আতঙ্কিত ও বিকারগ্রস্ত এক ব্যক্তির আত্মহত্যা প্রভৃতি ঘটনার ও কথোপকথনের মাধ্যমে স্বল্প ধৈর্য্যের এই নাম করা চিত্র সম্বন্ধে ভাল ও মন্দ দু'রকম মন্তব্যই আছে। বিখ্যাত পরিচালকের নাম করা চিত্রকে ভাল লাগেনি বলায় অনেকেই হয়ত চিত্র-অনভিজ্ঞ ও অরসিক বলে পরিগণিত হবেন। কিন্তু তাদের ভাল না লাগলে মিথ্যা করে ভাল লেগেছে বলবেন কি করে? অবশ্য ক্যামেরার কাজ ও টেক্‌নিকের দিক দিয়ে ছবিটি যে অনবদ্য হয়েছে তা অনস্বীকার্য্য। সুদীর্ঘ "আমেরিকা, আমেরিকা" চিত্রটি অনেকের কাছেই একঘেয়ে লেগেছে। আমোদপূর্ণ ও ঘটনাবহুল বিশেষ নামকরা রঙীন বৃটিশ চিত্র "টম্ জোন্‌স" অনেককেই আনন্দ দান করলেও, নাম ডাক অনুযায়ী ছবিটির ষ্ট্যাণ্ডার্ড যে নয় তা বলা চলে। খ্যাতনামা সুইডিশ্ চিত্র "ওয়েডিং সুইডিশ্ টাইল্" তার যৌন আবেদনে একশ্রেণীর দর্শককে মুগ্ধ করলেও তাকে উন্নত চিত্রের সম্মান দেওয়া চলে না। আর যৌন আবেদন পূর্ণ

তুর্কির চিত্র "কন্ফারাস্ অফ্ দি গোল্ডেন্ সিটি"-কে বিকৃত রুচির একটি দৃষ্টান্ত বলা চলে। উৎসব অনুষ্ঠানে এরূপ চিত্রের স্থান হওয়াই উচিত নয়। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই চিত্রটির খুবই খ্যাতি শোনা গিয়েছিল! এর মধ্যে মহাকবি সেক্সপীয়রের অমর নাটক "হ্যাম্লেট"-এর ঐ নামেরই রুশ চিত্রায়নের গুণাগুণ সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহের অবকাশ ছিল। বিশেষ করে সার লরেন্স অলিভিয়ার কৃত "হ্যাম্লেট" চিত্র এখনও অনেকেরই চোখের সামনে ভাসছে। কিন্তু এই রুশ চিত্র "হ্যাম্লেট" অনেকস্থলে সার লরেন্সের হ্যাম্লেটকেও টেক্কা মেরেছে বলা চলে। অবশ্য অভিনয়ের দিক দিয়ে লরেন্স অলিভিয়ারের ধারে কাছে ঘেঁসতে না পারলেও ছবিটি অনেকেরই ভাল লেগেছে। চেকোস্লোভাকিয়ার "ভাট্ ক্যাট্" পশ্চিম জার্ম্মানীর "দি ভিসিট," পোলাণ্ডের "দি ইনো সেণ্ট সরসারার" প্রভৃতি আর কয়েকটি চিত্রও অনেক চিত্র-রসিক দর্শকের মন্দ লাগে নি। এর পর এই চিত্রোৎসবের প্রথম পুরস্কার "গোল্ডেন্ পিকক্" বা 'স্বর্ণময়ূর' প্রাপ্ত সিলোনের চিত্র "গ্যাথ পেরেলিয়া"-র সম্বন্ধে বলতে হয় যে চিত্রটি যখন প্রথম পুরস্কার 'স্বর্ণময়ূর' পেয়েছে বলে জানা গেল, তখন অনেকেরই মনে জিজ্ঞাসার উদয় হয়েছিল যে কি করে চলচ্চিত্র আসরে এই স্বল্পখ্যাত সিলোন প্রথম পুরস্কার বিজয় করল। কিন্তু ছবিটি দেখবার পর বোঝা যায় যে সর্ব্বগুণান্বিত না হলেও এবং কিছু কিছু ত্রুটি থাকলেও সাধারণ সিংহলি পরিবার এবং গ্রাম্য পরিবেশ নিয়ে নির্ম্মিত এই সিংহলি ছবিটির মানবিকতা, সরলতা ও শালীনতা রুচিবান দর্শকমাত্রেরই মনকে নাড়া দেবে। ছবিটি দেখতে দেখতে সত্যজিৎ রায়কে মনে পড়বেই, কিন্তু তবুও ছবিটিকে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবমুক্ত স্বাধীন সৃষ্টির স্বীকৃতিই দিতে হবে। পরিচালক লেষ্টার জেমস্ পেরিসকে তাঁর এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টায় ও প্রথম পুরস্কার বিজয়ের জন্য আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আশা করছি উত্তরকালে তাঁর কৃত চিত্র আরও আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হবে।

স্বল্প সময়ে উৎসবে প্রদর্শিত সব কটি চিত্র যে দেখা সম্ভব নয় তা আগেই বলেছি। প্রেস ইনফরমেশন্ ব্যুরো ক্যাথলিক ইন্ফরমেশন্ সেণ্টারে উৎসবের কয়েকটি চিত্র সাংবাদিকদের দেখাবার ব্যবস্থা করে প্রশংসাভাজন হয়েছেন। এর জন্য বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই শ্রীবি, পি, মাথুকে।

এবারের উৎসবের চিত্রগুলির মান উচ্চস্তরের না হলেও ভবিষ্যতের উৎসবের চিত্রগুলি উন্নত মানের হবে এই আশা নিয়ে রইলাম।

খবরাখবর :

গত বছর জাপানে যে সব ছবি মুক্তিলাভ করেছে তার মধ্য থেকে জাপান ট্রডকাস্টিং কর্পোরেশন ১৯৬৪ সালের দশটি শ্রেষ্ঠ ফিল্মের একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন।

তালিকাটি হল : (১) জুল এণ্ড জিম্ (ফরাসী), (২) দি লেপার্ড (ইতালীয়ান), (৩) লানে ডেরনিয়ের আ মারিয়েনবাদ (ফরাসী), (৪) থ্রু এ গ্লাস ডার্কলি (সুইডিশ), (৫) টম্ জোন্স (বৃটিশ), (৬) পাসাজেরকা (পোলিশ), (৭) হ্যামলেট (রাশিয়ান), (৮) শারাদ (আমেরিকান), (৯) ক্যামিলি ডায়েরী (ইতালিয়ান) ও (১০) এ গোষ্ট আট্ নুন (ফরাসী)।

কিন্তু কমিটি জাপানের "সুনা নো ওয়া" (স্যাণ্ড ওয়ান) ছবিটিকে সমগ্রতার বিচারে ১৯৬৪ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে অভিহিত করেছেন।

• • •

শ্রীমতী [redacted] কাহিনী অবলম্বনে নির্ম্মীয়মান "অভয়া শ্রীকান্ত" [redacted] নিয়মিত স্যুটিং সুরু হয়েছে হরিদাস ভট্টাচার্যের পরিচালনায়।

নায়ক রূপে বসন্তচৌধুরী ও অন্যান্য ভূমিকায় সুহৃদ রায়, বিকাশ রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপলকুমার প্রভৃতি এই ছবিটিতে অভিনয় করছেন। এর স্যুটিংয়ে নায়িকা মাধবী সিংহ অংশ গ্রহণ করবেন ফেব্রুয়ারী মাসে। এই ছবিখানি প্রযোজনা করছেন কানন দেবী।

• • •

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ এবং দেবশ্রী রায় শ্রীঅরুণ প্রোডাকসন্সের "মণিগাঙ্গুলী" ছবিতে তিনটি মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন। স্বরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিখানি পরিচালনা করছেন সলিল সেন।

সম্প্রতি এই ছবির কয়েকখানি গান লতা মঙ্গেশকর এবং সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে বোম্বাইয়ে রেকর্ডিং করা হয়েছে।

• • •

প্রযোজক আর, ডি, বনশল তাঁর নির্ম্মীয়মান 'কাঁচ কাটা হীরে" ছবির নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য বোম্বাইয়ের আভিনেত্রী ওয়াহিদা রেহমানকে চুক্তিবদ্ধ করার পরিকল্পনা করছেন।

নায়িকা ব্যতিরেকেই এই ছবির স্যুটিং সুরু হয়েছে সম্প্রতি অজয় কর পরিচালনায়। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সবিতা চট্টোপাধ্যায় ও ছায়াদেবী এর মুখ্য চরিত্রগুলিতে অভিনয় করছেন।

• • •

অজয় কর দ্বিতীয়বার ফিল্মসের দ্বিতীয় ছবি 'পলিতা প্রসঙ্গ' পরিচালনার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

সুচিত্রা সেন এই চিত্রের নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন খুব সম্ভব রবীন চট্টোপাধ্যায়।

• • •

পেশাদার চিত্রাভিনেতা শিল্পী এবং প্রচারবিদ পূর্ণেন্দু পত্রী এবার ছবি প্রযোজনা ও পরিচালনা করবেন।

তাঁর প্রথম ছবি হবে "ভেলেনাপোতা আবিষ্কার"। প্রেমেন্দ্র মিত্র ছবির কাহিনীকার।

মাধবী মুখোপাধ্যায় হবেন এই ছবির নায়িকা আর নায়ক হবেন জনৈক নবাগত অভিনেতা।

• • •

দূরের মানুষের বিষয়বস্তুর বহুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে "বিজয় প্রোডাকসন্স" নামের একটি নবগঠিত সংস্থা একটি ছবি তৈরীর সিদ্ধান্ত করেছেন। ছবিটির নামকরণও করা হয়েছে "দূরের মানুষ"। হিমালয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশে ছবিটি চিত্রায়িত হবে।

• • •

ইউনাইটেড ফিল্মে প্রোডিউসার্সের "থানা থেকে আসছি" ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তিমির বরণ।

অজিত গঙ্গোপাধ্যায় রচিত নাটক অবলম্বনে হীরেন নাগের পরিচালনায় ছবিখানির সুটিং শেষ হয়েছে।

এই ছবির নায়ক উত্তমকুমার এক পুলিশ ইনস্পেক্টরের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক, প্রশান্তকুমার, কমল মিত্র, তরুণ রায় এবং ছায়াদেবী।

• • •

দিলীপ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত বি-কে-এর প্রোডাকসন্সের 'শ্রীশ্রী মধুসূদন' চিত্রের চারখানি গানে কণ্ঠদান করেছেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও উৎপলা সেন। সুরারোপের কৃতিত্ব কালীপদ সেনের।

ইতিমধ্যে ছবিটির চিত্রগ্রহণ বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে। শিল্পীদের মধ্যে আছেন তরুণ গাঙ্গুলী, বিশিন গুপ্ত, প্রেমাংশু বসু, তরুণ রায়, রেণুকা রায় প্রভৃতি এবং নবাগত শিশু-শিল্পী শ্রীমান সুজিত।

শ্রীমুখোপাধ্যায় ছবিখানির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন এবং প্রযোজনাও করেছেন তিনি নিজে।

• • •

পরিচালক-অভিনেতা বীরেন গাঙ্গুলীর (ভি, জি) নতুন ছবি 'মনের মতন'-এর শুটিং শুরু হয়েছে। এই চিত্রের মুখ্যশিল্পীরা হলেন : অরুণকুমার, সন্ধ্যা রায়, কমল মিত্র, মণিশ্রীমানী দত্ত, তরুণ রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপ্তি রায়, সুমিতা সিংহ ও ললিনা দেবী।

রাইচাঁদ বড়াল ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনা করবেন এবং নৃত্য পরিকল্পনা করছেন প্রখ্যাত নিত্যবিদ উদয়শঙ্কর।

• • •

প্রখ্যাত অভিনেতা-পরিচালক-প্রযোজক রাজ কাপুর প্রচুর অর্থব্যয়ে "অবারা" নামে একটি ইংরাজী ছবি তৈরীর পরিকল্পনা করেছেন। এই চিত্রের নায়ক হবেন তাঁর ভাই শাম্মী কাপুর আর নায়িকা হবেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্না চিত্রাভিনেত্রী সোফিয়া লোরেন।

রাজ কাপুরের এই সম্পর্কে সোফিয়া লোরেনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য আগামী মার্চ মাসে সোফিয়া লোরেনের কাছে যাবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

অজন্তা গিরিগুহার পটভূমিকায় এই ছবি তৈরী হবে। রাজ কাপুর নিজে এই ছবি পরিচালনা করবেন এবং সম্ভবতঃ তিনিও ছবিখানির এক বিশেষ চরিত্রে অভিনয়ও করবেন।

• • •

'সান্ অব ইণ্ডিয়া'-খ্যাত ভারতীয় শিশুশিল্পী সাজিদ হলিউডের প্রখ্যাত কিং ব্রাদার্সের প্রযোজনায় নির্মীয়মান "দ্যাট্ দি ম্যাগনিফিসেন্ট" ছবিতে এক বিশেষ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। ছবিখানি পুরোপুরি ভারতেই তোলা হবে এবং সাজিদ ছাড়াও আর কয়েকজন ভারতীয় শিল্পী এবং কয়েকজন মার্কিণ চিত্রতারকাও এই চিত্রে অভিনয় করবেন।

• • •

ব্রডওয়ের সঙ্গীতমুখর নাটকগুলির মধ্যে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নাটক "মাই ফেয়ার লেডী"র চিত্ররূপটি এবারে নিউ-ইয়র্ক চিত্র-সমালোচকদের পুরস্কার লাভ করেছে। এই চিত্রে প্রফেসর হিগিন্স-এর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেতারূপে নির্বাচিত হয়েছেন রেক্সফ হ্যারিসন্।

নিউইয়র্ক চিত্র সমালোচকদের এই ত্রিশতম পুরস্কার-অনুষ্ঠানে বৃটিশ প্রযোজিত "দেয়ার্স নো ওয়েট আফটার্নুন" ছবিতে অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীরূপে নির্বাচিত হন কিম্ স্টানলী।

তোটে "গুকটরস্' গেইলাড"-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় "মাই ফেয়ার লেডী" শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে নির্বাচিত হয়। অন্যান্য যে ছবিগুলি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে, তার মধ্যে ছিল 'দি সার্জেন্ট,' 'বেকেট,' ও 'জোরবা দি গ্রীক্'।

সম্পাদনা : শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ঃ

সর্ব্বভারতীয় স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে উত্তরাঞ্চল স্কুল ক্রিকেট দল এক ইনিংস ও ১৬ রানে পূর্ব্বাঞ্চল স্কুল ক্রিকেট দলকে পরাজিত ক'রে 'কুচবিহার কাপ' জয় করেছে। উত্তরাঞ্চল দলের পক্ষে 'কুচবিহার কাপ' জয় এই প্রথম। আলোচ্য প্রতিযোগিতা নিয়ে পূর্ব্বাঞ্চল দল উপর্যুপরি পাঁচবার রানার্স-আপ হ'ল।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতার একদিকের সেমি-ফাইনালে উত্তরাঞ্চল দল এক ইনিংস ও ২৬৩ রানে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান পশ্চিমাঞ্চল স্কুল দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছিল। এই খেলায় উত্তরাঞ্চল দলের সুরিন্দর অমরনাথ (প্রখ্যাত টেষ্ট খেলোয়াড় লালা অমরনাথের পুত্র) ডাবল সেঞ্চুরী (২০৭ রান) করেছিলেন। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে পূর্ব্বাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসে বেশী রান করার দরুণ দক্ষিণাঞ্চল দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উত্তরাঞ্চল দলের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল।

ফাইনাল খেলার চতুর্থ অর্থাৎ শেষ দিনে চা-পানের নির্দ্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা আগে জয় পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। উত্তরাঞ্চল দলের অধিনায়ক অশোক গানধোত্রা সেঞ্চুরী (১৫৮ রান) করেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পূর্ব্বাঞ্চল স্কুলদল : ১৮৫ রান (জয়ন্ত বিশ্বাস ৭২ নট আউট এবং সুব্রত মুখার্জি ৩২ রান। অশোক গানধোত্রা ৩৪ রানে ৩, শ্যাম বিহারী ১১ রানে ২ এবং কৃষ্ণ মূর্ত্তি ৬৩ রানে ২ উইকেট পান) ও ১৮৮ রান (পি চক্রবর্ত্তী ৫২ এবং মোহন সিং ৩১ রান, এস অমরনাথ ২৪ রানে ২, প্রেম নারায়ণ ৩৪ রানে ২ এবং কৃষ্ণ মূর্ত্তি ৬২ রানে ৩ উইকেট পান।

উত্তরাঞ্চল স্কুল দল : ৩৭৯ রান (অশোক গানধোত্রা ১৫৮, এস ওলাতি ৬৭ এবং এস পি সিং ৫৬ রান। অরুণ ভট্টাচার্য্য ২৬ রানে ৩, এস মুখার্জি ৬২ রানে ২ এবং এস গাঙ্গুলী ৫২ রানে ২ উইকেট পান)

জাতীয় লন্ টেনিস ঃ

নিউদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ১৯৬৯ সালের জাতীয় লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের এক নম্বর খেলোয়াড় এবং বর্ত্তমানের এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান রমানাথন কৃষ্ণান পুরুষদের সিঙ্গলস এবং ডাবলস খেলার ফাইনালে জয়ী হয়ে 'ডিমুকুট' সম্মান লাভ করেছেন। পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী অসুস্থ থাকার দরুণ প্রতিযোগিতা থেকে অবসর নেন ; ফলে কৃষ্ণান জয়ী হ'ন।

মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে শ্রীমতী ভি ন'র জয়লাভ খুবই অপ্রত্যাশিত ঘটনা। ফাইনালে শ্রীমতী ল ১৯৬৯

সালের এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান কুমারী নিরুপমা বসন্তকে পরাজিত করেন।

স্কাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস : রমানাথন কৃষ্ণান অষ্ট্রেলিয়ার মার্টিন মুলিগানের বিপক্ষে 'ওয়াক ওভার' পান।

পুরুষদের ডাবলস : রামনাথন (ভারতবর্ষ) এবং মাইক স্যাংস্টার (বৃটেন) ৬-০, ৬-৩, ৪-৬ ও ৬-৩ গেমে মার্টিন মুলিগ'ন এবং বব্ হিউইটকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : শ্রীমতী ভি ল ৬-৪ ও ৬-৩ গেমে কুমারী নিরুপমা বসন্তকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : শ্রীমতী ল এবং বেগম খাঁ ২-৬, ৬-৩ ও ৮-৩ গেমে কুমারী নিরুপমা বসন্ত এবং কুমারী লীলা পাকাশীকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : কুমারী লক্ষ্মী মহাদেবন এবং রবি ভেংটেশ ৫-৭ ও ৬-১ গেমে কুমারী কোদাগোদা এবং বিনয় ধওয়ানকে পরাজিত করেন।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় নৌ-বাইচ :

ক'লকাতায় অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় নৌ-বাইচ প্রতিযোগিতায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দল সর্ব্বাধিক ২২ পয়েন্ট পেয়ে শ্যামলাল মুখার্জি স্মৃতি ট্রফি জয়ী হয়েছে। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৬ পয়েন্ট) এবং তৃতীয় স্থান পুণা বিশ্ববিদ্যালয় দল (৯ পয়েন্ট)। প্রতিযোগিতায় মাত্র এই চারটি বিশ্ববিদ্যালয়—যাদবপুর, ক'লকাতা, পুণা এবং লাক্ষ্ণৌ যোগদান করেছিল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতার তিনটি অনুষ্ঠানেরই ফাইনালে উঠে দুটিতে জয়ী হয়েছিল। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দুটি অনুষ্ঠানের ফাইনালে উঠে একটিতে জয়ী হয়। পুণা একটি অনুষ্ঠানের ফাইনালে উঠে রানার্স-আপ হয়।

ফেডারেশন কাপ :

১৯৬৫ সালের মহিলাদের আন্তর্জাতিক লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে অষ্ট্রেলিয়া ২—১ খেলায় আমেরিকাকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি দু'বছর 'ফেডারেশন কাপ' জয়ের গৌরব লাভ করেছে। ১৯৬৩ সালের প্রথম বছরের খেলায় আমেরিকা 'ফেডারেশন কাপ' পেয়েছিল। প্রতিযোগিতার সূচনা থেকেই অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা—এই দুটি দেশ ফাইনালে খেলেছে। ১৯৬৪ সালের ফাইনালে অষ্ট্রেলিয়া জয়ী হয় দুটি সিঙ্গলস খেলায় এবং আমেরিকা জয়ী হয় ডাবলসে।

ভারতবর্ষ বনাম সিংহল :

আমেদাবাদের প্যাটেল স্টেডিয়ামে ভারতবর্ষ বনাম সিংহলের তৃতীয় অর্থাৎ শেষ টেষ্ট খেলায় সিংহল ৪ উইকেটে জয়ী হয়। ফলে ভারতবর্ষ ২—১ খেলায় আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে 'রাবার' লাভ করে। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের ১৮৯ রানের উত্তরে সিংহল খেলার চতুর্থ দিনে খেলার সূচনাতেই ১৪৪ রানের (৭ উইকেটে) মাথায় নাটকীয়ভাবে প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। এইদিন লাঞ্চের ১০ মিনিট আগে মাত্র ৬৬ রানের মাথায় ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে খেলায় জয়লাভের জন্যে সিংহলের ১১২ রানের প্রয়োজন হয়। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ৪৫ মিনিট আগে সিংহল ১১৫ রান (৬ উইকেটে) তুলে ৪ উইকেটে জয়ী হয়। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র দু'জন—অম্বর রায় (২৬ রান) এবং রমেশ সাক্সেনা (১২ রান) দু'অঙ্কের ঘরে রান তুলেছিলেন ; অতিরিক্ত রান উঠেছিল ১৩।

ভারতবর্ষ : ১৮৯ রান (রমেশ সাক্সেনা নটআউট ৬৩ রান। জয়সিংহী ৩৮ রানে ৬ এবং (ফ্রেডরিক ৮৫ রানে ৪ উইকেট পান) ও ৬৬ রান ফ্রেডরিক ২৪ রানে ৩, জয়সিংহী ১৪ রানে ৩ এবং পোলোনোভিতা ৭ রানে ৩ উইকেট পান)

সিংহল : ১৪৪ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। পোলোনোভিতা ৫৩ এবং কার্ণাণ্ডো নটআউট ৩৮ রান। কুলকার্নী ৪৩ রানে ৪ এবং ভাস্করণ ৩৫ রানে ২ উইকেট পান) ও ১১৫ রান (৬ উইকেটে। কুয়ার্ড ৪০ রান। সোয়েল ৩৩ রানে ৪ উইকেট পান)।

হায়দরাবাদের কুতে ময়দান স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বে-সরকারী টেষ্ট খেলায় ভারতবর্ষ ৭ উইকেটে জয়ী হয়।

চতুর্থ দিনে ৩১৮ রানের মাথায় সিংহল দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে ভারতবর্ষের খেলায় জয় লাভের জন্যে ১৫৪ রানের প্রয়োজন হয়। তখন হাতে খেলার সময়

ছিল ১৪০ মিনিট। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভারতবর্ষ ১০০ মিনিটে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলেছিল। ভারতবর্ষের উইকেট-রক্ষক ফারুক ইঞ্জিনীয়ার ১০৩ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারতবর্ষ : ৫০৫ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। চান্দু বোরদে ১৩৮, এস এম জয়সীমা ১৩১ এবং হনুমন্ত সিং ৯৮ রান। ও ১৫৪ রান (৩ উইকেটে। ফারুক ইঞ্জিনীয়ার নটআউট ১০২)

সিংহল : ২৮০ রানে (এস জয়সিংহী ৭৮ এবং টি সি টি এডওয়ার্ড ৫৩ রান। সুব্তি ১১৩ রানে ৫, জয়সীমা ৪৪রানে ২ এবং কেন্টবাম্বেন ৪০ রানে ২ উইকেট পান। ও ৩৭৮ রান (এস জয়সিংহী ১৩৫ এবং মাইকেল টিসেরা ২২২ রান। সুব্তি ১৩০ রানে ৩ এবং চন্দ্রশেখর ৬১ রানে ৩ উইকেট পান)

হকি টেষ্ট :

নাগপুরে ভারতবর্ষ বনাম ফ্রান্সের পঞ্চম হকি টেষ্ট খেলায় ফ্রান্স ১—০ গোলে জয়ী হয়। মধ্যপ্রদেশে এই দুই দেশের ৬ষ্ঠ অর্থাৎ শেষ হকি টেষ্ট খেলায় ভারতবর্ষ ৩—০ গোলে ফ্রান্সকে পরাজিত করলে ভারতবর্ষ ৪—১ খেলায় আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে 'ধবার ১ লাভ করে। ভারতবর্ষ জয়ী হয় প্রথম টেষ্টে ৫—১ গোলে, দ্বিতীয় টেষ্টে ৩—১ গোলে, তৃতীয় টেষ্টে ৪—২ গোলে, চতুর্থ টেষ্টে ২—১ গোলে এবং ৬ষ্ঠ টেষ্টে ৩—০ গোলে। আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে ভারতবর্ষ গোল দেয় ১৭টা এবং ফ্রান্স ৬টা।

জাতীয় ভলিবল :

পুরুষদের পঞ্চদশ জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে হায়দরাবাদ ১৫—৮, ৪—১৫, ১৫—১১ ও ১৫—৬ পয়েন্টে পাঞ্জাবকে পরাজিত করে।

জাতীয় বাস্কেট বল :

কটকে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

ফাইনাল

পুরুষ বিভাগ : সার্ভিসেস ৮১—৪৮ পয়েন্টে মহীশূরকে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগ : পশ্চিম বাংলা ৪৪—১৯ পয়েন্টে দিল্লীকে পরাজিত করে।

বালক বিভাগ : মাদ্রাজ ৬৮—৬০ পয়েন্টে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে।

ইংল্যাণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা :

জোহানেসবার্গে ইংল্যাণ্ড-দক্ষিণ আফ্রিকার বে-সরকারী দ্বিতীয় টেষ্ট খেলাটি অমীমাংসিত থেকে যায়। বৃষ্টিই ইংল্যাণ্ডের জয়লাভের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে মাত্র দু'ঘণ্টা খেলা হয়েছিল—খেলার বাকি সময়টা বৃষ্টিতে ধুয়ে যায়। ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের ৫৩১ রানের উত্তরে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম ইনিংসের খেলায় ৩১৭ রান করে 'ফলো-অন' করতে বাধ্য হয়। খেলার শেষ দিনে দেখা গেল দক্ষিণ আফ্রিকার ৬ উইকেট পড়ে ৩৩৬ রান দাঁড়িয়েছে। খেলায় সেঞ্চুরী করেন ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ডেভ ডেক্সটার (১৭২) এবং কেন ব্যারিংটন (১২১) এবং দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে কলিক ব্র্যাণ্ড (নটআউট ১৪৩)। নেহরু হকি প্রতিযোগিতা :

দিল্লীর হার্ডিঞ্জ মাঠে অনুষ্ঠিত নেহরু স্মৃতি হকি প্রতিযোগিতার প্রথম বছরের ফাইনালে নর্দার্ণ রেলওয়ে ২-০ গোলে সাউথ ইষ্টার্ণ রেল দলকে পরাজিত ক'রে উদ্বোধন বছরে নেহরু স্মৃতি কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে।

এশিয়ান লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা :

১৯৬৪ সালের এশিয়ান লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় অষ্ট্রেলিয়ার রব্ হিউইট তিনটি অনুষ্ঠানের ফাইনালে খেলে দুটি খেতাব (পুরুষদের ডাবলস এবং মিক্সড্ ডাবলস) পেয়েছেন। ভারতবর্ষের এক নম্বর খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণাণ ষ্ট্রেট সেটে রব্ হিউইটকে পরাজিত করে উপর্যুপরি তিনবার পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পান। ডাবলসের ফাইনালে অষ্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত রব্ হিউইট এবং মার্টিন মুলিগানের বিপক্ষে ভারতীয় জুটি কৃষ্ণান এবং নরেশকুমার প্রথম দুটো সেটে জয়ী হয়ে পরবর্তী দুটো সিটে পরাজিত হলে খেলার ফলাফল সমান ২—২ দাঁড়ায়। কিন্তু নরেশ কুমার বুড়ো আঙুলে জোর আঘাত পাওয়াতে তাঁর পক্ষে আর খেলা সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়ে ভারতীয় জুটিকে এই

অবস্থায় খেলা থেকে অবসর নিতে হয়। মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে মহারাষ্ট্রের কুমারী নিরুপমা বসন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান এবং এ বছরের এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় কুমারী লক্ষ্মী মহাদেবনকে পরাজিত ক'রে সিঙ্গলস খেতাব পায়। মিক্সড ডাবলস খেতাব পান বব্ হিউইট এবং তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী ডি হিউইট।

জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা :

১৯৬৪ সালের জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় রেলদল অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। রেলদল দলগত বিভাগের তিনটি 'সিনিয়র' খেতাবের মধ্যে দুটি খেতাব এবং ব্যক্তিগত বিভাগের পাঁচটি সিনিয়র খেতাবই পায়। রেলদলের কুমারী মীনা সাহ 'ত্রিমুকুট' সম্মান পান – মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস খেতাব। প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গলস এবং মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে রেলদলের খেলোয়াড়রাই কেবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন দলগত। চ্যাম্পিয়ানশীপে মহারাষ্ট্র তিনটি বিভাগের (পুরুষ, মহিলা ও জুনিয়র) ফাইনালে খেলে কেবল জুনিয়র খেতাব পায়। পুরুষ ও মহিলা বিভাগের ফাইনালে জয়ী হয় রেলওয়ে দল।

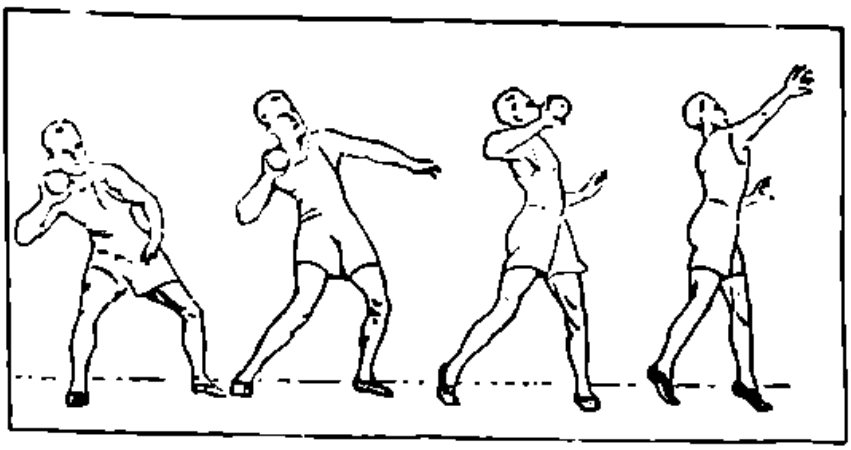

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০।৩।১২, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ৫।২।৬৫ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

হাটের পথে

শিল্পী : [illegible]

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ফাল্গুন—১৩৭১

দ্বিতীয় খণ্ড | দ্বিপঞ্চাশত্তম বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

সত্য

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

ব্রহ্ম সত্য ; ঈশ্বর সত্য। সত্যই ব্রহ্ম সত্যই ঈশ্বর। সত্যের অর্চনাই ঈশ্বরের অর্চনা। এক কথায় সত্যব্রতে ব্রতী হ'লে পরম ব্রতধারী হওয়া যায়। সত্যপথে চললে দেবযান পথে অগ্রসর হওয়া সুগম হয়। তৈত্তিরীয়োপনিষদে উক্ত হয়েছে—ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, সৎস্বরূপ। এ জগতে যা কিছু দৃশ্য ও অদৃশ্য তা সবই সত্যে প্রতিষ্ঠিত। ঋষি উদ্দালক, পুত্র শ্বেতকেতুকে বলছেন—"এই সমগ্র জগৎ তদাত্মক, একমাত্র তিনিই সৎ ও সত্যরূপে বিরাজিত। হে শ্বেতকেতু, তুমিও তাই অর্থাৎ তুমিও সৎ ও সত্য স্বরূপ ব্রহ্ম।"

সুতরাং সত্যের অপলাপ হেতু জীব আত্যন্তিক শোক সাগরে হয় নিমজ্জিত। মানুষ যখন সত্যকে বিস্মৃত হ'য়ে অসত্যের শরণ নেয় কিম্বা অসত্যকে স্মরণ করে তখনই পায় অশেষ দুঃখ, কারণ মানবের যে আনন্দ তা আসে সত্য থেকে। এই হ'ল জীবের শাশ্বত ধর্ম। তা ছাড়া যা হ'চ্ছে, যা হবে তার মূলে রয়েছে সত্য। যখন আমরা স্ব স্ব কর্তৃত্ব ও অহঙ্কারবশতঃ সত্যকে নস্যাৎ করে দিতে চেষ্টা পাই, তখনই আসে অমরার আঘাত ও অভিশাপ। সে আঘাতের ক্ষত স্থান নিরাময় করতে হ'লে সত্য ধর্মের প্রলেপ দিতে হয়। সে অভিশাপ থেকে নিষ্কৃতি পেতে হ'লে সত্যেরই আশ্রয় লাভ করতে হয়। অর্থাৎ সত্য-

ধর্মে ব্রতী হতে হয়। মহাভারতে ব্যাসদেব সেই হেতু বলেছেন—(সত্যং ব্রতপরং ব্রতম্।) সেই ব্রতে ব্রতী হ'য়ে রক্ষা করতে হয় সত্য ধর্মকে। আর সে ব্রত পালন করতে হ'লে যে তপস্যা করা হয়, সে তপস্যারও মূলে রয়েছে সত্য ("নাস্তিসত্যাৎপরং তপঃ") অর্থাৎ ব্রত পালনে, তপস্যা করলে সত্যের প্রয়োজন। জীবনে শান্তি ও সুখ লাভ করতে হলে সত্যধর্মাশ্রয়ী হওয়া একান্ত অপরিহার্য।

ধর্ম ব'লে যা আমরা জানি ও মানি, তাও সত্যের মণিময় নিয়মশৃঙ্খলাবদ্ধ। সেই ভাবে বদ্ধ হ'য়েই নিত্য নিজ অভ্যাস ও আচার আচরণের দ্বারা সত্য ধর্ম প্রতিপালিত হ'য়ে থাকে। (যথা—"যো বৈ ধর্মঃ সত্যং বৈ তৎ" বৃহদারণ্যক।) (মহাভারতকারও বলেছেন—"নাস্তি সত্যাৎপরো ধর্মঃ।") সুতরাং ব্রত, তপঃ ও ধর্ম রক্ষার্থে একমাত্র সম্বল ঐ সত্য। বাস্তবিকপক্ষে জীবন পথে অগ্রসর হতে হ'লে—এমন কি শ্বাস, প্রশ্বাস, নিমেষ উন্মেষের বেলায়ও সত্যকে বুকে ধরে রাখতে হয়। বলতে গেলে রাখতে হয় নয়—বুকের দুরুদুরুতে নয়নের মণি যুগলে সত্যই বিরাজিত। যদি বল যে সত্য বিনা কি জগতে বিচরণ করা যায় না? তাহ'লে বলবো—সত্য বিনা বিচরণ করা তো দূরের কথা আমাদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তবে হাঁ সত্যকে ভুলে চললেও চলতে পারে। এ জগতে মানুষ, পশু, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গম প্রভৃতি যা কিছু আছে তার না আছে সীমা ও সংখ্যা। এদের অনেকেই সত্য সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ, তথাপি তারা সত্যচ্যুত হ'য়ে নেই। কিন্তু মানুষের সঙ্গে এদের তুলনামূল্য করাও যায় না, কেননা মানুষ জগতের শ্রেষ্ঠ জীব—তার মাঝে রয়েছে বুদ্ধি বিচার ও বিবেক প্রভৃতি গুণ ও ধর্ম। সে সবকে দূরে সরিয়ে রেখে পশুর মত জীবন নির্বাহ করলে এক-প্রকার হ'তে পারে। পরন্তু মানুষ অন্ধকারের জীব নয়। আলোর পথে, সত্যের পথে চলাই তার ধর্ম। যারা মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে অসত্য পথে, অন্ধকার পথে চলে, তারা ঐ নিশাচর প্রাণীরই তুল্য। এতো নয় মানবের শাশ্বত ধর্ম। একে বলবো তমসাচ্ছন্ন আসুরী ধর্ম। অতএব মানুষ বলে গণ্য হবার জন্যে সত্যকে অন্তরের অমূল্য অলঙ্কার করে নেওয়া একান্ত দরকার। তিনি সত্য, জীব সত্য, জগৎও সত্য—এই মহাভাবে ভাবিত হ'য়ে সত্যকে মণিময় মুকুট করে শিরে ধারণ করলে লাভ হয় দেবত্ব।

ভারতবর্ষে উশীনর নামে এক সত্যনিষ্ঠ ন্যায়বান ও ধর্ম-পরায়ণ রাজা ছিলেন। একদা তিনি সিংহাসনে বসে আছেন এমন সময় একটি ভয়ার্ত পারাবত এসে তাঁর কোলে আশ্রয় নিল। রাজা তাকে প্রাণ দিয়েও রক্ষা করবেন বলে সত্যবদ্ধ হ'লেন। এমনি সময়ে একটি ক্ষুধার্ত বাজ-পাখী এসে রাজার কাছে আবেদন করলো—তার ভক্ষ্য পারাবতকে ছেড়ে দেবার জন্যে। রাজা আশ্রিতকে ছেড়ে দিতে পারলেন না। তা যদি করেন তবে তিনি হবেন সত্যভ্রষ্ট। বললেন—"তুমি যখন ক্ষুধার্ত, তোমার কি মাংস প্রয়োজন বল, পারাবতের সম পরিমাণ মাংসই দেব।"

বাজপাখী বললো—"পারাবতের মাংসতুল্য কেবল আপনারই দেহের মাংস হ'তে পারে, সুতরাং ঐ দেহের মাংসই প্রদান করুন।"

রাজা উশীনর তুলাদণ্ডের এক পাল্লায় পারাবতকে বসিয়ে নিজের দেহ থেকে মাংস কেটে কেটে দিতে লাগলেন। কিন্তু আশ্চর্য পারাবতের সমান আর হয় না। শেষ পর্যন্ত নিজেই পাল্লায় উঠে বসলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে দেখা গেল—সেই পারাবত ও বাজপাখীর পরিবর্তে ইন্দ্র ও অগ্নিদেবকে। অনন্তর ইন্দ্র তাঁর স্পর্শ দিয়ে রাজাকে দিব্য দেহ দান করলেন।

গল্পে যদিও দানশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, তথাপি এই দান সত্যের প্রোজ্জ্বল বিভায় যে সম্ভব হয়েছিল তা সত্যের আলোক সম্পাতে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে। এর মাঝে রয়েছে ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠা। সত্য রক্ষা করেই আশ্রিতকে রক্ষা করেছিলেন।

এমনি দাতাকর্ণ পুত্র বৃষকেতুকে কেটে ব্রাহ্মণের কামনা পূর্ণ করেছিলেন এবং ইন্দ্রকে কবচকুণ্ডল দান করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন। আর হরিশ্চন্দ্র রাজা, রাজ্য হারিয়ে অশেষ দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছিলেন—এসব যে সম্ভব হয়েছিল তা একমাত্র সত্যনিষ্ঠার বলে। সত্যকে ঢেকে চেপে রাখা যায় না—সে চিরপ্রকাশমান। একদিন না একদিন তার প্রকাশ ঘটবেই। তাই সত্য ঘটনাকে মিথ্যার আবরণ দিয়ে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা মূঢ়তা মাত্র। যেমন অগ্নিকে তুষ দিয়ে চাপা দিলে ক্রমে ক্রমে সেগুলো পুড়ে গিয়ে অগ্নি

প্রকাশিত হয় তেমনি সত্যও। সত্য ঘটনাকে লুকিয়ে রাখতে গিয়ে যে মিথ্যাবরণ টানা হয় তা নিছক বাতুলতা মাত্র। তা যেন নদীর বৈকল্পের বালুর বাঁধ। কিম্বা মেঘমালা যতই ঢাকতে চেষ্টা করুকনা কেন সূর্যকে—কখনই ঢাকা পড়েনা,তার প্রখর প্রতাপে মেঘগুলোই পাখনা গুটিয়ে সরে পড়ে এবং এক সময় প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে সূর্যের অম্লান মুখে তেমনি মিথ্যা ও সত্যের সম্বন্ধ। আর একটা কথা জানা দরকার যে সত্যকে ঢাকা চাপা দিতে গিয়ে যে সব মিথ্যার পর মিথ্যা সাজাতে হয়, যার ফলে অবশেষে এমন একটা সময় আসে মিথ্যার প্রাচীরটি এত সাজিয়ে গুছিয়েও ধ্বসে পড়ে এবং সত্যের পবিত্র উজ্জ্বল মুখখানি দৃষ্ট হয়।

মহারাষ্ট্র দেশের মহারাজ শিবাজী শয়ন কক্ষে নিদ্রায় মগ্ন। মালোজী নামক এক যুবক শিবাজীকে হত্যা করার জন্যে গোপনে প্রবেশ করলো। হাতের তীক্ষ্ণধার তরবারী তুলেছে—ঠিক সেই মুহূর্তে সেনাপতি তানাজী তলোয়ারটি ধরে ফেললেন এবং বজ্রকণ্ঠে বললেন—"আততায়ী"।

শিবাজী চমকে উঠলেন। নিদ্রাজড়িত চোখ মেলে দেখলেন যুবকটির হাতে তলোয়ার। তানাজী তাকে আটকে রেখেছেন। ছেলেটিকে দেখাচ্ছিল নির্ভীক পুরুষ বলে, আর চোখদুটি বীর্যোদীপ্ত হয়ে জল জল করে উঠেছে।

শিবাজী তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে তার পিতা ছিল মহারাজের সেনাদলের একজন সৈনিক। এক যুদ্ধে তার পিতা নিহত হওয়ায় এখন তারা অত্যন্ত দুঃখে পড়েছে। বৃদ্ধা জননী অসুস্থ হ'য়ে বাড়ীতে পথ্য ও ঔষধ অভাবে মরতে বসেছে—আর এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী মহারাজ স্বয়ং। আরো অবগত হ'লেন যে শোভন রায়ের ইচ্ছানুসারে তার কার্য সিদ্ধি হেতু সে এসেছে মহারাজকে হত্যা করতে, আর তার পুরস্কার স্বরূপ পাবে অনেক অর্থ।

শিবাজী যুবকের সত্যনিষ্ঠায় মুগ্ধ হ'য়ে ছিলেন এ কথা স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় পরবর্তী ঘটনা থেকে। মহারাষ্ট্রপতি এবার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—তুমি নিশ্চয়ই জানতে পেরেছ এই অপরাধের জন্য তোমার কী দণ্ড।

এবারও মালোজী নির্ভয়ে উত্তর দিল—"জানি মহারাজ মৃত্যু দণ্ড, তাতে আমার কিছুমাত্র ভয় নাই—তবে আমার একটি নিবেদন আছে—মৃত্যুর পূর্বে একবার মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা দরকার। অনুগ্রহ করে আজকের রাতটা আমাকে সময় দিন, মায়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁর চরণ ধূলি নিয়ে আগামী কাল প্রত্যূষে আসবো।"

শিবাজী বললেন—"তার প্রমাণ ?"

যুবক বললেন—"প্রমাণ রাজপুতের সত্যনিষ্ঠা।"

মহারাজ যুবককে সময় দিয়েছিলেন। পরদিন প্রত্যূষে এসেছিল এবং তার মৃত্যুদণ্ডের বদলে তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত রক্ষী হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন।

এখানে আমরা প্রত্যক্ষ ক'রলো যা সত্য, তা ব্যক্ত হ'য়ে পড়লো। আর সত্যনিষ্ঠার পুরস্কারস্বরূপ পেয়েছিল মহারাজের হৃদয়ের স্নেহ প্রীতি।

আর এটি সম্ভব হয়েছিল মহারাজ নিজেই তো ছিলেন পরম সত্যপরায়ণ।

সত্যের অনির্বাণ আলোয় হৃদয় একবার আলোকিত হ'লে জগতের কোন মিথ্যার কালিমা সে আলোকে ম্লান করতে পারেনা। কারণ সত্য যে চির অম্লান, সে যে চিরজ্যোতিষ্মান। জগতের ও জীবের কল্যাণ হেতুই যে তার নিত্য আবির্ভাব। বিশ্বের মঙ্গল বিধানের জন্যই তার নবনব রূপে প্রকাশ। সুতরাং সেই শাশ্বত নিত্য অখণ্ড সত্যকে কেমন করে ত্যাগ করবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন—"মা তোমার পায়ে সঁপি দিলাম তবে সত্যটুকু আমার থাকলো !" সত্য একান্ত অন্তরের সামগ্রী। তাকে ত্যাগ করা যায় না। তাকে পরিত্যাগ করলে নিজেরও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

স্থির নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি থেকে জানা যায়—সত্যস্বরূপ হ'তে হবে, যেমন আত্মাকে কেউ পরিত্যাগ করতে পারে না,আত্ম স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হয়। যেমন ভগবানের আমি অর্থাৎ ভগবানের হ'তে হয়—তেমনি আমি সত্যের এই বুদ্ধিতে সমাসীন হ'তে হয়। আবার যেমন অনেকেই বলে আমার ভগবান—তেমনি আমারি সত্য এই বোধেও স্থিত হতে পারা যায়। এই ত্রিবিধ ভাব ও বোধের মাঝে সত্যেরই আমি—এই ভাবই·· বোধই সর্বোত্তম।

জীবনে মিথ্যাকে বরণ করে নেওয়ার মত শোচনীয় পরাজয় সম্ভবতঃ এ ধরায় আর কিছুই নাই। একথা মনে রাখা দরকার যে আমি যেমন অপরের সত্যতাকে ভালবাসি

তেমনি অপরেও আমার সততা প্রত্যাশা করে। অর্থাৎ কেউ আমার কাছে মিথ্যাচারী বলে প্রতিপন্ন হলে তার প্রতি তুষ্ট হ'তে পারা যায় না, ঠিক তেমনি অপরেও আমার মিথ্যাচারে তুষ্ট হ'তে পারে না। এ বিষয়ে সচেতন হ'লে অনেক সময় সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকতে সুবিধেই হয়। সহসা সত্যভ্রষ্ট হ'তে হয় না।

মানুষ কর্তৃত্ব ও অহঙ্কারের দাস। তার ফলে সে সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য করতে চেষ্টা ক'রে তৃপ্ত ও বেহাই পেতে চায়। কিন্তু সনাতন সত্যের বিচার সত্যটাই সে-ক্ষেত্রে তাদের মানস পটে উজ্জ্বল ধ্রুব নক্ষত্র হয়ে পরিদৃষ্ট হয়।

অযোধ্যার রাজা দশরথ একদা এক যুদ্ধে সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েছিলেন। তাঁর ছিল তিন রাণী—কৈকেয়ী কৌশল্যা ও সুমিত্রা। কৈকেয়ী আন্তরিক আগ্রহ সহকারে তাঁর সেবা করেছিলেন। ফলে দশরথ খুশি হ'য়ে দুটো বর প্রার্থনা করতে বললেন। কৈকেয়ী সঙ্গে সঙ্গে বর না নিয়ে সময় মত নেবেন বলে সেদিনের সুখময় দিনটিকে আরো মধুময় করে তুললেন। সময় স্থির হ'য়ে বসে থাকেনা। কালের গতিও স্তব্ধ হ'য়ে রয়না। তাছাড়া নিয়তিকে কেউ ডিঙিয়ে যেতে পারে না। জাগতিক নিয়মে দশরথের হ'ল চার ছেলে—কৌশল্যার গর্ভে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। কালের অলঙ্ঘ্য নিয়মে দশরথ হলেন বৃদ্ধ। জ্যেষ্ঠপুত্র রামও উপযুক্ত হ'য়ে উঠেছেন। তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে দশরথ যাবেন বানপ্রস্থাশ্রমে। রাজ্যের ঘরে ঘরে রাজ্যাভিষেক, সারা রাজ্যে মহানন্দের সাড়া পড়ে গেছে। ঠিক এমনি সময়ে কৈকেয়ী মহারাজের কাছে তাঁর প্রতিশ্রুত বর প্রদান করে সত্যের মর্যাদা রক্ষা করার আহ্বান জানালেন। দশরথ উৎসুক নেত্রে প্রার্থনার বিষয় জানতে চাইলেন। কৈকেয়ী বললেন—"এক বরে রামের হ'ক চৌদ্দ বছর বনবাস এবং অন্যবরে ভরতের হোক রাজ্যাভিষেক।"

দশরথ যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তাঁর স্মরণে এলো অন্ধমুনির অভিশাপ। পুত্র শোকে কাতর হ'য়ে মূর্চ্ছিত হ'লেন দশরথ……অনন্ত কালের জন্য চোখ বুজলেন। তারপর পিতার সত্যরক্ষার্থে রামচন্দ্র গেলেন বনে, অনুগামী হ'লেন সীতা ও লক্ষ্মণ। এখানে সত্যের নিয়মটি অনুধাবন যোগ্য—

অতএব যাঁরা প্রকৃত ধার্মিক, জ্ঞানী—তাঁরা এমনি করে সত্যকে একমাত্র সত্যবলে মেনেন এবং সত্যাশ্রয়ী হন। সেই সঙ্গে মিথ্যাকেও সত্যাগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিয়ে সত্য করে নেন।

এ দুনিয়ায় সত্য ও মিথ্যার বিচার করা বড়ই কঠিন। দেশ কাল পাত্র হিসেবে অনেক সময় সত্য মিথ্যার রূপ নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। যেমন ধরুন একটি সোজা কাঠিকে কোন একটি জল পূর্ণ গ্লাসে ডুবিয়ে রাখলে দেখা যাবে কাঠিটি বাঁকা—আসলে আমরা সোজা কাঠিই ডুবিয়েছি। যেমন আমাদের মনে হয় পৃথিবী স্থির রয়েছে, সূর্যই সবে সরে যাচ্ছে—তারই ফলে দিন রাত্রি হচ্ছে। কিন্তু সত্যকথা এই যে পৃথিবীই সূর্যকে পরিক্রম করছে। অবশ্য সূর্যও যে ঘুরছে না এমনও নয়, তবে নিশ্চয়ই সে পৃথিবীকে করছেনা পরিক্রম। আবার চন্দ্র যে স্নিগ্ধ কিরণ দিচ্ছে তা তার নিজস্ব কিরণ নয়, ওতো সূর্যের থেকে ধার করা আলো, তবু আমরা বলি "চাঁদের কিরণ পড়ছে ঘরে দুয়ার পরে।" ইলেকট্রিক পাখা ঘুরছে বন বন করে মাথার উপর, কিন্তু মনে হয় রয়েছে সুস্থির। এক খণ্ড চুম্বক শলাকা নিয়ে দেখলে দেখা যাবে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু বলে যা চিহ্নিত করা হ'য়েছে তা উত্তরটা দক্ষিণ ও দক্ষিণটা উত্তর হওয়া দরকার, কারণ সমপ্রকৃতির মেরু বিকর্ষণ ও অসমপ্রকৃতির মেরু আকর্ষণ করে এই হচ্ছে সূত্র—তবে পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ মেরু আর চুম্বক শলাকার উত্তর দক্ষিণ মেরু একই দিকে নির্দেশ করতে পারেনা। সুতরাং এক্ষেত্রে মিথ্যাকে সত্যবলেই ধরে নিতে হচ্ছে। এই ভাবে জ্যামিতির বহু বিষয়কে মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা বলে মেনে নিয়েছি, সুতরাং আমার বুদ্ধি ও জ্ঞানমত যা সত্য তা তোমার বুদ্ধিও জ্ঞান মত নাও হ'তে পারে। সত্যকে যথার্থ কোন রূপগুণ দিয়ে বিশেষণ প্রয়োগ করে চিহ্নিত করা যায় না—যেমন করে ব্রহ্মকে ঈশ্বরকে কোন কিছুদিয়ে চিহ্নিত করা যায় না বা কোন সীমারেখা টেনে স্থিরকরা যায় না যে ঈশ্বর এই ব্রহ্ম—এই তেমনি সত্যের বেলায়।

একদময় চারজন অন্ধবন্ধু বসে বসে হাতীর স্বরূপ

জানবার ইচ্ছা করলো। কিছুদিন পরে একটি হাতী এসে পড়লো। ঐ চারবন্ধু একজন হাতীর লেজ, একজন পা, একজন শুঁড়, আর জন কান ধরলো। যে লেজ ধরেছিল সে বলে হাতী দড়ির মত। যে পা ধরেছিল বলে থামের মত, শুঁড় যে ধরেছিল সাপের মত, কান যে ধরেছিল বললো কুলো। মত। আসলে হাতী হাতীরই মত, ওগুলো তার এক একটি অংশ মাত্র। অথচ তারা প্রত্যেকের উপলব্ধিতে অটল অটল সত্যনিষ্ঠ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ থেকে এমনি একটি গল্প জানতে পারি—তা হ'চ্ছে বহুরূপীর। একদা চার বন্ধু এক এক সময়ে একটি বহুরূপীকে দেখেছিল। বহুরূপী নিয়ে একদিন তাদের আলোচনা আরম্ভ হ'ল, তাতে একবন্ধু বললো—বহুরূপী নীল, দ্বিতীয় বন্ধু বললো সবুজ, তৃতীয় বন্ধু বললো নাহে না ওটা হলদে—তাদের বাধা দিয়ে বিজের মত চতুর্থ বন্ধু বললে বহুরূপী লাল। আসলে তারা কেউই বহুরূপীর রূপসম্বন্ধে সম্যক পরিচিত নয়, কারণ তার নাহেই সে পরিচিত। অর্থাৎ সে এক সময় এক এক রূপে হয় প্রকাশিত। অথচ চার বন্ধুই তাদের নিজ নিজ দর্শনে সত্যনিষ্ঠ। তথাপি বলবেন—বহুরূপী বহু রূপ ধার।

একদা এক রাজার চারজন ছেলে ইচ্ছা করলো পলাশ গাছ দেখবে। তারা পলাশ সম্বন্ধে অনেক কাব্য কবিতা শুনেছে এবং পড়েছেও। তাই তাদের মন পলাশের জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, বড় ছেলে একদিন একজন গাইড নিয়ে পলাশ কুঞ্জে গিয়ে দেখে এলো—পত্র-পুষ্প হীন পলাশের বন। কয়েক মাস পরে মেজো ছেলে গিয়ে দেখলো—শ্যামল পত্রবহুল পলাশ। তার কয়েক মাসপরে সেজো ছেলে গিয়ে দেখলো ফুলে ফুল ময় রাঙ্গা পলাশ। কয়েক মাস পরে ছোট ছেলে গিয়ে দেখলো ফলভারে নম্রনত পলাসের কুঞ্জ। আসলে তারা পলাসের এক এক সময়ের রূপ দেখেছে। যে পলাসের সম্যক খবর রাখে সে জানে এই চারটি অবস্থাই পলাশের জীবন জুড়ে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে—তাইতো একে অন্যের দর্শনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে পিছপা হবে না। যখন তারা একত্রে আলোচনায় বসবে—অথচ প্রত্যেকে দেখেছে যা তা ছিল তাদের সত্যদর্শন। অতএব আমরা সত্য ও মিথ্যা সম্বন্ধে খুব অল্পই অবগত আছি, তবু মনে করি এ জগতের সব কিছুই আমাদের জানা। এর মাঝখান থেকে আমরা একটি সত্যে আসতে পারি—এই নিখিল বিশ্বের সব কিছুই সত্য কিম্বা সব কিছুই মিথ্যা। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলেছি মানুষ আলোর প্রার্থী। অমৃতের সন্তান সুতরাং মিথ্যা নিয়ে অন্ধকার দিয়ে গরল বা মৃত্যু দিয়ে নিজেকে এবং জগতকে ঢাকতে যাব কেন (?) অথবা ভরিয়ে তুলবো কিসের জন্যে ? আমরা সত্য দিয়ে অমৃত দিয়ে আনন্দ দিয়ে সবই পূর্ণ করবো, তা হ'লে জগতের সব কিছুই সত্য এবং জগৎ সত্যেই প্রতিষ্ঠিত। মিথ্যা ব'লে যাকে বলি বা দেখি তাও সত্যেরই, এই দর্শনে দর্শন স্থিতপ্রজ্ঞের দর্শন—এই জ্ঞানই শুদ্ধ জ্ঞান। এখানে বশিষ্ঠদেবের কথাটি স্মরণ করতে পারি—এসংসারে কোন্‌টি সত্য আর কোন্‌টি মিথ্যা তা বিচারে সত্যপরায়ণ হও।"

এখানে আমরা আর একটি বিষয়ে জানতে পারি—তা হচ্ছে এই যে সত্যের সাথে মিতালি করে—,সত্যে যার মতি, গতি ও রতি, যে সত্যে প্রতিষ্ঠিত সে বিশ্বজনের বন্ধু, সে জগতের কল্যাণকারী পুরুষ। সত্যইতো বিভিন্ন রূপ নিয়ে আমাদের চোখের সামনে দিব্যজ্যোতি ছড়িয়ে যায়। সেই তো মঙ্গল ধ্বনি হয়ে কর্ণে শ্রুত হয়। তারি পরাজ্ঞান-বুদ্ধি বিচার এনে দেয় জিহ্বাগ্রে পবিত্র প্রিয়কর বাক্যালাপ প্রেরণা। জনগণকল্যাণকারী কর্ম করার শক্তি এনে দেয় বাহুতে—সেই তো। চরণে উজ্জীবন পথে চলার শক্তি সামর্থ্য প্রেরণ করে—ঐ সত্য আমাদের গতিতে, রতিতে, মতিতে সত্যই অবস্থানকরে সত্য হ'য়ে। প্রাণের প্রতিটি স্পন্দনে প্রকাশিত হচ্ছে তারি অনন্ত নাম, চিরন্তনী শুভ ও অশেষ রূপ। এতএব প্রতি হৃদয়েযে সুখ ও আনন্দ উৎসারিত হচ্ছে তার একমাত্র কারণ ঐ সত্য। তাই তো ঋষি বলেছেন "সত্যং স্বর্গস্য সোপানং পারাবারস্য নৌরিব" সত্যই স্বর্গের সোপান এবং ভবসিন্ধু পারের ভেলা স্বরূপ।

অতএব আমরা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারি—মানবের মৌলিক ধর্ম হল সত্য, তপস্যা হ'ল সত্যরক্ষা করে চলা। ঋষি কণ্ঠকণ্ঠে বলেছেন—

সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযান :

যে না ক্রমন্তু ধ্রুবো ছাপ্তকামা
যন্ন তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্। মুণ্ডক ৩।১।৩

সত্যেরই হয় জয়, মিথ্যার কার্যনয়। সত্য সত্যসাধনের দ্বারা যেখায় নিহিত, সেই সর্বোত্তম পুরুষার্থ লাভে আপ্তকাম ঋষিগণ যে পথে গমন করেন সেই দেবযান পথ সত্যাদিত্যে সদাবৃত অবিচ্ছিন্ন ভাবে।

একদা সত্যকাম তাঁর জননীকে বললেন—আমি ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত গ্রহণ হেতু গুরুগৃহে যেতে চাই, সুতরাং আমি কোন গোত্রীয় তা কৃপাকরে বলুন।

সত্যকামের জননী জবালা অকুণ্ঠচিত্তে সত্য কথাই বললেন—"বৎস, তুমি যে কোন গোত্রীয় তা আমি জানি না। কারণ আমি তোমায় পেয়েছি ভরা যৌবনে। তখন ছিলাম আমি বহু কর্ম ব্যাপৃতা ও পরিচর্য্যানিরতা, সুতরাং তুমি যে কোন গোত্রীয় তা আমি জানতে পারিনি। তবে আমার নাম জবালা আর তোমার নাম সত্যকাম, তুমি গুরু গৃহে গিয়ে সত্যকাম জবালা বলেই পরিচয় দিও।"

সত্যকাম মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য করে হরিদ্রুমত গৌতমের কাছে গিয়ে বললেন "ভগবন! আমি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত উৎযাপন করে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে আপনাকে আচার্য্যরূপে পেতে চাই।"

আচার্য্যদেব তাঁর গোত্র জানতে চাইলেন।

সত্যকাম বললেন—"আমি কোন গোত্রীয় তা জানি না। মাকে জিজ্ঞাসা করায় বললেন "তুমি কোন গোত্রীয় তা জানিনা···।" ইত্যাদি মায়ের কথাগুলি হরিদ্রুমতকে বললেন।

আচার্য্য সত্যকামের কথা শুনে বললেন—"এরূপ বাক্য ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরে বলতে পারেনা, হে সৌম্য—তুমি কাষ্ঠ আহরণ করে নিয়ে এসো। তোমার উপনীত (দীক্ষা বা উপনয়ন) করবো। যেহেতু তুমি বলেছ সত্যকথা।

* * *

এই সত্যের জন্য চাই নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য। সত্যকে জানার জন্যে সমূহ সুখ ত্যাগে সত্যের কৃপাতেই তা সহজ সত্য হয়।

অতএব হে সত্য! সত্যস্বরূপ ভগবান।

আমরা তোমারি শরণাগত। আমাদেরকে আশ্রয় দাও।

"এষবৃথা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি"

ছান্দোগ্যোপনিষদ

"সত্যকে আশ্রয় করে যিনি অতিবাদী।
তিনিই প্রকৃত পক্ষে হন অতিবাদী।"

। ওঁ সত্যং পরং ধীমহি।

দেশের মাটী

প্রীতারক ভট্টাচার্য্য

স্বর্গাদপি গরীয়সী তুমি মা···আপন মনে গুণ গুণ করে গাইতে গাইতে দেয়ালে টাঙ্গানো মার ছবিটার দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিল বসন্ত।

বসন্ত ভাবী অনুভূতি-প্রবণ, তাই অন্তরের শিরা-উপশিরা দিয়ে অনুভব করতে চেয়েছিল মাকে—মাতৃ-ভূমিকে।

খোকা? খোকা, রান্নাঘর থেকে ডাকলেন মা, নিস্তাননী—

যাই মা—

থাক্ বাপু তোকে আর যেতে হবেনা, বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন নিস্তাননী। বলি ঘড়িটা দেখেছিস্,দশটা বেজে গেল যে, এখনও চান্ খাওয়া হল না, আপিস যেতে হবে না বুঝি।

মার কথা শুনে হাসতে হাসতে বললো বসন্ত, ভুল একা আমারই হয়না, তোমারও হয়, কি বল মা—

তার মানে—

খুব সোজা—আজ রোববার—নইলে তোমার বুড়ো খোকাকে কি এখনও দেখতে পেতে—

এঁ্যা, তাইতো—ভুলেই গেছলুম, আর বাবা—কাজের তাড়ে খেয়ালও থাকেনা। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন।

দিলে তো আমার গানের ভাবটা মাটী করে—অনুযোগ করে খোকা, কি চমৎকার গানখানা বলতো—

খোকার চোখে উদাস দৃষ্টি লক্ষ্য করলেন মা—

আমার বাপু ওসব গান-টান ভাল লাগে না, সংসারের কাজেই ব্যস্ত, শুনবোই বা কখন—যা দেরী করিস্‌নে, রান্না বখন হয়েই গেছে, খেয়ে নে বাবা—নইলে আবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

মার জবাবটা খোকার মনঃপূত হল না, শুধু খাওয়া, আর খাওয়া, জন্মের পর থেকেই তো খাচ্ছি, মায়ের আরও সামনে এগিয়ে আসে বসন্ত—জান মা? এই গানগুলি শুনলে সমস্ত শরীর রোমাঞ্চ হয় ওঠে! কি অপূর্ব্ব এই গানগুলি। চোখ দুটি বুজলো বসন্ত?

অদ্ভুত ভাব পরিলক্ষিত হয় বসন্তের মধ্যে, যা প্রকাশিত হল তার চোখে মুখে।

শিউরে উঠে নিস্তাননী—বহুকাল পূর্ব্বের ঘটনাগুলো পর পর ভাসতে থাকে তার চোখে।

একদিন স্বামীরও এমনি ভাব লক্ষ্য করেছিলেন, দেশ তখনও স্বাধীন হয়নি।

স্বামী পাড়ি দিলেন দেশান্তরের উদ্দেশে, যুদ্ধের চাকুরী নিয়ে। খোকা তখন মাত্র পাঁচ বৎসরের। সেই তার শেষ খাওয়া। মাত্র ন'মাস পরে এক সন্ধ্যেতে একখানা টেলি-গ্রাম পেলেন, স্বামী যুদ্ধে মারা গেছেন। তার অসম-সাহসিকতার জন্য তৎকালীন গভর্ণমেণ্ট তাঁর পরিবারকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা করে বৃত্তি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। তাও মাত্র দশ বৎসরের জন্য।

পাঁচ বৎসরের শিশু এখন যুবক বসন্ত। সংসারে মাত্র দুটি প্রাণী—বসন্ত আর তার মা নিস্তাননী।

মা ভেবেছিলেন বসন্তকে বিয়ে-থা দিয়ে সুখের সংসার পড়ে তুলবেন,কিন্তু খোকার ভাবান্তর দেখে মুষড়ে পড়লেন।

তার চোখ দুটী সজল হয়ে এল, আর তাকাতে পারলেন না খোকার মুখের দিকে, ছোট্ট এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন চোখের জল লুকোতে।

* * *

দীনেশ চৌধুরীর বাড়ী ভবানীপুর। পিতা যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এককালে নামকরা ডাক্তার ছিলেন। খুব পসার

ছিল তাঁর, প্র্যাকটিস্ করেই কোলকাতা সহরের বুকে, ভবানীপুরে, দু' দু'খান বাড়ী করেছিলেন। তারপর হঠাৎ প্যারালিসিসে আক্রান্ত হয়ে শয্যা নেন। অনেক রকম চিকিৎসা করেও কোন ফল পেলেন না, অবশেষে একদিন সজ্ঞানে পুত্র দীনেশ ও পুত্রবধূ নিস্তারিণীর হাতে স্ত্রীর ভার দিয়ে পরলোকগমন করেন।

দীনেশ সবেমাত্র কলেজ থেকে বেরিয়েছে ও বেকার। আকাশ ভেঙ্গে পড়লো দীনেশের মাথায়।

অর্থ যা ছিল সব নিঃশেষ হয়ে গেছে, এমন কি একখানা বাড়ীও চিকিৎসার জন্য বিক্রী করতে হয়েছিল। সম্বল মাত্র একখানা বাড়ী।

সমস্যা জর্জরিত দীনেশ সামরিক বিভাগেই চাকরী নিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের করালছায়া গোটা ইউরোপ ও এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

দীনেশ চাকুরী নিয়ে চলে গেল সুদূর বর্মায়। সামরিক বিভাগে চাকুরী নেওয়ার সংবাদ মায়ের প্রাণে প্রচণ্ড আঘাত হানলো—

একমাত্র পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে স্বামীর মৃত্যুশোক ভুলেছিলেন দীনেশের মা যোগমায়া।

বর্মায় তখন পুরোদমে যুদ্ধ চলেছিল। পুত্রের বার্মা যাওয়ার সংবাদ শোকাহতা মার বুকে শেল সম বিঁধলো—নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে মাত্র সতের দিনের ব্যবধানে মারা গেলেন যোগমায়া, নিস্তারিণী চিকিৎসার কোন অবকাশই পেল না।

শিশু পুত্রকে নিয়ে অকূল পাথারে ভাসতে লাগলো নিস্তারিণী, তার উপর স্বামীর কোন খবরাখবর না পাওয়ায় আরও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হল। পালবিহীন নৌকোর মত অথৈ সমুদ্রের কাণ্ডারী নিস্তারিণী। তার সমস্ত আশা ভরসা কালের কুটিল পঙ্কে নিমজ্জিত। নিস্তারিণী হালবিহীন তরণী, যে কোন মুহূর্তে ডুবতে পারে তার তরণী।

বিধি বাম। ঘটলো তাই। ন'মাস পরে, এক সন্ধ্যায় তুলসী তলায় শিখীর দিয়ে স্বামীর মঙ্গল কামনা করছিলো নিস্তারিণী—পেছন থেকে ডাকলো পিয়ন 'টেলিগ্রাম'—

হাত থেকে প্রদীপ পড়ে, ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। অমঙ্গল আশঙ্কায় বুকটায় মোচড় দিল নিস্তারিণীর—

কম্পিত পদে এক পা দু'পা করে এগিয়ে গেল। টেলিগ্রাম খানা নিতেই তার বুকের মাঝে ঝড় উঠলো, পা দুটো তার থরথর করে কাঁপতে লাগলো।

দুরু দুরু বুকে বললো, কিসের টেলিগ্রাম, পড়ে শোনাও না পিয়ন দাদা—

ভজহরি বহুকালের পিয়ন, সকলেরই সার্বজনীন দাদা, অক্লান্ত সৈনিক! দিনের পর দিন, বিরামহীন সেবা করে যাচ্ছে সকলের।

নিস্তারিণীর অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করে বললো—ঘরেই চল না ভাই, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভিজে কাপড়টা পাল্টে এস, আমি দাওয়ায় বসছি। এত ঘাবড়ে পড়লে চলবে কি করে, ভাল খবর হতেও তো পারে—আশ্বাস দিল ভজহরি—

তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। নিস্তারিণী ভেতরে চলে গেল।

পাঁচ বৎসরের শিশু বসন্ত পিয়নের হাতে টেলিগ্রাম খানা দেখে টানাটানি করতে লাগলো।

ধমকালেন নিস্তারিণী, ছেড়ে দে খোকা, এদিকে আয়, দাদুকে পড়তে দাও।

টেলিগ্রাম খুলে পড়েই, ভজহরির মুখ থেকে একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল—এঁ্যা—

কি হল পিয়ন-দাদা—চমকে গেলে যে—কি পড়লে বলনা—

ছটফট করতে থাকে নিস্তারিণী, পিদীমটা ভেঙ্গে যাওয়ার পর থেকেই অমঙ্গল আশঙ্কা করছিল নিস্তারিণী। তার অদৃষ্টে যে কালসন্ধ্যা নেমে এসেছে বুঝতে কষ্ট হলনা।

বলতে ইতস্তত: করছিল পিয়ন ভজহরি, শেষে তাকেই এই মর্মান্তিক খবরটা শোনাতে হবে?

দীনেশ তারা নেই, মাথা হেঁট করে বললো পিয়ন।

কি বললে—নেই? করুণ আর্তনাদ করলো নিস্তারিণী—

চোখ দুটো তার ভাগর ভাগর হয়ে উঠলো—কখনও না, হতেই পারেনা, মিথ্যে কথা, ও যে বলে গেছলো, ছুটি নিয়ে আসবে, খোকার হাতে ঘড়ি দেবে? সে নেই? অসহায় করুণ দৃষ্টিতে তাকালো ভজহরির দিকে—সে নেই

পিছনদাদা—উঃ মাগো—শিখে করাঘাত করতে করতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো—

উঃ ভগবান তুমি এত নিষ্ঠুর, আমার সব কেঁড়ে নিলে একে একে, আমি ভাইনী, রাক্ষসী—সকলকে খেয়েছি, কাউকে বাদ দিইনি, চীৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কান্নায় আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুললো। সেই দৃশ্য দেখে পাষাণেরও অশ্রু ঝরে—

অশ্রু সজল নেত্রে উঠে দাঁড়ালো ভজহরি—কাঁদো ভাই কাঁদো, তাতে বুকটা কিছু হাল্কা হবে!

ভগবান এই কি তোমার বিচার! তোমার খড়্গ কি শুধু দুর্ব্বলের পরে, আপশোষ করতে লাগলো পিসে ভজহরি—এই হাত কাউকে না হারায়, আবার কাউকে কাঁদায়। কেন—এমন হয় কেন, কেন কে তার জবাব দেবে?

শোকাতুরা নিস্তারিণীর শোক সামলাতে বেশ কিছুদিন সময় লাগলো।

সদ্যবিধবা নিস্তারিণী চোখে সর্ষেফুল দেখলো। উপায়ান্তর না দেখে শিশুপুত্রের হাত ধরে চলে গেল। অদূরে, কালীঘাটেই তার বাপের বাড়ী।

মাতুলালয়ে, মামার স্নেহ ছায়ায় ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলো বসন্ত।

প্রাইমারী থেকে হাইস্কুল, সেখান থেকে কলেজ। বি, এ, পাশ করলো বসন্ত।

বসন্ত উদাস প্রকৃতির, সংসারের প্রতি তার বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিলনা, বিশেষ করে মার কাছে পিতার সমস্ত ঘটনাই জানতে পেরেছিল বসন্ত।

বসন্ত বসে বসে শুধু পার্টি করে বেড়াক, নিস্তারিণীর ইচ্ছে ছিলনা। তাই তাগাদা দিল দাদাকে, বলি ও দাদা, খোকা কি এই ভাবেই বসে বসে দিন কাটাবে নাকি?

ভগ্নির কথায় হাসি পেল যতীশের—তুই হাসালি নিতা, কদিন থাকবে—এতদিনে কোন ক্ষতি না হয়ে থাকলে, কদিন বসে থাকলে আর কি ক্ষতি হবে? নিস্তারিণীর মনের কথা বুঝতে পারলোনা যতীশ।

বসে থাকার জন্যই কি বলছে নিতা, সে কি জানেনা বসন্ত বছরের পর বছর বসে থাকলেও তার খাবার অভাব হবেনা।

জোর দিয়ে বল্লো—তুমি বুঝছোনা দাদা, বসে থাকার জন্য বলিনি। দাদির জিনিষটা কি, এখনও বুঝতে শেখেনি। চাকরী বাকরী করলে তবে শিখবে। আর কলে কেবল মিটিং আর মিটিং। আবার দুটী ছেলে জুটেছে, তারাই মিটিং মিটিং করে পাগল করে তুলেছে ওকে। আতঙ্কিত হল নিস্তারিণী—

ভগ্নির কথায় যতীশও উদ্বিগ্ন হয়ে বসলেন, তুই ঠিকই বলেছিস, তবে কি জানিস্ নিতা—এটা যুগের হাওয়া, কেউ রোধ করতে পারবেনা।

তবুও আগে থেকে সাবধান থাকা ভাল? নিশ্চিন্ত হন যতীশ, দেখি একটা কিছু করে দিতে পারি কিনা। গেল কোথায় পাগলটা—

বসন্ত আছিস, বসন্ত—বাহির থেকে কে ডাকলো।

দেখনা দাদা খোকাকে কে যেন ডাকছে। বেরিয়ে এল যতীশ।

দেখতে পেল বসন্তের সমবয়সী একটি যুবক, দরজার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে। ইসারা করে ডাকলো, কাকে চাই—

আজ্ঞে, বসন্তের সঙ্গে একটু দরকার ছিল, বিনীত জবাব যুবকটির।

সে অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছে, কি দরকার তার সঙ্গে? রুক্ষ কুচ্ছকে প্রশ্ন করলো যতীশ।

এই সব বকাটে ছোকরাগুলো ভাগনাটাকে বিগড়ে দিচ্ছে বুঝতে কষ্ট হলনা। যতীশের যেন পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে উঠলো—

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, যুবকটি আবার বল্লো, আপনি বোধ করি বসন্তের মামা, এইটুকু বলেই থামলো—

তর্পিতা রাখ—রুক্ষকণ্ঠে বললো যতীশ, কি দরকার তোমার বলতে পার?

মানে খুব একটা জরুরী নয়, তবে কাল একটা মিটিং আছে কিনা—?

—মিটিং—কিসের মিটিং।

—আপনি কি কাগজ পড়েননা?

পড়ি কিনা তার কৈফিয়ৎটা কি তোমাকে দিতে হবে নাকি, রাগ হল যতীশের।

লজ্জিত হল যুবকটি, নত মস্তকেই বল্লো—মাফ করবেন মামাবাবু, আমি কিছু ভেবে বলিনি?

যত সব ইচড়-পাকগুলো—ধমকে উঠলেন যতীশ—শোন, তুমি যতটা স্বাধীন নিজেকে ভাব, বলত ততটা নাও হতে পারে।

হতভম্ব হয়ে গেল যতীশের কথায়—তাতে লাগলো যে মেসের পঞ্চকরা আটজন মূর্খ—তাদের বোঝাবে কে? এতে স্বাধীন পরাধীনের কি আছে। মিটিং আছে খবর দিয়ে গেলাম, এতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল?—নিজেই? নিজের চরকায় তেল দাওগে যাও? তেতে উঠলো যতীশ—

বেশ, যাচ্ছি, আর একদিন এসে আপনাকে সব খুলে বলবো, দেখি কি করে আমাদের উপর রাগ করেন? হন হন করে চলে গেল যুবকটি।

বকাটে সব! নিভা, নিভা, এগুলোকে কখনও ত্রিসীমানায় ঢুকতে দিবি না। অর্বাচীন। দু'আখর লেখাপড়া শিখে যেন কি হয়ে গেছে? খালি মিটিং আর মিটিং! আপন মনেই বলতে বলতে দোর বন্ধ করে ভেতরে চলে গেলেন।

মামার ঐকান্তিক চেষ্টায় চাকুরী একটা জুটে গেল বসন্তর। এদিন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল বসন্তর, ভালই হল চাকরী পাওয়া গেল। চাকরী পেয়ে খুসী হল বসন্ত। ইংরেজ কার্থে চাকুরী, দস্তুরি দেড়শো টাকা মাইনে, ভবিষ্যতে ভাল কাজ দেখাতে পারলে উন্নতির প্রভূত সম্ভাবনা। যতীশ, সাহেবকে কথা দিয়েছে—ঠিক দশটার মধ্যেই পাঠিয়ে দেবে। ন'টা বেজে গেল বসন্তর পাত্তা নেই।

মনে মনে ক্ষুব্ধ হল যতীশ, একেবারে দায়িত্বজ্ঞান-বর্জিত! পায়চারি করতে থাকে বারান্দায়। ঢং করে সাড়ে নটার ঘন্টি পড়তেই উৎকণ্ঠিত হয় যতীশ। কথার খেলাপ কখনও হয়নি বড়াই করে বলেছিল।

মামাকে বারান্দায় পায়চারি করতে দেখেই মনে পড়লো বসন্তর। ঘড়ির দিকে তাকাতেই দেখলো সাড়ে ন'টা বেজে গেছে, দশটায় যাওয়ার কথা, হন হন করে ভেতরে চলো।

দাঁড়াও, কণ্ঠস্বর যেন কেমন শোনালো—

কোথায় ছিলে বাবু সাহাব—ব্যঙ্গোক্তি করেন মামা, জবাবের জন্য প্রস্তুত ছিলনা বসন্ত।

উপস্থিত বুদ্ধি তার খুবই প্রখর। বললো—একজন মন্ত্রী এসেছিলেন, যুদ্ধের জন্য চাঁদা উঠাতে। সেখানে ছিলাম। মন্ত্রী এসেছিলেন—বিভ্রম করলো যতীশ, মাথাটা কিনে নিয়েছে যেন! তোমায় ডেকেছিলেন বোধকরি?

একটু থেমে—কটা বাজে সেই খেয়াল আছে, আজ না তোমায় যাবার কথা—

বেশী দেরী হবেনা মামা, পনের মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাব? আর দাঁড়াল না বসন্ত।

কাজে মন লাগছেনা বসন্তর—গোঁজামিল দিয়ে ৪টা বাজতেই বেড়িয়ে পড়লো—

বসন্তকে যেন খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।

দূরে হকারের চীৎকারে রাজপথ মুখরিত। আজকের সবচেয়ে বড় বেদনাদায়ক খবর "ভারতীয় ফৌজের হাত থেকে আরও একটা ঘাটির পতন।"

খুঁজে খুঁজে বোল পয়সা বের করে কাগজ একখানা নিয়ে পড়তে লাগলো বসন্ত।

হ্যালো বসন্ত যে, কেমন আছিস—পিঠ চাপড়ালো বসন্তর।

বসন্ত মুখ তুলে দেখে—আরে নির্মলবাবু যে—

উঁহু ব্রাদার, ঐখানটায় তোমার ভুল। আমি বাবু-টাবু নই—স্রেফ নির্মল। বাহবা আজকাল খুব কাগজ পড়ছিস নাকি রে—ঠাট্টা করতে ছাড়েনা নির্মল।

ঠাট্টা করছিস তুই? বিস্মিত হল বসন্ত। তুই জানিস না কিছু, তাই ওভাবে কথাটা বলতে পারলি? আরও একটা ঘাঁটি হাত ছাড়া হয়ে গেছে, কত বড় দুঃসংবাদ বলতো—

—যেতে দাও ব্রাদার, যেতে দাও? কত ঘাঁটি যাবে আসবে তার ঠিক আছে? ওই জন্যেই তো কাগজ পড়া বন্ধ করে দিয়েছি। চল্ চল্—যেখেতে তোর কাগজ, ভাল একটা সিনেমা হচ্ছে, চল দেখে আসি, অনেকদিন পর দেখা হল যখন, হাত ধরে টানলো বসন্তর—

মাফ কর ভাই, সিনেমা দেখতে আমি যাবনা, আশ্চর্য্য—এতটুকু লজ্জা হল না তোর, বসন্ত যেন ক্ষেপে উঠলো—এই বলো যা, মাইরী তুই একবারে ভাবুক হয়ে গেছিস্ দেখছি—তোর হাব ভাব দেখে কেমন ভয় হচ্ছে, এবার হয়তো তোকে হারাব আমরা—বুঝলি ভায়া, বিদ্রূপ করে নির্মল, আক্ষোভ চোখ থাকতেও আমরা অন্ধ। তোর

যা ইচ্ছে বল তাতে দুঃখ নেই, নইলে দেখতে পেতিস, কি ঘটতে চলেছে। বসন্ত স্বাভাবিকভাবেই বলছিল, তা সত্ত্বেও তার কণ্ঠে অস্বাভাবিকতা ফুটে উঠলো—

জানিস নির্মল, এই প্রচণ্ড শীতে আমাদের সৈনিকরা, সীমান্তে অনাহারে অনিদ্রায় দেশমাতৃকাকে রক্ষা করার কঠোর দায়িত্বপালন করে চলেছে। চীনা দস্যুদের অতর্কিত আক্রমণেও তাদের কর্তব্যচ্যুতি ঘটাতে পারেনি—আর আমরা—দীর্ঘশ্বাস ফেললো বসন্ত। উত্তেজিত দেখালো বসন্তকে ?

দাবাস্ জোয়ান। বসন্তের পিঠ চাপড়ে বললো নির্মল, সব সময় হালি ঠাট্টা আমি পছন্দ করিনা—হাতখানা সরিয়ে দিয়ে বললো বসন্ত।

ভাবতেও লজ্জা হয় আমরা কতটা নীচে নেমেছি। দেশের জোয়ানরা অতর্কিত আক্রমণে প্রাণ দিচ্ছে, আর আমরা চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলছি ? ছি, ছি, ধিক্ এজীবনে। আমি গরীব আমার দেওয়ার মত কিছু নেই, কিন্তু তুই, তোর বাবার তো অঢেল টাকা আছে, বাজে নষ্ট না করে যদি একটি টাকাও জোয়ানদের জন্যে সাহায্য করিস, জানবি জীবনে একটা মহৎ কাজ করেছিস' —ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে।

বাহবা, হাততালি দেয় নির্মল, চমৎকার লেকচার দিতে শিখেছিস তো, কিন্তু ভাই লেকচারটা, যাকে বলে ক্রাই ইন্ দি ডেজার্ট, এ শর্মার কাছে বৃথা ক্রন্দন—আরে ভাই খাও দাও ফুর্তিকর, কদিন বইতো নয়, চল আমার সঙ্গে তোকে এক পেনিও খরচ করতে হবেনা, দু পেগ জনি ওয়াকার তার সঙ্গে ফাউল কারি সব ভাবনা কয়েক মিনিটে কেটে যাবে—

কথা গুলো শুনে বিষাদপূর্ণ হাসি হাসলো বসন্ত, উচ্ছন্ন যেতে আর বাকী নেই—

উঁহু—বাজে সময় নষ্ট করতে রাজী নই, আরে তারা সঙ্গে একজন না থাকলে ও জিনিষটা বেশ জমে না ? নে চল—একান্ত অনুরোধ জানায় নির্মল—

না ?—স্পষ্ট জবাব দেয় বসন্ত—ভতটা নীচে এখনও নামতে পারিনি—

বেশ, না গেলে আর কি করি বল—গুড্ বাই—টা—টা—বলতে বলতে ভীড়ের মধ্যে মিশে গেল নির্মল।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ী ফিরলো বসন্ত।

খোকাকে ফিরতে দেখেই দোর গোড়ায় এগিয়ে এলেন মা—এত দেরী করলি যে, তোর মুখখানা শুকনো দেখাচ্ছে কেন রে ? মুখখানা পাংশু হয়ে গেল নিষ্প্রাণনীয়—

তোমার দেখার ভুল মা—হাসলো বসন্ত, কিন্তু হাসিতে কোন প্রাণ ছিল না।

বিশ্বিত হন মা, হ্যাঁরে কি হয়েছে বলতো—কদিন থেকেই লক্ষ্য করছি, তুই আর আগের সেই খোকা নস্ ? মার চোখের কোণে এক ফোঁটা জল টলমল করতে থাকে।

মার চোখের কোণের অশ্রুবিন্দু বসন্তের চোখেও ধরা পড়লো—প্রসঙ্গটা চেপে যেতে চেষ্টা করলো বসন্ত।

বড্ড খিদে পেয়েছে মা, খেতে দেবে চল।

তাই চ'—বাবা—

সকালে প্রশান্তদের বাড়ী পৌছে দেখতে পেল, রোদে বসে প্রণতি কি একটা বুনছে—

তোমার দাদা কোথায় প্রণতি।

বসন্তকে দেখে হাসলো, ওমা তোর না হতেই কোথায় চলেছেন—ভেতরেযান বসন্তদা, দাদার ঘুম ভাঙেনি এখনও।

—কি বুনছো ওটা।

একটা পুল ওভার—

বেশ, বেশ—ওরে প্রশান্ত ঘুম ভাঙলোরে—দরজায় দাঁড়িয়ে হাক দেয় বসন্ত !

আয় বসন্ত ভেতরে আয়—

বসন্ত চেয়ার টেনে বসতেই সহাস্যে জিজ্ঞাসা করে প্রশান্ত, তোর বিওরী কতটুক কার্যকরী হল বল তো ?

আর লজ্জা নাই বা দিলি, ওরে দুশো বছরের গোলামী সহজে ঘুচবার নয়, হতাশ ভাবে জবাব দিল—তবুও আশা আমি ত্যাগ করিনি। একটা কিছু করতেই হবে ?

প্রণতি, বসন্তকে এক কাপ চা দিয়ে যা তো—

কিছুক্ষণ পরেই চা দিয়ে গেল প্রণতি, যাওয়ার সময় শুধু একবার আড়চোখে দেখে নিল বসন্তকে ?

কিছুদিন পূর্বে বসন্তর সঙ্গে চলেছিল বিয়ের কথাবার্তা, কিন্তু বিয়ে হল না, বসন্ত প্রতিজ্ঞা করেছিল, যতদিন না সীমান্তের আগুন নিভবে ততদিন সে বিয়ে করবে না।

আহা ও কেন মিছিমিছি চায়ের হাঙ্গামা করতে গেলি—ঠিক আছে চায়া, এক কাপ চা বইতো নয়—

চায়ে চুমুক দিয়ে বললো, দেশের লোকগুলো যেন মিইয়ে গেছে। কি বল প্রশান্ত।

না রে না—আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। যেমন দেখছি তোকে? দেশের ছোকরাগুলো যখন তোর মত এগিয়ে আসবে—আসতেই হবে, দেখবি চীনারা ভয়ে মুড়-মুড় করে পালিয়ে গেছে। হ্যাঁ ভাল কথা, যাচ্ছিস তো, প্রশ্ন করলো প্রশান্ত।

কোথায়?—

কেন, সুপ্রভাত কিছু বলেনি তোকে?

—আমার সঙ্গে দেখা হলে ও বলবে?

হাজরা পার্কে মিটিং আছে যে—প্রশান্ত বললো—

—নিশ্চয়ই যাব, পরক্ষণেই মুষড়ে পড়ে,তবে কি জানিস ভাই, মিটিং করলেই কি কাজ ফুরিয়ে গেল?

হবে রে হবে, লোকের মনে প্রেরণা যোগাতে হবে, তার জন্য মিটিংএর প্রয়োজন সর্ব্বাধিক। বসন্তকে উৎসাহিত করে প্রশান্ত। তাছাড়াও, সঠিক কর্মপদ্ধতি একটা বেছে নিতে হবে বুঝেছিস। এটা করবো, ওটা করবো—বললে কোনটাই হবে না।

সুপ্রভাত ছেলেটা কিন্তু ভারী ভাল। আমার কিন্তু ভাল লাগে—ব'লে প্রশান্তর দিকে তাকালো—

তাই নাকি—তুই তো প্রথমে আসতেই দিচ্ছিলি না? ঈষৎ হাসলো প্রশান্ত?

গতকাল সাত ভরি সোনা ও কিছু নগদ টাকা জমা দিয়ে গেছে। কিন্তু আমার তাই এই দেহটা ছাড়া আর কিছুই নেই দেবার মত। আপশোষ করে বসন্ত—

তুই বড় অস্থিরচেতা—মৃদু ধমকায় বসন্তকে—

ক'জন লোকের কি আছে বলতে পারিস? এই তো সামান্য কিছু উল কিনে প্রপত্তিকে দিয়েছি পুলওভার বুনতে—যাক সে সব, চলি এবার বেরী করে কাজ নেই। তুইও খেয়ে নেয়ে চলে আসবি? একসঙ্গে বেরুবো। চলে গেল বসন্ত?

হাজরা পার্ক লোকে লোকারণ্য? চীনা আক্রমণের পর এই প্রথম জনসভা? শহরের সমস্ত নরনারী যেন ভেঙ্গে পড়েছে—পা ফেলবার তিল ধারণের স্থান নেই। যুবা বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে এগিয়ে এসেছে সকলে। এমন দৃশ্য কদাচিৎ দেখা গিয়েছে। গণজাগরণে শহরতলীর যান-বাহন কয়েক ঘণ্টার জন্যে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

ঘন ঘন মাইকের ঘোষণা—ধৈর্য্য ধরুন, গোলমাল করবেন না, সভার কাজ আরম্ভ হল বলে।

কি বলেছিলাম তোকে মনে পড়ে প্রশান্ত, মিটিংএরও প্রয়োজন আছে? বসন্তর চোখে মুখে একটা অদ্ভুত ভাব, তা লক্ষ্য করলো প্রশান্ত।

প্রশান্ত বললো এটা একটা শুভ লক্ষণ, আগে কখনও কোন সভায় এত লোকের সমাগম দেখেছিস কি?

চুপ, চুপ—ইসারা করে বসন্ত।

মাইকের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন জনৈক ভদ্রলোক—

বন্ধুগণ, আমরা সর্ব্বজনবরেণ্য শ্রীঅরিন্দম বসুকে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। তুমুল করতালির মাঝে তার কণ্ঠস্বর ডুবে গেল।

কোন অরিন্দম বসু বলতো—ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে প্রশান্ত।

হাওড়ার অরিন্দমবাবু, যিনি এককালে ধমধম জেলের দরজা ভেঙ্গে পালিয়েছিলেন। ঐ যে মঞ্চে দাঁড়িয়েছেন—

আবেগঘন কণ্ঠে সম্বোধন করেন অরিন্দমবাবু—

বন্ধুগণ, আপনাদের সম্মুখে আজ কিছু বলবার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, কি জন্যে আমরা এখানে মিলিত হয়েছি? আমাদের মাতৃভূমি, আমাদের জাতি, আজ বিপন্ন। বিশ্বাসঘাতক চীনারা পেছন থেকে অতর্কিতে মাতৃমন্ত্রে আঘাত হেনেছে। ওরা বিশ্বাসঘাতকেরই উপযুক্ত কাজ করেছে বটে। আমাদের কি কোন কর্ত্তব্য নেই—দেশের বা মাতৃভূমির প্রতি? আপনারা জানেন, একটা প্রবাদ আছে—বলের লাঠি একের বোঝা। আমরা কি কাপুরুষের মত তাকিয়ে থাকবো? এমন একটা অবস্থায় আমরা পৌঁছেছি, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আমাদের সকলকেই এক মত পথ ও গ্রহণ করতে হবে। উচ্চকণ্ঠে বলতে হবে, আমরা ভারতবাসী, একমন এক প্রাণ, আমাদের শপথ নিতে হবে 'ভূ অয় ভাই' কিছু কয় কিংবা ময়? কাপুরুষের মত পরের দাসত্ব গ্রহণের চেয়ে

বীরের মত একদিন বেঁচে থাকাও শ্রেয়ঃ? দুটী পথ খোলা আছে, হয় চীনা দস্যুদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে, নয় মাতৃভূমিকে দস্যুর হাতে তুলে দিতে হবে? কোনটা শ্রেয়ঃ?

কখনও না—আমরা দস্যুদের বিতাড়িত করবো, উচ্চকণ্ঠে জবাব দেয় শ্রোতৃমণ্ডলী।

জানি, আমি জানি, স্বাধীনতার স্বাদ যে জাতি একবার পেয়েছে শত প্রলোভনেও পরাধীনতার গ্লানি সে বহন করতে চাইবে না। তাই আজ দলে দলে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের শপথ করতে হবে, আমাদের শেষ রক্ত-বিন্দু দিয়েও আমরা আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করবো। কোন কিন্তু নেই, শুধু একটি প্রতিজ্ঞা—দেশমাতৃকার বুক থেকে শত্রুর শেষ চিহ্নটুকু যতদিন না মুছে ফেলতে পারবো ততদিন বিশ্রাম নেই, নাই কোন বিলাস ব্যসন, এর জন্য চাই অর্থ, চাই সৈনিক—পরন্তু চাই রক্ত।

জনতা চুপ, কোন সাড়া নেই কোথাও।

আবার বলে চললেন অরিন্দমবাবু--কোন দ্বিধা করলে চলবে না? হে ভারতের সুসন্তান, যুবকবৃন্দ, তোমরা কি এগিয়ে যেতে পারবে না দেশমাতৃকাকে রক্ষা করতে?

চারিদিকে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছিল।

চিত্তচাঞ্চল্য ঘটলো বসন্তর। ভিড় ঠেলে এগিয়ে চললো সম্মুখে।

প্রশান্ত আস্তে ডাকলো—কোথায় যাচ্ছিস, বসন্ত—বসন্ত—বসন্ত কান দিল না প্রশান্তের ডাকে—

রক্ত টগবগ করতে থাকে বসন্তর শিরা উপশিরায়—

মঞ্চের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে বললো—আমি শপথ করছি, আজ থেকে দেশমাতৃকার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করলুম?

সাবাস্—সাবাস্—এই তো চাই, পিঠ চাপড়ালেন অরিন্দম বাবু। দেশের মাটী যারা হরণ করে সেই দস্যুদের বিরুদ্ধে দলে দলে রুখে দাঁড়াতে হবে, প্রাণপাত করে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে, আমরা অতি শান্তিপ্রিয় জাতি, কিন্তু প্রয়োজন হলে রক্তও দিতে জানি।

আসন গ্রহণ করলেন অরিন্দমবাবু—

পরক্ষণেই জানালো মাইকে—এবার বলবেন শ্রীযুত শক্রঘ্ন মুখার্জী—

অশীতিপর বৃদ্ধ মুখার্জী, দাঁড়ালেন মাইকের সম্মুখে। যৌবনে শত্রুঘ্নবাবু দুবার বোমা ফেলেছিলেন লাট মারতে—অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল। এগার বৎসর জেলও খেটেছিলেন। বর্মার ইন্‌সিন জেলে ছিলেন সাত বৎসর, তারপর আলিপুরে ছিলেন চার বৎসর। শত্রুঘ্নবাবু প্রৌঢ়ত্বের কোঠা ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছেন। হঠাৎ এক সময় বলে উঠলেন—বন্ধুগণ, চতুর্দ্দিক দেখে নিয়ে বললেন—এইমাত্র আমার সুযোগ্য বন্ধুবর আপনাদের বললেন—কি জন্যে আজ আমরা মিলিত হয়েছি? মনে রাখবেন আমাদের দেশেও বিশ্বাসঘাতক শত্রু শত্রুর দল চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, কোথাও এক জায়গায় হয়ত নেই, কিন্তু তারা বিভিন্ন ভাবে ছড়িয়ে আছে আমাদেরই মধ্যে, তাদের চিনতে হবে।

চীনা দস্যুদের চেয়ে এরাও কোন অংশে কম নয়। বিশ্বাসঘাতক চীন ভাই-এর বুকে ছুরি বসিয়েছে, তাকে দেখিয়ে দিতে হবে ছুরীর বদলে ছুরী—আমরাও প্রতি-আঘাত হানতে পারি, নিধন যজ্ঞের সময় এসে গেছে, দেখিয়ে দিতে হবে আমাদের বাহু, ওরা ষাট কোটী হলেও আমরা চুয়াল্লিশ কোটি—

মুহুর্মুহু করতালির ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো হাজরা পার্ক। করতালি থামলে আবার বলতে লাগলেন শত্রুঘ্ন বাবু—মনে রাখবেন এ আহ্বান কারও একার নয়, দেশ-মাতৃকার চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর—

আমাদের উদ্দেশ্য মহৎ, জয় আমাদের হবেই, ঐক্যই আমাদের জয় গান বহন করে আনবে—জয় হিন্দ—

সভা ভঙ্গ হতেই ভীড় করতে লাগলো—

বসন্তের মুখে কোন ভাষা নেই—

অপূর্ব্ব—কি চমৎকার বচনভঙ্গী কি বলিষ্ঠ বসন্ত। এতগুলো লোককে একেবারে থ বানিয়ে রেখেছিল।

ভীড় কমে গেছে এবার চল প্রশান্ত।

বসন্তর কানে তখনও শত্রুঘ্নবাবুর কথাগুলো বাজছিল। বললো চল তবে—

হাজরা রোডের নামকরা সোনার দোকান হালদার জুয়েলারী মাত্র কিছু দিন পূর্ব্বে সোনার ফাট্‌কাতে লাখ দুই টাকা কামিয়েছে। মালিক শচীন হালদার খুব কেতাদুরস্ত লোক। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। ছিপছিপে গড়ন, চুল বেশীর ভাগ পাকা হয়ে গেছে—

হালদার মহাশয় সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে জানেন, প্রকাশ্যে বলেন কালোবাজারী করলে যদি মোটা মুনাফা হয় দোষ কি তাতে, না হয় দু দশ টাকা খরচই বা হোল। এতেও থামেন না তিনি। দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলেন—করুক না সরকার সোনার বিক্রী নিষিদ্ধ, তাঁর কারবার চলে খুব গোপনে, সরকারী বাধা নিষেধের আওতার বাইরে। অর্থই তার পরমার্থ, অর্থ পেলে তিনি আহারম্বে যেতে রাজি আছেন।

এহেন শচীনবাবু সবে মাত্র দোকান খুলেছেন, সরকারী বাধা নিষেধের জন্য সম্মুখের দরজা দিয়ে ইদানিং বড় একটা খদ্দের আসেনা,তাঁর একমাত্র ভরসা পেছনের দরজা।

তাই তিনি সম্মুখের একটি পাট মাত্র খুলে রাখেন, তার কারণ খুলতে হয় তাই খোলা।

হালদারের খদ্দেররা আসেন রাতের অন্ধকারে, পেছন দরজা দিয়ে।

হালদার পাকা জহুরী, দেখলেই চিনতে পারেন। অদূরে দণ্ডায়মান কয়েকজন লোককে দেখেই হালদার ধূপ ধুনা দিয়ে ডেকে বলেন।

তিনি হয়ত ভেবে থাকবেন—মোটা রকমের খদ্দেরও হতে পারে। এগিয়ে আসতে দেখেই অভ্যর্থনার ত্রুটি করেননা হালদার—

বত্রিশ দাঁতের পাটি বের করে হাত কচলাতে কচলাতে বলেন—আসুন, আসুন আপনারা, বলুন কি ধরণের, কত দামের বের করবো—

আজ্ঞে আমরা কেনা বেচা করতে আসিনি—হাসতে হাসতে প্রশান্ত বললো—

এঁা, হালদারের চক্ষুস্থির, আসেননি? মনটা দমে গেল হালদারের, গম্ভীর ভাবে বললেন—তবে কি জন্যে এসেছেন বলুন দয়া করে—

আজ্ঞে চাঁদা—

চাঁদা, তার মানে, কে তোম—মানে আপনারা? বিরক্ত হলেন হালদার—

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে, আপনার সাহায্য চাই, শুধু আপনি নন, প্রত্যেকটি লোককেই এই তহবিলে সাহায্য করতে আবেদন করা হয়েছে। দেখতে পারেন, এই দেখুন খাতাটা এগিয়ে দিল বসন্ত।

থাক, থাক। ও সব খাতা টাতা দেখতে চাইনে, আপনারা বোধ করি পথ ভুলে এসেছেন। খোঁচা খোঁচা জবাব হালদারের।

আজ্ঞে যাও বললেই কি আর যাওয়া যায় হালদার মশাই, আপনি বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাছাড়া—খামলো প্রশান্ত—

তাছাড়া—যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন, আমি অপেক্ষা করতে পারবো না।

দেখুন এতে বলাবলির কিছু নেই, দেশ আজ বিপন্ন এটা নিশ্চয়ই আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবেনা—মৃদু হাসে বসন্ত।

বিপন্ন—কে বিপন্ন, কি হয়েছে দেশের? ভ্যাকামো করে হালদার—

আশ্চর্য্য? দেশের কোন খবর আপনার কানে পৌছায়নি?

বিস্মিত হল বসন্ত।

ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে বলাই ভাল, আপনি খবরের কাগজ পড়েন—

তা মাঝে মাঝে পড়ি—

আপনি দেখেননি চীনাদস্যুরা আমাদের মাতৃভূমির কতকটা গ্রাস তো করেছেই আবার বীর বিক্রমে এগিয়ে আসছে?

চীনারা আবার দস্যু কবে থেকে হল? অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হালদারের, আরে মশায় এইতো সে বছর সেই যে কে, মানে চীনারা এসেছিলেন, ওদের গলা ধরে আমরাই তো 'হিন্দি চীনী ভাই ভাই' বলে নেচেছি, কোল দিয়েছি—এরই মধ্যে আবার দস্যু হয়ে গেল কেন মশায়?

দাঁত খিচিয়ে বলেন হালদার—

অবশ্য যুক্তিপূর্ণ কথা—

ভাই ভাই তো বটেই তবে কে জানতো ওই ভাই এর মুখের মধু কদিনের ব্যবধানে বিষ হয়ে দাঁড়াবে?

কেন, শুধু শুধু বাজে কথায় অবতারণা করছেন, অধৈর্য্য হয় প্রশান্ত?

কথাটা হয়ত বাজে শোনাবে, কিন্তু টাকাটা আমাকেই দিতে হবে তো? তাই না? ঘাড় কাত করলেন। হালদার—সাত সকালে দোকান খুলেছি, এক পয়সাও বিক্রী নাই, চাঁদা দিতে পারবো না—

এবার ধৈর্য্য চ্যুতি ঘটলো বসন্তর-ও—

দেখে তো বয়স কম হয়েছে বলে মনে হয়না-কিন্তু ভদ্রতা এক কোঁটাও আছে দেখে তো মনে হয়না? ঘৃণায় নাসিকাকুঞ্চন করলো বসন্ত?

গা রি রি করে উঠলো হালদারের—

মুখ সামলে কথা বলবেন? আপনাদের কাছে ভদ্রতা শিখিতে হবে তাই না? ওঃ আমার কি ভদ্র লোকরে?

মুখ কেংচে বললেন হালদার—

হালদারের মুখভঙ্গী দেখে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো প্রশান্ত—

চল্, চল্ বসন্ত, চল স্বদেশ, এই নরকে আর এক মিনিটও নয়—আজ না হোক কাল, ওকে দিতেই হবে চাঁদা।

যোব বইকি—যাও? আর কারুরা ফলাতে এস না? আমার নাম শচীন হালদার, এই তল্লাটে সকলেই চেনে—

আহা কেন মিছি চটাচটি করছেন হালদার মশাই, বসন্ত ও প্রশান্তকে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে এল স্বদেশ—

আপনি হলেন আমাদের পিতার বয়সী লোক—সহাস্যে বললো স্বদেশ, আপনারও তো একটা কর্ত্তব্য আছে। স্বদেশ নাছোড়বান্দা—

পিতার বয়সী লোককে যা সম্মান দিলেন আপনারা—উত্তেজিত হন হালদার—ওসব কর্ত্তব্যটর্ত্তব্য বুঝি না মশাই, সকলে দিলে আমিও যোব—হ্যাঁ—আর লাল চোখ দেখালে এক নয়াও নয়—

সোজা হয়ে বসলেন হালদার—আমার দোকানে এসে আমায় লাল চোখ দেখানো—যত সব—

আহা হা—কে লাল চোখ দেখালো আপনাকে?

কেন, ওই যে বাহাদুরবাবু, যাকে সঙ্গে করে এনেছেন—যান না মশায় বড়বাজারে, বলি যান না—যারা কোটি কোটি টাকা এই ক'দিনে ঘর ঢোকালো চোরাকারবার করে—তবেই তো বুঝবো মরদ?

পায়চারি করতে থাকেন হালদার—সরকারের কোটি কোটি টাকা ট্যাক্সো ফাঁকি দিলে ওরা আর যত জুলুম, আমাদের মত সামান্য ব্যবসায়ীর উপর ছ্যা-ছ্যা—খুব দেশ-প্রেমিক দেখেছি মশায়! প্রেমের যা নমুনা দেখালেন আপনারা তাতেই আত্মহারা হয়ে গেছি—রাগে ফুলছে তখনও হালদার।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল বসন্ত ও প্রশান্ত, ডাকলো স্বদেশকে—

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে—স্বদেশ চলে আয়।

এই যে দাঁড়া, বলুন হালদার মশায় কত দিচ্ছেন আপনি?

আজ দিনটাই মাটি হয়ে গেল—মনে মনে ভাবলো হালদার, পরক্ষণেই বললে, বিকালে আসবেন কিছু দিতে চেষ্টা করবো—

আর দাঁড়াতে ইচ্ছে হল না স্বদেশের, বিরক্তিভরে বেরিয়ে এলো—চল বসন্ত—

ধেৎ, যাত্রাটাই আজ খারাপ, আর কোথাও যাব না—প্রশান্ত বললো—

আপিস থেকে ফেরার পথে দেখা হল সহপাঠী অজয় সেনের সঙ্গে।

অজয় সদ্য ডাক্তারী পাশ করে বেরিয়েছে। শিবপুরে স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিস করছে।

বহুদিন দেখা হয়নি অজয়ের সঙ্গে, উৎফুল্ল হল বসন্ত। তারপর মাষ্টার বসন্ত, কোথায় লুকিয়েছিলি এদ্দিন বলতো? অজয় প্রশ্ন করলো—

আমি না হয় লুকিয়ে ছিলাম, তুই কোথায় ছিলি, তাই বল না? হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে বসন্ত।

সে একটা ইতিহাস, দু-চার কথায় শেষ হবার নয়—গম্ভীর দেখালো অজয়কে।

বসন্ত ঘমে গেল, কেন বলতো—কোন—

হাঁ—বাবা মারা গেলেন সেই বৎসর, সবে মাত্র বি-এস-সি পাশ করে বেরিয়েছি, বুঝতেই পারিস আমার অবস্থাটা—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো অজয়—যাক সে সব—কলে বেরিয়েছিলাম। চল না আমার সঙ্গে—

বসন্ত রাজী—বেশ, চল—

গাড়ীতে জিজ্ঞাসা করলো বসন্ত—বাড়ীতে কে কে আছেন রে?

বাড়ী নয়—ভাড়াটে বাসা—গেলেই দেখতে পাবি।

হাসলো অজয়—

শিবপুর ট্রাম টার্মিনাসের পাশেই মস্ত বড় বাড়ী—

দোতলায় দুখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে অজয়। প্রশস্ত ঘর দুখানা, পর্যাপ্ত আলো বাতাস? দরজায় দাঁড়িয়ে ঘন ঘন কড়া নাড়তে লাগলো অজয়—

সাড়া না পেয়ে চেঁচিয়ে ডাকলো—শান্তা, শান্তা—

হলো কি—চেঁচাচ্ছ কেন? দরজা খুলে স্বামীর পার্শ্বে অপরিচিতকে দেখে দু'পা পিছিয়ে গেল শান্তা—

ব্যস্ ব্যস্—হলো, লুকোতে হবেনা, আমার বাল্যবন্ধু বসন্ত চৌধুরী, এরই সম্বন্ধে কতবার তোমায় বলেছি। দুহাত তুলে নমস্কার জানালো শান্তা—।

প্রতি নমস্কার জানায় বসন্ত।

আপনারা ততক্ষণ গল্প করুন, আমি আস্‌ছি। বেরিয়ে গেল, খানিক বাদেই চা নিয়ে এলো শান্তা—

আজকাল কি করছিস বলতো—চায়ে চুমুক দিয়ে শুধোয় অজয়—

চাকরী—রেইনবো কোম্পানীতে, তাও কদিন থেকে কামাই হচ্ছে।

কেন?—অসুখ করেছিল নাকি, অজয় জিজ্ঞেস করলো। আর কেন? আমাদের ওয়ার্ডের চাঁদা তোলার ভার আমাকেই দিয়েছে।

উপলব্ধি করতে পারলো না অজয়—মানে?

প্রতিরক্ষা খাতে বলতে কি বুঝছিস বলতো—প্রশ্ন করে অজয়—বলিস কিরে—হো হো করে হেসে ফেললো বসন্ত। এও কি বিশ্বাস করতে হবে নাকি রে? নাড়ী দেখে যারা রোগের চিকিৎসা করে তাদের মুখে এই রকম জিজ্ঞাসা—হাসালে বন্ধু।

শোন তবে—বলতে থাকে বসন্ত। এই যে লড়াইটা চলছে তাতে আমাদের কমপক্ষে দৈনিক কোটি টাকা খরচ। আসবে কোত্থেকে বলতে পারিস? আমাদের জোয়ানরা যারা এই প্রচণ্ড শীতে দেশের জন্য লড়াই করছে তাদের শীতের পোষাক নেই, খাদ্য নেই, বিনা অর্থে কি এসব হয় তাই? তাই তো সারা দেশ সাড়া দিয়েছে, এগিয়ে আসছে মুক্তহস্তে সাহায্য করতে—

বিমনা হয় বসন্ত।

অজয় অবাক হয় ভেবে, বসন্ত, তুই তবে রাজনীতিও করিস নাকি রে?

এটা তো রাজনীতি নয়—সহাস্যে বসন্ত বললো—কিন্তু ওসব মাথায় ঢোকেনা আমার—আরে চীন তো আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র—সেবার কি খাতির না দেখিয়েছিল, আবার শত্রু হল কখন? বলিহারি তোদের রাজনীতি।

আগে সবটা শোন, হারপর উকিলের মত জেরা করিস?

এতক্ষণে মুখ খুললো শান্তা দেবী, আপনি কাকে বলছেন, ওসবের খবর উনি রাখেন নাকি? শুধু তো রোগী আর ডিস্পেন্সারী—

যাক বাঁচা গেল—ই.ফ হাঁড়লো বসন্ত? তুই খবর না রাখলেও শান্তা দেবী সব খবর রাখেন?

ঈষৎ হেসে বললো—চীন আক্রমণ করেছে—শুধু গবেষণা করলেই কাজ শেষ হয়ে গেল না। যতদিন না তারা ভারতভূমি ছেড়ে পালাবে, ততদিন বিশ্রাম নেই! 'বাকে বলে' আরাম হারাম হায়—

লেকচার তো খুব বাগিয়েছিস—কাজের বেলায় তো অষ্টরম্ভা? বলি পনেরো বছর কেটে গেল, এই কি স্বাধীনতার রূপ? সাধারণের জন্য কি করেছেন তোদের মহাজনরা—গোটা কয়েক লোক রাতারাতি বড়লোক হয়েছে এই যা—গরীব তো আরো গরীব হয়েছে। এই তো স্বাধীনতা—এরা ভোগ বিলাস করবে, না গরীবের দুঃখ মোচন করবে? কিচ্ছু হবেনা—এরাও শোষণ করতে কসুর করেন না?

অজয়ের বাক্যবাণে উত্তেজিত দেখালো বসন্তকে। হবেরে হবে, এঁদেরও জবাব দিতে হবে, তবে সে সময় এখনও আসেনি। বিচার করার সময় যথেষ্ট পাওয়া যাবে?

কিছুতেই না, ওরা সব ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, যুক্তি দিয়ে তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

এই দেখনা চাঁদার জন্য ঘুরে ঘুরে তোর জুতা জোড়া ক্ষয়ে গেল, আর আমাদের মহারথীরা, তাঁরা রোল্‌স রয়েসে চলেন, আর মাংস বিরিয়ানী কাবাব না হলে তৃপ্ত হন না—এরা এতটুকু ভোগ বিলাস কমাতে পেরেছেন কি? ঘৃঢ়-কণ্ঠে প্রতিবাদ করে অজয়—

দেখ ভাই অজয়, তর্ক করতে আমি আসিনি, দেশের ডাকে আজ নয় তো কাল, ভোগের মোহ ত্যাগ করে এগিয়ে আসতে হবে—নইলে তাদেরও একদিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

ওরে, ওদের কিছুই করতে হবেনা—ওরা হলেন টপ্ লেভেলের লোক। যাদের করতে হচ্ছে—তাদের দেখতে পাবি শিয়ালদা প্লাটফরমে, গেছিস কখনও, দেখেছিস্ ওদের? গম্ভীর হল অজয়, বাবার তার মন ভরে উঠলো—এ ভাবে পশুর মত বাঁচবার জন্যই কি স্বাধীনতা, এদের জ্ঞানও কম ছিল না?

অজয় বিশেষ রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেনা, কিন্তু কেন যেন আজ তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল।

এরা পনেরো বছর ধরে দরিদের জান-মাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, লক্ষ লক্ষ লোককে পথের ভিখিরী করেছে, এদের আগে হটান দরকার—

নিশ্চয়ই কোন ভুল নেই তাতে, কিন্তু ভেবে দেখ, তুই দারোয়ান রেখেছিস, তা সত্ত্বেও তোর বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে, তুই কি ডাকাতকে তাড়াবি—না দারোয়ানের বিচার করতে বসবি?

এটা কোন যুক্তিযুক্ত কথা নয়। দারোয়ান থাকতেও যদি ডাকাত পড়ে; জানতে পারা যাবে—

তবে তো কোন যুক্তই খাটবে না, তুই উত্তেজিত হয়ে আছিস, আর একদিন এসে বুঝিয়ে বলবো—আজ থাক্? বসন্ত চুপ করে রইলো—

কি করতে হবে, বলুন ঠাকুরদো, এগিয়ে এল অজয়ের আধুনিকা স্ত্রী শান্তা দেবী?

অনেক কিছু করার আছে, জাতির প্রয়োজন, প্রচুর সমরাস্ত্র, খাদ্য, বস্ত্র, রক্ত, যোদ্ধা—আপনার যে কোন দান, তা যত ক্ষুদ্রই হোক, জাতির মহৎ কাজ সাধিত হবে।

নূতন আলোক উদ্ভাসিত হয় শান্তার চোখের সম্মুখে। অনুপ্রাণিত হল শান্তা—নিশ্চয়ই দোব, আমরা স্বাধীন জাতি, অনেক সাধ্যসাধনা করে তবে স্বাধীনতা পেয়েছি, বহু ত্যাগ ও রক্তপাত করতে হয়েছে এই স্বাধীনতার জন্য, যে কোন মূল্যে রক্ষা করতে হবে বইকি। ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো শান্তা দেবী—

এই তো জেগেছে, কে বলে ভারতসন্তানরা ঘুমিয়ে আছে, অজয় শোন শোন—সত্যই আজ আমি অত্যন্ত খুসী হয়েছি, শান্তা দেবী—বেধে গেল বসন্ত।

আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, আপনিই আমার চোখের ঠানি সরিয়ে দিয়েছেন, বলুন কি করতে হবে? আগ্রহভরে তাকিয়ে থাকে শান্তা দেবী।

কি করতে হবে? কি করতে হবে? একটু ভাবতে দাও দিদি—

হাঁ কঠিন কাজ করতে হবে, শহরে শহরে পাড়ায় পাড়ায় স্বাধীনতার নাম গে য় নারীশক্তিকে জাগাতে হবে—এই হবে জাতির প্রতি তোমার প্রধান ও পবিত্র কর্তব্য।

মুহূর্ত চেতনাকে যেন ফিরে পেল শান্তা, ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল স্বামীর পার্শ্বে—

চুপ করে রইলে যে, কার ওপর অভিমান? দেখতে পাচ্ছ না আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা আজ বিপন্ন?

শান্তার মুখে শঙ্করের ছাপ ফুটে উঠলো। মাথা হেঁট করে ভাবতে থাকে অজয়—তাই তো! আমার ভুল ভেঙ্গেছে বসন্ত, শান্তা আমার ভুল ভেঙ্গে দিয়েছে, নারী এগিয়ে যাবে, আর পুরুষ আমরা পেছনে পড়ে থাকবো—

কখনও না—শপথ করলুম—আজ থেকে আর গা ঢাকা দিতে বেরুবো না—পায়ের ঘরটা তো বাঁচবে, আমি ওটা জাতীয় গবর্ণমেন্টে দান করবো।

ব্রাভো! আনন্দে লাফিয়ে ওঠে বসন্ত। এই তো বীরের মতন, পিঠ চাপড়ায় অজয়ের, আরে বুদ্ধু তো আর সকলে করবে না? বলব তো চাই, তাই তোর আমরা—বললে অজয়।

ব্যস্ ব্যস্ ওতেই হবে, ওরে অজয় আমি আজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, দেশ আমাদের ঘুমিয়ে নেই, জেগে উঠেছে। এমনি করে যখন সমস্ত জাতটাই জেগে উঠবে, আর রুখে দাঁড়াবে, তখন দেখবি ওই বন্দুকধারী ভয়ে চোরের মত পালাতে পথ পাবে না। শুধু বন্দুকের ভয়ে নয়—আমাদের জাতীয়তা বোধ ও ঐক্যবদ্ধ মনোবল দেখে। সাময়িক উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালো বসন্ত, অজয়, জাগিয়ে তুলতে হবে সমস্ত জাতিটাকে—মনে পড়ে সেই গান খানা—ইংরেজ হটাবার জন্য যা গাইতুম?—

"আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো, একলা রাতের অন্ধকারে"

দেশ প্রেমের অপূর্ব উৎস অজয়, উঠে দাঁড়ালো বসন্ত। আজ উঠি আর এক দিন আসবো—

গুড্ নাইট অজয়? চলি শান্তা দেবী।

বসন্ত চলে গেলে, মন্তব্য করে শান্তা—অদ্ভুত লোক কিন্তু ওই বসন্তবাবু।

তাই নাকি? ঠোঁটের ফাঁকে ঈষৎ হাসি টেনে বললো শুভ্র।

দেখো, আমাকে পরে হাসিয়ে দিওনা যেন?

লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠলো মুখখানা, যাও—তুমি ভারি—

হা হা হাসতে লাগলো অভ্র। ও হল চিরকেলে পাগল; ছোট বেলা থেকে দেখছি, আজও ঠিক তেমনিই আছে।

তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে দাওয়ায় বসেছে নিস্তারিণী, কিছুদিন থেকেই তাহাদের লক্ষ্য করছিল বসন্তর, কিন্তু মুখ ফুটে বলেনি কিছু।

নিস্তারিণী স্থির করেছে—আজ খোকাকে জিজ্ঞেস করবেই। কেন এই লুকোচুরি? স্পষ্ট করে তাকে বলতে হবে কি সে চায়?

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে বোনকে দাওয়ায় একা বসে থাকতে দেখে বিচলিত হলেও মনকে দৃঢ় করে জিজ্ঞেস করে—বসন্ত কোথায় রে, ফেরেনি?

জবাব না পেয়ে পাশটিতে দাঁড়ায় যতীশ—চুপ করে রইলি যে, কোথাও গেছে বুঝি?

না। হতাশা সূচক জবাব—

কিছুদিন থেকেই সে রাত করে বাড়ী ফেরে, কোথায় যায়, কিছু বলতে চায় না।

অশ্রুভারাক্রান্তকণ্ঠে বললো—খোকা নাকি যুদ্ধে নাম লিখিয়েছে—না না—ওসব বাজে কথা, কান দিস্‌নে শোনা কথায়—প্রবোধ দেয় সহোদরাকে?

না দাদা? তোমরা জান না, কিন্তু আমি সব খবর রাখি, ও-বাড়ির প্রশান্তর বোন প্রশান্ত বলেছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো—যতীশ, কি করবি বোন, এটা যুগের ধর্ম, কেউ কারও নয়। জোর করে কিছু করতে গেলে বরং উল্টোই হবে, তার চেয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফেরাতে পারা যায় কিনা দেখতে হবে।

বিধবা বোনটির একান্ত বক্ষে যে কি ব্যথা যতীশের বুঝতে কষ্ট হয় না, একমাত্র সম্বল ওই বসন্ত, সেও নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে!

গুণ গুণ করে গাইতে গাইতে ঢুকতেই, দাওয়ায় মা ও মামাকে বসে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়ালো বসন্ত।

মা, মামা—তোমরা এখানে বসে আছ যে—তার দুচোখে জিজ্ঞাসা—

বসন্তকে দেখেই যতীশের প্রাণ আকুলি বিকুলি করে উঠলো। এমন সোনার কান্তি ছেলে—সে যাবে যুদ্ধে—কামানের সম্মুখে বুক পেতে দিতে—না না—

তার দুচোখ জলে ভরে এল, আড়াল করে চোখের জলটা মুছে নিল পাছে নিভা দেখে ফেলে।

বসন্ত সম্পূর্ণ বুঝতে না পারলেও, আঁচ করেছিল, আর দাঁড়াল না—

নিভা এতক্ষণ জড়সড় হয়ে বসেছিল, উঠে দাঁড়ালো—

আজ আর কিছু বলিসনে—যতীশ বললো—কাল সকালে আমি বুঝিয়ে বলবো—

বেশ তাই কোরো—চাপা নিশ্বাস ফেলে ভেতরে চলে গেল।

সকালে চা খেতে খেতেই উত্থাপন করলো যতীশ, একটা কথার জবাব দিবি বাবা—

কি কথা মামা? অন্যমনস্কভাবে যেন জবাব দিল বসন্ত। তার মন কোন্ এক অজানার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

যতীশ, বসন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। কিয়ৎক্ষণ পরে ধীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললো—যাকে কাঁদিয়ে কেউ কখনও কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে পেরেছে, না করেছে?

আমি—আমি ঠিক—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে যতীশ বললো—তোমার কথাই বলছি। 'ও'—বসন্তর দৃষ্টি উদাস—কাঁদাবো কেন মামা—তাছাড়া সব কাজেই কি মার সম্মতি পাব আমি—

নিশ্চয়ই পাবে বাবা। যতীশ বললো—তুমি উপযুক্ত হয়েছ—কত কষ্ট করে তোমায় মানুষ করেছে একবার ভেবে দেখতো—চাকরী ও করছে—ভাল কাজে তোমার মাই বা বাধা দেবেন কেন। তুমি ছাড়া তার আর কে আছে বলতো—যতীশের গলাটা কেঁপে উঠলো—

তাহলে বলুন, যে কাজের ভার নিয়েছি আমি, আপনারা বাধা দেবেন না।

অতিকষ্টে, চোক গিলে বলল নিস্তারিণী, কি কাজ তুই খুলে বল খোকা, আমাকে আর কাঁদাস্‌নে বাবা!

আমি দেশের কাজে ব্রতী হয়েছি—বলুন মামা, আপনারা বাধা দেবেন না—

অতি উত্তম কথা, কত লোক ঘরে বসেই দেশের কাজ করে যাচ্ছে—তুমিও তেমনি ঘরে থেকেই কাজ করে যাও, তোমায় মা কিচ্ছুটি বলবে না—

মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালো বসন্ত,সে কাজ দুর্ব্বলের, অশক্তের, যারা ভীরু, মাকে যারা ভালবাসে, তারা কখনও দেশের এ বিপদে ঘরে বসে জীবনটাকে পঙ্গু করে দিতে পারেনা—তাছাড়া আমিষদের কাছে কি কৈফিয়ৎ দোব।

তোমার মা যদি সম্মতি না দেন তাহলে—আবার প্রশ্ন করলো যতীশ—

অসহায় ভাবে জবাব দিল বসন্ত, মার আশীর্ব্বাদ পাব কিনা জানি না, আমি সঙ্কল্পচ্যুত হতে পারবো না। না, না। চঞ্চল হয়ে উঠে বসন্ত।

নিতাননী খোকার কথা শুনে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলো দেয়ালে হেলান দিয়ে—তার বুকের মাঝে চলেছে ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য।

যতীশকে অসম্ভব গম্ভীর দেখালো, সমস্ত যুক্তিই তার অচল হয়ে গেল একরত্তি ছেলের কাছে।

মনকে দৃঢ় করে যতীশ, আবার প্রশ্ন, তার ফল কতখানি শুভ হবে ভেবে দেখেছ?

বসন্ত অটল—। কি হবে না হবে বলা শক্ত, কিন্তু মামা, যে এগিয়ে যেতে চায়, তার পথরোধ করা কি পাপ নয়—তবে মানুষে আর পশুতে তফাৎ রইলো কি?

যদি বলি মার আদেশ, কণ্ঠ দৃঢ়তর হয়ে উঠলো যতীশের। আজ একটা বোঝাপড়া করতে বদ্ধপরিকর যতীশ।

তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানায় বসন্ত—না—না? আমি বলবো—যিনি মা, তিনি কখনও জাতির দুর্দ্দিনে, নিজের সন্তানকে আঁচলে ঢেকে রাখতে পারেন না। কত সহস্র দৃষ্টান্ত আছে, কত সহস্র লোক অকাতরে প্রাণ দিয়েছে এই মাটীর জন্য, তাদেরও মা ছিল, স্ত্রীপুত্র আত্মীয় স্বজন ছিল, তারা কি করে মার কোল ছেড়ে ছুটে গেছলো, তবেই না আমরা আজ স্বাধীনতা পেয়েছি। চোখ ছলছল করে উঠলো বসন্তর।

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো যতীশ, একরত্তি ছেলের দেশানুরাগ দেখে, কাঁদ কাঁদ স্বরে বললো, ওরে সবই বুঝি—তুই হলি অন্ধের যষ্টি, এও কি খুলে বলতে হবে আমাকে? ভগ্নকণ্ঠে বললো যতীশ।

বুকের ভেতর মোচড় দেয় বসন্তের, মার কথা ভেবে সামলে নিল নিজেকে—যার কেউ নেই,ভগবান তার সহায়, আপনি তো রয়েছেন মাকে বুঝিয়ে বলবেন, কত মায়ের সন্তান চলেছে মাতৃভূমির বেদীতে রক্তার্ঘ্য দিতে, বাধা দেবেন না মামা—তাতে গোটা মাতৃজাতির কলঙ্ক হবে, সইতে পারবো না আমি? মার জন্য হাসি মুখে ফাঁসি বরণ করতে পারি মামা, কিন্তু সইতে পারিনা, মার ও মাতৃভূমির অসম্মান, গলা ভারী হয়ে এল বসন্তর।

নিতাননী মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল, তার চোখ দুটি কাপ্‌সা হয়ে এসেছে। বুকের ভেতর ঢিব ঢিব শব্দ নিজেই শুনতে পাচ্ছিল।

যতীশ অপলকদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল : সমুখ মুখের দিকে। বসন্ত বলে চললো—আমাকে যেতেই হবে মামা—বিপন্নকে রক্ষা করাই ধর্ম—যে পিছিয়ে যায় সে কাপুরুষ, বেঁচে থাকার কোন অধিকার তার নেই, সে বিশ্বাসঘাতক! কণ্ঠ নতেজ হয়ে আসে। বোবা-বনে গেল যতীশ, একরত্তি ছেলে বলে কি? কোথায় শিখলো মহান যুক্তিপূর্ণ কথাগুলো? এ কি সেই বসন্ত, যাকে শৈশব থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিলাম? না কোন স্বর্গের দূত! চোখের কোণ গড়িয়ে জল বেরিয়ে আসে যতীশের।

চলে যাস্‌নে, এখুনি আসছি, বলে বেরিয়ে গেল যতীশ—চোখের জল আড়াল করতে!

মুখ তুলতেই দেখতে পেল বসন্ত, তার মার দুচোখ বেয়ে শ্রাবণের ধারা নেমেছে? বহুকালের সঞ্চিত স্নেহ, এখন শুরু হয়েছে!

মুখ ফিরিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো নিতাননী, খোকার ভাবনায় নিতাননীকে আরও দুর্ব্বল করে ফেলেছে, অতি কষ্টে ডাকলো খোকা!

—ম মাগো, জড়িয়ে ধরলো বসন্ত তার মাকে?

ওরে ওরে আমার হারানিধি, খোকা খোকা—বসন্তকে বুকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগলো নিতাননী—

বসন্তর চোখও সিক্ত হল।

শান্ত হও মা, কেঁদে কেঁদে খোকার অকল্যাণ ডেকে

এনো না মা। তবে যেন ওরাও তো মায়ের সন্তান, যারা সেদিন প্রাণ দিল, তাদের জন্য তোমার এইটুকু দুঃখ হয় না মা, যেমন হচ্ছে তোমার খোকার জন্য ?

ওরে কি করে তোকে বুঝাবো, এ বুকে কত ব্যথা, কত জ্বালা জমে আছে ? দশ বছর ভাল করে খাইনি, ঘুমুতে পারিনি, কেবলই ভেবেছি—কতদিনে তুই বড় হবি, মানুষ হবি, আর আজ—দাঁত দিয়ে চেপে ধরলো ঠোঁট—

তাইতো বলি, তুমি আমার মা, দেশের মা, জাতির মা, কেন তবে বৃথা কান্না, খোকাভাগ ? চোখ মুছে ফেল মা ? যারা আমাদের মার বুকে ছোরা মেরেছে প্রতিশোধ নিতে হবেনা ? আশীর্বাদ কর মা। মার পদতলে বসলো খোকা। তোমার বুক ভরা আশীর্বাদ পেলে, ওই শয়তানের দল চুরমার করে আবার তোমার খোকা তোমার বুকে ফিরে আসবে। ওই শোন মা—ডাক এসেছে—ওই যে শোনলি তুমি ? চকল হয়ে উঠলো বসন্তর চোখ দুটি—

দূরে ধ্বনি হতে লাগলো 'বন্দেমাতরম্' 'জাহিন্দ'

ওই শোন মা, ওরা ডাকছে যারা মায়ের সন্তান, পূণ্য মাতৃভূমির জন্য, ছেড়ে দাও মা !

বুকে টেনে নিয়ে মাথা নীচু করে রইলো নিস্তারিণী। তার বুক যেন ঘন ঘন ওঠানামা করছিল। নিস্তারিণী নির্বাক। তার দেহের প্রত্যেক অণুপরমাণু যেন লোপ পেতে চলেছে। খোকা-খোকা—আমার আমার ফেলে চলে যাস্‌নে তুই—চোখের জল শুকিয়ে গেছে নিস্তারিণীর, ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠলো—ভাগর ভাগর চোখ দুটি চতুর্দিকে যেন কি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

তুমি কি ভুলে গেছ মা সেই যে সেই গানটা, তুমি বলতে আবার গাতো খোকা—"স্বর্গাদপি গরীয়সী তুমি মা" মনে পড়ে মাগো তুমি যে আমার সেই মা। ছটফট করতে থাকে বসন্ত ছাড়া পাওয়ার জন্য।

নিস্তারিণী শক্তকরে ধরে রেখেছে খোকাকে, যেন কেউ ছিনিয়ে নিতে না পারে !

আকাশ বাতাস 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে মুখরিত করে চলেছে মুহুর্মুহু দল—

বসন্ত বুকের মধ্যে সূচীবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা উপলব্ধি করলো—

বন্দেমাতরম্ ধ্বনি যতই নিকটবর্ত্তী হতে লাগলো বসন্তও তত উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো—

আর্তকণ্ঠে আবেদন করলে—ওমা, ছেড়ে দাও মা—আমায় বিদায় দাও, ওই যে ডাক এসেছে, আমাকে যেতেই হবে। মার বাহু বন্ধন হতে বেরিয়ে আসবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো বসন্ত।

আস্তে আস্তে হাত দুটি আল্‌গা হয়ে গেল নিস্তারিণীর। ছাড়া পেয়ে চকিতে পায়ের ধুলো নিল নিস্তারিণীর। আশীর্বাদ কর মা যেন আবার তোমার কোলে ফিরে আসতে পারি।

ফুলের মত শুভ্র হাসি ফুটে উঠলো বসন্তর মুখে। তড়িৎ পদে বেরিয়ে মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে—

পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো নিস্তারিণী, তার দৃষ্টি উদাস—

ছুটে এল যতীশ—খোকা কোথায় ? ওরে একি করলি নিতা ? নিস্তারিণী নির্বাক, যেন একটি পাষাণ প্রতিমা—

উঃ, এইটুকু সময় আটকে রাখতে পারলিনে ? কি করেছিস তুই ? মা হয়ে ছেলেকে গোলার মুখে ঠেলে দিলি—খেদোক্তি করে যতীশ।

হতভাগা চোড়ার দাঁড়িয়ে থাকতে লাগলো যতীশ—খোকা ? বসন্ত—তীব্র চীৎকার করে ডাকলো—

বসন্ত ততক্ষণ বহুদূরে চলে গেছে।

যতীশ বেরিয়ে যাচ্ছিল—

বাধা দিল নিস্তারিণী—দাঁড়াও, ডাকতে হবেনা, খোকা চলে গেছে, চোখের জল শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, দৃষ্টি নিষ্প্রভ।

তীব্র কণ্ঠে বললো—যেতে দাও ওকে, তাকে আর আটকে রাখা যাবেনা—বলে গেছে আবার ফিরে আসবে—

একদিন তার বাবাও এই ভাবে চলে গেছলেন, খোকাও চলে গেল। থাকবো শুধু আমি, আমি মা নই ? আমি—আমি রাক্ষসী মা, আমি রাক্ষসী ! কান্নায় ফেটে পড়লো নিস্তারিণী। খোকা, খোকা, তীব্র-আর্তনাদ করে মাটিতে আছড়ে পড়ে বিলাপ করতে থাকে নিস্তারিণী—

অসহায় যতীশ, অশ্রুসজল নেত্রে তাকিয়ে থাকে সর্ব্বহারা বোনের দিকে।

বঙ্গেশ্বর হরিবর্ম্মদেব

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

আমি তখন ঢাকায়। সালটা ঠিক্ মনে করিতে পারিতেছি না। বিশ্ববিখ্যাত বিদ্বান্ ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংযোগিতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নির্দ্দেশে আমি যখন চণ্ডিদাস পদাবলী সম্পাদন করিতেছিলাম, সেই সময় কয়েক বারই ঢাকায় যাই, পুরাণো পুঁথি হইতে চণ্ডিদাসের নূতন পদ ও পাঠান্তর সংগ্রহের উদ্দেশে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরানো হাতের লেখা পুঁথির বিপুল সংগ্রহ ছিল। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী এই সংগ্রহের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে তারিখ-ওয়ালা পুঁথি ছিল। সুলতান গিয়াস্ উদ্দীনের নাম যুক্ত পুঁথি ছিল। আশা করিতেছি, সেগুলি যত্নের সহিতই রক্ষিত আছে। এই সন তারিখ যুক্ত পুঁথির অক্ষর দেখিয়া ডক্টর শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাককে দিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত চণ্ডিদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথির লিপি-কাল স্থির করাইয়াছিলাম।

প্রথমবার আমি ঢাকায় গিয়া জগন্নাথ হোষ্টেলে ছিলাম। ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর যতবার গিয়াছি বন্ধুবর ভট্টশালীর বাসাতেই উঠিয়াছি। ভট্টশালী ঢাকা যাদুঘরেও অনেক পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। স্নানাহার করিতাম ভট্টশালীর বাসায়, থাকিতাম যাদুঘরে। আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বসিয়া পুঁথি দেখিতে হইত না। পুঁথি আনিয়া যাদুঘরে বসিয়া নূতন পদ ও পদের পাঠ সংগ্রহ করিতাম। এবিষয়ে ভট্টশালীর বিশেষ সাহায্যও পাইতাম।

সেবার এমনই একদিন যাদুঘরে বসিয়া পুঁথি লইয়া আলোচনা করিতেছি, একজন ভদ্রলোক একখানি তাম্র-শাসনের একটা টুকরা, প্রায় অর্দ্ধেকটা লইয়া উপস্থিত হইলেন। তাম্রশাসনের খণ্ডিতাংশের কিছু কিছু পড়িয়া ভট্টশালী বলিলেন, এখানে হরিবর্ম্মদেবের দ্বিতীয় তাম্রশাসনের অর্দ্ধাংশ। তাহার পর আগন্তুক ভদ্রলোককে প্রশ্ন করিয়া তিনি জানিয়া লইলেন—এই তাম্রাংশ কোথায় কেমন ভাবে পাওয়া গিয়াছে ইত্যাদি। যাদুঘরের কর্ত্তা ছিলেন বোধ-হয় সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ভট্টশালী তাঁহাকে সমস্ত জানাইয়া কয়েকদিন ছুটি লইলেন এবং বজ্রযোগিনী যাওয়ার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ভট্টশালীর শ্বশুরবাড়ী ছিল বজ্র-যোগিনীর নিকটবর্ত্তী একখানি গ্রামে। বন্ধুপত্নী স্নেহ করিলেন এই সুযোগে তিনিও একবার পিত্রালয়ে ঘুরিয়া আসিবেন। ভট্টশালী রাজী হইয়া গেলেন এবং একদিন একটি নৌকায় সপরিবারে শ্বশুরালয়ের পথে রওনা হইলেন। বলাবাহুল্য সহযাত্রীরূপে তিনি আমাকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন। শ্বশুরবাড়ীতে পৌঁছিতে বেশ একটু রাত্রি হইয়াছিল। পরদিন বিশ্রাম, তাহার পরেরদিন হইতে পূর্ব্বাহ্নেই আমরা জলযোগাদি সারিয়া একখানি ছোট ডিঙ্গিতে বজ্রযোগিনী রওনা হইতাম। ফিরিতে এক একদিন মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। যে পুষ্করিণী হইতে তাম্রশাসনের ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সেই পুষ্করিণীতে জাল ফেলিয়া এবং আনুষঙ্গিক আরো নানা উপায়ে তিনি অপর ভগ্নাংশের অনুসন্ধান করাইতেন। আমি তাঁহার বালককে সঙ্গে লইয়া রামপাল প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া বেড়াইতাম। ভট্টশালীর শ্বশুরবাড়ীতে পূর্ব্ববঙ্গের জামাই আদরের নমুনা দেখিয়া আসিয়াছিলাম, যদিও জামাতা তখন কয়েকটি পুত্র-কন্যার জনক। সেই অকপট প্রীতির সম্ভোগ আমাকে অভিভূত করিয়াছিল। সুপক্ক কদলী, খাঁটি ক্ষীর, সেই সঙ্গে চালতার মিঠাই, নানা জাতীয় ব্যঞ্জন ও বিবিধ মৎস্যের স্বাদু সমাহার—তাহারই সঙ্গে কেতাপ্রসিদ্ধ,—সোপকরণ সমাদর সব দিক্‌দিয়াই বিচিত্র ও সমৃদ্ধ ছিল। তাম্র-শাসনের অপরাংশ কিন্তু পাওয়া গেলনা।

পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল হইতে রামচরিত আনিয়া ইতিহাসের ক্ষেত্রে যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আমি ভট্টশালীর সঙ্গে রামচরিত ও হরিবর্ম্মদেবকে লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম। এ

বিষয়ে পাথর আধান প্রদানও হইয়াছিল। অনেক পত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আলোচনার কথা সামান্যই স্মরণ আছে। অনেক বিষয় পরে জানাইবেন বলিয়াছিলেন। সময়মত উত্তর পাওয়া হয়তো সে কথা ভুলিয়াছিলাম।

রাঢ়ের সিঙ্গল গ্রামীণ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভবদেব ভট্ট হরিবর্মণ দেবের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। শস্ত্রে এবং শাস্ত্রে তাঁহার সমান দক্ষতা ছিল। সিঙ্গল গ্রাম রাঢ়ে আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। রেনেলের মানচিত্রে ইহার নাম সিঙ্গল গ্রাম। এখন লোকে শীতল গ্রাম বলে। এই গ্রামে পূর্ব্বে আদিবাসী এক সম্প্রদায়ের বাস ছিল—পরিচয় "বাজীকর"। আজি হইতে ষাট বৎসর পূর্ব্বে আমি ইহাদের সঙ্গে পরিচিত হই। পুরুষেরা—বার বার বৎসরের বালক পর্য্যন্ত গ্রামে গ্রামে নানা রকমের বাজী দেখাইয়া বেড়াইত। মুখ হইতে সুতা বাহির করা, মুখে গুটি সিদ্ধিয়া কান দিয়া বাহির করা, বাঁশের ছোট নলি পেটে ঢুকিয়া মুখে উগারিয়া ফেলা, হরেক রকমের বাজী। ইহাদের ঘড়ির খেলাও জানিত। দাঁড়াইয়া ঘড়ির উপর হাঁটিয়া চলা, হাঁটু দিয়া ঘড়ির উপর চলা, একজনের পেটের উপর একটা লম্বা বাঁশ দাঁড় করাইয়া সেই বাঁশের উপর আর একজনের উঠিয়া দাঁড়ানো, আরো নানা রকম খেলা। মেয়েরা যুবতী এবং প্রৌঢ়ারা গৃহস্থের বাড়ীতে "হাবু" গাহিত। হাবুগান প্রাচীন গ্রাম্য নরনারীর চরিত্র সমালোচনা মূলক কেচ্ছা। গানে ছন্দ ছিল, মিল ছিলনা। হাবু গানের সঙ্গে মেয়েরা এক ধরণের নাচ নাচিত। অশ্লীল হাবু প্রায়ের বাহিরে শুনিতে হইত। সিঙ্গল গ্রামে অনুসন্ধানে গিয়া জানিতে পারি, গ্রাম বৃদ্ধেরা বলে; এখানে ভট্টরাজার বাড়ী ছিল। প্রায় নব্বই বৎসরের এক বৃদ্ধ বাজীকর বলিয়াছিল—আমরা ভট্টরাজার লোক। গ্রামে শিবের গাজন হয়। চৈত্র সংক্রান্তির পনের দিন পূর্ব্বে এক পুষ্করিণীর জল হইতে শিবকে তুলিয়া আনিতে হয়। তুলিয়া আনে বাজীকর পুরুষেরা। পূজক ব্রাহ্মণ পকগব্য দিয়া শিবকে শুদ্ধ করিয়া পূজা করেন। বৈশাখের প্রথম দিন ঐ শিবরূপী প্রস্তরখণ্ডকে পুনরায় জলে রাখিয়া আসিতে হয়, রাখিয়া আসে ঐ বাজীকর পুরুষে। আমার অনুমান ইহারা ভবদেব ভট্টের গুপ্তচর ছিল। মনীষী চাণক্যের গুপ্তচর ছিল পটুয়া সম্প্রদায়, আর নন্দের মন্ত্রীর গুপ্তচর ছিল বেদিয়ার দল। পটুয়ারা পট দেখাইয়া বেড়াইত, বেদিয়ারেরদল দেখাইত সাপের খেলা। আর এই বাজীকরেরা বাজী দেখাইয়া বেড়াইত। সুতরাং সংবাদ সংগ্রহে ইহাদের কোন অসুবিধা হইত না।

ভবদেবের পিতার নাম গোবর্দ্ধন, মাতার নাম নাগোকা। ভবদেবের প্রশস্তিতে লেখা আছে—

বন্মন্ত্রশক্তিসচিবঃ সুচিরং চকার
রাজ্যং স ধর্ম্মবিজয়ী হরিবর্ম্মদেবঃ।
তদ্মননে বসতি যস্য চ যৌবনশ্রী
র্বন্ধ্যাপ্যগা বহুল কল্পলতেব লক্ষ্মীঃ।

"যে সচিবের মন্ত্রশক্তি প্রভাবে ধর্ম্মবিজয়ী হরিবর্ম্ম দেব বহুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। হরিবর্ম্ম দেবের অন্তঃপুরে যাহার যৌবনশ্রী-বন্ধ্যীভূতা-লক্ষ্মী কল্পলতার মত সুপ্রতিষ্ঠিতা ছিলেন"। প্রশস্তিতে আরো লেখা আছে-"বৌদ্ধজলনিধির অগস্ত্য সেই সর্ব্ব পণ্ডিত পাষণ্ড ও বৈতণ্ডিকগণের মত খণ্ডন পূর্ব্বক অবনীতে লীলা করিয়াছিলেন।" বেজনাসায় তাম্রশাসনে হরিবর্ম্মদেবের ঊনচল্লিশ রাজ্যাবেক উৎকীর্ণ হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ, পরমেশ্বর, পরম ভট্টারক প্রভৃতি বিশেষণ হইতে প্রমাণিত হয় হরিবর্ম্মদেব একজন পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন—প্রায় চল্লিশ বৎসরের উর্দ্ধে হরিবর্ম্ম দেবের রাজ্যকাল নির্দ্ধারিত হইতে পারে। ভবদেব ভট্টের প্রশস্তিতে হরিবর্ম্মদেবের পুত্রের উল্লেখ পাইতেছি। কিন্তু এই পুত্রের অপর কোন পরিচয় পাওয়া যায়না। হরিবর্ম্মদেবের পর সামল বর্ম্মা রাজত্ব করেন।

রামচরিতে রাম পালের অপর দুই ভ্রাতার নাম আছে। তন্মধ্যে শূর পাল ও রাম পাল সহোদর ভ্রাতা। মনোহর মহী পাল রাম পালের বিমাতার সন্তান। রামচরিতে মহী পালের চরিত্র কলঙ্ক লিপ্ত, শূর পালের উল্লেখ মাত্র আছে। যে মদন পালের সহায়কবিরূপে সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিত রচনা করেন সেই মদন পালের মনহলি লিপিতে মহী পালের পরিচয় এই রূপ—

তদ্ভজন স্তম্ভন ধারি হারি কীর্ত্তি প্রভা নন্দিত
বিশ্ব গীতঃ।
শ্রীমান্ মহীপাল ইতি দ্বিতীয়ো দ্বিজেশমৌলিঃ
শিবমম্বুব। (১৩শ শ্লোক)

শ্লোকে মহীপালকে চন্দনবারি হারি কীর্ত্তি প্রভায় বিমুগ্ধ বিবুধগণ কর্ত্তৃক গুণগানে অভিনন্দিত এবং চন্দ্রমৌলী শিবতুল্য বলা হইয়াছে। এদিকে রামচরিতে প্রথম পরিচ্ছেদে বত্রিশ শ্লোকে তিনি প্রভূত কঠিন চিত্ত ও বিচিত্র মায়াবী রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন।

তৃতীয় বিগ্রহ পাল চেদীরাজ কর্ণের কনিষ্ঠা কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আমার অনুমান দ্বিতীয় মহীপাল এই যৌবনশ্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। শূর পালের ও রাম পালের মাতুল অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর হন অর্থাৎ রাম পালের জননী অঙ্গদেশের রাজকন্যা। সুতরাং ভ্রাতাদের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই সদ্ভাব ছিলনা। এই অসদ্ভাব হেতু মহীপাল রামপাল ও শূরপালকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। বঙ্গেশ্বর জাতবর্ম্মা কর্ণদেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা বীরশ্রীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। সামল বর্ম্মা এই যৌবনশ্রীর গর্ভজাত পুত্র। হরিবর্ম্মদেব জাতবর্ম্মার প্রথমা পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহীপাল কৈবর্ত্তনায়ক দিব্যের হস্তে নিহত হইলে কোন সুযোগে রামপাল কারাগার হইতে পলায়ন করেন। শূরপাল বোধহয় কারাগারেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। দিব্যের মৃত্যুর কারণও জানিবার উপায় নাই। দিব্যের মৃত্যুর পর বরেন্দ্রভূমি দিব্যের অনুজ রুদোকের পুত্র ভীমের অধিকারভুক্ত হয়। ভোজবর্ম্মদেবের বেলাব লিপিতে লিখিত আছে—

জাত বর্ম্মা ততো জাত স্যাদ্যের ইব শান্তনোঃ।
দয়া ব্রতং রণঃ ক্রীড়া ত্যাগো যস্য মহোৎসবঃ॥
গৃহন্ বৈন্য পৃথুশ্রিয়ং পরিণয়ন্ কর্ণস্য বীরশ্রিয়ং
পৌত্রেষু প্রথয়ন্ শ্রিয়ং পরিতব স্যাং কামরূপ শ্রিয়ং
নিন্দন্দিব্য ভুজশ্রিয়ং বিকলয়ন্ গোবর্দ্ধনস্য শ্রিয়ং
কুর্ব্বন্ছোত্রিয়শ্রিয়ং বিততবান্ যঃ সার্ব্বভৌমেশ্রিয়ং

বেণ নন্দন রাজা পৃথু যেমন স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎসরূপে কল্পনা করিয়া পৃথিবী দোহন করিয়াছিলেন, তেমনই জাতবর্ম্মাও পুত্রের শৌর্য্যেই রাজ্যরক্ষা করিয়াছিলেন এই ইঙ্গিত স্বীকার করিলে হরিবর্ম্মদেবই ঐ পুত্র, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনে "মহারাজাধিরাজ জাতবর্ম্মা পাদানুধ্যাত" পাঠ দেখিয়া জাতবর্ম্মা যে রাজেশ্বর ছিলেন তাহা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু তিনি যে হরিবর্ম্মদেবের বাহুবলেই রাজ্যরক্ষা করিয়াছিলেন ইহা অনুমান করা চলে। আমার মনে হয় জাতবর্ম্মার সঙ্গে কৈবর্ত্তপতি দিব্যের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই যুদ্ধেই দিব্য হত হইয়াছিলেন।

রামপালের সঙ্গে কৈবর্ত্তপতি ভীমেরই যুদ্ধ হইয়াছিল। রামচরিত পাঠে পরিষ্কার জানা যায় ভীম রামপালের হস্তে বন্দী ও হত হইয়াছিলেন। অপর মতে প্রথমবার হয় তো কোনরূপে পলায়ন করিয়াছিলেন। ভীমের স্বজ্ঞাতি হরি পলায়িত সৈন্যগণকে একত্রিত করিয়া রাম পালের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। কিন্তু প্রবল যুদ্ধে ভীমের পুনর্ম্মিলিত চতুরঙ্গ সেনা অনায়ক অবস্থায় বিধ্বস্ত হইয়াছিল। মতান্তরে ভীম এই যুদ্ধে বন্দী অবস্থায় বধ্যভূমিতে নীত হইলে রামপাল স্বহস্তে ভীমকে বধ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বেই ভীমের কুটুম্বগণ ভীমের চক্ষের সম্মুখেই একে একে হত হইয়াছিলেন। আমার প্রশ্ন এই অবস্থায় ভীমের স্বজ্ঞাতি হরি কি বাঁচিয়াছিলেন? হরির মৃত্যু না হইলে হরিরই উদ্যোগে মিলিত সৈন্য অনায়ক হয় কিরূপে?

ডক্টর বনার্জ্জীর মতে রামচরিত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সাঁইত্রিশ শ্লোকের মধ্যে ভীমের পলায়নের এবং হরির সঙ্গে যোগদানের ইঙ্গিত আছে।

অরমাতিথ্য কৃতার্থো নতভাতিমতং ন পুণ্যজনতোষ্মাৎ।
সপরিণতি রঙ্গদোরীহিতমস্তন্ কমবহদকরুবঃ ।২ ৩৭

এমনও হইতে পারে অর্কদু শব্দে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র হরিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। পরের শ্লোকে পরিষ্কার হরির উল্লেখ আছে।

অথ ভীমানীকং তেন মহাভরসাপনৈরমের বলম্।

সমচীতে হরিসূদনা সুবিহিত পরমওপাবরোধেন। অনন্তর (ভীমের) সুজন হরি অতি শীঘ্র ভীমের অবিভবল সৈন্যবলকে সম্ববদ্ধ করিয়া রাম পালের রাজমণ্ডলকে অবরুদ্ধ করিলেন। কিন্তু দৈব প্রতিকূল, নায়কহীন সৈন্যগণ একে একে নিহত হইতে লাগিল, সংখ্যা সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তের নদী বহিতে লাগিল। হতবীরগণের কবন্ধ ও মস্তক সমূহে সেই রক্ত প্রবাহ পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। অবশেষে—

"নিজে মৃত্যুস্থানং জেতা স পরাক্রমেণ হরেঃ।"

হরির পরাক্রমে প্রথমে জয়লাভ করিলেও সম্প্রতি পরাজিত ভীমকে রিপুপাল বধ্যভূমিতে লইয়া গেলেন। এখানেও

হরির উল্লেখ থাকাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে হরিও হত হইয়াছিলেন।

জেতা বিত্তপাল পরাক্রম সহকারে হরিকে মৃত্যু স্থানে লইয়া গেলেন, এমন অর্থও হইতে পারে। তৎ পূর্ব্বেই ভীম বন্দী হইয়াছিলেন এবং মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিলেন, সাঁইত্রিশ শ্লোকের (২য় পরিচ্ছেদ) "অর্কবৃ" শব্দে যম অর্থ গ্রহণ করিলেন, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। ভীমের মৃত্যুর পর হরি পলায়িত সৈন্যগণকে একত্রিত করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হন, ইহা মানিয়া লইলে—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সমাপ্তি শ্লোকে—

"ধৃত চন্দ্র হাস ধারো লঙ্কারাজঃ কৃতোহস্ত বধঃ" (৩৯)

এই শ্লোকে হরিকেই বধ করা হইয়াছিল এই অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। হরি শত্রুপক্ষের একজন যোদ্ধা মাত্র। তাহার এমন কোন পরিচয় রামচরিতে নাই যাহার জন্য হরি রামপালের বিশেষ প্রিয় পাত্র হইতে পারে। ইহাও বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস রামচরিতে হরিবর্ম্ম দেবের নাম রহিয়াছে।

অবরুদ্ধ মহাদ্রবিণ বেষ্টিত প্রতিষ্ঠাবিরোপিত
হরীশঃ।
কনকময় ধাম লেখাধিকরণমপি মেরু শিখর নিবং।
(তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ৩ শ্লোক)

"মহা পরাক্রমশালী প্রভূত্বে প্রতিষ্ঠিত রাজেশ্বর হরির (হরিবর্ম্ম দেবের) সহায়তায় রামপাল রামাবতী নগরীকে হেম-সমৃদ্ধ প্রাসাদ শ্রেণী-মূল্যে সুশোভিত করিয়া সুবর্ণ রশ্মির আধার মেরু শিখরের মত গড়িয়া তুলিলেন" শ্লোকের এইরূপ অর্থই সুসঙ্গত। শিবরাজ গেলেন, কাহ্নদেব সুবর্ণদেব পড়িয়া রহিলেন, ভীমের বন্ধু পূর্ব্বশত্রু হরিকে ডাকিয়া রামপাল রাজধানী নির্ম্মাণের ভার দিলেন—ইহা একেবারেই অবিশ্বাস্য। দিব্যকে পরাস্ত বা নিহত করিয়াছিলেন, দিব্যের কুলকে হতশ্রী করিয়াছিলেন, জাত-বর্ম্মা, সুতরাং সেই সূত্রে হরিবর্ম্মার সঙ্গে রামপালের পূর্ব্ব পরিচয় ছিল। এখন কৈবর্ত্ত যুদ্ধে জয়ী রামপালকে অভিনন্দিত করিতেই আসুন, অথবা রামপালই তাঁহাকে সাদরে আমন্ত্রণ করুন, রামপাল হরিবর্ম্মদেবের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা অসঙ্গত বা অসম্ভব মনে হয় না। যে প্রাসাদে রামপাল হরির সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন সে প্রাসাদ হীরা মণি মাণিক্যে এবং বিবিধ বহু মূল্য উপকরণে সজ্জিত ছিল। মৃগমদ, কুঙ্কুম, চন্দন, কর্পূরসুরভিত সেই প্রাসাদ সুমধুর গীত বাদ্যে মুখরিত হইতেছিল। রাজ-ভোগ্যা যুবতী রাজবিলাসিনীগণের লাস্যনৃত্যজনিত নূপুর কিঙ্কিণী ধ্বনি সে প্রাসাদকে উৎসবময় করিয়া তুলিয়াছিল, সেই কাঞ্চনময় প্রাসাদে পদাতিক ও অশ্বসৈন্য সমন্বিত দুই রাজা প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ অবস্থায় নিভৃতে মিলিত হইয়া সুচির সময় শোভা পাইয়াছিলেন।

ইহ বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত কর্ব্বুরবর মন্দিরে
মিথো মিলিতো।
চির মতি তুপরিরম্ভরো চেতাবলিলাবণিনৌ দেবৌ॥
(তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ৪০ শ্লোক)

জন্মভূমি উদ্ধার করিয়া রামপাল কি আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিবার আর লোক পাইলেন না! সে আলিঙ্গন আবার একান্তই একান্তে। আর সেই সুসজ্জিত কাঞ্চনময় প্রাসাদ সুগন্ধে আমোদিত, নৃত্যগীতে মুখরিত। মিলিত হইলেন—অশ্বিনীকুমার যুগলের মত দুই নরনাথ। কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব, রামপালের মত নীতিজ্ঞান সম্পন্ন শত্রু পক্ষের হতবল এক সামান্য সেনাপতিকে এই সম্মান দান করিতেছেন? ভীমের বন্ধু হরি আবার রাজা হইল কবে? তাহার সমস্ত সৈন্য তো বিধ্বস্ত হইয়াছিল? তবে আবার হরি পদাতিক ও অশ্বারোহী কোথায় পাইল? আর রামপাল কি এতই নির্ব্বোধ ছিলেন যে শত্রুপক্ষের হরিকে আবার সৈন্যবল সংগ্রহে সুযোগ দিলেন? আর সেই সৈন্য দলকে রাজধানীতে সম্মিলিত হইবার অধিকার দান করিলেন? এই জন্যই আমার সুদৃঢ় অভিমত এই যে, কথিত হরি হরিবর্ম্মদেব ভিন্ন অপর কেহ হইতে পারেন না।

স্বপরিত্রাণ নিমিত্তং পত্যা যঃ প্রাগ্ দিশীরেন।
বয় বারণেনচ নিজ জনন দানেন বর্ম্মণাবাবি।
(তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৪৪)

পূর্ব্ব দিকের বর্ম্ম বংশীয় কোন রাজা নিজের পরিত্রাণ জন্য শ্রেষ্ঠ হস্তী ও বধূ দান রূপ আরাধনায় রাম পালকে পরিতুষ্ট

করিয়াছিলেন। আমার অনুমান এই ঘটনা ঘটিয়াছিল হরিবর্ম্মদেবের স্বর্গারোহণের পর। আমি এই বর্ম্মরাজকে সামল বর্ম্মা বলিয়া মনে করি। হরিবর্ম্মদেব ও তাঁহার পুত্রের লোকান্তরপ্রাপ্তির পরে আপনাকে সহায়হীন মনে করিয়া এবং পাছে মহীপালের মাতৃষসার পুত্র বলিয়া রামপাল তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন এই আশঙ্কা করিয়া সামল বর্ম্মা রামপালকে উপায়ন প্রদানে সন্তুষ্ট রাখিয়াছিলেন। হরিবর্ম্মদেবের উচ্ছেদের সময় সন্ধ্যাকর নন্দী রামপালকে রামমর্য্যাদার কোন্‌রূপ অপচয় ঘটিতে পারে ভাবিয়া বর্ম্মরাজের বিশেষ কোন মহিমার বর্ণনা দেন নাই। তবে অশ্বিনীকুমার যুগলের উপমায় রামপালের সঙ্গে বর্ম্মরাজকে সম মর্য্যাদা দানে কুণ্ঠিত হন নাই। চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৩৭ শ্লোকের এবং ৪০ শ্লোকের হরি শব্দে আমি তেমন গুরুত্ব আরোপ করিনা। কবি প্রশস্তির ১৯ শ্লোকে "হরিরিব হরিকেতনং" শব্দ আছে। এই সব ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করা হয় নাই।

পরিশেষে স্বীকার করিতেছি, সংস্কৃত সাহিত্যে অভিজ্ঞ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক সঙ্কলিত ও ব্যাখ্যাত রাম চরিত হইতেই আমি সমস্ত পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। এজন্য তাঁহার উদ্দেশে স-শ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তবে আমি তাঁহার ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত হইতে পারি নাই এবং এই প্রবন্ধে অকপটে তাহা ব্যক্ত করিয়াছি। রামচরিত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের পঞ্চত্রিংশ শ্লোক পর্য্যন্ত প্রাচীন টিকা পাওয়া গিয়াছিল। বাকী অংশের অনুবাদ ডক্টর বসাকের এবং ডক্টর মজুমদার ও ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরাজী সংস্করণের অনুগত। সুতরাং মতভেদ স্বাভাবিক। আমি এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

স্বপ্নতোক্তি

শিশির মজুমদার

দূরের সূর্য্যাস্তের কোলে রেখে কাঁপাহাত এসেছিল সে :
বেদনা বিস্ময় নীল চোখ তার সমুদ্র অস্থির,
বুকে তার আহত আষাঢ়ে ঘেরা আকাঙ্ক্ষার স্তূপ,
আকর্ণ্য দুটো চোখ মেলে ছিল কৃপণ আলোয়—
আমি তাকে দেখেছি জ্যোৎস্না রূপোর এক হিমের শরীর।

শুনেছি আকর্ণ্য এক কণ্ঠস্বর তার,
উত্তাল সমুদ্র ঢেউ শীতের হাওয়ায় ঘুমে ওঠে,
বিক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস পাপড়ি ঝরার মত পড়েছে অনেক—
ঘুমের তিমির ক্ষেতে কাক-চীৎ ডানার আঁধার।

আমি তার দেখেছি ভিজে চোখ সূর্য্য-শিশির,
না পাওয়ার বেদনায় মিশে গেছে পৃথিবীর ভীড়ে,
দীর্ঘশ্বাস রুদ্ধ হল, স্নায়ু তার অন্ধকার শব—
তারপর হয়েছে সে স্মৃতির শিলায় এক স্তূপের গভীর।

তারার ফসল বোনা শিউলী বিছানো ছায়া পথে,
এমন হাজার সত্তা আকাশে বিস্ময় প্রেম প্রাণের গভীর,
অশ্রুমাখা হৃদয়ের বেদনার স্বরলিপি হাসি —
জীবনকে স্পষ্ট করে চিরন্তন ব্যথার সংলাপে।

শুনেছি ক্ষয়িষ্ণু প্রাণে আত্মলীন স্বগতোক্তি তার,
দূরান্তীর্ণ নক্ষত্রে ছিমের হাওয়ার মত হয়েছে বিলীন,
তারপর বিভ্রান্ত বিতংসের মৃত্যু নীল সন্ত্রাস আঘ্রাণে—
বুকে জমে নিশ্চিহ্ন 'কার্থেজে'র কঠিন অন্ধকার।

জীবনের সাজ্ঞায় সংবাত যত বড় প্রাণ,
আজ শুধু প্রত্যাহারেই প্রয়োজন আর মৎ
নিবিড় অস্তিকার,
হাজার হাজার মুখ প্রশ্ন তোলে চেতনার সংগ্রামে—
ঘৃণা আর যন্ত্রণার স্তব তোলে প্রতীক্ষার গান।

বাঙলার চর্যাপদ

ডঃ দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ-ডি

(২)

রাগ অরু

তিঅড়া চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী।
কমল কুলিশ ঘাটে করহুঁ বিআলী।
জোইনি তই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি।
খেপহুঁ জোইনি লেপ ন জাম।
মণিকুলে বহিআ ডোম্বি বাহ নাম।
সাসু ঘরে ঘালি কোঞা তাল।
চান্দ সুজ বেণি পখা ফাল।
ভণই গুডরী অহমে কুলুরে বীরা।
নরম নারী মঝেঁ উঠিল চীরা।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন অন্যতম চর্যাপদ। পদটি যে গান করা হত তা বোঝা যায় 'অরু' রাগ-উল্লেখে। ভণিতায় পদকর্তার নাম গুডরী বা গুডরী-পাদ। কোথাও কোথাও গুড্ডরী পাঠও আছে।

পদটিতে দেহযোগাশ্রিত তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতির ইঙ্গিত রয়েছে প্রহেলিকাময় ভাষায়। পদকর্তা ও যোগিনীর মিলন রহস্য রচিত হয়েছে আলোচ্য পদে। প্রহেলিকাময় ভাষা কেন ব্যবহার করা হোত তার কারণ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য ভারতবর্ষ, ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ সংখ্যা) পদটির সাধারণ অর্থ এই,—

তিঅড়া অর্থাৎ তখন চেপে যোগিনী আলিঙ্গন দেব বলে আমি পদ্ম ও বজ্রের সংযোগে বিকাশ করব। ওগো যোগিনী, তোমাকে ছেড়ে আমি মুহূর্তের জন্যও বাঁচি না। তোমার মুখ চুম্বন করে কমল রস পান করি। হে যোগিনী, স্বস্থান থেকে উৎক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে লিপ্ত হওয়া যায় না; কারণ সেই কমলরস শশিকুল থেকে ঝরে ঊর্ধ্ব স্থানে প্রবেশ করে। শ্বাসগৃহে তালা-চাবি (কুক্ষিকা তালক) দেওয়া হল এবং চন্দ্র সূর্য দুই পাখা তাতে বিস্তার লাভ করল। গুডরী বলেন, আমি কুলুরযোগে বীর; বীরত্বের চিহ্ন স্বরূপ নর-নারীর মধ্যে পতাকা উড়ানো হল।

প্রহেলিকা অপসারণ করলে পাওয়া যায় দেহ সাধন পদ্ধতির কিঞ্চিৎ আভাস। পদকর্তা যে একজন সাধক যোগী তা বোঝা যায় তাঁর অভিজ্ঞতা-লব্ধ বর্ণনায়। সুকঠোর সংযম সাধনায় তিনি যে শক্তিলাভ করেছেন তিনিই হচ্ছেন নৈরাত্মা যোগিনী। বস্তু জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কায়সাধনায় সুপ্ত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত পূর্বক ঊর্ধ্বস্থান অর্থাৎ সহস্রার কমলে উন্নীত করলে সাধক যে শক্তি লাভ করেন, তিনিই হচ্ছেন নৈরাত্মা যোগিনী। এই যোগিনীই তখন সাধকের সাধনসঙ্গিনীরূপে কল্পিত। এই যোগিনী তখন তিঅড়া অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না—এই তিনটি নাড়ীর সমযোগে সাধককে আলিঙ্গন দান করেন। দেহের বামদিকে অবস্থিত ইড়া এবং দক্ষিণে অবস্থিত পিঙ্গলা (শিব-শক্তি বা নারী-পুরুষ) নাড়ীদ্বয়ের মধ্যবর্তী সুষুম্না পথে প্রাণ ও অপান বায়ুকে পরিচালিত করে সহস্রারে প্রেরণ করতে পারলেই অদ্বয় সত্তা বা মহাসুখ। এই মহা-সুখের অনুভূতিতে ইন্দ্রিয়গুলি ঘুমিয়ে পড়ে, মন প্রবেশ করে অন্তরে; জাগতিক সংজ্ঞা চেষ্টা হয় নষ্ট। মায়িক জগতের প্রতি কোনো বোধ থাকে না; আত্মপর ভেদ হয় অন্তর্লুপ্ত এবং তত্ত্বমোহ ধ্বংস হওয়ায় শূন্যতাজ্ঞান লাভ হয়। সাধক তখন অবস্থান করেন প্রলয়ের মতো। কাহ্নপাদের এক চর্যায় মহাসুখের কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে,—

ঘুমই চ হেবই ণ জাণঅবিআরা।
সহজ নিদ্রালু কাহ্নিলা লাজা।
চেমন ণ বেমন তর নিদ গেলা।
সমরস সুখদুক্ষ রহে সুতেলা।

অর্থাৎ সহজ নিদ্রায় আকুল কাহ্ন আত্মপর ভেদ টের পান না ; তাঁর দৈতজ্ঞান বা বেদনা কিছুই নাই। সমস্ত থেকে মুক্ত হয়ে তিনি সুখে প্রসুপ্ত।

আলোচ্য পদে সাধক গুরুরী এই মহাসুখ লাভ করেছেন নৈরাত্মা যোগিনীর সাহচর্যে। ফলে তিনি বলছেন, চিত্ত-রূপ কমলের সঙ্গে শূন্যতারূপ বজ্রের মিলনে এই অমর সত্য মহাসুখ উপভোগ করতে থাকবেন বিকাল অর্থাৎ বিগত-কাল পর্যন্ত। এই মহাসুখানুভূতির কাল কখনও বিগত হবে না ; সমং-নিরপেক্ষ নিরবচ্ছিন্ন অনন্তকাল ধরে সাধক এই সুখানুভব করতে থাকবেন।

নৈরাত্মা যোগিনীর সাহচর্যে সিদ্ধাচার্য গুরুরী মহাসুখ লাভ করে বলছেন—হে যোগিনী, তোমাকে ছেড়ে ক্ষণ-কালের জন্য বাঁচিনা, তোমার মুখচুম্বন করে কমল রস পান করব। সহজানন্দ প্রাপ্তির আবেগে সাধক মহাসুখকমলে পরমার্থরূপ মধু পান করেন যোগিনীর সাহচর্যে ; সেই হেতু, এই শক্তির সঙ্গে ক্ষণকালের জন্যও তাঁর বিচ্ছেদ হয় না।

উৎক্ষেপ বা ঊর্ধ্বীপনায় বোধিচিত্ত নৈরাত্মা শক্তিকে লাভ করবার জন্য অবিদ্যা মোহে লিপ্ত হয়না। বস্তু-জগতের জ্ঞান সম্পূর্ণ তিরোহিত হওয়ায় এই বোধিচিত্ত মণিকুল অর্থাৎ মূলাধারচক্র ভেদে ঊর্ধ্বস্থিত মহাসুখচক্রে গিয়ে প্রবেশ করে। দেহের মধ্যে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা—এই ছয়টি চক্র কল্পিত হয়েছে। নাভিদেশে মূলাধারচক্রে বোধিচিত্তের প্রথম উৎপত্তি ; পরে অন্যান্য চক্রভেদ করে বোধিচিত্ত একেবারে আজ্ঞা বা মহাসুখচক্রে গিয়ে উপনীত হয়, তখনই সাধক মহাসুখকমলের মধুপানে অধিকারী।

শ্বাসগৃহে তালাচাবি দেওয়া হয়েছে বলে চন্দ্র-সূর্যের পাখা বিস্তৃত হল ; অর্থাৎ যোগসাধনায় শ্বাস-প্রশ্বাস অবরুদ্ধ হওয়ায় যোগের পরিপন্থী দ্বৈতজ্ঞান স্বরূপ চন্দ্র-সূর্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষীণ হয়ে উঠল। তাদের আর কার্যক্ষমতা না থাকায় জাগ্রত বোধিচিত্ত বিনা বাধায় মহাসুখকমলে উপস্থিত হল। দেহ-সাধনায় শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ অবশ্য করণীয়। কুম্ভকযোগে এই নিয়ন্ত্রণের ফলে সাধক বস্তু-জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে মনকে করেন অন্তর্মুখী। শূন্যতায় আরোপিত এই মনে দ্বৈতজ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ায় সাধক অদ্বয় সত্যলাভে মহানন্দধামে অবস্থান করেন।

তলিতায় বলা হয়েছে, সাধক গুরুরী কুম্ভক যোগবিশেষে বীর বা শক্তিমান হয়েছেন এবং এই বীরত্বের নিদর্শনস্বরূপ জয়পতাকা উড্ডীন করেছেন নরনারীর মধ্যে। কুম্ভকযোগ-সাধনায় মন-পবনের কাজ হয় অবরুদ্ধ। চঞ্চল মনকে সংযত ও অন্তর্মুখী করাই সাধকের সর্বপ্রধান কর্তব্য। ইন্দ্রিয়রাশি মনকে পরিচালনা করে। কঠোর সংযমে ইন্দ্রিয় বশীভূত হলে বস্তু জগতের প্রতি মনের কোনো আকর্ষণ থাকেনা। সেই জন্য সাধক বলেছেন, তিনি কুম্ভক যোগে মনকে জয় করে প্রজ্ঞাজ্ঞানের নিদর্শনস্বরূপ অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্যের পতাকা তুলে ধরেছেন সকলের সামনে, অর্থাৎ অণিমা, লঘিমা ইত্যাদি অষ্ট ঐশ্বর্য লাভ করে সাধক সিদ্ধ হয়েছেন।

আলোচ্য পদে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের আভাষ পাওয়া যায় 'কুলিশ' পদের প্রয়োগে। মহাযান ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা প্রবেশ করে তান্ত্রিকতার সংস্পর্শে। ফলে, মহাযানী ধ্যানধারণাগুলি ধীরে ধীরে তান্ত্রিকতায় রূপান্তরিত হতে লাগল। মহাযান মতের শূন্যতা এইভাবে 'বজ্রে' পরিণত হল। আলোচিত পদটিতে কুলিশ বা বজ্র প্রযুক্ত হওয়ায় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, চর্যাপদের ধর্মমত সহজিয়া বা তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম, অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের আবরণে এবং তার মূল ভিত্তির উপর সহজিয়া মনোভাব-প্রসূত তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতিই চর্যাপদে বর্ণিত।

তলিতায় পদকর্তার নাম গুরুরী। কেউ কেউ গুরুরী বলেন। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় নামটি ছন্দ বলে অনুমান করে বলেন—গুরুরী বা গুরুরী 'গুরুকরিক' থেকে সিদ্ধ হতে পারে। মদমত্ত অথবা ঐ জাতীয় দ্রব্য গুঁড়া করার ক্ষমতা যাদের আছে কিংবা ঐ জাতীয় দ্রব্য নিয়ে যাদের পেশা তারাই গুরুকরিক। পদটিতে অনেক পারিভাষিক শব্দ থাকায় মনে হয়, পদকর্তা প্রাচীন সিদ্ধা-চার্যদের দলে পড়েন না। পদটি গেয় 'রুরু' রাগে, কিন্তু প্রচলিত রাগ-রাগিণীর মধ্যে এই নাম পাওয়া যায় না। ইহা কোনো লৌকিক রাগের নামও হতে পারে।

আর একটি চর্যাপদ নিয়ে আলোচনা করা যাচ্ছে,—

তরুবর পঞ্চ বিডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ॥

ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামি-লোঅ নিঅর তরই।
ফাড়িঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ।
আদঅ দিঢ়ি টাঙ্গী নিবানে কোড়িঅ।
সাহসমত ডিলে দাহিন বাম মা হোহী।
নিঅড়ী বোহি দূর মা জাহী।
জই তুম্ হে লোঅ হে হোইব পারগামী।
পুচ্ছউ চাটিল অণুত্তরসামী।

দুই নাড়ীকে নিয়ন্ত্রিত করে মধ্য পথের দ্বারা ভবনদী উত্তীর্ণ হওয়ার নির্দেশ রয়েছে আলোচ্য পদটিতে। সেতু নির্মাণের রূপকে এই নদী পার হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তথাপি চাটিল নামে সিদ্ধাচার্যের উল্লেখ থাকলেও তিনি পদকর্তা নন; তাঁর কোনো গুণমুগ্ধ শিষ্যের রচনা বলেই মনে হয়।

পূর্বোক্ত পদটি যেরূপ প্রহেলিকায় আচ্ছন্ন, আলোচ্য পদটিতে সেরূপ হেঁয়ালি না থাকলেও রূপকের অন্তরালে অন্তর্নিহিত সাধনরহস্য প্রচ্ছন্ন। পদটির বহিরর্থ এই—

সংসারতটিনী গহন ও গভীর এবং বেগে প্রবাহিত; নদীর পার্শ্বদ্বয় কর্দমাক্ত, কিন্তু মাঝে অথই জল। সিদ্ধাচার্য চাটিল পারাপারের জন্য নদীর উপর দিয়ে সাঁকো নির্মাণ করে দিয়েছেন ধর্ম রক্ষার্থে এবং তার উপর দিয়ে সংসার-নদী উত্তীর্ণকামী মানব অনায়াসে পার হয়ে যায়। মোহ-তরু কেটে তক্তা করা হয়েছে এবং পরে তক্তাগুলি জোড়া দিয়ে একত্র করে সাঁকো নির্মিত হয়েছে; অধিকন্তু দৃঢ় টাঙ্গি দিয়ে তক্তাগুলি আঘাত করা হয়েছে নির্বেধের জন্য। সিদ্ধাচার্য নির্দেশ দিচ্ছেন, সাঁকোতে চড়লে ডান-বাঁ করো না; নিকটেই বোধিস্থান, দূরে যেওনা। হে বালযোগি! যদি সংসার নদী উত্তীর্ণ হতে চাও, তবে অনুত্তরস্বামী চাটিলকে জিজ্ঞাসা কর।

যৌগিক অর্থ এই—অনুক্ষণ কামনাবাসনা তরঙ্গের উত্থান পতনে এবং তজ্জনিত নানা ঘোষের প্রবাহ হেতু ভবনদী হয়ে উঠেছে ভীতিসঙ্কুল। সংসারযাত্রা পথ সহজ ও সরল হলে সংসারীর পক্ষে সাধনা সম্ভব; কিন্তু প্রবল বাসনায় মন অভিভূত হলে সাধনচিন্তা আর মনে স্থান পায় না। বাসনা পরিপুষ্ট হয় ইন্দ্রিয়বর্গের কুশলতায়; সেই প্রবল শক্তিশালী ইন্দ্রিয়কে দমন করতে না পারলে দেহীর হয় সর্বনাশ। সাধারণতঃ নদীর দুই তীর থাকে কর্দমাক্ত, কিন্তু মাঝে নদী অথই; সেখান দিয়ে নৌকা চালালে তার গতিপথ রুদ্ধ হয় না; সেইরূপ কামনা বাসনা কর্দমাক্ত ইড়া পিঙ্গলা বা দ্বৈতজ্ঞানের মধ্যে অবধূতিকা শক্তি আপতিত হলে দেহসাধন নৌকা আর অগ্রসর হতে পারে না; তদনদীর মধ্যপথ অর্থাৎ সুষুম্নার পথে দেহ নৌকা আসতে পারেনা। সুকঠোর সংযমে সাধনায় জাগ্রত নাভিস্থিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে দেহমধ্যস্থিত সুষুম্নাপথে পরিচালিত করলে তিনি ষট্‌চক্র ভেদ করে দেহের শীর্ষস্থান সহস্রারকমলে উপনীত হন এবং সেখানে শিব-শক্তির মিলন হওয়ায় দেহী অক্ষয় মহাসুখ লাভ করেন। (এই মহাসুখের স্বরূপ লক্ষণ ইতিপূর্বে আলোচিতপদে বর্ণিত হয়েছে।) সুষুম্নাপথে পরিচালিত এই শক্তি যদি অসংযতপ্রসূত যোগপরিপন্থী দ্বৈতজ্ঞান স্বরূপ দুই পার্শ্বস্থিত ইড়া-পিঙ্গলা দ্বারা কলুষিত হয়, তবে সাধক পুনরায় সংসারচক্রে পড়ে দেহকে বিনাশের মুখে ফেলে দেয়। সুতরাং সুদক্ষ নাবিক যেমন নদীর পার্শ্বস্থিত, কর্দমাক্ত পথ ত্যাগ করে মধ্যবর্তী স্রোতে নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে অক্লেশে গন্তব্যস্থানে পৌঁছায়, সেইরূপ দেহযোগীকেও সংসারের ইন্দ্রিয়জাত সমস্ত কামনা-বাসনা দূর থেকে পরিত্যাগ করে শক্তিকে পরিচালিত করতে হবে সুষুম্না মার্গে। সংসারের কামনা-বাসনাই কর্দম স্বরূপ, তাতে পড়লে দেহ সাধনা অসম্ভব।

বিষয় বাসনায় অভিভূত মানবের সহজধর্ম রক্ষার্থে ভবনদীর উপর একটি সাঁকো নির্মাণ করে দিয়েছেন সিদ্ধাচার্য চাটিল। পরিদৃশ্যমান এই জগৎ যে ষট্‌চাত্বারিংশৎ ভূত-বিকার তা সাধারণের বোধগম্য নয়। ভবনদী উত্তীর্ণ হতে গেলে স্বাধিষ্ঠান ও প্রজ্ঞাপায় ঐক্যরূপ সেতুর প্রয়োজন। এই সেতুকে অবলম্বন করে ভবনদী অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

তক্তা দিয়ে সাঁকো (bridge) তৈরী করতে হয়, আর সেই তক্তা সংগ্রহ করতে হয় গাছ কেটে। কুঠারাদি অস্ত্রেরও প্রয়োজন গাছ কেটে তক্তা বের করতে। অপরিচ্ছন্ন তক্তায় কিন্তু কাজ হয় না; সেগুলি অস্ত্রের সহায়তায় কাজের উপযোগী করে নিতে হয়। সেইরূপ দেহযোগীকেও সাধনা করতে হয় দেহ নিয়ে। বস্তুজগত-আচ্ছন্ন দেহকে

সাধনোপযোগী করতে হলে তাকে শুদ্ধ করে নিতে হয়। সর্ব আগে প্রয়োজন অদ্বৈত জ্ঞান। দেহযোগীরা অদ্বৈতবাদীর মতো শুধু দেহকেই সত্য বলে জানেন, তাঁদের কাছে জগৎ মিথ্যা। এই অদ্বয় দেহতত্ত্বজ্ঞানরূপ কুঠারে কামাদি মোহলিপ্ত অপরিচ্ছন্ন দেহকে কেটে এবং তা থেকে কায়-বাক-চিত্ত রূপ ভক্তা বের করে পৃথক করে নিতে হয়; কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই তিনটিই দেহের মূল উপাদান। এই তিনটিকে বাদ দিয়ে সাধনা অসম্ভব। সেই হেতু যোগী সুষুম্নার সংযমে এই তিনটি থেকে অবিদ্যা ধ্বংস করে শুদ্ধ করে নেন; পরে সর্বাজ্ঞানতামুক্ত পরিচ্ছন্ন কায়-বাক-চিত্ত দ্বারা নির্মিত স্বাধিষ্ঠান ও প্রভাস্বর ঐক্যরূপ অথবা সংবৃত্তি ও পারমার্থিক বোধিচিত্তের মিলনরূপ সেতুর মাধ্যমে যোগী মহাসত্তা লাভ করেন।

পরিশুদ্ধ দেহ নিয়ে সাধনা করলেও বিঘ্ন আসতে পারে। সেই জন্য সিদ্ধাচার্য পুনরায় সাবধান করে বলেন, ভবনদী পার হবার জন্য নির্মিত নৌকোতে চড়লে একেবারে সোজা পথ দিয়ে যেতে হবে; ডান-বাঁয়ে অর্থাৎ গ্রাহ্য-গ্রাহক অথবা দ্বৈতজ্ঞানের মধ্যে যেওনা; সোজা সুষুম্নার পথ দিয়ে অগ্রসর হলে ভাববিকল্প বা মায়াপাশে আবদ্ধ হবার সম্ভাবনা নাই। সুষুম্নার সাধনায় যে শক্তি সুষুম্নার পথে চালিত, সে শক্তি যাতে পুনরায় বস্তুজগৎ বা দ্বৈতজ্ঞানের মধ্যে লিপ্ত হয়ে না পড়ে সেই জন্যই সাধকের প্রতি সিদ্ধাচার্য চাটিলের এই সাবধান বাণী। তিনি আরও বলেন, নিকটে বোধিস্থান; দূরে যাবার প্রয়োজন নেই; অর্থাৎ বেদ-বেদান্ত, আগম পুরাণ ও নানা শাস্ত্র অধ্যয়নের সাহায্যে দেহ সাধনার প্রয়োজন হয় না। দেহের মধ্যেই মহাসুখস্থান রয়েছে এবং দেহকে যথোপযুক্ত যোগসাধনায় যুক্ত করতে পারলেই বোধিলাভ হয়।

ভবনদী উত্তীর্ণ হতে গেলে গুরুর উপদেশ একান্ত প্রয়োজন, কারণ দেহ-সাধন-বিদ্যা গুরুমুখীবিদ্যা। এ-বিষয়ে সিদ্ধাচার্য চাটিল সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই সিদ্ধাচার্যের গুণমুগ্ধ শিষ্য সকলকে (বালযোগীদের) বলছেন যে ভবনদী পার হওয়ার বিষয়ে আচার্য চাটিলের কাছ থেকে পথনির্দেশ জেনে নাও।

দেহ সাধনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে আলোচিত পদটিতে। এই দেহের মধ্যেই আছে জগৎ, ভাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড সব কিছুই। এই দেহ নিয়েই সাধনা এবং পরম সিদ্ধি লাভ হয় এই দেহের মধ্যেই। সিদ্ধির জন্য সন্ন্যাসধর্মের প্রয়োজন নেই। সংসার ছেড়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণেরও সার্থকতা নেই। পরম কাম্য স্থান বোধি বা মহাসুখপুর এই দেহের মধ্যেই বর্তমান। বৌদ্ধ দোহাতেও এই তত্ত্ব দুর্লভ নয়,—

এথু সে সুরসরি জমুনা এথু সে গঙ্গা সাঅর।
এথু পআগ বণারসি এথু সে চন্দ দিবাঅর॥
পণ্ডিঅ সঅল বক্খাণই।
দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই॥

এই দেহের মধ্যেই সুরেশ্বরী ও যমুনা, এইখানেই গঙ্গা সাগর; এখানেই প্রয়াগ, বারাণসী, এই দেহেই চন্দ্র সূর্য। পণ্ডিতেরা সত্য ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু দেহেই যে বুদ্ধ বসন্ত তা তাঁরা জানেন না।

এক্ষণে পদকর্তা-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। চাটিল বলে একজন প্রখ্যাত সিদ্ধাচার্য যে ছিলেন তা জানা যায় পদটির বর্ণনা থেকে; কিন্তু এটা নিশ্চিত, চাটিল স্বয়ং পদটি লেখেন নি; কারণ পদকর্তা নিজেকে কখনও 'অহুত্তর সামী' বা অহুত্তর স্বামী (শ্রেষ্ঠ সাধক) বলতে পারেন না। সুতরাং আলোচিত পদটি আচার্য চাটিলের গুণমুগ্ধ কোনো শিষ্যের রচনা। পদটিতে 'ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই' অংশটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে 'ধামার্থে' বা ধর্মের জন্য এই অর্থ না করে যদি 'ধাম নামে এক শিষ্যের জন্য চাটিল সাঁকো তৈরী করে দিয়েছেন'—এই অর্থ করা যায়, তবে মনে করতে পারি, আলোচিত পদটি সিদ্ধাচার্য ধামের রচনা। যে-ধাম নামক শিষ্যের জন্য গুরু চাটিল সাঁকো তৈরী করে দিয়েছেন তা ভবনদী উত্তরণেচ্ছু প্রত্যেক দেহযোগীরই প্রয়োজন—এই কথাই গুণমুগ্ধ শিষ্য ধাম প্রকাশ করেছেন। বাংলার চর্যাপদেও ধাম ভণিতায় একটি চর্যা আছে। পদটি যথারীতি পরে আলোচনা করা হবে। বলা বাহুল্য চর্যাকারদের তালিকায় চাটিল বলে কোনো সিদ্ধাচার্যের উল্লেখ নেই; তিব্বতী ঐতিহ্যেও এর সাক্ষ্য মিলছে। কেউ কেউ বলেন, চাটিল ছিলেন চট্টগ্রামের অধিবাসী। তবে এটাও অস্বীকার্য যে চাটিল একজন বিখ্যাত সিদ্ধাচার্য ছিলেন, আলোচিত পদটিই তার প্রমাণ, কারণ পদটিতে কায়সাধনের গূঢ় ইঙ্গিত রহস্য করছে। ইহাও অসম্ভব নয়, স্বয়ং সিদ্ধাচার্য ছদ্মনামে আত্মগোপন করেছেন।

পূর্বপ্রকাশিতের পর

ভাগ্যের চাবিকাঠিটা একরকম অযাচিতভাবেই দীপেনের হাতে গিয়েছিল। আর সেটা দিয়ে একের পর এক দুয়ার খুলে গেছে তার।

বক্সসাহেবের পার্সোনাল এ্যাসিস্টান্টের কাজটা খুব বেশিদিন করতে হয়নি দীপেনকে। মাত্র মাসদেড়েকের মত। তারপরেই সুযোগ এসেছে সুস্তনী—সব মিলিয়ে সুদর্শনা পার্শী পি, এ এসে গিয়েছিল। তাতে অবশ্য ক্ষতি হয় নি দীপেনের। বরং নতুন পি, এ, আসার ফলাফল তার স্বপক্ষেই গিয়েছিল। দেড়মাস আগে পার্সোনাল এ্যাসিস্টান্টের শূন্যতা পূরণ করতে যখন সে বক্সসাহেবের কামরায় ঢুকেছিল তখন সে আপার ডিভিশনের একজন কেরাণী মাত্র। দেড়মাস পর যেদিন বক্সসাহেবের কামরা থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেদিন দীপেন তার সেকসনের ইন্‌চার্জ। তার পর এক বছরের মধ্যেই ইন্‌-চার্জ থেকে এ্যাসিস্টান্ট একজিকিউটিভ অফিসার। তিন বছর পর জুনিয়র একজিকিউটিভ অফিসার এর পরেই সীনিয়র একজিকিউটিভ অফিসারদের বুড়ি ছুঁতে পারলে একটা পর্বশেষ হয়। অবশ্য তার জন্য বছর কয়েক অপেক্ষা করতে হবে।

সাধারণ নিষ্প্রভ একজন কেরাণী থেকে জুনিয়র একজিকিউটিভ অফিসার! চার পাঁচ বছরের মধ্যে এই অনায়াস ঊর্ধ্বগতি রূপকথাতেই বুঝি সম্ভব! চাকরি জীবনের সিঁড়িটা একরকম হাতের মুঠোতেই এসে গেছে দীপেনের।

অবশ্য এর জন্য দীপেন তার বাবা সুধাময় লাহিড়ীর আদর্শ পুরোপুরি অনুসরণ করে গেছে। প্রতি মুহূর্তে নিজের অস্তিত্বের গহন কেন্দ্র থেকে নির্দেশ পাওয়া গেছে, 'এ-ভাবে চল, ও-ভাবে তাকাও, সে-ভাবে কথা বল—আর সব দিকে নজর রেখে সুযোগগুলো কাজে লাগাও। নিশ্চয়ই সিদ্ধকাম হবে।'

পার্সোনাল এ্যাসিস্টান্টের কাজটা পাবার পর সারাদিনই বক্সসাহেবের কাছাকাছি থাকতে হ'ত দীপেনকে। সেটুকুতেই সন্তুষ্ট ছিল না সে। কেরিয়ারের ব্যাপারে তার নামে 'সুপরস্তি'। অতএব ছুটির দিনে অফিসের কাজের ছলে বক্সসাহেবের আলিপুরের বাঙলোতেও হানা দিত দীপেন।

অফিসের কাজটা উপলক্ষ মাত্র। শৈশবেই সুধাময় লাহিড়ী অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মত দীপেনের ধ্যানজ্ঞান মাছের যে চোখটিতে আটকে দিয়েছিলেন তার নাম কেরিয়ার। অতি সন্তর্পণে, নিঃশব্দে সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল সে।

অফিসের কাজ শেষ হতে কতটুকু সময়ই বা লাগত। তার পরেও উঠত না দীপেন। অফিসের সীমারেখার বাইরে দত্তসাহেবের একান্ত ব্যক্তিগত পারিবারিক একটা যে জীবন আছে, অত্যন্ত চুপিসাড়ে কবে যেন একদিন তার অন্তঃপুরে চলে গিয়েছিল সে।

পারিবারিক জীবন আর কি! চল্লিশের সীমান্ত পেরিয়েও দত্তসাহেবের কৌমার্য অটুট। অবিবাহিত বা মৃতদার, তা সে যে-ই হোক—গৃহিণীশূন্য সংসারে শৃঙ্খলা থাকে না এ-রকম একটা জনরব আছে। দত্তসাহেবের সংসারে শূন্যতা আছে ঠিকই, কিন্তু বিশৃঙ্খলা আছে বলে মনে হয় না।

দত্তসাহেবের সংসার পুরোপুরি ভৃত্যতান্ত্রিক। কেননা নিকট স্বজন কেউ নেই তাঁর। মা-বাবা দত্তসাহেবের কৈশোরেই মারা গেছেন। তিন দাদা চাকরির সূত্রে প্রবাসী। বড়দা উত্তর প্রদেশে, মেজদা জার্মানীতে, ছোটদা কেরালায়। কাজেই চাকর-বাকরের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না তাঁর। অবশ্য বিয়ে করলে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারত।

যাই হোক, মালী-বেয়ারা-বাবুর্চি—সব মিলিয়ে প্রায় এক অক্ষৌহিণী। সাধারণত গৃহিণীহীন সংসার যাদের হাতে থাকে তারা চুরির মহোৎসব শুরু করে দেয়। এদিক থেকে দত্তসাহেবের ভৃত্য-ভাগ্য ঈর্ষা করার মত। নীতি-শাস্ত্রের পাঠ শেষ করে কেউ আর পরের বাড়ি চাকর হ'তে যায় না। অতএব দত্তসাহেবের সংসারেও চুরি হয়। যে টুকু হয়, প্রায় নগণ্যই। অনায়াসেই তা উপেক্ষা করা যায়। তা ছাড়া নিজেদের করণীয় সম্বন্ধেও তারা অতিমাত্রায় সচেতন। দত্তসাহেবের সুবিশাল বাঙলোখানা ঝকঝকে করে সাজানো। সামনের সুবিস্তৃত 'লনে'র ঘাস নিরপেক্ষভাবে সমান করে ছাঁটা। একটিও অশোভন ভঙ্গিতে অন্যের চাইতে মাথা উঁচু করে নেই। একদিকে লন্। তার পরিচ্ছন্ন সুরকির পথ। পথের ওপাশে চমৎকার একখানা বাগান,—ডালিয়া, সুইটপী, ম্যাগনোলিয়া—সব বিদেশী অতি ভদ্র ফুল। বাগানটাকে ঘিরে আছে একসারি বাউ। কাউএর একটি পাতা কোথাও পড়ে নেই।

শুধু কি লন্ আর বাগানটাই—সমস্ত বাঙলোখানাই সুরুচিতে শোভন। মেঝের কার্পেটে কোথাও এতটুকু তাঁজ নেই। কাগজের সূচি বা সিগারেটের একটি টুকরো কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ফ্লাওয়ার ভাসের ফুলগুলি প্রতিদিনই বদলায়। বাসি ম্রিয়মান ফুল কোনদিন দেখতে পাওয়া যাবে না। বুক-র‍্যাকে এক বিন্দু ধুলো নেই; ওয়ার্ডরোবের জামাকাপড় এতটুকু এলোমেলো নয়। এ্যাস-ট্রে, চিরুণি, ব্রাশ—কোনদিনই সেগুলো স্থানচ্যুত হয় না।

আলিপুরের সেই বিশাল বাঙলোখানার সব কিছুই শৃঙ্খলাবদ্ধ, ত্রুটিহীন। দেখেশুনে হতাশই হয়ে পড়েছিল দীপেন। হতাশ—কেননা দত্তসাহেবের গৃহসজ্জা নিয়েই প্রথম প্রথম তাঁর জীবনের অন্তঃপুরে ঢুকতে চেয়েছিল সে। যাই হোক, হতাশটা খুব বেশিদিন তাকে নিষ্ক্রিয় রাখতে পারেনি। সুচারু সাজানো বাঙলোটার মধ্যে হঠাৎ একদিন নানা অসামঞ্জস্য আবিষ্কার করতে শুরু করে দিয়েছিল দীপেন। দত্তসাহেবকে কোনদিন সে বলেছে—'ফ্লাওয়ার ভাসটা উত্তরদিকে না রেখে দক্ষিণে মাথার কাছে রাখলে কিন্তু বেশ দেখায় স্যার।'

'দত্তসাহেব ঈষৎ হেসেছেন, 'তাই নাকি!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তা হ'লে রাখি?'

'না-না, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।' দত্তসাহেব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, 'বেয়ারাদের বলে দিচ্ছি। ওরাই রাখবে'খন।'

বেয়ারা ডাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করে নি দীপেন। দত্ত-সাহেবের বাধাও মানেনি। লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে নিজের পছন্দমত ফুলদানিগুলো সাজিয়ে দিয়েছে।

কোনদিন দীপেন বলেছে, 'স্যার, দরজা জানালার পর্দা-গুলো বড্ড ব্যাক্ ডেটেড হয়ে গেছে। কাল নিউ মার্কেটে গিছলাম। নতুন ধরণের জয়পুরী পর্দা দেখলাম। জলরঙে ব্রাশ করার মত কাজ। আমি কিন্তু নিয়ে আসব স্যার, আপনি কিছুতেই 'না' বলতে পারবেন না।'

দত্তসাহেব বিব্রত বোধ করেছেন। দীপেন তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী। তাঁকে খুশী করার জন্যই যে উপঢৌকনের মত দীপেনের এত ছোটাছুটি এত ব্যগ্রতা, সে সম্বন্ধে দত্তসাহেব নিঃসংশয়। বার বার তাঁর মনে হয়েছে, পরোক্ষে দীপেনের কাছ থেকে অন্যায় সুযোগ নিচ্ছেন।

হরপ্রসাদের কুণ্ঠিত হয়েছেন, সঙ্কুচিত হয়েছেন—কিন্তু দীপেনকে নিরস্ত করা যায় নি। ফুলধানি দালানো আর হল্লা-চালানোর পর্দা কেনা দিয়ে যার শুরু, তার শেষ যে সহজে আসবে না হরপ্রসাদের তা অনুমান করেছিলেন। করেও তাঁকে নিরুপায় থাকতে হয়েছে। অবশ্য রুঢ় হতে পারতেন তিনি, কিন্তু দীপেন সম্বন্ধে কোথায় যেন একটা সন্দেহ প্রচ্ছন্ন ছিল তাঁর।

যাই হোক, এর পর প্রতিমাসে দোকান থেকে নিয়মিত নতুন নতুন রেকর্ড নিয়ে এসেছে সে। বেডকভার, তোয়ালে, হরপ্রসাদের সুটের কাপড়, গাড়ির রঙ, দেওয়াল সাজাবার জন্য ত্রিপুরী এবং কাশ্মীরী হ্যাণ্ডিক্র্যাফট্—সমস্ত কিছুই দীপেনের পছন্দ অনুযায়ী এসেছে। অবশ্য এ-সবের যাবতীয় খরচ হরপ্রসাদেরই জুগিয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত হরপ্রসাদের কুণ্ঠা-সঙ্কোচ, আর ছিল না। দীপেনের ইচ্ছার কাছে ধীরে ধীরে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন তিনি।

গৃহসজ্জা দিয়ে আরম্ভ করেছিল দীপেন। অবশেষে হরপ্রসাদের শরীরের দিকেও তার দৃষ্টি পড়েছিল। প্রায়ই সে বলত, 'আপনার হেল্‌থটা রুড্ড খারাপ হয়ে যাচ্ছে স্যার।'

হরপ্রসাদ বলতেন, 'কই, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।'

'নিজের দিকে কি আপনার নজর আছে! দিনরাত শুধু কাজ আর কাজ।'

দীপেনের অনুযোগের মধ্যে আন্তরিকতার এমন কিছু মলম মেশানো থাকত—যা হরপ্রসাদকে ভোলা দিত। চাকর-বাকরেরা যতই অনুগত প্রভুভক্ত হোক, ও-জিনিসটি তাদের কাছে দুর্লভ। সস্নেহে হরপ্রসাদ বলতেন, 'কাজ না করলে চলবে কেমন করে?'

'আপনি কিছুদিন ছুটি নিন স্যার।'

'ইয়ার এণ্ডিং হয়ে আসছে। এ সময় ছুটি নিলে কোম্পানি যে কোলাপ্স করে যাবে।'

'তা হলে এক কাজ করুন।'

'কী?'

'আপনার শরীরের যা অবস্থা, তাতে একটা ধরো মেডিক্যাল চেক-আপ দরকার। তারপর ডাক্তার যে-ভাবে বলবে সেভাবে খাওয়া-দাওয়া,চলা-ফেরা—'

কথাটা অসমাপ্তই ছিল দীপেনের। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে মাঝখানেই হরপ্রসাদের বলে উঠেছিলেন, 'আই এ্যাম কোয়াইট ফিট। শুধু শুধু মেডিক্যাল চেক-আপ করিয়ে কি হবে!'

দীপেন কোন কথাই শোনেনি। একরকম জোর করেই তিনজন বিশেষজ্ঞর কাছে হরপ্রসাদকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তিনজনের মধ্যে যিনি প্রথম তিনি হৃদ্‌যন্ত্রের কারিগরী। পাকস্থলীর রহস্য দ্বিতীয়জনের নখদর্পণে। আর যে রক্তের চাপ হঠাৎ ঘোড়ার মত লাফিয়ে উঠে বা ঘাড় বাঁকিয়ে পিছু ফিরে শরীরের দুর্জ্ঞেয় অংশে গোলযোগ ঘটায় তৃতীয়জন তাকে বাগ মানিয়ে থাকেন।

মেডিক্যাল চেক-আপে কিছু কিছু শারীরিক বিশৃঙ্খলা ধরা পড়েছিল। রক্তের চাপ স্বাভাবিকের তুলনায় বেশ ঊর্ধ্বগামী। অতএব যে খাদ্যে রক্ত উত্তেজিত হয় তা খাওয়া বারণ হয়েছিল। শরীরে শর্করার ভাগ এত বেশি যে অচিরেই নিয়ন্ত্রণের একটি রোগের সম্ভাবনা। কাজেই মিষ্টি খাওয়ার কপালে নিষেধের কোঁটা পড়েছিল। তা ছাড়া পঞ্চাশোর্ধ্ব বছর অর্থাৎ চার যুগের ব্রত অবিরাম পরিশ্রম করে হৃদয় যন্ত্রে কিঞ্চিৎ বিদ্রোহের আভাস পাওয়া গেছে। সুতরাং ব্যবস্থাপত্রে সেটাকে যতখানি সম্ভব ছুটি দেবার নির্দেশ দেওয়া ছিল।

আগে আগে মাত্র ছুটির দিনেই হরপ্রসাদের আলিপুরের বাড়িতে আসত দীপেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা খাদ্য এবং বিশ্রামের ব্যাপারে যে যে গণ্ডি টেনে দিয়েছিলেন হরপ্রসাদের তার বাইরে পা বাড়াচ্ছেন কিনা, সেটা দেখবার জন্য প্রায় রোজই হানা দিত সে। সকালে উঠেই আলিপুর চলে আসত। তাড়া দিয়ে দিয়ে হরপ্রসাদকে ওষুধ খাওয়াত, স্নান করাত। সেখানেই দীপেনের খাবার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য সে নিজে করেনি। হরপ্রসাদেরই অনুরোধ করে দীপেনকে করিয়ে ছিলেন।

যাই হোক, হরপ্রসাদের সঙ্গেই খাওয়া সেরে অফিসে চলে যেত দীপেন। ছুটির পর তার সঙ্গে আবার আলিপুর ফিরত। তারপর হরপ্রসাদকে ন'টার মধ্যে ডিনার খাইয়ে বিছানায় পৌঁছে দিয়ে বাড়ি আসত। রাতের কয়েকটি ঘন্টা বাদ দিলে দীপেন হরপ্রসাদের সর্বক্ষণের সহচর।

এর মধ্যে আরো একটা ব্যাপার ঘটেছিল। প্রথম প্রথম দীপেনকে আপনি'ই বলতেন দত্তসাহেব। এক রকম জেদ এবং অভিমান করেই সম্বোধনটাকে 'তুমি'র অন্তরঙ্গতায় নামিয়ে এনেছিল দীপেন।

অর্থশাস্ত্রে 'বিনিয়োগ' বলে একটি শব্দ আছে। কেরিয়ার নামে মাছের চোখটার দিকে লক্ষ্য রেখে দত্তসাহেবের গৃহচর্চা এবং স্বাস্থ্যচর্চার মধ্যে সজ্ঞানে ধীর মস্তিষ্কে বিনিয়োগ করে যাচ্ছিল সে। ডিভিডেণ্ডের আশায় যুগের পর যুগ বসে থাকতে হয়নি। নগদ নগদ সেটা হাতে এসে গিয়েছিল দীপেনের। আপার ডিভিসন কেরাণীর বাহার-হীন ন্যাড়া ল্যাজখানায় পাঁচ বছরের মধ্যে জুনিয়ার একজিকিউটিভ অফিসারের পেখম ধরেছিল।

কিন্তু কেরিয়ারের ব্যাপারে দীপেনের 'ভূমৈব সুখম্।' অতএব জুনিয়ার একজিকিউটিভ অফিসারের পেখম মেলেও সে সুখী হয় নি। দিল্লীতে তাদের কোম্পানি একটা ব্রাঞ্চ খোলার পরিকল্পনা নিয়েছে। সেখানকার ম্যানেজারিটা পাবার জন্য দীপেন খুবই লালায়িত। মাইনের দিক থেকে লোভনীয় তো বটেই; কলকাতায় সে আট শ' টাকার মত মাইনে পায়। দিল্লীর ব্রাঞ্চ ম্যানেজারিটা পেলে সেই অঙ্কটাই আড়াই গুণ স্ফীত হবে। তা ছাড়া সেখানকার অফিসের সর্বময় হয়ে উঠতে পারবে সে। সেটাও কম প্রলোভনের ব্যাপার নয়।

দিল্লীর ব্রাঞ্চ ম্যানেজারিটার ব্যাপারে কিছুদিন থেকেই দত্তসাহেবের কাছে উমেদারি করে আসছিল দীপেন। স্পষ্ট বিশদ করে কিছু অবশ্য বলে নি, আভাসে জানিয়েছে মাত্র। দত্তসাহেব যে না বুঝেছেন, তা নয়। দীপেন যেমন আভাসের আশ্রয় নিয়েছিল তিনিও তেমনি অস্পষ্ট কয়েকটি ইঙ্গিতের ওপরে ওঠেন নি। দীপেনের উমেদারির উত্তরে 'হুঁ-হাঁ' জাতীয় দু-চারটে সংক্ষিপ্ত অব্যয় ছাড়া বিশেষ কিছুই ব্যবহার করেননি। কদাচিৎ এক-আধবার ডাইনে বাঁয়ে শিরশ্চালনা করেছেন। কিন্তু এ-সবের মধ্যে অনুকূল বায়ু কতটুকু বইছে, সেটাই বুঝে উঠতে পারে নি দীপেন। আর পারেনি বলেই অস্থির হয়ে উঠছিল সে।

দীপেনের অস্থিরতা যখন শীর্ষবিন্দুতে, সেই সময় একদিন দত্তসাহেব ডেকেছিলেন, 'আচ্ছা দীপেন—'

সময়টা ছিল ভাদ্রের মাঝামাঝি। দিনটা ছিল ছুটির। আকাশে বর্ষাশেষের উদ্বৃত্ত কিছু মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছিল। আর সেই ভাসমান মেঘে দিগন্তের আলো প্রাণভরে শেষখেলা খেলে নিচ্ছিল।

আলিপুরের বাড়ীর বিস্তৃত লাইব্রেরি-চেম্বের সোফায় প্রায় মুখোমুখি বসেছিল দীপেন আর দত্তসাহেব। দত্তসাহেব বিলিতি ছবির ম্যাগাজিনের পাতা অলস আঙুলে উল্টে উল্টে যাচ্ছিলেন। দীপেন দেওয়ালে টাঙানো সোনালী ফ্রেমের দুষ্প্রাপ্য একটা অর্কিডের ছোপ দেখছিল।

দত্তসাহেবের ডাক কানে যেতেই মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিল দীপেন।

দত্তসাহেব সঙ্গে সঙ্গেই কিছুই বলেন নি। দীপেনকে ডেকেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর চোখ দু'টি ম্যাগাজিনের পাতায় আর আবদ্ধ ছিল না। অনেক—অনেক দূরে পশ্চিমের ভাসমান মেঘের ওপারে হারিয়ে গিয়েছিল যেন।

কয়েক বছর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে দীপেন লক্ষ্য করেছে কথা বলতে বলতে প্রায়ই চুপ করে যান দত্তসাহেব। দৃষ্টিটা কি এক দুজ্ঞেয় সুদূর জগতে হারিয়ে যায়। কাছাকাছি কোন কিছুর ওপর সে সময় তাঁর মনোযোগ থাকে না। সমস্ত সংযোগই যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে। তখন তাঁকে আশ্চর্য সুন্দর আর অপরিচিত মনে হয়। তা ছাড়া আরো একটা ব্যাপার চোখে পড়েছে দীপেনের। মেডিক্যাল চেক-আপের পর থেকে সে দত্তসাহেবের প্রত্যহের প্রতি-মুহূর্তের সহচর। কিন্তু কোন কোন ছুটির দিনে কি অফিসের পর তাকে ফোনে একা-একা কোন নিরুদ্দেশে যেন পাড়ি দিতেন দত্তসাহেব।

দত্তসাহেবের হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যাওয়া—আর মাঝে মাঝে একা পালিয়ে বেড়ানো—এরের পেছনে কোন্ জটিল রহস্য আছে কে বলবে। হাজার চেষ্টাতেও তা আবিষ্কার করতে পারে নি দীপেন।

দত্তসাহেবের সঙ্গে তার যা সম্পর্ক তাতে গৃহচর্চা, বড় জোর শরীরচর্চা পর্যন্ত এগুনো সম্ভব। কিন্তু হৃদয়চর্চা অভাবনীয়। দত্তসাহেবের মনোজগৎ তার কাছে নিষিদ্ধ দেশ।

নিষিদ্ধ হ'লেও একেবারে নীরব থাকেনি দীপেন।

মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু না, সেখানকার সব কিছুই দৃষ্টি-শ্রুতি-ঘ্রাণ এবং অনুমানের বাইরে।

যাই হোক অনেকক্ষণ পরও দত্তসাহেব যখন কিছুই বললেন না তখন খুব আস্তে আস্তে মৃদুস্বরে দীপেন ডাকল, 'স্যার—স্যার—'

একটু চমকেই দূরের মেঘ থেকে চোখ ফিরিয়ে এনেছিলেন দত্তসাহেব; 'কি বলছ?'

'আপনি আমাকে কি বলবেন বলে তখন ডেকেছিলেন—দীপেন স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।

'ও হ্যাঁ।' বলেই চুপ করে গিয়েছিলেন দত্তসাহেব। একটু পর কি ভেবে আবার শুরু করেছিলেন, 'দেখ দীপেন, কিছুদিন থেকেই তোমাকে একটা অনুরোধ করব ভাবছি। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?' উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল দীপেন।

'বড় সঙ্কোচ হচ্ছে।'

'আমার কাছে আপনার সঙ্কোচ!' দীপেনের গলায় অভিমানের স্পর্শ ছিল। অভিমানটার কতখানি চেষ্টাকৃত, আর কতখানি স্বচ্ছন্দ সেটা সে-ই জানে।

দত্তসাহেব ব্যস্তভাবে বলে উঠেছিলেন, 'আমি জানি, ইউ আর মাই ডিভোটেড টু বী। তোমার কাছে আমার সঙ্কোচের কোন অবকাশই নেই। তবে ব্যাপারটা কী জান?'

মুখে কিছু বলে নি দীপেন। শুধু জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল মাত্র।

দত্তসাহেব বলেছিলেন, 'ব্যাপারটা বড় বেশি ব্যক্তিগত।'

দীপেন নিশ্চুপ। কী বলবে, সে বুঝে উঠতে পারেনি।

দত্তসাহেব আবার বলে উঠেছিলেন, 'তুমি আমার নিজস্ব কাজ করে দিতে পার দীপেন?'

সামনে-পেছনে, কোনদিকে না তাকিয়ে মানুষ যেভাবে ঝাঁপ দেয়, দীপেনও প্রায় সেই ভাবে ঝাঁপ দিয়েছিল। কাজটা যে কী, সেটুকু জানার যেটুকু পর্যন্ত তার সয় নি। দত্তসাহেবের কথা শেষ হবার আগেই সে বলেছিল, 'নিশ্চয় পারি স্যার।'

'কাজটা কী, না জেনেই কথা দিলে। আমি যদি বলি আমার জন্যে তোমাকে চাঁদে যেতে হবে। পারবে?' মৃদু হেসেছিলেন দত্তসাহেব।

নিজের অতিরিক্ত ব্যগ্রতায় লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল দীপেন। নত চোখে আস্তে আস্তে বলেছিল, 'আমি জানি আপনি এমন কিছু করতে বলবেন—যা মানুষের সাধ্যের বাইরে নয়।'

'আমার ওপর তোমার খুব বিশ্বাস দেখছি। কিন্তু—'

'কী'?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন নি দত্তসাহেব। আবার দূরমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর যখন কথা বলেছিলেন, মনে হয়েছিল কাছ থেকে নয়, অনেক—অনেক দূর থেকে বাতাসের তরঙ্গ আশ্রয় করে তাঁর স্বরটা ভেসে আসছে। তিনি বলেছিলেন, 'যে কাজটা তোমাকে দিতে চাইছি সেটা মানুষের সাধ্যের ভেতরে কি-না ঠিক বুঝতে পারছি না।'

দীপেন বলেছিল, 'ব্যাপারটা একটু যদি স্পষ্ট করে বলেন—'

'সে তো বলতেই হবে।' একটু থেমে দত্তসাহেব বলেছিলেন, 'একটা মানুষ আমার জানাশোনা জগৎ থেকে হারিয়ে গেছে। সে কোথায় কি-ভাবে আছে, আমি কিছুই জানি না। যেখানেই থাক, সেই হারানো মানুষটিকে খুঁজে বার করতে হবে। পারবে?'

দীপেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। একটি ঠিকানাহীন নিরুদ্দেশ মানুষকে পৃথিবীর অরণ্য থেকে খুঁজে বার করতে হবে। এর চাইতে অসম্ভব ব্যাপার কিছু আছে কি! বিমূঢ়ের মত সে বলেছিল, 'নাম কী তার? বয়েস কত? দেখতে কেমন? ফোটোটোটো কিছু আছে কি?'

'সব বলব—কিন্তু তার আগে তোমাকে কটি শর্ত করতে হবে।'

'কী-কী?'

'প্রথমত, যাকে তোমার খুঁজতে হবে—তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক, কোনদিন জিজ্ঞেস করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত তাকে যদি কোনদিন খুঁজে পাও আমার কথা তাকে বলবে না। তৃতীয়ত তাকে পাওয়ামাত্র আমাকে টেলিগ্রাম বা ফোন করে জানাবে। কী, রাজী?' [ক্রমশ]

রম্যরচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) সময় থেকেই ব্যক্তিগত রম্যরচনার পুরোপুরি আত্মপ্রকাশ। রম্যরচনার 'Style' বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে দ্বিধাহীনভাবে রূপলাভ করেছে। রম্যরচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিম অষ্টাদশ শতকের ইংরাজ লেখকদের যুক্তিবাদী চিন্তাধারার অনুসরণ করেছেন। ডিকেন্স, থীস, স্মলেট, অ্যাডিসন, বার্কলে প্রভৃতির প্রভাব তাঁর উপর গভীরভাবে পড়েছিল। অন্যদিকে চার্লস ল্যাম্বের প্রাণোচ্ছল লঘুরচনার প্রভাবকেও লেখক অস্বীকার করতে পারেন নি। এই উভয় রীতির দ্বন্দ্বে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন 'লোকরহস্য' (১৮৭৪), 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫) এবং মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত' (১৮৮৪)। এ ছাড়া তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে সংকলিত কয়েকটি প্রবন্ধে উৎকৃষ্ট রম্যরচনার বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট চোখে পড়ে।

১৮৭৪ সালে 'লোকরহস্য' প্রকাশিত হয়। অবশ্য একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র এ জাতীয় লঘু-সাহিত্য-সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। 'বঙ্গদর্শন'এর পত্র-সূচনাতেই সে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছে। বৃটিশ জাতি এবং ভারতবাসীর অন্তঃসলিলা প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক নিরন্তর তাঁকে উত্তেজিত করছিল। অপমান লাঞ্ছনার জ্বালা আর বেদনাকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ করলেন ব্যঙ্গ আর উপহাসের দলিল পত্রে। 'লোকরহস্যে'র রচনাগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতকের ইংরাজী 'ভাবপ্রধান আদর্শবাদী কাব্যগুণসমৃদ্ধ গদ্য রচনা'কে অনুসরণ করেন নি। এই গ্রন্থ রচনার মাথু আর্নল্ডের উক্তিটি সম্ভবতঃ তাঁর মনে ছিল।[১] 'লোকরহস্য' গ্রন্থের 'বাবু' একটি উল্লেখযোগ্য রম্যরচনা। এই রচনায় ঈষৎ ব্যঙ্গ থাকলেও তাতে জ্বালা নেই। 'বাবু'-র বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন :

> 'যাহার ইষ্টদেবতা ইংরাজ, গুরু ব্রাহ্মণ ধর্মবেত্তা, বেদ দেশী সংবাদপত্র এবং তীর্থস্নানাদি থিয়েটার—তিনিই বাবু। যিনি মিশনারীর নিকট খৃষ্টান, কেশব-চন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম, পিতার নিকট হিন্দু এবং ভিক্ষুক-ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক তিনিই বাবু।...যিনি নিজ গৃহে চলে খান, বন্ধু গৃহে মদ্য খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান এবং অমিত সাহেবের গৃহে গলাধাক্কা খান, তিনিই বাবু।'.....

এই উক্তিগুলি যদিও রম্যরচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন, কিন্তু মনে রাখা দরকার যে রচনাগুলি নিছক লঘু হাস্যরসে বিভরণের উদ্দেশ্যে লেখা হয়নি। লঘু হাসির আড়ালে প্রকাশ পেয়েছে জাতির পরানুকরণপ্রিয়তা, চাটুকারিতা প্রভৃতির প্রতি লেখকের আন্তরিক ক্ষোভ। ইংরাজী সাহিত্যে অ্যাডিসন এবং থীস এ জাতীয় বহু প্রবন্ধ লিখেছেন।

'লোকরহস্যে'র আর এক জাতীয় লঘু রচনা আমাদের চোখে পড়ে। রচনাগুলি প্রচলিত সংস্কৃত প্রবাদ এবং সমাজের বহুবিধ অবিচারের প্রতি পরিহাস করে লেখা। 'গ্রাম্যকথা' শীর্ষক রচনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায় :

> "পড় বাবা, মাতৃবৎ পরদারেষু"।
>
> ছেলে। সে কাকে বলে বাবা ?
>
> বাপ। এই যত স্ত্রীলোক পরের স্ত্রী, সবাইকে আপনার মা মনে করতে হবে।
>
> ছেলে। তারা সবাই আমার মা ?
>
> বাপ। হাঁ বাবা, তা বৈকী।
>
> ছেলে। বাবা, তবে তোমার বড় জ্বালা। আমার মা মলে তারা তোমার কে হলো বাবা ?
>
> বাপ। ছি! ছি! ছি! অমন কথা কী বলতে আছে ? পড়।

১। 'The needful qualities for a fit prose are regularity, uniformity precision and balance.'—Mathew Arnold.

'লোক-রহস্য' রচনার ঠিক এক বছর পরে 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ। 'দপ্তর' বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক সৃষ্টি, বাংলা সাহিত্যের একক-ফসল। এই গ্রন্থ প্রকাশের কিছু দিন আগে থেকেই পারিবারিক গোলযোগ বঙ্কিমচন্দ্রের মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। আর ঠিক একই সময়ে রাষ্ট্রীয় জীবনের বিবিধ বিপর্যয় বঙ্কিমচন্দ্রের মনকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। এমনই এক মানসিক অস্থিরতার মুহূর্তে কমলাকান্তের দপ্তর ধারাবাহিক ভাবে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হতে থাকে। 'দপ্তরে'র রচনাগুলিকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়। এক জাতীয় রচনা 'Serious', অপর জাতীয় রচনা 'humourous'। কুলের বিবাহ, মনুষ্যফল, কমলাকান্তের জবানবন্দী, বসন্তের কোকিল প্রভৃতি শেষোক্ত পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য রম্যরচনা। বাংলা সাহিত্যে প্রথম নির্মল, শুভ্র হাস্যরসের সৃষ্টির দায়িত্ব বঙ্কিমচন্দ্রই নিয়েছিলেন।

কমলাকান্ত 'বড়বাজার' দেখবার আশায় পথে বেরিয়েছে, শেষে সাহিত্যের বাজারে পৌঁছে সে দেখল—বাল্মীকি প্রভৃতি কবিরা অমৃতফল বেচছেন, সে বৃত্তান্ত সংস্কৃত সাহিত্য :

"আরও একখানি দোকান দেখিলাম—অসংখ্য শিশুগণ এবং আর্যগণ তাহাতে ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে—ভিড়ের জন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না—জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ কিসের দোকান ?

'বাঙ্গালা সাহিত্যের।'

'বেচিতেছে কে ?'

'আমরাই বেচি। দুই একজন বড় মহাজনও আছেন। তদ্ভিন্ন বাজে দোকানদারের পরিচয় পদাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন।'

'কিনিতেছেন কে ?'

'আমরাই।'.....

বিক্রয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম, খবরের কাগজে জড়ানো অপক্ক কদলী।"...

'কমলাকান্তের দপ্তরে, সে মানুষটা কেপিয়া গিয়াছে' তাকেই আবার আমরা 'চেঁকি' রচনায় অন্য রূপে দেখি :

...'কোথাও জমিদাররূপ ঢেঁকি প্রজাদের হৃদপিণ্ড পড়ে পিষিয়া, নূতন নিরিখরূপ চাউল বাহির করিয়া মুখে দিয়া করিয়া অন্ন ভোজন করিতেছেন। কোথাও আইন-কারক ঢেঁকি, মিনিট রিপোর্টে পড়ে পিষিয়া ভাঙ্গিয়া বাহির করিতেছেন—দারিদ্র্য কারাবাস।...বাবু ঢেঁকি বোতল পিতৃধন পিষিয়া বাহির করিতেছেন—পিলে যকৃৎ...সর্বাপেক্ষা ভয়ানক-দেখিলাম মা সরস্বতীর মুণ্ড ছাপায় পড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন—ভুল বুক !"...

উৎকৃষ্ট রম্যরচনা হিসেবে "ঢেঁকি" সার্থক সৃষ্টি। কেননা সমাজের প্রতি বিদ্রূপ এক্ষেত্রে হাসির পাত্রে উচ্ছলে পড়েছে। পরবর্তীকালে রচিত 'মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত' এমনই একটি রম্যরচনা। মোট চতুর্দশ পরিচ্ছেদে 'মুচিরামের বিচিত্র কাহিনী রচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

'মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত' উনিশ শতকের যে কোন পাশ্চাত্য শিক্ষায় এবং সাহেবীয়ানায় উদ্বুদ্ধ বাঙালীর জীবনচরিত। এটি একটি ব্যঙ্গাত্মক রচনা। লেখনীর বৈশিষ্ট্যে উৎকৃষ্ট রম্যরচনা হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করেছে। প্রথম পরিচ্ছেদে মুচিরামের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন : 'শুভ শুনিয়া কেহ মনে না করেন যে তিনি মিষ্ট বিশেষ হইতে জন্মিয়াছিলেন।' এ জাতীয় বহু কৌতুককর বাক্য রচনাটির সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। জনৈক সমালোচকের মতে :

> 'তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) নিজ সার্কিসে এবং হয়ত নিজ মেশিনেই নিজের পার্শ্বে অনেক অনেক মুচিরাম, ঘটিরাম দেখিয়াছিলেন। তাহাদের ক্রিয়া-কলাপ ও তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সরকারে প্রতিপত্তি নিশ্চয়ই তাঁহার মনে হাস্যরসের উদ্রেক করিয়াছিল। মুচিরামে বঙ্কিম পাঠকগণকে সেই হাস্যরসের ভাগ দিয়াছেন। অবশ্য ইহাতে হাস্যের সঙ্গে যে বিদ্রূপের বিষজ্বালা মিশ্রিত আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।'২

মুচিরামের জন্ম থেকে সুরু করে রায় বাহাদুরের সম্মান লাভ পর্যন্ত রচনার কাল বিস্তৃত। মুচিরাম সাহেব মহলে

২, বঙ্কিমচন্দ্র—লেখক : অক্ষয়কুমার দাসগুপ্ত

সুপরিচিত। সে মনে করে 'পেন্সারীতে সুর লইলে কত আয়, তাহার ডেপুটিগিরিতে কাজ নাই'। কিন্তু সাহেবের হাত থেকে নিস্তার নেই। তাই তাকে ডেপুটিগিরিতে কাজ শুরু করতে হলো। মুচিরাম সাহেব মহলে বিশেষ আদরের পাত্র হয়ে উঠল। কেননা সে মূর্খ, অতি সামান্য ইংরাজী জানত, নির্বিরোধী, খোসামুদে, প্রভৃতি আরও বহুগুণের অধিকারী। রচনার শেষে দেখি 'মূর্খ' মুচিরাম উন্নতির সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করেছে। গেজেটে ছাপা হয়েছে—'রাজা মুচিরাম রায়বাহাদুর।'...

বঙ্কিমচন্দ্র যে রম্যরচয়িতা হিসেবে কতদূর সার্থক, তার পরিমাণ বঙ্গদর্শন প্রবন্ধে আলোচিত অন্য গ্রন্থের মানদণ্ডেই সম্ভব। তা ব্যতীত বিভিন্ন উপন্যাসে (বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ প্রভৃতি) গম্ভীর রস পরিবেশনের অবকাশে বঙ্কিমচন্দ্র লঘু রম্যচিন্তার প্রকাশ করেছেন

দৈব ঔষধের আশ্চর্য্য সফলতা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে দৈব ঔষধের উপকারিতার আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমেই কৈফিয়ত দেওয়া আবশ্যক। প্রথমেই বলিব, যে ঔষধের দ্বারা বারংবার বহু ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করেন, তাহার ভিতর আমাদের অজ্ঞাত কোন বৈজ্ঞানিক শক্তি নিশ্চয়ই আছে। দ্বিতীয়তঃ বলিব, দৈব ঔষধগুলির মধ্যে অধিকাংশই বিনামূল্যে পাওয়া যায় এবং উহা সেবন করিতে হয় না। একটি শিকড়, আংটী, তাবের বালা মাত্র পরিলে, শতকরা অন্ততঃ পঁচাত্তর ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করেন। সুতরাং, এই দারুণ অর্থ-সঙ্কটের দিনে ও অতিসত্বর আরোগ্য লাভের উপযুক্ত দৈব ঔষধ পাওয়া যায়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে কোনও ক্ষতি নাই, বরঞ্চ যথেষ্ট উপকারের সম্ভাবনা আছে।

আমি ১৯১৬ সালে দৈব ঔষধের আশ্চর্য্য সফলতা প্রত্যক্ষ করি। আমার প্রথমা কন্যা শ্রীমতী শিবানীর তখন মাত্র একবৎসর বয়স। তাহার লিভার এত খারাপ হইয়া গিয়াছিল যে, কলিকাতার একজন বিখ্যাত ডাক্তার তাহার জীবনের কোন আশা নাই বলিলেন। আমরা এই অবস্থায় জানিতে পারিলাম যে, শিবপুরের এক কালীবাড়ী হইতে একখানি তাবের বালা পাঁচ পয়সা দিয়া আনিলে যে-কোন লিভারের রোগী রোগমুক্ত হয়েন। ইহার ফলে আমরা শিবানীকে একখানি বালা পরাইয়া দিলাম এবং একমাসের মধ্যে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। ইহা দেখিয়া, আমি যাহাকে পাইয়াছি তাহাকেই এই দৈব ঔষধের কথা বলিয়াছি এবং এই ৩৮।৪০ বৎসরে, আমার মাধ্যমে অন্ততঃ পাঁচশতাধিক লিভারের রোগী আরোগ্য হইয়াছেন।

ইহাতে উৎসাহিত হইয়া আমি অন্যান্য দৈব ঔষধের অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছি। বহু ঔষধের সন্ধান পাইয়াছি। এক একটী অসুখের জন্য অনেকগুলি করিয়া ঔষধ পাইয়াছি। তবে, আমি সকল ঔষধ পরীক্ষা করাইতে পারি নাই।

যে ঔষধগুলিতে আমি উপকার হইতে দেখিয়াছি, তাহাদের নাম ও প্রাপ্তিস্থান নীচে লিখিয়া দিলাম। যদি কাহারও ইচ্ছা হয়, উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ২।৩টী ঔষধের জন্য সামান্য মূল্য দিতে হয়। সেগুলি পরীক্ষা করা না করা রোগীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। তবে বিনামূল্যের ও বিনামেহনের ঔষধগুলি কেহ কেহ পরীক্ষা করিলে আনন্দিত হইব।

১। হৃদ্‌রোগ—বিনামূল্যে—শ্রী বি-এম-সেন, ১৮৭ শরৎ বসু রোড, কলিকাতা—২৯ বহুপরীক্ষিত।

২। উচ্চ রক্তের চাপ—বিনামূল্যে—শ্রীসুকুমার সেন,

২৯এ গোপীমোহন দত্ত লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। বহুপরীক্ষিত।

৩। অর্শ—বিনামূল্যে—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখার্জি, ১২ ডি, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯।

৪। আমাশয়—বিনামূল্যে—শ্রীতারকনাথ সাহা, ১২৬ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬।

৫। গ্যাস্ট্রিক আলসার
৬। সায়েটিকা বাত
৭। সাধারণ বাত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, এডভোকেট ১৩৪ ৩এ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২।

৭এ। সাধারণ বাত—বিনামূল্যে—শ্রীরামহরিদাস হরলালকা কোম্পানী ওয়ার্কস, সুবার্বাণ স্কুল রোড, ভবানীপুর কলিকাতা—২৫।

৮। ফাইলেরিয়া—বিনামূল্যে (১) শ্রীহুগোচন্দ্র চ্যাটার্জী, ৪২ হরিশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা ২৫। (২) শ্রীভোলানাথ গুহা, ৪৬এ, স্কট লেন, কলিকাতা ৯।

৯। পিত্তশূল—বিনামূল্যে—শ্রীজ্ঞানকীনাথ খাসনবীশ কালীবাড়ী রোড; নোয়াপাড়া বারাসত, ২৪ পরগণা।

১০। সূতিকা—বিনামূল্যে—কাশীরবাজার রাজবাড়ীর আপিস। ৩০২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৯।

১১। বুকে পুরাতন সর্দি—বিনামূল্যে—শ্রীনলিনীমোহন আচার্য, ২৯।১ ডি, চেতলা রোড, কলিকাতা—২৭।

১২। হিষ্টিরিয়া—বিনামূল্যে—শ্রীননীগোপাল বসু, ২৩ গোপাল মুখার্জী রোড, টালা, কলিকাতা—২।

প্রত্যেকটি ঔষধ পরীক্ষিত।

(পূর্বোক্ত)

১৩। লিভারের ব্যথা—মূল্য ১।০। শ্রীহারাধন বাড়ৈ, ১৫ বাহালপাড়া দ্বিতীয় বাইলেন, পঞ্চানুপুর, শিবপুর, পোঃ সাঁতরাগাছি, জেলা হাওড়া।

১৪। হাঁপানী—মূল্য ১৸৵—ডাক্তার শ্রীজে, এন-ঘোষ, ১৫ প্রতাপাদিত্য রোড, কলিকাতা—২৬ বহুপরীক্ষিত।

১৫। ক্যানসার—মূল্য ৫ টাকা—শ্রীমন্মথনাথ গোস্বামী, ২৭ পরাশর রোড, কলিকাতা—২৯

১৬। ডায়াবিটিস—বিনামূল্যে—শ্রীকালীপদ সিংহ, এডভোকেট, ৩এ মহানির্বাণ রোড, কলিকাতা—২৯

১৭। হার্টিন—বিনামূল্যে শ্রীচরণবিহারী সাহা, ১২১। ১বি মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ৬

দ্রষ্টব্য—(১) হৃদরোগের ও (২) উচ্চ রক্তের চাপের ঔষধ আমি আনাইয়া থাকি। কেহ নিজ ঠিকানাযুক্ত খাম পাঠাইলে, আমি উহা পাঠাইব।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৬৪ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা—৬

পিপাসা

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

টিপ টিপ চাদরটায় কড় হয়ে গেছে
এখন অস্পষ্ট আলো শুধু মেঘছায়া
ঘুম চাখ ঘাসেদের মাথা নোওয়া নোওয়া
নির্জনতা,—চেয়ে দেখি দিহন সময়।
জীবনের পশ্চাৎপট
সামনে, বা এলোমেলো স্বপ্নের রঙ
সমুদ্র অরণ্য দীপ ছায়া—ছায়াময়
এবং প্রত্যাশা ঘিরে আরেক সময়,—
তোমার নির্জন হাত মম প্রতীক্ষায়!
ঘুম চোখ মুছে যায় হাত নেই, নেই,
সূর্যের পিপাসায় নেই মেঘ নেই,
নগ্ন আকাঙ্ক্ষা জুড়ে শূন্যের স্বর।
দিহন-জীবন সব কুয়াশার জাল
ঝকঝকে রোদ হাঁকে সামনে সকাল।

বাসন্তী মাঝরাতের স্বপ্ন

* • • শ্রীমতী লীলা বিদ্যান্ত

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য—বনে পরীরাণী ঘুমোচ্ছে

কুইন্স, স্নাগ, বটম, ফ্লুট, স্নাউট ও ষ্টারভেলিংএর প্রবেশ

ব। আমাদের শুরু মিলন তো?

কু। নিশ্চয়, নিশ্চয়। বারে এ জায়গাটা রিহার্শালের জন্যে চমৎকার। এই সবুজ জমিটুকু হ'ল আমাদের ষ্টেজ, এই ঝর্ণার বেড়ার পেছনে হ'ল আমাদের গ্রীণরুম। আমরা ঠিক যেমন ক'রে ডিউকের সাম্নে করব, ঠিক তেমনি ক'রেই এখন রিহার্শাল দেব।

ব। পিটার কুইন্স।

কু। কী বল্‌ছ, বিলি বটম?

ব। এই নাটকে এমন সব জিনিষ আছে, যা লোকের ভালো লাগ্‌বে না। প্রথমে তো পিরামুস আত্মহত্যার জন্য তার তলোয়ার বার করবে; এটা তো মেয়েদের ভালো লাগ্‌বে না। তার জন্যে তুমি কী করবে ভেবেছ?

স্নাউট। সত্যি তো, এটা তো বড় ভাবনার কথা।

ষ্টার। আমার তো মনে হয় শেষ-শেষ আমাদের ঐ সব মহাটরা বাদ দিতে হবে।

ব। মোটেই নয়, আমি একটা মতলব ঠাউরেছি, যাতে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। একটা ভূমিকা লেখা হ'ক। এই ভূমিকাতে বলে দেওয়া হবে যে আমাদের তলোয়ার দিয়ে কারো কোন ক্ষতি করব না, আর পিরামুস সত্যি সত্যি মরেনি। ওদের আরো ভালো করে নিশ্চিন্ত করবার জন্যে ব'লে দিয়ো যে আমি পিরামুস সত্যি সত্যি পিরামুস নই—আমি হচ্ছি তাঁতী বটম। ব্যাস্ তাহ'লেই আর কেউ ভয় পাবে না।

কু। বেশ, আমরা এ রকম একটা ভূমিকা লিখ্‌ব; আর সেটা একটি আট লাইন ও ছ' লাইনের কবিতায় লেখা হবে।

ব। না ওতে আরও দুটো লাইন বাড়িয়ে দাও। আট আট লাইন করো।

স্নাউট। মেয়েরা সিংহ দেখে ভয় পাবে না?

ষ্টার। মাইরি বল্‌ছি—আমারও সেই ভয়।

ব। মশাইরা, আপনারা একটু বিবেচনা ক'রে দেখ্‌বেন, মেয়েদের মাঝখানে, কী সর্বনাশ, একটা সিংহ নিয়ে আসা, বড় ভয়ানক কথা—কারণ জ্যান্ত সিংহের চেয়ে বদমাস জন্তুর জন্ত আর নেই—এটা আমাদের ভাবা উচিত।

স্নাউট। তাই আর একটা ভূমিকা লিখে ব'লে দিতে হবে যে ওটা সত্যিকারের সিংহ নয়।

ব। না, তোমাদের তার নাম ব'লে দিতে হবে আর সিংহের ঘাড়ের ভেতর দিয়ে তার আধখানা মুখ যেন দেখতে পাওয়া যায়—আর সে মুখোসের ভেতর থেকে নিজে এই কথা বা এই ধরণের কিছু ব'ল্‌বে—"মহিলাগণ অথবা সুন্দরী মহিলাগণ,—আমি চাই অথবা আমি আপনাদের অনুরোধ করছি অথবা আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি যে—আপনারা ভয় পাবেন না, আপনারা ভয়ে কম্পিত হবেন না। আমি আপনাদের দাস। যদি আপনারা মনে ক'রে থাকেন যে আমি সত্যিই একটা সিংহ এখানে এসেছি, তা হ'লে সেটা আমার পক্ষে বড়ো দুখের হ'ত না। না, আমি সে রকম কিছু নই, অন্য সবার মতন আমিও একজন মানুষ।" আর এইখানে সে নিজের নাম ব'লে দিক এবং স্পষ্ট কথায় ব'লে দিক্ যে আমি হচ্ছি ছুতোর স্নাগ।

কু। আচ্ছা তাই হবে, কিন্তু দুটো মুস্কিল আছে। অর্থাৎ একটা ঘরের ভেতরে চাঁদের আলো কী ক'রে নিয়ে

আসবে? কারণ তোমরা জান যে পিরামুস আর থিসবী চাঁদের আলোয় মিলত।

স্নাগ। আমরা যে দিন প্লে করব, সে রাতে চাঁদ উঠবে কি?

ব। একটা ক্যালেণ্ডার, একটা ক্যালেণ্ডার চাই। পাঁজিতে দেখো তো চাঁদ উঠবে কিনা।

কু—হাঁ, সেদিন চাঁদ উঠবে।

ব—কেন তা হ'লে, তুমি রাজবাড়ীর সেই ঘরের একটা জানালা খুলে রেখো—আর সেই জানালা দিয়ে চাঁদ দেখা যাবে।

কু। হাঁ, নয়ত কেউ—একজন একটা কাঁটা ঝোপ আর লণ্ঠন নিয়ে ষ্টেজে আসবে—আর বলবে যে সে চাঁদের আলো। এ ছাড়া আর একটা কথা হচ্ছে এই যে ষ্টেজের ওপরে একটা দেয়াল আনতে হবে, কারণ এই গল্পটিতে আছে যে পিরামুস আর থিসবী দেয়ালের একটা ফাটল দিয়ে কথা বলত।

স্নাগ। দেয়াল আবার কী ক'রে আনবে, তুমি কী বল বটম?

ব। কোন একজন লোককে দেয়াল সাজতে হবে, তার গায়ে একটু প্লাষ্টার একটু চুন বালি বা এই রকম আর কিছু থাকবে—যাতে লোকে বুঝবে যে সে দেয়াল আর সে নিজের আঙুল এমনি করে থাকবে, আর সেই ফাঁকের মধ্য দিয়ে পিরামুস থিসবীর সঙ্গে কানে কানে কথা বলবে।

কু। তা হ'লে তো সব ঠিক হয়েই গেল। এসো সব মায়ের বাছারা ব'সো তো। নিজের নিজের পার্ট কর। আরম্ভ কর পিরামুস। তোমার বলা হ'য়ে গেলে ঐ ঝোপের আড়ালে যাবে, এমনি ক'রে সবাই নিজের নিজের পালা হিসাবে করবে।

[পেছন থেকে পাকের প্রবেশ]

পা। আরে এ-সব কোন গেঁয়ো ভূত এখানে এসে—পরী রাণী যেখানে শুয়ে আছে তার এত কাছে বারফাট্টাই মারছে। ও বাবা এযে ড্রামা হচ্ছে। আমি একজন দর্শক হব। সুবিধা পেলে একজন এ্যাক্টরও হ'তে পারি।

কু। বল পিরামুস, থিসবী, সামনে এসে দাঁড়াও।

ব। থিসবী, ফুলের কী সুন্দর বিশ্রী গন্ধ।

কু। বিশ্রী নয়, মিষ্টি, মিষ্টি।

ব। মিষ্টি গন্ধ, তোমার নিঃশ্বাসও তেমনি সুরভি।

থিসবী। আমার, কিন্তু ও কীসের শব্দ? তুমি একটুখানি এখানে দাঁড়াও, আমি এখুনি তোমার কাছে ফিরে আসব। (প্রস্থান)

পা। এমন অদ্ভুত পিরামুস আর কখনো পাই নি।

ফ্লুট। এবারে আমি বলব?

কু। হাঁ, নিশ্চয় তুমি বলবে, তোমায় বুঝতে হবে যে ও একটা শব্দ শুনে তাই দেখতে গেছে এবং এখনি আবার আসবে।

ফ্লুট। অপূর্ব্ব কলমলে পিরামুস আমার, তোমার রং সিলি ফুলের মতো সাদা, তোমার বর্ণ উদ্ধত কাঁটার বোঁটার ওপরকার গোলাপের মতো লাল, তুমি অপূর্ব্ব যৌবনোজ্জ্বল, আর সব চেয়ে সুন্দর ইহুদী দুলাল। সব চেয়ে প্রবৃদ্ধক, যে ঘোড়া কখনো ক্লান্ত হয় না, তুমি তারই মতো বিশ্বাসী। পিরামুস আমি নিনির সমাধির কাছে তোমার সাথে মিলব।

কু। বলো নিনার সমাধি ভাই। আরে এটা এখনি বললে কেন? ও তো তুমি পিরামুসের কথার জবাবে বলবে। তুমি যে পুরো পার্টটা এক নিঃশ্বাসে ব'লে গেলে। এসো পিরামুস, তোমার কিউ হ'য়ে গেছে। 'তুমি তারই মতো বিশ্বাসী' এই হ'ল তোমার কিউ।

ফ্লুট। তুমি তারই মতো বিশ্বাসী।

(পাক ও গাধার মাথা নিয়ে বটমের প্রবেশ।)

ব। সুন্দরী থিসবী, আমি তোমারই।

কু। আরে সর্ব্বনাশ কী অদ্ভুত, অপদেবতা আমাদের পিছু নিয়েছে। মশাইরা পালান, পালান। ওরে কে আছিস্, বাঁচা, বাঁচা। (সব পালাবে)

পা। আমি তোমাদের পিছু নেব। আমি তোমাদের জলা জমির ভেতর দিয়ে, ঝোপের মধ্য দিয়ে, কাঁটা বনের ভেতর দিয়ে ঘুরপাক খাওয়াব। কখনো আমি একটা ঘোড়ার রূপ ধরব, কখনো হব একটা কুকুর, একটা শূয়োর, একটা কন্ধ-কাটা ভালুক, কখনো বা একটা আগুন। আমি কখনো ডাকব চিঁহি, চিঁহি, কখনো

যেউ যেউ, কখনো ঘোঁৎ ঘোঁৎ, কখনো গর্জাব, কখনো ফস্ ক'রে জ্বলে উঠ্‌ব।

ব। ওরা সব পালালো কেন? ওরা আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে এই বদমাইশি করেছে।

[স্নাউটের পুনঃ প্রবেশ]

স্না। ওরে বটম, তোর এ কী সর্বনাশ হল রে, তোর মাথায় ও কী দেখছি?

ব। কী দেখছিস্? দেখছিস্ তোর নিজেরই গাধার মুণ্ডটা। দেখতে পেয়েছিস্?

(স্নাউট পালাবে]

[কুইন্সের পুনঃ প্রবেশ]

কু। ভগবান তোকে বাঁচান বটম, ভগবান তোকে বাঁচান, তুই আর বটম নেই।

ব। বুঝেছি ওদের বদমাইশি, ওরা আমার গাধা বানাতে চায়। ওদের মতলব আমাকে ভয় দেখাবে। কিন্তু আমি এখান থেকে নড়ব্ না। ওরা যাই করুক না কেন—আমি এখানেই এদিকে ওদিকে বেড়াব আর গান গাইব, যাতে ওরা শুনে বুঝতে পারবে যে আমি মোটেই ভয় পাইনি।

কালো রং এর ময়না পাখী—
কমলার তামাটে মেলানো ঠোঁট
আর মিষ্টি সুরে শীষ দেওয়া বুলবুল
আর বক, তার খাটো খাটো পালক।

টিটা। কোন্ দেবদূত আমার আমার ফুলের বিছানা থেকে জাগালো?

ব। (গান) পায়রা চড়ুই আর চাতক
ঘুঘুর রং এর কুহু পাখী—
সহজ গলায় করে গান
সে গান শুনেছে কতই লোক—
করেনি কোনই প্রতিবাদ।

সত্যি বলতে কি, এমনি একটা বোকা পাখীর সংগে কে নিজের বুদ্ধি খরচ করতে যাবে? সে যতই কুহু ব'লে চেঁচাক না কেন, কে একটা পাখীকে মিথ্যেবাদী বলতে যাবে?

টি। আমার অনুরোধ, ওগো সুন্দর মানুষ, তুমি আবার গান গাও। তোমার গান শুনে আমার কান মুগ্ধ, তেমনি তোমার রূপে আমার চোখ বাঁধা পড়েছে আর তোমার গুণগ্রামের শক্তি, প্রথম দর্শনেই আমার মনকে আকুল ক'রে তুলেছে। তাই আমি বল্‌ছি—আমি দ্বিধা-কেটে বল্‌ছি—আমি তোমায় ভালোবাসি!

ব। আমার মতে সুন্দরী, তোমার এরকম মনোভাবের বিশেষ কোন কারণ নেই। তবে কিনা সত্যি কথা বলতে কি, আজ কালকার দিনে যুক্তি আর প্রণয় খুব কমই একে অন্যের সংগে থাকে। এটা বড়ই আপশোষের কথা যে কোন ভালো প্রতিবেশী এদের দুজনার মধ্যে বন্ধুতা করিয়ে দেয় না। না, সুযোগ পেলে আমি বেশ রসিয়ে কথা বলতে পারি।

টি। তুমি যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি সুন্দর।

ব। না, তা ঠিক নয়, তবে যদি এই বন থেকে বেরবার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি আমার থাকত, তা হ'লেই আপাততঃ আমার কাজ চলে যেত।

টি। এই বনের বাইরে যেতে চেয়ো না। ইচ্ছায় হ'ক আর অনিচ্ছায় হ'ক, তোমাকে এখানেই থাকতে হবে। আমি এক পরী—তাও খুব উঁচু ঘরের। দেখ্‌ছ না বসন্ত ঋতু এখনও আমার সেবার জন্য হাজির রয়েছে। আর আমি তোমায় ভালোবাসি। তাই এসো আমার সংগে। আমি তোমার সেবার জন্যে পরীদের ব'লে দেব, তারা তোমার জন্য সাগর থেকে মুক্তো এনে দেবে। আর যখন তুমি ফুলের বিছানা ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে, তখন তারা গান গাইবে। আর আমি তোমার মানুষী স্থূলতা এমন ক'রে ঘুচিয়ে দেব যে—তুমিও অশরীরী হ'য়ে হাওয়ার মধ্য দিয়ে ভেসে বেড়াবে।

মটর ফুল, মাকড়শার জাল, মোমাছি, সরষে বীচি!

(চারটি পরীর প্রবেশ।)

১ পরী। রেডি।

২ পরী। আমিও।

৩ পরী। আমিও।

৪ পরী। আমাদের কোথায় যেতে হবে?

টিটা। এই ভদ্রলোকের প্রতি খুব সদয় আর ভদ্র হ'য়ে চল্‌বে।

ওর চলার পথে এক পায়ে চলো—
ওর চোখের আগে করো খেলা।
ওকে এনে দাও কালোজাম

আর বুনো ফুল, শিশির ঢালা—
রাঙা ঠোঁটে আঙুর
আর নরম চুমুর
আর মাদলেরি
আনো মিষ্টি মধু—
মৌমাছি পাড়া উজাড় করি।
আনো মোর ওদের ডানা থেকে
হবে রাতের আলো
আগুনে জোনাকির চোখের থেকে
তাকে জেলে তোলো।
আমার প্রিয়ের শোওয়া আর জাগানির জন্যে।
আর ছবি আঁকা
মৌমাছির পাখা—
এনো তুলে—
আঁচাল করো চাঁদের আলো—
সেই পাখা দুলিয়ে
যবে ওর আঁখি
ঘুমে পড়বে ঢুলে—।

সইরা মাথা নীচু ক'রে এঁকে সম্মান জানাও।

১প। জয় হ'ক, ওগো মানুষ!

২প। জয় হ'ক।

৩প। জয় হ'ক।

৪প। জয় হ'ক।

ব। মহাশয়, আমি সর্বান্তঃকরণে আপনার দয়া ভিক্ষা করি; দয়া ক'রে বলুন তো আপনার নামটি কি?

১ক। মাকড়শার জাল।

ব। মশাই মাকড়শার জাল, আমি আপনার সঙ্গে আরও ভাল ক'রে পরিচয় কর্‌তে ইচ্ছে করি। যদি আমার হাত কেটে যায়, তাহ'লে আমি আপনার আত্মীয় হব। সজ্জন মহাশয়, আপনার নামটা?

মটর। মটর ফুল।

ব। আপনার কাছে আমার নিবেদন, আপনার মা শ্রীমতী কাঁচা মটর এবং আপনার বাপ শ্রীযুক্ত মটরখোসা মশাইএর কাছে আমার নমস্কার জানাবেন। মশাই মটর ফুল, আপনার সঙ্গেও আমি আরও একটু আলাপ পরিচয় করতে চাই। মশাই বলুন তো আপনার নামটি কি?

সরষে। সরষে বীচি।

ব। মশাই সরষে বীচি, আপনার অসীম ধৈর্য্যের কথা আমি ভাল করেই জানি। সেই যে কাপুরুষ বিরাটকায় ষাঁড়, সে আপনাদের বংশের অনেক ভদ্রলোককেই খেয়ে ফেলেছে, বিশ্বাস করুন আপনার আত্মীয়-স্বজনরা ইতিপূর্ব্বে আমার চোখ দিয়ে জল বার ক'রেছেন। মশাই সরষে বীচি, আমি আপনার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অপেক্ষায় রইলাম।

টি। এসো, এর সেবা কর, একে আমার নিকুঞ্জে নিয়ে চলো।

আমার মনে হচ্ছে আজ চাঁদের চোখের দৃষ্টি অন্যভাবে আচ্ছন্ন। আর যখন চাঁদের চোখে জল দেখা দেয়, তখন প্রত্যেকটি ছোট ফুল কাঁদ্‌তে থাকে। বুঝি ওরা ওদের ওপরে জোর ক'রে চাপানো কোন এক সাথীহীন বেদনায় আকুল হয়। আমার প্রিয়তমের কণ্ঠ-রুদ্ধ ক'রে দাও, ওকে নিঃশব্দে নিয়ে চলো। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—বনের অন্য ভাগ

[ওবারণের প্রবেশ]

ও। আমি ভাব্‌ছি, টিটানিয়ার ঘুম কি ভাঙ্গল। যদি সে জেগে থাকে, তো জেগে উঠে নিজের পাশে তাকে সে দেখতে পেল। যাকেই সে দেখবে, তাকে নিয়েই একেবারে প্রেমে পাগল হবে।

[পাকের প্রবেশ]

এই যে আমার দূত আস্‌ছে, কী খবর, পাগলা পরী, আমাদের এই পরীতে-পাওয়া বাগানে আজ কোন্ রাতের রাজত্ব চল্‌ছে?

পা। আমাদের রাণী একটা জানোয়ারের প্রেমে প'ড়েছেন। তিনি যখন তাঁরনিভৃত নিকুঞ্জের কাছে অঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন তখন একদল গেঁয়ো মজুর মিস্ত্রী—যারা এথেন্সের দোকানে বাজারে পেটের ভাতের জন্যে দিন-মজুরী ক'রে, তারা—মহান থিসিয়াসের বিয়ে উপলক্ষে একটা প্লে তৈরী কর্‌বার জন্যে তারই নিহার্শাল দিতে ঐ-খানে একত্র হয়েছিল। ঐ সব হতভাগা গাঁওয়ারগুলোর মধ্যে আধার বেটা বোকার সর্দ্দার সে পিরামুসের পার্ট করছিল। সেটা যখন তার দিনের মাঝখানে বেরিয়ে এসে একটা ঝোপের আড়ালে এসে ঢুকল, আমি এই সুযোগে ওটাকে

ব'রে ওর মাথায় একটা গাধার মুণ্ড পরিয়ে দিলাম। তখনি ও খিদমদীর কথার জবাব দেবে তাই আমার এ্যাক্টর বেরিয়ে এলেন। যখন ওরা দূর থেকেই ওকে দেখ্‌তে পেল তখন ওৎপেতে চুপি চুপি এগিয়ে আস্‌বার সময়ে শিকারীকে দেখ্‌তে পেলে খুনো হাঁস অথবা লাল্‌চে বাদামী মাথা রঙবেরঙা কাঠবিড়া। বন্ধুকের আওয়াজ শুনে যেমন ঘাটি থেকে আকাশে উঠে প'ড়ে ডাক্‌তে থাকে দল ভেঙ্গে আলাদা আলাদা হ'য়ে যায়, আর পাগলের মতো এলো-মেলো ভাবে আকাশে উড়্‌তে থাকে তেমনি ওকে দেখে ওর সাথীরা সব পালিয়ে গেল, আর আমার অনুসরণ ক'রে, এ ওর গায়ে গিয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল, কেউবা চেঁচায় খুন খুন—এথেন্সের লোকদের সাহায্যের জন্যে ডাকে। নিদারুণ ভয়ের চোটে ওদের বুদ্ধিশুদ্ধি যখন লোপ পেয়ে গেল, তখন প্রাণহীন সব জিনিষগুলোকেও ওরা ভয়ঙ্কর কিছু ব'লে ভয় পেতে লাগ্‌ল। কাঁটাঝোপে ওদের কাপড় চোপড় আট্‌কে যেতে লাগ্‌ল,—কোন ঝোপে আট্‌কে গেল কারো জামার হাতা, কোথাও আট্‌কে রইল কারো টুপি; সে সব ফেলেই ওরা প্রাণের ভয়ে ছুট্‌তে লাগ্‌ল। এমনি নিদারুণ ভয়ে আমি ওদের তাড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগ্‌লাম—আর নায়ক পিরামুসকে ওদিকে গাধা বানিয়ে রেখে এলাম। আর দৈববশে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে টিটানিয়া জেগে উঠে, সোজা একটি গাধার প্রেমে প'ড়ে গেলেন।

ও। এতো আমার মতলবের চেয়েও চমৎকার হ'য়েছে। কিন্তু আমি যে তোমায় বলেছিলাম—সেই এথেন্সের লোকটির চোখ ঐ রসায়নে রাঙিয়ে দিয়ে এসেছ তো?

পা। আমি ওকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলাম, সে কাজটাও সেরে এসেছি। আর সেই এথেন্সের মেয়েটিও ওর পাশেই ছিল, যাতে ক'রে যখনি ও জাগ্‌বে, সেই মেয়েটিকে নিশ্চয়ই দেখ্‌তে পাবে।

(ডিমিত্রিয়াস ও হারমিয়ার প্রবেশ।)

ও। এদিকে এস, এই সেই এথেন্সের লোক।

পা। এ মেয়েটি তো সেই বটে, কিন্তু এ ছেলেটি ত' সে নয়।

ডি। ওগো যে তোমায় এত ভালোবাসে, কেন তুমি তাকে বক্‌ছ? এ ভাষায় তুমি তোমার পরম শত্রুর সংগে কথা বলো।

হা। এখনো শুধু বক্‌ছি, এর পরে এর চেয়েও খারাপ কিছু কর্‌ব। কারণ আমার মনে হচ্ছে তুমি এমন কিছু ক'রেছ যার জন্যে আমি তোমায় অভিশাপ দিতে পারি; যদি তুই ঘুমের মধ্যে লাইসেণ্ডারকে খুন ক'রে থাকিস্, তবে তোর জুতো ত' রক্তে ডুবেছে, আরো একটু নেমে আয় আমাকেও খুন কর। সূর্য্য যে বিশ্বাসের বাঁধনে দিনের সাথে বাঁধা, আমার সাথে তার বিশ্বাসের বাঁধন তার চেয়েও বেশি সত্য ছিল। সে কি তার যুবক হারমিয়ার পাশ ছেড়ে পালিয়ে আস্‌তে পারে? তার চেয়ে আমি বিশ্বাস কর্‌ব যে এই গোটা পৃথিবীটা যেন মুটো হ'য়ে গেছে, আর সেই কাটলের ভেতর দিয়ে অন্য পারে বেরিয়ে এসে চাঁদ যেন তার ভাই সূর্য্যে-দুপুর-বেলাকে অপ্রসন্ন ক'রে দিয়ে তার সন্ধ্যাতারাকে নিয়ে এসেছে। নিশ্চয়ই তুই তাকে খুন ক'রেছিস্, এছাড়া আর কিছু হ'তেই পারে না। তোর চেহারা ঠিক একটা খুনের মতোই লাগ্‌ছে, তেমনি ভয়ানক,—তেমনি নিদারুণ।

ডি। যাকে খুন করা হ'য়েছে, তাকেই ঐরকম দেখ্‌তে হয়। তাই আমার এই চেহারা। তোমার নিদারুণ নিষ্ঠুরতা আমার বুকের এপার থেকে ওপার পর্য্যন্ত বিঁধে আছে—অথচ যে তুমি খুনী, তাকে দেখ্‌তে তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি স্বচ্ছ, যেমন ঐ জ্যোতির্ম্মণ্ডলের মাঝে সুন্দরী শুকতারা।

হা। আমার লাইসেণ্ডারের তুলনায় এসব কথার কী মূল্য? কোথায় আছে সে? ডিমিত্রিয়াস, লক্ষ্মীটি, তুমি তাকে আমার কাছে ফিরে এনে দাও না।

ডি। তার চেয়ে তার মড়াটা আমি আমার কুকুরকে দেব।

হা। দূর হ কুকুর। দূর হ কুত্তা, তুই আমার ধৈর্য্যের সীমা শেষ ক'রে দিচ্ছিস। তা হ'লে তুই তাকে মেরেছিস, এর পরে তোকে আর কে মানুষ বল্‌বে? ওরে একবার সত্যি কথা বল্, সত্যি কথা বল্ না হয় আমার খাতিরেই বল্ সে জেগে থাক্‌লে তার মুখের দিকে তাকাবার তোর সাহস হ'ত না, তাই ঘুমে-

মধ্যে তাকে মেরেছিস্। তুই কত বড় বীর! এতো একটা পোকা, একটা সাপও কর্‌তে পার্‌ত। সাপেই তাকে মেরেছে, তোর কামড়ে যত বিষ, এত বিষ সাপের জিভেও নেই।

ডি। তুমি বৃথাই আমার ওপরে এত চট্‌ছ। আমি লাইসেণ্ডারকে মারিনি। আর যতদূর আমি জানি সে মরেও নি।

হা। তা হ'লে বলো—সে ভাল তো আছে?

ডি। যদি আমি বল্‌তে পার্‌তাম তো তাতে আমার কী লাভ?

হা। তোর এই লাভ যে আর কখনো তোর মুখ দেখ্‌ব না। তোর হৃদয়হীন সংগ ছেড়ে আমি চল্‌লাম।

ডি। ও এত রেগে আছে যে এখন ওর পিছে যাওয়া বৃথা, আমি কিছুক্ষণ এখানেই থাকব। কতদিন হ'ল দুঃখের আঘাত আমি ঘুমোইনি, এবার আমার একটু একটু ঘুম পাচ্ছে। এমনি ক'রে দুঃখের হৃদয়ভার আরও বেশি ভারী হ'য়ে উঠেছে, কারণ নিদ্রাহীন রাত যে দুঃখের কাছে ঋণী, সেই ঋণ আজকের মত একটুখানি শোধ কর্‌বে—যদি আমি তার এই ঋণ-শোধের অপেক্ষায় এখানে কিছুক্ষণ থাকি।

ও। তুমি কী করেছ? তুমি তো মস্ত ভুল ক'রে ব'সে আছ। সেই প্রেমের রস তুমি একজন সত্যিকারের প্রেমিকের চোখে দিয়ে দিয়েছ। তোমার ভুলের জন্য এখন এই রকম ঘটতে বাধ্য যে, যে ভালোবাস্‌ত না, তার মন তো বদলালো না। কিন্তু একজন সত্যিকারের প্রেমিকের মন গেল বিগড়ে।

পা। তা হ'লে আমি কী কর্‌ব। এ ভাগ্যেরই খেলা যে যেখানে একজন বিশ্বাস রক্ষা করে সেখানে এক কোটি লোক বিশ্বাস ভংগ করে—আর একটার পর একটা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে থাকে।

ও। তুমি বনের মধ্য দিয়ে হাওয়ার চেয়ে বেগে ছুটে চ'লে যাও। আর হেলেনা ব'লে এথেন্সের মেয়েটিকে খুঁজে বার করো। সে মেয়েটি প্রেমের বেদনায় আকুল হ'য়ে আছে, হতাশ প্রেমের দীর্ঘশ্বাসে তার মুখখানি ম্লান। এরকম হতাশা তরুণ জীবনের পক্ষে বড়ই নিদারুণ। কোন রকম ক'রে মায়ায় ভুলিয়ে তুমি তাকে এখানে নিয়ে এসো। যেমনি সে আস্‌বে, অমনি আমি এই লোকটির চোখে ঘোর লাগিয়ে দেব।

পা। আমি যাই, আমি যাই, দেখ আমি কেমন ক'রে যাই, তাতারী তীরন্দাজের তীরের চেয়েও বেগে আমি ছুটে চ'লে যাব। [প্রস্থান।

ও। লাল রংয়ের ফুল
কামনার তীর লাগা ফুল
ওর চোখের তারায় মিশে যাও।
হেলেনাকে যখন ও দেখ্‌বে
তখন যেন সে আকাশের
শুক তারার মতোই পরমাশ্চর্য্যরূপে
ওর চোখে দেখা দেয়।
যখন তুমি জেগে উঠ্‌বে
তখন যদি সে কাছে থাকে তো
ক্ষমা চেয়ে নিয়ো তার কাছে।

[পাকের পুনঃ প্রবেশ]

পা। পরী দলের রাজা, এই যে হেলেনা এসেছে, আর সেই লোকটিও এসেছে যে আমার ভুলের জন্যই এর কাছে প্রণয় নিবেদন কর্‌ছে। এদের মজাটা একবার দেখুন। প্রভু, এই মানুষগুলো কী বোকা!

ও। এক পাশে দাঁড়াও। একটা শর ক'রে আমরা ডিমিত্রিয়াসকে জাগিয়ে দেব।

পা। তখন দুজনে একই সংগে একজনের পেছনে পড়বে, তাতেই মজাটা যা হ'বে। এই সব খাপছাড়া ব্যাপার দেখতেই আমার ভারি মজা লাগে।

[হেলেনা ও লাইসেণ্ডারের প্রবেশ]

লা। তুমি কেন ভাবছ যে আমি তোমায় বিদ্রূপ করবার জন্যেই তোমার কাছে প্রণয় নিবেদন কর্‌ছি। ঠাট্টা করতে গেলে কি মানুষের চোখে জল আসে? তাকিয়ে দেখ, যখন আমি শপথ কর্‌ছি তখন আমি কাঁদছি। যে শপথ চোখের জলে জন্ম নেয়, সেই সত্যোজাত শপথ পূর্ণ সত্যরূপেই দেখা দেয়। আমার প্রেমের সত্যতা প্রমাণের জন্যে বিশ্বাসের এই যে প্রতীক চিহ্ন, আমার চোখের জল, তা দেখেও তুমি কী ক'রে ভাবতে পার্‌ছ যে আমি ঠাট্টা করবার জন্যেই তোমার কাছে প্রণয় নিবেদন করছি?

হে। তোমার চালাকি বেড়েই চ'লেছে। মিথ্যা যখন সত্যের ছদ্মবেশে আসে, তখন সেই শয়তানের পুণ্যের জ্ঞান যে কী ভয়ানক! তোমার এই প্রণয় প্রতিশ্রুতিতে হারমিয়ার অধিকার। তুমি কি তাকে ত্যাগ করবে? তুমি একজনকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ—যখন আর এক-জনকেও সেই একই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ, তখন তোমার কথার আর কোন মূল্যই থাকছে না। তাকে তুমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ আর এখন আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ —এ দুটোকে দাঁড়িপাল্লায় দুদিকে রেখে যদি ওজন করো তো দেখবে যে এ দুয়েরই ওজন এক, এবং এ দুই-ই মিথ্যা-গল্পের মতোই অন্তঃসারশূন্য হাল্কা।

লা। আমি যখন ওকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তখন আমার কোন বিচারবুদ্ধি ছিল না।

হে। আমার মতে, এখন যে তাকে ত্যাগ করছ এতেও তোমার বিচারবুদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না।

লা। ডিমিট্রিয়াস তাকে ভালোবাসে, তোমাকে ভালো-বাসে না।

ডি। ও হেলেন, দেবী, অপ্সরী, মূর্তিমতী পূর্ণতা, স্বর্গের ধন, প্রিয়া-গো, কিসের সংগে যে তোমার চোখ দুটির তুলনা করি? ওর তুলনায় স্ফটিক তো ঘোলা। তোমার দুটি ঠোঁটে কী পরিপূর্ণ পাকা ফলের রং, যেন দুটি চোখ-ভোলানো চেরীফল পরস্পরকে চুম্বন ক'রে ফলে আছে। তুমি যখন তোমার ঐ হাতখানি তুলে ধরো, তখন উঁচু টাউরাস পাহাড়ের ওপরকার পুবে হাওয়ায় বেড়ে পরিষ্কার করে দেওয়া বরফের যে নিষ্কলংক শুভ্রতা, তাকে মনে হয় একটা কাকের মতো কালো। ওগো, নিষ্কলংক শুভ্রতার ঐ রাণীকে, স্বর্গসুখের ঐ শীলমোহরটিকে আমায় চুমো খেতে দাও।

হে। ওগো একী নিষ্ঠুরতা, ওরে একী নরক, আমি দেখ্‌ছি তোমরা সবাই আমায় পেছনে লেগেছ। আমায় নিয়ে মজা করছ। তোমরা যদি ভদ্র হ'তে, ভদ্রতা কাকে বলে তা যদি তোমরা জানতে, তা হ'লে এমন করে আমায় অপমান করতে না। তোমরা কি আমায় শুধু ঘৃণা করেই খুশী নও? সে তো আমি জানি যে তোমরা আমায় ঘৃণা কর। আবার সবাই মিলে আমাকে বিদ্রূপও করবে? তোমরা যদি পুরুষ মানুষ হ'তে, যেমন তোমাদের চেহারা দেখে মনে হয়, তাহ'লে একটি ভালো মেয়ের সংগে তোমরা এমন ব্যবহার করতে না। তোমরা শপথ করছ, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ, আমার রূপ গুণের প্রশংসায় অত্যুক্তি করছ, অথচ আমি নিশ্চিত জানি যে মনে মনে তোমরা আমাকে ঘৃণা কর। তোমরা দুজনেই হারমিয়ার প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী, আর এখন দুজনেই হেলেনাকে বিদ্রূপ করবার জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছ। এটা তোমাদের পক্ষে বড়ই একটা বাহাদুরী, একেবারে একটা পুরুষোচিত কীর্তি যে তোমরা তোমাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ দিয়ে একটি অসহায় মেয়ের চোখে জল বার করছ। যারা সত্যিকারের পুরুষ তারা কখনই একটি মেয়ের সংগে এমন দুর্ব্যবহার করত না —শুধু মজা দেখবার জন্যে এক অসহায় বেচারার ধৈর্যের ওপরে এমন ক'রে অত্যাচার করত না।

লা। ডিমিট্রিয়াস, তুমি ত' বড় নিষ্ঠুর, এমন নিষ্ঠুর হয়ো না। তুমি ত হারমিয়াকে ভালোবাস, আর তুমি জান সে কথাটা আমি জানি। আর এই মুহূর্তে আমি সর্বান্তঃকরণে হারমিয়ার প্রতি আমার সমস্ত দাবী তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। তুমিও হেলেনা, যাকে আমি ভালবাসি এবং মরণ পর্য্যন্ত ভালোবাসব, তার ওপরে তোমার দাবী আমাকে ছেড়ে দাও।

হে। ঠাট্টা করবার জন্যে এমন মিথ্যে কথা আর কেউ কোনদিন বলেনি।

ডি। লাইসেন্ডার, তোমার হারমিয়াকে তুমিই রাখো, আমার চাই না। যদি আমি কখন তাকে ভালোবাসতাম, তবে সে ভালোবাসা আর নেই। আমার প্রাণ তার কাছে যেন অতিথির মতো গিয়েছিল, এবারে সে হেলেনার কাছে যেন নিজের বাড়ীতে ফিরে এসেছে, আর সে চিরদিন সে-খানেই থাকবে।

লা। হেলেন, ও মিথ্যে কথা বলছে।

ডি। যে নিজের কথা তুমি বোঝ না, তার মূল্য কমা-বার চেষ্টা কোরো না, পাছে এজন্যে তোমায় বিপদে পড়তে হয়। ঐ দেখ তুমি যাকে ভালোবাস সে আসছে।

[হারমিয়ার প্রবেশ]

হা। অন্ধকার রাতে চোখ দেখতে পায় না, কিন্তু কান বেশি সজাগ হ'য়ে ওঠে। যতখানি চোখে না দেখার লোক-

মনে হয়, তার চেয়ে দ্বিগুণ জানে শোনায় ক্ষতিপূরণ হয়। লাইসেণ্ডার, আমার চোখ তোমায় খুঁজে পায়নি, কিন্তু আমার কানকে আমি বলবার দিই যে তোমার আওয়াজ অনুসরণ ক'রে আমায় তোমার কাছে এনে দিয়েছে। কিন্তু অমন নিষ্ঠুরের মত তুমি আমায় ছেড়ে চলে এসেছিলে কেন?

লা। প্রেমের আহ্বান উপেক্ষা করে আমি তোমার কাছে থাকবই বা কেন?

হা। কার ভালোবাসা তোমায় আমার কাছ থেকে সরিয়ে এনেছে?

লা। লাইসেণ্ডারের ভালোবাসা, যে তাকে হেলেনার আহ্বান উপেক্ষা করতে দেয়নি—হেলেনা যে আকাশের ঐ যে সমস্ত জ্যোতিষ্ক আর জ্যোতির্ময় চোখের চেয়েও রাতের বুকে বেশি শোভা পাচ্ছে। তুমি আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন? আমি যে তোমায় অমন করে ছেড়ে চলে এসেছি, এতেও বুঝতে পারনি আমি তোমায় কতখানি ঘৃণা করি?

হা। তুমি তোমার মনের কথা বলছ না, এমন হ'তেই পারে না।

হে। দেখ, ইনিও এদের দলের একজন, এখন বুঝতে পারছি—এরা তিনজনেই মিলে আমাকে খেপিয়ে মজা দেখবার জন্যে এই ফন্দী এঁটেছে। দরজা বন্ধ হারমিয়া, নিশ্চয়ই তোমার মনে, তুমি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছ। এই ভয়ঙ্কর বিদ্রূপ দিয়ে আমায় কাঁদে ফেলবার জন্যে এদের সঙ্গে ফন্দী এঁটেছ? আমরা দুজনে যে কত মনের কথা বলাবলি ক'রেছি, দুটি বোনের মতো থেকে অঙ্কের কত না প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, কত সময় আমরা এক সঙ্গে কাটিয়েছি আর দ্রুতগামী সময়কে এই ব'লে গাল দিয়েছি যে সে আমাদের এত তাড়াতাড়ি আলাদা ক'রে দিল, একসঙ্গে স্কুলে পড়া দিনগুলোর সব বন্ধুতা ছোটবেলাকার সরলতা, সব ভুলে গেলে? আমরা যেন দুটি দেবতার অনুকরণে, আমাদের ছুঁচ দিয়ে একই ফুল সৃষ্টি করেছি একই ডিজাইনের ওপরে; একই সুপনে ব'সে, আর সেলাই করতে করতে আমরা দুজনে একই সুরে একই গান গুণগুণ ক'রে গেয়েছি—যেন আমাদের দুটি হাত, দুটি দেহ, দুটি মুখ আর দুটি মন একে অন্যের সঙ্গে মিশে গেছে। এমনি ক'রে আমরা বড় হ'য়ে উঠেছি, যেন যুগল বেরীফল ওপর থেকে দেখতে মনে হয় আলাদা, কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা অন্যটার সঙ্গে জোড়া লাগা। একই বৃন্তে ফলে-ওঠা দুটি ফলের মতো আমাদেরও শুধু দুটি দেহ দেখতে আলাদা ছিল, মনে প্রাণে আমরা ছিলাম এক। যেমন বীর্যের প্রতিযোগিতায় দুজন প্রথম পুরস্কার পেলে—তাদের একই কোট আর একই বিজয় মুকুট দিয়ে পুরস্কার দেওয়া হয়, যা একজনেরই পাওনা ছিল, কিন্তু যাতে এখন দুজনেরই সমান অধিকার, তেমনি আমরাও ছিলাম যেন একই পুরস্কারের অধিকারী একটি যুগল। তুমি কি আমাদের সেই পুরানো প্রীতির বন্ধনকে দুই টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে পুরুষ মানুষের সঙ্গে যোগ দিয়ে তোমার এই দুঃখিনী বান্ধবীকে বিদ্রূপ করবে? এতো বন্ধুর যোগ্য কাজ নয়! এতো কোন মেয়েমানুষকে সাজে না। যদিও আমি একাই দুঃখভোগ করছি, শুধু এই ব্যাপারে আমি এবং আমাদের সমস্ত মেয়েজাত তোমাকে নিন্দা করতে পারে।

হা। তোমার আবেগভরা এই কথাগুলো শুনে আমি অবাক হ'য়ে যাচ্ছি। আমি ত' তোমাকে ঘৃণা করি না, কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি আমাকে ঘৃণা কর।

হে। তুমি লাইসেণ্ডারকে আমার পেছনে লাগিয়ে দাওনি, যার জন্যে সে ফাঁকি ফাঁকি আমার চোখ মুখের প্রশংসা করছে। আর তোমার আর এক প্রণয়ী ডিমিট্রিয়াস, যে আমাকে এই একটু আগেও কুকুরের মতো লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাকেও তুমি শিখিয়ে দাওনি আমায় দেবী, অপ্সরা, স্বর্গের ধন, অনন্তা, মাণিক, অমরার দূতী এই সব ব'লতে? যাকে সে ঘৃণা করে তাকে সে এসব কথা কেন বলছে? আর যে তোমার মনে প্রাণে ভালো-বাসে সেই লাইসেণ্ডারই বা কেন বলছে যে সে তোমায় ভালোবাসে না, আর এমন কি আমার প্রণয় নিবেদন করছে। যদি না তুমি ওকে আমার পেছনে লাগিয়ে দিতে, তোমায় এতে সায় না থাকত। না হয় আমি তোমার মতো সবার আদরিণী, সবার সোহাগিনী অমন সৌভাগ্যবতী নই। সবাই তোমাকে ভালোবাসে, না হয় আমার দুর্ভাগ্য যে আমি যাকে ভালোবাসি সে আমাকে ভালোবাসে না, কিন্তু তাতে তোমার আমার

জন্যে দয়া হওয়া উচিত, উল্টে তুমি আমার অপমান করছ ?

লা। তুমি কী বলছ, আমি বুঝতে পারছি না।

হে। হাঁ, হাঁ, চালিয়ে যাও। ফাঁকি ফাঁকি মুখখানা এমন করে যেন তোমার কতই দুঃখ হয়েছে। আর যেই আমি পেছন ফিরব—অমনি আমাকে খুব ভেঙ চিয়ো। একজন আরেক জনের সংগে চোখ ঠারাঠারি কোরো, এমনি মজার ঠাট্টা চালিয়ে যাও। এমন মজা কী করে চালিয়ে যেতে পারলে, একেবারে ইতিহাসে লেখা থাকবে। যদি তোমার মধ্যে কোন দয়া, কোন সৌজন্য, কোন ভদ্রতা থাকত, তা হলে তুমি আমাকে নিয়ে এমন করতে পারতে না। কিন্তু তুমি সুখে থাক, এটা কতকটা আমার নিজেরই দোষ। আমার মরণ বা আমার দূরে সরে যাওয়াতেই এ দুঃখের সমাপ্তি হবে। (প্রস্থানে উদ্যত)

লা। হেলেনা, হেলেনা গো, আমার কথা শোন, প্রিয়া আমার, আমার প্রাণ, আমার আত্মা, ওগো সুন্দরী হেলেনা !

হে। বাঃ চমৎকার !

হা। প্রিয়তমে, ওর সংগে অমন দুর্ব্যবহার কোরো না।

ডি। যদি ওর অনুরোধে কাজ না হয় তো আমি তোমাকে ভদ্র ব্যবহার করতে বাধ্য করতে পারি।

লা। তোমার শাসানি আর ওর অনুনয় দুই-ই বৃথা। তোমার শাসানিকেও আমি কেয়ার করি না, ওর কাতর প্রার্থনাকেও নয়। হেলেন, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমার প্রাণের দিব্যি আমি ভালোবাসি। যে বলে যে আমি তোমায় ভালোবাসিনা, তার কথা মিথ্যা প্রমাণ করবার জন্যে আমি ঐ মেয়েটার নামে দিব্যি কাটছি, ওটাকে আমি তোমার জন্যে ত্যাগ করব।

ডি। আমি বলছি আমি তোমাকে ওর চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসি।

লা। যদি তুমি তাই বল তবে চলে এস, দ্বন্দ্বযুদ্ধে এ-কথার প্রমাণ দাও।

ডি। এখনি চল।

হা। লাইসেণ্ডার এসব কথার মানে কি ?

লা। দূর হ, কালো পেত্নী।

ডি। আরে ছিঃ ছিঃ ! ও দেখাচ্ছে যেন এখনি জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে আসবে। তুমি ভাণ করছ যেন আমার সংগে আসবে, কিন্তু আসলে তুমি আসবে না, ভীতু কোথাকারের, আরে ছাঃ !

লা। ছেড়ে দে, ওরে বেতালী, নোংরা কেরো, ছেড়ে দে বলছি। নয়ত' আমি একটা সাপের মতোই তোকে গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেব।

হা। তুমি কেন এমন কড়া কড়া কথা বলছ। এ তোমার কী পরিবর্তন, প্রিয়তম গো !

লা। তোর প্রিয়তম ? দূর হ তাড়াটে ভাতারী, দূর হ, দূর হ, তেতো ওষুধ, বিষাদ যাওয়াই, দূর হ।

হা। তুমি ঠাট্টা করছ না ?

হে। নিশ্চয় ঠাট্টা করছে, আর তুমিও তাতে যোগ দিচ্ছ।

লা। ডিমিত্রিয়াস, তোমার কাছে আমি নিজের কথা রাখব।

ডি। এ বিষয়ে তোমার একটা বাঁধাবাঁধি চুক্তি পেলে ভালো হ'ত, কারণ আমি দেখছি একটা দুর্দিন বাঁধন তোমায় বেঁধে রেখেছে। তাই তোমার মুখের কথা বিশ্বাস করতে পারছি না।

লা। ওঃ হো, আমি কি ওকে আঘাত করব, ওকে মারব, ওকে মেরে ফেলব ? যদিও আমি ওকে ঘৃণা করি —তবু আমি ওকে ব্যথা তো দিতে পারি না।

হা। ওঃ, তুমি আমার ঘৃণা করার চেয়ে আরো বেশি কী ব্যথা দিতে পার ? তুমি আমায় ঘৃণা কর, কেন গো ? ওগো যাগো, এ কেমন কথা প্রিয়তম গো ? আমি কি হারমিয়া নই, তুমি কি লাইসেণ্ডার নও ? একটু আগেও আমি যতখানি সুন্দর ছিলাম এখনও তো তেমনি আছি। কাল রাত পর্যন্তও তুমি আমায় ভালোবেসেছ, আর সেই রাতেই তুমি আমায় ছেড়ে চলে এসেছ। তা হ'লে কেন তুমি আমায় ছেড়ে চলে এসেছিলে, ওঃ, দেবতা না করুন, আমি কি বুঝব যে সত্যি সত্যি তুমি আমায় ছেড়ে চ'লে এসেছ ?

লা। আমি দিব্যি কেটে বলছি সত্যিই তাই—তোমাকে আর কোনদিন ফিরে দেখবার কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না। তাই তুমি আমার আশা ছাড়ো, আর প্রশ্ন কোরো না, আর সন্দেহ কোরো না, নিশ্চিন্ত করে জানো যে এর

চেয়ে সত্য আর কিছু হ'তে পারে না। আমি তোমায় ঘৃণা করি আর হেলেনাকে ভালোবাসি, এ মোটেই ঠাট্টা নয়।

হা। ওগো মাগো, ওরে যাদুকরী—ওরে পোকার খাওয়া ফুল, ওরে প্রেম-চোরা, এ্যাঃ, তুই রাতের বেলায় এসে আমার প্রিয়তমের বুক থেকে তার প্রাণ চুরি ক'রে নিয়েছিস্?

হে। বাঃ, বাঃ, সত্যি চমৎকার! তোর কি লজ্জা নেই? মেয়েদের তো একটু লজ্জা থাকবে? কী বেহায়া তুই, এ্যা, তুই বুঝি আমার ভদ্রতার সীমা নষ্ট ক'রে দিয়ে আমার মুখ থেকে গাল বের না ক'রে ছাড়্‌বি না? ধিক্ তোকে, তোর কি নিজের ব্যক্তিত্ব ব'লে কিছু নেই, পরের হাতের পুতুল তুই, পাজি মেয়ে।

হা। পুতুল? তার মানে? ওঃ, এই ব্যাপার? এখন বুঝেছি, ও আমাদের দুজনার চেহারার তুলনা করেছে। ও ব'লেছে ও কেমন লম্বা, ওর সেই ফিগার, ওর লম্বা সুন্দর চেহারার ব্যক্তিত্ব, ও হো, ও যে মাথায় কেমন সুন্দর উঁচু, এই দিয়ে ওর মন ভুলিয়েছে। ওরে, আমি এত নীচু এত বেঁটে যে তার জন্যে ওর কাছে তোমার আদর এত বেশি উঁচু হয়ে উঠেছে। আমি কত নীচু? ওরে রংকরা কাঠের খুঁটি, বল্ বল্ আমি কত নীচু? তবু আমি এত নীচু নই যে আমার নখ তোর চোখ পর্য্যন্ত পৌঁছবে না।

হে। মশাইরা, দোহাই আপনাদের আমায় ওর হাত থেকে বাঁচান, আমি কোন দিন ঝগড়া করতে পারি না, ঝগড়া করবার ক্ষমতা আমার একেবারেই নেই, আমি নেহাতই একটা ভীতু মেয়ে, আমায় ওর হাত থেকে বাঁচান। আপনারা হয়ত' ভাবছেন যে ও আমার চেয়ে একটু বেঁটে ব'লে আমি ওর সঙ্গে পারব।

হা। বেঁটে, ঐ শোনো, আবার সেই কথা।

হে। লক্ষ্মীটি, হারমিয়া, আমার ওপরে অত রাগ কোরো না। আমি চিরদিন তোমায় ভালবেসেছি, হারমিয়া। তোমার কথা আমি কোন দিন কাউকে ব'লে দিইনি, তোমার প্রতি কখনো কোন অন্যায় করিনি, শুধু এই একটিবার মাত্র ডিমিত্রিয়াসের প্রতি আমার ভালোবাসার খাতিরে আমি তাকে ব'লে দিয়েছি যে তুমি আজ এই বনে পালিয়ে এসেছ; ও তোমার পিছে পিছে এসেছে, আর ওকে ভালোবাসি ব'লে আমি ওর পিছে পিছে এসেছি। কিন্তু ও আমায় রাগ ক'রে এখান থেকে চ'লে যেতে বলেছে, আর ভয় দেখিয়েছে যে না গেলে ও আমাকে মারবে, আমায় তাড়িয়ে দেবে, এমনকি এতদূর পর্য্যন্ত বলেছে যে আমায় খুন ক'রে ফেলবে। তাই এখন যদি তুমি আমায় ভালোয় ভালোয় যেতে দাও তাহ'লে আমি আমার বোকামো নিয়ে এখেন্সে ফিরে যাব, আর আমি তোমাদের পিছে পিছে আসব না। আমায় যেতে দাও। দেখছ না—আমি কেমনি বোকা আর কেমনি প্রেমে পাগল।

হা। তা যাও না, কে তোমায় ধরে রেখেছে?

হে। একটি নির্ব্বোধ প্রাণ, যাকে আমি এইখানেই ফেলে রেখে গেলাম।

হা। এ্যা, লাইসেণ্ডারের কাছে?

হে। ডিমিত্রিয়াসের কাছে।

লা। ভয় পেয়ো না, আমি ওকে তোমার কোন ক্ষতি করতে দেব না, হেলেনা।

ডি। না মশাই ও কিচ্ছু করতে পারবে না, যদি আপনিও ওর পক্ষ নেন, তবুও নয়।

হে। ওঃ, ও যখন রেগে যায় তখন ও বেজায় হিংস্র আর শয়তান হ'য়ে ওঠে। ও যখন স্কুলে পড়ত তখন ভয়ানক ঝগড়াটি ছিল। যদিও ওকে দেখতে ছোট, কিন্তু ওর তেজ কম নয়।

হা। আবার বলে ছোট, খালি বেঁটে আর ছোট—এ ছাড়া আর কোন কথা নেই। তোমরা ওকে আমায় এমন ক'রে অপমান করতে দিচ্ছ কেন? আমায় ওর কাছে আসতে দাও।

লা। দূর হ, বামন কোথাকারের, পায়ে জড়িয়ে ধরা ঘাসে তৈরী ক্ষুদে, মাথার গুটি, ওকের বীচি!

ডি। তুমি যে ওর পক্ষ নিয়ে বড় বেশি বাড়াবাড়ি করছ, কিন্তু ও তো তোমার এই সাহায্য চায় না। ওর কথায় থাকবে না, হেলেনার নাম মুখে আনবে না, ওর পক্ষ নেবে না, তুমি ওর প্রতি এতটুকু ভালোবাসা দেখিয়েছ কি, তার জন্য তোমায় দাম দিতে হবে।

লা। এইবার ও আমায় ছেড়ে দিয়েছে। এবার

আয়না আমার পিছে, প্রমাণ হ'য়ে যাক্ হেলেনার ওপরে কার অধিকার বেশি, তোর কি আমার ?

ডি। তোর পিছে আস্‌ব, না, না—আমি তোর সংগে সংগেই আস্‌ছি, একেবারে তোর পাশে পাশে।

[লা ও ডিমি প্রস্থান]

হা। ওগো নায়িকা, এ সমস্ত গোলমাল তোমাকেই নিয়ে। না, তুমি যেতে পাবে না।

হে। আমি তোমায় বিশ্বাস করি না। আমি তোমার মতো ঝগড়াটি মেয়ের সংগে আর এক মুহূর্ত থাক্‌ব না। তোমার হাত আমার হাতের চেয়ে লড়াইতে ঢের বেশি ওস্তাদ। কিন্তু দৌড়বার বেলায় আমার পা দু'খানা তোমার চেয়ে ঢের বেশি লম্বা। [প্রস্থান।

হা। আমি অবাক্ হয়ে গেছি, কি যে বল্‌ব ভেবে পাচ্ছি না।

[হেলেনার পিছে পিছে প্রস্থান।

ও। এ তোমারই ভুলের ফল। হয় এ তোমার ভুল, নয় তো তুমি জেনে শুনে এই বজ্জাতি করেছ।

পা। বিশ্বাস করুন, ছায়া দেশের রাজা, এ আমার ভুল। আপনি আমায় বলে দেননি যে এথেন্সের পোষাক দেখে আমি লোকটাকে চিন্‌ব ? তাই এটা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে, এ ব্যাপারে আমার কোন দোষ নেই। আমি তো একটি এথেন্সের লোকের চোখই সেই রসে বাড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু এখন ব্যাপারটা যা হ'য়েছে তাতে আমার বেজায় আনন্দ হচ্ছে—ওদের এই ঝগড়াটা আমার বড়ই ভালো লেগেছে।

ও। দেখতে পাচ্ছ এই প্রণয়ীরা লড়াই করবার জন্যে একটা জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাড়াতাড়ি যাও রবিন, রাতের অন্ধকারকে ডাক। তারা-ভরা আকাশকে তুমি এখনি ঘনঘোর আনত আর মৃত্যু-নদীর মতো কালো কুয়াশায় ঢেকে দাও। আর এই দুই ঝগড়েরাজী প্রতিদ্বন্দ্বীকে এমন ক'রে পথ ভুলিয়ে নিয়ে যাও যে, যেন একজন আরেকজনের সামনে না আসে। কখনো তুমি লাইসেণ্ডারের গলায় কথা বলোগে—আর যা'তা' ব'লে ডিমিত্রিয়াসকে খুব চটিয়ে দাও। আর কখনো বা তুমি ডিমিত্রিয়াস হ'য়ে টিটকিরী দিতে থেকো, আর এমনি ক'রে ওদের এককে অন্যের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যেও, যতক্ষণ পর্যন্ত না মরণের অনুকারী ঘুম তার তারী-পা আর বাদুড়ে-পাখা নিয়ে নেমে আসে। তারপরে লাইসেণ্ডারের চোখে এই রস নিঙড়ে দিয়ো। রসের এই গুণ যে এর প্রভাবে চোখের সমস্ত ভুল দূর হয়ে যায়। এমনি করে তুমি ওকে ওর চোখের সহজ দৃষ্টি ফিরে দিয়ো। এর পরে যখন ওরা জেগে উঠ্‌বে, তখন এই সমস্ত খাম-খেয়ালী ব্যাপারটা ওদের কাছে একটা স্বপ্ন, একটা মিথ্যে মায়া ব'লে মনে হবে। তখন এই প্রণয়ীরা এথেন্সে ফিরে যাবে, আর ওদের এই প্রণয়-বন্ধন মরণের দিন পর্যন্ত অটুট থাকবে। ততক্ষণ তোমাকে এই কাজে লাগিয়ে দিয়ে আমি যাব আমার রাণীর কাছে, আর তার কাছ থেকে সেই ইণ্ডিয়ান ছেলেটিকে চেয়ে নেব, আর তার পরে আমি তার চোখ থেকে ঐ জানোয়ারটার প্রতি তার প্রেমের ঘোর কাটিয়ে দেব। তারপরে সব কিছুর শান্তি হয়ে যাবে।

পা। প্রভু পরীরাজ, এ কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেল্‌তে হবে, কারণ রাতের দ্রুতগতি অতিকায় পাখাগুলো মেঘের মধ্য দিয়ে বেগে উড়ে চলেছে, আর ঐ যে উষার আগমনীর ঝলক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—যা দেখে প্রেতাত্মা-গুলো, যারা এদিক ওদিক বেড়াচ্ছিল, তারা সব কবর-খানায় তাদের নিবাসে ফিরে যাচ্ছে। ওরা সব পাপী আত্মা। ওদের সব চৌরাস্তার মোড়ে আর বন্যায় অপমৃত্যু ঘটেছে। ওরা এর মধ্যেই ওদের পোকার বিছানায় ফিরে গেছে, কারণ ওদের ভয় পাছে দিনের আলোয় ওদের লজ্জা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। ওরা ইচ্ছে করেই দিনের আলো থেকে দূরে সরে থাকে। কালো ভ্রূকুটীওয়ালা রাতের সংগেই ওরা বাধ্য হয়ে মিতালি করে।

ও। কিন্তু আমরা তো অন্য জাতের অশরীরী আত্মা। আমি তো ভোরের আলোর সাথে মিতালি করে কতদিন খেলে বেড়াই। আমি তো বনডবদের মতোই বনে বনে বেড়াতে পারি—যতক্ষণ না পূবের রক্তভোরণ সমুদ্রের ওপরে খুলে গিয়ে তাকে আলোর আশীর্বাদে অভিষিক্ত করে দেয়, যতক্ষণ না সবুজ সমুদ্রের সবুজ লহরী হলদে সোনা হয়ে ওঠে। কিন্তু তবু তাড়াতাড়ি করো, দেরী কোরো না। দিন হবার আগেই যেন আমাদের এ কাজটা সমাধা হয়ে যায়।

[ওরা প্রস্থান।

পা। এদিকে সেদিকে, এদিকে সেদিকে।
আমি ওদের ভুলিয়ে নিয়ে যাব,
মাঠে নদীতে সবাই ভয় করে আমাকে
আমি দেহহীন পরী, নিয়ে যাব
এদিকে সেদিকে।

ঐ যে একজন আসছে।

না। কোথায় আছিস্ বেয়াদব ডিমিট্রিয়াস, এই বেলা জবাব দে।

পা। এই যে আমি, শয়তান, আমার তলোয়ার বের ক'রে তৈরী হয়েই আছি। তুই কোথায় আছিস্?

না। এই যে আমি তোর কাছে এসেই বসে।

পা। তাহ'লে আয় আমার পিছে পিছে, এর চেয়ে একটু সমান কোন জমিতে চল্।

[গলা অনুসরণ করে না: প্রস্থান।

[ডিমিট্রিয়াসের প্রবেশ]

ডি। লাইসেণ্ডার, কোথায় আছিস্ আর একবার সাড়া দে, ভীরু, কাপুরুষ, পালিয়েছিস্ বুঝি? কোথায় কোন্ ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছিস্ বল্?

পা। ওরে কাপুরুষ, তুই কি আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে মিথ্যে বড়াই করে যাচ্ছিস্, আর তোপরাড়-ওলে কে বোঝাচ্ছিস্ যে তুই লড়াইয়ের জন্যে অপেক্ষা করে আছিস্। অথচ আস্ছিস্ না! আর তো ভীতু কোথা-কারের, তুই তো একটা বাচ্চার মতোই ভীতু; আমি তোকে লাঠি পেটা করব। তোর সংগে যে তলোয়ার নিয়ে লড়তে আসে তাকে কি।

ডি। ও, তুই এখানে?

পা। আমার গলা অনুসরণ করে আয়, এই অসমান জমিতে আমাদের পৌরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা চলবে না।

[প্রস্থান।

[না: পুন: প্রবেশ]

না। ও আমার আগে আগে যাচ্ছে, আমায় লড়াই করবার জন্যে ডাকছে, কিন্তু যেখান থেকে ও ডাকছে আমি যখন সেখানে আসি তখন দেখি ও সেখানে নেই। পাজিটা আমার চেয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়োয়। আমি তো ওর পিছে পিছে দৌড়ে এসেছি, কিন্তু ও তার চেয়েও জোরে দৌড়ে পালিয়েছে। এমনি করে আমি এই অন্ধকার উঁচু নীচু জায়গায় এসে পড়েছি। এখানেই একটু বিশ্রাম করি। এসো ওগো সুন্দর দিন, কারণ তুমি যেমনি তোমার আবছা আলোর প্রকাশ আমায় দেখাবে, অমনি আমি ডিমি-ট্রিয়াসকে খুঁজে বার করব আর এই শত্রুতার শোধ তুলব।

(ঘুমোবে)

[পাক ও ডিমিট্রিয়াসের পুন: প্রবেশ]

পা। হো, হো, হো, হো, ওরে ভীতু, এগোচ্ছিস্ না কেন?

ডি। দাঁড়া ঐখানে, যদি তোর এত সাহস থাকে, কারণ আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি যে তুই আমার আগে আগে দৌড়ে পালাচ্ছিস্, কেবলি এখান থেকে ওখানে যাচ্ছিস্। এক জায়গায় দাঁড়াতে, কি আমার মুখের দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছিস্ না। এখন কোথায় আছিস্ তুই?

পা। আয়না এদিকে, এই যে আমি এখানে।

ডি। না:, তুই আমার সংগে ইয়ার্কি দিচ্ছিস্, দিনের বেলা যদি তোকে দেখতে পাই তাহ'লে তোকে এর ফল ভুগতে হবে। এখন যা, পালা। ক্লান্তি আমায় এমন পেয়ে বসেছে যে আমি এই ঠাণ্ডা মাটির ওপরেই শুয়ে পড়ব। যেমনি দিন হ'বে অমনি আমার সংগে তোর অন্তত সাক্ষাতের অপেক্ষায় থাকিস্।

[শুয়ে পড়বে এবং ঘুমোবে।

[হেলেনার প্রবেশ]

হে। ওগো ক্লান্ত রাত, ওগো দীর্ঘ নিরানন্দ রাত, তোমার সময়টা একটু সংক্ষেপ করো। পুব দিকে সান্ত্বনার আভা দেখা দিক। আমি যেন দিনের বেলা, যারা আমায় চায় না, তাদের কাছ থেকে ঘুরে এখেন্সে ফিরে যেতে পারি। আর ঘুম, যে একটুখানির জন্যে দুঃখের চোখ বুঁজিয়ে দেয়—সে এসে আমায় আমার কাছ থেকে একটু-খানির জন্যে নিষ্কৃতি দিক্। (ঘুমোবে)

পা। তিনজনই তো এলে, এস একজন আর,
দুরকমের দুজন ক'রে হলে
তবেই হবে চার।
এই যে আর একটি আসছে
বয়ে নিজের দুঃখের ভার।
ঐ মানুষটা ভারি দুষ্টু ছেলে

বেচারী মেয়েগুলোকে সে
পাগল ক'রে তোলে।

[হারমিয়ার প্রবেশ]

হা। এত শ্রান্ত আর কখনো হইনি, এমন দুঃখে আর পড়িনি। আমি শিশিরে ভিজে গেছি, কাঁটায় আমার শরীর ক্ষত বিক্ষত, আমি আর চলতে পারছিনা, বুকে হেঁটেও আর এগোতে পারছি না, আমার পা আর আমার ইচ্ছার পেছনে ছুটতে পারছেনা। যতক্ষণ তোর না হয় আমি এখানেই শোব, যদি তারা দুজনে বন্দ্বযুদ্ধ করে তাহ'লে দেবতা লাইসেণ্ডারকে রক্ষা করুন। (শোবে)

পা। মাটির ওপরে, ঘুমোও অঘোরে
আমি নিঙড়ে দেব রস
তোমার চোখের ওপরে
ওর দুঃখ হবে দূর
ওগো প্রেমিক মধুর।
(লাইসেণ্ডারের চোখে রস নিঙড়ে দেবে
যখন তুমি জাগবে
তাকেই ভালো লাগবে
আগে যাকে ভালোবাসতে।
তাই তো বলে গ্রামের লোক
যে যার সে তার হ'ক
জ্যাকের হ'ক জিল
দূর হ'ক, যা কিছু গরমিল।
মরহ মাটীকে দিয়ে পাক
সব কিছু ঠিকঠাক হ'য়ে যাক্।

[পাঃ প্রস্থান। ডি, লা:, হে, হা ঘুমবে।

ইচ্ছের জোনাকিরা

বিভা সরকার

মনের জানালা খুলে ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায়
এ মনের ছিল যত ইচ্ছে
যেন তারা এক ঝাঁক চকল জোনাকি
অকারণ পুলকেই যেথা সেথা উড়ছে।
কি যে চায় কারে চায় কোথা যায় নাহি যায়
আনমনা গান গেয়ে কি পুলকে উন্মন
নিঃসীম শূন্যে লাখে লাখে তারা ফুল
কল্পনা জোনাকিরা জ্বলে নেভে অনুক্ষণ!
না জানি কে নীলাকাশে ফুলঝুরি ফোটালো
পিঙ্গল পীত আলো জ্বলছে ও নিভছে!
সে আলোয় মরি! মরি! আনচান করি করি
ইচ্ছের জোনাকিরা দিকে দিকে ছুটছে।

চারিদিক নিঃঝুম প্রশান্ত অবকাশ
ঘুমন্ত নিশীথিনী একেবারে নিশ্চুপ
এরই মাঝে আনমনা ইতি-উতি আনাগোনা
ইচ্ছেরা ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায় চুপচুপ
নাহি লাজ বন্ধন নাহি মানে শঙ্কা
অশান্ত উতরোল এক ঝাঁক বিহ্বল ইচ্ছে
মনের জানালা খুলে চকল পাখনায়
প্রাণভরি মুক্তির আস্বাদ লুটছে!
আকাশের বুক চিরে যোজন যোজন দূরে
প্রশান্ত অবকাশে তারা ফুল ফুটছে
ভাবনা জোনাকিগুলি কল্পনা পাখাখুলি
ঝিক প্রহরগুলি দুরাশায় ভরছে!

অজ্ঞাতবাস ও পাণ্ডবেশ্বর

অধ্যাপক দুর্গাচরণ সরকার

উত্তরে পুণ্যতোয়া অজয়ের জল বর্ষাগমে খরস্রোতে নদী-গর্ভের বালুময় কান্তার, পাশের শস্যক্ষেত্র ও কোপ, ঝাড়, জঙ্গল-আকীর্ণ মাঠ প্লাবিত করে বেয়ে চলেছে; দক্ষিণে তার খাতেখাতে মাটি ও পাথর মিশান স্তর উঠেছে—অনেক উঁচু হয়ে, পলাশ, কেঁদ, ধ, হরিতকী, বহেড়া প্রভৃতির বনজাঙ্গলে তার গায়ে সাজান রয়েছে। বেলা পড়বার মুখে রাঁচীস্থ কলেজের কোন ছুটির দিনে ঐতিহাসিক পরিদর্শনে এসে পড়লাম বহু অবহেলিত পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের কিংবদন্তী-বিজড়িত লোক লোচনের প্রায় অগোচরে সাধারণের জানাশোনার বাইরে খুবই সাধারণ ও আড়ম্বরহীনের মধ্যে—"ফুলবাগান" নামে বরাবর পরিচিত সিদ্ধরাজবনমাল-বেষ্টিত অজয়ের ধারে ছোট্ট সেই ক্ষুদ্র-গ্রামে। সঙ্গে ছিলেন আমার পিতা শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ডঃ প্রফুল্লকুমার সরকার।

কথিত আছে, এখানে পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসের শেষ কয়টী দিন যাপন করতে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছিলেন—পূর্ব্ব দেশের একান্তে অজয়ের ন্যায় বিরাট এক নদীর অপরপারে। তাকে পাণ্ডবর্জিত বলা একেবারেই চলে না—মহাভারতের সে বিরাটত্বের দিনের উপ-জঙ্গল বললে ভুল হবে না। তখন এদিকে তীর্থযাত্রার ছলে কোন কোন মহারথীও যে না আসতেন তা নয়; প্রাচীন কপিলাশ্রম মহানাদের কাছে হুগলী-জনগরের সন্নিকটে দেখান হয়। তার কিছু দূরে ত্রিবেণীই বহুপূর্বে সাগর-সঙ্গম ছিল। বুদ্ধদেবের নিকটজাতি পাণ্ডুদাস পাণ্ডবদের অনেক পরে কপিলতীর্থেই প্রথম এসে সে অঞ্চলে রাজ্যলাভ করে সেখানে বসবাস করেন। সেই হতে তাঁর আবাসপুরীর নাম হল পাণ্ডুয়া। পাণ্ডবদের বহু পূর্বে ভগীরথ এতদঞ্চলের পূর্বাংশ বেয়ে গঙ্গাকে নামিয়ে আনেন—সে যাক কেউই হোক—পৌরাণিক অনুভাবেই হোক। নবদ্বীপের মাধাইতলার ঘাটে পাণ্ডবদের বলে কথিত পাথরের পিণ্ডের মত শিব (শিবলিঙ্গ নয়) এখনও দেখা যায়। পাণ্ডবেরা নাকি এই শিবের মাথায় জল ঢেলেছিলেন।

পাণ্ডবেশ্বরের দূরপ্রসারী অজয়ের বাঁকে থাকে থাকে সাজান দক্ষিণ পাঁড়ের মাথায় গহন বনের অন্তরালে অবস্থিত ছোট ছোট সেকেলে মন্দিরগুলির পরিবেশ যেন নূতনের মাঝে পুরাতনের লুকোচুরি খেলার কথা মনে করে দিচ্ছিল। সে দৃশ্য মহানাদের বশিষ্ঠগঙ্গার দক্ষিণধারের উঁচু পাঁড়ের জঙ্গলের মাঝে অবস্থিত শিব-মন্দিরের পরিবেশের মতই বোধ হচ্ছিল। নদীগ্রাস বা river capture এর নিয়মে গঙ্গা হয়তো কালবশে অজয় নদীতে (কেহনায় ?) পরিণত হয়েছে। মহানাদে দৃষ্ট শিবলিঙ্গ শিরাটাকৃতি ও গৌরীপট্ট শোভিত (অধ্যাপক নলিনীভূষণ দাসগুপ্তের মতে, যা পাল যুগ থেকেই চোখে পড়ে, আর, পাণ্ডবেশ্বরের শিব প্রাচীন যুগের-সাদাসিধে, কিংবদন্তী অনুসারে বেলেপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে ইলাম-বাজারের রাস্তার উপর পুরাণ ধরণের মন্দিরে অবস্থিত, সুরথ রাজার শিবও তাঁরই।

অতঃপর হয়ে পাণ্ডবেশ্বর রেলওয়ে ষ্টেশনে নেমে প্রায় দেড় মাইল হাঁটার পর আমরা অজয়ের দক্ষিণ পাঁড়ে কোলিয়ারী আফিসের উত্তর, নীচের চালে বনেডাকা সাত আটটি মন্দির দেখতে পেলাম; সেগুলি খুব বড় আকারের নয়, মনে হল প্রাচীন যুগের কাজের উপর নূতন যুগের হাত পড়েছে। তাই পাথর ও মাটির নাতি-উচ্চ চত্বরের উপর নাতি-প্রশস্ত মন্দির অঙ্গন—বনবাসীরই যোগ্যকীর্তি বলে মনে হয়। দু'একটা মন্দির বোধ হয় বহু আগেই পড়ে গিয়েছে; সেখানে শিলাময় শিবই কেবল পুরাতনের সাক্ষ্য দিচ্ছেন। বেলা পড়ে গিয়েছিল তখন; নিবিড় বনের মাঝে ছোট এই মন্দির-গুলির ফটো নেওয়া সম্ভব হয়নি তাই। নীচের মন্দিরটি

একটু আলসেভাবে নদীর দিকে রয়েছে। গঠনভঙ্গিমা খুব পুরাণ বলে মনে হল না তার। তবে দর মন্দিরেই চুণ গোলা রঙের। একধারে একখানি বারান্দা ঘর, তাও খুব প্রশস্ত নয়। বোধ হয় তা অতিথি অভ্যাগত, সাধু ও তীর্থযাত্রীদের জন্য; রান্না করার জায়গা তাতে আছে। মন্দিরের গাঁথনির ইট, পাথরের না মাটির তা দেখবার সুবিধা হয়নি সে অন্ধকারে, তাড়াতাড়ির মধ্যে। মনে হয় উপরের অংশ বেশীর ভাগই অধুনাতন সংস্কারাদির সাক্ষ্য বহন করে। তবে চত্বরে স্থানে স্থানে পাথর আছে বোধ হল। একটী সুবৃহৎ ইন্দারা—নদীতে নাবার আঁকাবাঁকা পথে শীতল বৃক্ষছায়াতলে অবস্থিত। সেখান থেকে কোলিয়ারীর লোকে জল নেয়। তাঁদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আমাদের পথ দেখিয়ে দিল। আমরা অন্ধকার নামছে দেখে জোরে যাচ্ছিলাম। তারা বলল, "অত জোরে যেতে হবে না—এই কাছেই।" এখানে পৌষের শেষে মেলা হয়। বেশ দেশান্তর হতে বহু লোকজন ও সাধুসন্তের আগমন তাতে ঘটে থাকে।

পাণ্ডবেশ্বরের উত্তরে নদীর অপর পারে ভীমগড় নামক স্থানে ভীমের একটি সুরক্ষিত গড়ের অবশেষ মিলে। কথিত আছে, তখন অর্জুন, যুধিষ্ঠিরের আদেশে অস্ত্রলাভের জন্য হিমালয় গিয়েছিলেন; তাই অর্জুনের অনুপস্থিতিতে ভীমসেন ঐ জায়গাটীতে সুড়ঙ্গ সমেত দুর্গের মত একটা কিছু গড়ে তুলেছিলেন বোধ হয়; তার অদূরে উত্তর দিকে অবস্থিত রাজনগরে এক দৈত্যরাজের আকস্মিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য। প্রবাদ অনুসারে এই দৈত্যই পাণ্ডবদের সঙ্গে সেবিকারূপে অবস্থিতা এক পরমাসুন্দরী বনচারিণীকে হরণ করে পাণ্ডবদের হাতে শেষে নিপাতিত হয়। ভীমগড়ের একটু পূর্ব-দক্ষিণে দুবরাজপুরের পাহাড় অনেকটা রোমান অধিকারের ব্রিটনদের সময়কার ভাটমোরের প্রাচীন দুর্গের মত বোল্ডার পাথরে সাজান। পাহাড়ের মাথায় উঠবার প্রায় মাঝপথে তার অভ্যন্তরে গুহাঘরের প্রায় সমান উঁচু গোলাকার একখণ্ড শিলাময় বিরাট শিব। কারও কারও মতে এখানে পাণ্ডবদের একটী দুর্গ ছিল। দুবরাজপুর নাম যুবরাজ যুধিষ্ঠির হতে এসেছে। ইলামবাজারের ডঃ হরকালি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, একথা তাঁরা পুরুষপরম্পরায় শুনে আসছেন। লৌকিক উচ্চারণে যা স্থানে দাঁড়িয়েছে। তিনি আরও বলেন, অদূরে "পদচিহ্ন" গ্রামের চলতি নাম 'পায়ের' হয়ে গিয়েছে পাণ্ডবদের পদধূলি পড়েছিল বলে সে গাঁয়ে। যাই হোক, আরও উত্তরে মল্লারপুরের দিকে একচক্রা প্রায় মিলে। প্রবাদ আছে যে সেখানে বকরাক্ষস বাস করত। এলাহাবাদের উত্তরে গঙ্গার অপর পারে ঝুসি নামে একটা জায়গা আছে, সেখানে জতুগৃহ দেখান হয়। তবে জতুগৃহদাহ বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের আগেকার দিনের ঘটনা।

অনেকে বলবেন, শ্রীকৃষ্ণ মাঝে মাঝে বনে অজ্ঞাতবাসকারী পাণ্ডবদের দেখতে আসতেন। সুধী শ্রীনৃপেন্দ্র নারায়ণ সোম মহাশয়ের মতে তাঁর গতিবিধি সাধারণতঃ আফগানিস্থান, সিন্ধুদেশ, দ্বারকা, রাজপুতানা, দিল্লীর নিকটবর্তী স্থান ও পূর্বে জোর অযোধ্যা পর্য্যন্ত, এক চক্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু কোন এক দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্টির সময়ে তৃণ শস্য শ্যামল শিমুল ও পলাশ বনভূমি বিধৌত কৃষ্ণনগরের উপান্তে প্রাচীন যুগের ক্ষীণ প্রবাহিনী অঞ্জনার ধারে বসবাস করবার জন্য গোপগণসহ শ্রীকৃষ্ণের আগমনের কথা প্রচলিত আছে।

ক্ষীরতোয়া গিয়ে পড়েছে সেকালে সাগরসান্নিধ্যসূচক, বর্ত্তমানে নীলাভ মুক্তাগর্ভ ইচ্ছামতী নদীতে। তাঁদের প্রবর্ত্তিত কৃষ্ণপূজা উপলক্ষে বাঙ্গলেশ্বরী মহারাজরাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের তাঁদের বাড়ীতে কদার খাওয়ার কথা শোনা যায়। সেকালে অশ্বপৃষ্ঠে বহু দূর দেশ পর্য্যন্ত পরিচিত ভারতের অন্তর্বর্ত্তী, উপান্তবর্ত্তী—এমন কি সীমাবহির্ভূত অঞ্চল পর্য্যন্ত বীরপুরুষদের যাতায়াত ছিল। এখন ভারতের মধ্যের ত্রিপুরা, মণিপুর, চাকমা প্রভৃতির উল্লেখ করা চলে। কুরুক্ষেত্রের পর শেষোক্ত দুই অঞ্চল পলায়িত ক্ষত্রিয়দের গুপ্ত আবাসে পরিণত হয়। তাদের পারিবারিক ইতিহাস এই ভাবেই মুখে মুখে চলে আসছে। এইরূপ জাতচক্রের বাইরেও মাঝে মাঝে অবস্থিত পান্থশালা ও তপোবন সমূহকে অবলম্বন করে বিশেষতঃ ভাগীরথী তটবাহী পথে কপিলতীর্থের ন্যায় স্থানের তীর্থঙ্কর কেউ কেউ যে না আসতেন তা নয়। বনবাস নিকটে না করে সুদূর অজ্ঞাত স্থানে করাই স্বাভাবিক। তিক্ত বিতৃষ্ণার

মনোভাবেই তা সম্ভব হয়। শ্রীরামচন্দ্র সে ভাবেই বেছে নিয়েছিলেন দণ্ডকবন। গঙ্গা ও ভাগীরথীর ধারে ধারে তপোবনেরও তখন অভাব ছিল না। "ইহৈব ভূয়ঃ কুলবন্ধী গঙ্গাঃ—ভাগীরথীতীরতপোবনানি।" এই তপোবনগুলির কথা রামায়ণেও আছে। এদের কোন কোনটিকে আশ্রয় করে শ্রীকৃষ্ণ হয়তো এসে থাকবেন, এতগুলির জঙ্গলে শেষ বৎসরে অজ্ঞাতবাসী পাণ্ডবদের দেখবার জন্য। তাঁর পথই হয়তো পরবর্তীকালে অশ্ববাহী ডাকের পথে পরিণত হয়। সাম্রাজ্যলোভী অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব-সাম্রাজ্যের সুদূর প্রান্তের ধাবমান জয় করতে সাহায্য করত সে যুগে, এ কথা বললে বেশী ভুল হবে না—কারণ অশ্ব ভ্রাম্যমাণ তখন কোথায়? সুতরাং ক্ষিপ্র রথারোহী —কখনও বা অশ্বারোহী শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবিত বা মিত্ররাজ্যের একান্তে বা উপান্তে লোকজনের আনাগোনার বাইরে সহজ বন ও জঙ্গল পাহাড়ে মিশ্র পথে পাণ্ডব-পরিদর্শনে আসা বিচিত্র নয়। পাণ্ডবদের বারণাবত হতে নৌকাযোগে একচক্রাযাত্রার কথা মহাভারতে আছে; তবে একচক্রা দিল্লীর নিকট হলে ও বনবাসকালীন বীরভূমের একচক্রার প্রতিষ্ঠা বা পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দিগ্বিজয়ী সম্রাট হর্ষের সময়কার "নৌসাধনোপেত" "বঙ্গকে" যেতে নৌযাত্রাই প্রশস্ত ছিল। পরবর্তী কালেও সেই ব্যবস্থা কম বেশী বিদ্যমান ছিল। পাণ্ডবদের বারণাবত হতে গঙ্গাপারে বনযাত্রার মুখে পরমভক্তানুরাগী মহাত্মা বিদুরের প্রতিনিধি দুর্যোধনের সম্ভাব্য সড়যন্ত্রের কথা জেনে সুদক্ষ মাঝিদের বাহিত নৌকায় নিরাপত্তার কথা বলে, তাতে তাঁদের আরোহণের উপদেশ দেওয়ার সময় বলেন "বাহ্যাহরঙ্গসম্পন্না চন্দ্রধ্বজ নৌকা তোমাদের এই সমস্ত দেশ অতিক্রম করে নিরাপদে গঙ্গাপারের গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেবে" অবশ্য এখানে রাজমহল, মালদ প্রভৃতি ভারতচন্দ্রের উল্লিখিত অঞ্চল—"বড়গঙ্গাপার" বুঝায় না।

বনবাসের প্রায় বার বৎসর সরস্বতী তীরে, রাজপুতানার উপান্তে, মৎস্যদেশের জঙ্গলময় বনাঞ্চলে ও গঙ্গাতটের বিজন অরণ্যে কাটিয়ে কলিঙ্গের সাগর তীর্থভ্রমণের ইচ্ছা করে যুধিষ্ঠির ভাইদের নিয়ে পূর্বাঞ্চলে আসবার সময় বলেছিলেন —তাঁদের অন্বেষণ বর্ষাপনের কাজ সহজ নয়, চারিদিকে লক্ষ চর পাঠিয়েছে তাঁদের সন্ধানে। তাঁর কথার ভাবে বোধ হয়, তাঁদের সতর্ক হয়ে থাকতে হবে গোপন আশ্রয় খুঁজে নিয়ে। এতৎ সম্পর্কে তিনি বিরাটের জঙ্গল রাজ্য কাম্যক বন উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচনা করেন। কাম্যক বন চলতো তখনকার দিনে পূর্বপশ্চিমে বহুবিস্তৃত ছিল—বিন্ধ্যপর্বতমালার দক্ষিণ বরাবর। আর তখন দণ্ডকবন দাক্ষিণাত্যের বিস্তীর্ণ উচ্চ মধ্যভূমিভাগে কাম্যকের দক্ষিণে ছিল। এখানে সন্দেহ জাগতে পারে—অপরাধী নির্বাসনের জন্যই চলতো সুদূরপ্রসারী অরণ্যাঞ্চলের নাম "দণ্ডক" দেওয়া হয়, আর তদ্ভবন্ধ অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী মৃগয়াবিলাস চরিতার্থ করবার উপযুক্ত সুবিস্তৃত বনস্থলী কাম্যক নামে পরিচিত হয়। এখানে award আর punishment এর কথা মনে করেই পাণ্ডবদের বনবাসের শেষ কয়টা দিন কাম্যকের বহুপূর্বে অবস্থিত সমতুল্য কোন বনেও কেটে থাকতে পারে। আলোচিত স্থানে অজ্ঞাতবাস সমাপ্তির নিশ্চয়তা নেই। তাঁদের অজ্ঞাত বাসের কথায় মহাভারতে উক্ত হয়েছে—যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জুন অস্ত্রশিক্ষালাভের জন্য ইন্দ্রের কাছে যান। সে সময়টা তাঁরা খুব চিন্তার মধ্যে ছিলেন। অর্জুনের অনুপস্থিতিতে যুধিষ্ঠিরের দুশ্চিন্তার ও ভীমের উপর প্রতিরক্ষার ভার দেওয়ার কথা জনশ্রুতিও বলে। এদিকে পাণ্ডবেশ্বরে বনবাস সম্বন্ধে জোর প্রবাদ যে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কথায় শিবলিঙ্গ বনে। মহাভারতে উল্লিখিত দ্রৌপদীর স্থলে পাণ্ডবেশ্বরের কিংবদন্তীতে এক পরমাসুন্দরী বনচারিণী সেবিকার কথা প্রচলিত। অজ্ঞাতবাসীদের পক্ষে পরিচয় সংগোপন কিছু অস্বাভাবিক নয়। এইটীই এখানে ভাববার বিষয়। স্থানীয় অতিসাধারণ লোক ও আদিবাসীদের মধ্যে চলিত এ প্রবাদ অনেকটা দণ্ডক বনে রাক্ষসের ভয়ের বিষয়ে সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত ধারণার মত। ত্রয়োদশ বর্ষের অজ্ঞাতবাসের সমাপনমুখে ভীমসেন রাজ আদেশে মল্লরাজদের পরাজিত করেন—মহাভারতে একথা আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য মল্লভূম ও একচক্রা বীরভূমের উত্তরাংশে; তা ছাড়া বিহার, বাঁকুড়া ও বীরভূমের অনেক অংশ মল্লরাজদের ছিল। একচক্রার নিকটবর্তী অঞ্চলে বিরাট রাজার একটা তীর্থাঞ্চলীয় উপনিবেশও হতে পারে—যেমন মহারাজা বল্লালসেনের সময়ে ঢাকা বিক্রমপুর নবীন বিক্রমপুর গড়ে উঠে কিংবা কপিলবস্তুর পাণ্ডুদাস রাজার ভাগীরথী-গঙ্গাসাগর তীর্থসঙ্গমে পাণ্ডুরাজে নবরাষ্ট্র গঠিত হয়।

আমাদের পাণ্ডবেশ্বর পরিদর্শনান্তে বর্তমান আলোচনার প্রসঙ্গে রাজসরকার, প্রত্নতত্ত্ববিভাগ, বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষৎ ও ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি অবহেলিত পাণ্ডবেশ্বরের প্রত্নসম্পদের দিকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে নিবন্ধ শেষ করি।

গৌরী সেন

শ্রীভাগবতদাস বরাট

—'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।' প্রবাদটি সু-প্রচলিত। মুখে মুখে সবই জানা কথা। যখন তখন যার তার মুখে শোনা যায়।

মনিব চাকরকে বাজারে পাঠালেন। কানে কানে জানিয়ে দিলেন, মাছের দর যদি চাপা দেখিস্, তা হলে পটল আর আলু নিয়ে বাড়ী ফিরবি। মাছ কিনতে হবে না। কিন্তু চাকর করল কি, মাছের দর চাপা সত্ত্বেও মাছ কিনল এবং আলু পটলকেও বাদ দিল না। চাকরের কীর্ত্তি দেখে মনিব তো রাগে আগুন! বলে পয়সা রোজগার তো করতে হয় না। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।

প্রবাদ বাক্যটি শুনে অনেকের মনে ধারণা হবে যে গৌরী সেন দাতা ছিলেন। সত্যি তাই, তিনি দাতাই ছিলেন। তাঁর দানের খ্যাতি আজ সর্ব্বজনবিদিত। সুতরাং এহেন দানশীল ব্যক্তির জীবনবেদ ও দানশীলতার বিষয় সবিশেষ জানবার আগ্রহ অনেকেরই হওয়া স্বাভাবিক। তাই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

গৌরী সেন সপ্তদশ শতাব্দীর মানুষ। হুগলি জেলার অন্তর্গত বালিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জাতিতে সুবর্ণ বণিক। সম্পূর্ণ নাম গৌরীশঙ্কর সেন।

নবাব-বাদশাহের আমল। ভারত তখন মুসলমান-শাসিত। কিন্তু তা হ'লেও হুগলী জেলার সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিল পর্ত্তুগীজরা। ইংরাজ-শাসন তখনও এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। গৌরীসেনের পূর্ব্বপুরুষ পুরন্দর সেন সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। সেখানে তাঁর বিরাট ব্যবসা ছিল। সপ্তগ্রাম পতনের পর পুরন্দরের অধস্তন বংশধর হলধর সেন হুগলীতে আসেন এবং বসবাস করেন। এই হলধরের প্রপৌত্রের নাম অনিরুদ্ধ সেন, অনিরুদ্ধের পুত্রের নাম নন্দরাম এবং নন্দরামের পুত্রই হলেন গৌরী সেন।*

মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন গৌরী সেন। পিতার তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় সম্পত্তি ছিল না। সামান্য কিছু মূলধন নিয়ে তিনি তাঁদের বংশগত আমদানী ও রপ্তানি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন এবং সাধুতা ও প্রখর বুদ্ধিবলে কমলার কৃপাদৃষ্টি লাভ করে প্রভূত ধন-ঐশ্বর্য্যে বিভূষিত হয়ে উঠেন।

আমাদের মত সাধারণ মানুষ গৌরী সেন ছিলেন না। সঞ্চিত ও উপার্জ্জিত অর্থের তিনি প্রকৃত সদ্ব্যবহার করে-ছিলেন। যার ফলে দাতা নামে তিনি সারা বাংলায় প্রসিদ্ধ এবং প্রবাদ বাক্যের মাধ্যমে তাঁর নাম প্রায় তিন শ' বছর লোকমুখে প্রচলিত। কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি কলকাতার বড়বাজারে বাস করতেন। সেই সময় বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী বৈষ্ণবচরণ শেঠের কারবারে তিনি অংশীদার হন এবং আমদানী রপ্তানির কাজ সুরু করেন। আবার কারো মতে গৌরী সেন পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলার প্রথম গীর্জ্জা ব্যাণ্ডেল চার্চ্চের দেওয়ান ছিলেন। গৌড়ের রাজার প্রীতি উৎপাদন করে পর্ত্তুগীজরা ব্যাণ্ডেল নামক স্থানটি লাভ করেন এবং ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐ স্থানে তাঁরা একটি গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন। খ্রীষ্টানদের ভজনালয় দেখে গৌরীবাবুর মনে সেই সময় ঐরূপ একটি মন্দির তৈরীর বাসনা হয়। অন্তর্যামী ভগবান তাঁর মনের কথা বুঝি বুঝতে পারেন। তাই আকস্মিক ধনলাভ তাঁর ভাগ্যে

* সুবল মিত্রের বাংলা অভিধানে দেখি, গৌরীসেনের পরিচয় প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে গৌরী সেনের পিতার নাম হরেকৃষ্ণ মুরলীধর সেন।

ঘটে গেল! এসম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। গৌরীসেনের প্রতি সৌভাগ্য দেবীর আকস্মিক কৃপাদৃষ্টি সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আজও লোকমুখে শোনা যায়।

সেই সময় গৌরীবাবু মেদিনীপুরের ভৈরবচন্দ্র দত্ত নামে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় কারবারে প্রবৃত্ত হন। বিক্রয়ের পণ্যদ্রব্য তিনি হুগলীর পর্তুগীজদের নিকট হতে ক্রয় করে মেদিনীপুরে পাঠাতেন। সেবার তিনি সাতটি নৌকাবোঝাই করে মেদিনীপুরে দ্রব্য চালান দেন। মেদিনীপুরে নৌকাগুলি পৌঁছলে ওঁর বন্ধু ভৈরববাবু দেখেন যে নৌকা-গুলি রৌপ্যপূর্ণ। সুতরাং নৌকাগুলি তাঁর নয় এই ভেবে তিনি নৌকাগুলি গৌরীবাবুর কাছে হুগলীতে ফেরৎ পাঠান।

এদিকে নৌকাগুলি ফিরে আসার পূর্বরাত্রে গৌরীবাবু স্বপ্ন দেখেন যে মহাদেব তাঁর সম্মুখে উপস্থিত। স্বপ্নে মহাদেব জানান যে তুমি আমার মন্দির নির্মাণের ইচ্ছা মনে পোষণ করেছিলে। আমি সেইজন্যে তোমাকে অর্থ পাঠালাম। কাল নদীর ঘাটে গিয়ে দেখবে—তোমার নৌকা ফিরে এসেছে। ঐ নৌকাতে যা দেখবে তা তুমি গ্রহণ করবে। আর তোমার বাড়ীর পশ্চিমের বাগানে আমার মন্দির নির্মাণ করবে।

পরদিন প্রত্যূষে স্বপ্নের কথা চিন্তা করে সেন মশায় গঙ্গার তীরে ছুটে চললেন এবং গিয়ে দেখেন যে তাঁর প্রেরিত সপ্ততরীর যাবতীয় দ্রব্য রৌপ্যে পরিণত হয়েছে। গৌরীবাবু বিস্মিত হলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন যে ঈশ্বর-কৃপায় প্রাপ্ত এই-সমুদয় ধনরাশি তিনি পরহিতে ব্যয় করবেন।

যথাস্থানে দেবাদিষ্ট মন্দির নির্মিত হল এবং মন্দির মধ্যে দেবতার বিগ্রহ বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করে দেবতার প্রাত্যহিক পূজার ব্যবস্থাও তিনি করলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত গৌরীশঙ্কর মন্দির আজও হুগলীতে বর্তমান। মন্দির গাত্রে প্রস্তর ফলকে তাঁর নাম লিখা আছে এবং মন্দির প্রতিষ্ঠার সাল, বাংলা ১০০৮ সাল ও ইংরাজী সন ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দ লিখা আছে।

দৈবলব্ধ ধনরাশি প্রাপ্তির পর গৌরীবাবু যেমন রাতা-রাতি ধনী হলেন, তেমনি দাতাও হলেন। যে কেউ তাঁর কাছে কোন কিছু প্রত্যাশায় এসে তিনি তাঁকে সেই জিনিষ প্রদান করতেন। কেউ বিফল মনোরথ হতেন না। তাঁর এই দানশীলতার কথা ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। যে কেউ লোক কোন কাজে প্রবৃত্ত হয়ে অর্থাভাব ঘটলে গৌরীবাবুর কাছে ছুটে আসতো। সকলেরই ঐ এক ভরসা—গৌরী সেনের কাছে যা চাওয়া যাবে তাই পাওয়া যাবে। সপ্তগ্রামের সমস্ত খাবারের দোকানে জানান ছিল যে তাঁর নাম করে যে কোন দরিদ্র লোক যা খেতে চাইবে তাকে যেন তা দেওয়া হয়। তাঁর দানশীলতার সুযোগ নিয়ে অনেকে তাঁর অপচয় করেছে। কিন্তু তাতে তিনি মোটেই ক্ষুণ্ণ হন নি।

গৌরী সেন প্রভূত ধনের অধিকারী হয়েও ধীর, বিনয়ী, নিরহঙ্কার ও সদালাপী ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দুধর্মোক্ত যাবতীয় ক্রিয়াকর্মে তাঁর গভীর আস্থা ছিল এবং তিনি তা খুব ধুমধামের সঙ্গে সম্পন্ন করতেন। তাঁর পুত্রের বিয়ের সময় তিনি তাঁর স্বজাতিবর্গকে এক বিরাট ভোজে আপ্যায়ন করেন। এরূপ ভোজ গঙ্গার পশ্চিম কূলে কেউ কোন দিন করতে সাহস করে নি। কল্পতরুসদৃশ গৌরী সেনের কাছে অর্থ সংগ্রহের আশায় সবাই ছুটে আসতো। সঙ্কোচ নেই, শঙ্কা নেই। সকলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। তাঁর এই অসামান্য বদান্যতার জন্য তাঁর খ্যাতি প্রবচনের মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং এখনও প্রবাদ বাক্যের মধ্যে তাঁর নাম সবার মনে জাগরূক আছে। অনুমান ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন!

গৌরীবাবুর বংশধরগণ আজও হুগলীতে রহিয়াছেন। কিন্তু পূর্বের মত তাঁদের সেইরূপ অর্থবল নেই। থাকার মধ্যে আছে তাঁর প্রাসাদোপম বিরাট অট্টালিকা, তাঁর প্রতিষ্ঠিত গৌরীশঙ্করের মন্দির, আর তাঁর পুণ্যময় অক্ষয় নাম।

পরীক্ষা

শ্রীশিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আকস্মিক, এক একসময় এমন এক একটা ঘটনা যা ঘটে যায় তা' চিন্তাকল্পনার মধ্যেও আসে না। অথচ ঘটে থাকে। আমাদের এই অতি ক্ষুদ্র জীবনে কখন্ কোন্ সময় কি যে ঘটবে তা কেউ বলতে পারে না। কোন ঘটনা ঘটবার পূর্ব্বেই লোকচক্ষুর অন্তরালে কখন্ কি ভাবে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হোয়ে যায় এবং তার কার্য্যকারণও ঠিক হোয়ে যায় তা' ধারণার মধ্যে আনা যায় না। বুঝবার, ভাববারও অবকাশ থাকে না—কেমন ভাবে কোথা দিয়ে যে ঘটে গেল তাও ধরা ছোঁওয়া যায় না। এক এক সময় নিজের মনেই প্রশ্ন জাগে, এমন তো ঘটবার কথা নয়, কেমন করে ঘটলো? এমনি একটি ঘটনা আমার জীবনে যা ঘটেছিল সেই কথাই বলছি এখানে।

এমনি এক শীতের রাত্রি।

পশ্চিমাঞ্চলের শীতের মত অত তীব্র তীক্ষ্ণ কন্‌কনে ঠাণ্ডা সমুদ্রোপকূলের মত স্থানে দেখতে পাওয়া যায় না। তবুও সেবার শীতটা যেন বেশ জাঁকিয়ে একটু বেশীমাত্রাতেই পড়েছিল।

দিন পনেরো হোল পুরীতে এসেছি। পুরীর জল-হাওয়ার সঙ্গে বহুবার আমার পরিচয় হ'য়ে গেছে। তাই এবার এখানে আসবার মত মনের ইচ্ছা আমার ছিল না। তবুও শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আসতে হোল। নিয়ানন্দময় দেহটাকে কোন রকমে ঠেলেঠুলে টানা হেঁচড়া করে সবার সঙ্গে একায় বয়ে আনতে হোল।

মানুষের দেহটা মনের আজ্ঞাকারী ভৃত্য। প্রভু মন, যখন যা হুকুম করবে তাকে ঠিক সেই নির্দ্দেশ পালন কর্ত্তে হবে। কাজেই শত অনিচ্ছা পাছে বলে পুরীতে এসে পৌঁছলাম।

দু'চার-কথা বলতে কি বহুদিন যাবৎ আমার মনের অবস্থা বেশ ভাল যাচ্ছিল না। মনের সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও নিদারুণ অবসাদে আমাকে কেমন যেন জড়তাগ্রস্ত করে তুলেছিল। সংসারের এই মানিময়ী রুক্ষ জড়তা, আর কুৎসিত কুটিল স্বার্থের অসহিষ্ণুতার পঙ্কিলতায় মনকে ক্রমা-গতে বিষিয়ে তুলছিল দিন দিন। কিছুতেই যেন শান্তি পাচ্ছিলাম না। যেন শিকলাবদ্ধ বিহঙ্গ এই দেহরূপ পিঞ্জরে আবদ্ধ থেকে সদাই ছটফট করে মরছে! কি যেন একটা বিষাদ-করুণ সুর সানাইএর করুণ মূর্চ্ছনার মত সদাই অন্তরকে মথিত ভারী করে তুলছিল। যেন মনে হচ্ছিল এই পিঞ্জরাবদ্ধ আত্মারামরূপী বিহঙ্গ পিঞ্জর ভেঙ্গে ওই নির্ম্মল নীলাকাশে পাড়ি দিতে চায়। তাই যেন তার এত আকুলি বিকুলি। পুরীতে এসেও তাই মনে কোন শান্তিই পাচ্ছিলাম না।

পূর্ব্বেই বলেছি শীতের রাত্রি। সেদিন সন্ধ্যার দিকে বেশ একটু ভাসাভাসা মেঘও বোধকরি করেছিল। কি মনে করে সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাপড় জামা ছেড়ে নিয়ে একাই পথে বেরিয়ে পড়েছিলাম। এদিক সেদিক ঘুরে-ঘারে সমুদ্রের ধারে এসে যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় নয়টা বেজেছে। একে শীতের রাত্রি, তায় আবার সমুদ্র-তীর কুয়াশায় আচ্ছন্ন। এই অল্প রাতেই জনশূন্য হয়ে গিয়েছে। এতক্ষণ পথচলায় ক্লান্ত দেহটাকে নিয়ে আর যেন কোথাও যেতে ইচ্ছা করছিল না। তাই একটু না বসে আর পারা গেল না।

ঊর্দ্ধে দিগন্ত-প্রসারিত নীলাকাশ, তাতে নীল চাঁদোয়ার উপর জরীর বুটির কাজ করার মত অসংখ্য নক্ষত্র-পুঞ্জ মিটমিট করে জ্বলছে। দ্বিতীয়ার চাঁদ ওই নীলাকাশের

গায়ে কখন মিলিয়ে গেছে। নিজে-প্রসারিত লীলায়িত ঢেউ এর পর ঢেউ তুলে হেলে দুলে নেচে-কুঁদে আপন মনে তীরে এসে লুটোপুটি খাচ্ছে। আবার লীলায়িত সফেন তরঙ্গমালা নৈশ আঁধারের কোন্ সুদূরে পাড়ি দিচ্ছে তা দেখা যাচ্ছে না। বসে বসে তাই দেখছি। দেখছি, আপন জীবনানন্দে আপনি উচ্ছ্বসিত মুখরিত মহাকরুণময় মহাসমুদ্র আপনার সুরম্য খেয়াল খেয়ায় আপনি মত্ত—আপনিই হাসে আনন্দিত। তার যেন ক্ষণিকের বিরাম নাই; কিসে চাহিয়ে তাকিয়ে শোনবার বুঝবার দেখবারও যেন কোন অবকাশ নাই। চির দুর্মদ দুর্বিনীত চিরবিদ্রোহীর মত অবিরাম হর্ষভরে ছলছল কলহাস্যে নৃত্য করতে করতে ছুটে চলেছে কোন্ আপন ছন্দে দিশাহারা হে যে দিক্ হতে কিসুরে—মনে হয় যেন এখনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাকে আপন মহাবেগে উপড়ে কেড়ে-কুঁড়ে ছিঁড়ে-কুঁড়ে কুটি কুটি করে দিতে চায় কি এক নিদারুণ তীব্র রোষে। যেন সৃষ্টির যত কিছু অনিয়ম, অধর্ম, পাপ, অসত্য অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত রোষ উদ্গীত হোয়ে, তাকে দলে পিষে দিতে অবিরাম গতিতে ছুটে চলেছে আপনার বেগে আপনার রুদ্র অভিসারের আনন্দে।

মনে মনে বললাম, হে সত্যের চিরসুন্দর দেবতা! হে মহাসমুদ্র—তোমার এমন যে মহাপ্রলয়ঙ্কর মহারুদ্র-রূপী সংহারমূর্ত্তি দেখছি, তুমি কি পারনা এই মহাশক্তি নিয়ে এই প্রপীড়িতা পৃথ্বীকে তোমার স্নেহময় কোলে স্থান দিতে। সকল অনাচার, অসত্য, অধর্ম তোমার ওই পবিত্র জলধারায় সিক্ত হইয়া সকল পাপের ক্ষালন করে দিতে! তোমার ওই জলধারায় এই পৃথিবীর পাহাড় পর্ব্বত বৃক্ষলতাদি সকল প্রাণময়কোষকে অন্ধকার অতল তলে তলিয়ে দিতে। এই তাপদগ্ধ ভারাক্রান্ত ধরিত্রী তাহ'লে হয়তো কিছুদিনের জন্য শান্তি লাভ করতে পারতো—তোমার স্নেহশীতল বক্ষে স্থান পেয়ে।

তারপর বিধাতা আবার নতুন করে সৃষ্টি করতো সত্য, ধর্ম, ন্যায় ও পুণ্যের পবিত্রতা দিয়ে। আবার গড়ে উঠতো চিরশ্যামল চিরমধুর ধরিত্রী সেই আদিমকালের সামগানের মধ্য দিয়ে তাঁর নিপুণ হাতের মাধুর্য্য দিয়ে। প্রেমে ধর্ম্মে সত্যে আবার এই সংসার সমুজ্জ্বল হোয়ে উঠতো।

কিছুক্ষণের জন্য আমার মনকে কি এক অজানা আবেশে শুদ্ধ করে দিলে। মনের মধ্যে কি এক অজানা রহস্যের ভারে আচ্ছন্ন করে তুললো। মনে মনে চিন্তার মধ্যে প্রকৃতির এই অপরূপ লীলারহস্যের কোন সূত্রই ধরতে পারলাম না। যতই চিন্তা করি কূল কিনারা পাই না। আর সম্মুখে লীলাময়ী বারি ধীর গীতঝঙ্কার উর্ম্মিমালা সফেন তরঙ্গের কল্লোল গীতে শ্রবণমনে কি এক অব্যক্ত করুণবেদনায় মথিত করতে লাগলো। স্থির দৃষ্টি দিয়ে যতদূর চেয়ে দেখি, এর যেন আদি-অন্ত কিছুই নেই। আকাশে সাগরে একাকার মিশে গিয়েছে। এ যেন এক বিরাট পুরুষ রুদ্রলীলায় আপনা আপনি মেতে আছে।

কতক্ষণ যে এমনি উন্মেষ হয়ে বসে আছি তার খেয়াল নেই। হঠাৎ যখন নিজের সম্বিৎ ফিরে এলো তখন ঘড়ির পানে চেয়ে দেখি পৌনে দশটা। একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করে মনে মনে বললাম—হে বিরাট তোমার সত্তা তুমিই নিজে। তোমাকে কে বাঁধবে—হে চিরমুক্ত চিরকিশোর, এমনি করে অবাধে চিরদিন স্বাধীন ভাবে বহে যাও—যুগ যুগ ধরে।

তারপর সে স্থান ত্যাগ করে স্বর্গদ্বারের দিকে এগুতে লাগলাম। লোকজন বিশেষ না থাকায় সমুদ্রতীর বেশ নির্জ্জন ছিল। এখানে ওখানে পথচারী কুকুরগুলো আপনা আপনি খেয়োখেয়ি করছিল। দু' একজন পথচারী তীরের উপরকার পথ ধরে যাতায়াত করছিল।

চলেছি, ধীর মন্থর গতিতে—আর স্মৃতির পাতায় চিন্তার ভারাক্রান্ত অক্ষরগুলো লাইনের পর লাইন দিয়ে আপনা আপনি লেখাগুলো সাজানো হয়ে যাচ্ছে। পূর্ব্বেই বলেছি নিজের জীবনের উপর একটা কেমন যেন বিতৃষ্ণার ভাব জেগে গিয়েছে। এই কাঠিন্যভরা মরুময় সংসারে আমার মত মানুষের বেঁচে থাকার কি যে হেতু তা যেন খুঁজে পাই না—রিক্ত দগ্ধ মন নিত্য পুড়ে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে, তবুও, কেন যে এই জীবন সংগ্রাম কিছুই ভেবে পাই না। এমন কতশত এলোমেলো কথাই না ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে স্মৃতির অধ্যায়ে একের পর এক লিপিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

অকস্মাৎ কোথা হ'তে যেন একটা অস্ফুট করুণ ক্রন্দনের সুর ভেসে আসতে লাগলো। নিজের মনের সমস্ত চিন্তার জাল মুহূর্ত্তে ওই করুণ ক্রন্দনের মূর্চ্ছনায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। হঠাৎ ঝড়ের ঝাপটে খেইহারা পাখী যেমন যার

ধরিয়ায় পড়ে পাক খেতে থাকে, সেইরূপ নিজের মনের শত সহস্র চিন্তারাশি খেইহারা, গতিহারা হয়ে ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। মনে হোল যেন ওই সমুদ্রের মধ্য থেকে এই ক্রন্দন ধ্বনি ভেসে আসছে।

ধীরে ধীরে ওই ক্ষীণ করুণ ক্রন্দন ধ্বনির পানে এগিয়ে চললাম। স্বর্গ দ্বারের ঘাট পার হয়ে যেমনি শ্মশান ঘাটের নিকট এসে পৌঁছেছি, অমনি দেখতে পেলাম অদূরে ধূমায়মান মৃত বহ্নিশিখা কিলিমিলি করে জ্বলছে। তার ক্ষীণ আলোকে অস্পষ্টভাবে দেখলাম—অনতিদূরে একটি নবমৃত শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ করে আঠারো উনিশ বছরের একটি যুবতী বালুর স্তূপের ওপর বসে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আর তারি পার্শ্বে একজন গেরুয়াধারী যুবক দাঁড়িয়ে আছে।

নৈশ আঁধারে চারিদিক বেশ স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। তথাপি একান্ত কৌতূহলী মন আমাকে সেইদিক পানে টেনে নিয়ে চলেছে। সেই গেরুয়াধারী যুবকের অস্পষ্ট স্বর আমার শ্রবণ বিবরে প্রবিষ্ট হোল। তাই আমি একান্ত কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে নিজেকে একান্ত গোপন করবার জন্য তাদেরি অনতিদূরে একটি অর্দ্ধ ভগ্ন ক্ষুদ্র ঘরের পাশে এসে দাঁড়ালাম।

যুবক কহিতেছে: সর্ব্বাণী, ভুল করে মিথ্যে বদনামের ভাগী করে সকল অপরাধের বোঝা আমারি ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করছ? কিন্তু ভাল করে যদি দেখতে, তবে বুঝতে,এই হৃদয়ে ঐ চিতার মত কত অগ্নি হেলিহান আগুন অহর্নিশি লকলক করে জ্বলে জ্বলে আমাকে ভিতে ভিতে খাক করে দিচ্ছে? তুমি বুঝছ না—বুঝতে চেষ্টাও করছ না।

যুবতী সর্ব্বাণীর নয়ন হতে একটা জ্বালাময় আগুনের দৃষ্টি যেন বেরিয়ে আসতেছিল। ক্ষণেক নীরব থেকে কাঁদামাখা শ্লেষের সুরে বললে: বুঝবো আবার কি? ও-সব ছাকামী বোঝবার আমার দরকারই বা কি? আর মিথ্যা দোষ দেওয়া আমার স্বভাবও নয়—বলনা, কে সন্ন্যাসীর আবরণে আপনাকে ঢেকে রেখে, কু অভিসন্ধি নিয়ে আমার বাছার সেবার অজুহাত নিয়ে, ওষুধ খাওয়ানোর ছলে একটু একটু করে বিষ দিয়ে তাকে এই সংসার থেকে চিরজনমের মত সরিয়ে দিল—আমার এই দেহটার লোভে? কে এমন পিশাচের মত আমার এমন সর্ব্বনাশ করল? বল, কে করেছে—সে তুমি।

গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী যুবা বললে: আমি! এ তুমি কি বলছ সর্ব্বাণী! এই কি তোমার অন্তরের কথা। এ যদি তোমার অন্তরের কথা হয় তবে বুঝবো এ সংসারটা একটা স্বার্থময় পূতিগন্ধবিশিষ্ট স্থান—অকৃতজ্ঞ নরক বিশেষ। সর্ব্বাণী নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করছিল। সন্ন্যাসীবেশী যুবক তাকে লক্ষ্য করে বললে: সর্ব্বাণী, আমিই তোমায় চেয়েছি? তুমি আমায় চাওনি? আর এই যে তোমার এমন বিপদের দিনে অক্লান্ত ভাবে তোমার ছেলের সেবা করলাম—তার প্রতিদান কি এই!

সর্ব্বাণী রোষে কহিল: হাঁ, হাঁ—যা করেছ সব নিজের স্বার্থের জন্যে—সেবা করার অছিলায় লোভাতুর কামুক মন নিয়ে আমাকে পাবার ছলনায় উঃ! অন্ধ বিশ্বাসে, সোদরসম শ্রদ্ধায় সকল নির্ভরতা দিয়ে যাকে আপন করতে চেয়েছিলাম—সেই বিষাক্ত ফণা বিস্তার করে আমাকে ছোবল দিতে চায়! বিশ্বাসহন্তা ছদ্মবেশী শয়তান আর কাকে বলে?

সন্ন্যাসী যুবা বললে: সর্ব্বাণী···সর্ব্বাণী—

সর্ব্বাণী: কি···কী···

সন্ন্যাসী যুবা: নির্জ্জলা মিথ্যাগুলো বলতে তোমার জিবে ব্যথা লাগছে না—

সর্ব্বাণী তেমনি সরোষে বললে: যা সত্য, তাই বলছি। মনে মনে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর—সে ঠিক বিবেকবশী হয়েই তার উত্তর দেবে।

সন্ন্যাসী যুবা: হাঁ সে ঠিকই উত্তর দেবে—যেমন লোহা চুম্বকে টানে? যেমন আগুনের কাছে ঘি থাকলে সে গলে—

সর্ব্বাণী: এখনও সেই মিথ্যা ছলনা? এই দেহের লোভে এই যে এত বড় নৃশংসতা করলে—এর পরও বলতে চাও যে তুমি বিনা স্বার্থে আমার তোমার সহোদরার আসনে ঠাঁই দিয়েছ? মিথ্যুক—তাই আজও যখন পুত্রশোকাতুরা জননী সন্তানের শব নিয়ে—যা হোয়ে তার প্রাণের নিধিকে বিসর্জ্জন দিতে এসেছে তখনও তোমার ওই স্নেহভরা কামনার চোখ দুটো থেকে কি বিশ্রী দৃষ্টিই না ফুটে বেরিয়ে আসছে? তুমি ঠগ, প্রবঞ্চক—মনে হচ্ছে

উত্তপ্ত লৌহশলাকা দিয়ে তোমার ওই কামনাতুর চোখ দুটোকে অন্ধ করে দিই! তামিনী-কাঞ্চনে যার এত আসক্তি, তার ওই সন্ন্যাসধর্ম নেওয়াই ভুল! তার চেয়ে ঘরে ফিরে গিয়ে সংসার ধর্ম করাই তার উপযুক্ত কাজ।

সন্ন্যাসী যুবা বললে: হ্যাঁ তুমি ঠিক বলেছ সর্ব্বাণী—সংসার ধর্ম আমি করতে পারি যদি তুমি আমার হও। আমায় যদি তুমি মনের অগোচরে একদিনের জন্যও ভাল-বেসে থাক—তবে তুমিই বল সর্ব্বাণী, এই প্রসারিত নীল সমুদ্রের সামনে—তাকে সাক্ষী রেখে। তা' যদি সত্য হয় তাহলে আমি আবার সন্ন্যাসীর বেশ ছেড়ে সংসার ধর্ম করতে একশোবার রাজী আছি। বল—হবে তুমি আমার?

সর্ব্বাণীর দুই গণ্ড বেয়ে অশ্রুর প্রবাহ বয়ে যাচ্ছিল। রাগে দুঃখে ব্যথায় তার অন্তর মনে যে দাবানলের সৃষ্টি হোচ্ছিল তাহাই যেন সশব্দে ফেটে গর্জ্জন করে উঠলো। সে অত্যধিক উত্তেজিত হয়ে বললে—তুমি দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে—তোমার সাহায্য আমি চাই না। তোমার সাহায্য চেয়ে আমি আমার নিজের সর্ব্বনাশ করেছি। নিজের পায়ে নিজেই কুঠার হেনে রক্তাক্ত করেছি। এখন সেই উত্তপ্তশোণিত ধারাই হৃদয়কে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। স্বামীহারা, পুত্রহারা আমি পাগলিনীর মত মৃত পুত্রের শব নিয়ে বসে বসে তোমারই সোহাগের বাণী এখনও শুনছি। এর চেয়ে পরিহাস আর কি হ'তে পারে? একজন নিঃসহায়া নারীর এর চেয়ে আর কি লাঞ্ছনা হ'তে পারে? আমি হতচকিতের মত বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সেই অর্দ্ধভগ্ন ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে সমস্তই উৎকর্ণ হয়ে শুনছি। সারা শরীর মন কেমন যেন রি রি করছিল তাদের এই কথাবার্ত্তায়। কি করব না করব কিছুটা ভেবে স্থির করতে পারছিলাম না। আর মনে মনে ভাবছিলাম—হে বিধাতা! এমন ঘটনাও ঘটে! বিচিত্র তোমার লীলাখেলা। হায়রে সংসার! তোমার ক্ষেত্রে কত প্রহেলিকাই না উৎপন্ন হচ্ছে। নইলে এমনও হয়! মানুষ পারে না এমন অসাধ্য কাজ বুঝি এ সংসারে কিছুই নাই। ছলনা, ক্রূরতা, পাপ, শঠতা, অধর্ম্ম, অন্যায়, ব্যভিচার—কি না করতে পারে মানুষ। অন্তর্যামীর কাছে কি এদের জবাবদিহি করবার কিছুই নাই। মানুষ হয়ে মানুষের উপর কেমন করে এই সব আচরণ করে বসল। হায়রে সভ্যযুগের মানুষ! এমন বর্ব্বর হিংস্র বন্যজন্তুর মত আচরণ কেমন করে করতে সাহস পেল মানবতা মনুষ্যত্বকে বিসর্জ্জন দিয়ে! এই কি সভ্যতা!

মনের চিন্তা মনেই রয়ে গেল। রুদ্ধ নিশ্বাসে আমায় শুনতে লাগলাম। ঘৃণায়, দুঃখে, আমার সর্ব্বশরীর কেমন জ্বালা করছিল—তবুও নিজেকে একেবারে সংযত করে নিলাম। যুবক সন্ন্যাসী বললে: সর্ব্বাণী অবশ্য বলতে পার আমি লম্পট, চরিত্রহীন! কিন্তু আমি যা বলছি এর বাড়া সত্য এ ভুবনে আর কেউ বলতে পারবে না। সর্ব্বাণী আমার পানে চেয়ে দেখ—এই নিশীথ রাত্রি, সম্মুখে মহাসমুদ্র! ঊর্দ্ধে নীল আকাশ, পিছনে শ্রীপুরুষোত্তম। যা বললাম এ সবই সত্য, সব বাস্তব। এই সত্যকে সাক্ষ্য রেখে বলছি—আমি তোমায় আমার এই বুকভরা হৃদয় দিয়ে মনেপ্রাণে সর্ব্বস্ব দিয়ে ভালবাসি—সে ভালবাসা ওই সমুদ্রের গভীরতার চেয়েও অতলস্পর্শী!

সর্ব্বাণী নিরুত্তর: সন্ন্যাসী যুবা বললে: সর্ব্বাণী এইমাত্র তুমি বললে না যে—মা হোয়ে সন্তানের শব কোলে নিয়ে বসে আছ। তাও সত্য। যে শিশু এতদিন ছিল তোমার, আজ সে নেই। মহাকালের কুটিল বিধানে সে চলে গেছে। তাকে ফিরে আর পাবে না। কিন্তু আবার তোমার শিশুসন্তান হবে, আবার তাদের কলহাস্যে বুকভরা বাৎসল্যের স্তন্যবন্যা অন্তরে বইবে। তাদের আনন্দময় মুখের পানে চেয়ে ভুলে যাবে এই শিশুকে। এই তো কালের নিয়ম। তবে অযথা শোক বাড়িয়ে, আমাকে ভিক্ত ভর্ৎসনা করে তোমার কোনই লাভ নাই, বরং প্রকৃতির রূপে রসে গন্ধে ভরে গিয়ে সব শোক পরিত্যাগ করে চল আমরা দু'টিতে নতুন করে সুখের নীড় রচনা করে প্রকৃতির বিধানকে মেনে নিই! স্নেহ, মায়া, দয়া ও সব কিছুই নয়—ওগুলো মানসিক বৃত্তি মাত্র, যত আঁকড়ে ধরবে ততই ব্যথা পাবে। সর্ব্বাণী, তার সাক্ষী ওই শ্রীপুরুষোত্তমের মন্দিরের ধ্বজার গায়ে লিখা হ'য়ে গেছে। যা সত্য সুন্দর তারই অনন্ত উপমা যুগ যুগ ধরে গোঁথাই করা হয়ে গেছে প্রতি জীবের অন্তরে অন্তরে।

সর্ব্বাণী স্নেহের সঙ্গে বললে—কি সুন্দর অভিনয়! তুমি সন্ন্যাসী হতে গেলে কেন? কোন মঞ্চে গিয়ে অভিনয় করলে যথেষ্ট পশার হোত, নামও হোত। কিছুক্ষণ কি ভেবে বললে: তোমার ওই সব ছলনাময় কথাগুলো আমার বিষ লাগছে। স্বামী যার নিরুদ্দেশ, পুত্র যার অন্তিম শয্যায় শায়িত, আর সেই ক্ষণে তোমার ভালবাসার উপদেশ-গুলো বড় মধুর লাগছে, না? চলে যাও তুমি আমার চোখের সামনে থেকে? মুখ দেখলেও পাপ হয়! যে গুরুর তুমি শিষ্য, সেই গুরুও নরকগামী হয় তোমার মত শিষ্যের আচরণে।

সন্ন্যাসী যুবা বিকটভাবে হেসে উঠলো—তার হাসির রেশ সেই নৈশনিথর আঁধার ভেদ করে যেন ছুটোছুটি করতে লাগলো। তারপর সে পুনশ্চ বললে: সর্ব্বাণী বুঝে দেখ, এ সবই ভুল! অনিত্য মায়াময় সংসারে তুমি, আমি, তোমার কোলের ওই মৃত শিশু—এই স্থাবর চরাচর, এ সবই মরীচিকার মতন চিক্‌চিক্ করছে—শুধু এরা মায়ার আলো নিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। এসব তুচ্ছ, তোমারও আপনার কেউ নয়—আমারও না। এ সংসারে এগুলো প্রহেলিকা বিশেষ। তবে মিথ্যে ও সমস্ত তার বয়ে বেড়ানোর অর্থ কি? তার চেয়ে এস—আমি পুরুষ, তুমি প্রকৃতি। প্রকৃতি পুরুষের মধুর প্রণয় লীলা-খেলায় আমরাও ভেসে যাই—এই দোদুল্যমান সাগর লহরীর মত বিশ্ব হতে বিশ্বান্তরে। এই তো বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্টির পরি-পূর্ণ জীবন সৃষ্টির লীলা।

সর্ব্বাণীর কোন সাড়া নেই—সে একদৃষ্টে সুদূর নীলা-কাশের পানে চেয়ে অশ্রুর ধারায় অঙ্গ বর্ষণ করছে। সন্ন্যাসী যুবা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে মৃদুমৃদু হেসে বললে: ভাবো, ভেবে দেখ,—যে প্রকৃতি হোতে জড়রূপী এই দুর্দ্দান্ত পুরুষের হোল সৃষ্টি, সেই দুরন্ত পুরুষই শেষে ওই প্রকৃতিকেই করে রেখেছে তার লীলার অনুগামিনী। বীজ হতে বৃক্ষ, কি বৃক্ষ হতে বীজ, কিম্বা বৃক্ষ হতে ফল—সে যাই হোক, তারা যুগ যুগ ধরে এমন ভাবেই সৃষ্টি হয়ে আসছে—সৃষ্টি করেই চলেছে। কে তার হিসাব রাখে! কত ফল পড়লো, কত শুখালো কতই বা অঙ্কুরিত হোল—হওয়াই তাদের কাজ, তারা দিয়েই চলেছে। সর্ব্বাণী—হিসেব তারা রাখে না, তাই শোক দুঃখ তারা পায় না। কারণ তাদের সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য এসব দুঃখ শোক তাদের তাই নাই। সর্ব্বাণী নিশ্চল প্রস্তর প্রতিমার মত বসে রইল, একটি জবাবও দিল না। খালি তার দুটি চক্ষু দিয়ে অনর্গল জলের ধারা ঝরে ঝরে পড়ে বুক ভিজিয়ে দিচ্ছিল।

সন্ন্যাসী যুবক পুনশ্চ বললে: সর্ব্বাণী, কথার উত্তর দিচ্ছ না যে? ভেবে দেব—তুমি আমার কথায় সম্মত কি না? তুমি হয় তো বলতে পার অনেক কিছু—কিন্তু যা সত্য তাই বললাম। যা বলবার এখনই তাড়াতাড়ি বলে ফেলো—কারণ আমার আর অধিকক্ষণ এখানে থাকবার সময় হবে না।—কি সাড়া দিচ্ছ না যে?

সর্ব্বাণী রুক্ষস্বরে বললে: বারে বারে একই কথা বলে বলে আর জ্বালাস্ নে বাপু!

সন্ন্যাসী যুবক তার কথায় বাধা দিয়ে বললে: জ্বালাস্ নে আমি করছি না। শুধু আর একটা কথা তোমায় বলতে চাই, ওই যে দেখছো সাক্ষী গোপাল দাঁড়িয়ে রয়েছে! ও কত কালের—কে ওকে নির্ম্মাণ করেছিল, কেই বা ওর নাম দিয়ে ছিল, তার কথা কেউ জানে না। তবুও এখনও মহাকালের সাক্ষীরূপে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে যুগ যুগ ধরে দেখাবার এই বাস্তব সংসারের সাক্ষী হয়ে, মূক হয়ে বসে আছে। ও হয়তো জানে কেমন করে এই সুন্দর পৃথিবী তিলে তিলে তিলোত্তমার মত গড়ে উঠলো। ও সব জানে, কিন্তু কিছু বলে না—কারণ ওযে গোপাল অতি শিশু, মুখ দিয়ে বা ফোটেনি—কিন্তু ও প্রকারান্তরে না বললেও জ্ঞান-চক্ষু দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে—ওর মহিমাময় নতুনরূপ পরিগ্রহ করে। সে রূপ ওই ত্রিনেত্রধর। যিনি সৃষ্টি স্থিতি লয়-কারক—এই সংসারের ত্রিজগৎ অধিকর্ত্তা—তাঁর রাজাধিরাজ মহিমাময় মূর্ত্তি নিয়ে ভুবনেশ্বর রূপে। নিত্য ত্রিসংসারের প্রণাম নিচ্ছে। কিন্তু ওখানেই তাঁর লীলার শেষ নয়। তাই এই শ্রীপুরুষোত্তম রূপে এই মহাসমুদ্রের তীরে তাঁর এমন অভিসার। ওই যে বিরাট মন্দিরের মধ্যে তিনটা মূর্ত্তি দেখছো ও মূর্ত্তি আর কিছুই নয়—ও প্রেম, ত্যাগ, আর তিতিক্ষা। আবার একদিকে নানান্ ভিন্নার্থ অর্থ ধরে নেওয়া যায়। প্রেম, বিবেক, জ্ঞান, সত্য মিথ্যা, সব কিছুর মিলনক্ষেত্র—এই শ্রীক্ষেত্র! প্রেমে মুক্তি, ধর্ম্মে মুক্তি, সব কিছু আবরণে মুক্তি—। বুঝে দেখ সর্ব্বাণী আমি যা বললাম সব কিছুকেই বুঝে দেখ। তবে হ্যাঁ—আর আমার

হিসেব করবার সময় নেই। তুমি শুধু চাও—কিম্বা না—এই দুটোর মধ্যে একটা আমায় জানিয়ে দাও—

সর্ব্বাণী এতক্ষণ পরে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে: তোমাকে আমি কতবার বলব? আমি তোমার কাছে জোড় হাত করে বলে যাচ্ছি—তুমি এখান থেকে চলে যাও—তোমার কথা শুনে শুনে আমার কান পচে গেল। যে অকৃতজ্ঞ কামাতুর ধর্ম্মের নাম নিয়ে সন্ন্যাসীর ষোলস পরে একজন নিঃসহায়া বিবাহিতা তরুণীর ধর্ম্মনষ্ট করবার কামনায় মত্ত—তার মুখে ওসব কথা শোভা পায় না। যাও—যাও—দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে—নইলে চীৎকার করে লোক জড়ো করব। পুলিশ ডেকে ওই ছদ্মবেশ উন্মুক্ত করে দেব। শুধু তাই নয়—এতক্ষণ যে পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিনি—সেই টাই তোমার পরম সৌভাগ্য—যাও? আর এক তিল এখানে তোমার থাকবার দরকার নেই—

ভুয়া সন্ন্যাসী বললে: মুখে তার মৃদু হাসি—সর্ব্বাণী তবে তাই হোক, আমি চল্লাম। হাঁ যাবার আগে আর একটা কথা তোমায় বলে যাই—আজ তুমি পুত্র হারিয়েছ, আমিও স্বেচ্ছায় তোমার ভার নিতে চেয়েছিলাম—আজ তাও হারালে। আর পুলিশ ডেকে আনলে তোমার পক্ষে বিশেষ সুবিধে হবে বলে মনে করলে সেটা ভুলই হবে—এবং সেজে তোমার নিজের জালে পড়ে নিজেকেই পস্তাতে হোত। যাই হোক, কিন্তু বলে যাচ্ছি একদিন আমার জন্যে তোমায় দুঃখ পেতে হবে—সেদিন কিন্তু এই লম্পট স্বেচ্ছাচারী সন্ন্যাসীর জন্য তোমার ওই অনিন্দ্যসুন্দর দেহ শ্রীযৌবন রূপযৌবন অকাতরে সন্তাদরেই বিকিয়ে দেবার জন্য আমারই পায়ের কাছে বসে অশ্রু বিসর্জ্জন করতে হবে।

এই বলে ভুয়া সন্ন্যাসী হনহন করে চক্ষের নিমিষে সেই গভীর আঁধারে মিশে গেল। সর্ব্বাণী সেই গমনপথ লক্ষ্য করে স্থির হয়ে খানিকটা সময় নিঃশব্দে বসে রইল।

রাত্রি বেড়ে চলেছে—জনহীন সমুদ্র তীর আর ওই দুরন্ত সমুদ্রের গা-ঘাঁষাঘাঁষি। শীতল হিমেল হাওয়ায় ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপুনি ধরে গেল এরপর কি করি না করি কিছুই ঠাহর পেলাম না। আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল নিজেকে প্রকৃতিস্থ করতে।

দেখলাম, সর্ব্বাণী একলা তারাভরা নীল আকাশের পানে নির্ব্বাক নিষ্পন্দ হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আর তার ভিতরের দুরন্ত-ঘরে রুদ্ধ ব্যথা-বেদনার কোন একটা জলন্ত বস্তু কুণ্ডলী পাকিয়ে ফেটে চিরে বেরিয়ে আসবার জন্য আলুপালু করছে। দ্বন্দ্ব-সংশয়-দ্বিধাসংকোচহীন যেন স্থবির স্থাণুর মত অর্দ্ধ অচেতন হয়ে বসে আছে।

তার এই অবস্থায় আমি হঠাৎ ওর কাছে প্রকাশ হব কিনা তাই চিন্তা করতে লাগলাম।

হঠাৎ কতকগুলো পথচারী কুকুরের বিকট চীৎকারে তার সত্তা যেন ফিরে এল। চমকে উঠে মৃত শিশুকে নিষ্পলক নেত্রে বারবার দেখতে লাগল—তারপর হঠাৎ গভীর আর্ত্তনাদ করে কেঁদে উঠলো।

আর স্থির থাকা চলে না ভেবে তার কাছে এগিয়ে গেলাম। আমাকে সেই আধা-আলো আধা-আঁধারে ঠিক মত ঠাওর করতে না পেরে প্রথমে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। রুদ্ধ কান্নাভাঙ্গা গলায় বললে,—আবার···আবার কেন এলে তুমি? নারীর এই দেহের প্রলোভন কি এতই মোহের! আমি দেব না তোমাকে এই দেহ কলুষিত করতে। তা' করবার পূর্ব্বেই এই মরা ছেলেকে বুকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বো ওই জলে। পারবে না তুমি নাগাল ধরতে। তোমার মত নরপিশাচের বিলাসের সামগ্রী হবার আগেই এই দেহের বিনাশ হোয়ে যাবে। নিরুদ্দিষ্ট স্বামী যদি কখনও ফিরে আসে তো এসে দেখবে, তার সাধের সংসারে বাধা দিতে আর কেউ নেই—বলেই সে তার মৃত শিশুকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে উঠে ছুটে পালাবার জন্য ব্যস্ত-ব্যাকুল হোয়ে উঠলো।

আমি তখন সকল সঙ্কোচ কাটিয়ে হুরন্তকে শক্ত করে তার একেবারে মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালাম এবং অতি মৃদুস্বরে ভাবে বললাম—বোন তোমার কোন ভয় নাই—আমি সন্ন্যাসী নই। অতি সাধারণ একজন পথচারী পথিক মাত্র। যেতে যেতে তোমাদের সকল কিছু শুনে এবং দেখেই তোমার এমন বিপদে সাহায্যের জন্য এলাম। যদি তোমার বিশ্বাস হয় তাহলে এই ভাইয়ের উপর নির্ভর করতে পার।

সর্ব্বাণী হাঃ হাঃ করে এক বিকৃত ভাবে হেসে উঠলো। একি? উন্মাদের পূর্ব্ব লক্ষণ এ যে। আমাকে আর কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়েই বললে: ভাই নেই—

ভরসাও নেই, বিশ্বাসও নেই, আর নির্ভর করবার ক্ষমতাও নেই—এই বলে আবার হাঃ হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলো।

আমি যতদূর পারি তাকে সান্ত্বনা দেবার আশায় বললাম : তোমাদের সব কথাই তো আমি শুনেছি। তাই স্বেচ্ছায় এসেছি তোমার যদি কোন উপকারে লাগতে পারি—বড় ভাইয়ের উপর যদি একান্ত বিশ্বাস করতে পার তাহলে তোমার এই বিপদে সাহায্য করতে আমি প্রস্তুত। আর বিশ্বাস ও নির্ভরের কথা বললে না?—তা' মানুষ মানুষকেই বিশ্বাস করে থাকে। আর সব মানুষই যে এক ছাঁচে গড়া হবে তাও তো নয় দিদি।

সর্ব্বাণী আমার কথা শুনে—আমার মুখের পানে খানিকক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলো, তারপর বললে : বিশ্বাস আর করতে ইচ্ছা হয়না—ওই তো একজনকে বিশ্বাস করেছিলুম! কি হোল? উল্টে আমারই এমন সর্ব্বনাশ করে বসলো!

আমি বললাম : সংসারে মানুষ ও অমানুষ দুই-ই আছে। শুধু চিনে নেবার দৃষ্টি চাই—বোন্—তোমার চিনতে ভুল হয়েছে। তাই এমন দুঃখ পেলে।

সর্ব্বাণী বললে : ঠিকই বলেছেন আপনি। আমি চিনতে ভুল করেছি। আর কি করেই বা বুঝবো বলুন—হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই—স্বামী কোথায় যে চলে গেলেন টের পেলাম না। একলা এই কচি শিশুকে নিয়ে কি যে আতান্তরে পড়ে গেলাম তা ভগবানই জানেন। উনি আসতেন পাশের ঘরে—সবাই ওঁকে সন্ন্যাসী বাবা বলে ডাকে—ভালোবাসে। আমি ছাই অতশত কি জানি—তাই সন্ন্যাসী মানুষ—এই বিপদে পড়ে একটু সাহায্য চেয়েছিলুম। কিন্তু তার মধ্যে যে এত ফের লুকিয়ে আছে তা জানবো কেমন করে?

আমি বললাম : কতদিন ওর সাথে এমন দহরম্ মহরম্ হয়েছে?

সর্ব্বাণী বললে : বেশী দিন নয়! মাস দিন কুড়ি হবে। আমার স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হবার পর। বিপাকে পড়ে ওঁর সাহায্য চেয়েছিলাম প্রথমে কোন আশ্রমে থাকবার আশায়—তারপর হঠাৎ একদিন এই ছেলের জ্বর—জ্বর আর সারলো না—

আমি বললাম : সব বুঝেছি। সর্ব্বাণীর নয়নের জমাট অশ্রু আবার গলে গলে পড়তে লাগলো। আমি স্নেহের সুরে বললাম : এখানে আর এরূপ ভাবে বসে বসে অধিক রাত্রি বাড়িয়ে কি লাভ। তার চাইতে কর্ত্তব্য কাজ শেষ করে যত শীঘ্র পারি তোমায় তোমার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসি চল। তারপর কাঠ এনে চিতা সাজিয়ে দু'জনে ধরাধরি করে সবে চিতায় শুইয়েছি এমন সময় সেই নিবিড় আঁধার ভেদ করে সহসা একজন আজানুলম্বিত দীর্ঘ-জটাজুটধারী সন্ন্যাসী এসে সেই স্থানে উপস্থিত হোলেন। বদনে একটা দীপ্তির ঝলক, মুখে মৃদু হাসি।

তাঁর এই আকস্মিক আগমনে আমরা দু'জনে পলকের মধ্যে হতচেকিতের মত আবিষ্ট হ'য়ে গেলাম। অন্ধকারে তাঁর চোখ দু'টো চক্‌চক করে জ্বলছিল—তিনি বললেন : তিষ্ঠ।

এই বলেই তিনি সেই মৃত শিশুকে হঠাৎ আপন ক্রোড়ে উঠিয়ে নিয়ে বললেন : আমার অনুসরণ কর।

আমরা দু'জনে দুজনের মুখ চাওয়া-চায়ি করে যন্ত্র চালিতের মত তাঁর অনুসরণ করলাম। কিছুক্ষণের জন্য যেন হতবুদ্ধি, হতভম্ব হোয়ে গিয়ে মুখ দিয়ে কোন কথা সরছিল না।

সন্ন্যাসী অতি দ্রুত সমুদ্র তীর ধরে অন্ধকারে প্রেতের মত এগিয়ে চলছিলেন। আমরা তাঁর নাগাল ধরে উঠতে পারছিলাম না। এক রকম ছুটতে ছুটতেই চলছিলাম। কিন্তু মনের মধ্যে একটা তীব্র বিস্ময় অনুভব করছিলাম। এ আবার কি আর এক ঘটনার জালে জড়িয়ে পড়তে চলেছি। অথচ সন্ন্যাসীর যে গতিরোধ করব—সে সাহসও তখন হচ্ছিল না। ঘটনার পর ঘটনার জাল বিস্তারই করে চলেছে। কোন কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

সমুদ্র তীর ধরে প্রায় আধ ঘণ্টা চলার পর একটি ছোট্ট আশ্রমের মধ্যে এসে প্রবিষ্ট হলাম। অন্ধকারে যদিও বিশেষ কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, তবুও আবছা আলো-আঁধারে আশ্রমের সম্মুখ ভাগটা বেশ পরিপাটি করে সাজান বলেই মনে হোল।

সেই আশ্রমে প্রবিষ্ট হয়েই সন্ন্যাসী আমাদের সঙ্গে কথা কইলেন। পাশে একটা ছোট জীর্ণ ঘর দেখিয়ে বললেন : তোমরা এইখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো আমি এখনি

আসছি। আমাদের কোন কথা শুনবার আগেই তিনি ভিতরের দিকে চলে গেলেন।

আমরা সেই স্থানে বসে উৎকণ্ঠার উপর উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে নানান্ দুশ্চিন্তার ভারে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বসে রইলাম। সর্ব্বাণী আমার মুখের পানে তাকিয়ে ভয়াতুর কণ্ঠে বললে: খোকাকে নিয়ে কোথায় গেল—তার কণ্ঠদিয়ে আর কথা বের হচ্ছিল না। খালি নীরবে উদ্গত অশ্রু ঝরে ঝরে বক্ষ সিক্ত করে তুলছিল।

এতক্ষণ আমি যেন একটা আবেশের মধ্যে ডুবে ছিলাম। এতক্ষণে তা কাটিয়ে উঠে নিজেকে দৃঢ় করে নিলাম এবং সর্ব্বাণীকে বললাম: ভয় কি বোন্—কোন ভয় নেই—আমি যখন সঙ্গে আছি তখন যা হয় কিছু একটা বিলি ব্যবস্থা হবেই। তোমাকে যখন ছোট বোনের মত দেখেছি, তখন তোমার জন্যে যতদূর যা করতে হয় সবই করব। সন্ন্যাসী না আসা পর্য্যন্ত একটু ধৈর্য্য ধরে থাকতেই হবে।

সম্মুখে ঊর্ম্মিমুখর মহাসমুদ্র তার বিরাট অভিমানের বোঝা নিয়ে যেন নিজের বক্ষে নিজেই করাঘাত করছে। নিশীথ রাত্রির সমস্ত নীরবতাকে ব্যঙ্গ করে যেন শাসাচ্ছে। যেন এখুনি সমস্ত নীরবতাকে দীর্ণ বিদীর্ণ করে ফেলে প্রতিশোধ নিতে চায়।

মনে মনে চিন্তা করছিলাম। হায় রে বিচিত্র সংসার। কে তোমাকে এমনি করে সৃষ্টি করেছিল! সৃষ্টির প্রথম উষাকালে স্রষ্টা বোধকরি অন্য কিছু গড়তে গড়তে অন্যমনস্কে ভুল করে তোমায় এমনি ভাবে গড়ে ফেলেছিল। তা না হলে, এই বিপুল বিরাট সংসারে এমনিধারা কত শত শত অঘটন সংঘটন হয় কিরূপে?

কতক্ষণ যে সেই জীর্ণ নীরব আঁধার-ভরা ঘরে বসে বসে আকাশ পাতাল চিন্তায় মগ্ন ছিলাম জানি না—হঠাৎ একটা পেচকের কর্কশ ডাকে সম্বিৎ ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সন্ন্যাসীর ডাকে হঠাৎ হতচকিত হয়ে উঠলাম—সমস্ত চিন্তারাশি যেন ছিঁড়ে-খুঁড়ে কেমন এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে গেল।

সন্ন্যাসী অতি কোমল কণ্ঠে সর্ব্বাণীকে সম্বোধন করে বললেন: কিরে বেটী, অত কাঁদছিস্ কেন? খুব ভয় পেয়েছিস্ না—

সর্ব্বাণী থতমত খেয়ে প্রথমে কিছুই উত্তর দিতে পারলে না। শুধু কেমন এক প্রকার দৃষ্টি দিয়ে সন্ন্যাসীর পানে তাকিয়ে রইল।

সন্ন্যাসী অতি কোমল স্নেহ মাখান কণ্ঠে মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বললেন: ভয় কি মা—

সর্ব্বাণীর এতক্ষণে মুখ দিয়ে কথা বের হোল—বললে: আমার খোকা—আমার খোকাকে কোথায় রেখে এলেন—

সন্ন্যাসী বললেন: তোর খোকা—

সর্ব্বাণী তার কথার উপর কথা দিয়ে বললে: হ্যাঁ, আমার খোকা—আমার অসীত—

তোর খোকা তো মৃত—তাকে নিয়ে আর কি করবি বল? বরং আমার কাছেই থাক—আমার প্রয়োজনে লাগবে।

আমি তাঁর এই কথা শুনে এক রকম আঁৎকে উঠলাম। মনে মনে ভাবলাম যে এক জাতীয় কাপালিক আছে তারা শব সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করে থাকে। তাহলে কি আমরা তাদি খপ্পরে পড়লুম নাকি? যাই হোক সেই ভেবে বললাম—দেখুন—

আমার কথায় বাধা দিয়ে সন্ন্যাসী বললেন—বাবাজী, তোমার মনের কথা আমি বুঝেছি। কিন্তু ওসব যা ভাবছ—তা আমি মোটেই নয়। তবে যে মৃত—তাকে তো আর ফিরে পাওয়া যায় না—সে তোমাদেরও এখন কেউ নয়—আমারও নয়। তাই তাকে মা'র পাদপদ্মে তুলে দিয়েছি। এখন মার যা ইচ্ছা—

আমি একটু উত্তেজিত হয়েই বললাম। মার যা ইচ্ছে মা করুন, আপনি আমাদের শব ফিরিয়ে দিন।

সন্ন্যাসী আমার কথায় হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, পাগল আর কাকে বলে! তারপর সর্ব্বাণীর পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন: কি রে বেটী, তোর মৃত শিশুকে ফিরিয়ে নিতে চাস্—

সর্ব্বাণী বললে: হ্যাঁ বাবা—আবার তার কথায় বাধা দিয়ে সন্ন্যাসী বললেন: তবে আয় তোরা আমার সঙ্গে। আমরা তাঁর অনুসরণ করলাম।

খানিকটা এঁকেবেঁকে বাগীর চত্বর পেরিয়ে যেখানে এসে পৌঁছলাম সেখানটা ঘন গাছ-গাছালিতরা স্থান। যেন বৃক্ষলতা গুল্মাদি দিয়ে কে যেন নিপুণভাবে একটি ঘর

ভাদ্রের রৌদ্র

पक्षी

তৈরী করে রেখেছে। সেই ঘরের মধ্যে কুহেলীভরা ঘন আঁধারের মধ্যে প্রথমে কিছুই ঠাহর করা গেল না।

সন্ন্যাসী কহিলেন: বড্ড ভয় ভয় লাগছে না মা—আর একটু—আমরা এসে গেছি—

আমি বললাম: এ আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন কিছুই বুঝতে পারছি না—

আমার কথায় বাধা দিয়ে সন্ন্যাসী বললেন: অবিশ্বাস কোরো না—আমি যেখায় নিয়ে যাচ্ছি, সে অতি পবিত্র এবং মনোরম স্থান—বিশ্বাস কর—বিশ্বাসই মানুষের সর্ব্ব সত্য সার—বিশ্বাস ছাড়া কোন কাজ কি হোয়েছে সংসারে বাবা?

আমি বললাম: কিন্তু বিশ্বাস করেও তো মানুষ ঠকে—

সন্ন্যাসী বললেন: তা' ঠকুক—তবুও বিশ্বাসের মূলেই সব—বিশ্বাসের ওপরই নির্ভর করে চলছে মানুষ যুগ যুগ ধরে—

যেতে যেতে আমরা সেই লতাগুল্ম পরিবেষ্টিত স্থান অতিক্রম করে একটি কুটীরের দ্বারে এসে পৌঁছলাম। ভিতর থেকে দ্বার রুদ্ধ ছিল। সন্ন্যাসী মৃদু আঘাত করতেই দ্বার খুলে গেল। ভিতরে প্রবেশ করলাম।

বাহিরের এই বিস্তৃতস্থানের এত জমাট অন্ধকার যা ঢেকে রেখেছিল, ঘরের মধ্যে দীপ্তিমুখর 'হ্যারাক' আলোর সেই বিপুল আঁধারকে গ্রাস করে চারিধারে তার রশ্মি ছড়িয়ে দিচ্ছিল। আঁধারে আঁধারে কেমন মোহাচ্ছন্ন হোয়ে গিয়েছিলাম। অ্যাকাশে হ্যারাকের আলোকে সেই ভাব কেটে গিয়েছিল। তারপর সামনেই চেয়ে দেখি, একটা কম্বলের উপর সর্ব্বাণীর খোকা—গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তার বুকের পাঁজরগুলো থেকে নিঃশ্বাসগুলো ওঠা-নামা করছে। বিস্ময়ে হতবাক হোয়ে গেলাম—মৃতের শরীরে প্রাণ স্পন্দনের লক্ষণ দেখে। এ কি কোরে হোল? এ যে অবিশ্বাস্য। আমার সমস্ত দেহটা বিটপি লতার মত হঠাৎ থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

আমার অবস্থা যখন এই প্রকার, তখন সর্ব্বাণীর অবস্থা আরও একধাপ উপরে। সর্ব্বাণীর তখন কোন হুঁস্ ছিল না। সাশ্চর্য্যে চেয়ে চেয়ে কি যেন দেখতে লাগলো এক-দৃষ্টে—তার নয়নের জমাট অশ্রু চক্‌চক করে চলচল হয়ে যেন বের হয়ে আসতে চায়, অথচ না হাসি—না কান্না এ এক বিষম অবস্থা তার।

এই পরিবেশকে হাল্কা করে সন্ন্যাসী মৃদুস্বরে কাঠ বললেন: কইরে বেটী, এতক্ষণ যে অস্থির হচ্ছিলি খোকা, খোকা করে—ওই তো শুয়ে আছে তোর খোকা। নিয়ে যা—

সন্ন্যাসীর ডাকে সর্ব্বাণীর চমক ভেঙ্গে গেল, সে উন্মাদিনীর মত ছুটে গিয়ে তার খোকাকে কোলে তুলে নিলো। অসিতের ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং সে তার মাকে জাপটে ধরে মা মা বলে সর্ব্বাণীর বুকে মুখ লুকালো। তারপর সেই সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে গিয়ে প্রণাম করে সর্ব্বাণী বললে: বাবা, এ যে এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। মা-র মৃত শিশু কেমন করে বেঁচে উঠলো?

সন্ন্যাসী স্মিতহাস্যে বললেন—সবই মায়ের ইচ্ছায়—

সর্ব্বাণী বললে: মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার—এ যে অবিশ্বাস্য—অবিশ্বাস্য: আপনি বাবা নিশ্চয়ই দেবতা—অভাগিনীর কাতর প্রার্থনায় বিচলিত হয়ে তার সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিতে স্বর্গ থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। ছলনা ছেড়ে আমাকে আপনার সেই দেবতার পূর্ণরূপ দেখান।

সন্ন্যাসী সর্ব্বাণীর হাত ধরে তুলতে তুলতে বললেন: মা আমি দেবতা নয়, আর এখন কিছু নয়—সামান্য রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ! সে যাক—এখন তুই আমাকে কি দিবি বল? আমি তো তোর ছেলেকে ফিরিয়ে দিলুম—

সর্ব্বাণী বললে: আমার কি আছে বাবা যে দোব—কাঙ্গালিনী আমি পুত্র হারিয়েছিলাম, এখন স্বামী হারা—আমার এই বুক ভেঙ্গে গেছে আঘাতে আঘাতে—ধন-রত্নও তেমন কিছু নেই যে—

সন্ন্যাসী বললেন: ধন রত্ন ওসবের প্রত্যাশী নই—

সর্ব্বাণী বললে: তবে তো আর কিছুই নেই বাবা—হ্যাঁ তবে আছে আমার এই দেহটা—দেহটা দিয়ে যদি আপনার আশ্রমের কোন কাজ করতে হয় তা আমি তাতে সম্মত আছি। যদি তাতেও না হয়, যদি এই দেহটাই সবাইকে আকর্ষণ করে তাহলে আমার সন্তানের বিনিময়ে তাই দোব।

সন্ন্যাসী জিভ কেটে বললে: ছিঃ ছিঃ ছি। বলে কর্ণে অঙ্গুলি দিয়ে বললেন: ও কথা শোনাও পাপ! যে

মা ঐ ওখানে পূজা পাচ্ছে,সেই তুই আমার সম্মুখে জীবন্ত! ও কি কথা মা তোর—

সর্ব্বাণী বললে: তাহলে আর তো কিছুই নাই বাবা—

সন্ন্যাসী বললে: আছে রে বেটী, আছে। তোর যা আছে ওই হৃদয়ভরা ভাণ্ডারে, তা আর এ সংসারে বুঝি কারু নেই!

সর্ব্বাণী বললে: এমন কি জিনিষ আছে বাবা—আমার তো কিছুই মনে হচ্ছে না।

সন্ন্যাসী বললেন: আছে তোর সর্ব্ব অন্তঃকরণ জুড়ে মা মধুর সেই মাতৃত্ব। আর আছে অপূর্ব্ব সতীত্ব। যে সতীত্ব মাপ করা যায় না—আমি মুগ্ধ হোয়েছি। যে এখন এই কলিযুগে এমন নারীত্ব আর স্বামী-প্রেমানুরাগিণী বিরল। আমি আশীর্ব্বাদ করি, স্বধর্ম্মে মতি রেখে সতীত্ব গৌরবে সর্ব্বাণী হয়ে মাতৃস্নেহে বিগলিত হয়ে সংসারে অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে যাবি। সার্থকতায় ভরা প্রাণে জগতের কল্যাণ সাধন করবি। তারপর কিছুক্ষণ কি ভেবে বললেন: তোরা চল্ মার কাছে, ওখানেই সব হবে।

আমরা পূজার ঘরের মধ্যে গিয়ে তো একেবারে 'থ' হয়ে গেলাম। বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে দেখলাম—সুমুখে এক চিন্ময়কালীমূর্ত্তি। সে মূর্ত্তির যেন তুলনা হয় না, অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় যেন সদা জাগ্রতা দেবী আমাদের সুমুখে সকল অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। যেন তাঁর সারা অঙ্গ বয়ে আলোর নীল তরঙ্গমালা খেলা করছে—যেন চোখের পলক নড়ছে, মুখে চিরমধুর কি অপূর্ব্ব স্নেহসিক্ত হাসি যেন সুধা ঝরে ঝরে পড়ছে। পলক সঞ্চারে মনে হয় বুঝি বা পলকে চলে যাবেন—আর হয় ত সে রূপ দেখা যাবে না। শুধু কি তাই—কখনও সে রূপমাধুরী শ্যামরূপে, কখন রাধারূপে, কখন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণরূপে, কখন বা মহারুদ্র মহাদেবরূপে ক্ষণে ক্ষণে যেন পরিবর্ত্তন হচ্ছে—যেন একের মধ্যেও বহু—বহুর মধ্যে এক। দুই দিকে দীপাধারে দুইটি প্রদীপ জ্বলছে। আমোদিত পুষ্প ধূপ ধুনা গন্ধে এবং তার ভিতর একটা স্বর্গীয় সুগন্ধে সেই স্থান পূর্ণ করে রেখেছে। যেন স্বপ্ন দেখছি। মনে মনে ভাবলাম—কত জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতির বলে এমন মূর্ত্তির দর্শন লাভ করে হৃদয় মন সার্থকতায় ভরে গেল। সমস্ত দেহের মধ্য দিয়ে যেন একটা বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল। নতজানু হোয়ে সেই সর্ব্বসন্তাপহারিণী মার চরণতলে লুটিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ যে এমনিভাবে ছিলাম জানি না—যখন জ্ঞান ফিরে এল—দেখি সন্ন্যাসী আমার মাথার মুখে জলের ছিটে দিচ্ছেন। আর সর্ব্বাণী তার ছেলেকে পাশে শুইয়ে রেখে পাখার বাতাস করছে। তার মুখে একটা কেমন উৎকণ্ঠার ভাব জেগে আছে।

আমি উঠে বসলাম, চোখটা রগড়ে চেয়ে দেখি, পূর্ব্বকার সেই যুবা সন্ন্যাসী হাসতে হাসতে এসে সর্ব্বাণীর সামনে দাঁড়ালো। তাকে দেখেই সর্ব্বাণী অন্ধকারে ভূত দেখার মত শিউরে উঠে বললে: এখানেও তুমি? মূর্ত্তিমান প্রেতের ছায়ার মত এসে হাজির হয়েছ?

তখন সেই যুবা সন্ন্যাসী হাসতে হাসতে এসে বললে: কায়া যথা, ছায়া তথা—কান টানলেই যখন মাথা আসে তখন আমি না এসে কি থাকতে পারি? আর ওই ত গুরুদেব তোমার আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁরই কাছে বলছি—সর্ব্বাণী এখনও বুঝে দেখ—জীবনকে সার্থক করে তুলতে হলে নির্ভরতা চাই। আর তোমার স্বামী থেকেও যখন নাই—তখন আমার কাছেই আত্মনিবেদন করে তোমার ওই রূপ যৌবনকে ডালি দেওয়াই ঠিক নয় কি? আমি এখনও বলছি তোমায়—আমি সুখী করব আমার মন প্রাণ তনু দিয়ে। গুরুদেবকেই জিজ্ঞাসা করনা এতে কোনই দোষ হবে না—

তার কথায় বাধা দিয়ে সন্ন্যাসী সর্ব্বাণীকে উদ্দেশ করে বললেন: হাঁা, মা তুমি কি রঙ্গনকে চেন না কি?

সর্ব্বাণী তীক্ষ্ণ কটাক্ষে উত্তেজিত স্বরে বললে: চিনি বই কি বাবা—বিলক্ষণ চিনি? আমার এত বড়—

তার কথায় বাধা দিয়ে নিজের দুই অস্ত্র-শুদ্ধগুলোকে মুখ থেকে খুলে টান মেরে ফেলতে ফেলতে বললে: এবার বোধহয় আরও ভাল করে চিনতে পারবে, কেমন না সর্ব্বাণী—

এতক্ষণ কেমন যেন এই এক অজানা ঘটনা স্রোতের মধ্যে দিয়ে অভিভূতের মত চলছিলাম—এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে আসতেই দেখলাম—সর্ব্বাণী সেই পূর্ব্বপরিচিত

সন্ন্যাসী যুবার (অবশ্য এখন আর নয়) পদপ্রান্তে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, আর সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

হঠাৎ একি ঘটে গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না। কি জানি কেন আমার যেন মনে হোল—আমার অন্তর্যামী বুঝি অলক্ষ্যে থেকে কি এক অজানা পরিণতির জন্য হেসে হেসে উঠছিল। মনে মনে তাই ভাবছিলাম, আজ আমার ভাগ্য-বিধাতা এই বিড়ম্বিত জীবনের উপর দিয়ে একি খেলা খেলে গেল। এর কার্য্যকারণসূত্র সবই যেন ছকে আঁকা ছিল—শুধু খেলিয়ে নিয়ে চলছে। তা নইলে সেই সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ করে এই এতখানি রাত্রি পর্য্যন্ত এ যেন এক ছায়াছবির মত একের পর একটি ঘটনায়—যেমন দর্শকগণকে অভিভূত করে রাখে, কিম্বা কোন যাদুকরের যাদু-খেলায় দর্শকগণ অভিভূত হয়ে থাকে—সেই মতন কোথা থেকে ঘটনার পর এক একটি ঘটনা যেন কে সাজিয়ে রেখে এমনি খেলা খেললে। কোথায় সেই সন্ধ্যায় একটু একা একা ভ্রমণ শেষ করে বাড়ী ফিরব, না এই দীর্ঘ রাত্রি, কত-শত উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে কেমন করে এমনিভাবে কেটে গেল। অন্তর্যামী আজ আমাকে ওই সমুদ্রের ঢেউএর মতই ঠেলতে ঠেলতে যেখানে আজ এনে ফেললে—সেখান থেকে কতক্ষণে যে মুক্তি পাব তা বলতে পারি না। তবে এই জীবনে যে এরূপ একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হোল তা চিরদিন মনের মণিকোঠায় অমল অক্ষয় দীপ্ত ভাবর হয়ে থাকবে। চোখের সম্মুখে এই যে এমন অঘটন ঘটল, এর মধ্যে সত্যের ইঙ্গিত যে কি আছে তখন পর্য্যন্ত বুঝা আমার পক্ষে কেমন যেন জটিল হয়ে রইলো। আমার মনকে কে যেন বারবার বাধা দিয়ে এইটুকু বলতে লাগলো—যে এর মধ্যে যেন কোথায় কোন একটি অজানা গোপন গভীর রহস্য লুকিয়ে থেকে সমস্ত কার্য্য-কারণকে ঘিরে উঁকি মারছে। সেই রহস্যটুকু ধরতে পারলেই যেন এর সব কিছুর সমাধান হয়ে যায়। ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে যে নাটকের সূত্রপাত হয়েছিল, এতক্ষণে যেন তার শেষ যবনিকা পড়বার উপক্রম হয়ে এল এবং সেই শেষটুকু সন্ন্যাসীই ফাঁস করে দিলে।

সন্ন্যাসী সেই যুবা সন্ন্যাসীর চরণ ছেড়ে উঠে বসে প্লাবিত অশ্রুরাশি আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে অভিমান এবং অভি-যোগের সুরে বললে : এতোও জান ?—এমন করে আমায় শাস্তি দিয়ে ছলনা করবার তোমার কি দরকার ছিল ?

সন্ন্যাসীর মুখে কহিল : আমি কিছুই জানি না সন্ন্যাসী—ওই তো গুরুদেব রয়েছেন ওঁকেই জিজ্ঞেস্ কর—

সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী অর্থাৎ গুরুদেব শান্ত কণ্ঠে সন্ন্যাসীকে বললেন : মা এই কাহিনীর ইতিবৃত্ত সবই বলব আমি একে একে। কিন্তু তার আগে তোরা দুজনের প্রসাদ খেয়ে নে! সারাদিন কিছু তো পেটে পড়েনি, তাছাড়া উৎকণ্ঠা ও শোকে অধীর হয়েছিলি। কি করব মা—একটু কষ্ট দিলাম—চরমতম শোচনীয় শাস্তিই হবে বা। যাই হোক সব অপরাধ ক্ষমা করে নে।

আমরা গুরুদেব প্রদত্ত প্রসাদ পেয়ে তৃপ্তি লাভ করলাম। যেন এতক্ষণে আমাদের দেহে নতুন জীবনের সঞ্চার হোল।

গুরুদেব মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে মধুর স্বরে বললেন : এবার কাহিনী যা তা সংক্ষেপে বলছি : একদিন শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম আমার এই শিষ্য রঞ্জনের সঙ্গে। নানান্ কথাবার্ত্তার মধ্যে এলো যোগ সম্বন্ধে শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। কথার কথায় বলেছিলাম—এই যোগ অভ্যাস দ্বারা অসাধ্য সাধন হয়। উদাহরণ দিয়ে বলেছিলাম ভগবান শঙ্করের কথা। শঙ্কর কি ভাবে নিজের দেহ ছেড়ে অপরের দেহে অধিষ্ঠান করে সংসার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পেরেছিলেন। তখন তো বুঝিনি মা—যে তোমার স্বামীটি আমাকেই মহা পরীক্ষায় ফেলে পরীক্ষা করে দেখে নেবে এবং সেই সাথে তোমাকেও এই পরীক্ষার ফল পেতে হবে? সন্ন্যাসী কথায় বাধা দিয়ে বললে : এ যে জীবন সর্ব্বনেশে পরীক্ষা বাবা—জীবন মরণ খেলা—

গুরুদেব বললেন : মা বুড়ো হোয়েছি, সব সময় সব বিষয়ে চিন্তা করতে পারিনা। আমাকে এরূপ অভ্যাস দেখ করে ধরলে—শিষ্য স্নেহে অন্ধ হোয়ে পরিণতির দিকে চেয়ে না দেখে যোগের নিগূঢ় রহস্য ওকে বোঝাবার জন্যই এই কাজ করতে হ'ল। আমি করতে চাইনি কারণ আমার কোথায়, কার উপর এটা প্রয়োগ করব। সে কথাও একে বলেছিলাম। তখন ও বললে—আমারই ওপর করুন। তখন ঠিক মত পরামর্শ করে ওকে দেখালাম যোগের মহাশক্তি। কিন্তু সর্ব্বদা আমি সে বিষয়ে সচেতন ছিলাম মা, এটা ঠিক জেনো। অবশ্য তোমার উপর দিয়ে একটা মারাত্মক

অথবা অত্যাচার যে হয়নি সে কথা কেমন করে বলব মা। কাজেই এই পরীক্ষায় তুমিও যতটুকু কষ্ট স্বীকার করেছ আমিও ততটুকু করেছি—এই বৃদ্ধ বয়সে আর কি আমার ওসব পোষায় মা! এবার আমায় ক্ষমা করে তোমার স্বামীর সঙ্গে ঘোকাপড়া করে নাও। তবে মা এইটুকু আমি নিশ্চয়ই বলব—তোমার ধৈর্য্য, তোমার সহ্যশক্তি, সর্ব্বোপরি তোমার অতুলনীয় মাতৃত্বই তোমায় মহিমান্বিত করে রেখেছে। এই কলিকালেও তোমার মত মেয়েরা জগতের আদর্শস্থানীয়া হোক—এই কামনা করি আর এই অশীতিপর বৃদ্ধের আশীর্ব্বাদ রইল মা—তোমার জ্যোতিপ্রভায় এই সংসার ভাস্বর হয়ে উঠবে। এই কথা বলেই তিনি সে স্থান ত্যাগ করলেন।

অতঃপর সর্ব্বাণী আমার পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে দাদা, এ গোলক ধাঁধাঁর সমাধান শেষ পর্য্যন্ত মিটেই গেল—এখন এই শেষ রাতে চলুন সমুদ্র স্নান সেরে ঘরে ফিরি।

আমি এতক্ষণ আকাশপাতাল কত কি চিন্তা করছিলাম। এই ঘটনার সূত্র ধরে কত দৃশ্যই তো এলো গেল। ভিতরের এই গাঢ় রহস্য কে বুঝবে। কাজেই পূর্ব্ব থেকেই কোন ঘটনার উপর একেবারে আগে থাকতে বিচার করে ফেলা যেন অর্ব্বাচীনের মত আমার মনে কেবল পাক খেতে থাকলো। এখন এই পরিবেশের মধ্যে নিজেকে যেন বড় অসার বলে মনে হতে লাগলো। সহসা সর্ব্বাণীর ডাকে সচকিত হোয়ে বললাম: দিদি, তোমাদের তো এবার শুভ মিলন হোয়ে গেল। এবার এই গরীব ভাইটিকে বিদায় দাও না ভাই—

সর্ব্বাণীর স্বামী অর্থাৎ রঞ্জন তাড়াতাড়ি উঠে এসে আমার হাত দুটি ধরে বললে: দাদা, অথবা আপনাকে যা কষ্ট দিয়েছি তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। শুধু তাই নয়, আপনার মত মহৎ ব্যক্তির সাথে আত্মীয়তাই কামনা করি!

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম—ও আর এমন কি ভাই—এ তো মানুষই মানুষের করে থাকে?

সর্ব্বাণী আমার দিকে চেয়ে বললে: ছোট বোনের যে উপকার করেছেন দাদা, তা জীবনে ভুলব না? অযাচিত-ভাবে এমন করে আমার দুঃখে কাতর হয়ে এই সারারাত্রি-ব্যাপি যে কষ্ট ভোগ করেছেন তার ঋণ তো শুধবার নয়।

তারপর তার স্বামীর পানে দৃষ্টি দিয়ে বললে: জান গা—তুমি তো চলে এলে—আমি তখন কেমন যে নিরুপায় পাগলিনীর মত হয়ে গিয়েছিলাম। উনি যদি দয়া করে না আসতেন—তাহলে আমার কি যে হোত বলে বোঝাতে পারবো না—

এমন সময় গুরুদেব ফের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন: মহৎ যার অন্তঃকরণ, ভগবান তাঁকে মহত্বই দান করেন। সর্ব্বাণী বললে: হাঁ বাবা—ওঁর গুণ অপরিশোধ্য—আমি তাড়াতাড়ি বাধাদিয়ে বললাম: মাপ কর দিদি—ও সব গুণ টুণ—ওসব কথা বোল না—

সর্ব্বাণীর সন্তান হঠাৎ জেগে উঠে বলে উঠলো: মা, বাড়ী চল না—

চল বাবা—বলে সর্ব্বাণী উঠে দাঁড়াল। গুরুদেব সর্ব্বাণীর স্বামীকে বললেন: রঞ্জন, আর বিলম্ব না করে তোমরা বাড়ী যাও—কাল বরং একবার এসো—

আমরা সকলেই তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি অতঃপর বিশ্রাম নিতে গেলেন। রঞ্জন আমাকে উদ্দেশ করে বললে: আপনার নামটি তো জানি না দাদা—

আমি হাসতে হাসতে বললাম: কোন নামটা বলব? একটা আসল, অপরটা নকল—যাকে বলে ছদ্মনাম—

সকলে হো, হো করে হেঁসে উঠলো। আমি বললাম: আমার ছদ্মনামটা ছদ্মবেশেই থাক—আসলটাই বলি—আমার নাম অঞ্জনকুমার রায় চৌধুরী। নিবাস কোলকাতা, সাম্প্রতিক পুরীতে ভ্রমণ করতে এসেছি।

তারপর সকলে কালীর ঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করলাম।

তখন ভোরের সুস্নিগ্ধ সুশীতল বাতাস বেয়ে মনে বেশ আমেজ ধরিয়ে দিয়েছে। নবীন উষার আগত পবিত্রা-লোকে উদ্ভাসিত সবিতা যেন সমস্ত অকল্যাণ নাশ করে মঙ্গলালোকে শুভযাত্রার পথ দেখাতে উন্মুখ।

মহা-সমুদ্র যেন এই শুচিশুভ্র উষাকালে শান্ত স্থির। যেন সমস্ত রাতের ধাপাধাপির পর ক্লান্ত ভোরে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিচ্ছে।

আমি তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। সর্ব্বাণী ও তার স্বামী আমাকে প্রণাম করলে। চেয়ে দেখি চোখে জল। কাপড়ের খুঁটে মুছতে মুছতে বললে: দাদা, এই গরীব বোনের বাড়ী কাল একবার আসা—চাই-ই চাই।

ঘোষপাড়ার কথা

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘোষপাড়ার মেলায় আখড়ার বসে গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আগের রাত জেগেছিলাম, তাই অসময়ে চোখ দুটো জুড়ে এসেছিল। মেয়ের ডাকে ঘুম ভাঙলো—"ও দাদা, ওঠ, তোমার তো সেবা হয়নি। সেবা করবে চল।" প্রথমে মনে হয়েছিল যিনি আমায় ডেকে তুললেন, তিনি বোধহয় লোক চিনতে ভুল করেছেন। পরে জানলাম—ভুল তিনি করেননি। ভুল আমারই হয়েছিল। সত্যধর্মীরা, পরিচিত অপরিচিত সকলকেই ঐ বলেই সম্বোধন করেন। মানুষকে ভালবাসাই তাঁদের ধর্ম। মানুষকে পূজো করাই তাঁদের রীতি।

ঘোষপাড়া কোথায়? কী উপলক্ষে মেলা? কোন্ পথ দিয়ে সেখানে যেতে হয়?—এ'সব প্রশ্ন নিশ্চয় আপনার মনে জেগেছে। (অবশ্য আপনি যদি ঘোষপাড়ায় না এসে থাকেন।)

বেশীদূর নয়। কলকাতার খুব কাছেই। উত্তর দিকে মাইল ছত্রিশ রাস্তা হবে। হাঁটতে হবে না। ট্রেণে কিংবা বাসে যে কোন একটায় চেপে আপনি আসতে পারেন। ট্রেণে এলে আপনাকে হয় কাঁচড়াপাড়া কিংবা কল্যাণী স্টেশনে নামতে হবে। সেখান থেকে ঘোষপাড়া যাবার বাস পাবেন। আর যদি বরাবর বাসে আসেন, কলেজ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড—এই একই রাস্তা ধরে সোজা চলে এসে বারাকপুর নামবেন। তারপর কাঁচড়াপাড়াগামী বাসে উঠে কন্‌ডাক্টারকে বলবেন বাগের মোড়ে নামিয়ে দিতে। বাগের মোড় থেকে ঘোষপাড়া দু'মাইল রাস্তা। এখান থেকে রিক্সা বা কল্যাণীর বাস যাতে খুশী চেপে যেতে পারেন। মেলার ক'দিন বারাকপুর থেকে ঘোষপাড়া পর্যন্ত বাস চলাচল করে।

ঐতিহাসিকরা বলেন, মুসলমান রাজত্বকালে ভারতবর্ষে যে ক'টি 'সহজিয়া' ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে, ফকির আউলচাঁদ হচ্ছেন তার একটি শাখা—কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তাঁরা বলেন, আউলচাঁদ প্রচারিত ধর্মমতটি বৈষ্ণব ধর্মের একটি সহজ সংস্করণ। কিন্তু এই ধর্মীয় সম্প্রদায় মহাপুরুষ আউলচাঁদকে চৈতন্যদেবের অবতার বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন, গৌরাঙ্গদেবের প্রিয় ভক্ত জগদানন্দ যখন শান্তিপুর হতে শ্রীপুরীধামে শ্রীচৈতন্যদেবের কাছে যান, যাবার সময় অদ্বৈতাচার্যের নিকট হতে তিনি একটা হেঁয়ালী নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই হেঁয়ালিটার মধ্যেই বৈষ্ণবধর্মকে আরও সহজ করে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে প্রচার করার ইঙ্গিত ছিল। চৈতন্যদেবই নীলাচলে লীলা সংবরণ করে গেছলেন। বহুর পরে আউলচাঁদ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, হেঁয়ালিটা আমি এখানে উদ্ধৃত করছি—

"বাউলকে কহিও লোক হইল আউল
বাউলকে কহিও মাঠে না বিকায় চাউল
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে আউল।"

এই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অভিমত, চৈতন্যদেব চোঁচা-গোপীনাথের মন্দিরে আউলচাঁদরূপে আবির্ভূত হয়ে প্রথমে ঘোলাডুবনী গ্রামে আসেন। তারপর আসেন উলোবীর-নগর গ্রামে। পরে সেখান থেকে বেজড়া গ্রামে এসে বাইশজনকে দীক্ষা দেন। এই বাইশজন শিষ্যের মধ্যে একজন হচ্ছেন ঘোষপাড়া গ্রামের রামশরণ পাল, আর একজন হচ্ছেন কাঁচড়াপাড়া গ্রামের কানাই ঘোষ। মহাপুরুষ আউলচাঁদ ঘোষপাড়া গ্রামে অনেকদিন বাস করেন। তিনি তাঁর বাইশজন শিষ্যের মধ্যে রামশরণ পালকে 'কর্তা' আখ্যা দেন এবং তাঁকে বংশ পরম্পরায় দীক্ষা দেবার অধিকার দিয়ে যান। তিনি তাঁর সমস্ত শিষ্যদের দোলপূর্ণিমাতে ঘোষপাড়ায় এসে মিলিত হবার নির্দেশ দিয়ে যান। সেই থেকেই ঘোষপাড়ার মেলার উৎপত্তি।

যুক্ত ত্রিবেণীর পূর্বপাড়ে কবে যে ঘোষপাড়া গ্রামের প্রথম পত্তন হয়েছিল, সে কথা আজ কেউ বলতে পারে

না। তবে একথা শোনা যায় মহাপুরুষ আউলচাঁদ যখন এ'গ্রামে এসেছিলেন এ'গ্রাম তখন বেশ বর্দ্ধিষ্ণু ছিল। ভাগীরথী তখন এ গ্রামের পাশ দিয়েই বয়ে যেতেন। আজ তিনি অনেক দূরে সরে গেছেন। দূরত্ব এখন প্রায় দু' মাইলের কাছে গিয়ে ঠেকেছে।

বেশীরভাগ লোকেরই অভিমত, এককালে ঘোষেরাই এ'গ্রামে বাস করতেন, তাই নাম হয়েছে "ঘোষপাড়া"। অনেকে বলেন, বহুপূর্বে এ'গ্রামের নাম ছিল 'ডুবোপাড়া।' যাক্ সে কথা।

আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগে সদ্‌গোপ-বংশীয় সংস্কৃতির মানুষ রামশরণ পাল জন্মভূমি জগদীশপুর ছেড়ে এই ঘোষপাড়ায় এসেছিলেন। এইখানেই গোবিন্দ ঘোষের কন্যা সতীমার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। সতীমার পিতৃদত্ত নাম ছিল সরস্বতী। মহাপুরুষ আউলচাঁদ তাঁর নাম পরিবর্তন করে নাম রেখেছিলেন সতীমা।

রামশরণ পাল আর কানাই ঘোষ মহাপুরুষ আউল-চাঁদের প্রতি কি করে আকৃষ্ট হয়েছিলেন সে সম্বন্ধে একটা সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটা এখানে বলছি :—

"রামশরণ পাল আর কানাই ঘোষের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। একদিন ঘোষপাড়ায় দুই বন্ধুতে বসে গল্প করছিলেন। কাছেই রামশরণবাবুর একটা গরু সেদিন নিখাদ ত্যাগ করে তখনও সেখানে পড়েছিল। এমন সময় ফকির বেশী মহাপুরুষ আউলচাঁদ এসে গরুটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেই গরুটা বেঁচে উঠল। এরপর তাঁরা দু'জনে ফকিরকে অনুসরণ করলেন। কিন্তু কিছুদূর এসেই তাঁদের মনে হল, ফকির সাহেব একটা তালিম গাছের আড়ে মিশে গেলেন। তালিম গাছের কাছে এসে তাঁরা তাঁকে ভন্ন-ভন্ন করে খুঁজলেন, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। কিছু পরে তাঁরা তালিম গাছের গোড়া থেকে ফকির সাহেবের গলা শুনতে পেলেন—'অমুক দিন—অমুক জায়গায় গেলে—আমার দেখা পাবে।

শোনা যায় সেই তালিম গাছ আজও বেঁচে আছে।

যে ঘোষপাড়ার তালিম গাছতলার মাটি, হিমসাগরের জল আর সতীমার নামের মাহাত্ম্যের অনেক কিংবদন্তী আছে। এখানে আমি একটা কাহিনীর কথা বলছি।

'সতীমা মহাপুরুষ আউলচাঁদকে ভক্তি করেন' প্রাণ দিয়ে সেবা করেন তাঁর। একদিন মহাপুরুষ আউলচাঁদ সতীমার কাছে এক ঘটি জল চাইলেন। সতীমা ঘরে এসে দেখেন, কলসীতে একবিন্দু জল নেই। সতীমা অবাক। কিছু আগেই যে তিনি গঙ্গা থেকে কলসী ভরে জল এনে রাখলেন সে জল গেল কোথায়! ঘরের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভাবছেন সতীমা—বাইরে অন্তর্যামী মহা-পুরুষ মনে মনে হাসছেন।

মহাপুরুষ তাগাদা দিলেন কইগা, জল নিয়ে এস!

সতীমা খালি ঘটি হাতে করে ঘর থেকে বার হলেন। মুখ তাঁর বিবর্ণ। চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে।

মহাপুরুষ বললেন—তুমি কাঁদছো কেন মা? আমার যাবার সময় হয়েছে। যাবার আগে আমার একটা বাসনা আমি পূর্ণ করে যেতে চাই। ঘরে জল না থাকে তুমি সামনের ঐ পুকুর থেকে—এক ঘটি জল নিয়ে এস, ঐ আমি পান করবো।

সতীমার মনে দ্বিধা জাগলো,—ঐ পচা পুকুরের জল কি কেউ খেতে পারে? কিন্তু গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করবেন কি করে! পচা পুকুর থেকেই ঘটি করে জল নিয়ে এলেন তিনি। কিন্তু মহাপুরুষের হাতে তুলে দিতে পারলে না সেই জল।

মহাপুরুষ বললেন, ইতস্ততঃ করছো কেন মা! সতীর স্পর্শে ও জল আর জল নেই, ও অমৃত হয়ে গেছে। ঐ অমৃত আমি কিছুটা পান করে আবার তোমার হাতেই ফিরিয়ে দিচ্ছি। যা থাকবে তার কিছু অংশ তুমি তালিম গাছতলায় ঢেলে দিও, আর বাকীটা দিও ঐ পচাপুকুরের জলে। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করে যাচ্ছি, তুমি বাকসিদ্ধা হবে। আর তোমার নাম স্মরণ করে যে-কেউ ঐ পচা পুকুরের জলে ডুব দিয়ে এসে তালিমগাছ তলায় তার মনের বাসনা জানাবে তা তার সফল হবে। রোগার রোগ ছুটবে। অন্ধ তার দৃষ্টি ফিরে পাবে। দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় হবে।

জলপান করেই মহাপুরুষ অন্তর্ধান করলেন।

সতীমা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। অনেকদিনের একটা চাপা বেদনা তাঁর মুখ ফুটে বেরিয়ে পড়ল,—'বাবা, তুমি তো আমায় অনেক উঁচুতে বসিয়ে গেলে। কিন্তু আমি

যে নিঃসন্তান—সে কথাটা কি তোমার একবারও মনে হয়নি ?

দৈববাণী হল :—তোমার মনের বাসনা পূর্ণ করতেই তো আমায় যেতে হচ্ছে মা। তোমার দুলাল হয়ে আমিই যে তোমার কোলে ফিরে আসবো।

সতীমার মনের বাসনা পূর্ণ হয়েছিল। তিনি ছেলের নাম রেখেছিলেন দুলালচাঁদ।

ঘোষপাড়ার মেলা সুরু হয়—দোল পূর্ণিমার আগের দিন সন্ধ্যা থেকে। উৎসব চলে তিন দিন তিন রাত ধরে, যাত্রী সংখ্যা তিনদিনের পর থেকেই কমতে আরম্ভ করে। ক'দিন পরেই দোকানগুলো একে একে উঠে যায়।

মেলায় বহু দূর দূর থেকে যাত্রীরা আসেন। প্রায় হাজার দশেক লোকের সমাগম হয় এখানে। ভক্তেরা আসেন নিত্য-ধাম ঘোষপাড়া তীর্থ দর্শনে। একতারা হাতে নিয়ে বাউল ফকিররা আসেন গান গেয়ে ভক্তির উৎসকে বাড়িয়ে তুলতে। আসে বহুপাকারের অসংখ্য নরনারী তাঁদের মনের বাসনা জানাতে। আসে অন্ধ ও অবোলা ছেলেমেয়েকে সাথে করে তাদের পিতা-মাতা। আর আসেন ব্যবসায়ীরা,—মেলায় দোকান খুলে কিছু লাভের আশায়।

আগের চেয়ে মেলার পরিসর এখন অনেক কমে গেছে। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংরাজ সরকার ভারত প্রতিরক্ষা আইনে এ গ্রাম সহেত নদীয়া মেলার আটাশটা গ্রাম অধিকার করেছিলেন। বাস্তুর তাগিদে একর জমি শ্মশানকরে নির্দিষ্ট হয়েছিল ইউনাইটেড স্টেট্স্ অব আমেরিকার আর্মস এ্যাণ্ড এ্যামিউনিশান ডিপো। নামকরণ হয়েছিল রুরডেন্ট নগর। তবু ধর্মীয় স্থান বলে ঘোষপাড়ার সতীমার মন্দির ও তার চারপাশে বিঘে পঁচিশেক জমি রক্ষা পেল। সেই থেকে এ'গ্রাম হয়েছে বসতিশূন্য, মেলার পরিসর কমে গিয়ে হয়েছে সীমাবদ্ধ।

তবু একদিন এই পৃথিবীর

শিবেন্দ্র গোস্বামী

আরক্ত উষা জন্ম নিয়েছে স্মৃতি মথিত দ্বীপে,
চেতনা শালিক কিচিমিচি ডাকে সবুজ কূজ নীপে।
গোধূলি ধূপের সবটুকু রঙ, অঙ্গ অঙ্গে জড়িয়ে—
চলেছিলে নাকি শতাব্দী ঘেরা মৃত্যু সাগর এড়িয়ে।

অনেক বাউল শশিন্দরের বিষ মেখে নিজ অঙ্গে,
চলেছিল সাঁঝে মেদুর সাঁঝের উৎকোচ বেঁধে সঙ্গে।
দেখেছো কেবল আমার হৃদয়ে পার্থিব লেনদেন
শান্ত দীঘির নীর চোখে চেয়ে তবু শেফালিকা সেন।

এই পৃথিবীর বাতাসে বাজেনা মুক্তির কলতান—
ছাতিমের ডালে ঘরোয়া পাখীরা কুটিল বাসার টান।
প্রান্তর ঘেরা শঙ্খক মনে নীল চোখে চেয়ে চেয়ে,
হতাশা আঁধারে শেফালিকা সেন উঠেছিল যেন নেয়ে।

তবু একদিন এই পৃথিবীর ঘুম ভেঙে যাবে বলে,
অনেক আগেই হলায়ন ঘরে ভজন কেঁপে ওঠে ;
শেফালিকা সেন অন্ধো স্থির চোখে শিশিরের ধারাপাতে
অনুভূতি খোঁজে স্মৃতি মথিত মোছনা মুখর রাতে।

দক্ষিণী অ্যাং

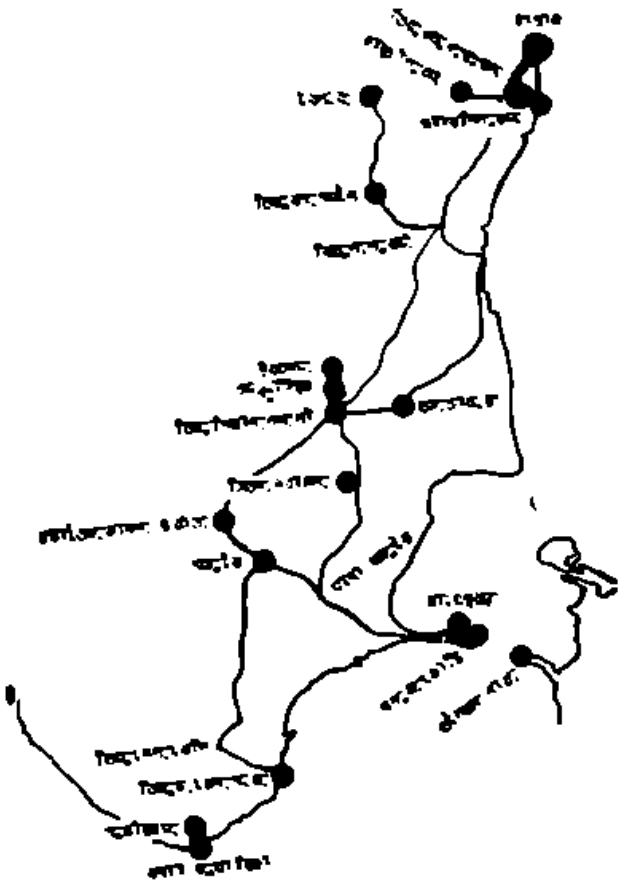

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

। ৪ ।

সুদূর দক্ষিণের আঞ্চলে যেতে হচ্ছে। ভারতের শেষ স্থলভাগ পর্যন্ত যাওয়ার পথে আপাততঃ গন্তব্যস্থল কোডৈকানল্।

মাদ্রাজের এগমোর স্টেশন থেকে তিরুনেলবেলি এক্সপ্রেস ছাড়বে সন্ধ্যায়। পুরো রাতের সফর। তাই গাড়ী ছাড়বার আধঘণ্টা আগেই জায়গা দখল করে বসেছিলাম। আর ওই সময়ের মধ্যেই আলাপ জমে গিয়েছিল সহযাত্রী লোকনাথন্-এর সঙ্গে। লোকনাথন্ যাবেন মদুরৈ-এ।

কামরাটায় ভিড় না হওয়ায় দুজনেই বলছিলাম—রাতে ভাল ঘুমনো যাবে। দুজনে দুখানা বাঙ্কও দখল করে ফেলেছিলাম। গাড়ী ছাড়বার মিনিট তিনেক আগে, জন বারোর একটি পরিবার ছুটতে ছুটতে এসে কামরায় ঢুকলো। তাদের মধ্যে চারটি বাচ্চা।

লোকনাথন্ ইংরেজীতে বললেন: দেখুন, কারা আবার এলো!

: অর্কেস্ট্রা পার্টি।—আমি বললাম। লোকনাথন্ বুঝতে পারলেন না। প্রশ্ন করলেন: তার মানে?

: মানেটা যথাসময়ে বুঝতে পারবেন।

গাড়ী ছাড়ার চল্লিশখানেকের মধ্যেই বাচ্চাগুলি ঘুমুতে শুরু করলো। কিন্তু রাত একটার পর থেকে প্রতিবার তিনজন এক সঙ্গে যেন পালা করে, তারস্বরে কান্নার ঐকতান শেষ রাত পর্যন্ত চালালো।

তিনটি যখন চেঁচায়, একটি তখন চুপ করে থাকে। চোখ মিট মিট করে। বোধ হয় বিশ্রাম নেয় অথবা, অন্যদের গাওনা কেমন হচ্ছে শোনে।

সবচেয়ে ছোটটি মেয়ে। তার গলায় আওয়াজ তারিফ করবার মতো। ঠিক ওদেশীয় নাদেশ্বরম্।

সকাল হতেই কিন্তু তাদের সেই কনসার্ট থেমে গেলো। সব তখন কতই যেন ভাল মানুষ!

দিন্ডুগ্‌গল্-এ ভোরের কফি খেতে খেতে লোকনাথন্-কে জিজ্ঞাসা করলাম: কেমন শুনলেন?

: উঃ, কি ভয়ানক সব ছেলে যে বাবা! আপনার identification মিলুল,—অর্কেস্ট্রা পার্টিই বটে!—লোকনাথন্ বললেন। সকাল সওয়া ছটায় গাড়ী কোডৈকানল্ রোড স্টেশন্-এ পৌঁছলো।

স্টেশনটি মাদ্রাজ থেকে ২৮২ মাইল। এখান থেকে বেল আউট এজেন্সীর বাস্-এ যেতে হবে কোডৈকানল্।

রেল স্টেশন থেকে কোডৈকানল শৈলাবাসের দূরত্ব পঞ্চাশ মাইল।

স্টেশনের পিছনেই বাস্ স্ট্যাণ্ড। আধঘণ্টার মধ্যেই ছাড়লো।

বিশ মাইল সমতল অতিক্রম করার পর শুরু হলো চড়াই। আরও চার মাইল যাওয়ার পর প্রায় ২২০০ ফিট উঁচু থেকে, বাঁদিকে, সওয়া দু'মাইল দূরে দেখা গেলো মণ্-চলর্ জল-প্রপাত। অত দূরে থাকায় মনে হচ্ছিল,—পাহাড়ের গা বেয়ে সুদীর্ঘ এক রূপালী রেখা সর্পিল ভঙ্গীতে নীচে নেমে চলেছে।

ধীরে ধীরে আমাদের আশে-পাশে উদ্ভিজ্জের ঘনত্ব বাড়তে লাগলো। স্থানে স্থানে দেখা দিলো জঙ্গল। অসংখ্য গাছপালা, লতা-গুল্মের মধ্যে বেশীর ভাগই নাম না জানা,—অপরিচিত, অপরিচিতা। তারই মাঝে, কোডৈ যাত্রী আগন্তুকদের স্বাগতম্ জানাতে যেন সকলকে আড়াল করে, রাস্তার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে আমার অতি পরিচিত নাকছাবি ফুলের দল। কোথাও জাফরানি রঙের, কোথাও দুধে-আলতা, আবার কোথাও বা শ্বেত-বর্ণের।

সারা ভারতের সকল প্রান্তেই দেখা যায় এই নাক-ছাবি ফুলের মেলা। রেল লাইনের ধারে, কোপে, ডঙ্গলে, ইমারতের ধ্বংস স্তূপে, পাহাড়ে,—সর্বত্র।

এ দেশে এ ফুলের কি নাম জানিনা। বাঙ্গলায় নাক-ছাবি ফুলের আর এক নাম ভূত-ভৈরব।

কয়েক জায়গায় ফুটেছে ম্যাডোনা লিলি। মাঝে মাঝে দু একটা বসতিতে প্রচুর জবা।

সাড়ে তিন হাজার ফিট পার হওয়ার পর দেখা গেলো নানা জাতের ফার্ন। সেই সঙ্গে মিললো পাইন ও ইউ-ক্যালিপটাস্-এর দর্শন।

এক গাছের মাথায় অন্য গাছের প্রাদুর্ভাব একটা দৃষ্টি আকর্ষণের বিষয়। আমার পিছনেই ছিলেন এক ফাদার্। তিনি ঐরূপ একটি গাছ দেখিয়ে তাঁর পার্শ্বচারীকে বললেন Trichomoues filicula।

আমি জানি ও আমাদের গাঁয়ের কথায়—'বাঁদরা'। গাছের ওপরে থাকে তাই বাঁদরা।

ক্রমে পথ আরও ঘোরালো হয়ে উঠলো। অতিক্রম করতে হলো তিন চারটি Hair pin curve—মেয়েদের কবরীতে ব্যবহারের কাঁটার আকারের বাঁক।

বেলা সাড়ে দশটায় পৌঁছলাম কোডৈকানল্। বাস স্ট্যাণ্ড-এর কাছেই বাজার, দোকান, হোটেল, পোষ্ট-অফিস এবং রেল্-এর আউট এজেন্সী অফিস। এক কথায় প্রয়োজনীয় সব কিছুই। টুরিষ্ট লজ্-এ আস্তানা ঠিক হলো।

কোডৈকানল্ নামটির অর্থ মৃগতৃষ্ণিকার উপহার। নিদাঘ দিনে ভারতবর্ষে সুদূর দক্ষিণের এই অঞ্চল হয়ে পড়ে মরুভূমির মতই নিষ্প্রাণ, নীরস। তখন মনোরম পার্বত্য নিবাসটির নামের মর্ম বুঝতে দেরি হয় না।

পাহাড়টি পল্নি পর্বত শ্রেণীর অংশ বিশেষ। পল্নি পশ্চিম-ঘাট পর্বতমালার শাখা।

কোডৈকানল্

সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে সাত হাজার ফিট উঁচু এই মনোরম শৈলাবাসটি ১৮২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বহির্জগতে অজ্ঞাত প্রায় ছিল। Lieut B. S. Ward নামে এক ইউরোপীয় ভদ্রলোক ঐ বৎসরে জরিপের কাজে কোডৈ পরিদর্শন করেন। তারপর আসেন Mr. Roughton এবং Cotton নামের দুই ভদ্রলোক। বিদেশীদের মধ্যে কোডৈকানল্-এ সর্বপ্রথম গৃহনির্মাণ করেন একটি আমেরিকান মিশন।

আমেরিকানরা তখন হতেই কোডৈ-এর যোগসূত্র রেখে আসছেন এবং আজও কোডৈ বহু আমেরিকান অধ্যুষিতা।

[কোডৈ-এর বহুবিধ উন্নতি সাধনের জন্য অনলস পরিশ্রম করেছিলেন Mr. Vere Henry Levinge। ইনি মদুরৈ-এর কলেক্টর ছিলেন। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর কোডৈকানল্-এ বসবাস করেছিলেন।]

আমাদের সেরেই বেরিয়ে পড়তে হলো।

তাড়াতাড়ি সব কিছু দেখে নিতে হবে। দুদিনের বেশী থাকা যাবে না। বছরের এ সময়টা কোডৈ এ বেড়াতে আসার ঠিক সময়ের নয়। সময় হলো এপ্রিল, মে এই দুমাস ও জুন মাসের অর্ধেক পর্যন্ত। জুনের শেষ হতে

লেক্—কোডৈক্ কানল্

আগস্ট্ পর্যন্ত কোডৈ-এর আবহাওয়া মেঘলা ও খারাপ থাকে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হলেও এই সময়ে বর্ষা নামে না। সেপ্টেম্বরের শেষ হতে নভেম্বর পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রভাবে এখানে বর্ষা হয়। ডিসেম্বর খুবই ঠাণ্ডা। জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে দু'এক জায়গায় সামান্য তুষার দেখা যায়।

কোডৈ-এর অসংখ্য প্রাকৃতিক দ্রষ্টব্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—সন্তর একর বিস্তৃত হ্রদটি। ভারতের পূর্বাঞ্চলে আমরা শিলংয়ের লেক ও দার্জিলিংয়ের সিকল লেক্-এর দৃষ্টান্ত দিই। কোডৈ-এর লেক্-এর সঙ্গে কিন্তু ওই লেক্ দুটির তুলনাই চলে না।

ছোট বড় নানা আকারের জলপ্রপাত ও ঝর্ণা স্থানটির সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। বিয়ার্ শোলৈ, পামরুর্, ফেয়ারি এবং গ্লেন্ ফলস্ খাস কোডৈকৃক্যানল্-এর সীমানার মধ্যে। কোডৈ-এর পথে পাঁচ মাইল বাকী থাকতে আছে একটি মনোরম জোয়া—সিলভার কাস্কেড্।

Pillar Rocks এখানের অন্যতম দ্রষ্টব্য।

বাস্ স্ট্যাণ্ড্ হতে সাড়ে চার মাইল দূরে, পাহাড়ের একাংশের একেবারে কিনারায়, একটি ছোট পার্ক-এর মত

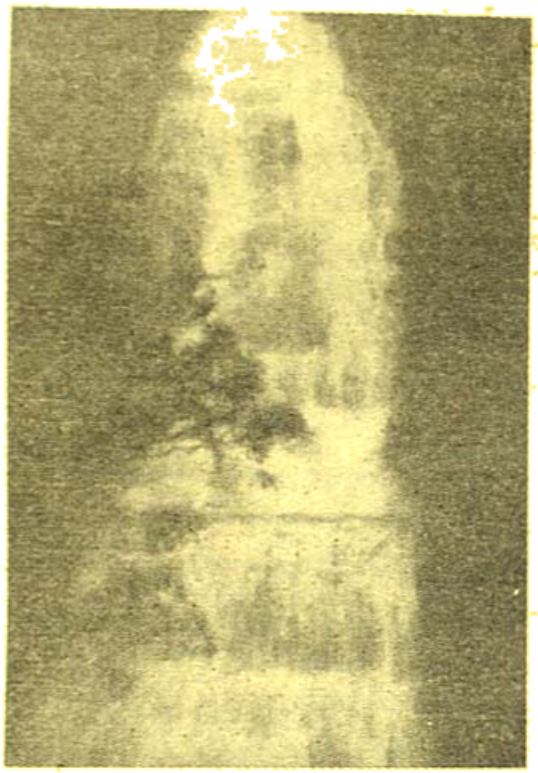

সিল্ভার্ কাস্কেড্—কোডৈক্ কানল্

করা আছে। অনেকটা দার্জিলিংয়ের 'দি ম্যাল্' ধরণের। তারই নীচে এক বিরাট খাদ। খাদের অপর পারে আর একটি পাহাড়ের মাথায় প্রায় চারশ' ফিট্ লম্বা তিনটি শিলা সোজা দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক যেন তিনটি থাম। তাই নাম হয়েছে Pillar Rocks।

দুই পাহাড়ের তলদেশে ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে খাদের ভিতর হুড় হুড় করে মেঘ ঢুকে পাহাড়ের বেড়ায় আটকে ঘুরপাক খাচ্ছে। সমস্ত অঞ্চলটা তখন মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। দর্শকের গায়ের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে মেঘ।

মেঘ চলে যেতেই সমস্ত অঞ্চলটা আবার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে হেসে উঠেছে।

মেয়ের সে কি চমৎকার খেলা! নতুন কোনও মেঘদূত রচনায় প্রেরণার উৎস হতে পারে স্থানটি।

বাস স্ট্যাণ্ড থেকে দুমাইল দূরে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭৬৮৮ ফিট উঁচুতে কোডৈকক্কানল্-এর মনোমন্দির।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত এটিই ছিল ভারতবর্ষের সবগুলি অবজারভেটরীর মধ্যে উচ্চতম স্থানে অবস্থিত।

শৈলাবাসটি সর্বোচ্চ স্থান হলো বণ্ডরুম্ ফরেস্ট্ অফিস-এর সন্নিহিত অঞ্চল। উচ্চতা ৮৩১০ ফিট্।

স্বাধীনতার পূর্বে ওই ফরেস্ট্ অফিসটির প্রান্তেই ছিল বৃটিশ-ইণ্ডিয়া ও করদরাজ্য ত্রিবাঙ্কুরের সীমানা।

বিকালের দিকে বাজার দেখতে গিয়ে বোঝা গেল যে, শ্বেতচর্মের সংখ্যাটা কোডৈ-এ বেশ পুষ্ট।

মিউনিসিপ্যাল মার্কেট-এর সামনে বসেছিল এক ফেরিওয়ালা পুঁতির মালা সাজিয়ে। ছোট একটি তামিল্ মেয়ে একটি মালা কিনে পরলো। কাছেই এক মেহাঙ্গিনী সপিঙ্ করছিলেন। তাঁর সঙ্গের বছর আটের মেয়েটি ঐ পুঁতির মালা কেনবার জন্ত আবদার ধরলো। মহিলাটি কিছুতেই মালা কিনে দিলেননা। মেয়েটিকে ওই সব বাজে জিনিসের পিছনে না ছুটতে এবং Silly না হতে উপদেশ দিয়ে হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন। সতৃষ্ণ নয়নে সে বার বার তমিল মেয়েটির গলার দিকে চাইতে চাইতে এক সময় দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো।

কোডৈ-এর বাজারে সারা বছরই শীতকালীন শাক-সব্জি পাওয়া যায়। সবই স্থানীয় উৎপাদন।

এখানে ফলের ফলনও ভাল। বিশেষ করে, পেরিকক্কাই, অন্নাসিপ্পলম্ ও বারলৈপ্পলম্-এর। তমিল, এই শব্দগুলির অর্থ যথাক্রমে—নাশপাতি আনারস ও কলা। এ্যাপ্রিকট এবং প্লামস্ আছে। আছে দ্রাক্ষৈপ্পলম্ অর্থাৎ দ্রাক্ষা। তবে, সবচেয়ে বিস্ময়কর এই পাহাড়ী অঞ্চলে পলাপ্পলম্-এর প্রাচুর্য। অতি স্বাদিষ্ট পলাপ্পলম্—কাঁঠাল।

হিল্‌স্টেশন হলেও এবং আমেরিকান ও মহার্ঘ জীবন-যাত্রার অত্যন্ত অস্তান্ত স্বদেশী বিদেশী বাসিন্দা থাকা সত্ত্বেও, কোডৈকক্কানল্-এ ভারতের অন্যান্য শৈলাবাসের মত ফ্যাশন-বাবুদের প্রাদুর্ভাব নেই: নেই exhibitionist-দের ভিড়।

আর নেই অপরাপর হিল্‌স্টেশন্-এর মত সমতল ভূমির অনুপাতে জিনিসপত্রের দামের মহার্ঘতা। কোডৈ-এ এক কাপ ভাল কফি উনিশ নয়া পয়সাতেই পাওয়া যায়। যেমন পাওয়া যায় মাদ্রাজ রাজ্যের সমতলের শহরগুলিতে। এদেশী নিরামিষ শাপ্পাড় সাতাশি নয়া পয়সায়ই সারা যায়।

বাজারের আশে পাশে ঘুরতে ঘুরতে সাহেবী স্কুলের কাছে গিয়ে পড়েছিলাম।

তখন সবেমাত্র স্কুলের ছুটি হয়েছে। দলে দলে ছেলে-

কোডৈকক্কানল্ স্কুল, কোডৈক্ কানল্

মেয়ে বেরিয়ে আসছে। বেশীরভাগই শ্বেতকায়। পড়ুয়াদের মধ্যে যারা কৃষ্ণকায় তারা অবশ্যই ধনীর দুলাল, দুলালী। আচরণে বিদেশী হওয়ার ছাপ পড়েছে। ওরা সাহেব হবেই।

তবে না শুধু এদেশের মাটির পরিবর্তন। এই মাটিতেই ওদের বাস করতে হবে,—থাকতে হবে এই দেশেরই মানুষদের সঙ্গে।

সন্ধ্যার পর থেকে ঠাণ্ডাটা বাড়তে লাগলো।

রাতে পড়লো একটু বেশী শীত।

শিমলা, নৈনিতাল, মুসৌরি—এমন কি স্থানে স্থানে

দার্জিলিংয়ের চেয়ে উচ্চতর হলেও, হিমালয়ের মত তুষারাচ্ছন্ন পর্বতের সান্নিধ্য না থাকায় শীতের তিন মাস ছাড়া কোডৈ-এর শীত অসহনীয় নয়।

তুষার-মৌলি গিরির আজব ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের বিচারে কোডৈকানল্ নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর শৈলাবাস।

রাতের অন্ধকার কাটেনি,—শুকতারাটি তখনও জ্বল জ্বল করছে। বেরিয়ে পড়লাম কার্স্ট বাস্‌টা ধরবার জন্য। মধুরৈ যেতে হবে।

হোটেলের ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করলেন: সরকারী কাজে এসেছিলেন বুঝি?

বললাম: না।

: তবে?

: এমনি।

যখন কিছু প্রকাশ করতে না পারা যায়, তখন ঐ 'এমনি' শব্দটি অতি উপযুক্ত।

কিন্তু কেন এসেছিলাম?—

'তিনি' এখানে কি রূপ কোটাচ্ছেন, তাঁর প্রকৃতি-প্রিয়াকে কেমন করে সাজিয়েছেন তাই দেখতে নয় কি?

ছ'টায় বাস্ ছাড়লো।

পথে পড়লো কয়েকটি কফি বাগান। বাস্ চললো সেমবগনূর ঘুরে। সেম্বগনূর কোডৈর পরবর্তী দ্বিতীয় বৃহত্তম পার্বত্য বসতি।

ত্রিশ মাইল পাহাড়ের বেড়াজাল অতিক্রম করে সমতলে নামতেই চোখে পড়লো পথের ধারে একটা বোর্ড-এ লেখা—Thank you-Please visit again. আবার আসার নিমন্ত্রণ!

লেখাটিকে পিছনে ফেলে, ঘণ্টায় ত্রিশমাইল বেগে, বাস্ ছুটলো কোডৈ রোড্ স্টেশনের দিকে।

তাকে তুতিকোরিন্ এক্সপ্রেস্ ধরতে হবে।

৫

মন্দির ভারতের অধ্যাত্ম-জীবনের পরিচয়,—পরম-চিন্তার অভিজ্ঞান,—ইতিহাসের উপাদান।

প্রবল প্রতাপ রাজশক্তিকে উপেক্ষা করেছে ভারতের মানুষ,—মন্দিরের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে।

রাজা গেছেন,—রাজপ্রাসাদ, রাজধানী, রাজত্বও হয়তো তাঁরই সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে। দুর্ধর্ষ রাজ-শক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কাল প্রভাবে।

কিন্তু যদি রাজার প্রতিষ্ঠিত মন্দির থাকে তবে, এখনও তাঁর নামের শেষ হয়নি। জনসাধারণ সংশ্লিষ্ট মন্দিরটিকে যুগ যুগান্তর ধরে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাতেই বেঁচে আছে রাজার স্মৃতি, রাজার নাম। মন্দির তাঁর স্মৃতিকে দিয়েছে অমৃতত্ব।

মন্দির-প্রাণ ভারতীয় সভ্যতার কালভুক্ত বহু পুরা-কীর্তির কোলে দাঁড়িয়ে,—ধ্বংসাবশেষের মাঝে একক বেঁচে থাকা মন্দিরের দিকে চেয়ে,—এই কথাটি আমার বারে বারে মনে হয়েছে।

মধুরৈ-এ পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই মীনাক্ষী মন্দিরের একটি গোপুরম্ দেখতে পেয়ে মনে পড়লো ঐ কথাটিই।

শতাব্দীর পর শতাব্দী মধুরৈকে সারা ভারতে প্রসিদ্ধ করে রেখেছে মীনাক্ষী মন্দির। আর তারই সঙ্গে বেঁচে আছে দুজন নায়ক রাজার নাম।

মধুরৈ বা মদুরৈ ইংরেজীর মাধ্যমে মাদুরা বলে পরিচিত।

নামটির উৎপত্তি সম্বন্ধে দুরকম মত শোনা যায়। কিংবদন্তীতে প্রকাশ, শিব এই নগরীর অপরূপ শোভায় মুগ্ধ ও প্রীত হয়ে এর উপরে মধু বর্ষণ করেন। সেই হতে এর নাম হয় মধুরৈ (মধুরা)।

অন্য এক মতে এর নাম মধুরৈ। মধুরৈ শব্দটি আর্যাবর্তের বা উত্তর ভারতের 'মথুরা'র তমিল প্রতিশব্দ। (তমিল শব্দের শেষস্থ 'ঐ' বাংলা, হিন্দী ইত্যাদির 'আ'-এর অনুরূপ।) অতএব মধুরৈ অর্থে মথুরা। সম্ভবতঃ স্থানটিকে দক্ষিণ ভারতের মথুরা হিসাবে গণ্য করা হতো।

শেষের মতটিই সমীচীন মনে হয়।

তিনদিকে আনৈমলৈ, নাগমলৈ ও পশুমলৈ অর্থাৎ হস্তী-গিরি, নাগ-শৈল এবং গো-পর্বত নামে তিনটি পাহাড়ের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা মধুরৈ,—তামিল্ নাদুর দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী। খৃষ্টপূর্ব কাল থেকে মধুরৈ-এর প্রসিদ্ধি দেশ দেশান্তরে বিস্তৃত।

মধুরৈ

এখানের পাণ্ড্যি রাজ সুদূর রোম নগরে দূত পাঠিয়েছিলেন। সেখানের নানা প্রাচীন গ্রন্থে মধুরৈর উল্লেখ থাকায় অনুমিত হয় যে, মধুরৈর সঙ্গে ইউরোপের, বিশেষ করে রোম-এর বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। মধুরৈ ও পশুমলির মধ্যবর্তী এক গ্রামে, ১৮৫৬ সালে, রোম-রাজ অগস্টস্-এর স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় এই ধারণার সমর্থন পাওয়া গেছে।

খৃষ্টপূর্ব-কালের মধুরৈর সমৃদ্ধি বিষয়ে বিক্ষিপ্ত সূত্রাদি পাওয়া গেলেও তৎকালীন মধুরৈর শাসক কুলের ইতিহাস অজ্ঞাত।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে চোল রাজ, মধুরৈ সমেত পাণ্ড্যি রাজ্য দখল করেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে পাণ্ড্যিরা স্বরাজ্য উদ্ধার করেন। চতুর্দশ শতকে আলাউদ্দিন খিলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর কর্তৃক মধুরৈ আক্রান্ত ও অধিকৃত হয়। তখন হতে প্রায় পঞ্চাশ বছর মধুরৈ-এ মুসলিম আধিপত্য চলে। পরে বিজয়নগর রাজগণ স্থানটি উদ্ধার করেন। মধুরৈ ও তার অধীন স্থানগুলি তাঁদের আশ্রিত করদরাজ্যে পরিণত হয়।

১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে তেরুচাবুরু-এর চোল রাজ মধুরৈ আক্রমণ করলে হীনবল পাণ্ড্যি-রাজ পালিয়ে যান ও বিজয়নগররাজের সাহায্য প্রার্থী হন।

তেরুচাবুরুও তখন বিজয়নগরের আশ্রিত রাজা ছিল। চোল-রাজের হঠকারিতার শাস্তি বিধানের জন্য বিজয়নগর-রাজ তাঁর সেনাপতি নাগম্ নায়ককে পাঠালেন। নাগম্ বিনা বাধায় মধুরৈ অধিকার করলেন, কিন্তু পাণ্ড্যি-রাজকে মধুরৈর সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না করে নিজেকেই ঘোষণা করলেন রাজা হিসাবে।

এই বিশ্বাসঘাতকতায় রুষ্ট হলেন বিজয়নগররাজ। তিনি তাঁর সেনাপতিদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন: কে নাগম্-এর ছিন্ন মুণ্ড এনে দিতে পারবে?

নাগম্-এর মত যোদ্ধার বিপক্ষে কেউই যেতে সাহসী হলেন না।

হঠাৎ সকলকে চমকিত করে এগিয়ে এলেন এক দীর্ঘ-দেহী যুবা,—নাগম্-এরই ছেলে বিশ্বনাথ নায়ক।

বিশ্বনাথ বললেন: বিশ্বাসঘাতক আমার কাছে বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আর কেউ নয়। আমি তাকে জীবিত বা মৃত যে কোনও অবস্থায় নিয়ে আসবই।

নাগম্‌কে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করে আনলেন বিশ্বনাথ।

পরে অবশ্য, বিজয়নগর রাজের কাছ থেকে তাঁর প্রাণ ভিক্ষা করলেন।

বিশ্বনাথের প্রার্থনা তো মঞ্জুর হলোই, উপরন্তু, প্রীত হয়ে রায় রাজ তাঁকে মধুরৈ-এ পাণ্ড্যি-রাজের সহ-প্রশাসক নিযুক্ত করলেন।

তখন হতেই হলো মধুরৈ-এ নায়ক প্রভুত্বের সূত্রপাত; পাণ্ড্যি রাজারা রইলেন নামেই রাজা। পরবর্তীকালে তিরুমাল্ নায়ক খোলাখুলি ভাবে নিজেকে মধুরৈ-এর রাজ চক্রবর্তী বলে ঘোষণা করলেন।

মধুরৈর সমৃদ্ধি ও গৌরবের ইতিহাস আরম্ভ হয় নায়ক-রাজকুলের শাসন কাল থেকেই।

বিশ্বনাথ নায়ক বর্তমান মধুরৈ শহরটির ভিত্তি স্থাপন করেন। মীনাক্ষি মন্দিরটিকে কেন্দ্রে রেখে, শহরের চারদিকে প্রাকার দিয়ে, তিনি মধুরৈর নিরাপত্তা সুদৃঢ় করেছিলেন। আজও শহরটি ঠিক তেমনি মন্দির কেন্দ্রিক-রূপে বিরাজ করছে।

বিশ্বনাথের দেওয়া চিত্তিরৈ, আবণি, মাসি ইত্যাদি পথের নামগুলি এখনও অপরিবর্তিত।

১৬১৩ হতে ১৬১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মদুরৈর সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন তিরুমাল্।

তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁর শিল্পীসুলভ মনোভাবের জন্য।

মীনাক্ষী মন্দিরের প্রধান রায়-গোপুরম্‌টি তিরুমাল্-এরই রচনা। তাঁর নির্মিত তিরুমাল্ প্যালেস্ মদুরৈ-র অন্যতম দ্রষ্টব্য। শেষ বয়সে তিনি অত্যন্ত খামখেয়ালী এবং অনাচারী হয়ে পড়েন।

শোনা যায় যে, তিনি কৃশ্চান যাজক রবার্ট ডি নোবিলির প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট হয়ে পড়েন ও যাজকের প্রভাবের ফলে হিন্দু দেব-দ্বিজের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে তিরুমাল্ কৃশ্চান হবার উপক্রম করলে মীনাক্ষী মন্দিরের পুরোহিতরা নাকি রাজাকে সুকৌশলে অপসারিত করেন।

ব্রাহ্মণ কুলশেখরের নির্দেশে, চারজন পুরোহিত গোপনে রাজাকে সংবাদ দেন যে, তাঁরা মীনাক্ষী মন্দিরের ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ পথের এক জায়গায় এক ধনভাণ্ডার আবিষ্কার করেছেন।

একথা শুনে তিরুমাল্ গোপনে তাঁদের সঙ্গে সেই ধন ভাণ্ডার দেখতে যান।

তিরুমাল্ সুড়ঙ্গ পথে ঢুকতেই পুরোহিতরা সুড়ঙ্গের মুখ বিরাট পাথর দিয়ে বন্ধ করে দেন। অবরুদ্ধ তিরুমাল্ লোকচক্ষুর অন্তরালে অনাহারে তিলে তিলে প্রাণ হারান।

ব্রাহ্মণরা প্রচার করেন, রাজা মীনাক্ষী দেবীর আরাধনা করতে করতে বিলীন হয়ে গেছেন!

অপর একটি জনশ্রুতিতে প্রকাশ যে, তিনি গভীর নিশীথে নগরীর কোনও এক গোপন প্রণয়িনীর কাছ থেকে ফেরবার পথে এক কূপে পড়ে নিহত হন।

শেষের কাহিনীটিই সমধিক প্রচলিত।

বিলাস ব্যসন ও শিল্প চর্চা নিয়ে সময় কাটানোর ফলে তিনি রাজকার্যে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় রেখে যেতে পারেননি।

নায়ক বংশের উল্লেখযোগ্যা মহিলা-শাসিকা ছিলেন মঙ্গম্মাল্।

তিনি তাঁর নাবালক পৌত্রের অভিভাবিকা হিসাবে পনরো বছর রাজকার্য পরিচালনা করেছিলেন। পথ ঘাট, মন্দির প্রভৃতির সংস্কার,—ধর্মশালা ইত্যাদি স্থাপন এবং নানা জনহিতকর কাজের জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন মঙ্গম্মাল্।

তাঁর প্রজা বাৎসল্য ও জনহিতৈষণার অতিশয্য কিন্তু কিছুসংখ্যক লোকের চিন্তায় বিঘ্ন হয়ে ওঠে। ফলে, হিন্দু বিধবার পক্ষে দয়া ধর্ম প্রবণতা স্বাভাবিক না ধরে, তাঁরা মঙ্গম্মাল্ এর ঐরূপ আচরণের পিছনে কি উদ্দেশ্য বা প্রেরণা থাকতে পারে তা আবিষ্কারে তৎপর হন।

তাঁদের অনেকেরই বিশ্বাস জন্মায় যে, মঙ্গম্মাল্ তাঁর মন্ত্রীর প্রতি আসক্তা। আর সেই কারণেই ধর্মাচরণ ও জনহিতকর কাজের আতিশয্যের ভেখ নিয়েছেন। পৌত্রের সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত বয়স হলেও মঙ্গম্মাল্ নিজ অধিকার ছেড়ে সরে দাঁড়াতে চাইলেন না। রাজ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিল এবং মঙ্গম্মাল্ কারারুদ্ধ হলেন।

আহার্য না দিয়ে অতি নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল।

মীনাক্ষী মন্দিরটি স্থাপত্য শিল্পের এক মূর্তিমান্ বিস্ময়। প্রাকার সমেত মন্দিরটির আয়তন সাড়ে পনরো একর। মীনাক্ষী ও সুন্দরেশ্বরের গর্ভ গৃহ দুটি পাণ্ড্যদের রাজত্বের আমলের। বাকী সব কিছুই ১৩১০ সালে মালিক কাফুর মাদুরা বিধ্বস্ত করার পরবর্তী কালের।

বর্তমান মন্দিরের শুভ পত্তন করেন বিশ্বনাথ নায়ক,—১৫৬০ খৃষ্টাব্দে। উত্তরকালীন রাজগণের সময়ে মন্দিরটি ক্রমে ক্রমে ইদানীন্তন আকার পায়।

পূর্ণ কলেবর হতে সময় লাগে একশ' কুড়ি বছর।

মন্দিরের চারটি গোপুরম্। পূর্ব গোপুরম্‌টি ছাড়া-অন্যগুলি যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হয়। অথচ, পূর্ব গোপুরম্‌টিই প্রাচীনতম।

জনশ্রুতিতে প্রকাশ, রাজা চোক্কনাথন্ নায়কের রাজত্বকালে মন্দিরের পুরোহিত ও কর্মীদের উপর কর আরোপ করা হলে, তার প্রতিবাদে, একজন কর্মচারী পূর্ব গোপুরম্‌টির চূড়া হতে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। ফলে ওই কর প্রত্যাহৃত হয়। তখন হতে গোপুরম্‌টি প্রেত

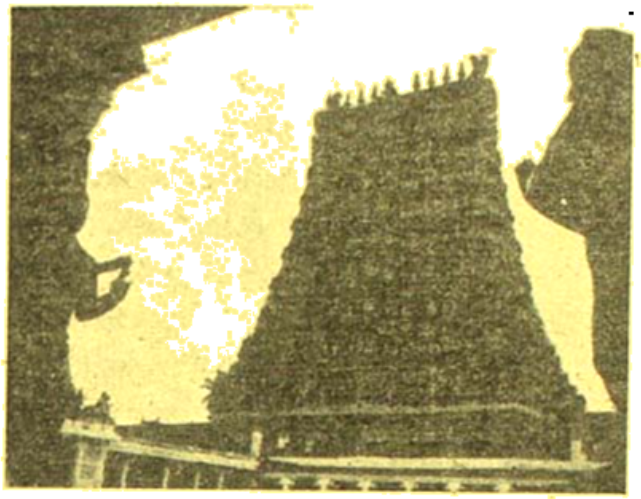

মীনাক্ষী মন্দির—মদুরৈ

শক্তিমূর্তি—মদুরৈ

অধ্যুষিত বলে পরিত্যক্ত হয়েছে। গোপুরমটির আঠারোটি সিঁড়ি এখন শুধু শপথের কাজে ব্যবহৃত হয়। সিঁড়িগুলি দিয়ে ওঠা নামা করতে করতে শপথকারী যা সত্য বলে ঘোষণা করেন, তা যদি অসত্য হয় তো আঠার দিনের মধ্যে শপথকারীর মৃত্যু অনিবার্য বলে একটা বিশ্বাস প্রচলিত।

এই গোপুরম্ সংলগ্ন সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপটিতে পুরী, কোণার্ক প্রভৃতির মত কয়েকটি মৈথুন মূর্তি আছে।

পশ্চিম গোপুরমটি শাস্ত্রানুসারে অতি বিশিষ্ট স্থানাধিকারী। উত্তর গোপুরমটির নাম মোট্টৈ গোপুরম্। মোট্টে কথাটির অর্থ, মুণ্ডিত। গোপুরমটি বহুকাল শিখরহীন অবস্থায় পড়েছিল বলে ওই নাম হয়েছিল।

মোট্টৈ গোপুরম্-এর কাছে আছে কয়েকগুলি ভগ্নস্তম্ভ। পাথরের স্তম্ভগুলিতে আঘাত করলে সা-রে-গা-মা ইত্যাদি ধ্বনি ওঠে। দক্ষিণ গোপুরমটি উচ্চতম।

পূর্ব গোপুরমটি পরিত্যক্ত হওয়ায় বর্তমানে অষ্টশক্তি মণ্ডপের মধ্য দিয়ে মন্দিরে প্রবেশের প্রকৃষ্ট পথ নির্দিষ্ট হয়েছে। মণ্ডপটির আটটি স্তম্ভসংলগ্ন মাতৃ-মূর্তিগুলির রূপসৃষ্টি ভাস্কর্যের এক অত্যুচ্চ স্বাক্ষর।

মূর্তিগুলি মহিষাসুর নিধনের কালে দেবী যে অষ্টশক্তি পরিবৃতা হয়েছিলেন সেই চণ্ডিকা, চণ্ডাবতী, চণ্ডরূপা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডোগ্রা, উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা এবং অতিচণ্ডার।

পরবর্তী আকর্ষণীয় মণ্ডপটির নাম মীনাক্ষী মণ্ডপম্। এই মণ্ডপের প্রবেশ দ্বারের একটি বিঘ্ননাশক অর্থাৎ গণেশ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণা পথে প্রত্যেক শিব বা শৈব মন্দিরের প্রবেশ পথে গণেশের মূর্তি স্থাপন অবশ্য কর্তব্য। আলোচ্য গণেশের বাম উরুতে উপবিষ্টা এক নারীমূর্তি কৌতূহলের উদ্রেক করে।

এই ধরণের প্রতিকৃতি দক্ষিণ ভারতের অনেক মন্দিরেই দেখা যায়। মাদ্রাজ শহরের কপালীশ্বরের মন্দিরের ছাদে এরূপ গণেশ মূর্তি আছে।

উত্তর ভারতে এ ধরণের মূর্তি বিরল। প্রচলিত কাহিনীতে প্রকাশ,—শিব ও পার্বতী গণেশকে বিয়ে করতে বলায় গণেশ বলেন যে, মা পার্বতীর মত রূপগুণসম্পন্না পাত্রী পেলে তবেই তিনি বিয়ে করবেন।

কিন্তু পার্বতীর মত রূপগুণসম্পন্না দ্বিতীয় নারী তো সম্ভব নয়। সুতরাং গণেশের বিবাহ হলো না।

তাই গণেশ প্রতিশিবমন্দিরের প্রবেশপথে বসে মন্দির দর্শনার্থী অনূঢ়া মেয়েদের মধ্যে নিজের ঈপ্সিতার

সন্ধান করছেন ? উর্দ্ধদিকে উড়তে স্থ পিতা নারী মূর্তিটি তাঁর ঐরূপ বিবাহের নিদর্শনের এক পাখী।

গণেশকে তামিলভূমির গ্রাম্য লোকেরা বলেন—হস্তী-দেবতা। তাছাড়া পিল্লৈয়র, বিনায়কন্ এবং গণপতি নাম সুপ্রচলিত।

মন্দির মধ্যে স্বর্ণ-পদ্ম পুষ্করিণী।

দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্ম-হত্যার পাপ হতে মুক্তির জন্য এই জলাশয়ে স্নান করেছিলেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা যে, এই পুষ্করের জলে মাছ বা ব্যাঙ্ নেই।

স্বর্ণ-পদ্ম পুষ্করিণীর সংলগ্ন, পশ্চিমদিকের অলিন্দটিকে বলা হয় কিলি কূট মণ্ডপম্। কিলি অর্থে তোতা

মীনাক্ষি মন্দিরের দক্ষিণ গোপুরম্—নম্বুর পাখী,—কূটুর অর্থ খাঁচা। মণ্ডপটিতে কতকগুলি খাঁচায় তোতা পাখী রাখা হয় বলেই এরূপ নামকরণ।

তোতা পাখী মীনাক্ষি দেবীর অতি প্রিয়।

কিলি কূটু মণ্ডপের সংলগ্ন পশ্চিমদিকের কক্ষটিই দেবী মীনাক্ষীর অধিষ্ঠান স্থল।

মীনাক্ষী দুর্গারই নামান্তর। অর্থ,—মাছের মত চক্ষু বিশিষ্টা। দেবীর এরূপ নামকরণ সম্পর্কে স্থানীয় বক্তব্য এই যে, মাছ যেমন তার ডিমগুলির দিকে তাকিয়ে থাকলে তার দৃষ্টির শক্তিতে ডিমগুলিতে প্রাণ সঞ্চার হয়, তেমনি, দেবী মীনাক্ষীর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলে দেবীর দৃষ্টি প্রভাবে দর্শকের মনে আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্ম হয়। অন্য একটি মত এই যে, দেবী দুর্গা উত্তরে যেরূপ পর্বতরাজের কন্যা, সেইরূপ এখানে তিনি কোনও এক পাণ্ড্যের রাজার কন্যারূপে পরিগণিতা। উক্ত রাজার মঙ্গল-চিহ্ন ছিল মীন। তাই তাঁর কন্যার নাম মীনাক্ষী।

সুন্দরেশ্বর শিবের সঙ্গে মীনাক্ষী পরিণীতা।

যদিও সুন্দরেশ্বর মীনাক্ষীর পতি তবু, পিতৃগৃহে অধিষ্ঠিতা মীনাক্ষীর প্রাধান্যই বেশী।

মন্দিরের অন্যতম সুদৃশ্য মণ্ডপ হলো কল্যাণমণ্ডপম্। তমিল্। ভাষায় কলিয়াণম্ (কল্যাণম্) কথাটির অর্থ বিবাহ। মণ্ডপটিতে এক নির্দিষ্ট তিথিতে মীনাক্ষী ও সুন্দরেশ্বরের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

দক্ষিণভারতে প্রায় প্রত্যেক শিবমন্দিরেই কল্যাণ-মণ্ডপম্ থাকে।

সুন্দরেশ্বর বিরাজ করছেন মীনাক্ষীর কক্ষটির উত্তরে, কম্বাত্তি-মন্টপম্ সংলগ্ন গর্ভগৃহে।

কম্বাত্তি মণ্ডপটি যেন ভাস্কর্যের যাদুঘর। মণ্ডপের প্রতি স্তম্ভেই একটি করে অনন্যসুন্দর মূর্তি। অধিকাংশই শিবের ও শিব-পার্বতীর। যার মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো—অনুগ্রহদায়ী, ঊর্ধ্ব-তাণ্ডবরত এবং গজমস্তকে নৃত্যশীল শিব, নটরাজ, কৈলাসে উপবিষ্ট হর-পার্বতী, নন্দী পৃষ্ঠে শিব-পার্বতী ইত্যাদি।

মীনাক্ষীকে সুন্দরেশ্বরের হাতে সম্প্রদানের মূর্তিটি কম্বাত্তি মণ্ডপের শ্রেষ্ঠ ও সূক্ষ্মতম কারুকৃতি।

শিবানুচর অঘোর বীরভদ্র এবং অগ্নি-বীরভদ্রের মূর্তি দুটিও উল্লেখ যোগ্য।—

দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা শুনে সতী করলেন দেহত্যাগ। ক্রোধে উন্মত্ত হলেন শিব। নিজের মুখ গহ্বর হতে সৃষ্টি করলেন বীরভদ্রকে।

বীরভদ্র অতি ভীষণ দর্শন। তার সহস্র মুণ্ড, অগ্নি-শিখাময় দেহ, বিকট মুখ ও দীর্ঘ হস্ত। যি সহস্র হস্তে শূল টঙ্কা ও মুদ্গর।

---

* স্কন্দপুরাণ অনুসারে কিন্তু, গণেশ 'পুষ্টি' নামক দেব-কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্ত্রশাস্ত্রেও বিনায়ক নামধেয় গণেশের শক্তির অর্থাৎ স্ত্রী অংশের নাম 'পুষ্টি'।

বীরভদ্র দক্ষের শিরশ্ছেদ করে রক্ষপট্টদের প্রহার করতে লাগলো।

দেবতাদের কাতর প্রার্থনায় বিষ্ণু এসে বীরভদ্রকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করে অকৃতকার্য হলেন। পরিশেষে ব্রহ্মার স্তুতিতে শান্ত হলো বীরভদ্র।

সুন্দরেশ্বরের কক্ষমণ্ডপাদিই মীনাক্ষী মন্দিরের অধিকাংশ দখল করে থাকা সত্ত্বেও এবং সুন্দরেশ্বরের মণ্ডপটির ভাস্কর্যাদি সুন্দরতর হওয়া সত্ত্বেও মন্দিরটির নাম 'মীনাক্ষী' হওয়ার কারণ বোঝা দুষ্কর।

যদি ধরা যায় যে, (মাতৃ) শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়াই এর উদ্দেশ্য তাতেও কিন্তু সংশয় মোচন হয় না। কারণ বাঙলা দেশের মত দক্ষিণ ভারতে মাতৃশক্তির বা দেবীর প্রাধান্য দেখা যায় না। শিব ও বিষ্ণু নিয়েই চলে দক্ষিণাপথের ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড, উৎসবাদি।...

মীনাক্ষী দর্শনের পর দেখতে গিয়েছিলাম তিরুমাল্-এর প্রাসাদ। প্রাসাদটির অধিকাংশই আদালতে রূপান্তরিত হয়েছে।

তিরুমাল্-এর প্রাসাদ থেকে ফেরবার পথে প্রচুর আঙুর বিক্রি হতে দেখে কেনবার ইচ্ছা হলো।

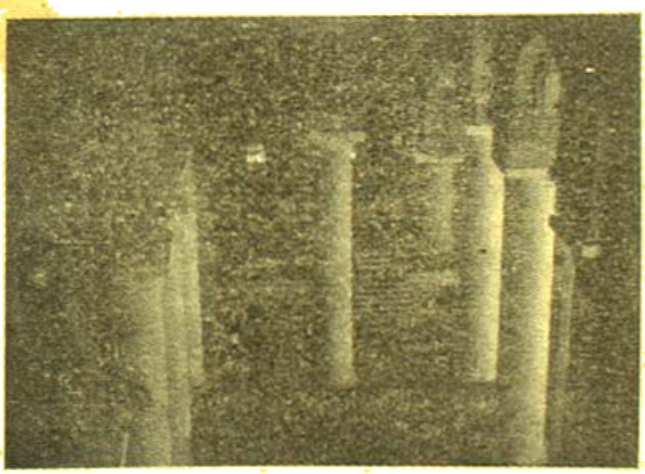

তিরুমল প্রাসাদের একাংশ—মদুরৈ

নীলগিরি ও পলনি অঞ্চলের আঙুর,—দাম খুবই সস্তা। মাত্র সাড়ে বারো টাকা মণ!

এমন বস্তু ছাড়া চলেনা। অন্ততঃ তিন চারদিন চলবার মত নিয়ে রাখা উচিত। তাই 'মণ প্রতি যত তফা হইবেক ধর, আড়াই সেরের দাম তত আনা ধর'—আর্যাটি আওড়ে নিয়ে দশরা ছ' আনা পয়সা দিয়ে এক ফেরিওয়ালাকে আঙুর দিতে বললাম।

লোকটি পয়সাটা গুণে ছ' আনা রেখে বাকীটা ফেরৎ দিলো। ভাবলাম একবারে পাঁচ পোয়া নিচ্ছি বলে বোধ-হয় এক পয়সা কম নিলো।

তার পরের ব্যাপার দেখে তো আমি হতবাক! লোকটি পাউণ্ড্-এর বাটখারায় বারো আউন্স অর্থাৎ মাত্র সেড় পোয়ার মত আঙুর ওজন করে দিলো।

রহস্য এই যে, এ অঞ্চলে মণ অর্থে ২৫ পাউণ্ড। ৮২½ পাউণ্ডের মণও আছে। তাকে বলা হয় 'বেঙ্গল মন্ড্'।

তমিল নাড়ুতে ইংরেজীর মাধ্যমে যে অক্ বেঙ্গল্ ও বেঙ্গল্ মন্ড্—এই দুটি কথা সর্বসাধারণের সুবিদিত।

আর আছে—বেঙ্গল গ্র্যাম্। কপিল বর্ণের ছোলার নাম এদেশে বেঙ্গল্ গ্র্যাম্।

এ ছাড়া বেঙ্গল্ সম্পর্কে অধিকাংশেরই আর কোনও ধারণা নেই। যেমন আমাদেরও নেই তমিল্ নাড়ুর সম্বন্ধে।

পরের দিন।

মদুরৈ-এ প্রাচীন ভারতের কারুকৃতির সৃষ্ট রূপ-সাগরে অবগাহন হয়েছে শেষ। মীনাক্ষী দর্শনের তৃপ্তিতে মন ভরপুর। এবার যেতে হবে কন্যাকুমারিকার পথে, তিরুনেল্বেলি।

স্টেশনে যেতে যেতে মনে হলো: মীনাক্ষী মন্দির সম্বন্ধে কলকাতায় ফিরে কি বলবো?

কে যেন কানে কানে বলে গেলো: বলবে যাঁরা স্থাই ফ্রাপায়্-এর রচনা দেখে মাতামাতি করেন, আধুনিক স্থাপত্য কলার ঐশ্বর্যের ভজগানে আত্মহারা হয়ে পড়েন, তাঁদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে মীনাক্ষী দেউল।

[ক্রমশঃ

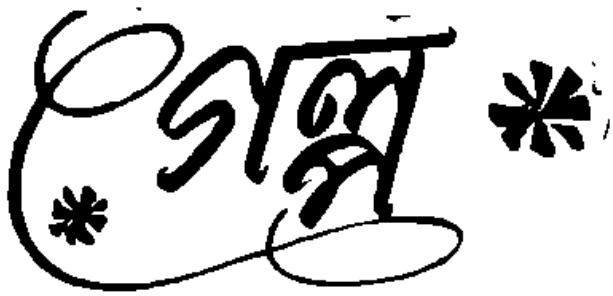

সহযাত্রী

মানসী মুখোপাধ্যায়

ট্রেন ছেড়ে দিল।

দেখতে দেখতে সবিতার করুণ মুখখানি জনারণ্যে হারিয়ে গেল। বারণ করেছিলুম, এসো না। স্টেশন এমন একটি জায়গা যেখানে আগমনীর আনন্দ ও বিসর্জনের অশ্রু যেন গলাগলি করে রয়েছে।

চুপচাপ বসে না থেকে কিছু করলে মনটা হালকা হবে ভেবে উঠে পড়লুম। হোল্ড-অল্ খুলে বিছানা বার করলুম। দুপুরের খাবার সবিতা সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে। একটু পরে খেয়ে-দেয়ে বেশ জুৎ করে একটা ঘুম দেওয়া যাবে। আমাদের মত চাকুরেদের এর জন্য কসরৎ করতে হয় না, ট্রেনের ঝনঝনানি বিরক্ত করতে পারে না।

—মশায়ের কতদূর যাওয়া হবে? আমার সামনের সীটের ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন।

উত্তরে জানাই—প্রতাপগড়। আপনি?

লক্ষ্ণৌ। অনেকক্ষণ এক সঙ্গে থাকব। বিছানার সঙ্গে এমনি বন্দোবস্তি নাইবা করলেন। আমার বিছানাও পাতাই আছে। আসুন, বসা যাক।

এমন অন্তরঙ্গতার প্রতিবাদ করা গেল না। আমি এমনিতেই চুপচাপ থাকতে পারি না। যেচে আহ্বান পেয়ে যেন বর্তে গেলুম।

ভদ্রলোক, মানে প্রমোদবাবুর বিছানায় বসে তাঁকে একটি সিগারেট অফার করে নিজে একটি ধরালুম। তারপর একথা সেকথা বলতে বলতে কখন যেন রাজনীতি চর্চায় পৌঁছে গেছি। কোলকাতা সহরে র‍্যাশনের দুর্ভোগ, গণ-ভোটে হিন্দী ভাষার জয়লাভ, এডুকেশন নিয়ে সরকারের ছ্যাবলামি, নাগা ল্যাণ্ড এবার কাশ্মীরের রূপ ধরল, চীনেরা আবার আক্রমণ করবেই, এই সব উচ্চাঙ্গ বিষয় নিয়ে গাড়ীর দোলায় দুলতে দুলতে আলোচনায় বেশ জমে উঠেছি।

দেখা গেল আমাদের কামরায় প্রায় সকলেই এই এক সুরে ছয়া ছয়া সুরু করে দিয়েছে।

হুঁস হল যখন চলন্ত গাড়ী একটি গর্জন ছেড়ে কোন এক ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল।

উঠে পড়লুম। মুখ বাড়িয়ে দেখি বর্ধমানে এসেছি। বর্ধমানের সীতাভোগ বলতেও শালীটি আমার অজ্ঞান। যাচ্ছি যখন ওর কাছে কিছু নিয়ে যাই। ঘুষ দিয়ে যদি মিষ্টি মুখের মিষ্টি হাসি তাড়াতাড়ি দেখতে পাওয়া যায়।

সীতাভোগের চাঙারী হাতে ফিরে এসে নিজের সীট আর খুঁজে পাইনা। অবাক হয়ে এদিক ওদিক দেখছি দেখে প্রমোদবাবু এগিয়ে এলেন। তারপর চোখ নাচিয়ে বললেন—আপনার বিছানা বে-ওয়ারিশ মাল পেয়ে ঐ ভদ্রমহিলা চেপে বসে পড়েছেন। এই ক্রীস্‌মাসের ভিড়ে নিজের সীট ফেলে যায় কখন? বোকামি করেছেন।

নিজেও বোকামি স্বীকার করি। মনে মনে শালীর মিষ্টি হাসিকে দোষ দিই। এবার নিজের জিনিষের টিকির দর্শন পাই। গুঁড়িয়ে পাতা বিছানা এখন তিন মণ ওজনের মহিলার চাপে ভয়ে জড়সড়। আমায় দেখে পানের ছোপ-ধরা দাঁত বে-পর্দা হল। জানালেন—মালপত্তরের গোছ-গাছ হলে এখুনি উঠে যাচ্ছি। আপনি ততক্ষণ এইখানে বসুন।

ভদ্রতার খাতিরে জানালুম—ঠিক আছে, ঠিক আছে। থাক, আপনি বসুন। তারপর বিজার্ভ করা নিজের আস্ত একখানা সীটের একপাশে একটু জায়গা পেয়ে গুটিয়ে বসলুম।

ভদ্রমহিলার ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখলুম, দুগাছীমেয়েটি ইতিমধ্যেই ওপরের বার্থ-এ বিছানা পেতে ভয়ে শামুকের মত চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। ছেলেটি আমার পাশের

সীটে বসে জানলার বাইরে মুখ বার করে ভসভসিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। যা কিছু করছে সব ছেলের বৌ। জিনিস-পত্তর গোছান হল ও সুরু হল খাবার পালা।

দেখলুম, সঙ্গে ঘরের তৈরী প্রচুর খাবার। এ সত্ত্বেও যেই কোনো ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াচ্ছে অমনি আরো নানা খাবার কিনছেন। কিছু না হোক ত' চা, পান, সিগারেট।

সমানে খেয়ে চলেছেন। মেয়েটি ওপরে বসেই খাচ্ছে এবং খাবার পর নিচে পাতা ফেলে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ছে।

এদের খাবারের পরিমাণ ও খাবার বহর দেখে মনে হল সঙ্গে আনা নতুন সোডামিন্ ট্যাবলেটের শিশিটা বার করে দিয়ে দিই।

ভদ্রমহিলার খাবার মধ্যেও বলার বিরাম নেই। প্রশ্ন করলেন—কী কাজ করেন বললেন? ও মেডিকেল রিপ্রেজেণ্টেটিভ। তা হলে ত' আপনাকে প্রায় ঘুরে বেড়াতে হয়। অনেক জায়গায় ঘুরেছেন নিশ্চয়।

ঘাড় কাত করে জবাব দিই!

—এত যখন ঘুরেছেন তখন ত আপনার অনেকের সঙ্গে জানাশোনা হয়ে গেছে। আপনি যা আপাপী মানুষ তাতে আমার ধারণা নিশ্চয় ভুল নয়।

নাঃ, ভদ্রমহিলা ডায়লেনটেড লেডী। ভাগ করে মুখ খোলার আগেই তিনি আমার ক্যারেক্টার ষ্টাডি করে ফেলেছেন। সদ্য পরিচিতার মুখে নিজের সুখ্যাতি শুনে লজ্জিতও হই। প্রতিবাদ করে কিছু বলার আগেই গাড়ী এসে ষ্টেশনে থামে। অমনি মা-ছেলে মিলে চা আর খাবার কেনাকাটা সুরু হয়ে যায়।

সঙ্গে আনা খাবার খেয়ে শরীরটা ভারি ভারি মনে হয়। এদিক ওদিক চেয়ে শোবার একটু সুলুকসন্ধি খুঁজি। খেয়ে একটু আরাম করব সেই দুপুর থেকে ভাবছি। কিন্তু ভদ্রমহিলা আমার বিছানায় এমন জমে বসেছেন যে ওঠার নামটি নেই।

চা-পানের শেষে ভদ্রমহিলা ছেড়ে যাওয়া কথার নড়া ধরে টান দিলেন। গালে পান-দোক্তা ফেলে আমায় বললেন—এত যখন বেড়িয়েছেন তখন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সংখ্যা নিশ্চয় অনেক।···আচ্ছা, তাদের মধ্যে কোনো ভাল ছেলে, মানে বিয়ের যুগ্যি কোনো ভাল ঘরের বেশ মোটা মাইনের ছেলে—

এমন কথা শুনতে হবে এ আগেই আন্দাজ করে-ছিলুম। তবে ভদ্রমহিলা যে এত তাড়াতাড়ি এমন প্রকট হবেন নিজে হালাল হয়েও ভাবতে পারিনি।

আমার ভাগ্যক্রমে তাঁর কোনো রূপান্তর হল না। নিজের ভঙ্গিমায় বলে চলেছেন—মেয়েকে আমার দেখছেন ত, তারই বলা চলে। এ বছর ফোরথ ইয়ারে উঠল, অথচ বয়েস এমন আর কি। মাথা যেন সাক্ষাৎ সরস্বতীর বাসা, কখনো ফেল করেনি। আবার বই-মুখ একরকে যে বসে থাকে তাও নয়।···আমার সংসার ওই-ই মাথায় করে রেখেছে। কাজে-কর্মে, রান্নাবান্না, সেলাই-ফোঁড়াই যাতে দেবেন এমন গুছিয়ে করে দেবে যে আপনি মুগ্ধ না হয়ে পারবেন না. এই রকম মেয়ের প্রশংসা অনেকক্ষণ ধরে চলল।···

তারপর অমায়িক হাসি হেসে অনুরোধ জানালেন—আপনারও ঘুরে ঘুরে কাজ, আসুন না একদিন আমাদের ওখানে। রোজ সুমির হাতের রান্না খাবেন।

পাঁচ ঘণ্টা এক সঙ্গে বসে থেকে এই এলাহি খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে এক ভাঁড় চা পেলুম না। বাড়ী ঘরে গিয়ে সুমির হাতের রান্নার বদলে কি যে পাব জানি না।

তিনি আমায় বেশীক্ষণ ভাবতে দিলেন না। আরম্ভ করলেন—বিধবার সন্তান, মনে রাখবেন।···এই যখন ওরা এতটুকুটুকু তখন ওদের বাবা মারা যায়। কথার সঙ্গে সঙ্গে হাতের মাপ দিয়ে দেখিয়ে দিলেন ছেলেমেয়ে কতটুকু ছিল। ছেলের দিকে চেয়ে দ-বিষাদে জানালেন—ও ত যা হোক সংসার পেতে বসেছে, এখন মেয়েটার—

কথা আর শেষ হল না। গাড়ী এসে ষ্টেশনে থামল। ওঁরা আবার খাবারের ঝাঁপায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

নিজের বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে শোবার চান্স সাসারামের আগে পাব না। তাই আশা ছেড়ে দিয়ে প্রমোদবাবুর বিছানায় বসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

রাত ন'টা পর্যন্ত বেশ গল্প গুজব করে আরামে কাটল। তারপর সবারের রাতের খাবার তাড়া ও শোবার পালা। আমিও খাওয়া দাওয়া সারলুম। কিন্তু শোবার

জায়গা নেই। এখন আমার সীটে ভদ্রমহিলা দিব্যি এলো-মেলো হয়ে নাক দিয়ে কালোয়াতী সুর ভাঁজছেন।

প্রমোদবাবু শোবেন কিনা ভেবে একটু এমব্যারাস্ বোধ করছিলেন। আমার অনুরোধে শেষে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি তখন তাঁর শ্রীচরণের দাস হয়ে পায়ের কাছে বসে রইলুম।

ছোটবেলার ইতিহাস আমার কাছে ভয়াবহ বস্তু ছিল। যুদ্ধবাজ সম্রাট-বাদশাদের দুচোখের বিষ মনে হত। অমুক জায়গায় অমুক যুদ্ধক্ষেত্রের বিদকুটে নামগুলো মুখস্থ করার আগেই মাথা ধরে যেত। শেরশা কালৌঞ্জর দুর্গে শেষ বন্ধ করেছিলেন। তখন ঐ দুর্গের নাম কিছুতেই মনে রাখতে পারতুম না। শিশু মন, রেগে গিয়ে শেরশার মুণ্ডপাত করতুম। আর যাতে কিছু মনে রাখতে না হয় সে জন্য শেরশার পুরো চ্যাপটার ইতিহাসের বুক থেকে ছিঁড়ে সরিয়ে দিয়েছিলুম।

আজ এই গাড়ীতে, ঘুমঘুপুরীর মাঝখানে বসে পুরোনো দিনের রোমন্থন করি। বসে বসে ভাবি, কতক্ষণে সেই অস্তাম্ব রবীর শেরশার কবর-তীর্থ সাসারাম থামবে। আমি আমার বে-দখল বিছানার দখল পাব।

গার্ডকে এঁরা বোধহয় বলে রেখেছিলেন। সাসারাম আসার আগেই গার্ড ভদ্রমহিলার ছেলেকে ডেকে দিলেন। ভদ্রমহিলাও উঠলেন। বৌ উঠল। মেয়েকে ডাকাডাকি করা হল। জিনিষপত্তর ঠিক করে নেওয়া হল। এখন মেয়ে উঠলেই হয়। ভদ্রমহিলা আরো কয়েকবার মেয়েকে ডেকে গজগজ করতে করতে বাথ-রুমে চলে গেলেন। সাসারামের আর দেরী নেই। মেয়ে কিন্তু 'প্রথম প্রহরে প্রভু চৌকি অবতার' হয়ে শুয়েই রইল।

একবেলা বিচ্ছেদের পর আমার বিছানা খালি পেতেই তাকে তখুনি যেন আঁকড়ে ধরলুম। আর তুল করছি না।

ফিরে এসে ভদ্রমহিলা মেয়েকে তখনো ঐ একভাবে শুয়ে থাকতে দেখে যেন ফেটে পড়লেন—বলি হুঁশি, একি হচ্ছে! ঢের ঢের মেয়ে দেখেছি, কিন্তু এমন মেয়ে আমার বাবার জন্মে দেখিনি!.....গাড়ীতে উঠে সেই যে ওপরে লম্বা হয়েছিস কুঁড়ের বাদশার নাবার নাম নেই!... আষাঢ়ের ঘাটতে ঘাটতে আর ডাকতে ডাকতে প্রাণ বেরিয়ে গেল, উনি দিব্যি শুয়ে আছেন। বলিহারি গুণের মেয়ে বাবা!.....

তারপর আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে রাগের মাথায় বলে চললেন—দেখছেন, কী কুঁড়ে মেয়ে! ঐ রকম, তিরিশ বছরের ধাড়ি মেয়ে অথচ কোনো কাজে কর্মে নেই, কোনো গুণের বালাই নেই।.....যেমন দেখতে প্যাচার মত তেমনি স্বভাব। ঐ জন্যেই ও আইবুড়ি মেয়ের বর জোটে না, আমি কেবল সম্বন্ধ করেই মরি।.....

এরপর মেয়েকে লক্ষ্য করে ভবিষ্যদ্বাণী বর্ষণ করলেন—তোর মত মেয়ের খুবড়ি আইবুড়ো সরস্বতী হয়ে থাকা ছাড়া আর গতি নেই। এই আমি বলে দিলুম।...

কথার শেষে তাঁর গলার স্বর যেন বড় বেশী ভারি হয়ে যায়।

সাসারাম থামতে ওঁরা নেবে গেলেন। আমি গুছিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লুম।

শুয়ে শুয়ে শুনি ঝিমঝিম জল পড়ার শব্দ। হালকা বৃষ্টি পড়তে সুরু করেছে। নিজের চিন্তায় এমন ডুবেছিলুম যে বাইরের জগতের কথা মনে পড়েনি। এখন মুখ বাড়িয়ে দেখি আর শব্দ শুনতে পাই। শব্দ নয় সুর, যেন বেহাগ রাগের করুণ মূর্চ্ছনা একটানা বেজে চলেছে।

হিন্দী ভাষা ও জহরলাল—

স্বর্গত প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহরু ১৯৪৯ সালের ৭ই আগষ্ট লোকসভাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, লোকে যতকাল চাহিবে ততকালই একটি সহযোগী অতিরিক্ত ও বিকল্প ভাষা হিসাবে ইংরেজির ব্যবহার অব্যাহত থাকিবে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিবে হিন্দী-ভাষীরা নহে, হিন্দী যাহাদের মাতৃভাষা নহে তাহারাই। স্বর্গত প্রধান মন্ত্রী ১৯৫৯ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর সংসদে অনুরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি ঐদিন আরও বলেন যে (১) ইংরেজি গৌণভাষা হিসাবেই থাকিতে পারে। লোক-শিক্ষার বাহন আমাদের নিজস্ব ভাষাকেই হইতে হইবে (২) যে কোন রাজ্য ইংরাজি ব্যবহার করিতে পারে (৩) কোন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ কাজকর্ম সেই রাজ্যের ভাষাতেই সম্পন্ন হইবে এবং (৪) সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে ইংরাজির স্থান থাকিবে। বলা হয় যে নেহরুর আশ্বাসকে কার্যে পরিণত করার জন্য ১৯৬৩ সালের সরকারী ভাষা আইন রচিত হয়। ঐ আইনের ২নং টীকায় বলা হইয়াছে যে সংবিধান প্রবর্তনের ১৫ বৎসর পরও ১৯৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী হইতে নিম্নলিখিত রাজ্যের জন্য হিন্দীর সহিত ইংরাজিও চালু থাকিবে—(১) ঐ তারিখের অব্যবহিত পূর্বে যে সকল সরকারী কাজের জন্য ইংরাজি ব্যবহৃত হইত, ঐ তারিখের পরও সেই সেই কাজের জন্য ইংরাজী ব্যবহৃত হইবে (২) সংসদের কার্য পরিচালনায় ইংরাজি ব্যবহার চলিবে। রাজ্যের সহিত কেন্দ্রের ও রাজ্যের সহিত রাজ্যের পত্রালাপে হিন্দীর সহিত ইংরাজির ব্যবহার চলিবে। সুপ্রীম কোর্টে শুধু ইংরাজি ভাষা থাকিবে। হাইকোর্টের বেলায় রাষ্ট্রপতির অনুমতি লইয়া কোন আঞ্চলিক ভাষা বা হিন্দী ভাষা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হইবে। কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা অনুরূপ কোন সংস্থার পরীক্ষায় কি ভাষা ব্যবহার করা হইবে তাহা মুখ্যমন্ত্রীদের সহিত পরামর্শের পর স্থির করা হইবে।

সকলের অবগতির জন্য উপরোক্ত বিষয়গুলি পুনরায় সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইল।

বিধান সভা ও পরিষদে—

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ও বিধান পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু ভাষণ দিতে যাইলে সভায় ভীষণ গোলমাল করা হয়—ফলে মুদ্রিত অভিভাষণ বিতরণ হওয়ায় পর রাজ্যপাল ভাষণ পাঠ না করিয়া সভা ত্যাগ করেন। পরদিন বিধান সভার অধ্যক্ষ রাজ্যপালের ঐ কাজ আইন-সঙ্গত বলিয়া ঘোষণা করেন। পরিষদের সভাপতি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কার্যকালের ঐটি শেষ দিন ছিল তিনি পরিষদের সদস্যদের উদ্দেশে একটি বিদায়ী ভাষণ লিখিয়া মুদ্রিত করিয়া আনিয়াছিলেন—তাহাও পরিষদে পড়ার সুযোগ হয় নাই—শুধু বিতরিত হইয়াছিল।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সারাজীবন অধ্যাপনা কার্যের পর গত ১৯৬২ সালের ১লা জুন পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য ও সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি গত ৮ই অক্টোবর সে পদ ত্যাগ করিয়াছেন। দীর্ঘ ১২ বৎসরের অধিককাল তাহাকে পরিষদের সভাপতির কাজ করিতে হইয়াছিল। এখন তিনি জাতীয় অধ্যাপকের পদে বৃত হইয়া আবার অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণা কার্যে নিযুক্ত থাকিবেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানানুশীলনের জন্য তিনি বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। সম্প্রতি পরিণত বয়সে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। তিনি সুস্থ দেহে আরও বহু বৎসর দেশের সেবায় নিযুক্ত থাকুন, আমরা সর্বনিয়ন্তার চরণে এই প্রার্থনা

জানাই। পরিষদের সভাপতিরূপে তাঁহার সুদীর্ঘকাল নিরপেক্ষ ন্যায় পরিচালনা দেশবাসী চিরদিন শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।

প্রাক্তন মন্ত্রী ডাঃ আমেদ—

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন সমবায় ও কৃষি মন্ত্রী ও কলিকাতার প্রসিদ্ধ হৃদ্‌রোগ চিকিৎসক ডাক্তার রফিউদ্দীন আমেদ গত ৯ই ফেব্রুয়ারী ৭৪ বৎসর বয়সে তাঁহার বালীগঞ্জ প্লেসের বাসগৃহে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্মাহত হইলাম। ১৯৪২ সালে ২৪ পরগণার দেগঙ্গা হইতে বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া তিনি কয়েক বৎসর মন্ত্রীর কাজ করিয়াছিলেন। তিনি 'ভারতবর্ষে'র জন্য বাংলায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সুপণ্ডিত, অমায়িক, পরোপকারী ডাক্তার আমেদ বহুজনপ্রিয় লোক ছিলেন এবং নিরহঙ্কার ও সরল ব্যবহারে সকলকে মুগ্ধ করিতেন। অবসর গ্রহণের পর তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি ও তাঁহার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

ভিয়েৎনামে যুদ্ধে ভারতের উদ্বেগ—

উত্তর ভিয়েৎনামের সহিত দক্ষিণ ভিয়েৎনামের আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে গত ৮ই ফেব্রুয়ারী ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি দিল্লীতে করাচী প্রধানমন্ত্রী আয়ুবের পেপেচুকে বিষয়টির গুরুত্ব সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। শ্রীশাস্ত্রী এ বিষয়ে মার্কিণ প্রেসিডেন্ট ও সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীকে পত্র দিয়া মীমাংসার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। ভারত আজ নিজেই বিপন্ন—চীন ও পাকিস্তান আক্রমণের আশঙ্কায় সর্বদা সন্ত্রস্ত—তাহার পর যদি নিকটে কোথাও যুদ্ধ লাগে, তবে ভারতকে আরও বিব্রত হইতে হইবে। দেশবাসী সকলকে আজ এই সকল বিপদের পরিপ্রেক্ষিতে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে।

শ্রীঅনিলকুমার সেন—

বিহার বিধান পরিষদে বিরোধীদলের নেতা শ্রীঅনিল কুমার সেন গত ১০ই ফেব্রুয়ারী পাটনায় বিধান পরিষদের সভায় হিন্দীতে ভাষণ না দিয়া বাংলা ভাষায় ভাষণ দিতে চাহিলে পরিষদের ডেপুটী সভাপতি তাঁহাকে বাংলা ভাষায় ভাষণ দিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। শ্রীসেন বিহারে পালিত হইয়াও বাংলা ভাষার প্রতি আনুগত্য দেখাইবার জন্য বাংলায় ভাষণ দেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের জ্ঞাতি ভ্রাতা—উভয়ে একই পিতামহের পৌত্র। আমরা অনিলবাবুকে বাংলায় বক্তৃতা করার জন্য অভিনন্দিত করি। সকলেই জানেন, দুর্গাপুর কংগ্রেসে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় চমৎকার নির্ভুল হিন্দীতে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সকলের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন।

সাহিত্যিক সম্মানিত—

২৪ পরগণা জেলার নৈহাটী নিবাসী খ্যাতিমান কবি, লেখক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীঅতুলাচরণ দে পুরাণরত্ন সম্প্রতি পর পর দুইবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

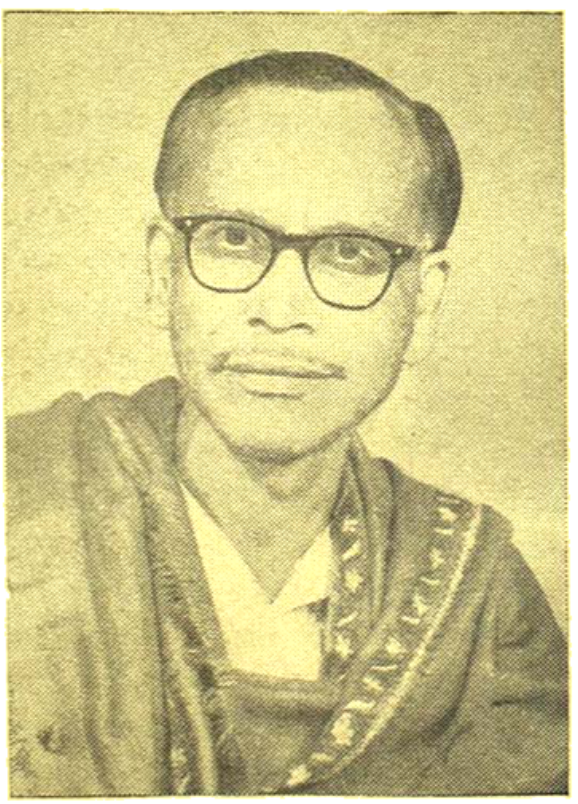

শ্রীঅতুলাচরণ দে পুরাণরত্ন

তিনি সুদীর্ঘ পচিশ বৎসরকাল সাংবাদিকের কাজ করিতেছেন এবং ঐ সময়ে তাঁহার একান্ত চেষ্টায় প্রথমে কাঁঠাল-

পাড়ায় কবি বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানায় সংগ্রহশালা স্থাপিত হয় ও পরে বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বিরাট গৃহ সরকার কর্তৃক গৃহীত হইয়া তথায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে। অতুল্যবাবু অবিবাহিত ও দেশপ্রাণ, তাঁহার চেষ্টায় কলিকাতা এবং প্রতাপ চাটুয্যে লেনের বঙ্কিমচন্দ্রের বসত বাটীও সরকার কর্তৃক গৃহীত হইয়া সাহিত্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। তিনি নৈহাটীর সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত এবং চব্বিশপরগণা জেলা সাংবাদিক সংঘ, চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ, বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন, বারাকপুর মহকুমা সমিতি প্রভৃতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

২৪ পরগণায় জহর জ্যোতি—

স্বর্গত প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর স্মৃতিবিজড়িত জহর জ্যোতি নামক অনির্বাণ দীপশিখা দুর্গাপুর কংগ্রেসের পর গত ১৬ই জানুয়ারী ২৪ পরগণা জেলার আদিলে বরাহনগর অশোকগড়ে সারারাত তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছিল। সে অনুষ্ঠানে জেলার বহু লোক যোগদান করিয়াছিলেন। শোভাযাত্রা সহকারে জহর-জ্যোতি ঐ অঞ্চল পরিক্রমণ করিয়াছিল।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী খুন—

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী বেলা ১১টার সময় পাঞ্জাবের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীপ্রতাপ সিং কায়রণকে চন্ডীগড় যাইবার পথে দিল্লীর নিকট খুন করা হইয়াছে। কায়রণের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীকায়রণ বর্তমান পাঞ্জাবের সংগঠনে একজন প্রধান কর্মী ছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা পাঞ্জাবের বহুবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার সহিত তাঁহার ২ জন সঙ্গীকে হত্যা করা হইয়াছে। হত্যার কারণ জানা যায় নাই।

(দলের চিত্রে জহরজ্যোতি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শিল্পপতি শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, জেলার কংগ্রেস নেতা শ্রীহংসধ্বজ ধাড়া, স্থানীয় তরুণ কর্মী শ্রীমণিমোহন প্রামাণিক প্রভৃতিকে দেখা যাইতেছে।)

বিহারে ফতোয়া প্রত্যাহার—

কিছুদিন পূর্বে বিহার সরকার এক ফতোয়া জারি

করিয়া বিহারের খনির মালিকদিগকে জানাইয়াছিলেন যে বিহারের খনিসমূহে নূতন লোক নিয়োগের সময় শুধু বিহারীদের নিয়োগ করিতে হইবে। সম্প্রতি কলিকাতায় পুরাকল রাজ্যগুলির সম্মিলনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন ঐ বিষয় লইয়া আলোচনা করার ফলে বিহার সরকার পূর্বের ফতোয়া প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের সন্নিহিত বিহার অঞ্চলের খনিসমূহে বহু বাঙ্গালী পুরুষানুক্রমে কাজ করে। তাহাদের অসুবিধার কথা ভাবিয়া বিহার সরকার ঐ আদেশ প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। মন্দের ভাল।

সুপণ্ডিতা শ্রীমতী পুষ্প দেবী—

শ্রীনিকেতনের প্রাক্তন কর্মসচিব সাহিত্যিক সুসন্তান ৺সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ও খ্যাতনামা গণিতাধ্যাপক ৺ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ বিদুষী শ্রীমতী পুষ্প দেবী

সুপণ্ডিতা শ্রীমতী পুষ্প দেবী

উপনিষদগুলি বাংলা কবিতায় অনুবাদ করায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'লীলাপুরস্কার' দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, ভট্টপল্লীর পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে 'সরস্বতী' এবং হিন্দু মিশন তাঁহাকে 'শ্রুতি ভারতী' উপাধিতেও সম্মানিত করিয়াছেন। সুবৃহৎ ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদদ্বয় কবিতায় অনুবাদ করা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। শ্রীমতী পুষ্প অধ্যাপক শ্রীশান্তনুকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী। আমরা তাঁহাকে এই সকল কৃতিত্বের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

কারিগরী ও বিজ্ঞান শিক্ষা—

৬ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে সর্ব-ভারতীয় কারিগরী শিক্ষা-পরিষদের সভা হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীগণি তাহাতে সভাপতিত্ব করেন এবং মধ্য প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীএন-আর দীক্ষিত তথায় ভাষা সমস্যার কথা আলোচনা করেন। তথায় স্থির হয় যে কারিগরী ও বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যাপারে ইংরাজি ভাষায় শিক্ষাদান প্রথা চালু রাখা হইবে। অহিন্দী ভাষী রাজ্য সমূহের শিক্ষামন্ত্রীরাই এই ব্যবস্থার কথা প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু সমস্যা—

ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত গত ৪ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ত্রিপুরা রাজ্যে উদ্বাস্তু সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। গত এক বৎসরে পূর্ব-পাকিস্তানের কুমিল্লা, নোয়াখালি, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলা হইতে দেড় লক্ষ উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়াছে। শ্রীসেনগুপ্ত দিল্লীতে ঐ বিষয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী ও পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রীত্যাগীর সহিতও আলোচনা করিয়াছেন। ত্রিপুরায় বেকার সমস্যাও খুব বেশী—সে জন্য নূতন নূতন কারখানা খোলার চেষ্টা চলিতেছে। উদ্বাস্তু সমস্যা শুধু পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা নহে—সর্ব-ভারতীয় সমস্যা—কিন্তু তথাপি কেন্দ্রীয় সরকার এ সমস্যা সমাধানে অবহিত হন না।

শ্যামনগরে কবি সম্মিলন—

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী রবিবার বিকালে চব্বিশ পরগণা জেলার শ্যামনগরে বঙ্গীয় কবি পরিষদের উদ্যোগে স্থানীয় রাইচরণকর ভাগবতচন্দ্র পাঠাগার ভবনে এক কবি সম্মিলন হইয়া ছিল। প্রবীণ কবি শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য তাহাতে সভাপতিত্ব করেন এবং খ্যাতিমান কবি শ্রীকৃষ্ণধন দে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। পরিষদের সম্পাদক কবিকঙ্কন শ্রীহেমেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় কলিকাতা হইতে প্রায় একশত কবি ও সাহিত্যিক ঐ সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রস্তাবে বর্ত্তমান ভাষা সমস্যা সম্বন্ধে সম্মিলনে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ঐ প্রস্তাবে অহিন্দীভাষীদের উপর হিন্দীভাষা জোর করিয়া চাপাইবার নিন্দা করিয়া ইংরাজি ভাষা আরও দীর্ঘদিন অন্যতম সরকারী ভাষারূপে রাখার কথা বলা হয়।

পরিবার পরিকল্পনা শিক্ষা শিবির—

ভারতীয় পরিবার পরিকল্পনা সমিতির পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে২৪ পরগণা ইছাপুরের সমাজ-সেবক কর্মী শ্রীভবানী প্রসাদ দাশগুপ্তের চেষ্টায় গত ১২, ১৩ ও ১৪ই ফেব্রুয়ারি তিন দিন ধরিয়া গাকলিয়া মিউনিসিপাল হলে এক পরিবার পরিকল্পনা শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। গাকলিয়ার চেয়ারম্যান শ্রীকমলাকর সিং, কলিকাতার ডাক্তার শ্রীমতী সরলা ঘোষ, মেয়র শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী ইলা পাল চৌধুরী, শ্রীমতী চিত্রলেখা ঠাকুর প্রভৃতি শিক্ষা শিবিরে যোগদান ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বহু ডাক্তার, নার্স, শিক্ষাব্রতী প্রভৃতি ঐ শিবিরে যোগদান করিয়া পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিঘাটী গ্রামে উৎসব—

চব্বিশ পরগণা জেলার আগড়পাড়া নিবাসী নামপ্রেমী ভক্তপ্রবর ডাক্তার সরোজকুমার মুখোপাধ্যায় ৭৭ বৎসর পূর্বে হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বরের পশ্চিমস্থ বিঘাটি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মতিথি শিবপক্ষ চতুর্দশী তিথিতে তাঁহার জন্মস্থানে এক উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় হরিসভার পক্ষ হইতে ঐ স্থানটি সংগ্রহ করিয়া তথায় একটি মন্দির নির্মিত হইয়াছে। গত ২১শে ফেব্রুয়ারী বিঘাটী গ্রামে ঠাকুর সরোজকুমারের বার্ষিক অন্যোৎসব উপলক্ষে তথায় বহু লোক সমাগম হইয়াছিল এবং পূজা, ভোগ, নামকীর্তন প্রভৃতির পর এক সভায় সরোজকুমারের জীবনকথা আলোচিত হইয়াছিল। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হাওড়ার উকীল শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বসু ও গোন্দলপাড়ার শ্রীকালীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষণের পর শ্রীসুদেবকুমার মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বিঘাটী একটি গণ্ডগ্রাম, রেল ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে। হরিসভাকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামটিকে উন্নত করা হইলে বহুলোক উপকৃত হইবে।

উড়িষ্যায় নূতন মন্ত্রিসভা—

উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন মিত্র পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থানে শ্রীসদাশিব ত্রিপাঠী কংগ্রেস পরিষদ দলের নূতন নেতা নির্বাচিত হইয়া গত ২১শে ফেব্রুয়ারী মুখ্যমন্ত্রী-রূপে কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মন্ত্রিসভায় ৮জন মন্ত্রী ও ৭জন উপমন্ত্রী গ্রহণ করিয়াছেন। এতদিন সহকারী মুখ্যমন্ত্রী বলিয়া কোন পদ ছিল না—শ্রীত্রিপাঠী মুখ্যমন্ত্রী হইয়াই শ্রীনীলমণি রাউত রায়কে সহকারী মুখ্যমন্ত্রীর পদ প্রদান করিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পর শ্রীত্রিপাঠীর মন্ত্রিসভা উড়িষ্যার অষ্টম মন্ত্রিসভা। শ্রীবিশ্বনাথ দাস, শ্রীহরেকৃষ্ণ মহাতাব, শ্রীবরকৃষ্ণ চৌধুরী, শ্রীবিজু পট্টনায়ক প্রভৃতির নেতৃত্বে অন্যান্য মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল। শ্রীবীরেন মিত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়া তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল।

ভারতে ভাষা সমস্যায় হাঙ্গামা—

গত ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারত সরকার হিন্দী ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া ঘোষণা করায় তাহা লইয়া প্রায় ১ মাসকাল ভারতের নানা স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। উত্তর ভারতের মাত্র কয়েকটি স্থানের অধিবাসী হিন্দীভাষী—সারা ভারতের এক তৃতীয়াংশলোকও হিন্দীভাষী নহে—কাজেই ভারত সরকার জোর করিয়া অধিকাংশ অহিন্দীভাষীর উপর হিন্দী ভাষা চাপাইয়া দেওয়ায় লোক ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হইয়া তাহার প্রতিবাদ জানায়। দক্ষিণ ভারতে সে প্রতিবাদ খুব জোরালো হয় এবং তাহার ফলে কেন্দ্রের নির্দেশে বহু স্থানে পুলিশ গুলী চালাইয়াছে ও তাহার ফলে কয়েকশত লোক হতাহত হইয়াছে। উত্তর ভারতেও পশ্চিমবঙ্গ, আসাম প্রভৃতি স্থানে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। স্বর্গত প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহরু এই ভাষা সমস্যার সমাধান সম্পর্কে যে নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা এই সঙ্গে প্রকাশ করিলাম। প্রায় ২শত বৎসর ধরিয়া সারা ভারতে ইংরাজী ভাষার চলন হইয়াছিল এবং তৎকালীন রাজভাষা বলিয়া আজও ভারতের সর্বাধিক সংখ্যক লোক ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করে। সে জন্য ইংরাজী ভাষাকে সর্ব-ভারতীয় ভাষারূপে এখনও কিছুকাল প্রচলিত রাখাই ভারতের অধিকাংশ লোকের অভিমত। তাহা ছাড়া হিন্দী ভাষা সর্বাঙ্গীন পুষ্ট নহে, তাহার সাহিত্যও নাই। যদি পরে হিন্দীভাষা সমৃদ্ধ ও পুষ্ট হয়—তখন হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী বিবেচনা করা হইবে। যতদিন তাহা না হয় ততদিন প্রত্যেক রাষ্ট্রের ভাষা সে রাষ্ট্রে এবং ইংরাজী কেন্দ্রে প্রচলিত থাকা সঙ্গত ও সমীচীন। আগামী ২৩শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে ভারতের সকল রাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীদের এক

সম্মিলনে ভাষা সমস্যার কথা আলোচনা হইবে ও সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য একদল অতি উৎসাহী লোক এখনই হিন্দী চালাইবার চেষ্টা করায় ভারতের সর্বত্র সে আন্দোলনের বিরোধিতা হওয়া স্বাভাবিক। এ বিষয় প্রধান মন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রীবাহাদুর শান্তীর কঠোরতার সহিত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইয়াছে।

বিশেষ সম্মান প্রদান—

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী রবিবার বিকালে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজভবনে সংস্কৃত কলেজের এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে রাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বাংলার ২ জন পণ্ডিতকে সম্মানিত করেন। অশীতিপর বৃদ্ধ কাঁটালপাড়া-নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থকে 'স্মার্ত-বাচস্পতি' ও খ্যাতিমান ঐতিহাসিক সুপণ্ডিত ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদারকে 'ভারততত্ত্ব ভাস্কর' উপাধি দান করা হইয়াছে। উৎসবে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীকবিভূষণ চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী সকলকে স্বাগত জানাইয়াছিলেন। গুণীর সম্মান দ্বারা দেশ নিজেকেই সমৃদ্ধ করিয়া থাকে।

বাঙালী শিল্পীর ওয়াটুমুল পুরস্কার লাভ—

দিল্লীর কারুকলা মিউজিয়মের জুনিয়র কিউ অফিসার, শিল্পী শ্রীসুধাংশুকুমার রায় বাংলার লোকশিল্প ও প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার লিপি বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট দানের জন্য ১৯৬১ সনের ওয়াটুমুল পুরস্কার পাঁচ হাজার টাকা ও স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন।

সিন্ধুলিপির পাঠ উদ্ধারে তাঁহার পঁচিশ বৎসর ব্যাপী গবেষণা বহু নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়াছে। এইসব তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া সিন্ধুলিপির পাঠ উদ্ধারের প্রচেষ্টা নূতন করিয়া আরম্ভ হইয়াছে। পাকিস্তান, জার্মানী, ইংল্যাণ্ড, ইতালী, চেকোশ্লোভাকিয়া ও আমেরিকার প্রখ্যাত লিপি-বিশারদবৃন্দ এই গবেষণার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

বাংলার ব্রত ও ব্রতানুষঙ্গিক আল্পনা, চিত্র ও মূর্তি সম্পর্কেও শ্রীরায় মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, হনলুলু (ইউ, এস, এ) হইতে পুরস্কার বিতরণী সমিতির সভাপতি আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁহাকে এই পুরস্কার প্রদান করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

অজ্ঞানতায় ঃ প্রবঞ্চনে

অনিলকুমার মোদক

সমূহ স্বপ্নের ঘোরে কতো আর ঘুমাবে মানুষ ?
সুন্দরের আশীর্বাদে, স্বচ্ছন্দের স্থির মহিমায়
জীবন হবেই জয়ী—এই সর্বনাশা ধারণায়
কতো কাল কাটাবে সে নিরিবিলি আঁধারে বেহুঁস ?
মিথ্যা মোহ, অন্ধকার, আরামের আপাত মধুর
মায়াবিনী মমতায় নিবিড়তা কবে হবে দূর ?
কতোকাল ঘুমাবে সে ? লড়াইয়ের দৃপ্ত আহ্বান
মরমে কি পশিবে না ? নেবে না সে শপথ তুলে ?
বিপ্লবের যে দামামা বাজে আজ—তারে সে কি ভুলে
পড়ে রবে মোহাচ্ছন্ন, মেদুর শয়ানে হতজ্ঞান ?
এ মহা দুর্দিনে আজো বুঝিবে না বড় সর্বনাশা
নির্বিকার অক্লান্তুষ্টি, অকারণ তৃপ্তি পেয়ে হাসা ?
প্রাণ ভরি—এ এক বিস্ময় বড় : মানুষ যা চায়
কোন্ পথে প্রাপ্তিযোগ, ভালোই সে জানে মনে প্রাণে,—
সে তবু নিশ্চিন্ত শান্ত থাকে কার যাদুর বিষাণে ;
নেই কোনো অসন্তোষ ; ব্রাত্যধর্মে অপমৃত্যু পায়।

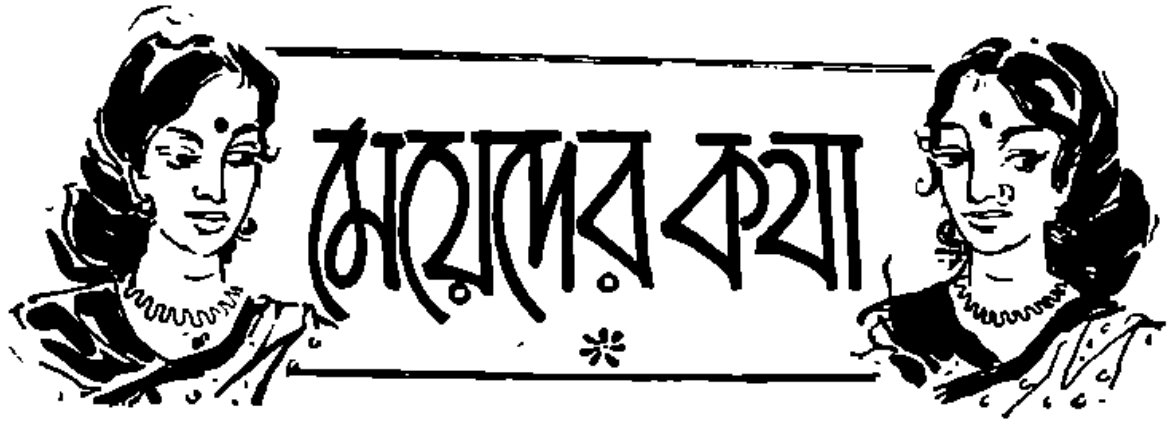

নারী প্রগতি ও জাতীয় সংহতি

মীরা দাস

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে দ্রুত পট পরিবর্তন হইতেছে। আমাদের দেশেও রাজনীতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সর্বক্ষেত্রেই এই পরিবর্তনের প্লাবন লাগিয়াছে। আমাদের সমাজ জীবনে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। আমাদের জীবনে কোথাও আজ নাই সুস্থ মানবতা। রাষ্ট্রে, সমাজে, পরিবারে, ব্যক্তিতে ঘুণ ধরিয়াছে। অর্থলোভ, স্বার্থ, দেশের দেহদণ্ড মধ্যবিত্তদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে। আধুনিক কালের আত্মসর্বস্ব আবহাওয়ায় মানুষ হইয়া পড়িয়াছে আত্মকেন্দ্রিক। নানা-সমস্যা ও সঙ্কটে জর্জরিত মানুষ অন্য কোন লোকের কথা ভাবিতেও অক্ষম। পিতামাতাও সন্তানদের এই সর্বনাশা যুগে সকল দিক্ দিয়া রক্ষা করিয়া চালিত করিতে সমাকরূপে সক্ষম নন। ইঁহারাও হইয়া পড়িতেছেন বিভ্রান্ত। উন্নত ও বলিষ্ঠ সমাজ গঠনে পিতামাতার দায়িত্ব অপরিসীম। একমাত্র তাহাদের উদ্যোগেই অনেক সামাজিক ত্রুটী-বিচ্যুতির সংশোধন সম্ভব। পিতামাতা যদি স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান হন তবে সন্তান উচ্ছন্নে যাইতে পারে না। কিন্তু সেই আশাও দুরাশায় পরিণত করিয়া স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই, অমিতাচারী, উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা নিজেরাই বিপথগামী তাহারা সুপথ দেখাইবে, না নিজেরাই তাহাদের সম্মুখে কু-আদর্শ স্থাপন করিবে? নিন্দনীয় রীতিনীতি ও শিষ্টাচার সম্পর্কে আমরা যদি অবহিত না হই তবে পুরাতন ব্যাধির নূতন প্রকাশ আরও মারাত্মক হইবে।

ইহাই হইল সমাজের সর্বাপেক্ষা বড় সঙ্কট। এই সঙ্কট প্রতিরোধ আমাদের মেয়েদেরই করিতে হইবে। গভীর আত্মপ্রত্যয় ও সংবেদনশীল হৃদয় লইয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। এই সাধনা যদি ব্যর্থ হয় তাহা হইলে নারী প্রগতি আবর্জনায় নিক্ষিপ্ত হইবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেশের শিক্ষিত নরনারীর সুরুচি, সুচিন্তা, সুবিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া আশা করি এই সঙ্কট হইতে সমাজ মুক্ত হইবে।

পুরুষের সঙ্গে নারীশক্তির সম্মিলনের ফলে আধুনিক জগতে প্রগতিমূলক সকল কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতেছে। পাখীর দুই ডানার মত দুই শক্তি একত্রিত হওয়ার ফলে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে। ভারতের নারী যোগ্য জায়া ও জননী রূপে, জ্ঞানে ও কর্মে, বীর্যে ও মহত্বে যোগ্য সহযাত্রিণী রূপে পুরুষের পাশে দাঁড়াইলেই নারীপ্রগতি সার্থক হইবে।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত বর্তমান পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকা দুর্ঘট! সে পুরুষই হোক বা নারীই হোক। নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অধিকার সংবিধানে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু পশ্চিম দেশগুলিতে মেয়েদের বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্রে অপরিসীম উৎসাহ দেখা যায়,

আমাদের দেশে ইহার একান্তই অভাব। সেইজন্যই তাহাদের প্রগতি কেবল বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, জীবিকার সর্ব্বস্তরে প্রসারিত আছে। কারিগরী শিক্ষা ছাড়া জীবিকার ব্যাপক প্রসার অসম্ভব। মেয়েরা পাইলট হইবে, ইঞ্জিনীয়ার হইবে, কেন হইবে না ধাপ্পরী, ছুতোর, ধরজী? জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে প্রসারিত না হইতে পারিলে বিস্তৃতি কোথায়? ফুলদানীতে সাজানো তোড়ার মত শুধু কয়েক ব্যক্তিক্রম দিয়ে সমাজ জীবনের শোভা বৃদ্ধি হইতে পারে, মুষ্টিমেয় কয়জনের চরম উন্নতিতে মন উল্লসিত হয় এবং গৌরব করা যায়। কিন্তু কেবল গৌরব লইয়া বাঁচা যায় না। প্রত্যক্ষ বাস্তবে, জীবন ধারণে নানা প্রয়োজনের চাহিদা।

সেই অনুরূপ চাহিদা মেটাতেই আজ নারীকে কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হইয়াছে। তাহাদের দায়িত্ব আরও বাড়িয়াছে। আর সেই সময় কিনা মেয়েদের নিশ্চিন্ত বিলাসে স্নোপাউডারের মোহে কৃত্রিম বর্ণ ও সৌরভের আবর্ত্ত তুলিয়া এক একটি মডেল সাজিতে দেখা যায়। সাজ-সজ্জা করা নারী চরিত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। তাই নারীর অঙ্গ সজ্জা চলিয়া আসিতেছে সেই প্রথম দিন হইতে। স্বাভাবিক রূপকে প্রসাধনের সাহায্যে অপরূপ করিয়া তুলিয়া এবং দেহ ও বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সাধারণ পোষাকেই অসাধারণ সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তোলা যায়। পোষাকে শালীনতা ও সামাজিকতা রক্ষা করিতে হইবে। যাহার নাকি একান্ত অভাব আজকাল মেয়েদের কাছে। তাই আজ বয়স্কা মেয়েদের পোষাকেও নাই মাতৃত্বের মহান ছাপ, আছে কেবল উৎকট আধুনিকতার নির্লজ্জ প্রকাশ। কে জানে ন্যাশান নামক মোহ হইতে কবে মেয়েরা মুক্ত হইবে? এই সবই হইল পশ্চিম দেশীয় অনুকরণ। তাহাদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য, বৈশিষ্ট্য, দৃষ্টিভঙ্গি সবই পৃথক। তাহাদের অনুকরণ করিয়া নিজেকে হেয়, হাস্যাস্পদ করা হয় নাকি? তাহাদের যাহা সদ্‌গুণ আছে, যেমন কর্ম্মে স্পৃহা, উৎসাহ, একাগ্রতা, শক্তি—তাহা আমরা অনুকরণ করি না, যাহা গ্রহণ করিলে সত্যই আমরা লাভবান হইতে পারি। সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের উদ্দেশ্য যে সৌন্দর্য্য বিকৃতি নয়, এই বিষয় প্রত্যেক নারীর সর্ব্বাগ্রে সচেতন হইতে হইবে। তাই নারীর প্রয়োজন রূপ-সচেতন মন লইয়া সহজাত রূপকে শ্রীমণ্ডিত করা।

আজ নারী দুর্নীতির পথে দুনিবার অধোগতিকে প্রতিরোধ করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে, দেশের সমৃদ্ধিবর্দ্ধন ও জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করিতে আত্মোৎসর্গ করিবে, ইহাই আজ প্রতিটি অগ্রগামী নরনারী কামনা করেন। নূতন ভারতকে সেই মিলিত সাধনাই সত্যকার শ্রেষ্ঠতা দিবে। "অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়", উপনিষদের এই বাণী আমাদের হৃদয়ে নিরন্তর ধ্বনিত হোক, সামাজিক কলুষনাশে সকলের প্রয়াস সম্মিলিত হোক্।

—•—

প্রসূতি-পরিচর্য্যা ও শিশুমঙ্গল

ডাঃ কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম,বি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রসূতি কিসে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকেন, কি হলে তাঁর মন প্রফুল্ল রাখা যায় এবং তাঁর আহার, বিশ্রাম প্রভৃতি সকল বিষয়েই বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। তাছাড়া সংসারের কাজের চাপও কম করে দিতে হবে এবং আর্থিক অবস্থার অসুবিধা ঘটলে সংসারে সকলেরই কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করা হয়তো প্রয়োজন হতে পারে। বাড়ীতে মেয়েদের প্রসূতি অবস্থাকালে আমাদের দেশে প্রাচীনারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রথম ছমাস ও পুনরায় আটমাসের পর আলাদা থাকবার উপদেশ দিতেন, যদিও আধুনিক যুগে সে ব্যবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন দেখা যায়। চিকিৎসকদের মধ্যেও এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক স্বর্গীয় স্যার কেদারনাথ দাস মহাশয় এ সম্বন্ধে নিজ মত পোষণ করতেন, অথচ পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞ-চিকিৎসকদের মধ্যে অনেকেই উপরোক্ত প্রাচীনাদের মতশ্রেষ্ঠ বলেন এবং তাঁদের মধ্যে স্যার ট্রবি কিং, লেডী ব্যারেট ও নার্স লিভিয়ার্ড প্রভৃতি সুনিপুণ ধাত্রীবিদ্যাবিশারদের মত বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে, শিশুমঙ্গল ও প্রসূতি পরিচর্য্যা বিষয়ে যথোচিত শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার কথাও বিশেষ বিবেচ্য বলেই মনে হয়। কারণ যদিও সব মাতাই

তাঁর ভবিষ্যৎ সন্তানের জন্য যে কোনও ত্যাগ স্বীকারে আগ্রহান্বিতা থাকেন, তখাপি কি ভাবে নিজের স্বাস্থ্য ভাল রাখা যায় ও কি ভাবে নবজাত শিশুর যত্ন নিলে সে স্বাস্থ্য-সম্মত উপায়ে মানুষ হয়ে উঠতে পারে ও রোগমুক্ত থাকে, সে জ্ঞান "ঠেকে শেখার" চেয়ে-"দেখে শেখাই" বাঞ্ছনীয়। অবশ্য এ বিষয়ে উপদেশ দেবার লোকের অভাব হয় তো হবে না···কারণ সংসারে মা ঠাকুমা, দিদিমা, পিসিমা, মাসিমা প্রভৃতি অভিজ্ঞা-স্নেহশীলা আত্মীয়ারা ছাড়াও পাড়া-পড়শী সকলেই তাদের ব্যক্তিগত ধারণা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কথা বলে ও বিবিধ উপদেশ দান করে শুধু যে প্রসূতিকে অনর্থক উদ্‌ভ্রান্ত করবেন তা নয়,উপরন্তু তাঁকে অথথা বিভ্রান্ত এবং সংশয়যুক্ত করে তুলতেও পশ্চাৎপদ হবেন না। কাজেই প্রসূতির পক্ষে শিশুর খাদ্যাখাদ্য বিচার, জামা কাপড়, বিছানা পত্র, যাযাবর বিশ্রাম, নিদ্রা, রোগ নিবারণ, প্রভৃতি সকল বিষয়েই বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান লাভ করা যে একান্ত আবশ্যক সে সম্বন্ধে কারো কোনও সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়। কারণ প্রসূতি ও শিশুর মঙ্গলের জন্য কখন এবং কোথায় সন্তান প্রসব হবে, সময় থাকতে তারখুঁটিনাটি প্রত্যেক বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে বিচার বিবেচনা করে রাখা প্রয়োজন এবং যথাযথভাবে এ সব কর্ত্তব্যের ব্যবস্থাদি সময় থাকতেই সুসম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ঘর নেওয়া আবশ্যক। সময়ে সাবধানতা অবলম্বনের ফলে প্রসূতির পক্ষে প্রসব সহজ সাধ্য হয়। সহজ উপায়ে গর্ভস্থ সন্তান সুপ্রসবের উদ্দেশ্যে 'বস্তীর (অস্থির) গঠন' ও গর্ভস্থ সন্তানের অবস্থান' সম্বন্ধে বিশেষভাবে দৃষ্টিদান করা দরকার। কারণ, সন্তানের অবস্থান যদি ঠিক না থাকে,তাহলে অভিজ্ঞ ধাত্রী ও চিকিৎসকের পরীক্ষার দ্বারা সময়েই সাবধান হওয়া যায়। প্রসূতির বস্তীর মাপ সম্বন্ধেও ঠিক এই একই কথা বলা চলে। এভাবে পরীক্ষার ফলে, পূর্ব্বভাগেই বিপদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা থাকলে, সময়োচিত ব্যবস্থা করা যায় এবং প্রসূতি ও গর্ভস্থ সন্তান উভয়ের প্রাণ রক্ষা করা সম্ভবপর হয়। গর্ভস্থ সন্তান সাধারণতঃ 'universal flexion' অর্থাৎ 'সম্পূর্ণ হাতপা গুটিয়ে মাথা ও হাত পা বুকের উপর রেখে মাথা নীচু করে থাকার অবস্থায় প্রসব সহজ হয়। কিন্তু যদি হাত পা ছড়িয়ে বা কাৎ হয়ে অথবা পা নীচু করে রাখা থাকে তা হলে যথেষ্ট বিপদের আশঙ্কা দেখা দেয়। অন্য দিকে বস্তীর (অস্থির) গঠনের দোষ থাকলে গর্ভস্থ সন্তান সহজে প্রসব হতে পারে না। এসব কারণেই প্রসূতিকে নিয়মিত পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন হয়। বিনাপরীক্ষায় শুধু শেষ মুহূর্ত্তে চিকিৎসক ও ধাত্রী ডেকে এনে বিশেষ কোন ফলই হয় না।

প্রসূতির মঙ্গলার্থে ও সুস্থ শিশুর জন্মদান করতে শিশুর মাতা ও পিতার সুস্থ মনের দরকার এবং সংসারেও সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এ জন্য ঘরে ঘরে চাই শিক্ষার বিস্তার। সন্তানের ভবিষ্যৎ-মঙ্গলের জন্য পিতার কর্ত্তব্য মাতার চেয়েও কোনো কম নয়। যৌথ-সংসারে বাড়ীর কর্ত্তা ও গৃহিণীর এ বিষয়ে কুসংস্কার-বিহীন হতে হবে।

গর্ভাবস্থার কোন দিকে সময় থাকতে কোথায়-কখন প্রসব হবে, এ সম্বন্ধে সবিশেষ বিচার বিবেচনা করে সুযোগ সুবিধা বুঝে যথোচিত ভাবে প্রস্তুত হতে হবে।

আমাদের দেশে শতকরা ৯৯টি বাড়ীতেই আঁতুড় ঘরের ব্যবস্থাদি করেই প্রসবের রীতি অনুসৃত হয়ে থাকে। কিন্তু সে ব্যবস্থায় সব সময়ে প্রসূতি ও শিশুর স্বাস্থ্য-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অনুকূল পরিবেশের বন্দোবস্ত থাকে না। শোনা যায়, স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও নাকি একবার তাঁদের সুবিশাল-সৌধিন প্রাসাদের নিরালা-অবহেলিত এক কোণে সিঁড়ির পাশের ছোট একটি কুঠুরীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রসূতি ও শিশুর সম্বন্ধে এ ব্যবস্থা সমীচীন নয়। কাজেই এ যুগে আমাদের সংস্কারের পরিবর্ত্তন করতে হবে। বাড়ীর মধ্যে সব চেয়ে আলোবাতাসযুক্ত ঘরে আঁতুড় ঘর রচনা করাই বাঞ্ছনীয়। যত দিন না দেশে শিশুমঙ্গলপ্রতিষ্ঠান অথবা হাসপাতাল প্রতি পল্লীতে পল্লীতে ছড়িয়ে পড়ছে ততদিন শুধু এ ব্যবস্থা বাহাল রাখা চলতে পারে। সুযোগ মিললে প্রসূতিকে সব সময়েই ভালো শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান অথবা হাসপাতালে সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত করাই ভাল। কারণ, সে ব্যবস্থায় সুবিধা এই যে :—

১। হাসপাতালে সব জিনিস হাতের কাছে থাকে ও বিপদের জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করাও সম্ভব হয়। তবে হাসপাতালে বা সেবাসদনে চিকিৎসক বা শিক্ষিত ধাত্রীর হস্তাবধানে থাকার ফলে যে কোনও বিপদ ঘটবে না এমন ধারণা রাখা ভুল।

২। হাসপাতালে গেলে গৃহের কাজ কর্ম্মের ঝামেলা শোধনের জন্য প্রসূতির মন সারাক্ষণ অস্থির চঞ্চল হয়ে ওঠে না।

৩। হাসপাতালের পরিবেশ সাধারণতঃ গৃহস্থ-ঘরের চেয়ে অনেক বেশী পরিষ্কার, তাছাড়া সেখানকার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য গৃহস্থকেও নিরন্তর ভাবতে হয় না।

৪। সেখানে সব সময়ে ডাক্তারের সাহায্য পাওয়া সম্ভব···যা অনেকের পক্ষেই বাড়ীতে সর্ব্বদা সম্ভব হয়ে ওঠে না। স্ব-নামধন্য পাশ্চাত্য ধাত্রী-চিকিৎসক ডাক্তার রুথ টুাং তাঁর গ্রন্থে বলেছেন-যে আমেরিকার মত দেশেও বাড়ীতে সময়ে ডাক্তার না পাওয়াতে (সময় মত ডাক্তারের উপস্থিতির অভাবে) কোনো কোনো সময়ে সামান্য মোটর-চালকের সাহায্যও তাঁকে ধাত্রীর কাজ সারতে হয়েছে।

প্রসূতিকে পরিচর্য্যার উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে হাসপাতাল বা সেবাসদনে স্থানান্তরিত করার অপর সুবিধা হলো আর্থিক অবস্থার কথা সব গৃহস্থকে ভাবতে হয়···কাজেই সে হিসাবে বিবেচনা করে দেখলে হাসপাতালে খরচ বাড়ীর চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম পড়ে।

৬। হাসপাতালে ২-৩ (দু-তিন) সপ্তাহ থাকার সময় প্রসূতি সম্পূর্ণ বিশ্রাম, সুস্থ ও সবল হবার সুযোগ পান। কোন্ হাসপাতালে যাওয়া হবে ঠিক হলে সেখানের কর্দ্দমাক্তি জিনিস পত্র জোগাড় করে ঠিক করে রাখতে হয় শেষ মুহূর্তের জন্য ফেলে রাখা উচিত নয়। এ ব্যবস্থা আটমাস থেকে করাই ভাল।

বাড়ীতে প্রসব হতে হলে কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে :—

১। ডাক্তারের বাড়ী কাছে হবে। ২। একজন শিক্ষিত বিশেষ বিজ্ঞ ধাত্রীর সাহায্য যাতে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা রাখা।

৩। বাড়ীতে আঁতুড় ঘর হওয়া সম্ভব কিনা। পরিবেশ ও স্থানাভাব না হয় দেখতে হবে।

৪। প্রসব সময়ে যেন কোনও বিপদের ভয় না থাকে। বাড়ীর বিকৃতি গর্ভস্থ সন্তানের অবস্থান প্রভৃতি কোনও বিপদের পূর্ব্বাভাস পেলে বা প্রসব সময়ের নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যতিক্রম দেখা দিলে অর্থাৎ কমবেশী হলে সময়ে সাবধান হতে হবে ও বাড়ীর চেয়ে হাসপাতালে প্রসব হওয়া অনেক নিরাপদ হবে।

সন্তান জন্মের পর

নিকটস্থ পৌর প্রতিষ্ঠানে জন্ম সময়, তারিখ ও পিতামাতার নাম ঠিকানা লেখাতে হয়। বিলাতে বিবাহ জন্ম ও মৃত্যুর জন্য নির্দ্দিষ্ট অধিকর্ত্তার কাছে "রেজিষ্টারী" বা "লিপিবদ্ধ" করার প্রথা প্রচলিত আছে, যাতে পরে বিবাহ, উত্তরাধিকার প্রভৃতির জন্য বিবাদ বিসম্বাদ না ঘটতে পারে। তাছাড়া রাষ্ট্রের স্বার্থে জনপরিসংখ্যানের জন্য ও নাম রেজিষ্টারী' করা প্রয়োজন হয়।

নব-জাতকের জন্য জামা কাপড়, বিছানা, প্রভৃতি সবও থাকতে ব্যবস্থা করতে হয়, যাতে খরচ ও পরিশ্রম কম হবে ও এক সঙ্গে অনেক অর্থব্যয় করে অসুবিধার কারণ হবে না। দেশ, কাল ও অবস্থানুযায়ী এবং যা সকলের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব, এরূপ একটা মোটামুটি তালিকা দেওয়া গেল। অবস্থা ও আর্থিক সচ্ছলতা হলে এ তালিকা বাড়ান যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে :—

১। জামাকাপড় হালকা, গরম ও বেশ নরম যেন হয়।

২। খুব কম জামাকাপড় ও ঠাণ্ডা না লাগে ও বায়ু নিরোধ না করে সে ব্যবস্থা থাকবে।

৩। সহজে কাচা শুখান এবং ইস্ত্রি করা যায়।

৪। এমন আঁট সাঁট হবেনা, যে শিশু নড়াচড়া করতে কষ্ট হওয়ায় জন্য বেশ আঁটই হয়ে থাকায় তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধা পায়।

৫। দু-তিন পরদা কোনও জামা কাপড়ে হলে কাচা ও শুখানর অসুবিধা হবে, সে জন্য সে বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে হবে।

৬। সময়ে আরম্ভ করে একটি একটি তালিকা মাফিক জামা কাপড় যাতে যে শিশু ভূমিষ্ট হবার ছমাস আগেই প্রস্তুত থাকে সে দিকে নজর দিতে হবে। আর নিজে সেলাই করতে পারলে কোনও অসুবিধা হবে না, জিনিস ভাল, মজবুত, যে-মত হো হবেই—আর অনেক অর্থও বাঁচবে।

নীচের তালিকা মোটামুটি শীতপ্রধান দেশের কাজ

দিবে ও অবস্থা হিসেবে সংখ্যার কম বেশী করা যাবে। প্রথম প্রথম ব্যবহার করার জন্য বড়দের পুরানো জামা কাপড় থেকে অনেক জিনিস তৈয়ার হতে পারে :—

১। তুলার লম্বাহাতা জামা বা সার্ট—চারটি (গ্রীষ্মে হাফ্ হাতা)

২। সিল্ক বা পশমের বোনা কুর্ত্তা— ঐ

৩। পেটিকোট—ঐ তবে গরম দেশে দরকার হয় না।

৪। ফ্রক্…ঐ

৫। কোট—দুই কি তিনটি—গরম দেশে শীতে শুধু লাগে।

৬। রাত্রির পোষাক—চারটি, গরম দেশে লাগে না; শাল বা গরম গায়ের কাপড়ে চলবে।

৭। বর্ড বা নাড়ী বাঁধবার জন্য—তিনটি বন্ধনী বা ব্যাণ্ডেজ।

৮। টুপি—বোনা বা হাল্কা সুতির দুটি রাত্রে দরকার হয়না শুধু বাহিরে যাবার জন্য।

৯। নরম জুতা বা মোজা—দু জোড়া, শীতের দেশে চার জোড়া।

১০। শাল—দুটি ছোট ও নরম, পুরাণো গায়ের কাপড় কেটে হতে পারে।

১১। শাল একটি বড় ও প্রধান।

১২। দুধতোলা—ছয়টি } নাহলেও চলে, তোয়ালে
১৩। রুমাল— ঐ } কেটে করা যায়।

১৪। ন্যাপকিন্ তিনডজন, আমাদের দেশে কাপড়ের টুক্রা ও কাঁথা ব্যবহার হয়—ন্যাপকিন সুধু সহরে ও অবস্থাপন্ন ঘরেই ব্যবহার হয় বা হতে দেখা যায়।

১৫। পা পর্য্যন্ত ঢাকা পড়ে এরূপ জামা—গরম দুটি শুধু শীতের দেশে ব্যবহার হয়।

বিদেশী এমন অনেক প্রতিষ্ঠান বা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র আছে যাতে জামাকাপড় তৈয়ারীর মাপ বানকরা দেওয়া থাকে। ২৮৩-নং এলিজাবেথ ষ্ট্রীট, গিড়নী-তে পত্র দিলে সেখানের মাদার ক্রাফট সোসাইটি একসিলিং ছয় পেন্স ও ডাকমাশুল দিলে ট্রাবি কিং বেবি ক্লোদিং প্যাটার্ণ পাওয়া যায়। এই বইতে জামাকাপড় কাটা সেলাই করার সুন্দর ব্যবস্থা দেওয়া আছে। নার্স মাবেল লিভিয়ার্ড ও তাঁর বইতে সুন্দর ভাবে এ বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন। এখানে কিছু আলোচনা এ বিষয়ে করা যাক—

বাচ্চারা কেন, কেহই পশমী জামা সোজাসুজি গায়ে পারে না, সেজন্য প্রথমে তুলার জামা পরিয়ে তার পর পশমী বস্ত্র দিতে হবে। (২১) সাতাশ ইঞ্চি চওড়া ও পৌনে তিন গজে (দুই তিনের চার গজ) বাচ্চাদের চারটি সার্ট তৈয়ার করা যাবে। সেলুলার কাপড় বেশ সস্তা, মজবুত আর আরামদায়ক, কাচলে ছোটও হবে না। সার্টের সামনের দিক ন্যাপকিনের সঙ্গে এঁটে দেবার (বা আটকাবার একটি ফিতে লাগালে ভাল হবে, যাতে সার্ট ন্যাপকিনের সঙ্গে বাঁধা থাকায় সরে যাবে না।

কুর্ত্তা—সিল্ক ও পশম মেশান সুতা শুধু পশমের চেয়ে ভাল। শীতের সময়ই শুধু আমাদের দেশে কুর্ত্তা দরকার হয় বা হবে। ফাঁক বোনা হলে হাওয়া চলাচল করে, সেজন্যে সার্টের উপর পরাতে হয়।

পেটিকোট উনিশ (১৯″ ইঞ্চি) লম্বা সস্তা, ফাঁক ফাঁক বোনা ফ্ল্যানেল হলেই কাজ চলে যায়। অবশ্য ফ্লানেলা বা ফ্লিন্সি (wincey) ও ব্যবহার করা যায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীতকালেই শুধু ব্যবহার করা যাবে প্রত্যেকটি পেটিকোট সোয়া একগজ (সোয়া) গজ লম্বা ও (৩৬″ ইঞ্চি) চওড়া কাপড় লাগবে।

ফ্রক্—চিলে বিশ ইঞ্চি লম্বা ফ্রকই সুন্দর। কাশ্মিরী কাপড়, ভিলেলা, ক্রেপ ফ্ল্যানেল, ডিবেন (delaine) বা তুলা মেশান ক্রেপ ও সিল্ক ফ্রকের জন্য ব্যবহার করা চলে তবে আমাদের দেশে মলমল ও লংক্লথ যথেষ্ট। সওয়া এক গজ লম্বা ও ত্রিশ ইঞ্চি চড়া কাপড়ে একটি ফ্রক তৈয়ারী হবে। যা ফ্রকে লাগবে শীতের সময়ে পশমের বোনা ফ্রকই ভাল।

কোট বা জ্যাকেট—ফ্রকের কাপড়ে কোটও বেশ হতে পারে। সহজে আগুন ধরে যেমন নাইলন্ বাচ্চাদের কাপড় জামায় ব্যবহার করা যাবে না বা করতে নেই। গরমদেশে ছিট্ ও মলমলই ভাল। পৌনে দু গজ লম্বা ও ত্রিশ ইঞ্চি চওড়া কাপড়ে একটি কোট হবে।

বনেট বা টুপি—ঠাণ্ডা হাওয়ায় বাহিরে যাবার সময়ই শুধু টুপি পরান উচিত, আর অন্য সময়ে খালি মাথায় থাকা ভাল। যদিও আমাদের দেশে এর ব্যতিক্রম এখন দেখা

যাচ্ছে। সিল্কের বেনো বা শর্টসের বেনো টুপিই ভাল। টুপি মাথায় দিয়ে ঘুরিয়ে টেনে দেওয়া হয়।

মোজা ও জুতা—ছয় বা কাপড় কাটার সময় যে ফ্রাকের ছাটকাট পড়ে থাকবে তা দিয়ে পায়ের জুতো মোজা বেশ সুন্দর তৈয়ারী করা যায়। বুনে নেওয়াও যেতে পারে। পরের সময়ে বাচ্চার পা ছুঁচ পর্যন্ত ঢেকে দিতে হবে।

বাচ্চার কাপড় জামার তালিকা বাড়িক না হলেও চলে, সাধারণ কিছু কম হলেও কিছু আসে যায় না—কারণ বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন অনেক ভিন্নিস উপহার দেন, যাতে পরে কোনও অসুবিধা হয় না। শীতের দেশে হাতের দস্তানা দরকার হয়ে পড়ে। মোজার মত চলে চলবে হাত ঢাকা আস্তিনের জন্য কোন ব্যবস্থা রাখার দরকার হবে না।

শার্ট ও পায়ের কাপড়—একটি বড় ও দুটি ছোট শার্ট যে দরকার তালিকায় তা দেখান হয়েছে। বাচ্চাকে বেড়াতে নিয়ে যাবার সময় বড় আর বাড়ীতে নাড়া চাড়া করার জন্য ছোট দুটী লাগে। কাশ্মিরী লাল অথবা নরম ও গরম যেরো বা দুই রঙ কাজের।

রূপচর্চা

সুপর্ণা দেবী

মেয়েদের দেহশ্রী-সৌষ্ঠব সুন্দর-সুঠাম এবং স্বাস্থ্য অটুট নীরোগ রাখার জন্য নিত্য নিয়মিতভাবে বিশেষ ধরণের যেসব ব্যায়াম অনুশীলনের কথা ইতিপূর্ব্বেই গতমাসের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি, এবারেও তেমনি ধরণের আরো কয়েকটি ব্যায়াম ভঙ্গীর ছবি দিচ্ছি। এই ব্যায়াম-অনুশীলনের ফলে মহিলাদের বক্ষোদেশ, উদর, জঘনদেশ, কোমর, উরু এবং পায়ের গঠন শোভা সুষমান্বিত হয়ে উঠবে—আধুনিক রূপচর্চা বিশেষজ্ঞেরা এমনি অভিমত প্রকাশ করেন।

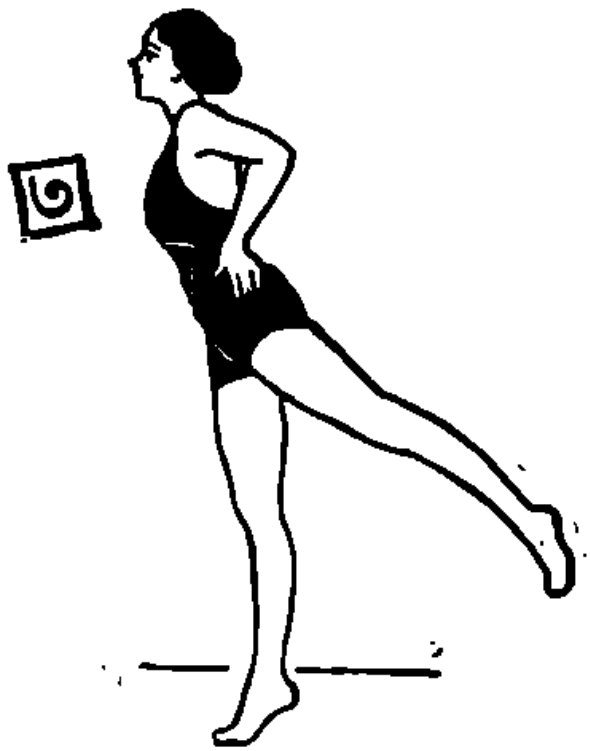

উপরের ৩নং চিত্রে যে ব্যায়াম-ভঙ্গীটি দেখানো হয়েছে, প্রত্যহ নিয়মিতভাবে কিছুক্ষণ সে ভঙ্গী অভ্যাস করা দরকার। এ ব্যায়ামের অনুশীলন পদ্ধতিটি হলো—ঘরের মেঝের খাড়াভাবে দেহ সটান রেখে দাঁড়িয়ে জঘনদেশের উপর দুই হাত ন্যস্ত করুন। এভাবে দাঁড়ানোর সময় হাতের আঙুলগুলিকে উপরের ছবির ভঙ্গী অনুসারে বেশ ফাঁকাফাঁকি ছড়িয়ে রেখে দেবেন। তারপর পায়ের সামনের অংশের উপর মাত্র দেহের ভর রেখে ঘরের চারি-দিকে ঘুরে বেড়ান। এমনিভাবে ঘুরে বেড়ানোর সময়, উপরের ছবির ভঙ্গীতে এক-পা তুলে অপর-পা জমিতে রাখবেন। যে-পা জমিতে রাখবেন, সে-পায়ের সুমুখের দিক মাত্র কুমি স্পর্শ করে থাকবে এবং খেয়াল রাখবেন—যে গোড়ালি যেন জমিতে না ঠেকানো থাকে। উপরন্তু

লক্ষ্য রাখতে হবে—যে পা তুলবেন, সে পা যেন ভোলা থাকে পিছন দিকে এবং পায়ের হাঁটু যেন বরাবর সিধা রাখা হয়। ব্যায়োমাণ্ডলনকালে এক পায়ে যখন ভূমি স্পর্শ করবেন, তখন সে পায়ের উপর সারা দেহের ভর রেখে অন্ততঃপক্ষে দশ-বারো সেকেণ্ড সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এই হলো উপরের ৩নং চিত্রে দেখানো ব্যায়ামের ভঙ্গীটির মোটামুটি নিয়ম।

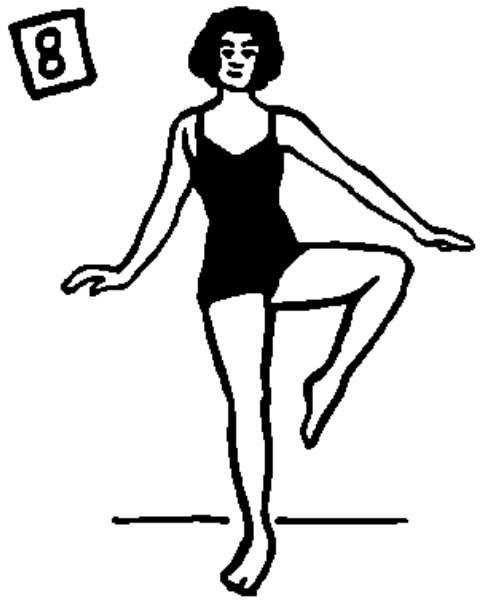

অতঃপর, উপরের ৩নং চিত্রে দেখানো ব্যায়ামের ভঙ্গীটি অনুশীলন পদ্ধতির হদিশ দিই। এ ব্যায়ামটিও প্রত্যহ নিয়মিতভাবে অন্ততঃপক্ষে দশ-বারোবার সযত্নে অভ্যাস করা দরকার। ব্যায়াম ভঙ্গীটির অনুশীলন পদ্ধতি হলো—ঘরের মেঝেতে সিধা সটান দাঁড়িয়ে একখানি চেয়ারের পিঠের বা হাতলের মুঠ অংশে ডান হাতের ভর রেখে উপরের ৪নং ছবির ভঙ্গীতে বাঁ দিকের পা মুড়ে জঘনদেশের সঙ্গে সমরেখায় নেবেন। তারপর ডান পায়ের উপর দেহের ভর রেখে, চেয়ারটিকে ছেড়ে ধীরে ধীরে বাঁ-দিক থেকে ডানদিকে এক-পাক ঘুরুন। এবারে বাঁ-হাতে চেয়ারটিকে ধরে অনুরূপ ভঙ্গীতে ডানদিকের পা মুড়ে আগের মতোই জঘনদেশের সঙ্গে সমরেখায় রেখে বাঁ পায়ের উপর দেহভার ন্যস্ত করে চেয়ারটিকে ছেড়ে ধীরে ধীরে বিপরীত দিকে, অর্থাৎ, ডানদিক থেকে বাঁ-দিকে ঘুরুন। এইভাবে কিছুক্ষণ···অর্থাৎ, অন্ততঃপক্ষে দশ-বারোবার একবার ডানদিকে এবং আরেকবার বাঁ-দিকে ক্রমাগত ঘোরাঘুরি করবেন। তাহলেই ব্যায়ামের এই বিশেষ ভঙ্গীটি সুচারুভাবে অনুশীলন করা হবে। এ ব্যায়ামটির এই হলো মোটামুটি নিয়ম।

আগামী সংখ্যায় এ ধরণের আরো কয়েকটি বিশেষ ব্যায়াম পদ্ধতির বিশদ পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো।

——

হাতের কাজ

কাদা-মাটির কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য গতবারে কাদা-মাটি দিয়ে সহজ-সরল ছাঁদের বিশেষ এক ধরণের মৌখিন খেলনা-পুতুল রচনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে মোটামুটি হদিশ দিয়েছি। এমনি প্রথারেই কলা-কৌশলগুলিকে অল্প-বিস্তর অদল-বদল করলেই শিক্ষার্থীরা সামান্য চেষ্টাতেই অনায়াসে অভিনব-বিচিত্র ছাঁদের আরো নানা রকম মৌখিন-সুন্দর খেলনা-পুতুল ও ঘর-সংসারের নিত্য-প্রয়োজনীয় বিবিধ মৃৎশিল্প-সামগ্রী বানিয়ে তুলতে পারবেন। কাজেই স্থানাভাবের কারণে, এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা না করে বরং আপাততঃ, কাদা-মাটি দিয়ে মৌখিন-সুন্দর সামগ্রী রচনার আরেকটি অভিনব পদ্ধতির মোটামুটি পরিচয় দিয়ে রাখি। এ পদ্ধতিটি অবশ্য নবীন শিক্ষার্থীদের অনেকের কাছেই হয়তো অনুশীলনকালের গোড়ার দিকে পূর্বোক্ত রচনা-পদ্ধতির চেয়ে অপেক্ষাকৃত কঠিনসাধ্য ব্যাপার বলে ঠেকতে পারে···তবে কয়েকদিন ধৈর্য ধরে সযত্নে এবং নিয়মিতভাবে এই নতুন পদ্ধতিটি অভ্যাস করলে অচিরেই তাঁরা যে সবিশেষ কলা-কুশলতার

পরিচয় দিতে পারবেন—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যাই হোক, আপাততঃ, কাদা-মাটি দিয়ে মৃৎশিল্প-সামগ্রী রচনার অপর পদ্ধতিটির মোটামুটি হদিশ দিই।

রূপকথার রাজা পুতুল

রূপকথার রাণী পুতুল

উপরের ছবিতে 'রূপকথার রাজা ও রাণী' পুতুলের যে নক্‌সা-নমুনা দেখানো হয়েছে, কাদামাটির সাহায্যে তেমনি ছাঁদের সৌখিন-পুতুল বানাতে হলে—প্রথমেই প্রয়োজনমতো আকারের মাটির নরম তাল নিয়ে দুই হাতের তালুর মধ্যে রেখে মৃদু চাপ দিয়ে কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেটিকে মোটামুটি ঐ 'রাজা' ও 'রাণী' মূর্তির অনুরূপ ছাঁদে রূপদান করে নেবেন। তারপর সেই ছাঁদে-গড়া মাটির তাল দুটিকে বেশ মজবুত ও সমতল কাঠের পাটা, পিঁড়া, টুল কিম্বা টেবিলের উপর রেখে সযত্নে হাতের আঙুলের চাপ দিয়ে টিপে টিপে ক্রমশঃ উপরের ছবিতে দেখানো নক্‌সা-নমুনার ছাঁদের মতো ধরণে রূপদান করতে হবে। প্রথমের আকর্ষ-দেহের অংশটি গড়ে নেবার পর, রাজার দু'পাশে বিস্তারিত হাত দুখানি, মুণ্ডদেশ ও মুকুট প্রভৃতি অংশগুলিকে পুতুলের দেহ-কাণ্ডের সঙ্গে পাকাপোক্তভাবে এঁটে জোড়া লাগানো যেতে পারবে। প্রায় অনুরূপ-ভঙ্গীতেই বানানো যাবে—'রূপকথার রাণী' পুতুলের ছাঁদটিকে। এভাবে কাজ করবার সময়, শুধু হাতের চাপ দেওয়া ছাড়াও, আরো কয়েকটি বিশেষ সাজ-সরঞ্জামের সহায়তা গ্রহণের প্রয়োজন আছে। এ সব সাজ-সরঞ্জামগুলি অবশ্য নিতান্তই ঘরোয়া সামগ্রী··· একটু কষ্ট করলে অনায়াসেই বাড়িতে বানিয়ে নেওয়া যায়। তবে যাঁদের পক্ষে এগুলি বাড়ীতে বানিয়ে নেবার অসুবিধা আছে, তাঁরা অবশ্য সামান্য চেষ্টা করলেই কাদা-মাটির শিল্প-সামগ্রী রচনার এ সব বিশেষ সরঞ্জাম গ্রামের বা শহরের কুমোর পাড়ায় কিম্বা বাজারে কারুশিল্প-উপকরণ ব্যবসায়ীদের দোকানে অল্প ব্যয়ে কিনে নিতে পারবেন। কাদা-মাটির কাজের জন্য সাজ-সরঞ্জাম দরকার—শক্ত-মজবুত বাঁকারি থেকে মসৃণ-ছাঁদে চেঁছে-ছুলে-বানানো কলম-পেন্সিলের অনুরূপ দীর্ঘ-মাপের ও পাৎলা ছবির মতো লম্বা, মাঝারি ও ছোট আকারের আধ-ইঞ্চি, সিকি-ইঞ্চি চওড়া এবং তার চেয়েও সরু-সাইজের কয়েকটি বিভিন্ন ছাঁদের 'Blades' বা 'ফলা'। মৃৎশিল্প সামগ্রী বানানোর সময়, ছোট বড়, সরু মোটা ও মাঝারি ছাঁদের এই সব 'ফলা' (Blades) ব্যবহার করতে হবে—অপ্রয়োজনীয় এবং অবাঞ্ছিত বাড়তি মাটির অংশ চেঁছে সাফ করে ফেলা, কেটে বাদ দেওয়া আর উঁচু-নীচু এবড়ো খেবড়ো মাটির অংশকে পরিপাটিভাবে মিলিয়ে মসৃণ করে তোলার কাজের জন্য। এছাড়া লম্বা

সরু গোলাকার মস্তক-বিহীন পেরেক বা তে-কোণা, চৌ-কণা 'হুক' (Hook) বা গয়নার মতো ছাঁদের কাঠের তৈরী ছোট-বড় ছাঁদের আরো কয়েকটি মজবুত গড়নের কাঠিও কাদা মাটির সামগ্রী বানানোর কাজের সংকোচ হিসাবে সঙ্গে রাখলে সুবিধা হবে। মৃৎশিল্প-সামগ্রীর গায়ে বিবিধ ধরণের আলঙ্কারিক-নক্সা খোদাই বা সুদীর্ঘ লতা-পাতা, সরল বা বঙ্কিম রেখা রচনার কাজে, এই ধরণের সরঞ্জামগুলি বিশেষ কার্যকরী হয়। এ সব হাতিয়ার ছাড়াও, কাদা-মাটির কারু-সামগ্রী বানানোর কাজের জন্য আরো কয়েকটি টুকিটাকি উপকরণও হাতের কাছে সংগ্রহ করে রাখা প্রয়োজন। সে উপকরণগুলি হলো—সরু ও মোটা ছাঁদের লম্বা কয়েক টুকরো 'Galvanized wire' বা টিনের তৈরী তার, খানা-খাবার ছুরির (Table Knife) মতো ছাঁদের চওড়া একখানি টিনের পাত, ছোট-বড়-মাঝ রি সাইজের কয়েক টুকরো মসৃণ-সমতল কাঠের টুকরো, কিছু পেরেক-কাঁটা, ছোট একটি হাতুড়ি, তার-কাটবার উপযোগী একখানা কাঁচি বা 'Pliers', একগাছি সরু-মজবুত সুতো, ধারালো একটি পেন্সিল-কাটা ছুরি এবং খানিকটা মিহি-মোলায়েম ধরণের সুতী কাপড়ের টুকরো। কাদা-মাটির কারু-সামগ্রী রচনার জন্য এ সব উপকরণ কিভাবে কাজে লাগে স্থানাভাবের কারণে, এবারে তার বিস্তারিত বিবরণ না দিয়ে বরং আগামী সংখ্যায় সে সম্বন্ধে বিশদ পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো। আপাততঃ, উপরোক্ত 'রূপ-কথার রাজা ও রাণী' পুতুল রচনার বিষয়ে মোটামুটি ভাবে আরো কয়েকটি দরকারী হদিশ দিয়ে, এবারের মতো প্রসঙ্গালোচনা শেষ করা যাক।

ইতিপূর্বেই যেমন বলেছি, তেমনি পদ্ধতিতে উপরের নক্সা-নমুনা অবলম্বনে 'রাজা' ও 'রাণী' পুতুলের আসন-ছাঁদ রচনার পর, শিক্ষার্থী-শিল্পীর যোগ্যতা ও অভিরুচি অনুসারে, পূর্বোক্ত শিল্প-সরঞ্জামগুলির সাহায্যে সরাসরি মাটি খোদাই করে মূর্তির নাক, মুখ, চোখ, কেশদাম, পোষাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্করণ প্রভৃতি বিবিধ অংশ গড়ে তোলা কিম্বা মোটামুটি-ছাঁদে গড়া পুতুল মূর্তিকে শুকিয়ে পাকাপোক্ত করে নিয়ে, গত সংখ্যায় বর্ণিত 'গুড়িয়া-পুতুল' চিত্রণের অধিকল-পদ্ধতিতে রঙ-তুলির প্রলেপ বুলিয়ে পরিপাটি-সুন্দর ধরণে রূপদান করা যেতে পারবে। তবে প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি যে নরম কাদা-মাটির তালের উপর নিপুণভাবে হাতের আঙুলের চাপ দিয়ে সুষ্ঠু উপায়ে বিবিধ শিল্প-সরঞ্জাম ব্যবহার করে মূর্তির ছাঁদ গড়ে তোলার ব্যাপারে মৃৎশিল্পীর কলা-কুশলতার পরিচয় প্রকাশ পায়, শুকনো মাটির পুতুলের গায়ে রঙ-তুলির প্রলেপ বুলিয়ে সুচিত্রিত করার প্রয়াসের চেয়ে অনেক বেশী এবং কলারসিক-মহলেও শেষোক্ত প্রথায় রচিত মৃৎশিল্প-সামগ্রীর চেয়ে পূর্বোক্ত-প্রথায় নির্মিত সামগ্রী অপেক্ষাকৃত অধিক সমাদর লাভ করে।

[ক্রমশঃ

সূচী-শিল্পের নক্সা-নমুনা

মৃন্ময়ী দেবী

সূচী-শিল্পে যে সব মহিলার সবিশেষ অনুরাগ এবং দক্ষতা আছে, নিত্যই তাঁরা নানা রকমের ও নতুন-নতুন ছাঁদের সৌষ্ঠব-সুন্দর বিচিত্র অভিনব 'প্যাটার্ণ', (Pattern), 'ডিজাইন' (Design) বা 'নক্সা-নমুনা' সংগ্রহ করার জন্য রীতিমত উৎসুক আগ্রহান্বিত হয়ে থাকেন। এই সব সূচীশিল্পনিপুণা মহিলাদের অধম্য অনুসন্ধিৎসার চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে এবারে আলপনার ছাঁদের বিচিত্র-আলঙ্কারিক নক্সা নমুনার একটি অপরূপ প্রতিলিপি প্রকাশিত হলো।

উপরের ছবিতে আপনা-শিল্পের ছাঁদে রচিত কারু-কার্য্যের যে আলঙ্কারিক নক্সা নমুনাটি দেওয়া হয়েছে, মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘরের আসবাবপত্রের ঢাকা, কুশন, পর্দ্দা, 'টি-কোজি' (Tea-cosy), বালিশের ওয়াড়, টেবিল-ক্লথ (Table cover), 'রানার' (Runner), 'স্কার্ফ' (Scarf), 'ন্যাপ্‌কিন্' (Napkin-cloth), 'ল্যাম্প শেড্' (Lamp-shade) প্রভৃতি ঘর-সংসারের বিবিধ সৌখিন ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিচিত্র মনোরম ছাঁদে সুসজ্জিত করবার কাজে ব্যবহার করা চলবে। সূচীশিল্প-নিপুণা মহিলাদের পক্ষে, সূতী, রেশমী এবং পশমী কাপড়ের উপর মানানসই রঙের সূতোর সাহায্যে এম্‌ব্রয়ডারী সেলাইয়ের কাজ করে এ ধরণের আলঙ্কারিক-নক্সা রচনা—এমন কিছু দুঃসাধ্য কঠিন ব্যাপার নয়। তবে কোন রঙের সূতো ব্যবহার করে, সূতী, রেশমী বা পশমী —কোন ধরণের গাঢ় বা হালকা রঙীণ কাপড়ের উপর আপনার ছাঁদে রচিত সূচীশিল্পের এই আলঙ্কারিক নক্সাটি ফুটিয়ে তুলবে, সে বিষয়ে কোনো নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দেশ দেওয়া চলে না। কারণ এ বিষয়ে সূচীশিল্পীর ব্যক্তিগত রুচি এবং প্রয়োজন এবং আর্থিক-সঙ্গতি অনুসারেই কাজ করা সমীচীন বোধ হয়। তবে মোটামুটিভাবে, এইটুকুই বলে রাখা যায় যে—এ নক্সার পরিপাটি রূপদানের জন্য গাঢ় রঙের কাপড়ের উপর হালকা ও মানানসই রঙের সূতো··· এবং হালকা রঙের কাপড়ের জমিতে মানানসই ধরণের গাঢ় রঙীণ সূতো ব্যবহার করলেই সূচীশিল্প সামগ্রীটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়ে উঠবে। সূতী, রেশমী বা পশমী হালকা বা গাঢ় রঙীণ কাপড়ের উপর মানানসই ধরণের দুয়েকটি বা বহু রঙের সূতো ব্যবহার করে এ নক্সাটিকে মনোরম ছাঁদে ফুটিয়ে তোলার সময়—আগাগোড়া 'স্যাটিন্-ষ্টিচ' (Satin-Stitch) পদ্ধতিতে সেলাই দিয়ে এমব্রয়ডারী করবেন। তাহলেই সহজ উপায়ে সূচীশিল্পের কাজ করে অচিরেই পরিপাটি ধরণে আপনার ছাঁদের এই আলঙ্কারিক নক্সাটিকে যথাযথভাবে রঙীণ কাপড়ের জমিতে সুন্দররূপে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন।

এবারে এই পর্য্যন্তই···বারান্তরে এমনি ধরণের আরো কয়েকটি অভিনব বিচিত্র সূচী শিল্পের নক্সা-নমুনার পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

— —

সুধীরা হালদার

এবারে পশ্চিম-ভারতের গুজরাট-অঞ্চলের অধিবাসীদের পরম-প্রিয় অভিনব-সুস্বাদু বিশেষ এক ধরণের মিষ্টান্ন রান্নার বিচিত্র পদ্ধতির কথা বলছি। গুজরাটি-প্রথায় বানানো অপূর্ব্ব মুখরোচক এই মিষ্টান্নটির নাম—'গোল-পাপ্‌ড়ি'। বাড়ীতে কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে

অল্প-ব্যয়ে সময়ে নতুন ধরণের এই মিষ্টান্নটি পাক ও পরিবেশন করে সাধ্যে আত্মীয়-পরিজন এবং অতিথি-অভ্যাগতদের প্রচুর আনন্দ ও পরিতৃপ্তি দান করতে পারবেন।

গুজরাটি-প্রথায় 'গোল-পাপড়ি' খাবার রান্নার জন্ত উপকরণ চাই—সিকিখানা নারিকেল, সাধারণ চায়ের পেয়ালায় এক-পেয়ালা গুড়, চায়ের পেয়ালায় এক পেয়ালা গমের আটা এবং চায়ের পেয়ালায় আধ-পেয়ালা ঘি। এ সব উপকরণ ব্যবহার করে প্রায় দেড়-পোয়া পরিমাণ 'গোল-পাপড়ি' মিষ্টান্ন বানানো যাবে।

উপরের ফর্দমতো উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, রান্নার আয়োজনের পালা শুরু করতে হবে—কুরুণীর সাহায্যে মিহি-ছাঁদে নারিকেলের শাঁসটুকু আগাগোড়া ভালোভাবে কুরে নিয়ে এবং উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সেই পাত্রে গুড় ও তার সঙ্গে আন্দাজমতো পরিমাণে অল্প খানিকটা জল মিশিয়ে, 'মিশ্রণটি'কে কিছুক্ষণ ভালোভাবে ফুটিয়ে নিয়ে গুড়ের তরল রস বানিয়ে ও তুলে রেখে দিন। এ কাজ সারা হলে, উনানের আঁচের রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে সেই পাত্রে ঘি দিয়ে আটাটুকু পরিপাটি-ভাবে ভেজে নিন। এভাবে ভাজবার ফলে, আটার রঙ বেশ বাদামী ধরণের হলে, রন্ধন-পাত্রে নারিকেল-কোরা মিশিয়ে দিন এবং হাতা বা খুন্তীর সাহায্যে 'মিশ্রণটিকে' কিছুক্ষণ ভালোভাবে নাড়াচাড়া করুন। এমনিভাবে নাড়াচাড়া করবার সময়, সজাগ-দৃষ্টি রাখবেন যে 'মিশ্রণটি' যেন কোনোমতেই রন্ধন-পাত্রে এঁটে না বসে বা ধরে যায়।

উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় 'মিশ্রণটি' আগাগোড়া ভালোভাবে পাক করে নেবার পর, রন্ধন-পাত্রে ইতিপূর্বে বানিয়ে রাখা তরল গুড়ের রস মিশিয়ে, খাবারটিকে আরো কিছুক্ষণ উনানের আঁচে রেখে ফুটিয়ে নিতে হবে। খানিকক্ষণ ফোটানোর পর, সাবধানে উনানের উপর থেকে রন্ধন-পাত্রটিকে নামিয়ে, সদ্য-পাক-করা খাবারের 'মিশ্রণটিকে' সময়ে পরিষ্কার একটি কানা-উঁচু থালায় ঢেলে রেখে কিছুক্ষণ ভালোভাবে জুড়োতে দিন। এমনিভাবে জুড়োনোর সময়, থালায় রাখা খাবারটি 'অর্দ্ধেক-জমাট ধরণের হলেই, পরিষ্কার একটি ছুরির সাহায্যে পরিপাটি-ভাবে পছন্দমতো ছোট, বড় বা মাঝারি বরফীর আকারে কয়েকটি টুকরোয় ভাগ করে কেটে রাখুন। তাহলেই গুজরাটি-প্রথায় 'গোল-পাপড়ি' মিষ্টান্ন বানানো যাবে।

এই হলো—'গোল-পাপড়ি' মিষ্টান্ন রচনার মোটামুটি নিয়ম।

আগামী সংখ্যায় অভিনব মুখরোচক আরেকটি নতুন ধরণের ভারতীয় খাবার রান্নার পদ্ধতির পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

প্রাণকাব্য

চুণীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

মরা গাঙে বান ডেকেছে আমার চিত্তে,
তাই বুঝি ইচ্ছা হল কবিতা লিখিতে।

মায়াময় জীবনখানি বাসনায় ভরা,
তার মাঝে মহানন্দ দিল এই ধরা।

সুদীর্ঘ মরপাঠে পুণ্য পূজায়,
মহাশিব সুপ্রসন্ন আজি করুণায়।

আজকের দিনে

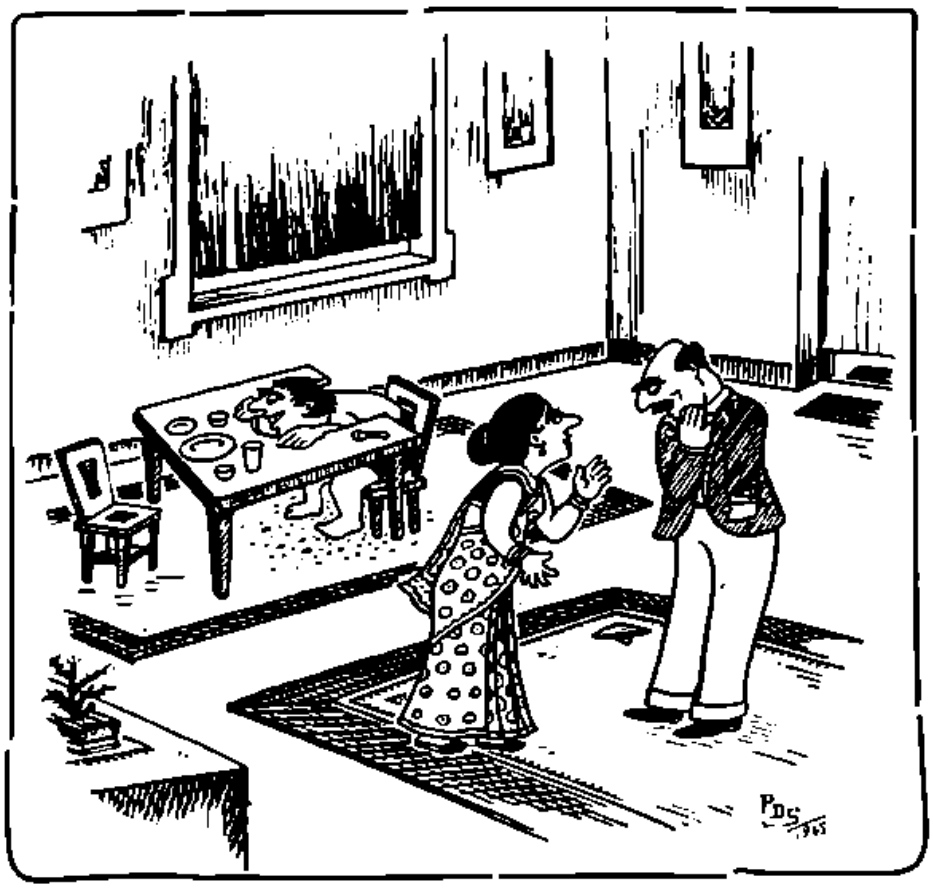

কর্তা :—ব্যাপার কি ?·· ছেলেটা খাবকা এমন
টেবিল কামড়াচ্ছে কেন ?···
গিন্নী :— পেটের জ্বালায় !···দিন-কাল যা হয়েছে !
···কি খাবে ?···চাল জোটে তো ডাল
জোটে না···মাছ জোটে না···মাংস
জোটে না···তেল জোটে না···দুধ জোটে
না !···পেট ভরবে কিসে ?··

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্মা

রাগ বসন্ত

তেতালা (দ্রুতগতি)

(সখী) বসন্ত এলো ঘন বন বীথিকায়
নূপুর চরণে বাজে দূর উপবনে
হিন্দোলে দোলে হিয়া মধু জোছনায়।
তমালের শাখে শাখে কোকিল বধূয়া ডাকে
মিলন পাগলপারা নয়নে তৃষায়।

কথা : শ্রীশিশির মুখোপাধ্যায় সুর ও স্বরলিপি : শ্রীভূপেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আস্থায়ী

০	১	২	৩
III সা মা -া গা | মা ধা না র্সা | না ধা মগা ক্ষা | মা -া -া -া II			
ব স • ন্ত	এ লো ঘ ন	ব ন বী• থি	কা • • য়
০	১	২	৩
মা গা মা ক্ষা | মা গা ঝা সা | ন্সা মা ক্ষা গা | মধা নর্সা র্সা -া I			
ন্ পু র চ	র ণে বা জে	দূ• র উ প	ব• •• নে •
০	১	২	৩
না মা র্সা র্সা | না না ধা ক্ষা | মা গা ক্ষা মা | গমা গা ঝা সা II			
হি • ন্দো লে	দো লে হি য়া	ম ধু জো ছ	না• • • য়

অন্তরা

০ ১ ২ ৩ ৩
II| ধা ক্ষা ধঃ না | র্সা র্সা র্সা র্সা | না না না ধা | (ক্ষধা নধা ক্ষা গা)| ক্ষধা ধনা না না |
ত মা লে র পা খে পা খে কো কি ল ব ধু• য়া• ডা কে ধু• য়া• ডা কে

০ ১ ২ ৩
র্সা র্মা র্গা ঋা | ঋা ঋা র্সা র্সা | র্মা ধা নর্সা নধা | মগা মগা ঋা সা II
মি ল ন পা গ ল পা য়া ন ব বে• ত• ধা• •• • ন্

তান

২ ৩
নধা মগা মধা নর্সা | নধা ক্ষগা মগা ঋসা |
ব• •• ন• •• বী• খি• কা• •ন্

২ ৩
২। ধনা র্সধা নর্সা ধনা | র্সনা ধক্ষা মগা ঋসা |
ব• •ন •• বী• •• খি• কা• •ন্

২ ৩
ধা নর্সা র্মর্গা ঋর্সা | নধা ক্ষগা মগা ঋসা |
ব ন• •• •• বী• খি• কা• •ন্

২ ৩
৪। মা ধনা র্সধা র্সা | মগা ক্ষমা গঋা সা |
ব ন• •• • বী• খি• কা• ন্

অন্তরার তান

২ ৩ ১
১। র্সা -। -। -। | না -। ধা -। | ক্ষা ধা না -। | ধা -। ক্ষা গা |
আ • • • • • • • • • • • • • • • •

২ ৩
মধা নসা। -। ধা | না -। র্সা -। |
•• •• ৯ • • • • • •

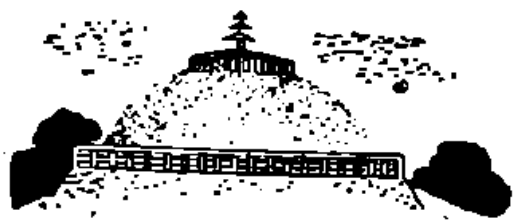

ভাষা ও আশা

শ্রীজ্ঞান

আজকের দিনে ভারতের ভাষা সমস্যা যে একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়ই হয়ে উঠেছে, তাই শুধু বাংলায় নয় সারা দেশেই এই সমস্যা একটা বিরাট আলোড়নের ঢেউ তুলেছে। অবশ্য এর প্রকোপ দক্ষিণ ভারতেই সবচেয়ে বেশী। ভাষা-সমস্যা সর্ব্বস্তরের মানুষের কাছেই একটা বিশেষ ব্যাপার হলেও, ছাত্রদের কাছে এই সমস্যার গুরুত্ব অনেক বেশী; কারণ শিক্ষার মাধ্যমটা কি হবে তার ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করে। হিন্দী ভাষা একক ভাবে জাতীয় ভাষা হলে, হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণে ও পরীক্ষা দেওয়াতে হিন্দীভাষীদের সুবিধা হবে সবচেয়ে বেশী। অন্যান্য প্রদেশের অহিন্দীভাষীদের চেষ্টা করে হিন্দী ভাষা শিখে পরীক্ষা দিতে হবে ও হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণও হয়ত করতে হবে। তাই অহিন্দীভাষী রাজ্যের লোকেরা এই অসাম্য ব্যবস্থা মেনে নিতে রাজী নয় এবং এটাই হল এই আন্দোলন, আলোড়ন ও বিরোধের মূল কথা। তোমরা অনেকেই এ সমস্তই জান। আরও নিশ্চয়ই তোমরা জান যে মাদ্রাজ, বাংলা প্রভৃতি অহিন্দী ভাষী রাজ্যের লোকেরা তাই ইংরাজী ভাষাকে, যে ভাষা শিক্ষিত লোক মাত্রেই কিছু না কিছু জানে, তাকেও পূর্ব্বের মতন জাতীয় বা সর্ব্বভারতীয় ভাষারূপেই রাখতে চান। এ-পর্য্যন্ত অবস্থা দেখে মনে হয় ইংরাজী ভাষা আরও অনেকদিন সর্ব্বভারতীয় ভাষা রূপে ব্যবহৃত হবে।

এই ইংরাজী ভাষা যদিও আমাদের ভারতের নিজস্ব নয় এবং ভারতের মতন সুপ্রাচীন, ঐতিহ্যময় ও সংস্কৃতিবান দেশের নিজস্ব কোনও ভাষাকেই জাতীয় ভাষা করা উচিত, তবুও বলব ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম ও সর্ব্বভারতীয় ভাষা রূপে গণ্য করাতে ছাত্রেরা তো দূরে থাক—ভারতবাসী মাত্রেই লাভবান হবে। ইংরাজী ভাষা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যে আজ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষার মর্য্যাদা পাচ্ছেই শুধু নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষাই সবচেয়ে চালু ভাষারূপে গণ্যও হচ্ছে। সুতরাং এরূপ একটি প্রগতিশীল ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত বিশ্বভাষাকে যদি আমরা নিজস্ব ভাষার মতন আয়ত্ত করতে পারি তাতে আমাদের জাতীয়তাবোধ একটু ক্ষুণ্ণ হলেও, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদের ছাত্ররা বিশেষ করে লাভবান যে হবে তাতে কোনও সন্দেহই নেই। কিন্তু এই সূত্রে একটা বিষয়ের উল্লেখ না করে থাকতে পারছি না। সেটা হল আজকালকার ছাত্রদের মধ্যে ইংরাজী ভাষাকে ভাল করে শিক্ষা করবার চেষ্টা ও যত্নের অভাব। সেটা বোধ হয় ইংরাজী আর সর্ব্বভারতীয় ভাষা থাকবে না বা ওটা বিদেশী ভাষা এইরূপ কোন মনোভাব থেকে, কিংবা ভ্রম-বিমুখতা বশতঃ এই ইংরাজী ভাষাকে নিষ্ঠাভরে শিক্ষা করবার দিকে ছাত্রদের আজকাল নজর নেই। এটা কিন্তু

ঠিক নয় বা বুদ্ধিমানের কাজও নয়। আগেই বলেছি ইংরাজী আরও বহুদিন সমগ্রভারতীয় ভাষারূপে ব্যবহৃত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এবং ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করে আমরা অতীতেও লাভবান হয়েছি, বর্ত্তমানেও লাভবান হচ্ছি এবং ভবিষ্যতে লাভবানই হব। সুতরাং ইংরাজী ভাষাকে তোমরা ভাল করে শেখবার চেষ্টা কর। তবে সেই সঙ্গে তোমাদের মাতৃভাষাকেও পরম নিষ্ঠাভরে শিক্ষা কর। কারণ মাতৃভাষা ভাল করে না জানলে কখনও শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, আর মাতৃভাষার ছাত্রেরা অনুরাগী না হলে মাতৃভাষারও উন্নতি হয় না।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। ইংরেজীর সংস্পর্শে এসে এবং বাংলার মনীষী সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদদের ঐকান্তিক চেষ্টায় বাংলা ভাষা আজ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যশালী আধুনিক ভাষা বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। এখন এই ভাষাকে আরও প্রগতিশীল, আরও উন্নত করতে হলে এই ভাষার প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে হবে, ঐকান্তিক নিষ্ঠায় এর সেবা করতে হবে। আশা করি তোমরা, এই ছাত্র সম্প্রদায়, ইংরাজীর সঙ্গে সমান নিষ্ঠায় আমাদের মাতৃভাষা এই বাংলা ভাষাকে, যার সম্বন্ধে কবি গেয়ে গেছেন—"মোদের গরব মোদের আশা, আমাদের এই বাংলা ভাষা" আমাদের পরম গর্ব্বের বস্তু এই ঐশ্বর্য্যশালী ভাষাকে পরম শ্রদ্ধাভরে শিক্ষা করবে।

——

চার্লস্ ডিকেন্স্

রচিত

অলিভার্ টুইষ্ট্

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এমনিভাবে একা সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অজানা-অচেনা লণ্ডন শহরে এসে কিশোর অলিভার ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় পরিশ্রান্ত হয়ে গলির মোড়ে একটা বাড়ীর রোয়াকের কিনারায় বসে পড়লো। কিছুক্ষণ বাদেই অলিভারের হঠাৎ নজর পড়লো —কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে তারই সমবয়সী শীর্ণকায় চেহারার অপরিচিত আরেকটি ছোকরা। পথের ধারে অলিভারকে একা চুপচাপ এমন অসহায়ভাবে বসে থাকতে দেখে ছোকরাটি সটান তার কাছে এগিয়ে এসে আড়চোখে তাকিয়ে বললে,—মুখ দেখে তো আনকোরা নতুন মানুষ বলে ঠাওর হচ্ছে।…বলি, আসছো কোত্থেকে হে, বাপু ?…

অলিভার নিতান্তই সরল সাধাসিধা মফঃস্বলের ছেলে …শহরে মানুষদের হালচাল পরিচয় সম্বন্ধে তার কোনো ধারণা নেই…কাজেই সম্পূর্ণ অচেনা অজানা হলেও, সে সরল বিশ্বাসে অপরিচিত ছোকরাটিকে সরাসরি জানালো তার দুর্ভোগ-দুর্দ্দশার মর্ম্মান্তিক কাহিনী।

অলিভারের দুঃখের কাহিনী শুনে সেই ছোকরাটি হো-হো হেসে উঠলো…সহানুভূতির সুরে বললে,—আরে ভাই, কেন মিথ্যা কষ্টভোগ করে শুকিয়ে মরছো এমন !…

বিরাট এই লণ্ডন শহরে···অতেল কাজ···অতেল পয়সা··· অতেল মজা!···কাক-পক্ষী ..ছারপোকাটি পর্যন্ত কেউ এখানে কখনো উপোষী থাকে না!···কত কি ফন্দী-ফিকির ···কত কি ধান্ধা!···চলে এসো, আমার সঙ্গে · দেখবে··· দিব্যি মজাসে খাবে-দাবে থাকবে···রাজার হালে দিন কাটাবে!···কোনো চাঁই-চিন্তা থাকবে না তোমার এতটুকু!···

অপরিচিত ছোকরার কথা শুনে অসহায় অলিভার যেন অকূলে কূল পেলো···আগ্রহভরে সে বললে,—তাই নাকি!···বেশ ··তাহলে চলো, তোমার সঙ্গেই যাই!

এই বলেই অলিভার সোৎসাহে বাড়ীর রোয়াক থেকে উঠে দাঁড়ালো। অপরিচিত ছোকরাটিও ক্ষণেক আড়-চোখে অলিভারের পানে তাকিয়ে থেকে মুচকে হেসে বললে,—আচ্ছা, এসো আমার সঙ্গে!

এমন আচমকা লণ্ডন শহরের এই ধরণী নতুন বন্ধুটিকে পেয়ে অসহায় আগন্তুক অলিভার ভাবলো—এবারে বুঝি তার বরাত ফিরলো এতদিনে!···এই ভেবে সে তার লব্ধ-পাওয়া বন্ধু অপরিচিত ছোকরাটির পিছু পিছু শহরের নানান গলি-ঘুপচি রাস্তা ঘুরে অবশেষে এসে হাজির হলো নিরালা বস্তীর প্রান্তে জীর্ণ পুরাতন একটি ভাঙাচোরা বাড়ীর সামনে। সে বাড়ীর সুমুখে এসেই আড়চোখে সরল কিশোর অলিভারের পানে তাকিয়ে মুচকে হেসে অপরিচিত ছোকরাটি বললে,—এই হলো আমাদের আস্তানা—এখানেই থাকতে হবে তোমায়!···ভিতরে চলো ···আমাদের ওস্তাদের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই!

নতুন বন্ধুর সঙ্গে বাড়ীর ভিতরে ঢুকতেই অলিভার দেখলে ছোট্ট একটি আলো আঁধারে ভরা অপরিচ্ছন্ন কুঠরীর কোণে লম্বা একখানা কাঠের টেবিলের সামনে উঁচু টুলের উপর বসে রয়েছে শয়তানের মতো কুৎসিত চেহারার কুঁজো রোগা এক বুড়ো···অলিভারকে দেখেই সে বুড়ো কটমট করে তার পানে তাকিয়ে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো। বুড়োর হাবভাব দেখে অলিভার শিউরে উঠলো···অজানা আতঙ্কে তার সর্বাঙ্গ যেন ছমছম করতে লাগলো। নতুন বন্ধুর কিন্তু সেদিকে এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই ···সে সটান টেবিলের সামনে এগিয়ে গিয়ে সোৎসাহে কুৎসিত বুড়োকে বললে,—নয়া সাকরেদ পাকড়াও করে এনেছি, ওস্তাদ!···কি বকশিশ দেবে বলো, সর্দার!··· ছোঁড়াটার চেহারাও দিব্যি সুবোধ সরল নিরীহ ভদ্র-ঘরের!···দু'চারদিন তালিম দিয়ে পাকাপোক্ত করে নিলেই খাসা কাজ চালানো যাবে আমাদের!···নয় কি?

এ কথা শুনে কুঁজো বুড়ো ক্রুর-দৃষ্টিতে আরেকবার অলিভারের আপাদমস্তক লক্ষ্য করে মুচকে হেসে ঘাড় নেড়ে বললে,—হুঁ!···তা কথাটা নেহাৎ মন্দ বলিসনি রে! ···তোর নজর আছে দেখছি!···ছোঁড়াটাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে তৈরী করে নিতে পারলে হয়তো মুনাফা মিলবে! ···বেশ তো, এবার থেকে কাজে বেরুনোর সময় ছোঁড়া-টাকে দু'চারদিন সঙ্গে সঙ্গে রেখে কলে তালিম দিয়ে নে··· অন্ধিসন্ধিগুলো বাৎলে দে··· তাহলেই···

বুড়োর কথা আর শেষ হলো না···সেই মুহূর্তেই অলিভারের সমবয়সী আরো ক'জন ছোকরা ঘরে এসে হাজির···ঘরে ঢুকেই তারা সোৎসাহে তাদের ছেঁড়া তালি মারা জীর্ণ মলিন কোট পেণ্ট্‌লেনের পকেট থেকে কমালে-মোড়া একরাশ ছোট বড় পুঁটলি আর বাণ্ডিল বার করে কুঁজো বুড়োর সামনে টেবিলের উপর জড় করে রাখলো··· বললে—এই নাও সর্দার···আজকের রোজগার ··এতক্ষণ শহর চুঁড়ে যে সব দৌলত জুটিয়ে এনেছি হাত সাফাইয়ের কারসাজিতে!···

এ সব কাণ্ড-কারখানা দেখে অলিভার তো স্তম্ভিত। মফঃস্বল থেকে পালিয়ে একা অসহায় অজানা লণ্ডন শহরে এসে পথের অচেনা ছোকরাটির সঙ্গে ফন্দীবাজ কুঁজো বুড়োর বিচিত্র আড্ডায় হাজির হয়ে এতক্ষণ যে সব কথা-বার্তা শুনছিল আর আজব আচরণ লক্ষ্য করছিল, সে সবই তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন ··অপরিচিত···অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা! এমনটি যে ঘটতে পারে—এ ছিল তার কল্পনারও অতীত। কাজেই এমন অজানা অপরিচিত নতুন আবহাওয়ার মধ্যে এসে হাজির হয়ে রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে আড্ডাখানার স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার জীর্ণ কুঠরীর এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে বেচারী অলিভার একাগ্রভাবে নজর করছিল তার সমবয়সী এই সব শহুরে কিশোরদের আজব কীর্তিকলাপ।

আগন্তুক ছোকরার দল তাদের পকেট থেকে কমালে-ছোট-বড় বিচিত্র বাণ্ডিলগুলি বার করে সারি দিয়ে

টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখতেই আড্ডাখানার সর্দার কুঁজো-বুড়ো ক্ষুধিত-দৃষ্টিতে খাবারগুলির পানে তাকিয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো···তার মুখে-চোখে ফুটে উঠলো উল্লাসের আভা···ছোকরাদের তারিফ জানিয়ে বললে,—সাবাস্!··· এই তো চাই!···দিন-দিন দিব্যি পাকাপোক্ত হয়ে উঠছিস্ দেখছি তোরা!···এমনটি হলেই রীতিমত বাহাদুর··· ওস্তাদ বনতে পারবি শেষ পর্যন্ত!···এখন ডাখদিকি···ঐ নতুন ছোঁড়াটাকে ঠিকমতো তালিম দিয়ে যদি গড়ে-পিটে মানুষ করে তুলতে পারিস্!···

সর্দারের কথা শুনে ছোকরাদের দলের সবাই তাকালো অপরিচিত অলিভারের পানে···কুটুরীর কোণে তাকে চুপ-চাপ হতভম্বভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অলিভারের পথ-পরিচিত পথের বন্ধু ছোকরাটি কুঁজো বুড়োর দিকে তাকিয়ে মাতব্বরী ভঙ্গীতে বললে,—কোনো চিন্তা করো না, ওস্তাদ ···ওকে আমরা দু'দিনেই তালিম দিয়ে বাহাদুর বানিয়ে তুলবো!···

এই বলেই সে মুরুব্বী-চালে অলিভারের কাছে এগিয়ে গিয়ে পিঠ চাপড়ে ভরসা দিয়ে বললে,—কি হে ছোক্কা··· এমন ঘাবড়ে গেলি কেন?···কোনো ভয় নেই!···আরে ···ইনি হলেন আমাদের মালিক···দলের সর্দার···সবাইকার গুরু···ক্যাগিন কর্তা···রীতিমত নামডাকা ওস্তাদ!

সর্দারের পরিচয় পেয়েও অলিভারের মনের সংশয় কিন্তু ঘুচলো না···সে যেমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনিই রইলো। তাকে এমন নিরুৎসাহভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পথের বন্ধু ছোকরাটি অভয় দিয়ে বললে,—কি রে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলি যে!···আয় আমাদের সঙ্গে!··· তোর নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে···পথে-পথে ঘুরে কাটিয়ে-ছিস এ ক'দিন···খাওয়াদাওয়া···আশ্রয় কিছুই জোটেনি বরাতে!···চল্ দেখি · দু'মুঠো কিছু মুখে দিয়ে নে আগে··· তারপর···

আড্ডাখানার ছোকরা বন্ধুর এই সাদর আহ্বানে অনাথ অসহায় অলিভারের সরল কিশোর মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো···এমন সদয় আহ্বান জীবনে সে এই প্রথম শুনলো! এতদিন তার বরাতে শুধু জুটেছে—অবহেলা, অনাদর, লাঞ্ছনা, তিরস্কার · নির্মম পীড়ন অত্যাচার আর দুঃখ-দুর্দশার অপরিসীম কষ্ট দুর্ভোগ! তাই আজ অপ্রত্যাশিতভাবে এই অজানা শহরে অচেনা আড্ডাখানার আশ্রয়ে অপরিচিত বন্ধুর কাছে আহারের এমন সাদর আহ্বান পেয়ে সংসার অনভিজ্ঞ সরল কিশোর অলিভার অসীম আবেগে এতই অভিভূত হয়ে উঠলো যে তার মুখে আর কথাটি পর্যন্ত সরলো না···নড়বার সামর্থ্যটুকুও যেন লোপ পেলো···পুঞ্জীভূত আবেগের প্রবল বন্যায় তার দেহ-মন শুধু-মৌন হয়ে উঠলো।

অলিভারকে এমন নিশ্চল নিশ্চুপ আবেগ-বিহ্বল অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আড্ডাখানার সেই ছোকরা-বন্ধুটি শেষে তাকে হাত ধরে সাদরে টেনে নিয়ে গেল তাদের খানা-ঘরে···সেখানে সে সোৎসাহে অলিভারের সামনে সাজিয়ে এনে দিলে একরাশ বাসি রুটি আর আধ-পোড়া মাংসের টুকরো···সে খাবারের স্বাদ অলিভারের কাছে অমৃতের চেয়েও অনেক বেশী মনে হলো। অলি-ভারের মন ভরে উঠলো এতদিন পরে এমন ঘরোয়া আদরের পরশ লাভ করে পরম পরিতৃপ্তিতে। পেটভরে এ সব খাবার দাবার খেয়ে অনাথ অলিভারের মন ভরে উঠলো আড্ডা-খানার সবার প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতায়-অনুরাগে। তাই খাওয়াদাওয়ার পালা চুকিয়ে বিশ্রামের সময় সে তার বন্ধুকে বললে,—আজ থেকে আমিও তাই তাহলে তোমা-দেরই দলের একজন হলুম। কাজেই কাজে বেরুনোর সময় রোজ তোমরা আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যেও··· আমিও তোমাদের দলে থেকে এবারে কাজ শিখতে চাই।

অলিভারের এই সহজ সরল কথা শুনে তার সমবয়সী আড্ডাখানার অন্য সব ছেলেরা মুচকে হেসে আড়চোখে পরস্পরের মুখের পানে তাকালো···ছোকরা বন্ধুটি মুরুব্বী-চালে জবাব দিলে,—বেশ, তাই হবে'খন। সর্দারকে আমরা তাহলে জানিয়ে রাখবো তোমার কথা ইতিমধ্যে!

[ক্রমশঃ

চিত্রগুপ্ত

সঙ্গীতের সুমধুর সুরধ্বনি শুনতে কার না ভালো লাগে! ভগবানের হাতে-গড়া সেরা জীব মানুষ ছাড়াও, বনের দুরন্ত-ভয়ঙ্কর জন্তু-জানোয়ার···এমন কি বিষধর সাপও সুরেলা সঙ্গীতের ধ্বনি শুনে মোহিত হয়—এ কথা তোমরা সকলেই জানো। আজ তাই তোমাদের বিচিত্র-অভিনব উপায়ে সঙ্গীতের সুমধুর সুরধ্বনি সৃষ্টির আজব-মজার একটি কলা কৌশল শিখিয়ে রাখি। সঙ্গীত-সৃষ্টির এই আজব কলা-কৌশল আয়ত্ত করা নিতান্তই সহজসাধ্য ব্যাপার···সামান্য চেষ্টা করলেই তোমরা অনায়াসে এমনি-উপায়ে বিচিত্র সঙ্গীতের সুরধ্বনি শুনিয়ে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের শুধু আনন্দদানই নয়, উপরন্তু, রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে। আপাততঃ, শোনো—অভিনব মজার এই সঙ্গীত-সৃষ্টির বিচিত্র কলা-কৌশলের কথা। কিন্তু সে কথা বলবার আগে, এমনি উপায়ে সঙ্গীতের সুরধ্বনি সৃষ্টি করতে হলে নিতান্ত-ঘরোয়া টুকিটাকি যে সব সাজ-সরঞ্জাম দরকার—তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ তোমাদের জানিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এ কায়দা দেখানোর জন্য চাই—তিন-চার হাত লম্বা-মজবুত 'টোয়াইন' (Twine-chord) সুতো, একখানি কাঁচি, একটি চামচ, খানা-খাবার একটি কাঁটা এবং একখানা ছুরি। ব্যস, তাহলেই খাসা সঙ্গীত-সৃষ্টির কায়দা দেখানো চলবে।

এ সব সরঞ্জাম জোগাড় হবার পর, আত্মীয়-বন্ধুদের আসরে কলা-কৌশল দেখানোর সময় উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি ধরণে সোজাসুজি ভাবে (virtical) দু'পাশে সমান-মাপের লম্বা দু'টুকরো সুতো ঝুলিয়ে, সে দুটির মাঝামাঝি জায়গার দুই প্রান্তে আড়াআড়িভাবে (Horizontal) আরেক টুকরো সুতো ফাঁস দিয়ে বেঁধে নাও। তারপর উপরের ছবিতে যেমন যেমন দেখছো, অবিকল তেমনি ভঙ্গীতে আড়াআড়িভাবে ফাঁস দিয়ে আঁটা সুতোর কালির সঙ্গে সমান-মাপের ছোট ছোট তিন টুকরো সুতো বেঁধে পাশাপাশি ঝুলিয়ে রাখ ঐ কাঁটা, চামচ আর ছুরিখানা।

এ কাজ সারা হলে, উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, অবিকল তেমনি ভঙ্গীতে লম্বালম্বিভাবে-বাঁধা (Vertically-tied) দু'পাশের সুদীর্ঘ সুতোদুটির প্রান্ত ধরে তোমার নিজের, অথবা আসরের আত্মীয়-বন্ধুদের কাউকে সাদরে ডেকে এনে, তাঁর দুই কানের দুই ফোকরের উপরে দুই হাতের দুই আঙুলের চাপ দিয়ে কষে এঁটে রাখো এবং মাথাটিকে মৃদুভাবে নাড়তে বলো। মাথা নাড়ানোর এই মৃদু-আন্দোলনে সুতোয়-ঝোলানো শূন্যে ঝোলুল্যমান কাঁটা, চামচ ও ছুরি পাশাপাশি থাকার ফলে পরস্পর পরস্পরকে ধাক্কা দেয় এবং তাদের ধাক্কার ফলে, টুংটাং শব্দে বিচিত্র সুমধুর সঙ্গীতের সুরধ্বনি জাগিয়ে তোলে। এমনি উপায়ে অভিনব যে সুরধ্বনি সৃষ্টি হয়, বিজ্ঞানের রহস্যময় নিয়মে তার কম্পন যেন আঙুল দিয়ে

দুই কানের লোকরের উপরে রেখে রাখা হয়-দুটো বরে ফিতে দিয়ে শোঁয়ায় বন্ধ করবে।

এই হলো—অভিনব-কৌশলে সঙ্গীতের সুরলহরি সৃষ্টির বিচিত্র উপায়। এমনি উপায়ে কাঠ, চামড় এবং ধাতু—মোট তিনটি সুরসৃষ্টিকারক জিনিসের সঙ্গে ঐ ধরণের আরো কয়েকটি ধাতুনির্মিত সামগ্রী জোগাড় করে আড়াআড়িভাবে-বাঁধা সুতোয় ঝুলিয়ে দাও তো—সবগুলি থেকে তোমরা অনায়াসেই আরো নানান্ পঞ্চার সুমধুর সঙ্গীতের সুর ফুটিয়ে তুলতে পারবে।

মনোহর মৈত্র

১। দেশলাই-কাঠির আজব হেঁয়ালী :

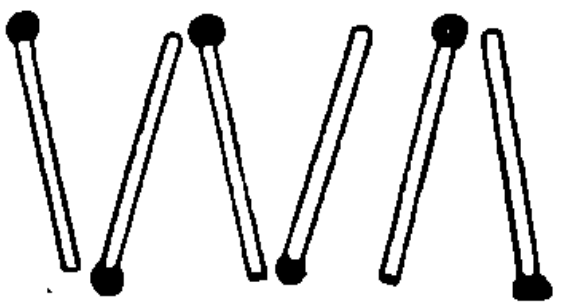

উপরের ছবিতে এলোমেলোভাবে ছড়ানো রয়েছে দেশলাই-কাঠি। মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে তোমরা মাত্র এই ছয়টি দেশলাই-কাঠি কায়দা করে সাজিয়ে বিচিত্র-ছাঁদের এমন একটি নক্সা বানাও—যে সেই নক্সাটির ভিতরে পাশাপাশি এবং অঙ্গাঙ্গীভাবে মোট যেন আটটি ত্রিভুজ (Triangle) রচিত হয়ে যায়। তোমাদের মধ্যে যারা অবিলম্বে এবারের এই আজব হেঁয়ালিটির সঠিক উত্তর লিখে সরাসরি আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দিতে পারবে, আগামী ১৩৫ মাসের সংখ্যায় আমরা নাম-সহ তাদের নাম ধাম ছাপার হরফে সবাইকে জানিয়ে দেবার যথাযথ ব্যবস্থা করবো। কাজেই দেরী করে ফেলো না। তোমরা—দেশলাই-কাঠির এই আজব হেঁয়ালির সঠিক উত্তর লিখে পাঠাতে পারো তো বুঝবো—বুদ্ধিতে রীতিমত দড় হয়ে উঠেছো আজকাল।

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

২। তিন অক্ষরে নাম তার,
চোখের তুষণ।
প্রথমাক্ষর বাদ দিলে,
জীবের জীবন।
শেষাক্ষর ছেড়ে দিলে,
কলহ বুঝায়।
মধ্যাক্ষর বাদ দিলে,
বহু এক হয়।

রচনা : সত্যবান কুণ্ডু (হনুয়া)

৩। চার অক্ষরে নাম—এমন একটি বস্তুর নাম করো, যার প্রথমার্দ্ধে বুঝায় 'রাত্রি'···দ্বিতীয়ার্দ্ধে বুঝায় 'সৃষ্টি'। প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ মিলিয়ে বুঝায় 'নিদ্রা'···এবং দ্বিতীয় ও শেষ বর্ণ মিলিয়ে বুঝায় বিশেষ এক-ধরণের গাছ আর পঞ্চম দিয়ে যেনা বিশিষ্ট এক প্রকার শীত-বস্ত্র। বলো তো, সেটি কি ?

রচনা : ধীরেন্দ্রনাথ মোদক (বাশবেড়িয়া)

গতমাসের ধাঁধা ও হেঁয়ালীর উত্তর :

১।

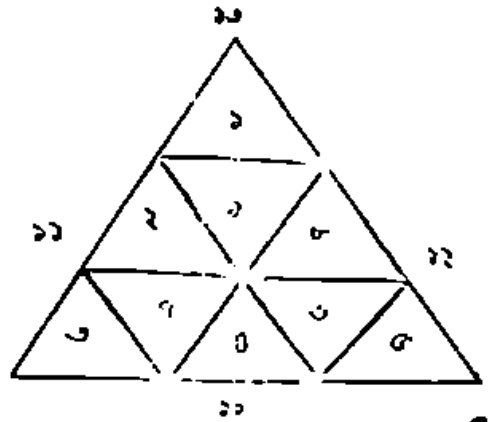

উপরের নক্সাটি দেখলেই সুস্পষ্ট হবিশ মিলবে যে কি

ভাবে তিনটি সরল-রেখা এঁকে ত্রিভুজ তিনটির পাশে মোগ দিতে হবে।

২। নিস্তব্ধতা

৩। পেনসিলভেনিয়া

[বিশেষ বিজ্ঞপ্তি : ভুলক্রমে গত সংখ্যায় ধাঁধার নিম্নলিখিত অংশটি ছাপা হয় নাই। এখানে সেগুলি প্রকাশিত হলো। নৃপেন, ধীরেন, অমিত, দুলাল, অভেদ, নিমাই, দয়াল]

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

সুনু মিত্র (কলিকাতা), পিন্টু হালদার (বালি), সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু (হাওড়া), হিরণ্ময়ী ও কল্যাণী মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), সীনা ও মীরা (দিল্লী), বুবু ও মিঠু গুপ্ত (কলিকাতা), সন্তোষ, অমিয়, মুরারি, সঞ্জয় ও সুনীল (ভিলাই), রিঙ্কি ও রুমি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), হরন্ত, কল্যাণ, শঙ্কর, অমিত, ইন্দ্র, বিনয় (কলিকাতা), সঞ্জীব ও সুনীতা মুখোপাধ্যায় (লক্ষ্ণৌ), শ্যামাপ্রসাদ দাস, অরুণেশ, গুরুদয়াল, পম্পা, প্রতিমা, অনিমা ও বড়দা (কয়াপাট)।

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বাপ্পা ও শিবাজী রায় (কৃষ্ণনগর), ঝুনি ও রীতু দাশগুপ্ত (কলিকাতা), পাপু, ছোটন ও অচ্চি (কলিকাতা), বিশ্বনাথ ও দেবকী সিংহ (গয়া), বাপি, বুলাম ও পিন্টু (বোম্বাই), অলি, বুবুন, সীমা ও বাপলি (কলিকাতা), দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্যাঙ্গালোর), কল্যাণী ও মোহন দেবশর্ম্মা (মাদ্রাজ), শর্ম্মিষ্ঠা ও মজুমিতা রায় (কলিকাতা), পার্থ মুখোপাধ্যায় (বনপাহাড়ি) জলি মহলানবিশ (কলিকাতা), কানু ও বেনু ঘোষাল (উত্তরপাড়া), পুপু ও টুটন (কলিকাতা),

——

খুকুর ইচ্ছা

শ্রীধীরেন চট্টোপাধ্যায়

আঁধার রাতের আলোক লয়ে চাঁদ উঠল যেই,
খুকু বলে : তোর কাছে মা একটি কথা কই।
আকাশটি মা তারায় ভরা ফোটা ফুলের মত,
বলবি মাগো সত্যি করে কে ছড়ালো এত ?
মা বললেন মুচকি হেসে, খুকুর পানে চেয়ে,
'আছেন সেথা তোমার মত চাঁদের ছোট মেয়ে।'
হাতে নিয়ে নানান রঙের তুলি এবং বই,
বললে খুকু : তার সাথে মা পাঠিয়ে দেনা সই ?
মা বললেন তখন হেসে : বলবো কি আর তোরে,
ওখান থেকে চাঁদের মেয়ে আসবে কেমন করে ?

—কেমন দেখাচ্ছে—

ফটো : রবীন চক্রবর্ত্তী

বাদ্যযন্ত্রের কথা

দেবশর্মা প্রিন্টিং

ভারতের ভাট, চারণ-কবি, কবিয়াল, বাউল ও অন্ধ গায়ক-সম্প্রদায়ের মতোই অতি-প্রাচীন পাশ্চাত্য-সমাজে বিশেষ-ধরণের বিভিন্ন ভ্রাম্যমান গীত-বাদ্য-পারদর্শী দেশোদ্ধার গায়ক, বাদ্যযন্ত্রী ও গীতিকার একশ্রেণী অথবা দল বেঁধে নিত্যই রাজ্যের নানা স্থানে এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাড়ি দিয়ে বেড়িয়ে জন-সাধারণের সাদ্ধে বিভিন্ন বিষয়ের বিচিত্র সব সৌখ্য-বীর্য্যময় ও সামাজিক কল্যাণকর কীর্ত্তিকলাপের অভিনব-অসংকল্প নৈতিক, ঐতিহাসিক এবং আধ্যাত্মিক গানা-গান রচনা ও কীর্ত্তন করতেন। পাশ্চাত্য-সমাজে এই সব ভ্রাম্যমান-সঙ্গীতপরিবেশকারীদের নাম দেওয়া হয়েছিল — 'চারণ-গীতিকার' বা 'THE MINSTRELS'।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের প্রবল বন্যাজল বন্যা-বন্দিত, প্রস্তুত-অভিপ্রায় এবং প্রাচারণ-মন্ত্রণাবিদ্ধ, লিখিত-অলিখিত, গদ্য ও নাস্তিক সর্ব-শ্রেণীর নর-নারীর কাছেই গীত-বাদ্য-নৃত্যের চর্চার রীতিমত প্রসাদর ছিল। তার ফলে, ভারতীয় সঙ্গীত-কলা কালে-কালে বিভিন্ন অভিনব সম্পদে প্রতিশোধ গরীয়ান হয়ে উঠে এখুনা বিশ্বের প্রাকৃতিক-সুন্দর নয়ন বিলিষ্ট একটি স্থান লাভ করেছে। ভারতীয় সঙ্গীতের এই অন্যায়ত সাধনা-অনুশীলনের ফলেই যুগে-যুগে বিভিন্ন ধরণের সুর-ছন্দ-তান প্রকৃতির প্রবর্তন ও প্রসারতা ছাড়াও, উদ্ভাবিত হয়েছে বিভিন্ন প্রকারের বাদ্য-যন্ত্র যেগুলির বৈশিষ্ট্য-গরিমা আজ জগৎ-প্রসিদ্ধ। ভারতীয় বীণা, সেতার, সুরোদ, সারেঙ্গী, প্রভৃতি তার-যন্ত্রের সুখ্যাতি এখুনা দুনিয়ার দেশে-দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতীয় সাংস্কৃতিক-কলাতে সুপ্রাচীনকাল থেকে সঙ্গীতের বিশিষ্ট একটি আসন আছে। আমাদের দেশের চৌষট্টি-কলার অন্যতম সুনো — সঙ্গীত।

সঙ্গীত-জগতে ফুঁ দিয়ে বাঁশী বাজিয়ে সুমধুর সুর-সৃষ্টির রেওয়াজ অতি প্রাচীন যুগ অর্থাৎ, মানব-সভ্যতার আদিমকাল থেকেই সুপ্রচলিত। সেই সুপ্রচলিত-রীতি অনুসরণ করেই সুদূর অতীতে ইংলণ্ডের অন্তর্গত স্কটল্যাণ্ডের মনোরম পার্বত্য-অঞ্চলের সঙ্গীতকলারসিক অধিবাসীরা একদা উদ্ভাবন করেন বিচিত্র ধাঁচের এই অভিনব 'ব্যাগ্-পাইপ' বাদ্য-যন্ত্র (BAG-PIPE)। এ বাঁশীর বিশেষত্ব হলো — বাঁশীর মধ্যে প্রবেশ করানো ধমনিতে ফুঁ দিয়ে বাতাসের প্রয়োগ-প্রক্রিয়ায় এবং বাঁশী বাজাবার সময়ে তার

পালির ভাগ্যবিপর্যয়ঃ হিন্দীর প্রতি হুসিয়ারী

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, কাব্যসাংখ্যতীর্থ

কপিলবাস্তু বা কপিলাবস্তু উত্তর ভারতের যেখানেই থাকুক না কেন সেই অঞ্চলটা যে একান্তভাবে সংস্কৃত ভাষাভাষী ছিল, তা রাজপরিবারের পুরুষ নারী বা ছেলে মেয়েদের নামকরণ হতেই বেশ বোঝা যায়। বুদ্ধদেবের নিজের নাম গৌতম বা সিদ্ধার্থ, খুড়তুত ভাই-এর নাম অনিরুদ্ধ, বৈমাত্রেয় ভাই এর নাম আনন্দ, শালকের নাম দেবদত্ত, পিতার নাম শুদ্ধোদন, শ্বশুরের নাম সুপ্রবুদ্ধ, মাতার নাম মায়াদেবী, স্ত্রীর নাম যশোধারা। যেন বিশুদ্ধ সংস্কৃতের হাট বসে গেছে। কুটুম্বাদি সমেত একটা পরিবারের নামকরণ হতেই বোঝা যায়, সেই যুগে, সেই অঞ্চলে সংস্কৃতই ছিল সমাজের উচ্চস্তরের কথ্য বা লেখ্য ভাষা। অবশ্য নিম্নস্তরের জন্য কোনো একটা উপভাষাও ছিল। সারথীর ডাকনাম ছন্দক, আর স্ত্রীর ডাকনাম গোপা হতেই তার প্রমাণ।

অতএব বুঝতে হবে বুদ্ধদেব সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল কথাবার্তা চালাতে পারতেন এবং অনেক সংস্কৃত পুস্তকও পাঠ করেছিলেন—গীতা, উপনিষদ, পাতঞ্জল ও নিশ্চয়ই। তার পর, সংসার ত্যাগ করে জ্ঞান লাভের আশায় তিনি যেখানে বহুবছর কাটিয়ে ছিলেন সেই বারাণসী কেন্দ্রিক সমস্ত গাঙ্গেয় প্রদেশটাই ছিল সংস্কৃত ভাষার লীলা নিকেতন। তিনি মুনি, ঋষি, যোগী প্রভৃতি যে সব জ্ঞানিলোকের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন সংস্কৃত ভাষাভাষী।

এর পর মগধে এসে সাধনার শেষ সোপানে উঠে তিনি যখন বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন তখনো তিনি সংস্কৃতের বেষ্টনীর মধ্যেই ছিলেন। কারণ, তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'বুদ্ধ' উপাধি এবং অল্পপ্রসিদ্ধ 'তথাগত' উপাধি সমাজের উচ্চস্তরের অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষাভাষীদেরই দান—নিম্নস্তরের গুণমুগ্ধ জনসাধারণ অতবড় গূঢ়ার্থক গালভরা শব্দদু'টি কল্পনাই করতে পারেনা।

এরপর বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে ধর্মপ্রচার শুরু করে দিলেন। এই শিষ্যরা বা গুণগ্রাহী ভক্তরা, অধিকাংশই ছিল মগধের অধিবাসী। আবার অভিজাত শ্রেণী অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই তাঁর শিষ্যগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ দখল করেছিল। সুতরাং বুদ্ধদেব এই সব শিষ্য ও স্তাবকদের সঙ্গে সরল সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্তা চালাতে লাগলেন। এই সরল সংস্কৃত ভাষাই হচ্ছে পালি ভাষা, যাতে সংস্কৃতের শব্দ ক্রিয়াপ্রভৃতিকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে বিকৃত করে উচ্চারণ করতে হয় এবং যাতে সংস্কৃতের ব্যাকরণঘটিত জটিলতা ও সাহিত্যঘটিত পাণ্ডিত্যকে সরিয়ে রাখতে হয় বা বাদ দিতে হয়।

এই পালি ভাষা তখন ছিল মগধাঞ্চলের স্থানীয় ভাষা এবং রূপে গুণে 'প্রাকৃতেরই' মত। তবে সংস্কৃত গ্রন্থে যেমন পালির নামগন্ধ নাই, বৌদ্ধ গ্রন্থে তেমনি প্রাকৃতের উল্লেখ বড় একটা নাই—উভয় পক্ষের রেষারেষির ফল। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে বুদ্ধদেব নিজে ছিলেন দোভাষীয়া বহু-ভাষী—পণ্ডিতদের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় এবং জনসাধারণের সঙ্গে তাদেরই মাতৃভাষায় কথা কইতেন। একটা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষে সংস্কৃতজাত উপভাষায় কথা বলা খুবই সহজ। (চৈতন্যদেব উড়িষ্যায় গিয়েই উড়িয়া ভাষা শিখে নিয়েছিলেন।) কিন্তু পালি ভাষাভাষী শিষ্যরাই বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় তাঁর শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে।

বুদ্ধদেবের দেহাবসানের পর প্রায় দু'শো বছর কেটে গেল। ভিক্ষুভিক্ষুণীদের উজ্জ্বল ও মধুর চরিত্র দেখতে দেখতে অখিল ভারতে, বিশেষতঃ উত্তরভারতে এরূপ প্রভাব বিস্তার করলে যে যারা পালিভাষাভাষী ছিল তারাত বটেই, যাদের স্থানীয় ভাষা অপর কিছু ছিল তারাও ভিক্ষুভিক্ষুণীদের মুখ হতে বৌদ্ধবাদ শুনে বৌদ্ধধর্ম

গ্রহণ করতে লাগল। বৌদ্ধ ধর্মটা এতদিন মুখে মুখে চলে আসছিল, এবার এক ধর্মসভার আবশ্যক হয়ে পড়ল। বুদ্ধদেবের বাণী ও জীবনী নিয়ে দুচারখানা বই হয়ত ইতঃপূর্বেই চালু হয়েছিল কিন্তু তার উপর নির্ভর করে এতবড় এক মহান ধর্মের সুপ্রতিষ্ঠা হয় না।

প্রথম ধর্মসভায় বা লোকসভায় বা পার্লামেণ্টে প্রথম আলোচ্য বিষয় হল—কি ভাষায় বৌদ্ধ শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করতে হবে। কেহ বলতে লাগল, সংস্কৃত ভাষায় হোক, আবার কেহ বলতে লাগল পালিভাষায় হোক।

যারা সংস্কৃতের অনুকূলে মতপ্রকাশ করলে তাদের যুক্তিছিল এই "সংস্কৃতই অখিল ভারতের কথা, লেখা, চিন্তা ভাষা। যে মুনি বা যে ঋষি যে মতবাদ প্রচার করেছেন তা সংস্কৃত ভাষাতেই করে গেছেন বুদ্ধের বাণী, জীবনী ও মতবাদ সংস্কৃত ভাষায় প্রচার না করলে বৌদ্ধধর্ম ভারতে স্থায়ী হবে না। পালিভাষায় তাঁর বাণী বা মত প্রচার করলে, একটা অঞ্চলের জনসাধারণ তার সারবত্তা উপলব্ধি করতে পারবে বটে, কিন্তু অখিল ভারতের সুধীসমাজে তা গ্রাহ্য হবে না। গীতায় বলেছে, শ্রেষ্ঠরা যা আচরণ করে ইতর জনেরা তাই অনুসরণ করে, সুতরাং ভারতের শ্রেষ্ঠরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ না করলে জনসাধারণ তার অনুকরণ করবে কেন?"

আবার যাঁরা পালির অনুকূলে মতপ্রকাশ করলেন তাঁদের যুক্তি ছিল এই—"সংস্কৃত ভাষা বেদানুগামী। বুদ্ধদেব যাগযজ্ঞ, পশুবলি প্রভৃতি মানতেন না, জাতিভেদ মানতেন না, দেবতাবাদ মানতেন না। সংস্কৃত ভাষাকে বৌদ্ধ ধর্মের, বৌদ্ধসংস্কৃতির বাহন করলে প্রকারান্তরে যাগযজ্ঞ, বলিদান, দেবত্ব, জাতিভেদ প্রভৃতিকে স্বীকার করে নিতে হয়। বুদ্ধদেব বৈদিক পরিবেশের মধ্যে পুষ্ট হয়েছিলেন বটে এবং চিরকাল নিজেকে হিন্দুরূপে পরিচয় দিয়েছিলেন বটে (তখন অবশ্য হিন্দুত্বের জন্ম হয় নি) কিন্তু তিনি এক নূতন ধর্ম প্রচার করে গেছেন। তিনি ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের জন্য মাথা ঘামাতেন না, সমাজের নিম্নস্তরের উপরই তাঁর দরদ বেশী ছিল, সুতরাং তাঁর বাণী, তাঁর জীবনী, তাঁর অনুশাসন, সবকিছুই পালিভাষাতে হওয়া উচিত। আমরা স্বীকার করি, পালিভাষা আঞ্চলিক ভাষা কিন্তু বৌদ্ধধর্মের সৃজনীশক্তি এত বেশী যে দু'দশ বছর চেষ্টা করলেই পালিভাষা অখণ্ড বৌদ্ধ ভারতের জাতীয় ভাষা হয়ে উঠবে, হয়ত একদিন অখিল বিশ্বকেও এই ভাষা বিজয় করবে।"

এর পর ভোট-গণনার পালা। এক ভোটের আধিক্যে পালিওয়ালারা বিজয় লাভ করলে। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের কি আনন্দ! চারিদিকে পালির জয়জয়কার পড়ে গেল। দেখতে দেখতে পালি সাহিত্য ত্বরিত গতিতে গড়ে উঠতে লাগল। বৌদ্ধধর্মের, বৌদ্ধ সাহিত্যের নানা পুস্তক বাজারে চালু হতে লাগল—বৌদ্ধপুরাণ, বৌদ্ধ ইতিহাস, বৌদ্ধদর্শন, বৌদ্ধ কাব্যনাটক পালিভাষায় প্রকাশ পেতে লাগল এবং পালি ভাষা সংস্কৃত ভাষার সহিত টেক্কা মারতে লাগল। এই সব পালিশাস্ত্র বগলে নিয়ে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর দল ধর্মপ্রচারে বহির্গত হল। কাহারো প্রচার কার্য ভারতের চতুঃসীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল, আবার যাদের মনে অদম্য তেজ, দেহে অমানব শক্তি—তারা সমুদ্র ডিঙ্গিয়ে এবং পর্বত টপকে তিব্বত, ব্রহ্ম, চীন, সিংহল, শ্যাম প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্মের মাহাত্ম্য, পালির মাধ্যমে, প্রচার করতে লাগল। এই সব দেশে পালিভাষার আদর আর পালিপুস্তকের গৌরব দেখে কে? এই সব দেশের বৌদ্ধ পুরোহিতেরা শ্রাবকদের সন্তানগণকে যত্নের সহিত পালিভাষা শিক্ষা দিতে লাগল। অর্থাৎ স্রোতের মাথায় বা ভাবাবেগে যতটা কাজ হতে পারে ততটা এগুতে লাগলো।

কিন্তু দু'চারশ' বছরের চেষ্টাতেও পালিভাষার বিশেষ কোন উন্নতি দেখা গেল না। আঞ্চলিক ভাষা সর্বজনীন ভাষার সোপানে কিছুতেই খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারল না। একদিকে রাজারাজড়াদের চেষ্টা, অন্যদিকে সারা ভারত ব্যাপী বড় বড় বৌদ্ধ, বড় বড় বৌদ্ধ সঙ্ঘের চেষ্টা, পর্বতগাত্র খোদাই, শিলাস্তম্ভে খোদিত লিপি, কিছুতেই বৌদ্ধভারতের পালি মাধ্যমিক সংহতি গড়ে উঠতে পারলেনা। এই সময় আবার প্রাকৃতজাত নানা উপভাষা—শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, বৈদর্ভী, মাগধী, অর্ধমাগধী, প্রাচ্যা (গৌড়িয়া প্রভৃতি), দাক্ষিণাত্যা, দ্রাবিড়ী এবং প্রাকৃত স্বয়ং ভারতের অঞ্চলবিশেষে মাতৃভাষারূপে প্রকট হয়ে পড়ল। একে অগাধ জলধিসদৃশ সংস্কৃতভাষার প্রবল চাপ, তার উপর অসংখ্য উপভাষার ছড়াছড়ি, এর মধ্যে আদি ও অকৃত্রিম পালি ভাষা কতদিন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে? আর তাইই

যখন বিলুপ্তপ্রায় তখন বৌদ্ধধর্ম কার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ?

এই সময় বৌদ্ধ সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের মধ্যে একটা মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন দেখা দিলে। শিক্ষিত ব্যক্তিরা বুঝতে পারলে—পালির সহিত সংস্কৃত না শেখালে এবং পালিদর্শনের সহিত সংস্কৃত দর্শন না পড়ালে, আর সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র না রচনা করলে বৌদ্ধ ভারতের ভবিষ্যৎ নাই। বৌদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা শিখবার হিড়িক পড়ে গেল। এমন এক বিশ্ব-বিদ্যালয় গড়ে উঠল যেখানে পালিগ্রন্থ ও সংস্কৃতগ্রন্থ সমান যত্নের সহিত পড়ান চলতে লাগল এবং সংস্কৃতভাষায় অনেক বৌদ্ধ শাস্ত্র, কাব্য, নাটক, ইতিহাস, পুরাণ গড়ে উঠতে লাগল। এরূপ অবস্থায় বৌদ্ধ সমাজে একটা ফাটল ধরবেই। যারা গোঁড়া পালিওয়ালা তারা হয়ে পড়ল হীনযান, আর যারা ধীরস্থিরভাবে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম উভয়কেই শ্রদ্ধা দেখাতে লাগল তারা হল মহাযান।

এইভাবে আরো দুচার বছর কাটল বটে কিন্তু পালির সুদিন আর ফিরে এল না। হীনযানেরা অর্থাৎ পালি-ওয়ালারা বহির্ভারতে তখনো বেশ প্রভাব বিস্তার করতে লাগল বটে, কিন্তু ভারতের অভ্যন্তরে তাদের স্থানচ্যুত হতে হল এবং সংস্কৃতঘেঁষা মহাযানরাই কোনরকমে হিন্দুদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে লাগল। বিশুদ্ধ পালি—যাতে বুদ্ধের ও বড় বড় বৌদ্ধাচার্যের বাণী ও জীবনী জ্ঞানবিজ্ঞান লিপিবদ্ধ তা—কেউ আর বুঝতে পারেনা। কেবল বৌদ্ধ পুরোহিতেরা কতকগুলো পালি মন্ত্র মুখস্ত করে গৃহস্থ শ্রাবকদের মধ্যে ধর্ম কার্য চালিয়ে যেতে লাগল, আজ-কালকার অধিকাংশ হিন্দু পুরোহিত যেমন করে।

আবার আর এক বিপদ ঘনিয়ে আসতে লাগল, যাকে বলে হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ। হিন্দুধর্মের চিন্তানায়কগণ নূতন উদ্যমে হিন্দুধর্মের প্রচার কার্যে মেতে উঠলেন। তাঁরা ত্রেতা-দ্বাপরের রামায়ণ-মহাভারতকে নবকলেবরে সজ্জিত করে হিন্দু জনসাধারণের সম্মুখে ধরলেন। (মহাযান বৌদ্ধরাও এর বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ল।) তাঁরা নূতন নূতন পুরাণ রচনা করে সর্বসাধারণকে হিন্দুধর্মের দিকে আকৃষ্ট করতে লাগলেন। তাঁরা ভারতের সর্বত্র, বিশেষকরে দাক্ষিণাত্যে হিন্দু দেবদেবী ও রামকৃষ্ণের মন্দির স্থাপন করে ভারতীয় সমাজকে আবার সনাতন-পন্থী করে তুলতে লাগলেন। তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মের সম-সদৃশ আর একটা ভয়ঙ্কর মতবাদ প্রচার করতে লাগলেন—তথাগত মুনিও একজন হিন্দু অবতার ছিলেন—হিন্দুধর্মের জঞ্জাল সাফ করবার জন্য তিনি নারায়ণের অংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

এইসব নানা কারণে পালি শিখবার মনোবৃত্তি ধীরে ধীরে সমগ্র ভারত হতে লোপ পেয়ে গেল। পালি ম'ল এবং বৌদ্ধধর্মকে মেরে ম'ল।

এর পরের কথা সকলেই জানে। ভারতের ও ভারতের বাহিরে যে কয়টা প্রস্তর বা লৌহস্তম্ভ আছে সেগুলো যে কার দ্বারা স্থাপিত, আর তাদের গায়ে যে হিজিবিজি লেখা আছে সেগুলোর মানে কি—কোন ভারতবাসী আর বলতে পারল না। বুদ্ধের দেশ হতে বৌদ্ধধর্মের যা কিছু ভাল সবই লোপাট হয়ে গেল। কেন এরূপ ঘটল ? সেই গোঁড়াকার অবিমৃষ্যকারিতা। সেই কাঁচের বাটিতে হাইড্রোজেন খেলা রাখবার দুঃসাহস। সেই আকস্মিক ভাবে দিয়ে জাতীয় সংহতি গড়ে তুলবার দুঃস্বপ্ন।

এখানে একটি অবান্তর প্রসঙ্গের উল্লেখ করি। কতিপয় পাশ্চাত্য ও ভারতীয় পণ্ডিত ভিন্সেন্ট প্রভৃতি বৌদ্ধ মুলুক হতে যদি না পালিগ্রন্থ সকল উদ্ধার করতেন এবং পালি ব্যাকরণ ও পালি সাহিত্যকে সাজিয়ে-গুছিয়ে পাঠোপযোগী করেনা তুলতেন, তবে শিক্ষিত ভারতবাসীরাও জানতে পারত না যে এককালে পালিভাষা বলে একটা ভাষা ভারতে চালু ছিল, যার মাধ্যমে বুদ্ধের বাণীও ধর্ম প্রচারও হয়েছিল। (হালে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পালি ভাষার পুনরুজ্জীবনের জন্য স্কুল কলেজে পালি শিখাবার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু কতিপয় অগাম্মারা ছেলে, যারা সংস্কৃতকে যমের মত ভয় করে, কেবল তারাই সহজে ৩০নং পাবার জন্য সংস্কৃতের বিকল্পরূপে পালি লয়, তার পর পাশ করেই বা ফেল করেই বেমালুম ভুলে যায়।)

দেখছি আবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। ভারত স্বাধীন হয়েছে এবং সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধের পরিকল্পনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। আধ্যাত্মিক জগতে বেদান্ত বা অদ্বৈতবাদ যত বিশাল, যত জটিল, বৈষয়িক জগতে জাতীয়তাবাদ তত বড়, তত কঠিন, তত দুরধিগম্য।

এতবড় একটা রাষ্ট্রকে একটা অনুন্নত আঞ্চলিক ভাষার ঘরে রাখবার বা প্রকাশ করবার চেষ্টা পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতের যে অঞ্চলের লোকেরা একদিন পালি ভাষা নিয়ে লাফালাফি করেছিল ঠিক সেই অঞ্চলের লোকেরাই আবার হিন্দী ভাষা নিয়ে মাতামাতি করছে। অতীতে পালিওয়ালারা যা যুক্তি দেখিয়েছিল বর্তমানে হিন্দীওয়ালারাও ঠিক সেই যুক্তি দেখাচ্ছে। যারা এককালে বলেছিল, "বৌদ্ধধর্ম জনসাধারণের ধর্ম—জনসাধারণ বলতে শ্রেফ পালিভাষীদেরই বোঝায়, সুতরাং পালিভাষাই বৌদ্ধধর্মের বাহক হোক।" তাদেরই অনুজন পুরুষেরা বলতে আরম্ভ করেছে, "হিন্দী ভাষা জনসাধারণের ভাষা—জনসাধারণ বলতে বিহার-উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি গোটাকয় প্রদেশের অধিবাসী বোঝায়—অতএব হিন্দীই প্রশাসনের ব্যাপারে বা সংস্কৃতির ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় ভাষা হোক।" সেবারও যেমন ধাপ্পা, এবারও তেমনি ধাপ্পা—অর্থাৎ জনসাধারণ বলতে ভারতের কতকটা অঞ্চলের কতিপয় অধিবাসীদের বুঝতে হবে। বুদ্ধদেবের শিষ্য-পরম্পরায় আগত বৃষ্টদের পালি ভাষা-ভাষার প্রভাবে যেমন সমগ্র ভারত খাতিরে পড়ে পালির অনুকূলে ভোট দিয়েছিল, এবারও সেই 'খাতির' অর্থাৎ জহরলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতির উপর শ্রদ্ধা, একটা অঙ্গারকে স্বয়ম্ভূ-মোহিত বলে স্বীকার করেছে—যাকে বলে খাতিরে চৌকী দেওয়া। কিন্তু তারা ভাবে নি, পালি-হিন্দী ভাই-ভাই। সুতরাং অতীতে পালির যা দশা হয়েছিল, অচির ভবিষ্যতে হিন্দীরও তাই দশা ঘটবে। অর্থাৎ হিন্দীর পালিদশা-প্রাপ্তি ঘটবেই ঘটবে। যদি জোর করে হিন্দীকে অহিন্দী-ভাষীর ঘাড়ে চাপান হয়, যেমন চেষ্টা চলেছে, তবে বিশুদ্ধ হিন্দী বলে আর কিছুই থাকবে না, তুলসীদাসের হিন্দী, প্রতাপসিংএর হিন্দী, জহরলালের হিন্দী ভারত হতে লোপ পেয়ে যাবে। তখন নিজেও যেমন খান খান হয়ে যাবে জাতীয়ভাষাদর্শকেও টুকরা টুকরা করে দেবে—বহু রাষ্ট্রনায়ক, চিন্তানায়কের চেষ্টায় যতটুকু সংহতি গড়ে উঠেছে সব চুরমার হয়ে যাবে। হিন্দীবাদী ভ্রাতাদের এখানে মাতৃভাষার পবিত্রতা রক্ষার সনদ আছে—সাধু সাবধান!

যারা বলেন—হিন্দী অপুষ্ট-ভাষা সত্য, কিন্তু দশ বৎসর চেষ্টা করলেই হিন্দী পরিপুষ্ট উচ্চাঙ্গের ভাষায় রূপান্তরিত হবে। তখন তাহা ভাইনামাইটকেও হাতের মুঠোর মধ্যে রাখতে পারক হবে, তখন ভারতের অপর ভাষাভাষীরা হিন্দীকে অগ্রাধিকার দান করবে। কিন্তু এই দশ বছর বাঙলা, মারাঠী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি উন্নত ভাষা সকলও কি চুপ করে বসে থাকবে? অর্থাৎ হিন্দীকে পথ ছেড়ে দিয়ে তারা কি নিজেদের গতি আটকে রাখবে?

তবেই হলো দশ বছর পরে হিন্দী যতটা অগ্রসর হবে, হিন্দী অপেক্ষা অগ্রসরমান ভারতের আঞ্চলিক ভাষাসমূহও তত পরিমাণ অগ্রসর হবে। সুতরাং হিন্দী চিরকালই ভারতের ভাষাগোষ্ঠির পশ্চাতে পড়ে থাকবে। এরূপ অবস্থায় হিন্দী কখনই উন্নততর আঞ্চলিক ভাষার নিকট শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারবেনা—আর শ্রদ্ধাই যদি না পেলে তবে সে 'দাদাভাই' 'বড় ভাই' হবে কোন অধিকারে—হিন্দী-ওয়ালাদের এই আত্মদৃষ্টি কবে ফিরে আসবে?

তাহলে উপায়? উপায় অতি সোজা। যে উপায়টা বিবেকানন্দ স্বীকার করে নিয়েছিলেন, যে উপায়টা রবীন্দ্রনাথ পাকে-প্রকারে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, সেই উপায়টাই অবলম্বন করতে হবে। বিবেকানন্দ বলতেন, "এখনো ইংরাজীভাষা না জেনেও ভারতের সমস্ত উন্নত গ্রামে ও শিক্ষিত নগরে টহলদিয়ে আসা যায় এবং সেই সেই গ্রামবাসী বা নগরবাসীর সহিত ভাবের বিনিময় করে আসা যায়, যদি পর্যটক ব্যক্তির সামান্য একটু সংস্কৃতে জ্ঞান থাকে। ভারতের সর্বত্রই যেমন ইংরাজীজানা লোক আছে, তেমনি দু'চারজন সংস্কৃত জানা লোকও আছে। পর্যটক যদি সংস্কৃত ভাষায় তার মনের কথা প্রকাশ করে অমনি কোথা হতে একজন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি তার বক্তব্য শ্রবণ করে গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে দেবে।"

অতএব—কুড়ি—পঞ্চাশ বছর এখনো ইংরাজী ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদালাভ করুক। এই দশ—কুড়ি বৎসর (পঞ্চাশ লাগবেনা) সংস্কৃতকে দেবতার কোঠা হতে নামিয়ে এনে মানবীর কোঠায় স্থাপন করা হোক। এবং ইহার মধ্যে নবীনরক্ত ইন্‌জেকশান দিয়ে যুগোপযোগী জীবন্ত ভাষায় রূপান্তরিত করা হোক এ কার্যে কত বিদ্যাসাগর এগিয়ে এসে নব্য ব্যাকরণ রচনাকরে দেবেন। তার পর ইংরাজী সংস্কৃতের হাতে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে ভারতের ভাষাগোষ্ঠির সহিত মিলেমিশে বাস করতে আরম্ভ করে দেবে।—"এ নহে কাহিনী—এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে।"

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রাচীন পুঁথি-পত্রের পাতা ঘাঁটতে ঘাঁটতে সেদিন সৌভাগ্যক্রমে সেকালের বিলাতী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের আরো কয়েকটি বিচিত্র-অভিনব চিত্তাকর্ষক কাহিনীর সন্ধান মিলেছে। এবারে তাই একালের অনুসন্ধিৎসু-পাঠকপাঠিকাদের আসরে সেকালের সেই সব কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী-ইতিবৃত্তের কয়েকটির পরিচয় দিচ্ছি।

খৃষ্টীয় ১৬০৯ সালে গঙ্গার প্রশাখা ভাগীরথী নদীর কূলে কোম্পানীর কুঠিয়াল-সাহেব জব চার্ণকের আগ্রহে ও উৎসাহে জলা-জঙ্গলময় অনুন্নত সামান্য তিনটি পল্লীগ্রাম —সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও ডিহি কলিকাতা—এ অঞ্চলের ভূমির বুকে ভারত প্রবাসী ইংরাজদের প্রধান বাণিজ্য-উপনিবেশ তথা সাম্রাজ্য-বিস্তারের কেন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই শহর কলিকাতা ও আশপাশের বিভিন্ন মফঃস্বল এলাকায় বিলাতী সাহেব-সুবোদের এবং এদেশের নানা রাজ্যেই নানা ধর্মের নানা ভাষাভাষী, নানান্ লোকজনের রীতিমত ভিড় জমতে শুরু করলো··· বিবিধ ধরণের কর্ম এবং ব্যবসায়সূত্রে ক্রমশঃ এখানেই তাঁদের বসবাস এবং সামাজিক জীবন কায়েমী হয়ে উঠলো। সেকালের শহর কলিকাতার দেশী ও বিলাতী সমাজের আদি অধিবাসীরা অধিকাংশই ছিলেন বাইরের লোক···ব্যবসা-বাণিজ্য আর বিবিধ ধরণের কাজকর্ম করে মোটা মোটা টাকা রোজগার ও ক্ষমতা প্রতিপত্তি অর্জন, দৌলত-সম্পত্তি আহরণ এবং সৌখিন বিলাস-আড়ম্বরে মেতে অবিচ্ছিন্ন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ আর অফুরন্ত আমোদ প্রমোদ, পানাহার, নৃত্যগীত, হৈ-হুল্লা-চছুপ্পের রঙীন নেশায় সারাক্ষণ বুঁদ হয়ে থেকে জীবনটাকে ভরপুর করে তুলবেন—এই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। কাজেই তখনকার আমলে শহর কলিকাতার দেশী-বিলাতী সমাজের লোকজন সকলেই থাকতেন বিবিধ ধরণের আমোদ প্রমোদ, আহার বিহার, খেলাধুলো, নাচ-গান, বাজনার আসর, আর বিভিন্ন পাল-পার্বণ সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানের হরেক রকম কিকিরের ধান্ধায়। প্রাচীন পুঁথি-পত্রের পাতায় সেকালের দেশী বিলাতী সমাজের লোকজনের এই সব কৌতূহলোদ্দীপক কীর্তি-কলাপের যে সব বিচিত্র নিদর্শন লিপিবদ্ধ আছে—নীচের উদ্ধৃত-বিবরণগুলিতে তার সুস্পষ্ট আভাস মিলবে।

নীচের উদ্ধৃত-বিবরণগুলির প্রথমটি থেকে ধারণা হয় যে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি সময়ে কোম্পানীর প্রধান কেন্দ্র কলিকাতার উপকণ্ঠে সুবিখ্যাত মফঃস্বল-শহর শ্রীরামপুরেও তখন ছিল—বিলাতী সাহেব-সুবোদের রীতিমত জমজমাট ও বসবাস। প্রসঙ্গক্রমে আরো বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে সেকালে বাঙলা দেশের

এই জনবহুল মফঃস্বল শহর শ্রীরামপুরেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—বাঙলা ভাষায় রচিত পুস্তক আর সংবাদ পত্র ছাপবার সর্ব্বপ্রথম ছাপাখানা। এই ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা এবং বাঙলা বই ও সংবাদপত্র প্রকাশ আর প্রচারের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সেকালের সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ মিশনারী উইলিয়াম কেরী (William Carey) সাহেব। তাঁর উৎসাহে ও কর্ম্মপ্রেরণার ফলেই তখন শ্রীরামপুরের এই বিলাতী মিশনারীদের ছাপাখানা থেকেই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বাঙলা ভাষায় লেখা এবং কাঠের তৈরী বাঙলা হরফ সাজিয়ে ছাপা প্রথম বাঙলা সংবাদ-পত্র—"সমাচার দর্পণ"। কাজেই স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে তখনকার আমলে—হাওড়া, হুগলী, চুঁচড়া, চন্দননগর, প্রভৃতি সুবিখ্যাত জনবহুল মফঃস্বল শহরগুলির মতোই শহর কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ শ্রীরামপুর অঞ্চলেও সৌখিন ও সাধারণ সকল শ্রেণীর সাহেবসুবো এবং এদেশী লোকজনের রীতিমত যাতায়াত ও বসবাসের রেওয়াজ ছিল। এই রেওয়াজের ফলে, এ সব অঞ্চলে নানান সৌখিন সরাইখানাও সেকালের বিলাসী ও প্রবাসী সাহেবসুবোদের পৃষ্ঠপোষকতায় সাড়ম্বরে ব্যবসা জমিয়ে তুলেছিল। নীচে প্রদত্ত সেকালের সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রাচীন বিজ্ঞাপনটি থেকে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় মেলে।

* * *

(কলিকাতা গেজেট, ২৬ই মার্চ্চ, ১৭৮৬)

Denmark Hotel and Tavern, Serampore.

...Gentlemen passing up and down the river may be accomodated with breakfast, dinner, supper and lodging, and may depend on the charges being very reasonable, as terms are ready money.

To prevent mistakes or imposition, the prices of every thing will b publicly placed in each of the rooms, with a daily bill of fare etc. etc.

Dinners dressed and sent out at short notice ; also liquors sold by the single dozen, for ready cash. A good Billiard Table and Coffee room, with the Newspapers, etc.

An ordinary on Sundays at 3 Sicca Rupees each.

N. B.—The road from Serampore to Gyrotty House is now repairing for Carriages.

* * *

সেকালের শহর কলিকাতায় সাধারণ বিলাতী হোটেল ও সরাইখানায় সাহেব সুবাদের সান্ধ্য আপ্যায়নের কেমন আয়োজন ব্যবস্থাদি থাকতো—ইতিপূর্ব্বে গত মাসের সংখ্যাতেই তার মোটামুটি আভাস দিয়েছি। এবারেও সেই ধরণের আরেকটি প্রাচীন তথ্য বিবরণ প্রকাশিত হলো। একালে কৌতূহলী পাঠকপাঠিকাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে, এ বিবরণটি সংগ্রহ করা হয়েছে—খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে প্রকাশিত এবং অধুনা দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন একখানি ইংরাজী গ্রন্থ থেকে। নীচের উদ্ধৃত রচনাংশ থেকে, সেকালের শহরে সরাইখানা এবং সেখানকার বিচিত্র পরিবেশ সম্বন্ধে নিখুঁত সুন্দর একটি অভিনব বাস্তব প্রতিলিপির পরিচয় মেলে।

(Knighton—1855)

The European Confectioners' Coffee houses (in Calcutta) are the great resorts of the Anglo-Indians during the heat of the day. They are kept as cool as possible within, marble floors and tables, and perpetual breezes, caused by constantly swinging fans, forming a delightful contrast to the red-brick dust, the painful glow and intense heat without. Ices and sherry cobblers are the articles most in demand in

the day-time in these establishments, all kinds of American drinks are to be had at all times, and the quantity of ice used in the concoction of such drinks, renders them great favourites in India,

The familiar faces of the principal London periodicals meet our eyes upon every table mingled with Indian newspapers of various names and as various type and appearance··· and whilst the visitors divide punch or the Hurkaru, the Times or the purnochundrodoy between them, the waiter flies off to supply their wants.

•

এ সব তো হলো সেকালের শহর কলিকাতার বিলাসী সৌখিন সাহেব সুবোদের সাজানো হোটেল আর সরাই-খানার কাহিনী। এমনি ধরণের সাড়ম্বরে ধুমধাম আর সৌখীন কায়দায় অজস্র অর্থব্যয়ে অনুষ্ঠিত পূজা-পার্ব্বণ, বাঈনাচ, শুভ-বিবাহ, শ্রাদ্ধ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি আরো নানা রকমের সামাজিক উৎসব আনন্দের ব্যবস্থাদি হামেশাই করতেন তখনকার দিনের বিত্তশালী অভিজাত বংশের সম্ভ্রান্ত বিলাসী খামখেয়ালী অভিজনেরা—সরকারী, বেসরকারী, লঘু ও গুরু, সামান্য আর অসামান্য···সব রকম কারণেই। সে সব উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রচুর লোক সমাগম, বিরাট হৈহুল্লোড়, সাজসজ্জা, আনন্দ বাসরের আয়োজন, পানাহার, খাদ্যভোজ্যভাণ্ড···কোনো কিছুই বাদ পড়তো না শেষ পর্য্যন্ত···চালাও ভাবে প্রাণভরে রাশি রাশি টাকা অকাতরে অথবা অপব্যয় করে! সেকালের প্রাচীন সংবাদপত্রে এ সব বিচিত্র ঘটনারও, প্রচুর নজীর মেলে। আপাততঃ একালের পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল মেটানোর উদ্দেশ্যে সেকালের সংবাদপত্র থেকে কয়েকটি অভিনব তথ্য পরিচয় সাদরে পরিবেষণ করা হলো।

•

সমাচার-দর্পণ

(২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৩১। ২রা ফাল্গুন, ১২৩৭)

মহানাচ।—শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুরের কনিষ্ঠ শ্রীযুত গোপাললাল ঠাকুরের বিবাহেতে সংপ্রতি পাথুরিয়া-ঘাটায় একটা অত্যুচ্চ উত্তম খড়ুয়া ঘর প্রস্তুত হইয়াছিল এবং মর্ম্মর প্রস্তরের বর্ণতুল্য বর্ণ করা কতক থান তাহাতে নির্ম্মিত ছিল পরে তাহা অত্যুত্তমরূপে সুশোভিত করা গিয়া-ছিল এবং পাঁচ রাত্রিতে অসংখ্য বাতি জ্বালান গিয়াছিল বিশেষতঃ ইং সোমবার ৩১ তারিখ লাং ৪ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত তাহাতে মহা আলোক হইল এবং রাজমার্গ দিদৃক্ষু লোকেতে পরিপূর্ণ তদ্ব্যতিরেকে নানা সারঙ্গন ও সিপাহী রাস্তার দরওয়াজাতে স্থাপিত হইল ঘরের মধ্যে অনেক বাইয়ের নাচ নানা তোজবাজীকরেরা আপন ব্যবসায় করিতে উক্ত পাঁচ রাত্রির মধ্যে তিন রাত্রি এতদ্দেশীয় শিষ্টবিশিষ্ট লোকেরদের ও দুই রাত্রি ইউরোপীয় সাহেবদিগের সমাগম হইয়াছিল এবং ঐ রাত্রিতে বাটী নিমন্ত্রিত ব্যক্তিতে পরিপূর্ণ এবং তাঁহারা গৃহপতি ও তৎপরিজনকর্ত্তৃক সমাদরপূর্ব্বক গৃহীত হইলেন। তাহাতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরদের মর্য্যাদা হইল অতএব যাঁহারা উক্ত বাবুদিগের শিষ্টাচারেতে তুষ্ট হইলেন তাঁহাদের নাম লেখা উচিত। অপর এতদ্দেশীয় হিন্দু ও মুসলমানের-দের মধ্যে শোভাবাজারের শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীশ্রীযুত নওয়াব সৌলত জঙ্গ বাহাদুর ও আন্দুলের রাজা শ্রীযুত রাজনারায়ণ রায় ও শ্রীশ্রীযুক্ত নাগ-পুরের রাজার উকীল ও অন্য২ প্রধান২ বাবুরা বুধবার রজনীতে ঐ সভায় সমাগত হইলেন এবং ইউরোপীয় সাহেবেরদের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের সিবিল ও মেবাল ও মিলেটারিসম্পর্কীয় এত কর্ম্মকারক ও তাঁহারদের বিবি সাহেবেরা সমাগত হইলেন যে তাঁহারদের তাবতের নাম লেখা অসাধ্য···।

• • •

সমাচার দর্পণ

(২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৩২। ১৪ই ফাল্গুন, ১২৩৮)

শুভবিবাহ।—এডমগরের শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিকের প্রধান পুত্র শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিকের বিবাহ গত ৬ ফাল্গুন শুক্রবার সম্পন্ন হইয়াছে ঐ বিবাহ মহাসমারোহ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হয় যদ্যপিও রূপলাল বাবু আপন বিষয়

বিবাহাগারে বাসযাত্রা করেন নাই তথাপি কলিকাতার বর্ত্তমানাবস্থায় সমস্ত ব্যাপার বলিতে হইবেক যেহেতু বিবাহোপলক্ষে যে যে বিষয়ে ব্যয়াবশ্যক তাহা তাবৎ করিয়াছেন অর্থাৎ লোকলৌকিকতা নিমিত্ত শিষ্টলের ভৈজস বহু তৈল হরিদ্রাদি দ্রব্য বহুজনের ভবনে প্রেরণ করিয়াছেন এবং ২ কালুড়ন অবধি ৪ পর্য্যন্ত চারি রাত্রি মজলিস করিয়াছিলেন ইহাতে আহূত হইয়া এতদ্দেশীয় এতদ্বগরস্থ প্রায় সমস্ত প্রধান লোক এবং ইংলণ্ডীয় ও মুসলমানাদি অনেকের আগমন হইয়াছিল শুনিয়াছি বৈদ প্রিসীডেণ্ট শ্রীযুত সি মিডকেল সাহেবেরও আগমন হইয়াছিল। অপর নর্ত্তকীও উত্তমাং ছিল বিবাহরাত্রে কন্যাকর্ত্তার ভবনে গমনকালে বরের সমভিব্যাহারে যে সকল রোসনাই আবশ্যক তাহাও মন্দ হয় নাই—কেন না মল্লিক-বাবুর বাটী অবধি শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র ধরের বাটী পর্য্যন্ত বাস্তা রোসনাই এবং নানাপ্রকার পাহাড় পর্ব্বত দালান নহবৎ নর্ত্তক নর্ত্তকী প্রভৃতির বিবিধপ্রকার সং করিয়াছিলেন ইত্যাদি অতএব এই কর্ম্ম সামান্য বলা যায় না। তবে পূর্ব্বে ২ যে কএক বিবাহ দেখা গিয়াছে তত্তুল্য নহে ইহা সত্য বটে কিন্তু শ্রীশ্রীপরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা যায় রূপলাল বাবু যেপ্রকার করিয়া পুত্রের বিবাহ দিলেন ইহার ন্যূন কাহার না হয়। কেননা সমর বড় শক্ত উপস্থিত ইহার পর আর যে কেহ কোন কর্ম্ম বাঙ্গলা রূপে করিবেন এমত বুঝিতে পারি না। সং চং।

[ক্রমশঃ

কেশ ও
মস্তিষ্কের
পরম হিতকারী

মনোরম গন্ধযুক্ত "ভৃঙ্গল" আয়ুর্ব্বেদীয় মতে প্রস্তুত মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল। ইহা ঘন কৃষ্ণ কেশোদগমে সহায়তা করে এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে।

ভৃঙ্গল
সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ
কেশ তৈল

নতুন সুদৃশ্য ছোট শিশি প্রচলিত হইয়াছে বড় শিশিও শীঘ্রই পাওয়া যাইবে।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

কোষ্ঠীর বিচার

জ্যোতি বাচস্পতি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

রাশির ত্রয় ও চতুরস্র

এ কথা আগেই বলা হয়েছে, রাশিগুলিকে এক একটী পদার্থ বা তত্ত্বের নির্দেশক হিসাবে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। রাশি বারটি কাজেই তিনটি ক'রে রাশি এক এক শ্রেণীর পদার্থের জ্ঞাপক। এক শ্রেণীর পদার্থের জ্ঞাপক রাশি-তিনটিকে এক একটী ত্রয় বলা হয়। যেমন—

মেষ, সিংহ ও ধনু অগ্নিত্রয়
বৃষ, কন্যা ও মকর পৃথ্বীত্রয়
মিথুন, তুলা ও কুম্ভ বায়ুত্রয়
কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন জলত্রয়

তেমনি তিনটী শক্তি হিসাবে চারটি ক'রে রাশিকে এক এক চতুরস্রে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—

মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর চর চতুরস্র
বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ স্থির চতুরস্র
মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীন দ্বিস্বভাব চতুরস্র

শুভগ্রহ, পাপগ্রহ ও সমগ্রহ

আগে বলেছি যে গ্রহগুলি যেমন অনুভূতির নির্দেশক—সেই হিসাবে গ্রহগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে।

(১) শুভগ্রহ—অর্থাৎ যে গ্রহগুলি সুখকর অনুভূতির সূচনা করে। (২) পাপগ্রহ—অর্থাৎ যে গ্রহগুলি দুঃখ-জনক অনুভূতির সূচক (৩) সমগ্রহ—অর্থাৎ যে গ্রহগুলি সুখ-দুঃখ বহির্ভূত শান্ত বা সমতা যুক্ত অনুভূতি নির্দেশ করে। সাধারণ জ্যোতিগ্রন্থগুলিতে গ্রহকে শুভ ও পাপ এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে; এবং সাধারণ জ্যোতির্বিদের ধারণা এই যে, শুভ অর্থে হিতকর ও অশুভ বা পাপ অর্থে অহিতকর, কিন্তু তা ঠিক নয়। গ্রহগুলি বাস্তবিক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত এবং এই তিন শ্রেণীর অর্থ উপরে যা লেখা হয়েছে তা যুক্তিযুক্ত।

শুভগ্রহ—বৃহস্পতি, শুক্র ও বরুণ
পাপগ্রহ—শনি, মঙ্গল, রাহু, প্রজাপতি ও রুদ্র
সমগ্রহ—রবি, চন্দ্র, বুধ ও কেতু

সমগ্রহগুলি যদি পাপগ্রহের সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহ'লে দুঃখ-জনক অনুভূতি দেয় এবং যে-গুলি শুভগ্রহের সঙ্গে যুক্ত হ'লে সুখকর অনুভূতি সূচনা করে। যদি কোন গ্রহের সঙ্গেই যুক্ত না হয়, তাহ'লেই তারা মনের সাম্যাবস্থার নির্দেশক হয়। চন্দ্র যদি ক্ষীণ হয় অর্থাৎ চন্দ্রের উজ্জ্বল অংশ যদি অর্দ্ধেকের কম হয় তাহ'লে তা শুভগ্রহ যুক্ত না হ'লে পাপগ্রহের মতই ফল দেয়, এবং তা যদি পূর্ণ অর্থাৎ তার উজ্জ্বল অংশ যদি অর্দ্ধেকের বেশী হয়, তাহ'লে

হা পাপগ্রহ যুক্ত না হ'লে শুভগ্রহের মতই সুখজনক অনুভূতি দেয়।

সৃষ্টিজ্ঞাপক ও ধ্বংসজ্ঞাপক গ্রহ

এ ছাড়া রাশিগুলিকে যেমন সৃষ্টি ও ধ্বংসের কারক হিসাবে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, গ্রহগুলিকেও তাই করা হয়ে থাকে। যথা—

সৃষ্টিজ্ঞাপক—রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, বরুণ ও কেতু

ধ্বংসজ্ঞাপক—শনি, শুক্র, বুধ, প্রজাপতি, রুদ্র ও রাহু

গ্রহের শত্রু-মিত্র

এই সৃষ্টি ও ধ্বংসের ব্যাপার নিয়ে গ্রহদের পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক মিত্রতা ও শত্রুতা নির্ণয় করা হ'য়ে থাকে। প্রত্যেক গ্রহের নিজের নিজের এক একটি স্বাভাবিক প্রকৃতি আছে। এখানে মিত্র কথাটির মনে রাখা দরকার নিজের সেই স্বাভাবিক প্রকৃতির প্রকাশে বাধা হয় না। মোটামুটি ভাবে এইটুকু ধরা যায় যে সৃষ্টিজ্ঞাপক গ্রহগুলির পরস্পরের মধ্যে একটা স্বাভাবিক মিত্রতা আছে এবং ধ্বংসজ্ঞাপক গ্রহগুলি প্রত্যেকে প্রত্যেকের মিত্র। তা ছাড়া প্রত্যেক সৃষ্টিজ্ঞাপক ও প্রত্যেক ধ্বংসজ্ঞাপক গ্রহ পরস্পরের শত্রু। এই মিত্রতা ও শত্রুতা কিন্তু সব ক্ষেত্রে সমান নয়। রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, বরুণ ও কেতু এদের প্রত্যেকটী প্রত্যেকের মিত্র বটে, কিন্তু রবির সঙ্গে মঙ্গলের মিত্রতা যেমন ঘনিষ্ঠ অন্য গ্রহের সঙ্গে তেমন নয় সেইজন্য রবি ও মঙ্গলকে পরস্পরের অতিমিত্র বলা হয়। অতিমিত্র মানে তারা পরস্পরের প্রকৃতি বিকাশে খুব বেশী সহায়তা করে। নীচে অতিমিত্রের তালিকা দেওয়া গেল—

অতিমিত্র—রবি ও মঙ্গল, চন্দ্র ও বৃহস্পতি, মঙ্গল ও কেতু, শুক্র ও প্রজাপতি, রাহু ও রুদ্র।

অতিমিত্রের মত কতকগুলি গ্রহের পরস্পরের মধ্যে কোরকম শত্রুতা আছে। তাদের পরস্পরকে অতিশত্রু বলা হয়। অতিশত্রুর তালিকা নীচে দেওয়া হ'ল—

অতিশত্রু—রবি ও শনি; চন্দ্র ও রাহু; মঙ্গল ও বুধ; বৃহস্পতি ও শুক্র; প্রজাপতি ও কেতু; বরুণ ও রুদ্র।

বাংলার জ্যোতির্বিদ্‌দের মধ্যে শত্রুতা ও মিত্রতার আর একটি মত প্রচলিত আছে, কিন্তু তা খুব যুক্তিযুক্ত নয়। এখানে যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত মতটিই দেওয়া গেল।

নৈসর্গিক শত্রুতা ও মিত্রতা ছাড়াও গ্রহদের রাশি চক্রের অবস্থানের হিসাবে তাৎকালিক শত্রুতা ও মিত্রতা হয়ে থাকে। দুটি গ্রহ যদি নৈসর্গিক মিত্র হয়ে তাৎকালিক মিত্র হয় তাহ'লে তাদের অতিমিত্র বলা হয়। তেমনি নৈসর্গিক শত্রু হয়ে তাৎকালিক মিত্র হলে তাদের মধ্যে আর শত্রুতা থাকে না, তাদের পরস্পরের মধ্যে একটা সামাভাব প্রকাশ হয়—তখন তাদের একটীকে আর একটীর সম বলা হয়। দুটি গ্রহ যদি নৈসর্গিক শত্রু হয়ে তাৎকালিক শত্রু হয়, তাহ'লে তারা অতিশত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং নৈসর্গিক শত্রু হয়ে তাৎকালিক মিত্র হ'লে তারা হয় পরস্পরের সম। তাৎকালিক শত্রুতা ও মিত্রতা নির্ভর করে গ্রহদের পরস্পরের প্রেক্ষার উপর। দুটি গ্রহের মধ্যে যদি শুভ প্রেক্ষা থাকে, তাহ'লে তারা তাৎকালিক মিত্র হয় এবং অশুভ প্রেক্ষা থাকলে হয় শত্রু। প্রেক্ষা কি এবং কোন প্রেক্ষাগুলি শুভ আর কোনগুলি অশুভ তা পরে বলছি।

তাৎকালিক শত্রুতা ও মিত্রতা সম্বন্ধে যে অপর একটি মত প্রচলিত আছে; অর্থাৎ গ্রহগুলি পরস্পরের দ্বিতীয় দ্বাদশ, তৃতীয়-একাদশ ও চতুর্থ-দশমে থাকলে তাদের মধ্যে মিত্রতা অন্যথায় শত্রুতা এর কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না, এবং বাস্তবিক ক্ষেত্রেও তা মেলেও না।

গ্রহের ক্ষেত্র ও রাশির আধিপত্য—

সৃষ্টি ও ধ্বংস হিসাবে রাশি এবং গ্রহদের শ্রেণী বিভাগের কথা আগেই বলা হয়েছে। এটা আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, সৃষ্টি জ্ঞাপক রাশিগুলি সৃষ্টি জ্ঞাপক গ্রহগুলির শুভ প্রকাশের পক্ষে আনুকূল্য করবে এবং ধ্বংস-জ্ঞাপক রাশিগুলি ধ্বংসজ্ঞাপক গ্রহদের শুভ প্রকাশে সাহায্য করবে। এই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা এও জানা গিয়াছে যে, এক একটি রাশির দিকে এক একটি গ্রহের বিশেষ আকর্ষণ আছে, সেই রাশিটিকে সেই গ্রহের ক্ষেত্র এবং গ্রহটিকে রাশিটির অধিপতি ব'লে জ্যোতিষ শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। নীচে কোন্ রাশি কোন্ গ্রহের ক্ষেত্র বা কোন গ্রহ কোন্ রাশির অধিপতি তা দেওয়া গেল—

ক্ষেত্র	অধিপতি
মেষ	মঙ্গল
বৃষ	শুক্র ও রাহু
মিথুন	বুধ
কর্কট	চন্দ্র
সিংহ	রবি
কন্যা	বুধ ও কেতু
তুলা	শুক্র
বৃশ্চিক	মঙ্গল ও কেতু
ধনু	বৃহস্পতি
মকর	শনি
কুম্ভ	শনি ও প্রজাপতি
মীন	বৃহস্পতি ও বরুণ

উপরের তালিকাটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কোন কোন রাশির আধিপত্য দু'টি ক'রে গ্রহকে দেওয়া হয়েছে আবার কোন কোন গ্রহকে দু'টি ক'রে রাশির অধিপতি ব'লে স্বীকার করা হয়েছে। আধিপত্য বিচারের সময় প্রায়ই প্রথমে লেখা গ্রহটিকে রাশির অধিপতি ব'লে ধরা হ'য়ে থাকে। কিন্তু আমার মনে হয়, দুটি গ্রহকেই অধিপতি ধরে বিচার করা উচিত। অন্ততঃ এটা যে একটা গবেষণার বিষয় সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। অনেক জ্যোতিগ্রন্থে রাহুর স্বক্ষেত্র কন্যা ও কেতুর স্বক্ষেত্র মীন বলা হয়েছে। জৈমিনি বৃশ্চিককে কেতুর ক্ষেত্র বলেছেন বটে, কিন্তু রাহুর ক্ষেত্র বলেছেন কুম্ভকে। কিন্তু বৃশ্চিক যদি কেতুর ক্ষেত্র হয় তাহ'লে বৃষ রাহুর ক্ষেত্র হওয়াই যুক্তি যুক্ত। তা ছাড়া বৃষরাশির প্রকৃতির সঙ্গে রাহুর প্রকৃতি যেমন মেলে এমন আর কোন রাশির সঙ্গে নয়। সুতরাং রাহুর ক্ষেত্র যে বৃষ তার সন্দেহ নেই। গ্রহ স্বক্ষেত্রে থাকলে, তার নিজের নৈসর্গিক ভাব, তা সে ভালই হোক্-আর মন্দই হোক্, বেশ স্পষ্ট, পরিষ্কার ও পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করতে পারে।

উচ্চস্থান ও নীচস্থান

গ্রহদের স্বক্ষেত্র ছাড়াও একটা উচ্চরাশি বা তুঙ্গরাশি কল্পনা করা হয়। যথা—

রবির	তুঙ্গ	বা	উচ্চরাশি	মেষ
চন্দ্রের	,,	,,	,,	বৃষ
মঙ্গলের	,,	,,	,,	মকর
বুধের	,,	,,	,,	কন্যা
বৃহস্পতির	,,	,,	,,	কর্কট
শুক্রের	,,	,,	,,	মীন
শনির	,,	,,	,,	তুলা
প্রজাপতির	,,	,,	,,	বৃশ্চিক
বরুণের	,,	,,	,,	সিংহ
রুদ্রের	,,	,,	,,	কুম্ভ
রাহুর	,,	,,	,,	মিথুন
কেতুর	,,	,,	,,	ধনু

গ্রহ যখন উচ্চরাশিতে বা তুঙ্গ রাশিতে থাকে তখন তাকে উচ্চস্থ বা তুঙ্গী বলা হয়। তুঙ্গী গ্রহ স্বক্ষেত্রী গ্রহের মত অত প্রবল ও পরিপূর্ণ ভাবে নিজের গুণ প্রকাশ করতে পারে না; রাশির ভাবের দ্বারা তার নিজস্ব গুণ ভালোর দিকে সংযত হয়ে থাকে। যেমন মঙ্গল সাহসিকতা, বীর্য, কর্মশক্তি ইত্যাদির কারক; মঙ্গল স্বক্ষেত্রে থাকলে এই গুণগুলির প্রকাশে কোন বাধা হয় না ব'লে তা বীরত্ব, হঠকারিতা, দুঃসাহসিকতা ইত্যাদি রূপে অভিব্যক্ত হয়; কিন্তু মকরে উচ্চস্থ হ'লে মঙ্গলের শৌর্য-বীর্য মকরের সাবধানতা, ব্যবহারিক উপযোগিতা ইত্যাদির দ্বারা অনেকটা সংযত হ'য়ে আসে।

একটি গ্রহের তুঙ্গ বা উচ্চরাশির বিপরীত (বা সপ্তম) রাশিকে সেই গ্রহের নীচ রাশি বা নীচস্থান বলা হয়। গ্রহ তার নীচ রাশিতে থাকলে তাকে নীচস্থ ব'লে উল্লেখ করা হয়। নীচে গ্রহদের নীচস্থান দেওয়া গেল—

রবির	নীচস্থান	বা	নীচরাশি	তুলা
চন্দ্রের	,,	,,	,,	বৃশ্চিক
মঙ্গলের	,,	,,	,,	কর্কট
বুধের	,,	,,	,,	মীন
বৃহস্পতির	,,	,,	,,	মকর
শুক্রের	,,	,,	,,	কন্যা
শনির	,,	,,	,,	মেষ
প্রজাপতির	,,	,,	,,	বৃষ
বরুণের	,,	,,	,,	কুম্ভ
রুদ্রের	,,	,,	,,	সিংহ
রাহুর	,,	,,	,,	ধনু
কেতুর	,,	,,	,,	মিথুন

অনেকে বলেন তুঙ্গ রাশিতে থাকলে গ্রহ ভাল ফল দেয়, এবং এই কথা থেকে অনেকে ধারণা ক'রে বসেন যে, গ্রহ উচ্চস্থ বা তুঙ্গ হ'লেই কোষ্ঠি ভাল হয় এবং নীচস্থ হ'লেই কোষ্ঠি খারাপ হয়। তুঙ্গ ও নীচের প্রকৃত অর্থ জানলে এ ধারণা হবার সম্ভাবনা থাকে না। উপরে বলেছি, তুঙ্গের আসল মানে সংযত ও সঙ্গত অভিব্যক্তি, নীচের মানে তেমনি অসংযত ও অসঙ্গত অভিব্যক্তি, তুঙ্গী হ'লেই যে সেই গ্রহের গুণ খুব বেশী ক'রে প্রকাশ পায়, তা নয়। বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে নীচস্থ হ'লেই গ্রহের গুণ অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠে। আসল কথা, স্বক্ষেত্রে গ্রহের গুণ যেমন পরিপূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত হয়, নীচস্থ হ'লে তার গুণ অতিরিক্ত ও খাপছাড়া ভাবে প্রকটিত হয়, তার মধ্যে কোন সঙ্গতি, শৃঙ্খলা বা সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না।

উচ্চ ও নীচের আর একটি মানে এই যে গ্রহ উচ্চস্থ হ'লে উঁচু দিকে তার গুণ-গুলি অভিব্যক্ত হয় ও নীচস্থ হ'লে নীচের দিকে। এখন এই উঁচু দিক ও নীচু দিক বলতে আমরা কি বুঝব? এখানে উঁচু দিকের অর্থ আমার মনে হয় আধ্যাত্মিক অর্থাৎ Subjective দিক এবং নীচু দিকের অর্থ জাগতিক অর্থাৎ Objective দিক। গ্রহ উচ্চস্থ হ'লে তার আধ্যাত্মিক বা ভিতরকার গুণগুলি খুব স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পায় এবং নীচস্থ হ'লে তার জাগতিক বা বাইরের কাজের উপযোগী কারকতার বিকাশ হয় বেশী। (ক্রমশঃ)

মানসী

সুদর্শন চক্রবর্ত্তী

সুন্দরী তুমি মুখপানে কেন চাহগো সকৌতুকে।
পেলে কি কিছুই সন্ধান তার কি বেদনা বাজে বুকে
শুনছ ঝঙ্কারে অতনুর ডাক
বাজিছে বিষাণ কোথা তব শাঁখ
পলকে বলতে গোপন বাণীকে বলিতে নারি মুখে
কামনা জমানো পিপাসা বাড়ানো দুরাশার সিন্ধুকে!
তুমি কি দেখেছ দুঃস্বপ্নের ক'ড়ে নিতে যাওয়া আলো
নীড় খোঁজা আঁখি কি যে সকরুণ ভীরুর কি তয়ালো
আপন বলিতে কেউ নেই যার
ধু ধু ফাঁকা মরু শুধু হাহাকার
তারে বুকে টেনে তুমি কি কখনো বেসেছ গভীর ভালো
চাঁদ যদি তুমি কেন গো তোমার স্নিগ্ধতা নাহি ঢালো!
আমি যে দেখেছি ঘোমটায় ঘেরা তোমার ছলনা যত
হাতটি বাড়ায়ে টানো বারে বারে যেন মৃত্যুর মতো
পিছে পিছে থাক ধরা দাও নাক
প্রিয় নাম ধরে মৃদু সুরে ডাকো
সলাজ আঁখি মুখে মৃদু হাসি কপোল পুলকে নত।
ধরিবারে যাই ধরিতে না পাই একি সাধ অবিরত?
যেন মনে হ'ল এই বুঝি তুমি পাশে এসে পিছে দাঁড়ালে
দুটি হাতে মোর চোখ টিপে দিতে ওগো কের ছুটে পালালে
উন্মনা মনে আমি চঞ্চল ঢল ঢল চোখে হাসি ছলছল
কুতূহলে তব আমি যে বিহ্বল মুগ্ধ মৌনে কাঁদালে
হরষ পরশ দুরন্ত দুরাশা বিমর্ষ শুধু বাড়ালে!
চাঁদ তারা আলো আকাশ-বাতাসে সেজেছ গো অপরূপ
মোর মনে কেন ভুবন মোহিনী হয়েছে স্বরূপ?
যত হাসি গান উচ্ছল প্রাণ মোর কাছে যেন লভি ম্রিয়মাণ
যত আলো জ্বালি নেভে, বাড়ে কালি বারে বারে অনুরূপ
নীরবে তাকাও কামনা বাড়াও কেন গো হেন বিরূপ?
মোরে লয়ে খেলা একি সারা বেলা কিবা আছে এর দাম
শুধু হাসা কাঁদা ভাঙা আর গড়া যাওয়া-আসা পরিণাম;
আলোকে আঁধারে বিরহে মিলনে
কি আনন্দ তুমি পাওগো গোপনে
স্মরনে স্বপনে ঘুমে জাগরণে ইশারায় অবিরাম
দেখি শুধু তুমি ঘুরে ফিরে মোরে ডাকো ধ'রে প্রিয় নাম!
আমি ঘুমালেও ঘুমাও না দেখি শিয়রে জাগিয়া থাক
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে আভাসে আবেশে আমারে ভরিয়া রাখ
ভুল বুঝে যদি দূরে ঠেলি তোমা
বাতাসে দিয়েছ পরশের চুমা
মোর অভিমানে নিখিলের গানে মিনতি জড়ায়ে ডাক
ওগো অনুপমা এত ক্ষমা জমা তবু কেন বুঝিনাক?

সম্পাদনা : শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

শুভাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

নিউজিল্যাণ্ড বনাম পাকিস্থান ঃ

ক্রাইস্টচার্চে অনুষ্ঠিত নিউজিল্যাণ্ড বনাম পাকিস্থানের তৃতীয় অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। ফলে ১৯৬৪ সালের তিনটি টেস্ট খেলাই ড্র গেল এবং টেস্ট সিরিজও অমীমাংসিত রইলো।

প্রথম দিনের খেলায় পাকিস্থান ৭ উইকেটে ২০৯ রান করে। দ্বিতীয় দিনে ২০৬ রানের মাথায় তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হলে নিউজিল্যাণ্ড দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ে ১৩০ রান (৭ উইকেটে) তুলেছিল। তৃতীয় দিনে ২০২ রানের মাথায় নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। পাকিস্থান মাত্র ৩ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের ৪ উইকেট হারিয়ে ১৮১ রান তুলে। চতুর্থ দিনের লাঞ্চের সময় সময় পাকিস্থান ৩০৯ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলা ভাঙার সময় পর্যন্ত নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস টিকেছিল—রান উঠেছিল ২২৩ (৫ উইকেটে)। পাকিস্থানের অধিনায়ক হানিফ মহম্মদ দ্বিতীয় ইনিংসে ১০০ রান ক'রে নট আউট থাকেন—১৯৬৪ সালের আলোচ্য টেস্ট সিরিজে তিনিই একমাত্র সেঞ্চুরী করেন। নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে রস মর্গান মাত্র তিনরানের জন্যে সেঞ্চুরীর গৌরব লাভ থেকে বঞ্চিত হন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্থান ঃ ২০৬ রান (মহম্মদ ইলিয়াস ৮৮ রান। মঞ্জ ৪৮ রানে ৩ এবং ইউল ৪৮ রানে ৩ উইকেট পান) ও ৩০৯ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেঃ হানিফ মহম্মদ নট আউট ১০০ এবং সৈয়দ আমেদ ৮৭ রান। কলিন্স ৫০ রানে ৩ এবং ইউল ৬৪ রানে ৩ উইকেট)।

নিউজিল্যাণ্ড ঃ ২০২ রান (বেরী সিনক্লেয়ার ৬৬ রান। আসিফ ইকবাল ৪৬ রানে ৬ উইকেট) এবং ২২৩ রান (৫ উইকেটে। রস মর্গান ৯৭ রান। আসিফ ইকবাল ২৯ রানে ২ উইকেট)।

দলীপ সিংজী ট্রফি ফাইনাল :

বোম্বাইয়ের ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ইণ্টার জোন ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চল দল এক ইনিংস এবং ৮৯ রানে মধ্যাঞ্চল দলকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি চার বার দলীপ সিংজী-ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করে। প্রতিযোগিতার সূচনা থেকেই পশ্চিমাঞ্চল দল এই ট্রফি জয় করে আসছে। গত বছর দক্ষিণাঞ্চল দলের সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চল দল যুগ্মবিজয়ী হয়েছিল—বৃষ্টির জন্যে খেলার জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি।

আলোচ্য চতুর্থ বৎসরের প্রতিযোগিতার ফাইনালে মধ্যাঞ্চল দলের অধিনায়ক বিজয় মঞ্জরেকার টসে জয়ী হয়েও প্রথম ব্যাট করার সুযোগ নেননি। প্রথম দিনের খেলায় পশ্চিমাঞ্চল ৭ উইকেট খুইয়ে ৪৬৬ রান তুলেছিল।

ফারুক ইঞ্জিনীয়ার (১৪২ রান) এবং বিজয় ভোসলে (১০০ রান) সেঞ্চুরী করেন। দ্বিতীয় দিনে ৫৫৫ রানের মাথায় পশ্চিমাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। দ্বিতীয় দিনের তিন ঘণ্টারও কম সময়ের খেলায় মাত্র ৩৫ রানের মাথায় মধ্যাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস শেষ হলে পশ্চিমাঞ্চল দল ১২০ রানে অগ্রগামী হয়। ফলো-অন করে এই দিনের বাকি সময়ে মধ্যাঞ্চল দল দ্বিতীয় ইনিংসের ১ উইকেট খুইয়ে ৬৩ রান সংগ্রহ করে। তৃতীয় দিনে ৩৩১ রানের মাথায় মধ্যাঞ্চল দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে পশ্চিমাঞ্চল দল এক ইনিংস এবং ৮৯ রানে জয়ী হয়। তৃতীয় দিনের ৫২ মিনিট এবং চতুর্থ দিনের পুরো খেলার সময় 'মাঠে-মারা' যায়। মধ্যাঞ্চল দলের দ্বিতীয় ইনিংসে উল্লেখযোগ্য রান—সেলিম দুরানীর ১১১ এবং বাংলার প্রকাশ পোদ্দারের ৬২ রান।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পশ্চিমাঞ্চল দল : ৫৫৫ রান (ফারুক ইঞ্জিনীয়ার ১৪২, বিজয় ভোঁসলে ১০০, চান্দু বোরদে ৯১ এবং বাপু নাদকার্নী ৬৯ রান। সুব্রা ৭৬ রানে ৩ এবং সিদ্ধিক ১০৯ রানে ৩ উইকেট)।

মধ্যাঞ্চল দল : ১৩৭ রান (সেলিম দুরানী ৬২ রান। নাদকার্নী ১৬ রানে ৫ এবং দেশাই ২৭ রানে ৩ উইকেট) ও ৩৩১ রান (সেলিম দুরানী ১১১ এবং প্রকাশ-চন্দ্র পোদ্দার ৬২ রান। বাপু গুপ্তে ৬৭ রানে ৫ উইকেট)

জাতীয় বিলিয়ার্ডস প্রতিযোগিতা :

১৯৬১ সালের জাতীয় বিলিয়ার্ডস প্রতিযোগিতার ফাইনালে দু'বারের (১৯৫৮ ও ১৯৬১) বিশ্ব অপেশাদার বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়ান উইলসন জোন্স ৪৩০৭—২২১৫ পয়েন্টে সিংহলের এম জে এম সাফিরকে পরাজিত করে দ্বিতীয় বার উপর্যুপরি তিন বছর জাতীয় বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। জাতীয় বিলিয়ার্ডস প্রতিযোগিতায় উইলসন জোন্স সর্বাধিক বার (মোট ১১ বার) চ্যাম্পিয়ান হওয়ার রেকর্ড করেছেন। তিনি চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন—১৯৫০-৫২ (উপর্যুপরি ৩ বার), ১৯৫৩-৫৫, ১৯৫৭, ১৯৬০-৬১, ১৯৬৩-৬৪ (উপর্যুপরি ৩ বার)।

জাতীয় স্নুকার চ্যাম্পিয়ান সীল :

১৯৬৫ সালের ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী শ্যাম ব্রহ্ম (মহারাষ্ট্র) ৬—৩ ফ্রেমে ১৯৬৩-৬৪ সালের রানার-আপ টনি মন্টিরোকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

রোভার্স কাপ ফাইনাল :

১৯৬৪ সালের রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার (বোম্বাই) ফাইনালের দ্বিতীয় দিনে কলকাতায় বি এন আর দল ১—০ গোলে মোহনবাগান দলকে পরাজিত ক'রে নিজ দলের পক্ষে প্রথম রোভার্স কাপ জয়ের গৌরব লাভ করে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলাটি ১—১ গোলে ড্র ছিল। দ্বিতীয় দিনের খেলায় বি এন আর দল এক বিতর্কমূলক পেনাল্টি কিক থেকে জয়সূচক গোলটি দেয়। বি এন আর দলের পক্ষে এই প্রথম এবং অপরদিকে মোহনবাগান দলের পক্ষে ৬৪বার রোভার্স কাপের ফাইনাল খেলা। মোহনবাগান রোভার্স কাপ পেয়েছে ১৯৫৫ সালে।

জাতীয় মল্লযুদ্ধ প্রতিযোগিতা :

জাতীয় ফ্রি স্টাইল মল্লযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস দল ২৭ পয়েন্ট সংগ্রহ ক'রে উপর্যুপরি ১০বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ান লাভের গৌরব লাভ করেছে। ২য় স্থান পেয়েছে পাঞ্জাব (১৬ পয়েন্ট) এবং ৩য় স্থান রেলওয়ে (১৪ পয়েন্ট)।

জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ :

একাদশ জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় গত বছরের চ্যাম্পিয়ান সার্ভিসেস দল ৫৬ পয়েন্ট সংগ্রহ ক'রে প্রথম স্থান লাভ করেছে। এই নিয়ে সার্ভিসেস দল ৮ বার চ্যাম্পিয়ান হল। আলোচ্য প্রতিযোগিতার ১১টি বিভাগে সার্ভিসেস দল সাতটি বিভাগের ফাইনালে উঠে সাতটিতেই জয়ী হয়। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী রেলওয়ে দল সাতটি বিভাগের ফাইনালে উঠে ৪টিতে জয়ী হয়। বাংলার প্রতিনিধি দুটি বিভাগের ফাইনালে উঠে পরাজিত হন।

ইংল্যাণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা :

ইংল্যাণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার ৫ম বেদরকারী টেস্ট খেলা ড্র গেছে। ফলে ইংল্যাণ্ড ১—০ খেলায় ১৯২৬ সালের বেদরকারী টেস্ট সিরিজে 'রাবার' জয়ী হল। ডার্বানের প্রথম টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড এক ইনিংসে ও ১০৪ রানে জয়ী হয়েছিল। পরবর্তী চারটি খেলাই ড্র যায়।

অস্ট্রেলিয়ান লন্ টেনিস :

১৯৬৫ সালের অস্ট্রেলিয়ান লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায়

কুমারী মার্গারেট স্মিথ (অষ্ট্রেলিয়া) মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হলে উপর্যুপরি ছয় বার এই খেতাব জয়ের রেকর্ড করেন। পুরুষ বিভাগের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন রয় এমার্সন (অষ্ট্রেলিয়া)—এই নিয়ে উপর্যুপরি তিন বছর এবং মোট চারবার সিঙ্গলস খেতাব পেলেন। পুরুষদের ডাবলস ফাইনালে জন নিউকম্ব এবং টনি রোচ (অষ্ট্রেলিয়া) অপ্রত্যাশিতভাবে ১৯৬৪ সালের উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ান প্রখ্যাত রয় এমার্সন এবং ফ্রেড স্টোলী জুটিকে পরাজিত করেন।

আন্তঃরাজ্য এ্যাথলেটিক্স স্পোর্টস

চণ্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বার্ষিক আন্তঃরাজ্য এ্যাথলেটিক্স স্পোর্টসের পুরুষ এবং বালক বিভাগে পাঞ্জাব, মহিলা বিভাগে দিল্লী এবং বালিকা বিভাগে পশ্চিম বাংলা সর্ব্বাধিক স্বর্ণপদক জয় করে।

চারদিনের এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে চোদ্দটি রাজ্য এসোসিয়েশনের প্রায় পাঁচশত এ্যাথলীট যোগদান করেছিলেন এবং ১৪টি বিষয়ে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। দৌড় অনুষ্ঠানে ডাবলস খেতাব (অর্থাৎ ১০০ এ ২০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণ পদক) জয় করেছেন—পুরুষ বিভাগে কেনেথ পাওয়েল (মহীশূর), মহিলা বিভাগে সন্দেশ সোধী (দিল্লী), বালক বিভাগে ই জুয়ারটি (মহারাষ্ট্র) এবং বালিকা বিভাগে সোফিয়া খাতুন (পশ্চিমবাংলা)। এঁদের মধ্যে কেনেথ পাওয়েল ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে, সন্দেশ সোধী ১০০ মিটার দৌড়ে এবং সোফিয়া খাতুন ২০০ মিটার দৌড়ে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেন।

পশ্চিমবাংলার কোন প্রতিনিধি পুরুষ ও মহিলা বিভাগে স্বর্ণপদক পাননি। বালক বিভাগে একটি স্বর্ণ পদক পেয়েছেন—হীরালাল মুখার্জি (লং জাম্পে)। বালিকা বিভাগে পশ্চিমবাংলা ৩টি স্বর্ণপদক পেয়েছে—১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে সোফিয়া খাতুন, লং জাম্পে রুমী নন্দী এবং ৪ × ১০০ মিটার রীলেতে পশ্চিমবাংলা।

পদ্মশ্রী খেতাব :

ভারতবর্ষের পঞ্চদশ প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রবীণ ক্রিকেট খেলোয়াড় অধ্যাপক ডি বি দেওধর এবং ১৯৪৮ ও ১৯৬৩ সালের বিশ্ব বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়ান (অপেশাদার) উইলসন জোন্স 'পদ্মশ্রী' খেতাবে সম্মানিত হয়েছেন।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট :

চলতি মরসুমের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে গতবারের বিজয়ী বোম্বাই ২৬১ রানে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলকে পরাজিত ক'রে মোট ২০বার 'রোহিন্টন বেরিয়া' ট্রফি জয়ের রেকর্ড করেছে।

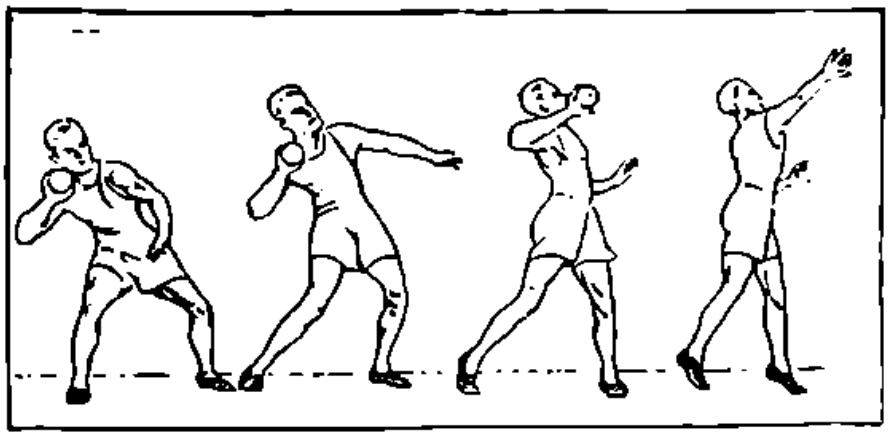

সাহিত্য সংবাদ

মসনদে মোঘল (নাটক) : অমল সরকার

মোঘল সম্রাটদের ইতিহাস ভারত-ইতিহাসের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মোঘল যুগে শিল্প সাহিত্য তার ভাস্কর্যের গৌরব আর নরহত্যার হিংস্রতা যেন একটা রূপকথার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। অমলবাবু সেই রূপকথার জগতের নারীপুরুষদের প্রেম আশা-আকাঙ্ক্ষা হিংসা-প্রতিহিংসা হিংস্রতা নিয়ে রচনা করেছেন এক ঘনঘন, দ্রুত-তালী, নাটা রস, যা শুধু ঐতিহাসিক নাটকমাত্রেই সহজলভ্য নয়। নাটকের চরিত্র সকল অতিপরিচয় আর অপরিচয়ের আলোছায়ায় যেন কুহক সৃষ্টি করেছে। রচনা করেছে একটা অতীত ইতিহাসের ইন্দ্রজাল।—প্রকট করেছে একটা নিদারুণ দুঃস্বপ্ন।

এ নাটকের বিশেষ আদর হবে তা নিঃসন্দেহেই বলা চলে।

[প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩-১-১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, মূল্য দুই টাকা।]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

উদ্ভিদ জীবন : ইন্দিরা দেবী মজুমদার।

"গাছেরও যে আমাদের মত প্রাণ আছে, তাদের অনুভূতি আছে, তাদের মধ্যে সাড়া জাগে" উদ্ভিদ জগতের এই নূতন তথ্য বিশ্বে প্রথমে জানিয়ে দিয়ে মনীষী বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র একদিন বিজ্ঞান জগতে নব জাগরণ এনেছিলেন। পাশ্চাত্য জগতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও এ-কথা শুনে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক সত্যের পূজারী প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন বৈজ্ঞানিক এই অভ্রান্ত, সত্য। এমন প্রতিভাসম্পন্ন ক্ষণজন্মা বৈজ্ঞানিক দুর্লভ হ'লেও বর্তমান জগতে বিজ্ঞানের সাধকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে চ'লেছে। জ্ঞান লাভ করবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে জাগ্রত হ'য়ে তাকে এগিয়ে নিয়ে চ'লেছে সভ্যতার ক্রমোন্নতির পথে। কিন্তু জ্ঞান উপলব্ধি করবার ক্ষমতা জোগায় বৈজ্ঞানিকের শিক্ষা-পদ্ধতির ওপর।

এই স্বল্পপরিসর "উদ্ভিদ জীবন" পুস্তকটির মধ্যে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখক উদ্ভিদ জীবনের জটিল রহস্যগুলি সহজ পদ্ধতি ও এবং সুবোধ্য ভাষায় আলোচনা করে পুস্তকখানি পাঠকবর্গের মনোজ্ঞ করে তুলেছেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মধ্যে উদ্ভিদ জীবনের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়—যথা অঙ্গ-বিন্যাস, শারীরবৃত্ত, শারীরবৃত্তি, স্বাস্থ্য, ব্যাধি, ব্যাক্-টিরিয়া, উদ্ভিদের ইতিহাস প্রভৃতি সুসন্নিবিষ্ট করে এবং বিশদভাবে বুঝিয়ে সকলের মনে জ্ঞানের আলোকপাত করতে পেরেছেন। এমন কি মেণ্ডেলবাদের মত দুরূহ ব্যাপারটিকেও অতি সহজবোধ্য ও মনোজ্ঞ করে উপস্থিত করেছেন। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

[প্রকাশক : বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ১৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য এক টাকা]

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

লৌকিক জীবনে অলৌকিক জগৎ :

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। কল্পনাতীত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দেখে মানুষ আজ বিস্ময়-বিমূঢ়। কিন্তু লৌকিক জীবনে আজও যে বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটে, সেও তো অনস্বীকার্য। বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও তর্কে এ সব ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা চলে না। মানুষ সৃষ্টি করেছে বিজ্ঞান। কিন্তু সেই মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন—তাঁর ক্ষমতা সীমাহীন, অপরিমেয়। তাই মাঝে মাঝে মানুষের জীবনে অলৌকিক ঘটনা ঘটতে দেখে আমরা ক্ষণিকের জন্যে আত্মসমাহিত হই—ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠি।

আলোচ্য গ্রন্থখানার লেখক একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। তিনি এই গ্রন্থে সত্যঘটনা সহজভাষায় বিবৃত করেছেন অতি সুন্দর ভাবে। পরিশিষ্টে কতকগুলি দৈব ওষুধের সন্ধান দিয়েও তিনি বহুরোগীকে দেখিয়েছেন আশার আলো। বইখানার বহুলপ্রচার আমরা কামনা করি।

[প্রকাশক—এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স, প্রাঃ লিঃ, ১৪ নং বঙ্কিমচ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলি : ১২, মূল্য—২·৫০ পঃ]

—কুমারেশ ভট্টাচার্য

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ২।৩।৫৫ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রস্ফুটিত

শিল্পী : দীপক চন্দ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

চৈত্র—১৩৭১

দ্বিতীয় খণ্ড | দ্বিপঞ্চাশত্তম বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

রামকৃষ্ণের দর্শন

শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার

"বিচার করবার সময় শাঁসকেই সার, খোলা আর বীচিকে অসার বলে বোধ হয়। বিচার হয়ে গেলে সমস্ত জড়িয়ে এক বলে বোধহয়। আর বোধহয়বে সত্তাতে শাঁস, সেই সত্তা দিয়েই বেলের খোলা আর বীচি হয়েছে। বেল বুঝতে গেলে সব বুঝিয়ে থাকে। বেলটা কত ওজনে ছিল বলতে গেলে শুধু শাঁস ওজন করলে হবে না। ওজনের সময় শাঁস, বীচি, খোলা সব নিতে হবে। ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার, আবার সাকার নিরাকারের পার। তাঁর ইতি করা যায় না। এক দুয়ের পার। 'এক' অবস্থায় 'অনেক' চলে যায়, আবার 'এক'ও চলে যায়—কেন না এক থাকলেই দুই। তিনি যে উপমা-রহিত।'

—শ্রীরামকৃষ্ণ।

(১) মানুষের মনে নানা প্রশ্ন জাগে। যেমন বিশ্বসত্তা কি গুণ ও আকারের বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে গেছে? সবিশেষরূপে প্রকাশিত হয় নি এরকম অতিরিক্ত সত্তা বা শক্তি কি কিছু নেই? বিশ্বের সমস্ত নিয়ম ও সকল তথ্যের অতীত কোনও পরমসত্তা কি নেই? সে সত্তা সর্বজ্ঞ, সর্বগুণাকর, সর্বশক্তিমান্, সর্বব্যাপী? কিংবা সে সত্তা শুদ্ধ, নিষ্ক্রিয় নির্বিশেষ, নির্গুণ, নিত্য ও অপরিবর্তনশীল? যদি থাকে এই দুটো সত্তা কি এক ও অভিন্ন?

যদি বিশ্বাতীত সত্তা থাকে, সেই সত্তা ও বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বপ্রোত সত্তা কি এক ও অভিন্ন? পূর্ণসত্তার কি প্রকাশজনিত কোনও স্তর নেই? মানুষ কি পূর্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে? মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধরূপে পূর্ণের স্বরূপ কি? সম্পূর্ণ অসম্বন্ধরূপে অর্থাৎ পূর্ণসত্তার স্বয়ংপ্রকাশ কি সম্ভবপর? যদি সম্ভবপর হয়, তাহলে জীব জগৎ মানুষ ইত্যাদির বস্তুতা কতদূর সত্য? এইসব প্রশ্নের উত্তর রামকৃষ্ণের কথাগুলোর মধ্যে পাওয়া যায়।

"ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার, আবার সাকার নিরাকারের পার, তাঁর ইতি করা যায় না।" এইভাবে রামকৃষ্ণ ঈশ্বরকে বর্ণনা করেছেন, এক স্থানে। যে-বস্তুর ইতি করা যায় না, যে-শক্তির ইতি করা যায় না—সেই-বস্তুর বা সেই শক্তির নিঃশেষ নেই। নিঃশ্রেয়সের নিঃশেষ নেই, বাধের দ্বারা বা প্রকাশের দ্বারা পূর্ণের কোনও ক্ষয় নেই। পূর্ণ থেকে পূর্ণ গেলেও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। কারণ, পূর্ণের স্বভাবই হচ্ছে স্বশক্তিবলে সর্বাবস্থায় সম্পূর্ণ থাকা। কোটি কোটি বিশ্ব ভাঙাগড়ার পরও, অনন্তরূপ ধারণের পরও পূর্ণবস্তু পূর্ণই থাকে। সেইজন্য পরমবস্তু বা ঈশ্বর সাকারের পার। ঈশ্বর যত কেন না আকার বা আকৃতি ধারণ করুন, তাঁর শক্তি অক্ষয় ও অক্ষতই থেকে যায়। অন্যস্থলে রামকৃষ্ণ বলেছেন: "ঈশ্বর একজন ব্যক্তি বোধ থাকলেই হলো, যে ব্যক্তি প্রার্থনা শুনেন, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, যে ব্যক্তি অনন্তশক্তি।" (রামকৃষ্ণকথামৃত ১।৭৫) ঈশ্বর যদি ব্যক্তিস্বরূপ হন তাঁকে নিরাকার এবং নিরাকারের পার বলা যায় কি? ব্যক্তিটা কি আকার নয়? সাধারণত আমরা যে জিনিসকে ব্যক্তিত্ব বলি তা একটা সীমাবদ্ধ ও আকার-বিশিষ্ট জিনিস; মানুষের ব্যক্তিত্ব হচ্ছে এক বিশেষরূপে জানবার, ভাববার, ভোগ করবার এবং কর্ম করবার প্রবৃত্তি। কিন্তু ঈশ্বর অনন্তশক্তি ও সর্বজ্ঞ; সেইজন্য ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোনও সীমাজনিত, বাধাজনিত, অভাবজনিত বা অবচ্ছেদ-সম্ভূত আকার থাকতে পারে না। এই অর্থে ঈশ্বরকে নিরাকার বলা দোষাবহ নয়। কোনও আকার, বিকার ও প্রকার ঈশ্বরে প্রযোজ্য নয়। ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব হচ্ছে মানুষ প্রভৃতির সঙ্গে সম্বন্ধের জন্য, যে সম্বন্ধের জন্য ঈশ্বর "প্রার্থনা শুনেন"; ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব হচ্ছে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা পাতা ও প্রলয়কর্তা হওয়ার জন্য। জীব জগৎ ইত্যাদির সঙ্গে অনন্তশক্তি ঈশ্বরের যে-সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ হচ্ছে স্বগত সম্বন্ধ এবং এই সম্বন্ধগুলো গুণ-রূপে বিদ্যমান: সুতরাং সেই সম্বন্ধের জন্য কোনও বিচ্ছেদ বা অবচ্ছেদের উৎপত্তি হয় না এবং ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব দ্বারা তাঁর নিরাকারত্ব বাধিত হয় না, এক কথায় ঈশ্বর হচ্ছেন সগুণ ব্রহ্ম বা পূর্ণ ব্যক্তি। "সগুণ ব্রহ্মকে বেদ পুরাণ তন্ত্রে কালী বা আদ্যাশক্তি বলে গেছে।"

রামকৃষ্ণ ঈশ্বরকে 'সাকার' এবং 'নিরাকারের পার'ও বলেছেন। কলাকে এক অর্থে সমগ্র বলা চলে; যে-হেতু সমগ্রের কলাই কলাবিশেষ; আবার সমগ্রকেও এক অর্থে কলা বলা চলে: যে-হেতু কলাবিশেষ সমগ্রেরই অংশ। পূর্ণ ব্যক্তিস্বরূপ ঈশ্বরকে সমগ্র মনে করলে, সাকার দেব-দেবী, অবতার ইত্যাদি তাঁর অংশ-স্বরূপ এবং সেইজন্য এক অর্থে ঈশ্বরকে সাকার বলা চলে। কিন্তু সগুণ ব্রহ্মই ব্রহ্মের সবটা নয়। সমগ্র পরমবস্তুর অংশবিশেষ হচ্ছে সগুণ-ব্রহ্ম, এছাড়া নির্গুণ ব্রহ্মও আছে এবং সমগ্র সত্তাটা সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম দুই-এরও অধিক। সুতরাং পূর্ণ ব্যক্তি-স্বরূপ ঈশ্বর সমগ্র সত্তের কলাবিশেষ মাত্র; এই দিক থেকে এক অর্থে ঈশ্বরকে নিরাকারেরও পার বলা অসঙ্গত নয়; সুতরাং অংশার্থে ঈশ্বরকেও সমগ্রবস্তু বলা চলে।

ঈশ্বর, নির্গুণ ব্রহ্ম ও সমগ্র-সৎ সম্বন্ধে রামকৃষ্ণের ধারণা কি ছিল বুঝতে হলে তাঁর উক্তিগুলোর বিশ্লেষণ দরকার। ঈশ্বর, নির্গুণ ব্রহ্ম ও পূর্ণ শিব-শক্তি সবই যদি একার্থক হয় তাহলে তিনটে ভিন্নশব্দের কোনও সার্থকতা থাকে না; আবার তিনটের মধ্যে যদি মিল বা অভেদ না থাকে তাহলে তিনটে পরমতত্ত্ব থেকে যায়; কিন্তু পরমতত্ত্ব একাধিক হতে পারে না। সুতরাং এই তিনটে তত্ত্বের ভেদ ও অভেদ দুইই আছে এবং তাদের ভেদাভেদ নির্ণয় করতে পারলে রামকৃষ্ণের দর্শন সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা হয়।

"ব্রহ্ম এক'ও নয়, দুই'ও নয়। এক দুয়ের মধ্যে। অস্তি বলা যায় না, নাস্তিও বলা যায় না। তবে অস্তি-নাস্তির মধ্যে।" এইরকম নেতিবচন দিয়ে রামকৃষ্ণ নির্গুণ ব্রহ্মের বর্ণনা করেছেন। আবার আর এক স্থলে রামকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন: জ্ঞানী নেতি বিচার করে। এই বিচার করতে করতে যেখানে আনন্দ পায়, সেই ব্রহ্ম। আবার বলেছেন

ব্রহ্ম অটল, নিষ্ক্রিয় সুমেরুসম। আরও এক জায়গায় বলেছেন : তাঁর স্বরূপ কি মুখে বলা যায় না। এই উক্তিগুলো প্রণিধান করলে বোঝা যায় যে নিরাকার, নির্বিশেষ সচ্চিদানন্দের বোধই ব্রহ্মবোধ। এই বোধে জীব, জগৎ, আমি, তুমি বা অন্য কোনও উপাধির বোধ থাকে না। কিন্তু তাই বলে জীব জগৎ ঈশ্বর যে মিথ্যা বা স্বপ্নবৎ—এমন কথা রামকৃষ্ণ বলেন না। বিচারের এক অবস্থায় এসব স্বপ্নবৎ মনে হয়; তবে বস্তুত সেগুলো স্বপ্নবৎ নয়। ঈশ্বরাদি অন্যান্য তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা যেই-সত্তার মধ্যে—সেই-সত্তাকে রামকৃষ্ণ 'তিনি' বললেন। যিনি ব্রহ্ম তাঁর সত্তাতেই জীবজগৎ, 'তিনি'ই ঈশ্বর, মায়া, জীব জগৎরূপে প্রতীয়মান হচ্ছেন। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী, যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার। অদ্বিতীয় পূর্ণ সত্তাকে রামকৃষ্ণ 'তিনি' বলে অভিহিত করেছেন; এই পূর্ণের এক অংশ হচ্ছে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়শীল জীব ও জগতাদি। ব্রহ্মবোধ ও ঈশ্বরবোধে সেইজন্য ভেদ আছে এবং দুটো বোধই পূর্ণবোধ থেকে পৃথক্।

পূর্ণের যে অংশ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করে, সেই অংশকে রামকৃষ্ণ সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলেছেন। শক্তি হচ্ছে ঈশ্বরের স্বরূপ; শক্তি ও ঈশ্বর অবিভাজ্য এক ব্যক্তি এবং যতক্ষণ জীবজগৎ সত্য এই বোধ থাকে ততক্ষণ ঈশ্বরে ব্যক্তিবোধও সত্য, ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ এইখানে যে, ব্রহ্ম হচ্ছে নির্বিশেষ ও নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় সত্তা এবং ঈশ্বর হচ্ছেন এক সর্বজ্ঞ, সর্বগুণৈশ্বর্যশালী এবং সর্বশক্তিমান অন্তর্যামী সত্তা। আবার উভয়েই অভিন্ন, কারণ, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম দুইই সমগ্রের বা পূর্ণের দুই ভিন্ন অংশ মাত্র; এক পূর্ণসত্তা ব্রহ্ম ও ঈশ্বর দুইই হয়েছেন—যে বাবুর ঘরদোর নেই, সবই বিকিয়ে গেল সে বাবু কিসের বাবু? তেমনি যে-সত্তার কোনও গুণ বা ক্রিয়া নেই, সে-সত্তা গুণাতীত বা নিষ্ক্রিয় অস্তিত্ব মাত্র, সেই সত্তা কিসের পূর্ণসত্তা? এই কথাই রামকৃষ্ণ অন্যত্র সমগ্র বেলের উপমা দিয়ে বুঝতে চেয়েছেন। তিনি বলতেন: "বেলটা কত ওজনে ছিল বলতে গেলে শুধু শাঁসটা ওজন করলে হবে না। ওজনের সময় শাঁস, বীচি, খোসা সব নিতে হবে। যে সত্তাতে শাঁস সেই সত্তা দিয়েই বেলের খোসা আর বীচি হয়েছে।...পূর্ণসত্তাই হল রামকৃষ্ণের উপমিত সমগ্র বেল। বিশ্বে অকিঞ্চিৎকর কিছুই নয়; ছোট, বড়, অণু, বৃহৎ সবার ওপর ও মধ্যে পূর্ণের পুণ্য স্পর্শ আছে; সমগ্রকে মানুষের বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না; সেটাকে মানুষের ভাষায় বা বচন দ্বারা বর্ণনা করা যায় না; কারণ, মানুষ হল পূর্ণের অতি ক্ষুদ্র কণিকা মাত্র। সব রকম বিরোধ ও বিবাদের সমন্বয় ও সুসংগতি এই সমগ্রসত্তের মধ্যে হয়েছে, এবং পূর্ণ শিব-শক্তি বা 'তিনি' হচ্ছেন ব্যক্তি ও অব্যক্তি, নির্বিশেষ ও সবিশেষ সাকার ও নিরাকার, প্রকাশ ও বিধর্ম, সব কিছুর ওপরে ও সব কিছুর অধিক। 'তিনি'র উপমা একমাত্র 'তিনি'ই তিনি সেইজন্য নিরুপম, ও অনুপম।

"যা কিছু দেখছ, শুনছ চিন্তা করছ সবই মায়া। আদ্যাশক্তি বা মহামায়া ব্রহ্মকে আবরণ করে রেখেছে। আবরণ গেলেই 'যা ছিলুম তাই হলুম'। আমিই তুমি, তুমিই আমি।...তিনিই সুমতি দেন, তিনিই দুর্মতি দেন। তিনি মিষ্টি আমগাছও করেছেন, আর টক আমড়া গাছও করেছেন।...এসব তাঁর মায়ার ঐশ্বর্য। সৎ, অসৎ, ভাল, মন্দ, পাপ, পুণ্য, ব্রহ্ম আর "আদ্যাশক্তি" প্রথমে দুটো বোধ হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে দুটো আর থাকে না। মানুষ তাঁর মায়াতে পড়ে স্বরূপকে ভুলে যায়। তাঁর মায়া ত্রিগুণময়ী। এই ত্রিগুণই ভাকাত, সর্বস্ব হরণ করে, স্বরূপকে ভুলিয়ে দেয়। এদের মধ্যে সত্ত্বগুণই ঈশ্বরের পথ দেখিয়ে দেয়। তাঁর মহামায়াতে এই জগৎসংসার। এই মায়ার ভিতর বিদ্যামায়া, অবিদ্যামায়া দুইই আছে। অবিদ্যা আছে কেন? তাঁর লীলা; অন্ধকার না থাকলে আলোর মহিমা বোঝা যায় না। দুঃখ না থাকলে সুখ বোঝা যায় না। মন্দ জ্ঞান থাকলে তবে ভালজ্ঞান হয়। বিদ্যামায়া, অবিদ্যামায়া আমের খোসার ন্যায়: দুইই দরকার।...'মায়ার কার্যে অনেক গোলমাল। এটার পর ওটা, এটা থেকে ওটি হবে—ওসব বলবার যো নেই।' তুমি পূর্ণ আমি অংশ।...এই ভেদবোধ, আমি একটি, তুমি একটি। এ ভেদ-বোধ তিনিই করাচ্ছেন। যতক্ষণ এই ভেদবোধ ততক্ষণ শক্তি মানতে হবে। আদ্যাশক্তি লীলাময়ী: সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন।"

সমগ্র ভারতবর্ষে যদি এমন কোনও একটা শব্দ খুঁজে বার করতে হয় যা বিদ্বান্ মূর্খ, ধনী নির্ধন, সাধু পামর নির্বিশেষে সকলেই কোনও না কোনও অর্থে গ্রহণ করেছে

যা ব্যবহার করেছে সেই শব্দটি নিশ্চয়ই মায়া। মায়া দেশের লোকের এই শব্দটার ওপরও যেন একটা মায়া পড়ে গেছে। কত বিভিন্ন অর্থে শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি এখানে মানুষের ওপর কত বিভিন্ন খেলা দিয়েছে। কখনও মায়া অবলম্বন করেছে, কখনও মায়া চমৎকৃত করেছে, কখনও মায়া সঞ্জীবিত করেছে এবং কখনও উদ্বুদ্ধ করেছে। কখনও মায়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতা করা হয়েছে, কখনও মায়াকে স্বামিনীর মত বন্দনা করা হয়েছে, কখনও তার করুণা ও কৃপা ভিক্ষা করা হয়েছে। ভারতবর্ষের সম্পর্কে বিদেশীর যত কুৎসা সবই এই মায়া শব্দটার জন্য। জীবনবিমুখিতাই নাকি মায়া; যে-দেশ জগৎ ও জীবনকে মায়া বলে সেই দেশ জগৎ পরাঙ্মুখ সেই-দেশ জীবন-প্রতিকূল ত বটেই।

মায়া কি? 'কি' বলতে আমরা দুরকম প্রশ্ন করি। একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে-ব্যাপারগুলোকে আমরা 'মায়া' বলি সেই ব্যাপারগুলোর বর্ণনা: ইংরেজীতে যাকে বলা হয় ডেস্‌ক্রিপশন্। দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে—এই ব্যাপারগুলোর স্বরূপ, স্বভাব, প্রকৃতি বা কারণ সম্বন্ধীয়। যে কোনও জিনিস বুঝতে গেলে প্রথমে জানতে হয় উপাত্ত বিষয়গুলো কি, আপাতসত্য তথ্যগুলো কি? তারপর প্রশ্ন ওঠে আপাতসত্য তথ্যগুলোর তাৎপর্য বা অর্থ কি? সেগুলোর মধ্যে বা পেছনে কারণধানীয় তত্ত্বটা কি? অন্যভাবে বলা চলে যে 'কি' প্রথম অর্থে বর্ণনামূলক এবং দ্বিতীয় অর্থে ব্যাখ্যামূলক।

বর্ণনারূপে বলা চলে যে আমরা যা কিছু দেখছি, শুনছি এবং চিন্তা করছি সবই মায়া। আমার ব্যবহারিক জগৎ মূলত তিন রকম জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত; (১) আমার নিজ প্রত্যক্ষজ্ঞান (এই জ্ঞান হল আমার দর্শন বা দেখা) (২) আমি ছাড়া অন্যান্য জীবের প্রত্যক্ষজ্ঞান (এই জ্ঞান হল আমার পক্ষে শোনা বা শ্রুতি) এবং (৩) আমার প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ও অন্যান্য জীবের প্রত্যক্ষজ্ঞানের স্মরণের ওপর ভিত্তি করে চিন্তা (এই জ্ঞান হল স্মৃতি বা চিন্তন)। দর্শন, শ্রুতি এবং স্মৃতি ছাড়া আর কোনও জ্ঞানের পথ নেই; দর্শন হচ্ছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ; স্মৃতি বা চিন্তন হচ্ছে অনুমান ও উপমান প্রমাণ এবং শ্রুতি হচ্ছে শব্দ প্রমাণ। এই ত্রিবিধ প্রমাণের ওপর যে ব্যবহারিক জগৎ প্রতিষ্ঠিত তারই বর্ণনামূলক সংজ্ঞার নাম মায়া। তাহলে এই বলা চলে যে লৌকিক ও বৈজ্ঞানিক জগৎ বলতে আমরা যা বুঝি তার নাম মায়া, এক কথায় বাচ্য, পরিমেয়, বিচার্য বা উক্ত সর্ববিধ বিষয়ের সামান্য নাম হচ্ছে মায়া। সর্ববিধ বাচ্য এবং উক্তের সমান বা সাধারণ ধর্ম কি? সেগুলোর সামান্য ধর্ম হচ্ছে এই যে—সেগুলোর মাপ বা সীমা আছে, সেগুলোর আয়তন বা কায় আছে। কায়িক ও মায়িক শব্দ দুটো এবং মায়া ও মেয় শব্দদুটোর তাৎপর্য এক। ইংরেজী ভাষায় যাকে কেনমেন্সাল বা রেলেটিভ বলা যায় তারই সংস্কৃত প্রতিশব্দ হল মায়া।

ব্যাখ্যানের সময় প্রশ্ন ওঠে এই সীমার জগৎ বা ব্যবহারিক জগৎ—এর উদ্ভবের কারণ কি? তার উদ্ভবের কতকগুলো দুর্লঙ্ঘ্য বা অমোঘ নিয়ম আছে কি? রামকৃষ্ণ বলেছেন: মায়ার কার্যে অনেক গোলমাল, এটির পর ওটি, এটি থেকে ওটি হবে বলবার যো নেই। রামকৃষ্ণ কি বলতে চাইছেন যে কার্যকারণ শৃঙ্খলা গড়ে বা মোটামুটি-ভাবে থাকলেও প্রতীয়মান জগতের সর্বত্রই সূক্ষ্মাকারে যদৃচ্ছা বর্তমান? এই মতের সঙ্গে সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিকদের মতের যথেষ্ট মিল আছে। (১) এটির পর ওটি এবং (২) এটি থেকে ওটি, এই দুটোই হল কার্যকারণ সূত্রের দুটো লক্ষণ, (১) একটা হল পারম্পর্য লক্ষণ এবং (২) দ্বিতীয়টা হল অবিনাভাব বা ব্যতিক্রমহীনতার লক্ষণ। সোজা কথায়, অব্যর্থ বা অমোঘ কার্যকারণ-ভাবিত্ব, রামকৃষ্ণের মতে, সত্য নয়। কার্যকারণের অমোঘত্ব যদি না থাকে তাহলে জীবননির্বাহ, ধর্মসাধনা বা বিজ্ঞানচর্চা কি করে সম্ভবপর? কতকগুলো বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ পরিধির মধ্যে বা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই যদৃচ্ছা বা স্বতঃস্ফূর্তি বা কৃপা বা স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশের সম্ভাবনা। সুতরাং এই বিচারে কার্যকারণভাবিত্ব সম্ভবপর। গল্পটির স্বাধীনরূপে চরার গণ্ডী তার ঘিরে নির্দিষ্ট হয়ে আছে; ঐ নির্দিষ্ট গণ্ডীটির মধ্যে থাকলে তবে সে তার ইচ্ছা মতো চরলেও চরতে পারে; গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করার আগে তার একেবারেই কোনও স্বাধীনতা নেই। রামকৃষ্ণের 'কৃপা' শব্দের অর্থ এই প্রসংগে লক্ষণীয়। 'কৃপা' হচ্ছে করার পর পাওয়া।

পারুল কর

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

"রে সতি, রে সতি, কান্দিস পশুপতি; পাগল শিব প্রমথেশ" শিবও পাগল হয়েছিল, অধ্যাপক ডঃ রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য নিজের চেয়ারে নিরর্থকভাবে একখানা বই খুলে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর আপন মনে এই কথাগুলো উচ্চারণ করলেন।

অধ্যাপকের স্ত্রীবিয়োগের পর প্রায় পাঁচমাস কেটে গেছে। স্ত্রীর জীবনকালে তিনি বুঝতেও পারেন নি যে স্ত্রীর কোন প্রয়োজন আছে। মৃত্যুর সময় কিছু দুঃখ হয়েছিল বটে, কিন্তু এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। মেয়ের বয়স প্রায় কুড়ি। সেই বাবার জামা-কাপড় গুছিয়ে দেওয়া থেকে মিশ্রির জল ও টোব্যাকোর ডিবা সমস্তই এগিয়ে দেয়। ছেলেমেয়ে সকলেই বেশ নম্র, ভদ্র, বিনয়ী। পুরাণো বিশ্বাসী রাঁধুনী সংসারের সমস্ত তত্ত্বাবধান করে। একান্ন বছর বয়সের অধ্যাপক ভেবেছিলেন একরকম চলেই যাবে, কোন অসুবিধা হবে না।

কিন্তু মনের গ্রন্থি বড়ই জটীল, একেবারে দুর্জ্ঞেয়। স্ত্রী-বিয়োগের তিনমাস পর থেকে রাজনারায়ণবাবু পৃথিবীটাকে বড়ই শূন্য বলে মনে করতে লাগলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে, তিনি আস্তে আস্তে ফুরিয়ে যাচ্ছেন। নতুন বই পড়বার কোন কৌক আর আসে না, পড়লেও মনে থাকে না, কলেজে পড়াবার সময় আগেকার মত সেই উৎসাহ যেন নেই, ছাত্র অথবা শিক্ষকমহলে কোন অন্যায় দেখলে তার প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে আর করে না। তবে কি তিনি নিঃশেষিত? কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবনা হোল, বোধ হয় মেলনকোলিয়া রোগ হয়েছে! কিম্বা লো-ব্লাড্‌প্রেসার। চিন্তিত মনে বহুদিনের পুরাতন পারিবারিক চিকিৎসকের কাছে তিনি গেলেন; বিচক্ষণ চিকিৎসক সবিশেষ পরীক্ষা করে বল্লেন, কিছুই হয়নি। শেষে বল্লেন, ওটা মানসিক, একটা মেণ্টাল শক্ পেয়েছেন ত?

স্ত্রীবিয়োগ যে তাকে কোন শক্ দিয়েছে, অধ্যাপক তা বিশ্বাস করতে চান না। কারণ স্ত্রী কমলাকে তিনি কোনদিনই নিজের উপযুক্ত সঙ্গিনী বলে মনে করেন নি। তিনি একজন উচ্চশিক্ষিত পি-এইচ-ডি অধ্যাপক, স্ত্রী পল্লীগ্রামের মেয়ে, বাংলার কোন রকমে চিঠি লিখতে পারতেন বটে কিন্তু কখনও লিখতেন না, বলতেন ভালো লাগে না। অধ্যাপক যখন রবীন্দ্র সাহিত্যে কাণ্টের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করতেন, স্ত্রী তখন কিয়ের মাজা বাসনে তেল আবিষ্কার করে বিকট ভাবে চীৎকার করতেন এবং কাপড় ছেড়ে সর্ব্বত্র গোবর প্রলেপে মনঃসংযোগ করতেন। যৌবনে অধ্যাপক একবার সস্ত্রীক দার্জ্জিলিং-এ বেড়াতে গিয়েছিলেন, সেই সময় এক গভীর রাত্রে তিনি ঘরের বাইরে এসে পাহাড়ের ওপোর চাঁদের আলো দেখে সাগ্রহে স্ত্রীকে ঘুম থেকে তুলেছিলেন চাঁদ দেখবার জন্য, স্ত্রী বাইরে এসে চাঁদের দিকে একবার চেয়েই বলেছিলেন, হয়েছে হয়েছে, এখন ভেতরে চল, শেষটা কি ঠাণ্ডা লাগিয়ে নিমোনিয়া হবে নাকি? এর পর রাজনারায়ণবাবু আর কোনদিন স্ত্রীকে নৈসর্গসৌন্দর্য্য দেখাবার চেষ্টা করেন নি। এ হেন স্ত্রীর অবর্ত্তমানে তাঁর যে কোন অসুবিধা হবে, তা তিনি মনে না করলেও একান্ন বছরের দুর্জ্ঞেয় মন কেমন যেন অনাহারক্লিষ্ট নিরাশ্রয় পথচারীর মত ধীরে ধীরে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়তে লাগলো। অধ্যাপক সত্যই চিন্তিত হলেন।

দুই

চরিত্রবান, আত্মসম্মানী অধ্যাপক মনে করতেও পারেন না, যে তিনি কোনদিন কোন নারীর দিকে লালসার দৃষ্টি

নিক্ষেপ করেছেন। না, যৌবনেও এ রকম দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে তাঁর মনে পড়ে না। বিয়ের পর স্ত্রীকেই স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে তাঁর প্রায় একমাস সময় লেগেছিল। এমনই ছিল তাঁর কঠোর নিষ্ঠা, তাঁর সংযম ছিল এতই স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু স্ত্রী বিয়োগের পাঁচটা মাস পরে হঠাৎ তিনি রাতে এক নারীদেহের সান্নিধ্যে এসে মনে মনে এমন একটা পুলক অনুভব করলেন যে, পরমুহূর্তে নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু এই নিজের কাছে নিজের লজ্জায় তাঁর চৈতন্য হওয়া দূরে থাক, তিনি ঐরূপ ঘটনার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন, আহা, আর কোন মহিলা অসতর্কভাবে তার গায়ের ওপোর আর একবার কি পড়বে না!

ঘরে ফিরে নিজেকে নিজে কশাঘাত করেন নির্মমভাবে, সকাল সন্ধ্যা শ্রীমদ্ভাগবৎগীতা নিয়ে আবৃত্তি করতে বসেন, কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের কাছে বসে বেদান্ত দর্শনের পাঠ নিতে চেষ্টা করেন, ছেলেমেয়েদের তত্ত্বাবধান করতে আরও বেশী সময় দেন, কিন্তু দুষ্টগ্রহের একটা বর্জনীয় চিন্তা এক একবার এমনভাবে উঁকী মেরে যায় যে, অধ্যাপক পর মুহূর্তেই নিজেকে নিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েন। রাত্রে ঘুমও আর হয় না। "পঞ্চমি দেবাংস্তবদেবদেহে" পাঠ করতে করতে হঠাৎ মনে হয় "কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে কুঞ্জকাননে সুখে, ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা ধরেছি তোমার মুখে।" এই অবাধ্য মন নিয়ে অধ্যাপক সত্যই বড় বিরক্ত এবং বিব্রত হয়ে পড়লেন।

অধ্যাপক লোকটি ছিলেন বড় চাপা গোছের, হয়ত কারুর সঙ্গে মনের মিল হোত না বলেই চাপা। নিজে নিজে ভাবতে লাগলেন, কি করা যায়! শরীর ক্রমশঃই খারাপ হচ্ছে, রাত্রে ঘুম নেই, কাজেই হজমেরও অসুবিধে হচ্ছে, ডাক্তার বলছে কোন রোগ নয়, বলছে নের্ভাস শক, কাজেই ডাক্তার দেখিয়ে কোন লাভ নেই। নিজের চিকিৎসা নিজেকেই করতে হবে। শেষে তিনি ঠিক করলেন, রাত্রে আহারাদির পর যদি একটা বেশ লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে আসা যায় তাহলে হয়ত হজম এবং সুনিদ্রা দুটোই স্বাভাবিকভাবে হতে পারে।

প্রথম রাত্রে প্রায় আটটার সময় আহারাদি সেরে শ্যামবাজার থেকে বেরিয়ে বাগবাজার ষ্ট্রীট ধরে আপন মনে এসে পড়লেন গঙ্গার ধারে; সেখান থেকে আহিরীটোলার ঘাট। বড় অন্ধকার, স্থানে স্থানে অন্ধকারে জল এবং গোবর থাকায় পথ চলা বেশ অসুবিধাজনক। অধ্যাপক দ্রুতগতি হেঁটে চলেছেন, আর মনে মনে বলছেন হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণযাদবায় নমঃ ইত্যাদি। রাত্রে একরাশ ক্লান্তি নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। শয়ন মাত্রেই ঘুম এল বটে, কিন্তু প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর মানসিক অবসাদ রইল পূর্ব্ববৎ। ভাবলেন, একা একা ঘুরে তেমন সুবিধে হবে না, একজন বন্ধু চাই, যার সঙ্গে গল্প করতে করতে ঘুরতে হবে।

দ্বিতীয় রাত্রে আহারাদির পর এক বন্ধুর বাড়ী গিয়ে বল্লেন, বেড়াতে যাবে? বন্ধু বল্লেন, মাথা খারাপ! এই মাঘ মাসের শীতে ঠাণ্ডা লাগুক আর কি? তার চেয়ে বোসো, গল্প করা যাক্। অধ্যাপক তাঁর বন্ধুর বাড়ী থেকে সোজা বেরিয়ে পড়লেন।

কিন্তু কোথায় যান! গঙ্গার ধার বড় নির্জ্জন, শেষে কেউ যদি আংটি আর সোনার বোতাম কেড়ে নেয়! তার চেয়ে হেদুয়ার পুকুর ঢের ভালো। সার্কুলার রোড ধরে অধ্যাপক এগিয়ে চল্লেন বিডন ষ্ট্রীটের দিকে।

হেদুয়া থেকে ফেরবার সময় দেহটা একটু সুস্থ বোধ হচ্ছিল বটে, কিন্তু মন ছিল পূর্ব্বেরই মত অবসন্ন। বড় কথা কইতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আশ্চর্য, বন্ধুরা কেউই কথা বলার উপযুক্ত নয়, সবাই যেন ভয়ানক রকম কেজো লোক হয়ে গেছে, বাজে গল্প করতে কেউই আর যায় না। অধ্যাপক নিজে কিন্তু একবারও ভাবলেন না যে, মাত্র কয়েকমাস পূর্ব্বে তিনিও বাজে গল্প করতে একেবারেই চাইতেন না।

হেদুয়া থেকে কর্ণওয়ালিশ ও গ্রে ষ্ট্রীট পার হয়ে তিনি এসে পড়লেন সার্কুলার রোডে। মাঘমাসের রাত্রি দশটা, এ-ক'দিন ঠাণ্ডা একটু বেশীই পড়েছে, রাস্তায় লোক চলাচল খুবই কম, পথ দিয়ে চলতে গিয়ে হঠাৎ দেখলেন গ্যাসের তলায়—ও কে? ঠিক যেন কমলা একলাটি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। একবার চোখ বুজে আর একবার চাইলেন ঠিক—ঠিক, কমলাই ত!

হন্ হন্ করে এগিয়ে এলেন কমলার দিকে; কমলার ছায়া মূর্ত্তির দিকে পূর্ণ দৃষ্টিপাত করে অধ্যাপক বল্লেন, তুমি, তুমি এখানে?

কমলা অধ্যাপকের মুখের দিকে চেয়ে অত্যন্ত পরিচিতের মত মিষ্টি স্বরে বল্লে, এস।

প্রেতের আহ্বানে, নিশির ডাকে মোহাচ্ছন্ন অধ্যাপক পাশের গলিপথে প্রবিষ্টমানা কমলার পশ্চাদনুসরণ করলেন। এ আহ্বান উপেক্ষণীয় নয়। অবশ্য অনুসরণীয়।

গলিপথ হুহাত মাত্র চওড়া। দু'পাশে টিনের চালায় মোটর মেরামতী কারখানা, মধ্যে সেই গলিপথ গভীর অন্ধকার, জনমানবশূন্য। চিন্তা করার ক্ষমতামাত্র বর্জ্জিত একায় বৎসরের প্রৌঢ় অধ্যাপক প্রেতমূর্ত্তির অনিবার্য্য আহ্বানে সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারের জঠর মধ্যে নিমেষেই বিলীন হয়ে গেলেন।

তিন

অনেকখানি গলি পার হয়ে একটুখানি খোলা উঠান। কে যেন সেই উঠানের এক পাশে বসে আছে। কমলা কোন দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করে একটা ছোট দরজার সামনে এসে শিকলের ফুলুপে চাবি ঘুরিয়া ঘর খুল্লে। খোলার চালার মধ্যে একখানি অতি ক্ষুদ্র জানলা বিহীন ছোট ঘর, ঘরের একপাশে একখানি তক্তপোষ, দড়িতে ঝোলান আছে কয়েকটা কাপড়, এক দিকে কয়েকটা থালা বাটি, অপর দিকে এক বালতী জল। একটি ছোট জল চৌকীর ওপোর কয়েকটা প্রসাধনের শিশি ও ভিমিত প্রায় একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন। ঘরে ঢোকবার সময় দরজার বাইরে চটি খুলে রেখে স্ত্রীমূর্ত্তি ঘরে প্রবেশ করে হ্যারিকেনটি উজ্জ্বল করে রাজনারায়ণবাবুর দিকে চেয়ে বল্লে, আসুন। রাজনারায়ণবাবু যন্ত্রচালিতের মত ঘরের বাইরে অন্ধকারেই জুতো খুলে ভেতরে প্রবেশ করে মেয়েটির ইঙ্গিতমত। চৌকীতে বসলেন, বসে এক দৃষ্টে তার পানে চেয়ে রইলেন। মেয়েটি দরজার হুড়কো বন্ধ করে চৌকীর কাছে এসে দাঁড়ালো।

মোটা সোটা গোলগাল বেঁটে রকমের চেহারা, বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি; প্রবীণ ভারিক্কী মুখে হাসি হাসি ভাব, মেয়েটি ধীরে ধীরে সপ্রতিভ ভঙ্গীতে রাজনারায়ণবাবুর পাশে বসে তার মুখের দিকে চুপ করে চেয়ে রইল। কোন কথা বল্লে না।

হঠাৎ যেন রাজনারায়ণবাবু তাঁর সম্বিৎ ফিরে পেলেন। তাঁর মুগ্ধ দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে কঠোরতর হয়ে এলো। একটু পরে বল্লেন—তুমি বারবণিতা?

মেয়েটি মুখ নীচু করে ধরা গলায় বল্লে, হ্যাঁ।

তোমরা ত টাকা নিয়ে দেহ বিক্রয় কর?

সে বল্লে, হ্যাঁ।

আমার কাছে আজ টাকাকড়ি কিছু নেই, আমি ভুল বুঝে এখানে এসেছিলুম। দরজা খোল, চলে যাই।

কাপড়ের আঁচলটা নাড়াচাড়া করতে করতে মেয়েটি বল্লে, কেন, এলেছেন ত যাবেন কেন?

তোমার এখানে বসতে আমি ঘৃণা বোধ করি, কঠোরভাবে কথাগুলো উচ্চারণ করে অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বল্লেন, আর তাছাড়া আজ আমার সঙ্গে টাকাকড়িও কিছু নেই।

নাই বা রইলো, আর একদিন দিবেন; তা ছাড়া আজ আপনি অসুস্থ, একটু সুস্থ হয়ে তারপর বেরুবেন।

তোমায় কে বল্লে আমি অসুস্থ।

বড় বড় চোখ দুটি মুখের দিকে তুলে মেয়েটি বল্লে, আমি জানি, আপনি অসুস্থ। একটু স্থির হয়ে বসুন।

এটা অনুরোধ কি নির্দ্দেশ, অনুনয় কি ভীতিপ্রদর্শন—অধ্যাপক তা বুঝতে পারলেন না, শীতের মধ্যেও তিনি ঘেমে উঠলেন।

মেয়েটি অধ্যাপকের মুখের দিকে চেয়ে চাপা হাসি হেসে বল্লে, উঃ, আপনি যে ঘেমে উঠেছেন। বাতাস করবো? বলে হাত বাড়িয়ে চৌকীর পাশ থেকে একখানা পাখা বার করে বাতাস করতে সুরু করলে।

অধ্যাপক তার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। আশ্চর্য্য! বহুকাল পূর্ব্বে একদিন পরীক্ষটা খারাপ হয়ে যেতে ঘর্মাক্ত অধ্যাপককে তার গৃহিণী কমলা ঠিক এই কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করেছিল—বাতাস করবো, ও তারপর রান্নাঘর থেকে তালপাতার পাখা এনে অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে এমনি বাতাস করেছিল।

কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অধ্যাপক বল্লেন—তোমার নাম কি?

চাপা গলায় বাতাস করতে করতে মেয়েটি বল্লে, আমার নাম পাকল।

তোমরা কি জাতি? পুরা নাম কি?

আমরা কায়স্থ। আমার পুরো নাম পারুল কর।

দেশ কোথায়? তুমি কি এই অঞ্চলেরই মেয়ে।

ধরা গলায় সে বলে, না, দেশ ছিল নদীয়ায়। বরাৎ খারাপ, তাই পাকচক্রে এখানে এসে পড়েছি।

বরাৎ খারাপ কেন? এখানে তোমার ভালো লাগে না? অধ্যাপকের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়।

নরক কি কারো ভালো লাগে?

হুঃ, অধ্যাপক চিন্তিতের মত প্রশ্ন করলেন, ভালো লাগে না, তবে আছ কেন?

যাব কোথায়? কে স্থান দিবে? আপনার বাড়ীতে কি আমায় স্থান দেবেন?

প্রকাণ্ড এক সামাজিক প্রশ্ন, কিন্তু অধ্যাপক পাল্টা প্রশ্ন করলেন, বল্লেন, তুমি মদ খাও?

পারুল বলে—খাই তবে স্বেচ্ছায় নয়, কেউ খেতে বাধ্য করলে।

ভালো লাগে না?

না।

সিগারেট খাও!

সেও ঐ রকম, ইচ্ছে করে না, তবে কেউ জোর করে দিলে খাই।

পান খাবে?

না, ভালো লাগে না।

তবে কি খাও?

ভাল ভাত। আর সেই ভাল ভাতের জন্যই নরকের পাঁক ঘাঁটতে হয়?

নরকের পাঁক? এটা কি তোমার মনের কথা।

মিথ্যে বলে লাভ কি?

তোমার বয়স কত?

কত বলে মনে হয়।

পঁচিশ, অধ্যাপকের মুখে দুষ্টামির ভাব।

হতে পারে।

না—না চব্বিশ।

হুরন্ত—পারুল হেসে ফেল্লে।

এমনি করেই তোমরা পুরুষের মাথা বাড়াও তাই না?

জানি না।

অধ্যাপক কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

পাখা ফেলে পারুল অধ্যাপকের হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলে, কি ভাবছেন?

অধ্যাপক শিউরে উঠলেন। একটু পরে পারুলের চোখের দিকে চেয়ে বল্লেন, 'মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি যেই পদে তপস্যার ফল, তোমার কটাক্ষাঘাতে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল'! তুমি লেখাপড়া শিখেছ?

সামান্য। পারুল অধ্যাপকের ডান হাতের আঙুল নিয়ে খেলা করতে লাগ্‌ল।

অধ্যাপক হঠাৎ সচকিত হয়ে বল্লেন, ছাড়ো খোল, বাড়ী যাব!

বাড়ী? পারুল ভাবুকের মত বলে, বাড়ী যাবেন, যান, আপনাদের বাড়ী আছে যাবেন বই কি, কিন্তু আমার বাড়ীও নেই, যাওয়ার জায়গাও নেই।

বিরক্ত হয়ে অধ্যাপক বল্লেন, নিজের হাতে বাড়ী ঘুচিয়ে দিয়ে এসেছ, এখন আর দুঃখু করে কি হবে বল?

লোকে তাই মনে করে, পারুল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, কিন্তু সে অনেক বড় ইতিহাস। আমি অবস্থার দাস, আমার কোন উপায় ছিল না।

কি রকম?

আর একদিন শুনবেন, সে এক দুঃখের কাহিনী।

না আজই বল, অধ্যাপক জেদ করলেন।

শুনবেন। একটু ভেবে পারুল বলে, না আজ থাক্। আজ আপনার মনটা খুবই খারাপ আছে দেখ্‌ছি। আবার একটা দুঃখের কাহিনী শুনলে কেন দুঃখ পাবেন, তার চেয়ে—না, আজই বল, আজই শুনতে চাই, অধ্যাপকের দুর্নিবার জেদ।

শুনবেন তবে শুনুন। একটু থেমে পারুল বলে, গান শুনবেন? বলেই গুন্ গুন্ করে গান ধরলো 'রাজার দুলাল এসেছিল মোর ঘরের সমুখ পথে, কিন্তু পরে বুঝলুম, সে রাজার দুলাল নয়, সে শয়তানের ছদ্মবেশী অসুর।

কি রকম।

নড়ে চড়ে পারুল ঠিক হয়ে বস্‌লে। হঠাৎ তুমি সম্বোধন করে বলে, আচ্ছা, তুমি ত এ লাইনের লোক নও, তবে হঠাৎ আমার ঘরে এলে কেন বল না গো?

আশ্চর্য্য, এই কণ্ঠ, এই অনুনয়, এই প্রশ্নভঙ্গী, এ একেবারে কমলার নিজস্ব। কমলা ব্যতীত অন্য কোন

নারী সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ অধ্যাপক শ্রীরাজনারায়ণ কেবলই ভাবতে লাগলেন, এটা কেমন করে হয়।

বল না, বলবে না ?

তোমাকে দেখে আমি ভুল বুঝেছিলুম, অধ্যাপক যেন স্বগত উত্তর দিলেন।

কি ভুল হয়েছিল গো, বল না, আমাকে দেখে কি ভুল হোল তোমার।

আমার স্ত্রীর কথা মনে পড়েছিল।

তিনি কোথায় ?

অধ্যাপক ওপোরে হাত দেখিয়ে বল্লেন—স্বর্গে।

আহা, দুঃখে বিগলিত হয়ে পাকুল জিজ্ঞাসা করলে, কতদিন ?

আজ পাঁচমাস হোল, সে আমায় ছেড়ে গেছে।

পাঁ-চ-মা স, পাকুল যেন অজ্ঞাতে পুনরুচ্চারণ করলে।

অধ্যাপক হঠাৎ সচকিত হয়ে বল্লে—কিন্তু পাকুল, তুমি কেন আমায় নিয়ে সময় নষ্ট করছো, আমার কাছে ত টাকা-কড়ি কিছুই পাবে না।

ম্লান হেসে পাকুল বল্লে—টাকাটাই কি সব ! মানুষের কি কোন দামই নেই। মানুষ কি টাকা ছাড়া সুখ দুঃখের দুটো কথাও কইতে পারে না ?

পারে, কিন্তু তোমার ত খরচ আছে ?

তা ত আছেই, পরে একদিন দিয়ে যাবেন।

আচ্ছা, তোমার মাসিক খরচ কত হয়।

প্রায় দেড়শ' টাকা।

দেড়'শ ? আশ্চর্য্য হয়ে অধ্যাপক কথাটা পুনরুচ্চারণ করলেন। এত কেন ?

মুখে মুখে পাকুল হিসেব দিলে। বল্লে, ঘর ভাড়া দৈনিক দু'টাকা।

অধ্যাপক বল্লেন, এই ঘর দৈনিক দু'টাকা, অর্থাৎ মাসিক ৬০ টাকা, এত কেন ?

এ পাড়ার বাড়ীতে এই রকমই ভাড়া। তাছাড়া অন্য পাড়ায় ত আমাদের রাখে না।

তারপর দরোয়ানের মাইনে দৈনিক আট আনা।

দরোয়ান কেন ?

কতরকমের লোক আসে, নিজেদের রক্ষা করার জন্য দরোয়ানের দরকার হয় ত ?

বন্দোবস্ত বেশ আছে এখানে, তাই না ?—অধ্যাপক চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করলেন।

সবই তাই,—তোমার মত একজনকেও ত পাই না।

আমার মত ? আচ্ছা পাকুল, অধ্যাপক ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেন, বল্লেন, আচ্ছা পাকুল, আমি যে বন্দোবস্ত নই, তা তুমি কি করে বলছ। আমাকে তুমি চেন কি, বল ত আমার নাম কি ?

নাম নিয়ে আমার কি দরকার ? আমি জানি, তুমি ভালো—বাস্, আর কিছুই বলতে চাই না।

তবুও অধ্যাপক প্রশ্ন করলেন—বল্লেন, আমি যে ভালো, তা তোমাকে কে বল্লে ? আমার ভালোত্বের প্রমাণ কি ?

অন্ধকারেই যাদের চব্বিশ ঘণ্টা কাটে, আলো দেখলেই তারা চমকে উঠে চিনে নেয়, তাদের কাছে সাক্ষীসাবুদ দিয়ে আলোকে প্রমাণ করাতে হয় না।

পুলকিত হয়ে অধ্যাপক বল্লেন, বাঃ, বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পার ত ? খুব নভেল পড় বুঝি ? লেখাপড়া জান ?

না।

তবে ? এমন ভাষা শিখলে কোথা থেকে ?

ঈষৎ লজ্জিত হয়ে পাকুল বললে, নভেল তৈরী হয় যে সব মানুষ নিয়ে, সেই সব মানুষই যে এ-পাড়ায় দিনরাত যাতায়াত করে। আমাদের জ্ঞান বই পড়ে নয়, আমরা শিখি মানুষের মুখ দেখে।

আনন্দিত অধ্যাপক পাকুলের হাতের ওপোর চাপ দিয়ে বললেন, যত তোমাকে দেখছি, ততই তোমাকে যেন আমার কতকালের পরিচিত বলে মনে হচ্ছে, অথচ খানিকটা আগেও তোমাকে চিনতুম না।

বিজ্ঞের মত চোখ করে পাকুল বললে, আধঘণ্টা আগে যে চিনতুম না, একথা সত্যি, কিন্তু গতজন্মে যে তুমি আমার আপনজন ছিলে না, তার কোন প্রমাণ আছে কি ? একটু থেমে বললে, হয়ত তালভঙ্গ দোষে দেবরাজের অভিশাপে আমি নরকে এসেছি, আর তুমি তোমার স্বর্গ থেকে আমাকে উদ্ধার করতে এই নরকের দরজায় এসে দেখা দিয়েছ। রাজনারায়ণবাবুকে ঠেলা দিয়ে পাকুল বললে, কি গো, বল না, তাও ত হতে পারে ?

চিন্তিতমুখে অধ্যাপক বল্‌লেন, সত্যি, তুমি যে শিক্ষিত নও, তা কে বল্‌বে ?

খিল্ খিল্ করে হেসে পারুল বল্‌লে, বল্‌ব ত, আমাদের শিক্ষা স্কুলে বই পড়ে নয়, আমাদের জ্ঞান পৃথিবীর নরলোকের পায়ের ছাপ দেখে।

সুন্দর! এমন সব কথা বলার ভাষা তোমরা পাও কোথায় ?

পারুল গুন্ গুন্ করে গান গেয়ে উত্তর দিলে, বল্‌লে,

আকাশের তারায় তারায় যে জ্ঞান আছে লুকিয়ে
দিগ্‌বলয়ের প্রান্তসীমা যে কথা যায় লিখিয়ে
সেই ত আমার ভাষা—

বুঝলে, এ ভাষা কোথায় পাই শুনলে ত ?

অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন অধ্যাপক, বল্‌লেন, এটা কার গান ?

জানি না—

বাইরে থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাক এলো—পারুল ও পারুল—

কান খাড়া করে পারুল জবাব দিলে, কি মাসি।

তোকে কে খুঁজছে রে, নেপথ্য থেকে উত্তর এল।

যাই। চট করে উঠে পারুল দরজা খুলে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল, একটু পরেই ফিরে এল। অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করলে, কে ?

একজন ক্ষুধার্ত, পারুল অধ্যাপকের গায়ের ওপোর ঝুঁকে পড়ে উত্তর দিলে, হাসি মুখে বল্লে, তোমার মত মনের মানুষ নয়, মনের ক্ষুধা নিয়ে আসে নি ; এসেছে দেহের ক্ষুধা নিয়ে, পুরানো চেনা লোক—

তাহলে ? অধ্যাপক চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করলেন।

সস্মিত মুখে পারুল বল্‌লে, এবার স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়ে আবার নরকে ফিরে যাব। এমনই আমার নিয়তি।

তাহলে উঠি।

এসো। বলেই পারুল গলায় আঁচল দিয়ে হেঁট হয়ে প্রণাম করে অধ্যাপকের পদধূলি গ্রহণ করলে।

এ কি ? এটা কি সকলেরই কাছ থেকেই নাও ?

পাগল ছাগলের স্থলে, শেয়াল কুকুরের নখে ত আর প্রণাম করা যায় না। উপযুক্ত পা পেলে তবেই পায়ের ধুলো নিই।

৪ঁ. অধ্যাপক উঠে দাঁড়ালেন। বল্লেন, তোমায় কি দেব, আমার কাছে ত একটাও পয়সা নেই। তা তুমি আমার আংটিটা নাও, বলে হাত থেকে আংটি খুলতে উদ্যত হলেন।

অধ্যাপকের হাত দুটো চেপে ধরে পারুল বল্লে, ছিঃ, একদিনেই কি আংটি দিতে আছে। ওটা কোরো না, তা ছাড়া তোমার হাতের আংটি আমার হাতে পরার মত বুকের পাটাও আমার নেই। সবাই ত টাকা দেয়, তোমার কাছে না হয় একটু ভালবাসাই পেলুম, এতেই আমার হয়ে যাবে।

অধ্যাপক নিজেকে নিয়ে বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। পারুল গায়ের কাপড় ঠিক করে নিয়ে বল্লে, পরশু এসো, কেমন, সেদিন আর কাউকে আসতে দেব না। এই ঠিক রইলো। বলেই দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লো। রাজনারায়ণবাবু কি যেন বলতে চাইলেন, কিন্তু বলার সুযোগ না পেয়ে ঘাড় হেঁট করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। যে লোকটি আসছে, পাছে সে কোন চেনা লোক হয়—এই কথা মনে হতেই রাজ্যের লজ্জা এসে অধ্যাপককে এমনই বিপর্যস্ত করে তুল্লে, যে, তিনি কোন দিকে না চেয়ে ঘাড় হেঁট করে গলি পার হয়ে সার্কুলার রোডে পড়ে হন্ হন্ করে বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিলেন।

চার

বাড়ীতে চাকর দরজা খুলে দিলে। ঘৃণিত অপরাধীর মনোভাব নিয়ে অধ্যাপক চাকরের মুখের দিকে মুখ তুলে, চাইতে পর্যন্ত পারলেন না ; নিজের ঘরে এসে খাটের ওপোর নির্জীবের ন্যায় শুয়ে পড়লেন। রাত্রের আহার শেষ করে বেরিয়ে ছিলেন, কাজেই খেয়ে কি অপর কারুর সম্মুখীন হতে হোল না, বিশেষ করে ওরা সকলেই যে যার ঘরে নিদ্রিত ছিল।

কিন্তু অধ্যাপকের নিদ্রা নেই। বৃদ্ধ বয়সে এ তাঁর কি এক নিদারুণ উপসর্গ। শেষে কিনা খোলার বাড়ীতে এক বারবণিতার গৃহে—এ কি অধঃপতন !

মনে হওয়া মাত্রই শরীর ঘিন্ ঘিন্ করতে লাগলো। উঠেই বাথরুমে গেলেন। শীতের মধ্যেও গায়ে মাথায় জল ঢাললেন। কাপড় জামা সমস্ত ছেড়ে কাচা কাপড় পরে ঘরে ফিরে এলেন। বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনে

হোল, সর্বনাশ, কাল সকালে কলঘরে পরিত্যক্ত কাপড় জামা দেখে যদি কেউ কিছু মনে করে। আবার উঠলেন। আবার কলঘরে। স্বহস্তে নিঃশেষে সমস্ত খেচে ভাবলেন, ভুল করেছি, রাতের মধ্যে এগুলো শুকোবে কি করে, তার চেয়ে এগুলো সব ধোপার বাড়ীর বাণ্ডিলে দিয়ে দিলে কেউ কিছু সন্দেহ করতে পারতো না, কিন্তু সব যে ভেজানো হয়ে গেছে, তাহলে—

অধ্যাপকের কান্না এসে গেছে। এখন করি কি? মনে মনে ভীষণ রাগ হোল। চুলোয় যাক্, সবাই জানুক, আমি কি, সবাই জানুক, আমি চরিত্রহীন, রাত্রে বেশ্যাবাড়ী গিয়েছিলুম। ঘিক আমার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাড়িয়ে, ছেলে মেয়েরা আমার দিকথেকে মুখ ফিরিয়ে নিক। সেই হচ্ছে আমার উপযুক্ত শাস্তি। জানুক, জানুক, সবাই জানুক। কিন্তু না, এক কাজ করা যাক্। জামা কাপড় ঘরে শুকুতে দিয়ে পাখাটা পুরো দমে খুলে পাশে পড়ার ঘরে গিয়ে বই পড়ে রাত কাটিয়ে দিই। সারা রাত্রে এগুলো শুকিয়ে যাবে। যেমন চিন্তা, তেমনই কাজ, পাখা খুলে কাপড় জামা শুকুতে দিয়ে পড়ার ঘরের শোফায় গিয়ে কম্বলমুড়ি দিয়ে বসলেন। আলো জ্বালতে ভয় হোল, কি জানি, যদি কেউ কিছু মনে করে, অন্ধকারে কম্বল চাপা দিয়ে সোফার ওপোর চুপ করে বসে রইলেন।

ভোর চারটে নাগাদ উঠে দেখলেন—কাপড়-জামা শুকিয়ে এসেছে। সেগুলো তুলে আলনায় যেভাবে থাকে সেই ভাবে রাখতে গিয়ে দেখলেন, ওগুলোর ইস্ত্রী একেবারে নেই। সকাল হলেই মেয়ে এসে এগুলোর হাত দিয়ে কি মনে করবে। তাইত, কি করা যায়। অনেক ভেবে সেই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা জামা-কাপড় পরে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। যেন রাত্রে এত ঘুম পেয়েছিল যে, জামা-কাপড় ছাড়তে আর সময় পান নি এবং পরে বিছানায় শোওয়ার জন্য ওগুলোর ভাঁজ নষ্ট হয়ে গেছে। ঠিক! এই অভিনয়েই আত্মরক্ষার পক্ষে সর্বোত্তম।

সারাদিন নিদারুণ অস্বস্তির মধ্য দিয়ে কাটলো। কলেজে কেমন যেন অন্যমনা ভাব, অন্য অধ্যাপকদের সঙ্গে ভালো করে কথা কইতেও পারলেন না। ক্লাসে ঢুকে মনে হচ্ছে, কোন ছাত্র দেখেনি ত! ছেলেবেলায় প্রথম সিগারেট খেয়ে বাড়ী ফেরার সময় ঠিক এই রকম ভয় ভয় করেছিল। সে কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে, কিন্তু সে এক কথা। আর এটা কি, ছিঃ।

পরের দিন কেবলই মনে হতে লাগল, আজই ত পারুলের পরশু। যাব কি? ছি ছি, একি এক চিন্তা। কিন্তু না, তাকে সে টাকা দেওয়া হয়নি! ঋণী থাকবো কি? আচ্ছা তাকে পাঠিয়ে দিলে হয় না? কিন্তু ঠিকানা ত জানি না। কোন লোক দিয়ে—কি সর্বনাশ, কাকে বলবো, পারুলকে এই টাকা ক'টা দিয়ে এসো, সে কি মনে করবে! শেষে ঠিক করলেন—থাক্ সে থাক্, পৃথিবীতে অনেকের কাছেই ত ঋণী হয়ে গিয়েছি, এর ঋণও না হয় থাকবে, যাব না, যাব না, যাব না।

সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। কি জানি কেন, তাড়াতাড়ি খেতে বসলেন। মেয়ে বললে, বাবা কি খেয়ে-দেয়ে বেরুবেন নাকি?

অন্যমনস্কভাবে অধ্যাপক উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, কাজ আছে। সামলে নিয়ে কের বললেন, মানে এক জায়গায় যাব। মেয়ে আর কিছুই বললেনা। অধ্যাপকের ভয় হোল, কি জানি, মেয়ে কি জানতে পেরেছে, সে ত কই জিজ্ঞাসা করলে না যে, কোথায় যাবে!

আহারাদির পর নিজের ঘরে ঢুকে জামা-কাপড় পরে দেখলেন, দরজার কাছে কেউ আছে কিনা। কাউকে থাকতে না দেখে চট্ করে সন্তর্পণে একটা দশ টাকার নোট বাক্স থেকে বার করে পকেটে পুরে নিলেন। নিয়েই ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে আবার ঘরে ঢুকে ধাঁ করে একবার চিরুণী দিয়ে মাথাটা আচ্ড়ে নিলেন, তারপর বেরুতে গিয়ে আবার কি মনে করে আর একবার বাক্স খুলে আরও দুটো পাঁচ টাকার নোট নিয়ে পকেটে পুরলেন। তারপর চোরের মত পা টিপে টিপে সদর দরজা পার হয়ে রাস্তায় বেরুলেন।

সার্কুলার রোডের মোড়ে গিয়ে ভাবলেন, নাঃ যাব না। এমনিই এদিক ওদিক ঘুরে চলে যাই। কিন্তু পায়ে পায়ে যথাস্থানে পৌঁছেই দূর থেকে দেখলেন—আরও দু' তিনটি মেয়ের সঙ্গে এক সঙ্গে বসে আছে পারুল। সর্বনাশ, দু' তিনজনের চোখের সামনে দিয়ে কেমন করে যাব! অপর দিকের ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তাদেরটা অতিক্রম করে এগিয়ে গেলেন। খানিক ঘুরেই আবার পূর্বস্থানে

এসে গেলেন। আজ ঠাণ্ডাটা কম, হাওয়া একেবারেই নেই, কুয়াশা আর ধোঁয়ার বেশ একটু অন্ধকার-অন্ধকার ভাব। কাছাকাছি আসতেই পারুল হাসি মুখে উঠে দাঁড়ালো, দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে অধ্যাপক দ্রুতপদে গলির মধ্যে প্রবেশ করলেন। পেছনে পেছনে পারুল গলির মধ্যে ঢুকেই বললে—আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলুম। কি ভাগ্যি যে, আমাকে ভুলে যান নি।

অধ্যাপক নির্ব্বাকভাবে পারুলের ঘরে ঢুকেই বললেন—সেদিনের টাকাটা দাও, আমি আর বসবো না। এবার চলি—বলেই পকেট থেকে কুড়িটা টাকা বার করে পারুলের বিছানার ওপর ফেলে দিলেন।

নোট তিনখানা তুলে নিয়ে পারুল যেন অবাক হয়ে রাজনারায়ণবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইল। শেষে গম্ভীরভাবে বললে, বোসো, কথা আছে।

কি? অধ্যাপক তখনও দাঁড়িয়ে।

বোসো বলছি, পারুলের কণ্ঠস্বরে আদেশের ভঙ্গী।

অধ্যাপক আদেশ পালন করলেন। বসে বললেন—বল।

পারুল তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, তুমি জানো না, রাস্তার ধারে যারা দাঁড়ায়, তাদের পক্ষে চার-পাঁচ টাকাই যথেষ্ট, অনেকে দু'তিন টাকার বেশী দেখই না, তুমি আমায় এত টাকা দিলে কেন?

আমার খুশী, অধ্যাপক উত্তর দিলেন।

না, এভাবে টাকা নষ্ট করতে তুমি পারবে না। পাঁচ টাকার বেশী আমি নেব না, বলে পারুল পনের টাকা অধ্যাপকের দিকে এগিয়ে ধরল।

অবাক হয়ে অধ্যাপক পারুলের মুখের দিকে চেয়ে রইল। পারুল আর দ্বিরুক্তি না করে পনরটা টাকা অধ্যাপকের বুক পকেটে গুঁজে নিয়ে ঘাড় হেঁট করে ধীরে ধীরে বললে, তোমার কাছ থেকে টাকা নেওয়াই অন্যায়। কিন্তু কি করবো, খরচ ত চাই, তাই এই পাঁচটা টাকা নিলুম, নইলে—

তোমরা যার যা পাও নিয়ে নাও না?

পারুল বললে—নিই, বন্ধুদের কাছ থেকে, কিন্তু আপন জনের সঙ্গে টাকার সম্বন্ধ রাখি না।

আমি তোমার আপন জন! কি বলছ তুমি, আমি তোমায় ঘৃণা করি। সেদিন তোমার ঘর থেকে বাড়ী ফিরে স্নান করেছি, তা জান?

তা ত করবেই। কোন ভাল লোকই এ ঘর থেকে বাড়ী ফিরে স্নান না করে থাকতে পারে না। এ যে নরক!

আশ্চর্য্য, তুমি কি জ্ঞানপাপী? যদি নরক ত এখানে আছ কেন?

বলেছি ত, আমি নিরুপায়। একটু থেমে বললে—যাও না, এমন একটা কাজ দেখে যাও, যাতে ভদ্রভাবে ভাত-কাপড় জোটাতে পারি।

একি তোমার মনের কথা?

হনুমানের মত বুক চিরে দেখাতে পারতুম যদি, তাহলে দেখতে পেতে এ কথা সত্যি কি না! চল, তোমার বাড়ীতে আমাকে নিয়ে চল। আমি নিরাশ্রয়, তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি।

আশ্রয়প্রার্থিনীর কাতর অনুনয়ে অধ্যাপক ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁকে চিন্তিত দেখে পারুল তার হাতটা ধরে সকরুণভাবে বললে—পতিতকে উদ্ধার করবে না, তবে তোমার মাহাত্ম্য কোথায়?

অধ্যাপক আপন মনেই স্বগত-উক্তি করলেন। বললেন,

"দেবতারে যোর কেহ ত চাহে নি
সবে নিয়ে গেছে মাটির ঢেলা"

তোমার অন্তরের দেবতাকে কেউ চিনতে পারে নি, তাই না পারুল?

অন্তর্যামী না হলে অন্তর চিনতে পারে গো!

এ রকম প্রার্থনা অনেকের কাছেই করেছ কি?

না, কারুর কাছেই করি নি। বিশ্বাস কর, মানুষ না হলে কি প্রার্থনা করা যায়। কল্পতরুর কাছে প্রার্থনা করা চলে। শেওড়া গাছের কাছে কেউ প্রার্থনা করে না।

তুমি মানুষ চেন?

বলেছি ত চিনি। তোমার মত কোন মানুষই আমার কাছে আসে নি।

কিন্তু তুমি যে এই সব ছেড়ে যাবে, পারবে এর মোহ কাটিয়ে থাকতে?

পারবো, খুব পারবো, নিশ্চয়ই পারব। আমি এই নরক থেকে পরিত্রাণ পেতে চাই।

অধ্যাপক গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন, বলেন, আচ্ছা

হঠাৎ এতদিন পরে তোমার একথা মনে হচ্ছে কেন বল ত? এতদিন ত এইখানেই বেশ ছিলে।

কি জানি কেন, তোমাকে দেখে অবধি মনে হচ্ছে, যেন তোমার জন্যই আমি এতদিন অপেক্ষা করছিলুম। আমি পতিতা, কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি যেন তোমারই প্রতীক্ষায় এতদিন ঘরে অশোক বনে চেড়ীদের নির্যাতন সহ্য করে পড়ে আছি। তুমি আসবে বলেই আমি এতকাল ধরে ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকি।

কিন্তু আমি তোমায় কি করে নিয়ে যাব বাড়ীতে? সেখানে আমার ছেলে মেয়ে সব রয়েছে যে।

বাড়ীতে না হয়, অন্য বাড়ীতে নিয়ে চল। ভাল ভাত খাওয়াতে পারবে না।

তা হয় তো পারি,অধ্যাপক চিন্তিত মুখে উত্তর দিলেন।

তবে? তবে তাই নিয়ে চল। আমি আর এখানে থাকতে পারবো না।

অধ্যাপক উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আজ আর থাকতে পারছি না, আজ যাই।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পারুল বললে, আচ্ছা, কিন্তু মনে রাখবেন, ভুলবেন না যেন। তারপর পারুল দরজা খুলে বললে—আবার কবে দেখা পাব?

দেখি, কবে আসি।

পারুল বললে, সোমবার আসবেন, কেমন?

দেখি, অধ্যাপক ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। বাইরের হাওয়ায় আসতেই পারুল দ্রুত বেরিয়ে এসে বললে—একটু দাঁড়াও।

অধ্যাপক ফিরে দাঁড়াতেই পারুল গলায় কাপড় দিয়ে হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে চাপা গলায় বললে, সোমবার মনে থাকবে? অধ্যাপক কোন কথা না বলে এগিয়ে পড়লেন, কারণ একটু দূরেই অন্ধকারে কাকে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

গলির অন্ধকারে অধ্যাপক অদৃশ্য হতেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তি খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠে বললে, কিরে পারুলী, অত ভক্তি করে নমস্কার করলি কাকে রে? বলি গুরু কেড়েছিস্ না কি?

সমানে হেসে উঠে পারুল বললে—এক বউ-মরা পাগল-বাবু পেয়েছি ভাই! বড্ড মজার লোক।

কি রকম?

পরে বলবো।

কি? ব্যাপার কি, বল্ না রে, মেয়েটি পারুলের খুব কাছে এসে দাঁড়ালো।

ঘরে ঢুকে হ্যারিকেনটা কমিয়ে বিছানাটা ঝেড়ে পারুল ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় তুলুপ লাগাতে লাগাতে বলে, বেশ পয়সা আছে, বয়সও বেশী, দেখি, যদি বাঁধা হয়ে থাকতে পারি।

তোর যেমন কথা, বন্ধনে যাবি কেন রে, বরঞ্চ যা পারিস্ বাগিয়ে নে।

বয়স বাড়ছে রে গৌরী, বয়স বাড়ছে। দু'দশ টাকা বাগিয়ে নিয়ে কি হবে? তার চেয়ে শেষ জীবনের একটা ব্যবস্থা হলে—

দূর, মোটামুটি কিছু দেয় কি?

গলা নীচু করে পারুল বললে, আজ একটা নতুন চাল চেলে দিয়েছি। বাবু দিলে কুড়ি টাকা, আমি পাঁচ টাকা নিয়ে পনর টাকা ফেরৎ দিলুম। বাবুটা একেবারে অবাক্।

বলিস্ কিরে, সব্‌লগ্ পনের টাকা ছেড়ে দিলি? ভালো করলি কি?

দেখাই যাক্ না, এই পনর টাকার বদলে অনেক পনের আসবে বলেই ত মনে করি। লোকটা একটু পাগলাটে গোছের। মনে হয় এ লাইনে প্রথম।

দেখ্, যদি খেলিয়ে তুলতে পারিস্। এর পর গলি দিয়ে দুজনেই রাস্তায় দাঁড়ানোর জন্য বেরিয়ে গেল।

পাঁচ

গ্যাসের তলায় মোটর গ্যারেজের পাশে ছোট্ট একফালি বাঁধানো রোয়াক, সকালের দিকে সেই রোয়াকে একটা বুড়ো আলু ও পিঁয়াজ বিক্রী করে, ভাড়া দেয় দৈনিক চার আনা; দুপুরে গ্যারেজের কারিগররা অবসর সময়ে সেই রোয়াকে বসে বিনা ভাড়ায় বিড়ি ফোঁকে, আর সন্ধ্যের পর পারুল ও তারই মত আরও চার পাঁচটি মেয়ে খদ্দেরের আশায় বসে, এদেরও ভাড়া দিতে হয় মাথা পিছু দৈনিক তিন আনা করে, ভাড়া না দিলে রোয়াকের মালিক সেখানে কাউকে বসতে এমন কি দাঁড়াতেও দেয় না। পাঁচজনের কাছ থেকে পনর আনা ভাড়া নেয় সে।

সোমবার রাত্রি আটটার সময় সেই রোয়াকে বসে আছে পারুল, গৌরী, কৃষ্ণা, সুন্দরী আর পাগলী। এদের মধ্যে পাগলী ও কৃষ্ণা এরা দুজনে ছিল ভালো ঘরের মেয়ে, ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছিল আট দশ বছর আগে, তারপর স্রোতে ভাসতে ভাসতে নানা আবর্তের মধ্য দিয়ে এই রোয়াকে এসে হাজির হয়েছে. আর বাকী তিন-জন একেবারে জাতকাঠ অর্থাৎ তিন পুরুষে কুলীন। এরা এই অঞ্চলেই জন্মেছে এবং শৈশব পার হওয়ার পূর্ব থেকেই দেহের পসরা নিয়ে কিরি করতে সুরু করেছে। অবশ্য মুখ ফুটে কেউই সেকথা স্বীকার করে না, সকলেই বলে যে তারা ভদ্রঘরের মেয়ে, যে-কথা পারুলও বলেছে রাজনারায়ণবাবুর কাছে।

হঠাৎ বড় রাস্তায় দেখা গেল রাজনারায়ণবাবু এক ছোকরার সঙ্গে কথা কইতে কইতে আসছেন। পারুলের পায়ে একটা খোঁচা মেরে গৌরী বললে, তোর বউ-মরা-বাবু আসছে রে।

দেখেছি, পারুল চাপা গলায় বললে।

কিন্তু সঙ্গে আবার কে একটা মড়া আসছে আজ, গৌরী টিপ্পনী কাটলে।

হয়ত রাস্তায় জুটে গেছে, পারুল বললে, এখন দেখিস্, ঢুকবে না।

সত্যই তাই। একটা বাস্ আসছিল। রাজনারায়ণ-বাবু বাসে উঠে রওনা দিলেন। যাওয়ার সময় একবার রোয়াকের দিকে চেয়ে দেখে গেলেন।

পাগলী পারুলের অপর পাশে বসেছিল। উৎসুক স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, কে রে পারুল?

উত্তর দিলে গৌরী, বললে, পারুল এবার শাঁসালো বুড়ো ধরেছে। আমাদের দল ছেড়ে বাঁধা হয়ে চলে যাবে।

নিঃশ্বাস ফেলে পাগলী বললে, বাঁধাবাবুতে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। বাড়ী থেকে বার করার সময় কত কথাই বলে, "তারপর দুদিনের খেলা দুদিনে ফুরায় দীপ নিতে যায় আধারে।"

পারুল বললে, আমার বয়ে গেছে। না পোষায় আবার এই রোয়াকে ফিরে আসব।

কৃষ্ণা বললে, তাহলে ত ভালো, কিন্তু যদি রঙ্ ধরে যায়। কেঁদে কেঁদে চোখ অন্ধ হয়ে যাবে।

আমরা তোর মত ছিঁচ্‌কাঁদুনী নই, না পোষায় আবার চলে আসবো।

তবে যাচ্ছিস্ কেন, বেশ ত আছিস্।

বয়স বাড়ছে রে, বয়স বাড়ছে, সেদিকে খেয়াল আছে কি? পারুল বললে।

ও, সেই গান শোনার পর থেকে তুই দেখছি খুব ঘাবড়ে গেছিস্। তা ও আর নতুন কথা কি? ঐ যে আমাদের কি হয়েছে, এক সময়ে ওর কত সুখ ছিল তা ত শুনেছিস।

সুন্দরী বললে, দূর দূর, ও সব ওর মিথ্যে কথা। ঐ ত চেহারা, ওকে নাকি বাবুদের ঝিনচারখানা ফিটন এসে কাড়াকাড়ি করে নিয়ে যেত। আমি ত তাই শুনে হেসেই মরি।

কাড়াকাড়ি না করুক, ওর ভারী ভারী গয়না ছিল। সে ত আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। রোগের জ্বালায় সেগুলো সব গেল, তা কি হবে বল—পারুল কথাগুলো বললে।

ওঃ ভারী ত! সেকালের আমোলে সস্তার সোনা, ভারী ভারী গয়না গড়িয়েছিল। হোক একালের একশ টাকা ভরির সোনা, ত দেখতুম।

তা সে যাক্, তোর বুড়োবাবুত এখনও এলনা।

আসবে আসবে, যাবে কোথায়, পারুল বললে।

গৌরী বললে, হাঁরে, তোর ব্যাঙ্কের বাবু মেয়ে উঠেছে?

কে জানে, সেরেছে কি মরেছে, পারুলের কণ্ঠস্বরে একরাশ অবজ্ঞা। ব্যাঙ্কের বাবু সম্বন্ধে পারুল যেটুকু জানে সেটুকু কাউকেই বলতে সাহস পায় না।

বলিস্ কি রে, তার জন্যে পাঁচের কড়ি খরচ করে ফল নিয়ে হালপাতালে ছুটোছুটি করলি, আর শেষে কিনা কোন খবরও রাখিস্ না।

ওসবগুলো করতে হয় রে, আর তা ছাড়া নার্সিংয়েও ত আরাম আছে, পারুল বললে।

কৃষ্ণা বললে, পারুলের বাক্যোত্থান দেখা সত্যিই সার্থক। দেখ্ না, বুড়ো হয়ে গেল কিন্তু এখনও ভালো ভালো বাবুরা সব পারুল পারুল করে অজ্ঞান।

পারুল বললে, দেখ্, বুড়ো বুড়ো করিস নি বলছি।

গৌরী বল্‌লে, যা যা পারুলী, রাগ করিস নি, তোর বুড়ো বাবুর গল্প বল শুনি।

যাঃ।

পারুল একটু চুপ করে থেকে বল্‌লে, সত্যি, শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা এত বোকা যে বড়ই হাসি পায়। মড়াদের যা বল, তাই বিশ্বাস করে।

সত্যি ভাই, আমার কাছে—

একটা ট্রাম থেকে টপ্ করে নেমে পড়লেন অধ্যাপক। এদিক ওদিক চেয়ে সোজা গলির পথে এসে ভেতরে ঢুকলেন। পারুল উঠে পেছন পেছন গেল।

সুন্দরী মনে মনে হাস্‌লে, ভাবলে পারুল বেশ আছে। বড় বড় বোলচাল দিয়ে বেশ আধুনিকাটি সেজে থাকে, আর বায়োস্কোপের শোনা ভালো ভালো কথা গুছিয়ে বলে শিক্ষিতবাবুদের কেমন ঘায়েল করে। মনের দিকে হয়েও কেমন ভদ্র সেজে থাকে, সত্যি দেখবার মত।

ঘরে ঢুকেই অধ্যাপক পারুলের দুটো কাঁধ ধরে তার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন,

আর কতদূর নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী,
বল কোন পারে ভিড়িবে তোমার
পাপের তরী।

বল্‌তে পার, তুমি আমায় কোথায় নামিয়ে আনবে?

অবাক্ হয়ে পারুল তার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে, আমি তোমায় নামিয়ে আন্‌ব? ছিঃ, এ কথা বোলো না, তুমি আমায় টেনে তুল্‌বে, এই কথাই ছিল। বলেই দরজা বন্ধ করে অধ্যাপকের পাশে খুব নিবিড় হয়ে বস্‌লে এবং তার হাতখানা টেনে নিয়ে বল্‌লে, কেন গো, আজ একথা বল্‌ছো কেন?

অধ্যাপক বল্‌লেন, প্রথম যখন এসেছিলুম তখন এক ছাত্রের সঙ্গে দেখা হোল, মান বাঁচাবার জন্য তাড়াতাড়ি বাসে উঠে পড়লুম, তারপর খানিক দূরে গিয়ে আবার ট্রামে করে ফিরে এলুম।

উঃ, তাই বলো, আমার মনটা এত খারাপ হয়ে গেল, ভাবলুম বুঝি আমায় ভুলে গেলে। আচ্ছা, আমার চোখটা একটু ভারী ভারী দেখাচ্ছে, নয়?

অধ্যাপক চোখে হাত বুলিয়ে বল্‌লেন, কই না ত, কেন, চোখ ভারী হবে কেন?

পারুল ঘাড় হেঁট করে বল্‌লে, তুমি চলে যেতে আমার চোখ কেটে এমন জল এলো—ভাবলুম বুঝি ভুল করেছি, স্বর্গ কখনও নরকের কাছে থাকে! অন্য মেয়েরা বল্‌লে, কাঁদছিস্ কেন, কাঁদছিস্ কেন? তা আমি বল্লুম—না, চোখে কি পড়েছে, বলেই পারুল হেসে উঠলো।

অধ্যাপক বল্‌লেন—সর্বনাশ, অন্য মেয়েরা আমাকে চেনে নাকি?

নাঃ, তোমায় কেউ চেনে না, তোমার কোন কথাও হয়নি। কিন্তু এই এতক্ষণ যে আমার কি ভাবে কাটল, তা আর কি বলব? তা হাঁগা, ও ছেলেটি তোমার কে হয়?

ও আমার এক পুরাতন ছাত্র। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

তুমি বুঝি মাষ্টার, মানে কলেজের প্রফেসার বুঝি?

সন্দিগ্ধভাবে অধ্যাপক বল্‌লেন, কে বল্‌লে তোমাকে যে, আমি প্রোফেসার।

গদ্‌গদ্‌চিত্তে অধ্যাপকের বুকে মুখ লুকিয়ে পারুল বল্লে—বলেনি কেউ, কিন্তু যাকে ভালবাসা যায়, তার সম্বন্ধে কি কোন কথা অজানা থাকে গো? মন যে অন্তর্যামী, সেই সব খবর শুনিয়ে দিয়ে যায়।

পারুলের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে অধ্যাপক বল্‌লেন, সত্যি পারুল এত কথা তুমি কোথা থেকে শিখলে বল ত? এত জ্ঞান তোমার কি করে হোল।

বুকে মুখ রেখেই পারুল বল্লে বল্লুম ত, তোমরা বিদ্যাকে ভালবাস। তাই বিদ্যার কাছ থেকে সব জ্ঞান পাও। আর আমি তোমাকে ভালবাসি, তাই তোমার সব জ্ঞান ধীরে ধীরে আমার মধ্যে জেগে ওঠে। তোমার আলোতেই আমি আলোময়ী হয়ে উঠছি, এটা তুমি শিক্ষিত হয়েও বুঝতে পার না?

অধ্যাপক অনেকক্ষণ পারুলের মাথায় হাত বুলিয়ে বল্‌লেন, দেখ পারুল তোমার ঘরে আস্‌তে আমার মোটে ইচ্ছে হয়না। অথচ যে দিনটিতে তুমি আসতে বল, সেদিন না এলেও থাকতে পারি না কেন বল ত? তুমি আমার কে?

একটু চুপ করে থেকে পারুল বলে, আমি তোমার ছায়া! অন্ধকার রাত্রে একা পথ চলবার সময় ছায়া দেখে অনেক সময় ভয়ও হয়। কিন্তু তবুও ত ছায়াকে বাদ দেওয়া যায় না।

সত্যি, চমৎকার কথাই বলেছ। ছায়াকে বাদ দেওয়া যায় না। তবে একেবারে আলোর ঠিক তলায় এসে দাঁড়ালে ছায়া কায়ার সঙ্গে মিলে-মিশে এক হয়ে যায়।

তাহলে মিলিয়ে নাও, আমাকে উদ্ধার কর।

ভেবে চিন্তে তাই ঠিক করলুম। তোমাকে আমার বাড়ীতেই নিয়ে যাব। তোমার এই-জীবন সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে আমার বাড়ীতে আমার ছেলেমেয়ের পিসি হয়ে থাকবে তুমি, কিম্বা যদি মাসী হয়ে থাকতে চাও,—বলেই অধ্যাপক দুষ্টামীর হাসি হাসতে লাগলেন। বললেন, কি হতে চাও, পিসী না মাসী।

তুমি যা চাও, আমি তাই হব, ছায়ার কি নিজের কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকে গো।

চমৎকার! এই জন্যেই তোমাকে এত ভালবাসি। না—না তোমাকে এত ভালবেসেছি কেন জানো, তুমি আমার কমলার মত বলে। চেহারার এত সাদৃশ্য যে দু'জন মানুষের মধ্যে থাকতে পারে, তা আমি আগে জানতুম না। এমন কি মাঝে মাঝে মনে হয়, তুমি বুঝি সেই। বিধাতার অভিশাপে স্থানচ্যুত হয়ে এইখানে এসেছ, এবং আমি আবার তোমায় তোমার পুরাতন জায়গায় নিয়ে যাব।

মুখ তুলে পারুল অধ্যাপকের দিকে চেয়ে বললে, আমার কমলাদিদিকে তুমি বুঝি খুব ভালবাসতে?

জানতুম না, অধ্যাপক জবাব দিলেন। 'জীবনে যারে তুমি দিলে না ফুল, মরণে তারে তুমি দিতে এলে মালা', আমার হয়েছে সেই অবস্থা। তাকে আমি বোধ হয় যেন ভালবাসি নি, কিন্তু তোমার চালচলন ভাব-ভঙ্গী তার মতন বলেই বোধ হয় প্রথম দিন থেকেই তোমাকে আমার এত ভাল লাগছে।

আচ্ছা, বিয়ের পর থেকে আমার দিদির সঙ্গে তোমার বোধ হয় কখনও ছাড়াছাড়ি হয় নি।

না, পাড়াতেই আমার শ্বশুর বাড়ী ছিল, আর আমিও চিরকাল কলকাতাতেই আছি, কাজেই বিচ্ছেদ বলে কোন জিনিষ এতদিন জানতুম না, কেবল এই পাঁচ মাস সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

দু হাত দিয়ে অধ্যাপককে জড়িয়ে ধরে পারুল বললে, পাঁচ মাস পরে আবার যে সে ফিরে এসেছে, তা কি দেখতে পাচ্ছ না, বলেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে অধ্যাপকের কোলে মুখ লুকালে।

অধ্যাপক নীরবে পারুলের মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন, তাঁর চোখেও জল এসে গিয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করলেন, কবে যাবে?

যেদিন বলবে।

বাড়ীতে গিয়ে থাকতে পারবে? এতদিনের এই অভ্যাস ছাড়তে কষ্ট হবে না?

না, তোমার কাছে থাকতে পেলে কোন কষ্টই হবে না।

আমার ছেলেমেয়েদের নিজের ছেলেমেয়ে করে নিতে পারবে?

তারা ত আমারই ছেলে মেয়ে।

বাঃ বেশ। সংসার মাথায় করে রাখতে পারবে ত? কষ্ট হবে না?

পারবো, এ মাথায় হাত দিয়ে তুমি যে এটা তোমারই মাথা করে নিয়েছ, এ ত আর আমার নয়।

সুন্দর! ওঃ, কমলা তুমি আবার ফিরে এলে বটে কিন্তু আগের চেয়েও অনেক বেশী বুদ্ধিমতী হয়ে ফিরে এসেছ। আমি ভাগ্যবান। কিন্তু কি পরিচয়ে আমার বাড়ীতে গিয়ে থাকবে তুমি?

তুমি বলে যাও।

শোন, কি পরিচয়ে যাবে, তা আমি ভেবে রেখেছি। মনে কর তুমি একজন বিধবা—

না না বিধবা নয়—তাহলে মাছ খেতে পাবে না, মনে কর তোমার স্বামী তোমাকে নেয় না, সে আবার বিয়ে করে তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। তুমি সামান্য সেলাই বা গান জানো। আমি যেন তোমাকে একটা স্কুলে চাকরী করে দিয়েছিলুম। সেইখানে তুমি কাজ করতে ও স্কুলের মেসে থাকতে। সেখান থেকে হঠাৎ চাকরী গেছে, এখন তুমি নিরাশ্রয় এবং কিছুদিন আমার বাড়ীতে থাকার জন্য যাচ্ছ। তারপর কিছুদিন থাকতে থাকতে তুমি এমন হয়ে

যাবে যে আর কেউ তোমাকে পর বলে মনেই করবে না।

কিন্তু পরে যদি তোমার ছেলেরা আমাকে তাড়িয়ে দেয়, তাহলে—

বাধা দিয়ে অধ্যাপক বললেন, সে ব্যবস্থা আমি অবশ্যই করবো, তুমি যাতে যাবজ্জীবন সুখে থাওয়া থাক পাও, সেরকম লেখাপড়া করে তোমার পাকা বন্দোবস্ত আমি নিশ্চয়ই করবো।

পরম তৃপ্তিতে অধ্যাপকের কোলের ওপোর মাথা রেখে পাকল যেন ঘুমিয়ে পড়লো। অধ্যাপক তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কমলার কথা স্মরণ করতে লাগলেন।

ছয়

দুপুরে পাকল গিয়ে বসলো তার বাড়ীউলী মাসিমার ঘরে। মাসিমা বললে, কিরে পাকলী, কি খবর?

পাকল বললে, ভালো খবর মাসিমা, কেমন আছ তুমি?

মাসিমা বললে—ভালো, তারপর মাসিমা পাকলের মুখের দিকে চেয়ে বললে, কিছু চাই নাকি?

পাকল বললে, দাও, কিন্তু পরক্ষণেই বললে না, এখন থাক্। অর্থাৎ মাসিমার কাছে সস্তায় চোলাই করা বে-আইনী মাল সব সময়ই পাওয়া যায়।

বৃদ্ধা সন্দেহের দৃষ্টি দিয়ে বললে—ব্যাপার কি বল্ ত? কি বলবি বল্ না।

পাকল বললে, মাসিমা, এক বাবু বাঁধা রাখতে চায়। কি করবো বল ত?

মাসিমা শুয়েছিল। একটু উঁচু হয়ে বালিসে ঠেস দিয়ে বললে, কি রকম বাবু? কত মাইনে দেবে, কতদিনের জন্যে, কিছু আন্দাজ করতে পারছিস্।

হাসতে হাসতে পাকল বললে, বিনা মাইনের যাবজ্জীবন।

তবেই মরেছিস্, মাসিমা বললে, লোকটার বয়স কত?

পঞ্চাশ বাহান্ন হবে।

বউ মরেছে বুঝি? বউকে বোধ হয় তোর মত দেখতে ছিল?

ঠিক ধরেছ মাসিমা, একেবারে ঠিক। কি করে বুঝলে?

বুঝবো আর কি করে—দেখে দেখে চক্ষু হয়ে গেলুম। পঞ্চাশে বউ মরা আর অবেলায় গুমাড়ানো এক জিনিষ। গা ঘিন্ ঘিন্ করে, অথচ ভূত দিয়ে চাষ করাও যায় না, তাই গঙ্গাজল পরশ করতে এই সব বাড়ীতে আসে।

পাকল হাসতে লাগল। মাসিমা বললে, না বাপু, আমি ওসব ভালো বুঝি না। বাহান্ন বছরের বুড়ো লোক, ছমাসেই নেশা ছুটবে, তখন ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাবে। ওদের কাছে মোটা মাইনে নিয়ে যেতে চাস্ যা, যাবজ্জীবন-টিবন বাজে কথা।

আঁচলে আঁচল জড়াতে জড়াতে পাকল বললে—না মাসিমা, বলছে সম্পত্তির এমন লেখাপড়া করবো যে, সারা জীবনের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

তাই নাকি? তাহলে আমাদের উকীলবাবুকে দিয়ে সব কাজ পাকা করে তবে যাবি, তার আগে নয়, আর আমার নমস্কারীটাও ঠিক করে নিবি, বুঝলি।

তিনি খুব ভদ্দর লোক, ওসবে কি রাজী হবেন?

মাসিমা বলে উঠলো। বললে—ভদ্দরলোক বলে কি একজনের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন? আমরা যে এতদিন তোকে রাখলুম, তার কি কোন দামই নেই।

পাকল হাসতে হাসতে বললে, তা তিনি করবেন না, আমি মানুষ চিনি।

কাঁপতে কাঁপতে মাসিমা উঠে বসলো। বললে, রং ধরিয়েছিস বুঝি? তবে যা মরগে যা, কিন্তু পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে তবে এখান থেকে যেবি। আর ছমাস পরে শুধু হাতে চোখের জল ফেলতে ফেলতে যদি এমুখো হবি, তাহলে ঝেংরে তাড়িয়ে দেব, তা জেনে রাখিস্।

কাকে ঝেংরে তাড়াবে মাসিমা, পান চিবুতে চিবুতে গৌরী এসে দরজার কাছে দাঁড়ালো। মাসিমা বললে, শোন না, এই পাকলীর কথা, এক বুড়োর সঙ্গে রং ধরিয়ে এসেছেন, যাবজ্জীবন বিনা মাইনের বাঁধা থাকবেন।

গৌরী হাসতে লাগল। বললে, আমি জানতুম।

জানতিস্? কই বলিস্ নি ত।

গৌরী বললে, অতটা বিশ্বাস করি নি। তা ছাড়া পাকল যে এতটা ভুল করতে পারে, তা বিশ্বাস হয় না।

মাসিমা বললে, না বাপু, আমাদের লাইনে রং ধরার মত এমন বিপদ আর নেই, চোখের জলের নদী বয়ে যাবে।

কৃষ্ণা এসে ডাক দিলে, বল্‌লে, গৌরী, পাগলী, মাসিমা —আমাদের কবি এসেছে।

মাসিমা বিরক্ত হয়ে বল্‌লে, হ্যাঁ, ঐ এক পাগল এসে জুটেছে। আর তোরা ওকে আস্কারা দিয়ে দিয়ে—

কিন্তু কবির নামে ওরা দুজনেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এই কবি ছিল এক সময় এদের সকলেরই বাবু। বয়স এখনও পঁচিশের মধ্যে, কিন্তু পৈতৃক সব কিছু উড়িয়ে দিয়ে নানারকম রোগগ্রস্ত হয়ে এখন পুরোপুরী পথের ভিখারী। এক সময় নামকরা কলেজের ছাত্র ছিল, কবিতায় ওর হাত ছিল পাকা, নিজের সান্‌বীম গাড়ী নিয়ে ঝড়ের বেগে এমন কি চিৎপুর রোড দিয়েও চক্ষের নিমেষে উধাও হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল ওর, আবার ভালো গান গাইতেও পারে। তবে এখন আর কিছুই নেই। মাঝে মাঝে পুরানো পাড়ার পরিচিতদের কাছে এসে পান খেয়ে যায়। কেউ কিছু প্রসাদ দিলে হাত পেতে গ্রহণও করে।

বাইরের উঠোনে মেয়েরা জটলা পাকিয়ে বল্‌ছে, কবি আজ একটা নতুন ধরণের ভালো গান শোনাও।

কবি বল্লে—বিড়ি খাওয়ার আগে, তবে গাইব। আর খাওয়ার সময় এক পেয়ালা ভক্তি করে দিতে হবে।

পাগলী বল্‌লে, আচ্ছা তাই দেব, তুমি গাও ত আগে।

কবি বল্‌লে, তাহলে দেবী স্তোত্র দিয়েই সুরু করি। শোন, বলেই সুর করে জোড় হাতে স্তবপাঠের ভঙ্গীতে আরম্ভ করলে—

বহুকরমর্দ্দিত লম্বিত পয়োধর
চীরখণ্ড বাঁধি কটিতে প্রখরতর
সর্ব্ব বিনাশিনী দুঃখপ্রদায়িনী
নগর বিলাসিনী যে—
কবি-মুনি মানস ধ্বংসকরী,
সংসারী জনমন শান্তি হরি,
দুর্দ্দিন শূন্য নগ্নদেহী বস্ত্রা
বহুবিধ পাতককারিণী যে—
বহির্বহনে বহি নিজ সংসারে,
বহির জ্বালা আন শত পরিবারে,
নিজ দেহে রোগ আনি অপরেরে যাও দানি,
নিজেরে নাশিয়া পরনাশিনী যে—
যৌবন গত হবে পুঁজি কুল-নারী
বিপথে ভুলায়ে আনি দিয়ে যাও ছাড়ি,
নরকের দীক্ষায় শেষে কর ভিক্ষা
কোলা কাঁধে হও পথচারিণী যে।

দরাজ গলায় গানটা গাইলে ভালো। গেয়েই বল্‌লে, জয় হোক শালীদের আর শালীপতিভাইদের, এখন নাও, বিড়ি-টিড়ি ছাড় দিকিন্ দেখি।

পাগলী একটা ভালো সিগারেট এনে দিলে। সিগারেটটা দেখে কবি বল্‌লে, ওঃ, পাগলীর এখন সময় ভালো দেখছি, ক্যাপষ্টানের ছড়াছড়ি। বেশ, ভালো, কিন্তু দেশলাই কোথা বাবা, দেশলাই, ম্যাচেস্।

কৃষ্ণা হেসে উঠলে, বল্‌লে—সেটাও বুঝি পকেটে নেই।

হাস্‌তে হাস্‌তে কবি বল্‌লে, পকেটে যতক্ষণ কিছু থাকে ততক্ষণ কি আর চৈতন্য হয় বাবা। পকেট গড়ের মাঠ না হলে কি আর এ-পাড়া থেকে কেউ রেহাই।

কি এসে বল্‌লে, ওগো কবিবাবু, মাসিমা তোমায় একবার দেখা করতে বলেছে।

সিগারেট ধরিয়ে আরামে দুটো টান দিয়ে কবি বল্‌লে, না বাবা কি, এইটি পারবো না। এ কবি তার নিজের সর্ব্বস্ব উড়িয়ে পথের ভিখারী হতে পেরেছে। কুপরোয়া নেই! এ-সব সে গ্রাহ্যই করে না, কিন্তু মাসিমার কথা শুনে কোন বে-আইনী কাজ করে জেলে যেতে পারবো না।

কি বল্লে—না-না জেল যেতে হবে না, তবে কিনা —

বাধা দিয়ে কবি বল্লে, আমি জানি ত মাসিমা এমন কোন মহৎ কার্য্যের লোভ দেখাবেন যে, তাতে কারুর-না-কারুর সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। সর্ব্বনাশ আমি একমাত্র নিজেরই করেছি, অপরের অনিষ্ট এখনও পর্য্যন্ত করিনি, করবোও না। জানো কি, পথের ভিখারী হলেও আমি হাটখোলার বনেদী বংশ, সেটা ভুললে চলবে না।

বিরক্ত হয়ে কি বল্লে, তবে ঘর গে যাও।

হ্যাঁ, এ ভালো কথা, কবি স্বীকার করে নিলে। বলে মাসিমার কাজ এখানকার কিচেন ছোকরাদেরদিয়ে করিয়ে নিতে বোলো মাসিমাকে।

পাগল বল্লে, আচ্ছা কবি, তুমি কি করে বুঝলে মাসিমা খারাপ কাজ করতে বল্‌বে?

কবি বল্লে, হুঁ হুঁ, আমি জানি রে পাগলী, সব জানি।

ভদ্রলোক এ লাইনে তলিয়ে যায়, নিজেরা ঘুরে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কিন্তু ইতর হতে পারে না। আমিও ইতর হতে পারবো না। তাই মাসিমার হুকুম তামিল করার শক্তি আমার নেই।

পাকল বলে, সামলে চল্‌লে তলিয়ে যাবে কেন?

যাবেই, যেতেই হবে, কবি বলে। যাদের বংশে খারাপ রক্ত নেই, তারা ঐ দিকে পা বাড়িয়েছে কি মরেছে, আর যারা ছাতকাঠ, তারা এখান থেকে উপার্জ্জনও করে, আবার জেলও খাটে।

মাসিমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলে, আমার বাড়ীতে বাজে ঝামেলা চল্‌বে না। জগা কোথা রে।

ওধারের রোয়াকে বসেছিল একটা ষণ্ডা গোছের লোক। সে বলে, এই যে মাসিমা।

মাসিমা বলে, দে ত, ঐ পাগ্‌লাটাকে তাড়িয়ে দে ত।

জগা উঠে দাঁড়ালো। কবি বলে, যাবা, মারপিট করতে হবে না, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। বরং চলে যাব মাসিমা, কিন্তু তোমার মনমত কাজ করতে পারবো না। বলেই কবি গান গেয়ে উঠলো—

নারী, আমি তোমার রূপে,
সকল দিলাম চুপে চুপে;
দিনদুনিয়ার সবই আমার
দিলাম তোমার অরূপরূপে
চুপে চুপে।
এলাম কেন, কিসের টানে
নাই মনে
বেরিয়ে গেলাম সর্ব্বহারা
তিন দিনে—
এমনি ধারা পাগলপারা
নিত্য নূতন আত্মধারা
পড়ছে এসে
তোমার কূপে
চুপে চুপে

মাসিমার ইঙ্গিতে জগা এসে সামনে দাঁড়াল। বলে, চল্! দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েরা কেউই কোন কথা কইতে সাহস পেলে না, কবি আপন মনেই গান গাইতে গাইতে চলে গেল, নেপথ্য থেকে শোনা গেল

দীপান্বিতার আগুন-পোকার
জ্বান হবে না জলে

মাসিমা মেয়েদের ধমকে বলে, যে যার ঘরে যা। সবাই নিঃশব্দে আপন আপন ঘরের দিকে চলে গেল, কিন্তু পাকলের মনের মধ্যে ঐ শেষ লাইনটা কেবলই বাজতে লাগ্‌ল, "জ্বান হবে না জলে।"

নিজের ঘরখানা পরিষ্কার করতে করতে পাকলের কেবলই মনে হতে লাগল কবির কথা। মাত্র কয়েক বছর আগে সে প্রথম দেখেছে ঐ ছোকরাকে। বড় ভাল লেগেছিল। কি উঁচু মন, আর দরাজ হাত ছিল ঐ ছোকরার। মুখে মুখে ছড়া ও গান বাঁধতে পারত। মদ সিগারেট দূরের কথা, পানটি পর্য্যন্ত খেত না, সুপারী মশলা খেত। তাই ওরা নাম দিয়েছিল সুপারীবাবু। তারপর ঐ ছেলেটি আস্তে আস্তে কেমন নেমে গেল। নগদ টাকা ফুরিয়ে গেল। সম্পত্তি বাঁধা দিলে, সেও এদের এখানকার উকীলবাবুর সাহায্যে। তারপর ভারী ভারী গয়না বাড়ী থেকে এনে এদেরই সাহায্যে আধা দামে বিক্রী করত। শেষে মটর গাড়ী চলে গেল, ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরতে শুরু করলে। পড়াশুনা করে যে ছেড়ে দিয়েছিল তা ওরা ঠিক টেরও পায় নি। শেষে সর্ব্বত্র ধার-দেনা হয়ে গেল। পানওয়ালার কাছেও দেনা, চায়ের দোকানে ধার বন্ধ, মেয়েদের কাছে চেয়ে-চিন্তে খেতে লাগল। এর পর কি একটা ব্যাপারে পুলিশের কবলে পড়ে গেল।

ঘর পরিষ্কার করে পাকল কবির কথা ভাবতে ভাবতেই বস্তির কলে গেল জল তুলতে। জল ভরতে ভরতে আরও কয়েকজনের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল —ব্যাঙ্কের বাবুর কথা, যে পাকলকে ভাল ভাল কাপড় দিয়েছে, একখানা গয়নাও দিয়েছে। তারপর অসুস্থ হয়ে বহুদিন ভুগেছে। শেষে মরণাপন্ন অবস্থায় ওর কাছে সেও একদিন হাত পেতেছিল। ও তাকে কিছু সাহায্যও করেছিল, তারপর সে আর অনেকদিন আসে নি। একদিন লোকমুখে শুনল, সে নাকি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। মনে পড়ল, অখিলবাবুর নাতিকে। বিরাট বড় লোকের নাতি। সেও ওদের খদ্দের ছিল। প্রতিমা মেয়েটাকে কি ভালই বাসত! বাড়ী, বাগুনী, দারোয়ান

সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। তারপর কোথায় কি হয়ে গেল। কি একটা যোকদ্দমায় দু'বছর জেল হয়ে গেছে তার, প্রতিমা আবার রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে।

চুল বাঁধতে বাঁধতে পারুলের মনে হল, বউ-মরা বুড়ো আজই আসবে। আহা, বড় ভাল লোক, কি সরল বিশ্বাসী। সুখের সংসার; ছেলে, মেয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠা, সে ওকে নিজের সংসারে নিয়ে যেতে চায়, ছেলেদের দিদী অথবা মাসী হয়ে থাকতে হবে। পারুলের হাসি এল। কিন্তু মনটা বড়ই উদাস হয়ে গেল। ওদের সংস্পর্শে যারা এসেছে, কেউই সুখী হয় নি। কবি বলেছে 'নিজেরে হারিয়া পরনাশিনী রে'—কিন্তু এই বুড়োটার জন্য বড়ই মায়া হয়। এত শিক্ষিত, কিন্তু কি বোকা! আহা, ওরা কি কিছুই বুঝে না। কি হয় আর কি হয় না, সে জ্ঞানও ওদের নেই। ঐ ছোকরা কবি এতদিনে বুঝেছে যে ভদ্দর লোক এ লাইনে এলে তলিয়ে যায়। কিন্তু যখন বুঝেছে, তখন আর সময় নেই। তা সময় থাকতে বউ-মরা বুড়োটাকে সাবধান করলে অন্ততঃ একটা ভাল কাজ এ জীবনে করা যেতে পারে। আর নিজের কথা, নিজের যা আছে তাই থাকবে, সেটা ছাড়তেও ভয় হয়। পারুল যেন মনে মনে একটা সংকল্প স্থির করে ফেলে।

চুল বেঁধে গা ধুয়ে দু'পয়সার মুড়ি ও এক মগ চা খেয়ে অন্য সব মেয়েদের সঙ্গে পারুলও যথারীতি অফিস করতে বেরিয়ে এল, অর্থাৎ রাস্তার ধারের রোয়াকে হাজিরা দিতে এল। পারুলের মনটা আজ কেমন ভারভার, দুটো বিড়ি শেষ করার পর রাত্রি সাড়ে আটটায় অধ্যাপক এসে গলির মোড়ে দেখা দিলেন। একরাশ আনন্দ ও অনেকখানি দুঃখ নিয়ে পারুল পেছন পেছন এসে ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করলে।

সম্পূর্ণ ঘরের লোকের মত পরম নির্ভরে অধ্যাপক তক্তপোষের ওপর বসেই বল্লেন, সামনের বুধবারে ভালো দিন, সেই দিন বিকেল তিনটেয় তুমি আমার বাড়ী প্রথম যাবে, সেই সময় আমার বাড়ীর লোকের সঙ্গে পরিচয় করবে, তারপর তুমি সকলের সামনেই তোমার চাকরী যাওয়ার কথা বলবে, আর আমিও বলবো—এইখানে থেকে যাও। তখন তুমি সব কথা ঠিক করে চলে আসবে এবং বিকেল ছ'টা থেকে সাড়ে ছয়টার মধ্যে তোমার কাপড় চোপড় নিয়ে আমার বাড়ীতে নতুন করে গিয়ে গৃহপ্রবেশ করবে, কেমন? আমি পাঞ্জী দেখে দুটো সময়ই ঠিক করে এনেছি।

পারুল চুপ করে রইল। অধ্যাপক বল্লেন—শোন, আজ থেকে তোমার ব্যবসা ছেড়ে দাও, আর যে ক'খানা কাপড় নিয়ে যাবে সেই ক'খানা আর্জেন্ট কাচিয়ে নিয়ে যেও। এখানকার কোন কাপড়জামা না কাচিয়ে নিও না। তোমার বিছানা, তক্তপোষ যা আছে সমস্তই তোমার এখানকার বন্ধুদের দিয়ে দিও। তোমার ভালো বাক্স না থাকে ত একটা সুটকেস কিনে নিও। এই চার দিনে সমস্ত ব্যবস্থা করে নাও। আমি বরং মঙ্গলবার রাত্রে এসে পাকাপাকি জেনে যাব তোমার ব্যবস্থা ঠিক হোল কি না। আর এখানে কি কারুর কাছে তোমার কিছু ধার আছে না কি?

পারুল নিরুত্তর। অধ্যাপক সস্নেহে তার পিঠের ওপোর হাত দিতেই সে শিউরে উঠলো। অধ্যাপক ভীত হয়ে বল্লেন, কি হোল?

নড়েচড়ে বসে পারুল বল্লে—কিছু না। একটা কথা মনে পড়ে গেল—শোন। আমাদের গাঁয়ে শুনেছিলুম এক চাষীর বাঁ হাতের কব্জি আঙুলে এক কেউটে সাপ কামড়ে দিয়েছিল। চাষীর হাতে ছিল কাস্তে। সে এক কোপে কেউটেটাকে দু'টুকরো করে কেটে সঙ্গে সঙ্গে নিজের আঙুলটাকে এক কোপে কেটে বাদ দিয়ে বাড়ী চলে যায়। তারপর তেল ন্যাকড়া দিয়ে কাটা আঙুলের গোড়াটাকে বেঁধে রাখে। পরের দিন দুপুরে সে মাঠে এসে দেখে তার কাটা আঙুলটা তেমনি পড়ে আছে। বিষাক্ত বলে শিয়াল শকুনে সেই কাটা আঙুলটাকে ছোঁয় নি। আঙুলটা গিয়ে পর্য্যন্ত চাষীর মনে একটুও দুঃখ ছিল না। অনেকক্ষণ আঙুলটাকে দেখতে দেখতে শেষকালে সে করলে কি জানো, তার হাতের ন্যাকড়া খুলে কাটা আঙুলটাকে কুড়িয়ে নিয়ে ঠিক জায়গায় লাগিয়ে দেখতে লাগলো, আঙুল কাটার আগে তার হাতটা কেমন ছিল। হঠাৎ তার মাথা ঘুরে সর্ব্বশরীর নীল হয়ে গেল। তারপর সেইখানে ঢলে পড়ে গেল। পরের দিন সবাই এসে দেখলে, চাষী মরে পড়ে আছে। শুনলে?

হ্যাঁ, অধ্যাপক জবাব দিলেন।

এ রকম কেন হলো বল ত ?

অধ্যাপক বল্লেন, হবেই ত। ঐ কাঁটা আঙুলের বিষটা তার হাতের ক্ষতের ভিতর দিয়ে সর্পদেহে সঞ্চারিত হতেই সে সাপের বিষে মারা গেল।

তাই বুঝি ? পাকল যেন অবাক হয়ে উত্তর দিলে।

তা ছাড়া আর কি, অধ্যাপক সায় দিয়ে বললেন কিন্তু হঠাৎ এ সব কথা কেন কমল ?

অনেক দিনের কথা, হঠাৎ মনে পড়লো, তাই বল্লুম।

সন্দিগ্ধ চিত্তে অধ্যাপক বল্লেন, তুমি বুদ্ধিমতী, শুধু শুধু যে পুরাতন কথা মনে পড়লো, আর তুমি বললে, এ কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না।

পাকল অধ্যাপকের বুকে মুখ লুকোল। তারপর মনে হোল, যেন সে কাঁদছে। কি ব্যাপার, কাঁদছ কেন ? অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করলেন।

পাকলের মনে পড়লো মাসিমার কথা। বড় ধরলে চোখের জলের নদী বয়ে যাবে, মুখে বললে—না এমনিই।

অধ্যাপক ভাবলেন, সে বোধ হয় ভবিষ্যৎ আশার আনন্দে কেঁদে ফেলেছে। তিনি সস্নেহে তার মাথায় হাত রেখে বললেন, কই বুধবারের কথা ত কিছু বললে না ?

পাকল বললে, তুমি কি দেবতা, না কি ?

অধ্যাপক বললেন, কেন ?

না হলে তুমি এই নোংরা ঘর থেকে একটা বুড়ীকে টেনে তুলে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চাইছ কেন বল ত ? তা ছাড়া নিয়ে গিয়ে রাখবে একেবারে তোমার সংসারের মধ্যে।

হ্যাঁ, তাই রাখবো। শাস্ত্রে আছে, আবর্জনার মধ্যে রত্ন আবিষ্কার করলে সমস্ত আবর্জনা সরিয়ে তাকে ধুয়ে-মুছে তুলে নিতে হয়।

আমি কি রত্ন ?

হ্যাঁ, আমার কাছে তুমি তাই। কিন্তু এ সব কথা কেন কমল ?

আমার বড় ভয় হচ্ছে, হয়ত আমি তোমার সমস্ত সংসার বিষাক্ত করে ফেলবো !

তাই বুঝি তুমি সাপে-কাটা আঙুলের গল্প বললে ? তবেই দেখ, আমি ভুল করিনি। যে অমনিধারা গল্প বলতে পারে, সে সত্যিই রত্ন।

পাকল কিছুক্ষণ চুপ করে অধ্যাপকের বুকের ওপোর মাথাটা এলিয়ে দিয়ে যেন অন্যমনস্ক হয়েই পড়ে রইল। তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে একটু সরে বসে বললে, আমাদের কাগুলোর কি কোনদিনও বুদ্ধি হবে না ? আগুন দেখলেই ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে, আর ধড়ফড় করে পুড়ে মরবে ?

তার মানে ?

মানে আমরা ঐ আলোর আগুন। কারুর উপকার করি না, বরং সকলের সর্বনাশ করি, তবু—তবু তোমরা আমাদের কাছে আস কেন ?

পাকলের রুক্ষ কঠোর মূর্তি দেখে অধ্যাপক চমকে উঠলো। পাকল যেন ক্ষিপ্ত হিংস্র হয়ে উঠলো, বললে, তুমি জানো আমরা নিজেদের সর্বনাশ আগে করি, তারপর আমাদের সংস্রবে যারা আসে, তাদের সকলের সর্বনাশ করি। তবু—তবু তোমরা আমাদের কাছে আসো কেন ? কেন আসো, কি আছে আমাদের ?

হতভম্বের মত অধ্যাপক চুপ করে রইলেন। পাকল হঠাৎ হাপুস নয়নে কেঁদে উঠলো। কিছুক্ষণ কেঁদে নিয়ে হঠাৎ অধ্যাপকের দু'টো পা ধরে পায়ের মাঝখানে মুখ গুঁজে আবার কাঁদলে, শেষে অশ্রুপ্লাবিত মুখ তুলে বলে, বাগো, তুমি কি আমায় ভালোবাসো ?

স্বপ্নজড়িত সুরে কাঠপুত্তলির ন্যায় অধ্যাপক উত্তর দিলেন, বাসি।

তবে আমার মাথায় হাত দাও, পাকল অনুরোধ করলে।

অধ্যাপক পাকলের মাথায় হাত দিলেন। পাকল বলে—প্রতিজ্ঞা কর যে, আর কখনও তুমি আমার ঘরে, বা আমাদের মত কোন মেয়ের ঘরে এ জীবনে কোনদিনও ঢুকবে না। প্রতিজ্ঞা কর—বল, মুখ ফুটে বল—আর আসবে না। আমি শুনতে চাই।

পুরোহিতের পড়ানো মন্ত্রোচ্চারণের মত অর্থবোধ না করেই যেন অধ্যাপক বলেন, আসবো না। বল, কখনও আসবে না, আমার ঘরে বা আমার মত অন্য কোন মেয়ের ঘরে !

সম্মোহিত অধ্যাপক টেনে টেনে উচ্চারণ করলেন, কখনও আসবো না—তোমার ঘরে—বা তোমার মত অন্য কোন মেয়ের ঘরে।

দম্ দেওয়া পুতুলের মত তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পাকল বলে, যাও—ঘর থেকে চলে যাও, তার অভ্রান্ত কণ্ঠের আদেশবাণী যেন ভাঙা ঘড়ির মত বেজে উঠলো।

হতভম্ব অধ্যাপক চিন্তা করার অতীত মনোভাব নিয়ে ধাক্কায় পাওয়া শবদেহের প্রায় উঠে দাঁড়ালেন।

যাও, ঘর থেকে বেরিয়ে যাও, পাকল আদেশ দিলে।

হুড়কো খুলে অধ্যাপক ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, এবং ছুতো পরে গলি পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়লেন।

শেষ মাঘের ঠাণ্ডা হাওয়ায় বড় রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘুরে হঠাৎ কি মনে করে তিনি আবার এলেন গলির মোড়ে। পাকলকে বোধকে দেখলে না, গলিতে ঢুকতে যাবেন, মনে পড়লো পাকলের দেওয়া মাথার দিব্যি। আর যাওয়া হোল না, ধীরে ধীরে ফিরে এলেন।

কিছুক্ষণ পথে পথে ঘুরে অধ্যাপক রাজনারায়ণ নিজের বাড়ীতে ফিরে এলেন। তখন তিনি আপন মনেই আবৃত্তি করছিলেন—

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্
বিহিতবহিত্র চরিত্রমখেদম্
কেশব ধৃত মীনশরীর
জয় জগদীশ হরে।

প্রকৃতির আহ্বানে

শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়

বাইরে আকুল বিশ্ব হাতছানি দিয়ে
বারবার যেন কাছে ডাকে ;
সবুজের সমারোহ সুবিশাল প্রান্তরে
তোমাকেই যেন ঘিরে থাকে।
দূরন্ত পাঠায় ফুল বাতাসে বাতাসে
বলে, 'তুমি মোর কাছে এসো',
চাঁদ আর তারাগুলি বলে হাসিমুখে,
'আমাদের তুমি ভালোবেসো'।
পাখীরাও বলে, 'তুমি আমাদের সাথে
প্রাণখুলে গেয়ে যাও গান,'
বারিধারা বলে, 'তুমি হিংসা-দ্বেষ ভুলে
সবারেই ক'রো প্রেম-দান'।
কুলু কুলু স্বরে যেন বলে ছোট নদী,
'এসো মোরা যাই দূর-দেশে',
শরতের মেঘ বলে, 'যদি তুমি আস,
এক সাথে যাবো ভেসে ভেসে'।
বিশাল সাগর ডাকে, 'এসো মোর কাছে,
মোর কূলে কিছুক্ষণ জুড়াও' ;
'আতপে হোয়োনা ক্লান্ত'—বলে বট-তরু,
'মোর ছায়ে জীবন জুড়াও'।
উদার আকাশ বলে, আমার মতন
খুলে দাও তোমার হৃদয় ;
জীবনে জীবন যোগ ক'রো যদি তবে
সেই হবে জীবনের জয়'।
সমগ্র প্রকৃতি ডাকে তবু কেন তুমি
গৃহ-কোণে একা একা রবে ;
ধরাতলে স্বর্গ-সুখ পেতে চাও যদি
প্রাণ দিয়ে ভালোবাসো সবে।

রাষ্ট্রভাষার দাবী ও যোগ্যতা

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী, এম-এ

সম্প্রতি রাষ্ট্রভাষা লইয়া দক্ষিণভারতে যে শোচনীয় হুলস্থুল-কাণ্ড ঘটিয়া গেল এবং যাহার জের এই কলিকাতা নগরেও আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহার জন্য অনেকে হিন্দী-ভাষীগণকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকজন কর্ণধারকেই দায়ী করিতেছেন। তাঁহাদের দূরদৃষ্টি ও বিচার বিবেচনার অভাবই এই পরিস্থিতির জন্য অনেকাংশে দায়ী, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অহিন্দী অঞ্চলসমূহের গণনেতাগণও কি ইহার জন্য, সদ্ভাবে না হইলেও, কতকাংশে দায়ী নন? বিগত এক যুগ ধরিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের একচোখো নীতি ও হিন্দীপ্রেম ধাপে ধাপে বাড়িয়া যে স্তরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং কালে অকালে হিন্দী ও অহিন্দী অঞ্চলের বিভিন্ন গণনেতা বক্তৃতা দেশ-প্রেম বনাম হিন্দী প্রেমের মহিমা যেভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে হিন্দীপ্রেমীগণের উল্লাস ও উদ্দীপনা মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতে উৎসাহই পাইয়াছে। দেশ-প্রেম ও জাতীয়তাবোধের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে ক্রমাগত আঘাত করিয়া, এই নেতাগণ ও সরকারী অনুগ্রহপুষ্ট পণ্ডিতগণ যেভাবে স্বাধীনরাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হিন্দীর মহিমা কীর্ত্তনে, ও বিদেশীয় ভাষা ইংরেজীর আদ্যশ্রাদ্ধের আয়োজনে, নানা সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিয়াছেন, বা সংবাদপত্রের মারফতে বিবৃতি ও ফতোয়া ঝাড়িয়াছেন, তাহাতে দেশের জন-সাধারণ একথা বুঝিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, হিন্দীভাষা সার্ব্বজনীন প্রসারলাভ না করিলে দেশের সর্ব্বনাশ ঘটিবে, জাতীয়তাবোধ নষ্ট হইবে, ইত্যাদি। আঞ্চলিক ভাষা বলিয়া স্বীকৃত কয়েকটি ভাষার জন্য একাডেমি পুরস্কারের নামে বৎসরে কিছু ছিটে ফোঁটা দান-খয়রাতের ব্যবস্থা করিয়া, রাজস্বের একটা সিংহভাগ যে গোপনে ও প্রকাশ্যে হিন্দীভাষার উন্নতি ও প্রসারকল্পে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া দরাজ হাতে ব্যয় করা হইতেছিল, সেদিকে কিন্তু কোন অহিন্দী গণনেতার দৃষ্টি ছিলনা। অতি সম্প্রতি এসব কথা আমরা তাঁহাদেরই কাহারো কাহারো মুখ হইতে শুনিতেছি। বলি, তাঁহারা কি এতকাল নাকে তেল দিয়া ঘুমাইয়াছিলেন?

হিন্দীর মত একটা দুর্ব্বল আঞ্চলিক ভাষাকে যখন রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা দেওয়া হইল এবং যখন ইহার স্বপক্ষে ওকালতি করিতে উত্তরভারতের বিভিন্ন উকীল মোক্তার ও নেতা উপনেতাকে অতিমাত্রায় উৎসাহী দেখা গেল, তখনই বোঝা উচিৎ ছিল যে, ইহা ঠিক রাষ্ট্রপ্রেম নয়, রাষ্ট্রভাষার প্রেমও নয়, আসলে আঞ্চলিক প্রেমের নামান্তর মাত্র। হিন্দীভাষী অঞ্চলের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আকাশবাণীর দিল্লী-কেন্দ্র হইতে বিবিধ ভারতীয় ও অন্যান্য হিন্দী প্রোগ্রামের মারফতে হিন্দী প্রচারের যে প্রবল বন্যা বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া দেশকে প্লাবিত করিতেছিল এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মারফতে বিভিন্ন অহিন্দী অঞ্চলে যেভাবে অতি সুকৌশলে এবং লোকের অজান্তে, হিন্দী-প্রচার ও প্রসারের সূক্ষ্ম ব্যবস্থা সমূহ প্রবর্ত্তিত হইতেছিল, তখন কিন্তু কেহই ইহার প্রতিবাদ করেন নাই। হিন্দী প্রচারের দুই কেন্দ্রস্থল, স্বরাষ্ট্রদপ্তর এবং তথ্য ও বেতার দপ্তরের জন্য বিগত বহু বৎসরের মধ্যে পণ্ডিত নেহরু উত্তর-প্রদেশ ও বিহারের প্রতিনিধি ছাড়া আর কোথাও উপযুক্ত লোকের সন্ধান পান নাই। তাঁর অকৃত্রিম ইচ্ছা থাকিলে, ভাষা-আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার সময়ই তাঁহার মৌখিক আশ্বাসসমূহ প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচ হিসাবে আইনে লিপিবদ্ধ করা যাইত। তখন ভাষা আইনে "may" থাকিবে কি "shall" কথাটি থাকিবে, সেই বাদানুবাদের সময়ও তিনি চুপ করিয়াই ছিলেন, এবং হিন্দীর স্বপক্ষে বক্তৃতাদি দিয়াছিলেন, যদিও তিনি নিজে প্রকৃতপক্ষে ছিলেন উর্দুভাষী; বিশুদ্ধ হিন্দী বলিতে

বর্তমানে যারা বুঝায়, সে ভাষার ব্যবহার তাঁহার মুখে কোনদিনই শুনা যায় নাই। সেদিকে অবশ্য তাঁহার ভাষা কতকটা হিন্দুস্থানীর মত শুনাইত। অহিন্দী নেতাদের চোখকান তখনই সজাগ রাখা উচিত ছিল। ১৩টি আঞ্চলিক ভাষা সরকারী স্বীকৃতি পাইলেও ভারতীয় লোকসভায় কিন্তু, কোন এক অজ্ঞাত কারণে, ইংরেজী ছাড়া একমাত্র হিন্দীরই অবাধ অধিকার স্বীকৃত। অন্য যে-কোন ভাষায় তথায় বক্তৃতাদি দিতে হইলে অধ্যক্ষের অনুমতির প্রয়োজন হয় এবং বক্তৃতার বিষয়বস্তুর ইংরেজী অনুবাদ অধ্যক্ষের নিকট পূর্বাহ্নে পেশ করিতে হয়। বলা বাহুল্য, এই অনুমতি লাভ করা কষ্টসাধ্য, বা প্রকারান্তরে অসম্ভব ব্যাপার। অথচ হিন্দী অঞ্চলের ইংরেজী অনভিজ্ঞ অথবা অর্ধ-শিক্ষিত সভ্যগণও অবলীলাক্রমে সংসদে তাঁহাদের মাতৃভাষার মাধ্যমেই সর্বদা বক্তৃতাদি দিয়া আসিতেছেন। এই অতি অপমানকর পার্লামেন্টারী রীতি বা ঐতিহ্য একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। বিভিন্ন অধ্যক্ষের আমলে, এমন কি, দক্ষিণ-ভারতীয় শ্রীঅনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার মহাশয়ের আমলেও, এই নিয়ম প্রত্যাহৃত করার দুর্ভাগ্য দেশবাসীর হইয়াছে। কাহার বা কাহাদের অলিখিত আদেশে বা অদৃশ্য চোখ রাঙানিতে এই ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, একথা কি আজ কাহারও জানা আছে? অথচ আজও পর্যন্ত দেশ-নেতারা বলিতেছেন যে, পণ্ডিত নেহরুর ঘোষিত তথাকথিত বক্তাকবচগুলি ভাষা আইনে বিধিবদ্ধ করা হইলেই সব মুস্কিলের আসান হইবে। সত্যই কি তাহা হইবে? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাহাতে এমন বিশেষ কিছুই হইবে না। তবে আপাততঃ কিছুদিনের জন্য ব্যাপারটি ধামা-চাপা পড়িবে মাত্র। সমস্যার মূলে আঘাত না করিলে ইহার মূল সমাধান কিছুতেই সম্ভবপর নয়। যতদিন পর্যন্ত হিন্দী একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলিয়া স্বীকৃত থাকিবে, ততদিনই হিন্দীভাষীগণের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অবরদস্তি, আর অহিন্দী অঞ্চলের হীনমন্যতা বজায় থাকিবে। ফলে ভবিষ্যতে আবার ভাষা লইয়া গোলযোগ হইতে বাধ্য। কারণ ঘর বাঁধিয়ে চলুক না কেন, দুর্বল হিন্দীভাষাই সরকারী সাহায্যপুষ্ট হইয়া, অপর সকল ভাষার উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে। নিয়মিতভাবে পথ্যাদি না পাইলে, শুধুমাত্র তাবিজ মাদুলীর জোরে যেমন কোন মানুষ বাঁচিতে পারেনা, সেরূপ সরকারী সাহায্যপুষ্ট না হইলে বা উৎসাহ না পাইলে, শুধুমাত্র রক্ষাকবচের সাহায্যে কোন আঞ্চলিক ভাষার উন্নতি সাধনের সম্ভাবনা নাই। স্থানীয় লোকের উৎসাহ ও সহযোগিতায় সেই ভাষাগুলি টিম্‌টিম্ করিয়া জ্বলিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে পারে মাত্র। কিন্তু সেই সঙ্গে অন্ততঃপক্ষে যদি আঞ্চলিক সরকারেরও সক্রিয় সহযোগিতা না থাকে, তবে সেই বাঁচিয়া থাকাটাও কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আদম-সুমারীর নথীপত্রে যেভাবে হিন্দী অঞ্চলের বহু মৈথিলী, ভোজপুরী, অবোধী, হিন্দুস্থানী, রাজস্থানী ও বুন্দেলী ভাষাভাষী লোককে হিন্দীভাষী বলিয়া চালান হইয়াছে, সেই রহস্য আজ আর কাহারো অজানা থাকিবার কথা নয়। উর্দুভাষী মুসলমান এবং হিন্দু সম্পর্কেও যে এই কারচুপি করার চেষ্টা হয় নাই, তাহারই বা ঠিক কি? এই কারচুপি লীগ আমলে পরিচালিত বাংলার আদমসুমারীর কেলেঙ্কারীকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। গোপন ক্রিয়াকলাপ যেখানে এত গভীর ও ব্যাপক, সেখানে মুখের মিষ্টি মিষ্টি বুলির উপর ভরসা কোথায়? শ্রীরাজাগোপালাচারী পাকিস্তান সৃষ্টির অন্যতম হোতা হইলেও, তিনি মাদ্রাজের ভাষা সম্পর্কিত গোলযোগের ব্যাপারে অন্ততঃ একটি সত্য কথা বলিয়াছেন যে, হিন্দীর দৌলতে ভারতবর্ষ ১৫ টুকরায় বিভক্ত হইবে। হিন্দীপ্রেমী তথাকথিত দেশভক্ত নেতাদের গোপন ষড়যন্ত্র আর দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাই দেশের সংহতি, দেশের মর্যাদা প্রভৃতির ফাঁকা বোহাই সত্ত্বেও, এবং দক্ষিণভারতের দুই পদত্যাগী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মন্ত্রীসভায় পুনঃপ্রবেশ সত্ত্বেও, মাদ্রাজের পর অন্ধ্রদেশে নূতন করিয়া গোলযোগ দেখা দিয়াছিল। ইহার প্রতিকার কোথায়? আর স্থায়ী সমাধানই বা কি?

যতদূর মনে হয়, আঞ্চলিক স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে, যে ভাষাকে "মৃত" বলিয়া ঘোষণা করা হয়, এবং যে ভাষার দৌলতে ভারতীয়গণ সুসভ্য ও ঐতিহ্যসম্পন্নজাতি বলিয়া বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারে, সেই তথাকথিত মৃত, অথচ বাস্তবে চির-জীবন্ত ও সর্বভাষার জননী বলিয়া অবিসংবাদিতরূপে স্বীকৃত, সংস্কৃতভাষাকে

রাষ্ট্রভাষা করা হইলে কোথাও কোন গোলযোগ হয়ত হইত না। হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত, ভারতীয় হিন্দুমাত্রেই যে ভাষায় রচিত ও লিখিত মন্ত্রাদির সাহায্যে, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্ত্তন, বিবাহ প্রভৃতি দশকর্ম্ম, এবং বিবিধ যাগযজ্ঞ, পূজা-পার্ব্বণ, শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডকরণ, পিণ্ডদান, তর্পণাদি ধর্ম্মকর্ম্ম, বিনা দ্বিধায় বিগত কয়েক হাজার বৎসর যাবৎ সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন, সেই চিরজীবন্ত ভাষাকে মৃত বলা সত্যের অপলাপ মাত্র। ইহা স্বকীয় অজ্ঞতাকে গোপন করার ও আঞ্চলিক স্বার্থসিদ্ধির একটি সহজ হাতিয়ার মাত্র, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্বার্থহানির ভয়ে, অথবা সরকারের বিষ-নজরে পড়িবার ভয়ে, জনকতক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও পণ্ডিত ব্যতীত (কারণ সরকারী চাকুরীতে বহাল থাকাকালে, তাঁহারা ভাল মানুষ সাজিয়া থাকেন) আর কেহই মুখ ফুটিয়া এই সত্য কথাটি জোর দিয়া বিশেষভাবে বলেন না। অথচ রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মনোনীত হইবার যোগ্যতা ও সমৃদ্ধি এই ভাষার মত আর কোন ভাষারই নাই ; আর ভবিষ্যতেও তাহা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। বেদ-উপনিষদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, যে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত ও পুরাণ প্রভৃতি হিন্দু মাত্রেরই শেষ বয়সের একমাত্র অবলম্বন, তাহাও সংস্কৃত ভাষায়ই রচিত, হিন্দী অথবা অপর কোন আঞ্চলিক ভাষায় নয়। আঞ্চলিক ভাষায় এসব গ্রন্থের অনুবাদ মাত্রই হইয়াছে, তাহার বেশী কিছু নয়। সেই পবিত্র দেবভাষাকে অবহেলা করিয়া,আজ আমরা নিজেরাই পাপে ডুবিয়া মরিতেছি, অন্ধকারে দিশাহারা হইয়া পড়িতেছি, আর পরস্পর হানাহানি ও মারামারি করিয়া ও দেশের সম্পত্তি নষ্ট করিয়া অবিচার ও অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতেছি। দেশের যাঁহারা নিয়ামক, তাঁহাদের অধিকাংশই ইংরেজী ভাষায় বলিতে কহিতে অভ্যস্ত। তাই ইংরেজীর এই মহিমা-গীতি। কিন্তু ইংরেজী আসলে একটি বিদেশী ভাষা। জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে এই ভাষার উপযোগিতা যতই থাকুক না কেন, প্রকৃত স্বাজাত্যবোধ ও দেশপ্রেম গড়িয়া তুলিতে ইহার উপযোগিতা কতখানি ? আজ এই সব বিষয় ধীরভাবে ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। দেশের শিয়রে ভীষণ শত্রু হাতিয়ারবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান। এ সময়ে আঞ্চলিক স্বার্থবুদ্ধির বিষয় চিন্তা না করিয়া দেশের সামগ্রিক স্বার্থরক্ষার বিষয়ই চিন্তা করা উচিত। কথায় কথায় যাঁহারা প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা জনমানসে তুলিয়া ধরেন, তাঁহারা কি করিয়া সংস্কৃতভাষাকে ভুলিয়া থাকিতে পারেন, এ বিষয় বুদ্ধির অগম্য বলিয়া মনে হয়।

লোক গণনার হিসাবের কারচুপির পরও, বিগত ১৯৬১ সালের হিসাব অনুযায়ী, ভারতের মোট ৪৩ কোটি লোকের মধ্যে হিন্দীভাষীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে কিঞ্চিদধিক ১৩ কোটি, তেলুগুভাষী ৩ কোটি ৭৬ লক্ষ, বাংলাভাষী (খণ্ডিত পশ্চিম বাংলার) ৩ কোটি ৩৮ লক্ষ, মারাঠীভাষী ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ এবং তামিলভাষী ৩ কোটির কিছু বেশী। সমগ্র বাংলা দেশের জনসংখ্যা (অখণ্ড বাংলার) ১০ কোটির মত। দুঃখের বিষয় এই যে, হিন্দীপ্রেমীগণ (হিন্দী অঞ্চলের লোক ও অহিন্দী অঞ্চলের কতিপয় স্বার্থান্বেষী গণনেতা ও শিক্ষাব্রতী) অহিন্দী অঞ্চলের মোট ৩০৩১ কোটি লোকের কথা বেমালুম ভুলিয়া গিয়া, বা ইচ্ছাকৃতভাবে বেমালুম আড়াল করিয়া, কথাবার্ত্তায় ও বক্তৃতা-বিবৃতিতে এমন ভাব দেখাইয়া থাকেন, যেন হিন্দীভাষা দেশের অধিকাংশ লোকেরই মাতৃভাষা। দেশে স্থায়ী শান্তির আশা করিতে হইলে, এই মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক। ভারতীয় লোকসভায় ইংরেজী ও হিন্দীর মত সমস্ত আঞ্চলিক ভাষায়ই বক্তৃতা দেওয়ার স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এবং সকল ভাষার প্রসার ও উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে পর্য্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। হিন্দীর জন্য আনুপাতিক হারেরও কিছু বেশী খরচ হইলে, সম্ভবতঃ কেহই বিশেষ আপত্তি করিবেন না। কিন্তু একদিকে শতকরা ৮০ ভাগ, অপরদিকে আর সব ভাষা মিলাইয়া মাত্র ২০ ভাগ, কি তাহারও কম,—এই অবিচার ও অন্যায় নীতির আমূল পরিবর্ত্তন এখনই ঘটাইতে হইবে। পণ্ডিত নেহরু মুখ চাহিয়া এতদিন অনেকেই হয়ত স্পষ্টভাবে কোন কিছু বলেন নাই। এখন আর সেদিন নাই। বর্ত্তমান কর্ণধারগণ আঞ্চলিক নেতা মাত্র, সর্ব্ব-ভারতীয় নেতা নন, এই সত্যটি তাঁহাদের উপলব্ধি করিতে হইবে এবং সে অনুযায়ী কাজও করিতে হইবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের আওতা হইতে হিন্দী প্রচারের দায়িত্ব শিক্ষামন্ত্রকের হাতে বদলী হইলে, অনেক অনর্থের আশু অবসান আশা করা যায়। আর সাংস্কৃতিকমন্ত্রকের হিন্দীপ্রেমী টাইপরাইটারকেও সরকাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, কেন্দ্রীয় রাজকোষের টাকাটা গৌরীসেনের টাকা নয়। প্রকাশ বিগত ১৯৫৬ সংবৎসরে সুপরিকল্পিতভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে হিন্দীপ্রেমীগণের নিযুক্তি ও পদোন্নতি ঘটিয়াছে। তাই খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রীর অগোচরেই কোন হিন্দীপ্রেমী সচিব কর্তৃক দপ্তরের সকল কাজে হিন্দী-ভাষা ব্যবহারের নির্দেশনামা জারী হইতে পারিয়াছে। অন্যান্য সকল দপ্তরেই নাকি এই শ্রেণীর সচিবগণ সক্রিয় হইয়া উঠিয়া, এই মর্মে কড়োরা জারী আরম্ভ করিয়াছিলেন। দক্ষিণভারতের হাঙ্গামার পর এবং তাহার ধাক্কায় যোধ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বিপন্ন হইবার ফলে, এই সমস্ত কড়োরা-জারী আপাততঃ স্থগিত রাখা হইয়াছে। লোকসভার বিতর্কে প্রকাশ, বিগত ২৬শে জানুয়ারীর পর হইতেই দক্ষিণ ভারতে হিন্দীতে ছাপা রেল-রসিদ, হিন্দী-মার্কাযুক্ত মালগাড়ী প্রভৃতি পাঠান আরম্ভ হইয়াছিল। এই কলিকাতা শহরেও ইংরেজী ভাষায় লিখিত টাইম-টেবলের পরিবর্তে হইয়াছিল। অথচ পুরাপুরি নাগরী অক্ষরে ছাপা ও হিন্দী বয়ানে রচিত অসংখ্য পুস্তক মজুদ করা হইয়াছিল। এই সমস্ত ঘটনা হইতে স্পষ্টই ধরিয়া লওয়া যায় যে বহু পূর্ব হইতেই উদ্যোগ-আয়োজন গোপনে গোপনে পাকা করা হইয়াছিল। বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তাই রাষ্ট্রপতি গভীর দুঃখে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, কোন কাজ করিবার পূর্বে তাহার সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে পূর্বাহ্নে বিচার-বিবেচনা করাই রাজনৈতিক বিচক্ষণতার লক্ষণ। বলা বাহুল্য, তিনি হিন্দীওয়ালাগণের বাড়াবাড়ির ফলে উদ্ভূত অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শুনা যায়, ইহাতে দিল্লীর কতিপয় উৎসাহী হিন্দীপ্রেমী উষ্মা প্রকাশেও বিরত হন নাই। এই সমস্ত অদূরদর্শী ও স্বার্থান্বেষী লোকই শেষ পর্যন্ত দেশের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিবে। প্রবাদ আছে, আপৎকালে বুদ্ধিমান লোকেরও বুদ্ধিভ্রংশ হয়। আর ইহা দেখা গিয়াছে, কোন দেশের আপৎকালে, সেই দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে, তখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর নেতৃগণই রাষ্ট্রের পরিচালক ও কর্ণধার হইয়া দাঁড়ায়। ভাগ্যবলে এই শ্রেণীর নেতৃত্বই আমাদের কপালে জুটিয়াছে!

ইতিমধ্যে দেখা গিয়াছে, হিন্দী অঞ্চলের কয়েকটি স্থানে হিন্দীর একচ্ছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হিন্দী ভিন্ন অন্য ভাষায় লিখিত (ইংরেজী ভাষায়) তার প্রেরণ, এমন কি ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন লেখাও নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। সংবিধান মতে ইংরেজী সহযোগী ভাষা হিসাবে স্বীকৃত থাকা সত্ত্বেও যখন এই দাপট, তখন ইংরেজী ভাষা উঠিয়া গেলে যে অবস্থাটা ঠিক কি হইবে, তাহা ধারণা করিতেও কষ্ট হয়। প্রকাশ, হিন্দী অঞ্চলের বাংলাভাষী ছাত্রবৃন্দকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, অতঃপর নাগরী হরফেই বাংলাভাষার পঠন-পাঠন ও পরীক্ষাদি চলিবে। ইহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে যদি কলিকাতা ও বাংলাদেশের নানা স্থানে অবাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীদিগকে বাংলা হরফের মাধ্যমে তাহাদের মাতৃভাষার শিক্ষাগ্রহণ ও পরীক্ষাদি দিতে বলা হয়, তবে তাহা খুব অন্যায় হইবে কি? আমাদের একপ প্রতিশোধমূলক পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী ছাত্রগণের দুরবস্থার প্রতিকার হইবেনা। যে স্বভাবতঃই দুর্জন ও স্বার্থান্বেষী, তাহার ক্ষেত্রে সদ্ব্যবহার বা ঔদাসীনতা সুফলের বদলে কুফলই প্রসব করিয়া থাকে।

বিগত ২৬শে জানুয়ারী তারিখটি হিন্দীকে সর্ব-ভারতীয় ভাষা হিসাবে চালাইবার শুভ মহরতের দিন ধার্য করা হইয়াছিল। আর ২৭শে তারিখে দিল্লীতে বসিয়াছিল হিন্দী সম্মেলন তথা সরকারী ভাষা সম্মেলন। সেই সম্মেলনে বর্তমানে প্রধান মন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী যে "সুচিন্তিত" অভিভাষণটি দেন, তাহাতে বলা হইয়াছিল, "অহিন্দী-ভাষীগণের অসুবিধার কথা না উঠলে, সঠিকভাবে বলতে গেলে আজই ইংরেজীর স্থানে পুরাপুরি হিন্দীর আসন হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এখন পরিবর্তনটা দ্রুত হবে। তবে যদি দেখা যায়, এতে ভারতের ঐক্যের ব্যাঘাত হচ্ছে, তাহলে আমাদের সামান্য একটু ঢিলে দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।" এই সম্মেলনের অন্যতম বক্তা, বিহার বিধান সভার অধ্যক্ষ, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সুধাংশু মহাশয় বলিয়াছিলেন, "হিন্দীকে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করার জন্য অহিন্দীভাষীদের সম্মতির অপেক্ষা করার অর্থ

হচ্ছে, মন্ত্রণায়ীর কাছে মাদক বর্জন সম্পর্কে অভিমত চাওয়ার সামিল।" বলা নিষ্প্রয়োজন, এ শ্রেণীর কয়েকটি "সুচিন্তিত" ভাষণের পরই দক্ষিণভারতে অগ্নিদাহ আগুন জ্বলিয়া উঠে এবং ক্রমে ক্রমে নানাভাবে ও নানারূপে সমগ্র অহিন্দী অঞ্চলেই তাহা ছড়াইয়া পড়ে। শাস্ত্রীজী আজ ভুলিয়া গিয়াছেন যে, মাত্র কয়েক মাস পূর্বে, এই অহিন্দী অঞ্চলের ভোটের জোরেই তিনি প্রধান মন্ত্রীর গদীতে বসিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃভূমি ও বিহারের অনেক সদস্যই সেদিন কয়েকজন নেতার কূট-কৌশলে শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের পক্ষে হেলিয়াছিলেন।

সংসদে ভাষা বিলের আলোচনার সময় পণ্ডিত নেহরু আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, অহিন্দী ভাষীদের সম্মতি ও অনুমোদন ব্যতীত ইংরেজী ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে বড় রকমের কোন পরিবর্তন করা হইবেনা। পণ্ডিত নেহরুর মৃত্যুর মাত্র ৮মাসের মধ্যেই ইংরেজী কেন্দ্রের একমাত্র সরকারী ভাষার আসনচ্যুত হইয়া "সহযোগী সরকারী ভাষার" স্থান লাভ করিয়াছে। কেন্দ্রীয় কর্তাগণের দৃষ্টিতে ইহা অবশ্যই কোন বড় রকমের পরিবর্তন নয়। সরকারী কর্মকর্তাগণের প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে, হিন্দী অঞ্চলের সংসদ-সদস্যগণের স্পর্দ্ধা ও ধৃষ্টতা কতদূর সীমাহীন হইয়াছে, তাহার একটা নমুনা দেখিবার দুর্ভাগ্য পণ্ডিত নেহরুর জীবদ্দশায়ই দেশবাসীর হইয়াছে। গত বৎসর ভারতীয় পার্লামেন্টের উদ্বোধনী ভাষণ কালে কতিপয় উদ্ধত হিন্দী-প্রেমী মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে হিন্দী ভাষায় তাঁহার ভাষণ দিতে আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপতি অস্বীকৃত হইলে ঐ সদস্যগণ তাহার প্রতিবাদে সভাকক্ষ পরিত্যাগ করিয়া যান। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সরকারী কর্ণধারগণ নীরবে রাষ্ট্রপতির এই অপমান হজম করিয়াছিলেন। এবারে যখন অহিন্দী অঞ্চল সমূহে হিন্দী বিরোধী মতবাদ মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে, তখনও এই সকল ধৃষ্ট ও অবিবেচক লোকের চৈতন্যোদয় হয় নাই। জনসঙ্ঘ দল যোগ দেওয়ায় তাহাদের বল আরও ভারী হইয়াছিল। এবারে রাষ্ট্রপতির ভাষণের সময় তাহারা অধিবেশনেই যোগদান করেন নাই। অথচ না সরকার পক্ষ, না কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদ, কাহারও পক্ষ হইতেই এই অর্দ্ধোন্মাদগণের কার্য্যকলাপের প্রকাশ্য নিন্দাবাদ হয় নাই। ইহার ফলাফল কি কখনও ভাল হইতে পারে? স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ই কয়েকদিন পূর্বে এক ভাষণে বলিয়াছিলেন যে, "যাহারা হিন্দীভাষার বিরোধী, তাহারা দেশের শত্রু!" প্রকৃত প্রস্তাবে দেখা যাইতেছে যে, যাহারা হিন্দীর উগ্র সমর্থক, তাহারাই দেশের আসল শত্রু, অপরপক্ষ নয়। স্ব স্ব মাতৃভাষার প্রতি সকলেরই টান আছে, একথাটা হিন্দী-প্রেমীগণ মনে রাখিলেই ভাল করিবেন।

বলা হইয়া থাকে যে, এক জাতি, এক ভাষা ও এক প্রাণ, এই মনোভাব গড়িয়া না উঠিলে দেশের মঙ্গল নাই বা হইতে পারে না। কথাটা সারগর্ভ এবং শ্রুতিমধুরও বটে। কিন্তু সেই ভাষা কোন্‌টি? তাহা হিন্দী না সংস্কৃত? কোন্ ভাষা দেশকে সুপ্রাচীন কাল হইতে অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছে? "বন্দে মাতরম্" বা "জনগণ-মন-অধিনায়ক হে" প্রভৃতি জাতীয় সঙ্গীত কি হিন্দী ভাষায় রচিত, না অতি সরল সংস্কৃতে? এই জাতীয় সঙ্গীত দুইটির মর্ম্মার্থ বোঝেন না, এমন ভারতীয় কেহ আছেন কি? কোন্ ভাষার গ্রন্থাদি হইতে সময়োপযোগী নানা সারগর্ভ উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেশ-নেতাগণ বক্তৃতার আসরে বাজীমাৎ করেন? তাহা কি হিন্দী, না সংস্কৃত? বিবিধ ধর্মকর্মে, আসমুদ্রহিমাচলবাসী কোন্ ভাষার মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া থাকেন? তাহা কি সংস্কৃত নয়? একটু সরলভাবে লিখিত ও কথিত হইলে, তাহা দেশের আপামর সাধারণ অতি সহজে গ্রহণ করিবে। এখানে হিন্দী অঞ্চল ও অহিন্দী অঞ্চলের কোন প্রশ্ন থাকিবেনা। আসমুদ্র হিমাচলে সকলেরই ইহা মর্ম্মের ভাষা ও ধর্ম্মের ভাষা। এখানে সংস্কৃত অঞ্চল ও অ-সংস্কৃত অঞ্চলের কোন প্রশ্ন বিদ্যমান নাই। কাহারো ভাত্র যায়, আবার কাহারো পৌষ মাস, এই প্রশ্নও এখানে অনুপস্থিত। মান-অপমানের কোন প্রশ্নও এখানে নাই। তবে হাঁ, সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ওটিকতক গণ-নেতার স্বার্থে ইহাতে কিছুটা আঘাত করিবে, ইহা সত্য।

সংস্কৃত ও হিন্দী সহ ভারতের সমুদয় প্রধান প্রধান আঞ্চলিক ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা দেওয়া হউক, এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত খরচের অজুহাত তোলা হইয়া থাকে। ইহা অতি অসার ও দুরভিসন্ধিপূর্ণ, সন্দেহ নাই। বিবিধ পরিকল্পনার খাতিরে যেখানে হাজার হাজার কোটি

টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ হইতেছে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সরকারের পেটোয়া ব্যক্তিগণ পরিকল্পনার যৌলতে রাতারাতি লক্ষপতি ও কোটিপতি বনিয়া যাইতেছেন, সেখানে দেশের সংহতির প্রয়োজনে যদি বৎসরে কয়েক কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচই হয়, তবে তাহাকে সম্বায় না বলিয়া অপব্যয় বলা যায় কি? পার্শ্ববর্তী পাকিস্তানে উর্দু ও বাংলা, আর আফগানিস্থানে ফারসী ও পোশ্‌তো, এই দুইটি করিয়া রাষ্ট্রভাষা কি স্বীকৃত নয়? ইয়োরোপের সুইজারল্যাণ্ডের মত ক্ষুদ্র দেশেও, জার্মান, ফরাসী ইতালীয়ান ও রেতো-রোমান এই ৩টি রাষ্ট্রভাষা; বেলজিয়ামে ফরাসী ও ফ্লেমিশ, আর রাশিয়ার অন্ততঃপক্ষে ১৬টি বিভিন্ন ভাষা রাষ্ট্রভাষা বলিয়া স্বীকৃত। কানাডায় ইংরেজী ও ফরাসী এবং দক্ষিণ-আফ্রিকায় ইংরেজী ও আফ্রিকান্‌স্ রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা প্রাপ্ত। সুতরাং বিশাল দেশ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে একাধিক রাষ্ট্রভাষার ব্যবস্থা হইলে কোন মহাভারতই অশুদ্ধ হইবেনা। আসলে এক দেশ এক ভাষা ও এক প্রাণ, এই সারগর্ভ যুক্তিটি উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবেই হিন্দীর স্বপক্ষে দেখান হইয়া থাকে। উপরে যে-কয়টি দেশের উল্লেখ করা হইল, সেখানে কি একাধিক বা বহু রাষ্ট্রভাষার জন্য দেশের সংহতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে—না দেশের সংহতি আরও বাড়িয়াছে? ভারতের মত বিভিন্ন ভাষাভাষী একটি বিশাল দেশে, সংযোগ রক্ষাকারী ভাষা হিসাবে ইংরেজীর স্থান অধিকার করার দাবী ও যোগ্যতা যদি অপর কোন একটি ভাষার থাকে, তবে তাহা নিঃসন্দেহে একমাত্র সংস্কৃত ভাষা। ভারতের রাষ্ট্রভাষা ভৌগোলিক এবং জনসংখ্যার দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে, স্বাভাবিক ভাবেই একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। এই আন্তর্জাতিক ভাষা রূপে স্বীকৃতি পাইবার যোগ্যতা হিন্দীভাষার নাই। বিগত ১৫।১৬ বৎসরের অবিরাম চেষ্টার ফলেও, ইহা বাংলা, মারাঠী, তামিল, তেলেগু, মৈথেলী প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষার সমকক্ষ হওয়া দূরের কথা, ধারে কাছে ঘেঁসিবার যোগ্যতাও অর্জন করিতে পারে নাই। ভবিষ্যতে কি হইবে-না হইবে, বা কি হইতে পারে, ব না পারে, তাহা কল্পনা-সাপেক্ষ বিষয় মাত্র, বাস্তব বিবেচনার যোগ্য নয়। ভবিষ্যতে একমাত্র হিন্দীভাষাই ক্রমোন্নতির শিখরে আরোহণ করিবে, আর অন্য সব ভাষা ডাহামারে যাইবে, তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? সুতরাং ইংরেজীর স্থানে সংস্কৃত ভাষাকে বসাইয়া, হিন্দীসমেত অপর ১৩টি আঞ্চলিক ভাষাকে রাষ্ট্র-ভাষার মর্য্যাদা দেওয়া হইলে, এই অতি দুরূহ ভাষা-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করা যায়।

ভাষা-আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য বিভিন্ন অহিন্দী অঞ্চল হইতে যেসব প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহল হইতে এই যুক্তি দেখান হইতেছে যে, সংবিধান অতি পবিত্র, ইহার পরিবর্তন মহাপাপের সামিল! পণ্ডিত নেহরুর আমলেই, বিগত ৮।১০ বৎসরের মধ্যে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদে, এই অতি পবিত্র সংবিধানকে অন্ততঃপক্ষে ১৪।১৬ বার সংশোধন করা হইয়াছে। আর পাকিস্তানকে পশ্চিমবঙ্গের বেরুবাড়ী এলাকা খয়রাতের খাতিরেও, সেই অতিপবিত্র সংবিধানকে আর একবার সংশোধনের অতি-প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল, বাংলাদেশের দৃঢ় প্রতিবাদ সত্ত্বেও—আর সংবিধানের বর্তমান "অছিগণ" নানন্দে সেই সংশোধনে সায়ও দিয়াছিলেন! রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের তাগিদে যদি অতীতে বহুবার পবিত্র সংবিধানের পবিত্রতা নষ্ট করা হইয়া থাকে, তবে বর্তমানে রাষ্ট্রীয় সংহতির জরুরী প্রয়োজনে, সেই সংবিধানকে সংশোধন করিলে, তাহাতে নতুন করিয়া কোন মহাভারত অশুদ্ধ হইবেনা। বিশেষতঃ যাহার পবিত্রতা প্রয়োজনের তাগিদে পূর্বেই বহুবার নষ্ট করা হইয়াছে, তাহাকে নতুন করিয়া আবার পবিত্র বলা যায় কি? আসলে পবিত্রতা-অপবিত্রতার কোন প্রশ্নই এখানে নাই; প্রশ্ন হইল হিন্দী অঞ্চলের স্বার্থরক্ষা, আর তাহারই জন্য এই কৃত্রিম অশ্রুপাত! আর পবিত্র সংবিধানের কথাই যখন উঠিল, তখন এ সম্পর্কে একটি পুরাতন নেপথ্য-কাহিনীর উল্লেখ করা যায়। স্বাধীনতা লাভের বহু পূর্ব হইতেই মহাত্মা গান্ধী বলিতেন যে, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবে হিন্দুস্থানী (হিন্দী নয়) কংগ্রেসের "মনোনীত" সভ্য-সমন্বিত গণপরিষদে যখন ভাষার প্রশ্ন আসিল, তখন মহাত্মা গান্ধী মৃত। সেই সুযোগে উত্তরভারতের জনকতক প্রভাবশালী নেতা (বিহারের ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীকৃষ্ণসিংহ ও অনুগ্রহ নারায়ণ এবং উত্তর-প্রদেশের শ্রীগোবিন্দবল্লভ, পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন প্রভৃতি

ও শেঠ গোবিন্দদাস প্রমুখ জনকতক হিন্দীপ্রেমী) মহাত্মা গান্ধীর প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলিয়া গিয়া হিন্দুস্থানীর বদলে হিন্দীর স্বপক্ষে জোর ওকালতি আরম্ভ করেন। ক্রমে উর্দুভাষী পণ্ডিত নেহরু ও মৌলানা আজাদ এবং হিন্দুস্থানী-ভাষী সর্দার প্যাটেলও কতকটা অনিচ্ছাসত্ত্বে এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিন্তু তাহাতেও ভোটাধিক্য হইলনা, বিপক্ষে কয়েকটা ভোট বেশী পড়িল। তারপর আরম্ভ হইল গোপনে দল ভাঙ্গাভাঙ্গি। প্রকাশ, শেষ পর্যায়ে, কয়েকটি অলিখিত গোপন প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন প্রতিনিধিকে দলে ভিড়ান হয়। ইহার ফলে বিরুদ্ধ পক্ষের দুইটি ভোটই শুধু কমিয়া গেলনা, এই দু'জন সরকারপক্ষে যোগ দেওয়ায়, মোট ও ভোটের ব্যবধান মুছিয়া গেল। উভয় পক্ষে ভোট এবার সমান সমান হইল; গণপরিষদের অধ্যক্ষ ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ হিন্দীর পক্ষে তাঁহার কাষ্টিং ভোটটি প্রদান করেন। যতদূর মনে হয়, গণপরিষদে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে হিন্দী নামক আঞ্চলিক ভাষাটি গৃহীত হইবার ইহাই নেপথ্য-ইতিহাস। বর্তমান গণনেতাগণের অনেকেরই সেদিন ভারতীয় গণপরিষদে বসিবার সৌভাগ্য হয় নাই। কারণ সেদিন তাঁহারা ছিলেন অল্প-পরিচিত বা প্রায় অজ্ঞাত।

নেহরু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, পন্থ, গোবিন্দদাস প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় যে হিন্দীভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করিয়া ধীরে ধীরে সারা ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল, অদূরদর্শী কতিপয় হিন্দীপ্রেমীর উদগ্র লোভ ও আগ্রহের দোষে তাহার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আজ অনেক বৎসর পিছাইয়া গেল। ভাষা সম্পর্কে বর্তমানে যে প্রস্তাবই গৃহীত হউক না কেন, তাহাতে হিন্দীর একচেটিয়া অধিকার যে অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর এই ব্যস্তাধিক্যের ফলে, ফাঁকতালে ষোল আনার উপর আঠার আনা লাভ হইবে ইংরেজীরই। সংস্কৃত ভাষার যে বিশেষ কোন সুরাহা হইবে, বর্তমান নেতৃত্বের আমলে তাহা মোটেই আশা করা যায়না। হিন্দীপ্রেম বনাম ইংরেজী-প্রেমের বন্যায় ভাটা পড়িলে, তখন যদি সংস্কৃতের প্রতি কাহারো কৃপাদৃষ্টি পড়ে, আশাতঃ এইটুকু মাত্র ভরসাই আমরা করিতে পারি।

কোন ভাষা সমৃদ্ধ হইলে, সেই ভাষার পাঠক ও সমঝদার ঢাক পিটাইয়া বা টাকা খরচ করিয়া যোগাড় করিতে হয়না। প্রাচীন ইউরোপের গ্রীক ও ল্যাটিন এবং এযুগের ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, জার্মান ও রাশিয়ান প্রভৃতি সমৃদ্ধ ভাষাকে, স্ব স্ব প্রয়োজনের তাগিদে এবং জ্ঞান-বৃদ্ধির তাগিদে, পৃথিবীর দূরদূরান্তের অধিবাসীগণ সাগ্রহে শিক্ষা করিয়া থাকেন। সারা পৃথিবীর প্রাচ্যানুরাগী সমাজে ঠিক এই কারণেই আর্যজাতির প্রাচীনতম ভাষা সংস্কৃতের এত আদর। ইউরোপীয় ভাষাসমূহের মধ্যে, ইংরেজী ও ফ্রেঞ্চ ছাড়া, অপর ভাষাগুলি সাম্রাজ্য বিস্তারের দ্বারা সারা পৃথিবীতে বিস্তৃতি লাভ করে নাই, একথা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু ইংরেজ ও ফরাসী জাতির রাজনৈতিক সাম্রাজ্য আজ বিলুপ্ত হইলেও, ভাষার সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয় নাই। ভাষার এই সাম্রাজ্য ঘুষ, প্রচারকার্য্য, শাসানি বা চোখরাঙ্গানির দ্বারা সারা পৃথিবীতে বিস্তৃতি লাভ করে নাই। ভাষার সমৃদ্ধিই দূরের মানুষকে আকৃষ্ট করিয়াছে। আজিকার হিন্দীপ্রেমিগণকেও সেইজন্যই রাজনীতির রক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া ভাষা-সমৃদ্ধির আদরে আসিতে হইবে এবং হিন্দীকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। হিন্দী-প্রচার-পরিষদ কর্তৃক রচিত কৃত্রিম হিন্দীভাষা কাহারো মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে না, আর অবরদস্তিমূলক প্রচারকার্য্যও কেহ বরদাস্ত করিবেনা।

মুক্তি সংগ্রামে চন্দননগর

শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চন্দননগর শহরের একটি বিশিষ্ট অবদান আছে। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে অথবা তার পরবর্তী কালেও এই শহরে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর একেবারে শুরু থেকে বাঙ্গালী যুব সমাজের মনে যে বিপ্লবী চিন্তাধারা স্থান পেয়েছিল খুব স্বাভাবিকভাবেই চন্দননগর-বাসীর মনেও তার প্রভাব দেখা যায়। ফরাসী শাসনের অধীনে এই শহরবাসীরা যে বেশ সন্তুষ্ট ছিলেন একথা বলা চলে, কারণ ১৯০৪ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত এই শহরটি বাংলা দেশের অগণিত খ্যাতনামা সন্ত্রাসবাদীদের কর্মক্ষেত্র ছিল। এমনকি বাংলার বাহিরেরও অনেক বিপ্লবীর এই শহরে যাতায়াত ছিল। ভারতে বৃটিশ শাসন উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে পরিচালিত বিপ্লবী-কর্মধারাকে বন্ধ করে দেওয়ার মত কঠোরতার সঙ্গে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হইত না। শুধু এই কারণেই এই শহরটিকে বিপ্লবীরা একটি প্রধান কর্মক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করেছেন।

বিভিন্ন ধরণের বৈপ্লবিক কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও এই শহরেরই নাগরিকেরা পর পর দুইবার দাবী—১৯১২ সালে ও ১৯১৮ সালে "চিরদিন ফরাসী প্রজা থাকিবার ইচ্ছার পুনরাবৃত্তি" করেন। এই ঘটনা থেকে এমনও অনুমান করা যেতে পারে যে, যেহেতু বৃটিশ ও ফরাসী সরকার এই শহরটির সঙ্গে পণ্ডীচেরীর সংলগ্ন কিছু বৃটাগ দেওয়া-নেওয়া পদ্ধতিতে হস্তান্তর করিতে চান এবং যেহেতু শহরবাসীরা বৃটিশের করলে যাইতে সম্পূর্ণ নারাজ, শুধু সেই কারণেই তারা ফরাসী প্রজা থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তবে একথাও ঠিক যে, বৃটিশের মত অপর আর একটি বিদেশী শাসকের কবল মুক্ত হওয়ার ইচ্ছাও তাঁরা প্রকাশ করেন নাই। পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের চিন্তা যে এই হস্তান্তরের ঘটনার সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে আসতে পারে না তাহা খুব সহজেই বোঝা যায়। অবশ্য এই শহরবাসীরা তাঁদের নিজেদের সংগঠিত কোনও প্রতিষ্ঠান মারফৎ স্বাধীনতার কোনরূপ সনদ ঘোষণা—করেছিলেন বলে জানা যায় না। এই সময় থেকে আরম্ভ করে ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় পর্যন্ত এই শহরের বিভিন্ন কর্মীরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন রকমের কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের স্বাধীনতা শহরবাসীরা দাবী করেন ১৯৪৬ সালে। কি কারণে যে এত বছর ধরে তাঁরা কোনরকম স্বাধীনতা দাবী করেন নি তা অনেক অনুসন্ধান করেও জানা গেল না।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগল ততই এই শহরবাসীরাও স্বাধীনতা লাভের জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় ফরাসী শাসকগোষ্ঠীও বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন এবং স্থানীয় জনসাধারণের হাতে অর্থনৈতিক অধিকার ও শাসনকার্য পরিচালনার আংশিক অধিকার প্রদান করেন।

১৯৪৭ সালে এপ্রিল, মে ও জুন এই তিনমাস ব্যাপী স্থানীয় প্রতিনিধি পরিষদ ও জাতীয় গণতান্ত্রিক দল—এই দুটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে ফরাসী কর্তৃপক্ষের সমীপে বার বার স্মারকলিপি পেশ করেন। এই সময়ের অবস্থা লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে ফরাসী প্রশাসকেরা খুব শীঘ্রই শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। অবশেষে ৮ই জুলাই (১৯৪৭) থেকে ফরাসী ভারতের গভর্নর মসিয়ে বার্ঁ (C. F. Baron) চন্দননগরে উপস্থিত হইয়া এখানকার ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের উপনিবেশ বিষয়ক মন্ত্রীর মতামত ঘোষণা করেন, ইতিমধ্যে ৩০শে জুন তারিখে এক আদেশ বা ডেক্রের (Decre) বলে "সাধারণ শাসন পরিষদ" গঠন ও এদেরই হাতে আংশিক ক্ষমতা হস্তান্তরের আদেশ জারী করেন। উপরোক্ত বার্ঁ সাহেবের ঘোষণাতেও এই আদেশের উল্লেখ ছিল এবং এই আদেশ বলবৎ হওয়ার দিন ধার্য্য হয় ১৫ই আগষ্ট।

ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভাবে গঠিত এই অন্তর্বর্তীকালীন বা অস্থায়ী শাসন পরিষদের হস্তে শহরের শাসনভার অর্পণ করা হয়। কিন্তু এই শাসন পরিষদের ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে সীমাবদ্ধ করায় শহরের অধিবাসীরা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না—কারণ তাঁরা অতীতে দাবী করে ছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতা। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালনের দিনে চন্দন নগরের অধিবাসীরা ভারতীয় জাতীয় পতাকা স্থানীয় প্রশাসক ভবনের শীর্ষে উত্তোলন করবার জন্য বিশেষ আগ্রহী হয়ে পড়েন। শহরবাসীদের তখনকার মত উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য স্থানীয় ফরাসী প্রশাসক শুধুমাত্র এই দিনের জন্য ভারতীয় জাতীয় পতাকা প্রাসাদশীর্ষে উত্তোলনের অনুমতি প্রদান করেন। ভারতীয় জাতীয় পতাকা ব্যবহার সম্বন্ধে মঁসিয়ে বাঁর এইভাবে নির্দেশ দেন যে ১৫ই আগষ্টের পরবর্তীকালে সকল দিনের জন্যই ফরাসী ও ভারত এই দুই জাতীয় পতাকা প্রশাসক ভবনের প্রাঙ্গণে পাশাপাশি উত্তোলন করা চলবে।

১৫ই আগষ্ট ভারতীয় রাষ্ট্রের পতাকা উত্তোলন প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ বিশেষভাবে প্রয়োজন। সামান্য কিছু মাত্রায় স্বাধিকার পাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হওয়া এবং পরস্পরের মধ্যে আত্মকলহে লিপ্ত হওয়া এই সময় থেকেই আরম্ভ হয়। যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান এতদিন পর্য্যন্ত এই শহরে কোনও শাখা বিস্তার করতে সমর্থ হয় নি, সেই প্রতিষ্ঠানেরই নাম নিয়ে "কংগ্রেস কর্ম্মী পরিষদ" নামে একটি সংগঠন সৃষ্টি করা হয়। এই সংগঠনের প্রভাব ও প্রতিপত্তি খু-ই নগণ্য ছিল, অথচ এই সংগঠনের উদ্যোক্তারাই পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসের প্রধান শ্রীঅতুল্য ঘোষকে পতাকা উত্তোলনের জন্য অনুরোধ জানিয়ে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু এর ফল সম্পূর্ণ বিপরীত হয়। কারণ স্থানীয় মেয়র শ্রীকমল ঘোষ ফরাসী আইন অনুযায়ী পতাকা উত্তোলনের অধিকার একমাত্র তাঁরই, এই দাবী জনসমক্ষে উপস্থাপিত করেন এবং তিনিই স্বহস্তে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। ফলে শ্রীঅতুল্য ঘোষ কর্তৃক পতাকা উত্তোলন করা সম্ভব হয় নি।

ঠিক এই অবস্থায় স্থানীয় অধিবাসীরা পূর্ণ স্বাধীনতা থেকে অনেক দূরে রয়ে গেলেন। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার —যাকে রাজনীতিতে Right for self determination বলা হয়, সেই অধিকারলাভ কংগ্রেসও তাও খুবই সীমিত ছিল এবং ভারতের ১৫ই আগষ্ট ও চন্দননগরের ১৫ই আগষ্ট-এর মধ্যে প্রভেদ অনেক। এই অবস্থায় চন্দননগরের অধিবাসীরা স্থির থাকতে পারলেন না। এইভাবে কিছুদিন মনোনীত একটি পরিষদ দ্বারা স্থানীয় শাসন কার্য্য চলতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী ভারত শাসনব্যবস্থার প্রতিনিধি হিসাবে স্থানীয় ফরাসী শাসন পরিচালকও সর্ব্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বিদ্যমান থাকেন।

যে স্বাধিকার লাভের আশায় চন্দননগরবাসীরা খুবই আগ্রহান্বিত ছিলেন তা যে এইভাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার মত তাঁদের হাতে আসবে এবং সার্বভৌম ক্ষমতা যে ফরাসী শাসকদের হাতেই রয়ে যাবে এই ধরণের চিন্তা তাঁরা কোনদিনই করেন নি। শহরবাসীরা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হলেও পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের আগ্রহ সকলের মধ্যেই ছিল। অবশ্য ফরাসী জাতীয় বা স্থানীয় প্রশাসকের অনুগ্রহপুষ্ট মুষ্টিমেয় লোক এই শহর যাতে বরাবরই ফরাসীদের অধীনে থাকে সেই উদ্দেশ্যে খুব গোপন ভাবে জনমতকে বিপথে চালিত করার প্রয়াস পেয়েছিল। সমগ্রভাবে শহরবাসীর স্বাধীনতা লাভের অদম্য আগ্রহকে কোনমতেই বাধা দেওয়া যায় না, এই অবস্থা লক্ষ্য করে ১৯৪৭ সালে ২৩শে নভেম্বর তারিখে আরেতে (ARETE) বা আইনের দ্বারা অনুযায়ী এই শহরকে "মুক্তনগরী" (Villelibre) বলিয়া ঘোষণা করেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী পূর্বের প্রতিষ্ঠিত শাসন পরিষদ বাতিল করা হয় এবং ২১ জন সদস্যকে লইয়া অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন পৌরসভা ও শাসনপরিষদ গঠিত হয়।

অদূর ভবিষ্যতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া অপেক্ষে মনোনীত এক শাসন পরিষদই ক্ষমতায় আসীন হন। ঠিক এই অবস্থায় এই শাসন পরিষদের ক্ষমতা কি ধরণের ছিল তা বিচার করতে গেলে "মুক্ত নগরী" ঘোষণা উপলক্ষ্যে ফরাসী প্রজাতন্ত্র প্রতিনিধি মঁসিয়ে বার' (Baran) এর ভাষণের উল্লেখ প্রয়োজন। এই ভাষণে মঁসিয়ে বার' বলেছেন—"আজ হইতে চন্দননগর 'মুক্তনগরী' জনসাধারণ

দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত শাসন-পরিষদ শাসিত একটি ছোট স্বাধীন রাষ্ট্র"। আবার একথাও তিনি বলেন—"ইহা নিশ্চিত যে ফিলীর সহিত আলোচনার সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত চন্দননগরকে আমরা যেরূপ সর্ব্বরকমে সম্ভবপর স্বাধীনতা অর্পণ করিয়াছি তাহা অপেক্ষা উত্তম ও ন্যায় সঙ্গত কিছু সিদ্ধান্ত হয় না।" এই অবস্থা থেকে অনুমান করা চলে যে চন্দননগরবাসীরা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা থেকে অনেক দূরে রয়ে গেলেন, এমনকি যে শাসন পরিষদ এই শহরের শাসনভার গ্রহণ করেন তাঁদের ভাষায়ও হতাশার সন্ধান পাওয়া যায়। শাসন-পরিষদের মুখপত্র "চন্দননগর গেজেট" এর ১ম বর্ষ-২য় সংখ্যা, যাহা ২৪শে জানুয়ারী (১৯৩৮) তারিখে প্রকাশিত হয়—এর থেকে জানতে পারা যায়। উক্ত গেজেটে শাসন পরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবটি নিম্নরূপ ছিল—"এই নভেম্বর ফরাসী কর্তৃপক্ষের ঘোষণায় চন্দননগরকে মুক্তনগরী স্বীকার করিয়া চন্দননগরবাসীকে স্বরাষ্ট্র পরিচালনার যে অধিকারটুকু দান করা হইয়াছে তাহাকে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছিনা। চন্দননগর চাহে—"ফরাসী ভারত অথবা ফ্রান্সের কবল হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বীয় ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে। এই অধিকার দুইমাসের মধ্যে স্বীকৃত না হইলে আমরা তাহাদের ভারত ত্যাগে বাধ্য করিবার পন্থা গ্রহণ করিব। আরও সিদ্ধান্ত হয় যে এই প্রস্তাব ফ্রান্স মন্ত্রিসভার নিকট প্রেরিত হউক।"

এই প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং এই প্রস্তাব যথানিয়মে ফ্রান্সে মন্ত্রিসভার নিকট প্রেরিত হয়। শাসন পরিষদের এই ধরণের প্রস্তাব গ্রহণ করা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে সহরের আভ্যন্তরীন শাসনের স্বাধিকার লাভ করা সত্ত্বেও ফরাসী জাতির প্রতি আনুগত্য কাহারও কাম্য ছিলনা এবং তাঁদের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের দাবী থেকে অনেকখানি দূরেই তাঁরা রয়ে গেলেন।

অবশ্য এই অবস্থায় যে সহরবাসীরা যে এই ক্ষুদ্র শহরটিকে নিয়ে একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের আশা করতেন এ কথা মনে করবার কোনও কারণ নেই। কারণ তাঁদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ছিল বিনা সর্তে এবং সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে ভারত রাষ্ট্রের অঙ্গীকৃত হওয়া। এই লক্ষ্য ছিল বলেই তাঁরা আর কালক্ষেপ করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

শাসন পরিষদের স্বাধীনতা লাভের জন্য অনেকখানি সততা থাকা সত্ত্বেও এবং প্রকৃত অনেককিছু জনহিতকর কাজ করা সত্ত্বেও এই সময়ে দেখতে পাওয়া গেল যে পরিষদ বা পৌর সভার কিছু সদস্য পদত্যাগ করলেন। আবার প্রতিনিধি সভার বাইরের অনেকে এই পরিষদের সততার উপর আস্থা হারালেন। অবস্থা দেখে মনে হল যেন স্থানীয় পরিষদের প্রতিনিধিবর্গ ফরাসী শাসকদের মতই অবিশ্বাসের পাত্র। শহরবাসীর যেন একটা বড় অংশ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে আত্মকলহে লিপ্ত হলেন এবং এসব অশান্তির মূলে ভারতীয় এসাকার কংগ্রেস, সোস্যালিষ্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক ও কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতাদের যোগাযোগ ছিল। রাষ্ট্রীয় স্বাধিকার লাভের সামান্য সুযোগেই জন্ম নিল কয়েকটি রাজ নৈতিক দল—যার কোনটিরই দু এক বছর আগেও কোনও অস্তিত্ব ছিলনা।

এই সময়ের শাসন পরিচালনার পদ্ধতিও খুব বিচিত্র ধরণের ছিল। শহরের সকল বিষয়ে শাসন পরিচালনার ক্ষমতা পরিষদের হাতে থাকলেও পরিষদ বহির্বিষয়ক সকল বিষয়ই ফরাসী ভারত শাসন পরিষদের সভাপতির স্থানীয় প্রতিনিধি অর্থাৎ স্থানীয় প্রশাসককে জানাইতে হইত। সার্বভৌম ক্ষমতা ফরাসীদের হাতে থাকলেও অনেকটা দ্বৈতশাসন প্রচলিত ছিল।

অপরদিকে আবার ভারতরাষ্ট্রের বা পশ্চিমবাংলার নেতৃবৃন্দের পরামর্শ গ্রহণ ও সেইভাবে শহরের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করার উদ্দেশ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবার সুযোগও ছিল। এই সময় থেকেই সহরবাসীরা ভারতের সঙ্গে যোগদান করবার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে পড়েন। শহরের কোন কোন দল অতিমাত্রায় আগ্রহ প্রকাশ করবার ফলে সত্যাগ্রহ, অনশন—ওই সব পথও গ্রহণ করেন। ফলে স্থানীয় শাসন পরিষদ বিশেষ ভাবে বিব্রত বোধ করেন।

অনেক সময়ে চন্দননগর শহরের এই অচল অবস্থার জন্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উপদেশ ও সাহায্য প্রার্থনা করা হয় এবং স্থানীয় জনসাধারণকে কিছুকাল ধৈর্যধারণ

করতে উপদেশ দেন। এই সব নেতাদের মধ্যে শ্রীনেহরু, সর্দার প্যাটেল ও রাজাজী বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। কিন্তু বিপদ হল এই যে, যে সব দল আন্দোলন করতে অভ্যস্ত তাঁরা কিছুতেই এই সব নেতাদের মূল্যবান্ উপদেশ অনুসরণ করতে চাইলেন না। ফলে বেশ কিছু-কাল শাসন পরিষদের পক্ষে শান্তি বজায় রাখা খুব কষ্ট-সাধ্য হয়ে পড়ে। একদিকে যেমন বিদ্রূপবান বিরোধী-দলের অশান্তির প্রয়াস, তেমনি গোড়ার দিকে পুলিশ-ব্যবস্থা চালনার অধিকার পরিষদের হাতে না থাকায় পরিষদ ঠিকমত শাসন পরিচালনা করতে অক্ষম ছিলেন। পরবর্তীকালে যখন পুলিশ ও বিচার বিভাগের দায়ীত্ব পরিষদের হাতে এল তখন আবার পণ্ডিচেরীর ফরাসী-ভারত-সরকারের প্রতিশ্রুত অর্থ না পাওয়ায় বিশেষ সংকটের সম্মুখীন হতে হল।

এই সময়ের ফরাসী শাসকবৃন্দের মনোভাব যথেষ্ট উদার না হওয়ায় শহরবাসীরা খুব স্বাভাবিকভাবেই অস্থির হয়ে পড়েন। কারণ গোড়ার দিকে অপরাপর ভারতীয় উপ-নিবেশসহ ভারতকে হস্তান্তর করা হবে এবং এই কারণে ভারত সরকারের সঙ্গে সলা পরামর্শে অনেক সময় লাগবে বলে জানান। পরে যখন তাঁরা দেখলেন যে জনমতের চাপে তাঁদের ছেড়ে যেতে হবেই তখন তাঁরা এটি প্রথম ভারতীয় উপনিবেশ—যা হস্তান্তর করতে হবে সে জন্য এ ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন—এই ধরণের একটি যুক্তি খাড়া করলেন। অবশ্য শেষোক্ত যুক্তিটি ভারতীয় সরকারও স্বীকার করেছিলেন। ইতিমধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ফরাসী উপনিবেশ ভিয়েৎনাম দখল হয়ে যাওয়ায় ফরাসী শাসকদের মনে কিছুটা উদারতা এল; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা বিনা পরীক্ষায় এই শহর হস্তান্তরের জন্য রাজী হলেন না। এই অবস্থায় শহরবাসীর দাবীকে আংশিকভাবে রূপ-দান করা এবং ফরাসী রাষ্ট্রকেও মর্যাদা দেওয়া—এই উভয় উদ্দেশ্য নিয়ে ভারত সরকারের মধ্যস্থতায় এই সংঘের ভারতে যোগদান অথবা পূর্ববৎ ফরাসী রাষ্ট্রে অবস্থান বিষয়ে এক গণভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। শহরবাসীরা সানন্দে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। দুইজন আন্তর্জাতিক আইনবিদকে শহরের এই গণভোট চলাকালীন অবস্থার পর্যবেক্ষক হিসাবে প্রেরণ করা হয়।

গণভোট গ্রহণের মাত্র ৪।৫ দিন পূর্বেও শহরের অবস্থা মোটেই শান্তিপূর্ণ ছিলনা। এমন কি স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলিও সম্পূর্ণভাবে শান্তি বজায় রাখবার মত কাজ করেন নি। এই সময় শুধু ভারত সরকার নয়, স্থানীয় শাসন পরিষদও শান্তি রক্ষার সমস্যার সম্মুখীন হলেন। তাই নিকটবর্তী ভারতীয় পুলিশবাহিনীর সাহায্য এসে গেল। এখানে মুষ্টিমেয় ফরাসী শাসক-গোষ্ঠির তাঁবেদার শ্রেণীর অধিবাসীও কিছু ছিলেন এবং তাঁরাও গোলো-যোগের সুযোগে যাতে গণভোট পণ্ড করা যায় সেইভাবে চেষ্টা করছিলেন। স্থানীয় শাসনপরিষদও কয়েকটি বিরোধী দলের উপর ঠিক ভরসা করতে পারছিলেন না। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল গণভোট গ্রহণের দিন। ভারতের যে সমস্ত রাজনৈতিক দল এখানে শাখা প্রসারিত করেছিলেন তাঁরা সকলেই হঠাৎ শান্তিপূর্ণভাবে ভোটদানের জন্য প্রস্তুত হলেন। ১৯৪৯ সালের ১৯শে জুন এই গণভোট (Referendum) গ্রহণ করা হয় এবং শত-করা ৯৯ জন ভারতে যোগদানের পক্ষে ভোট দেন। এই দিনই স্থির হয় যে এই শহর ভারতে যোগদান করবে। এই ভাবে শহরবাসী বিশ্বকে প্রমাণ করে দিলেন যে ভারতের অচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তাঁরা ভারতে ব্যতীত অন্য কোন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া কল্পনা করেন না। ভারতের নেতৃবৃন্দও এতে খুবই আনন্দিত হন—কারণ এই গণভোট বা তার ফলাফলের বিষয়ে তাদেরও যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ ছিল।

এই ব্যাপারে স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিও ধন্যবাদের পাত্র, কারণ সমস্ত বিভেদ ভুলে তাঁরাই এই ভবিষ্যৎ রচনা করলেন। যে অশান্তিজনক অবস্থাওয়ার এই শহরের অধিবাসীরা গণভোটের দিকে এগিয়েযাচ্ছিলেন তাতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দেরও যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। শহরবাসীরা নিজেদের মধ্যে যত বিভেদই থাকনা কেন, বিদেশী শাসনকে নিশ্চিহ্ন করতে ভারতের সঙ্গে শহরবাসীরা যে এক জাতি এক প্রাণ—এতে তাহাই প্রমাণিত হল।

অদূর ভবিষ্যতে চন্দননগর শহরটি ভারতের অন্তর্গত হবে এই রকম জনমত দেওয়ার পর ভারত ও ফরাসী সরকারের মধ্যে নানারকমের প্রয়োজনীয় বৈঠক ও আলাপ আলোচনা চলতে থাকল। কারণ ভারত সর-

কারের পক্ষে খুব তাড়াতাড়ি ভাবে একটি অপর শাসকদের উপনিবেশ গ্রহণ করায় অনেক অসুবিধা ছিল। এছাড়া আবার এই শহরবাসীদের ভবিষ্যৎ বিষয়ে মতামত ও ইচ্ছা গ্রহণ করবার জন্য কিছু সময় দরকার ছিল। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণের কিছু অংশ এই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য সময় দিতে নারাজ। এ ছাড়া শাসন পরিষদের বিরুদ্ধেও বিভিন্ন দল উপদল আন্দোলনে নেমে পড়লেন। শহরে আবার অশান্তির সৃষ্টি হল। ফলে চূড়ান্তভাবে চুক্তির মাধ্যমে শহর অধিকারে নেওয়ার আগেই, ভারত সরকার অস্থায়ীভাবে শাসনভার গ্রহণ করলেন ১৯৪০ সালের ২রা মে। আইনত-হস্তান্তর ১৯৪১ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী এবং এই চুক্তিপত্রে ভারত ও ফরাসী সরকারের প্রতিনিধি স্বাক্ষর দান করেন এবং এই বছরের ১১ই এপ্রিল তারিখে ফরাসী জাতীয় পরিষদ এই চুক্তি অনুমোদন করেন। ৩০শে জুন তারিখে ভারতীয় রাষ্ট্রপতি এই শহর দখল নেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি বিধান বলবৎ করেন—যার ফলে সম্পূর্ণ আইনানুগভাবে শহরটি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানে একটি বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা বিশেষ প্রয়োজন। যেমন শহরটি যখন গণভোট দিয়ে স্থির করেছেন যে ভারতে যোগদান অবধারিত, তখন প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুসরণ করবার সময় না দিয়ে হস্তান্তর চুক্তি গ্রহণ করা বা বলবৎ করার সময় না দিয়ে আগে থেকে কার্যতঃ হস্তান্তর করতে বাধ্য করেছিলেন এই সহরের অধিবাসীরা। এরকম দৃষ্টান্ত খুবই বিরল—বিশেষ যেসব এলাকার ভবিষ্যৎ গণভোটের দ্বারা নির্দ্ধারিত হতে যায় সেইসব জায়গার ক্ষেত্রে। ভারতীয় রাষ্ট্রপতি যে উভয় জাতির মধ্যে অনুষ্ঠিত চুক্তির বলে সহরটিকে গ্রহণ করলেন তাঁর নিজস্ব প্রচারিত বিধানবলে, ঠিক সেই সময় থেকেই শহরটিকে ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্গত বলে মনে করতে হবে এবং তার আগে পর্য্যন্ত সমস্ত সময়ের জন্য উহা ফরাসী প্রজাতন্ত্রের অধীন বলে মনে করতে হবে। আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী ঠিক কবে থেকে সহরটি ফরাসী শাসনমুক্ত হল এবিষয়ে অনেকে। পরিষ্কার ধারণা না থাকায় একই সঙ্গে ফরাসী ও ভারতের পতাকা ব্যবহার করার জন্য প্রশাসককে জীতি প্রদর্শন প্রভৃতি অনেক দুষ্টিকটু ঘটনাও সংঘটিত হয়। তবে ফরাসীভারতের সর্ব্বপ্রথম উপনিবেশ বা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হল—এই হিসাবে শহরবাসীর রাজনৈতিক চেতনাকে প্রত্যেক ভারতীয় অধিবাসী শ্রদ্ধা করে থাকেন।

তথ্য সংগ্রহের সূত্র

১। সংক্ষিপ্ত চন্দননগর পরিচয়—শ্রীহরিহর শেঠ।
২। মুক্তিসাধনায় চন্দননগর—শ্রীহরিহর শেঠ।
৩। চন্দননগর—পঃ বঃ সরকার।
৪। "চন্দননগর গেজেট"—চন্দননগর শাসনপরিষদের মুখপত্র। —প্রথম হইতে পঞ্চম সংখ্যা।
৫। জয় বিশ্ব—স্থানীয় পত্রিকা।
৬। সেবক—স্থানীয় পত্রিকা।
৭। আজকাল—স্থানীয় পত্রিকা।

ফুলবন পড়ে আছে

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

সোনার স্বপন জাগাইল সে যে আমার জীবন-মাঝে
স্বপন ছেড়েছে, ছবি মিলায়েছে, দূরে, অভিমানে লাজে ;
এসেছিল যবে, বসেছিল কাছে, দিল হাসি উপহার
সলম্ব আনিল বাতাসে বহিয়া, কেশের সুরভি তার ;

আজ তার স্মৃতি বেদনা জাগায়, নিভৃত হৃদয়-কুঞ্জে,
কোটে নাক ফুল, ছোটে নাক অলি, কাননে পুঞ্জে পুঞ্জে ;
সেদিন দেখেছি, সোনার প্রতিমা, কমল-কলির সাজে,
সেদিন শুনেছি, মধুভরা গীতি তাহার কথার মাঝে ;

যাহারে ঘিরিয়া ফুলদের হাসি, সেই যে চলিয়া গেছে
নিদাঘের তাপে শুষ্ক নিষ্ফল, ফুলবন পড়ে আছে।

বাসন্তী মাঝরাতের স্বপ্ন ·

* · · শ্রীমতী লীলা বিদ্যান্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

চতুর্থ অংক

প্রথম দৃশ্য—বন।

টিটানিয়া, বটম, পরীদের প্রবেশ ; পিছনে ওবারণ অদৃশ্য।

টি। এসো, ব'সো এই ফুলের বিছানায়—আর আমি তোমার সুন্দর দুটি গালে আদর করি। মুসমাতি, সুগন্ধি গোলাপ, পরিয়ে দিই তোমার চিকন মসৃণ মাথায়

চুমো খাই তোমার দুটি সুন্দর লম্বা কানে,

ওগো সুন্দর মরি মরি।

ব। মটর ফুল, কোথায় ?

ম। রেডি।

ব। আমার মাথাটা একটু চুলকে দিন তো, মটরফুল। মাকড়সার জাল মশাই কোথায় ?

মা। রেডি।

ব। মসিঁয়ে মাকড়সার জাল, লক্ষ্মীটি মশাই, আপনি নিজের হাতিয়ার হাতে নিন, আর আমার জন্তে একটি লাল পাছাওলা ছোট্ট মৌমাছি আকন্দঝাড়ের ওপর থেকে মারুণ গিয়ে, আর শুনুন মশাই, তার মধুর থলিটা আমার জন্ত নিয়ে আসুন। আর যখন সেটা আনবেন তখন যেন আপনি বেশি ছট্‌ফট্ ক'রবেন না মশাই, দেখুন মশাই খেয়াল রাখবেন ঐ মধুর থলিটা যেন ফেটে না যায়। আমি চাই না যে মধুর থলি ফেটে গিয়ে আপনার গা'ময় মধুতে লচ্‌পচ্ হয়ে যায়, মশাই। কোথায় গেলেন মসিঁয়ে সরষে বীচি ?

স। রেডি।

ব। আসুন আপনার সঙ্গে হাত মেলাই। মসিঁয়ে সরষে বীচি, দেখুন আপনার আর অত কষ্ট ক'রে বিনয় প্রকাশ করতে হবে না, লক্ষ্মীটি মশাই।

স। আপনার জন্তে কী করব বলুন ?

ব। কিছুনা মশাই, শুধু কেবল কাঠবেলেরো মাকড়সার ভাল মশাইকে একটু আমার চুলকতে সাহায্য ক'রে দিন। আমার একবার নাপিতের কাছে যেতেই হবে মশাই, কারণ আমার মনে হচ্ছে যে আমার মুখে দাড়ি বেজায় বেড়ে গেছে। আমি আবার এমনি কাতুকুতু-লাগা গাধা যে আমার গায়ে যদি চুলের সুড়সুড়ি লাগে তো আমি না চুলকে থাকতে পারি না।

টি। বলো না, মিঠুয়া, তুমি গান শুনবে ?

ব। তা আমার গান শুনবার কান নেহাৎ মন্দ নয়। বীণা-বেণুগুলো নিয়ে এসো।

টি। নয় তো বল, মিঠুয়া গো, তোমার কী খেতে মন যায়।

ব। সত্যি কথা বলতে কি এক শেক আনোয়ারের দানা। ঐ যে তোমার শুকনো ওটের দানা, সেও চিবোতে বেশ। আমার মনে হচ্ছে, আমার এক বোতল ঘাস খেতে ভারি ইচ্ছে করছে, মিষ্টি ঘাস, চমৎকার ঘাস, ওঃ কি আর তুলনা আছে ?

টি। আমার একটি খুব সাহসী পরী আছে, সে গিয়ে কাঠবেড়ালির বাসা খুঁজে তোমার জন্তে তাজা বাদাম এনে দেবে।

ব। তার চেয়ে আমার দু'এক মুঠো শুকনো মটর ফলিয়া পেলে ভাল হ'ত। কিন্তু দেখ—তোমার লোকেরা যেন আমায় বিরক্ত না করে। আমার যেন একটু ঘুমের আমেজ আসছে।

টি। তুমি ঘুমোও, আমি তোমার বাহুপাশে বেঁধে রাখব। পরীরা চ'লে যাও, তোমরা সব দূরে দূরে বেড়াও গিয়ে। এমনি করেই বন্যলতা, (wood bine) মিষ্টি হানিসাকল (honey suckle) সোহাগে জড়িয়ে

ধরে, এমনি করেই যেরে আইভিলতা ঘিরে ধরে এলম্ গাছের বাকল ঢাকা অঙ্গকে। ওগো, আমি যে তোমায় কত ভালোবাসি। আমি তোমার প্রেমে দিশে-হারা। (ওরা ঘুমুবে)

(ওবারণ এগিয়ে আসছে, পাকের প্রবেশ)

ও। এসো রবিন, দেখছ কী চমৎকার দৃশ্য। এবার কিন্তু ওর এই অন্ধ ভালোবাসা দেখে আমার মায়া হচ্ছে। কারণ এই কিছুক্ষণ আগে এই বনের পেছন দিকে ওর সংগে আমার দেখা হয়েছিল। ও তখন এই নোংরা হতভাগাটার জন্যে বনের যত মিষ্টি সুগন্ধি ফুল খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তখন আমি ওকে খুব ব'কেছি আর তাড়া ক'রেছি, কারণ সেই সময়ে ও তাজা সুগন্ধি ফুলের দুটো গ'ড়ে এই হতভাগীটার লোমে-ভরা মাথায় পরিয়ে দিয়েছিল। আর সেই যে শিশির যা কখনো কখনো পুষ্প মুকুলের ওপরে প্রাচ্য দেশের গোল গোল মুক্তোর মতো ঝুলতে থাকে, সেগুলো এখন সুন্দর মুখগুলোর চোখের পাতায় অশ্রুবিন্দুর মতো টল্‌টল্ করছিল। ওরা যেন নিজেদের এই দুর্গতিতে কাঁদছিল। যখন আমি নিজের মনের সাধ মিটিয়ে ওকে বিদ্রূপ ক'রে নিলাম আর ও মিনতি ক'রে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে লাগল, তখন আমি ওর কাছে ওর সেই পোষা ছেলেটাকে চাইলাম। ও তৎক্ষণাৎ ছেলেটিকে দিয়ে দিতে রাজি হ'য়ে গেল। ও নিজের এক পরীকে দিয়ে সেই ছেলেটিকে পরীদেশে আমার নিকুঞ্জে পাঠিয়ে দিল। এখন আমি সেই ছেলেটিকে পেয়ে গেছি, তাই এবারে আমি ওর চোখকে এই জঘন্য দৃষ্টিদোষ থেকে মুক্তি দেব। আর লক্ষ্মীটি পাক, তুমি এই এথেন্সের গাঁওয়ার-টার মাথা থেকে এই বদ্‌লে যাওয়া মুণ্ডুটা খসিয়ে নাও। যখন অন্য সবাই জেগে উঠবে, তখন ও যেন জেগে উঠে সবার সংগে এথেন্সে ফিরে যায়। ওরা যেন রাতের এই অদ্ভুত ঘটনাগুলোকে স্বপ্নের নিদারুণ উৎপাত ছাড়া আর কিছু বলে বুঝতে না পারে। কিন্তু তার আগে আমি পরীরাণীর মন্ত্রের ঘোর কাটিয়ে দিই।

যেমন ছিলে তেমনি হও ;

(ওর চোখে ওষধি ছুঁইয়ে দেবে)

ফিরে আসুক তোমার সহজ দৃষ্টি—
মদনের ফুলের ওপরে
চন্দ্রমল্লিকা মুকুলের
আছে এই শুভ শক্তির
আশীর্বাদ।

জাগো টিটানিয়া, প্রিয়া আমার, রাণী আমার।

টি। ওবারণ আমার, আমি যে কী সব স্বপ্ন দেখেছি। আমার মনে হ'চ্ছিল যেন আমি একটা গাধার প্রেমে প'ড়েছি।

ও। ঐ যে তোমার সেই প্রণয়ী ঘুমিয়ে আছে।

টি। এ সমস্ত ঘটল কেমন ক'রে ? ওঃ, এখন আমার চোখে ওটাকে কী বিশ্রী লাগছে।

ও। একটুখানি চুপ করো তো, রবিন, ওর মাথাটি খুলে নাও। টিটানিয়া, তোমার গানের বল ডাক, আর এই পাঁচজন ঘুরন্ত লোকের চেতনাকে সাধারণ ঘুমের চেয়েও বেশি ক'রে অচেতন ক'রে দাও।

টি। গান শুরু করো, এই, শুরু করো গান, ঘুম-পাড়ানি গান।

প। এবারে জেগে উঠে তোর নিজেরই বোকা চোখে পুট পুট ক'রে তাকাস্।

ও। গান চালিয়ে যাও। (গান চলবে)

এসো রাণী আমার, এই যে ধর আমার হাত।
দোলা লাগাও এই মাটিতে
যেখানে ঘুমিয়ে আছে এই প্রণয়ীরা।
এবারে তোমাতে আমাতে
হ'য়েছে নতুন ক'রে মিলন
তাই কাল মধ্য রাতে
ডিউক থিসিয়াসের ঘরেতে
আমরা নাচ্‌ব উল্লাসে মগন।
আমরা আশীর্বাদ করব
ঐ ঘরকে, শুভ সন্ততির জন্যে।
সেখানে থিসিয়াসের সংগে
আরো বিয়ে হ'বে এই বিশ্বস্ত প্রণয়ী যুগলদের
আনন্দ—সমারোহে।

প। পরী-রাজ মন দিয়ে শুনুন

আমি শুনছি ঐ যে, ভোরের
চড়ুই পাখীর ডাক।

ও। তা হ'লে রাণী আমার, নীরস বিবাদে
আমরা অনুসরণ করব রাতের ছায়াকে।
আমরা তো নিমেষে ঘুরে আসতে পারি
এই পৃথিবীর চত্বরে—
ঐ পথিক চাঁদের চেয়েও তাড়াতাড়ি।

টি। এসো, রাজা আমার, আর
উড়ে চলতে চলতে
বলো আমায় যা' যা' ঘটেছে
আজকের এই রাতে
কেমন ক'রে আমার তোমরা—
দেখলে ঘুমিয়ে পড়তে
এই মাটিতে, এই মাটির
মানুষদের মাঝে। [প্রস্থান

(তেতরে শিঙা বেজে উঠবে)

(থিসিয়াস, হিপোলাইটা, ইজিয়াস এবং পরিজনদের প্রবেশ)

থি। তোমাদের মধ্যে একজন চলে যাও, এই বনের রক্ষককে ডেকে আনো কারণ আমি এই বন পর্যবেক্ষণ সারা ক'রে নিয়েছি, আর যেহেতু এখন দিনের অরুণ দূত দেখা দিয়েছে—তাই এবারে আমার প্রিয়া আমার শিকারী কুকুরদের গলার গান শুনবে। পশ্চিমের উপত্যকায় কুকুর-গুলোর বাঁধন খুলে দাও. ওদের এখানে নিয়ে এসো, আর ডেকে আনো বন-রক্ষককে। সুন্দরী রাণী গো, এসো আমরা চ'ড়ে যাব ঐ পাহাড়ের শিখরে আর শুনব কুকুর-দলের মিলিত চীৎকারের সুরেলা গোলমাল, আর তারই প্রতিধ্বনিত রেশ।

হি। একবার আমি গ্রীকবীর হারকিউলিস ও কেড-মাসের সংগে ছিলাম। ওরা তখন ক্রীটের এক বনে ভালুক শিকার করতে স্পার্টার কুকুর নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবু আমি এমন দুর্জয় কুকুরেই ডাক আর কখনো শুনিনি। কারণ এই উপবনের সীমানা ছাপিয়ে ঐ আকাশ, ঐ ঝরণার জল, আর আশে-পাশের সমস্ত জায়গা জুড়ে মনে হ'ল যেন একই সংগে একটা গভীর চীৎকার জেগে উঠল। এমন সুরেলা গোলমাল, এমন মধুর বজ্র গর্জন আমি আর কখনো শুনি নি।

থি। আমার কুকুরগুলো ঐ স্পার্টান জাতের কুকুর দিয়েই প্রজনন করা হয়েছে, স্পার্টার কুকুরের মতই ওদের চোয়াল, গায়ে তেমনি হ'লদে ফুটকি। ওদের মাথার দুপাশে কানগুলো এমনি লম্বা এমনি ঝুলে পড়েছে যে তাতে ক'রে ভোরের শিশিরকে ওরা মুছে মুছে চলতে থাকে। ওদের হাঁটুগুলো বাঁকানো, ওদের গলার নীচে ঝুলে পড়েছে ভাঁজে ভাঁজে চামড়া ঠিক ষেণালীর ষাঁড়ের মতো। ওরা শিকারকে ধীরে ধীরে অনুসরণ করে বটে—কিন্তু ওদের মুখগুলো একটার পর একটা এমন সাড়া দিয়ে চলে যে মনে হয় যেন একসার ঘণ্টা। এর চেয়ে সুরেলা চীৎকার, আর কখনো শিকারীর শিঙার প্রত্যুত্তরে জেগে ওঠেনি, শিঙার ধ্বনি শুনে উত্তেজিত হ'য়ে ওঠেনি, ক্রীটে স্পার্টায় বা থেসালীতে কোথাও কেউ এমনটি শোনে নি। তুমি নিজ কানে শুনে নিজেই একবার বিচার ক'রো। কিন্তু আরে থামো থামো, এ কোন অপ্সরীরা এখানে?

ইজি। প্রভু, এই যে আমার মেয়ে এখানে ঘুমিয়ে। এই যে সাইলেওারা, এই তো ডিমিট্রিয়াস আর এ-তো হেলেনা, বুড়ো নেদারের মেয়ে হেলেনা। আমি অবাক হ'য়ে ভাবছি—এরা সব একসংগে এখানে এল কী ক'রে?

থি। নিশ্চয় ওরা আজ সকালে উঠে বসন্তোৎসব করতে এসেছে। আর ওরা শুনেছে যে আমরাও এখানে আসছি, তাই আমাদের সম্মানে ওরাও এখানেই এসেছে। কিন্তু বলুন তো ইজিয়াস, আজই তো সেই দিন যেদিন হারমিয়া কোন্ পথ বেছে নেবে সেই জবাব দেবে।

ইজি। আজই প্রভু।

থি। যাও, শিকারীদের বলো শিঙা বাজিয়ে ওদের জাগিয়ে দিক্।

(নেপথ্যে হর্ণ ও চীৎকার-শব্দ)

(হা, হে, ডি, লা চমকে জেগে উঠবে।)

থি। সুপ্রভাত, বন্ধুগণ, সেণ্ট ভ্যালেনটিনের দিন, পাখীদের মিলন ঋতু তো শেষ হয়ে গেছে। এই বুনো পাখীরা কি এত দেরীতে তাদের মিলনের পালা শুরু করল?

লা। ক্ষমা করুন প্রভু।

(লাই এবং অন্য সবাই থিসিয়াসের সামনে নতজানু হবে)

থি। আপনারা সবাই উঠে দাঁড়ান। আমি জানি

আপনার দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু। তবে কেমন ক'রে এই বাস্তব সংসারে এরকম প্রশান্ত মিলন সম্ভবপর হ'ল যে শত্রুতা আর ইর্ষা পরস্পরের থেকে আলাদা হ'য়ে গেল, যাতে ক'রে শত্রুর পাশে তারও শত্রুতার ভয় রইল না?

লা। প্রভু, আমি অবাক হ'য়ে আপনার কথার জবাব দিচ্ছি: মনে হচ্ছে আমি যেন আধো-ঘুমে আধো-জাগা। কিন্তু আমি সত্যিই বল্‌ছি যে, সত্যিই আমি জানিনা যে আমি কেমন ক'রে এখানে এসে পড়েছি। কিন্তু মনে হচ্ছে—আমি সত্যি কথাই বল্‌ব, ও এইবার মনে পড়েছে বটে, এটা এমনি হয়েছে যে আমি হারমিয়ার সঙ্গে এসেছি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এথেন্স থেকে পালিয়ে অন্য কোথাও যাওয়া—যেখানে এথেন্সের আইনের হাত থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারব।

ই। হ'য়েছে হ'য়েছে, প্রভু, আপনি যা শুনবার তা শুনলেন। আমি আইনের সাহায্য চাই, ওঃ প্রতি আইনের বিধান প্রয়োগ করুন। ওরা পালিয়ে যেত, ওরা ঠিক যেত, আর এমনি করে ডিমিট্রিয়াস্, তোমাকে এবং আমাকে দুজনকেই ওরা ফাঁকি দিত। তোমাকে ঠকিয়ে তোমার স্ত্রীকে নিয়ে যেত, আর আমাকে ঠকিয়ে নিত আমার সম্মতি—আমার সম্মতি যে ও তোমার স্ত্রী হবে।

ডি। প্রভু, সুন্দরী হেলেন ওদের পালিয়ে আসার খবর আমাকে দেয়, ওরা যে পালিয়ে এই বনে আসবে—সেই কথা আমাকে বলে দেয়। তখন আমি রাগে অন্ধ হয়ে ওদের অনুসরণ করে এখানে আসি। সুন্দরী হেলেন নিজের ইচ্ছায় আমাকে অনুসরণ করে। কিন্তু যখান প্রভু আবার, আমি জানি না কোন যন্ত্র বলে—কিন্তু নিশ্চয়ই এটা কোন এক মন্ত্রবলেই ঘটেছে,—হারমিয়ার প্রতি আমার ভালোবাসা বরফের মতোই গলে ঘুরে বেরিয়ে গেছে। এখন ঐ ভালোবাসাকে আমার মনে হচ্ছে যেন কোন এক তুচ্ছ চকচকে খেলনার স্মৃতি, যা নিয়ে আমি শিশুকালে খেলে ছিলাম। আজ আমার সমস্ত বিশ্বাস, অন্তরের সমস্ত আন্তরিকতা, আমার চোখের একমাত্র আনন্দ ঐ হেলেন। প্রভু, হারমিয়াকে দেখার আগে ওকেই আমি বাগ্‌দান করেছিলাম। কিন্তু অসুস্থ লোকের যেমন খাবারে অরুচি হয়, তেমনি আমি ওর প্রতি বিমুখ হয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমি যেন আবার স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বাভাবিক রুচিও ফিরে এসেছে। ওই আমার প্রাণের খাদ্য, ওকে আজ আমি চাই, ওকে ভালোবাসি, ওরই জন্যে আগ্রহে অধীর হই, আর চিরদিনের জন্যে আমি ওরই কাছে সত্যের বাঁধনে বাঁধা থাকব।

থি। ওহে তরুণ প্রেমিকপ্রেমিকারা, এটা খুবই ভাল হ'য়েছে যে এখানে আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হ'য়ে গেল। এই আলোচনাটা আমরা আজকালের মধ্যেই আরো ভাল ক'রে শুনব। ইজিয়াস, আমি আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কাজ করব, কারণ আমাদেরই সঙ্গে মন্দিরে এই দুই জোড়া প্রেমিক প্রেমিকার চিরজীবনের বন্ধন বাঁধা হ'য়ে যাবে। আর এদিকে যেহেতু বেলা বেশ বেড়ে গেছে, তাই আমরা যে শিকার করা ঠিক ক'রেছিলাম, সেটা আজ থাক্ গে। চলুন আমরা তিন প্রণয়ী আর তিন প্রেমিকা, এথেন্সে ফিরে যাই, সেখানে আমরা খুব জাঁকজমক ক'রে তিনের আয়োজন করব। এসো হিপোলাইটা।

(থি, হিপো, ইজি আর অনুচরদের প্রস্থান)

ডি। ঐ দূরে কী কতকগুলো দেখা যাচ্ছে, যেমনি ছোট তেমনি অস্পষ্ট, যেন দূরের পাহাড় মেঘের মতো দেখাচ্ছে।

হা। আমার মনে হ'চ্ছে যেন আমার চোখ দুভাগে ভাগ হ'য়ে গেছে, আর আমি সব কিছুই দুভাগে ভাগ করা দেখতে পাচ্ছি।

হে। আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছে। আর আমি একটি মুক্তোর মতোই ডিমিট্রিয়াসকে ফিরে পেয়েছি—যা আমার অথচ আমার নয়।

ডি। আমার মনে হচ্ছে যেন আমরা এখনো ঘুমোচ্ছি, স্বপ্ন দেখ্‌ছি—আপনাদের কি মনে পড়্‌ছে যে এইমাত্র থিসিউস এখানে ছিলেন আর তিনি আমাদের বলেছেন তাঁর সঙ্গে যেতে।

হা। হ্যাঁ, আমার বাবাও ছিলেন।

হে। আর হিপোলাইটা।

লা। আর থিসিউস আমাদের বলেছেন, তাঁর সঙ্গে মন্দিরে যেতে।

ডি। তা হ'লে নিশ্চয় আমরা জেগেই আছি, চলুন আমরা থিসিউসের সঙ্গে যাই। আর পথে যেতে যেতে আমরা নিজেদের স্বপ্নের গল্প বল্‌ব। [প্রস্থান

(ওরা চ'লে যেতেই বটম জেগে উঠবে)

ব। আমার যখন কিউ আসবে তখন আমায় ডেকো, আমি জবাব দেব। এর পরে আমার কিউ হ'ল, "ওগো সুন্দর পিরামুস"।—এই, ও পিটার কুইন্স, হাপর-মেরামত-করনেওয়ালা ফ্লুট, কালাই-কর স্নাউট, টারভেলিং!—হে ভগবান, সবাই এখান থেকে চুপি চুপি স'রে পড়েছে, আর ঘুমন্ত অবস্থায় আমাকে ফেলে রেখে গেছে। আমি যে কী অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছি। আমি যে স্বপ্ন দেখেছি, সে যে কেমনতরো স্বপ্ন তা মানুষের বোঝার বাইরে। যে লোক এই স্বপ্নের কাহিনী লোককে বলে বেড়াবে—সে একটা আস্ত গাধা। আমার মনে হ'য়েছিল আমি যেন,—মনে হ'য়েছিল আমার যেন। কিন্তু যে লোককে ব'লে দেবে সে আমার কী—সে একটা গোদর্থ। আমি যে কী স্বপ্ন দেখেছি তা মানুষের চোখ কখনো শোনেনি, মানুষের কান কখনো দেখেনি, মানুষের হাত তা রেখে দেখতে পারে না, মানুষের জিভ তা ধারণা করতে পারে না, আর মানুষের অন্তর তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না। আমি পিটার কুইন্সকে বলব আমার এই স্বপ্ন নিয়ে একটি গীতিকা রচনা ক'রতে। সেই গীতিকার নাম হবে "বটমের স্বপ্ন"—কারণ এর কোন বটম বা তল নেই। আমি এটা ডিউকের সামনে একটা নাটকের শেষভাগে গেয়ে শোনাব। আচ্ছা, তার চেয়ে এটা আরো মানান সই হবে, আমি যদি এই গীতিকা আমার সেই প্রিয়ার মৃত্যুর পরে গান করি।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

এথেন্স,—কুইন্সের বাড়ীর একটি ঘর।

(কুইন্স, ফ্লুট, স্নাইট এবং টারভেলিংএর প্রবেশ।)

কু। তোমরা কি বটমের বাড়ীতে খবর নেবার জন্যে কাউকে পাঠিয়েছ? সে কি বাড়ী ফিরেছে?

টা। কেউ তার খবর বলতে পারছে না, নিশ্চয় তাকে বনদেবতারা নিয়ে গেছে।

ফ্লু। সে যদি না আসে তা হ'লে তো আমাদের প্লে গোল্লায় গেল। আমাদের প্লে তো আর হ'তে পারবে না, কী বল?

কু। ওকে ছাড়া প্লে তো সম্ভব হবে না, সারা এথেন্সে সে ছাড়া এমন কেউ নেই যে পিরামুসের পার্ট করতে পারে।

ফ্লু। না কেউ নেই। এথেন্সের ছুতোর মজুরদের মধ্যে সেই বুদ্ধিতে সবার সেরা।

কু। হ্যাঁ, আর দেখতেও সবচেয়ে ভালো, আর তার গলার মিষ্টি সুরের জন্যে তো সে একেবারে একটি প্যারামুর।

ফ্লু। বলো প্যারাগন, প্যারামুর মানে তো, ভগবান রক্ষে করুন, একেবারে বাজে তাই।

(স্নাগের প্রবেশ)

স্না। তাই সব, ডিউক মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছেন, আর তার সংগে আরও দু-তিনটি ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার বিয়ে হয়ে গেল। আমাদের এই ড্রামাটা যদি হয়ে উঠত, তাহ'লে আমাদের একটা হিল্লে হয়ে যেত।

ফ্লু। ওরে ঘোস্ত, বুলি বটম! এমনি ক'রে সে তার সারা জীবনের জন্যে দৈনিক ছ'পেনি করে ভাতা হারাল। এ হ'তেই পারে না—যে সে দৈনিক ছ-পেনির ভাতা পেত না। পিরামুসের পার্ট করবার জন্যে ডিউক যদি তাকে দৈনিক ছ-পেনি ভাতা না দিতেন তো আমি কী বলেছি। সে নিশ্চয় এই ভাতা পেতই পেত। পিরামুসের পার্ট করার জন্যে দৈনিক ছ-পেনি ভাতা, এটুকু যদি তাকে না দেওয়া হ'ত ত' তার চেয়ে তাকে কিছু না দিলেই হ'ত।

(বটমের প্রবেশ)

ব। বাছারা সব কোথায়, দোস্তরা কোথায় সব?

কু। বটম, ওরে আজ একী শুভদিন, একি শুভ দিন।

ব। মশাইরা আমি যা বলতে পারি তা অপূর্ব, অদ্ভুত, কিন্তু সে যে কী সে প্রশ্ন আমায় করবেন না, কারণ আমি যদি তা আপনাদের ক'ছে বলি তো আমি এথেন্সের লোক নই। যেমনটি যেমনটি হয়েছিল আমি তা সবস্ত আপনাদের কাছে বলব।

কু। আমাদের বলো, বটম শোনা!

ব। আমি তার একটি বর্ণ বলব না। আমি যেটুকু তোমাদের বলব সে হ'ল এই যে - ডিউকের ভোজ খাওয়া সারা হয়ে গেছে। তোমাদের সাজ পোষাক গুছিয়ে-গাছিয়ে নাও। দড়ি বাঁধার জন্যে শক্ত তার নাও, বেল্ট বাঁধবার জন্যে নতুন ফিতে নাও। এক্ষুণি রাজপ্রাসাদে সবাই একত্র হও। প্রত্যেকে নিজের পার্ট আর একবারটি ভাল করে দেখে নাও। কারণ সবশুদ্ধ খবর এই যে আমাদের প্লে ওঁদের পছন্দ হয়েছে। আর যার হ'ক না হ'ক থিস্‌বীর পোষাক যেন বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়, আর সিংহের পার্ট যে করবে, সে যেন নিজের নখ কেটে না বসে—কারণ বড় বড় নখ নিয়েই সিংহের থাবা দেখাতে হবে। আর বন্ধু এ্যাক্টরস্‌, আপনারা যেন পেঁয়াজ আর রসুন একেবারে খাবেন না, কারণ—আমরা যখন কথা বলব, তখন আমাদের মুখ থেকে ভাল গন্ধ বেরোনো চাই, তা হ'লে পরে আমার কোন সন্দেহ নেই যে আমরা শুনতে পাব যে ওরা বলছে—এটা ভারি সুন্দর কমেডি হয়েছে। আর কোন কথা নয়, চলুন, বাস, এখনি বেরিয়ে পড়ুন।

[প্রস্থান

(ক্রমশঃ)

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কোম্পানীর আমলে শহর কলিকাতা এবং আশপাশের পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীরা অনেকেই বিলাতী সাহেব-সুবোদের সঙ্গে হামেশা নানা রকম কাজ-কারবার চালানো আর ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার ফলে, অচিরেই রীতিমত বিত্ত-প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠতেন। অবশ্যম্ভাবী এই বিত্ত-প্রতিপত্তির দৌলতে তাঁরা অনায়াসেই গ্রাম্য এবং শহুরে সমাজেও বিশিষ্ট সম্মানের আসন অধিকার করে বসতেন। কাজেই সমাজে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং সম্মান বজায় রাখা, ব্যক্তিগত যৌবন খেয়াল-আনন্দ মেটানো, আর বিলাস-আড়ম্বরের বাহুল্য-প্রচার করার উদ্দেশ্যে তাঁরা নিত্যই কারণে-অকারণে অকাতরে মুঠো মুঠো টাকা পয়সা খরচ করে বিচিত্র অভিনব ধরণের ছোট-বড় নানা রকম সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। এ সব উৎসব-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের ব্যাপারে শুধু যে রীতিমত ধুমধাম, ঘটা আড়ম্বর হতো তাই নয়, উপরন্তু তুমুল রেষা-রেষি আর প্রতিদ্বন্দ্বিতাও দেখা যেতো সেকালের অধিকাংশ বিত্ত-প্রতিপত্তিশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পরস্পরের মধ্যে। এর ফলে, পূজো-পার্ব্বণ, বিবাহ-উপনয়ন-পারলৌকিক-শ্রাদ্ধ-নবান্ন-পীঠ-বাদ্যের আনন্দ-আসর প্রভৃতি বিবিধ উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সাড়ম্বরে অতিথি-অভ্যাগত আপ্যায়ন, পানাহার, বাঈতাং ভূয়তাং, সারঙ্গী, আতস-বাজী, রোসনাই, জৌলুষ, বাঈ-নাচ, সঙ্গীতালাপ এমনি নানা ধরণের বিলাস-ব্যবস্থার পিছনে রাশি রাশি কত যে অর্থ অপচয় হতো—উনবিংশ শতকের প্রাচীন সংবাদ-পত্রে তার নজীর প্রচুর নজরে পড়ে। তাই অতীতের সে সব কাহিনীর বর্ণনা একালের লোকজনের কাছে খুবই কৌতূহলোদ্দীপক হবে, বিবেচনা করে, আপাততঃ, তারই কয়েকটি বিচিত্র নমুনা নীচে উদ্ধৃত করা হলো।

• • •

সমাচার দর্পণ

(৯ই মার্চ্চ, ১৮২২।২৭শে ফাল্গুন, ১২২৮)

বিবাহ।—মোং জনাইর শ্রীযুত বাবু রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু গোলো কচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু হরদেব মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু তারকনাথ মুখোপাধ্যায় পাঁচ সহোদর প্রত্যেকেই গুণবান্ ও ভাগ্যবান্ ও ধার্ম্মিক ও দাতা ও দয়ালু এবং পরস্পর পরভ্রাতা সংপ্রীতিপূর্ব্বক সুখ্যাত। এঁহারদিগের মধ্যে কনিষ্ঠ শ্রীযুত বাবু তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের শুভবিবাহ গত ৯ ফেব্রুআরি বাঙ্গলা ২৮ মাঘ শনিবারে মোং বরাহনগরে শ্রীযুত সরোপাধ্যায়ের বাটীতে হইয়াছে। তাহাতে যেমত সমারোহ হইয়াছিল এরূপ গঙ্গার পশ্চিম-পারে সংপ্রতি প্রায় হয় নাই। প্রথমতঃ মজলিসের ঘর ডাকের সাজ ও মোমের সাজ দ্বারা সুশোভিত এবং অপূর্ব্ব

বিছানাতে মণ্ডিত শ্বেত নীল রক্তবর্ণ ঝাড় ও লণ্ঠন ও দেওয়ালগিরি প্রভৃতি নানাবিধ রোশনাই হইয়া বিবাহের পূর্ব্ব চারি দিবস নাচ ও গান হইল। তাহাতে বড় মিয়া ও ছোট মিয়া ও নেকী ও কাশ্মীরিপ্রভৃতি প্রধান২ গায়ক আর২ অনেক তরফাও আসিয়াছিল—এ সকল গায়কেরা যে মজলিসে আইসে সে মজলিস সুখদায়ক হয়। এবং সামাজিক ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপকেরদিগের নিমন্ত্রণপূর্ব্বক সমাদরে আনয়ন করিয়া নানাবিধ সম্মান করিয়াছেন এবং দেশ বিদেশীয় ঘটক ও কুলীন যত আসিয়াছিলেন তাহারদিগের বিবেচনা মত পুরস্কার করণে অতিশয় সুখ্যাতি হইয়াছে। এবং বিবাহের দিবসে মোং কাশীপুরের শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসুজার বাগানের নিকট হইতে গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটী পর্য্যন্ত এক ক্রোশ পথ বান্ধা রোশনাই হইয়াছিল···।

• • •

সমাচার দর্পণ

(২৭শে মে, ১৮২৬। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৩৩)

বিবাহ ॥—১১ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার শহর শ্রীরামপুর নিবাসি শ্রীযুত বাবু রাঘবরাম গোস্বামির দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুত বাবু রাজমোহন গোস্বামির বিবাহ হইয়াছে। বাবু রঘুরাম গোস্বামি মহাশয় তদুপলক্ষে সামাজিক ব্রাহ্মণেরদিগকে বস্ত্রাভরণদ্বারা সমাবৃত করিয়াছেন এবং নানা দিগ্দেশাগত স্বশ্রেণী ঘটক কুলীনেরদিগকেও যথোপযুক্ত বিদায় দিয়াছেন তাহাতে কোন প্রকারে ত্রুটি হয় নাই। বিবাহের রাত্রিতে বরের সমভিব্যাহারে কৃত্রিম পর্ব্বত ও ময়ূরপঙ্খী এবং তদ্রূপীভূত আশাসোটা প্রভৃতি নানা প্রকার সজ্জা গিয়াছিল ও অনেক লোকের সমারোহও হইয়াছিল। পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীক্রমে উত্তর রোশনাই ও মধ্যে২ অগ্নিক্রীড়া অর্থাৎ নানাবিধ বাজি হইয়াছিল। কলিকাতা শহরে বাজী পোড়াইতে হুকুম নাই যদি তাহা থাকিত তবে ঐ নগরস্থ ধনি লোকেরা বিবাহোপলক্ষে ঈর্ষা করিয়া বাজী পোড়াইতে ত্রুটি করিতেন না অর্থাৎ আড়াআড়িতে কলিকাতা নগরের অধিক ভাগ পুড়িত। আমাদের শ্রীরামপুর উত্তম স্থান এখানে কোন লেঠা নাই এবং এই বিবাহেতে যেমন স্থান তদুপযুক্ত বাজী হইয়াছে। তৎপর দিবস প্রাতঃকালে দশ ঘণ্টার সময় বর অতি সমারোহপূর্ব্বক নিজ বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন তাহার বিশেষ লিখনের প্রয়োজনাভাব যেহেতুক বিবাহের রাত্রির সমারোহের অনুসারে সকলেই অনুমান করিতে পারিবেন।

• • •

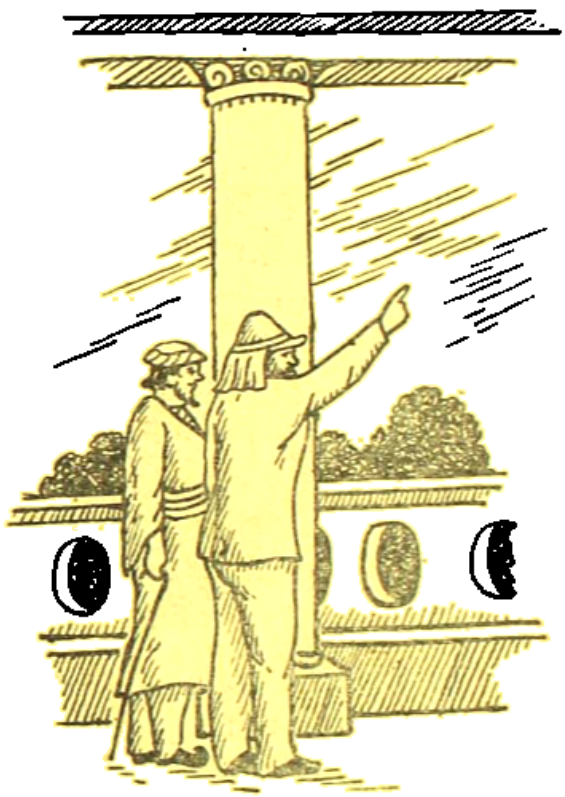

সেকালের বিলাতী সাহেব ও তাঁর দেশী সহচর

(প্রাচীন প্রতিলিপি অনুসরণে)

এ সব সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সেকালের বিত্তপ্রতিপত্তিশালী সম্ভ্রান্ত-ব্যক্তিরা কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রেই ঢালাওভাবে অর্থব্যয় করে লোকজনকে সাদর আপ্যায়ন জানিয়ে ভূরিভোজন এবং যথোচিত প্রথামী, বখশিশ আর বিবিধ উপকরণাদি উপহারদানে পরিতুষ্ট ও সম্মানিত করার ব্যাপারে রীতিমত উদার-মনোভাবের পরিচয় দিয়ে গেছেন। এমন কি, এদের মধ্যে অনেকেই

আবার অতিথি-অভ্যাগতদের যথোপযুক্ত সম্মান-প্রদর্শন আর সন্তোষ-সাধনের উদ্দেশ্যে সাধ্যেরও অতিরিক্ত অর্থব্যয় করে নিজেরা ঋণগ্রস্ত নিঃস্ব হয়ে যেতেও এতটুকু দ্বিধাবোধ করেননি। এতই অসামান্য উদার ছিল তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী আতিথ্যসৎকারের ধারণা। এক কথায় বলতে গেলে—কালে কালে এটিই ক্রমশঃ হয়ে উঠেছিল সেকালের খাটি-বনেদীয়ানার চিরাচরিত রীতি। তবে, এ রীতিরও যে তখন মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম ঘটতো না—এমন কথাও বলা চলে না। উনবিংশ শতকের প্রাচীন সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায় তেমন ব্যতিক্রমেরও যে সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে—নীচের উদ্ধৃত অংশটিতে তার নজীর নজরে পড়বে।

•

সমাচার দর্পণ

(২৫শে ফেব্রুআরী, ১৮৩২।১৬ই ফাল্গুন, ১২৩৮)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—নিবেদন বিশেষঃ সন হালের ১৪ জানুআরি তারিখের সমাচার দর্পণের দ্বারা বোধ হইল যে জিলা হিজলীর এলাকায় জলামুঠা ওগয়রহের জমীদার শ্রীযুত রাজা নরনারায়ণ রায় আপন জ্যেষ্ঠ রাজকুমার শ্রীযুক্ত বাবু রুদ্রনারায়ণ রায়ের শুভবিবাহের লগ্ন ২২ জানুআরি তারিখে স্থির করিয়া পাঁচ লক্ষ টাকা খরচের দ্বারা কল্প বৃক্ষের ন্যায় হইবেন এমত আশয়ে ছিলেন, ইতিমধ্যে রাজসভাসদ মন্ত্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণ খানসামা ও শ্রীমুন্সী মুকুন্দরাম ও শ্রীদেবকরাম বসু সেরেস্তার ও শ্রীভোলানাথ দাস উড়ীয়া মুহুরির ও শ্রীহিন্দী বাইতি নাপিত প্রভৃতি গোপনে পরামর্শ করিলেন যে বর্ত্তমান ভূপতি কল্পবৃক্ষের ন্যায় হইলে সর্ব্বস্ব যাইতে পারে যাহাতে কল্পবৃক্ষের ন্যায় না হন এমত পরামর্শ দেওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া তাবৎ আমলাগণে ঐক্য হইয়া ভূপতির সাক্ষাৎ গলবস্ত্রে যোড়করে বিবাহের পূর্ব্বদিবসে সায়ংকালে উপস্থিত হইবাতে ভূপতি জিজ্ঞাসা করিলেন কারণ কি। রাধাকৃষ্ণ কহিলেন আপনকার সরকারে পুরুষানুক্রমে আমরা প্রতিপালন হইয়া আসিতেছি এক্ষণে মহারাজ কল্পবৃক্ষের ন্যায় হইলে যথাসর্ব্বস্ব যাইবেক এবং সুখ্যাতি লইতে পারিবেন না কারণ বিবাহের সমাজে বহু দেশের বহুযা আসিয়াছে এবং আসিবেক। দশ লক্ষ টাকা তহবীলে মজুৎ আছে মাত্র কিন্তু মহল খুকী ইহাতে সরকারের খামানা দুই লক্ষ তঙ্কা দিতে হইবেক বাকী আট লক্ষ তঙ্কা থাকিবেক এ বাকা শ্রবণে ভূপতি যথেষ্ট খেদিত হইয়া বিবাহের বিষয়ের ভারাভার আমলাগণে দিয়া ক্ষান্ত থাকিলেন ঐ সকল আমলা একে ধনসা ছিলেন দ্বিতীয়তঃ ধুনার গন্ধ পাইলেন বিবাহের বিষয় কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি ব্যাপক করিতে অনুমতি হইবেক।

প্রথমতঃ বিবাহের দিবস হাজরির কাগজাতের দ্বারা বোধ হইল যে বাজকর ৭৯৬ জন ও বেহারা ৯৭৩ জন বাই ৯২২ জন ও সামাজিক ২১০৩ জন ও ভাট ৪২৩ জন ও ব্রাহ্মণ ৫১৩ জন ও অতিথি ৮১২ জন ও দেশি-বিদেশিতে পঁহুছেন তৎপরে নিজাধিকারের কুলিবেগার আন্দাজী তিন হাজার লোক সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইবাতে উপরের লিখিত লোকদিগকে খাদ্যসামগ্রী কোন রকমে কিছু না দিয়া বরসজ্জা করিয়া তথা হইতে তিন ক্রোশ তফাত মথনানামে এক গ্রাম আছে তথায় রাত্রি হইলেন বাজদের গাছ ১৪০ নানা রকমের ছিল তাহা দগ্ধ করিলেন। দ্বিতীয়তঃ পাতিকুলছড়ির দ্বারা ৫১ সের মোমবাতির রোশনাই হয়। তৃতীয়তঃ নারিকেল তৈল ২২/ মোন ছিল তাহা আড়া ও হাতমশালের দ্বারা রোশনাই হইল ইহাতে রাত্রিশেষ বিবাহ হইতে পারে নাই পরদিবস দিবা চারি দণ্ডের কালীন বিবাহ হইল। ঐ দিবস তিন প্রহর পর্য্যন্ত কেহ জল স্পর্শ করে নাই কারণ পল্লিগ্রামে পাইলেক না এবং ভূপতিও দিলেন না—তৎপরে কতক লোক তথা হইতে পলায়ন করিয়া রাত্রিকালীন যাদুদেবপুর বোকানে পঁহুছিয়া আপনং নিকট হইতে মুদ্রাদি ভঙ্গিত করিয়া বুদির নিকটে চালু ইত্যাদি খরিদ করিয়া প্রাণ রক্ষা করে তথাকার মুদীতে যে প্রকার ডাকাইতি করিলেক তাহা লিখন নহে কিন্তু চালু সের ।০ আনা বিরিঘালির সের ৵০ আনা হাঁড়ি ও কাষ্ঠ মণের ন্যায় অধিক কি নিবেদন করিব।

দ্বিতীয়তঃ তৃতীয় দিবসে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও আমলা ও পয়রহ ও ভাট ও বেহারাদিগকে দুই রোজের সীদা দেওনের হুকুম হইল ঐ সীদা রাজবাটীর উপযুক্ত

তাহাও কেহ পাইল কেহ পাইল না হাতির ভোগ চালু খেসারিদালি নারিকেল তৈল।

তৃতীয়তঃ চতুর্থ দিবসে উপরের লিখিত ব্রাহ্মণ ও অতিথি তাহারা নিরাহারে ৩।৪ রোজ থাকিয়া অনেকেই পলায়ন করিলেন কিন্তু চালু ৫০০/ মোন ও দালি ১০০/ মোন প্রদান করিলে অনেক জীবের উপকার হইয়া ভূপতির সুখ্যাতি হইত ফলতঃ ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা ভূপতিকে কহিলেন, আমরা অনেক দেশ ভ্রমণ করিলাম এমত পাষণ্ড ভারতবর্ষে দেখি নাই।

চতুর্থ রাজা নিমন্ত্রণের দ্বারা তমোলুকের শ্রীযুক্ত বিদ্যাধর মহাশয় ও পটাশপুরের মৌলবী অর্থাৎ জ্ঞানের শৌর চূড়ামণি শ্রীযুত গোলাম আলেবা সাহেব ও হিজলীর নিমকী দেওয়ান শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাসদ শ্রীযুক্ত বাবু গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গৌরমোহন সেন সদর তহসীলদার ও শ্রীযুক্ত নবলাল দত্ত জোকতহসীলদার ও থানার থালের পোলীসের দারোগা শ্রীযুক্ত মীরজা সাহেব এই ছয়জন সেওয়ায় ইহার লওয়াজিমাত ২০০ জন বার বেহারা ও ব্রজবাসী ও বরকন্দাজ ইত্যাদি গড় মোকামে পহুছিয়া বিধিমত লৌকিকতা করেন এবং ৫ রোজ থাকেন ইতিমধ্যে ২ দুসরা রোজ সীদা পান তাহাও ১।০ মোন কেবল চালুদালি যাকেলোকের উপযুক্ত নহে পরে মহাশয়েরা রাজব্যবহারে চমৎকৃত হইয়া আপনং তরফ হইতে মুদ্রাদি বিতরণ করিয়া স্থানান্তর হইতে সামগ্রী আনাইয়া ৫ রোজ কালযাপন করিয়া ষষ্ঠ দিবসে বিদায় হন তাঁহারদিগের বিদায়ের বিবেচনা যে যাহা লৌকিকতা দিয়াছিলেন তাহা কেবং তৎসেওয়ায় ২।০ টাকা মূল্যের এক২ খানমাখনি এবং কাহার লওয়াজিমাত ৩২ জন কাহার ৪০ জন ছিল তাহারদিগকে একত্র ৩ টাকার হিসাবে ১৮ টাকা দিবাতে কেহ বিদায় না লইয়া কেবত দিয়া নিজালয় গমন করিলেন পুনরায় ভূপতি এপর্য্যন্ত তল্লাস করিলেন না।

পঞ্চম রাজনিমন্ত্রণে হৈদাবলের শ্রীযুক্ত রাজা রামনাথ গর্গের তরফ জমাদার আর ৫ জন বরকন্দাজ ও সুজামুঠার শ্রীযুক্ত রাজা গোপালেন্দ্রের তরফ জমাদার আর ৫ জন শ্রীযুক্ত বরকন্দাজ ও জলামুঠার রাজা শ্যামাপ্রসাদ নন্দীর তরফ মুহুরির ১৬ জন বাবহার লইয়া পহুছে তাহার যেরূপ বিদায় তাহা লিখন অতি অনুচিত কেবল জলপানের দক্ষিণার ন্যায় তাহারা গ্রহণ না করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন ইতি।

* * *

শুধু বিবাহ উপলক্ষেই নয়, সমাজের বিত্ত-প্রতিপত্তিশালী বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের গৃহে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন প্রভৃতি ছোট-বড় যে কোনো শুভানুষ্ঠান···এমন কি, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি বেদনাবারক পারলৌকিক কার্যাদির ব্যাপারেও সেকালে অনেকেই অকাতরে প্রভূত অর্থব্যয় করে রীতিমত ধুমধাম-ঘটা আর জাঁকজমক-আড়ম্বরে বহু নিমন্ত্রিত অতিথি অভ্যাগতকে সাদরে আপ্যায়িত এবং ভূরি-ভোজনে ও সমুচিত প্রথামী-পারিতোষিক দানে যেভাবে সম্মান জানাতেন—উনবিংশ শতকের প্রাচীন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তারও যে সব নজীর মেলে, একালের অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকার কৌতূহল নিবারণের উদ্দেশ্যে, নীচে সেগুলির কিছু বিবরণ উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

* *

সমাচার দর্পণ

(১০ই ডিসেম্বর, ১৮৩৬।২৬শে অগ্রহায়ণ, ১২৪৩)

শুভান্নপ্রাশনং।—আমরা আপ্যায়িত হইয়া প্রকাশ করিতেছি গত ২১ নবেম্বর সোমবারে শ্রীযুতরাজা রাজনারায়ণ বাহাদুরের স্বীয় রাজধানী আন্দুলের বাটীতে উক্ত নৃপাত্মিনবরাত তনয়ের প্রসিদ্ধ নাম শ্রীলশ্রীযুক্ত কুমার বিজয়কৃষ্ণ বাহাদুর ইতি রক্ষিত হইয়া শুভান্নপ্রাশন কর্ম্ম যথাবিধি সুসম্পন্ন হইয়াছে প্রথমতঃ এতৎ শুভবার্ত্তা বহুসংখ্যক ভোপধ্বনি দ্বারা ইতস্ততঃ স্থানে সুপ্রকাশ করা গেল। এই মাঙ্গলিক কর্ম্মে রাজবাটীস্থ এবং গ্রামস্থ সকলই মহাহ্লাদিত হইলেন ঐ দিবস রাজকোষ হইতে যথাযোগ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যথাযোগ্য সম্মানিত এবং বহুতর দীনদরিদ্র কাঙ্গালিগণ পরিতুষ্ট হইয়াছেন।

* * *

স্থানাভাবের কারণে এবারে সেকালের আর অধিক কোনো বিবরণ প্রকাশ করা সম্ভব হলো না। কাজেই আগামী সংখ্যায়, এমনি ধরণের আরো কয়েকটি বিচিত্র-কৌতূহলোদ্দীপক অতীত-আমলের স্মৃতি-কাহিনীর পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

[ক্রমশঃ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বিচিত্র শর্তগুলি একবার মনে মনে জপ করে নিয়েছিল দীপেন। অদ্ভুত আচ্ছন্ন বোধ করছিল সে। তার মনে হচ্ছিল, কোন এক জাদুকর তাকে সম্মোহিত করে রহস্যময় আবর্তের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। সুহৃকিত এক ঘোরের মধ্যে দীপেন ফিসফিসিয়ে উঠেছিল, 'আমি রাজী স্যার।'

একটু চুপ করে থেকে দত্তসাহেব বলেছেন, 'তুমি যদি আমার এই কাজটা করে দিতে পার তা হলে—'

'তা হলে?' উদ্গ্রীব সুরে জিজ্ঞেস করেছিল দীপেন।

'তোমারও কিছু সুবিধে হতে পারে।'

অর্থাৎ দত্তসাহেবের প্রতি অনুরাগ বশে নিঃস্বার্থভাবে খাটতে হবে না দীপেনকে। দত্তসাহেব তাকে দিয়ে ব্যক্তিগত একটা কাজ করিয়ে কিছু প্রতিদানও করতে চান। দীপেন কিছু বলে নি। উৎসুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে শুধু তাকিয়েই ছিল।

দত্তসাহেব আবার বলেছিলেন, 'দিল্লীর ব্রাঞ্চ ম্যানেজারিটার ব্যাপারে তুমি তো ইন্টারেস্টেড্?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।' রুদ্ধশ্বাসে উত্তর দিয়েছিল দীপেন।

'আমি চেষ্টা করব, তুমি যাতে সেটা পাও।'

এবার আর কোন আভাস নয়, ইঙ্গিত নয়। দিল্লী ব্রাঞ্চের যে ম্যানেজারিটার জন্য এতকাল উমেদারি করে আসছিল দীপেন সে সম্বন্ধে দত্তসাহেব স্পষ্ট মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। হিসেবটা সোজাসুজি। দত্তসাহেবের জন্য কিছু করতে হবে তাকে, পরিবর্তে কিছু পাবে সে। যাই হোক কৃতজ্ঞ গাঢ় স্বরে দীপেন শুধু এটুকুই বলতে পেরেছিল, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ—'

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ।

এক সময় দত্তসাহেবই স্তব্ধতা ভেঙে শুরু করেছিলেন, 'এইবার কাজের কথাটা শোন—'

'বলুন স্যার'—ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ করে বসে ছিল দীপেন।

'যাকে তোমায় খুঁজতে হবে সে—'

'সে কী?'

তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দেন নি দত্তসাহেব। কি এক অতল গভীর ভাবনার মধ্যে কিছুক্ষণ নিজেকে লুপ্ত করে রেখেছিলেন। তারপর আস্তে আস্তে বলেছিলেন, 'সে একটি মেয়ে!'

'মেয়ে!' সমস্ত সত্তার মধ্যে বিচিত্র এক তরঙ্গ বয়ে গিয়েছিল যেন দীপেনের।

'হ্যাঁ।' ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে দত্তসাহেব বলেছিলেন, 'তার নাম নীলা'—গলার স্বরে প্রাণের সবটুকু আবেগ আর গাঢ়তা সঞ্চার করে নীলা নামটা উচ্চারণ করেছিলেন। তারপরেই চুপ করে গিয়েছিলেন।

দত্তসাহেবের কথার প্রতিধ্বনি করেছিল দীপেন, 'নীলা!'

'হ্যাঁ নীলা—নীলা চৌধুরী।'

'কত বয়েস হবে তার মেয়েটির?'

'তিরিশ বত্রিশ।'

বয়স শুনে মনে মনে খানিকটা খতিয়ে নিয়েছিল দীপেন। তিরিশের সীমানা যে পার হয়ে গেছে তাকে মেয়ে বলা বোধহয় অনুচিত, মহিলা বলাই সঙ্গত। সে অবশ্য না জেনেই 'মেয়ে' বলেছে। অজ্ঞানের পাপে দোষ নেই, এই যা রক্ষা। তা ছাড়া আরো একটা কথা মনে পড়েছিল দীপেনের। দত্তসাহেব যার কথা উল্লেখ করেছেন সে বালিকা নয়, কিশোরী নয়, এমন কি নবীনা যুবতীও নয়; তিরিশ উত্তীর্ণা এক বয়স্কা মহিলা সে।

নীলা চৌধুরী নামে সেই মহিলাটিকে খুঁজে বার করতে হবে। ঐ বয়েসের একটি মহিলার পক্ষে নিজের থেকে না হারালে এমনি এমনি পৃথিবীর জনারণ্যে হারিয়ে যাওয়া কি সম্ভব? আর স্বেচ্ছায় যে হারিয়ে যায় তাকে খুঁজে বার করা কি সহজ না সঙ্গত? কতকগুলো এলোমেলো ভাবনা দীপেনের চেতনায় দোলা দিয়ে গিয়েছিল।

দত্তসাহেব হঠাৎ ডেকে উঠেছিলেন, 'দীপেন—'

'আজ্ঞে—'

'তুমি কবে থেকে কাজ আরম্ভ করতে চাও?'

'আপনি যেদিন থেকে বলবেন।'

'কাল থেকে যদি বলি—'

'আমার আপত্তি নেই।'

'তা হলে এক কাজ কর, আফিসে আজই ছুটির দরখাস্ত করে দাও। কতদিনের ছুটি নেবে?'

কতদিনে নীলা চৌধুরীকে খুঁজে বার করা সম্ভব হবে, সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না দীপেনের। সে বলেছিল, 'আমি কতদিন নেব, আপনিই বলে দিন।'

একটু ভেবে দত্তসাহেব বলেছিলেন, 'মাসখানেক নিয়ে যাও।'

দীপেন কিছু বলেনি, মাথা নেড়েছিল শুধু।

দত্তসাহেব এবার বলেছিলেন, 'নীলা সম্বন্ধে কিছু ইনফরমেশন তোমাকে দিচ্ছি। তাকে খুঁজে বার করার ব্যাপারে এই সূত্রগুলো তোমার নিশ্চয়ই কাজে লাগবে।'

দীপেন এবারও নিশ্চুপ থেকেছে। তবে তার চোখের দৃষ্টি উৎসুক হয়ে উঠেছিল।

দত্তসাহেব বলেছিলেন, 'নীলার বয়েসের কথা তোমাকে বলেছি। কোথায় থাকত তার মোটামুটি একটা ইঙ্গিত দিয়েছি। সোনারপুরে ওদের বাড়ি, সোনারপুরের তাহুড়ি-পাড়ায়। রাস্তাটার নাম অঘোর তাহুড়ি লেন; বাড়ির নম্বর সাতাশের এক। নীলার বাবা-মা এখনও আছেন সেখানে। বাবার নাম, সতীশ চৌধুরী। আমার মনে হয়, সেখানে গেলে নীলা সম্বন্ধে আরো কিছু সূত্র তুমি পাবে। তবে একটা কথা—'

'কী?'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে দত্তসাহেব বলেছিলেন, 'ওখানে গিয়ে আমার নাম একেবারেই করবে না। তাতে—'

দীপেন প্রশ্ন করেছিল, 'তাতে কী?'

'তোমার কাজের পক্ষে খুব অসুবিধে হবে। হয়তো নীলার বাবা সতীশবাবু তোমাকে—' বলতে বলতে থেমে গিয়েছিলেন দত্তসাহেব।

'আমাকে কী স্যার?' দীপেন যেই ধরিয়ে দিয়েছিল।

শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের লনটার দিকে তাকিয়ে স্খলিত স্বরে দত্তসাহেব বলেছিলেন, 'তোমাকে অপমানও করে বসতে পারেন।'

দীপেনের সমস্ত স্নায়ু একসঙ্গে চকিত হয়ে উঠেছিল। তার মনে হচ্ছিল দত্তসাহেবের সঙ্গে নীলা চৌধুরীদের একটা বিপজ্জনক সম্পর্ক আছে। কী সেটা? সে সম্বন্ধে কিছু অনুমান করার আগেই দত্তসাহেব আবার বলেছিলেন, 'তাই বলছিলাম কি, খুব ট্যাক্টফুলি ওদের সঙ্গে মিশে নীলার খবর বার করবে। কী ভাবে মিশবে সেটা কিন্তু তোমার নিজের ওপর।'

প্রথম প্রথম কাজটা যত সহজসাধ্য মনে হয়েছিল, আসলে তা নয়। দীপেনের ধারণা ছিল পৃথিবীর জটিলতা থেকে একটি পলাতককে খুঁজে বার করতে হবে; এইমাত্র। কিন্তু দত্তসাহেব সে প্রসঙ্গে যে সূত্রগুলো তার হাতে তুলে দিতে শুরু করেছিলেন সেগুলোর মধ্যে কিসের যেন একটা ইঙ্গিত আছে। দীপেনের স্নায়ুগুলো অস্পষ্টভাবে টের পেয়েছিল, নীলা চৌধুরীকে বেষ্টন করে বিচিত্র জটিল এক রহস্যময়তা রয়েছে। শুধু রহস্যই না,

হয়তো কোন বিপদের সাংকেতও। অতএব মহিলাটিকে খুঁজে বার করার দায়িত্ব সে নেবে কি নেবে না—এই ভাবনাটা তাকে ক্রমাগত বিব্রত করে তুলছিল। একবার দীপেন ভেবেছে, এ ব্যাপারে দত্তসাহেবকে সে তার অক্ষমতা জানিয়ে দেয়। পরমুহূর্তেই তার খেয়াল হয়েছে এই কাজটির সঙ্গে তার সমস্ত ভবিষ্যৎ জড়ানো।

কী সিদ্ধান্ত তার নেওয়া উচিত, এই কথাটা যখন দীপেন ভেবে উঠতে পারছিল না ঠিক সেই সময় দত্তসাহেব আবার বলে উঠেছিলেন, 'ভালো কথা—'

চকিত দীপেন মুখ তুলে সাড়া দিয়েছিল, 'আজ্ঞে'—

'নীলা চৌধুরীর ব্যাপারে তোমাকে আরেকটা জিনিস দিতে পারি।'

'কী?'

'ফোটো।' বলতে বলতেই উঠে পড়েছিলেন। তারপর বিশাল একটা আলমারি থেকে কতকগুলো ফোটো বার করে এনে দীপেনের হাতে দিয়েছিলেন।

একটু আগের দ্বিধান্বিত মনোভাবটার কথা খেয়াল ছিল না দীপেনের। পৃথিবীর জনারণ্যে পলাতকা সেই মহিলাটিকে দেখার জন্য নিদারুণ এক আকর্ষণ বোধ করেছিল সে। হাত বাড়িয়ে বিপুল আগ্রহে ফোটো-গুলো নিয়েছিল দীপেন এবং গুণে দেখেছিল, মোট সাতটা।

সাতখানা ফোটো, সবগুলোই নীলা চৌধুরীর কুড়ি বাইশ বছরের। কিছু কমবেশিও হতে পারে। তবে ফোটোর তরুণটি পঁচিশোর্ধ্ব কখনই নয়।

সাতটি ভঙ্গির সাতখানি ফোটো। কোনটিতে নীলা চৌধুরী দাঁড়িয়ে রয়েছে, কোনটিতে বসে, কোনটিতে আবার আধশোয়া। সবগুলো ফোটোই এক দৃশ্যপটে তোলা নয়। প্রতিটির জন্যই ভিন্ন ভিন্ন পটভূমি। একটিতে পশ্চাৎপট হিসেবে রয়েছে নদী, আরেকটিতে দূরবিস্তৃত দিগন্ত, অন্য একটিতে জনবহুল শহরের কোন রাজপথ। দু-একটি আবার ফোটোগ্রাফারের স্টুডিওতে তোলা।

ফোটো দেখে একটি মানুষের কতটুকুই বা ধরা যায়! বিশেষ করে সে যদি তরুণী হয়। শরীরিণী মেয়েটির রূপ-রস-স্পর্শ-গন্ধ—সব কিছুই প্রায় ফোটোতে অনুপস্থিত। তবু দীপেনের মনে হয়েছিল, নীলা চৌধুরী দীপ্তবর্ণা মধ্যক্ষীণা। দেহের কোথাও মেদের বাহুল্য নেই। দীর্ঘ শরীরখানি ঘিরে ছুরির ফলার মত শাণিত কি একটা যেন আছে। ফোটোতে চোখ দুটি তার স্থির। কিন্তু দীপেনের মনে হয়েছিল সে-দুটি নিশ্চয় ছটফটে, চঞ্চল। ধারাল চিবুক, সুঠাম গলা, কুঞ্চিত চুল, দীর্ঘ আঙুল—সকল প্রত্যঙ্গে নীলা চৌধুরী আশ্চর্য ভাষাময়। ফোটোতে তাকে যেটুকু বোঝা গেছে, দীপেনের মনে হয়েছিল, তার চাইতে সে অনেক বেশি জটিল, অনেক বেশি রহস্যময়ী।

দত্তসাহেব বলেছিলেন, 'নীলার এই ফোটোগুলো চার পাঁচ বছর আগের তোলা। তখন ওর বয়েস পঁচিশ ছাব্বিশ।'

ফোটো দেখে নীলা চৌধুরীর এই রকম বয়সই অনুমান করেছিল দীপেন। যাই হোক, সে কিছু বলে নি। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দত্তসাহেবের দিকে তাকিয়েছিল মাত্র।

দত্তসাহেব থামেননি, 'এই ফোটো ক'খানা, নীলাদের বাড়ির ঠিকানা, ওর বাবার নাম—এ ছাড়া আমি আর কোন সূত্র দিতে পারব না।' বলতে বলতে হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে গিয়েছিল। চোখের দৃষ্টি চকিতের জন্য স্ফুলিঙ্গের মত ঝকমকিয়ে উঠেছিল। আশ্চর্য তীক্ষ্ণস্বরে আবার তিনি বলেছিলেন, 'আরেকটা কথা—'

'কী?' দীপেন প্রশ্ন করেছিল।

'এক বছরের মত নীলা নিরুদ্দেশ। তার আগের বছর তিনেক—' বলতে বলতে থমকে গিয়েছিলেন দত্তসাহেব। এবং কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন।

অনেকক্ষণ যখন চুপ করে রইলেন দত্তসাহেব তখন প্রসঙ্গটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল দীপেন, 'তার আগের তিনটে বছর কী তার?'

দত্তসাহেব চমকে উঠেছিলেন। ব্যস্তভাবে বলেছিলেন, 'কিছু না, কিছু না।'

দীপেন বুঝতে পেরেছিল, নিজের অজ্ঞাতসারে কিছু একটা বলতে চেয়েছিলেন দত্তসাহেব। বলেও হয়ত ফেলতেন। কিন্তু হঠাৎ সে-সম্বন্ধে সচেতন হতেই প্রসঙ্গটা চাপা দিয়েছিলেন। কি চেয়েছিলেন দত্তসাহেব? সেদিন সে প্রশ্নটার কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় নি।

এরপর কিছুক্ষণ স্তব্ধতার মধ্যে কেটে গেছে। নীলা চৌধুরীর ব্যাপারে একটা প্রশ্ন অনেকক্ষণ থেকেই দীপেনের চেতনায় ক্রমাগত আঘাত হেনে যাচ্ছিল। বার বার ইচ্ছা হচ্ছিল, দত্তসাহেবের কাছে প্রশ্নটি করে। কিন্তু বার বারই অদ্ভুত এক সংকোচ তার মুখে হাত চাপা দিচ্ছিল। অবশেষে দ্বিধান্বিত ভাবটা প্রাণপণে ঠেলে দিয়ে মরিয়ার মত সে ডেকে উঠেছিল, 'স্যার—'

কী এক ভাবনার গভীরে ডুবেছিলেন দত্তসাহেব। দূরমনস্কের মত আস্তে সাড়া দিয়েছিলেন, 'বল—'

'আপনি যদি অপরাধ না নেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।'

'কী ?'

'এই নীলা চৌধুরীর ব্যাপারে।' আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না তো ?

তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন নি দত্তসাহেব। একটু আগের অন্যমনস্কতা তাঁর কেটে গিয়েছিল। বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত খাড়া হয়ে বসেছিলেন তিনি। স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিটা অনেক-ক্ষণ নিবদ্ধ করে রেখেছিলেন দীপেনের মুখে। তারপর ধীরে ধীরে বলেছিলেন, 'না, অসন্তুষ্ট হ'ব না। তুমি নির্ভয়ে বলতে পার।'

অভয় পাওয়া সত্ত্বেও সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেনি দীপেন। সে শুধু ভাবছিল, প্রশ্নটা অনধিকারের পর্যায়ে গিয়ে পড়বে না তো ?

দত্তসাহেব এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন, 'চুপ করে রইলে কেন ? কী জিজ্ঞেস করবে, করে ফেল। বললাম তো ভয় নেই।'

দত্তসাহেব শর্ত করিয়ে নিয়েছিলেন তাঁর এবং নীলা চৌধুরীর মধ্যে কী সম্পর্ক আছে তা যেন কোন কারণেই জিজ্ঞেস না করে দীপেন। কিন্তু সে-কথাটা সেই মুহূর্তে বিস্মৃতই হয়েছিল দীপেন। কাঁপা স্খলিত স্বরে সে বলেছিল 'নীলা চৌধুরী আপনার কে হয় স্যার ?'

প্রশ্নটা শেষ হতে না হতে দত্তসাহেবের ফর্সা মুখে রক্তের উচ্ছ্বাস খেলে গিয়েছিল। আরও বিব্রত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। কয়েকটা মাত্র মুহূর্ত। তারপরেই গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। দত্তসাহেবের এই দ্রুত চকিত পরিবর্তন দীপেনকে বিমূঢ় করে ফেলেছিল।

যাই হোক একটু পরেই বিষণ্ণ বিব্রত ভাবটা কাটিয়ে উঠেছিলেন দত্তসাহেব। এ বার তাঁর মুখে যে ভাবের খেলা শুরু হয়েছিল তার নাম পরিহাস। ঠোঁটের প্রান্তে শব্দহীন বিচিত্র একটু হাসি ফুটিয়ে সকৌতুকে ফিসফিসিয়ে উঠেছিলেন তিনি, তোমাকে কিন্তু আমাদের মধ্যেকার সম্পর্কটার কোন প্রশ্ন করতে নিষেধ করেছিলাম।

দীপেন হকচকিয়ে গিয়েছিল, 'আমার অন্যায় হয়ে গেছে স্যার।'

দত্তসাহেবের মুখ থেকে কৌতুকের হাসিটা বিলীন হয়নি। তিনি বলেছিলেন, নেহাৎ জিজ্ঞেস যখন করেই বসেছ কী আর করা যাবে ! আচ্ছা তুমিই বল না, নীলা আমার কে হতে পারে ?'

দীপেন এবার স্তম্ভিত। দত্তসাহেব যে নীলা সম্বন্ধে তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করে বসতে পারেন, এতটা সে ভাবে নি। নিষিদ্ধ সুরে সে বলেছিল, 'আজ্ঞে, কোন আত্মীয়া ?'

'উঁহু'—মাথা নেড়েছিলেন দত্তসাহেব।

'তবে কি কোন পরিচিতা ?'

'পরিচিতা তো নিশ্চয়ই, নইলে তার সম্বন্ধে এত কথা তোমাকে বললাম কী করে ? আর—'

'কী ?'

'অপরিচিতা হলে আমি ইন্টারেস্টেডই বা হব কেন !'

তা বটে ! একজন অজ্ঞাত-পরিচয় মহিলা সম্বন্ধে অকারণে দত্তসাহেব এত উৎসুক হবেনই বা কেন—আর এত তথ্যই বা তার সম্বন্ধে সংগ্রহ করবেন কোথা থেকে !

তবে নীলা চৌধুরী কি সাহেবের যে কথাটা দীপেনের মনে এল তা উচ্চারণ করতে ভরসা পায় নি সে। একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, স্যার, নীলা চৌধুরী কি আপনার বান্ধবী ?'

'বান্ধবী !' বলেই কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন দত্তসাহেব, 'বান্ধবী, হ্যাঁ তা বলতে পার। তবে নীলার আর আমার মধ্যেকার সম্পর্ক বোঝাতে ঐ একটা মাত্র শব্দই কিন্তু যথেষ্ট নয়।'

'যথেষ্ট নয় ?'

'না।'

এরপর কী বলবে, ধীপেন ভেবে পায় নি।

ভদ্রসাহেব এবার অনেকখানি ঝুঁকে চাপা কিসফিস স্বরে বলেছিলেন, 'নীলা দেখেছ?'

'নীলা!' বিমূঢ়ের মত শব্দটার প্রতিধ্বনি করে ধীপেন বলেছিল, 'আজ্ঞে আপনি কী মীন করছেন—'

ধীপেনের বাক্যের শেষাংশ পূরণ করে ভদ্রসাহেব বলে উঠেছিলেন, 'কী মীন করছি, তুমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছ না, কেমন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমি নীলা চৌধুরীর কথা বলছি না। যে নীলার কথা আমি বলছি তা স্টোন—রক্তমুখী নীলার নাম তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ।

এতক্ষণে ব্যাপারটা বোধগম্য হয়েছিল। ধীপেন বলেছিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

এবারও সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলেন নি ভদ্রসাহেব। একটু চুপ করে থেকে যখন আবার বলতে শুরু করেছিলেন তখন আগের কৌতুকের চিহ্নমাত্র ছিল না। তাঁর মধ্য থেকে একটি ক্লান্ত পরাজিত দরদ খোয়ানো মানুষ যেন কথা বলে উঠেছিল।

ভদ্রসাহেব বলেছিলেন, 'রক্তমুখী নীলার গুণ জানো?'

ধীপেন বলেছিল, 'আমার নিজের কোন অভিজ্ঞতা নেই স্যার। তবে লোকের মুখে শুনেছি রক্তমুখী নীলা ধারণ করলে যার গ্রহ তাকে রাজা করে দেয়—আর যার গ্রহ না তাকে পথের ভিখিরি করে ছাড়ে।

'ঠিকই শুনেছ।' ঘাড় ভেঙে যেন ঝুলে পড়েছিল ভদ্রসাহেবের। বিষণ্ণ উদাস স্বরে সে বিড় বিড় করে উঠেছিল, যার গ্রহ সে রাজা হয়, যার গ্রহ না সে হয় ভিখিরি, তার সব যায়।'

ধীপেন অনুমান করেছিল, ভদ্রসাহেবের জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে বসে আছে সে নীলা চৌধুরী। এবং এই মহিলাটিকে ঘিরে ভদ্রসাহেবের প্রাণে দুঃখের সমুদ্র থৈথৈ করে আছে। অনুমানই শুধু করেছিল, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করার সাহস হয়নি তার। শোভনও মনে হয় নি।

ভদ্রসাহেবই অর্ধস্ফুট কাতর গলায় স্বগতোক্তির মত আবার বলে উঠেছিলেন, 'আমার জীবনে সোনারপুরের নীলা চৌধুরী রক্তমুখী নীলার মতই।'

ধীপেন চকিত হয়ে উঠেছিল। অতর্কিতে বলে ফেলেছিল, 'স্যার, তা হলে—'

কথা শেষ করতে পারেনি ধীপেন। তার আগেই হাতের ইঙ্গিতে তাকে থামিয়ে দিয়েছিলেন ভদ্রসাহেব। বলেছিলেন, আর কোন কথা নয়। তোমাকে যে ইনস্ট্রাকশনগুলো দিয়েছি, এর বেশি আমার কিছু জানা নেই। ইচ্ছে হলে ওগুলোর ওপর ভরসা করে নীলা চৌধুরীকে খোঁজার কাজ শুরু করতে পার।

যাই হোক, অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ কয়েকটি সূত্র হাতে নিয়ে নীলা চৌধুরীকে খুঁজে বার করা সম্ভব কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় ছিল ধীপেনের। তা ছাড়া ভদ্রসাহেব যা আভাস দিয়েছেন তাতে অসম্মান, হয়তো বিপদেরও সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে নীলা চৌধুরীর সঙ্গেই তার চাকরি জীবনের স্বর্গটা জড়ানো।

কী করবে, কয়েকটা দিন কিছুই সিদ্ধান্ত করতে পারেনি ধীপেন। তার সমস্ত চেতনা একটা দোলকের মত শুধু দোল খেয়েছে।

ভয় ছিল, সংশয় ছিল। সেই সঙ্গে ছিল নীলা চৌধুরী সম্পর্কে দুর্বার এক কৌতূহল। কোন দুঃখে অথবা কোন সুখের আশায় পৃথিবীর জটিলতার হারিয়ে গেছে নীলা চৌধুরী? সেটা জানবার জন্য ধীপেনের প্রাণ অস্থির উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। একটা অদৃশ্য দুরন্ত স্রোত তাকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করেছিল। আর নিজের অজ্ঞাতসারে কবে যেন একদিন ভদ্রসাহেবের দেওয়া নীলা চৌধুরীদের সোনারপুরের ঠিকানায় চলে এসেছিল, বিন্দুমাত্র খেয়াল ছিল না ধীপেনের।

(নীলা চৌধুরীর চালচিত্র)

মনে আছে, সেটা শ্রাবণের শেষাশেষি একটা দিন। সময়টা ছিল বিকেল আর সন্ধ্যের মাঝামাঝি একটা জায়গায় থমকানো।

শ্রাবণ মাস; নিয়ম অনুযায়ী বর্ষা কাল। কিন্তু আকাশে বাতাসে দ্বিতীয় ঋতুর চিহ্নমাত্র ছিল না। বায়ুকোণে যে ভরদুপুরে লঘু মেঘের টুকরোগুলো ভেসে বেড়াচ্ছিল সেগুলো জলবাহী নয়; কেমন যেন প্রগলভ

চপল-স্বভাব। নীলাকাশ চুঁইয়ে চুঁইয়ে সোনালী ঢলের যত রোদ নেমে এসেছিল। যেদিকে চোখ ফেরানো যায় শারদশ্রী যেন উছলে উছলে পড়ছিল।

ঠিক সেই সময় সোনারপুরের ভাদুড়িপাড়ায় পুরনো দোতলা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল দীপেন।

কলকাতা থেকে কতটুকু আর পথ! চার পাঁচটা তো মাত্র স্টেশন। শিয়ালদা, বালিগঞ্জ, চাকুরিয়া, যাদবপুর, গড়িয়া পার হয়ে দক্ষিণ শহরতলীর সোনারপুর। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে পৌঁছানো যায়। ষ্টেশনে নেমে যে রাস্তাটা সোজা পশ্চিমগামিনী হয়েছে তারই মাঝামাঝি গিয়ে বাঁয়ে যে গলিটা বাঁক নিয়েছে তার নাম অঘোর ভাদুড়ি লেন। গলিটার শেষ প্রান্তের বাড়িখানার নম্বরই দিয়েছিলেন দত্তসাহেব।

সদর দরজা ভেতর থেকে বন্ধই ছিল। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে কড়া নেড়েছিল দীপেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ কর্কশ পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এসেছিল, 'কে?'

এ জাতীয় সম্ভাষণের জন্য প্রস্তুত ছিল না দীপেন। কিছুটা হকচকিয়ে স্খলিত গলায় বলেছিল, 'আজ্ঞে আমি।'

ভেতরের কণ্ঠটি এবার তীক্ষ্ণতর, 'আমি কে?'

'আজ্ঞে নাম বললে তো চিনতে পারবেন না। দয়া করে যদি বাইরে আসতেন।'

'না, দয়া-টয়া আমি করতে পারব না। দরজা খোলা হবে না।'

[ক্রমশঃ

নূতনের মাঝে পুরাতন

শ্রীনিকুঞ্জ সরকার

সূর্য আজও ওঠে পূবদিকে···
অস্ত যায় পশ্চিমের সাঁঝে।
নীলাভ আকাশ আজও ভ'রে যায় নক্ষত্র তারায়।
চাঁদ আজও স্নিগ্ধ জোছনায়—
বিচিত্র এ পৃথিবীর বুকে বিছিয়ে দেয়—
নাইলনের শ্বেত ওড়নার আবরণ।
নদী আজও প্রবাহিত হয়···
সেই পাহাড় থেকে সাগরের বুকে।
অমাবস্যা, একাদশী, পূর্ণিমারা
আজও লেখা থাকে, ক্যালেণ্ডারের পাতায় পাতায়।
সেই আদিম সৃষ্টিই আজও
বর্তমানের রক্ত মাংস মেখে—
আধুনিকতার বড়াই ক'রে ঘোরে।

সেই আদিমকালের গাছ—
শত সহস্র মাটির নিচে, থেকে হ'ল' কয়লা।
সেই কয়লাকে পুড়িয়ে করা হ'ল ছাই
গাছ হারিয়ে গেল,
কয়লাও রইল না আর,
রইল' শুধু ছাই—
তাকে নিয়ে কেউ আসবাব পত্র তৈয়ারী ক'রবেনা,
মণদরে বিক্রিও হবে না—আলানী হিসাবে,—
তবুও সে ছাই।
যে ছাই সেই আদিম গাছের গন্ধ বয়ে বেড়ায়,
সেই পুরাতনকে পরিচয় করিয়ে দেয়।
তাই বুঝি এই যান্ত্রিক সভ্যতার গায়—
আদিম সভ্যতার গন্ধ ভেসে আসে।

পরাজিতা প্রণয়িনী

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

নিদ্রিতা অন্তোন্মুখকলিকার মত তখনও অচেতনা সেই সুরতোদ্দীপিকা লোচনলোভনা। তার দিকে বিপুল তৃষ্ণার অতৃপ্তি নিয়ে কুঞ্চিতভ্রূ হ'য়ে তাকিয়ে আছেন দেবোপমদেহী এক যুবক নৃপতি।

অদূরে ছিন্নবিচ্ছিন্নাংশে পড়ে আছে কামান্ধা এক দৈত্যের শোণিতাপ্লুত কলেবর।

নীলাকাশবক্ষে অমৃতালোকের অমৃত ক্ষরিত ক'রে উদিত হয়েছেন পৌর্ণমাসীর শশিলেখা। অনিলনির্ভর হ'য়ে সমাগত হ'য়ে আসে পারাণ-প্রস্থনের মাতাল সুরভি।

ভাবছেন আর্যশ্রেষ্ঠ মহাবল মহীপতি :

কি আর এমন অপরাধ করেছিল কামান্ধা দৈত্য? কামনিধান এই অপরিচিতাকে দেখে অনঙ্গ তরঙ্গের আবেগে কম্পিত হয় না কার চিত্ত?

হ্যাঁ। দ্বান্দ্বিক কুণ্ঠার সঙ্গেই স্বীকার ক'রে নেয় তারুণ্যমণ্ডিত রাজহৃদয় :

স্বেচ্ছায় বরণ না করলে যে কোন পুরুষই আপন মূঢ়-করের নিষ্ঠুরতায় নিষ্পেষিত করতে এগিয়ে আসতে বাধ্য ঐ মদনরসাবেশের আকর। ঐ অনুপমা মোহাকর্ষী নারীকে একাকিনী অসহায়া পেয়ে, যে কোন স্বভাবদুর্বল পুরুষের অসংযমিত প্রবৃত্তির স্পর্ধাই কন্দর্পতাপে তাপিত হ'য়ে এগিয়ে আসবে তার ঐ কামলতপ্রসরা বিম্বাধরপানের অধম্য অভিলাষে।

এগিয়ে আসবে পাষণ্ডরূপী শত ষণ্ডির ষড়রক্ষিত মুনক্ষা—যদি আহ্বান জানায় এই একটি চুম্বনতার সাধর আলিঙ্গন।

না।

কটিবন্ধের আধারে শোণিতপানতৃপ্ত দৈত্যরাজী অসি পুনঃস্থাপিত ক'রে পুনরায় স্থির হ'য়ে দাঁড়ান প্রজানুরঞ্জক মহীপতি।

পুনরায় কুঞ্চিত হ'য়ে ওঠে তাঁর ভ্রূ যুগল।

না। আপন মনের অসংযত কামনার উল্লাসকে স্তব্ধ ক'রে দেন যুবক রাজর্ষি। তিনি কাপুরুষ দৈত্য নন্। একটি সংজ্ঞাহীনা নারীত্বের প্রতি আপন পৈশাচিক লালসার অনলকে প্রতি মুহূর্তে প্রশমিত করার শিক্ষাই যে তাঁর রাজকীয় যৌবনের অহঙ্কার।

আর তিনি তো শুধু পুরুষই নন্, তিনি যে পুরুষশ্রেষ্ঠ এক যৌবনের আশীর্বাদ! তাঁরই আদর্শের নিষ্ঠায় যে পরিনিষ্ঠিত হ'য়ে আছে অগণিত প্রজার কল্যাণ-কামনা!

মুহূর্ত আগের কথা ভাবছেন দ্বিরদ মর্ত্যাধীশ্বর :

তখন আপন উজ্জলতার জ্যোতি বিকীরিত করে সুরবর্ত্মকে বিদ্রূপ হেনে কল্পনিলের মত অনিরুদ্ধ গতি নিয়ে বর্ণগিরির শীর্ষ দিয়ে উড়ে চলেছিল তাঁর সুবর্ণ-কেতনশালী মহারথ। অকস্মাৎ নারীকণ্ঠের আর্তচিৎ-কারে স্তব্ধ করতে হয়েছিল তার গতি।

যথাস্থানে এবং যথাকালেই নেমে এসেছিলেন সেই অরাতিনিপাতন গুণধামী।

কিন্তু তৎক্ষণে যৌবনমুখার্ত দৈত্যরাপদের উলঙ্গ কামনার কাছে সংজ্ঞাহীনা হ'য়ে আত্মসমর্পণ করেছিল বিকসিত কুরবক অশোক পুন্নাগ ও নব-চম্পকে কৃতাবতংসা এবং উৎফুল্ল মল্লিকায় উৎকলিতালকা এই অনতিলোমা রূপাতিশালিনী। আপন নারীত্বের চরম অবমাননাকে প্রতিহত করার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হ'য়ে গিয়েছিল তার। আর, তারই পরিচয় বহন করছে এই অঙ্গহীন ছিন্নভিন্ন-পরিধেয়, চিহ্নহীন স্তনবন্ধনী কূর্পাসক, এবং এলায়িত অপ্রবন্ধ কুন্তল রাশি।

কিন্তু চমকিত হয়ে উঠেছিল কামান্ধা দৈত্য। চমকিত হয়ে উঠেছিল পরিচিত দৈত্যত্রাস বহুস্বরে :

—কালাকৃষ্ট রে আর্যারি খাণ্ডব, তোর সকল মত্ততার অবসান এনেছি আমি চেয়ে দেখ্।

মৃত্যুর দর্শনে বিস্তৃত হয় যেমন ক্ষুধ্র মৃগ, প্রাণভয়ে তেমনই পলায়নোদ্যত হয়েছিল উৎপথাচারী দৈত্য। কিন্তু মুহূর্তে ছিন্নশির হ'য়ে মূলোৎপাটিত শাখাতরুর মত শিলাতলে লুটিয়ে পড়েছিল সেই অসুর নাগেন্দ্রের মত পরাক্রমী লালসার দেহ। আর, অবিরত আঘাত দানের পরিণামে দৈত্যশোণিতে রঞ্জিতাঙ্গ হ'য়ে উঠেছিল সেই আর্যকুলশ্রেষ্ঠ মধুজেশ্বরের সর্বজয়ী অসি।

দণ্ডদানের ক্ষেত্রে কোন ন্যায় অন্যায়ের বিচার করেন না সপ্তদ্বীপবলয়া বসুন্ধরাধীশ্বর। নারীধর্মপেক্ষুক পুরুষের একমাত্র শাস্তি—প্রাণদণ্ড, এই তাঁর অধিকারভুক্ত সপত্নী ধরণীর অন্যতম অলঙ্ঘনীয় অনুশাসন। এবারেও তা লঙ্ঘিত হয় নি একটুও।

তখনও নিরাবৃত হ'য়ে পড়ে ছিল হতচেতনা রূপমতির সুষমিমা বরতনু।

ত্বরিতে আপন উত্তরীয় উন্মোচিত ক'রে সুতনু যৌবনবতীর অনাবৃত সর্বাঙ্গের সেই সতৃষ্ণ আহ্বানকে আচ্ছাদিত ক'রে দেন তরুণ রাজর্ষি। ঐ ভাবে কোন নারী-দেহের বিকচ শোভার প্রতি দৃষ্টিদানের অভিজ্ঞতা নেই তাঁর কোনদিনের।

জীবনের কোন দুর্বল মুহূর্তে কোন নারীদেহের প্রলোভন কোন পুলকের উপচার নিয়েও আসেনি যোদ্ধৃ-শ্রেষ্ঠ তরুণ রাজর্ষির হৃদয়ে। অবিরত সংগ্রাম-বিজয়ের মধ্য দিয়ে বিপুল এক সাম্রাজ্যের অধিকারকেই জেনেছিলেন তিনি, পুরুষজীবনের সর্বোজ্জ্বল আশার আলো, এবং সফল তৃষ্ণার একমাত্র পরিতৃপ্তি। ত্রিলোকের একচ্ছত্র প্রভুত্বের স্পর্শরক্ত রত্নাংশুপল্লবিত হৈম-সিংহাসন ছাড়া যৌবনের আর কোন স্বপ্নই দেখেনি তাঁর অবসরহীন দুই নয়নের কৌতূহল।

কিন্তু আজ হয়েছে তার ব্যতিক্রম। আজ চেতনহীনা কনকবর্ণ-নারীদেহ তাঁরই জীবনের বিপুল তৃষ্ণার আর এক নূতন অনুপ্তি এনে দিয়েছে যৌবনাঢ্য রাজর্ষির সংযমিত চিত্তে।

বুঝতে পারেন না রাজর্ষি, নবপল্লবমুক্ত উন্মত্ত ভৃঙ্গের মত কেন সেদিকেই বারে বারে ছুটে যেতে চায় তাঁর লোভাতুর দৃষ্টি নবগলিত মনঃশিলার মত অঙ্গাভা বিকীরিত করে যেদিকে পড়ে আছে এই বরতনু।

বুঝতে পারেন না, শিহরিত নীপের মত এ কোন্ পুলকের স্ফুটনাবেশে সর্বাঙ্গে তাঁর ফুটে ওঠে রোমাঞ্চ ?

শুধু ভাবছেন :

শৃঙ্গারবিলাসের মত আয়োজন নিয়ে কোথায় চলেছিল, কে এই সুতনু বরবর্ণিনী ?

তরঙ্গবিক্ষুব্ধ অতলান্ত মহাপানীর মতই কুলহারা তাঁর আলোড়িত অনুমান :

নিখিল নিসর্গের মধুরিমা আহরিত ক'রে সুগঠিতা অনিন্দ্যসুন্দর তনুকা, কে এই অনন্তরূপা শোভাময়ী ? এ তো মর্ত্যের কোন মানবী নয় !

লোচনরঞ্জন ছিন্নাংশুকে অসমাবৃতা সুঘন দু'টি বিস্ময়কর জঙ্ঘা, অলক্তকরঞ্জিত নূতাপটিয়সী দু'টি আরক্ত চরণ এবং শীতল উশীরে অনুলিপ্ত দু'টি চারুবৃত্ত পয়োধরের চিরন্তন কম্পন নিয়ে বিগলিতা সৌদামিনীর মত স্থিরা হ'য়ে পড়ে আছে যে নয়নরঞ্জনা রূপাভিমানিনী, তার সবই তো নূতন ! এ কি তবে গন্ধর্বলোকেরই কোন লাবণ্যের শৃঙ্গারবিলাসিনী মণিকন্যকা ?

অথবা—

নীলোৎপলের কোরকের মত মুদিত অক্ষিপল্লবা, রক্ত দন্তাঘাতে প্রজ্বলিত প্রায় সোদ্গমরহিতা পেলব কপোলিকা নিষ্কম্পা চম্পকসদৃশা কালতনা চিবুকা, তবে কে এই তাপদগ্ধা বাতাহতা মাধবিকা ?

কে গো, তবে কে এই কামাঙ্গশীলা মূর্চ্ছিতা নিরুপমা ?

আহা, আত্মত্রাণের অভিলাষে অপহৃত কস্তুরীবিন্দুর পরিবর্তে নবচন্দ্রিকাসদৃশা সুন্দর কপালে মৃদুমর্দিতা সিন্দুরার-মঞ্জরীর মত বিন্দু বিন্দু স্বেদাঙ্কুরেখা নিয়ে, এবং শিলাবক্ষে নীল-কুঞ্চিত-কুন্তলের অর্ধা-সজ্জা রচনা করে কাঞ্চনলতিকার মত লুণ্ঠায়িতা যেন অবকর্ষিতা রতি !

রাজকার্যে বিলম্ব ?

আপন মনেই হাসেন রাজর্ষি পুরুষোত্তম। সমস্ত

জীবনের অবলম্বিত কল্পসম্পদের অপচয়েও এই লোচন-গ্রাহিণী মৃগতৃষ্ণিকার পরিচয় জানবার উৎসুক্যে স্বীকৃত আছেন তিনি আজ।

অনুমান করেছেন দেহজ রাজর্ষি, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সংজ্ঞাময়ী হয়ে উঠবে এই দেবদুর্লভা। সেই মুহূর্তের সুযোগে আপন কর্তব্য স্থির করে নিতে থাকেন তিনি।

আর কিছু নয়, শুধু জানতে চেয়েছেন তিনি, স্বামীজন-পরিত্যক্তা কি না এই সুশ্রোণী ভামিনী? অথবা, পুরুষ-স্পর্শবঞ্চিতা সুকেশা কুমারী?

জানেন না রাজর্ষি, কি এক অজ্ঞাত বর্ণে বর্ণিমাতীত উজ্জ্বলো বর্ণায়িত হয়ে ওঠে তাঁর সৌধদীপ্ত হৃদয়ের চিত্রপট। শুধু বুঝেছেন, অভাবিত যে অমৃতধারায় পরিষিক্ত হ'য়েছে তাঁর চিত্ত, তাকে অস্বীকার করতে পারে না তাঁর কোন কর্তব্যেরই আহ্বান।

আনুকূলিতা কমলকলিকা অবশেষে প্রস্ফুটিতা হ'ল। চক্ষু উন্মীলিত ক'রেই যৌবনস্থাতি সেই নয়নাভিরাম রাজমূর্তিকে দর্শন ক'রে বিস্মিতা হ'ল রূপোত্তমার কটাক্ষ।

পরক্ষণেই নিজের অবস্থা বুঝতে পারে সে। বুঝতে পারে, দেহের স্বাভাবিক চাঞ্চল্যেও নারীত্বের সকল লজ্জা উদ্ঘাটিত হ'য়ে যাবে। তাই, বিস্ময় ও লজ্জার এক সম্মিলন অনুভূতিই শুধু অভিব্যক্ত হ'য়ে ওঠে ক্ষীণতটীর ক্ষীণকণ্ঠে:

—কে আপনি, দীপ্তকান্ত রাজন্?

অবিচলিত গাম্ভীর্যে স্থির হ'য়ে থাকবার চেষ্টা করেন তরুণ রাজর্ষি। তিনিও জানেন, মুহূর্তের চাঞ্চল্যে চরম প্রকটিত হ'য়ে যাবে তাঁরও প্রমুক্ত পৌরুষত্বে লজ্জা। তাই, সংযত স্বরে আপন পরিচয় দান করেন তিনি। বলেন:

—সপত্নজা সপ্তদ্বীপা এই মর্তেরই এক নগণ্য ভূখণ্ডের অধিপতি আমি, সামান্য লোকেশ। দানযোগ্য আর কোন পরিচিতিই আমার নেই। শুধু তুমি আপন স্বপ্নের কুশলতা পুনঃপ্রাপ্তা হয়েছ জেনে আপন সৌভাগ্যকে ধন্য মনে করেছি, অনামিকা রূপোত্তমা। তুমি কে?

হিল্লোলিত হ'য়ে ওঠে রুচিরাপাঙ্গীর রুধিরধারা। রহস্যের কৌতুকে লীলায়িত হ'য়ে ওঠে তার সে দৃষ্টি কৌতূহল। আপন পরিচয় গোপন রেখে শুধু সবিনয় প্রণতি জানিয়ে সে বলে:

—রাজন্যদত্তর প্রণম্য, আমার সম্পূর্ণ সম্বিৎ ফিরে এসেছে। আর সেই সঙ্গে এক অজ্ঞাত উৎসবের হর্ষে আকুল হয়ে উঠেছে নারীজীবনের নভঃপট। তবু, অনামিকাই থাকুক আমার পরিচয়।

এই প্রথম পশ্চাতে ফিরে দাঁড়ান তরুণ রাজর্ষি। সুযোগ দেন। সেই সুযোগে রাজন্যদত্তর পুরুষের রত্নখচিত স্বচ্ছতন্তু উত্তরীয়ে আপন যৌবনান্বিত বক্ষাঙ্গের দীপ্তি শোভা সংবৃত ক'রে উঠে দাঁড়ায় ধন্যিতাজনা নারী।

কিন্তু পশ্চাতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই বিপুল এক বিস্ময়ের পুলকে পুলকিত হ'য়ে ওঠে পৌরুষদীপ্ত রাজহৃদয়। উজ্জ্বল নয়নে তাঁর স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে এক অভাবিত গরিমাদ্যুতি। চকিতে ভুলে যান তিনি স্বর্বেশ্যার ভূপতিত অভিজ্ঞান।

সহাস্যে সহসা ব'লে ওঠেন রাজন্যদত্তম মহীধর:

—পরিচয় প্রদানে নিরুৎসুকা উর্বশী, রাজোচ্চারিত উত্তর দানে কুণ্ঠিতা হ'য়েছিলে, কিন্তু ভূলোকের সকল প্রশ্নের প্রহেলিকা যে নিজেই অপাবৃত হ'য়ে আসে তার কাছে, তা বোধ হয় জানতে না?

শম্পাস্পৃষ্টা ভিষিগ্বার মত মুহূর্তের চমকে চমকিতা হ'য়ে ওঠে স্বর্গের বারনারী। কল্পনাই ক'রতে পারেনি চিরছলপ্রণয়িনী কুহকিনী যে, এই ভাবে কারো কাছে চরম উদ্ঘাটিত হ'য়ে যাবে তার কৌতুকগুপ্ত পরিচয়।

জানে উর্বশী, তার প্রকৃত পরিচয়ের গরল গোপন রেখেই শুচিশুভ্র হ'য়ে আছে সকল পরিচয়ের গৌরব। জানে সে, ছিন্নজর্জরিত নিষ্পত্র অশোকতরুর মতই রিক্তা হ'য়ে যাবে প্রকটিতপরিচয়া হেমকূটবাসিনী এই ভূধরকের বণিতা। জানে, দেহোপজীবিনী নারীত্বের পরিচয়ই তার সকল মধুরিমার চিরন্তন কলঙ্ক।

নীলোৎপলে শিশিরকণিকার মত বিন্দু বিন্দু অশ্রুভারে প্রোচ্ছল হ'য়ে আসে দু'টি মৃগাক্ষিগোলকের আবেদন।

কিন্তু সেদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করেন না নারীমন অজ্ঞ মহীপতি। সুদীর্ঘ যৌবনের কোন দুর্বল মুহূর্তে কোন ছল-বিলাসিনী বারবণিতারও সাথে মিলিত হ'বার সম্ভোপন অবসর আসেনি তাঁর। আজ এসেছে যেবনটী স্বয়ং উর্বশী,

—স্বাধিজন-পরিবৃতা কোন শুচিতার প্রতীক সে নয়, নয় পুরুষস্পর্শবঞ্চিতা পবিত্রোত্তমা কোন কন্যা-কুমারিকা। সুতরাং, আর কোন বিহ্বলতা নয়, শ্রদ্ধাপরিপূত বাক্যোপচারের প্রলোভনে প্রলোভিত হ'য়ে তীব্র আঘাতের শর বর্ষিত হ'য়ে ওঠে সহসা তাঁর রহস্যময় কণ্ঠস্বরের নিষ্ঠুরতায় :

—কেলিকপটিনী পণ্যাঙ্গনা, তবে কি দৈত্যশ্রেষ্ঠ হরিত্তের বক্ষলগ্না হ'য়ে তোমার সেই রভস-সুখের আবেশ উপভোগে বিঘ্নোৎপাদন ক'রেছি ? ব'ল, বিভ্রমনিপুণা লাস্যবিলাসিনী, সেই আর্তস্বর কি তবে এক সুরত-সুখের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্যই উৎসারিত হ'য়ে বিভ্রান্ত করেছিল রাজর্ষি পুরূরবার শ্রুতি ?

—রাজর্ষি পুরূরবা !

পুনরায় চকিত চমকে চমকিত হ'য়ে ওঠে উর্বশীর তনুলতা। আলা ও তৃপ্তির এ এক অভিনব চমক !

একবিংশতি স্বর্গ-বসন্তের কত অগণন মুহূর্তে কত মধুবিলাসীর পৌরুষাক্ত দংশনের আলা নিয়েও স্থিরা ছিল কুসুমিকা স্বর্গোপবনের কণক হাস্যের সুধাশ্বেত জ্যোতি। কত নির্বোধ প্রেমিকের নির্বাধ প্রনুত্ততাকেও নির্মম প্রত্যাখ্যানের আঘাতে আহত ক'রে লাস্যলীলার প্রমত্তা হ'য়েছে বিভ্রমকুটিলা উর্বশী। এতদিন তারই দেওয়া চমৎকারিত্বের মোহে চমৎকৃত হ'য়েছে ত্রিলোকের সকল বীর্যের অহঙ্কার, চমকেছে তারই চমকে।

কিন্তু এ কি হ'ল তার আজ ?

বুঝতে পারে না ত্রিদিববাসিনী উর্বশী—নিসর্গজ নারীত্বের এই অসহায় বেদনার দুর্বলতা আলোকলোকের কোন্ জ্যোতিষ্কণিকার তমসাভ্যন্তর অপসৃত হ'য়েছিল এত কাল ? বুঝতে পারে না, রাজসসত্ত্ব এই রাজর্ষির একটি নগণ্যতম বিভ্রমের আঘাতেই কেন বিদিগ্বাহতা মৃগবধূর মত ভূতলাশ্রয়িনী হ'তে চায় তার চিরাসুমতি যৌবনের অবসাদ ?

—রাজর্ষি পুরূরবা !

একটি নাম। কোন্ অনন্তরের স্বপ্নলোকের স্বপ্নাধারে চিরসুপ্ত একটি নাম !

মনে হয় উর্বশীর, কামনাধার এই একটি নামের কাছে পাওয়া সামান্যতম বিভ্রমও আজ তনুগ্রাসী গরলের বিভীষণতা নিয়ে বিলুপ্ত ক'রে দিতে উদ্যত হ'য়েছে তার সকল চেতনার সাধ।

—শিষ্টপ্রতিপালক রাজকুঞ্জর পুরূরবা ! রাজর্ষি পুরূরবা !

বাচ্যাতীতা বেতসলতিকার মত পুনরায় সংজ্ঞালুপ্ত হ'য়ে তাঁরই সম্মুখে লুটিয়ে পড়ে সেই উত্তরীয়াবৃতা-অবাসিত-যৌবনের তনুশ্রী। তড়িৎগতিতে সেই তনুশ্রী ধারণ করেন বিস্মিত রাজর্ষি।

বিগতাভ্র নীলাকাশের বক্ষে তখনো মিলে গেছে সপ্তর্ষিমণ্ডলের শেষ চিহ্নবিন্দু। প্রহরাতীত হ'য়ে এসেছে রাত্রির নির্জনতা।

মন্দিরতাম্রর কুসুমরেণু বহন ক'রে পুনরায় প্রবাহিত হ'য়ে আসে সুখস্পর্শ সুরভি সমীরণ।

আশ্বস্ত হ'য়েছেন রাজর্ষি পুরূরবা।

সত্যই নিরপরাধিনী স্বর্লোক-বর্জিতা উর্বশী।

শক্রের আদেশে সাধনপ্রয়াসী এক স্বতন্ত্র ঋষির সকল সাধনসাধ আঁধারাচ্ছাদিত করার মন্ত্রণে নিশাযোগেই স্বর্লোকের আলোকরেখা থেকে মর্ত্যবক্ষে নেমে এসেছিল কামচারিণী অপ্সরা। কিন্তু হিমগিরির নির্জন শীর্ষে পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়েছিল কামশিলাস্থ নিশাচর। দীর্ঘকালের সঞ্চিত যে উর্বশী-লালসা তৃষার্তির মত আচ্ছন্ন ছিল অবসাদের ঘুমে, নির্জন শৈলের আলোকান্ধকারে তাকে একাকিনী অসহায়া পেয়ে অনলসংলগ্ন হিমস্তূপের মত তা প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠেছিল সহসা।

উত্তাল তরঙ্গের মত নির্বাধ কামনার বোঝা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে বেপথুমতী স্বরোপবনার তরঙ্গায়িত দেহোপরে। আর, আর মাত্র কয়েকটি নির্বাধ মুহূর্তের অবসর পেলে হয়ত সার্থক হ'ত তার দীর্ঘদিন প্রতীক্ষার যাতনা।

আশ্বস্ত হয়েছেন, কিন্তু বিস্ময়াবেগ পরিত্যাগ করতে পারেন নি পুরূরবা। কারণ, তখনও জানতে পারেন নি তিনি সেই সাধনপ্রয়াসী ঋষির নাম, শক্রাদেশে যার সকল সাধনসাধ একটি উৎক্ষণের বিনিময়ে ব্যর্থ ক'রে দিতে চলেছিল উর্বশী।

শুধু স্বীকার করেছে উর্বশী, শৃঙ্গারকেলিনিপুণা বটে স্বর্গের মন্থরিকা, কিন্তু হীনতম পুরুষত্বের প্রতীক সেই দৈত্যবীর্যকে আপন দেহশোণিতে ধারণ করতে ঘৃণাই বোধ করেছে সে চিরকাল। অকপটে নিবেদন করেছে উর্বশী,

হীনা পণ্যাঙ্গনারূপে ঘটিয়ানদে বিভ্রমনগরে সে অনুপমা. কিন্তু অনার্য কামুকের পাশবিক প্রণয়ের বলাৎকারে প্রলুব্ধা হয়নি সে কোনদিন। হৃদয়ের সর্ববলে সে তাদের ঘৃণা ক'রে।

অনুতপ্ত হয়েছেন রাজর্ষি পুরূরবা। সেদিনের সকল ব্যাক্রোশের জন্য নিজেরই অনুতপ্ত হৃদয়ের নির্মমতার প্রতি আক্রোশ জাগে।

উর্বশীর সান্নিধ্যে সকল সংযমের দুর্বলতা অপনোদিত হয়ে গেছে তাঁর।

বুঝতে পেরেছেন, হীনা পণ্যাঙ্গনা নয় আর স্বর্গবাসিনী উর্বশী—প্রনুপ্ত দর্শনের অভিলাষে প্রমুগ্ধ হ'তে শুরু করেছে তাঁরই হৃদয়াকাঙ্ক্ষা। বুঝতে পেরেছেন, তাঁরই অজ্ঞাতে তাঁর সেই এক কণ-মধুরিমার চেয়ে তাকে আরও রূপমতী-রূপে দেখতে অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে তাঁর এই দু'টি অক্ষির আকুলতা।

মনে পড়েছে প্রথম দর্শনের স্মৃতি :

সেদিনের সেই শৈলবক্ষের ফাঁকে ফাঁকে তরুশিরে দেখেছিলেন তিনি বিভ্রমের সমারোহ। প্রস্ফুটিত হ'তে দেখেছিলেন রাশি রাশি বসন্তকুসুম। আর সেই সঙ্গে অপূর্ব মাদকতায় বিধূনিত হয়ে উঠেছিল তাঁর সর্বাঙ্গ, মলয় বায়ুর মধির নিশ্বাসে। আজও, তাঁর মধিরা-বিহ্বল আঁখিতে রয়েছে সেই একই তন্দ্রার ঘোর।

মনে পড়েছে, নীলোৎপলের কোরকের মত মুদিতা সেই অক্ষিপল্লব। মনে পড়েছে, নিষ্কম্পা চম্পকদলনিভা কামরূপা সেই চিবুক।

ভোলেন নি প্রতিষ্ঠানাধিপতি পুরূরবা। ভোলেন নি, সেদিন সেই প্রদোষের ছায়াচ্ছন্ন উপলতলে দাঁড়িয়ে এক সংগোপন অভিলাষের অর্ঘ্যও নিবেদিত করেছিল মধিরেক্ষণা উর্বশী। ভোলেন নি, অনঙ্গদেবের স্বপ্নলোকের স্বপ্নাধারে চিরসুপ্ত একটি নামের কাছে আপন দ্বাবিংশতিতম বসন্তের আকাঙ্ক্ষাকে উপহার দিতে চেয়েছিল প্রমাদিতা উর্বশী।

দু'টি তৃষিত তৃষ্ণাহরণ প্রসারিত ক'রে আবেগাপ্লুত-কণ্ঠে সম্মতি জানিয়েছিলেন যৌবনার্তা রাজর্ষি।

মনে আছে :

একটি কৌতুকের প্রলোভন তবু পরিত্যাগ করতে পারেনি কৌতুকিনী স্বর্বাসিতা। স্বয়ম্বরসভায় এক নিষ্ঠুর ছলনার অনুতে পরীক্ষা নিতে চেয়েছিল সে স্বর্গ্য অমৃতের।

আনিতম্বপ্রলম্বিত কুন্তলদামে অঙ্গুলি সঞ্চালিত করে এবং আকর্ণবিশ্রান্ত দুটি পদ্মপলাশের কটাক্ষ হেনে এবার এক কপট অভিশাপের দুর্বার্তা বিঘোষিত করেছিল সে রাজর্ষির কানে কানে :

—কথা দাও প্রণয়ী, একটি ইরাবৎসরের সমাপ্তি ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে ভুলে যাবে আমাকে। কথা দাও, ত্রয়োবিংশতিতম বসন্তের স্বর্ণমল্লিকা আঘ্রাত হ'বে না তোমার ইন্দ্রিয়ে।

প্রতিবাদ করেননি পুরূরবা। দু'টি তৃষিত বাহুর আলিঙ্গনে সবিহ্বল কণ্ঠে ধ্বনিময় ক'রে তুলেছিলেন এক বিবাহীন সম্মতি।

যেন মূর্ছারার মন্ত্রণে ঝংকৃত হ'য়ে উঠেছিল সুরাকর বীণা। ব'লে উঠেছিল প্রেমরোমাঞ্চরঞ্জিতা স্বর্যুতি কপটিকা :

—জেন প্রণয়ী, সকামা উর্বশীকেই সুরতসঙ্গিনীরূপে পেয়েছে সপ্তলোকের মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান। অকামা উর্বশীর নির্জন অবসরকে দুর্বিসহ বিরক্তির আঘাতে আহত করলে তাকে হারাতে হয়। এবং……

—এবং ?—সুকুঞ্চিত হ'য়ে উঠেছিল প্রতিজ্ঞাবান রাজ-ললাটের বলিরেখা।

—এবং, এই একটি বৎসরের জন্য অভিশপ্তা হয়েছে অকামা উর্বশী। তাকে কথা দাও, শুধু আলিঙ্গন ও নিক্কণের মধ্যেই সীমায়িত থাকবে তোমার সকল কামনার অধিকার। তার বেশী নয়।

সেই মুহূর্তে, মনে আছে পুরূরবার, আচম্বিতে ফিরে পেয়েছিলেন তিনি তাঁর আবেশ-ভ্রষ্ট সম্বিত। অপসারিত হ'য়ে গিয়েছিল কোমলোষ্ঠপানের সকল মধিরতা। স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল পূর্ণস্ফুট সেই যুগল উরসিজালিঙ্গনের বিলাসিতা। মনে আছে, বিস্ময় ও বেদনায় সহসা আর্তস্বর উৎসারিত করতে চেয়েছিল তাঁর অনাহত যৌবনের শিহরণ।

তবু অটল হ'য়ে ছিলেন তিনি তাঁর পৌরুষদীপ্ত প্রতিজ্ঞায়।

—যেন কামাভিশপ্তা তপোভঙ্গা, সপ্ততলব্যাপিনী পৃথিবীর এই একটি কালচক্রাবর্তনে রচিত কোন দিন বা রাত্রি, কলা বা কাষ্ঠা, যদি সেই রতি-অভিশাপের মুক্তি-বার্তাও নিয়ে আসে, তবে তাকেও সপ্রেম আলিঙ্গনের সাথে শুধু এক নিষ্ফল চুম্বনের পুরস্কার দান ক'রেই ফিরিয়ে দেবে প্রতিজ্ঞাভঙ্গী পুরুরবার কামনা।

মনে মনে হেসেছিল উর্বশী। কত উর্বরা মর্ত্য-মানবের রতিবাসনা সাধনবিপ্লবী ভোগকামনায় উদ্বেগ হ'য়ে উঠেছে তার ঐ একটি বিলোল কটাক্ষের ইঙ্গিতে। দু'টি উন্নতাগ্র পীনস্তনের নির্বাক আহ্বান সন্দর্শন করে আসঙ্গ আহবে উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে কত সংযমী সাধকের খণ্ডনরত লালসা। আর আজ তারই সম্মুখে শুধু আলিঙ্গন ও চুম্বনের মধ্যেই আপন কামনার অধিকারকে সীমিত ক'রে রাখবার প্রতিশ্রুতি দান করেছে মর্ত্যের ভোগপিপাসু এক যৌবনের অহঙ্কার।

পরিণতি অনুমান করতেও কষ্ট হয়নি উর্বশীর। অনন্তমেঘ স্বপ্নলোকের স্বপ্নাধারে চিরসুপ্ত এক সুকান্ত যৌবনের নাম নিঃশেষে রিক্ত হয়ে যাবে শারদোৎপলগন্ধা উর্বশীর হিল্লোলিত ভ্রূ-বল্লরীর দিকে তাকিয়ে। তার আতপ্ত দেহের স্পর্শে স্পর্শান্বিতা হ'য়ে অন্তহীন সম্ভোগের বিদ্যুৎ-শিহরণে শিহরিত হ'য়ে উঠবে যৌবনান্বিত রাজ কিরীটের প্রতিজ্ঞা।

কিন্তু সেদিন বুঝতে পারেননি রাজর্ষি পুরুরবা—পথোন্মুক্ত নির্ঝরের মতই অশান্ত হাস্যলীলায় সহসা প্রমত্তা হ'য়ে উঠেছিল কেন বিমোহিনী স্বর্গোপরা? বুঝতে পারেননি, কিসের উল্লাসে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল ভয়চকিতা হরিণীর মত আয়ত ও চঞ্চল, এবং শ্বেতাভাভিন্ন উজ্জ্বল নীলিমা-জড়িত সেই যুগল অক্ষিগোলকের ইঙ্গিতময় দীপ্তি?

মার্গশীর্ষে স্থিরূপে আবির্ভূত হ'য়ে ফিরে গেছেন দেবাগ্রণী ভাস্কর। চলে গেছেন বৈভাষিক পৌষের সনাতন। উষরান্তের অবিচলিত কর্তব্য সমাপনে অবহেলা করেননি মধুমাসের সূর্য ও চৈত্রের ভানু।

জ্বালামালাময় স্পর্শের অবশেষ নিয়ে একই ভাবে আপন স্বজন-পথে যাত্রা ক'রেছেন খরকর বৈশাখী-তাপন এবং জ্যৈষ্ঠের ইন্দ্ররূপী জ্যোতিষ্কুণ্ডলের দ্যুতি।

প্রাবৃটপুত্র আষাঢ়ের কৃষ্ণবলাকায় সমাচ্ছন্ন থাকার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছেন স্বয়ম্প্রোতি রবি।

গগনবক্ষ থেকে বিদায় নিয়েছেন তমোহর শ্রাবণ গভস্তি ও তাদের স্বপ্রচণ্ড মহিষবাহন। আশ্বিনের হিংসারেতাও নেই আর আকাশে।

একটি ইন্দ্রাবৎসরের অচির সমাপ্তি ঘোষিত করার দায়িত্ব নিয়ে অবশেষে উদিত হ'য়েছেন প্রাক্-হিমের জগচ্চক্ষু দিবাকর।

কিন্তু বিগত পৌর্ণমাসীর সকল মিলন-বিহ্বল হাসি শুধু বিদ্রূপের উপল নিয়ে বেদনহীন রুক্ষতায় অবরুদ্ধ ক'রে দিয়েছে পথোন্মুক্ত প্রেম-নির্ঝরের প্রোদ্দাম স্বপ্নগতি। এসেছে বিরহাক্রান্ত কয়েকটি অমানিশার ব্যর্থ বেদনা।

আপন কুহকে আপনিই প্রতারিতা হ'য়েছে স্বর্গের কৌতুক। সুরভিত আপন দেহেরই সৌরভে প্রমত্তা হয় যেমন মৃগমদলোভী বন-কুরঙ্গীর আবেগ, তেমনই আপন দুর্দমনীয় স্মরাবেগের উন্মাদনায় উন্মত্তা হ'য়ে ওঠে স্বর্গের অনাহত এবং অভিশপ্ত যৌবনের পিপাসা।

মণিকুট্টিমে আঘাত পেয়ে বারে বারে তারই কাছে ফিরে আসে তারই দেওয়া প্রেমবিদ্রূত আলাপন। কামনা-বিলসিত তার সকল সম্ভাষণেই নিরুত্তর এবং নিরুত্তাপ থাকে পৌরুষত্বের বিস্রাজিত অহঙ্কার।

বিফল হয়েছে বিমুক্তাহার পীনস্তনের বিলাস। মধন আলিঙ্গনের সীমা লঙ্ঘন ক'রেনি রাজর্ষি পুরুরবার কামনা।

তপ্ত ওষ্ঠপানের সাথে সাথে কেলীক্রীড়ালাভের ব্যাকুলতাতেও প্রমত্তা হ'য়ে উঠেছে সুরলোকের পুষ্পাসব-পানমত্তা কপট অভিশাপ। তবু প্রতিবারই অপ্রমত্ত থেকে গেছে যৌবনান্বিত এক মর্ত্যের অহঙ্কার।

প্রতিষ্ঠানপুরের রাজপ্রকোষ্ঠে হেমপর্যঙ্কের নিভৃতে এইভাবে এক অভিনব কুহকের ইন্দ্রজাল রচনার নিষ্ঠা শুধু ব্যর্থতার দহনেই দহিত ক'রে চলে নিজেকে।

ভুলতে পারে না স্বয়ম্ভুরা উর্বশী।

বক্ষের একান্ত সান্নিধ্যে হীরকস্তূপের দীপ্তিদীপ্তিত সুবর্ণকান্তি এক তরুণ পুরুষ-শার্দুলী, কিন্তু কোন সুসজ্জার বিন্যাসেও কুঞ্চিত হয়না সে ললাট-স্বর্গের বিভা। জ্যোতি-র্বিমণ্ডিতা রাকাচন্দ্রসদৃশা বরবপুর সেই রূপমায়াকে একই

ভাবে শুধু আলিঙ্গন ও নিকণের উপহারে ধন্য ক'রে ফিরিয়ে দিয়েছে সে বারে বারে।

স্বপ্নাচনার সাথে সাথে আরও এগিয়ে আসে কাল। নিরঙ্কুশ প্রতিকূল কামনার চরম জর্জরিতা হ'য়ে ওঠে সকামা উর্বশী। রতিনাভের অত্যুগ্র বাসনায় ক্ষিপ্তা হ'য়ে ওঠে উৎক্ষিপ্তা যৌনলালসা। কুণ্ঠা ও লজ্জার নির্বোক জলাঞ্জলি দিয়ে আপন যৌবন-সম্ভার নিঃশেষে উৎসর্গের বিকারিত উন্মাদনা নিয়ে এগিয়ে যায় স্বর্গের উদ্দাম রতি-বুভুক্ষা, কিন্তু শুধু সংযমহীন সম্ভোগবাসনার শস্পায়িত শিহরণে শিহরিত হয় না সেই বিচিত্র মর্ত্যাভিলাষ।

অতৃপ্ত কামনার শূন্যতায় অবশেষে পরিস্তিমিত হ'য়ে আসে স্বর্গের সমুজ্জ্বল কাম-বর্তিকার শিখা। প্রবুদ্ধ শৈংকার সহ অন্তর-চড়িমার অসকল ব্যাকুলতায় অবশেষে ক্ষীণা হ'য়ে আসে সেই অনন্ত-যৌবনা স্বর্গের নীলাম্বরসংবৃতা দিবাতন্বী কান্তি।

সপ্তত্রলবায়ুসী ধরণীর একটি কালচক্রাবর্তন পরিপূরিত হওয়ার সাথে সাথে অরুণিত প্রতীচী সীমান্তে একটি ইদাবৎসরের সমাপিকা বিঘোষিত ক'রে যান দীপ্তি-দীধিত রক্তভানু।

অশ্রুপ্লুত দু'টি চক্ষের নীরব আকুতি নিয়ে বিদায়-ক্ষণের প্রতীক্ষা ক'রে অনুতপ্তা উর্বশী।

প্রশান্ত ঔদাসীন্যে ব'লে ওঠেন রাজর্ষি পুরূরবা :

—বল সকামা প্রণয়িনী, এই ইদাবৎসরের পরিসমাপ্তির সাথে সাথে তোমাকে বিস্মৃত হ'য়ে গেলে, সুখী হ'বে তোমার আর কোন্ অভিশাপ ?

অবরুদ্ধ বিলাপ যেন গুহাবিদারি স্রোত নিয়ে প্রাবিত ক'রে গণ্ডভট। মলয়াহতা বল্লরীর মত ভেঙ্গে পড়ে আত্ম-বঞ্চকী ছলনা। মর্ত্যযৌবনের রাজীব চরণে লুটিয়ে পড়ে স্বর্গের অহঙ্কার।

বাষ্পায়িত দু'টি চক্ষুর আবেদন নিয়ে যেন অস্ফুটে আর্তনাদ ক'রে ওঠে উর্বশীর বেদনা :

—রাজর্ষি প্রণয়ী, নিজেরই কপটাভিশাপের ছলনায় প্রতারিতা হ'য়েছে ছলপ্রণয়িনী উর্বশী ; আজ শুধু সে তোমারই চিরপ্রেমাকাঙ্ক্ষিণী। সকল কপটতার আবরণ থেকে উন্মোচিতা হ'য়ে সুধারুণ এই অন্তর্জ্বালা থেকে আজ রক্ষা পেতে চায় তোমারই অনুরাগবন্যা ধরিত্রী।

—সুতনু কৈতবিনী, সে যে শুধু কপটই অভিশাপ, তা অনাবৃতই ছিল পুরূরবার প্রেমস্নিগ্ধ দৃষ্টির অন্তর্ভেদী প্রজ্ঞার তীক্ষ্ণতায়, কিন্তু আপন প্রণয়িনীর সে কপট অভিশাপকে অশ্রদ্ধায় আপ্লুত করেনি পুরূরবার নিকষিত হেম। সুযোগ দ্যাও প্রণয় রুচিরা স্বর্গশ্রী, ত্রয়োবিংশতিতম বসন্তের স্বর্গ-মল্লিকা যেন অনাঘ্রাত থাকে তোমারই প্রণয়ধন্য মর্ত্য-সত্বের প্রতিজ্ঞায়। জানাতে এসেছি প্রিয়তমা, যে বাসুদেব একদিন পরম প্রাপ্তির উন্মাদবেগে প্রিয়াসঙ্গী হ'য়ে ছুটে এসেছিল আপন গৃহে, স্বর্লোকের সীমাদ্বারে সে তার সেই প্রাণবল্লভাকে বিদায় জানিয়ে মর্ত্যজীবনের অবশিষ্ট রিক্ততাকে বরণ ক'রে নেবার স্বীকৃতিতে প্রস্তুত হ'য়ে আছে।

চিৎকার ক'রে ওঠে ক্রন্দনাপ্লুতা স্বর্গের অভিমান :

—নিষ্ঠুর সুন্দর, সব জেনেও একটি সেই প্রণয় পরিমলের সকল উৎসর্গের সৌরভ ঘৃণা জর্জরিত উপেক্ষার অনলে আহুতি দিয়ে কি তুমি পেয়েছিলে এতদিন ?

—মিথ্যা ছলনার আত্মোৎসর্গে ছলনাময়ী, ক্ষণপ্রণয়ের কুহকিনীরূপে তোমায় চায়নি পুরূরবা। তাই, নিরুত্তাপ থেকেছে তার উত্তপ্ত আশ্বাস।

—অশান্ত বাহুর মত্ততায় তবে ছিন্নভিন্ন ক'রে দাওনি কেন সেই ক্ষণপ্রণয়ের লালসাকে ? তাহলে হয়ত চির-প্রণয়ের বন্ধনমন্ত্রে নিজেই বন্দীভূতা হ'তে চাইত সেই ক্ষণিকবিভ্রান্তির বিলাস !

—জানতাম। কিন্তু সকল চাওয়ার উপলব্ধিতেই সুতৃপ্ত হয়না পুরূরবার প্রেম। নিষ্ঠার কাঠিন্যে পরীক্ষা চায় সে সকল কামনার।

আর এক চরম সত্যের প্রতিজ্ঞা সুকঠোর বিদ্রূপ হেনেছে স্বর্গের অভিমানাহত অহঙ্কারে। তাই ভাষাহীন বিস্ময়তায় স্তব্ধ হ'য়ে যায় স্বর্লোকের সত্যদ্রষ্টা প্রণয় কামনা।

বুঝতে পারে না অপূর্ণবাসনা উর্বশী, কোন্ নিষ্ঠার কাঠিন্যে স্বর্গপ্রার্থনার পরীক্ষা চায় প্রত্যাখ্যানশিল্পী মর্ত্য-যৌবনের নির্মম আকাঙ্ক্ষা ?

অথচ—

মনে পড়ে উর্বশীর, দেবদুর্লভ দু'টি শুনকোরকের আশ্লিষ্ট

সম্ভোগরসে এবং পরমাকাঙ্ক্ষিত কুসাধরপানের দীর্ঘস পরিতৃপ্তি পেয়েও শেষ বিদায়ের মুহূর্তে মন্দিরতামস আর একটি হতস-রাত্রির সকরুণ প্রার্থনায় স্বর্গযৌবনের এই স্বর্ণ-বিনির্মিত চরণ-হংসতে লুটিয়ে পড়েছে ত্রিলোকের কত গর্বান্বিত যৌবনের সাধনা। মূঢ় প্রেমার্তীর সে আবেদনাপ্লুত প্রার্থনাকেও আপন রূপগর্বে ধিক্কারকুটিল ক'রে তুলেছিল রসাঞ্জনাঙ্কিত দু'টি আকর্ণবিস্তারী স্থির নয়নের দৃষ্টি। প্রতি-বারের মত প্রতিবারই একটি ক্ষণপ্রণয়ের বিলাসে সমাপ্তি আহুত ক'রে অবহেলাভরে চলে গিয়েছিল নিষ্ঠুরা নায়িকা।

আর আজ তার সকল ক্ষণপ্রণয়ের গর্বকে হসিত-মথিত ক'রে চিরজীবপ্রেম-স্বপ্নের রূপ ধ'রে দাঁড়িয়ে আছেন যৌব-নান্বিত পুরুরবা। আজ, তারই সম্মুখে চিরপ্রণয়ের অক্ষয় বিজয়কেতন ধূলিত ক'রে তৃপ্তির হাসিহাসছে মর্ত্যযৌবনের রাজসিক অহঙ্কার। আর, তারই কাছে বিদায় গ্রহণের দুঃসহ বেদনায় উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে স্বরসভ্যের রূপগর্ব; এবং উদ্গত অশ্রুজলের জ্বালা নিয়ে প্রণামনমিতা হ'য়েছে তার সকল অভিমান।

আজ মনে হয় উর্বশীর সব বৃথা, বৃথা তার সকল যৌবনের উপচার। আজ শুধু সরব চিৎকারে ঘোষণা করতে ইচ্ছা যায় সেই নব্যজ্ঞানাভিলাষী তরুণ তাপসের নাম—শক্রাদেশে যার কাছে আত্মসমর্পিতা হ'য়ে তারই দুর্ভাগ্যকে আহ্বান জানাতে উদ্যতা হয়েছিল সে সেদিন।

কিন্তু পারে না। অন্তহীন ক্রন্দনের আবেগে রত্নখচিত হর্ম্যতলে লুটিয়ে পড়ে স্বর্গোপ্সরা উর্বশী।

রাত্রিনিঃস্বনে সূচিত হ'ল স্বর্গমুক্তার শুভাগমন বার্তা।

অমৃতলোকের আলোকমঞ্চে ফিরে এসেছে স্বর্গপ্রিয়া উর্বশী।

কলহাস্তে কলকোলাহলে ইন্দ্রসভাকে মন্দিরতার পূর্ণ ক'রে দেয় স্বর্গের যে ক'টি ছন্দোময়ী স্বপ্নের উল্লাস, তারই একটি হারিয়ে গিয়েছিল মর্ত্যলোকের কোন্ এক সুকলিন্ অরণ্যের নিবিড়তায়। সে ফিরে এসেছে আবার।

আর একটি মূর্ছনার রম্যতালে ও তন্ত্রীলয়ের মৃদুস্পর্শে বিমনা হ'বার অথও সুযোগ ফিরে পেয়েছে সোমোন্মত্ত দেবলোকের সানন্দ অবসর। আনন্দ-নিনাদে তাই মুখরিত হ'য়ে উঠেছে উর্বশীপ্রিয় স্বরমূর্ত্তিকা। পরম প্রাপ্তির পুলকা-বেগে তরঙ্গায়িত হ'য়ে চলেছে তাই আনন্দোৎসবের অনির্বাণ আলোক-তরঙ্গ।

প্রগল্ভা বারাঙ্গনার বিলাসোজ্জ্বল রসবাক্যের শীতলতায় অবগাহিত হ'য়ে স্বর্লোকের সান্নিধ্য রুক্ষতার জ্বালা অপ-নোদিত ক'রতে আসেন মধুপিপাসু সুর-মধুপের দল। অসুরাক্রমণের চিরন্তন সন্ত্রাসের হাত থেকে কয়েকটি মুহূর্তকে বিমুক্ত ক'রে নিতে আসেন তাঁরা স্বর্গনটীর বিলাস-বাসক-সজ্জিত প্রকোষ্ঠের নিভৃতে।

কিন্তু অবরুদ্ধ বিলাস-বাসকের দ্বার উন্মুক্ত হয় না কোন নাগরাস্বানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। সানন্দে শ্রুতি-সম্ভোগের স্বীকৃতি আনেনা আর কোন আভরণ শিরন। আর কোন ক্ষণপ্রণয়ের ময়ময় ইঙ্গিতে মুখর হ'য়ে ওঠে না সেই মায়াময় গভীর-নিকন।

দ্বারপ্রান্ত থেকে বুঝি চিরতরে অদৃশ্যা হ'য়ে গেছে রম্য-ভূষায় বিক্ষোভিতা সেই নারী।

চরম বিস্ময়ে একে অপরের প্রতি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে আলোক-তীর্থে ফিরে চলে অগ্নিজিহ্ব প্রতিষ্ঠ সুরোত্তমের উপেক্ষিত জ্যোতির্বেহ।

আলোড়ন জাগে আলোক-লোকে।

চরম অবমাননাকর উপেক্ষায় সুরপুরুষদের রসলাভের কামনাকে উপেক্ষিত করায় স্পর্ধায় স্পর্ধায়িতা হ'য়ে উঠেছে দেহোপজীবিনী কেলিপটিয়সী!

মর্ত্যলোকের এ কোন্ দুঃসহ দুর্যোগ বহন করে এনেছে দেবসুরতা নৃত্যপটিয়সী!

পলে বিপলে বর্ধিত হ'য়ে চলে স্বর্গের বিস্ময়োজ্জ্বল আলোক-শিখা।

কিন্তু জানে না স্বর্গ, ছিন্নমূল শতদলের মত নিষ্ফল স্ফুটনাকাঙ্ক্ষার বেদনা নিয়ে মর্ত্যলোক থেকে ফিরে এসেছে আলোকলোকের উর্বশী। হাস্যলাস্যের চিরন্তন জীবনরস ধীরে ধীরে অবসিত হ'য়ে আসছে সেই স্বর্গসুষমের কেন্দ্রপরাগে।

জানে না স্বর্গ, তার এই মহোচ্চ উদারতা থেকে অনেক দূরে, নিম্নলোকে, ভূতলের এক অজ্ঞের বিজয়কেতনের বাতাস-নির্ভরতায় কম্পিত শোভায় প্রমুগ্ধা হ'য়ে আছে শক্রপ্রিয়া উর্বশীর কামনা। জানে না, আলোক-লোকের সকল সমাদর আজ নির্মম নির্যাতন হ'য়ে নূতন বেদনায় অভিভূত ক'রেছে তার সকল অবসাদ।

কেবল অনুমান ক'রেছেন স্বর্গাধীশ বাসব।

দেবাসুরের সর্বশেষার পথে সেই অনুমানেরই সত্যতা পরীক্ষা নিতে আসেন তাই ঐরাবতাসীন পুরন্দর।

কিন্তু কি ছিল কে জানে সেই রূপোত্তমা স্বর্গোদ্যানের মনে!

সহসা উন্মুক্ত হ'য়ে যায় বিলাস-বাসকের দ্বার!

কিন্তু প্রবেশ-মুখে দাঁড়িয়েই সুতীব্র বিস্ময়ের প্রতোষা-ঘাতকের চমকে চমকিত হ'ন দেবরাজ ইন্দ্র।

বিরহবিধুরা এক মর্ত্যবধূর সজ্ঞাহীন নৈরাশ্যের শয্যায় সঙ্কিতা হ'য়ে দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মুখে প্রণামনমিতা হ'তেও ভুলে গেছে স্বর্গের দ্বারনিরতা দ্বারবোষা। মনসিজে কোন্ শক্তিশ্রেষ্ঠের নীরাজনাভিলাষে দেবশ্রেষ্ঠকেও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদিত ক'রতে ভুলে গেছে বামোরু দেবনটী?

বিস্মিত দেবরাজ! এ কোন্ অভাবনীয় অনাসক্তির অন্তরে অপসৃত হ'য়ে গেছে মন্থিরস্রাবী দু'টি মৃগাক্ষি-লোকের সতৃষ্ণ আবাহন? কোন্ পরমাপ্রাপ্তির বিস্ময়-পুলকে স্তব্ধ হ'য়ে গেছে তালচকল দু'টি চরণের নিক্কণিত মঞ্জীর? বুঝতে পারেন না তিনি, কোন্ সে বেদনার আশা নিয়ে চিরতরে তিরোহিত হ'য়ে গেছে বিশ্ববিলাসিনী সেই সুচারু বদনের হাস্যজ্যোতিরেখা?

তবে কি সত্যই হ'ল তাঁর অনুমিত আশঙ্কা? মর্ত্যকে জয় করতে গিয়ে কি তবে তারই চরণে চিরদাসত্বের স্বাক্ষর দান ক'রে এসেছে স্বর্গের অভিশাপ?

নিজেরই কাছে প্রশ্ন করেন দেবরাজ:

সকল আভরণের শূন্যতায় নিবৈচিত্র্যা বিরহিনী মানবী-রূপা, ধূমাবলিজটিল পাবকপ্রভাব মত মলিনকায়া—এই কি সেই উরুসম্ভবা উর্বশী? অথবা, স্বর্গগর্বের মূর্তিমতী দুর্যোগবাহিকা?

ঐ ললাটকহীন ঘনকৃষ্ণ কুন্তল, মুক্তাকণ্টকহীন মৃণাল কণ্ঠ, ললাটিকাহীন ক্ষুদ্র ললাট, ললম্বিকাহীন রুচির কণ্ঠ, বন্ধকহীন সুঘন জঘন, কেয়ূর ও পক্ষকাহীন মৃণাল বাহু, রশনাহীন রসাধরা কটি, এবং অঙ্গরাগহীন অপাঙ্গ আজ পরম বিস্ময়ের কৌতূহলে পূর্ণ ক'রে দেয় পাকশাসনের অন্তর-ভূমি।

এই কি সেই রম্ভোরু উরুসম্ভবা, প্রসাধনাবিলাসিনী?

—বল, তুমিই কি শক্রপ্রিয়া উর্বশী?

—হ্যাঁ, আমি বিদায়প্রার্থিনী, একদা তোমারই অংশবিলাসের অংশভাগী স্বর্গনটী উর্বশী।

—বিদায়!

—হ্যাঁ, আমি বিদায় চাই, ত্রিদিবেশ্বর বজ্রপাণি!

—কিন্তু, কোথায় যাবার প্রলোভনে প্রমত্তা হয়েছ তুমি, চিরস্মরাতুরা নারী? এ কোন্ নবীন প্রহসন নিয়ে এসেছ তুমি আলোকের আলোক-মঞ্চে?

—প্রহসন নয় ইন্দ্রিয়েশ্বর বাসব, এ আমার নবীন অভিলাষ। তোমারই আদেশরক্ষার প্রতিশ্রুতি নিয়ে জীবনের সবচেয়ে বড় প্রহসনেরই অপচয় বহন ক'রে নিষ্ফলা হ'য়ে গেছে সেই চিরস্মরাতুরা উর্বশী। যাব, এই কামনাময় দেহকে নিষ্কামের চিতা-লে অঙ্গারিত ক'রে দিতে যাব। যেখানে ক্ষণবিলাসের অভিশাপে অভিশপ্ত থাকে না কোন ক্রন্দসী যৌবনের স্মরায়িত অভিলাষ।

—নিষ্কাম! ক্রন্দসী যৌবন!—বিপুল পুলকে অট্টহাসে ফেটে পড়েন বাসব:

—প্রণয়ের লীলাভূমি স্বর্গবেশ্রে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রাধিপের বাসবের সম্মুখেও অর্থহীন প্রলাপে মুখরা হ'য়েছ অস্থিরা নারী! কিন্তু, স্বর্গের প্রণয়মালিকার কোন্ বুলাই কি নেই আজ তোমার জীবনে?

—না, স্বর্গে সুকোমল প্রণয়কুসুম সেই দেবরাজ, প্রণয়হীন বিলাসকণ্টকের তীক্ষ্ণতায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে উর্বশী প্রার্থনার তনুলতা। স্বর্গের দেওয়া আলাময় কণ্টক মালিকা অনেকবার আপন কণ্ঠে বরণ ক'রেছে উর্বশী, এবার মুক্তির প্রার্থনায় অস্থিরাই হ'য়েছে তার অবসন্ন যৌবনের মন। এবার সে বুঝেছে দেবরাজ, কনকটকেও লুকিয়ে থাকে বিটপীর ত্রাস।

থর থর কাঁপে পাকশাসনের শাসনযষ্টি। স্বর্গের সর্ব মনজয়ী প্রলোভনকে ধিক্কার দিয়েছে স্পর্ধিতা স্বর্গ-নটী! অথচ……।

ভাবেন স্বর্গাধীশ পুরন্দর:

অথচ সহস্র সপ্তলোকে স্বর্গসুষমার একক দম্ভ বাহিত ক'রার অধিকার ও চাতুর্য শুধু এদেরই দাসত্বের কাছে চিরবদ্ধ হ'য়ে আছে। এই অপ্সরলোকবাসিনী চকিত-নয়নাদেরই একটি চারুকটাক্ষের প্রতীক্ষায় সুপ্ত হ'য়ে থাকে সর্বভুবনের প্রলয়-জাগরণ। এরাই বজ্রায়ুধ ইন্দ্রের

আপন পদরক্ষার শ্রেষ্ঠতম আয়ুধ। এদেরই মোহোন্মাদনা-কর সম্ভাষণে দেবেন্দ্রপদের প্রলোভন স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ ক'রেছে কত শক্তিমন্তের পৌরুষের আকাঙ্ক্ষা। আর, তারই বলে নির্দিষ্ট হ'য়েছে দেবসিংহাসনের একাধিপত্য।

আজ, জ্যোতির্লোকের একটি সেই জ্যোতিঃকেন্দ্র তার সকল উচ্ছলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে নিতে যেতে চায়। তার ঐ অনিমেষনয়নের কোণে চকিত বিদ্যুতের বিদ্রোহাদ্বিত বিরোধীজ্বালার দ্যুতি দেখতে ভুল করেননি বৃন্দাকরবন্দিত পুরন্দর।

তাহলে সত্যই সেই আলোক-লোকের আলোড়ন! সত্যই তার অনুমান!

—কিন্তু স্বর্গ যদি তোমার বিদায়দানের স্বীকৃতিকে না বরণ করে?

—তাহলে বিদায়প্রার্থিনী উর্বশীর দেহলতা স্বর্গের আকর্ষণ পরিত্যাগ করে যাবে না কখনও। কিন্তু সেই সঙ্গে ক্ষণপ্রণয়ের সকল অভিশাপ থেকে মুক্তি দেবার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে তাকে। দেবরাজ, ক্ষণেক রতি-বিলাসের বাসনা নিয়ে নাগরবেশী আপনাকে বরণ ক'রবে না আর স্বর্গাপ্সরা উর্বশী, স্বর্গরাণীর সম্মানোচ্চ সিংহাসনে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠাই হ'বে তার প্রার্থনা।

সহসা সরোষ সিংহগর্জনে কেঁপে পড়েন বজ্রধর বাসব:

রসনা সংযত ক'র যৌনাশুচি বারাঙ্গনা। যে কলুষিত পাপ-ওষ্ঠে পুরুষরূপী শত রিপুরক্তের স্বরবিলসিত চুম্বন বরণ ক'রেছ, সেই ওষ্ঠে ইন্দ্রাণীর শুচিতাধন্য আসনের প্রার্থনা ক'রো না অসতীনা নরবিলাসিনী

প্রতিবাদ করে না উর্বশী। আপন পদাঙ্গুলি দিয়ে ধরাকবক্ষ বিলিখিত করে বিলুলিত চক্ষের কৌতূহল নিয়ে কি যেন সে খোঁজে।

দেবাসুরের বর্বরেখার পথে পুনরায় চলে যান ক্ষিপ্ত ক্ষুব্ধ সুরপতি বজ্রাধীশ।

আর, সেই মুহূর্তেই যেন এক বিপুল পুলকের কৃটিকায় প্রলেপিত হ'য়ে যায় উর্বশীর সকল বেদনার মলিনতা। পরম প্রাপ্তির হর্ষে রূপান্তরিত হ'য়ে যায় দেহপণ। নারীত্বের সকল প্রাণান্তিক বিষাদে।

বিফল হয়নি উর্বশীর পতিংবর। আরো সুন্দরভাবে মর্ত্য ও স্বর্গের দু'টি যৌবনাঢ্য প্রতিশ্রুতির স্বরূপকে চিনতে পেরেছে উর্বশী। জানতে পেরেছে, মৃত্তিকা-হীন নীরসতার চেয়ে অনেক রম্য সেই মর্ত্যমৃত্তিকার মায়া।

তাই, মর্ত্যযৌবনের সেই চিরপ্রণয়ের প্রতিশ্রুতিবন্ধ প্রজ্ঞা বিশ্বরূপেতনের অঙ্গীকারই নূতন এক স্বপ্নসাধের পুলক সঞ্চারিত ক'রে চলে পুনরায়।

হাহাকার ক'রে ওঠে ব্যর্থ পৌরুষত্বের বেদনা। প্রিয়াবিরহক্লিষ্ট রাজর্ষি পুরূরবা!

ভাবতে পারেন না পুরূরবা—ঘনকৃষ্ণ জলদের বক্ষে ক্ষণিক বিদ্যুৎ বিলসনের মত, শত রাজকীয় কর্মব্যস্ততার মধ্যেও কেন মৌহূর্মুহু এক অনুকৃতিতে পূর্ণ হয়ে যায় তাঁর সংরাগিত হৃদয়ের আকুলতা? কেন বারে বারে মনে পড়ে সেই বিবশতার স্পর্শে প্রলিপ্ত একটি সুডৌল সুখাবয়বের সুচিত্রিত বেদনা?

সন্দেহদোলায় দোলায়িত হ'য়েছে দৃঢ়িষ্ঠ রাজচিত্তের বিবেক। জীবনের প্রতিজ্ঞা রক্ষা বড়, না আপন আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি বড়? যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়াই যদি হয় রাজ-জীবনের সার্থকতা, তবে যাকে চাওয়া যায়, তাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কেন তীব্র আকুলতায় বিদ্যুৎরূপে আসবে না তাঁর জীবনে?

ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারী চাওয়ার বুভুক্ষায় তাই বুভুক্ষিত হয়ে ওঠেন রাজর্ষি পুরূরবা।

চাই, চাই, চাই। আমি ফিরে পেতে চাই সেই রূপোত্তমা প্রেয়সীকে,—অর্থহীন প্রতিজ্ঞা রক্ষার বধিরতার যার অমূল্য আত্মসমর্পণের বাণী শুনতে পায়নি শ্রুতি। ফিরে পেতে চাই—নিষ্ফল পৌরুষত্বের অবিবেকী অন্ধত্বে যার আত্মনিবেদনোদ্যত অর্ঘ্যতনু ক্ষীণতর হ'য়ে গেছে অনাপ্রাপ্তির বিষাদোচ্ছ্বাসে।

ব্যাহত হয় রাজকার্য। পরিত্যক্ত মৃগয়া। অনাদৃত রাজপ্রিয় মাধ্বীপাত্র। রত্নসভায় তন্দ্রালস দাঁড়িয়ে থাকে বায়ুবেগের চতুর্দশ তুরঙ্গম।

ভাল লাগে না নূপুরের মুখরতা। বজ্রঘুমে বধির হয় অকারণ অশ্রুরাশি। স্বর্ণদণ্ড চামরের বিজন মনে হয় নির্মম উষ্ণতার পরিহাস।

দূরে অলকাপুরীর আলোকের দিকে তাকিয়ে অশ্রুসজল আচ্ছন্ন হ'য়ে আসে পৌরবধূর দুটি চক্ষু।

জীবনের প্রথম নব অনুভূতি আসছে তাঁর,—জীবনের প্রথম বৈচিত্র্যের স্বাদ।

অজ্ঞাত প্রেমের পুলকে ধন্য হ'য়েছেন পুরুরবা,—এবার এসেছে প্রিয়াবিরহের অশ্রুজল।

কাঁদছেন রাজর্ষি পুরুরবা! জীবনের প্রথম ক্রন্দনে ভেঙে পড়েছে মর্ত্যের শ্রেষ্ঠতম অধিকার। হীনমন্য প্রকৃতি-পুরুষের মত অসহায় সেখানে রত্নখচিত হেমকীরিটের রাজসিক প্রলোভন।

অধিকরণলিপিকার সকল ব্যবস্থার অব্যবহৃত হ'য়ে ওঠে রাজকক্ষে। ভেসে ওঠে, লোভনরঞ্জন ছিন্নাংশুকে অনন্যবৃত্তা সুঘন দুটি জঘা। ভেসে ওঠে, অলক্তক-রঞ্জিত নৃত্যপটিয়সী দুটি আকৃষ্ট চরণ। ভেসে ওঠে, শীতল উরুতে অনুলিপ্ত দুটি চারুবৃত্ত পয়োধরের চিরন্তন কম্পন। মনে পড়ে, বিগলিতা সৌদামিনীর মত স্থিরা এক রূপান্তি-শালিনীর দেহ।

—ওগো সুরসত্রের সুরকেন্দ্র, তোমার কাছে নতজানুতে চক্রবর্তিপুটে প্রার্থী হ'য়েছে আজ ধাতা পুরুরবা। মর্ত্যের সকল বৈভবের বিনিময়ে, দাও, ফিরিয়ে দাও তাকে তার ঘরিত্রা।

স্বপ্ন দেখেন পুরুরবা:

হীরকমণির জ্যোতির্বলিত এক অবৈভব কুটিরের পর্ণশয্যার শুয়ে আছেন এক বনবাসী রাজন্। সেখানে দারিদ্র্যের শত অগ্নিজ্বালার মধ্যেও এক অনির্বচনীয় সুখ-মিলনের প্রশান্তিময় আশ্রয়ে ধন্য হ'য়ে আছে তার জীবন। প্রকৃতির সখী হ'য়ে ভুলে গেছে সে তার চিরন্তনী বরা-ভরণের বিলাস।

সৌম্য থেকে সৌম্যতরা এক অক্ষয় মমতার ক্রোড়ে নম্রকণ্ঠার অর্পিত ক'রে সুপ্তির মধ্যেও সুপ্তিমগ্ন হ'য়ে আছে বীর্যান্বিত সকল অহঙ্কার। ত্রিলোকব্যাপ্ত সেই মমতার মোহিনী মায়ায় আচ্ছাদিত হ'য়ে গেছে পুরুষ-জীবনের সকল গ্লানি।

স্বপ্নলোকের অপ্রমেয় সুখাবেশে এইভাবে প্রিয়াবিরহের মহাতীব্র বাস্তবাতপের জ্বালা ভুলে যান পুরুরবা।

সহসা সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে স্বর্গলোক। সর্বগ্রাসী বুভুক্ষায় স্বর্গকে কেন্দ্র ক'রে চারিদিকে প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠেছে অসুরঘোষ।

বিভীষণ দৈত্যত্রাসে আলোকহারা হ'য়ে আসে আলোক-লোকের আলোক-তরঙ্গ।

অভাবিত সে বিপর্যয়ে স্বর্গ ভুলে থাকে উর্বশীর কথা। ভুলে যায় কেলিরসোচ্ছল প্রমোদ-বিলাসের কথা। আপন প্রাণরক্ষার সত্বরে পলায়নপর হ'য়ে স্বর্গকেন্দ্রে ছুটাছুটি করতে থাকেন সকল দেবতা।

এবার প্রচণ্ড শক্তিতেই শক্তিমত্ত হ'য়ে ছুটে এসেছে দেববৈরী অসুর। সূর্যকরোজ্জ্বল সুবিস্তীর্ণ সাগর-সৈকতের মত পরিবেষ্টন ক'রেছে তারা লক্ষিত স্বর্গভূমি। ধন্বী দেবতার সকল ধনু কালিমা প্রলিপ্ত ক'রে, তবে তারা ফিরে যাবে।

সকল শক্তি দিয়ে অসুরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন দেবরাজ বাসব।

কিন্তু বৃথা।

রণদুর্জয় সে দুর্ভেদ্য অসুরবৃত্তের চাপে অস্থির হ'য়ে অস্তমিতনক্ষত্রের মতই স্বর্গবক্ষে ছিটকে আসেন তিনি বার বার।

প্রমাদ গণেন সুরসেনাধিপতি! সুরসৈন্যের বরধন্য কর্ণিরপাণির বুভুক্ষিত উল্লাসে উল্লসিত হ'য়ে ওঠে ভয়ঙ্কর অসুরানীকিনীর অধীর কলরোল।

নিরুপায় দেবকুল!

অবশেষে সেই সুপ্রচণ্ড পরিণাম মুহূর্তের অনিবার্যতায় কাঁপতে থাকে চিরশান্ত সুর-মূর্তিরা। সর্বান্তক মৃত্যুর আঁধারিত সর্বান্তের প্রতীক্ষা নিয়ে এক অস্থির নিশীথের মূর্ছিত প্রহর গোণে অন্ধকার দেবভূমি।

কিন্তু সহসা আর এক বিস্ময়ের চমকে চমকিত হ'য়ে ওঠে সুরদল।

দুঃসহ দেববামিনীর অবসানের সাথে সাথেই সংবাদ বহন ক'রে আনেন স্বয়ং জ্যোতিষ্মান্ জ্যোতির্ময়:

—গলোহিত দেবজে গতজীবন হ'য়ে লুটিয়ে পড়ে যেমন অস্থিহীন কীট; তেমনই এক শক্তিমান্ নর-মানবের অযুত সেনানীর দুর্ধর্ষ আক্রমণের আঘাতে ছিন্নশির হ'য়ে

রণাঙ্গনে পতিত হ'য়েছে রণাভিলাষি অসুরের রণসাধ। সমরাভিলাষ পরিত্যাগ ক'রে হতাবশিষ্ট অসুরসংঘও সুরবৃন্দ পরিত্যাগ ক'রে পলায়নপর হ'য়েছে। অসুরাক্রমণের কোন সম্ভাবনাই নেই আর।

—জাগো সুরমৃত্তিকা, তোমার সকল সন্তাপ দূরীভূত হ'য়ে যাক।

নিশাবসানের হর্ষোৎসবে মত্ত লোহিতময় গগনতলের মত মৃত্যুমুক্তির পুলকে আত্মহারা হ'য়ে ওঠে অমরেরও অমরদল।

কিন্তু বিস্ময় কাটে না তবু। সবিতৃদেবের কাছেই জানতে চায় তাদের সংশয়ভীত জিজ্ঞাসা :

—কে সেই মহীয়ান স্বর্গের অপ্রতিরোধ্য নির্ঝরের পথ-রোধ ক'রে সন্তাসমুক্তির স্বস্তিশ্রী লাভে ধন্য ক'রেছেন যিনি তাকে ?

মৃদু হেসে চলে যান দ্যুতিমান-দৈবত তেজভাস্কর। স্বর্গ-মর্ত্যের নিশাহীন সকল কর্মের দিশা যে তাঁরই বরপুত্র হ'য়ে আছে,—তিনিই যে সর্বসৃষ্টির পালনী-রক্ষার দিশা।

বলেননি দেবজ্যোতিঃ—কিন্তু অজ্ঞাত রইল না স্বর্গের।

বৃদ্ধাতিথিরূপে নয়, অসুরের উদ্যত স্বর্গগ্রাসের মুখে পরাজয়ের ভস্ম প্রলেপিত ক'রে, স্বর্গদ্বারে শিবির রক্ষার আদেশ দিয়ে স্বর্গের সকৃতজ্ঞ উপহার লাভের প্রতীক্ষায় প্রতিক্ষিত হয়ে আছেন ত্রিলোকবিশ্রুতকীর্তি মর্ত্যাধীশ্বর স্বয়ং পুরূরবা,—শৌর্যে, বীর্যে ও অমিত পরাক্রমে স্বয়ং বাসবও শ্রীভ্রষ্ট যাঁর পাশে,—চিরবিজয়ের তিলক বিলেখিত যাঁর সুপ্রশস্ত ভালদেশ।

দিগন্তের পুঞ্জিত নীহারিকার মতই দূর হ'তে দেখা যায় মর্ত্যশিবিরের সেই শ্বেত চন্দ্রাতপ। যেন স্বর্গাভরের প্রতিশ্রুত শুভ্রতায় হিরণ্ময় ঔজ্জ্বল্যে সকল আলোকের মাঝেও আলোকময় হ'য়ে আছে সেই একাগ্র প্রতীক্ষা।

তার কারণটিও জেনেছে স্বর্গ। আর কিছু নয়, স্বর্গের কোটি কোটি কুসুমের একটিকে পরম সম্মান দাবী দিয়ে মর্ত্যলোকে বরণ ক'রেই নিয়ে যেতে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু সেই মুখে তাঁরই পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে বরণ ক'রেছিল কালবশ অসুরের প্রতিশ্রুত নিয়তি।

কিন্তু এ কি সেই নগণ্য এক বন্য-কুসুম ? এ যে স্বর্গের সকল কুসুমের প্রস্ফুটন সুরভির কেন্দ্র !—এ যে সপ্তমন্বন্তর মানসস্থ সেই সুরভিতা ব্রহ্মকলা, স্বর্গের সকল আকাঙ্ক্ষার মণিস্বরূপিনী,—উরুসম্ভবা উর্বশী ! বিধাহীন উর্বশী-দানের চেয়ে বড় দুঃসাধ্য ধ্যান কল্পনাও করতে পারে না স্বর্লোকের উপহার।

কিন্তু প্রতিবার্তা ফিরে আসে :

—তাহলে অসুরাক্রমণের সন্ত্রাস থেকে হয়ত চিরতরে মুক্ত হ'বে স্বর্গের সুরদল, কিন্তু সেই একটি কুসুমকেই চিরতরে একান্তে পাবার অধিকার নিয়েই দেবেশ্বরের সিংহাসনে উপবিষ্ট হবেন স্বয়ং মনুজেশ্বর পুরূরবা। আর, দেবানীকিনীর শস্ত্রসজ্জায় নূতনভাবে লক্ষিত হবে তাঁরই অযুত মানব-সেনানী।

বিস্মিত ধন্বা শতক্রতু। বুঝতে পারেন, ছলনাময়ীর বিমূঢ়চিত্ত দানব কিংবা দেবতা নন্ এই স্থির-সঙ্কল্পের অটল বিটপী। যে সুরসুন্দ প্রেমাকর্ষণের বিশ্বাসবলে দেবযানেরও সকল দুর্গমতা পরিজয় ক'রে স্বর্গদ্বারে উপনীত হয়েছেন বুধপুত্র পুরূরবা, তাকে দেবার কিছুই নেই, স্বর্গকুসুমের সেই পরম-প্রীতির উপহার দানের প্রতিশ্রুতি ছাড়া।

অবশেষে জয়ী হয় পুরূরবার পণ।

দেবাসুরের বর্ণরেখার পথে নেমে আসে মাতলির রথ।

দেবলোকের সকৃতজ্ঞ উপহাররূপেই শুধু নয়, মর্ত্যের সাথে চিরবন্ধনের বন্ধকরূপেও স্বর্গের সেই দুঃসাধ্য ধ্যানের বেদনা বরণ ক'রে ধন্য হন পুরন্দর।

স্বর্গপার্শ্বের আকর্ষিত শূন্যযোজন থেকে উঠে যায় মর্ত্যবাহিনীর জয়ধ্বনি। উদয়াচল চলোর্মির মত মর-লোকের বক্ষকেন্দ্র অভিমুখে ফিরে এ চতুরঙ্গের রঙ্গায়িত উল্লাস।

দিগন্তের দূরপ্রান্তে দাঁড়ায় প্রেমালিঙ্গনের সাথে মর্ত্য-ওষ্ঠে চুম্বনদান করে মহোদ্যা গগন। বৃক্ষশাখের সুখনীড়ে চঞ্চুপুটের স্পর্শ আনে অভয়-সম্পত্তি।

বিরহবেদনাবৃত জীবনের সকল নৈরাশ্যের সন্তাপ অপরিবর্তিত হ'য়ে যায় সৃষ্টির আদিম দু'টি সৃষ্টির স্বয়ং-প্রকাশের একাত্মতার সুখ-সমাগমে ! হৃদয়ের স্তরে স্তরে মুখরিত হ'য়ে চলে অনাময় সৃষ্টির অনুপম মিলন-গীতির সুর।

নবীন পল্লবের স্পর্শস্পর্শ ক'রে প্রবাহিত হ'য়ে আসে বকুল-সুরভিত মলয়।

নূতন কিছু বলার নেই আর দু'জনের। শুধু চারি চক্ষুই যেন একই সঙ্গে উপহার দিতে চায় অনেক বলার প্রতিশ্রুতি। তারা নক্ষত্রের প্রস্নিগ্ধ মিনতার প্রলেপ নিয়ে আপনাপন তৃপ্তির দিকে তাকিয়ে থাকে নিষ্পলক। অতুল প্রাপ্তির আবেগে নতাপর সেই চক্ষুতারা যেন ছন্দিত হ'তে চায় ক্ষণে ক্ষণে।

রূপোলে রূপোলস্পর্শে পরিপূর্ণ হ'য়ে আসে সকল পুলকের সম্ভার; যেন অনিচ্ছুকে ধন্য হয়ে আসে অতলীয় আশা।

অনির্বচনীয় ছন্দের উপচারে শিরায় শিরায় ছন্দোময় হ'য়ে ওঠে অপার্থিব আনন্দেরও ঝঙ্কার।

—সুরুল তাপস নয়, উর্বশী, জেনেছে পুরুরবা, শক্রাবেশে তারই স্বর্গবিজয়ের পথ কণ্টকাকীর্ণ করার অভিলাষে নেমে এসেছিলে সেদিন সেই প্রথম প্রদোষের ছায়াচ্ছন্ন প্রায়ান্ধকার উপলক্ষে। পুরুরবার অমৃতলোভ থেকে রক্ষা পেয়েছে সুরভূমি, কিন্তু হারাতে হ'য়েছে তার সকল সুষমা।

এবার ক্ষণপ্রণয়ের ছলনা নয়, নয় শুধু চিরপ্রণয়েরও প্রতিশ্রুতি,—মর্ত্যাংকারের রাজীব চরণে চিরপরাজয়ের অঙ্গীকার নিয়ে এসেছে স্বর্গের কপট অভিশাপ।

এবার এক অচ্ছেদ্য মিত্রতার সূত্রে অনুস্যূত হয় দু'টি প্রাণ,—এক হ'য়ে যায় দুটি দুর্লভ আত্মার অন্তরতা।

তাই, পরম প্রণয়ের প্রেমায় দোলে মর ও অমর, মিলন হয় প্রভাত ও সন্ধ্যা-গোধূলির নবারুণ আদিত্যের প্রাচী-উদ্ভাসিনী কান্তির সম্পাতে যেন বিলীন হ'য়ে যায় প্রভাতের অন্তরল কুহেলিকার ঘোর।

সময় সংলাপ

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

অনুরণন ভাবনার এলোমেলো প্রাত্যহিক পাখী
ক্রমাগত উড়ে আসে, বুঝি শেষ নেই!
আমরাও ভাবি তাই অবিশ্রান্ত
কত কী যে, আবোল-তাবোল!
পান থেকে চুন-খসার হিসাবে
পরমাণুর শূন্যতা মেলে।
প'ড়ো বাড়ীটার স্যাঁৎসেঁতে গন্ধে—
সময়ের শঙ্খচিল বদলায় ভোল!
সভ্যতা, জীবন, নদী আর
বিজ্ঞান ঘড়ির প্রশ্ন এক: তুমি কি পেলে?
কাণ্ড-জ্ঞান-হীন বুড়ো ছেলেটার মত
সূর্য ওঠে! অস্ত যায় দিন।
উৎসনার আলো জ্বলে,
ডুবে যায় কোলাহল, পৃথিবীর শঙ্খের নূপুর।
মুমূর্ষু রোগিণীর শিয়রের পার্শ্বে বসে থাকে
অতি বৃদ্ধ জরাজীর্ণ-প্রত্যাশা প্রবীণ!
আর
আকাশের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে—
ক্ষীণ-কণ্ঠ মৌনীবট বলে:
শান্তি দাও ভগবান, আমি তৃষাতুর।

বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টার লুপ্ত পাতা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বিশ্বাসঘাতক নন্দ কুণ্ডুর হত্যা
(১৯০৭-১৯০৮ সাল)

লর্ড কার্জনের কুখ্যাত বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনা এবং তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ স্বদেশী আন্দোলনের কথা অন্যত্র বলা হয়েছে। বাংলার দিগ্বিদিকে উত্থিত বলিষ্ঠ প্রতিবাদ সত্ত্বেও ঐ বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাবে ভারতসচিব সম্মতি দেন ১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই। • • (• • এই সম্বন্ধে অধুনা প্রকাশিত 'The last Days of British India নামক পুস্তকে Michael Edwards এর উক্তি—"...in 1905 when, for sound administrative reasons the British decided to divide the vast province of Bengal" (p-27) ভারতবর্ষ কিছুতেই সমর্থন করতে পারে না। ঐ 'sound administrative, reasons'-এর অন্তরালে যে ছিল Karl Marx-এর ভাষায়—"The Roman divide et impera was the great rule by which Great Britain·· contrived to retain the tenure of her Indian Empire" (vide 'The First Indian war of Independence, 1857-1859', page 41) সে কথা আজ সংশয়াতীত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। ফলে রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। অন্যদিকে প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান বিভাগ এবং বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরকে নিয়ে নূতন বাংলাদেশ গঠনের পরিকল্পনা চলে। তা ছাড়া কার্জন সাহেব ১৯০৫ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে, চ্যান্সেলার হিসাবে ভাষণ প্রসঙ্গে সমস্ত এসিয়াবাসীকে কপট, অসত্য, মিথ্যাবাদী প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে গালি গালাজ করেন।—"অতঃপর ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে বরিশালের স্মরণীয় প্রাদেশিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে অগ্রগণ্য বাংলার বহু গণ্যমান্য নেতাকে পুলিশের লাঠির গুঁতা এবং অন্যান্য প্রকারের বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়।" • (• 'অগ্নি যুগের অগ্রগুরু হেমচন্দ্র'—শ্রীবিনয় জীবন ঘোষ, পৃঃ-১০০)। এই সময় দেশবাসীর উপর কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহার যে কতখানি চরমে উঠেছিল তা নিম্নোদ্ধৃত বিবরণী থেকে আরো কিছু বুঝা যেতে পারে। —"Hither to we have refrained from making any comments on the Barisal cases because they were pending trials at the District courts. But now that a finality has been reached with some of these remarkable trials, we must say that they have been marked by a deliberate disregard of the first principles of law and procedure by the executives and their plaint judicial officers. If this matter be not taken serious notice of by His Excellency the Viceroy, the life and liberty of the British subjects in India will be at mercy of the Magistrate; the Police and the untrained District Judges who are not far removed from them in their thoughs, ideas and antecedents."•

(• Calcutta Weekly Notes. 2nd July, 1906, vol Lxiii, No 21)—1.

এই সমস্ত ব্যাপারের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ একদিকে দেশে যেমন স্বদেশী প্রচার, বিদেশী বর্জন ইত্যাদির মাধ্যমে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল, অপর দিকে অনুরূপ ভাবেই কতকগুলি সংবাদপত্রের প্রকাশ দেশকে জাতীয়তার ভাবে এবং বিপ্লব মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করায় সচেষ্ট হয়ে ওঠে। তখনকার প্রত্যক্ষদর্শী এবং পরে একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের সেই সময়কার বর্ণনার সারমর্ম নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।—

"I came from the distant district town Second grade college of the Curzon-created and

Fuller-ruled new Province of Eastern Bengal & Assam. Politically our minds were already tinged with 'extremism'···The youths of those days were almost to a man drawn to 'extremism' and the cult of bomb···The philosophy of extremism preached by Tilak, Lajpat, Bipinchandra, Aurobinda, Shyam Sundar and the nationalist press represented by Krishna Kumar Mitra's Sanjibani, Monoranjan Guha Thakurtha's Nabasakti, Brahmabandhab Upadhay's Sandhya and the Jugantar the organ of the revolutionaries who favoured armed insurrection against the British···"•

• 'Glimpses through the City's speed-holes' vide the Calcutta Municipal Gazette—31st Aniversary Number, March 24, 1956).

'যুগান্তর' পত্রিকার আত্মপ্রকাশের কথা সকলেরই জানা আছে। তা' ছাড়া 'সন্ধ্যা', 'নবশক্তি' 'বন্দেমাতরম্' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে বিভিন্ন তেজোগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করে দেশকে সেদিন সহসা বিপ্লববাদে প্রাণবন্ত করে তুলতে সময় হয়েছিল। সেই কারণে ঐ সকল পত্রিকার বিরুদ্ধে অনেকটা সময়ে রাজদ্রোহের মোকদ্দমা চলতেই থাকত। ১৯০৭ সালের ১৭ই জুলাই (কোথাও লেখা হয়েছে ১৩শে জুলাই—স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম'—শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য, পৃঃ ১০) 'যুগান্তর' সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ইংরাজী দৈনিক 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার কর্ণধার ছিলেন অরবিন্দ। কিন্তু এই পত্রিকার সম্পাদনার কাজ চলত এক সম্পাদক সঙ্ঘের দ্বারা। অরবিন্দ প্রধান সম্পাদক আর বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দরচক্রবর্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বি, সি, চ্যাটার্জী) প্রভৃতি ছিলেন ঐ সম্পাদক সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত। 'বন্দেমাতরমে' আপত্তিকর রচনা প্রকাশের জন্য শীঘ্রই অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র ইত্যাদি রাজদ্বারে অভিযুক্ত হন। 'সন্ধ্যাও' ঐ রাজরোষ থেকে রেহাই পায় নি। ১৯০৭ সালের শেষভাগে "ঠেকে শেখা শেষের হাসি" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে 'সন্ধ্যা'র সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় অভিযুক্ত হন। কিন্তু বিচার প্রহসনের আগেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

কিংসফোর্ড সাহেবের এজলাসে তখন এই সমস্ত অভিযোগের শুনানী চলত। চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের ঐ সময় মামলার বিচার দেখার জন্য তাঁর আদালতে অত্যন্ত জনসমাগম হ'ত। এইরূপ জনসমাগমের মধ্যে একদিন সুশীল সেন নামে একটি ১৫।১৬ বছরের কিশোর এসে হাজির হন। সে দিন ছিল 'বন্দেমাতরমের' সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পালের উপর কারাদণ্ড আদেশের দিন। কোর্টের সেই বিপুল জনসমাগম নিয়ন্ত্রণের ভার ছিল, চিরন্তন সরকারী আমলাতান্ত্রিক নীতি হিসাবে, পুলিশের উপর। পুলিশও তাদের চিরাভ্যস্ত প্রথায় ঘুসি, লাঠি ইত্যাদির সাহায্যে ঐ জনতা নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত ছিল। এইরূপ অবস্থায় তারা সেই কিশোর সুশীলকেও একটি ঘুসি মারে। সুশীলও পাল্টা ঘুসির সাহায্যে সেই অপমানের প্রত্যুত্তর দেন 'মিঃ হিউ' নামে এক পেতাগ সার্জেন্টকে। ফলে পূর্বোল্লিখিত 'untrained District judge কিংসফোর্ড সাহেব সুশীলের ঐ অপরাধের জন্য পনর ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ দেন। এই সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত অংশ তখনকার দিনের কর্ণধার বিচার প্রহসনের উপর কিছুটা আলোকপাত করতে পারে।—

"···Sentences of whipping have come into vogue. At one time the rod was brought in to requisition in the Police Court as a disciplinary measure for juvenile offenders, but the time have evidently changed and the last appears to be cousidered necessary for the reclamation of mature criminals. The Chief Presidency Magistrate will do well to make himself familiar with the views of the majority of English Judges with regard to the lash and we would like to see him fall in with the ways of Mr. Justice Grantham in this respect."• (• Calcutta Weekly Notes, Nov. 6, 1903, comment portion.)

প্রবীন বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে কিংসফোর্ড সাহেব সেই সময়ে ঐরূপ নানা প্রকার কুৎসিত হুকুম জারিতে বেশ অভ্যস্ত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সন্ধ্যার মামলার শুনানী উপলক্ষ্যে ১৯০৭ সালের ৩রা অক্টোবর চিত্তরঞ্জন দাসের (পরে দেশবন্ধু) মত আইনজীবীর

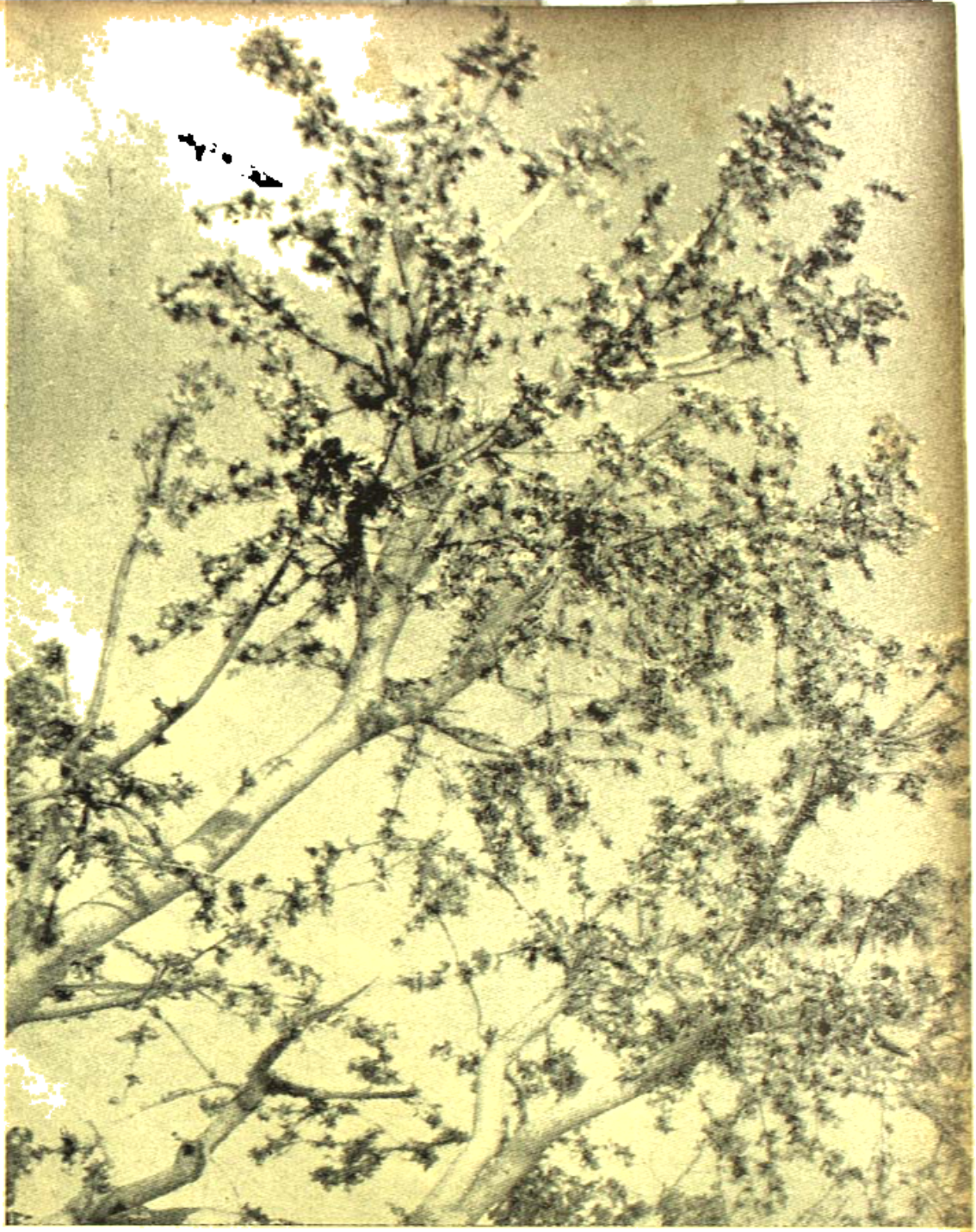

বসন্ত

ফটো : রামকিঙ্কর সিং

আমের পাউল

*

ছিতেন নাগ

সঙ্গেও তিনি অতি কদর্য ব্যবহার করেছিলেন। এই সম্বন্ধে শহীদ প্রফুল্ল চাকীর ভ্রাতুষ্পুত্র হেমন্ত চাকী লিখিত 'অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকী' নামক পুস্তকের ৭৩-৭৭ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায়। (প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে, স্বাধীনতা লাভের পরে সংঘাতীত অঘটনের কথা বাদ দিয়েও দুটি ঘটনার কথা। একটি, সংবাদ পত্রে বহু আলোচিত দীনবন্ধু সেণ্ট্ এণ্ড্রুজ কলেজের ছাত্র ভূদেব সেনের হত্যাকাহিনী, আর অপরটি হচ্ছে—"হরিপাল কৈলাসচন্দ্র পাঠাগারের ভূতপূর্ব গ্রন্থাগারিক বিশ্বনাথ পালের……২০শে জুন……তাঁর জীবনের অন্তিম দিন……।" এই হত্যাকাণ্ড দিনের আলোতে প্রকাশ্য রাস্তায় পুলিশের চোখের সামনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যার মর্মন্তুদ কাহিনী বর্ণিত হয় ২৯।৬।১৯৬৬ তারিখের 'বসুমতী' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে। এই ঘটনা সম্বন্ধে হুগলী জেলা থেকে প্রকাশিত ২৯শে জুন ৬৬ তারিখের 'পঞ্চায়েত' নামক পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—"বিকৃত-মস্তিষ্ক যুবক সন্তান শ্রীবিশ্বনাথ পালকে স্থানীয় (সহদেব) অকলপ্রধান কয়েকজন লাঙ্গোপাঙ্গ ও কয়েকজন পুলিশ কন্‌ষ্টেবল্‌সহ দলবদ্ধভাবে গত ৬ই ঘণ্টাধিক ধরে পিটিয়ে থুঁচিয়ে ইটমেরে পৈশাচিকভাবে হত্যা করেছেন বলে এক চাঞ্চল্যকর খবরে এতদঞ্চলে নিদারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হয় বলে এক লজ্জাকর অভিযোগ পাওয়া গেছে।…ভামিন যোগ্য নয় এমন হত্যাকারী অপরাধ করা সত্ত্বেও গূঢ় রহস্যময়ভাবে শ্রীরায় ও শ্রীমল্লিক ভামিনে মুক্ত হইয়াছেন। হরিপালের দৈ মিষ্টিতে সবাই বশ বলে নাকি প্রধান মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

* * *

শুনা যায় অশীতিপর বৃদ্ধ নেতা পণ্ডিত ধরানাথ ভট্টাচার্য্যের হস্তক্ষেপের পরে ব্যাপারটির যৎকিঞ্চিৎ সমাধান হয়তো হয়েছিল, কিন্তু আজও দেশে এই জাতীয় ঘটনার কথা ভাবতেও লজ্জা হয়।

এই সমস্ত কারণে কিংস্‌ফোর্ডের নাম তখন দেশের চতুর্দ্দিকের আবহাওয়াকে বিষিয়ে তুলেছিল। অপরদিকে সেই সময়ে দেশের দিগ্বিদিক বিপ্লব বহ্নিতে ধূমায়িত। ব্যাপার লক্ষ্য করে ইংরেজ সরকার কিংস্‌ফোর্ডকে মজঃফরপুরে সেসন্‌স্ জজের পদে বদলি করে দেন। বিপ্লবীদের গুপ্ত-চক্র তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। কিংস্‌ফোর্ডের বিচারের জন্য তিনটি পাকা আইনজ্ঞকে নিয়ে এক 'ফুল-বেঞ্চ' বসে বিপ্লবীদের গুপ্ত কোর্টে। অরবিন্দ-সুবোধ মল্লিক-চারু দত্ত। দু'জন পাকা আই-সি-এস—আর একজন বিচক্ষণ ব্যারিষ্টার। বিচারে সাব্যস্ত হয় কিংস্‌ফোর্ডের প্রাণদণ্ড আর তার আজ্ঞাবাহক নির্দ্ধারিত হন মৃত্যুঞ্জয় প্রফুল্ল চাকী, আর অমর ক্ষুদিরাম। বলাবাহুল্য শেষোক্ত দুটি বীর সন্তানই তখন 'আত্মোন্নতি সমিতিতে' ব্যায়াম চর্চ্চা করতেন। (১ 'দেশ হ'ল স্বাধীন'—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ২৬ এবং 'প্রফুল্ল চাকী' স্মরণে'—শ্রীকালীপদ বাগচী লিখিত পুস্তকের ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত মুখবন্ধ, পৃঃ ।৵০)—। অতঃপর প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম বোমা-পিস্তল সঙ্গে নিয়ে মজঃফরপুর রওনা হন এবং যথা সময়ে কিংস্‌ফোর্ডের গাড়িও আক্রমণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি তখন সেই গাড়িতে না থাকায় রক্ষা পেয়ে যান এবং অনতিবিলম্বে স্বদেশে ফিরে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। ক্ষুদিরাম তখনকার মত গা ঢাকা দিয়ে সরে গেলেও ১লা মে ১৯০৮ সালে 'ওয়েনী' নামক ষ্টেশনের কাছে ধরা পড়ে যান ও পরে হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে আত্মবলি দেন। অপরদিকে প্রফুল্ল চাকী ফেরার পরে ট্রেনের মধ্যে নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামে সিংভূমের এক পুলিশ-সাব-ইন্‌স্পেক্টরের কবলে পড়েন। এই ভাবে নন্দলাল যখন মোকামা ঘাট ষ্টেশনে নিজের স্বার্থান্ধ হীনমনোবৃত্তি ও কূটকৌশলের দ্বারা প্রফুল্লকে গ্রেপ্তারের জন্য সচেষ্ট হন, প্রফুল্ল তখন আত্মহত্যা করে সেই গ্রেপ্তার এড়িয়ে যান। নন্দলালকে না মেরে আত্মহত্যা করার আগে ব্যাথার স্বরে প্রফুল্ল কেবল বলেছিলেন একটা চিরন্তন সত্য—"আপনি বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীকে ধরাইয়া দিলেন?" (২ 'অগ্নি যুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকী'—হেমন্ত চাকী প্রণীত, পৃঃ ৬০)—

"…… বিদেশী সরকার দেশদ্রোহী নন্দলালকে পুরস্কৃত করে। নন্দলালের পদোন্নতি হয় এবং সরকার বাহাদুর তাহাকে ঘাটভাঙ্গা রেলায় ৫০ বিঘা নিষ্কর জমি দান করে।" (২ উপরোক্ত পুস্তক, পৃঃ ১৯১-১৯২)—অতঃপর বিংশশতকের প্রারম্ভে বাংলার এই বিশ্বাসঘাতকের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছিল 'আত্মোন্নতি সমিতির' সভ্য-

দের হাতে। উক্ত জঘন্যতম দেশ-দ্রোহিতার কিছু পরে নন্দলাল কলকাতায় আসেন বিবাহ করার উদ্দেশ্যে। বর্তমান ১০২ ও ১০২বি নং সারপেন্টাইন লেনে তাঁরই আর একজন আত্মীয় পুলিশ কর্মচারীর গৃহে তিনি তখন অবস্থান করছিলেন, আর দু'চার বাড়িতে মেয়ে দেখতে গিয়ে সুযোগ বিশেষে প্রাতঃস্মরণীয় প্রফুল্ল চাকীকে তাঁর গ্রেপ্তার করার প্রচেষ্টার গল্প শুনাচ্ছিলেন। উক্ত গৃহের বিপরীত দিকে, বর্তমান ২৯নং সারপেন্টাইন লেনে তখন আত্মোন্নতি সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য থাকতেন, নাম ডাক্তার জ্ঞান চট্টোপাধ্যায় ওরফে 'তোলাদা'। ডাক্তার হিসেবে 'তোলাদার' বহুগৃহে যাতায়াত ছিল। কাজেই নন্দলালের কলকাতায় আগমনের খবর শুনতে এবং যথা-সময়ে সেই খবর আত্মোন্নতি সমিতির বিশিষ্ট সভ্যদের কানে পৌঁছে দিতে তাঁর পক্ষে কোনই অসুবিধা হয় নি। প্রকাশ নন্দলাল মেয়ে দেখা ছাড়াও সেই সময় আত্মোন্নতির বিশিষ্ট সভ্যদের উপর গুপ্তচর বৃত্তিও চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বিপিনদার ভাষাতে "আমরা দেবতার সে কাজই অনুসরণ করতুম, হয় আমার, না হয় আমাদের কোন সহকর্মীর।" (৫ 'বিপিনদা স্মরণে—শ্রীবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়—যুগান্তর, ২৪।২।১৯৫৭।—। তাই আত্মোন্নতির গুপ্ত সভায় সিদ্ধান্ত হয়—নন্দের শেষ চাই। রণেন্দ্রনাথ বলেন যে তাঁর উপর নির্দেশ হয়েছিল—'রণেন! একটু নজর রেখ।'

আত্মোন্নতির প্রথম কালীন সভ্য তালিকায় রণেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম দেখা যায়। রণেন্দ্রনাথেরও জন্মভূমি ছিল হালিসহরে এবং তিনি ছিলেন বিপিনদার শৈশবের সঙ্গী। তাঁর বাসস্থান ৬৪নং বিশ্বেশ্বর ব্যানার্জী লেন, ব্যাটরা, হাওড়া, আর মাতুলালয় ছিল ৩০নং ট্যাঙ্ক লেন, বর্তমান চতুরীমল লেন, কলিকাতা। রণেন্দ্রনাথের জন্ম ও বাল্যজীবন তাঁর মাতুলালয়েই কেটেছিল। পরে ১৯১৭ বৎসর বয়সে তাঁর পিতা তাঁকে অ্যাডজিনিট্রেটর্ জেনারেল বেঙ্গলের অফিসে ঢুকিয়ে দেন। সমিতিতে যোগাযোগের সুবিধার জন্য রণেন্দ্রনাথ তাঁর মাতুলালয়েই থাকতেন। ভগবৎ কৃপায় আজও তিনি জীবিত আছেন, তবে তাঁর বর্তমান আর্থিক অবস্থা শোচনীয়।

১ই নভেম্বর, ১৯০৮ সাল। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁর অফিসের ছুটি ছিল। রণেন্দ্রনাথ বলেন—সেই সুযোগে তিনি সারাদিন নন্দলালের গতিবিধি অনুসরণ করেন। তারপর সন্ধ্যা ৫টা আন্দাজ ৩০নং ট্যাঙ্ক লেনে (তদা চতুরীমল লেনে) তাঁর মাতুলালয়ের বৈঠকখানায় আত্মোন্নতির হরিপদ (হরিশ্চন্দ্র শিকদার) এসে উপস্থিত হন—সঙ্গে ছিলেন আর একজন ভদ্রলোক, বেঁটে খাট মানুষটি, চোখ দুটি আগুনের মত উজ্জ্বল, অণু পরমাণু থেকে তাঁর বিপ্লব বহ্নির ঝলক দিচ্ছিল বলে মনে হয়েছিল। হরিশ্চন্দ্র দু'জনার মধ্যে পরিচয় করিয়ে দেন, সেই দিনকার পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞে রণেন্দ্রনাথের সাথী হিসাবে। পরক্ষণেই দুটি পিস্তল ও দুটি ছোরা তাঁদের সামনে রাখা হয়। শুনাযায় তারপর এসে হাজির হন ডি এন্ চক্রবর্তী পরে ডক্টরেট লাভ করে যিনি রিপন কলেজের প্রিন্সিপালের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। চক্রবর্তী এনে-ছিলেন কিছু পোটাসিয়াম্ সায়নাইড্, ছোরা দুটিতে মাখিয়ে নেওয়ার জন্য। যথাযোগ্য আয়োজন এইভাবে নিমেষে সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

সন্ধ্যা ৭ টা হবে। সারপেন্টাইন্ লেনের আশে পাশে দেবমন্দিরগুলিতে শঙ্খ ঘণ্টা বেজে উঠেছে। রণেন্দ্রনাথ ও তাঁর নবপরিচিত বিপ্লবী তখন নন্দলালের বাসস্থানের নিকটে পশ্চিমদিকে অবস্থিত একটি শিবমন্দিরের সামনে অপেক্ষারত, আরতি দেখার ছলে। গায়ে তাঁদের চাদর জড়ান ছিল। ১০২নং সারপেন্টাইন্ লেন থেকে নন্দলাল বার হয়ে সেই মন্দিরের সামনে দিয়ে সারপেন্টাইন্ লেনের উত্তর দিকে এগিয়ে চললেন। রণেন্দ্রনাথ ও তাঁর বিপ্লবী সঙ্গী অমনি তাঁকে অনুসরণ আরম্ভ করেন। সারপেন্টাইন্ লেন ও কেরাণীবাগানের (বর্তমান সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার) সংযোগের উত্তর-পশ্চিম কোণে নন্দলাল পৌঁছেছেন, এমন সময় দু'টি গুলির আওয়াজ। পরক্ষণেই সেই বিশ্বাস-ঘাতকের দেহ রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। বিপিনদার ভাষায়—"অব্যর্থ লক্ষ্য, ব্যানার্জী এই খানেই শুয়ে পড়ল।" বিপিনদা আরো বলেছিলেন—"ব্যানার্জী যদি পালাবার চেষ্টা করত কিংবা ওরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো—তা' হ'লেও তার কোন ক্রমেই নিস্তার ছিল না। দেশদ্রোহিতার মূল্য তাকে দিতেই হতো এইখানেই—হয় তার হাতে—না হয় আমার।" (৫ যুগান্তর—২৪।২।১৯৫৭)—। এই সময় বিপিনদার সঙ্গে ছিলেন কোন্নগরের নিবারণচন্দ্র মিত্র, আর রণেন্দ্র-

নামের সহচরের নাম—ঢাকার বিপ্লবী বীর শ্রীশচন্দ্র পাল। এটি ছিল বাংলার দ্বিতীয় বিশ্বাসঘাতক হত্যা। প্রথম বিশ্বাসঘাতক হত্যা হয়েছিল মুরারিপুকুরের সত্য ও চন্দননগরের অধিবাসী সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও কানাইলাল দত্তের হাতে, পিস্তলের সাহায্যে, জেল প্রাঙ্গণেই—নরেন গোঁসাই এর জীবনাবসান, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯০৮ সাল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে নন্দলালের হত্যাকারীদের সরকার পক্ষ কোন দিনই সন্ধান করতে পারেন নি, সেটি হচ্ছে তখনকার সুশৃঙ্খল সংগঠনের পরিচয়। বড়লাট সাহেব তাই লিখেছিলেন—

"...The murder of Mrs. and Miss Kenedy in April 1908, which was the first great outrage...was followed by the raids on Manicktolla Garden and other revolutionary premises ...But...the conspiracy soon revived...An unscrupulous press combined with Samity organisation had done their work well."*

* Sedition Committee, 1918, Report—para 173, page 189.

কিন্তু সেদিনকার বাংলার বিপ্লব আন্দোলন সম্বন্ধে জজ্ সাহেবের উক্ত আন্দাজ সত্য হলেও যে সম্পূর্ণ হয় নি, তার সাক্ষ্য পাওয়া যায় নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি থেকে—

"Ranen was a clerk in the Administrator General's Office and though not a science student he had great regard for Acharya (meaning Acharya P. C. Roy) and loved his association. Acharya was then inflaming educated youngmen to take to business...Though he was on the surface a mere science teacher stimulating spirit of research in his pupil...he inwardly admired the spirit of sacrifice shown by youngmen working for country's freedom even though that might be done through terrorism...I latterly came to know from Ranen that he felt he saw Acharya happy when he disclosed to the latter how he had shot dead the spy Nandalal Banerjee as an obstacle to the advent of freedom."*

* Calcutta Municipal Gazette, 31st Aniversary Number, March 24, 1956—'Glimpses through the City's speed holes' by Shri R. C. Roy.

এখন এটা আন্দাজ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রেরও উপরোক্ত বৈপ্লবিক কাজ কর্ম্মে সহানুভূতি ও অনুমোদন ছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত 'Last years of British India" নামক পুস্তকে Michael Edwards লিখেছেন—"The terrorists who threw bombs and fired revolvers at British officers did not seriously think they could bring down the British Raj." (p-11.)

উত্তরে আমরা বলব যে বাংলার বিপ্লবীদের কাছে নিশ্চয়ই সে কথা অজ্ঞাত ছিল না। তবে উপরোক্ত ঘটনাগুলি ছিল অসহ্য অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ মাত্র।

স্মৃতির ভিড়ে

রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাজের ভিড়ের মাঝে তব মুখ ক্লান্ত ও পাণ্ডুর,
অবসর ক্ষণে তাই সবুজ শাখায় স্মৃতি ভাসে ;
অবসন্ন দেহ-মনে বিতৃষ্ণায় যবে ভরপুর
তোমার ইলোরামুখ ধীর স্থির শান্তি লয়ে আসে।
তখন তাতেই শুধু সযতনে করি রোমন্থন,
কখন তোমার চোখ ভীরুপায়ে মুক্তিকারে খোঁজে ;
গোপনতা রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা করে অগণন,
হঠাৎ সে ধরা পড়ে আবেশেতে তাই চোখ বোজে।

ও চোখের ইসারাতে বুকে আসে দামামার ঝড়,
মুখের ওপরে মুখ নেমে এসে স্নান করে লয়।
হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ বুক শুধু কাঁপে থর থর
আলিঙ্গনে দুটি দেহ পরস্পর এক সত্তা হয়।
তাই ও কুমারী মনে বাসনারা খাসা বাসা বোনে,
সলজ্জ আবেশে দেখি ভাবাদের শান্ত করে গতি।
আমার আবেগী মনে তারে চাই একান্ত গোপনে
সুখ-স্বপ্ন সমাধিতে লীন হ'তে কপোত-কপোতী।

দক্ষিণ ভ্যাং

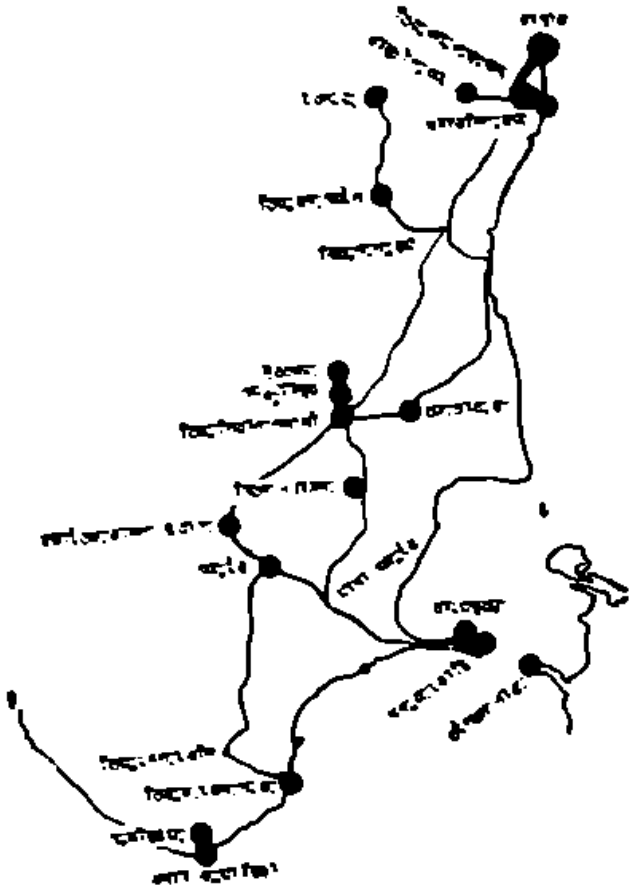

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৬

মাদুরা—ত্রিচিনোপলি প্যাসেঞ্জার-এর দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা কামরায় আমি ও মণিদাচন্দ্রির শ্রীরামলিঙ্গম্ যাচ্ছিলাম।

আমরা দুজন ছাড়া কামরায় ছিলেন বিদেশী এক ভদ্রলোক। গৌরাঙ্গী মহিলাটি সত্যই আনিন্দ্যসুন্দরী। বিশেষতঃ, তিনি কৃষ্ণ-কেশিনী। ভারতীয় শাড়ীতে সুসজ্জিতা।

মাদুরার তিনটি ষ্টেশনের পর তিরুমঙ্গলম্ থেকে উঠলেন তিনজন দেশীয় মহিলা। সকলেই যুবতী ও কৃষ্ণ-বর্ণা। ভূরি ভূরি অলঙ্কারভারে গরবিনী। প্রত্যেকেই যেন এক একটি চলন্ত গহনার দোকান।

সকলেরই একাধিক নাকছাবি।

একজনের কর্ণাভরণ দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। অলঙ্কারটির ভারে মহিলার কান দুটি ঝুলে পড়েছে ও বিরাট দুটি গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে।

এই ধরণের কর্ণাভরণ তিরুনেলভেলি জেলার প্রবীণাদের অতি প্রিয়।

ওঁদের সঙ্গে বছর দশেকের একটি ছেলে এবং এক বৃদ্ধা পরিচারিকা। গাড়ীতে উঠে প্রথমে ভাল জায়গা নিয়ে বসবার চেষ্টায় সবাই কিছুক্ষণ খুব ব্যস্ত রইলেন। মনোমত উপবেশন হলে আরম্ভ হলো পান সাজা। অতঃপর চর্বণ ও রসাস্বাদন করতে করতে তাঁরা বিদেশিনী মেয়েটির দিকে চেয়ে নিজেদের মধ্যে কি এক আলোচনা শুরু করলেন।

হঠাৎ একসময়ে তাঁদের আলোচনা থেমে গেলো, আর রামলিঙ্গম্ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে অতি কষ্টে হাসি চাপতে লাগলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম: কি ব্যাপার?

তিরুনেলভেলির কর্ণাভরণ—তিরুচেন্দুর্

রামলিঙ্গম্ বললেন : প্রথমে ওই মহিলারা বিদেশনীর রূপের খুব প্রশংসা করছিলেন। কিন্তু পরে সে সব প্রশংসা বাতিল করে দিলেন। কারণ, মেয়েটির নাক-ছাবি আর কানে গহনা না থাকায় ওঁকে ঠিক সুন্দরী বলা চলেনা।

মনে পড়ে গেলো একটি শ্লোক,—

যা এব সীতাং দদৃশুস্তদানীং রূপং মনোজ্ঞং

প্রশশংসুরস্যাঃ।

পশ্চাৎ সুপুচ্ছং বয়বেক্ষ্য সর্বং: পরং বিষাদং

কপিযোষিতস্তাঃ॥

রামচন্দ্র সীতাকে লঙ্কা হতে উদ্ধার করে আনলে বানরীরা সীতাকে দেখতে এলো। সীতার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তারা তাঁর রূপের অজস্র প্রশংসা করতে লাগলো। কিন্তু হঠাৎ প্রশস্তি থামিয়ে হায় হায় করে উঠলো। কারণ, লেজ অভাবে সীতার সব সৌন্দর্যই ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাঁকে সুন্দরী বলা যায় না।

মহিলাগুলি বিরুধ নগরে নেমে গেলেন।

এখানে রেলপথ দ্বিধা হয়ে একটি চলে গেছে তিরুবরনম্ পুরম্-এর দিকে এবং অপরটি তিরুনেলবেলিতে। আমরা এগিয়ে চললাম দক্ষিণে,—দ্বিতীয়টির দিকে।

ঘণ্টা খানেক পরে স্পর্শ পওয়া গেলো দক্ষিণ সমুদ্রের বাতাসের।

রেলপথের দুপাশে কোথাও বাঙলা দেশের মত গাছ-পালা নেই। নেই বট, অশ্বত্থ, আম-কাঁঠালের চিহ্ন। শুধু আছে বাবলা, ফণি-মনসা, আর কোঙ্গা বা সিশল-এর ছড়াছড়ি। ফুল ফুটেছে ফণি-মনসার। আর ফুটেছে ভারে ভারে দুধ-কলমি।

সবুজের অভাব থাকা সত্ত্বেও পড়ন্ত সোনালী রোদে মাঠ ঘাট ক্ষেত-খামার কেমন যেন মায়াময় হয়ে উঠেছিল।

সন্ধ্যা সওয়া সাতটায় পৌঁছলাম মণিয়াচ্চি।

রামলিঙ্গম্ বিদায় নিলেন।

বিদেশী দম্পতিটিকে নিয়ে গাড়ী চলে গেলো তুতুকুড়ি পথে।

আমি গাড়ী বদল করে উঠলাম তিরুনেলবেলির গাড়ীতে।

রাত আটটায় এলো তিরুনেলবেলি।

স্টেশনের কাছেই নেলয়াপ্পার মন্দির। একটু বরণডালা ছাড়া আর কোনও যান ছিল না। (একটু বরণডালার অর্থ বগলে টানা গাড়ী।) ঐ রথেরই সাহায্যে গিয়ে উঠলাম নেলয়াপ্পার মন্দিরে।

স্নান ও নৈশভোজনের পর বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে রেলওয়ে টাইম্ টেব্‌লটার পাতা ওলটাচ্ছিলাম। আমার পাশের ঘরের শ্রীযুক্ত চেল্‌লৈয়া এসে আলাপ শুরু করলেন। কথায় কথায় বললেন : কেপ্ কমোরিন্ তো যাবেনই, কিন্তু কাছের একটা বিখ্যাত জায়গা ছেড়ে যাচ্ছেন যে।—তিরুচ্চেন্দুর্-এর বাল সুব্‌রিয়মণিয়ম্ মন্দির দেখে যান। এখান থেকে রেলপথে মাত্র আটত্রিশ মাইল। বাস্-এ আরও কম। ভোরে চলে যান। ফিরে এসে দুপুরের বাস্-এ কেপ্-এ যাবেন।

ভদ্রলোকের নির্দেশ গ্রহণ করলাম।

সকালের প্রথম ট্রেনটায় তিন ঘণ্টার মত সময় লাগলো তিরুচ্চেন্দুর পৌঁছতে।

মনলার্ উপসাগরের গা ঘেঁসে গড়ে ওঠা এই ছোট জনপদটির প্রাচীন নাম—তিরুচেন্দিল্, তিরুচীর্ অলৈবার এবং তিরুচেন্দিলুর্। পাণ্ডির রাজগণের শিলালেখে স্থানটি তিরি ভুবন মাধেবির ও চতুর্বেদী মঙ্গলম নামে বর্ণিত এবং সংস্কৃত সাহিত্যে দিন্ধুপুরম্ নামে অভিহিত। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হতে স্থানটি তিরুচ্চেন্দুর্ নামে পরিচিত।

তিরুচ্চেন্দুর্ শব্দের অর্থ—পবিত্র বিজয় ক্ষেত্র (গ্রাম)। সুব্‌রিয়মণিয়ম্ এখানে অসুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়লাভ করেছিলেন তাই স্থানটির এরূপ নামকরণ।

সুব্‌রিয়মণিয়ম্ সংস্কৃত সুব্রহ্মণ্য নামটির তমিল্ সংস্করণ।

রেল্ স্টেশন থেকে এক মাইল দূরে মনলার উপসাগরের তীরে, সুব্রহ্মণ্যম্ দেবের বিশাল মন্দির। মন্দিরের পূর্বে ও দক্ষিণে সমুদ্র।

দেবস্থানটির বয়স আনুমানিক দু'হাজার বছর। সুপ্রাচীন তমিল গ্রন্থ শিলপ্পতিকারম্, অপ্পর-তিরু

মইয়ৈক্কাট্টু-তিরুত্তাণ্টকম্ ইত্যাদি গ্রন্থে এই দেবস্থানের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ আছে শুনেছি।

তমিল্ ভূমির রীতি অনুযায়ী সুব্রহ্মণ্যম্-এর অধিষ্ঠান পর্বতশীর্ষে হওয়া বিধেয়। তাই তমিল্ নাড়ুর সর্বত্রই কার্তিকেয়র মন্দির দেখা যায় পাহাড়ের উপর। তিরুচ্চেন্দুর্-এর বালসুব্রহ্মণ্যম্ মন্দিরই উক্ত রীতির একমাত্র ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রমের কারণ এই যে, তিরুচ্চেন্দুর্-এর সাগর তট হতে অল্পে, সমুদ্র গর্ভে, বীর-মহেন্দ্র দ্বীপে আত্মগোপনকারী অসুর সুরপদ্মের বিনাশের জন্য সুব্রহ্মণ্যম্কে তিরুচ্চেন্দুর্-এর নৈকতে অবস্থান করতে হয়েছিল।

এ বিষয়ে তমিল্ * কন্দ পুরাণে আছে একটি চমৎকার কাহিনী :

কোনও এক সময়ে অসুর সুরপদ্মের অত্যাচারে অতিষ্ঠ দেবগণ শিবের শরণাপন্ন হলেন। তাঁদের প্রার্থনায় শিবের তৃতীয় নয়ন হতে ছ'টি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হলো। স্ফুলিঙ্গগুলি গ্রহণ করলেন অগ্নি। পরে তিনি ওগুলি গঙ্গায় নিক্ষেপ করলেন। গঙ্গার ধারাপথে, হিমালয়ের শ্রবণা-হ্রদে উপনীত হতেই, স্ফুলিঙ্গগুলি ছ'টি শিশুর আকার ধারণ করলো। কৃত্তিকা ও তাঁর সখীরা ঐ শিশু গুলিকে পালন করতে লাগলেন।

দেবী দুর্গা একদিন শিশু ছ'টিকে দেখতে পেয়ে তাদের রূপান্তরিত করলেন একটিতে। একটি দেহধারী হলেও কিন্তু ঐ শিশুর ছ'টি মাথা ও ছ'টি মুখ রইলো। তাই তাঁর নাম হলো ষড়ানন। ষড়ানন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে কৈলাস ছেড়ে চললেন দক্ষিণাপথে,—অসুর দলনে। তিরুচ্চেন্দুর-এর সমুদ্রতীরে এসে তিনি ও তাঁর অনুগামীরা অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এই সময়ে ষড়াননের ইচ্ছা হলো শিব আরাধনার। সে তখনি সমুদ্রতটে শিবের এক রমণীয় মন্দির নির্মাণ করে ফেললো। ঐ দেবালয়ে কয়েকদিন শিবের অর্চনা করবার পর ষড়ানন সুরপদ্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।

পাঁচদিন ধরে জল, স্থল ও আকাশযুদ্ধের পর সুরপদ্মের বিশাল বাহিনী ও তার ভাইরা সকলেই নিশ্চিহ্ন হলো। সুরপদ্ম কিন্তু নিহত হলো না। মায়াবী অসুর একাই সাগর জলে আত্মগোপন করে তুমুল যুদ্ধ করতে লাগলো। তখন দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্য নিলেন ষড়ানন। ইন্দ্র ধারণ করলেন ময়ূরের রূপ। ষড়ানন তাঁর পৃষ্ঠারূঢ় হয়ে অস্ত্রক্ষেপ করতে লাগলেন। সাগর জলে নিক্ষিপ্ত তাঁর অস্ত্রের তেজ সহ্য না করতে পেরে অসুর তার বীর-মহেন্দ্র দ্বীপের একস্থানে আমগাছের রূপে আত্মপ্রকাশ করলো। তৎক্ষণাৎ তাঁর দ্বারা গাছটিকে দ্বিখণ্ডিত করলেন ষড়ানন। নিমেষের মধ্যে খণ্ড দুটি একটি ময়ূর ও একটি মোরগের রূপ ধারণ করে ষড়াননকে আক্রমণ করলো। দেবতা ধর্মাপরবশ হয়ে ময়ূরটিকে বধ না করে তাঁর শাশ্বত বাহনরূপে গ্রহণ করলেন এবং মোরগটিকে করলেন স্বীয় পতাকায় সংযোজিত। (দক্ষিণাপথে ষড়াননের কোনও কোনও ছবিতে সেই জন্য মোরগের উপস্থিতি দেখা যায়। হিন্দু দেবদেবীর প্রতিকৃতিতে মোরগের অবস্থিতি উত্তরভারতে বিরল।)

সুরপদ্ম অসুরের বিনাশ অর্থাৎ পাপ ও অত্যাচারের উচ্ছেদের স্মারক হিসাবে সারা তমিল্ প্রদেশে ঐপ্পশি (কার্তিক) মাসে শুক্ল প্রতিপদ হতে ছ'দিনব্যাপী এক অনুষ্ঠান পালিত হয়। শেষ দিনটি স্কন্দষষ্ঠী হিসাবে পরিগণিত।

ষড়াননের অপর নাম স্কন্দ। তমিল্ ভাষায় স্কন্দ—কন্দন্। দেবতার কার্তিক নামটি দক্ষিণভারতে অতি অল্পই ব্যবহৃত হয়। কার্তিক নামটি বাঙ্গলাতেই সুপ্রচলিত। কৃত্তিকা মাতৃসমা তাই কৃত্তিকার অপত্যার্থে কার্তিক। ষড়ানন নামটিও উত্তরাপথেই চলিত। দক্ষিণাপথে কার্তিকের সুপ্রচলিত নাম—শণমুখম্, আরুমুখম্ (অর্থাৎ ছয় মুখ), কন্দন্, মুরুগন্, সুব্রহ্মণিয়ম্, কুমরন্ ও কুমারস্বামী। তিরুচ্চেন্দুর-এর বিগ্রহ সুব্রহ্মণিয়ম্ নামেই পরিচিত।

সুব্রহ্মণ্যম্-এর মন্দিরটি উত্তর-দক্ষিণে ৩০০ ফিট ও পূর্ব-পশ্চিমে ২১৪ ফিট্ বিস্তৃত। মূল প্রবেশপথ দক্ষিণমুখী। গর্ভগৃহে দেবতার শালঙ্কার মূর্তি। দেবতা পূর্বমুখে দণ্ডায়মান। সুব্রহ্মণ্যম্-এর বামে একটি শিবলিঙ্গ। লিঙ্গ মূর্তিটির নাম জগন্নাথ।

* স্কন্দ পুরাণ

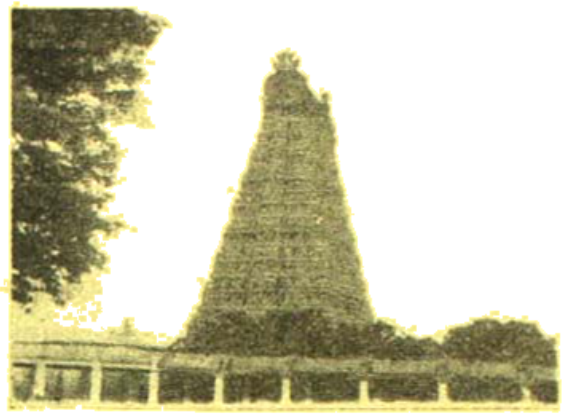

সুব্বিরম্ মন্দিরের গোপুরম্—তিরুচ্চেন্দুর্

শিবলিঙ্গের জগন্নাথ নাম আর কোথাও শুনিনি। কথিত আছে যে, সুরপদ্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে সুব্রহ্মণ্যম্ এই লিঙ্গ মূর্তিটিরই পূজা করেছিলেন।

মন্দিরে প্রতিদিনই উৎসবের পরিবেশ। সারা বছর ধরে প্রত্যহ বহিরাগতদের ভিড়। বিশেষতঃ সন্তান ও সন্তানের মঙ্গলকামী মহিলাদের সমাগম খুব বেশী।

মন্দিরের উত্তরে, সমুদ্রের ধারে, একটি ছোট পাহাড় আছে। পাহাড়টিতে একটি গুহা মন্দির। নাম

বল্লি গুহা—তিরুচ্চেন্দুর্

বল্লিগুহা। গুহায় বল্লিদেবী ও দত্তাত্রেয়ের মূর্তি অধিষ্ঠিত।

দত্তাত্রেয় বিষ্ণু। বল্লিদেবী তমিল্ মতে সুব্রহ্মণ্যম্ বা কার্তিকের স্ত্রী।

উত্তর ভারতে প্রচলিত মতে, ব্রহ্মা-দুহিতা দেবসেনা কার্তিকের স্ত্রী। সচরাচর দেবসেনাকে ষষ্ঠী বলা হয়। ষষ্ঠীরূপ নামেই কার্তিক-মাতা পূজিতা হন।

দেবালয়ের পূর্বপ্রান্তে আছড়ে পড়ছে দুরন্ত সমুদ্রের অবিরাম তরঙ্গমালা। কিন্তু কখনও জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির দ্বারা সমুদ্র মন্দিরটির কোনও ক্ষতি করেনি।

মন্দিরের অদূরে, জলের ধারে ধারে দেখা যায় ইতস্ততঃ স্থাপিত চব্বিশটি শিলাস্তম্ভ। প্রতিটি শিলাস্তম্ভ সংশ্লিষ্ট স্নানের জায়গাটি এক একটি তীর্থবিশেষ।

চব্বিশটি তীর্থের মধ্যে সর্ব প্রসিদ্ধটির নাম বদনারম্ভ বা মুখারম্ভ তীর্থ।

শিব একবার কুপিত হয়ে চতুর্মুখ ব্রহ্মার একটি মুণ্ড ছেদন করেছিলেন। বদনারম্ভ তীর্থে স্নানের ফলে ব্রহ্মা তাঁর সেই মুণ্ডটি ফিরে পেয়েছিলেন। এ ছাড়া একটি কিংবদন্তীতে প্রকাশ যে, অপসুন্দরী নামে জনৈকা পাণ্ড্যের রাজকন্যার জন্ম হয়েছিল বোড়ার মত মুখ নিয়ে, কিন্তু তিরুচ্চেন্দুর-এর বদনারম্ভ তীর্থে স্নানের ফলে তিনি অপূর্ব-সুন্দর মুখমণ্ডলের অধিকারিণী হয়েছিলেন।

তিরুচ্চেন্দুর্-এর কাছেই পুনৈ-কায়ল্ গ্রামে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে মহাকাব্যের নদী—তাম্রপর্ণি। স্থানীয় জনসাধারণ নদীটিকে তমরপরণি বলেন। শুদ্ধ তমিল -এ নদীটির নাম—তপ্রবোরুণৈ।

কয়েকজন তীর্থযাত্রী ঐ নদীর সঙ্গম দেখতে গেলেন। সময় সংক্ষেপের জন্য আমার যাওয়া হলো না। একখানা গরুর গাড়ী ঠিক করে ওনা হলাম বাস্ স্ট্যাণ্ড্ অভিমুখে। তিরুনেল্বেলিতে ফিরেই যেতে হবে কন্যাকুমারিকা।

রাত্রির অস্তিম যাম।

দিগন্তে আলোর ক্ষীণতম আভাসও দেখা দেয়নি। জীবলোক তখনও সুপ্তিমগ্ন,—ধরিত্রী তমসাচ্ছন্ন।

শতেক প্রদীপ প্রজ্জ্বালিত হলো। গৃহগৃহের তমসা হলো অপসারিত। শুভ্রকেশ গৌরাঙ্গ ব্রাহ্মণের কণ্ঠধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো ব্রাহ্মমুহূর্ত। ধ্বনিত হতে লাগলো শিবানীর স্তব মন্ত্র।

শিহরণ কম্পিত করে কুমারীর গাত্র মার্জনা করলেন ব্রাহ্মণ। মূল্যবান কলস হতে ত্রি-অর্ণবের মিশ্রিত বারিধারায় সিক্তিত করলেন কন্যাকে। অনুলেপ দিলেন অগুরু চন্দন, হরিদ্রা,কুমকুমের। ভূষিতা করলেন নানা আভরণে।

স্বপনের পর আরেক।

বাদ্যভাণ্ড ও মন্ত্রোচ্চারণের রবে নৈঃশব্দ বিলীন হলো,—মুক পরিবেশ হয়ে উঠলো মুখরিত। কন্যার বাম কক্ষের পাষাণ প্রাচীর ভেদ করে বাইরের সমুদ্র গর্জনের সঙ্গে মিলিত হতে লাগলো সে ধ্বনি, শূন্যে তরঙ্গে প্রকম্পিত হতে লাগলো প্রদীপ শিখাগুলি।

শেষ হলো আরতি।

বেরিয়ে পড়লেন মন্দির থেকে। বেরিয়ে পড়লেন ব্রাহ্মণ,—বেরিয়ে এলেন সেবক ও অনুচরের দল। একাকিনী রইলেন কুমারী কন্যা। রইলেন তাঁর শিব-সুন্দরের অপেক্ষায়।...

যুগ যুগান্ত ধ'রে, স্মরণাতীত কাল হ'তে, ওই কুমারী অপেক্ষা করছেন তাঁর প্রেমাস্পদের জন্য,—অর্ধেন্দুসুন্দরের জন্য। তিনি কন্যাকে বলেছিলেন, এইখানে, মহেন্দ্র-পরতের পরপারে অপেক্ষা করতে।

মহাপ্রলয়ের পর কুমারীর দেখা হবে তাঁর প্রিয়তমের সঙ্গে,—মিলিত হবেন তাঁরা আবার সৃষ্টির প্রয়োজনে।

সেই প্রলয়োত্তর মিলনের আশ্বাস দিয়ে পরমেশ্বর কৈলাস হতে সরিয়ে রেখেছেন নিজের অর্ধস্বরূপিনীকে,—তাঁরই সজনী শক্তিকে,—জগৎ মাতাকে,—এত দূরে, এই নির্জন সমুদ্রতটে, একাকিনী!

পূর্বকালে এখানে ছিল জনারণ্য।

তারই উপবনে সখীদের মাঝে প্রেমাস্পদের তপস্যায় বসেছিলেন কুমারী।

সেই সময়ে বাণাসুরের আধিপত্য ত্রি-জগৎ ব্যাপী।

চন্দ্রমুখে জনারণ্যে উপবিষ্টা অনন্তসুন্দরী নারীর সংবাদ পেয়ে বাণাসুর ছুটলো নারী-রত্নটিকে আহরণ করবার জন্য। কুমারীর সন্নিহিত হয়ে অসুর নানা ভাবে প্রেম নিবেদন করেও যখন তাঁর মনে রেখাপাত করতে পারল না তখন, সে তার পৌরুষের উল্লেখ করলো,—সে ইন্দ্রকে পরাভূত করেছে, বিষ্ণু তার ভয়ে সাগরজলে আত্ম-গুপ্ত, শিব পলায়িত পর্বতে। দেবকুল তার দাসত্ব করছেন।

কুমারীর তাতেও মনোভাবের পরিবর্তন হলো না।

বাণাসুর তখন তরবারি কোষোন্মুক্ত করে ত্রাসের সঞ্চার করতে চেষ্টা করলো।

তপস্যায় সামান্যিক ছেদ পড়লো কন্যার। হস্তধৃত পুষ্পমালা হলো বিচ্যুত। নয়নে অগ্নি। চূর্ণ করলেন বাণাসুরের রথ ও সকল অস্ত্র। তাঁর চক্রাঘাতে নিহত হলো বাণাসুর।

কুমারীর ব্রহ্মচর্য ব্রত হলো নিরুপদ্রব। আবার তিনি নিমগ্না হলেন তপশ্চর্যায়।

তারপর,—

আর একবার ওই ভবিষ্যৎ-জগৎ প্রসবিনী কন্যার তপস্যা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা ঘটেছিল।

আত্মবিস্মৃত ত্রিলোচন কুমারীর পাণিগ্রহণের জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠলেন।

শিহরিত হলেন দেবর্ষি নারদ। তবে কি ভুলে গেছেন ভোলানাথ তাঁর স্বকৃত ব্যবস্থাপনার কথা! প্রলয়ের পর যে তাঁদের মিলন নির্দিষ্ট হয়েছিল। তবে কি মহাপ্রলয় আসন্ন?—না, না, ভূলোককে রক্ষা করতেই হবে,—রোধ করতে হবে আশুতোষের এই উদগ্র মিলন-বাসনা।

ধাবা ছিলেন নারদ।

ভোরগের রূপ ধরে ত্রিলোচনের যাত্রাপথে কুকুটরবে রাত্রিপ্রভাত ঘোষণা করলেন।

দিবা সমাগত জেনে বিভ্রান্ত, আশাহত ভোলানাথ ফিরে গেলেন। কুমারী রইলেন লগ্নক্ষণের প্রতীক্ষায়।...

আগের দিন যখন তিরুনেলভেলি থেকে নাগরকোয়িল হয়ে কন্যা-কুমারিকায় এসে নেমেছিলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। দেবস্থানম্ ট্রাস্ট্-এর যাত্রী-নিবাসে আশ্রয় নির্দিষ্ট করেই বেরিয়ে পড়েছিলাম সমুদ্র সৈকতের উদ্দেশে। একাধিক বারিধির সম্মিলনে এখানে মহাসাগরের কেমন রূপ তাই দেখার আকুলতা ওই রাতেই টেনে নিয়ে গিয়েছিল আমাদের তিন জনকে,—আমাকে ও আমার সঙ্গী দুই বাঙ্গালী ভদ্রলোককে। তাঁরাও এসেছেন একক। মোট আমরা তিনজন, কিন্তু সবাই একা।

রাত্রের অন্ধকারে সাগরের কিছুই দেখা গেলো না।

শুধু শোনা গেলো জলকল্লোল। আর সাগর জলের স্পর্শ-বহা দামাল হাওয়ার ছোটাছুটি।

সূর্যোদয়ের পূর্বে—কন্যাকুমারিকা

সৈকত হতে ফিরে দেখি আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে এক বৃদ্ধা।

বৃদ্ধা—পাল্ অম্ম অর্থাৎ দুধাউলী মা। আমাদের দেশের গোয়ালিনী মাসী।

পাল্ অম্ম বিনা আহ্বানেই আমাদের জন্য ঘটি ভর্তি গরম দুধ এনেছিলো। তাই উদরস্থ করে পথশ্রান্ত তিন জন তখনি মগ্ন হয়েছিলাম গভীর ঘুমে। কিন্তু ঠিক ব্রাহ্ম মুহূর্ত সমাগমে কে যেন জাগিয়ে দিয়েছিল ঐ স্নান ও আরতি দর্শনের জন্য।

বেলা হতেই কুমারিকা ক্ষেত্রের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

সূর্যোদয়—কন্যাকুমারিকা

উপভোগ করতে বেরিয়ে পড়া গেলো। কন্যা কুমারিকা তমিল্ ভাষার কন্‌নিয়া কুমরি। ত্রি-অর্ণবের সঙ্গম ঘটেছে এখানে। বিশিষ্ট হয়েছে গুপ্ত-স্রোতা পৌরাণিক নদী কন্‌নি ও কুমরি।

সমুদ্র সঙ্গমের উর্ধ্বে, ভারতবর্ষের অন্তিম স্থল খণ্ডে দেবী-কুমারীর মন্দির। মন্দিরের পূর্ব ভিত্তির গায়ে শত তরঙ্গ-ভঙ্গে আছড়ে পড়ছে বঙ্গোপসাগর। তারই বুকে, তীর

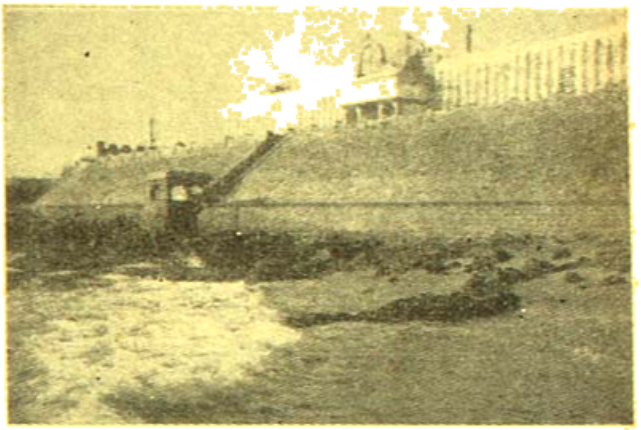

কুমারীর মন্দির—কন্যাকুমারিকা

হতে আনুমানিক পঞ্চাশ গজ দূরে, জলের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে—বিবেকানন্দ রক্! যে উপলখণ্ডে ধ্যানস্থ হয়েছিলেন স্বামীজি, পেয়েছিলেন শিকাগো ধর্ম মহাসভায় যাওয়ার প্রেরণা ও নির্দেশ। পেয়েছিলেন মুলধর্মের সন্ধান, সেবা-ব্রতের আহ্বান। কণ্ঠে তাঁর ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল—'জীবে দয়া করে' যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। জীবই শিব। জীবের সেবা শিবেরই সেবা।

স্থানীয় অনেকে বলেন, ঐ শিলার উপরেই পূর্বে দেবীর স্থান ছিল। পরবর্তীকালে মধুরৈ-এর রাজারা মূল ভূ-খণ্ডে দেবীর বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করান।

বিবেকানন্দ রক্—কন্যাকুমারিকা

দেবীমন্দিরের অদূরে বিবেকানন্দ পাঠাগার। আকারে ছোট হলেও অতি সুশৃঙ্খল এর ব্যবস্থাপনা।

মন্দিরের পিছনেই সঙ্গম ঘাট। উপকূলের সংলগ্নপ্রায় কয়েকটি শিলাখণ্ডের বেষ্টনীর মধ্যে সমুদ্রের জল ঢুকে যেন একটি স্বতন্ত্র জলাশয়ের সৃষ্টি করেছে। তারই উপরে বাঁধানো ঘাট। ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দক্ষিণে অনন্ত-বিস্তৃত মহাসাগরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে পড়ে গেলো ভারতবর্ষের এই শেষ স্থলখণ্ডের পরেও ছিল ভূভাগ। যা আজ হারিয়ে গেছে ঐ সাগর গর্ভে। হারিয়ে গেছে প্রাচীন গণ্ডোয়ানা, যার একাংশ এই দক্ষিণ ভারতের মালভূমি।

কন্যাকুমারিকায় ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত আছে এগারটি তীর্থ, — চক্রতীর্থ, পাপনাশন, গায়ত্রী, সাবিত্রী, সরস্বতী, কুমারী,

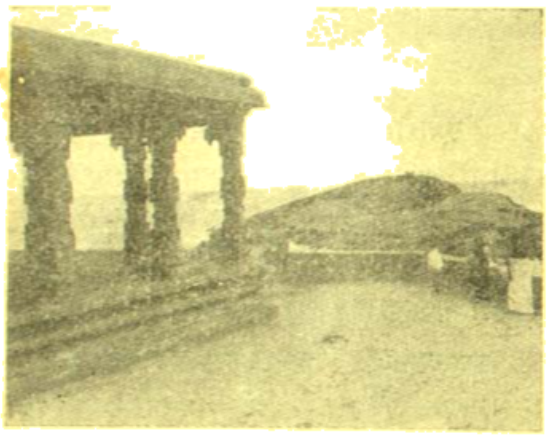

সঙ্গম ঘাট—কন্যাকুমারিকা

গণেশ, স্থাণু, ভীম, মাতৃ ও পিতৃতীর্থ। নামগুলির মধ্যে স্থাণু শব্দটি দক্ষিণ দেশীয়। সংস্কৃত 'স্থাণু' কথাটির তামিল রূপ। স্থাণু অর্থে শিব।

মাতৃতীর্থটি ব্রহ্মাণী, মহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী ও চামুণ্ডা এই সপ্ত-মাতৃকার নামে উৎসর্গীকৃত। তামিল-এ এই সপ্ত-মাতৃকা সপ্ত কন্নি নামে পরিচিতা, আর কন্নি নায়কী তাঁদের প্রধানা। কন্নি নায়কী সপ্ত-কন্যা সমভিব্যাহারে অসুর নিধন করেছিলেন।

এ তো গেলো ধর্মীয় কথা। প্রাকৃতিক বিশেষত্ব ও রমণীয়তায় তুবন মনোহারিণী ভারতের এই অন্তিম ভূ-খণ্ড।

তিনদিকে সমুদ্রের বেষ্টনী দেওয়া কন্যাকুমারিকার সৈকতে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম একই জলরাশিতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত। কি বিচিত্র বিস্ময়কর রূপের খেলা!

সবচেয়ে বিস্ময়কর দৃশ্যটি দেখা যায় চৈত্র পূর্ণিমার দিন। আকাশ মেঘমুক্ত থাকলে, একই সঙ্গে, পূর্ব দিগন্তে সমুদ্র গর্ভ হতে চন্দ্রের আবির্ভাব ও পশ্চিমের সমুদ্রে সূর্যের অস্তর্ধানের যে দৃশ্য কন্যা-কুমারিকার নয়নগোচর হয়, তা পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না।

ছোট বসতি কন্যা-কুমারিকা। আদি অধিবাসীদের অধিকাংশই মৎস্যজীবী। উপকূলের এরূপ গ্রামে কর্ষণ-যোগ্য জমির অভাবে ওই জীবিকাই স্বাভাবিক।

মৎস্যজীবীদের দেশীয় ভাগই ক্রিশ্চিয়ান্। এঁদের মধ্যে অনেকের ধারণা যে, দেবী কুমারী তাঁদের ভার্জিন্ মাদার মেরী।

কন্যা-কুমারিকা থেকে বিদায়ের পূর্বে আর একবার গেলাম দেবী দর্শনে। গেয়ে এলাম একটি প্রার্থনা,—আবার যেন এখানে আসতে পারি।

শুচীন্দ্রম্-এর পথে বাস এগিয়ে চললো। কুমারীর মন্দির ধীরে ধীরে সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলো।

কন্যার পাদমূলে আমরা এলাম, আমরা চলে গেলাম। মানুষ আসে, মানুষ যায়। সাগরের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়ে ছুটে এসে পড়ে তাঁর মন্দিরের তলায়,—লুটোপুটি খায়,—আবার ফিরে যায়। আসে জন্ম, আসে মৃত্যু। কন্যা কিন্তু নিশ্চলা। অপেক্ষারতা তাঁর শিবসুন্দরের জন্য। শিব আসবেন সর্বসংহারের পরে।

[এক সত্যযুগের পরিমাণ ১৭২৮০০০ বৎসর। দু' হাজার সত্যযুগে ব্রহ্মার এক দিন। ঐরূপ ত্রিশ দিনে এক মাস এবং বারো মাসে ব্রহ্মার এক বৎসর। ব্রহ্মার বয়স একশ বছর হলে এক প্রবল বন্যা উপস্থিত হবে যার নাম ব্রহ্মা-প্রলয়। দশটি ব্রহ্মা-প্রলয়ের সমকাল, বিষ্ণুর জীবন-কাল। অনুরূপ বাইশ বিষ্ণুর আয়ুষ্কালের সমষ্টি অবসানে ঘটবে সর্বসংহার।]

তখন সব একাকার হয়ে যাবে। নিরাকার নির্গুণ হয়ে যাবে পরিদৃশ্যমান জগৎ।

তখন মিলিত হবেন শিব ও কন্যা,—কুমারী। স্রষ্টা ও তাঁর সৃজনী শক্তি।

নিরাকার আবার হয়ে উঠবেন সাকার। অপরূপ হবেন রূপময়। নির্গুণ ব্রহ্ম হবেন সগুণ,—তাঁরই গুণময়ী শক্তির স্পর্শে, সম্মিলনে। হবে নতুন বিশ্বের জন্ম।

ভবিষ্যৎ সেই বিশ্ব-মাতা, শুচি-সম্পন্না কুমারীরূপে তাই বিশ্ব-পিতা হতে দূরে অবস্থান করছেন। তাঁকে আর একবার প্রণাম জানাই।

আর প্রণাম জানাই তাঁর ওই রূপের রূপকারদের,—ওই রূপের কল্পনাকারীদের উত্তুঙ্গ কল্পনা শক্তিকে। [ক্রমশঃ

বড়াল-কবির 'প্রদীপ' কাব্যগ্রন্থ ও কবিমানস

ডঃ জয়ন্ত গোস্বামী

কবির কামনা সংস্কার থেকে উদ্ভূত কল্পনাজগৎ বস্তুজগতের পরিদৃশ্যমান রূপ থেকে স্বতন্ত্র। এর কারণ, কামনার পূর্ণ পরিতৃপ্তি বস্তুপরিবেশে অসম্ভব। কামনা-পরিতৃপ্তির মূলে থাকে মানসিক সম্ভোগের অনেকখানি। বাহ্য ইন্দ্রিয় সম্ভোগ তাকে উদ্দীপন করে মাত্র। কিন্তু উভয়ের সঙ্গে সম্পর্ক যতোই থাক না কেন, মানসিক গতি বস্তুজগতের সাধারণ গতিকে লঙ্ঘন করে থাকে। তাই বাস্তব জগতে কামনার পূর্ণ পরিতৃপ্তি ঘটে না এবং বস্তুজগৎ ও কল্পনা-জগতের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

ব্যক্তিচিত্তের সুপ্তকামনাই ব্যক্তির কামনা, সংস্কার, বহির্জগতে প্রতিষ্ঠা করবার প্রবণতা জাগ্রত করে। এর থেকেই জাগে সৃষ্টির ইচ্ছা। চিত্তবিধৃত কল্পনার বহিঃরূপ-সৃষ্টিতে মানুষের এই আকাঙ্ক্ষা শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ পেয়ে থাকে। সাহিত্যের বহিঃরূপ হচ্ছে বাঘয়। এই বাঘয় রূপসৃষ্টির মূলে শিল্পীর প্রকাশ ক্ষমতা কোনো ক্ষেত্রেই পূর্ণাঙ্গ নয়। তবে কল্পনা ও বাহনের পারস্পরিক উপযোগিতা সম্পর্কের মধ্যেই শিল্পীর প্রকাশ বেদনা অভিব্যক্তি লাভ করে। উচ্চ সূক্ষ্মতর কল্পনাজগতের অভিব্যক্তিতে কবি যে ভাষাকে বাহন করেন, তাকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করতে গিয়ে ভাষাকে করে তোলেন স্বতন্ত্র। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে অভিব্যক্তি যতোই থাক না কেন, তার পরিধি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। তাই ভাষার স্বাতন্ত্র্যও কবির প্রকাশকে আত্মাবগাহনেই পর্যবসিত করে। সাধারণের কল্পনা-জগতের চেয়ে ভাবুকের কল্পনা-জগৎ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম। বাইরের থেকে ভাবুকের ভাবনার মাত্রা নির্ধারণ অসম্ভব। কিন্তু অপেক্ষাকৃত স্থূল কল্পনার প্রকাশেও সাধারণ ভাবুকের মনে একই ধরণের প্রকাশ বেদনা জাগা স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে ভাষাবয়ব গঠনে অধিকতর দৈন্যই এই বেদনার সৃষ্টি করে। সুতরাং কবি—তা তিনি বড়োই হোন্ বা ছোটোই হোন্—তাঁর এই অক্ষমতা তিনি না স্বীকার করে পারেন না।

'প্রদীপ' কাব্যগ্রন্থটির নামকরণের মধ্যে কবির এই অক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন ভাব উপলব্ধি করা যায়। কবি উপলব্ধি করেছেন, কল্পনার আলোক স্বরূপে আনন্দময়, কিন্তু তার প্রকাশক্ষেত্র-বিশেষ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। কিন্তু তবুও সেই আনন্দ বিন্দু ব্যর্থ নয়। কবি উপলব্ধি করেন,—

"আহা, প্রাণারাম কিবা নির্মল উজল বিভা
চারিদিকে খেলিছে তোমার।"

কিন্তু এই উপলব্ধির মধ্যেও আছে একটা সীমা। তাই উপহারের সামগ্রী হয়েছে 'প্রদীপ'।

একটা প্রদীপ লয়ে ছুটে আসে ব্যস্ত হয়ে
গরবে বলিয়া বার বার,—
এই লও ধর উপহার!"

উপহারের মধ্যে কবির বেদনা মিশে আছে। প্রকাশের অক্ষমতা কবিকে পীড়িত করেছে। তাই কবি বলেছেন,—

"গীত অবশেষে নিঃশ্বসিল কবি
বল কি গাহিব আর—
মরণের গান ফুটিল না তাহে
বাজিল না হৃদি তার!"

বিভেদের মধ্যে ঐক্য অনুসন্ধান মানবমনের স্বাভাবিক ধর্ম। তাই কল্পনা জগতের মূলে একটা কামনাময় সত্তাকে প্রত্যেক কবিই উপলব্ধি করে থাকেন। যৌন চেতনা মানুষের প্রবৃত্তির আদিতম উৎস বলে অনেকে স্বীকার করে থাকেন। সুতরাং কামনা সংস্কার অনেক ক্ষেত্রেই যৌনচেতনাকে অবলম্বন করে কেন্দ্রীয় সত্তার উপলব্ধি ঘটায়। পুরুষের ক্ষেত্রে তাই নারীমূর্তিকে কল্পনার জগতের কেন্দ্রীয় সত্তা বলে অনুভব করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সৌন্দর্য চেতনার মূলে আধুনিক যুগে যাঁরা ইন্দ্রিয় সম্ভোগকে বড়ো করে মানেন, তাঁরা প্রকৃতি ও নারীর সৌন্দর্য অনুসন্ধানের মধ্যে ইন্দ্রিয় সম্ভোগের অত্যন্ত অবচেতন অবস্থা উপলব্ধি করেন। সেক্ষেত্রে নারী এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে থাকে একটা ঐক্য। কিন্তু যৌন-সংস্কার যখন অত্যন্ত পরিবেশ-সচেতন, তখন প্রকৃতি-সৌন্দর্য এবং নারী-সৌন্দর্যের মধ্যে একটু পার্থক্য থেকে যায়। Clifford Box তাঁর The Beauty of Woman (London 1946) গ্রন্থে নারী-সৌন্দর্যের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে এই যৌন চেতনার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। (P-9 দ্রষ্টব্য)। অতীতের সৌন্দর্য চেতনাকে সৌন্দর্যচেতনা বলতে অনেকে সঙ্কুচিত হলেও, তাঁদের বক্তব্যের মধ্যেই প্রকৃত সত্যের ইঙ্গিত থেকে গেছে। এই যৌনচেতনা পরিবেশ-বৈশিষ্ট্যে এবং সংস্কৃতি-বৈশিষ্ট্যে বিশেষভাবে

প্রকাশ পায়। কখনো কবি তাই নারীমূর্তিকে পারিবারিক গণ্ডীতে নিজস্ব বন্ধনের মধ্যে উপলব্ধি করেন, আবার কখনো বা সম্পূর্ণ মানসিক সম্ভোগের উপযোগিতার অভাবে নারীমূর্তি হয়ে পড়ে অবহা। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই এই যৌনচেতনা কবিকে আন্দোলিত করে। তাই সৌন্দর্যক্ষেত্রে কবি যৌনচেতনাকেই প্রধান মূল্য দিয়ে বসেন এবং প্রকৃতি সৌন্দর্যকে তারই নিয়ন্ত্রিত বলে উপলব্ধি তথা প্রচারের মাধ্যমে সমর্থন পুষ্টি এবং প্রতিষ্ঠার আসন পেয়ে থাকেন। তাই 'নারীবন্দনায়' কবি বলেছেন—

"রমণীরে সৌন্দর্যে তোমার
সকল সৌন্দর্য আছে বাঁধা।"

সৌন্দর্যের সৌরজগতে তাই রমণী কবির কাছে তপনের মতো। এখানে প্রকৃতি-সৌন্দর্য ও রমণী-সৌন্দর্যের মিলন নয়, প্রকৃতি-সৌন্দর্যের সত্তা নাশ। এই বিরোধ আছে বলেই কবি তাঁর 'কবিত্ব' কবিতার মধ্যে উপলব্ধি করেছেন যে নারী ও প্রকৃতি যেন জগৎ বেষ্টন করে আছে মেরুর মতো—সেখানে কবি যেন বিদ্যুৎ।

পরিবেশ-বৈশিষ্ট্য এবং সংস্কৃতি-বৈশিষ্ট্য শুধু নারী ও প্রকৃতির মধ্যে বিরোধই আনে নি, কবির সঙ্গে নারীর সম্পর্ক বিশ্লেষণেও বিরোধ এনেছে। পরিবেশ ও সংস্কৃতি-সচেতনতা নারী সম্পর্কে কবিকে করে তুলেছে বৈরাগ্যবাদী। কিন্তু এই সচেতনতা কামনাসংস্কারের তাগিদে বিঘটিত হয়। তাই নারীকে কবি তাপক্লিষ্ট বস্তুজগতে সঞ্জীবনী শক্তিরূপে কল্পনাও করতে সক্ষম হয়েছেন।—

"এ নির্দয় জীবন-সংগ্রামে
তুমি বিধাতার আশীর্বাদ।
নিত্য তব পরাজয়ে পাছে পাছে ফিরিতেছ
সকলে লইয়া সুখ সাধ।"

কবির মতে, কল্পনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সঙ্গে কবির সম্পর্ক চিরন্তন। তিনি মানবীর মধ্যে সংসার-চারিণী হয়েও এক নন।—

"নারী
যুগ যুগান্তর ধরি একত্র সংসার করি
এক লক্ষ্য অনুসরি আমরা দুজনে
তবু কি বিভিন্ন মোরা—অতি ভিন্ন মিলনে।"

প্রভেদের মধ্যে অভেদের তত্ত্ব উপলব্ধিতেই কবির আনন্দ। কবি উপলব্ধি করেছেন যে এই অভেদতত্ত্বই এই বিরাট সৃষ্টির মধ্যে এনেছে শান্তি ও সান্ত্বনা। কারণ শান্তি ও সান্ত্বনার লয়ের সঙ্গে সৃষ্টির লয়ও স্বাভাবিকভাবে সংঘটিত হতো। তাই কবি বলেছেন,—

"অভেদে প্রভেদে এই বিধা সুমঙ্গল।
এ সংসার রণাঙ্গনে, হেম দৃঢ় আলিঙ্গনে
না মিলিলে ভিন্নগতি দু'টী মহাবল,
গ্রহ উপগ্রহ লয়ে, বিশ্ব যেত চূর্ণ হয়ে,
বিধির সৃজন কর্ম হইত বিফল।"

এই অভেদতত্ত্বের সত্যতায় কবির প্রতি নায়িকার আকর্ষণও চিরন্তন। কবি বস্তু জগতের কালিমালিপ্ত এবং নায়ক কল্পলোকের রঙে লিপ্ত। এক্ষেত্রে কল্পলোকে কবির অন্তিমারে আছে হীনতার সঙ্কোচ। কবি নিরাশার মূর্তি! তিনি উপলব্ধি করেন,—

"আমি—নিরাশার মূর্তি, মরণ ঘোমর,
দুরদৃষ্ট মনে বাঁধা সহস্র বন্ধনে;
অন্তদিন—অন্তক্ষণে আপন ক্রন্দনে
হেরি আপনার সত্তা সন্তপ্ত কাতর।"

কবির পঞ্চেন্দ্রিয় দুঃখ, পাপ এবং মৃত্যুতে লিপ্ত। তাই তিনি নায়িকার সঙ্গে নিজের অভেদ কল্পনা করতে সঙ্কুচিত হন। তাঁর প্রেমও হয়ে ওঠে স্বার্থপরের কামনা। কবি তাই নায়িকার প্রতি তাঁর প্রেমনীতিতে বলেছেন—,

"শুন তবে, রমণী রে, বলি আজি গর্ব ভরে—
এ প্রণয় স্বার্থশূন্য নয়;
জনম—বিফল ব্যর্থ, এ স্বার্থ না হলে পূর্ণ;
এ প্রণয় মহাস্বার্থময়!"

এই স্বার্থপরতার জন্যেই কবি তাঁর মিলনের অন্তরায় উপলব্ধি করে নিজেকেই ধিক্কার দিয়েছেন। বস্তুতঃ কামনা-সংস্কারকে সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে এবং মানসিক সম্ভোগ-স্পৃহাকে তুচ্ছ করে শুধুমাত্র বস্তু উপকরণে যে আত্মার তৃপ্তি ঘটে না,—এই সত্যই যেন কবি তাঁর সৌন্দর্যা-ভিসারে সঙ্কোচের অভিব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু কবির এই হীনতা কি কল্পলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে কবির প্রতি বিমুখ করে! বস্তুতই কল্পনাদেবীর উৎস। সুতরাং স্বরূপে ভিন্ন হলেও প্রাণের সঙ্গে তাঁর আকর্ষণ দুর্নিবার। কল্পনাদেবী বাস্তবের সঙ্কীর্ণতাকে সহ্য করতে পারেন না বটে, কিন্তু এই বিতৃষ্ণা প্রকৃত আকর্ষণকে বিদলিত করতে পারে না। তাই বিতৃষ্ণা এই সাময়িকভাবে আকর্ষণ নষ্ট করলেও তা অনুশোচনায় পরিণতিলাভ করে বলে কবি চিন্তা করে সান্ত্বনা খুঁজেছেন। 'ভাবুকতা' কবিতায় তিনি বলেছেন—পাষাণ-গিরির আবাস ত্যাগ করে চঞ্চলা অভিমানী কোমলা গিরি নির্ঝরিণী চলে যায়—তারপর জগৎমরুর মধ্যে এসে সে পাষাণের কাছে ফিরে যাবার জন্যে হাহাকার করে।

পরিবেশ ও স্বরূপগত সম্পূর্ণ প্রভেদ সত্ত্বেও কবি ছাড়া নায়িকা অপূর্ণ, আবার নায়িকা ছাড়া কবি অপূর্ণ। এই পারস্পরিক আকর্ষণে কোথাও কবি সক্রিয়, আবার কোথাও বা নিষ্ক্রিয়। তাই কখনো কবি নায়িকার জগতে যাবার আকাঙ্ক্ষা করেন, আবার কখনো বা নায়িকাকে নিজের জগতে আকর্ষণ করেন।

প্রভেদে অভেদ স্থাপন করতে গিয়ে তাই কবি কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের প্রেমতত্ত্বে মূল সত্তার পারস্পরিক আকর্ষণের দোহাই দিয়ে প্রভেদকে বিস্মৃত হবার চেষ্টা করেছেন। 'আবাহন' কবিতায় "শিরীতি"কে আহ্বান করতে গিয়ে কবি বলেছেন,—

"হে শিরীতি, সমুন্নতি কর অধিষ্ঠান!
লঘু স্বর্গ, রাখ নর মান।
এত চেষ্টা যত্ন শ্রম,
এত ধৈর্য পরাক্রম
এত যাগ যজ্ঞ কর্ম
এত শিক্ষা দীক্ষা ধর্ম
এত ত্যাগ অনুরাগ, এত ভক্তি জ্ঞান,
নহে—নহে তুচ্ছ এই ধ্যান।"

কিন্তু বস্তুজগৎ ও কল্পনাজগতের মধ্যেকার যে বিরাট প্রভেদ কবি অনুভব করেছেন, মাঝেমাঝে তা কবিকে এমন বেদনার্ত করেছে যে, কবি মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ নৈরাশ্যবাদী হয়ে পড়েন। তখন তাঁর মনে হয়েছে যে—কল্পনাজগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রেমকে অনুসন্ধান করা আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর। তিনি বলেছেন,—

"ভালবাসা—ভালবাসা— এ শুধু কথার কথা,
কবির কল্পনা;
ভালবাসা—ভালবাসা— পাগলের হাসি-কান্না
নারীর খেলনা।"

কারণ কল্পনাজগতের অক্ষেত্রে বাস্তবের কোনো প্রতিচ্ছবি নেই। এটা কি তবে বস্তুজগতের প্রতি কল্পনাময়ীর প্রেমহীনতার লক্ষণ? কিন্তু আকর্ষণশক্তির উৎস জানবার জন্যে কবি ব্যাকুল। এই সাধনাতেই তিনি কল্পনাময়ীকে আকর্ষণ করতে চান।—

"রমণী তোমায় তরে তোমারি মতন হই
কোন্ সাধনায়?
মুখে হাসি প্রেমকথা, বুকে নাই কোন ব্যথা
মত্ত আপনায়।"

কিন্তু কবি উপলব্ধি করেছেন যে—এই বিশ্বাসহীনতার মূলে আছে তাঁর নিজের আসক্তিমূলক প্রেম। প্রকৃত প্রেম দুর্লভ।—

"ভালবাসা—চিরভক্তি, চাই প্রাণ, চাই শক্তি
এ অনন্ত অনুভূতি খেয়ালের নয়,
বহু স্বার্থ আত্ম-ত্যাগে বহু রূপে তপে যাগে
বহু স্মৃতি কথা মন্ত্রে প্রেম সমুদয়।"

প্রকৃত প্রেম কবি উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এ যেন জাগ্‌তে চায় না। নিজের প্রেমের মালিন্য ও অপবিত্রতা নারীর সংস্পর্শেও কবির জীবনকে করেছে দুর্বিষহ।—

"সুখের অভাব নাই, তবু সুখ নাহি পাই—
সুখে একি অসুখ-গহন!
কি দুর্বহ আমার জীবন!"

এর থেকে মুক্তি পাবার জন্যে কবি অবশেষে আধ্যাত্মিক সংস্কারে আক্রান্ত হয়ে নারায়ণের কাছে মুক্তিভিক্ষাও করেছেন।—

"কোথা তুমি জীবন জীবন
হে চিত্ত-বিহারী নারায়ণ!"

কিন্তু কবির এই পরাভব ক্ষণিক আচ্ছন্ন-অবস্থা মাত্র। নৈরাশ্য-বাদ নারীর সংস্পর্শে নতুন বিশ্বাসে আবার দূরে চলে গেছে। নারীর মধ্যেই তিনি চান তাঁর আশ্রয়। তাঁর মধ্যে রয়েছে ত্রুটি বিচ্যুতি সঙ্কীর্ণতা—তবুও নারী তাঁকে অসীম সহানুভূতিতে টেনে নিক।

"শুন তবে একবার এ প্রাণের জ্বালাময়ী
দুঃখের কাহিনী;
বলিতে বলিতে সুখে একবার চিরতরে
ঘুমাই রমণী।···
ধরাতল বিপ্লবিনী উন্মত্তা কল্পনা নদী
এ ক্ষুদ্র অন্তরে,
নৈরাশ্য পাষাণ দিয়া কতদিন বল আর
রাখি রুদ্ধ করে?···
একটু অপেক্ষা কর, মনে বড় আছে সাধ
দিব উপহার,—
জগৎ বন্ধনহীন সুখদুঃখ প্রেমাতীত
পরাণ আমার।"

'প্রদীপ' কাব্য অক্ষয়কুমার বড়ালের রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশকাল ১২৯০ সালের চৈত্রমাস। কবির জীবিতকালেই ১৩০০ সালের আশ্বিন মাসে দ্বিতীয় সংস্করণ এবং ১৩১৯ সালের ফাল্গুন মাসে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। কবির আত্যন্তিক অতৃপ্তি দুটি সংস্করণকেই স্বতন্ত্ররূপ দিয়েছে। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ পাবার সাত মাস আগে তাঁর সর্বশেষ এবং শ্রেষ্ঠ কাব্য 'এষা' প্রকাশিত হয়ে গেছে।

সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ে "প্রাচ্যবাণী"

পণ্ডিত শ্রীঅনাথশরণ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

"প্রাচ্যবাণীর" মধ্যমণি আজ আর নাই। আমাদের সকলের হৃদয় চিরতরে বিদীর্ণ করিয়া, আমাদের সকলের আশার মূলে চিরতরে কুঠারাঘাত হানিয়া, আমাদের সকলের আনন্দের উৎস চিরতরে রুদ্ধ করিয়া, আমাদের সকলের প্রাণপ্রতিম দেশ গৌরব, সর্বজনবরেণ্য, পণ্ডিতা-গ্রণ্য, আধুনিক কবি-শ্রেষ্ঠ ডক্টর যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী মহোদয় বিগত ১০ই জুলাই রাত্রি এগারটায় অতি অকস্মাৎ অতি অকালে, অতি নিষ্ঠুর ভাবে আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। সমগ্র দেশ আজ তাঁহার জন্য শোকমগ্ন। কিন্তু সকল কিছু ছাপাইয়া উঠিয়াছে তাঁহার আত্মজন, তুলাভূণবিমণ্ডিত, সমদর্শনাই, ধার্মিকশ্রেষ্ঠা, ব্রহ্মবাদিনী পত্নী ডক্টর রমার অসহনীয় শোক! ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের সুপবিত্র শ্রাদ্ধ বাসরে, ডক্টর রমা তাঁহার অপূর্ব মর্মস্পর্শী, ভাবগম্ভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি ভাষণে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সগৌরবে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে পত্নী পতির অর্ধাঙ্গিনী মাত্রই নহেন, পতির পূর্ণাঙ্গিনী। সেজন্য হয়তো, কেহ কেহ এরূপ আশঙ্কাও করিয়াছিলেন যে পতির বিরহে হয়ত তিনিও সম্পূর্ণ রূপেই শেষ হইয়া যাইবেন নিঃশেষে। কিন্তু তাহা হইবার নহে, কারণ যাঁহারা পূর্ণ—তাঁহারা চিরকাল পূর্ণই থাকেন, তাঁহাদের আর শেষ কোথায়? এই জন্যই আমাদের উপনিষদ কি সুন্দর ভাবেই না বলিয়াছেন—"পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" "পূর্ণ হইতে পূর্ণ লইলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।"

সেইজন্য ডঃ যতীন্দ্রবিমলের আত্মা পরিপূর্ণভাবে ডঃ রমার মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে—তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার শক্তি, তাঁহার কার্য, তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার সাধনা, তাঁহার তপস্যা কোনো কিছুই ত আজ মরিয়া যায় নাই, শেষ হইয়া যায় নাই; বরং পরিপূর্ণভাবে জীবিত আছে ডঃ রমারই মধ্যে।

তাহারই কি অপূর্ব প্রমাণ অচিরেই পাইলাম। প্রত্যেকবারেই পূজাবকাশে ডঃ যতীন্দ্রবিমল পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে নানা প্রদেশে তাঁহার প্রাণপ্রিয় "প্রাচ্যবাণী নাট্য-সম্প্রদায়ের" প্রকাণ্ড দলবলসহ সংস্কৃত অভিনয়ের জন্য যাইতেন মহোৎসাহে ও পরমানন্দে। এ বৎসর এই সকল কিছুই হইবে না বলিয়াই আমরা ধারণা করিয়া বসিয়া ছিলাম। কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই একটি প্রকাণ্ড সাংস্কৃতিক সফরের সর্বপ্রকার ও আশাতীত প্রকারের সুবন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন ডঃ রমা অতি অপরূপ সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে। যাত্রার ঠিক প্রাক্কালে দেখিলাম এক অপূর্ব করুণ, অথচ, আশাব্যঞ্জক দৃশ্য—তাঁহার দুই চক্ষু বহিয়া অঝোরে ঝরিয়া পড়িতেছে শোকাশ্রু ধারা; অথচ তাঁহার মস্তক উন্নত, আনন প্রদীপ্ত, পদক্ষেপ দৃঢ়। বুঝিলাম, আর আমাদের ভয় নাই, তাঁহার চক্ষে চিরকালই ঝরিবে অশ্রুজল; কিন্তু তাঁহার বক্ষে চিরকালই জ্বলিবে অদম্য সাহস, অনমনীয় সংকল্প, অফুরন্ত শক্তি; যাহাপাওয়া যায় সাথে এক।

যতীন্দ্রবিমল মরেন নাই, তিনি জীবিত রহিয়াছেন আমাদেরই প্রাণপ্রতিম মাতা রমার মধ্যে। সত্যই, এই-বারের ন্যায় একপদীর্ঘ এবং এরূপ গৌরবজনক সাংস্কৃতিক সফর ত পূর্বে আমাদের কোনদিনও হয় নাই—পূর্ণ তিন-লক্ষ যে ছয়টি সংস্কৃত নাটকের অভিনয়। পূর্বপ্রান্ত কলিকাতা হইতে পশ্চিম প্রান্ত ওখা আসিতে যাইতে প্রায় ৪০০০ মাইল, অভূতপূর্ব সম্মান, সমাদর—এরূপ ত আর পূর্বে কোনদিনও হয় নাই। কাহার অমর শক্তি ইহার পশ্চাতে কার্য করিল? উত্তরের প্রয়োজন নাই।

দিল্লীতে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

বিগত ২রা অক্টোবর ১৯৬৭ আমরা পূর্ববৎ গায়ক বাদক রূপকারাদি সহ প্রকাণ্ড দলবল লইয়া স্পেশাল ট্রেনে দিল্লী যাত্রা করিলাম, আমাদের জন্য একটি স্পেশাল কোচের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া কর্তৃপক্ষগণ আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

এইবার আমাদের দিল্লীতে চারটি সংস্কৃত নাট্যাভিনয় হয়। অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা এই যে আমাদের এইবারের সাংস্কৃতিক সফরের সর্বপ্রথম অনুষ্ঠানই (১২ই অক্টোবর ১৯৬৭) হয় নয়াদিল্লীস্থ রাষ্ট্রপতি ভবনে পরম শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণের পূণ্য উপস্থিতিতে। বিগত বৎসর ইষ্টারের বন্ধেও (এপ্রিল ১৯৬৩) আমরা রাষ্ট্রপতি ভবনে সর্বজনবরেণ্য রাষ্ট্রপতি এবং বহু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, পণ্ডিত ও ভক্তগণের সানুগ্রহ উপস্থিতিতে ডঃ যতীন্দ্রবিমলের "অমর মীরম্" নামক ভক্ত শ্রীমীরা বাইয়ের পূণ্য জীবনী অবলম্বনে বিরচিত অতি মনোহর সংস্কৃত নাটকটি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করি। এই বৎসর আমরা রাষ্ট্রপতি-ভবনে অভিনয় করিলাম ডাঃ যতীন্দ্রবিমলের সর্বজনপ্রিয়, বহু অভিনীত, অপূর্ব সংস্কৃত নাটক "ভারত-বিবেকম্"—পূণ্যকীর্তি স্বামী বিবেকানন্দের অনুপম জীবনগাথা। ভক্ত

কবির সুনিপুণ তুলিকায় রূপে, রসে, গন্ধে, উদ্বেল—সুশোভন বারনা, সুললিত কবিতা, সুমধুর সঙ্গীতে উচ্ছল। পূর্ণ দুই ঘন্টা ধরিয়া প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রপতি মহাশয় এবং বিহারের রাজ্যপাল—সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রী অনন্ত-শয়নম আয়েঙ্গর প্রমুখ বহু জ্ঞানিগুণিজন মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়া এই অভিনয় দর্শন করিয়া আমাদের পরম কৃতার্থ করিলেন। পরিশেষে শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতি মহাশয় আমাদের সকলের সঙ্গে ছবি তুলিলেন, সকলকেই স্নেহবাক্যে অটোগ্রাফ দিলেন, উৎসাহিত করিলেন, বিশেষ করিয়া ডাঃ রমাকে এই অবস্থাতেও এই ভাবে পতির ব্রত উদ্‌যাপনার্থে প্রচেষ্টা করিবার জন্য সাধুবাদ দিলেন এবং আশীর্বাদ স্বরূপ প্রাচ্যবাণীকে পাঁচ শত টাকা উপহার দিলেন। সত্যই তাঁহার স্নেহের তুলনা নাই। তাহার এই উপহার চিরদিন আমাদের পাথেয় স্বরূপ হইয়া রহিল।

দিল্লীতে আমাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিনয় হয় ১৩ই এবং ১৪ই অক্টোবর ১৯৬৪ "অখিল ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্য সম্মেলনের" উদ্যোগে, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি সুন্দর, সুবিস্তৃত প্রেক্ষাগৃহে। প্রথম দিন অভিনয় হয় "ঊরুভঙ্গম্" দ্বিতীয় দিন "ভারত বিবেকম্"। প্রথম দিনের (১৩ই) প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় উপ-শিক্ষা মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রীভক্তদর্শন এবং সভাপতি ছিলেন সুবিখ্যাত "নব ভারত টাইম্‌স্" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅক্ষয়কুমার জৈন। দ্বিতীয় দিন প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা সচিব শ্রদ্ধেয় শ্রীবিশ্বম্ভর দত্ত এবং সভাপতি ছিলেন "দৈনিক হিন্দুস্থানের" সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীরতনলাল ঘোষ। উভয় দিনই সুবৃহৎ প্রেক্ষা গৃহে তিল ধারণের স্থান ছিল না এবং সকলেই অভিনয় দর্শনে বিশেষ মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হন। পরিশেষে ডাঃ আর কে শর্মা এবং পণ্ডিত শ্রীরামেশ্বর শর্মা অভিনয়ের উচ্চপ্রশংসা পূর্বক সকলকে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন। অখিল ভারতীয় সংস্কৃত সম্মেলনের পক্ষ হইতে চারটি ঘোষণা করা হয়। ইহার সচিব শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীমণ্ডন মিশ্র অভিনয়ের সর্বপ্রকার সুব্যবস্থা করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত, শ্রদ্ধেয় শ্রীবেদপ্রকাশ খান্না, তাঁহার সহ-ধর্মিণী ও ভ্রাতা দিল্লীতে আমাদের সকল প্রকার সুখ-সুবিধার জন্য অতি সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া আমাদের চির-কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

দিল্লীতে আমাদের চতুর্থ অভিনয় হয় ডাঃ যতীন্দ্রবিমলের সুবিখ্যাত "শক্তি-সায়কম্" নাটকের—নয়াদিল্লী নগর বালিকা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে। উদ্বোধক ছিলেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষাধিকর্তা শ্রীডি, ডি, উপাধ্যায় এবং সভাপতি ছিলেন "নব ভারত টাইম্‌স্" পত্রিকার শ্রদ্ধেয় শ্রীফতেচাঁদ শর্মা। এই দিনও সুবৃহৎ প্রেক্ষাগৃহ জ্ঞানি-গুণি-জনে পরিপূর্ণ ছিল এবং সকলেই একবাক্যে অভিনয়ের অত্যুচ্চ প্রশংসা করেন।

জয়পুরে সংস্কৃত-নাট্যাভিনয়

জয়পুরে বৈদিক সংস্কৃতি প্রচার সঙ্ঘের উদ্যোগে ১৯শে এবং ২০শে অক্টোবর ১৯৬৪ অতি সুন্দর, সুবৃহৎ রবীন্দ্র-রঙ্গমঞ্চে আমাদের পর পর দুইটি সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হয়। প্রথম দিনে সভাপতিত্ব করেন পরম শ্রদ্ধেয় রাজ্যপাল, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ মহোদয়, দ্বিতীয় দিনে বিধান সভার শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহাশয়।

সর্বজনপ্রিয় রাজ্যপাল মহাশয়ের অনুগ্রহের সীমা নাই। তিনি রাজ্যপাল ভবনে আমাদের চা পানের আমন্ত্রণ করিয়া পরম সমাদর করিলেন; এবং উভয় দিনের অনুষ্ঠানেই প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বসিয়া থাকিয়া রাত্রি এগারটা পর্যন্ত সাগ্রহে আমাদের অভিনয় দর্শন করিলেন।

প্রথম দিনের শেষে শ্রদ্ধেয় শিক্ষাধিকর্তা শ্রীহরিভাব উপাধ্যায় এবং সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও বিধান সভার সদস্য শ্রদ্ধেয় শ্রীশ্বরূপনারায়ণ পুরোহিত, এবং দ্বিতীয় দিনের অভিনয়ের শেষে শ্রদ্ধেয় রাজ্যপাল ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ নাটক-গুলির সরল সহজ ভাষা, উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব সুমধুর সঙ্গীত এবং অভিনেতৃবর্গের উচ্চারণ ও অভিনয়শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। পরম স্নেহশীল রাজ্যপাল মহাশয় অভিনেতৃগণকে স্বহস্তে অতি সুন্দর পুরস্কারও দান করিলেন, এতদ্ব্যতীত "বৈদিক সংস্কৃতি প্রচার সঙ্ঘের" পক্ষ হইতে চারটি পদক ও একটি শীল্ড্ পুরস্কার দেওয়া হয়।

জয়পুরে এই সর্বপ্রথম সংস্কৃত অভিনয়। যে স্নেহ সমাদর আমরা জয়পুরে পাইয়া ধন্য হইয়াছি, তাহা সত্যই অতুলনীয়। নিরলসকর্মী শ্রদ্ধেয় শ্রীমুরারী চতুর্বেদী অভিনয়াদির এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীরুংটা ও শ্রী মেহতা আমাদের বাসস্থানাদির সকল প্রকার সুব্যবস্থা করিয়া আমাদের অপরিশোধ্য ঋণজালে আবদ্ধ করিয়াছেন।

ওখা'তে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

'ওখা', ভারতের শেষ পশ্চিম প্রান্তস্থিত একটি অতি সুন্দর নগরী। এইখানেও পূর্বে কোনও সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হয় নাই। ২২শে অক্টোবর ১৯৬৪ সুবিখ্যাত "লায়ন্স্ ক্লাবের" উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আমাদের সর্বপ্রথম সংস্কৃত নাট্যাভিনয়কে সেজন্য সকলেই বিশেষ ভাবে অভি-নন্দিত করেন এবং সেজন্য প্রাচ্যবাণীকে বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হয়।

দ্বারকায় সংস্কৃত নাট্যাভিনয়।

পুণ্যভূমি দ্বারকায় এই আমাদের দ্বিতীয় আগমন। ২৩শে অক্টোবর ১৯৬৪ শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজার রাত্রিতে উন্মুক্ত আকাশের নিচে বসিয়া পূর্ণচন্দ্রের বিভাতে স্নাত অসংখ্য সুধী ভক্তজন যে ভাবে মহোৎসাহে পরমাদরে গভীর রাত্রি পর্যন্ত থাকিয়া

আমাদের "অমর-মীরম্" নাটক দর্শন করিলেন, তাহাতে আমরা পরম ধন্য বোধ করিলাম, যাহাকে শ্রমীরার অভিনয় করা ডাঃ যতীন্দ্রবিমলের বহুদিনের সাধ ছিল, আজ তাহা কি পূর্ণ হইল? যাহাকে শ্রদ্ধেয় শ্রীজগৎ প্রসাদজী ও তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্মিণার কত সভাই অপরিশোধ্য।

জামনগরে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়।

জামনগরেও আমাদের এই দ্বিতীয় আগমন। "সংস্কৃত সাহিত্য সংমেলনের" উদ্যোগে, সুবিখ্যাত ও সুবৃহৎ "টাউন হল" প্রেক্ষাগৃহে ২৫শে ও ২৬শে অক্টোবর ১৯৬৪, আমাদের দুইটি নাট্যাভিনয় বিগত বৎসরের অপেক্ষাও অধিকতর সর্বজনপ্রিয় হইল শ্রীভগবানের অশেষ কৃপায়। উভয় দিনই সুবৃহৎ প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ ছিল এবং পরম শ্রদ্ধেয় ধর্মগুরু শ্রীমৎ শান্তিপ্রসাদজী মহারাজ সশিষ্য সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে নাটক এবং অভিনয়ের অত্যুচ্চ প্রশংসা-পূর্বক আমাদের আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিলেন শ্রীমৎ শান্তি-প্রসাদজী, সুবিখ্যাত সন্ন্যাসী শ্রীমৎ প্রেমভক্তজী, সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত অধ্যক্ষ ডি, কৌণ্ডিন্য, মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ এস্, এন্, সেন, সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদ কলেজের ডেপুটি ডিরেক্টার শ্রীবি. ডি. শর্মা এবং সুবিখ্যাত শিল্পপতি শ্রীপ্রফুল্লাল শা। শ্রীমৎ প্রেমভক্তজী আবেগভরে বলিলেন যে, সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি এই প্রথম পাবলিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিলেন এবং অভিনয় দর্শনে অন্তরে অশ্রুপাত করিয়াছেন। শুনিয়া আমরা পরম কৃতার্থ বোধ করিলাম। শ্রীবি, ডি, শর্মা প্রাচ্যবাণী ও ডাঃ যতীন্দ্রবিমলের স্তুতিমূলক একটি সুন্দর সংস্কৃত কবিতা লিখিয়া আমাদের উপহার দিলেন। এত-দ্ব্যতীত শ্রীমৎ শান্তিপ্রসাদজী, শ্রীপ্রফুল্লাল শা প্রভৃতি প্রাচ্যবাণীকে বহু পুরস্কারাদি দান করিলেন। আমাদের চিরবন্ধু ডাঃ নিমাই রায়, ডাঃ উর্মিলা সেন, ডাঃ অরুণ মৈত্র প্রভৃতির নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁহারা সকলেই আমাদের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই।

অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন পণ্ডিত শ্রীমনাথশরণ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীসুশীল ধাম, শ্রীমনীন্দ্রসুন্দর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনরেন দে, শ্রীমতী উর্মিমালা চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী রমা চক্রবর্তী। শ্রীপূর্ণেন্দু রায় সঙ্গীত এবং শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী তবলা সঙ্গত করেন। পরম শ্রদ্ধেয়া "দিদিমণি" শ্রীমতী উষা গুহের সর্ববিধ সাহায্য ব্যতীত আমাদের এই সফর সম্ভবপরই হইতনা। দ্বারকা ও জামনগরে সেইখানকার সুবিখ্যাত গায়ক শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদজী আমাদের অভিনয়ের সংস্কৃত সঙ্গীতগুলি অতি-সুন্দর ভাবে গান করিয়া আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

উপসংহার

এইবারের সাংস্কৃতিক সফরে যে অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ হইয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়জনক; কারণ এইবারে যে হইল আমাদের "শিবহীন যজ্ঞ"। হয়ত এই জন্যই আমরা প্রতি পদে পদে এরূপ অকুণ্ঠ সাহায্য, সহযোগিতা ও সহা-নুভূতি লাভে ধন্য হইলাম। রাজস্থানের পরম শ্রদ্ধেয় রাজ্যপাল ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ জয়পুরের সভায় আবেগ ব্যাকুল কণ্ঠে ডাঃ রমাকে বলিয়াছিলেন—"মাত্র তিন মাসও গত হয় নাই—অন্য যে কোনো পত্নী এই অবস্থায় ঘরে বসিয়া কাঁদিত। কিন্তু ডাঃ রমা সুদূর পশ্চিমবঙ্গ হইতে পতির শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহারই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য দলবল সহ এতদূরে চলিয়া আসিয়াছেন। সেজন্য সমগ্র দেশ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু তিনি ত একাকিনী নন—আমরা সকলেই তাঁহার পশ্চাতে রহিয়াছি।" প্রতি-স্থানেই আমরা এই একই কথার প্রতিধ্বনি শুনিলাম। সত্যই "প্রাচ্যবাণী" মরিবেনা। ডাঃ যতীন্দ্রবিমলের প্রাণ-প্রতিম "প্রাচ্যবাণী" তাঁহারই চির অমর প্রাণে চিরকাল প্রথমিত হইয়া থাকিবে; তাঁহারই দ্বিতীয় বিগ্রহ ডাঃ রমার স্নেহ পরিচর্যায় চিরকাল লীলায়িত হইয়া থাকিবে; দেশবাসিগণের সাগ্রহ সাহায্য চিরকাল পুষ্পিত হইয়া থাকিবে। পরমা জননী সেই আশীর্বাদই করুন।

সুনীতি ও দুর্নীতি

শ্রীজ্ঞান

শিক্ষার প্রচলন যে আমাদের দেশে ব্যাপকভাবেই বেড়ে চলেছে একথা বলা চলে স্কুল-কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর অবিরাম ভীড় দেখে। কিন্তু বিদ্যালয়ে ছাত্রের ভীড় যেমন রয়েছে, শিক্ষাও কি তারা তেমনি পাচ্ছে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়—না, তা পাচ্ছে না। তোমাদের মধ্যেও অনেকেই হয়ত আমার কথায় সায় দেবে। কেননা তোমরাও, যারা সত্যকার শিক্ষা লাভের জন্য বিদ্যালয়ে যাতায়াত করছ, তারা নিশ্চয়ই বুঝছ যে শিক্ষা যে ভাবে দেওয়া উচিত, যে ভাবে পাওয়া উচিত—তা ঠিক সে ভাবে হচ্ছে না। আগেকার তুলনায় শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা নেওয়ার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে স্বীকার করি। কিন্তু সে পরিবর্ত্তনে ছাত্র সমাজে কতটা উপকৃত হয়েছে তা ভাবনার অবকাশ রাখে। তাছাড়া যুদ্ধোত্তর এই আধুনিক যুগে মানুষের মনেরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হয়েছে। মনের এই পরিবর্ত্তন ঘটানর জন্য প্রধানতঃ দায়ী দেশের রাজনৈতিক অবস্থা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে নানা রকমের রাজনৈতিক মতবাদের প্রচারে ও প্রসারে প্রভাবিত হয়ে পড়েছে দেশের সাধারণ মানুষও। আর তার থেকে শিক্ষক ও ছাত্র সমাজও বাদ পড়ে নি। বিদ্যালয় বিদ্যাচর্চ্চার স্থান, শিক্ষা লাভের ও শিক্ষা বিতরণের পীঠস্থান—এইটাই হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকালকার অনেক বিদ্যালয়ই যেন হয়ে উঠেছে রাজনীতি-চর্চ্চার শিক্ষায়তনে ও তথাকথিত নেতা তৈরীর কারখানা! শিক্ষার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক কতটা এবং তা আদৌ থাকা উচিত কি না, সে তর্কের মধ্যে না গিয়েও এই কথা বলা চলে যে বিদ্যার্জ্জনের সময় শিক্ষার্থীর অন্য দিকে মন না দিয়ে একাগ্রমনে বিদ্যাশিক্ষাই করা উচিত। অবশ্য উচ্চশিক্ষার্থী রাজনীতি-বিজ্ঞানের ছাত্রদের রাজনীতির আলোচনা করা আবশ্যক নিশ্চয়ই, কিন্তু তাই বলে হৈ-হুল্লোড়ে মেতে বিদ্যার্জ্জনে ব্যাঘাত ঘটান উচিত নয় কোন মতেই। তাছাড়া নীতিগতভাবে বিদ্যালয়ে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ না ঘটাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাতো ঘটছেই, তার ওপর রাজনৈতিক দলভুক্ত অনেক শিক্ষকও এই ব্যাপারে ইন্ধন যোগাচ্ছেন এবং শিক্ষকদের আগ্রহে ছাত্ররাও অনুপ্রাণিত হয়ে উঠছে। কিন্তু ছাত্রদের ওপর এর প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে উঠতে যে পারে, এ সম্বন্ধে শিক্ষকের মহান দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অবশ্যই জ্ঞান থাকা উচিত। ছাত্রদেরও এইসব রাজনৈতিক আন্দোলন ও ক্রিয়াকলাপ থেকে দূরে থাকাই উচিত। আর তাদের মেনে চলা উচিত একটা সুনির্দ্দিষ্ট নীতিকে। সে নীতি হল শিক্ষার্থীর পবিত্র দায়িত্ব পালন করা, বিদ্যালয়ের পবিত্রতা রক্ষা করা, পবিত্র মনে শিক্ষাগুরুর আদেশ পালন করা এবং সর্ব্বতোভাবে বিদ্যালয়ের দুর্নীতি দমন করা। বিদ্যালয়ের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ থাকলে ছাত্রদের মনও প্রফুল্ল

ও পবিত্র থাকবে, বিদ্যালয়ও সুষ্ঠুভাবে গড়বে, দুর্নীতির জায়গায় সুনীতিই তোমাদের মনে বাসা বাঁধবে। তার ফলে তোমাদের বিবেক জাগ্রত হয়ে বুদ্ধিকে বর্দ্ধিত করবে, উচিত-অনুচিত বুঝতে শিখবে, মানসিক দৃষ্টিশক্তিও স্বচ্ছ হয়ে উঠে তোমাদের চিনিয়ে দেবে কে তোমাদের প্রকৃত বন্ধু, কে তোমাদের শুভানুধ্যায়ী; আর কে তোমাদের অনিষ্টকারী, স্বার্থান্বেষী, ধর্মপাকানো শত্রু! সভাকার জ্ঞানলাভেচ্ছু, উন্নতমনা, কর্তিবান ছাত্রদের ওপর তাই আর এক দায়িত্ব এসে পড়েছে—তা হচ্ছে জ্ঞানের পীঠস্থান বিদ্যালয়কে দুর্নীতিমুক্ত করা ও সহাধ্যায়ীগণকে এই দুর্নীতির প্রভাব থেকে রক্ষা করে সুস্থ সবল ছাত্রসমাজ গঠন করা। আশা হয় সুনীতিপরায়ণ ছাত্রেরা এ বিষয়ে অগ্রণী হয়ে দেশের বিপথগামী ছাত্রসমাজকে রক্ষা করে বিদ্যালয়ের সুস্থতা ও পবিত্রতা ফিরিয়ে আনবে এবং শিক্ষা-ব্যবস্থাকেও সুষ্ঠু করে তুলবে।

***

চার্লস্ ডিকেন্স্

রচিত

অলিভার্ টুইষ্ট্

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এমনিভাবে সুদূর মফঃস্বলের অনাথ-আশ্রম থেকে অজানা-অচেনা লণ্ডন শহরে পালিয়ে এসে অসহায় অলিভারের বরাতে ফ্যাগিনের এই আজব আড্ডায় আশ্রয় জুটলেও, দুর্ভোগ কিন্তু ঘুচলো না। কারণ, বুড়ো হলেও, ফ্যাগিন আসলে ছিল—শহরের পাকা বদমায়েশ চোর-বাটপাড় আর পকেটমারদের এক দলের সর্দার···কপালের ফেরে সরল কিশোর বেচারী সরাসরি পড়লো পাকা ওস্তাদ সেই ফ্যাগিনের খপ্পরে। ফ্যাগিনের আড্ডায় অলিভারের মতোই আরো অনেক দুঃখী-গরীব অনাথ অসহায় ছেলেমেয়ে ছিল ওস্তাদ ফ্যাগিনের সাকরেদ। তাদের সঙ্গে ফ্যাগিন পাঠালো অলিভারকে শহরের পথে—চুরি-বিদ্যার কলকৎ শিখতে। অর্থাৎ অলিভারেরই সমবয়সী আড্ডার আরো ক'জন ছোকরা পকেটমারদের সঙ্গে সঙ্গে রেখে হাত সাফাইয়ের কায়দা কেরামতীতে তাকে তালিম দিয়ে দুদিনেই রীতিমত পাকা-পোক্ত সাকরেদ বানিয়ে তুলবে—এই ছিল ফ্যাগিনের মতলব।

কাজেই সর্দারের ফন্দীমতো সরল অসহায় অলিভারকে সঙ্গী করে শহরের পথে বেরিয়েই ফ্যাগিনের সাকরেদ ছোকরারা সদলে গলির মোড়ে এক বইয়ের দোকানে সেঁধিয়ে নিপুণ কারদায় হাত সাফাই করে আচমকা দোকানের খদ্দের এক প্রবীণ ভদ্রলোকের পকেট থেকে সরালো টাকার থলি! তারা ছিল রীতিমত পাকা-পোক্ত পকেটমার···পকেট মেরেই তারা দিলে চোঁ-চা চম্পট··· ব্যাপার দেখে ভয়ে ঘাবড়ে গিয়ে ধরা পড়লো নিরীহ অলিভার বেচারী।

ধরা পড়ে সরল অসহায় অলিভার বেচারীর দুর্ভোগের আর অন্ত নেই···পুলিশের হাতে লাঞ্ছনা···থানার গারদে নরক-যন্ত্রণাভোগ···তারপর আদালতে বিচার। এমন কি বিচারের সময় আদালতের আশেপাশে কোথাও বুড়ো-সর্দার ফ্যাগিন কিম্বা তার সাকরেদ ছোকরাদের কাকেও চোখে দেখতে পাওয়া গেল না···যেন যাদু-মন্তরে কর্পূরের মতো বেবাক উবে গেছে তারা সবাই!

আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় নাবালক অলিভারকে দেখেই হাকিম তো মহা-খাপ্পা···রাগে ধমক দিয়ে বললেন, —এই কচি বয়সেই হাত সাফাইয়ের কারসাজিতে এমন পাকা ওস্তাদ হয়ে উঠেছ হতভাগা!···কড়া শাস্তি না দিলে শায়েস্তা হবে না এ সব পাজী বদমায়েশ ছোকরারা! ···এদের দৌরাত্ম্যে শহরের শান্তি গেছে ঘুচে!···ডাকো দেখি···কে আছে এ মামলার সাক্ষী!

হাকিমের হুকুমে আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে

দাঁড়ালো—সেই বইয়ের দোকানের মালিক দোকানদার। দোকানদার চুরির সময় দূর থেকে ব্যাপারটা আগাগোড়া লক্ষ্য করেছিল···আদালতে সবাইকার সামনে দাঁড়িয়ে সে সাক্ষী দিলে—অলিভার নিরপরাধ···পকেট মেরেছে অলিভারেরই সমবয়সী অন্য আরেকটি ছোকরা!

দোকানদারের কথায় হাকিমের সন্দেহ কিন্তু ঘুচলো না···তিনি অলিভারকে ধমক দিয়ে শুধোলেন,—সত্যি কথা খুলে বল্ সব···নইলে তোর নিস্তার নেই!

হাকিমের হুমকীতে অলিভার লোকজনের ভীড়ে ঠাসা আদালতে নিজের দুর্ভাগ্যের কাহিনী খুলে বললো আগাগোড়া। আদালতে চুরির এই মামলা শুনতে সেদিন সহরের যে সব কৌতূহলী লোকজন এসেছিলেন, তাঁদেরই ভীড়ের মধ্যে ছিলেন মিঃ ব্রাউনলো নামে লণ্ডনের এক সৌখিন সম্ভ্রান্ত বিত্তশালী প্রৌঢ় ভদ্রলোক। অলিভারের দুঃখ-দুর্দশার করুণ কাহিনী শুনে ব্রাউনলোর মনে জাগলো দয়া···হাকিমকে অনুরোধ জানিয়ে অসহায় অনাথ অলিভারকে আদালতের নাগপাশ থেকে মুক্ত করে সদাশয় ব্রাউনলো সরাসরি সেই সরল কিশোরকে তাঁর নিজের প্রাসাদোপম ভবনে এনে আশ্রয় দিলেন···স্নেহে-যত্নে নিজের ছেলের মতোই বেচারী অলিভারকে সেখানেই সারাক্ষণ কাছে কাছে রেখে মানুষ করে তুলবেন—এই তাঁর সঙ্কল্প। সদাশয় ব্রাউনলোর কৃপার-ছোঁয়াতে এতদিনে অলিভারের দুর্ভোগ দুর্দশা ঘুচলো···জীবনে সে এই প্রথম মমতা ভালোবাসার মধুর স্পর্শ আর শান্তি-সুখের পরিচয় পেলো। শুধু খাওয়াদাওয়া,পোষাক-পরিচ্ছদ,যত্ন পরিচর্যা আর স্বাচ্ছন্দ্য-সুখের সুব্যবস্থাই নয়, নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাউনলো ভালো মাষ্টার রেখে নাবালক অলিভারকে লেখাপড়া শেখানোরও বন্দোবস্ত করলেন। এমনিভাবে ব্রাউনলোর স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয়লাভ করে অনাথ অসহায় অলিভারও পরম নিশ্চিন্তে সেখানেই মানুষ হতে লাগলো।

কিন্তু বরাত নিতান্তই মন্দ···কাজেই এতখানি সৌভাগ্য সুখ অলিভারের টিঁকলো না বেশী দিন···ক'দিন বাদেই, হুমকা ঝড়ের মতো কোথা থেকে আচমকা ঘনিয়ে এলো—দুর্ভাগ্যের একরাশ গাঢ় কালো মেঘ।

নতুন আশ্রয়ে অলিভার তখন সবেমাত্র নিশ্চিন্ত সুখে বসবাস শুরু করেছে এমন সময় ঘটনাচক্রে হঠাৎ একদিন সেখানে বেড়াতে এলেন—ব্রাউনলোর প্রিয়বন্ধু মিঃ গ্রিমউইগ। গ্রিমউইগ ছিলেন বিচক্ষণ আইনজ্ঞ···সংসারে অনেক কিছু দেখেছেন আর অনেক দুঃখ সহেছেন··· কাজেই সহজে কাউকে বড় একটা বিশ্বাস করতেন না তিনি। আলাপ আলোচনা প্রসঙ্গে ব্রাউনলোর মুখে অলিভারের কাহিনী শুনে গ্রিমউইগ তাঁর বন্ধুকে হুঁশিয়ার করলেন যে অথানা অচেনা পথে কুড়িয়ে আনা এসব ছেলেকে দয়া না দেখিয়ে বাড়ী থেকে দূর করে দেওয়া উচিত। কারণ, এরা হলো—আসলে কাল-সাপ···দুধ-কলা দিয়ে যত্ন আদরে পোষ মানালেও, আচমকা কখন যে বিষের ছোবল বসিয়ে দেবে, তার কোনো হদিশ মেলে না! কাজেই এ সব ছেলেকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভালো···বাড়ীতে রাখলে অনর্থ ঘটবে শেষ পর্যন্ত!

ব্রাউনলো কিন্তু বন্ধুর কথায় কর্ণপাত করলেন না··· বরং তিনি মৃদু হেসে প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন,—লোকচরিত্র আমিও কিছু কিছু বুঝি হে, গ্রিমউইগ!···অলিভারের মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি—এ ছোকরা নিতান্ত বাজে বদমায়েশ নয়···ঠিকমতো শিক্ষা আর যত্নের সুযোগ পেলে এ ছেলেটিও একদিন যথার্থ মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারবে···সে কথা তোমায় আমি হলফ্ করে বলতে পারি।

ব্রাউনলোর কথা শুনে গ্রিমউইগ অবিশ্বাসভরে হেসে বললেন,—বেশ তো দুদিন বাদেই মিলিয়ে দেখো···তোমার ধারণা ঠিক, না আমার ধারণা!···তখন নিজেই মর্মে-মর্মে বুঝবে—বন্ধুর উপদেশ অমান্য করার কি ফল!

দুই বন্ধুর এমনি আলাপ আলোচনার মাঝে সে ঘরে হঠাৎ কি যেন কাজে এসে হাজির হলো কিশোর অলিভার। অলিভারকে দেখেই গ্রিমউইগ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার পানে তাকালেন···সরল অলিভারও আচমকা নতুন মানুষ দেখে কেমন যেন ঘাবড়ে গেল। ঘরের কোণে কৌচের আসনে বসেই ব্রাউনলো তার শঙ্কিত সচকিত ভাবটুকু লক্ষ্য করলেন···সঙ্গে সঙ্গে সামনের টেবিলের উপর থেকে খান-কয়েক বই তুলে নিয়ে অলিভারের হাতে গুঁজে দিয়ে সোৎসাহে তিনি বললেন,—যাক্, ভালোই হলো··· তোমাকেই আমি খুঁজছিলুম হে, এতক্ষণ!···যাও দেখি, চট করে এই নতুন বই কখানা বাজারের মোড়ে বইয়ের দোকানে ফেরৎ দিয়ে এসো তো···আর সেই সঙ্গে নগদ

এই পাঁচ পাউণ্ড সাতটাও দোকানীকে দিও, আগের বার যে সব বই কিনেছিলুম, তার দরুণ বাকী পড়েছিল এ টাকাটা···হাত-নাগাদ চুকিয়ে দিলুম এই সঙ্গেই।

এই বলেই ব্রাউনলো তখনি তাঁর কোটের পকেট থেকে পাঁচখানা করকরে এক পাউণ্ডের নোট বার করে অলিভারের হাতে গুঁজে দিলেন। অলিভারও আর এতটুকু কাল-বিলম্ব না করে ব্রাউনলোর দেওয়া বই কখানা এবং টাকা হাতে নিয়ে সোজা ছুটলো বাজারে—বইয়ের দোকানের পানে···ঘরের চৌকাঠ পার হয়ে দালানের দিকে এগুতেই দূর থেকে তার কানে ভেসে এলো গ্রিমউইগের কড়া মন্তব্য···অলিভার স্পষ্ট শুনতে পেলো—বসবার-ঘরে গ্রিমউইগ তাঁর বন্ধু ব্রাউনলোকে বলছেন,—আমার কথা শুনলে না তো!···দেখো, এই ভুলের জন্যই তোমাকে শেষ পর্যন্ত পস্তাতে হবে!···তখন নিজেই হাড়ে-হাড়ে বুঝবে পথের ঐ অজানা-অচেনা হতভাগা ছোকরার উপর তোমার এমন অন্ধ বিশ্বাসের মূল্য কতটুকু!···বেশ ভালোই বুঝতে পারছি···ও ছোকরা আর সহজে এ-মুখো হচ্ছে না ···কড়কড়ে নগদ টাকা আর আনকোরা নতুন বইগুলো হাতে পেয়েছে···বাছাধন সটান চম্পট দিলো এ যাত্রা!

গ্রিমউইগের কড়া মন্তব্য শুনে অলিভার তো স্তম্ভিত!··· অকারণে তাকে এমন সন্দেহ···অবিশ্বাস!···মন তার দুঃখের ভারে ভারী হয়ে উঠলো!···সে ভাবলো—আর নেই, বাজারে বইয়ের দোকানে ছুটে যাবার···তার চেয়ে বরং এখনি বসবার-ঘরে গিয়ে ব্রাউনলোর হাতে নগদ টাকা আর নতুন বইগুলো ফিরিয়ে দিয়ে সে সটান্ এ বাড়ীর আরামের আশ্রয় ছেড়ে আগেকার মতোই পথে বেরিয়ে পড়বে···এখানকার এই সন্দেহ অবিশ্বাসের বিষবাষ্পে ভরা অসহ্য আবহাওয়ায় ঘর-বন্ধ হয়ে জীবন কাটানোর চেয়ে শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে দুর্ভোগ-কষ্ট সহে মুক্ত স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকা অনেক বেশী ভালো!···এই ভেবে ক্ষণেক ইতস্তত করেই সে যেমন বসবার ঘরের দিকে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে অলিভারের মনে হলো—গ্রিমউইগ তো বাইরের লোক···বন্ধু ছাড়া এ বাড়ীর আর কেউ তো নন···কাজেই বাইরের লোকের বাজে কথায় অনর্থক এতখানি বিচলিত হয়ে তার আসল আশ্রয়দাতা হিতাকাঙ্ক্ষী ব্রাউনলোর প্রতি এমন অন্যায় অবিচার করবে···অকারণে তাঁর মনে কষ্ট দেবে!··· ব্রাউনলো তো অলিভারকে সন্দেহ করেননি···এতটুকু অবিশ্বাস করেননি···বরং স্বেচ্ছায় সরল বিশ্বাসে সরাসরি তার হাতে সঁপে দিয়েছেন তিনি—নগদ এতগুলো টাকা আর আনকোরা নতুন এই সব বই! মনে-প্রাণে অলিভারকে ভালোবাসেন···স্নেহ করেন·· বিশ্বাস করেন বলেই তো ব্রাউনলো পরম নিশ্চিন্তে তার মতো নিতান্তই পরিচিত নাবালকের জিম্মায় এত টাকা আর এমন জরুরী কাজের দায়ীত্বভার তুলে দিয়েছেন! কাজেই ব্রাউনলোর এই বিশ্বাসের মর্যাদা বজায় রাখা অলিভারের সব চেয়ে বড় কর্তব্য।

এ কথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই অলিভার তার মনের বল ফিরে পেলো সোৎসাহে বইয়ের বাণ্ডিল আর নগদ টাকা হাতে নিয়ে সে তৎক্ষণাৎ বাড়ী থেকে বেরিয়ে সটান পাড়ি দিলো—বাজারের মোড়ে দোকানের পথে।

অলিভারের বরাত কিন্তু নিতান্তই মন্দ! এতদিন সে ছোট্ট মফঃস্বল-শহরেই জীবন কাটিয়েছে···মাত্র ক'দিন লণ্ডনে এসে বসবাস করলেও, এমন বিরাট শহরের পথ-ঘাট, দোকান-পাট কিছুই বিশেষ চিনতো না। কাজেই বাজারের মোড়ে বইয়ের দোকানের সন্ধানে অজানা অচেনা বিশাল শহরের বুকে ছড়ানো গোলোক-ধাঁধার মতো ছোট বড় একরাশ গলিঘুঁচি রাস্তা মাড়িয়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে অলিভার বেচারী কেমন যেন দিশেহারা হয়ে শেষ পর্যন্ত পথ হারিয়ে বসলো! কোন পথে যাবে···কোথায় সেই বাজার···কোনদিকেই বা বইয়ের দোকান—কিছুই ঠাওর করতে পারলো না!

[ক্রমশঃ

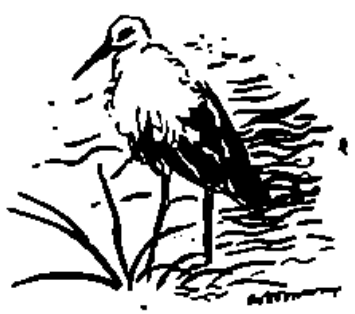

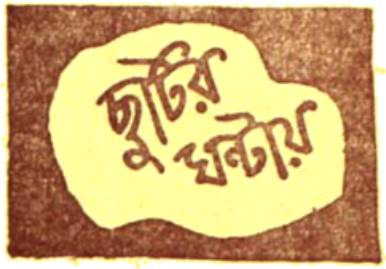

চিত্রগুপ্ত

সচরাচর চাষবাসের জমিতে, বাগানে বা ফুলের টবে, মাটির বুকে বীজ বা চারা পুঁতলে, প্রকৃতির স্বাভাবিক-নিয়মে সেই বীজ বা চারা থেকেই দিনে-দিনে ক্রমশঃ ফুলে ফুলে ফলন্ত গাছ গজিয়ে ওঠে—এমনটি ঘটতে তোমরা হামেশাই দেখছো। কিন্তু ধরো, এই স্বাভাবিক-নিয়মের বদলে, কেউ যদি হঠাৎ তোমাদের হাতে বেশ বড়সড় কিম্বা মাঝারি ছাঁদের খালি শূন্য একটি কাঁচের শিশি বা বোতল তুলে দিয়ে বলে বসেন যে—বাহাদুরী দেখিয়ে তারিফ আদায় করতে চাও তো, এক্ষুণি এই শূন্য খালি কাঁচের শিশি বা বোতলের ভিতরে মাটির কণামাত্রও ব্যবহার না করে···অর্থাৎ, সম্পূর্ণভাবে বিনা মাটিতে স্রেফ্ ভোজবাজীর ভেল্কীর মতো আজব কায়দায় বিবিধ জলজাত একটি ফল, ফুল কিম্বা শক্তীর গাছ গজিয়ে দাও দেখি !···তবেই বুঝবো, তোমাদের কেরামতীর দৌড় কতখানি দূরে পৌঁছুতে পারে। এ কথার জবাবে, তোমরা হয়তো হেসে বলবে,—পাগল হলেন নাকি !···এ কখনো সম্ভব !···

বাস্তবিকই, ব্যাপারটা নিতান্তই অসম্ভব ছিল এতকাল ···কিন্তু সম্প্রতি নানান্ পরীক্ষা-গবেষণার পর, আধুনিক বিজ্ঞানীরা এমন একটি অভিনব-বিচিত্র উপায়ের সন্ধান পেয়েছেন, যার ফলে—ভোজবাজীর ভেল্কীর মতো রহস্যময় বিজ্ঞানের আজব কলা-কৌশলে শুধু জল আর মাত্র কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে বিনা মাটিতেই সাধারণ একটি কাঁচের শিশিতে বা বোতলে দিব্যি অনায়াসেই সুন্দর সুন্দর হরেক রকমের ফল ফুল শক্তীর গাছ গজিয়ে তুলতে পারেন।

কথাটা শুনে তোমরা হয়তো অবাক হয়ে যাচ্ছো··· ভাবছো—এমন আজব-কাণ্ড ঘটানো সম্ভব হবে কেমন করে !···শোনো তাহলে···আজ তোমাদের এই আজব-কাণ্ড সম্ভব করে তোলার বিচিত্র অভিনব বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশলের আসল পরিচয় দিই। এ কলা-কৌশলটি শিখে এবং ঠিকমতো রপ্ত করে নিয়ে, ছুটির দিনে বাড়ীতে বসেই তোমাদের আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের সামনে বিনা মাটিতেই কেবলমাত্র কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে কাঁচের শিশি-বোতলে এমনি ধরণের আজব-মজার নানা রকম ফল ফুল শক্তীর গাছ ফলিয়ে খুব সহজেই তাঁদের সবাইকে রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারো। কাজেই, জেনে রাখো—বিজ্ঞানের এই আজব খেলার মোটামুটি কয়েকটি কায়দা-কানুন এবং সেই সঙ্গে তোমাদের নিজেদের নোট-বুকে টুকে নাও—এমনি ধরণের বিচিত্র কেরামতী দেখানোর জন্য টুকিটাকি যে সব সাজ-সরঞ্জাম আর রাসায়নিক-পদার্থ প্রয়োজন, সেগুলির প্রত্যেকটির নাম আর পরিমাণের হিসাব তালিকা। এই ধরণের আজব কেরামতী দেখানোর কায়দা-কানুন আয়ত্ত করা খুব কঠিন কাজ নয়···সামান্য চেষ্টা করলেই তোমরা অনায়াসেই এ কশরৎ দেখাতে পারবে। তবে সাজ-সরঞ্জাম আর রাসায়নিক পদার্থগুলির অধিকাংশই জোগাড় করতে হবে বাজারের ভালো মার্শারী বা বীজের দোকান কিম্বা ডাক্তারখানা থেকে কিনে এনে। সুতরাং কশরতীর কায়দা কানুনের কথা বলবার আগে, যে সব সাজ-সরঞ্জাম আর রাসায়নিক পদার্থগুলি সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন, আপাততঃ, তারই মোটামুটি পরিচয় দিয়ে রাখি।

ধরো, তোমাদের সখ হয়েছে বিনা মাটিতে কাঁচের বোতলে লঙ্কা-গাছ ফলানোর। এমনিভাবে লঙ্কা-গাছ এবং সে গাছে ফল ফলাতে হলে, তোমাদের সংগ্রহ করা দরকার—৪৮২পৃষ্ঠার ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি ধরণের বড় বা মাঝারি সাইজের একটি কাঁচের বোতল, সেই বোতলের মুখে ছিপি-হিসাবে চাপা দেবার উপযোগী এক টুকরো বেশ পুরু-মজবুত কার্ডবোর্ড, একখানি কাঁচি, একপাত্র নির্মল জল এবং সচরাচর ইস্কুল-কলেজে বিজ্ঞানের ক্লাশে বা ল্যাবরেটারীতে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা রাসায়নিক পরীক্ষা গবেষণার কাজের জন্য একদিকটি ঈষৎ

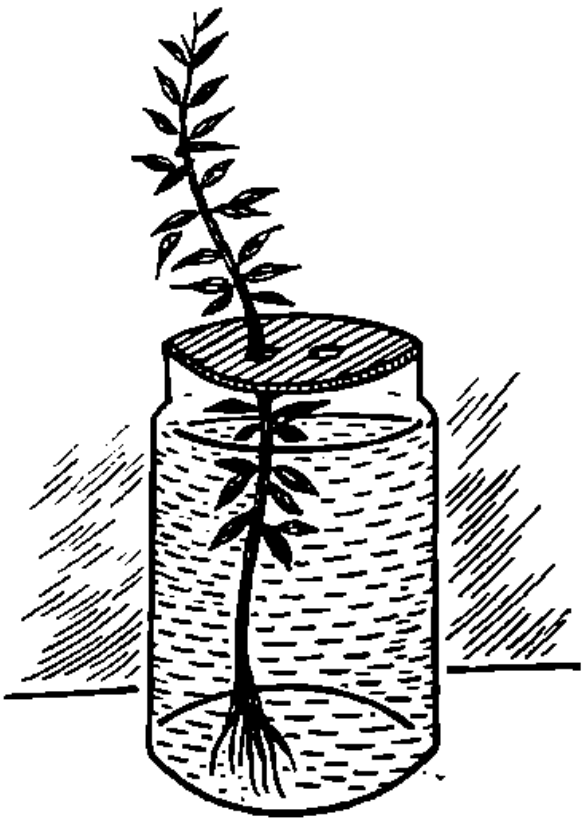

যাঁরা এ যে ধরণের ফাঁপা কাঁচের নল ব্যবহার করেন, ঠিক তেমনি ধরণের একটি জিনিস। এছাড়া চাই—নীচের কষ্করতো পরিমাণে বিশেষ কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ··· অর্থাৎ :—

(১) ক্যাল্‌সিয়াম্ নাইট্রেট্ (Calcium Nitrate)—২ গ্রাম।

(২) পটাশিয়াম্ নাইট্রেট্ (Potassium Nitrate)—২ গ্রাম।

(৩) পটাসিয়াম্ ফস্‌ফেট (Potassium Phosphate)—২ গ্রাম।

(৪) ম্যাগ্‌নেসিয়াম্ সাল্‌ফেট্ (Magnesium Sulphate)—১ গ্রাম।

(৫) ফেরিক্ অক্সাইড্ (Pheric Oxide)—½ গ্রাম

উপরের কষ্করতো এ সব সাধ্য-সরঞ্জাম এবং রাসায়নিক পদার্থগুলি সংগ্রহ হবার পর, আজব প্রথায় বিনা মাটিতে কাঁচের বোতলে লঙ্কা-গাছ ফলানোর কায়দা-কানুন আয়ত্ত করার পালা। সে পালা শুরু করতে হবে—প্রথমেই পরিষ্কার জল দিয়ে কাঁচের বোতলটিকে আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে ধুয়ে নিয়ে। বোতলটিকে ধুয়ে সাফ্ করে নেবার পর, কাঁচির সাহায্যে কার্ডবোর্ডের টুকরোটিকে বেশ পরিপাটিভাবে বোতলের মুখের ফাঁদের মতো আগাগোড়া গোল-চাকতির ছাঁদে ছাঁটাই করে নাও এবং ছাঁটাই করা সেই কার্ডবোর্ডের চাকতির মাঝখানে, উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি ধরণে পাশাপাশি এক লাইনে কাঁচের নল এবং গাছের চারা প্রবেশের উপযোগী আলাদা আলাদা দুটি ফুটো বা গর্ত (Hole) রচনা করো। এ কাজ সারা হলে, বোতলের প্রায় ½ অংশ জল দিয়ে ভরাট করে, সেই জলে একের পর এক উপরোক্ত রাসায়নিক পদার্থগুলিকে মিশিয়ে, বোতলটিকে হাতে তুলে ধরে কিছুক্ষণ সজোরে ঘুরিয়ে ক্রমাগত নাড়াচাড়া ও ঝাঁকুনি দিয়ে, বোতলের 'মিশ্রণ-টুকুকে' আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে গুলে একাকার করে নাও।

এবারে 'তরল মিশ্রণ'-ভরা ঐ বোতলটিকে সমতল জমি বা টেবিলের উপর খাড়াখাড়িভাবে বসিয়ে রেখে, বোতলের মুখে কার্ডবোর্ডের গোল-চাকতিটি চাপা দিয়ে, উপরের ছবির ভঙ্গীতে চাকতির মাঝখানে রচিত দুটি গর্তের একটির মধ্যে দিয়ে বোতলের ভিতরে জলের তলায় প্রবেশ করিয়ে দাও ঐ লঙ্কার কচি চারাটির শিকড়ের প্রান্ত এবং অপর গর্তের ভিতর দিয়ে সেঁধিয়ে দাও কাঁচের তৈরী ফাঁপা নলের লম্বা-সোজা প্রান্তটি। অর্থাৎ, ঐ কাঁচের নলের বাঁকানো প্রান্তটি যেন বরাবর রাখা থাকে বোতলের মুখে-বসানো কার্ডবোর্ডের চাকতির উপরদিকের গর্তের বাইরে। কাঁচের নলটি এভাবে বসানোর আসল উদ্দেশ্য হলো—ফাঁপা-নলের ভিতর দিয়ে কার্ডবোর্ডের চাকতি ঢাকা বোতলের মধ্যে বাইরের উন্মুক্ত বাতাস সহজেই বোতলের অভ্যন্তরে জলে প্রবেশ করে গাছের কচি চারাটিকে সদা সজীব করে রাখবে।

এমনি উপায়ে লঙ্কার চারা এবং ফাঁপা নলটিকে সুষ্ঠু-ভাবে কাঁচের বোতলের ভিতরে বসিয়ে নেবার পর, বোতলটিকে বাড়ীর খোলা ছাদে, বারান্দায় কিম্বা জানলার কিনারে রেখে কয়েকদিন রোজ কিছুক্ষণ রৌদ্র বাতাসের স্পর্শ দিতে পারলেই দেখবে—বিজ্ঞানের বিচিত্র নিয়মে

সম্পূর্ণ মাটি-বিহীন অবস্থাতেই রাসায়নিক মিশ্রণ-ভর্ত্তি ঐ কাঁচের বোতলের চারাগাছটি ক্রমেই শুধু যে বড় হয়ে উঠছে তাই নয়, উপরন্তু সে গাছে লঙ্কাও ফলন্ত হচ্ছে রীতিমত স্বাভাবিক ধরণেই। তবে প্রসঙ্গক্রমে, বলে রাখা দরকার —দীর্ঘক্ষণ খুব প্রখর রৌদ্রের তাপে রাখলে, চারা গাছটি কিন্তু অচিরেই শুকিয়ে বিনষ্ট হতে পারে। কাজেই এমনি উপায়ে বিনা মাটিতে কাঁচের বোতলে গাছ ফলানোর সময়, এ সম্বন্ধে হুঁশিয়ার থাকা ও আবশ্যকমতো যত্ন নেওয়া সবিশেষ প্রয়োজন···না হলে সব প্রচেষ্টাই কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নিষ্ফল পণ্ডশ্রম হয়ে দাঁড়াবে।

এবারের মতো এখানেই আলোচনা শেষ করলুম। আগামী সংখ্যায় বিজ্ঞানের আরেকটি বিচিত্র অভিনব মজার কারসাজির পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

—

মনোহর মৈত্র

১। পাথরের মূর্ত্তি সাজানোর

হেঁয়ালী ৪

রতনগড়ের রাজাবাহাদুর ভারী খেয়ালী-সৌখিন মানুষ···দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো আর নানান্ জায়গা থেকে নানা রকম সুন্দর-সুন্দর জিনিষ কিনে এনে রাজবাড়ী, বাগান সাজানো তাঁর রীতিমত বাতিক। সেবারে তিনি জয়পুরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে আসবার সময়, তিনি মোটা টাকা খরচ করে কিনে আনলেন বারোটি অপরূপ-সুন্দর পাথরের মূর্ত্তি। রতনগড়ের প্রাসাদে পদার্পণ করেই তিনি প্রবীণ দেওয়ানজীকে ডেকে পাঠালেন···বললেন,—বাগান সাজানোর জন্য জয়পুরের কারিগরদের তৈরী এই বারোটি পাথরের মূর্ত্তি এনেছি। লোকজনদের ডেকে এখুনি হুকুম দাও···রাজবাড়ীর সামনের ঐ বাগানে বারোটি এই জয়পুরী পাথরের মূর্ত্তিকে এমন কায়দায় সাজাতে হবে যে মূর্ত্তিগুলি যেন আগাগোড়া ছয়-সারিতে থাকে এবং প্রত্যেক সারিতে যেন বসানো হয় চারটি করে মূর্ত্তি!···রাজাবাহাদুরের ফরমাস শুনে দেওয়ানজী পড়লেন মহা ফাঁপরে! রাজাবাহাদুর বললেন,—যাও—সাতদিন মাত্র সময় দিলুম—এরই মধ্যে বারোটি মূর্ত্তিকে যেমনভাবে বলেছি, ঠিক তেমনিভাবে সাজিয়ে দেওয়া চাই—নাহলে তোমার গর্দ্দান নেবো!

রাজাবাহাদুরের কড়া মেজাজের কথা দেওয়ানজী ভালো করেই জানতেন। কাজেই ভয়ে তাঁর আহার-নিদ্রা ঘুচে গেল—দিন-রাত কেবল ভাবেন—কিন্তু কোনো উপায়ই মেলে না। এমনি ভাবনায় চিন্তায় আকুল হয়ে তাঁর পাঁচদিন কেটে···মাত্র আর দু'দিন বাকী! এমন সময় ঘটনাচক্রে বিদেশে গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষার পালা শেষ করে দেওয়ানজীর বুদ্ধিমন্ত ছেলে হঠাৎ বাড়ী ফিরে এলো। বাড়ীতে পৌঁছেই দেওয়ানজীর এই জীবন মরণ সমস্যা দেখেই ছেলের মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো—সে তখনি একখানা পুঁথির পাতা হাতে নিয়ে তার উপর কালির আঁচড় টেনে মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে চটপট কি যেন কয়েকটা বিন্দু আর রেখার বিচিত্র ছক এঁকে ফেললো—তারপর হেসে সেই বিন্দু আর রেখার আঁচড় টানা পুঁথির পাতাখানা তার বাবার হাতে সঁপে দিয়ে সোৎসাহে বললে,—মিথ্যে আর দুশ্চিন্তা করো না—এই যে ছক এঁকে দিয়েছি, ঠিক এমনি কায়দায় আগাগোড়া ছয়টি সারিতে বারোটি পাথরের মূর্ত্তি বাগানে সাজাতে বলো—তাহলেই প্রত্যেক সারিতে চারটি করে মূর্ত্তি সাজানো থাকবে!—এভাবেই অনায়াসে হবে এই হেঁয়ালির মীমাংসা! বুদ্ধিমন্ত ছেলের কথামতো দেওয়ানজী অবিলম্বে লোকজনদের বাগানে পাথরের মূর্ত্তিগুলিকে সাজাতে হুকুম দিলেন—রাজাবাহাদুর দেখে বললেন,—হ্যাঁ, যেমনটি বলেছিলুম, হুবহু তেমনটি হয়েছে! এ কাজের জন্য রাজকোষ থেকে তোমাকে পুরস্কার দিলুম—নগদ একলক্ষ সোনার মোহর!—

যাই হোক, বুদ্ধিমন্ত ছেলের বুদ্ধির দৌলতে দেওয়ানজীর তো বিপদ কাটলো সে যাত্রা! কিন্তু তোমরা যদি বুদ্ধি খাটিয়ে এক টুকরো কাগজে কালির আঁচড় টেনে এঁকে

দেখাতে পারো—এ হেঁয়ালির সঠিক মীমাংসা, তাহলে বুঝবো যে দেওয়ানজীর ছেলের মতো তোমরাও রীতিমত বুদ্ধিমন্ত হয়ে উঠেছো আজকাল! আচ্ছা তো চেষ্টা করে —এ হেঁয়ালির সঠিক ছক এঁকে পাঠাতে পারো কিনা!

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

২। আমি এক জাতের পাখী—সুমধুর সুরে গান গাই। আমার নামের প্রথম আর তৃতীয় অক্ষর মিলিয়ে ভারতের বিশেষ একটি ধর্মাবলম্বীদের বিশিষ্ট এক উৎসব বোঝায়। বলো তো, আমার নাম কি?

রচনা : অশোক, গৌতম, কল্পনা ও নীতা

গতমাসের ধাঁধা ও হেঁয়ালীর উত্তর :

১। নীচের নক্সাটি দেখলেই ছয়টি দেশলাই কাঠি কিভাবে সাজাতে হবে, তার সুস্পষ্ট হদিশ মিলবে।

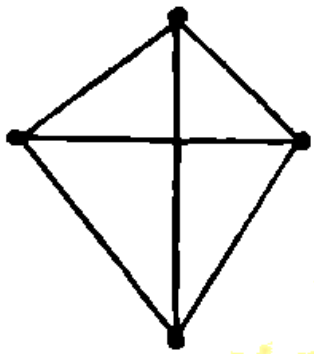

২। কাজল

৩। নিশাচর

গতমাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

হিরণ্ময়ী ও কল্যাণী দেবশর্ম্মা (কলিকাতা), রবি ও রিনি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), সত্যেন, মুরারি, সুনীল ও সঞ্জয় (ডিমাই), কুলু মিত্র (কলিকাতা), টাবলু, চাবলু, ঘুমা ও পুতুল (হাওড়া), বাপি, বৃতাম ও পিন্টু গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই), বাপ্পা ও শিবাজী রায় (কলিকাতা), হারাণচন্দ্র ইতাংশু ও হিমাংশু মুখোপাধ্যায় (শিলিগুড়ি)।

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

মিঠু ও বুবু গুপ্ত (কলিকাতা), রীতু ও রবি দাশগুপ্ত (কলিকাতা), দেববর বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্যাঙ্গালোর), সন্ধমিত্রা ও শর্মিষ্ঠা রায় (কলিকাতা), রাহু ও বেণু ঘোষাল (উত্তরপাড়া), অর্চ্চি, ছোটন ও পাপু (কলিকাতা), বিনয়েন্দ্র ও বিনয়েন্দ্র সিংহ (হাজারীবাগ), অরিন্দম, গুতা, সোমা ও কল্পনা (বোড়াল), রাণা ও বুনা মুখোপাধ্যায় (চুঁচুড়া), শ্যামল ও অনীতা মজুমদার (আগ্রা), অমৃত, অমিয়, অভীন্দ্রনাথ ও প্রশান্ত (নিউ দিল্লী), শৈলেন ও সুজাতা সেন (পুরী), শমী, পুলু, বুবু ও মোহন চট্টোপাধ্যায় (পানাগড়), নীরেন, বীরেন, অরুণ ও রামবিহারী (আড়িয়াদহ), পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), নৃপেন, নলিন, নীহারিকা চট্টোপাধ্যায় (অন্ত্রেশ্বর), গৌতম, কল্পনা, অশোক, নীতা (কলিকাতা), নির্ম্মল মণ্ডল, দীনবন্ধু সাহা, মানব ঘোষাল (চুঁচুড়া)।

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

দেবকী ও বিশ্বনাথ সিংহ (গয়া), অজয় মিত্র (কলিকাতা), ক্ষেপু ও খজু গঙ্গোপাধ্যায় (রাণাঘাট) বুলবুল ও টুলটুল (কৃষ্ণনগর)।

বাদ্যযন্ত্রের কথা

দেবশর্ম্মা বিরচিত

অতি প্রাচীনকাল থেকে গান-বাজনা-নৃত্য আর নানা রকম লৌকিক উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আমাদের দেশে ঢোল, কাঁসর আর শানাই-বাঁশীর মুর্মুর সুরে গ্রামের আকাশ-বাতাস ... শ্যামল-শান্ত পরিবেশ নিত্যই আনন্দ-মুখরিত হয়ে উঠতো। এমনি বিচিত্র সুর-লহরী আজও আমাদের মন মাতিয়ে তোলে বটে, তবে ইদানীং বিলাতী-কায়দার 'মাইক-এম্‌প্লিফায়ার' আর হিন্দী সিনেমার গন্ডা-চটকদার গানের রেকর্ড বাজানোর উৎকট- ঝোঁকের উত্তরে বঙ্গনা-দেশের এই পরম-ঐশ্বর্য্য ক্রমশঃ জাতীয়-বৈশিষ্ট্যটুকু প্রায় লোপ পাবার দাখিল হয়ে উঠেছে এবং বিপুল বাদ্যকরেরাও দিন-দিন ক্রমেই তাদের কদর ও পৃষ্ঠপোষকতা হারাতে বসেছেন। কথাটা আজ সকলেরই ভাববার বিষয়।

●

বিচিত্র-ছাঁদের এই তার-যন্ত্রটি বাজিয়ে সুললিত সঙ্গীতের সুরঝঙ্কার সৃষ্টি করার রেওয়াজ ছিল প্রাচীন গ্রীস রাজ্যে। সেখানে এই ধরণের অভিনব তার-যন্ত্রগুলির নাম দেওয়া হয়েছিল 'LYRE' বা 'লায়ার'। এই সব বাদ্য-যন্ত্র গ্রীসের সুসভ্য-সৌখিন সমাজে একদা রীতিমত প্রসারের ও পরিশেষে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। পরবর্ত্তীকালে রোম-সাম্রাজ্যের ও রোমান সভ্যতার প্রসার-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গ্রীসের এই বিচিত্র 'লায়ার' যন্ত্রেরই অনুরূপ-ছাঁদে নির্ম্মিত আরেক ধরণের ছোট এবং বড় মাপের যে সব নতুন নতুন তার-যন্ত্রের প্রচলন হয়েছিল, তার পরিচয় পরে যথা সময়ে জানাবো তোমাদের। প্রসঙ্গক্রমে, বলে রাখা যায় যে প্রাচীন গ্রীসবাসীদের এই 'লায়ার' যন্ত্রের মিশরের সুসভ্য-উন্নত আদিম-অধিবাসীদের 'HARP' বা 'হার্প' তার-যন্ত্রের বিশেষ সাদৃশ্য চোখে পড়ে।

●

আরেক ধরণের বিচিত্র ছোট-ছাঁদের ঢোলের মতো বাদ্য আর অভিনব-গড়নের 'তাম্বুরিন' (TAMBOURINE) বা 'ডমরু-করতাল' জাতীয় বাজনা বাজিয়ে নোক-নৃত্য ও নোক-সঙ্গীত অনুষ্ঠানের রীতিমত রেওয়াজ চলে আসছে প্রাচ্য-ভূখণ্ডের চীনদেশে, বহু প্রাচীন কাল থেকে। ওদেশের সঙ্গীত-শিল্পীরা এ সব বাদ্য ব্যবহার করেন প্রচুরাচুর, বিশিষ্ট তাল-যন্ত্র হিসাবে। ঢোলের মতো ছাঁদের বাদ্য-যন্ত্রটির নাম — 'THE WAIST DRUM' বা 'কোমরে-ঝোলানো ঢাক'। এ নামেই এটি সাধারণতঃ পরিচিত ... তবে দক্ষিণ-চীনের অধিবাসীরা এ বাদ্যটিকে 'THE FLOWER DRUM' বা 'ফুল-ঢোল' নামে অভিহিত করেন। কারণ, এদেশের কারু এ বাদ্যটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় ও-অঞ্চলে। চৈনিক-ভাষায় এ বাদ্যটিকে বলা হয় 'YANGKO' বা 'ইয়াঙ্কো'। 'তাম্বুরিন' জাতীয় কুলকুলি বাদ্যটিও বহুকাল ধরে ওদেশী নোক-নৃত্য ও নোক-সঙ্গীতের অঙ্গসজ্জার উদ্দেশ্যে

ভারবাহী

শ্রীঅনিল মজুমদার

'সড়া গধা রে'

এ কথাটা যখনই মনে আসে তখনই হাসি।

রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলাম বাসের অপেক্ষায়। ফুটপাত বেয়ে চলেছিল একজন সাহেব। কোন্ জাতের তা জানি না, তবে সাহেব এটা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। সাহেবদের মতই রং, চাল চলনটাও অনেকটা তাই।

কোলকাতা সহরে সাহেব দেখা নতুন কিছু নয়। এমন দাদা কালো সাহেব রাস্তায় বেরুলে হাজারো গণ্ডা দেখতে পাওয়া যায়। তবে এর মধ্যে একটুখানি বিশেষত্ব ছিল।

সত্যিই অবাক হয়েছিলাম তাকে দেখে।

ভুল বললাম।

তাকে দেখে ঠিক নয়, তার পিঠের বোঝা দেখে!

দুটো বড় বড় কিট্‌ব্যাগ তার পিঠে চাপানো, তার সঙ্গে একটা হোল্ড-অল। এক হাত দিয়ে সেগুলোকে সে বেশ চেপে ধরে রেখেছে অন্যহাতে আবার একটি বিশাল-কায় স্যুটকেস।

আজব ব্যাপার!

এত বোঝা মানুষে বইতে পারে?

অবাক না হয়ে আর উপায় কি।

কিন্তু আমাকেও হার মানালে আমার পাশের সেই উড়িয়া মালিটি। আমি শুধু তাকে চোখ চেয়েই দেখ-ছিলাম, সে দেখি তার সঙ্গে আবার মুখখানাও খুলে রেখেছে।

যতক্ষণ সাহেবটি হেঁটে চলেছিল, ততক্ষণই তাকে দেখেছি। পরে যখন সে একটা গলিতে ঢুকে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল তখনই সেই উড়িয়া মালিটির সরস উক্তিটি কানে এল-'সড়া গধা রে'!

উপভোগ্য উপমা।

না হেসে উপায় নেই।

গাধা একটি ভারবাহী পশু তা আমরা সবাই জানি, বোকা বলেও তার একটা কুখ্যাতি আছে। তাই মানুষ বোকা হলেই তার সঙ্গে আমরা গাধার তুলনা করি।

কিন্তু যখনই গাধার কথা ওঠে তখনই আর একজনকে মনে হয়। সে হচ্ছে ধোপা।

স্বামীর সাথে যেমন স্ত্রী, এককালে গাধার সঙ্গে ধোপারও তেমনি একটা অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ছিল।

এই কোলকাতা সহরেই দেখেছি গাধার পিঠে দুটো বড় বড় কাপড়ের মোট চাপিয়ে তার ওপর ধোপা মহারাজ নিজে বসে দিব্যি ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে চলেছেন।

দেখে কেউ কোনদিন অবাক হয়নি, কারণ সে ছিল সেদিনের একটি সাধারণ ঘটনা।

ধোপার বাড়ী চিনতেও কারও কোনদিন কোন অসুবিধা হয়নি। কারণ বাড়ীর সামনেই গাধা বাঁধা। সেই ছিল তার বাড়ীর নম্বর বিশেষ।

ধোপার স্ত্রীকেও দেখেছি তার নিজের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে সেই গাধাটিকেও সমভাবে পরিচর্যা করতে। তাকে কাছে রাখতে এমনিতে তেমন কোন অসুবিধা ছিল না, শুধু আশে পাশের লোকেরা মাঝে মাঝে একটুখানি বিরক্তি বোধ করতো—গাধা বাবাজী যখন মাঝে মাঝে নিজের খেয়ালে একটু আধটু গলা সাধতো।

এই গাধা-ধোপার সম্বন্ধ নিয়ে সেকালে একটা ফিল্মও দেখেছিলাম। কোথায় কবে তা বলতে পারবো না। তবে গল্পটা বেশ মনে আছে।

এক ধোপা রাজবাড়ীর কাপড় কাচতো এবং সেই-সূত্রে তার রাজবাড়ীতে ছিল অবাধ-গতিবিধি। রাজা-মহারাজদের কাণ্ড যা হয়, সে সে সব নিজের চোখেই দেখতো—আর মনে মনে ভাবতো—'আহা, একদিন যদি রাজা হতে পারতাম'!

এই কথা ভাবতে ভাবতেই একদিন সে তার নিজের ঘরের খড়ের গাদায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে এবং সেই সঙ্গে

স্বপ্ন দেখে সে রাজা হয়েছে এবং রাজপ্রাসাদেই রয়েছে। আর তার মনোরঞ্জনের জন্যে প্রায় শতখানেক সুন্দর সুন্দর মেয়ে তার আশে পাশে নেচে গেয়ে বেড়াচ্ছে।

ধোপাটির তখন বড় কঠিন অবস্থা। কি যে করবে তা ভেবেই পায় না। শুধু ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত তার মনোমত একটি মেয়েকে বেছে নিয়ে তাকে ডেকে তার কাছে বসালে এবং তার পর যখনই তার গলা ধরে একটু ভাব করতে যাবে অমনি তার ঘুম ভেঙ্গে গেল!

চেয়ে দেখে ঘুমের ঘোরে সে তার প্রাণের সাধাটিরই গলা জড়িয়ে ধরেছে, আর সেও প্রভুর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে মনের খুশীতে তার সাধা গলায় গান জুড়ে দিয়েছে।

বেচারা!

এমন মধুর সম্বন্ধ কিন্তু এখন ঘুচে গেছে।

গাধার চাকরি গেছে। সে এখন বেকার। এমপ্লয়-মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়েছে কিনা জানিনা। চোখেও আর তাকে দেখিনা।

উপায় নেই।

খেটে খাওয়ার যুগ নয় এটা, এ হচ্ছে ঘর যুগ।

ঘরই এসে পশুর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে। মানুষও বাদ পড়ছে না। যা অবস্থা দাঁড়াচ্ছে, কিছুদিন বাদে ধোপারও হয়ত চাকরি যাবে।

যাক।

কিন্তু একটা কথা।

গাধা গেছে, কিন্তু গাধার কি পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে?

একবার চার পাশে চোখ ঘুরিয়ে দেখুন দিকিনি।

জনষ্টন সাহেবের পার্শোনাল এ্যাসিষ্টাণ্ট ত্রিলোচন রায়। যেমন কালো, তেমনি বেঁটে—আর তেমনি লোমশ। শত গুণ থেকেও তার আর কোন উন্নতি হলোনা। এক চেহারাতেই তাকে মেরে দিলে। অথচ সারা অফিস ঘুরে আসুন, শুনবেন তার মত কাজের লোক আর দ্বিতীয়টি নেই। সব মিঞাকেই তাঁর দরজায় ধন্না দিতে হয় কাজের জন্য। অথচ হ'লে হবে কি, পাবার মধ্যে সামান্য একটু মৌখিক ধন্যবাদ ছাড়া আর কিছু তার কপালে জোটেনা!

জনষ্টন সাহেব নিজে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, যদিও কাগজে-কলমে আছে ডোমিসাইল্ড ইউরোপিয়ান্। প্রচণ্ড মাতাল কিন্তু একটুও বেতাল নয়, তাল ঠিক বজায় রেখে চলে।

মানুষ চেনে জনষ্টন। যেখানেই থাকুক না কেন, বেছে বেছে ঠিক এমন একটি লোককে নিজের পার্শোনাল এ্যাসিষ্টাণ্ট করে নেয় যাতে তার কাজ চলে যায়। এখানে এসেও ত্রিলোচনকে সে বেছে নিয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, সেখানে তার চেহারাতে কিছুই আটকায়নি।

সেদিন জনষ্টন সাহেবের ওপর আদেশ হ'ল একটা রিপোর্ট পেশ করার জন্যে। বেশ বড় রকমের রিপোর্ট, সহজে হবার নয়, বেশ কিছুদিন সময়ের প্রয়োজন—কিন্তু হুকুম হয়েছে তাকে দুদিনের মধ্যেই দিতে হবে।

ডাক পড়ল ত্রিলোচনের।

ঘরে এসে বসতেই জনষ্টন সাহেব সিগারেট কেস থেকে একটি সিগারেট বার করে তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'হ্যাভ এ স্মোক্ ট্রিলোচন'।

তারপরই ফাইলখানা তার দিকে এগিয়ে দিলেন।

ফাইল উল্টেই ত ত্রিলোচন মাথায় হাত দিয়ে বসল।

বললে 'উইদিন টু ডেজ্! হাউ ইজ ইট পশিবল!'

'আঃ, হোয়াট আর ইউ টকিং মিষ্টার' একগাল ধোঁয়া ছেড়ে জবাব দেয় জনষ্টন সাহেব। 'ইউ আর ট্রিলোচন, ম্যান হাজিং থ্রি আইজ। ক্যান্‌চিউ ডু ইট? নো নো, ট্রিলোচন, প্লিজ।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে ত্রিলোচন।

তারপর দুদিন ধরে দিবারাত্র খেটে সেই পনের দিনের কাজ দুদিনে শেষ করে যথা সময়ে সে সেই রিপোর্ট জনষ্টন সাহেবের হাতে দিয়ে এল।

জনষ্টন সাহেব মহাখুসি।

সেদিনও একটি সিগারেট বার করে তার হাতে তুলে দিয়ে বললে—'থাঙ্ক ইউ, ট্রিলোচন, ইউ আর রিয়েলি ওণ্ডারফুল'।

কিছুদিন বাদেই জনষ্টন সাহেব প্রমোশন পেয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। তার জায়গায় এলেন আর এক সাহেব। শুনেছি সেও নাকি ত্রিলোচনকে খুব ভালবাসে।

এমন মানুষ দুনিয়াতে অনেক পাবেন।

বিয়ে বাড়ীতে যান, নেমন্তন্ন বাড়ীতে যান, সখের

বিয়েটারে যান আর গানের আসরেই যান, যেখানেই যান, সেখানেই দেখবেন একজন না একজন কেউ আছেন—যিনি হয়ত সারাক্ষণ খেটে খেটে মরছেন অথচ লোকে তাকে কেউ তেমন চেনে না।

এবার আসুন সংসারে।

এককালে এই বাংলা দেশে একান্নবর্তী পরিবারের প্রচলন ছিল, এখনও আছে কিছু কিছু। খোঁজ নিয়ে দেখবেন—এই সব পরিবারের পিছনে এমন কেউ না কেউ একজন আছেন যিনি সেই সংসারটিকে একেবারে মাথায় করে রেখেছেন। তিনি যত ছাড়ছেন অন্য লোকে হয়ত তত গোছাচ্ছে, কিন্তু তাতেও তার কোন হুঁস নেই।

আমারই বন্ধু ঘনশ্যাম।

মাথার চুল পেকে গেছে, দাঁত পড়ে গেছে, বয়েসের তুলনায় একদম বুড়ো হয়ে গেছে।

পেশা ডাক্তারি।

প্রচুর রোজগার করে, দিবারাত্র খাটে, তবু তার দিন চলেনা। এমনিতে তার দর্শন পাওয়া ভার, হঠাৎ আসে তখনই হাতে একখানা মেয়স্ত্রের চিঠি।

বলি, ব্যাপার কি? শুনি 'ভাইঝির বিয়ে'। 'আর কটি হইল?'

'দুটি।'

'তাতেই শেষ ত'।

'বলতে পারিনা' জবাব দেয় ঘনশ্যাম।

বাপের বড় ছেলে ঘনশ্যাম। বাপের অবস্থা কোন-কালেই তেমন ভাল ছিলনা তবু তিনি অনেক কষ্ট করে ঘনশ্যামকে ডাক্তারি পড়ান। দুই ভাই পাঁচ বোন। ঘনশ্যাম রোজগার শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় পাঁচটি বোন বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠল এবং তাদের উদ্ধার করতে করতেই ঘনশ্যামের নিজের বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেল। সে আর বিয়ে করতে চাইলে না।

এতে বাপ গেলেন চটে। লোকেলে মানুষ। নাতি না থাকলে স্বর্গে বাতি দেবে কে?

রেগেমেগেই তিনি তাঁর ছোটছেলে রাধাশ্যামের বিয়ে দিয়ে দিলেন। রাধাশ্যাম একটি নীরেট অপোগণ্ড।

লেখাপড়া কিছুই হয়নি। পাড়ার সখের থিয়েটারে কেষ্ট সেজেই তার দিন কাটত। বাড়ীতে তার প্রায় টিকিই দেখা যেতনা। এহেন বারমুখো ছেলেকে ঘরমুখো করাটাও ছিল বিয়ের আর এক উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সফল হ'ল।

ঘরে রাধা আসতেই শ্যাম আর ঘরের বাইরে বেরুলেন না। সারা জীবন বাড়ীতে বসেই বাঁশি বাজালেন।

বৃদ্ধেরও মনস্কাম পূর্ণ হল।

বাড়ী একেবারে নাতি-নাতনিতে ভরে গেল। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ একদিন গত হলেন দুই নাতি আর সাত নাতনি রেখে।

আর আমাদের ঘনশ্যাম?

তার শ্যাম বপু এখন একেবারে ঘন হয়ে উঠেছে? তাদের হাতের বাতি যোগাতে যোগাতে।

এমন একান্নবর্তিপরিবার ক্রমেই এখন ভেঙ্গে পড়ছে। কারণ যাই থাক না কেন, কেউ যে এখন গাধা সাজতে রাজী হচ্ছে না, এটা তার অন্যতম কারণ।

এখন হয়েছে একার সংসার। যাকে আমরা বলি 'তুমি-আমির' সংসার। কিন্তু তবু কি নিষ্কৃতি আছে?

স্বামী বিপুলানন্দ।

মঠের নয়, মাঠের নয়—পুষ্পর।

বড়লোকের ছেলে, বুদ্ধিমান ছেলে। প্রেম করে বিয়ে করেছিল বলে বাপের ত্যাজ্যপুত্র হয়।

এতে যদিও তার কিছু আসে যায়নি। নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে সে নিজেকে বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। গাড়ী বাড়ী করেছে, বিষয় সম্পত্তি করেছে, তবু তার মুখে সব সময়ই যেন অমাবস্যা লেগে আছে।

সেদিনের সেই শীর্ণ বিপুল এখন হয়েছে বিপুলতর। ঘাড়ে গর্দানে প্রায় মিশে গেছে। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা লাগিয়ে যখন সে তার অফিস ঘরে বসে থাকে তখন সত্যি সত্যিই বাঘ বিশেষ, কিন্তু সেই বাঘও মেঘে পরিণত হয়—যখন সে এসে দাঁড়ায় পুষ্পর সামনে।

স্ত্রী পুষ্পলতা, ওরফে লতা, অতীতে সে ছিল একজন সত্যিকারের সুন্দরী। কিন্তু সে লতাও কালে কালে ফুলে ফুলে এখন দাঁড়িয়েছে বহু শাখাপ্রশাখাসমন্বিত একটি বিশাল বটবৃক্ষ।

পুষ্পেরও আর সে গন্ধ নেই। গন্ধের নামে এখন সে যা ছড়ায় সে শুধু হুঙ্কার, যাতে সবাই সচকিত—সর্বাগ্রে স্বয়ং বিপুলানন্দ।

একদিন যেতে হয়েছিল তার কাছে।

সবে সন্ধ্যে নেমেছে।

বিপুলানন্দকে দেখি গাড়ীবারান্দার তলায় বসে চুরুট ফুঁকছে।

প্রশ্ন করলাম—'শেষ পর্যন্ত এখানে ?'

জবাব পেলাম—'উপায় কি ?'

শুনলাম ছেলেমেয়েদের গণ্ডা কয়েক মাষ্টার। ইংরিজি, বাংলা, অঙ্কের মাষ্টার ত আছেই, তাছাড়া আছে গানের মাষ্টার, নাচের মাষ্টার, পীটারের মাষ্টার, আঁকার মাষ্টার, সেলাইয়ের মাষ্টার, ইংরিজিতে কথা বলার মাষ্টার, স্বাস্থ্য-চর্চার মাষ্টার। একের পর এক করে সবাই আসে, তাই আর ঘরে কুলোয় না, বাধ্য হয়েই বিপুলানন্দকে স্থান নিতে হয়েছে গাড়ীবারান্দার তলায়।

বেশীক্ষণ আর বসতে পারিনি সেদিন।

এক কাপ কফি খেয়েই চলে এসেছিলাম।

কিছুদিন বাদে শুনলাম বিপুলানন্দ আর কোলকাতায় থাকে না। কারখানায় নানা রকম গোলযোগ হচ্ছে, কাছাকাছি থেকে যাতে সেগুলোকে সামলানো যায় সেই উদ্দেশ্যেই সে এখন থাকে আসানসোলে।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখলাম বেশ ভালই আছে বিপুলানন্দ। বিরাট বাড়ী, চারিদিকে ফুলের বাগান, একগাদা লোকজন, বয়-বেয়ারা-বাবুর্চি। একেবারে পুরো সাহেবি চালে রাজার হালে বাস করছে বিপুলানন্দ। প্রচুর খানাপিনা হল।

কথায় কথায় বিপুলানন্দকে বললাম—'ভালই ত আছিস্ দেখছি'।

জবাব পেলাম—'তা আছি।'

কিন্তু পরক্ষণেই সিগারেটের ছাই ফেলে সে বললে—'তবে জানিস্ কি, বয়েস হয়েছে, এখন স্ত্রী কাছে না থাকলে সব কিছুই যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে।'

কোলকাতায় ফিরে সেই কথাটাই জানালাম পুষ্পকে। সে আমায় একটু ভাল চোখেই দেখে। কারণ তাদের রেজিষ্ট্রীকৃত বিবাহে আমি ছিলাম অন্যতম সাক্ষী। তা ছাড়া বাপের বাড়ীর তরফ থেকেও তার সাথে আমার একটা দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়তা আছে।

জানিনা অতীতটা আবার তার সামনে টেনে আনলাম কিনা।

তবে পুষ্পকে দেখে মনে হল—বিপুলানন্দের প্রতি তার যেন একটু ঘৃণার উদ্রেক হয়েছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পরে সে নিজেই ইনিয়ে-বিনিয়ে বললে—'এ কথা ত সে একলোবার বলতে পারে, ভাই। এ বয়েসে কি আর চাকর-বাকরের হাতে থাকা চলে। কিন্তু কি করি বল, ছেলেমেয়েগুলোকেও ত দেখতে হবে, শুধু তাদের মুখ চেয়েই এখানে পড়ে আছি।

কথাগুলো একেবারে দরদে ভরা।

সেই শুনে আমারও অবিবাহিত জীবনের দুঃখ-জ্বালাটা একেবারে হাউ হাউ করে জ্বলে উঠল তখনই।

কদিন বাদে শুনলাম পুষ্পও আসানসোল গেছে। শুনে আনন্দই হল।

যা হোক বিপুলানন্দের আবার কপাল ফিরেছে। আর তার মধ্যে যে আমারও অনেকখানি অবদান আছে সে কথা ভেবে আমিও বেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম।

অতবড় একটা কাজ করে দিয়েছি, অতএব বিপুলা-নন্দের কাছে আমারও একটা 'বড়াখানায়' পাওনা হয়েছে নিশ্চয়ই এবং সেই পাওনা আদায় করতেই আমিও এক-দিন আসানসোলের দিকে রওনা হলাম।

আসানসোলে গিয়ে যখন পৌছলাম তখন সন্ধ্যে হয় হয়—আর বিপুলানন্দের বাড়ী গিয়ে যখন পৌছলাম তখন অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে এসেছে চারিদিকে। আকাশে দু'চারটে তারাও দেখা দিয়েছে।

বাড়ীর সামনে এসে কিন্তু একটু থমকে দাঁড়ালাম।

অতবড় বাড়ীটা প্রায় এক রকম অন্ধকার। খাঁ খাঁ করছে। লোকজন কেউ আছে বলেই মনে হল না।

মনে একটু সন্দেহ হল।

ওরা আবার কোলকাতায় ফিরে গেল না তো ?

সাত পাঁচ ভাবছি।

এমন সময় সদর দরজার দিকে নজর পড়ল। দেখলাম খিড়কি খোলা পড়ে রয়েছে।

লোক তাহ'লে আছে কেউ নিশ্চয়ই।

সাহসে ভর করে ভেতরে ঢুকলাম।

ওপরে উঠে দেখি পিছনের দিকে একটা ঘরে আলো জ্বলছে এবং সেইখানেই স্বামী বিপুলানন্দ একাই বসে আছেন। হাতে একখানা ইংরিজি নভেল, চোখ ঢুলু ঢুলু, অবসাদে মাথা একেবারে নুয়ে পড়েছে। পাশেই একটা ইকমিক্ কুকার, তার থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, সুস্বাদু অন্নের গন্ধে ঘর একেবারে ভরপুর।

ভাজব বনলাম মনে মনে।

ঠিক বুঝতে পারলাম না—এ বড়ের পূর্বাভাস, না শেষ।

দূরে দাঁড়িয়েই প্রশ্ন করলাম—'কেমন আছিস্, বিপুল'।

'আয়ে তুই'।

একরকম ভূত দেখার মতই চমকে উঠল বিপুলানন্দ।

বললাম—'পুষ্প কোথায়'।

'সে তো চলে গেছে' জবাব দিলে বিপুলানন্দ। 'ছোট ছেলেটার আবার জ্বর হয়েছে, থাকতে পারলে না। যেতেই হল। ওরও টানা পোড়েন কম হল না।

পুষ্পের কণ্ঠে তখনই প্রায় গদগদ হয়ে উঠল বিপুলানন্দ।

শুনলাম পুষ্প এসেছিল, চলেও গেছে আবার। যাবার আগে ঘর বেয়ারা বার্বুটি, এমন কি ড্রাইভারটির পর্যন্ত মুণ্ডচ্ছেদ করে গেছে। বুঝি দেখিয়েছে একজন লোকের জন্যে এতগুলো লোক রাখা নেহাতি অপব্যয় ছাড়া আর কিছু নয়। তাছাড়া এখন বয়েস হয়েছে, একটুখানি কৃচ্ছ্র সাধন করা দরকার। ছেলেমেয়েগুলোকে মানুষ করতে হবেত?

যুক্তি অকাট্য।

পুরোপুরি মেনে চলেছে বিপুলানন্দ।

চাকরবাকর আর রাখেনি, রাখবার সাহসও নেই। গাড়ী সে নিজেই চালায়। রান্নাবান্নাও সে নিজে করে। একদিন এই করতে সে হাত পুড়িয়েছিল, এখন ইকমিক কুকারের শরণাপন্ন হয়েছে। রাত্রে সারা বাড়ীতে একটি আলো জ্বলে,তাতে আলোরও খরচাটাও অনেক কমে গেছে।

বুঝলাম কঠিন অবস্থা।

'বড়াখানা' আমার মাথায় উঠল। এককাপ চায়েরও আশা নেই। রাত্রের ক্ষুধা নিবৃত্তিটাও বোধহয় ঐ ক্যানেস্তারাতেই শেষ করতে হবে!

তাই করতে হল।

ফেরার সময়ই তাকে শুধু বলে এলাম—'ভাইরে, তোর যা অবস্থা তাতে দেখছি তোর প্রেমের চেয়ে বিরহই ছিল ভাল'।

সে কথার আর কোন জবাব দেয়নি বিপুলানন্দ। মনে হয় কথারও কৃচ্ছ্রসাধন করছে সে।

'পড়া গধা রে'।

উড়িয়া মালি, তোমার নমস্কার।

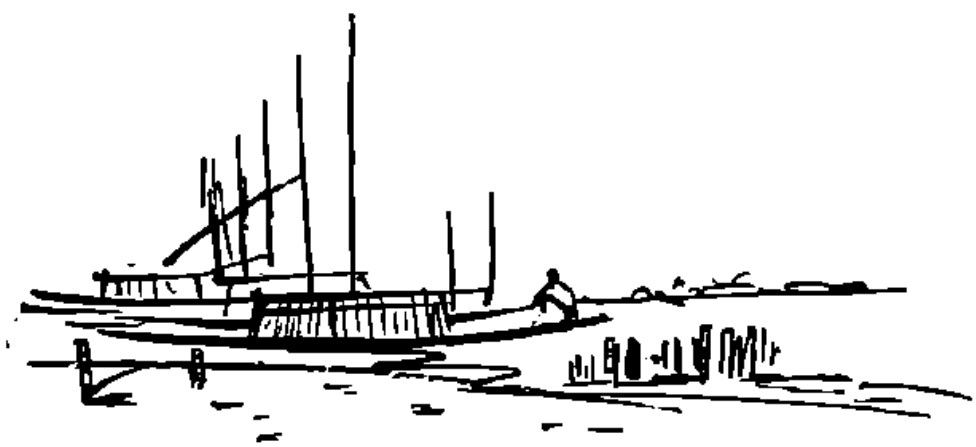

শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মোৎসব—

অন্যান্য বৎসরের মত এ বৎসরও গত ১৭ই মার্চ বুধবার হইতে কয়েকদিন কলিকাতা দেশবন্ধু পার্কে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। অমৃতবাজার পত্রিকার ঘোষ পরিবার উক্ত উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা। বুধবার সন্ধ্যায় দেশবন্ধুপার্কের (শ্যামবাজার) বিরাট জনসভায় কয়েক লক্ষ লোক সমাগম হইয়াছিল। প্রবীণ বৈষ্ণব পণ্ডিত ডাঃ রাধাগোবিন্দ নাথ সভায় সভাপতি হন, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সভার উদ্বোধন করেন, প্রধান অতিথি রূপে পণ্ডিত শ্রীশ্রীজীব ন্যায়-তীর্থ এবং বক্তা হিসাবে মন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী, তারকেশ্বরের মোহান্ত ১০৮ শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ আশ্রম, নবদ্বীপের শ্রীরসরঞ্জন গোস্বামী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। কয়দিন ধরিয়া সঙ্গীত, কীর্তন, বৈষ্ণবশাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা প্রভৃতির মধ্য দিয়া বিরাট উৎসব সম্পন্ন হয়। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের প্রধান উদ্যোগে এই ধর্মমহাসম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় এবং বিশিষ্ট বহু রাজনীতিক, অর্থনীতিক, সমাজসেবক, অধ্যাপক, ছাত্র, নবীন প্রবীণ সকলেই সাগ্রহে ইহাতে যোগদান ও সহযোগিতা করেন। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও তাঁহার পুত্র পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের এই কার্যে সহযোগিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পার্কে কয়দিনের জন্য অস্থায়ী মন্দির নির্মাণ করিয়া তথায় শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সেবাপূজা প্রভৃতিও চলিয়াছিল। এ যুগে এইভাবে ধর্ম প্রচারে সকলের অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

রাষ্ট্রভাষা সমস্যা—

গত ২৬শে জানুয়ারী ভারত সরকার হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করিবার পর হইতে গত দুই মাস যাবৎ ভারতের সর্বত্র নানারূপ হাঙ্গামা হইতেছে। ভারতে হিন্দি ভাষাভাষীর সংখ্যা শতকরা মাত্র ২৫ জন। কিন্তু সে কথা অগ্রাহ্য করিয়া দিল্লীর মন্ত্রিসভা জোর করিয়া হিন্দিকেই ভারতের সর্বত্র চালাইতে উদ্যোগী হইয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীরাও ইহার প্রতিবাদে বহু প্রাণদান করিয়াছে। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাষ্ট্রেও কেহ হিন্দিকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিতে সম্মত নহে। পনর বৎসর পূর্বে জোর করিয়া হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করা হয়। হিন্দির পক্ষে ও বিপক্ষে সে সময়ে গণপরিষদে সমান ভোট হওয়ায় পরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিজের অতিরিক্ত ভোট দিয়া হিন্দিকে সমর্থন করিয়াছিলেন। তখন ঠিক হইয়াছিল, পরবর্তী ১৫ বৎসরকাল ইংরাজী সর্বভারতীয় ভাষা থাকিবে এবং ঐ সময়ের মধ্যে হিন্দিকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। হিন্দিভাষার অবস্থা ১৫ বৎসরে কোনরূপ পরিবর্তিত হয় নাই। কাজেই এখন হিন্দি লইয়া মাতামাতি করা হইলে ভারতের অধিকাংশ মানুষ যে তাহার প্রতিবাদ করিবে তাহাতে আশ্চর্য নাই। এই গোলমাল অধিক দিন স্থায়ী হইলে, অধিক স্থানে ছড়াইয়া পড়িলে ভারতের সংহতি নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহা কোন দেশপ্রেমিকের কাম্য নহে। কাজেই এখন এই সমস্যা সমাধানের উপায় স্থির করা প্রয়োজন। বহুদিন হইতে ভারতের একদল মানুষ সংস্কৃত ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষা-রূপে গণ্য করার জন্য আন্দোলন করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে বহু সুপ্রসিদ্ধ দেশনেতা ও পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন। ইংরাজী ভাষাকে এখনি সহসা শুধু বিদেশী ভাষা বলিয়া বর্জন করিলে তাহা দেশের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হইবে। কাজেই আরও ১৫ বৎসরের জন্য ইংরাজীভাষাকে সর্ব-ভারতীয় ভাষারূপে রাখিবার জন্য যাহারা আন্দোলন করিতেছেন তাহাদের আন্দোলনের প্রতি দিল্লীর রাষ্ট্র-নায়কদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তাহাতে কাহারও

আপত্তি হওয়ার কারণ নাই। তাহার পর ধীর ও স্থির-ভাবে চিন্তা করিয়া পরবর্তী সর্বভারতীয় ভাষা কি হইবে সে কথা বিচার করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে দেশে অধিকতর আন্দোলন চালাইয়া কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষকে ইংরাজী ভাষা রক্ষা করিতে বাধ্য করা প্রয়োজন। হিন্দির যে সর্বভারতীয় ভাষা হইবার যোগ্যতা নাই তাহাও সকলের বুঝা ও সে বিষয়ে কর্তব্য পালন করা উচিত।

আড়িয়াদহে গঙ্গাতীরে উৎসব—

মাঘী পূর্ণিমায় ২৪ পরগণা জেলায় আড়িয়াদহে গঙ্গা-তীরে বুড়োশিবতলা ঘাটে নবনির্মিত শিবমন্দির প্রাঙ্গণে এক ধর্মসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তথায় কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী সভাপতিত্ব করেন এবং অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীপুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রধানঅতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসলিল চট্টোপাধ্যায়ের স্তোত্র পাঠের পর শ্রীকৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে স্থান মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। গৌরীনাথবাবু ও পুষ্পিতারঞ্জনবাবু তাঁহাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণে মানুষকে ধর্মপ্রাণ হইতে আবেদন জানাইয়াছিলেন।

মায়াপুরে প্রাদেশিক সম্মেলন—

গত ১৩ই ও ১৪ই মার্চ হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার মায়াপুর গ্রামে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। শনিবার সকালে সেখানে পতাকা উত্তোলন করেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীঅতুল্য মুখোপাধ্যায়। মধ্যাহ্নে একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন একটি কৃষি ও কুটির শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনীতে দুইটি উল্লেখ যোগ্য জিনিষ ছিল। একটি ৮৬ ফিট্ লম্বা বাঁশ। অপরটি ৮৫০ গ্রাম ওজনের আলু। বিকালে কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভ সহায়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লবাবু তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—গ্রামের বিদ্যুৎ শক্তি লইয়া গিয়া কুটির শিল্প প্রসারের জন্য সকলকে উদ্যোগী হইতে হইবে। যেসব বৃহৎ শিল্পে যেখানে ৮ লক্ষ লোক কাজ করে সেখানে ১৯ লক্ষ লোক কুটির শিল্পে কাজ করে। শ্রীরেড্ডী তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, শাস্ত্রীজি সরকার-পরিচালনায় আমাদের নেতা। একদল লোক তাঁহার বিরোধী হইলেও কংগ্রেস তাঁহার নেতৃত্ব মানিয়া চলিবে। শ্রীকামরাজ কংগ্রেস সংগঠনের নেতা। কংগ্রেস দল তাঁহার নেতৃত্বে সকল রাষ্ট্রের সকল বিবাদ মিটাইয়া চলিবার চেষ্টা করে। শ্রীসহায় সভাপতির অভিভাষণে ভাষা সমস্যা মিটাইবার জন্য সকলের নিকট আবেদন জানাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিন রবিবার সকাল হইতে রাত্রি ২টা পর্যন্ত সম্মেলনের অধিবেশন হয়। সে দিন নিখিল ভারত কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার ও উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী অধিবেশনে যোগদান ও বক্তৃতা করেন। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ ছাড়াও ২৪ পরগণার শ্রীহংসধ্বজ ধাড়া, হাওড়ার শ্রীকৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রমিক-নেতা শ্রীকালী মুখোপাধ্যায়, কলিকাতার ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, মন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সম্মেলনের প্রস্তাব-সমূহের মধ্যে "লাঙ্গল যার মাটী তার" এই কথাটি বার বার উচ্চারিত হয় এবং এক সুদীর্ঘ প্রস্তাবে কংগ্রেস সংগঠনকে জোরদার করার জন্য সকলকে চেষ্টিত হইতে বলা হয়। আগামী বৎসর কোচবিহারে প্রাদেশিক সম্মেলন হইবে স্থির হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি শ্রীরাধাকৃষ্ণণ—

ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীসর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন গত ১৬ মার্চ ভারতবর্ষ হইতে লণ্ডনে গিয়াছেন। তিনি কয়েকমাস যাবৎ চক্ষু রোগে কষ্ট পাইতেছেন। বিলাতের সর্বশ্রেষ্ঠ চক্ষু চিকিৎসক দ্বারা চক্ষুর অস্ত্রোপচার তাঁহার বিলাত গমনের উদ্দেশ্য। শুধু রাষ্ট্রপতি বলিয়া নহেন তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি পৃথিবীতে একজন সর্বজন-শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।

কেরলে নির্বাচনের ফল—

সম্প্রতি কেরল রাষ্ট্রে বিধান সভার সাধারণ নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। একদল বামপন্থী কম্যুনিষ্ট গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক আটক থাকা সত্ত্বেও সমস্ত পদ প্রার্থী হইয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকে নির্বাচিত হইয়াছেন। কেরলে কংগ্রেস দল দুই দলে বিভক্ত। উভয় দলেরই কয়েকজন করিয়া

সদস্য নির্বাচনে জয়লাভ করিয়াছেন। মুস্লিম লিগের যে সকল সদস্য এম-এল-এ নির্বাচিত হইয়াছেন তাঁহারা কম্যুনিষ্টদের সহিত এক যোগে কাজ করিতে সম্মত নহেন। কাজেই কেরলে কোন দল একক হিসাবে বা অপর কোন দলের সহিত মিলিত হইয়া নূতন দল করিয়া মন্ত্রী-সভা গঠন করিবার মত সংখ্যা লাভ করিতে পারেন নাই। কাজেই তথায় কোন মন্ত্রীসভা গঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কোন রাজ্যে মন্ত্রীসভা গঠিত না হইলে সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন বহাল করিতে হয়। কেরলেও তাহাই হইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

উত্তরবঙ্গে পাকিস্থানের আক্রমণ—

উত্তরবঙ্গের বেরুবাড়ীতে কয়েকটি গ্রাম লইয়া পাকিস্থানের সহিত ভারতরাষ্ট্রের যে সমস্যা চলিতেছিল তাহার সমাধান হয় নাই। সেখানে পাকিস্থানীরা নিত্য-নূতন জমি পাইবার আব্দার করায় বিবাদ কিছুতেই মিটিতেছে না। গত ১৩ই মার্চ হইতে পাকিস্থানি সৈন্যরা বেরুবাড়ী সীমান্তে বহু-সংখ্যক গ্রামের উপর সর্বহা গুলি বর্ষণ করিতেছে। ঐ সকল গ্রামের জন সংখ্যা কম বলিয়া ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তথায় অধিক সৈন্য রাখিতেন না। এখন সেখানকার ভারতীয় অধিবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বহু ভারতীয় সৈন্য সেখানে লইয়া যাওয়া হইতেছে। বর্তমান অবস্থাকে পূর্ণভাবে যুদ্ধাবস্থা বলা না গেলেও সেখানে যুদ্ধাবস্থার পূর্বাভাষ দেখা যাইতেছে। সমস্যা সমাধানের উপায় নাই। অথচ ভারতের পক্ষেও পাকিস্থানকে আক্রমণ ছাড়া অন্য গতি নাই। সে জন্য বেরুবাড়ীর এই আক্রমণ ভারতের সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিকে উদ্বিগ্ন করিয়াছে।

কচ্ছ সীমান্তে বিপদের আশঙ্কা—

কচ্ছপ্রদেশ আরবসাগরের তীরে অবস্থিত—তাহার অতি নিকটে পশ্চিম পাকিস্থান। সেখানেও পাকিস্তানীরা কাঞ্চারকোট নামক অঞ্চলে অন্যায়ভাবে প্রবেশ করিয়া ঐস্থান দখল করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে পশ্চিম পাকিস্থানের নিকট পত্র লিখিয়া কোন উত্তর পান নাই। এই অবস্থা অধিকদিন চলিলে সেখানেও ভারতকে যুদ্ধে নামিতে হইবে। উভয় পক্ষই এখানে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। বর্তমানে কোন তৃতীয়-পক্ষ হস্তক্ষেপ না করিলে ভারত-পাকিস্থান সমস্যা সমাধান সম্ভব হইবে না।

কাশ্মীর সমস্যা—

কাশ্মীর রাজ্যের যে অংশ পাকিস্থানের অধীনে আছে সেখানেও কিছুদিন হইতে গোলমাল বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাকিস্থানী কাশ্মীরীরা ভারতরাজ্যের অন্তর্গত কাশ্মীর রাষ্ট্রে অধিকতরভাবে হানা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্তমানে কাশ্মীর ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। সেখানকার শাসন ব্যবস্থা নূতনভাবে গঠিত হওয়ায় সেখানে বিদ্রোহ দমনের নীতি নূতন হইয়াছে। অন্যান্য স্থানের মত সেখানেও ভারতরক্ষা আইনে বহুলোককে ধরিয়া আটক রাখা হইয়াছে। কিন্তু এইভাবে কাশ্মীরকে রক্ষা করা কতদিন সম্ভব হইবে তাহা সকলের চিন্তার বিষয়। ভারতের বহির্বিষয়ক শাসননীতি প্রায় অচল হইয়া পড়িয়াছে। একদিকে যেমন মানবিক ব্যয়বৃদ্ধির ফলে মানুষের সাধারণ জীবন যাপন সমস্যা কঠিন হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি সর্বদা আশঙ্কার মধ্যে থাকিয়া ভারত-পাকিস্থান সীমান্তের কোটি কোটি লোক প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায় বাস করিয়া কষ্ট পাইতেছে। এ সমস্যার সমাধান কোনদিনই যুদ্ধ ব্যতীত সম্ভব হইবে না।

শিক্ষক ধর্মঘট—

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক-সমিতির একদল সদস্য নানা অভাব অভিযোগ পূরণের দাবীতে কলিকাতার ধর্মতলার মোড়ে ধর্মঘট আরম্ভ করিয়াছিল। প্রায় ২০ দিন পরে গত ৭ই মার্চ শিক্ষকগণ নিজেরাই সে ধর্মঘট প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। ঐ সময়ের মধ্যে কয়েকবার শিক্ষক প্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অধিক অর্থ পাইবার দাবী পেশ করিয়াছিলেন। ধর্মঘটের পূর্বেই শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষকদের অবস্থা ভাল করিবার জন্য কয়েকটি বিষয়ে অধিক অর্থ প্রাপ্তির আশ্বাস দিয়াছিলেন। কয়েকবার সাক্ষাতের পরও সেই আশ্বাসের কথা তিনি বারবার উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমান অবস্থায় শিক্ষকদের জন্য আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থা যতটা করা সম্ভব মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী তাহা করিয়াছেন। শিক্ষকগণের বেতন ভাতা প্রভৃতি যে আরও অধিক

হওয়া উচিত সে বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু সহসা তাহা করা যখন সম্ভব নয় তখন শিক্ষকগণেরও এ বিষয়ে ধীরতার সহিত কার্য করা কর্তব্য ছিল। শিক্ষকগণ এখনও ভারতের সমাজে শ্রদ্ধার পাত্র বলিয়া বিবেচিত হন। সেই মর্যাদা রক্ষা করিয়া শিক্ষকগণ কার্য করিলে তাঁহাদিগকে বিনাসর্তে ধর্মঘট প্রত্যাহার করিতে হইত না।

খড়দহে শত-শ্রীখোল উৎসব—

অন্যান্য বৎসরের মত এবারও ২৪পরগণা জেলার খড়দহে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরসংলগ্ন শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বাসভবনে শত-শ্রীখোল উৎসব হইয়াছিল। ৺মৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রবর্তিত এই উৎসব বর্তমানে শ্রীনেপালচন্দ্র গোস্বামী ও শ্রীউমাপতি ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় অনুষ্ঠিত হইতেছে। সারাদিনব্যাপী উৎসবে প্রাতে পূজাদি, মধ্যাহ্নে বহুসংখ্যক ভক্তকে প্রসাদ বিতরণ, অপরাহ্নে শতাধিক শ্রীখোল লইয়া কয়েকখানি গ্রাম প্রদক্ষিণ ও সন্ধ্যায় উৎসব স্থলে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এবার সভায় গৌড়ীয় মঠের হুগলী মহেশ শাখার অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডী স্বামী হৃষীকেশ মহারাজ সভাপতি ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। প্রায় ২ ঘণ্টা কাল বৈষ্ণব ধর্ম ও মহাপ্রভুর জীবন সম্বন্ধে আলোচনার পর রাত্রিতে কীর্তন গান হইয়াছিল।

বিরহ

প্রবীরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

সন্ধ্যা বেলা কি খেয়াল বন্ধু—
বাজিল বিদায় বাঁশি,
তুমি কি পান্থ ক্ষণিকের তরে
হয়েছিলে পরবাসী ?
ওগো ও বিদেশী কেন আশা দিয়ে
পেতেছিলে অধিকার,
না চাহিতে মোরে সব কিছু দিয়ে
জাগালে অহঙ্কার,—
বুকের পাঁজরে বেদনা গুমরে
চোখ ফেটে আসে জল ;
বন্ধন টুটে কোথায় বন্ধু
মুক্তির খোঁজ ছল,
অস্ত বেলায় বাঁশরীর সুর
কেঁদে কেঁদে মরে ঘুরে,—
শীর্ণ তটিনী মৃদু কলতানে
কাঁদে বেণুবন ধারে।
স্মৃতির কণিকা জাগিয়ে মনে,—
চোখেতে আঁধার আনে
চাহি নাই যারে বিরহ তাহার
মরণ ছোবল হানে।

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৯২০ সালের জুলাই কি আগষ্ট মাস। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের M. A. Classএর ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছি। সুভাষচন্দ্র বসুর বন্ধু নদীয়া-কৃষ্ণনগরবাসী হেমন্তকুমার সরকার M. A. পাশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হইয়াছেন। তিনি প্রথমদিকে ভাষা-তত্ত্বের অধ্যাপক ডাঃ আই, জে, এস, তারাপুরওয়ালার সহিত আমাদের Classএ আসিতেন এবং সকল ছাত্রের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। নানা কারণে তাঁহার সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বেই দৈনিক বসু-মতীর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ আরম্ভ করিয়াছিলাম।

একদিন হেমন্তবাবু আমাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া সাবিত্রীপ্রসন্নের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দেন। সাবিত্রীপ্রসন্ন তাহার পূর্ব্বেই কবিখ্যাতি লাভ করিয়া-ছিলেন। তিনি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ হইতে B. A. পাশ করিয়া আসিয়াছিলেন। সাবিত্রীপ্রসন্ন আমা অপেক্ষা বয়সে কয়েকমাসের বড় ছিলেন এবং বোধহয় ঐ বৎসরই B. A. পাশ করিয়াছিলেন। তিনিও বাংলায় M. A Classএ ভর্ত্তি হইয়াছিলেন ও সেজন্য আমার সহিত তাহার পরি-চয়েরও প্রয়োজন হইয়াছিল।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। সাবিত্রীপ্রসন্ন-র M. A. পড়া হইল না। ১৯২০ সালে সেপ্টেম্বরে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইল। তাহাতে সভাপতি হইলেন লালা লাজপত রায় ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী। সেই সময় হইতে অসহ-যোগ আন্দোলনের বন্যা আরম্ভ হয়। ১৯২০ সালে ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে অসহযোগের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সদলে নাগপুর যাইয়া মহাত্মা গান্ধীকে ভোটে হারাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নিজে মহাত্মা গান্ধীর অনুগামী হইয়া অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব মানিয়া লইয়াছিলেন। গান্ধীজি ঘোষণা করিয়াছিলেন অসহযোগ প্রস্তাব কার্য্যকরী করা হইলে ছয়মাসের মধ্যে দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহাতে সারা ভারতবর্ষের কয়েক লক্ষ

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

লোক আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল। সাবিত্রীপ্রসন্নও সেই সময়ে কলেজ ছাড়িয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ করেন।

তাহার পর সুদীর্ঘ ৪২ বৎসর অতিবাহিত হইতে চলিয়াছে। এই দীর্ঘকাল কত স্থানে কত রূপে কত বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে সাবিত্রীপ্রসন্নের সহিত মেলা-মেশা করার সুযোগ লাভ করিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই।

তিনি নদীয়া জেলার এক গণ্ডগ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রানাঘাট, কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অর্থসাহায্যে তিনি কলেজে পড়িবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। সাবিত্রীপ্রসন্নের পরিবারের সহিত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং তিনি মণীন্দ্রচন্দ্রের পুত্র মহারাজা শ্রীশচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। ছাত্রজীবনের পর তিনি মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত মাসিকপত্র উপাসনা'র সহকারী সম্পাদকরূপে কিছুকাল কাজ করিয়াছিলেন। সে সময়ে সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 'উপাসনা' কাগজের সম্পাদক ছিলেন। পরে রাধাকমলবাবু লক্ষ্ণৌ-এ অধ্যাপকের কাজ করিতে চলিয়া গেলে সাবিত্রীপ্রসন্ন ঐ কাগজের সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

পরে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র ও তৎপুত্র শ্রীশচন্দ্রের অর্থানুকূল্যে সাবিত্রীপ্রসন্ন ইণ্টালী শরৎ ঘোষ রোডে উপাসনার প্রেস প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজে তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন। পত্রিকা সম্পাদনার সাথে সাথে নিজের সাহিত্য চর্চ্চাও তিনি চালাইয়াছেন।

পত্রিকা সম্পাদনা বা সাহিত্য চর্চ্চা করিলে কি হইবে রাজনীতি হইতে তিনি নিজেকে কখন দূরে সরাইয়া রাখিতে পারেন নাই। তাই তিনবার তাঁহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে। সাবিত্রীপ্রসন্ন ছিলেন সংসারী লোক, তাই সংসারের প্রয়োজন মিটাইতে তাঁহাকে হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানীতে চাকুরী করিতে হইয়াছে।

সাবিত্রীপ্রসন্নের কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা অবশ্য প্রচুর নহে। মহারাজা মণীচন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পরিবারবর্গের আগ্রহে তিনি মণীন্দ্রচন্দ্রের একখানি জীবনী গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তবে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দান হইল বিভিন্ন দেশের জাতীয় সঙ্গীতের সংকলন। কবিশেখর কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতির মত তিনিও প্রথম শ্রেণীর কবি বলিয়া সুখ্যাতি ও সমাদর লাভ করিয়াছেন।

শেষজীবনে সাবিত্রীপ্রসন্ন কয়েকখানি সংগ্রহপুস্তক সম্পাদন করিয়াছিলেন। বাংলাভাষায় দেশপ্রেম সম্পর্কিত সঙ্গীতের সংকলন নাই দেখিয়া তিনি ঐ বিষয়ে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিলেও তিনি তাঁহার কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

গত দুইমাস কাল তাঁহার শরীর ভাঙিয়া গিয়াছিল এবং এক সপ্তাহকাল পূর্ব্বে তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচার করার প্রয়োজন হইয়াছিল। গত ২৩শে মার্চ্চ মঙ্গলবার বেলা দুইটার সময় তিনি কলিকাতার এক নার্সিং হোমে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁহার বিধবা পত্নী, পাঁচপুত্র ও তিন কন্যা বর্ত্তমান। তথাপি বলিব তিনি প্রকৃত সংসারী ছিলেন না। সাহিত্য-সেবা, কাব্যরচনা ও দেশপ্রেমিকতা তাঁহার জীবনকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। যৌবনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া তিনি তাঁহাদেরই মত জীবন যাপন করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন এবং তাঁহাদেরই মত বৈচিত্র্যময় জীবন যাপন করা একান্ত কাম্য ছিল।

কাশিমবাজারের রাজ-পরিবারের আগ্রহে বহু বৎসর পূর্ব্বে তিনি দক্ষিণ কলিকাতায় ১৬নং বিপিন পাল রোডে একটি ক্ষুদ্র বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং কবির ভাষায় সেই গৃহের নাম দিয়েছিলেন 'স্বপ্ন সায়র'। সাবিত্রী-প্রসন্ন বহুগুণের অধিকারী ছিলেন, তাই আজ বার বার তাঁহার বন্ধু বাৎসল্যের কথা স্মরণ করিয়া মন আজ বন্ধু-বিয়োগবেদনায় ব্যথিত হইতেছে।

তাঁহার মধ্যে আমরা যে একজন প্রকৃত মানুষের পরিচয় দেখিয়াছিলাম তাহা আজিকার সমাজে ক্রমেই দুর্লভ হইয়া পড়িতেছে।

আজকের দিনে

প্রবীণ বঙ্গ-সন্তান :—কালে-কালে কি যে হলো !···এতদিন জানতুম—
ছেলে-মেয়েরাই অবাধ্য হয়ে বেয়াড়াপণা করে···
কিন্তু এখন দেখছি তাদের গুরুরাও···

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

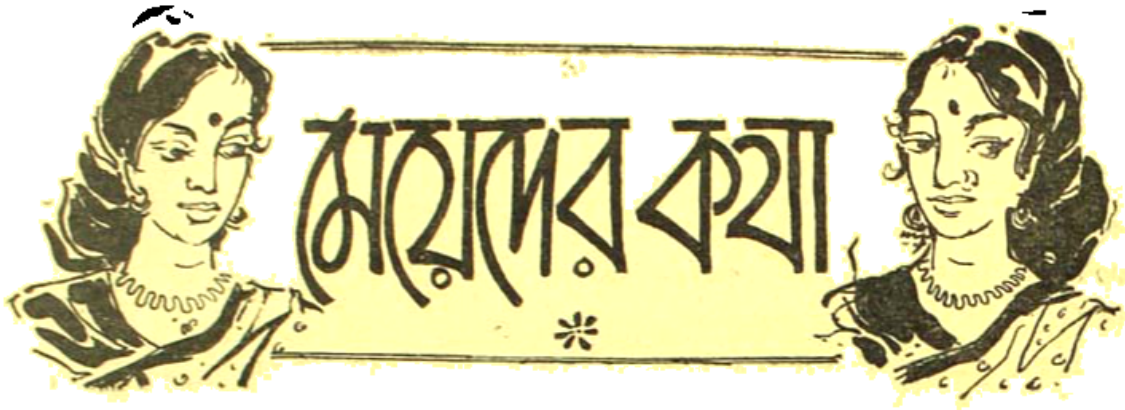

নারীমনের বাসনা ও বিকার

শ্রীমতী কমলা ভট্টাচার্য

মেরিলিন মনরো ১৯৬২ সালের আগষ্ট মাসে আত্মহত্যা করল। সারা বিশ্ব স্তম্ভিত হল। মনরো-ভক্তদের মধ্যে কে একজন ভক্ত সেই দুঃখের আঘাতে এমন মুষড়ে পড়ল—সে নিজেও আত্মহত্যা করল। অশ্রু ঝরে পড়ল সারা জগতের মনরো-ভক্তদের চোখ বেয়ে। কিন্তু মনরো আত্মহত্যা কেন করল? সে যখন তার সৌন্দর্য, দীপ্তি, যশ ও ঐশ্বর্যের চূড়ান্ত শিখরে, কেন তার পক্ষে অসহ্য হল সেই সৌভাগ্য—কেন সে নিজের হাতে নিজের জীবন নাশ করল? হলিউড মনরোকে সব দিয়েছিল। একজন আধুনিকা নারীর জীবনে যা যা চাহিদা থাকতে পারে সব দিয়েছিল—অতিরিক্ত দিয়েছিল তিনটি স্বামী একের পর এক—তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন বিখ্যাত নাট্যকার আর্থার মিলার।

মনরোর বাল্যজীবন ছিল অতি দুঃখের। সিণ্ডারেলার কাহিনী যে মিথ্যে নয়, তাই যেন প্রমাণ করে দিয়েছে মনরো। তার মা গ্লেডিস বেকারের প্রথম স্বামী তাঁর দুই সন্তানকে নিয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে যান। তারপর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় মনরোর পিতার। কিন্তু তিনিও যখন জানতে পারলেন মনরো আসছে—তিনি পলায়ন করলেন। তাই ১৯২৬ সালের ১লা জুন যখন মনরোর জন্ম হল লস এনজেলস্‌এ নামকরণ হল নর্মা জীন মর্টেনসন, তিনি উপস্থিত নেই।

মনোরোর জন্মের কয়েক বছর পরে তার মা পাগল হয়ে যান। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। স্থানীয় কল্যাণ সমিতি মনরোকে অনাথ আশ্রমে রাখল, নিয়ে গেল একের পর এক অনেক পালক পিতামাতার ঘরে। কোথায়ও প্রকৃত আশ্রয় পেল না মনরো। সে বাসন মেজে, পায়খানা পরিষ্কার করে, দু-চারটি পয়সা পেত। সাত আট বছর বয়সে কোন এক পালক পিতার ঘরের এক বাসিন্দা তাকে প্রলুব্ধ করেছিল মাত্র পাঁচ সেণ্ট দিয়ে। তারপর সে পালক মাতার হাতে কঠিন মার খায়। একজন প্রকৃষ্ট ভদ্রলোকের নামে কলংক আরোপ করেছে বলে।

যৌবনের আগমনে মনরো লক্ষ্য করল পুরুষ-হৃদয়ে তার আলোড়ন সৃষ্টি করবার ক্ষমতা। সে নিজের সে ক্ষমতা অনুভব করে উল্লসিত হল মনের গভীরে। মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে তার প্রথম বিয়ে হয়ে গেল ১৯৪২ সালে। ১৯৪৪ সালে সে বিয়ে ভেঙ্গে গেল—ভালোবাসার অভাবে। ১৯৪৫ সালে সে এক ফটোগ্রাফারের মডেলের কাজ নেয়, টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফিল্মে একটা অভিনয়ও সে করে। ১৯৪৮ সালে মেরিলিন্ মনরো নাম নিয়ে সে ছায়াচিত্রে অবতরণ করে। হলিউড-রাজপুত্র এবার তার সিণ্ডেরেলাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল অবহেলা আর দুর্দশার দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে। মনরো যা চায়নি ও যা চেয়েছিল সবই পেল—অগণিত দর্শক ভক্তের মুগ্ধপিপাসা মাখানো দৃষ্টি, অফুরন্ত অজস্র প্রশংসা, অর্থ, সম্ভোগ, বিলাস—যা যা আমেরিকার মত ঐশ্বর্যশালী দেশের লোক কল্পনা করতে পারে। পেল

সে পর পর দুজন দেশখ্যাত স্বামী,—জো জিমগিও, আর আর্থার মিলার।

মিলারের সঙ্গে বিয়ের পরই নাকি মনরো ভালবাসা কাকে বলে কিছুটা বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু মিলারও ভালোবাসায় তার মন ভরিয়ে দিতে পারেন নি। মনরো-ছিল ভালোবাসার জন্য দারুণ তৃষ্ণার্ত। সে তৃষ্ণা মেটাতে পারেননি মিলার। মনরো অনুভব করল সবাই তাকে অর্থার্জনে প্রয়োগ করছে,—তার পালক মাবাপের দল, ফটোগ্রাফার, হলিউড—সবাই যেন তাকে বিক্রয় করছে, শেষ পর্যন্ত যেন সে বুঝতে পারল যে-স্বামীর মধ্যে প্রেমের উত্তাপ সে অনুভব করেছে—তিনিও গোপনে তাকে তার নাটকের কাজে লাগাচ্ছেন। একী ঘৃণ্য প্রতারণা—তিনিও মনরোকে বিক্রয় করবার চেষ্টা করছেন! জীবনের প্রতি তার বিতৃষ্ণা এসে গেল। এতবড় উজ্জ্বল একটা তারকা খসে পড়ল আকাশ থেকে।

শিশুকালে কি ভাবে লালিত হচ্ছে তার উপরই বিশেষ ভাবে নির্ভর করে প্রত্যেক মানুষের ভবিষ্যৎ জীবন—মানুষের মানসিক গড়ন, সুখ অনুভবের ক্ষমতা, আর দুঃখ সহ্যের শক্তি। নারীর মনের গঠনে মৃদুতার আধিক্য বশতঃ শৈশব জীবনের সুখ দুঃখ তাকে প্রভাবিত করে আরও বেশী। মাতাপিতার বা তৎস্থানীয়দের ভালোবাসা,—আর মাতাপিতার মধ্যে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার বা আবরণই সুস্থ নর-নারীর জীবন বিকাশে সহায়ক। নারীর হৃদয়ের কোমলতার পক্ষে বাতাবরণই আরও বেশী প্রয়োজন, আর সে প্রয়োজন মেটে না বলেই নারীর চরিত্র এত বেশী বিচিত্র। সে কি চায় সে জানে না, যা চায় তা পেলেও খুশী হয় না, সব পেয়েও সে সর্বহারা, এ যে দুর্বোধ্য মানসিক পরিণতি—তার কিকিন্মাত্র হৃদয়ঙ্গম করতে হলে, মনরোর মত লক্ষ লক্ষ নারীর মনোব্যথা বুঝতে হলে—নারীমনের বাসনা ও বিকার নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং বুঝতে হবে এই বিকারের কারণ কি।

— —

প্রসূতি-পরিচর্য্যা ও শিশুমঙ্গল

ডাঃ কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম,বি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বিব্-পুরানো টার্কিশ তোয়ালে (Turkish Towel) থেকে তৈরী করা যায়। প্রত্যহ বাড়ীতে নিজের হাতে সহজে কাচা ও শুখানোর সুবিধা ছাড়াও অর্থব্যয়ের দিক থেকে বিশেষভাবে সস্তা হয়। মলমলেরও বিব্ হতে পারে। ন্যাপকিন্-সচরাচর প্রায় তিন ডজন দরকার হয়। যদি অবস্থায় কুলোয় তো—'হ্যারিংটন এ্যাবসরবেন্ট ন্যাপকিন' (Harington Absorbent Napkin) ব্যবহার করা যেতে পারে। 'হ্যারিংটন এ্যাবসরবেন্ট ন্যাপকিন' বেশ নরম, আরামপ্রদ আর সহজে ধোয়া ও শুখান যায় এগুলো। নব-জাত শিশুদের গা নরম, বিশেষ কারো গায়ে কোন চর্মরোগ থাকলে, এ ধরণের ন্যাপকিন ব্যবহার করলে, কোনও ক্ষতি বা অস্বস্তি হয় না। আমাদের দেশে মলমল-কাপড়ও বেশ ভাল···অবশ্য বিলাতে সাধারণ গৃহস্থরা সচরাচর টার্কিশ তোয়ালেই ব্যবহার করে থাকেন। তোয়ালে যদিও নরম এবং সহজেই শিশুর মলমূত্র প্রভৃতি শোষণ করে নেয়, তবু ধোয়ার পর, সহজে শুকিয়ে নেবার অসুবিধা ঘটে। শিশুকে ন্যাপকিন পরানোর সময় মনে রাখা দরকার যে··· জন্মের পরেই প্রথম কয়েক সপ্তাহ তার পায়ের মধ্যে দিয়ে ন্যাপকিন এঁটে দিতে নেই···বরং কোমর থেকে হাঁটুদেশ পর্যন্ত ঘিরে ঘিরে সামনের দিকে মজবুত সেফটী পিন ব্যবহার করে এঁটে দিতে হবে। ন্যাপকিন বানানোর সময়—মাপ মতো ছেঁটে সামনের দুদিকে মুড়ে সেলাই দিতে হবে।

ন্যাপকিন পরানোর সময়, প্রথমে চারকোণা ন্যাপকিন কোণাকুণি-ছাঁদে ভাঁজ করে তিনকোণা ধরণের বানিয়ে নিতে হবে; তারপর সেই ত্রিভুজের খাড়া বা দীর্ঘদেশ নীচের দিকে রেখে তার উপর শিশুকে শুইয়ে সেই দু-ভাঁজ মাথার একপরদা (Flap) বস্তীর নীচে মুড়ে দিয়ে অন্য পরদা (Flap) পায়ের মধ্যে দিয়ে টেনে এনে দুপাশের দুকোণ সামনে রেখে তার সঙ্গে দুপাশের দুই কোণ ও সামনের

অংশ একত্র করে. সেফটিপিন এঁটে দিতে হবে। নবজাত শিশুর পরিধেয় ন্যাপকিন খুব টান বা ঢিলে ধরণের হলে চলবে না। অনেকেই এভাবে ন্যাপকিন পরানোর বিপক্ষে। কারণ, ন্যাপকিন বেশী টান করে বাঁধা হলে, শিশুর বস্তীর হাড়ের উপর ক্রমাগত চাপ পড়ে. পরে বেঁকে যেতে পারে এবং ভালভাবে পরিপুষ্ট হতে বা বাড়তেও পারে না। বিলাতে শিশুদের মধ্যে সাধারণতঃ বস্তীর অস্থি-বিকৃতির যে সব নিদর্শন দেখা যায়, আমাদের দেশে সে তুলনায় এমন দৃষ্টান্ত মেলে খুব কম। তার কারণ, শিশুদের এভাবে ন্যাপকিন পরানো রীতি. আমাদের দেশে প্রচলিত নেই বললেই চলে। তবে পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন নৌখিন সমাজের ঘরে ঘরে ইদানিং তার ব্যাপক প্রসার ঘটতে দেখা যাচ্ছে। শীতপ্রধান দেশে শিশুর মলমূত্রে বিছানাপত্র যাতে সহজেই অপরিচ্ছন্ন না হতে পারে, সেই জন্যেই ন্যাপকিনের; যোগহয় এত প্রচলন। ন্যাপকিন পড়াতে হলে, শিশুর কোমর ঘিরে আবরণ দেওয়াই ভাল। কারণ, তার ফলে শিশু নড়াচড়া বা হাত-পা ভাল খেলাতে পারে এবং বস্তীর হাড়ও স্বাভাবিক উপায়ে বাড়তে পারে এবং বাঁধার সময় চাপ পড়ে বিকৃত হয় না।

আমাদের দেশে অনেক সময় অয়েল ক্লথের উপর কাঁথা দিয়ে শিশুকে শোয়ানো হয় ও ছোট ছোট কাপড় চাদর বস্তীদেশের নীচে বিছিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। সেগুলি পরে মলমূত্রে অপরিচ্ছন্ন বা ভিজে গেলে বদলে দেওয়া হয়। কিন্তু শীতপ্রধান দেশে ও যেখানে জলাভাবে ধোয়াধুয়ি করার অসুবিধা ঘটে, সেখানে অনেক সময় ন্যাপকিনের মধ্যে (Cellulose) সেলুলোজের বিশেষ এক ধরণের চাকতি(প্রায় ছয় ইঞ্চি মাপের) শিশুর বস্তীদেশের তলায় বিছিয়ে দেওয়া হয়। এসব চাকতি দামে খুব সস্তা এবং মলমূত্রও সহজে শুষে নেয় আর পরে জলে ফুলেই সহজে গলে যায়।

নাড়ীর বন্ধনী—নবজাত শিশুর নাড়ী শুখানোর সময়টুকু পর্য্যন্ত সর্ব্বদা পরিষ্কার 'ব্যাণ্ডেজ' (Bandage) দিয়ে বেঁধে বা ঢেকে রাখতে হয়। হার্নিয়া বা অন্ত্রবৃদ্ধি হবে না ভেবে অনেকে নবজাত শিশুর নাড়ী শুখিয়ে গেলেও বেঁধে রাখেন। তার ফলে, শিশুর স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসের বাধা ঘটে এবং পেটের পেশীর উপর চাপ পড়ে, হজমের গোলমাল হয় ও পেটের পেশীর স্বাভাবিক পুষ্টি বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। এ-ধরণের বন্ধনীর জন্য তিন থেকে পাঁচ ইঞ্চি চওড়া ও একগজ লম্বা নরম মলমল বা ক্রেপ কাপড়ের 'ব্যাণ্ডেজ' বা কালি শিশুর শরীরে দু-তিন পাক জড়িয়ে সামনের দিকে সেলাই করে রাখা হয়। এক্ষেত্রে সেফটি-পিন ব্যবহার করা উচিত নয়। সাধারণতঃ তিনটি বন্ধনী হলেই শিশু পরিচর্য্যার কাজ চলে যায়। শিশুর কোমল গায়ে ও চামড়ায় চাপ বা ঘর্ষণ না লাগে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে কোনও গিঁট দেওয়া হয় না। বন্ধনী বানানোর সময় গরম জলে কুটিয়ে ভাল করে সেগুলিকে কেচে, শুখিয়ে ও গুটিয়ে যথাযথভাবে ব্যবহারের সুব্যবস্থা করে রাখা চাই।

টুপি—শিশু হাঁটতে বা হামা দিতে সক্ষম হলে, তুষার-প্রধান দেশে তাদের বাড়ীর বাইরে রোদে বেড়াতে ছেড়ে দেবার সময় প্রায়ই মাথায় টুপি পরিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। টুপির ভিতরাংশে নরম রঙের কাপড় দেওয়া থাকে, যাতে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ ও অতিবেগুনি রশ্মি কোন অনিষ্ট সাধন না করে। লিনেন টুপিও (Linen Cap) দেওয়া চলে। আমাদের দেশে কান ঢাকা টুপি শীতের দিনে অনেকেই ব্যবহার করেন। তবে গ্রীষ্মকালে টুপি পরানোর আধুনিক রেওয়াজ ভাল নয়।

রবারের পোষাক পরিচ্ছদ—শিশুদের পক্ষে, রবারের প্যাণ্ট বা জামা কাপড় ব্যবহার করা উচিত নয়। এতে চর্ম্মরোগ ও স্বাস্থ্যহানি ঘটবার সম্ভাবনা থাকে। অয়েল-ক্লথ, অয়েল সিল্ক বা রবারের কাপড় বিছানার নীচে অনেক সময় দেওয়া হয় বটে···কারণ তার উদ্দেশ্য—শিশুর ব্যবহার্য্য গদী, তোষক প্রভৃতি বিছানাপত্র মলমূত্রে যাতে সহজে ভিজে বা অপরিচ্ছন্ন হয়ে না যায়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে মনে রাখা চাই যে, এ সব উপকরণ সব সময়েই যেন চাদরের নীচে থাকে এবং শিশুকে তার উপর কখনই শোয়ানো না হয়। তাছাড়া বহু জননীই আচমকা ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে শিশুদের প্রায়ই একরাশ জামাকাপড় পরিয়ে রাখেন। এ রীতিটি কিন্তু ঠিক নয়। কারণ, কোনও সময়েই শিশুকে অবশ্য প্রয়োজনাতিরিক্ত জামা-কাপড় পরানো সমীচীন নয়। এতে শিশুরা রীতিমত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে ঘামাচি, দাদ প্রভৃতি নানা রকম চর্ম্মরোগও দেখা দিতে পারে। উপরন্তু

হাত-পা ভাল খেলাতে না পারার দরুণ, শিশুর পুষ্টি-বৃদ্ধিও কমে যায়···অজীর্ণতা ও কোষ্ঠকাঠিন্যেও ভোগে। কাজেই এ কথা ভুললে চলবে না যে, বর্ষা শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচবার জন্যেই বিভিন্ন ঋতুকালের উপযুক্ত জামাকাপড় ও আশ্রয়ের প্রয়োজন। অথবা একরাশ জামাকাপড় চাপানোও যেমন অন্যায়, তেমনি নজর রাখা দরকার যে শিশুর জামাকাপড় যেন সর্ব্বদা দেশ, কাল ও সময়োপযোগী গরম ও নরম হয়। কেবলমাত্র সৌখিনতার দিকে নজর দিলেও যেমন চলবে না, তেমনি দেখতে হবে যে অনাবশ্যক জামা কাপড়ের ভারী বোঝায় শিশু যেন অথথা অসুস্থ বা কাতর না হয়। অর্থাৎ এক কথায়, শিশুকে কাপড়ের 'পুঁটলী' বানালে চলবে না।

জামাকাপড় কাচা—প্রসঙ্গক্রমে এবারে শিশুর জামা-কাপড় কাচার বিষয়ে কয়েকটি দরকারী কথা বলে রাখি। শিশুদের পরিধানোপযোগী সিল্ক ফ্ল্যানেল, পশম ও সুতির কাপড়ের পোষাকপরিচ্ছদ বানানোর আগে, সে কাপড় কেচে নেওয়া হলে, পরে আর ছোট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে না। এক বালতি ঠাণ্ডা জলে কাপড়গুলি আধ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখার পর, জল না নিংড়েই কাপড়গুলিকে রোদে দিতে হবে। তবে ফ্ল্যানেল, সিল্ক ও পশম রোদে শুকোতে দিতে অনেকে বারণ করে এবং রোদে না দিয়ে ছায়ায় দিতে বলে।

শিশুদের ব্যবহৃত ময়লা ন্যাপকিন প্রভৃতি যাবতীয় কাপড়চোপড় সবই একটি চাকাপাত্রে স্নানের ঘরে ভিজিয়ে রাখাই ভালো। প্রথমেই নোংরা অপরিচ্ছন্ন কাপড়গুলি ধুয়ে তারপর ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে রাখা চাই। পরে সময়মত সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে কেচে নিলেই হবে। অপরিচ্ছন্ন কাপড়গুলি কেচে নেবার পর, নিজের হাত ভাল করে পরিষ্কার করতে হবে।

ফ্ল্যানেল ও পশমী বস্ত্র কাচতে হলে, এক পেয়ালা গরম জলে ভাল সাবান গুলে বেশ ফেনা করে, ছোট এক বালতী ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে, সেই জলে ময়লা কাপড় ভিজিয়ে রেখে খানিকক্ষণ পরে কাচা বিধেয়। কাপড় বেশি ময়লা হলে, কাচবার সময় বালতির জলে সাবানের সঙ্গে এক চামচ এমোনিয়া দিলে ভাল হয়। বোরাক্স (Borax) বা সোহাগার খই দেওয়া যায়। কাচার সময় খোপানের প্রয়োজন নেই, শুধু সাবধানে কচ্‌লে নিংড়ে টিপে জল বার করে দিয়ে পরে বারবার পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে বাতাসে মেলে ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। পশমী কাপড় ঝুলিয়ে শুকুতে দেওয়া ঠিক নয় এবং শুকোতে দেবার সময় কাপড়-গুলিকে বেশ টেনে দিয়ে করে না দিলে সহজেই গুটিয়ে যায়।

তুলার জামা বা শার্ট দিনে দুবার বদল করতে পারলে ভাল হয়। এ সব কাপড় পরিষ্কার জলে সাবান দিয়ে কুটিয়ে নিলেই সাফ্ করা চলে এবং ন্যাপকিনের সঙ্গেও কাচা যেতে পারে।

শিশু ক্রমেই যত বড় হবে, তার জামা-কাপড়ও সেই সঙ্গে বদল করা দরকার হবে। প্যাণ্ট-কোট প্রভৃতি পরানো যাবে; তবে মনে রাখতে হবে, জামা কাপড় এমন ধরণের হবে যে, শিশু যেন স্বচ্ছন্দে ও স্বাভাবিকভাবে হাত পা নেড়ে খেলাধুলা করতে পারে বা তার নড়াচড়ার কোনও কষ্ট না হয়। কারণ শিশু দিনে দিনে যত বড় হবে, ততই সে হাত পা নেড়ে খেলা করবে এবং এর ফলেই তার স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে। সঙ্কোচন-বিকোচন (Elastic) হয় এমন কোনও জামাকাপড়, শিশুকে কোমর বন্ধ বা মোজা পরান উচিত নয়।

খেলনা—খেলার জন্য শিশুদের নানা রকম খেলনা ও পুতুল দেওয়া দরকার। ৪।৬ মাস বয়সের হলে, শিশুর যখন দাঁত দেখা দেয়, তখন তারা সচরাচর সব কিছুই মুখে পুরে দেবার চেষ্টা করে। এসময়ে চুষি বা ঝুমঝুমি জাতীয় খেলনা দিলে ভাল হয়।

শয্যা—আমাদের দেশে সচরাচর দেখা যায় যে মা ও শিশু একই শয্যা গ্রহণ করেন। এ রীতি কিন্তু ঠিক নয়। কারণ এতে অনেক বিভ্রাট ঘটে এবং মায়েরও ভাল বিশ্রাম হয় না। একই ঘরে (যদি পাশের ঘরে সম্ভব না হয়) শিশুকে আলাদা বিছানায় শুইয়ে রাখা উচিত। এমন কি শীতপ্রধান দেশেও শিশুদের বারান্দায় বা গলিপথে (Porch) রাখতে দেখা যায়। শিশুদের ঘুমানোর জন্য সব সময়ে খাট-পালঙ্ক ব্যবহার করতে হবে, এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। দরকার হলে, বেতের মোলনাও ব্যবহার করা যায়। বিলাতে অনেক সময় বেতের ঝুড়িতেও সদ্যোজাত শিশুকে বা অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সের

বাচ্চাদের রাখা হয়। তবে সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেঁতে মেঝের উপর শিশুকে শোয়াতে নেই। কারণ, স্যাঁৎসেঁতে মেঝে থেকে জলীয় বাষ্প উঠে শিশুর স্বাস্থ্যহানি ঘটায়···তাই শীতপ্রধান দেশে শিশুর অঙ্গে কোথাও যাতে ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ না লাগে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। প্রচুর রোদ ও আলো-বাতাস আসে, এমন জায়গায় জানলার পাশে—তবে একেবারে সামনে নয়, এমন জায়গায় শিশুকে শোয়ানোর ব্যবস্থা করা ভালো। বেতের দোলনায় বা ঝুড়িতে শিশুকে প্রথম প্রথম শোয়ানে বেশ সুবিধা হয়। কারণ, এ ব্যবস্থার ফলে, শিশুকে সহজে নাড়াচাড়া ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব হয়। এছাড়া দোলনা বা ঝুড়ি কেনার খরচাও কম এবং চারিদিকে উঁচু-আড়াল থাকার দরুণ শিশু সহজে হঠাৎ গড়িয়ে পড়ে যেতেও পারে না।

শিশুর শয্যা রচনার সময় আরো কয়েকটি বিষয় মনে রাখা দরকার। অর্থাৎ—

১। শীতের সময় মাথার দিকে দোলনার ভেতর একটা গরম কাপড় দিয়ে দিতে হয়। যাতে ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ শিশুর মুখে না লাগে। আমাদের দেশে মশা-মাছির উপদ্রব থেকে বাঁচাবার জন্যে অনেক সময় মশারী বা জালের ঢাকা ব্যবহার করা হয়।

২। শীতের সময় প্রধান সাইজের একটি কম্বল দিয়ে শিশুদের দোলনাটি ঢেকে দেওয়া যায়। পাতবার সময়ে নজর রাখা দরকার যে কম্বল যেন দোলনার পেছনে একটু আলগা বাড়িয়ে থাকে এবং বাঁদিকের চেয়ে ডান দিকে একটু বেশী রাখা হয়। কারণ, শিশুকে যখন শোয়ান হবে, তখন তাকে ঢাকা দিয়ে কম্বলের বাড়তি অংশটুকু সহজেই শয্যার পাশে ভালোভাবে গুঁজে দিতে পারা যাবে।

৩। প্রথমে দোলনার উপর নরম একটা গদী পেতে, (বালিশ না দিলেও চলে) তার উপর নরম ও গরম একটি পুরানো কম্বলের টুকরো বিছিয়ে সেই কম্বলটিকে চাদরে ঢেকে চার পাশ মুড়ে দিতে হবে। তবে এমন চাদর না হলেও যে চলে না তা নয়।

৪। তাছাড়া শিশুর মলমূত্রে বিছানা যাতে অপরিচ্ছন্ন না হয় বা ভিজে না যায়, সে জন্য বিশ ইঞ্চি লম্বা ও বার ইঞ্চি চওড়া মাপের একখানা অয়েল ক্লথ, রবার ক্লথ বা অয়েল সিল্ক পাততে হবে—শয্যায় শায়িত শিশুর দেহের নীচের দিকে। বাড়ীতে দুখানা অয়েল ক্লথ থাকলে, একটি অপরিচ্ছন্ন হলে, পরিষ্কার করে অপর অয়েল ক্লথ ব্যবহার করতে পারবেন। এতে কাজের সুবিধা হবে অনেকখানি।

ভূষীর গদী—অষ্ট্রেলিয়া বা অন্যান্য যে শীতপ্রধান দেশে ভূষিঠাসা গদী বা তোষক পেতে শিশুর শয্যা রচনার রীতি অনুসৃত হতে দেখা যায়। এর সুবিধা এই যে অপরিচ্ছন্ন হলে তোষকের ভূষি ফেলে দিয়ে তোষক বা গদীর কাপড়টিকে পরিষ্কারভাবে কেচে সাফ করে শুখিয়ে নিয়ে, নূতন ভূষি পুরে নেওয়া চলে। এতে শয্যার খরচও কম পড়ে এবং শয্যাটিও বেশ নরম ও গরম থাকে। ভূষির গদী বা তোষক বানানোর রীতি হলো—প্রথমে শাদা রঙের মোটা কাপড়ের মাপমত খোল বানিয়ে, সেই খোলের ভিতর সের চার পাঁচ ভূষি পরিষ্কারভাবে বাছাই করে নিয়ে তপ্ত হাওয়াতে কিছুক্ষণ সেঁকে এবং ঠাণ্ডা হলে সেই ভূষি তোষক ও বালিশের খোলে ভরে দেওয়া হয়। অনেকে হয়তো এ ব্যবস্থা পছন্দ নাও করতে পারেন কারণ, ভূষির গন্ধ বড় উৎকট ধরণের। তবে এ গন্ধ দূর করতে হলে একটু ধুনো বা গোলাপী আতর ব্যবহার করা যেতে পারে। বিলাতী সমাজের লোকজন ল্যাভেণ্ডার ভালবাসেন, তাই তাঁরা সাধারণতঃ ল্যাভেণ্ডার অথবা ইউকেলিপটাস্ তেল ব্যবহার করে ভূষির উৎকট গন্ধ দূর করেন।

৫। শিশুর শয্যায় রবার ক্লথ বা অয়েল ক্লথ বিছিয়ে দেবার পর, শীতপ্রধান দেশে সচরাচর একটা গরম কাপড় বা পুরানো কম্বলের টুকরো তার উপর পেতে ঢাকা দিয়ে, সেটিকে চারপাশে গুঁজে দেন। আমাদের দেশে অবশ্য চাদরের টুকরা কিম্বা ন্যাপকিন দিয়ে ঢেকে দিলেই চলবে —তবে প্রয়োজন মত বদল করতে হবে।

৬। এমনি ভাবে শয্যা রচনার পর, বিছানার মাঝখানে হাতের চাপ দিয়ে পরিপাটি ধরণের খাঁজ বানিয়ে নিয়ে শিশুকে সেই খাঁজের ভিতরে শোয়াতে হবে। তাহলে আর বালিশের দরকার হবে না। মসৃণ, নরম বিছানায় শিশুরা বেশ নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোতে পারে এবং বালিশ না থাকায়, তাদের শ্বাস প্রশ্বাস বেশ স্বচ্ছন্দে পড়ে। একান্ত প্রয়োজনে যদি বালিশ দিতে হয়, তাহলে বেশ নরম

নীচু একটি বালিশ মাথার দিকে দিয়ে পাশে গোল বালিশ সাজিয়ে দেওয়াই ভাল। বালিশে ওয়াড় পরিয়ে, সেটিকে শিশুর শয্যার চাদর বা ম্যাপকিনের নীচে দিতে হবে। শীতের দিনে শিশুকে বিছানায় শুইয়ে দেবার পর গরম একটি শাল বা কম্বল ঢাকা দেওয়া দরকার। ইতিপূর্ব্বে দোলনার উপর ঢাকা দেবার জন্ত কম্বল পেতে যে ধরণের শয্যা রচনার কথা বলা হয়েছে, সেই ভাবেও শিশুকে আচ্ছাদিত করা চলবে। এভাবে শীতের দিনেও শিশুদের ঘরের বাইরে বাগানে বা খোলা বারান্দায় কিম্বা ছাদে রাখা যেতে পারে। গরম জলের বোতল দেওয়ার প্রয়োজন সাধারণতঃ হয় না এবং দেওয়াও বিপজ্জনক। সামান্ত অসাবধান হলেই শিশুর ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। যদি কম্বল দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয় তো কম্বলের নীচে একটি সুতির চাদর দিয়ে ঢেকে দিলে, শিশুদের অঙ্গে কম্বলের কর্কশতা অনুভব হবে না। কম্বলটি পাশে গোঁজা থাকলে শিশু কোনোমতেই সেটিকে অনায়াসে টেনে মুখে দিতেও পারবে না। শিশুর শয্যারচনার বিষয়ে মোটামুটি আভাস দেওয়া হলো, কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কম্বল, শাল প্রভৃতি খুব বেশী কাজে লাগে না। সচরাচর মশারী, পাতলা তোষক বা কাঁথা কিম্বা সাদা সুতির চাদর হলেই চলে। অবশ্ত চাদরের তলায় রবার ক্লথ বা অয়েল ক্লথ যে দিতে হবেই, সে কথা বলাই বাহুল্য। ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে, শিশুদের অযথা ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখা, শুধু যে ভুল ধারণা তাই নয়, বরং সবিশেষ স্বাস্থ্যহানিকর। কোলে দোলা দিয়ে, চাপড়ে, বা স্তনদান করে শিশুদের কখনো ঘুম পাড়ান উচিত নয়। সর্ব্বদা আলাদা ব্যবস্থা করা উচিত। বাচ্চাদের কাপড়জামা রাখবার জন্তে পাশ্চাত্য দেশে বেতের বা বাঁশের ঝুড়ি ব্যবহার হয়। জাপানে মানুষের সুটকেশ ব্যবহারের রীতি প্রচলিত আছে। এ ধরণের ঝুড়ি বা সুটকেশ দামেও সস্তা এবং নাড়াচাড়া করতে যেমন সুবিধা, গোছা গোছাও তেমনি সহজ। আমাদের দেশে পাহাড়ীরা এবং সাঁওতালরা এ ধরণের উপকরণাদি ব্যবহার করে।

[ক্রমশঃ

সুপর্ণা দেবী

নিত্য-দিন সংসারের বিবিধ কাজকর্ম, দায়-দায়িত্ব-পরিশ্রম, অভাব-অভিযোগ, দুর্ভোগ-দুশ্চিন্তা, দুঃখ-কষ্ট আর অশান্তি অসন্তোষের নির্ম্মম-চাপে, আমাদের দেশের সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের শত-করা প্রায় নিরানব্বই জন মেয়ে-বউঝির দেহ-মন আজকাল নিতান্তই অকালে জরাজীর্ণ হয়ে উঠছে। তাই মেয়েদের দেহ-মন সুস্থ-নীরোগ, রূপ-লাবণ্য অটুট-অক্ষয় এবং শ্রী-সৌন্দর্য্য-শোভা-মাধুরী অম্লান-অনন্ত রাখার উদ্দেশ্তে, ইতিপূর্ব্বে নিত্য-নিয়মিতভাবে সহজ-সরল উপায়ে একান্ত ঘরোয়া-পদ্ধতিতে বিশেষ ধরণের যে সব ব্যায়াম-চর্চ্চার কথা বলেছি, এবারেও তেমনি ধরণের আরো কয়েকটি ব্যায়াম-ভঙ্গীর মোটামুটি পরিচয় দিচ্ছি। দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের অবসরে, প্রত্যহ নিয়মিতভাবে কিছুক্ষণ এসব ব্যায়াম-ভঙ্গীগুলি অনুশীলনের ফলে, অচিরেই মহিলাদের কোমর, বক্ষোদেশ, উদর, জঘন-দেশ, উরু, গ্রীবাদেশ এবং হাত-পায়ের গঠন শুধু যে সুঠাম-সুন্দর হয়ে উঠবে তাই নয়, উপরন্তু দেহগ্রন্থিগুলিকেও উত্তরোত্তর রীতিমত সুপুষ্ট-সাবলীল ও পেলব-নমনীয় করে তুলবে—একালের বহু অভিজ্ঞ-বিচক্ষণ রূপচর্চ্চা-বিশেষজ্ঞেরই এই হলো অভিমত।

৫০৪ পৃষ্ঠায় ৯নং চিত্রে যে বিশেষ-ধরণের ব্যায়াম-ভঙ্গীটি দেখানো হয়েছে, প্রত্যহ নিয়মিতভাবে অন্ততঃপক্ষে, দশ-পনেরোবার সময়ে এ ভঙ্গীটি অভ্যাস করা দরকার। এ ব্যায়ামভঙ্গীটির অনুশীলন-পদ্ধতি হলো—ঘরের সমতল মেঝের উপর ৯নং চিত্রের অনুরূপ-ভঙ্গীতে দেহটিকে সটান-সিধা

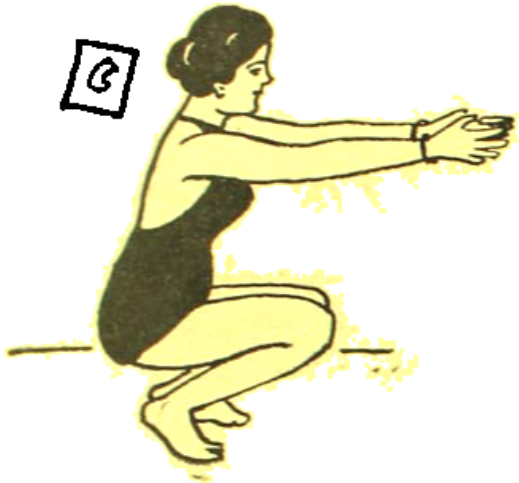

খাড়াখাড়িভাবে রেখে, দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে নিশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে হাত দুখানি মুখের সামনে সম্প্রসারিত করে, পায়ের আঙুলের প্রান্তভাগের উপর দেহ-ভার ন্যস্ত করে, পায়ের গোড়ালী দুটিকে ঈষৎ-উঁচুভাবে রেখে ক্রমশঃ হাঁটু মুড়ে উবু হয়ে বসে পড়বেন ও নিশ্বাস-ত্যাগ করে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকবেন। ক্ষণেক এইভাবে স্তব্ধ-শান্ত বসে থাকার পর, পুনরায় ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পায়ের গোড়ালির উপর দেহের ভার বজায় রেখে পূর্বের সটান-সিধা খাড়াখাড়ি-অবস্থায় উঠে দাঁড়াবেন এবং সেই হাত দুটিকেও এমনিভাবে উঠে দাঁড়ানোর গতি-ছন্দের তালে-তালে সোজাসুজি ভঙ্গীতে রেখে ক্রমশঃ দেহের সুমুখ-দিক থেকে পিছন-দিকে সরিয়ে নিয়ে যাবেন। হাত দুখানি এমনিভাবে দেহের সুমুখ-দিক থেকে পিছন-দিকে সরিয়ে নিয়ে যাবার সময়, সাবলীল-ভঙ্গীতে কোমরের উপর-ভাগ থেকে মাথা পর্যন্ত দেহের ঊর্দ্ধাংশটিকে ক্রমশঃ মেঝের দিকে নীচু করে ঝুঁকিয়ে দেবেন এবং নিশ্বাস-ত্যাগ করে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ-শান্ত হয়ে এমনি-অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবেন। ক্ষণেক এমনি-অবস্থায় স্থির-নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থাকবার পর, পুনরায় ধীরে ধীরে নিশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখা দেহের ঊর্দ্ধ-অংশ ক্রমশঃ সিধা খাড়াভাবে উঁচু করে নিয়ে সটান উঠে দাঁড়াবেন এবং এই উঠে দাঁড়ানোর গতি ছন্দের তালে তালে ইতিপূর্বে দেহের পিছন দিকে সম্প্রসারিত করা হাত দুখানিকে ধীরে ধীরে দেহের সামনের দিকে সরিয়ে এনে মুখের সুমুখে ঊর্দ্ধে তুলে রাখবেন ও আগের মতোই নিশ্বাস ত্যাগ করে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ স্থির অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবেন। ক্ষণেক এমনিভাবে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার পর, পুনরায় গোড়ার ভঙ্গীটি থেকে এ ব্যায়ামটি আগাগোড়া অনুশীলন করবেন—একের পর এক বিভিন্ন ধরণের ভঙ্গীগুলি পুনরানুবৃত্তির সহায়তায়। এই হলো উপরের ছবিতে দেখানো ব্যায়াম ভঙ্গীটির অনুশীলনের মোটামুটি নিয়ম।

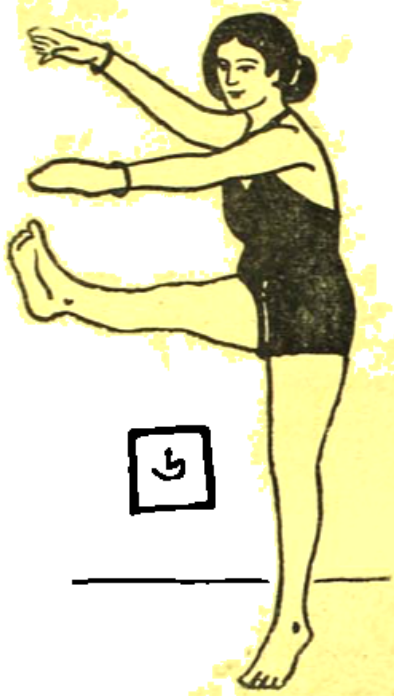

এবারে বলি, উপরের ৬নং চিত্রে দেখানো বিশেষ ধরণের ব্যায়াম ভঙ্গীটি অনুশীলনের কথা। এ ব্যায়াম ভঙ্গীটিও প্রতিদিন নিয়মিতভাবে অন্ততঃপক্ষে দশ পনেরো-বার অভ্যাস করা উচিত। এই ব্যায়াম অনুশীলনের ফলে, শুধু মেয়েদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শ্রী সৌষ্ঠবই নয়, উপরন্তু দেহগ্রন্থিসমূহও ক্রমশঃ সুস্থ সাবলীল হয়ে উঠবে···রূপ-লাবণ্য আর দৈহিক স্বাস্থ্যও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

এ ব্যায়াম ভঙ্গীটির অনুশীলন পদ্ধতি হলো—ঘরের সমতল মেঝের উপর দেহটিকে আগাগোড়া খাড়াভাবে রেখে সটান সিধা দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের তালে তালে গোড়ালিটিকে উঁচু রেখে এক পায়ের আঙুলের প্রান্তভাগের উপর দেহ ভার ন্যস্ত করে, উপরের ৬নং ছবির ভঙ্গীতে অপর পা-টিকে সোজাসুজিভাবে ক্ষণেক

শূন্যে তুলে রাখুন এবং সেই শূন্যে তুলে-রাখা পায়ের বিপরীত দিকের হাতখানিকে ঊর্দ্ধোত্থিত পায়ের আঙুলের দিকে সম্প্রসারিত ও অপর হাতখানিকে মাথার পাশে তুলে রেখে, নিশ্বাস ত্যাগ করে কয়েক স্থির স্তব্ধ হয়ে থাকবেন। তারপর পুনরায় নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এ যাবৎ শূন্যে তুলে রাখা পা ও হাতখানিকে ধীরে ধীরে পূর্ববৎ যথাস্থানে নামিয়ে রেখে, অপর পা এবং হাতখানিকে পূর্ব্বোক্ত প্রথায় শূন্যে উঁচু করে তুলুন। এমনিভাবে একবার ডানদিকের পা ও বাঁ দিকের হাতখানি, তারপর বাঁ দিকের পা ও ডান দিকের হাতখানি শূন্যে তুলে রেখে কিছুক্ষণ ধরে বারম্বার এই বিশেষ ধরণের ব্যায়ামভঙ্গীটি অভ্যাস করবেন। তাহলেই অচিরে এ ব্যায়ামের কায়দা কৌশলটি অনায়াসে রপ্ত করে নিতে পারবেন।

আপাততঃ, এই দুটি ব্যায়ামভঙ্গীর হদিশ দিয়েই এবারের আলোচনা শেষ করছি। আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরো কয়েকটি ব্যায়ামভঙ্গীর পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

——

হাতের কাজ

কাদা-মাটির কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কাদা মাটির তাল দিয়ে সৌখিন সুন্দর ছাঁদের যে সব খেলনা পুতুল তৈরীর কথা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করেছি, সেগুলি হলো—নিতান্তই সহজ সরল পদ্ধতি। কাদা-মাটির কারু-শিল্প সামগ্রী রচনার কাজে যারা সবে হাত পাকাতে সুরু করেছেন, তাঁদের পক্ষে এমনি ধরণের সহজ সরল পদ্ধতিতে বিবিধ ছাঁদের সৌখিন সুন্দর খেলনা পুতুল বানিয়ে তোলার কলা-কৌশল আয়ত্ত এবং সবিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিতে খুব বেশী সময় বা পরিশ্রম ব্যয় করার আবশ্যক নেই। বরং, প্রত্যহ নিয়মিতভাবে কিছুক্ষণ কাদা-মাটির তাল দিয়ে তাঁরা যদি এমনি ধরণের টুকিটাকি নানা রকম খেলনা পুতুল গড়ে মৃৎশিল্পসামগ্রী রচনার কলা-কৌশলগুলি অভ্যাস করেন, তাহলে অচিরেই অনায়াসে আরো উন্নত উপায়ে উত্তরোত্তর উন্নত ছাঁদের আরো বহুবিধ অপরূপ মনোরম সৌখিন ও নিত্য-প্রয়োজনীয় কারুকলা সামগ্রী বানিয়ে তুলতে পারবেন।

ইতিপূর্ব্বে কাদা-মাটির তাল দিয়ে যে পদ্ধতিতে খেলনা পুতুল আর সরল সৌখিন ছাঁদের মূর্ত্তি গড়ার কথা বলেছি, এবার তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নত ও জটিল ধরণের আরেকটি অভিনব পদ্ধতির মোটামুটি পরিচয় দিই। আপাতদৃষ্টিতে, এই নতুন পদ্ধতিটি কোনো কোনো শিক্ষার্থীর কাছে কিঞ্চিৎ কঠিন ও আয়াস-সাধ্য বোধ হলেও, আসলে কিন্তু তেমনটি নয়। বরং, কয়েকদিন সযত্নে এই নতুন পদ্ধতির অনুসরণে, নিজের হাতে কাদা-মাটির তাল দিয়ে সহজ-সরল ছাঁদের টুকিটাকি দুয়েকটি খেলনা পুতুল বা মূর্ত্তি তৈরী করলেই, শিক্ষার্থীরা সুস্পষ্ট বুঝতে পারবেন যে পূর্ব্ব-বর্ণিত পদ্ধতির তুলনায় নতুন পদ্ধতিটি কত বেশী উন্নত ধরণের এবং সার্থক-সুন্দর মৃৎশিল্প সামগ্রী রচনার উপযোগী।

এই নতুন পদ্ধতিতে কাদা-মাটির শিল্প-সামগ্রী বানাতে হলে বিবিধ কলা-কৌশল রপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে যে সব সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন, আপাততঃ, তারই মোটামুটি হদিশ দিয়ে রাখি।

ধরুন, মৃৎ-শিল্পীর ঝোঁক হয়েছে—কাদা-মাটি দিয়ে পরপৃষ্ঠার ওনংছবিতে দেখানো নক্সার ছাঁদে—নৃত্যরত মানুষ আর তার পাশের নমুনামতো ধরণের ঘোড়ার মূর্ত্তিটি গড়ে তুলবেন। এমনি ধরণের মূর্ত্তি গড়তে হলে,—প্রয়োজনানুযায়ী মাপের দুখানি চৌকোণা সমতল কাঠের 'পিঁড়ে' (Square and plain Block of wood) বা টুকরো জোগাড় করে, কাঠের সেই টুকরো বা পিঁড়ে দুটির উপর পাকা-পোক্ত মজবুতভাবে পেরেক, 'হুক' বা গজালের সাহায্যে তারের 'ফ্রেম' (Wire framing') কিম্বা বাঁশ

অথবা কাঠের কাঠামো এঁটে, শুকানো এবং দাঁড়ানো মূর্তির ভঙ্গীর ছাঁদে আগাগোড়া 'ফ্রেম' বা 'কাঠামোটিকে' বানিয়ে নেবেন—উপরের ১নং ছবিতে যেমনটি দেখানো রয়েছে, অবিকল তেমনি ধরণে।

এ কাজ সারা হলে, উপরের ২নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি ধরণে—মিহি-মোলায়েম সুতীর কাপড়ের টুকরো বা কালি মূর্তির ফ্রেম বা কাঠামো-টিকে আগাগোড়া বাণ্ডেজের মতো পাক দিয়ে মূর্তির বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ছাঁদে বেশ পুরুভাবে পটি মুড়ে জড়িয়ে নেবেন অথবা কুমোরপাড়ায় ঠাকুরের প্রতিমা গড়ার সময় যেভাবে কাঠামোর গায়ে ঘাস কিম্বা খড় জড়িয়ে আগা-গোড়া মুড়ে জায়গায় জায়গায় মজবুত সুতো বা সরু-তারের বাঁধন দিয়ে সেগুলিকে পাকাপাকিভাবে এঁটে রাখা হয়, ঠিক তেমনি উপায়েই মাটি চাপানোর আগে, মূর্তির ভঙ্গী অনুযায়ী কাঠামোটিকে পুরোপুরি পুরুষ্টু ও তয়ার করে তুলবেন।

তারপর এই ঘাস-খড় কিম্বা কাপড়ের পটি জড়ানো মূর্তির কাঠামোর গায়ে যথাযথভাবে ভিজা নরম কাদা-মাটি ধরিয়ে সযত্নে হাতের আঙুলের কম-বেশী চাপ এবং ইতি-পূর্বে (গত ফাল্গুন মাসের সংখ্যায়) বর্ণিত মৃৎশিল্পকারুর উপযোগী বিভিন্ন হাতিয়ার সহযোগে ব্যবহার করে ক্রমশঃ কল্পনা-অনুযায়ী ছাঁদে মূর্তি দুটিকে নিখুঁত ধরণে গড়ে তুলতে হবে। এভাবে রূপদানকালে, প্রথমেই মূর্তির মুখ, মাথা ও দেহের গড়নে, ছাঁদ রচনা করবেন···তারপর একে একে পরিপাটিভাবে ক্রমশঃ ফুটিয়ে তুলবেন—কাদা-মাটির মূর্তির মুখ, চোখ, নাক, কান প্রভৃতি দেহের খুঁটিনাটি অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি। এমনি ধরণের কাদা-মাটির মূর্তি রচনার কাজ অনেক সময় একদিনের মধ্যেই শেষ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কাজেই প্রত্যহ কাজের পর, অসম্পূর্ণ ও কাঁচা নরম কাদা-মাটির মূর্তিটিকে আগাগোড়া স্যাঁতসেঁতে ভিজা কাপড়ের টুকরো জড়িয়ে ভালোভাবে মুড়ে রাখবেন—অর্থাৎ, কাজ পুরো শেষ না হওয়া পর্যন্তকাল মূর্তির গায়ের মাটি যেন বরাবর সিক্ত এবং কাঁচা অবস্থায় থাকে। কারণ, মূর্তি রচনাকালে কাদা-মাটি ঠিকমতো ভিজা এবং কাঁচা অবস্থায় না রাখা হলে, মাটি শুকিয়ে যাবার ফলে, মূর্তি রচনার কাজে প্রচুর অসুবিধা ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত মৃৎ-শিল্পীর যাবতীয় পরিশ্রম, নিছক পণ্ডশ্রম হয়ে ওঠে।

এ-পদ্ধতি সম্বন্ধে আরো কয়েকটি হদিশ জেনে রাখা দরকার। কিন্তু স্থানাভাবের কারণে, এবারে যে আলোচনার সুযোগ-সুবিধা মিলবে না। কাজেই, আগামী সংখ্যায় তার মোটামুটি তথ্য বিবরণ জানানোর চেষ্টা করবো।

[ক্রমশঃ

'হানি-কোম্ব'-সেলাইয়ের কাজ

চিন্ময়ী দেবী

সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক কাজকর্মের অবসরে যে সব মহিলা নিজের হাতে নানা ধরণের সৌখিন ও সুন্দর সূচীশিল্প-সামগ্রী রচনা করতে ভালবাসেন, তাঁদের সুবিধার জন্য এবারে বিশেষ ধরণের একটি সেলাই-পদ্ধতির হদিশ দিচ্ছি। এই বিশেষ-ধরণের সেলাই-পদ্ধতিটির পাশ্চাত্য-সমাজে রীতিমত কদর আছে এবং আজকাল আমাদের দেশেও এটি বেশ সুপ্রচলিত হয়েছে। পাশ্চাত্য-সমাজে এ ধরণের সেলাই-পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছে—'স্মকিং' (Smocking) বা 'হনি-কোম্বিং (Honey Combing)।

পাশের ১নং ছবিতে 'স্মকিং' বা 'হনি-কোম্বিং' সেলাই-পদ্ধতিতে রচিত মহিলাদের পরিধানোপযোগী সহজ-সরল অভিনব-ছাঁদের যে সৌখিন-সুন্দর ব্লাউসের নমুনাটি মুদ্রিত হয়েছে, সেটি দেখলেই মোটামুটি অনুমান করতে পারবেন—সাধারণ ব্লাউস বা ফ্রকের গলায় ও হাতায় সামান্য একটুখানি 'স্মকিং' বা 'হনি কোম্বিং' সূচীশিল্পের আলঙ্কারিক-কাজ করে দিলে, সেগুলির শ্রী-শোভা কত বেশী মনোরম হয়ে ওঠে।

অনেকের ধারণা—এ ধরণের 'স্মকিং' বা 'হনি-কোম্বিং' সেলাইয়ের কাজ করা বুঝি খুবই দুঃসাধ্য-কঠিন ব্যাপার—রীতিমত অভ্যাস-অনুশীলন, অসামান্য সূচীশিল্পদক্ষতা, সুদীর্ঘ শিক্ষা-গ্রহণ না করলে, এ কাজে নৈপুণ্য লাভ করা সম্ভব নয়। এমন ধারণা পোষণ করা কিন্তু যথার্থ নয়। কারণ, 'স্মকিং' বা 'হনি-কোম্বিং' পদ্ধতির মতো সহজ অথচ মনোরম সেলাই খুব কমই আছে—সামান্য চেষ্টাতেই মাত্র অল্প কয়েকটি সূচী শিল্প-উপকরণের সাহায্যে এত সহজে এমন সুন্দরভাবে এ কাজ করা যায় যে বাড়ীতে বসে হাতে-গড়া সে সব বিচিত্র অপরূপ সূচীশিল্প-সামগ্রীর শ্রী-শোভা দেখে কারো মুখে আর নিন্দা বা সমালোচনার কোনো বাক্য ফোটে না। কেবলমাত্র মহিলাদের পরিধানোপযোগী ব্লাউস আর ফ্রক অলঙ্করণের উদ্দেশ্যেই নয়, এমনি ধরণের সৌখিন ছাঁদে 'স্মকিং' বা 'হনি-কোম্বিং' সেলাইয়ের বিচিত্র অভিনব নক্সার কাজ করে কি উপায়ে অনায়াসে শিশুদের 'ব্লাউস-শার্ট' 'ফ্রক' প্রভৃতি বিবিধ পোষাক-পরিচ্ছদকে মনোরম-সুন্দর বানিয়ে তোলা যেতে পারে—৫০৮ নং পৃষ্ঠার ছবিটি দেখলেই, তার সুস্পষ্ট আভাস মিলবে।

বিচিত্র-অপরূপ এই 'স্মকিং' বা 'হনি-কোম্বিং' সেলাই পদ্ধতি সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়—হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, প্রভৃতি মধ্য-ইউরোপীয় রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে—গ্রামের অতি সাধারণ পল্লীগ্রামবাসিনীদের অভিনব সূচীশিল্পানুরাগ, উদ্যোগ-উৎসাহ আর কলা-নৈপুণ্যের ফলে। অর্থাৎ, ও-সব শীত-প্রধান দেশের গ্রামের পুরুষেরা মাঠে-ঘাটে কাজ করবার সময় সচরাচর তাঁদের লম্বা হাতওয়ালা ঢিলে-ঢালা ছাঁদের 'ব্লাউস-শার্ট' অঙ্গে ধারণ করেই থাকতেন—কেউ কেউ বা নিজেদের সুবিধার জন্য জামার ঢিলা-হাতা বা

আস্তিন দুটি বড় জোর আলগাভাবে একটু আধটু গুটিয়ে গুটিয়ে নিতেন। কাজেই কাজের সময় কড়া মেহনতীর ফলে, বার-বার তাঁদের সেই আলগাভাবে গুটোনো জামার হাতা বা আস্তিন বার-বার নেমে পড়ে প্রায়ই রীতিমত অসুবিধার সৃষ্টি করতো। তাই এ অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে, গ্রামের মহিলারা অভিনব কায়দায় ছুঁচ-সুতোর সাহায্যে রুমালি-ছাঁদের সেলাই দিয়ে পুরুষদের জামার হাতা বা আস্তিন গুটিয়ে রাখার যে বিচিত্র-পন্থা প্রবর্তিত করেছিলেন, কালে কালে সেই পন্থাই ক্রমশঃ সুপ্রচলিত হয়ে উঠেছে—অধুনা-জনপ্রিয় 'স্মকিং' বা 'হনি কোম্বিং' সূচীশিল্প-পদ্ধতি হিসাবে। অভিনব এই সেলাইয়ের পদ্ধতিটি প্রবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ও-সব দেশের সূচী-শিল্পানুরাগিণী মহিলাদের মধ্যে ক্রমেই রীতিমত প্রতি-যোগিতা সুরু হয়ে যায়—কে কত সূক্ষ্ম সুন্দর আলঙ্কারিক-নক্সা রচনা করে সীবন-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেন—পাল-পার্ব্বণ আর সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে তারই প্রবল রেওয়াজ দেখা দিলো গ্রামে···শহরে···ধনী-দরিদ্র সকল সমাজেই। সূচীশিল্পকলার এই ব্যাপক প্রসারতা এবং এমনি সব প্রতিযোগিতার ফলে, কালে-কালে ক্রমশঃ এই সূক্ষ্ম-সুন্দর বিচিত্র-সৌখিন 'স্মকিং' বা 'হনি-কোম্ব' সেলাই পদ্ধতি নানা ছাঁদে এবং উন্নত-ধরণে শুধু মধ্যইউরোপের ঐ সব অঞ্চলেই নয়, সারা দুনিয়ার দেশে-দেশে সকল শ্রেণীর নরনারীর কাছেই রীতিমত সমাদর লাভ করে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। অর্থাৎ, এক কথায় বলা চলে যে—এই 'স্মকিং' আর 'হনি-কোম্ব' সেলাই পদ্ধতির সৌলতেই নিখিল বিশ্বের মেয়েদের ও শিশুদের বিবিধ সৌখিন পোষাক পরিচ্ছদ আজ রকমারি শ্রী-সৌন্দর্য্যে পরিপাটি অপরূপ হয়ে উঠেছে। এই হলো—'স্মকিং' বা 'হনি-কোম্ব' সেলাই পদ্ধতির মোটামুটি ইতিহাস।

স্থানাভাবের কারণে, আপাততঃ 'স্মকিং' বা 'হনি কোম্ব' সীবন পদ্ধতির কলা-কৌশল রীতি সম্বন্ধে বিশদ জানানো সম্ভব হলো না। আগামী সংখ্যায় সে বিষয়ে মোটামুটি পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো।

——

সুধীরা হালদার

এবারে বাঙলা দেশেরই অপরূপ সুস্বাদু অভিনব এক ধরণের মিষ্টান্ন রান্নার কথা বলছি। বিচিত্র মুখরোচক এই মিষ্টান্ন-টির নাম—'আতপ চালের হালুয়া'। বাড়ীতে বৈকালিক চায়ের আসরে নতুন ধরণের জলখাবার হিসাবে, নিতান্তই সহজ উপায়ে এবং অল্প ব্যয়ে নিজের হাতে এ মিষ্টান্নটি রান্না করে অনায়াসেই প্রিয়জনের পাতে সাদরে উপহার দেওয়া যেতে পারে।

'আতপ-চালের হালুয়া' রান্নার জন্য যে সব উপকরণ দরকার, গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এ মিষ্টান্ন বানানোর জন্য চাই—একপোয়া ভালো সুগন্ধি আতপ চালের গুঁড়ো বা গুঁড়ো, দেড়পোয়া চিনি, আন্দাজমতো পরিমাণে ঘি, কয়েকটি তেজপাতা, কিছু কিসমিস ও বাদাম, আর গোটা কয়েক ছোট এলাচ।

ফর্দ্দমতো উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর রান্নার কাজে হাত দেবার আগেই আতপ চালের গুঁড়ো বা গুঁড়ো থেকে

অপ্রয়োজনীয় কাঠিকুঠো কাঁকর বেছে ফেলে, চালের গুঁড়ো আগাগোড়া জলে ধুয়ে সাফ করে, সেগুলিকে ভালোভাবে শুকিয়ে নেবেন। তারপর বাদামের খোসা ছাড়িয়ে ছুরি বা বঁটির সাহায্যে শাঁসালো-অংশগুলিকে ছোট-ছোট টুকরো করে কেটে নিন এবং ছোটএলাচের খোসা ছাড়িয়ে দানাগুলিকে সযত্নে একটি পাত্রে তুলে রাখুন।

এ কাজ সারা হলে, উনানের আঁচে রন্ধন পাত্র চাপিয়ে, সেই পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে ঘি দিয়ে, তপ্ত তরল ঘিয়ে তেজপাতা, কিসমিস আর বাদামের টুকরোগুলি ছেড়ে, কিছুক্ষণ খুন্তীর সাহায্যে নাড়াচাড়া করে 'মিশ্রণটিকে' আগাগোড়া ভালভাবে ভেজে নিন।

এমনিভাবে 'মিশ্রণটিকে' ভেজে নেবার পর, রন্ধন-পাত্রে ঝরঝরে শুকনো চালের গুঁড়োগুলিকে ছেড়ে দিয়ে আগের মতো পদ্ধতিতেই খুন্তীর সাহায্যে কিছুক্ষণ নাড়া চাড়া করুন। এভাবে পাক করার ফলে, 'মিশ্রণটি' থেকে ক্রমশঃ সুগন্ধ বেরুতে শুরু করলেই, রন্ধন-পাত্রে আন্দাজ-মতো পরিমাণে খানিকটা জল মিশিয়ে, পাত্রের এই তরল-মিশ্রণটুকুকে' ভালোভাবে ফুটিয়ে নেবেন। 'তরল মিশ্রণটি' ফুটন্ত হলেই, রন্ধনপাত্রে চিনি মিশিয়ে দিয়ে, পাত্রটিকে আরো কিছুক্ষণ উনানের আঁচে বসিয়ে রেখে, এই 'নব-মিশ্রণটুকু' আগাগোড়া সুসিদ্ধ করে নেবেন। এভাবে সুসিদ্ধ হবার ফলে, রন্ধনপাত্রের তরল 'নবমিশ্রণটির' জলীয়ভাগ ক্রমশঃ শুকিয়ে আগাগোড়া নরমকাদাগোটির মতো বেশ ঝকঝকে ধরণের হয়ে উঠলেই, উনানের উপর থেকে রন্ধন পাত্রটিকে নামিয়ে নিলেই 'আতপ চালের হালুয়া' রান্নার কাজ হবে।

এবারে সদ্য বানানো মিষ্টান্নটিকে সযত্নে রন্ধন পাত্র থেকে পরিবেশনের উপযোগী অন্য একটি পরিষ্কার পাত্রে তুলে রেখে, খাবারটির উপর পরিপাটিভাবে ছোট এলাচের দানাগুলি ছড়িয়ে দিন। তাহলেই অভিনব উপায়ে বাঙলাদেশের বিভিন্ন মিষ্টান্ন 'আতপ চালের হালুয়া' রান্নার পর্ব্ব চুকবে।

অতঃপর, সাদরে প্রিয়জনদের পাতে পরিবেশনের পালা। অভিনব মুখরোচক মিষ্টান্নজাতীয় এই নতুন ধরণের খাবারের সুস্বাদ গ্রহণ করে তাঁরা যে সবিশেষ খুশী হবেন—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন

সুশীলকৃষ্ণ সেনগুপ্ত

আজ কোথা সেই মাধবী-বিতান, কোথা সেই মধুবন,
বাঁশরী যেথায় 'রাধা' ব'লে বাজে কারণে বা অকারণ ;
যেথা যমুনায় বহিছে উজান
কুসুম-কাননে মধুপের তান
কুঞ্জে-কুটীরে শিখি-শিখিনীর মিথুন মহামিলন,
যেথা পাখি গায় নিশিদিন প্রায় উচ্ছ্বসি অনুখন ?
কোথা সে কৃষ্ণ দরশনাকুল গোউয়ের হরিবোল
পল্লীর পথে প্রাণচালা প্রেম প্রীতি-প্রদারিত কোল,
কোথা সে বিনয় শুরু হ'তে হীন
স্নেহে বাঁধা যার নবীন প্রবীণ
অজানতার আঁধার কাটাতে প্রাণ যার উতরোল,
কোথা সে ভাবের পরশ পুণ্য হরি-হরা-হরিবোল ?
আজ কোথা সেই গঙ্গার তীরে পঞ্চবটীর ছায়ে
নিভৃতে দু'জনে কথা ক'য়ে যায় সাধক ছেলে ও মায়ে ?
'বিবেকে'র বাণী জাগে না তো আর
ঘুচাতে বিভেদ, শত অনাচার ;
ধর্ম-ধারার মহা ওঙ্কার বেদস্তবের ঘারে—
অনুরণি উঠি যায় না তো ছুটি শত স্রোতে
ব্যোমে বারে ?
আজ দুনিয়ার মানুষের বুকে বিকৃত বাসনা জাগে
ভুলে গেছে তা'রা সত্য-সাধন, ন্যায়-নীতি অনুরাগে :
শ্রদ্ধা ও স্নেহ প্রেম প্রীতি ছিঁড়ে
লুণ্ঠন আশা আত্মারে ঘিরে—
ওঠে কেঁপে কেঁপে ক্ষণে কেঁপে কেঁপে দুর্দ্দম
দ্বেষে রাগে,
বিশ্বগ্রাসের কামনা-কুটিল স্বর্গ-শাসন মাগে !
অতীত-আলোকে উদ্ভাসি হিংসা ভারত আজিকে ভাবে
স্মৃতি-মন্থন অমল আবেশে দিন বুঝি কেটে যাবে !
বিশ শতকের এই দেহা ধান
দিয়েছো কি তুমি নিষ্ঠুর মহ'ন—
মানুষে মানুষে এত দ্বেষাদ্বেষি হানাহানি লাভে লোভে :
সঞ্চিত ব্যথা বুকে বুকে যত বঞ্চনা বিক্ষোভে ?

গল্প

নিশান্তিকা

অজয় নন্দী

অবশেষে রাতের শেষ গাড়ীটাও হাঁফাতে হাঁফাতে ষ্টেশনে এসে পৌঁছালো। সব কটা কামরা যেন খাঁ খাঁ করছে। অন্য দিন এ সময়ের গাড়ীটার সাথে আজকের যেন কোন তুলনাই চলে না। গাড়ীটার একেবারে মাঝামাঝি একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরার মাত্র জনা ছয়েক লোক বেরিয়ে উবু হয়ে চাটুতে বুতনি ঠেকিয়ে বসে আছে। ওরা সাদনের জংশন ষ্টেশন পর্যন্ত যাবে। অন্যান্য সবাই এখানেই নেমে গেল। রাইফেল কাঁধে সৈন্যবাহিনীর লোকটা যেন নিখুঁত যত্নের মতো সমস্ত গাড়ীটায় তার সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে এক-প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত গট্‌গট্ করে হেঁটে গেল। আবছা আলোর একটা কেরোসিন আলো হাতে গার্ড-সাহেব কালো উর্দিপরা চাপরাশীটার হাত থেকে একটা কাগজ খাবলে তুলে নিল। তারপর গার্ডের বাঁশী, তারপর ইঞ্জিনের চীৎকার—তুস্‌তুস্ করে গাড়ীটা ছেড়ে দিল।

ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মের নীলাভ আলো, বিরাট কোলাপ্সিবল্ গেটটার হাতের মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়ানো টিকিট কালেক্টর, আর গাড়ী থেকে সদ্যোনামা চারজন লোক, আর খাঁ খাঁ প্ল্যাটফর্ম দুটো—সব মিলিয়ে আজ রাতে যেন এক নিস্তব্ধ প্রেতপুরী, আর কোন লোক নেই, আর কোন শব্দ নেই। খালি দূরের অপসয়মান গাড়ীটার গম্ভীর গুম্ গুম্ আওয়াজ।

পশমের কালো কোট-প্যান্টে সর্বাঙ্গ আবৃত টিকিট কালেক্টর ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন এদিকে। সদ্যোনামা যাত্রী চারজন তখনো যেন কেমন বিশ্বাস করতে পারছেনা—ষ্টেশনটাই কালকে এই সময় জনতার ভীড়ে, বিচিত্র শব্দরূপে সরগরম ছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তারা যেন আরেক জগতে এসে পৌঁচেছে যেখানে জীবনের কোন চিহ্ন নেই। কোন নিশ্চয়তা নেই নিজেদের সজীবত্বের প্রমাণের পর্যন্ত।

টিকিট-কালেক্টরের গলার আওয়াজটা বড়ো অদ্ভুত শোনালো—টিকিট! ওরা চারজনেই এক সাথে চারটে টিকিট এগিয়ে দিল। টিকিট কালেক্টর আজ এই প্রথম উপযুক্ত টিকিট হাতে পেয়েও বল্লো,—"কিন্তু আপনারা তো বাইরে যেতে পারবেন না।"

—কেন?—এক সাথে চারজনের উৎসুক জিজ্ঞাসা।

টিকিট কালেক্টরের দুই অক্ষরের বড় সংক্ষিপ্ত উত্তর—কার্ফু!

বৃদ্ধ ভদ্রলোক লাঠিতে ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। প্রৌঢ় লোকটা তাঁর হাতের ব্যাগটা চেপে ধরলেন ভাল করে। কলেজ ফেরৎ ছেলেটা একটু বেশি গম্ভীর হয়ে উঠলো। আর শিউরে উঠলো মেয়েটা। প্রৌঢ় জিজ্ঞাসা করলেন—কেন, এখানেও কিছু ঘটলো নাকি আবার?

টিকিট কালেক্টর ভদ্রলোক চারিদিকে একবার বেশ ভালো করে দেখে নিয়ে বল্লেন,—আজ সন্ধেবেলায়। গান্ধী-মোড়ে। এক ছুরিতেই শেষ—নাড়ী-ভুঁড়ি একেবারে বেরিয়ে গিয়েছে।

—কটায় এ্যানাউন্স করলো?

—এই তো, রাত নটা থেকে। মিলিটারীতে একেবারে ছেয়ে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ আর কোন কথা হল না। সবাই যেন ভৌতিক নিস্তব্ধতায় দাঁড়িয়েছে। সবার সামনেই একটা হিংস্র পশুর ছবি! যে পশুটা খুলনা থেকে যশোর, যশোর থেকে ফরিদপুর, ঢাকা, বরগা, বেলেঘাটা, শিয়ালদা, কাঁচরাপাড়া, রাণাঘাটের পথে পথে উন্মত্তের মতো ছুটছে তার কদর্য তন্ত্রীতে। হৎপিণ্ড লাফাচ্ছে, বিকট চীৎকার করছে তার ধারালো নখরগুলো আকাশে তুলে ধরে!

—তা হলে উপায়?

টিকিট-কালেক্টর যেন কৃতার্থ করলেন এমনি ভঙ্গীতে একটু হেসে বললেন,—আমি ফার্ষ্ট ক্লাশ ওয়েটিং রুমটা বরং খুলে দিচ্ছি ওখানেই রাতটা কাটিয়ে দিন।

প্রৌঢ় যাত্রী মেয়েটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—ইনি?

আবার সবাই চুপ করে গেলেন। কারো মুখে কোন কথা নেই।

টিকিট-কালেক্টর বল্লেন,—লেডিস্ ওয়েটিং রুমটাও বরং খুলে দেই?

বৃদ্ধ ভদ্রলোক অভিভাবকত্বের সুরে হুমকি দিয়ে উঠলেন,—"না, না, তা কি করে হয়? ও মেয়ে মানুষ, একা থাকবে কী করে? ও আমাদের কাছেই থাকবে। বলে মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"কী বলো মা?"

মেয়েটা কোন কথা বল্ল না।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বল্লেন,—এসো, এসো, চলে এসো।

টিকিট কালেক্টর ওয়েটিং রুমের দরজাটা খুলে ঘরের আলোটা জেলে দিলেন। সমস্ত ঘরটা আলোয় ভরে গেল।

বৃদ্ধভদ্রলোকই প্রথমে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন। তারপর লাঠিটা টেবিলের ওপর সশব্দে রেখে হাঁফ ছেড়ে বল্লেন,—বাপস্। তবুতো রাতটার মতো একটা আস্তানা পেলাম। মন্দ কি! বেশতো। খালি একটু লেপের অভাব এই যা। কিন্তু বাড়ীতে থাকলে এতগুলো মিলিটারীর পাহারা কোথায় পেতাম! বসে পড়ুন মশাই, বসে পড়ুন।

কলেজের ছোকরাটা আর সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক দুজনে দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন। কিন্তু মেয়েটা তখনো দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধ একমুখ হেসে বল্লেন,—আরে, রাজদ্বারে, শ্মশানে, আর কার্ফুতে যে পাশে থাকে সেইতো প্রকৃত বন্ধু।—বসে পড়ো মা, বসে পড়ো।

প্রৌঢ়ভদ্রলোকও বল্লেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, উই অল আর ফ্রেণ্ডস্ হিয়ার। বসো, বসো।

কলেজের ছেলেটা কিছুই বল্লোনা,—তবু ওরও চোখ-দুটো যেন বলছে, মেয়েটি আর বিন্দুমাত্রও কষ্ট না করে এক্ষুণি বসে পড়ুক। তবেই যেন তার সর্বনাশ মেটে।

এতগুলি লোকের অনুরোধের সামনে মেয়েটা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। বাধ্য হয়েই কোণের একটা চেয়ারে জড়োসড়ো হয়ে বসলো।

প্রৌঢ় বল্লেন,—নিন, এবার সবাই হরিঘটর চিবুতে চিবুতে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন। রাত প্রায় সোয়া-বারো বাজতে চল্লো।

একগাল হেসে বৃদ্ধ বল্লেন,—না না, মশাই তবু হরিঘটর চিবুতে চিবুতে শোয়া কেন? আমার নাম ভুবন বাঁড়ুজ্জে, অত কাহা-আগলা লোক আমি নই। নিন্—বলেই বৃদ্ধ তাঁর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কোটের পকেটথেকে বেশ বড়ো বড়ো চারটে কমলা লেবু বার করে একটা মেয়েটার হাতে একরকম জোর করেই গুঁজে দিয়ে আর দুটো বাকী দুইজনকে দিয়ে নিজে একটা তুলে নিয়ে এক এক বারে তিনচারটে করে কোয়া মুখে দিতে দিতে বল্লেন,—মেয়েটার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিলাম, বুঝলে মা। কিন্তু কপালে নেই বেটীর—তা কি হবে? কোলকাতা থেকে কিছু না নিয়ে ফিরলে বেটীর ঘুমই হয় না। সেকি আজকের অভ্যেস—কুড়ি বছর হতে চল্ল। তা প্রায় তোমার মতনই হবে, তবে একটু কালো। এখানকার কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। আর্টস্।—ওকি মা? তুমি খাচ্ছো নাত? খাও খাও। তুমি খাওয়াও যা, আমার মেয়ের খাওয়াও তাই। খেয়ে ফেলো।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক চোখের ইশারায় মেয়েটাকে খেতেই বল্লেন। কলেজের ছেলেটাও আড়চোখে মেয়েটার সলজ্জ-ভঙ্গিটা বেশ উপভোগ করলো। এবারে মেয়েটা সবার অনুরোধেই কমলাটা খেতে সুরু করলো এককোয়া এককোয়া করে।

ততক্ষণে একটা মাত্র কমলা লেবু প্রায় সবারই শেষ হয়ে গিছে। বৃদ্ধ ভুবন বাঁড়ুজ্জে কমলার রসে ভেজা হাতদুটো বেশ করে নিজের কোটের গায়ে মুছতে মুছতে যেন কী ভীষণ একটা অপরাধ করে ফেলেছেন এমনি ভঙ্গীতে বল্লেন,—কিন্তু কী আশ্চর্য কাণ্ড দেখেছেন! আমরা সবাই বন্ধু হতে যাচ্ছি, অথচ কেউ কারো পরিচয়টাও জানিনে।

কলেজের ছেলেটা এবার কিন্তু বেশ বড়ো গলায়ই বল্লো,—"আমি কিন্তু আপনাকে চিনি। গতবার সরস্বতী

পূজোর চাঁদা নিতে গিয়েছিলাম। রবীন্দ্রনগরের আটা কলটাতো আপনাদেরই ?

ভুবন বাঁড়ুজ্জে হা হা করে হেসে উঠলেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওইটা আধখাই চালাই। আর দুই একটা ছোটখাটো কণ্ট্রাক্টরী করি। তাই মাঝে মাঝে কোলকাতায় যাই। কিন্তু তুমি ?

ছেলেটা যেন বিনয়ে একেবারে গলে গিয়ে বল্ল,—আজ্ঞে, আমার নাম মাণিক সরকার। আমার বাবা এখানকার ব্রহ্মদাস ইস্কুলের অ্যাসিস্টেণ্ট হেড্-মাষ্টার।

ভুবন প্রায় লাফিয়েই উঠলেন,—ও। তুমি নিবারণ-বাবুর নাতি ? নিবারণবাবুতো আমার একরকম বন্ধু বলেই হয়। প্রায়ই দেখা হয় নদীর ধারে। কিন্তু আপনার পরিচয়টাতো—ভুবনবাবু এবার প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন।

প্রৌঢ় একগাল হেসে বল্লেন,—আজ্ঞে, আমার আবার পরিচয় ! নাম বৃন্দাবন সমাদ্দার। কাম এ, বি, বেঙ্গলের বাড়ীতে কলম পেষা, আর বাস—মাঠের পাড়া—এই।

ভুবনবাবু বল্লেন,—আমাদের এক মামাতো ভাই ওখানে কাজ করে। কী কাজ তা মনে নেই। নৃপেন মুখার্জি। দোহারা গড়ন, শ্যামল রং।

প্রৌঢ় বৃন্দাবন সমাদ্দার খানিকটা চিন্তা করে নিয়ে বল্লেন,—ঠিক নাম আর চেহারাটায় মিলিয়ে নিতে পারছি না।

ভুবন বাঁড়ুজ্জের আবার সেই জোরালো হাসি—তা হবে, তা হবে। সেখানে কী আর দুই একটা লোক ! কিন্তু, মা, তুমি তো কিছুই বল্লে না।

মেয়েটি এতক্ষণে যেন খানিকটা সহজ হয়ে এসেছিল, ভুবনবাবুর কথায় আবার একেবারে অর্ধেক হয়ে গেল।

ভুবনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—নাম কী তোমার ?

কিছু না বলতে হলেই যেন মেয়েটা বাঁচতো,—লেখা-পড়া করো বুঝি ?

মেয়েটা এবারে সসঙ্কোচে জবাব দিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ। লেডি ব্রাবোর্নে।

মাণিক এতক্ষণে যে সুযোগ খুঁজছিল এবার তা পেয়ে গেল। সে যেন কলম্বাস—আমেরিকা আবিষ্কার করেছে এমনি ভঙ্গীতে বল্লো,—আপনি লেডী ব্রাবোর্নে পড়েন ? কোন্ ইয়ার ?

মেয়েটার এবারো ঠিক তেমনি সঙ্কুচিত জবাব—ফাইনাল ইয়ার। সায়েন্স।

—ফাইনাল ইয়ারে পড়েন ? সায়েন্স ? সুপ্রভা সরকারকে চেনেন না ? কলেজ হোষ্টেলে থাকে।

মেয়েটা সামান্য একটু হেসে বল্ল,—হ্যাঁ, ওই তো আমাদের ক্লাসের বেষ্ট গার্ল।

মাণিক বেশ গর্বিত স্বরে বল্ল,—সুপ্রভা আমার বোন। আপন বোন।

মঞ্জু বল্ল,—সুপ্রভা আমার বন্ধু।

ভুবন বাড়ুজ্জে এবার জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমরা কোথায় থাকো ? তোমার বাবার নাম কি ?

মঞ্জু বল্ল,—আমার বাবা নেই, মা পাকিস্থানে থাকেন। এখান থেকে চারমাইল দূরে আহুলিয়ার চৌধুরীরা আমার মামা হন। আমি কলেজ হোষ্টেলেই থাকি। কোলকাতার অবস্থা দেখে ভয় হোলো, তাই রাতারাতি পালিয়ে এসেছি।

ভুবনবাবু বল্লেন,—কী জানি বাপু, চিনতে তো পারলাম না।—বৃন্দাবনবাবুও চিনতে পারলেন না মঞ্জুর মামাদের। ভুবনবাবু বল্লেন,—যাই বলো, তুমি কিন্তু কাজটা ভালো করোনি মা। একে তো এই রাতবিরেত, তারপর অশান্তি। তার মধ্যে তুমি একা বেরিয়ে কাজটা মোটেই ভালো করোনি। যদি বিপদ আপদ একটা কিছু ঘটেই যেতো ?

মেয়েটা নিজেকে আরো গুটিয়ে নিলো। ওর মুখে অনাগত বিপদের ঘন কালো ছায়া। বৃদ্ধ ভুবনবাবু বেশ ভালো করে লক্ষ্য করলেন মঞ্জুকে। তারপর বল্লেন,—না, না, অত ভয় পাচ্ছো কেন ? এখন আর ভয়ের কী আছে ? নাও, এবার চোখ দুটো একটু বন্ধ করো রাতটার মতন।

বৃন্দাবনবাবুই এবার প্রস্তাব করলেন,—আমরা সবাই কি একসাথে ঘুমিয়ে পড়বো ? তার চেয়ে পালা করে একজন করে জেগে থাকলে হতো না ?

ভুবনবাবু বল্লেন,—তা মন্দ কি। প্রত্যেকে ঘণ্টা-দেড়েক করে জেগে থাকলেই রাতটা কেটে যাবে।

মাণিক বল্‌লে,—কী দরকার? আপনারা সবাই ঘুমিয়ে পড়ুন, আমি একাই জেগে কাটিয়ে দেব।

ভুবনবাবু সজোরে প্রতিবাদ করলেন,—ইম্পসিব্‌ল্! তোমরা ইয়ং যেন। তোমাদের জন্যে অনেক কাজ বাকী। সারাটা রাত জেগে বসে থেকে শক্তিক্ষয় করবে কেন? তুমিও ঘুমোবে। জাগতে হয় আমরা সব অপদার্থ বুড়োরাই জেগে কাটাবো। আমাদের দ্বারা তো আর কোন কাজই হবে না—তোমরা অনেক কাজে লাগবে।

বৃন্দাবনবাবুও ভুবনবাবুর কথার সমর্থন করলেন,—নিশ্চয়ই, কালকেই হয়তো তোমাকে কাজে লাগতে পারে। ব্যাটারা যা শুরু করে দিয়েছে পাকিস্থানে! তখন আর ঘুমানোর সময় পাবে না।

আলোচনা দেখতে দেখতে দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে গড়িয়ে চলতে লাগলো—বীভৎস সব হত্যাকাণ্ড, নারী-ধর্ষণ, লুণ্ঠনরাজ, অগ্নিসংযোগকে কেন্দ্র ক'রে।

সবাই তখন সোজা হয়ে বসেছে।

ভুবনবাবু বল্‌লেন,—জেনোসাইড চলছে মশাই! জেনোসাইড! এককোটি মানুষকে ইঁদুরের মত খাঁচায় পুরে মারছে। আর এদিকে সব ক্লীবের মতন বসে আছে।

বৃন্দাবন সমাদ্দার বল্‌লেন,—এদিকে খালি কলেরা-পটাস্—ঘুটঘুট। মানুষ মারতে জানে নাকি হিঁদুরা? ইঁদুর মারতেই তিমি খায়। 'সোর্ড্ এগেনষ্ট সোর্ড্' নইলে কি আর শয়তান শায়েস্তা হয়?

ভুবনবাবু খানিকটা যেন বিদ্রূপের সুরেই হেসে বল্‌লেন,—তাতে কি হবে মশাই? সমস্যার তাতে কি সমাধান হবে? মাঝখান থেকে এখানেও কতকগুলো হতভাগা মরবে, কতকগুলো গরীব তাদের ঘরবাড়ি হারাবে। ওদিকে ওরা তাই দেখাদেখি আরো বেশি করে শুরু করতে লাগবে।

মাণিক এতক্ষণ চুপচাপ সব শুনছিল, এবার ও বল্‌ল,—আসল কথা—কিছুতেই কিছু হবে না, যতক্ষণ না আমাদের সরকার শক্ত হচ্ছে। মাকুক যেখি ওরা একটা খৃষ্টানকে। সাথে সাথে সারাটা পৃথিবীতে তোলপাড় কাণ্ড সুরু হয়ে যাবে। আর আমরা কিনা সব চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। আর দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। আন্দোলন করতে হবে, সরকারকে শক্ত হতে বাধ্য করতে হবে।

ভুবনবাবুর গলায় এবার আরো খানিকটা বিদ্রূপের ঝাঁজ,—"কে আন্দোলন করবে তারা? ওই স্বাথ—"

মাণিক তাকিয়ে দেখলো—বৃন্দাবনবাবু ঝিমুচ্ছেন। মাণিক সেদিকে তাকিয়ে একটু করুণার হাসি হাসলো।

ভুবনবাবু ডাকতে লাগলেন,—ও বৃন্দাবনবাবু, ও মশাই, ঘুমিয়ে পড়লেন যে একেবারে!

বৃন্দাবনবাবু ঝিমুনি ছেড়ে লজ্জিত হয়ে বল্‌লেন,—না। চোখ দুটো একেবারে এঁটে আসছে ভাই। সমস্ত দিন তো শরীরের ওপর দিয়ে কম ঝক্কি যায়নি! বছরের শুরু। রাজ্যের কাজ!

ভুবনবাবু বল্‌লেন,—তা ঘুমোন। কিন্তু রাতজাগার রুটিনটা তো এখনো তৈরী হলো না।

মাণিক বল্‌লো,—আমি বল্‌লাম তো। আমি একাই জেগে থাকছি।

বৃন্দাবনবাবু বল্‌লেন,—না, না। তা হয় না। আমরা সবাই একঘণ্টা করে জাগবো। তবে, আমার আবার একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার অভ্যাস।

ভুবনবাবু বল্‌লেন,—বেশ, বেশ, তাই হবে। আপনারা সবাই ঘুমিয়ে পড়ুন। আমি একা প্রথম ঘণ্টা জেগে থাকছি। একটু গভীর রাত ছাড়া কিছুতেই আমার আবার ঘুম আসে না।

মাণিক এতক্ষণ বারবার মেয়েটার একান্ত সঙ্কুচিত ভাবটা লক্ষ্য করছিল। এবার তাকাতে গিয়ে ভুবনবাবুর চোখে ধরা পড়ে গিয়ে বল্‌ল,—আপনিও ঘুমিয়ে পড়ুন। আপনি আবার শুধু শুধু রাত জেগে রয়েছেন কেন? আমরা তো আছিই। চিন্তার কী আছে?

ভুবনবাবুও বল্‌লেন,—হ্যাঁ মা, এবার তুমি একটু ঘুমানোর চেষ্টা কর। আমরা তো আছিই—ভয়ের কিছু নেই।

মঞ্জু কোন কথা না বলে ইজি চেয়ারটায় পাশ ফিরে শুলো। মাণিকও চোখ বুঁজলো।

ভুবনবাবু কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে বসে রইলেন। অনেকক্ষণ বিড় বিড় করে গীতার কয়েকটা শ্লোক

আওড়ালেন। তারপর উঠে গিয়ে একবার দরজার ছিট-কিনিগুলো সবকয়টা লাগিয়ে দিয়ে এসে কোটের পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোটবই বের করে কী যেন হিসেব করতে লাগলেন। কিন্তু হিসেব করতে করতে বারবারই লক্ষ্য করতে লাগলেন,—মাণিক আর বৃন্দাবনবাবু শুতে শুতেই ঘুমিয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু মেয়েটা এখনো ছট্‌ফট্‌ করছে। কিছুতেই ও যেন আর ঘুমোতে পারছে না। ভুবনবাবু আরেকবার সমস্ত ঘরটা ভালো করে লক্ষ্য করে নিয়ে নোটবইটা টেবিলের উপর উল্টে রেখে ডাকলেন,—হ্যাঁ মা, ও মনু মা। তুমি ঘুমাচ্ছ না যে বড়!

মনু ইজি চেয়ারটায় সোজা হয়ে বসে বলল,—ঘুম আসছে না।

ভুবনবাবু হেসে বললেন,—একটু অসুবিধে তো হবেই। বিশেষ করে তোমরা মেয়েমানুষ। তবু ঘুমানোর চেষ্টা কর। ঘুমাও, ঘুমাও। শুধু শুধু রাত জাগবে কেন?

মনু চেয়ারটা ছেড়ে আস্তে আস্তে ভুবনবাবুর কাছে এসে বলল,—আমার ভীষণ ভয় করছে।

ভুবনবাবু হেসে বললেন,—কী পাগল মেয়ে! ভয় কী? আমরা এতগুলি লোক আছি এখানে।

মনু চাপা গলায় বলল—আমরা যে মুসলমান!

ভুবনবাবু চমকে উঠলেন—এঁ্যা, তোমরা মুসলমান? তবে যে বললে,—তোমরা চৌধুরী। তোমার নাম মনু।

মনু আরো ভীতভাবে জবাব দিল,—আমি সত্যিই বলেছি। আমরা চৌধুরী। আর আমার বাবা এই নাম রেখেছেন।

ভুবনবাবু যেন মনুর চেয়েও আরো বেশি ভয় পেয়েছেন এমনিভাবে আরো কয়েকবার সমস্ত ঘরটার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন,—তাতে কী হয়েছে? তোমার কোন ভয় নেই। এখানে কেউ তোমার কোন ক্ষতি করবে না। যাও, তুমি শুয়ে পড়োগে। কোন চিন্তা তোমো না। ঘুমিয়ে পড়ো। একঘণ্টার ওপর হতে চলল, ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে। তুমি না ঘুমানো পর্যন্ত আমিও ঘুমাতে পারবো না।

মনু আবার ফিরে গিয়ে ইজি চেয়ারটায় পাশ ফিরে শুলো।

ভুবনবাবু নোট বইয়ের হিসাব বন্ধ করে ওটা পকেটে পুরে রেখে মনুর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন। কী আশ্চর্য! হিন্দুযাত্রও বুঝবার উপায় নেই ও হিন্দু না মুসলমান। ওর দিকে চেয়ে চেয়েই তিনি আরো ঘণ্টা খানেক বিড়বিড় করে গীতার শ্লোক আওড়াতে লাগলেন, আর চট্‌চট্‌ করে মশা মারতে থাকলেন।

ভুবনবাবুর ঘন ঘন মশা মারার শব্দে বৃন্দাবনবাবুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি সোজা হয়ে বসে বলেন,—কী ভুবন-বাবু, ঘুমোবেন নাকি এবার?

ভুবনবাবুর চোখ দুটো ততক্ষণে তন্দ্রায় ভারী হয়ে এসেছে। তিনি বলেন,—হ্যাঁ মশাই, এবার একটু ঘুম আসছে মনে হচ্ছে। রাত তো প্রায় তিনটে হতে চল। আপনি এবার কিছুক্ষণ জেগে থাকুন।

বৃন্দাবনবাবু বলেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন এবার। বৃদ্ধ মানুষ, আপনি আর কতক্ষণ জেগে থাকবেন? ঘুমোন, ঘুমোন।

ভুবনবাবু ইজি চেয়ারটায় গা টান করে দিলেন। তারপর একটু পরেই আবার ধড়মড় করে উঠে বসে খুব চাপা গলায় বৃন্দাবনবাবুকে ডাকলেন,—এই মশাই, শোনেন।

বৃন্দাবনবাবু কোন কিছু বুঝতে না পেরে হকচকিয়ে গিয়ে কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—কি?

ভুবনবাবু বৃন্দাবন সমাদ্দারের কানের একেবারে কাছে মুখ এনে বলেন,—ঐ মাণিক ছোকরাটাকে যেন ডেকে দিয়ে আপনি আবার ঘুমিয়ে পড়বেন না। আপনি একাই জেগে থাকবেন। আর তো মাত্র ঘণ্টা দুয়েক রাত বাকী আছে। দেখতে দেখতেই কেটে যাবে।

বৃন্দাবনবাবু অত একটা কিছু সন্দেহ করে যেসে জিজ্ঞাসা করলেন,—কেন?

ভুবনবাবু খুব চাপা গলায় বলেন,—মেয়েটা মুসলমান।

বৃন্দাবনবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন এমনিভাবে চমকে উঠে বলেন,—আপনি কেমন করে জানলেন?

ভুবনবাবু বলেন,—মেয়েটাই বল।—সাবধান, ঐ মাণিকটা যেন আবার না জানতে পারে। ওরা আবার কলেজের ছেলে—রক্তে ওদের আগুন ধরেই আছে। ওকে আর ডাকাডাকি করবেন না। ও ঘুমিয়ে থাকুক।

বৃন্দাবনবাবু খুব ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলেন ঘুমন্ত

মাণিকের মুখের দিকে, ও তাঁদের কোন কথাবার্তা শুনতে পেয়েছে কিনা। তারপর নিশ্চিন্ত হ'য়ে বল্লেন,—না, না। আপনি ঘুমোন। রোজ রাতে এমনিতেই আমাকে এই সময় উঠে পড়তে হয়। নইলে স্নান খাওয়া করে অফিসের গাড়ী ধরা যায় না। আমি একাই জেগে থাকতে পারবো। আপনি একটু ঘুমোন এবার।—বলে বৃন্দাবনবাবু ম্যাজাটরীর দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে গেলেন।

খানিকক্ষণ বাদে বৃন্দাবনবাবু বাইরে এসে দেখলেন, ভুবনবাবু তখনো তাকিয়ে রয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলেন,—কী মশাই, ঘুমোচ্ছেন না?

ভুবনবাবু চোখ বন্ধ করে বল্লেন,—এই ঘুমোই।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়ুন। আর তো মাত্র ঘণ্টা দেড়েক বাকী আছে রাত ভোর হতে।

ভুবনবাবু চোখ বন্ধ ক'রে পড়ে রইলেন। কিন্তু অনেকক্ষণচেষ্টা করেও কোনমতেও ঘুম নামলোনা তার চোখে। কিছুক্ষণ বাদেই আবার চোখ দুটো খুলে সোজা হয়ে উঠে বসে বল্লেন,—নাঃ। আজ আর কোনমতেই ঘুম নামবে না। শরীরটা একেবারেই চড়ে গেছে!

বৃন্দাবনবাবু তবু বল্লেন,—না, না। বৃদ্ধমানুষ, আপনি কোন মতে ঘুমানোর চেষ্টা করুন। সমস্ত রাত জাগলে শরীর খুব খারাপ হবে।

ভুবনবাবু হেসে বল্লেন,—কী আর খারাপ হবে মশাই? কয়দিন রাতে মোটেই ঘুম হয়না। খুলনায় আমার মামাতো বোনেরা রয়েছে। ওদের কোন খবরই পাওয়া যায়নি। অনেক চেষ্টা করেছি।

বৃন্দাবনবাবু বল্লেন,—আমারো মশাই সেই একই দশা। আমার দাদার ছেলেমেয়েরা সব ঢাকায় থাকে, এতদিনে তারা বেঁচে আছে কিনা একমাত্র ভগবানই জানেন।

বৃন্দাবন সমাদ্দার আর ভুবন ব্যানার্জী দুই জনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। কারো মুখে কোন কথা নেই। উভয়ের চোখে-মুখেই নিদারুণ দুশ্চিন্তার ছাপ। কিছুক্ষণ পরে বৃন্দাবনবাবুই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বল্লেন,—মাঝে মাঝে মনে হয় যেন আমরাও পশু হয়ে গেলেই ভালো হতো। কিন্তু তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই দুজনের চোখ গিয়ে পড়লো সেই মেয়েটার ওপরে। মেয়েটা পরম নিশ্চিন্তে নিঃসাড়ে ঘুমাচ্ছে।

ভুবনবাবু ফিস্‌ফিসিয়ে বল্লেন,—আস্তে। আস্তে বলুন মশাই, ও জেগে উঠবে।

বাস্তবিক, বৃন্দাবনবাবুর মুখেও একটা চরম লজ্জার ভাব ফুটে উঠলো। তিনিও ভুবনবাবুর মতোই খুব আস্তে আস্তে বল্লেন,—সত্যিই, ওরা কী পশু! এমনি নিষ্পাপ মানুষের ওপরে মানুষ কেমন করে পাশবিক নির্যাতন চালায়, কেমন করে তার গলায় ছুরি বসিয়ে দেয়, কেমন করে জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারে—ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়।

ভুবনবাবু আবার সাবধান করে দিলেন,—আস্তে, আস্তে বলুন।

কিন্তু বৃন্দাবনবাবু আর কিছুই বলতে পারলেন না। দুইজনে খালি বসে বসেই কাটিয়ে দিতে লাগলেন মুহূর্তের পর মুহূর্ত। আর তাদের চোখের সামনে ঘুমোচ্ছে একটা মেয়ে। মুসলমানের মেয়ে। পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে মনু।

এমনিভাবে বসে থাকতে থাকতেই কখন ঘড়ির কাঁটা এগুতে এগুতে গিয়ে পাঁচটায় ঠেকেছে। আকাশটা নতুন সূর্যের আলোয় লাল হয়ে উঠলো। নতুন দিনের প্রথম গাড়ীর ঘণ্টা বাজলো ঢং ঢং করে।

ভুবনবাবু এবার হেসে বল্লেন,—আমরা দুই বুড়োই শেষ পর্যন্ত সারাটা রাত জেগে পাহারা দিলাম ছেলেমেয়ে দুটোকে?

বৃন্দাবনবাবু হাসলেন। কোন কথা বল্লেননা।

ইতিমধ্যে গাড়ীর ঘণ্টার শব্দে মাণিকেরও ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে। মাণিক ধড়মড় করে উঠে বসে সলজ্জভঙ্গীতে বল্ল,—একী! রাত শেষ হয়ে গেল অথচ আমাকে ডেকে দেননি! ছি, ছি, আপনারা জেগে রইলেন, আর আমি কিনা ঘুমোলাম?

ভুবনবাবু হেসে বল্লেন,—তাতে কী হয়েছে? বেশতো কেটে গেল রাতটা।

মাণিকের গলার স্বরে মনুরও ততক্ষণে ঘুম ভেঙে গিয়েছে। সেও উঠে বসেছে চেয়ারটায়।

মাণিক জিজ্ঞাসা করলো,—কার্ফু শেষ হয়ে গিয়েছে না?

ভুবনবাবু ষ্টেশনের বাইরের দিককার জানালাটা খুলে

দেখে নিয়ে বল্লেন, তাইতো মনে হচ্ছে ! লোকজন আসা-যাওয়া করছে দেখছি।

মাণিক বল্লো,—তবে চলুন, এবার আমরাও বেরিয়ে পড়ি।

ভুবনবাবু বল্লেন,—চলো।

বৃন্দাবনবাবুও সম্মতি দিলেন।

মাণিক মঞ্জুর কাছে এগিয়ে এসে বল্লো,—চলুন, আপনাকে বাসে উঠিয়ে দিয়ে আসি।

মঞ্জু কিছুক্ষণ হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ভুবনবাবু আর বৃন্দাবনবাবু মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলেন।

কিন্তু কেউই কোন কথা বললেননা। মঞ্জু মাণিকের পিছন পিছন ওয়েটিংরুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় নেমে মাণিক মঞ্জুকে বল্লো,—শুনুন, আপনাকে কেউ যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে, তবে নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দেবেন।

নিমেষে মঞ্জুর মুখটা কাগজের মত সাদা হয়ে গেল। ভয় পেয়েছে বুঝতে পেরে মাণিক বল্লে,—আমি জানতাম। আমার বোন সুপ্রভার কাছে আপনার কথা অনেকবার শুনেছি। আপনার কোন ভয় নেই, চলুন।

মঞ্জু মাণিকের পিছন পিছন বাসষ্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়ালো। দিনের প্রথম বাস তখন ছাড়বার সময় হয়ে গিয়েছে। মাণিক মঞ্জুকে বাসে তুলে দিয়ে একজন চেনা কণ্ডাক্টরকে ডেকে বল্লে,—আমার আত্মীয়া, আহুলিয়া যাবেন। টিকিটটা নামিয়ে নেবেন।

বাস ছাড়া পর্যন্ত মাণিক বাসষ্ট্যাণ্ডেই দাঁড়িয়েছিল। বাসটা ছেড়ে দিলে ও যখন ফিরে আসছিল তখনই পথের মাঝে দেখা ভুবনবাবু আর বৃন্দাবনবাবুর সাথে। মাণিক আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো,—আরে, আপনারা এদিকে ?

ভুবনবাবু একটু হেসে বল্লেন,—না, এই মানে দেখতে এলাম। দিনকালতো ভালো নয়। বলা যায়না, কোথা থেকে কোন্ বিপদ এসে পড়ে। মেয়েটা আবার মুসলমান কিনা !

মাণিক যেন এই প্রথম সেই আশ্চর্য সংবাদটা শুনলো এমনি ভঙ্গীতে বল্লো,—তাই নাকি ? আপনারা জানলেন কী করে ?

বৃন্দাবনবাবু বল্লেন,—মেয়েটা যে বস্তু গত রাত্রে।

মাণিক গম্ভীরভাবে শুধু একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর করলো, হোকগে।—তারপর তিন জনেই একই রাস্তায় তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল্লো। রাস্তার ওপরে তখন নতুন সূর্যের সোনালী আলোর ঢল নেমেছে।

যাত্রা

নির্জন প্রাণ, শালবন ছায়, সরযূরেখাপথ ধ'রে,
চলেছি দুজনে, কুয়াশা জড়ানো শিশির-সিক্ত ভোরে।
শুনেছি এ পথে অনতি-অদূরে নদী বয় কল-স্বরা,
পায়ে পায়ে তার পাথর ছড়ানো, ঠেলে চলে সে প্রহরা,
বালুতটে তার আলো ঝলকায় প্রভাতী রৌদ্র প'ড়ে।

বহে অনাবিলা স্বচ্ছসলিলা শৈলজা প্রবাহিনী,
মুক্তা-ধারায় অবগাহি দোঁহে গাব অনাহত বাণী।
মন্দিরে সেথা জাগেন বিজনে বিরাজ-গিরিজানাথ,
সিনানের বারি শিরে ঢালি তাঁর, নিবেদিব প্রণিপাত,
কি মাগিবে জানি, তুমি জান আমি
কি মাগিব পূজা ক'রে।

কথা, সুর ও স্বরলিপি : গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

III(সধ ধণ ধপপ | পধম ধপপ | সরগ মপগ | মপপ - - - -) |
নি॰ র্জ নপ্রা ণ শা লব ন ছা য় প থ রে খা প থ ধ॰ ০ রে ০ ০ ০
ম পধণ র্সর্স | ণপ র্সণণধ | পপপপপস ণ | ণ ধর্স ণ - - |
চ লেছি দু জনে কু য়াসা জড়া নো শি শি রসি ক্ত ভো ০ রে ০ ০ ০

স র গ ম প গ । প - ম - - -॥

প দ রে ধা প ধ ধ • রে • • •
॥ মধ ধ প ধ ধ । ধ ধ ণ ধ প প । ধ ণ র্স - - - । - - - - প প ।

শু • নে ছি এ প থে অ ন তি দূ রে ন দী ব • • হ্ • • • • ন দী
পধ ণর্স র্রর্স র্রর্স ণ ধ । প ধ - - - - । ধ ণ ধ প ধ পস । প প প প প প ।

হ • • • • • • ক ল ঝ রা • • • • পা রে পা রে তা • রু পা খ র ছ ড়া নো
র্স র্স ণ ধ প ধ । প প ম - - - । র্গ র্গ র্র র্স র্র র্স র্স । ম প ধ ণ ধ ণ ।

ঢে লে ঢ লে • সে প্র হ রা • • • বা লু তটে • তা র আ লো • • ঝ ল
র্স - - - - - । ম ম ম গ গ র । র গ র - - - - ॥

ক্ষ • • ণ্ • • প্র ভা তী রে উ ড়ে প • ড়ে • • • •
॥ ম ন ম গ র গ । র - - স - - । স স র ধ স র গ । ম - - - - - ।

ব ে ছ না • বি লা • • • • • ম • • ছ • লি লা • • • • •
গ গ ম প - - । প ণ ধ - ম । ন ন ন ন ন ন । ন র্স র্স র্র র্স ম গ ।

কে ই ল ভা • • প্র বা হি নী • • মু ক্ত ধা রা য় অ ব গা • হি দৌ হে
ম ধ ধ - • - । ণ ণ ধ প ধ প । ম - - - - - ।

গা ব • • • • অ না হ ত • বা ণী • • • • •
র্স র্গ র্গ র্গ র্র র্র র্স । র্র র্র র্স - র্র র্র । র্স - - - - - । ম প ধ ণ ধ প ।

ম নু ষি রে সে খা আ সে • ন্ বি জ নে • • • • • বি রা জ গি রি জা
র্স - - - - - - । ন ন ন ন র্স র্স র্স । র্স র্র র্স ণ ধ ধ । প ধ প র্স র্স ণ ।

না • • • • ধ্ সি না নে • রু বা রি শি রে চা লি তা র, নি বে দি ব প্র তি
ধ - - - - - - । ম ন ম গ র গ । গ্র র - - - - । র্গ র্গ র্গ র্র র্স র্র ।

পা • • • • ত্ কি মা গি রে • জা নি • • • • • তু মি জা নো আ •
র্স - - - ন ম । ম প ধ ণ ধ প । প র্স র্স র্স - - - ॥ ॥

মি • • •, আ মি কি মা গি র পূ জা ক • রে • • •

কোষ্ঠীর বিচার

জ্যোতি বাচস্পতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্বতুঙ্গ ও স্বনীচ

প্রাচ্য জ্যোতিষে প্রত্যেক গ্রহের শুধু তুঙ্গ ও নীচ রাশিই নির্ণয় করা হয়নি, রাশির কোন অংশে গ্রহটি তুঙ্গের বা নীচের ফল সবচেয়ে বেশী পেয়ে তা-ও কল্পনা ক'রে সেই অংশটীকে গ্রহের স্বতুঙ্গাংশ বা স্বনীচাংশ আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এই হিসাবে, মেষের দশম অংশ রবির স্বতুঙ্গাংশ এবং এবং তুলার দশমাংশ রবির স্বনীচাংশ। তেমনি বৃষের তৃতীয় ও বৃশ্চিকের তৃতীয় অংশ যথাক্রমে চন্দ্রের স্বতুঙ্গাংশ ও স্বনীচাংশ। মকরের ২৮ অংশে ও কর্কটের ২৮ অংশে মঙ্গল, কন্যার ১৫ অংশে ও মীনের ১৫ অংশে বুধ, কর্কটের ৫ অংশে ও মকরের ৫ অংশে বৃহস্পতি, মীনের ২৭ অংশে ও কন্যার ২৭ অংশে শুক্র, তুলার ২০ অংশে ও মেষের ২০ অংশে শনি, মিথুনের ২০ অংশে ও ধনুর ২০ অংশে রাহু এবং ধনুর ২০ অংশে ও মিথুনের ২০ অংশে কেতু যথাক্রমে স্বতুঙ্গী ও স্বনীচস্থ হ'য়ে থাকেন। প্রাচ্য জ্যোতিষে প্রজাপতি, বরুণ ও রুদ্রের কোন উল্লেখ না থাকায় তাদের তুঙ্গাংশ বা নীচাংশ নির্ণয় করা হয় নি।

এই তুঙ্গাংশ ও নীচাংশের অনেক ব্যবহার প্রাচ্য জ্যোতিষে দেখা যায়, কিন্তু বাস্তবিক এদের কতখানি উপযোগিতা আছে তা পরীক্ষা ও গবেষণার বিষয়। অনেকে বলেন গ্রহ তুঙ্গাংশের দিকে অগ্রসর হলেই বলবান হয় এবং তুঙ্গাংশ পেরিয়ে গেলেই দুর্বল হয়। বাস্তবিক, তুঙ্গাভিমুখী ও তুঙ্গচ্যুত গ্রহের বলাবল সম্বন্ধে এই ধারণার গুরুত্ব আছে কিনা সন্দেহ। কেননা অনেক গ্রন্থে এও পাওয়া যায় যে, যে গ্রহ তুঙ্গাংশের যত কাছে থাকে, সে তত দুর্বল।

আমার নিজের, অভিজ্ঞতায় আমি তুঙ্গাংশের বা নীচাংশের বিশেষ কোন সার্থকতা পাইনি। তবে তুঙ্গরাশি বা নীচরাশির যে একটা মূল্য আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, যদিও তুঙ্গী গ্রহকে যে ভাবে ব্যাখ্যান হয়েছে, তারও সার্থকতা কোথাও দেখিনি। কতকগুলি বচনে তুঙ্গী গ্রহ সম্বন্ধে নানারূপ অত্যুক্তি থাকাতে, অনেক শিক্ষার্থী তুঙ্গী গ্রহ সম্বন্ধে এমন ধারণা নিজের মনে ক'রে নিয়েছেন, যে কারও কুণ্ডলীতে তুঙ্গীগ্রহের বাহুল্য দেখলেই তাঁরা জাতককে আকাশে তোলেন। তাঁদের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, তাঁরা যদি ১৩০, কিম্বা ১৩০২ সালে যাঁদের জন্ম তাঁদের কোষ্ঠী পরীক্ষা করেন, তা'হলে এমন ঢের কোষ্ঠী পাবেন যাতে দুটো, তিনটে, চারটে, এমন কি পাঁচটা পর্য্যন্ত গ্রহ তুঙ্গী হয়ে আছে। সেই সব জাতকের জীবনের ফলাফল শিক্ষার্থীকে বুঝিয়ে দেবে যে, গ্রহ তুঙ্গী হ'লেই রাজা, মহারাজা বা খাতিমান্ হওয়া যায় না। বস্তুতঃ কোষ্ঠী বিচার শিখতে হ'লে তুঙ্গ ও স্বক্ষেত্র সম্বন্ধে অতিরিক্ত ধারণা ত্যাগ করা দরকার।

গ্রহদের মূলত্রিকোণ

গ্রহদের স্বক্ষেত্র ও তুঙ্গস্থান যেমন ঠিক করা হয়েছে, তেমনি এক একটি রাশিকে এক একটি গ্রহের মূলত্রিকোণ ব'লে ঠিক করা হয়েছে। যেমন—

রবির	মূলত্রিকোণ	সিংহ
চন্দ্রের	,,	বৃষ
মঙ্গলের	,,	মেষ
বুধের	,,	কন্যা
বৃহস্পতির	,,	ধনু
শুক্রের	,,	তুলা
শনির	,,	কুম্ভ
রাহুর	,,	কুম্ভ
কেতুর	,,	সিংহ

প্রজাপতি, বরুণ ও রুদ্রের প্রাচ্য জ্যোতিষে উল্লেখ না থাকায়, তাদের মূলত্রিকোণ সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নি।

উপরে মূলত্রিকোণ তালিকাটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, চন্দ্র ও রাহু-কেতু ছাড়া অন্য সব গ্রহের মূলত্রিকোণ তাদের স্বক্ষেত্রও বটে। চন্দ্রের তুঙ্গ রাশি তার মূলত্রিকোণ। রাহু-কেতুর মূলত্রিকোণ তাদের তুঙ্গ রাশির নবম রাশিতে। মূলত্রিকোণের অর্থ ও সার্থকতা যে কি তা বোঝা দুষ্কর। বস্তুতঃ মূলত্রিকোণ সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলা আছে যে, মূলত্রিকোণে গ্রহের বল স্বক্ষেত্রের চেয়ে বেশী এবং তুঙ্গের চেয়ে কম। কিন্তু বল কষবার বেলায় আবার কোন কোন গ্রন্থে তুঙ্গের চেয়ে স্বক্ষেত্রে বলই বেশী ধরা হয়েছে, এবং সেখানে মূলত্রিকোণ ও স্বক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করা হয় নি। মূলত্রিকোণের আর একটি প্রয়োগ পাওয়া যায়—কতকগুলি গ্রন্থে যে শত্রু-মিত্রের তালিকা আছে সে তালিকা প্রস্তুতের বেলায়। কিন্তু সে হিসাবে শত্রু-মিত্র নিরূপণ যুক্তি ও বিজ্ঞানের বিরোধী। *

প্রাচ্যেরা কেবল যে মূলত্রিকোণের রাশিই ঠিক করেছেন, তা নয়, কুষ্ঠীর মত তাঁরা প্রত্যেক গ্রহের মূলত্রিকোণের অংশও ঠিক করেছেন। যেমন সিংহের ২০ অংশ রবির, বৃষের ৩০ অংশ চন্দ্রের, মেষের ১২ অংশ মঙ্গলের, কন্যার ২৫ অংশ বুধের, ধনুর ১০ অংশ বৃহস্পতির, তুলার ১৫ অংশ শুক্রের এবং কুম্ভের ২০ অংশ শনির মূলত্রিকোণ। এই মূলত্রিকোণে অংশের প্রয়োগ বা সার্থকতা যে কি তা বোঝা মুস্কিল।

নাশস্থান

প্রত্যেক গ্রহের তুঙ্গস্থানের সপ্তম রাশিকে যেমন তার নীচস্থান বলে, তেমনি স্বক্ষেত্রের সপ্তম রাশিকে বলে তার নাশস্থান। এই হিসাবে—

রবির	নাশস্থান	কুম্ভ
চন্দ্রের	,,	মকর
মঙ্গলের	,,	বৃষ ও তুলা
বুধের	,,	ধনু ও মীন
বৃহস্পতির	,,	মিথুন ও কন্যা
শুক্রের	,,	মেষ ও বৃশ্চিক
শনির	,,	কর্কট ও সিংহ
রাহুর	,,	বৃশ্চিক
কেতুর	,,	বৃষ
প্রজাপতির	,,	সিংহ
বরুণের	,,	কন্যা
রুদ্রের	,,	মীন

নীচস্থানের মত নাশস্থানেও গ্রহের বাইরের দিকটা অভিব্যক্ত হয় বেশী। বাইরের অভিব্যক্তিতে বাহ্য জগতের সঙ্গে একটা সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। কাজেই, নাশস্থানে থাকলে, গ্রহের ভাব-প্রকাশে বাধা-বিঘ্ন, ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হয়। সেই হিসাবে বলা হয় যে, গ্রহ নাশস্থানে দুর্বল হ'য়ে পড়ে। অনেকের মনে হতে পারে যে কোন একটি গ্রহ নাশস্থানে থাকলে তার স্বক্ষেত্রে পূর্ণদৃষ্টি ত থাকলই, তা'হলে সে দুর্বল হবে কেন? এইখানে একটা কথা ভেবে দেখা দরকার—গ্রহ স্বক্ষেত্রে পূর্ণ দৃষ্টি করলে, কোনটি বলবান হয় রাশিটি না গ্রহটি? বস্তুতঃ অধিপতির পূর্ণ দৃষ্টিতে কেহই বলবান্ হয়, অধিপতির বলাবল অন্য ব্যাপারের উপর নির্ভর করে?

রাশি, গ্রহ ও ভাবের পরস্পরের সম্বন্ধ

আগে বলেছি যে ফলিত জ্যোতিষের বিচারের ভিত্তি হচ্ছে রাশি, নক্ষত্র, গ্রহ ও ভাব। নক্ষত্রের কথা পরে বলছি। কেন না নক্ষত্র ধ'রে বিচার একটা স্বতন্ত্র জিনিষ। পোড়াতে দেখা যাক্ বারটি রাশি, বারটি ভাব ও বারটি গ্রহের মধ্যে যোগাযোগ হয় কেমন ক'রে এবং সেই যোগ-যোগ বা সম্বন্ধ কত রকমের হ'তে পারে। এই সম্বন্ধগুলি আমরা এই ভাবে সাজাতে পারি—

(১) রাশির সঙ্গে রাশির সম্বন্ধ
(২) রাশির সঙ্গে ভাবের সম্বন্ধ
(৩) রাশির সঙ্গে গ্রহের সম্বন্ধ
(৪) ভাবের সঙ্গে ভাবের সম্বন্ধ
(৫) ভাবের সঙ্গে গ্রহের সম্বন্ধ
(৬) গ্রহের সঙ্গে গ্রহের সম্বন্ধ

রাশির সঙ্গে রাশির সম্বন্ধ

একটা রাশির সঙ্গে আর একটা রাশির সম্বন্ধ হয়

* মতটি এই—প্রত্যেক গ্রহের মূলত্রিকোণ থেকে দ্বিতীয়-দ্বাদশ, চতুর্থ-অষ্টম ও পঞ্চম-নবম রাশির অধিপতি এবং তার তুঙ্গ রাশির অধিপতি সেই গ্রহের মিত্র, অন্য রাশির অধিপতি তার শত্রু। অনেক গ্রহের দুটি ক'রে ক্ষেত্র আছে, কাজেই দুই ক্ষেত্র হিসাবে যদি গ্রহটি মিত্র হয় বা দুই ক্ষেত্র হিসাবে শত্রু হয়, মিত্র বা শত্রু হবে। এক হিসাবে শত্রু ও অপর হিসাবে মিত্র হ'লে হবে সম।

গ্রহের মধ্য দিয়ে। যদি একই গ্রহ দুটি রাশির অধিপতি হয়, তাহ'লে সেই দুটি রাশির মধ্যে একটা যোগাযোগ ঘটে, এই সম্বন্ধ নৈসর্গিক এবং সকল কোষ্ঠীতেই এই সম্বন্ধ একই রকমের। এই হিসাবে মেষ-বৃশ্চিক, বৃষ-তুলা, মিথুন-কন্যা, ধনু-মীন, মকর-কুম্ভ— এই সব এক এক জোড়া রাশি পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট।

রাশির সঙ্গে ভাবের সম্বন্ধ

একটা রাশির সঙ্গে ভাবের সম্বন্ধ হয় সেই ভাবের সম্বন্ধ দিয়ে। কোন রাশিতে যদি একটা ভাব পড়ে তাহলেই সেই ভাব এবং সেই রাশির মধ্যে একটা যোগ হয়। যেমন কর্কটে যদি কারো লগ্ন পড়ে—তাহ'লে সেক্ষেত্রে কর্কট রাশি এবং লগ্নভাব এই দুইটি যেন একই পদার্থ হয়ে পড়ে, এবং সেখানে লগ্নের কারকত্ব এবং কর্কট-রাশির স্বভাব দুটি মিশে গিয়ে একটি বিশেষ ফল হয়। তেমনি যদি কোন কোষ্ঠীতে কর্কটে পঞ্চম ভাব পড়ে, তাহলে সেই কোষ্ঠীতে পঞ্চম ভাবের সব ব্যাপার কর্কটরাশির গুণ-স্বভাবের সঙ্গে মিশে যায়।

রাশির সঙ্গে গ্রহের সম্বন্ধ

এক একটা রাশির সঙ্গে এক একটা গ্রহের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, সে হিসাবে একটা রাশি একটা গ্রহের স্বক্ষেত্র, তুঙ্গস্থান, নীচস্থান বা নাশস্থানে হয়ে থাকে, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এ সম্বন্ধগুলি অপরিবর্তনীয়। প্রত্যেক কোষ্ঠীতে এগুলি একই। কিন্তু এছাড়াও গ্রহের সাময়িক আহ্বানের জন্য এক একটি রাশির সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ হয়, যা সেই গ্রহের গতির দ্বারা মাঝে মাঝে পরিবর্তিত হয়। এই সম্বন্ধ হয় দু'রকমে, এক গ্রহের স্থিতির দ্বারা—অপর গ্রহের দৃষ্টির দ্বারা।

একটা গ্রহ যে রাশিতে থাকে সেই রাশির সঙ্গে তার সাময়িক সম্বন্ধ হয় এবং সেই রাশিতে থেকে যে সকল রাশির উপর সে দৃষ্টি করে সেগুলির সঙ্গেও তার একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এ দৃষ্টির নিয়ম নীচে লেখা হ'ল।

গ্রহের দৃষ্টি

আমরা সহজ বুদ্ধিতেই বুঝতে পারি যে একটা গ্রহ যে রাশিতে থাকে, সেই রাশির উপর তার প্রভাব পড়ে এবং সে নিজেও সেই রাশির দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই প্রভাব ছাড়াও আর্যা-ঋষিরা আবিষ্কার করেছিলেন যে প্রত্যেক গ্রহ যে রাশিতে থাকে তার বিপরীত রাশির উপর (অর্থাৎ তার স্থিত রাশি থেকে গুণে সপ্তম রাশির উপর) একটা প্রভাব বিস্তার করে। রাহু ও কেতুর বেলা কিন্তু এই সপ্তম রাশিতে দৃষ্টি ধরা হয় না, কেন না রাহু ও কেতু এই দুটি বিন্দু বা পাতগ্রহ সব সময়েই পরস্পর থেকে সপ্তমস্থ। কাজেই রাহুর সপ্তম দৃষ্টির মানেই কেতুর অবস্থিতি এবং কেতুর সপ্তম দৃষ্টির অর্থ রাহুর রাশিস্থিতি। কয়েকটি গ্রহের দৃষ্ট তার স্থিতরাশি থেকে সপ্তম রাশি ছাড়াও অন্য কতকগুলি রাশির উপরে পড়ে। যেমন—

মঙ্গলের—তার স্থিতরাশি থেকে চতুর্থ ও অষ্টম রাশির উপর।

বৃহস্পতির—তার স্থিতরাশি থেকে পঞ্চম ও নবম রাশির উপর।

শনির—তার স্থিতরাশি থেকে তৃতীয় ও দশম রাশির উপর।

রাহুর—সপ্তমে দৃষ্টি নেই, কিন্তু সে তার স্থিতরাশি থেকে পঞ্চম, নবম, ও দ্বাদশ রাশিতে দৃষ্টি দেয়।

প্রজাপতি, বরুণ ও রুদ্রের সপ্তমে দৃষ্টি নিশ্চয় আছে, কেন না গ্রহ মাত্রেরই তার স্থিতরাশি থেকে সপ্তম রাশির একটা প্রভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু অন্য কোন রাশিতে তাদের দৃষ্টি পড়ে কি না, এবং পড়লে তা কোন্ কোন্ রাশিতে পড়ে তা গবেষণার বিষয়। খুব সম্ভব অন্য দু'টি ক'রে রাশির উপরও এদের দৃষ্টি পড়ে, কেন না, এই তিনটি গ্রহ যখন আবিষ্কৃত হয়নি, তখন আবিষ্কৃত গ্রহগুলির মধ্যে প্রত্যেক Major Planet এর দৃষ্টি তিনটি ক'রে রাশির উপর কল্পিত হ'য়েছিল।

গ্রহের স্থিতি ও দৃষ্টিতে একটু প্রভেদ আছে, স্থিতির সম্বন্ধটা বেশী প্রবল। কেন না, রাশিতে গ্রহের অবস্থানের জন্য সেই রাশির উপর যেমন গ্রহটির প্রভাব পড়ে, তেমনি গ্রহটি নিজেও সেই রাশির দ্বারা প্রভাবিত হয়। দৃষ্টির বেলায় কিন্তু রাশিটিই শুধু গ্রহের প্রভাব পায়, দৃষ্ট রাশির প্রভাব গ্রহের উপর পড়ে না।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদনা : শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

নিউজিল্যাণ্ড বনাম ভারতবর্ষ ঃ

প্রথম টেস্ট, মাদ্রাজ

ভারতবর্ষ : ৩৯৭ রান (কাকত ইঞ্জিনীয়ার ৯০, বাপু নাদকার্ণী ৭৫, চাদু বোরদে ৬৮ এবং এম এল জয়সীমা ৫১ রান। মন্ত্র ৮৭ রানে ৩, ভিক্টর পোলার্ড ১০ রানে ৩ এবং ইউল ৬২ রানে ২ উইকেট) এবং ১৯৯ রান (২ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। মঞ্জরেকার নট আউট ১০২ এবং এম এল জয়সীমা ৫১ রান)

নিউজিল্যাণ্ড : ৩১৫ রান (বার্ট সাটক্লিফ ৫৬ এবং জন রীড ৪২ রান। দুরাণী ৫৩ রানে ৩ উইকেট) এবং ৬২ রান (কোন উইকেট না পড়ে। ভাউলিং নট আউট ২১ এবং টেরী জার্ভিস নটআউট ৪০ রান)

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্ট খেলার চতুর্থ অর্থাৎ শেষ দিনে ৩১৫ রানের মাথায় নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হ'লে ভারতবর্ষ ৮২ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের ১৯৯ রানের (২ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। একঘণ্টার খেলার সময় হাতে নিয়ে এবং ২৮১ রানের পিছনে পড়ে নিউজিল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় কোন উইকেট না খুইয়ে ৬২ রান তুলেছিল। ফলে খেলা অমীমাংসিত থেকে যায়।

দ্বিতীয় টেস্ট, কলকাতা

নিউজিল্যাণ্ড : ৪৬২ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। বার্ট সাটক্লিফ নট আউট ১৪১, ক্রস টেলর ১০৪ এবং জন রীড ৮২। দেশাই ১২৮ রানে ৪ এবং ভেঙ্কটরাঘবন ৮৬ রানে ৩ উইকেট) এবং ১৯১ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। পোলার্ড ৪৩ এবং ভিভিয়ান ৪৩। ভেঙ্কটরাঘবন ১৫ রানে ৩ এবং দুরাণী ৩৪ রানে ২ উইকেট)

ভারতবর্ষ : ৩৮০ রান (পাতৌদি ১৪৩ এবং চাদু বোরদে ৬২ রান। টেলর ৮৬ রানে ৫ এবং ইউল ৪৩ রানে ৩ উইকেট) এবং ৯২ রান (৩ উইকেটে। ইঞ্জিনীয়ার ৪৫ রান)

কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা ড্র যায়।

তৃতীয় দিনে ৩৮০ রানের মাথায় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হলে নিউজিল্যাণ্ড ৮২ রানে অগ্রগামী হয়ে এই দিনের সামান্য খেলার সময়ে একটা উইকেট খুইয়ে ৪ রান তুলেছিল। চতুর্থ অর্থাৎ শেষ দিনে ১৯১ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় নিউজিল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলার বাকি ৫৫ মিনিট সময়ে ভারতবর্ষের তিনটে উইকেটে পড়ে ৯২ রান উঠেছিল।

তৃতীয় টেস্ট, বোম্বাই

নিউজিল্যাণ্ড : ২৯৭ রান (গ্রাহাম ভাউলিং ১২৯ এবং রস মর্গান ৭১ রান। দেশাই ৫৬ রানে ৬ এবং দুরাণী ২৬ রানে ২ উইকেট) ও ৮০ রান (৮ উইকেটে। টেলর ২১ রান। চন্দ্রশেখর ২৪ রানে ৩, দুরাণী ১৬ রানে ২ এবং জয়সীমা ৪ রানে ১ উইকেট)

ভারতবর্ষ : ৮৮ রান (বোরদে ২৫ রান। টেলর ২৬ রানে ৫, মঞ্জ ৩০ রানে ২ এবং কণ্ট্রাক্টর ২১ রানে ২ উইকেট) ও ৪৬৩ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সারদেশাই নটআউট ২০০, বোরদে ১০৯, হনুমন্ত সিং নটআউট ৭৫ এবং জয়সীমা ৪৭ রান। টেলর ৭৬ রানে ৩ উইকেট।

বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; এই দিনের খেলায় ১৬টা উইকেটের পতন—নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের শেষ পাঁচটা, ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের দশটা (মাত্র ৮৮ রানে) এবং দ্বিতীয় ইনিংসের একটা। এই ষোলটা উইকেট পড়ে ১৭৬ রান উঠেছিল। নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় ভারতবর্ষের এই ৮৮ রান সর্ব্ব নিম্ন রানের রেকর্ড।

ভারতবর্ষের অনুকূলে খেলার মোড় ঘুরিয়ে ছিলেন সারদেশাই, জয়সীমা এবং বোরদে। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে ভারতবর্ষের ২য় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৫ উইকেটে ২৮১। উইকেটে অপরাজিত ছিলেন সারদেশাই (২১ রান) এবং হনুমন্ত সিংহ (৩ রান)।

চতুর্থদিনে লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের রান ছিল ৪০২ (৫ উইকেটে) ; অপরাজিত ছিলেন সারদেশাই (১৪৮ রান) এবং হনুমন্ত সিং (৬৭ রান)। ৪৬৩ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়। সারদেশাই (নট আউট ২০০) এবং হনুমন্ত সিং (নটআউট ৭৫) ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে যে ১৯৩ রান তুলেছিলেন তা যে-কোন দেশের বিপক্ষে সরকারী টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের ৬ষ্ঠ উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড। ১৫০ মিনিট খেলার সময় হাতে নিয়ে, নিউজিল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। এই সময়ে ২৫৫ রান তুলে খেলায় জয়লাভ করা নিউজিল্যাণ্ড দলের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং সকলেই ভেবেছিলেন এই তৃতীয় টেস্ট খেলাও গতানুগতিক ড্র হবে, খেলা যে দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি করবে তা কেউ কল্পনা করেনি। নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় কোন রান সংগ্রহ করার আগেই দুটো উইকেট পড়ে যায়।

তারপর ১৮ রানে ৩য়, ৩৪ রানে ৪র্থ, ৩৭ রানে ৫ম, ৫৫ রানে ৬ষ্ঠ, ৪৬ রানে ৭ম এবং ৭৬ রানের মাথায় ৮ম উইকেট পড়ে। চা-পানের বিরতির সময় নিউজিল্যাণ্ডের তিনটি উইকেট পড়ে মাত্র ২৮ রান দাঁড়িয়েছিল। দলের ৩৭ রানের মাথায় যখন ৫ম উইকেট পড়ে তখন খেলা শেষ হ'তে ৪৫ মিনিট বাকি ছিল। খেলায় তখন দারুণ উত্তেজনা। ৭৬ রানের মাথায় নিউজিল্যাণ্ডের ৮ম উইকেট পড়ে—তাতে তখন খেলার সময় ছিল মাত্র পাঁচ মিনিট। এই সময়ে নিউজিল্যাণ্ডের আর কোন উইকেট পড়েনি। সুতরাং প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি ক'রে খেলাটি শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিতই থেকে গেল।

চতুর্থ টেস্ট, দিল্লী :

নিউজিল্যাণ্ড : ২৬২ রান (মর্গান ৮২ এবং কণ্ট্রাক্টর ৪৮ রান। ভেঙ্কটরাঘবন ৭২ রানে ৮ এবং চন্দ্রশেখর ২৬ রানে ২ উইকেট) ও ২৭২ রান (ডাভিস ৭৭, সাটক্লিফ ৫৪ এবং কলিন্স ৫৪ রান। ভেঙ্কটরাঘবন ৮০ রানে ৪, সুব্রহ্মনিয়াম ৩২ রানে ২ এবং চন্দ্রশেখর ৯৫ রানে ২ উইকেট)।

ভারতবর্ষ : ৪৬৫ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। পাতৌদি ১১৩, সারদেশাই ১০৬, বোরদে ৮৭ এবং হনুমন্ত সিং ৮২। কলিন্স ৮৯ রানে ৪ উইকেট) ও ৭৩ রান (০ উইকেটে। পাতৌদি ৩০ এবং সারদেশাই নটআউট ২৮ রান)।

দিল্লীর ফিরোজ শাহ কোটলা মাঠের চতুর্থ অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ ১ উইকেটে নিউজিল্যাণ্ডকে পরাজিত ক'রে ১৯৬৫ সালের টেস্ট সিরিজে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে 'রাবার' জয় করে। চারটি টেস্ট খেলার মধ্যে প্রথম তিনটি খেলা ড্র যায়। বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে বিগত ২২টি সরকারী টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষের এই চতুর্থ বার 'রাবার' জয় এবং নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয়। নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষ প্রথম 'রাবার' জয়ী হয় ১৯৫৫-৫৬ সালের সিরিজে।

প্রথম দিনের খেলায় ৭টা উইকেট পড়ে নিউজিল্যাণ্ডের ২৫৫ রান ওঠে। দ্বিতীয় দিনে ২৬২ রানের মাথায় নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হলে ভারতবর্ষ বাকি চার ঘণ্টার খেলায় ১ উইকেট খুইয়ে ৩৩০ রান সংগ্রহ করে।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের পর ৩১ মিনিট ব্যাট ক'রে ৪৬৫

রানের মাথায় (৮ উইকেটে) ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। নিউজিল্যাণ্ড ২০৩ রানের পিছনে পড়ে তৃতীয় দিনের বাকি ১৬০ মিনিটের খেলায় চারটে উইকেট খুইয়ে মাত্র ৯৫ রান তুলেছিল। নিউজিল্যাণ্ড তখনও ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের রানের থেকে ১০৮ রানের পিছনে—এদিকে হাতে জমা ছিল ৬টা উইকেট।

খেলার চতুর্থ অর্থাৎ শেষ দিনে ২৭২ রানের মাথায় যখন নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ হয় তখন হাতে ছিল একঘণ্টা খেলার সময় ছিল এবং খেলা জয় লাভের জন্যে ভারতবর্ষের ৭০ রানের প্রয়োজন ছিল। দারুণ উত্তেজনা নিয়ে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা চলতে থাকে। ভারতবর্ষের ১৩ রানের মাথায় যখন দ্বিতীয় উইকেট পড়ে তখন খেলা ভাঙতে আর ৫০ মিনিট সময় বাকি ছিল এবং জয়লাভের জন্যে ৫৭ রানের প্রয়োজন ছিল। তৃতীয় উইকেটের জুটি পাতৌদি এবং সারদেশাই ঘড়ির কাঁটাকে পিছনে ফেলে রান সংগ্রহ করতে থাকেন। দলের ৬৬ রানের মাথায় পাতৌদি নিজস্ব ২৯ রান ক'রে আউট হ'ন। এই তৃতীয় উইকেটের জুটি দলের ৫৩ রান সংগ্রহ করে। খেলার ১৩ মিনিট বাকি থাকতে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। ভারতবর্ষের ৩ উইকেট পড়ে ৭৩ রান তাতায়—প্রয়োজনের অতিরিক্ত ৩ রান। শেষ চার রান করেন হনুমন্তসিং—তাঁরই ব্যাট থেকে জয়সূচক রান সংগৃহীত হয়।

নতুন রেকর্ড

১৪৩ রান (৮ম উইকেটের জুটিতে): ইঞ্জিনীয়ার এবং নাদকার্নী, মাদ্রাজ (১ম টেস্ট)। এই রান যে-কোন দেশের বিপক্ষে সরকারী টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের ৮ম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড।

৬১ রান (১০ম উইকেটের জুটিতে): ওয়ার্ড এবং কলিন্স, মাদ্রাজ (১ম টেস্ট)। এইরান যে-কোন দেশের বিপক্ষে সরকারী টেস্ট খেলায় নিউজিল্যাণ্ডের ১০ম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড।

১১৩রান (৭ম উইকেটের জুটিতে): বার্ট স্যাটক্লিফ এবং ফ্রস টেলর, কলকাতা (২য় টেস্ট)। এই রান যে কোন দেশের বিপক্ষে সরকারী টেস্ট খেলায় নিউজিল্যাণ্ডের ৭ম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড।

১০৫ রান ফ্রস মেলর (কটিকাতা, ২য় টেস্ট) খেলোয়াড় জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে সেঞ্চুরী—নিউজিল্যাণ্ডের সরকারী টেস্ট খেলার ইতিহাসে এইটি দ্বিতীয় নজির।

৪৬২ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড), কলকাতা ২য় টেস্ট)—ভারতবর্ষের বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় নিউজিল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ রানের নতুন রেকর্ড।

ফ্রস টেলর (নিউজিল্যাণ্ড) ক'লকাতায় তাঁর খেলোয়াড় জীবনের প্রথম সরকারী টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে সেঞ্চুরী রান এবং এক ইনিংসে ৪টা উইকেট পেয়ে প্রথম বিশ্ব রেকর্ড করেন।

৮৮ রান (১ম ইনিংস, বোম্বাই): ভারতবর্ষের এই রান নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড।

১২৩ রান (৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে, বোম্বাই)—সারদেশাই (নট আউট ২০০) এবং হনুমন্ত সিং (নটআউট ৭৫) —যে কোন দেশের বিপক্ষে সরকারী টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের ৬ষ্ঠ উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড।

১২৩ রান (২য় উইকেটের জুটিতে, দিল্লী)—সারদেশাই এবং হনুমন্ত সিং ১ম ইনিংসের খেলায় এই রান তুলে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড করেন।

১০৪ রান (৪র্থ উইকেটের জুটিতে, দিল্লী)—স্যাটক্লিফ এবং জার্ভিস ২য় ইনিংসের খেলায় এই রান তুলে ভারতবর্ষের বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ডের ৪র্থ উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড করেন।

৫১ রান (৯ম উইকেটের জুটিতে, দিল্লী)—কলিন্স এবং ক্যামেরণ ২য় ইনিংসের খেলায় এই রান তুলে নিউজিল্যাণ্ডের পক্ষে ৯ম উইকেট পুটির রেকর্ড করেন।

পাট ও পাঠ

শ্রীশ—

॥ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ॥

পুরাণ জিনিসের সংরক্ষণ যে আবশ্যকীয় তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যাদুঘরে বা মিউজিয়ামে সংরক্ষিত থাকে ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক বিষয়বস্তু, পাঠাগারে বা লাইব্রেরীতে সংগ্রহীত হয়ে থাকে পুরাণ পুঁথিপত্র, শিল্পাগারে বা আর্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত থাকে শিল্পকলার বহু নিদর্শন। এই সব সংরক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে অতীতকে বর্তমানের চোখের সামনে তুলে ধরা এবং তার থেকে শিক্ষা লাভ করা। ইতিহাসকে না জানলে, পুরাণকে না বুঝলে, অতীতকে আস্বাদ না করতে পারলে কোন শিক্ষা, কোন উন্নয়ন, কোন অগ্রগতিই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। তাই এই সংরক্ষণের এত প্রয়োজন।

নানারূপ পুরাণ তত্ত্বের সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মধ্যে এবারে পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চের বিষয়-বস্তুর একটি দপ্তরখানা বা "রেকর্ড রুম" স্থাপিত হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। ভারতের চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চ দপ্তর-খানা (Film and Theatre Archives of India) এ বিষয়ে বিপুল উদ্যমে কাজ করে চলেছেন। রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্র বিষয়ক পুরাণ ঐতিহাসিক কাগজপত্র ইতিমধ্যেই সংগৃহীত হয়েছে এই দপ্তরখানার সংরক্ষণের জন্য। কিছু-কাল পূর্বে ব্যক্তিগত অর্থানুকূল্যে ব্যারাকপুর পৌর এলাকার মধ্যের নোনা-জাফরপুর নামক স্থানে এরূপ একটি দপ্তরখানা স্থাপনের প্রচেষ্টাও হয়েছিল, কিন্তু অর্থা-ভাবে সে প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নি। কিন্তু এবারে পশ্চিম বঙ্গ সরকার এ বিষয়ে আগ্রহী হয়েছেন বলে জানা গেছে এবং তাতে মনে হয় সরকারী ও ব্যক্তিগত সাহায্যে পুষ্ট হয়ে অচিরেই এই সংস্থা তাঁদের নিজস্ব গৃহ স্থাপন করে পূর্ণোদ্যমে কাজ করতে পারবেন এবং ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রের এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নির্মাণেও সকল সাহায্য দিতে পারবেন। আমরা "ফিল্ম এণ্ড থিয়েটার আর্কাইভস অফ ইণ্ডিয়া"র উদ্যোক্তাদের এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার জন্যে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

***

খবরাখবর :

বিখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায় এবার এক চিত্র-তারকা সম্বন্ধীয় কাহিনী অবলম্বনে একখানি বাংলা ছবি তৈরী করছেন। চিত্রটির কাহিনী তিনি নিজেই লিখেছেন। ছবিখানির সঙ্গে এর সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বও তিনি নিজেই নিজেই করেছেন।

ছবির নাম হবে "নায়ক", আর বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল এই ছবির নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন বাংলা চিত্রের নায়কত্রানায়ক উত্তমকুমার। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে উত্তমকুমারের অভিনয়ও এই প্রথম।

চিত্রতারকার ব্যক্তিগত জীবন এবং চিত্রজগত সম্পর্কে আলোকপাতই হ'ল 'নায়ক' ছবিখানির মূল বিষয়বস্তু। ছবিখানির বেশ একটা বড় অংশের স্যুটিং হ'বে এক চলন্ত ট্রেণের মধ্যে।

• • •

এখন সত্যজিৎ রায় যেমন আইভির পরিচালনায় নির্মীয়মাণ "শেক্সপীয়ারওয়ালা" চিত্রের নেপথ্য সঙ্গীত পরি-চালনায় ব্যস্ত।

নিজের পরিচালনাধীন ছবি ছাড়া অপর ছবির সঙ্গীত পরিচালনা শ্রীরায়ের এই প্রথম। ছবিখানি তাঁকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে বলেই তিনি এই দায়িত্ব নিয়েছেন, এই কথাই শ্রীরায় বলেছেন।

ভারতে ভ্রাম্যমাণ এক নাট্যগোষ্ঠীর কাহিনী অবলম্বনে এই চিত্রটি নির্মিত হচ্ছে। বোম্বাইয়ের শশী কাপুর এর নায়ক।

•

ছোট্ট চিত্রের দুই

তরুণ নায়ক

রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্পটিকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করছেন পরিচালক তপন সিংহ। পরিচালক শ্রীসিংহ এই চিত্রটির সঙ্গীত পরিচালনাও করছেন। ইতিমধ্যে ছবিটির কিছু বহিদৃশ্যও গৃহীত হয়েছে। ছবিটির প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন নবাগত পার্থ মুখোপাধ্যায়।

• • •

অজয় কর পরিচালিত "কাঁচকাটা হীরে" ছবির একটি বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে ভূটান সীমান্তের নিকটবর্তী দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে প্রবাহিত জলঢাকা নদীর উপর নির্মীয়মাণ একটি সেতুকে কেন্দ্র করে। এই বহির্দৃশ্যে অংশ গ্রহণ করেন শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায় ও সিলি চক্রবর্তী।

প্রবোধ সান্যালের কাহিনী অবলম্বনে নির্মীয়মান আর-ডি-বি'র এই চিত্রটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন মৃণাল সেন, এর যোজনা করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

• • •

উত্তমকুমার কিশোরের পরবর্তী চিত্রটি হচ্ছে শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাস অবলম্বনে ঐ নামেরই চিত্র।

সুচিত্রা-উত্তম-সৌমিত্র অভিনীত এই ছবিখানি পরিচালনা করছেন সুবোধ মিত্র (কচিবাবু)।

• • •

শ্রীমতী পিকচার্সের নির্মীয়মান 'অভয়া ও শ্রীকান্ত' চিত্রের একটি জাহাজের ডেকের দৃশ্যের সুটিংয়ের জন্য ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে দশ হাজার টাকারও বেশী ব্যয়ে একটি জাহাজের ডেকের সেটটি তৈরী হচ্ছে। 'অভয়া'র ভূমিকায় অভিনয় করছেন মালা সিংহ এবং

ওয়াহীদা রহমান

পরিচালনা করছেন হরিদাস ভট্টাচার্য্য। জাহাজের ডেকের ইন্‌ডোর স্যুটিংয়ের পর প্রকৃত জাহাজ চলার দৃশ্যের স্যুটিং হবে আন্দামানে সমুদ্রবক্ষে।

• • •

জনপ্রিয় "আলিবাবা" কাহিনীর মর্জিনা চরিত্র অবলম্বনে 'চিত্র সাধনা'র প্রথম নিবেদন হবে বাংলা ছবি 'মর্জিনা'।

হিন্দী চিত্রজগতের খ্যাতনাম্নী নৃত্যশিল্পী মধুমতী সম্ভবতঃ এর নামভূমিকায় অভিনয় করবেন বলে মনে হয়।

• • •

টেকনিশিয়ানদের :

প্রযোজক-পরিচালক প্রমোদ চক্রবর্ত্তী তাঁর 'লাভ ইন্ টোকিও' ছবিটির কয়পক্ষে ৭খানি গান জাপানের বিভিন্ন পরিবেশে চিত্রায়িত করবেন বলে স্থির করেছেন। এই ছবির সঙ্গীত-পরিচালক শঙ্কর জয়কিষণ দুটি গান ইতি-মধ্যেই রেকর্ড করে ফেলেছেন। এর মধ্যে নায়িকা আশা পারেখের গানটিতে কণ্ঠদান করেছেন লতা মঙ্গেশকর এবং নায়ক জয় মুখার্জির গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন মহম্মদ রফি।

• • •

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত আর, ডি, বনশালের 'চারুলতা' ছবিটি এবারকার কান্ চলচ্চিত্র উৎসবে পেশ করার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক নির্ব্বাচিত হয়েছে। এই আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব সুরু হচ্ছে আগামী মে মাসে।

• • •

ভারত সরকার মেট্রো-গোল্ডউইন মেয়ার"-এর "মায়া দি ম্যাগনিফিসেন্ট" ছবিখানি তোলার ব্যাপারে হলিউডের কিং ব্রাদার্সকে পূর্ণ সহযোগিতা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এম-জি-এম্ জানিয়েছেন যে, এই ছবি তোলার সময়

ভারত থেকে তিনশ ছাত্র ছিয়ে সাহায্য করা হবে বলে তাঁরা প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন।

• • •

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না ইতালিয়ান চিত্রাভিনেত্রী সোফিয়া লোরেন আরব লীগ-ভুক্ত ১৩টি দেশে আর প্রবেশ করতে পারবেন না বলে জানা গেছে। শুধু তিনিই নয়, তাঁর অভিনীত যে কোনও ছবির এই তেরোটি দেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ বলেও ঘোষিত হয়েছে!

এর কারণ হিসাবে জানা গেছে যে "জুডিতা" নামের একটি ছবিতে অভিনয়ের জন্যই সোফিয়ার উপর এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বলা বাহুল্য "জুডিতা" চিত্রটিও ঐ ১৩টি দেশে নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে। এক ইহুদী রমণীর জীবনকাহিনী অবলম্বনে নির্মিত এই ছবিতে ঐ ইহুদী রমণীর ভূমিকায় অভিনয় করাটাই নাকি সোফিয়ার পক্ষে দোষনীয় হয়েছে এবং সেজন্যই এই শাস্তি!

এই ছবি আরব লীগের ইস্রায়েল্ বয়কট নীতির বিরোধী বলে উত্তর-আফ্রিকা থেকে সুরু করে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের শেষ রাজ্য পর্যন্ত সোফিয়া এবং তাঁর অভিনীত চিত্রের প্রবেশ নিষেধ বলে ঘোষিত হল।

• • •

হলিউডের চিত্রাভিনেত্রী কিম্ নোভাক্ ও বৃটিশ অভিনেতা রিচার্ড জনসন্ বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ আছেন।

বত্রিশ বৎসর বয়স্কা মিস্ নোভাকের এইটিই প্রথম বিবাহ। কিন্তু ৩৭ বৎসর বয়স্ক মিঃ জনসনের বিবাহ আগেও হয়েছিল।

জনসনের সঙ্গে অভিনেত্রী কিম্ নোভাকের প্রথম পরিচয় ঘটে বৃটেনে 'দি অ্যাডভেঞ্চার্স অব মল ফ্ল্যাণ্ডার্স' ছবিটিতে অভিনয় করার সময়। ছবিটিতে তিনি ছিলেন নায়িকা আর জনসন্ হয়েছিলেন নায়ক। বিবাহের পরও ছবির কাজ তাঁরা চালিয়ে যাবেন বলেছেন।

• • •

ইস্রায়েলের "ইরাসমাস্" পুরস্কারটি এবারে দেওয়া হয়েছে চার্লি চ্যাপ্লিন্ ও সুইডিশ চিত্রপরিচালক ইঙ্গমার বার্গম্যানকে। এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের এই পুরস্কার নেদারল্যাণ্ডের রাজা বের্নহার্ড কর্তৃক আগামী ২৬শে জুন আমষ্টারডামে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদত্ত হবে।

ডাচ্ কল্চারাল্ ফাউণ্ডেশন্ গত ১৯৫৮ সাল থেকে প্রতি বৎসর এই পুরস্কার দিয়ে আসছেন সেই সব ব্যক্তি বা সংস্থাকে, ইয়োরোপের সংস্কৃতি বা সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁদের দান উল্লেখযোগ্য।

চার্লি চ্যাপ্লিনকে এই পুরস্কারটি দেওয়া হয় এখনও তিনি চলচ্চিত্রকে তাঁর স্বকীয় প্রতিভায় ঐশ্বর্যশালী করে রেখেছেন বলে। আর ইঙ্গমার বার্গম্যান্ এই পুরস্কারটি লাভ করেন চলচ্চিত্রের উন্নয়ন ও পুনরুত্থানে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য।

• • •

রিচার্ড বার্টন ও পিটার ও'টুল অভিনীত 'বেকেট' ছবিটি বৃটিশ ফিল্ম আকাডেমি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে।

'বেকেট' চিত্রটির সঙ্গে আর যে-সব ছবি বছরের শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে মনোনয়ন লাভ করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে—'ডক্টর স্ট্রেঞ্জলাভ', 'দি পাম্পকিন ইটার' ও 'দি ট্রেন'।

শ্রেষ্ঠ বিদেশী অভিনেতারূপে মনোনয়ন পেয়েছেন ক্যারি গ্রাণ্ট ('অরেঞ্জ'), স্টারলিং হেডেন্ ('ডক্টর স্ট্রেঞ্জলাভ'), মার্সেলো মাস্ত্রোয়ানি ('ইয়েস্টারডে, টুডে এণ্ড টুমরো') এবং সিডনি পইটিয়ার ('লিলিজ অব দি ফিল্ড')

শ্রেষ্ঠ বিদেশী চিত্রাভিনেত্রীর মনোনয়ন পেয়েছেন,—অ্যানে ব্যাম্ক্রফ্ট ('পাম্প-ইটার') এভা গার্ডনার ('দি নাইট অব দি ইগোয়ানা') শার্লে ম্যাক্লেন্ ('ইয়স্ মা হাউস এবং "হোয়াট এ ওয়ে টু গো') এবং কিম্ স্টানলি ('দিয়ার্স অব দি ওয়েট আফটারনুন')।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে ১।৪।৬৫ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

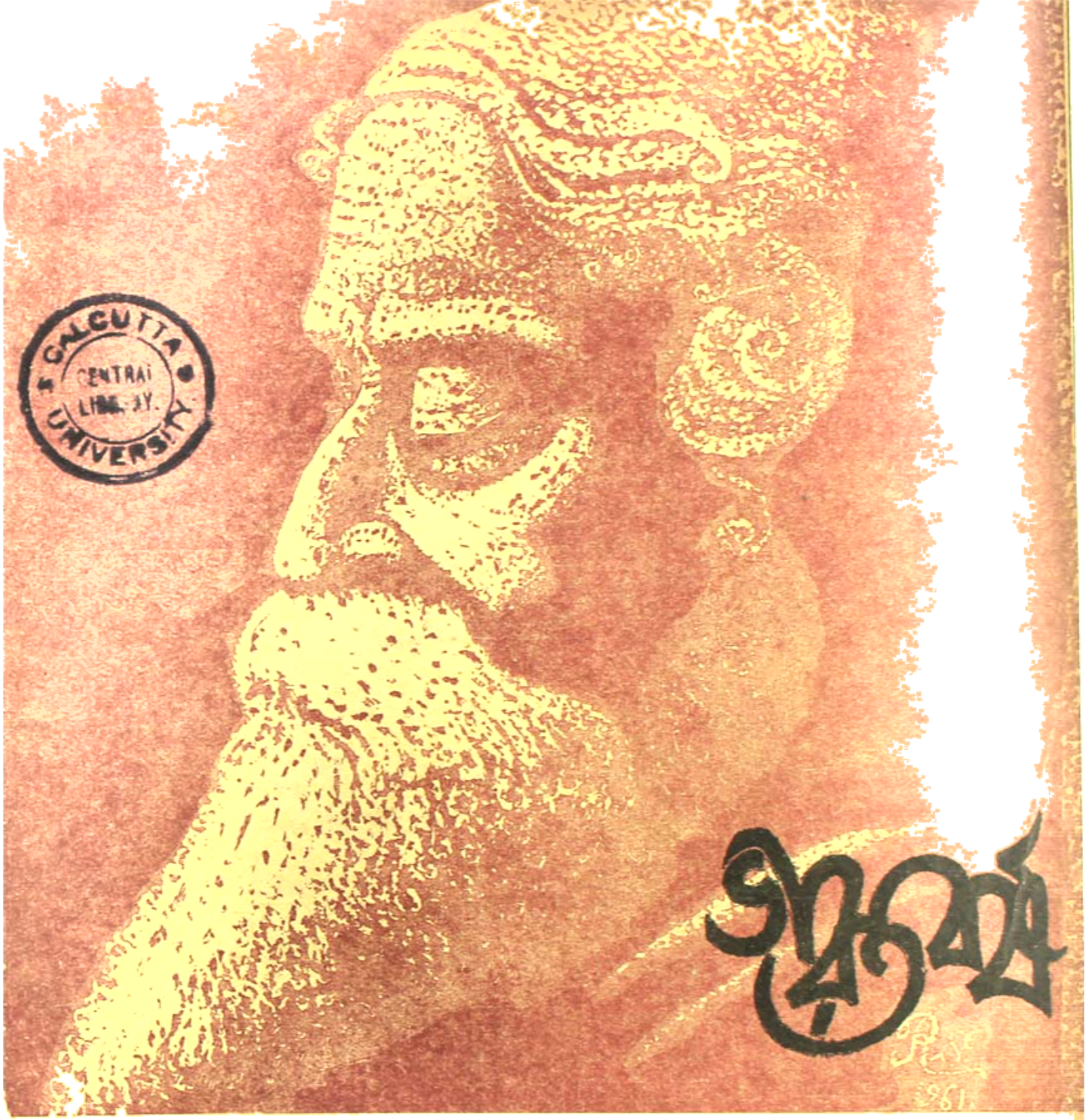

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

প্রবাসী

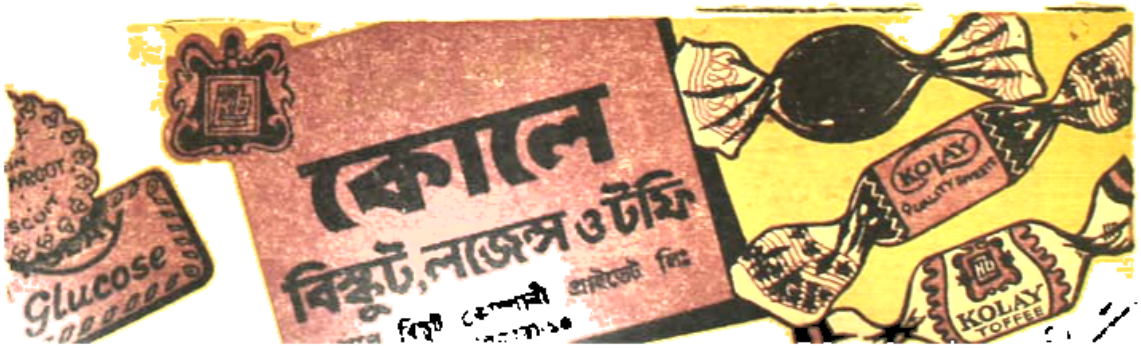

বৈশাখ
১৩৭২

৬৫তম বর্ষ
প্রথম খণ্ড

উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের

উজ্জ্বল কান্তি

যেমন মলাটের সঙ্গে গ্রন্থের,পাতার সঙ্গে বৃক্ষের—

তেমনি ত্বকের সঙ্গে সৌষ্ঠবের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক।

বোরোলীন ক্রীম

নিত্য ব্যবহারে আপনার অন্তর্লীন লাবণ্য

চোখে মুখে সর্বাঙ্গে উদ্ভাসিত হবে।

বোরোলীন হাউস্, কলিকাতা-৩

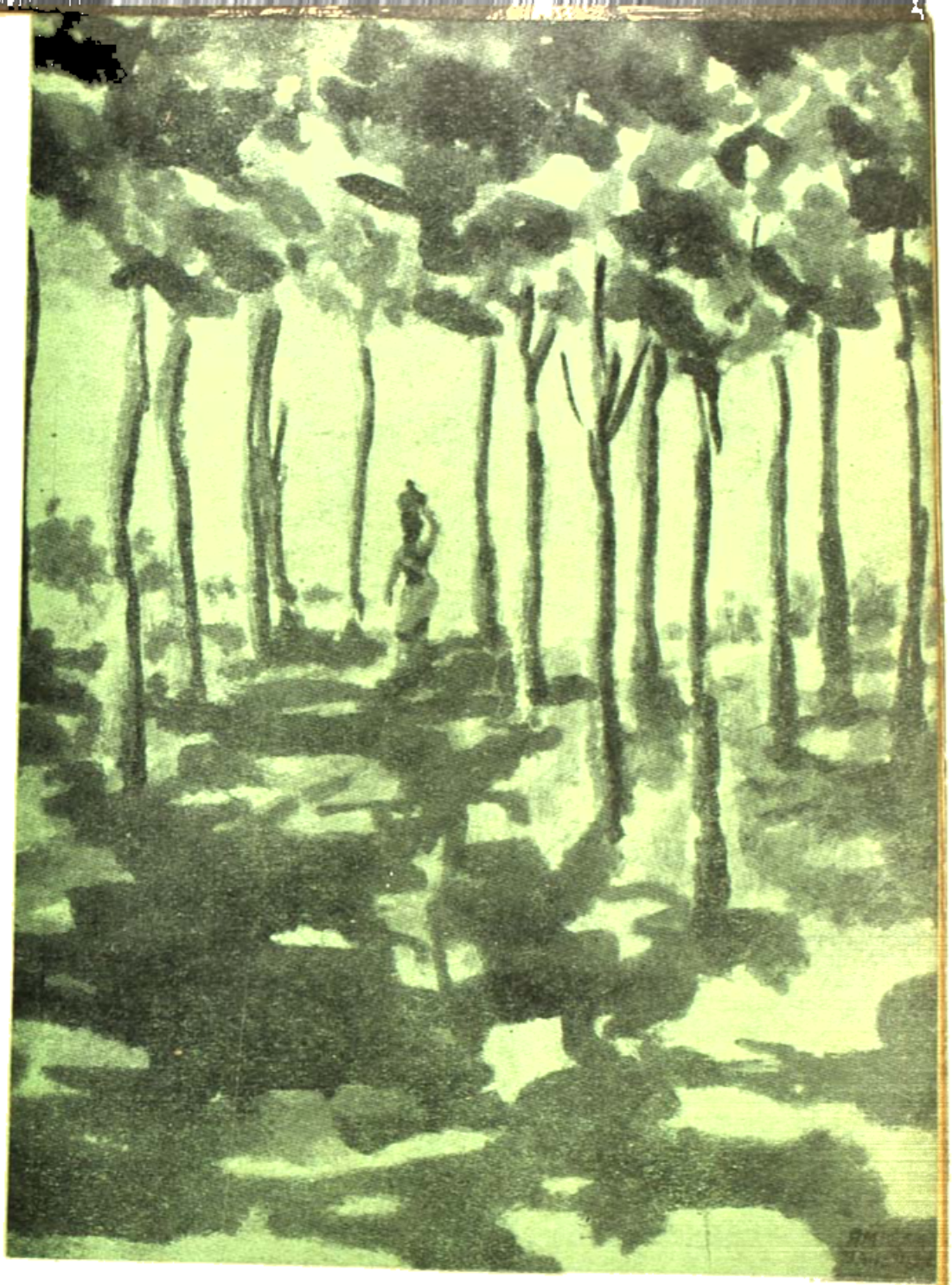

ছায়া বীথিকা

বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিন্টিং ওয়ার্কস

বৈশাখ—১৩৭২

দ্বিতীয় খণ্ড | দ্বিপঞ্চাশত্তম বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

রবীন্দ্রচেতনায় গীতার রূপ

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলতে গেলেই প্রাচীন কালের ঋষিদের একটি কথা মনে পড়ে। ঋগ্বেদে (৫, ১১, ১) একটি সূক্তে বলা হয়েছে 'ঘৃত প্রতীকো বৃহতা দিবিস্পৃশা দ্যুমদ্বিভাতি ভরতেভ্যঃ শুচি"—প্রদীপ্তমূর্তি পাবক তাঁর গগনস্পর্শী বিশাল মহিমায় ভারতীয়গণের সম্মুখে দেদীপ্যমান আছেন। বৃহস্পতি সেইখানেই প্রথম জায়মান। শরৎচন্দ্র একদিন রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন—'কবি, তুমি অনেক দিয়েচো, এই দীর্ঘকাল তোমার কাছে অনেক পেয়েছি।' আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে—"যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে।" রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও বোধহয় এই উক্তি অসঙ্গত নয়। তিনি শুধু বাক্যবিলাসী সাহিত্যিক নন, কবির্মনীষী, মহদ্গুরু মানব, ভাবুক, সাধক, কল্পনাচকল জীবনশিল্পী, শিক্ষাবিৎ। নিখিলের অমৃতময় আকৃতিকে ভাবে ও ভাষায় তিনি রূপ দিতে চেয়েছেন। মর্ত্যলীলাক্ষেত্রে সুখে দুঃখে আমরা অমৃতের স্বাদ পেয়েছি। জানি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ভাবগদগদ মোহাবিষ্ট হয়ে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার দিন চলেগেছে—নিরঙ্কুশ নিরভিমান সমালোচনায় তাঁর মানস স্বীকৃতির দিন হয়তো এসেছে, তবু তিনি আমাদের এতো কাছে, এতো অপরূপভাবে "আমাদের সৃষ্টির পথ রেখেছেন আকীর্ণ করি" যে তাঁর হাতে যদি

চলন'ও সইতে পারি তাহলে হয়ত শান্তির অক্ষয় অধিকার পাব। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাধারণী মনের এই যে মমত্ববোধ, এটা হচ্ছে সমালোচকের অতীত এক নিগূঢ় সত্য। অনেককে প্রশ্ন করতে শুনেছি যে শেকস্‌পীয়রের সমালোচকরা যে উচ্ছ্বাসের সমালোচনার নিদর্শন দিয়েছেন, হিজাদাকে যে ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, রবীন্দ্রমানস অনিন্দিতেরা ততদূর তো যেতেই পারেন নি, শুধু তত্ত্বকথার বাগাড়ম্বরে ও রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাব ও ভাষার অক্ষয় উক্তিতেই তাঁদের বহু গবেষণার সমাধি মন্দির স্থাপন করেছেন। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু বলতে বা লিখতে একটু দ্বিধা আসা অসম্ভব নয়, বিশেষ করে এরূপ প্রবীণদের পক্ষে—যারা তখনকার দিনে সেই প্রহরাদের সমকালীন ছিলেন, তাঁকে দেখেছেন, তাঁকে শুনেছেন, তাঁর সঙ্গে পত্র বিনিময় বা আলাপ আলোচনা করেছেন—ভাবময় জগতে তাঁরা যে সেই শাশ্বতাংশু মহাদূত, সৌম্যাতিসৌম্যের কাছে অনেক প্রকারে ঋণী। তাছাড়া প্রায় সাতষট্টি বছর ধরে প্রতিটি দিন প্রতিটি রাত্রি তিনি ভেবেছেন, লিখেছেন, স্তূপীকৃত হয়েছে তাঁর রচনাসম্ভার, গতশতাব্দীর শেষ পাদ থেকে প্রায় এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত চলেছে একটানা এই সারস্বত তপস্যা, গানে, গল্পে, কবিতায়, রসরচনায়—এ কী কোটা-ফুলের মেলা—না ঝরা-ফুলের খেলা? সেখানে কী দৈনন্দিন ব্যবহারিক মনকে কেহ করে ঘুরছেনা না একটা ভাবঘন অথচ আত্মসচেতন প্রাণসত্তা—যেখানে আশা আকাঙ্ক্ষা সুখদুঃখ, জৈবিক তাড়না, সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ যেমন আছে, তেমনি সংস্কার, সংস্কৃতি ও সংঘাতের বিষয় বিচার আছে—আর আছে রস ও সৌন্দর্যের প্রেরণা এবং তার অতীত একটা অধ্যাত্ম স্বীকৃতি।

দিকে দিকে ঢেউ জাগল লীলার পারাবার
আলোকছায়া চমকিছে
ক্ষণেক আগে, ক্ষণেক পিছে
ডাইনে বাঁয়ে দ্বন্দ্ব লাগে
সত্যের মিথ্যায়

প্রবন্ধের শ্রীযুক্ত নলিনী গুপ্ত মহাশয় লিখেছেন—যাঁরা লোকোত্তর পুরুষ তাঁদের চেতনা বহুতর পুরুষের চেতনার সমষ্টি। বিভিন্ন এমন কি বিরোধী ধারা মিলে কি অপরূপ অভিনব ঐকতান সৃষ্টি করতে পারে তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা।

রবীন্দ্রনাথ সেকালের ঋষিকবির বাক্য উদ্ধৃত করে বলেছেন যে বিশ্বস্রষ্টা তাঁর অর্ধেক দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এই নিখিল জগৎ। তারপরে তাঁদেরই প্রশ্ন করেছেন—যদ্‌ভার্ধং কতমঃ স কেতুঃ—তার বাকি সেই অর্ধেক যায় কোনদিকে কোথায়? এই অংশটুকুই ওতোপ্রোতঃ ভাবে বিলীন হয়ে আছে শুধু বাইরের দৃশ্যমান জগতে নয়, অন্তরের প্রতিটি রহস্যাসন অনুবৃত্তিতে।

তাই কিছুদিন পূর্বে এক বিখ্যাত সাময়িকীতে আমি রবীন্দ্রনাথ ও গীতা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছিলাম—গীতার কোন প্রভাব তাঁর চিন্তার চেতনায় লেখায় পড়েছে কিনা—সেই কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করে পরিপূরক হিসাবে প্রশ্নটিকে নানাদিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমেই কথা উঠতে পারে, গীতার আদর্শ ও উপদেশ কী, নানামুনির নানা মত হিসাবে গীতাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন মনীষী ও সাধকরা—নিজেদের মতের সঙ্গে মিলিয়ে একটা সুসমঞ্জস টীকাও করেছেন অনেকে। হাজার হাজার বছর ধরে হিমাহারা মানুষ এই বাণীসমুচ্চয় থেকে সান্ত্বনা চেয়েছে, পেয়েছে, নিয়েছে, জীবনে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করেছে। ভারতপুরুষ শংকরাচার্যের যুগ থেকে আজও এর টীকাটিপ্পনী ব্যাখ্যা ভাষ্য আলাপ আলোচনার অন্ত নেই। সেকালের বসুগুপ্ত, অভিনব গুপ্ত, আনন্দ বর্ধন, রামানুজ, যামুন, নিম্বার্ক, মধ্ব, নীলকণ্ঠ সূরি, জ্ঞানেশ্বর, শ্রীধরস্বামী, কেশব কাশ্মিরী, হনুমৎ স্বামী, রাঘবেন্দ্র স্বামী, মধুসূদন সরস্বতী, বামদেব বিদ্যাভূষণ থেকে একালের রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর দুই ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, কালীনাথ, রামকৃষ্ণ তৈলঙ্গ, বঙ্কিম, তিলক, গান্ধীজী, শ্রীঅরবিন্দ, নবীন সেন, হীরেন দত্ত প্রভৃতি কতো মনীষী কৃষ্ণচরিত্র ও গীতার সম্বন্ধে নিজ নিজ পথ ও মতানুযায়ী বিশ্লেষণ করেছেন, আশ্বাস চেয়েছেন, দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। তাই স্পর্শকাতর রবীন্দ্রনাথের মনে গীতার ঠিক প্রভাব নয়, গীতা চেতনার আস্বাদন যে পড়েনি সে কথা বলা যায়না। গীতা বার বার নিষ্কাম কর্মযোগ সাধনার কথা বলেছে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবকে ভালোবেসে বিশ্বমানবের কর্মে আত্ম-

নিষ্কামকে 'সাধু কর্মের' মধ্যে আত্মত্যাগকে শ্রেষ্ঠ উপাদান বলেছেন। অনেকে বলেন গীতায় হৃদয় বৃত্তির স্থান নেই, অথচ কবি চেতনায় হৃদয় বৃত্তি শুধু আদৃত নয়, সর্বমুখী কর্মের categorical Imperativeকে এবং 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে'র সঙ্গে তুলনা করা যায়। এই প্রসঙ্গে আরো দুটি প্রশ্ন উঠবে—গীতার আদর্শ ও উপদেশ শুধু কি সম্প্রদায় গোষ্ঠীর বিশেষ কোন প্রণালী—না ভারতবর্ষের সব সাধনার সমন্বয় ও পরিপূর্ণ ইতিহাস, যেখানে সব পথ ও মত এক বিরাট ঐক্যে পরিণত হয়। এই যে মূল্যবোধ সে তো মানুষের আত্মার ঐশ্বর্যের কথা, চেতনার স্তরে স্তরে তার স্ফুরণ, জ্ঞান কর্ম ভক্তির ত্রিধারায় ও ত্রিকালে সে ভাব বিলসিত। বেদে মেধাবী কবিরা, আরণ্যক উপনিষদের ঋষি রাজর্ষিরা, গীতার কৃষ্ণার্জুন, জাতকে বোধিসত্ত্বের দল, বৈষ্ণব ও তন্ত্রশাস্ত্রের আচার্য ও কুলপতিরা সেই অন্তরপুরুষের বিবর্তনের কথাই বলেছেন, কেউ বা ভক্তিগদগদ হয়ে, কেউ বা তত্ত্বকথার বিশ্লেষণে, কেউ বা আচারবিচারের লৌকিক ও অ-লৌকিক অনুষ্ঠানে। কিন্তু কবি শুধু তত্ত্বকথার মনীষী নন, তিনি ডুব দেন জীবনের স্বাদ-বর্ণ-গন্ধ-ময়,রূপময় ঐশ্বর্যের লীলাময় বৈচিত্র্যের গহনেও, যেখানে ক্ষর ও অক্ষর মিলিত হয়ে এক পুরুষোত্তমকে কল্পনা করছে। একদিক থেকে দেখতে গেলে গীতায় আমরা পাই সব সাধনার শুধু সমন্বয় নয়, পরিপূর্ণ ইতিহাসও। রবীন্দ্রনাথ সেই কথাই বললেন—"এই মহাভারতে কেবল যে নির্বিচারে জনশ্রুতি সংকলন করা হইয়াছে তাহাও নহে। আতপ কাঁচের এক পিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্যালোক এবং আর এক পিঠে যেমন তাহারই সংহত দীপ্তরশ্মি, মহাভারতেও তেমনি একদিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরাশি, আর এক দিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি—'সেই জ্যোতিটিই ভগবদ্গীতা। জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির যে সমন্বয়যোগ তাহাই ভারত ইতিহাসের চরমতত্ত্ব……মানুষের সকল চেষ্টাই কোনখানে আসিয়া অবিরোধে মিলিতে পারে, মহাভারত সকল পথের চৌমাথায় সেই চরম লক্ষ্যের আলোকটি জ্বালাইয়া ধরিয়াছে। তাহাই গীতা……"

অবশ্য সাহিত্যের আদর্শের দিক থেকে মহাভারতে গীতাকে তিনি অন্যভাবে দেখেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—ভগবদ্গীতা আজও পুরাতন হয়নি, হয়তো কোনো কালেই পুরাতন হবেনা। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে পশ্চাতে রেখে গীতাকে আবৃত্তি করা সাহিত্যের আদর্শ অনুসারে নিঃসন্দেহেই অপরাধ। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রকে গীতার ভাবের দ্বারা ভাবিত করার সাহিত্যিক প্রণালী আছে, কিন্তু সংকথার প্রলোভনে তার ব্যতিক্রম হয়েছে বলে গীতাকে খর্ব করা হয়না। সাহিত্যের স্বরূপ, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ (পৃ ১৬)। হয়তো সাহিত্যিক বিচারের নিক্তিমাফিক ওজনে রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলির মূল্য আছে—এমন কি অনেকে প্রশ্নই তুলেছেন, মহাভারতে গীতা প্রক্ষিপ্ত কিনা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিজেরই একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। 'গোরার গৌরমোহনের মুখ দিয়ে যে দুর্জয় দুঃসহ আবির্ভাবের কথা বা ব্রাহ্মণের সরোজন্ম কবি পাঠ করিয়েছেন, সেতো শুধু উপন্যাসের চরিত্রের কথা নয়, বা সেই চরিত্রবিশেষকে ফুটিয়ে তোলবার শিল্পচেতনা নয়, সেটা হচ্ছে মহাভারতের স্বপ্নবিলাসী রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-আদর্শের কথাও, যেখানে নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর কঠিন ঝংকারে বলে "এই হচ্ছে জীবনের তাণ্ডব নৃত্য—পুরাতনের প্রলয় বজ্রের আগুনের শিখার উপরে নূতনের অপরূপ মূর্তি দেখবার জন্যই পুরুষের সাধনা। রক্তবর্ণ আকাশ ক্ষেত্রে একটা বন্ধন মুক্ত জ্যোতির্ময় ভবিষ্যৎকে দেখতে পাচ্ছি" (রবীন্দ্ররচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ১২৫)। এই 'গোরা' উপন্যাসকেই সুধীরা বলেছেন "an epic of India in transition এবং এর সম্বন্ধে পঞ্চমুখে প্রশস্তি গেয়েছিলেন স্বয়ং বিবেকানন্দ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ধ্যান মন্ত্রে আছে যে ব্যাস এই বাণীগুলিকে মহাভারতের মধ্যে গ্রথিত করেছিলেন (ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতে) এবং নারায়ণের উক্তি হচ্ছে পার্থায় প্রতিবোধিতাং। শ্রীঅরবিন্দ একে 'গত সন্দেহের' জন্য বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে বললেন—সামাজিক মানুষের জীবনে সঙ্গীণ মুহূর্তে যে সব গভীর প্রশ্ন ও সমস্যা উদিত হয় অর্জুনের সমস্যাকে (বিষাদযোগকে) উপলক্ষ্য করে গীতাতে সেই সবেরই চরম সমাধান দেওয়া হয়েছে। অর্জুনের কর্মত্যাগ ও সংসারত্যাগের প্রবৃত্তিকে তামসিকতা ও ক্লৈব্য বলে নিন্দা করেই গীতার শিক্ষার

হয়েছে। য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরীতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন —এক মহাভারত পড়লেই দেখা যায় আমাদের তখনকার সভ্যতার মধ্যে জীবনের আবেগ কত বলবান ছিল···সে সমাজে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, দ্রোণকৃপপরশুরাম ব্রাহ্মণ ছিলেন, কুন্তী সতী ছিলেন, ক্ষমাপরায়ণ যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় পুরুষ ছিলেন এবং পদ্মকুড্মলোপমা তেজস্বিনী দ্রৌপদী রমণী ছিলেন। সমাজে ছিল বুদ্ধদেবের শালপ্রাংশু সভ্যতা। গান্ধীজী তাঁর গীতাভাষ্যে কিন্তু বলেছিলেন "গীতার কৃষ্ণ —কাল্পনিক—অর্জুনের শুদ্ধ বুদ্ধ করিবে কেন ইহাই নহে, অর্জুনের জিজ্ঞাসা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—গান্ধীভাষ্য শ্রীমহাদেবদেব দেশাই পৃঃ ৭৮-৮০) গীতা এ্যালডুস হাক্সলি বলিত "the most systematic Statement of perennial philosophy ও বটেই বা অধ্যাত্ম ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মীমাংসা ও বটেই—গীতা ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবনের নানা ক্ষেত্রে শুভ সমাধানেরও নির্দেশক। শ্রীঅরবিন্দ তাই বললেন···The situation from which the Gita aries sis a type of human life and even of world existence···It is Selfevident that in the actsual life of man, intellectual, social, political, moral, one can make no real step forward without a struggle, a battle between what exists and what seeks to exist and hve, and all that stands behind either····· There is a method of explaining the Gita in which not only the episode but the whole Mahabharata is turned into an allegory of the inner life,···(Sri Aurobindo—Essays on the Gita first Series.)

রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক মনকিন্তু গীতাকে ঐতিহাসিকতার দিকেও আমাদের টেনে নিয়ে গেছে। "বাংলা জাতীয় সাহিত্য (১৩০১), ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা (১৩০৮), ধর্মের অধিকার (১৩২৮), কর্তার ইচ্ছায় কর্ম (১৩১৬), শক্তিপূজা (১৩২৯), সত্যের আহ্বান (১৩২৮) শান্তিনিকেতন (১-২১ খণ্ড) প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে অপরোক্ষভাবে গীতার ভাব ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা করেছেন কবি এবং তাঁর কাছে ধর্ম হচ্ছে মানুষের পূর্ণ-শক্তির অনুষ্ঠিত বাণী। সেই জন্য গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাংখ্য যোগের এই কথা কয়টি খুবই প্রিয় ছিল।

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"

'অধর্মেনৈধতে তাবৎ' মনুর এই বাক্যটিকেও রবীন্দ্রনাথ বহুবার নিজ অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর কাছে সত্য ধর্ম কী তার একটা বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর "মানুষের ধর্ম" বক্তৃতাগুলিতে। তিনি বলছেন যে আমার মধ্যে দুটো দিক আছে—এক আমাতেই বদ্ধ, আর এক সর্বত্র ব্যাপ্ত। এই দুইই যুক্ত এবং উভয়কে মিলিয়ে আমার পরিপূর্ণ সত্তা।·····মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন····· মানবনাট্যমঞ্চের মাঝখানে যে লীলা তার অংশ আমি। সব জড়িয়ে দেখলুম সকলকে— '—জীবন দেবতার সঙ্গে' জীবনকে পৃথক করে দেখলেই, দুঃখ মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি (রবীন্দ্ররচনাবলী চতুর্দশ খণ্ড)। ঐতিহাসিকতার দিকে ভারতবর্ষের সমাজপতি নির্ণয় করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "My interpretation of Indian History" (মনস্বী যদুনাথ সরকারের উদ্দেশে অনূদিত, মডার্ণ রিভিউ ১৯১৩) ও তারই পরিবর্ধিত ও সংশোধিত রূপ "A vision of India's History—Viswabharti quarterly 1923.) সেখানে তিনি লিখছেন—"In this latter version of the epic, the fact is suppressed that it was an unorthodox religious movement, acknowledging Krishna to be its prophet that gave rise to be most desperate fight in the ancient ages in India. The very fact that Krishna was the charioteir of Arjuna is proof enough that it was a war of rival creeds ; and for that very reason the battleground of Kurukshetra has ever remained a sacred spot of pilgrimiage.

সম্প্রতি সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় একটি মূল্যবান প্রবন্ধে মহাভারত প্রসঙ্গ আলোচনায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য এই উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ অন্য অনেক উপমার সঙ্গে তাঁর অপূর্ব

ভাষায় গীতার কিছু কিছু কথা ও শ্লোক ব্যবহার করেছেন সম্ভ্রমভাবে।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচাং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥
(গীতা ২।৪২

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধি :..... ২।৫৩

কিন্তু গীতার একথাও মনে রাখা উচিত যে শুধু বিচার-বিহীন বেদবাদে অনুরক্ত শ্রুতিমনোহর বাক্য বিভ্রান্ত করে তোলে অন্তরের আলোক যদি না থাকে—রবীন্দ্রনাথের আরো দু একটি উদাহরণ দিই।

"সৌন্দর্য কল্যাণ বীর্য, ত্যাগ প্রকাশ করে মানুষের আত্মাকে, অতিক্রম করে প্রাকৃত মানুষকে, উপলব্ধি করে জীবনের অন্তরতম বিশ্বমানবকে।

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ
(গীতা ৬।২২)

সেইজন্য মানুষের মুক্তি যে-মহাপুরুষরা কামনা করেছেন তাঁদেরই বাণী—'সম্ভবামি যুগে যুগে'। যুগে যুগেই তো জন্মাচ্ছেন তাঁরা দেশে দেশে, আজও এই মুহূর্তেই জন্মেছেন, কালও জন্মাবেন। সেই জন্মের ধারা চলেছে ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে, এই বাণী বহন করে,—"সোঽহম্"।..... "আমার প্রকাশরূপ যে অহং—তার সঙ্গে আত্মার একটা বৈপরীত্য আছে। আত্মা 'ন জায়তে ন ম্রিয়তে'—না জন্মায় না মরে।...অহং জন্মমরণের মধ্য দিয়ে চলেছে। আত্মা দান করে, অহং সংগ্রহ করে, আত্মা অন্তরের মধ্যে সংহরণ করতে চায়, অহং বিষয়ের মধ্যে আসক্ত হতে থাকে'.....'কিন্তু আমার কথা এই যে নারায়ণকে যদি সারথি করি, তবে অক্ষৌহিণী সেনাকে ভয় করতে হবে না। লড়াই একদিনে শেষ হবে না, কিন্তু শেষ হবেই, জিত হবে তার সন্দেহ নেই। (রবীন্দ্ররচনাবলী চতুর্দশ খণ্ড পৃ ৩৮৩, ৪৩২ ইত্যাদি)

শান্তিনিকেতন নিবন্ধমালার বহু স্থানেই জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে গীতার কতকগুলি অতি প্রসিদ্ধ বাক্য ব্যবহার করেছেন কবি—যেমন 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং' (গীতা ৪।৩৯), 'ন জায়তে ম্রিয়তে' (গীতা ২।২০) 'সম্ভবামি যুগে যুগে' (গীতা ৪।৮), 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে' (গীতা ২।৪৭) 'তস্মাৎ সর্বগতং' (গীতা ৯।১৫)

মানব দেবতার কথা বলতে গিয়ে তিনি গীতার কথাই আবৃত্তি করলেন—তিনিই 'পৌরুষং নৃষু'।

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্
(গীতা ১০।৪১)

যা কিছুতে ঐশ্বর্য আছে, শ্রী আছে, শ্রেষ্ঠতা আছে, সে আমারই তেজের অংশ থেকে সম্ভূত" (রবীন্দ্র রচনাবলী বিংশখণ্ড পৃ ৩৯৫)।

মানুষ অন্তরে বাহিরে অনুভব করে—সে আছে একটি নিখিলের মধ্যে। সেই নিখিলের সঙ্গে সচেতন সচেষ্ট যোগসাধনের দ্বারাই সে আপনাকে সত্য করে জানতে থাকে। বাহিরের যোগে তার সমৃদ্ধি, ভিতরের যোগে তার সার্থকতা...এই কথাটিই বোঝাতে গিয়ে কবি এই শ্লোকটি নিজের মত ব্যাখ্যা করলেন—

সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
(গীতা ১৩।১৪)

অর্থাৎ বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত এই দুইএর মিল চাই। এই বাণীকে নিজের মধ্যে সার্থক করবে সেই স্পর্ধা নিয়ে মানুষ অগ্রসর।

(রবীন্দ্ররচনাবলী বিংশ খণ্ড পৃ: ৩৯৯)

মানুষ হয়ে জন্মেছি, ললাটের লিখনে নিয়ে এসেছি সোঽহম্, এই বাণীকে সার্থক করবার জন্যই আমরা মানুষ। আমাদের একজনেরও অগৌরব সকল মানুষের গৌরব ক্ষুণ্ণ করবে। যে সেই আপন অধিকারকে খর্ব করে সে নিজের মধ্যে তাঁর অসম্মান করে—যিনি কর্মাধ্যক্ষ সর্বভূতাধিবাস: সাক্ষী, যিনি সকল কর্মের অধ্যক্ষ, সকলের যিনি অন্তরতম সাক্ষী, সকলের মধ্যে যাঁর বাস (রবীন্দ্র রচনাবলী বিংশখণ্ড পৃ: ৪৮২)

'যাত্রী'তে (রবীন্দ্র রচনাবলী ঊনবিংশখণ্ড পৃ: ৪৬৮) দেখি—"গীতা বলেছেন 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ' দেখা গেছে স্বধর্মে জগতে খুব মহৎ লোকেরও নিধন হয়েছে, কিন্তু সে নিধন বাইরের স্বধর্ম ভিতরের দিক থেকে তাকে বাঁচিয়েছে। আর এও দেখা গেছে

পরধর্মে খুব কম লোকেরই ভক্তি বড়ো হয়ে উঠেছে কিন্তু তার নিধন ভিতরের থেকে যাকে উপনিষদ্ বলেন মহতী-বিনষ্টি : লোকমান্যতিলক যখন রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন যে রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপার থেকে নিজেকে পৃথক রাখলে তবেই আপনি নিজের কাজ ও দেশের কাজ করতে পারবেন। তখন রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"আমি বুঝতে পারলুম তিলক যে গীতার ভাষ্য করেছিলেন সে কাজের অধিকার তাঁর ছিল ; সেই অধিকার মহৎ অধিকার" (পৃঃ ৩৬৯) গীতায় আছে কর্মের বিশুদ্ধ মুক্ত রূপ হচ্ছে তার নিষ্কাম রূপ। অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা নয় বৈরাগ্যের দ্বারাই কর্মের বন্ধন চলে যায়। তেমনি ভোগেরও বিশুদ্ধ রূপ···বলতে হয় মা গৃধঃ (পৃ ৩৬৫)। মানুষকে নারায়ণ সখা বলে তখনই সম্মান দিয়েছেন, যখন তাকে দিয়ে দেখিয়েছেন তাঁর উগ্ররূপ, তাকে দিয়ে যখন বলিয়েছেন—

···দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ (১১।২০)

তখনই মানুষ প্রণমন দিয়ে স্তব করতে পেরেছে—

অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি
ততোঽসি সর্বঃ (১১।৪০)

(রবীন্দ্ররচনাবলী উনবিংশ খণ্ড পৃ ৩৬৪)

মহাযোগেশ্বর মানুষকে এই 'পরমং রূপমৈশ্বরম্' দেখান্ সময় অধিকার ও রীতিনীতি ভেদে। এই হলো 'অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিতম্ পরমং গুহ্যং বচঃ।'

কিন্তু এই বচনটি কি—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নানা জনে নানাভাবে কতো ব্যাখ্যা কতো টীকা করেছেন তার ইয়ত্তা নেই, নিজের সাধনা ও আদর্শ অনুযায়ী। সেকালের অদ্বৈতবাদী শাঙ্কর ভাষ্যের যুগ থেকে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত অচিন্ত্যভেদাভেদ পার হয়ে আজকের গান্ধী তিলক অরবিন্দ ভাষ্য পর্যন্ত বহু পথ ও মতের সমন্বয় সাধন করে একটি স্থির দীপালোক জ্বালিয়ে রেখেছে গীতা। বঙ্কিম ও নবীনচন্দ্র গীতা ও মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণমনুষ্যত্বের আধার রূপে কল্পনা করলেন—অবশ্য তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী এক নয়—কোমতের পজিটিভিজম্, হেগেলীয় দর্শনবাদ, ঐতিহাসিক বিবর্তন, রেনেসাঁস চেতনা, ভক্তিমিশ্রিত ভিক্টোরিয়ালিজিম্,অনেক কিছু মিশ্র চিন্তন সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে ঢুকেছিল। রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দে তার পুনরাবৃত্তি দেখি। রবীন্দ্রনাথের কাছে এবং আরো সূক্ষ্ম ও ব্যাপক ভাবে শ্রীঅরবিন্দের কাছে বস্তু রস রূপ এরা মায়া নয়, বন্ধন নয়। অরূপ আবহমান কাল এদের মধ্যেই নিজেকে জানান দিয়েছেন। যে কর্মে বাঁধে, তার নাম আসক্তি। তাই বর্জনীয়, রূপ নয়, রূপের মোহ। কিন্তু মোহকে কাটাতে হবে বলে প্রাণের দোললীলাকেও পাশ কাটিয়ে নিস্তরঙ্গ নীরস শূন্যে মজতে চাইলে আমরা যে দেবতার দানের অমর্যাদা করে শুধু যে অপরাধী হব তা নয়, হব আত্মঘাতী। এই ছিল কবির নিঃসংশয়িত মত। মানুষ বড় হয় অনুভূ হয়ে, প্রভূ হয়ে নয়।

অনেকে বলেন গীতা উপনিষদেরই সারাংশ—সর্বশাস্ত্র-ময়ী—তাই রবীন্দ্রনাথকেও আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু রবীন্দ্র-নাথে বহুধারা এসে মিলেছে। রূপ রস ঐশ্বর্যের মুক্তধারাও (pagan abandon) তাঁকে চঞ্চল ও পিয়াসী করেছে, যেমন করেছে বৌদ্ধ মত, আধুনিক বিজ্ঞান ও ঔচিত্যবোধ। তিনি লিখছেন 'সোনার তরী বলে একটি কবিতা লিখে-ছিলুম, এই উপলক্ষ্যে তার একটা মানে বলা যেতে পারে। মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের খেতটুকু বীজের মতো, চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত, ওই একটুখানিই তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে। সেই জন্যে গীতা বলেছেন—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা।

গীতা (২।২৮)

(রবীন্দ্ররচনাবলী চতুর্দশ খণ্ড পৃঃ ৩৭৫)

গীতার ভাব ও ভাষা তাঁর চিঠিপত্রেতেও ফুটেছে কোথাও কোথাও। দু-একটি উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃতি করা যেতে পারে—

"আমি নরদেবতাকে বিশ্বাস করি বুদ্ধের মধ্যে, কেননা বুদ্ধ অনৈতিহাসিক গালগল্প মাত্র নয়, বিশ্বাস করি ভগবদ্-গীতায় কৃষ্ণের মধ্যে, সে কৃষ্ণও মর্ত্যমানুষের ঘরের লোক (চিঠিপত্র ৯ পৃঃ ৯৬)। ২১শে নভেম্বর ১৯৩৪ সালে তিনি লিখছেন হেমন্তকুমারী দেবীকে—"বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" ভগবানকে বারে বারে জন্ম নিতে হয়, এই কথা গীতায় আছে। ধর্মযুদ্ধে অনিবার্য নিধনকার্য নিরাসক্ত মনেই করা যেতে পারে"। এই কথারই পুনরাবৃত্তি করে তিনি

লিখেছেন—"শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই ধর্মের উদ্দেশেই প্রাণ দিতে ও নিতে স্বয়ং উপদেশ দিয়েছিলেন" (১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ তারিখের চিঠি) এই প্রসঙ্গে একটি মত উত্থাপন করা যেতে পারে—শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কিছুটা ভাবসাদৃশ্য—কেউ কেউ মনে করেন যেমন —রোমারোঁলা, সি, এফ্ এণ্ড্রুজ—(রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ মাঘ ১৩৭১ এণ্ড্রুজ স্মরণ সংখ্যা)। যে রবীন্দ্রনাথে শ্রীঅরবিন্দের প্রভাব এতোই বেশী যে তাঁদের শেষ সাক্ষাৎকার বোধহয় রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রায় আমূল রূপান্তর ঘটিয়েছে। প্রশ্নটিকে ঠিক ঐদিক দিয়ে না দেখেও বলা যেতে পারে যে এই দুজন বিশ্ববিশ্রুত অসাধারণ মনীষী প্রায় একই পথের পথিক—শ্রীঅরবিন্দ অন্ততঃ তাঁকে সেই wayfarer towads the same goal বলেই স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য নিজেকে কখনই সাধক বা যোগী বলে দাবী করেন নি। তিনি বলতেন 'আমি কবি, বিচিত্রের দূত, মানুষের মধ্যেই মনের মানুষকে অন্বেষণ করি, আমি থাকি ধরণীর অতি কাছাকাছি—আর সম্মুখে প্রাণের নদীর জোয়ার ভাঁটা দেখি, যে নদী চঞ্চলা, যে নদী চলেছে।'

এই প্রসঙ্গে দুটি কথা মনে রাখতে হবে। বাল্যকাল হতেই তাঁদের পরিবারে গীতার সঙ্গে সম্পর্ক সূচিত হয়েছে। জীবনস্মৃতিতে (রবীন্দ্ররচনাবলী সপ্তদশখণ্ড পৃঃ ৩১৫) পড়ছি যে ভগবদ্গীতায় মহর্ষির মনের মত শ্লোকগুলি চিহ্নিত করা ছিল। সেইগুলি বাংলা অনুবাদ সমেত তিনি তাঁকে কপি করতে দিয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি ভ্রাতারাও গীতার অনুরক্ত পাঠক ও অনুবাদক ছিলেন। বাল গঙ্গাধর তিলকের "গীতারহস্য"এর বঙ্গানুবাদ শ্রদ্ধেয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর করেন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সাধনা মূলতঃ কবিধর্মী। বৈদিক কবির মত তিনি জ্যোতির্ময়ী উষাকে দেখেছেন, উজ্জয়ন্ত সূর্যকে আবাহন করেছেন, জল স্থল আকাশের সহযোগিতা চেয়েছেন—প্রকৃতির সঙ্গে আনন্দের যে যোগ, শুভবুদ্ধি দ্বারা জাগ্রত চিত্তবৃত্তির যে যোগ—সেই হয়েছে তাঁর কাছে দেবতার কাম্য—'দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি।' ১৯শে অক্টোবর ১৯৩৫ সালের আর একটি চিঠিতে শ্রীমতী হেমন্তবালাকে তিনি লিখলেন—শুচিতা জলে মাটিতে অশনে বসনে মনে শুদ্ধে নেই—শুচিতা অন্তর প্রকৃতিতে, যেহেতু মানুষ মুখ্যতঃ আধ্যাত্মিক। যীশুখ্রীষ্ট এই কথাই বলেছেন, ভগবান বুদ্ধেরও এই উপদেশ। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেন, যখন যজ্ঞকে তিনি বাহ্যউপকরণগত না বলে বলেছেন আন্তরিক। সত্যই যজ্ঞ, দান যজ্ঞ, জীবে দয়া যজ্ঞ, সর্ব মানুষে মৈত্রী যজ্ঞ। যেখানে সত্য নেই, দয়া নেই, চিত্তের নির্মলতা নেই, আছে পূজা অর্চনা, আছে ভক্তিরসের সম্ভোগ, সেখানে আধ্যাত্মিকতা আত্মপ্রবঞ্চনা। বিধাতার জগৎকে অবিশ্বাস করোনা, ঘৃণা করোনা, তিনি পৃথক্ একটা স্বর্গ সৃষ্টি করে নিজের পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে বিরোধ বাধাননি। সব কিছুতেই আনন্দিত হও, সবাইকে আনন্দিত করার সাধনা করো এতেই মুক্তির আস্বাদ।

এই হলো একদিকদিয়ে রবীন্দ্রনাথের গীতাভাষ্য, এই হলো যজ্ঞার্থ কর্ম। বল্লভসম্প্রদায়ীরা এর এক ধরণের ভাষ্য করেছেন 'ইজ্যতেঽনেন সাবয়বো ভগবানিতি যজ্ঞঃ' —ভগবান অর্থাৎ যিনি ষড়ৈশ্বর্যশালী তিনি যে 'সাবয়ব' তাই তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।" এই আসক্তিহীনতা, অপ্রমাদই কর্মের সব চেয়ে বড় কৌশল। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের অবচেতনে ছিল যে কর্ম মানেই ফল কামনা রচিত কর্ম শুধু নয়, 'জগদ্ধিতায় কর্ম' 'লোকসংগ্রহার্থ' কর্ম।

ভগ্নাংশ

শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

কেন আবার দেখা হোলো সতার সঙ্গে ?

হ'য়ে হয়তো একদিকে ভালই হ'য়েছে। নইলে চির-দিনের জন্যে অগোচরেই থেকে যেত অতনী বৌদির কাহিনী।

কিন্তু কাহিনী জেনে কী করতে পারলুম ?

ঘরে বসে কোন এক ব্যর্থ-জীবনের স্মৃতির রোমন্থন শুধু ?

সেই কথাটাই বলি।

থাকি ভারতের পশ্চিম প্রান্তিক প্রদেশের মহানগরীতে।

আশী বছরের বৃদ্ধা ঠাকুমার চিঠি পেয়ে মনটা চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো! চিঠিটা কাউকে দিয়ে লিখিয়েছেন। 'আমার ত সময় হইয়া আসিল,···তোমাকে বড় দেখিতে ইচ্ছা করে।'

ছুটি পাওনা ছিল। বাধা-ও ছিল না কিছু। কাজেই, বেরিয়ে পড়্‌লুম।

কল্‌কাতা পৌঁছে 'ভিসা' বের করতে গলদ্‌ঘর্ম!

দু'দিনের যায়গায় পাঁচদিন। তার মানে মেজমাসের ছুটির এক সপ্তাহ অনর্থক কাট্‌লো কল্‌কাতায় বসে!

আর বসেই বা কোথায়? 'ভিসা' ছাড়াও আমার এক বন্ধুর কল্‌কাতার অফিসের কিছু জরুরী কাজকর্ম! সেখানেও ধৈর্য ধরে বসে থাকা। চুলোয় গেল কদিন ঠিকমত স্নানদান খাওয়া-দাওয়া।

অবশেষে গোয়ালন্দগামী রাতের মেল-ট্রেনের ছোট এক ইন্টার ক্লাশের কামরায় জুৎসই হ'য়ে বসে ভাব্‌লুম, বুঝি বা স্বস্তি মিল্‌লো! কিন্তু এটা যে কতবড় ভুল, কয়েক মিনিটের মধ্যে জলের মত পরিষ্কার হ'য়ে গেল। কোথাও দাঁড়াবার মত একচুল স্থান রইলো না,—আর ট্রেণের গন্তব্য স্থলে না পৌঁছানো পর্যন্ত চৈত্রমাসের ভ্যাপ্‌সা গরমে ঠাসা ছোট কামরাটা নানাপ্রকার পিঁয়াজী ও বিড়ির মিশ্র অব্যক্ত কটু গন্ধে এমন দুর্গন্ধ হ'য়ে রইলো যে, অদূর ভবিষ্যতে স্বজন মিলনের সুখস্বপ্নটুকু ব্রস্তব্যস্ততে স্থান লাভ করে দু'চোখের ঘুমকে শুধু হরণই করলো না,—একটা প্রাণান্তকর অস্বোয়াস্তিতে সারাটা সময় মনকে অবশ-বিবশ করে রাখ্‌লে।···

দূর থেকে পেলাম অনেকদিনের পরিচিত গন্ধটা। সে গন্ধ ঝিরিঝিরি ভেজা-হাওয়ায় ভেসে-আসা অনেক-স্মৃতি-জড়িত কীর্তিনাশা পদ্মার। প্রথম বৃষ্টি পাওয়া ভেজা মাটির মত সোঁদা-সোঁদা মিষ্টি মিষ্টি সে গন্ধে বুক-জুড়ানো শান্তির প্রলেপ-মাখানো। ভুলে গেলাম ট্রেণের স্বস্তিহীন পরিস্থিতি। তিমির থেকে ছানা বের হওয়ার মত পূর্বাকাশের ভ্রূণ থেকে জাগ্‌লো আলোর শিশু। দিক হ'তে দিগন্তরে ছড়িয়ে গেল স্বচ্ছ হাসির ধারা। পদ্মার ছোট ঢেউয়ের মাথায় আর সাদা-সাদা গাঙ্‌চিলের লঘু ডানায় সে হাসি-উচ্ছ্বাসের রঙ্। পশ্চিমের আলো-আঁধারি দিক্-চক্রবালে জেলে-ডিঙির রঙিন পালের একটানা সারি—, ধূসর, অস্পষ্ট।

ষ্টীমারের উপর নীচের ডেক যেন ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। চারিদিকে নানা যাত্রীর পীড়াদায়ক হট্টরোল। নীচের ডেকের পিছন দিকে ছোট্ট একটু স্থান পেয়ে গেছি। পাশেই স্তূপীকৃত মুরগীর শূন্য খাঁচা, আর কীসের বস্তা,—হয়তো শুক্‌না লঙ্কার। পিছনে উপর ডেকে ওঠার সিঁড়ি। আরেক পাশে মধ্যবিত্ত একঘর মুসলমান পরিবার—গোল সেরে 'খানা' বের করে বসে গেছে। আর এক-জন—যে আমার মুখোমুখী—সা' মহাজন বলেই মনে হয়। গোলগাল চেহারা। নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মাজ্‌ছিলেন,

—তাকেই আমার বাঁদিকে নজর রাখতে বলে 'ফ্রেস' হবার উদ্দেশে উঠে পড়লুম।

উপর ডেকে আরাম ক'রে দু'কাপ চা খেয়ে যখন নীচে নেমে এলুম, তখন অনেক হাঁকডাক করে নোঙর তোলার কাজ সুরু হ'য়েছে। ষ্টীমের চাপে দু'চাকায় লাগ্‌ছে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের গর্জন।

সমস্ত রাতের পর একটু বস্‌তে পেয়ে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আস্‌ছিল!

তেজা-তেজা ঝাপ্‌টা হাওয়া লাগ্‌ছে এলোমেলো। জলতরংগের সুর জাগ্‌ছে ষ্টীমারের গতিশীলতায়। সকালের রৌদ্র-লাগা রোলারের মত গড়িয়ে যাওয়া অগুণতি ঢেউয়ের বুকে দোল দিচ্ছে মৎস্যদুক্ গাঙ্‌চিল।···

গাঙ্‌চিলের পাখার স্পন্দনের মত এলো স্মৃতির ঢেউ।

পাকিস্থান হবার পর এ পথে আমার দ্বিতীয়বার। প্রথমবার 'ভিসার' দরকার ছিল না। তখন জীবিত ছিলেন আমার ঠাকুর্দা।

অল্পবয়সে মা মারা যাবার পর থেকে ঠাকুর্দার বুকেই আমি মানুষ। ছোটবেলায় কী ভালই না বাসতেন। আরো ত কত নাতি-নাতনি তাঁর, অথচ এত আদর-যত্ন কেউ পায়নি। এক রকম পক্ষপাতিত্বই বলা চলে। এ কারণে ভাই বোনদের হিংসার-ও অন্ত ছিল না।···ষোল বছর পর্যন্ত এ' রকমই কাটলো। পড়া শেষ করে যখন মফঃস্বল শহর ত্যাগ করে যাই, তখন থেকেই আমার পরিবর্তন। কলেজে থাকতে ছুটি-ছাটাতে তবু দেখে যেতাম, কিন্তু কাজ হবার পর বছরে দাঁড়াল একবার। এজন্যে ঠাকুর্দার অভিযোগের অন্ত ছিল না।

ঠাকুর্দা সত্তরবছর পর্যন্ত কার্যক্ষম ছিলেন। এমনটি বড় দেখা যায় না। এ বয়সে তাঁকে এক মাইল হেঁটে সহরের কোর্টে সওয়াল করতে দেখা গেছে। তিনি সহরের সবচেয়ে প্রবীণ উকিল।

এ বয়সে আরো কতদিন 'বারে' গিয়ে বসতেন, বলা যায় না, হঠাৎ যেন তিনি বসে গেলেন। বসে ঠিক নয়, একেবারে শুয়ে পড়লেন।

এটা হ'লো ঠিক পাকিস্থান হবার পরেই।

'বার' ভেঙে অভিজ্ঞ প্রবীণ হিন্দু উকিলের দল হিন্দুস্থানের পথে প্রস্থান করলে, ঠাকুর্দা কিন্তু নড়তে চাইলেন না। জননী জন্মভূমিকে স্বর্গাদপি জ্ঞান করে পড়ে রইলেন,—কিন্তু বারেও গিয়ে বসলেন না আর। কানাঘুষায় শোনা গেল, অহিন্দু জুনিয়রদের উচ্ছৃঙ্খলতাই নাকি একমাত্র কারণ।

কলকাতা থেকে নতুন চাকুরি পেয়ে যেদিন আমি বোম্বাই চলে যাই, তার এক সপ্তাহ বাদে ঠাকুর্দারদেহান্তের বার্তা আসে।

তারপর চারবছর আর দেশমুখো হতে পারিনি।

পারিনি তার একমাত্র কারণ, আমার স্ত্রী সুমিতা।

প্রস্তুত হয়েছি তিনবার, বাধা পেলাম তিনবারই। দোষ সুমিতার, একথা বলা চলে না,—দোষ দৈবের বোধ হয়।

প্রথমবার সুমিতার এক্সিডেন্ট,—হঠাৎ সিঁড়ি থেকে পড়ে যাওয়া। দ্বিতীয়বার, এবার ঠিক সুমিতা নয়, তার বোনের বিয়েকে কেন্দ্র করে। শ্বশুরমশাই কিছুতেই ছাড়তে চাইলেন না। আর তৃতীয়বার—সুমিতা তখন পাঁচমাসের অন্তঃসত্ত্বা। হঠাৎ সেদিনই অজ্ঞান হয়ে গেল যেদিন আমার হাওড়ার টিকিট কেনা হয়ে গেছে। রওনা হব, এমন সময় এই কাণ্ড! ডাক্তার দুটি কারণ দেখিয়ে রায় দিলেন। একটি হ'চ্ছে রক্তাল্পতা, আরেকটি 'শক্'। শকটা নাকি সাময়িক বিচ্ছেদ!

এবার যে রওনা দিতে পারলুম, কোন উপলক্ষই আর বাধা হ'য়ে উঠ্‌লো না, তার হেতু, 'সুমিতা আর নেই। রক্তাল্পতার জন্যেই হয়তো,—ছেলেমেয়ে হ'তে মারা গেল।

আমার বিয়ের খবরটা জানতো সকলেই।

একটা বিষয় আশ্চর্য লেগেছে, আমার ঠাকুর্দা কিন্তু কোন চিঠিতেই তাঁর নাত বৌকে সস্নেহ আমন্ত্রণ জানাননি, কোন সময় লেখেননি—তুমিও অবশ্য এসে বৃদ্ধা ঠাকুমাকে দেখে যাও।

এ উপলক্ষে সুমিতার যদি অভিমান হয়ে থাকে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। এ নিয়ে সুমিতা কিন্তু ঠাট্টাও করেনি আমার সঙ্গে। আর ঠাকুমাকে দেখার জন্যে রওনা দেবার কালে বাধাও দেয়নি সে; তবু বাধা পেয়েছি।···

ব্যাঘাত, ঘট্‌লো স্মৃতির রাজ্যে।

: মশাই, আপনার টিকিট-টা।

মুখ তুলে তাকালুম। তাকিয়ে থাকে দেখলুম, সেই

আমাদের সত্য। সত্যনারায়ণ ঘোষ। সত্যকে যে এ বেশে দেখ্‌বো, এমন আশা কে করেছিল? সত্যও চিন্‌তে পেরেছে আমাকে!

: আরে, তুই আমাদের সুবু না, বলে হাত দু'টো এসে জড়িয়ে ধর্‌লে। তারপর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললে: উঃ, কতকাল পরে দেখা বল্‌তো?

নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে সাশ্চর্যে বল্‌লুম: তা বোধ হয় আট দশবছর হবে। কিন্তু তোর একি ব্যাপার?

: ব্যাপার যা, তা'ত দেখ্‌তেই পাচ্ছিস্‌।···সে অনেক কথারে। চল্‌, ওপরে চল্‌ আমার ঘরে। বলে হাত ধরে টান্‌তে লাগ্‌লো।

ওর সম্বন্ধে জান্‌বার জন্যে আমিও উদ্‌গ্রীব ছিলাম। উৎসাহ দেখিয়ে বল্‌লাম. বেশ, তাই চল্‌। কিন্তু আমার মালপত্র—

: ও-ঝকাট নিয়েই চলনা,—বলে সত্য আগ্রহাতিশয্যে আমার বেডিং আর চামড়ার স্যুট্‌কেসটা অবলীলায় তুলে নিলে।

ওর স্বাস্থ্যটা বরাবরই ভাল। এবার দেখে মনে হল, সেই ভাল হওয়াটা যেন চারগুণ বেড়েছে। ভরাট মুখ। এক জোড়া উদ্ধত মজবুত গোঁফ। কিন্তু কৌর কার্যাভাবে গাল দুটো বিশ্রী মলিন,—যদিচ টেরী কাটা চুলে বিন্যাস-বাহুল্যের অস্ত নাই। কী একটা ফুলেল তেলের গন্ধ! গায়ে আমেরিকান কাট টুইলের হাওয়াই সার্ট, আর পরণে টাঙ্গাইলের চেককাটা তাঁতের লুঙ্গি। পায়ে চাকার সন্তরঘাটি-মার্কা শস্তা স্যাণ্ডেল। মোট কথা, বাইরের রূপটাকে সত্য মনেপ্রাণে খাঁটি পূর্ববঙ্গীয় পাকিস্থানী সংস্করণ করে তুলেছে।

এ সঙ্গে মনে হোলো ওর আগের কথাটাও। যখন একসঙ্গে স্কুলে পড়েছিল প্রায় আটবছর।

সেকেণ্ড-থার্ড ষ্ট্যাণ্ড করতো বরাবর। অত্যন্ত গোবেচারী চেহারা। সত্যবাদী আর চরিত্রবান্‌ ছেলে বলে মাষ্টার মশাইদের সার্টিফিকেট ছিল। আমরা ডাকতুম 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির।' অবস্থা খুব ভাল ছিল না ওদের, কোন উকিলের মুহুরি ছিলেন ওর বাবা। আশা ছিল, আইন পড়িয়ে ছেলেকে উকিল বানাবেন। কিন্তু শিক্ষক মহাশয়দের দেওয়া সত্যবাদিত্যের সার্টিফিকেটের সঙ্গে উকিল হওয়ার আদপেই যোগ নেই, সত্যর বাবা উকিলের মুহুরি হয়েও জানতেন না একথা। কিন্তু সত্য জান্‌তো। আমরা ঠাট্টা করলে ও হাস্‌তো: মাঝে মাঝে মুখ ফুটে বল্‌তো: হোস্‌ তোরা গাধা উকিল, আমি ওর মধ্যে নেই। আমি হব তারও চেয়ে বড়—

বিবেকানন্দ আর নেতাজী—দুই সত্যব্রতী কর্মবীরের ও ছিল ভক্ত। আমরা ভাল করেই জানতাম এ খবর। ওঁদের সম্বন্ধে জ্ঞানও বড় কম ছিল না। নিজের পড়ার টেবিলে দুই কর্মযোগীর ফটো রেখে বৃহত্তর আদর্শের স্বপ্ন সম্ভাবনায় ভাসিয়ে দিত নিজকে।

ম্যাট্রিক পাশের পর সত্য চলে যায় ঢাকায় আই, এ পড়্‌তে। আমি কল্‌কাতায়। তারপর বোধ হয় দু'বার দেখা হয়েছিল সত্যর সঙ্গে। বছর দুই পরে দেশে গিয়ে শুন্‌লাম, সত্য পড়াশুনা ছেড়ে স্বদেশী করে বেড়াচ্ছে। ওর বাবা দুঃখ কর্‌লেন এই নিয়ে। ছেলেকে ঘিরে তিনি যে আশা করেছিলেন, তা আর হোলো না। প্রত্যুত্তরে আমিও কিছু আশার কথা শোনাতে পারলুম না। সে-বছরই সত্যর বাবা মারা যান। তারপর সত্য কোথায়, কী করে, অনেকের কাছে জিজ্ঞেস করেও উত্তর পাইনি।

তারপর এই সাক্ষাৎকার!

উপর ডেকের পিছনে ছোট কামরা। দরজার মুখে লেখা টি, সি অফিস। একটি লোহার সিন্দুক, কতকগুলো বাহারীরঙের কাগজের ফাইল।

অবিন্যস্তভাবে কতকগুলো টিকিট ছড়ানো টেবিলের উপর। কে একজন বসে টিকিট 'সর্ট' কর্‌ছিল।

সত্য মালগুলো নামিয়ে রেখে বল্‌লে: তুই বোস সুবু, আমি চায়ের কথা বলে আসি। আর কি খাবি বল? না-টা শুন্‌বো না কিন্তু···

: শুন্‌বিনে যখন, তখন তোর যা খুসী···, হেসে ফেলে বল্‌লাম।

সত্য বেরিয়ে গেল। মিনিট দুয়েকের মধ্যে ফিরে এসে একটা টুল চেপে বসে বল্‌লে: তারপর বল তোর খবর? কোথায় আছিস্‌ এখন? কর্চ্ছিস্‌ কি?

কোথায় এবং কি করছি খুলে বললাম।

সব শুনে সত্য বল্‌লে: খুব ভাল, খুব ভাল। কিন্তু বোধে—সে যে অনেক দূরের।

কেন, দেশে থেকে হোলো না বুঝি কিছু? এক মুঠো জোটাতে পারলিনে কোথাও?

: মুঠোর কথা ত চিন্তা করিনি ভাই।...আর সেজন্যেই ত বিদেশে যাওয়া।

তবে—

আর বলতে হ'বে না, বুঝেছি। সত্য বললে: আসলে কি জানিস, তোরা অনেক চাস বলেই ভাগ্যেও তোদের জোটে না। একদিন আমিও কি কম চেয়েছি?

কিন্তু কি হোলো? কী পেলাম? শুধু মিথ্যা দুর্ভোগ আর বদনাম।

জীবনে ও কি চেয়েছে, কিছুই জানি না। শুধু শুনেছি, কলেজের পড়ায় ইস্তাফা দিয়ে খুব স্বদেশী করছে। স্বদেশী করার দুঃখ আছে, দুর্ভোগ আছে জানি। জীবনে অনেক চাওয়ার মত দুঃখও হয়তো নাই। এখানেই পোড় খেয়ে কি সত্য বেছে নিলো এমন এক পথ, যাতে ছিল না অন্ততঃ বিবেকানন্দ আর নেতাজীর জীবনদর্শনের আদর্শ? কেন এই পরিবর্তন?

খাবার একরাশ মিষ্টি, ছুমাশ দুধ, আর দু'কাপ চা রেখে চলে গেল একজন ছোকরা।

যে লোকটা 'সার্ভ' করছিল তার নাম আবেদ। সত্য তাকে এক কাপ এগিয়ে দিলে। আবেদ 'থ্যাঙ্কস্' জানিয়ে কাপটা হাতে তুলে কী কাজে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সত্য বললে: এখানে থেকে চা খাওয়া মানে বোকামি।' বুঝলি সুবু। দুধের দাম আর চায়ের দাম যেখানে এক, সেখানে ভাল জিনিষ খাওয়াই ভাল।—বলে গ্লাসটা তুলে নিলে।

জানলা পথে দেখা গেল, ষ্টীমার চলছে তীর ঘেঁসে। চৈত্রের নদীর ভাওলা-সবুজ জল তীরের অনেক নীচে ঘুমিয়ে। নরম বালুকা ধূসর পড়ছে কোথাও। বাইরে সূর্যের কড়া আলোটা চোখে এসে লাগলো।

সত্য বলতে লাগলো তার হারানো দিনের কথা। যেখানে এলো তার জীবনে মস্ত পরিবর্তন।

এরজন্যে দায়ী করা চলে মুন্সীগঞ্জের ষ্টীমারের বড়বাবুর মেয়ে অতসীকে। কী করে জড়িয়ে গেল সত্য তার জীবনে, আজো আশ্চর্য মনে হয়।

বিপ্লবী জীবনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে সত্য তখন নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ সূত্রে অনেক ছেলে অনেক মেয়ের সঙ্গেই তাকে মিশতে হয়েছে। সবাই তারা কোন-না-কোন বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু অতসী এলো যেন অতর্কিতে—যার সঙ্গে কোন সংস্থার যোগসূত্র পর্যন্ত নাই।

পুলিসের ওয়ারেন্ট এড়িয়ে এখানে-সেখানে সত্য তখন লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। স্নান নেই, খাওয়া নেই, চোখের ঘুম পর্যন্ত হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। শ্রান্তির শেষ সীমায় যখন এসে পৌঁছেছে, তখন সত্য স্থির করলে সে ধরা দেবে।

মুন্সীগঞ্জের পুলিস কাঁড়ির দিকেই সে চলছিল। অন্ধকার রাত। তার উপর চলছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। হঠাৎ দেহ করলে বিশ্বাসঘাতকতা। কোথায় কী ভাবে জ্ঞান হারালো, বুঝতে পারলে না। চোখ মেললো যখন, তখন দিনের আলো। শুয়ে আছে ঘরের ভেতর। আর কথা বলার মত প্রথম যাকে দেখতে পেলে,—সে অতসী।

জ্বরে মাথা কাঁ-কাঁ করছে, দৃষ্টি আচ্ছন্ন, তবু সত্য বিছানা ছেড়ে উঠবার চেষ্টা করলে। কিন্তু উঠা আর হোলো না, অতসী দিলে প্রবল বাধা। তারপর ঘরের পরিচয় দিয়ে অনেক বুঝিয়ে নিবৃত্ত করলো সত্যকে।

কিছুদিন যেতে একটা অদৃশ্য আকর্ষণ অনুভব করলে সত্য। এ আকর্ষণ ঠেলে ফেলা যায়, এমন সাধ্য ছিল না। নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন করে সত্য দিন পনেরো সেখানে অজ্ঞাতবাস করে।...তারপর ফিরে আসে সাত দিন বাদেই। তিন দিন বাদেই আবার চলে যায়।... এমনি চলে কিছুদিন। তারপর হঠাৎ দীর্ঘ দুই বছরের অনুপস্থিতি। সরকারের স্তেন্ দৃষ্টির জালকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি বলেই ঘটলো জেলবাস।

ফিরে আসতে হোলো সেই আকর্ষণে। কীসের সে আকর্ষণ?

ছোট পরিবার। দুই ভাই বোন আর বাবা। তিন জনের অভাব-অভিযোগহীন নিরুপদ্রব জীবন। বছর চারেক আগে মা হঠাৎ মারা যেতে চোদ্দ বছরের মেয়ে অতসীকে স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর পড়া ত্যাগ করে সংসারের ভার গ্রহণ করতে হয়।

অহসী সুন্দরী নয়—মাঝারি গড়ন, বর্ণ উজ্জ্বলশ্যাম, নাকটা একটু খাটই হবে, চোখ দুটি ডাগরপানা। কিন্তু গুণ আছে। সংসারের দশকর্ম ছাড়া দশজনকে এক হাতে রান্না করে খাওয়াতে পারে। সেবা-শুশ্রূষায় অদ্বিতীয়া, আর নানা প্রকার গৃহ-শিল্পে নিপুণতা আছে। আর আছে স্নেহ-স্পর্শকাতর মন—বলেশ্বরীর পলিমাটির মতন নরম। একটু আঘাতে সেখানে চোখের জলের বাধা মানে না।

সত্য বলতে লাগলো: প্রকৃতপক্ষে অতনীর এই চোখের জলের বানভাসীতে ভাসিয়ে গেল আমার বিপ্লবী জীবনের কর্মপ্রেরণা আর প্রচেষ্টা। জীবনে এমন মেয়ে বড় দেখিনি। যখন ও জানলে আমার চলার পথের খবর, তখন এই চোখের জলের মধ্য দিয়েই একদিন আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলে,—যাতে আমি এমনি কঠোর, ভীষণ পথে আর না চলি। আর তার পরিণতিতে যা' হোলো, তা' চোখের উপরই দেখতে পাচ্ছিস্। জেল থেকে ফিরে এসে হোলো এ ব্যাপার।…কবিন বাদে ওর বাবা মারা গেলেন; আর তাঁর কর্মফলের যোগ-সূত্র দিয়ে গেলেন আমার ঘাড়ে,—সেই সঙ্গে অনূঢ়া কন্যাটিকেও।

সত্য একটু থামলো। তারপর যখন কথা বললে, সে স্বরে অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করে চমকে গেলাম। ভেজা-ভেজা আচ্ছন্ন সে স্বর। বললে: কিন্তু এ সবের কী প্রয়োজন ছিল? এখন কি তাবি জানিস্ সুবু,—তাবি, অমনি একটা মেয়েলী প্রতীক্ষা যদি হেসে উড়িয়ে দিতাম তখন—

ওর মুখের দিকে তাকালুম ভাল করে। অবাক্ হ'য়ে বললাম: কি ব্যাপার সত্য?

সত্য একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ফেললো। জিনিষটা আমার কাছে আরো স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। কোথায় জমে রয়েছে ওর জীবনের এক বেদনাপূর্ণ অকথিত ইতিহাসের অধ্যায়।

আমি সভয়ে বললাম: কোন কিছু হয়নি ত? সবাই ভাল আছে ত রে?

সত্য সহসা জবাব দিলে না। কেমন অন্যমনস্ক হ'য়ে গেল।

ছোট কেবিনটার ভেতর অজস্র আলো-হাওয়ার লুকো-চুরি খেলা। চা-টা শেষ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে আমিও চুপ করে রইলুম।

ষ্টীমারের আচম্‌কা ভোঁ-তে চমকে উঠে দেখলাম, ষ্টেশন এসে গেছে। এখানেই নামতে হবে আমাকে। নেমে আরো আটক্রোশ মোটর বাসে—নয়তো ঘোড়ার গাড়ীতে।

সত্য ব্যস্তভাবে উঠে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে নীচে নেমে গেল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মাল-পত্র নিয়ে আমাকেও নামতে হোলো।

ভেবেছিলাম, টিকিট কালেক্টারের পাশে সত্যকে দেখতে পাবো। কিন্তু না দেখতে পেয়ে অবাক হলাম।…

উঃ, কতদিন বাদে দেশের মাটি পায়ে লাগলো। আর ষ্টেশনটা একটু-ও বদলায়নি কিন্তু। চার-পাঁচ বছর আগে যা দেখেছি, ঠিক তাই আছে।

: কবে যাবেন বাবু? কবে যাবেন কত্তা?…

আট-দশজন গাড়োয়ান ততক্ষণ চক্রব্যূহ রচনা করে ফেলেছে।

এদের হাত এড়িয়ে গেলাম বাসের উদ্দেশে এগিয়ে।

দীর্ঘ রাস্তায় দু'টো মাত্র বাসের যাতায়াত আছে। একটি দেখলাম, ইতিমধ্যেই যাত্রীতে ভরে গেছে। আর একটি শূন্য। শোনা গেল, কোন একটি যন্ত্র বিগড়ে যাবার দরুণ এটি যাবে না।

অগত্যা ঘোড়ার গাড়ী।

এদিকে সত্যর হঠাৎ উধাও হ'য়ে যাওয়ার কথাটা ভাবছি। আর একবার দেখা হওয়া উচিত ওর সঙ্গে। ওর কোন কথাই যে শেষ হ'ল না!

একজন গাড়োয়ানের সঙ্গে দরদস্তুর করছি, এমন সময় দেখি হন্তদন্তভাবে ছুটে আসছে সত্যনারায়ণ। হাতে একটা কিসের ঠোঙা।

সত্য একটা হাত চেপে অনুনয়ের সুরে বললে: কিছু মনে করিস নে ভাই,—শালার যত কর্মঝামি মিটাতে হোলো দেরী। আর আমারও জিদ্, তোকে গাড়ীতে না বসিয়ে ষ্টীমারে ফিরবো না। তা' গাড়ী ঠিক হোলো একটা? হয়নি?…

গাড়ী হ'য়েছে জেনে আশ্বস্ত হ'য়ে সত্য আমার হাতে

ঠোঙ্গাটা খুঁজে দিয়ে বল্‌লে : তোর পুড়তুত ভাইবোনদের হাতে দিবি—

: এসব আবার কেন? বলে গাড়ীতে মেয়ে উঠে বস্‌লাম। গাড়োয়ান লাগামে টান দিলে।

গাড়ী চল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে, সত্যও পিছন পিছন আস্‌তে লাগলো।

সত্য বল্‌তে লাগলো : তোকে ত সবটা বলা সম্ভব হোলো না সুবু, সবই জান্‌বি গিয়ে একসময়। এতে আর গোপন কিছু নেই···সম্বন্ধে পর্যন্ত মাথলা উঠেছিল কিনা। সবই জানাজানি হ'য়ে গেছে।···বলে ছোট একটুক্‌রা কাগজে লেখা কি একটা আমার হাতে দিয়ে বল্‌লে : ঠিকানাটা তুই নিয়ে যা সুবু···সময় করে উঠতে পারিস্ ত যাস্ একবার—

সত্যর স্বর গম্ভীর।

ঠিকানাটা পড়ে দেখলাম : মালতী দাসী C/o গোবিন্দবল্লভ বসাক, বাজার গেট রাস্তা—

চোখে বিস্ময় আর প্রশ্ন নিয়ে তাকালুম সত্যর মুখে। সত্য বুঝে একটু শুষ্ক হেসে বল্‌লে : আজকাল তোদের ওখানে এ নামেই ও পরিচিত কিনা!···যাক্, আমার ষ্টীমারের টাইম হ'য়ে এলো। একটা পত্রাঘাত করিস আমার ঠিকানায়। ষ্টীমার অফিস গোয়ালন্দ। আর··· সত্য গলাটা একবার ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিয়ে বল্‌লে : হ্যাঁ, আর দেখা হলে ওকে বল্‌বি, ও মর্‌লেই আমার এ দেশ ছাড়া সম্ভব হবে, তার আগে নয়।

সত্য দাঁড়িয়ে গেল।

দূর থেকে শোনা গেল ষ্টীমারের ঘাট ত্যাগের প্রথম সংকেত!

বহুদিনের কাঁচা মাটির সড়কটা প্রায় তেমনি আছে। পথিকদের পথক্লান্তি অপনোদনের জন্যে দু'ধারে তরুবীথি। পাশে খাদ। বর্ষাকালে জল জমা হয়। তারপর দিগন্ত-বিস্তারী মাঠ। আষাঢ়-শ্রাবণে এইসব মাঠ ভরে যায়, ধান-পাটের সবুজের প্লাবনে।

এখন চৈত্রের প্রথম। মাঠগুলো বৈরাগীর ঝুটির মত রুক্ষ ধূসর। জলশূন্য খাদ ফেটে চৌচির। মাঝে মাঝে হুমকা হাওয়ায় পথের শুক্‌নো ধুলির ঘূর্ণি উড়ছে। এলাম ঠাকুমার চরণ দর্শনে, আর শুন্‌তে হোলো আরেকজনের জীবনের উপকাহিনী! কে জান্‌তো এমনি হঠাৎ দর্শন মিল্‌বে এমন এক প্রাক্তন বন্ধুর—যার জীবনাদর্শ একদিন ছিল আকাশের মত বিরাট। কোথাকার এক অখ্যাত ষ্টেশনমাষ্টারের মেয়ে অতসী,—যার চোখের জলের বন্যায় ভেসে গেল একটা আদর্শপ্রাণ জীবন। বস্তুতঃ জিনিষটা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।

এইখানেই শেষ নয়। জানিনা কেমন করে সম্ভব হ'য়েছে,—তবে ব্যাপারটা অস্পষ্টও নয়।

বিবাহের পর দম্পতি হয়তো সুখেই ছিল। সুখের ঘরে ঝড় লাগলো অতর্কিতে। বুদ্ধিজীবী মানুষ যতই কেন না সত্যতার বড়াই করুক, তার বর্বর অন্ধলালসা, আদিম ও সনাতন। এই লালসারই ক্ষুধিত ঝড় একদিন হয়তো সুখী সুস্থ দম্পতীর জীবনে ঘটিয়েছে বিচ্ছেদ। এ বিচ্ছেদ আর জোড়া লাগেনি।

কিন্তু লাগেনি কেন?

এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়তো সহজ নয়।

শুধু চোখের জলের জন্যেই নয়, অতসীকে অন্তর দিয়েই ভালবেসেছিল সত্য। শুধু তাই নয়, আছে এক অনিবার্য আকর্ষণ,—যাকে আহোরাত্র সত্য মনে মনে লালন করছে। শেষের কথাটাই ওর একমাত্র সাক্ষ্য; তা সত্ত্বেও সত্য কেন গ্রহণ কর্‌তে পার্‌লো না অতসীকে? দেশকর্মীর মনের বলিষ্ঠতা কোথায় গেল তার? হাওয়ার ঘূর্ণির মতই সত্যর চিন্তা ঘুর্‌তে লাগ্‌লো।

বেলা বেড়ে চলেছে। ঘোড়ার খুরে উড়ছে শুক্‌নো ধুলো এলোমেলো। কাপড় জামার অবস্থা কাহিল। ছায়া-কার্পেট বিছানো পথে পথে। দুই একটি বিশ্রামরত পথিক।

গাড়ীর দুলুনিতে শরীর দুল্‌ছে,···চোখে ঘুম নেমে আস্‌তে চায়।

সত্য বলেছে—মালতী ওরফে অতসীর সঙ্গে দেখা করতে।

দেখা করা উচিত কিনা তাই ভাবছিলাম। অথচ সত্যর মুখে শোনার পর একেই দেখার জন্য অস্থির হ'য়ে উঠেছি। মেয়েটির চোখের জলে কী যাদু আছে, যার জন্যে অমন কঠোর লোকটা চিরজীবনের মত বন্দী হ'য়ে গেল? যাদু, না, প্রেম? স্বীকার ক'র্‌তে হবে, ওর

ক্ষমতা আছে। কিন্তু যারা ওকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, সেই বরবরের কাছে সে ক্ষমতা উড়ে গেল কোথায়? না পেরেছে আত্মরক্ষা করতে, না পেরেছে সতীত্ব বাঁচাতে নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে! প্রেমের মর্য্যাদা তার কোথায় গেল?···বেঁচে থাকতে হবে? এই বিশাল পৃথিবীতে মনুষ্যত্বের চরম অবমাননার পথ ছাড়া আর কিছু কি খোলা ছিল না?···

বাড়ী এসে সময় যে কোথা দিয়ে গেল, বুঝতেই পারলুম না।

এতদিন পরে কাকাকাকিমা অনেক করলেন।

ঠাকুমা থাকেন বিছানার আশ্রয়ে। হাটের অসুখ,—তা বাদে বয়সও যথেষ্ট হোলো। উঠতে মানা।

কাকা হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। এখানকার সব হিন্দু ডাক্তার করলেন চলে যাওয়ায় তাঁর হয়েছে পোয়া বারো। যেন বাঁশবনে শেয়ালরাজা।

এত ত দেখে হৈ-হল্লা, খুনোখুনী হোলো, কাকা নির্ভীক ও নির্বিকার। কারো কথাই তিনি শোনেননি। ঠাকুরার মত জন্মভূমিপ্রীতি ছিল কিনা বলা যায় না, তবে অর্থপ্রীতি যে ছিল, তাতে নিঃসন্দেহ।

আদর আপ্যায়নের ঘটায় কোন কিছু মনে থাকবারও কথা নয়। কোন্ হারানো দিনের বন্ধু সত্যনারায়ণ,—যার স্ত্রী ভাগ্যদোষে আজ দেহ বেসাতীর বৃত্তি গ্রহণ করেছে—তার কথাও যে মনে থাকবে না, তাতে আর আশ্চর্য কি!

তবু মনে হোলো হঠাৎ। শুধু মনে হওয়া নয়, চাক্ষুষই দেখলাম অতসীকে।

ছুটি শেষ হতে আট কি দশদিন।

সেদিন গিয়েছি কাকার ডিস্‌পেন্‌সারিতে—যেমন যাই।

প্রথমে বুঝতে পারিনি। দৈনিক কাগজখানা নিয়ে এককোণে বসেছিলাম চেয়ারে। মেয়েটি একেবারে কাকার মুখোমুখি বসাতে চোখে ঠেকল লাগলো।

বয়স পঁচিশের মধ্যেই। অদ্ভুত সাজ-পোষাক কিছু ছিল না। সাধারণ একখানা সাদা চাকাই শাড়ী পরণে। আমার কাছে সাধারণ বাঙালী মেয়ের মতই মুখ নাক মনে হোলো,—চোখ দুটো একটু বড়ই হবে হয়তো। কিন্তু বেশ সুশ্রী ও সপ্রতিভ···

কে এই মেয়েটি?

অসংকোচ কথাবার্তা। সহরে আজকাল এমন মেয়ে ত দেখা যায় না!

আধঘণ্টা ছিল বোধ হয়। যাবার আগে তাকালে আমার দিকে। আমিও তাকালুম। চোখাচোখি হোলো। চোখ ফিরিয়ে নিলে মেয়েটি। মনে হোলো যেন হাসছে।

মেয়েটি বেরিয়ে যেতেই আমি কম্পাউণ্ডার উমানাথ-বাবুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলুম। উনি পরিচয় দিয়ে বললেন,—মহিলাটি এখানকার হসপিটালের নার্স। নাম মালতী দেবী।

শুনে স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম।

পরের দিন খোঁজ নিয়ে জানলুম আমার অনুমান ঠিক; এই মালতী দেবীই মালতী দাসী।

কিন্তু সত্য যে ঠিকানা দিলে আমাকে? তবে কি 'দেবী' হওয়ার খবর ও জানে না?

একটা অদম্য কৌতূহল। এই কৌতূহলই একদিন আমাকে মালতী দেবীর দোরে পৌঁছে দিলে।

শুক্লপক্ষের মরা সন্ধ্যা। আলোটা দিনের বেলার পেঁচার চোখের মত অস্বচ্ছ!

সহরের পশ্চিমে বড় রাস্তাটা যেখানে পানাকুড়ি ভরা খালের কাছে বাঁক নিয়েছে ঠিক তার দক্ষিণে ছোট একপায়ে চলার পথ। পথের দুপাশে নতুন কলাগাছের ঝাড়,—নতুন পত্তনী দেওয়া বাড়ীগুলোকে আড়াল করে রেখেছে। স্থানটা নির্জন। পায়ে চলা পথ দিয়ে এগিয়ে যেতে একজন বেঁটেখাটো লোক পাশ কাটাতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো।

: মশাই কি মালতীর ওখানে যাচ্ছেন?

লোকটার ভদ্রভাজ্ঞানের অভাব দেখে অবাক হলাম অনিচ্ছাসত্ত্বে বললাম: হ্যাঁ,···

কেন?

লোকটা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বলে: তা যাচ্ছেন যান্,···গিয়ে আপনাদের মালতীকে বলবেন, আমিও আসছি কোর্টের সমন নিয়ে। আমার নাম গোবিন্দবল্লভ বলাক···মাগীকে যদি দশটি বছর না ঠুকি ত আমার

নাম ফিরিয়ে রাখ্‌বো। রক্ত-জল করা টাকা আমার মশাই, মাগ্‌না নয়···বিপদের সময় দুটি বচ্ছর মাগীকে আমি বসে বসে খাইয়েছি, ঘরভাড়া যুগিয়েছি, চাকায় পাঠিয়ে নার্সিং শিখিয়েছি,···আর···আর এখন সুখের নাগাল মিলেছে কিনা,···ধরাকে সরা জ্ঞান···তা আমারে বলে কিনা, বেরিয়ে যাও। শালা বেইমান্, নিমক-হারাম···আরো একগ্রস্থ কী সব বলে লোকটা সদর্পে চলে গেল।

আমি স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলাম।

একি কাণ্ড! লোকটা অভদ্র, সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-সমস্ত আমার কাছে বলে লাভ? লোকটা ভুল করেছে নিশ্চয়ই। তবে মুহূর্তের মধ্যে মালতী সম্বন্ধে যে চিত্র সে প্রকাশ করে গেল, তা' যতই খারাপ হোক্, তাকে কোন সাধারণ মানুষই অবহেলা কর্‌তে পারে না।

হাওয়ার দোলালাগা কলাপাতার উপর জ্যোৎস্নার ঝিলিমিলি। পলাতকা নেবু ফুলের গন্ধ। একটানা ঝিঁঝির আর্তনাদ—।

অনর্থ বিলম্ব করা উচিত হ'বে না মনে করে মালতী দেবীর দোরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

আশ্চর্য, দরজায় হাত রাখ্‌তেই তা আপনি খুলে গেল। আর ঠিক দোরের মুখেই মালতী দেবী। মনে হয় যেন আমারই প্রতীক্ষারতা। ঘরের মৃদু হারিকেনের আলো ওর মুখের একধারে পড়েছে। একটা স্নিগ্ধ বিষণ্ণতার ছাপ।

মালতী যেন ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো আমার অভ্যর্থনায়: আসুন, আসুন, নমস্কার। আমার কী সৌভাগ্য। আমি জানি, আপনি আস্‌বেনই একদিন—

ঘরে ঢুকে একখানা চেয়ার দখল করে বসে বল্‌লাম: আস্‌তেই হবে, কেন বলুন ত?

হারিকেনের শিখা বাড়িয়ে কাছেই চৌকিতে বসে মালতী একটু হেসে বল্‌লে: যদি বলি আমার মন বলেছে—

বল্‌লাম: বিশ্বাস করি না। কারণ, আপনি ত আমাকে জানেন না। আলাপও ত আমাদের এই প্রথম—

মালতী স্বীকার করে বল্‌লে: তবু বল্‌বো, আপনার সম্বন্ধে আমি অনেক কিছু জানি,—যা আপনি নিজেই জানেন না।

হেসে বল্‌লাম: যেমন—

: যেমন, মালতীও একটু মুখ টিপে হাস্‌লো: যেমন ধরুন, পরশু আপনার যাওয়া ঠিক অথচ যাওয়া হবে না—

আশ্চর্য বোধ করে বল্লাম: কেন?

মালতি বল্‌লে: আপনার ঠাকুমার কাছেই তা জান্‌তে পার্‌বেন,—আমি শুধু জানালাম মাত্র।···আচ্ছা, একটু বসুন, আমি আস্‌ছি। বলে চট্ করে উঠে পাশের ঘরে চলে গেল।

এবার দৃষ্টিটা ঘরের চারিদিকে ছড়িয়ে দিলাম। ঘরখানি খুবই সাধারণ। পূবে, পশ্চিমে দুটি জান্‌লা। দরজাও দুটি। অল্পের মধ্যে সাজানো-গোছানো। ঘরের ভেতর দুটির বেশী ছবি নাই। দুটিই মেয়েদের। ফুল-তোলা টেবিল ক্লথ দিয়ে ঢাকা ছোট একটি টেবিল। তার উপর একটি ফটো আর ফুলদানী। একটিমাত্র চৌকি,—তাও একটি চাদর দিয়ে ঢাকা!

সত্যির কথা মনে হোলো। বেচারা হয়তো জানে না,—যে মালতীকে সে জানে না, সে ফিরে এসেছে তার পূর্বতন জীবনে। কিন্তু ফিরে আসে নি,—যে জীবন ছিল অতসী নামকে কেন্দ্র করে।···তবু চান্দুদ দেখ্‌লে একবার খুসীই হোতো সত্য।

ফিরের হাতে জলের গ্লাস দিয়ে কিছু ফলমূল মিষ্টি থালায় সাজিয়ে নিয়ে ফিরে এলো মালতী।

ছোট টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে মালতী বল্‌লে: যৎসামান্য·· কিন্তু চা হ'বে কি?

হেসে নিয়ে বল্‌লাম: চা-ই আমার দরকার··· যৎসামান্যটা আপনি নিয়ে যেতে পারেন। আমার ক্ষুধা নেই।

একটু হেসে মালতী বল্‌লে: ক্ষুধা নেই, না, ঘৃণা—?

আশ্চর্য বোধ করে বল্লুম: ঘৃণা? ঘৃণা কেন?

: কেন, পথে দাঁড়িয়ে যে লোকটা আমার কুৎসা গাইলে আপনার বিশ্বাস হয়নি?

ও যা বল্‌লে, ওর কোনটাই মিথ্যে নয়, সুব্রতবাবু!

বল্লুম; আপনারও কানে গেছে তবে! কিন্তু কোন্‌টা সত্যি, কোনটা মিথ্যে, তার জন্য ত আমি দায়ী

নই,—ওটা থাক মালতী দেবীর মনে মনে। আমি শুধু অতসী দেবীর সম্বন্ধে জানতে পারলেই যথেষ্ট মনে করবো।

শুনে স্তব্ধ গম্ভীর হয়ে রইলো মালতী।

প্রদীপ্ত হারিকেনটা অনিমেষ ভাবে তাকিয়ে আছে। ঘরের এক কোণ থেকে স্তব্ধতা ভেঙ্গে দিচ্ছে এলার্ম ঘড়িটা।

কি একসময় চা রেখে গেল। হাতে তুলে নিয়ে নিঃশব্দে চুমুক দিলাম।

অনেকক্ষণ পর মুখ তুললো মালতী। গলার স্বরটা ভারী-ভারী। মৃদু কণ্ঠে বললে: বেশ ত, কি জানতে চান, অতসী দেবী সম্বন্ধে বলুন।

একটু ঘোর থেকে বললুম, জানতে ত চাই অনেক কিছুই। কিন্তু বিরক্ত করবো না আপনাকে। শুধু যে সম্বন্ধে আমার কৌতূহল তা জানতে পারলেই যথেষ্ট। মামলা-মকদ্দমা চুকে যাবার পর স্বামীর ঘরে অতসী দেবী ফিরে যাননি,—সে কি নিজের ইচ্ছায়,—না, স্বামীই তাকে নিতে চাইলেন না?

মালতী ধীরে ধীরে বললে; যদি বলি, সে নিজের ইচ্ছাতেই যায়নি, বিশ্বাস হবে কি?

বললুম: না। কারণ যে চোখের জল আর প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে অতসী দেবী স্বামীকে পেয়েছেন, তাই যে মিথ্যে হ'য়ে যায়—

মালতী বললে: তা সত্যি। কিন্তু তাই হয়েছে সুব্রতবাবু,—নিজের ইচ্ছাতেই অতসী দেবী যায়নি। যদি জিজ্ঞেস করেন, কেন, তবে তার উত্তরে এই বলা যায়, একটি বিষয় নিয়ে তার মনে এক নিদারুণ সংশয় জাগে—

অস্ফুট-বিস্ময়ে বললাম: সংশয়—?

গম্ভীর ভাবে বলতে লাগলো মালতী: তবে শুনুন। কেস্ চলতে থাকা কালে অতসী দেবীকে রাখা হয় এক অনাথ আশ্রমে। মাস তিনেক থাকতে হয় সেখানে। মাঝে মাঝে দেখা করতে স্বামী আসতেন সেখানে।···কিন্তু একদিন অতসী দেবীই তাঁকে আসতে মানা করে দেয়। স্বামী কারণ জানতে চাইলেন। স্ত্রীর কেমন লজ্জা করতে লাগলো। স্বামী জিদ করাতে স্ত্রী একরূপ ছুটে পালিয়ে গেলেন। পারলেন না সামনা সামনি নিজেকে প্রকাশ করতে। পরে কিন্তু স্বামী জানতে পারলেন সব। স্ত্রীর লেখা চিঠিতেই জানতে পারলেন। তিনি বিশ্বাস করলেন না। ছুটে এসে বললেন: সন্তান যে আমার নয়, তার প্রমাণ কি?

প্রমাণ? তাইত প্রমাণ কোথায়?···কিন্তু প্রমাণের চেয়ে বড় অতসী দেবী নিজে,—একথা বোঝানো গেল না তাঁর স্বামীকে। শুধু অনুমানকে মেনে নিতে তিনি রাজী হলেন না।

মালতী থামলো।

দীর্ঘশ্বাসের মত এক ঝলক হাওয়া হারিকেনের আলোকে দুলিয়ে দিয়ে গেল। জানলা পথে কয়েকটা তারা—যেন কয়েকটা হীরের কুচি। মালতীর চৌকির উপর তীর্যকভাবে এসে পড়েছে এক ফালি জ্যোৎস্না।

আমি চুপ করেই রইলাম। মালতী বললে: তবু তার স্বামীকে ফিরে যেতে হোলো। অতসী দেবীর ধারণাই হোলো বড়। আর একটা কথা। পাপ দেহ নিয়ে একটা পবিত্র সংসারকে কলুষিত করতে কখনো রাজী হোলো না অতসী দেবী। মরে গেলেও নয়।'

শুধু সংশয় আর অনুমান!

আর পাপ দেহ নিয়ে একটা সংসারকে অপবিত্র না করা,—বস্তুতঃ স্বামীর ঘরে না ফেরার এই ইচ্ছে অন্যতম কারণ অতসী দেবীর।

হঠাৎ এলার্ম বেজে উঠলো ঘড়ির।

শব্দে যেন চমকে উঠে দাঁড়াল মালতী।

ঐ যা: ভুলেই গেছি,—বলে মুখে একটু হাসি টেনে বললে: আমাকে যে এখনি উঠতে হচ্ছে সুব্রতবাবু। পোড়া একটা ডিউটি রয়েছে আবার। ···আচ্ছা, আপনি কি যাবার আগে আরেক দিন আসতে পারেন না?

সঙ্গে সঙ্গে আমিও উঠে দাঁড়ালুম; বললুম যদি দরকার বোধ করেন ত আসতে পারি—

: দরকার?—হাঁ, দরকারই ত, মালতি আঁচল দিয়ে মুখটা একবার মুছে নিয়ে বললে: শুনেছি, আপনি নাকি অতসী দেবীর স্বামীর এককালীন বন্ধু ছিলেন—

: ও, এ জন্যেই। আচ্ছা, নমস্কার—

বলে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালুম।

: নমস্কার—

গেলুম দুদিন পর। একটু সকাল সকালই।

সেই লোকটি দাঁড়িয়ে আছে। পথের মোড়ে, গোবিন্দবল্লভ বসাক।

পাশ কাটিয়ে আসতে লোকটা যেন তেড়ে এলো: বাবুর দেখি খুব তাড়া! অনুগ্রহ করে একটা কথা শোনার কি ফুরসুৎ হয় না?

ইচ্ছা ছিল না, তবু ফিরে দাঁড়ালুম। এবার লোকটাকে ভাল করে দেখা গেল। বয়স বোধ হয় পঞ্চাশের কিছু নীচেই হবে। রোগা একজোড়া গোঁফ্। চুলগুলো কদমছাঁট। পরণে লুঙ্গি, চুড়িদার ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবী—কী একটা আতরের গন্ধে ভুর্‌ভুর্। একমুখ পান। ঠোঁট দুটি পানের রসে রসে বিবর্ণকালো।

ভ্রূ কুঁচকে গেল, বল্‌লুম: কি কথা?

লোকটা খুসিতে আকর্ণ বিস্তার করে হেসে বল্‌লে: হেঃ হেঃ, আর কিছু নয়,···শুধু মালতীকে বল্‌বেন,···আমি এসেছি, ব্যস্—

লোকটা পাগল নাকি? সক্রোধে বল্‌লুম: ইচ্ছা হয়ত তুমি গিয়ে বল্‌তে পার···

বলে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে এলুম।

লোকটার অকথ্যভাষা পিছন থেকে নিষ্ফল আক্রোশের মত তাড়া করে আসতে লাগ্‌লো।

ঘর খোলাই পেলাম,—কিন্তু দেখ্‌তে পেলুম না মালতীকে।

ঝি এসে বল্‌লে: আপনি বসুন, মা আসছেন।

প্রায় দশমিনিট বাদে এলো মালতী। একটু বিশেষ রকমের সাজগোজ। ফিকে হল্‌দে রঙের ব্লাউজের উপর বড় পাড়ের কোরা টাঙ্গাইলের শাড়ী। হঠাৎ যেন জ্বল্ জ্বল্ করে উঠ্‌লো সিঁদুরের টিপটা—বিবাহিত জীবনের নীরব স্বাক্ষর। কিন্তু সেদিন টিপটা যেন চোখে পড়েনি।

মালতী ঘরে ঢুকতেই বল্‌লুম: আচ্ছা, এসব আপনি সহ্য করেন কি করে? একটু চম্‌কে উঠ্‌লো যেন মালতী—বল্‌লে: কোন্ সব, বলুন ত?

: মানে, ঐ যে লোকটা···রাস্তায় শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনার মুণ্ডপাত করে। বলুন ত একবার পুলিসে খবর দিয়ে দি'—

শুনে যেন একটা ছায়া পড়্‌লো মালতীর চোখে। একটু চুপ করে থেকে বল্‌লে: সে কথা কি আমিও ভাবিনি বলুন? সেদিন ওর মুখে সব কথাই ত শুন্‌লেন! মরতেই আমি চেয়েছিলাম···কিন্তু বার বার বাঁচিয়ে দিলে এই লোকটা। দিলে আশ্রয়,···দিলে টাকা পয়সা, ওর যাবতীয় সব কিছু। এসব ত আমি কিছুই চাইনি। যেচ্ছায় যে স্বামী ত্যাগ করে, তার সংসারে বেঁচে থেকে লাভ? হস্‌পিটালে একটা পাপ বিইয়ে যখন নিজেই মরতে বসেছি,···আবার বুক দিয়ে রক্ষা কর্‌লে এই লোকটাই। কাণ্ড দেখে আমার রাগের অন্ত রইলো না। কি আপদ, লোকটা দেখি মর্‌তেও দেবে না।···অবশেষে বোঝা গেল, স্বার্থটা ওর কোথায়। বেঁচেই যখন গেলাম,···তখন বলে না থেকে কিছু করা ভাল। এই মনে করেই নার্সিং পড়তে যাওয়া। ঠিক এর আগে একদিন লোকটা ওর ইচ্ছার কথাটা জানালে। ভাবটা, আমাকে না পেলে ও মরে যাবে। অথচ শুনেছি ওর দুই স্ত্রী বর্তমান। সেই দিন থেকে ওর উপর কী ঘেন্নাই হোলো!···আর ভয়।

মালতী বল্‌তে লাগলো: আর ভয়। তার পর অনেক ভেবে ঠিক করলুম নার্সিং পড়া শেষ করে তারপর যা হোক্ কিছু করা যাবে। কথাটা বল্‌লুম ওকে—লোকটা পাষণ্ড হ'লে কি হবে, হৃদয় আছে। রাজী হ'য়ে গেল।···তার পর ফিরে এলে ত এই চল্‌ছে। ওর আক্রোশ, কেন আমি ভিন্ন বাড়ী নিয়ে আছি। আর নিয়ে আছি ত কেন দেখা করি না—। দেখ যে কেন করি না, তা ত আপনি বুঝতেই পারছেন। আর যাই হোক্, মুখে ছাড়া লোকটা এ পর্যন্ত ক্ষতি কিছু করেনি। সে সাহস ওর নেই। আমি জানি। তাই আবার একটা পুলিস ডেকে অনর্থক—

একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বল্‌লুম: আপনি অনর্থক মনে কর্‌তে পারেন; কিন্তু সত্যি যদি ও প্রাপ্য টাকার জন্যে মামলা দায়ের করে—বলা ত কিছু যায় না—

মালতী হেসে বল্‌লে: অর্থাৎ তাতে আমার ব্যবস্থা? তা মিথ্যে বলেন নি। এদিকে ও সব পারে।

: তবে কাজেই আমার কথার উপর নির্ভর করেন ত কিছু বল্‌তে পারি—

: নিশ্চয়ই।···একটু দাঁড়ান, আপনার জন্যে চা নিয়ে আসি,—বলে উঠে গেল মালতী।

চলে যেতে ওর কথাটাই মনকে আচ্ছন্ন করে রাখলে। এ সেই অতসী—নিজ ক্ষমতায় যে কঠোরব্রতী একটা মানুষকে বশে এনেছিল—আর যে অনেক অগ্নিপরীক্ষায় পার হয়ে এলো।···

আরো ঘণ্টাখানেক থাকতে হোলো মালতী দেবীর বাসায়।

চা নিয়ে ফিরে এলে, সেই কথাটাই ওকে বলেছি। বলেছি: ভদ্রোচিত সম্মান নিয়ে যদি বাস করতে হয়, হবে এ'দেশ তার ত্যাগ করাই উচিত।

কথাটা মেনে নিয়েছে মালতী। বলেছে: আপনি ঠিকই বলেছেন সুব্রতবাবু। এখানে হামেশা শুনতে পাবেন আমার মত হতভাগিনীদের দুর্দশার কাহিনী।···আচ্ছা কোথায় যাওয়া যায়, বলুন ত? আমার ত কোথাও কেউ নেই—

হেসে বললুম: বিপুলা 'পৃথ্বী'। তাছাড়া আপনি যে কাজ নিয়ে আছেন, তাতে সব ঘরে ঠাঁই। আপনি আমার বন্ধুর স্ত্রী,···সেই সুবাদে আমার বৌদি, বলুন ত আমি একটা ব্যবস্থা—

এই কথার পর অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো মালতী। দেখলুম চোখ দিয়ে জল পড়ছে। আঁচল দিয়ে মুছে নিয়ে ধীরে ধীরে বললে: বেশ, আপনি যা বলবেন, তাতেই আমি রাজী।

চোখের জলের হেতুটা পরে বুঝেছিলাম।···

যাবার দিন গাড়ীতে তুলে দিতে এলেন মালতী দেবী —মালতীদেবী নয় অতসী বৌদি। এতটা আশা করিনি।

অতসী বৌদির সর্বাঙ্গে বিষণ্ণতার ছাপ। মনে হয় যেন অনেক কেঁদেছেন।

কথা হয়েছে, আমি কলকাতা পৌঁছেই ওকে চিঠি দেব কিছু ব্যবস্থা করে। এদিকে উনি প্রস্তুত হয়ে থাকবেন।

সময় আর নেই, অথচ সেই থেকে কথাটা মনে তোলপাড় করছে।

বলেই ফেললাম: আচ্ছা বৌদি, সত্যর সঙ্গে ত আপনার ঝগড়া নেই,—সে যদি আপনাকে নিতে রাজী থাকে, আপনি যাবেন এখন?

অতসী বৌদি এক লহমা আমার দিকে তাকিয়ে থেকে একটু হাসলেন। বললেন: কিন্তু তিনি রাজী হবেন কেন ঠাকুরপো, আপনি ত তাঁকে ইদানীং দেখেন নি?

: যদি বলি, তাকে দেখেই আমি একথা বলছি—

গম্ভীর হয়ে গেলেন অতসী বৌদি। বললেন: সত্যি বলছেন?

তখন এতদিন যা বলিনি, এক নিঃশ্বাসে তা' বলে গেলাম। আর চলে আসবার সময় যা বলেছিল, তাও বললাম।

সবটা মন দিয়ে শুনে অতসী বৌদি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে রইলেন। তারপর বললেন: একথা শোনার পরেও আপনার বন্ধুর কাছে যেতে বলেন?

অপ্রস্তুত না হয়ে বললাম: বলি, কারণ ও কথাতে আপনার উপর তার একটা অনিবার্য আকর্ষণই বোঝা যায়—

অতসী বৌদি হঠাৎ কঁাদের সঙ্গে বললেন: এই যদি, তবে তিন বছরের মধ্যে একবার এসে উনি ওকথাটা বলেন নি কেন?

আশ্চর্য বোধ করলুম: শুধু বললুম: তিন বছর—!

মালপত্র গাড়ীতে তোলা হয়েছে। গাড়োয়ানের ভাগাদায় নীরবে গাড়ীতে উঠে বসলুম। পায়ের থেকে দেশের মাটির স্পর্শ সরে যেতে সকলের মুখই ভেসে উঠলো মনে—যাদের কয়েকদিনের জন্যে কাছে পেয়েছিলাম—ঠাকুমা, কাকাকাকিমা, খুড়তুত ভাই বোন, আরো অনেকে।

দুপুরের রোদ্দুর। কৃপণ আকাশ গাঢ় নীল। রাস্তার ধারের শিশু গাছগুলো নিঝুম। চৈত্র দিনের যে ক্ষ্যাপা হাওয়া পাতা ঝরিয়েছে, সে হাওয়া কোথায় যেন মরে গেছে। চারপাশেই যেন বিচ্ছেদের একটা বৈরাগীসুর···

গাড়ী চলতে সুরু করেছে।

অতসী বৌদি একটু চেঁচিয়েই বললেন: না ঠাকুরপো,···আমার পথ আমি খুঁজে পেয়েছি। আর আমার কাদনা নেই।

ধাবমান ঘোড়ার খুরে ধুলো উড়লো একরাশ। মুহূর্তে সেই ধুলোয় আড়াল হয়ে গেল অতসী বৌদির বেদনাবিধুর মুখখানি—!

প্রায় দেড়মাস বাদে একখানা চিঠি দিতে পারলুম অতসী বৌদিকে।

সত্যকেও একখানা।

আশ্চর্যের বিষয়, অতসী বৌদির নামে চিঠিটা ফিরে এলো আমার হাতে অনেক পোষ্টাল ছাপ নিয়ে। মিলেনি মালিকের সন্ধান। চিঠিতে বিশেষ যা ছিল, তা' হ'চ্ছে একটি ভাল চাকুরীর খবর।

সত্যর চিঠির উত্তর পেলাম—দুইমাস বাদে চিঠির কথা যখন ভুলে গেছি।

সত্য লিখেছে অনেক কিছুই। অতসী বৌদির কথাও একটু ছিল। লিখেছে: তোর চিঠির উপর নির্ভর করে অনেক আশা নিয়ে গেলুম একদিন সহরে। কিন্তু যাওয়া যে বৃথা হবে, কে জানতো?

কোথায় চলে গেছে মাসতো নার্স,—কেউ কোন সন্ধান দিতে পারলে না।

মনটা হু-হু করে উঠ্‌লো।···এইবার আমাকেও ছাড়তে হবে দেশের মায়া।

'ভাবছি, অতসীর খোঁজটা একবার নেব কিনা!···

সত্যর চিঠি পড়ে বুঝতে পারা গেল, কেন আমার চিঠি পাননি অতসী বৌদি। কিন্তু কেন গেলেন নিরুদ্দেশের পথে?

দুটি জীবন তবে সংশয়েই রয়ে গেল তবে?

কবি ও কবিতা

শ্রীসুধীর গুপ্ত

১

গীতি-কবি স্বল্পতম শব্দের প্রতীকে
মুহুর্মুহু রূপ-কল্প বিরচিয়া চলে
লীলামুগ্ধ মহাবিশ্বে নিত্য কুতূহলে।
লক্ষ বিম্বে-প্রতিবিম্বে প্রেমে সত্তাটিকে
বিচ্ছুরিত—বিস্ফারিত করি' চতুর্দিকে
ক্রমাগত-সৃষ্ট রূপ প্রজ্ঞা-প্রীতি-বলে
অতিক্রম ক'রে ক'রে চলে পলে পলে।
মূলমন্ত্র করে কাব্যে মহা পৃথিবীকে।
বুদ্ধি-জাত যুক্তি যার বোধিতে চূর্ণিয়া—
বিগলিত মহাভাবে গলায়ে—গলায়ে।
অহরহ-সৃষ্ট যত ধ্বনি-রূপ দিয়া
আনন্দ-মানসী-মূর্ত্তি সর্ব্ব-সমবায়ে
গড়িতে গড়িতে তৃপ্ত অতৃপ্ত সে হিয়া।
সৃজ্যমান সৃষ্টি তা'রে রাখে যে ভুলায়ে।

২

কবিতা আত্মার গন্ধ আনন্দ-বিহ্বল,
স্বতস্ফূর্ত্ত প্রেমাপ্লুত শুভ্র অশ্রুধার
আহ্লাদিত দীপ্তি যেন অভ্র তারকার,
সারদার অর্চ্চনার প্রফুল্ল কমল।
যোগীর প্রার্থিত বুঝি মুক্তি-মোক্ষফল।
জানি না কেমন সত্তা পরিপূর্ণতার,—
মুক্ত-পক্ষ কবিতার সঙ্গমে সংসার
তা'রই উপলব্ধি বুঝি সভে অধিরল।
যুগ-যুগ-প্রধাবন্ত নিরবধি কাল,
দেশে-দেশে-পরিব্যাপ্ত নিবারিত স্থান,
মানবের সভ্যতার স্বপ্ন সুবিশাল,
কবিতারই মহাভাব-রসে করি' স্নান
অনর্গল হয় শুধু উল্লাসে উত্তাল।
প্রাণারাম প্রেরণায় কাব্য অনির্ব্বাণ।

নববর্ষ

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

'উষ আভাহি···

···সৌভগং সুভগে দধিষ্টিষু।'

বৈদিক ঋষিদের কণ্ঠে নববর্ষ দিবসের প্রার্থনা উচ্চারিত হ'ল।—নিরানন্দ দূর করে আনন্দ আনো উষা! অন্ধকার নাশ করে এসো জ্যোতিতে! দিনে দিনে আনো তুমি সৌভাগ্য-সম্পদ!

ঋষিদের এই প্রার্থনাবাণীই পৃথিবীমানবের নববর্ষ-দিবসের মুখ্য প্রার্থনা। এই প্রার্থনাকেই কবি সত্যেন্দ্রনাথ কাব্যের ভাষায় রূপ দিয়েছেন—'জ্যোতির রূপে চিত্তে এসো নামি।' কবিগুরু বলেছেন,।···আলোয় আলো সকল আলোর দান···।

জীবজগতের জন্মলগ্নে পূর্বদিগন্তের উষার অরুণ আলোর প্রথম আনন্দস্পর্শ বুঝি মানুষের মানসপটে এঁকে গিয়েছিল অজ্ঞাতেই। সেই আনন্দের ছোঁয়াকে নতুন ক'রে, উপলব্ধিতে জাগিয়ে তোলবার স্পৃহা-প্রচেষ্টা মানুষের তাই চিরন্তন। ''চরৈবেতি'—এগিয়ে চলেছে ক্রমে। এগিয়ে চলবেও। এ চলা যেন অনাদির আদির কাছে পৌছানো।

চলার গতিতে পূর্ণচ্ছেদ পড়লে জীবন্মৃত অন্ধকার নামবে। অন্ধকার থেকে রেহাই পাবার জন্যই আলোর সাধনা। তাই নববর্ষের প্রথম দিনে বিশ্বস্রষ্টা সূর্যজ্যোতির প্রার্থনা চলে আসছে যুগ যুগ ধরে।—'··· প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।'

জ্যোতি আরাধনার সূত্র ধরেই মানুষ তার জীবন রক্ষার প্রধান উপাদান আবিষ্কার করেছিল—শস্যকমল-ফল। শস্য-কমল-ফল ফলনের ঋতুকে সূর্যদেবতার আশীর্বাদ —নববর্ষ আখ্যা দেওয়া হ'ল। এই ঋতু বিদায়ের সময় হাহাকারে ভরে উঠতো মানুষের অন্তর। জীবনী শক্তির প্রধান সম্বল যেন চলে যাচ্ছে। প্রতীক্ষাতুর মন খুশিতে মেতে উঠতো আবার ঋতুর পুনরাগমনে। নাচে গানে-প্রার্থনায় ঋতুনিয়ন্তা সূর্যকে পূজা করতো সকলে শস্য-কমল-ফল পূজার মধ্য দিয়ে। আশা—বাঁচবে আবার মানুষ। আঘুরুদ্ধি হবে মানুষের আবার।—'নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল আমার আঘুর পথে'—মধুসূদন।

অতীতে পৃথিবীর সকল দেশেই বীজ বোনা, ফল ফসল কাটা ও তোলার মাসকে নববর্ষের প্রথমমাস ধরে ধরেছে পরে অনেক সময়। বর্তমান নববর্ষে পুরাণো কালের মাস পরিবর্তন ঘটলেও, এককালের বাস্তব—ফল ফসল সুধার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া আজো প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের অনেক দেশের নববর্ষ উৎসবের মধ্যে ধরা রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এগুলি উপাসিত না হ'লেও, সৌভাগ্য কামনা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের সংগে যুক্ত হয়ে আছে অপরিহার্য প্রথা হিসাবে।

বাংলাদেশের অনেক জায়গায় অনন্তকালের কুমার-রূপে কাঁচা আমকে পূজা করা হয় নববর্ষ দিনে। কুমার—নববর্ষের জন্মলগ্নের উৎসব এটি। উত্তর প্রদেশের দীপালী ও কাশ্মীরের 'নওরোজ'—নববর্ষ উৎসবে ধানচালের (লক্ষ্মী) পূজা বিধেয়। তিব্বতের 'লোসারে'—নববর্ষে যবের মত প্রধান, লণ্ডনে যবের স্নিগ্ধ সবুজ পাতা, আপেল, কমলালেবু নিয়ে বাড়ী বাড়ী দেখিয়ে আনা শুভেচ্ছা-জ্ঞাপনের নিদর্শন। রুমানিয়ার পরস্পরের গায়ে ভুট্টার দানা ছড়ানো, ম্যাসিডোনিয়ার জলপাইপাতা ছোঁয়ানো দ্বিতীয় ব্যক্তির সৌভাগ্য আহ্বান করা। ইউক্রেনে টেবিলে রক্ষিত গম গাছকে সুখসমৃদ্ধি ও কল্যাণ প্রদানের প্রতীক ধরা হয়।

বর্ষা ঋতুই শস্যশ্যামল করে তোলে ধরিত্রীকে। কৃষি-কেন্দ্রিক দেশের প্রাণ বর্ষার মৃতসঞ্জীবনী বারিধারা। প্রাচীনেরা বর্ষা ঋতু থেকে বর্ষা সুরু করলেন।—'লোমঃ সংবৎসরে বর্ষ।' খৃঃ পূঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে সূর্যের দক্ষিণায়নে বর্ষা ঋতুর শ্রাবণমাসে নববর্ষ আরম্ভের প্রমাণ—শ্রাবণের ঝুলন উৎসব।

বীজ বুনবার, ফসল ফলাবার, কাটবার মাস চারটি—বৈশাখ, শ্রাবণ, মাঘ, কার্তিক। রবিপথের বৃত্তকে আকাশে চারটি অংশে বিভক্ত করা হল। মহাবিষুব, দক্ষিণায়ন,

উত্তরায়ণ, জলবিষুব। সূর্যরশ্মি প্রভাবের স্থান দুটি আয়ন বিন্দু ও দুটি বিষুব বিন্দুতে রূপ পেল গাণিতিক যুগে।

দক্ষিণায়নে বর্ষাঋতু, উত্তরায়নে শীত, জলবিষুবে শরৎ, বসন্ত ঋতুতে নববর্ষের শুভ প্রবেশ হতে লাগল ক্রমে ক্রমে। অতীতের এই নববর্ষস্মৃতি বিষুপদীসংক্রান্তিমাসে সূর্যের প্রতীক দেবতার পূজা উৎসবের মধ্যে এখনো বর্তমান।

বিষুপদীসংক্রান্তির মাঘ মাসে গণেশ সরস্বতী পূজা, কার্তিকে দুর্গা কালী পূজা ও দেওয়ালী উৎসব (খৃঃ পূঃ ৭০০০ অব্দের কার্তিকী অমাবস্যায় বর্ষ আরম্ভ হত—দীপালী উৎসব সেই স্মৃতি)। বর্তমানেও উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ী মহলের নববর্ষ দীপালী উৎসবের দ্বিতীয় দিনে। কার্তিক সংক্রান্তি দিনে ঈতুর (সূর্যের) উপাসনা ও বৈশাখের বিষু-চিক্রুকের সূর্যপোল উৎসবও প্রাচীন নববর্ষ উৎসব।

খৃঃ পূঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে মাসে যে অয়নবিন্দু ও বিষুবিন্দু স্থান পেতো, ২১৬০ বছর পর সেই সেই অয়নবিন্দু ও বিষুবিন্দু আগের মাসে স্থান পাবে। এই হচ্ছে কক্ষপথে পৃথিবী পরিক্রমা আর রবিপথের গণিত হিসাব। তাই হাজার হাজার বছর আগেকার শ্রাবণ মাসের দক্ষিণায়ন বর্তমান আষাঢ় মাসে পিছিয়ে গেছে। অয়নবিন্দু ও বিষুবিন্দুর পরিবর্তনের সংগে ঋতুমাস বদলাচ্ছে। ভবিষ্যতেও বদলাবে।

ঋগ্বেদের সময় হিম (শীত) ঋতু ও শরৎ ঋতু বছরের প্রথম ঋতু। ঋতু আরম্ভের তিথিকে নববর্ষের প্রথম দিন গণনা করা হত। সেদিনকার নববর্ষ উৎসবের প্রধান অংগ ছিল যজ্ঞ।

খৃঃ পূঃ ৪৫০০ অব্দে শরৎবর্ষের প্রথম মাস ছিল অগ্রহায়ণ। খৃঃ পূঃ ২৫০০ অব্দে কার্তিক। খৃঃ পূঃ ১১৯৩ অব্দে মহেশ্বর যুগে আশ্বিন শুক্লা সপ্তমীতে শরৎবর্ষ আরম্ভ। ৩১৯ খৃষ্টাব্দের গণিত অনুসারে আশ্বিনের শুক্লাদশমীতে।

খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে গৌধ অমাবস্যায় উত্তরায়ণে—হিমবর্ষে নববর্ষ সুরু।

আর্যযুগে মাঘোৎসব ও বসন্তোৎসবও প্রাধান্য পেয়েছিল নববর্ষের রূপ নিয়ে।

অতীতে পৃথিবীর সকল দেশই শরৎ বসন্ত শীত—এই তিনটি ঋতুকে বর্ষের প্রথম ঋতুর স্বীকৃতি দিয়েছিল এক এক সময়ে। সেই স্মৃতিই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের শারদ-বসন্ত-হিমোৎসব।

শারদোৎসব।

আশ্বিনের শুক্লাদশমীতে দশরা উৎসব ক্ষত্রিয়দের নববর্ষ।

গুজরাটীরা যজুর্বেদ-অথর্ববেদের শরৎবর্ষে নববর্ষ পালন করে আজো—আশ্বিনী অমাবস্যার পরদিন কার্তিকী শুক্লা প্রতিপদে। সেনশাহী সম্প্রদায়ের পার্সিদের শরৎ ঋতুতে নববর্ষ। শরৎঋতুতে নববর্ষ প্রচলিত হয় মিশরে খৃঃ পূঃ ১৩০ অব্দে।

বসন্তোৎসব।

ভারতীয়দের বাসন্তীদুর্গা, অন্নপূর্ণা পূজা এবং দোল উৎসব প্রাচীনকালের নববর্ষেরই অস্তিত্ব। ইওরোপে-রোমে ডায়োনিসাস, ইস্তার প্রভৃতি দেবতাদের উৎসবও তাই। ইওরোপে পুরোনো দিনে মার্চমাসকে বছরের প্রথম মাস ও বসন্ত ঋতুকে প্রথম ঋতু ধরা হ'ত।

হিমোৎসব।

ইওরোপে খৃষ্টমাস, ডায়োনিসাস দেবতা ও রোমানদের মিথ্রা দেবতার উৎসবের মধ্যে প্রাচীন নববর্ষ প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। বাঙলায় পৌষপার্বণেও।

খৃঃ পূঃ ৪৬ অব্দে হিমঋতুতে—সর্বকর্মে সিদ্ধি-প্রদায়কারী দেবতা জেনাসের নামে অনুযায়ী, জুলিয়াসকে স্মৃতিপটে চিরজাগরূক রাখবার জন্যে, জানুয়ারী মাসকেই বছরের প্রথম মাস ধরা হয় ইওরোপে।

জেনাস্ দেবতা, প্রকৃতিতে, গুণে সিদ্ধিদাতা গণেশের অনুরূপ। বাঙলায় শকাব্দাবর্ষের প্রথম মাস বৈশাখ। বৈশাখের প্রথমদিনে নববর্ষে এবং ভারতের অন্যদেশে চৈত্র শুক্লা প্রতিপদে সংবৎ বর্ষে ব্যবসায়ী মহলের মধ্যে সকল কর্মে সিদ্ধিলাভের দেবতা গণেশকে স্মরণ করা হয় পূজাপাঠের ভিতর দিয়ে।

নববর্ষ উৎসব প্রকৃত সৌর উৎসব। তাই বিভিন্ন রূপের সূর্যের প্রতীক দেবতাদের শ্রদ্ধা জানায় দেশবিদেশের মানুষ নববর্ষ দিনে।

নতুন বছর দেবতার আশীর্বাদ হ'য়ে বিরাজ করুক পৃথিবীতে। সুখ-সৌভাগ্য-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি ও কর্মে সিদ্ধি-লাভের সহায়ক হ'ক জনগণের। অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাবার দিশারী হ'ক।

'অসতো মা সদ্গময়—
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।'

সংকটের সমাধান কোন্ পথে

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত, এম-এ

দৈনন্দিন জীবন ধারণের গ্লানিতে খাদ্য সংকট ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জনিত নানা সমস্যায় 'ত্রয়মাণ সাধারণ মানুষ যখন আজ প্রাণ ধারণের প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় নিতান্ত অসহায় বোধ করছে, ঠিক তখনই একদল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত লোক তারস্বরে তাদের বাক্যজাল বিস্তার করে এক অপ-প্রচারে সাধারণ জনসাধারণকে ধুম্রজালে আচ্ছাদিত করে তাদের আরও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তুলছে। তাদের মতে—কোন সীমারেখা না রেখে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও যখন বাজারে কোন ভোগ্যপণ্য অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে থাকেনা—পরন্তু ইচ্ছা এবং চাহিদা অনুসারে অনেক সময় পণ্য পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে তখন স্বভাবতঃই আমরা এই সিদ্ধান্ত করে নিতে পারি যে—মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই আমাদের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমাদের জীবন-ধারণের মানও নিশ্চিতরূপে যথোচিত বজায় রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে তাদের এই বক্তব্য কখনও কখনও যথাযথ বলে প্রতিভাত হয়ে সাধারণ মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রাথমিক জ্ঞান নিয়ে বিশ্লেষণ করলেই তাদের এই বক্তব্যের অসারতা এবং অযৌক্তিকতা আমাদের নিকট পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রাকে পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে অনটনের প্রথম অবস্থায় মানুষ তার জীবনধারণের, অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য বাদ দিয়ে অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের বিশেষ করে বিলাসসামগ্রীর ব্যয় সংকোচের দিকে মনোযোগ দেয়। জীবন ধারণের অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর মধ্যে খাদ্য দ্রব্য হল প্রধান। কারণ এই অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের উপর মানুষের জৈবিক অস্তিত্বই নির্ভরশীল।

স্বভাবতঃই মানুষ তাই তার শেষ কপর্দক পর্য্যন্ত ব্যয় করে খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা মেটাতে বাধ্য হয়। বর্ত্তমানের অস্তিত্ব বজায় রাখতে তাদের বহু ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের কথা বিস্মৃত হতে হয় এবং তারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের কথাও তাদের মনের পাতা থেকে মুছে ফেলে দিতে হয়। পরিকল্পনাশ্রয়ী অর্থনীতির বর্ত্তমান নিয়ন্ত্রণ ও রেশন ব্যবস্থার শিথিলতার সুযোগে এই সকল অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে অসাধু ব্যবসায়ীর দল অবস্থাকে জটিলতর ও দুর্বিসহ করে তোলে। এই কারণগুলি নিশ্চয়ই আমাদের জীবন ধারণের মানের উন্নতির স্বাক্ষর বহন করেনা। অতএব দেখা যায় বাজারে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর কোন বাড়তি পরিলক্ষিত না হওয়াই জীবন ধারণের মানের উন্নতির লক্ষণ বলে যারা প্রচারে উৎসাহ প্রকাশ করেন,হয় তাঁরা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, পরিকল্পিত অর্থনীতির গতিপ্রবাহ সম্বন্ধে অজ্ঞ, নতুবা বিশেষ স্বার্থ এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

অন্যান্য ভোগ্য-পণ্যের তুলনায় খাদ্য দ্রব্যের একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। জীবন ধারণের ব্যয় সংকুলানে মানুষ যখন অসমর্থ হয়ে পড়ে তখনও সে খাদ্যদ্রব্য বাদে অন্যান্য ভোগ্য পণ্যের ব্যয় সংকোচের দিকেই দৃষ্টি দেয় যতক্ষণ না পর্য্যন্ত সে দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে পতিত হয়ে নিতান্ত অসহায় বোধ করে। কারণ পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে মানুষের অস্তিত্বই নির্ভর করে এই খাদ্য দ্রব্যের উপরে। তাই দেখা যায় যে মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও লোকের খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা সাধারণতঃ হ্রাস পায়না। এই সুযোগই গ্রহণ করে অতিলোভী মুনাফাবাজীর দল এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের সহায়কের ভূমিকা গ্রহণ করে সমাজ সেবা এবং দেশ সেবার নামাবলী গায়ে স্বার্থান্বেষী একদল রাজনীতিবিদ্ মিথ্যা অপপ্রচারে যারা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। মুনাফাবাজীর দল দেশের এবং দশের স্বার্থের দিকে দৃক্‌পাত না করে বেআইনীভাবে খাদ্য দ্রব্যের বন্টন

করে বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে, যার ফলে মূল্যবৃদ্ধি দেখা দেয় এবং কালোবাজারের সৃষ্টি হয়। অর্থনীতির মূল-সূত্রকে অর্থাৎ বাজারে চাহিদা যদি বেশী থাকে এবং সরবরাহ কম হয় তবে মূল্যবৃদ্ধি অবধারিত—কাজে লাগিয়ে সেই দুর্বৃত্তের দল তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করে। এই সকল সমাজ বিরোধীদল, চাহিদা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তাদের আয়ত্বের বাইরে জেনেই নিজেদের সঞ্চিত পুঁজির সাহায্যে মানুষের অতিপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যসামগ্রীকে জমা ক'রে লুকিয়ে রেখে বাজারে সরবরাহের অভাব সৃষ্টি করে এবং পরে জনসাধারণকে শোষণ করে অন্যায় মুনাফা লুটে তাদের সৃষ্ট এই কৃত্রিম অভাবের সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। কলিকাতার মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের এক সাম্প্রতিক সম্মিলনে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ-মন্ত্রী শ্রীসদানারায়ণ সিংহের উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন যে বর্তমান খাদ্যসংকটের প্রকৃত কারণ ফসলের অভাব নয়, মূল কারণ হল সরকারের সঙ্গে একশ্রেণী অসাধু ব্যবসায়ী মহলের অসহযোগিতা। বস্তুত গত বৎসর কোন অনাবৃষ্টি বা বন্যা হয়নি যার ফলে খাদ্য দ্রব্যের উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। পরন্তু খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন ভালই হয়েছিল বলে আমরা জানি। কিন্তু বণিক্ জোতদারদের সঙ্গে যোগসাজসে অসাধু ব্যবসায়ী মহলের কারসাজিতে গতবছরের তুলনায় এবছর বাজারে খাদ্যশস্য শতকরা চল্লিশভাগ কম আমদানি হয়েছে যার পরিণামে বর্তমান অনটনের সৃষ্টি হয়েছে—অর্থাৎ বর্তমান খাদ্যদ্রব্য সামগ্রীর এই অনটন মূলতঃ ও প্রধানতঃ মনুষ্য সৃষ্ট অনটন। কাজেই দেখা যায় কেবলমাত্র উৎপাদন বাড়ালেই সমস্যার সমাধান হবেনা (উৎপাদন ও ফলন বাড়ান অবশ্যই প্রয়োজনীয় নিঃসন্দেহ।)—সঙ্গে সঙ্গে মজুতদারী বন্ধ করে সুষ্ঠুবণ্টন ব্যবস্থার পথ গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় সমস্যার সমাধান কখনও সম্ভব নয়। মুনাফাবাজ ও মজুতদারদের ক্ষমাহীন শাস্তির অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত জন সাধারণের কাছে তুলে ধরতে হবে নিঃসন্দেহ, যে প্রচেষ্টা সরকারী পর্যায়ে সুরু হয়েছে, কিন্তু সমাজ জীবনের এই পচনশীলতা রোধ করতে সমাজবিরোধীদের শাস্তিব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ব্যবস্থারও, বিশেষকরে ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। জোতদারদের ক্ষমতা একেবারে খর্ব করে সমবায় প্রথায় চাষের প্রবর্তন করে ভূমিসংস্কারের আশু প্রয়োজন এবং সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ব করাও দরকার, অন্যথায় ফসল বৃদ্ধি পেলেও আমাদের অভাব ঘুচবার কোন নিশ্চয়তা নেই—আমাদের দেশে প্রবর্তিত এই মিশ্র অর্থনীতিতে।

দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পরিকল্পনাশ্রয়ী অর্থনীতিতে ভোগ্যপণ্যের মূল্য খানিকটা বৃদ্ধি পায় ঠিকই, কিন্তু সেই মূল্যবৃদ্ধিরও একটা মোটামুটি হার রয়েছে শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য পরিকল্পিত অর্থনীতিতে। সাধারণতঃ মৌলিক ও ভারী শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করে তার বিকাশের ব্যবস্থা করা হয় অবশ্য কৃষিকে অবহেলা না করে। বিশেষকরে ভারতবর্ষের মত কৃষিপ্রধান দেশের অগ্রসরমান অর্থনীতিতে কৃষির উপর সকল সময়েই যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। আমরা দেখেছি—প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা কৃষির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে রচিত হয়েছিল এবং তার পরেই রচিত হয়েছিল দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা ভারী ও মৌলিক শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করে—অবশ্য কৃষিকে একেবারে অবহেলা না করে। প্রথম দুই পাঁচসালা পরিকল্পনার ত্রুটি বিচ্যুতিকে শুধরে নিয়ে রচিত হল তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা তাও আজ সমাপ্ত প্রায়। বিভিন্ন পরিকল্পনার সবিশদ আলোচনা না করেও এই কথা বলা চলে যে একটা বিষয়ে আজ সকলেই একমত যে শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খাদ্যদ্রব্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনও সমভাবে প্রয়োজন, অন্যথায় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। পরিকল্পনা রচয়িতাগণের দৃষ্টিও সেদিকে ছিল এবং বর্তমানে হয়েছে জেনে আমরা আশ্বস্ত। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কিতও সেই সকল দেশ সেবার মুখোসধারী রাজনীতিবিদদের প্রচার ও কার্যকলাপের জন্য, যারা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির স্বার্থে ও নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে বর্তমানে চতুর্থ পরিকল্পনার পূর্বে আকাশচুম্বী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে পরিকল্পিত অর্থনীতির অনিবার্য ফল রূপে ঘোষণা করেন। পূর্বেই বলা হয়েছে—পরিকল্পনাশ্রয়ী অর্থনীতিতে কিছুটা মূল্য বৃদ্ধি স্বাভাবিক – এইকারণে যে বিভিন্ন প্রকল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে ভোগ্যপণ্যের যোগান বা উৎপাদন বর্দ্ধিত করা সম্ভব

হবেনা। তাই নির্দিষ্ট ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনের বর্দ্ধিত ব্যয়ের ফলে যে চাপসৃষ্টি হয় তার ফলে উক্ত বর্দ্ধিত ব্যয়ের হারে মূল্য বৃদ্ধি স্বাভাবিক। অর্থাৎ বর্দ্ধিত ব্যয়ের অনুপাতিকহারে মূল্য বৃদ্ধি হওয়াকে আমাদের গ্রহণ করে নিতেই হবে। তার অর্থ এই নয় যে গগনস্পর্শী বর্ত্তমান মূল্যবৃদ্ধিকে পরিকল্পনাপ্রসূত অর্থনীতির ফল বলে মেনে নিতে হবে। একদল অতিলোভী কালোবাজারী ব্যবসায়ী মহল পরিকল্পিত অর্থনীতির এই ছিদ্রপথে প্রবেশ করে ভোগ্যপণ্যের বিভিন্ন সামগ্রীকে মজুত করে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে জনসাধারণকে শোষণকরে, যার ফলে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি বিশেষ করে খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহের জন্য জনসাধারণকে অসাধুব্যবসায়ীদের খেয়ালখুসী মত মূল্য দিতে হয়। এই অসাধু মুনাফাবাজীদের শক্তির সহায়ক রূপে আমাদের দেশের বর্ত্তমান ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। বিভিন্নপণ্য ও খাদ্য দ্রব্যকে মজুত রাখতে অতিমুনাফা লোভী অসাধু ব্যবসায়ীকুলকে সহায়তা করে ব্যাঙ্কগুলি তাদের অর্থ জুগিয়ে, এই পাপচক্রের গতি রোধ করতেই ব্যাঙ্ক জাতীয় করণের প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই ওঠে এই অসাধু ব্যবসায়ী মহলের দুষ্টচক্রে নিষ্পেষিত হয়ে দীর্ঘশ্বাস উঠছে জন সাধারণের। তাদের মন ছেয়ে গেছে এক অসহায়তা বোধে চারিদিকেই যেন সঞ্চারিত এক নিতান্ত নৈরাশ্যবোধ কিন্তু এই হতাশাবোধ বা নৈরাশ্য সমস্যাসমাধানের উপায় নয়—পরন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে জাতির এই সন্ধিক্ষণে আমাদের সম্মুখে এই সমস্যা এক মহত্তর চ্যালেঞ্জরূপে দেখা দিয়েছে। হয় আমাদের সাহসের সঙ্গে, উৎসাহের সঙ্গে এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে অথবা এই অমঙ্গলের দানবিক শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করে আমাদের বিনষ্টের অতলে ডুবে যেতে হবে। কোন্ বিকল্প আমরা গ্রহণ করব? পরাজয়ী মনোভাবে হতাশায় ভেঙে না পড়ে আমাদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং ইতিহাসের শিক্ষা আশাবাদেরই শিক্ষা। ইতিহাসে আমরা দেখেছি যখন কোন দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিটি স্তরে অবক্ষয় দেখা দেয়, যে অবক্ষয়ের লক্ষণ আমাদের দেশের সমাজ জীবনে এবং অর্থনৈতিক জীবনেও দেখা দিতে সুরু করেছে, অসাধু, সমাজ বিরোধী এবং কালোবাজারী ব্যবসায়ী মহলের এবং দেশ সেবা ও সমাজ সেবার নামাবলীধারী ঐ সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মুখপাত্র রাজনীতিবিদ্ এবং সমাজ সেবীদের যোগসাজসে, তখন তার থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় গণতন্ত্র ভিত্তিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈপ্লবিক বা আমূলিক পরিবর্তন, কোন জোড়াতালি দিয়ে নয়, একমাত্র বৈপ্লবিক পরিবর্তন দ্বারাই এই অবক্ষয়কে রোধ করে, সমাজ জীবন থেকে এই পঙ্গু শীলতাকে মুছে ফেলে দিয়ে সুস্থ, গণতান্ত্রিক সমাজবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব—যে সমাজ ব্যবস্থাই আমাদের রাষ্ট্রের বহু বিঘোষিত লক্ষ্য এবং যে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত রয়েছে জনগণের কল্যাণ এবং মঙ্গল। এই গণতান্ত্রিক সমাজবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কেবলমাত্র সরকারের নয়, এর দায়িত্ব সরকারের সঙ্গে সমভাবে জনসাধারণকেও গ্রহণ করতে হবে। প্রশাসনিক প্রচেষ্টার সঙ্গে জনসাধারণের শুভ প্রয়াসের সমন্বয় সাধনেই এই আকাঙ্ক্ষিত সমাজ ব্যবস্থা পত্তন সম্ভব। শুধু মাত্র সরকারী ব্যবস্থার সাফল্য বা অসাফল্য সমালোচনা করেই জনসাধারণের কর্ত্তব্য শেষ হয়না, জনগণের শুভবুদ্ধি সঞ্জাত জাগ্রতচৈতন্যকে কার্য্যকরী করে তুলতে হবে সরকারী কল্যাণ প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করে, তবেই ঈপ্সিত সাফল্য অর্জ্জন সম্ভব।

রবীন্দ্রচিন্তায় আধুনিকযুগের সভ্যতা

অধ্যাপক গৌরীদাস মল্লিক এম্. এস্ সি

জ্ঞানবিজ্ঞানের উত্তরোত্তর অগ্রগতির ফলে আধুনিক মানব-সমাজ এক বৈচিত্র্যপূর্ণ নবসভ্যতার আলোয় উদ্ভাসিত। এই সভ্যতার চোখ-ঝলসানো রূপ মোহাচ্ছন্ন করে দেয় মানুষের চিত্তকে, তার নিত্যনূতন আবিষ্কারজাত অবদান বিস্ময়াভিভূত করে দেয় তাদের মনকে। বিজ্ঞানের দৌলতে বুদ্ধিমান মানুষ প্রকৃতিকে মন্থন করে তার ভিতর থেকে বার করে নেয় প্রভূত পরিমাণে জ্ঞানের নির্যাস, আর তার ভিতর বাহিরে অভিযান চালিয়ে বিস্তার করতে থাকে মানুষের আধিপত্য। এমনি করে বিদ্যাবুদ্ধিবলে মানুষ শক্তি ও বস্তুসম্পদে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলছে আধুনিক সভ্যতাকে।

এইরূপ শক্তিসম্পদে সমৃদ্ধ বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের অন্তঃকরণে সুকুমার-বৃত্তি কতটা উন্নত বা ব্যাহত হয়েছে তাহার যাথার্থ্য প্রমাণসাপেক্ষ। মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে, এই সভ্যতা মানুষের নৈতিক চরিত্রকে কি নিষ্কলঙ্ক করে রাখতে পেরেছে, মনের সরলতা মনের শান্তি কি অক্ষুণ্ণ করে রেখেছে, মানবধর্মকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে কি সে নিজে প্রগতির পথে চলেছে? অনুসন্ধান করলে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় চিন্তাশীল মানবপ্রেমিক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের লিপিবদ্ধ বহু ভাষণে, তাঁর রচিত নানা প্রবন্ধে, কবিতায় ও সংগীতে। তাঁর বহু তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধে, আবেগময় ছন্দোবদ্ধ কবিতায়, সুরতাললয়সমন্বিত সংগীত এবং কুণ্ঠাহীন সরল সভ্যভাষণে ব্যক্ত হয়েছে আধুনিক সভ্যতার সত্যরূপ, তার মূলগত প্রকৃতি, তার রীতিনীতি ও কর্মধারা। কারণ রবীন্দ্রচিন্তায় আধুনিক সভ্যতার প্রতিক্রিয়া গভীরে প্রবেশ করে তাঁর মনে নানা ভাবের সৃষ্টি করেছিল। তাঁর মনোজগতের সেই ভাব ভাষায় ও ভাষণে মূর্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে বহির্জগতে। তাই, ভাষায় ও ভাষণে প্রতিফলিত হয়েছে এই সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা ও তাঁর মনোভাব।

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সভ্যতার প্রতি মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, বরং বিরূপই ছিলেন। তাঁর এই মনোভাবের কথা স্পষ্টই বোঝা যায় তাঁর এই শ্লেষপূর্ণ কথায়—

"আমি ছেড়েই দিতে রাজী আছি
সুসভ্যতার আলোক।"

এই 'সুসভ্যতার আলোকের' প্রতি কেন যে তাঁর এইরূপ কটাক্ষপাত তা বেশ বুঝতে পারা যায়, যখন এই যুগের সভ্যতার রুক্ষ ও বিকৃত পরিবেশের কথা উল্লেখ করে তাঁকে বলতে শুনি—

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির,
তৃপ্তি যেথা ছিল সেথা এলো ভ্রব্যরাশি,
শান্তি যেথা ছিল সেথা স্বার্থের সমর।"

এই কথা বলে তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, এই আধুনিক 'সুসভ্যতার আলোক' প্রকাশের পূর্বে মানুষের ছিল উদার চিত্ত, তৃপ্তিময় জীবন ও শান্তিময় পরিবেশ। কিন্তু 'সুসভ্যতার আলোর প্রকাশের সঙ্গেই সে সব হয়েছে অন্তর্ধান, আর সে সবের পরিবর্তে উদ্ভূত হয়েছে বিলাস-ব্যসন চরিতার্থের জন্য নানাবিধ দ্রব্যজাত ঐশ্বর্যের সমারোহ, পাপদুর্বলতা গোপনে রাখবার জন্য নানাবিধ অনুষ্ঠানের আড়ম্বর আর স্বল্প কার্যসিদ্ধির জন্যে স্বার্থপরতা—যার ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্পর্ধা ও সমর আয়োজনের উত্তেজনা। তাই কবি এই ধরণের চোখঝলসানো মন-ভুলানো সভ্যতার আলো সহ্য করতে পারেন নাই। শুধু তাই নয়, এই সভ্যতা যে কত বিভীষিকাময়; বিশেষ বিশেষণে বিশেষিত করে তারও বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছেন—

"———আজি সভ্যতার

অন্তহীন আড়ম্বরে, উচ্চ আস্ফালনে,
দরিদ্রক্ষধিরপুষ্ট বিলাস লালনে,
অগণ্য চক্রের গর্জে ঘূর্ণর ঘর্ঘর
লৌহবাহুদানবের ভীষণ বর্বর
রক্তরক্ত অগ্নিদীপ্ত পরম স্পর্ধায়
.....।"

আবার তিনি দেখতে পেলেন এই 'সভ্যতার অন্তহীন আড়ম্বর' এর অন্তরালে বর্বরতার গুপ্তলীলা। সে কথাও তিনি প্রকাশ করে বললেন—

"উপর আকাশে দাঁড়ানো ডড়িৎ আলো,
নিম্নে নিবিড় অতি বর্বর কালো
ভূমিগর্ভের রাতে—
ক্ষুধাতুর আর ভূরি ভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে সেথায়
জমেছে লুটের ধন।"

কবির এই কথার মধ্যে ফুটেছে আধুনিক সভ্যতার অন্তর্নিহিত বর্বর রূপ। এই সভ্যতার ধনদৌলতে ভরা বাহ্যিক উজ্জ্বল আবরণের অন্তরালে ঘনীভূত হয়ে রয়েছে 'দরিদ্র রুধির পুষ্ট বিলাসলালনে' অত্যন্ত 'ভূরিভোজীদের বর্বরতার কালিমা।

এই ভাবে কবি সভ্যমানুষদের চিত্তবৃত্তির অধঃপতনের কথা উল্লেখ করলেন। তাদের অন্তরে যে পাপ বর্বরতা প্রভৃতি অসত্য প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, তার জন্য তাদের মনে কিছু লজ্জাবোধ নাই কিংবা তার ফলস্বরূপ অবশ্যম্ভাবী বিপদের কথা ভেবে তাদের মনে কোন ভয় নাই। আধুনিক সভ্যতার যাদুপ্রভাবে যেন মানুষের মন থেকে অন্তর্হিত হয়েছে লজ্জাভয়বোধ। এই কথাই কবি বলেছেন এই ভাবে—"যাদুকরের সভ্যতার বেগের পরিমাণ সকল দিকেই এত বেশি ত্বরান্বিত যে, মানুষের মন অন্যত্র লজ্জিত ও অপঘাত সম্ভাবনায় শঙ্কিত হবার সময় পাচ্ছে না।"

তিনি এই সভ্যতাকে দ্রুতবেগে হাত পা চালনা দ্বারা ভেল্কি দেখানো যাদুকরের সঙ্গে তুলনা করেছেন এই ভেবে যে, তার মত এই সভ্যতা ও বিজ্ঞানের যাদুবলে ভড়িৎ-শক্তিতে উৎপন্ন করে যাচ্ছে নানাবিধ বস্তু শক্তিজাত সম্পদ ও দেখিয়ে দিচ্ছে তাদের বিস্ময়কর কর্মনৈপুণ্য। এই সভ্যতার যাদুকরী-বৃত্তির ফলে, মানুষের মন এত মোহাচ্ছন্ন ও বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছে যে তাদের মনের সুকুমারবৃত্তিগুলি বিকশিত না হয়ে তামসিকতার আঁধারে ডুবে আছে। এই ভাবে তিনি ব্যক্ত করেছেন আধুনিক সভ্যতার প্রতি তাঁর মনোভাব। অধিকন্তু, প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন যে, আধুনিক সভ্যতা বস্তুপ্রধান ও শক্তিপ্রধান, কিন্তু ধর্মপ্রধান বা মঙ্গলপ্রধান নয়। আবার বস্তুপ্রধান শক্তিপ্রধান সভ্যতা সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন এই বলে—"বস্তু-প্রধান, শক্তিপ্রধান সভ্যতার সম্পদ্ আমাদের ইন্দ্রিয় মনকে অভিভূত করিয়া দেয়। তাহার কল দ্রুত চলে, তাহার প্রাসাদ আকাশ স্পর্শ করে, তাহার কামান শতঘ্নী, তাহার বাণিজ্যজাল জলস্থলব্যাপী,—ইহা আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ও বুদ্ধিকে স্তম্ভিত না করিয়া থাকিতে পারে না।"

উপরোক্ত সভ্যতা যে তাঁর অভীষ্ট নয়, তা তাঁর এই কথার সংকেতেই অনুমান করা যায়। কিন্তু কিরূপ সভ্যতা তাঁর ঈপ্সিত তা' তিনি নিজেই প্রকাশ করে বলেছেন—"এ অবস্থায় প্রথমে আমাদের বুঝিতে হইবে, বস্তুপ্রধান শক্তিপ্রধান সভ্যতাই একমাত্র সভ্যতা নহে, ধর্মপ্রধান মঙ্গলপ্রধান সভ্যতা তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শেষোক্ত সভ্যতাই আমাদের ছিল।"

এইরূপে কবি আধুনিক সভ্যতার উপরে প্রাচীন যুগের ভারতীয় সভ্যতাকে স্থান দিয়ে শেষোক্ত সভ্যতাকে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করলেন। উপরন্তু, আধুনিক যুগের মানুষকে প্রাচীন যুগের ভারতীয় সভ্যতার গ্লানিহীন দিনের কথা স্মরণ করিয়ে তিনি বললেন,—

"যে প্রশান্ত সরলতা জ্ঞানে সমুজ্জ্বল,
স্নেহে যাহা রসসিক্ত, সন্তোষে শীতল,
ছিল তাহা ভারতের তপোবনতলে।"

কবি ভারতীয় সভ্যতার আদর্শে মুগ্ধ, তাই তিনি সেই গৌরবময় ভারতীয় সভ্যতার যুগের কথা স্মরণ করে সে যুগের ভারতের কীর্তির কাহিনী উল্লেখ করে ভারতজননীর উদ্দেশ্যে বললেন—

"হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুটবদ্ধ শিংহাসন ভূমি,
ধরিতে ধরিত্রবেশ ;

সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি' সর্বদুঃখ সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।"

বস্তুসম্পদলোলুপ জ্ঞানবলশক্তিসাধনায়সিদ্ধ আধুনিক সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সভ্যতা যে কত মহান্ ছিল, তা বিশদভাবে উল্লেখ করে কবি বললেন—"ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ শহরে নয়, বনে।...অরণ্যবাস-নিঃসৃত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়নি। এই রকমে আরণ্যকদের সাধনা থেকে ভারতবর্ষ সভ্যতার যে প্রকৃতি (energy) লাভ করেছিল সেটা নাকি বাইরের সংঘাত থেকে ঘটেনি, নানা প্রয়োজনের প্রতিযোগিতা থেকে জাগেনি, এই জন্য সেই শক্তিটা প্রধানতঃ বহির্বিমুখী হয়নি। সে জ্ঞানের দ্বারা বিশ্বের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করেছে, নিখিলের সঙ্গে আত্মার যোগ স্থাপন করেছে। সেই জন্যে ঐশ্বর্যের উপকরণেই প্রধানভাবে ভারতবর্ষ আপনার সভ্যতার পরিচয় দেয়নি।.....ভারতবর্ষের সভ্যতা হচ্ছে, জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা।

তাই কবি ভারতীয় সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবান্। তাঁর চিন্তায় যখন জাগে সেই সভ্যতার আদর্শ তখন তিনি মুগ্ধ হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর চিন্তায় যখন তাঁর সেই ঈপ্সিত সভ্যতার পটভূমে আবির্ভূত হয় আর এক দৃশ্যপট—যে দৃশ্যে দেখা যায়, 'আজি সভ্যতার অন্তহীন আড়ম্বরে, উচ্চ আস্ফালনে, দরিদ্র কবির পুষ্ট বিলাস লালনে' অত্যন্ত হতে 'রক্তরক্ত অগ্নিস্রোত পঙ্কে স্পর্ধায়' মানুষ এগিয়ে চলেছে 'সভ্যতামায়িক পাতালে—যেথায় জমেছে লুটের ধন, তখন আধুনিক সভ্যতার প্রতি তাঁর মনে জেগেছে বিদ্রোহ-ভাব, যে ভাব তিনি ভাষায় প্রকাশ করে তাকে নবসভ্যতা আখ্যা দিয়ে তার উদ্দেশে বলেছেন—

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লহ যত লৌহ, লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর,
হে নবসভ্যতা, হে নিষ্ঠুর, সর্বগ্রাসী,
দাও সে তপোবন, পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি,——।"

এই ভাবে কবি উত্থাপন করেছেন দুই প্রকারের সভ্যতার কথা, (১) প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা তথা হিন্দু সভ্যতা, (২) আধুনিক সভ্যতা অর্থাৎ নবসভ্যতা যাহা য়ুরোপীয় সভ্যতা তথা পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত। এই দুই প্রকার সভ্যতার মধ্যে যে বিভিন্ন পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, তার মূলগত পার্থক্য কোথায়? এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,—"বস্তুতঃ প্রত্যেক সভ্যতারই একটি মূল আশ্রয় আছে। সেই আশ্রয়টি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা তাহাই বিচার্য।"

উপরোক্ত দুইটি সভ্যতার মধ্যে প্রথমটি ধর্মপ্রধান, তাই কবির মতে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু দ্বিতীয়টির সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করলেন, যদি তাহা উদার ব্যাপক না হয়, যদি তাহা ধর্মকে পীড়িত করিয়া বর্ধিত হয়, তবে তাহার আপাতঃ উন্নতি দেখিয়া আমরা তাহাকে যেন ঈর্ষা এবং তাহাকেই একমাত্র ঈপ্সিত বলিয়া বরণ না করি।"

কবির এই সতর্কবাণীর তাৎপর্য, এই নবসভ্যতার আশ্রয় ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, উহা উদার ব্যাপক নয় এবং উহা যদিও বস্তুসম্পদে ও বহির্বিমুখী শক্তিতে উন্নত তবুও এই সভ্যতা মানুষের একমাত্র কাম্য নয়। কবির মতে, মানবসভ্যতা স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে তখন, যখন উহা বস্তুপ্রধান শক্তিপ্রধান হয়েও ধর্মকে আশ্রয় করে থাকবে ও মঙ্গলসাধনে ব্রতী হবে।

কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা পরিচালিত আধুনিক নবসভ্যতা ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত, ভিন্ন নীতিতে অনুগত। আধুনিক সভ্যতার পথপ্রদর্শক যে য়ুরোপীয় সভ্যতা, তার যে কি নীতি, সে সম্বন্ধে কবি উল্লেখ করে বললেন,—"য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি।" আর এই নীতির পরিণাম সম্বন্ধেও বললেন য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলভিত্তি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ.....স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ। য়ুরোপীয় সভ্যতার সীমায় সীমায় সেই বিরোধ উত্তরোত্তর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবী লইয়া ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি

পড়িবে, তাহার পূর্বসূচনা দেখা যাইতেছে।" তাঁর এই মন্তব্যের কিছু পরেই আরম্ভ হলো বোয়ার যুদ্ধ।

কবির চিন্তায় যে আশঙ্কার ছায়াপাত হয়েছিল, সেই আশঙ্কাকে সত্য পরিণত করে উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণে আফ্রিকায় বাধলো বোয়ারযুদ্ধ। য়ুরোপের বিভিন্ন সভ্যজাতি নিজ নিজ রাষ্ট্রীয় স্বার্থে আফ্রিকার সম্পদ বহুল স্থান নিয়ে কাড়াকাড়ি হানাহানি আরম্ভ করে তথাকথিত অসভ্য আফ্রিকাবাসীর রক্তে সে দেশ রাঙিয়ে দিয়ে, তাদের সর্বস্ব লুট করে যে সভ্যতার নিদর্শন দেখিয়েছিল,সেই সভ্যতাকে'সভ্যতানাগিনী' আখ্যা দিয়ে কবি আফ্রিকার সেই দুর্দিনেরকথা প্রসঙ্গে বললেন—

"শতাব্দীর সূর্য আজি রক্ত মেঘ মাঝে
অস্ত গেল। হিংসার উৎসবে বাজে
অহে অহে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী। লজ্জাহীন সভ্যতা নাগিনী
তুলিছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে,
শুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি' তীব্র বিষে।"

কবির এই উক্তিতে ফুটে উঠেছে পাশ্চাত্য সভ্যতার হিংস্র মূর্তি, আর তার প্রতি তাঁর প্রচণ্ড বিদ্বেষ। শেষ পর্যন্ত বস্তাভন্তর পূর্ণ 'জাদুকরের সভ্যতা'কে তিনি বিষধরা নির্লজ্জ 'সভ্যতানাগিনী' রূপে প্রকাশ করলেন তার কুটিল ও হিংস্র প্রবৃত্তির জন্য।

ঐ সভ্যতা সম্বন্ধে তিনি আরও অভিমত প্রকাশ করে বললেন, "ইহাও দেখিতেছি, য়ুরোপের এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতা ধর্মকে প্রকাশ্যভাবে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 'জোর যার মুলুক তার' এই নীতি স্বীকার করিতে আর লজ্জাবোধ করিতেছে না।"

রাষ্ট্রীয় স্বার্থে পরিচালিত য়ুরোপীয় সভ্যতা ধর্মপ্রধান ও মঙ্গলপ্রধান নয়, তাই তার নীতি যে ঐরূপ হবে, তা কবি পূর্বেই জানতেন এবং সে সম্বন্ধে তিনি পূর্বেই বলেছেন। কিন্তু ঐ নীতির প্রয়োগ শুধু আফ্রিকার মধ্যেই নিবদ্ধ হয়ে রইলো না, তা' পৃথিবীর সর্বত্রই বিস্তৃত হতে লাগলো। এই সম্বন্ধে তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, "ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, য়ুরোপের বাহিরে অনাত্মীয় মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটা আলো দেখাবার জন্য না, আগুন লাগাবার জন্য।"

কোথায়কি ভাবে ঐ সভ্যতার মশালের আগুন জ্বালানো হয়েছিল, সে সবের দৃষ্টান্তগুলি কবির মনে ভীড় করে এসে দাঁড়ালো, তিনি একে একে দিলেন তাদের বিবরণ।

পারস্যে সভ্য য়ুরোপের তন্ত্রবেশী বর্বরতা সম্বন্ধে কবি লিখলেন, "একদিন তরুণ পারসিকের দল দীর্ঘকালের অসাড়তার জাল থেকে পারস্যকে উদ্ধার করবার জন্য যখন প্রাণপণ করে দাঁড়াইয়াছিল, তখন সভ্য য়ুরোপ···দুই হাতে তার টুঁটি চেপে ধরেছিল।"

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোজাতির উপর সভ্য পাশ্চাত্যজাতির বর্বরতার কথাও উল্লেখ করলেন,—"আজও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোজাতি সামাজিক অসম্মানে লাঞ্ছিত এবং সেই জাতির কোন হতভাগাকে যখন জীবিত অবস্থায় দাহ করা হয়, তখন শ্বেতবর্ণ নরনারীরা সেই পাশব দৃশ্য উপভোগ করবার জন্য ভিড় করে আসে।"

আয়র্ল্যাণ্ডে ঘটিত বৃটিশের বর্বরতা সম্বন্ধে তিনি জানালেন, "আয়র্ল্যাণ্ডে রক্তশিঙ্গলের যে উন্মত্ত বর্বরতা দেখা গেল, অনতিপূর্বেও আমরা তা কোনদিন কল্পনা করতে পারতুম না।"

ভারতবর্ষে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গে তিনি বললেন, "তারপরে চোখের সামনে দেখলাম জালিয়ানওয়ালাবাগের বিভীষিকা। যে য়ুরোপ একদিন তৎকালীন তুর্কীকে অমানুষ বলে গঞ্জনা দিয়েছে, তারই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকাশ পেল ফ্যাসিজম্‌এর নির্বিচার নিষ্ঠুরতা।"

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন সভ্য য়ুরোপের জাতি-প্রেমমার্কা তন্ত্রবেশী বর্বরতা আফ্রিকার কঙ্গো প্রদেশের অরণ্যভূমি নিরীহ আফ্রিকাবাসীদের রক্তে রাঙিয়ে দিয়েছিল, তখন মানবদরদী কবি আফ্রিকাবাসীদের সহানুভূতি দেখানোর প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম রচিত 'আফ্রিকা' নামক তাঁর কবিতায় আফ্রিকাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—

"রূপমদোদ্ধত ইয়ুরোপ
ধরাবেশে নিয়েছিল দীপহীন তোমার প্রাঙ্গণে
তোমার বক্ষের 'পরে চালায়েছে রথ,—"

তারপর সেই পরদম্পদ্-লোভী স্বার্থপর হিংস্রপ্রকৃতির সভ্য জাতি নিজ নিজ রাষ্ট্রীয় স্বার্থে যে নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছিল, তা' তিনি বিশদভাবে উল্লেখ করে বলেছিলেন—

"সভ্যের বর্বর লোভ নগ্ন করেছিল অন্ধকারে
নির্লজ্জ অমানুষিতা।
অশ্রু তব রক্ত সাথে মিশে
ভাষাহীন ক্রন্দনের পথ দিয়েছে পঙ্কিল করি,
দস্যুপদপাদুকার তলে অশুচি কর্দম সেই
চিরচিহ্ন দিয়ে গেছে তোমার দুর্ভাগ্য ইতিহাসে।"

কবি এইরূপে দেখে যেতে লাগলেন, হিংসামত্ত পৃথিবীর কঠোর ও নিষ্ঠুর পরিবেশ, যার মধ্যে চলেছে কবির ভাষায় 'সভ্যতার গিল্‌টি-করা ভক্তমা'-পরা বর্বর লোভী সভ্য জাতিদের জয়যাত্রা। এই পৃথিবীর নিদারুণ পরিবেশে কোমলচিত্ত কবির হৃদয়ে লেগেছিল আঘাত, যার ফলে তাঁর কবিসুলভ ভাবসমুদ্রে উঠলো আলোড়ন, সেই আলোড়ন বাণীময় হয়ে প্রকাশ পেলো তাঁর রচিত 'পৃথিবী' শীর্ষক কবিতায়। এই কবিতার এক অংশে পৃথিবীকে উদ্দেশ্য করে তিনি লিখলেন—

"জলেস্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণরঙ্গভূমি,
সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয়
বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা।
তোমার নির্দয়তার ভিত্তিতে উঠেছে সভ্যতার
জয়তোরণ,
ত্রুটি ঘটলে তার পূর্ণ মূল্য শোধ হয় বিনাশে।"

কবি দেখেছেন, পৃথিবীর সভ্য মানুষ পৃথিবীর বুকে দেশে দেশে আকাশে সাগরে রণক্ষেত্র সৃষ্টি করে অগণিত মানুষের প্রাণনাশ করে বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হয়েছে। মানবতার মানদণ্ডে বিচার করলে, এইরূপ স্বার্থবশে মানুষের প্রাণনাশ দ্বারা জয়লাভ ও তজ্জনিত উল্লাস 'নির্দয়তার পরিচায়ক বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার মানদণ্ডে উহা শুধু সমর্থিত নয়, উহা কৃতিত্ব হিসাবেও সমাদৃত। তাই কবি মন্তব্য করে বলেছেন, নির্দয়তার ভিত্তিতে উঠেছে সভ্যতার জয়তোরণ।'

এইভাবে তিনি নানাভাবে প্রকাশ করেছেন বর্তমান যুগের নবসভ্যতার স্বরূপ ও তার অধর্মোচিত রীতি নীতি। এইরূপ নিদারুণ ঘটনার জন্য অধ্যাত্মভাবাপন্ন কবির হৃদয় দুঃখে ক্ষোভে জর্জরিত হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় একদিন তিনি প্রসঙ্গক্রমে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন,—"বলদর্পিতের পেষণযন্ত্রে পীড়িত মানুষ এই সভ্যতার বিচার-সভায় ধর্মের দোহাই পেড়ে এমন ভরসা আর কোথাও রইলো না……উগ্রলোভের তীব্র মদকরস-পানে উন্মত্ত সভ্যতার পদতলে কম্পান্বিত সমস্ত পাশ্চাত্য মহাদেশ।"

এই 'উন্মত্ত সভ্যতার' বিরুদ্ধে সমালোচনা করে তিনি আরও স্পষ্টরূপে বললেন,—"ওই সভ্যতা বস্তুগত ধন-সঞ্চয়ে ও শক্তি আবিষ্কারে অদ্ভুত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু সমগ্র মনুষ্যত্বের মহিমা তো তার বাহ্যরূপ এবং বাহ্য উপকরণ নিয়ে নয়। হিংস্রতা, নৃশংসতা, রাষ্ট্রিক কূটনীতির কুটিলতা পাশ্চাত্য মহাদেশ থেকে যে রকম প্রচণ্ড মূর্তি ধরে মানুষের স্বাধিকারকে নির্মমভাবে দলন করতে উদ্যত হয়েছে, ইতিহাসে এমন আর কোনদিন হয়নি।"

বলা বাহুল্য, বর্তমান সভ্যতার বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের দ্বারাই এখন বস্তুগত ধনবৃদ্ধি ও শক্তি আবিষ্কারের কাজ দ্রুতবেগে এগিয়ে যাচ্ছে পাশ্চাত্য মহাদেশে, সুতরাং ইহাতে প্রকাশ পায় বিজ্ঞানের মহিমা, মনুষ্যত্বের মহিমা নয়, বরং বিজ্ঞানগর্বে মনুষ্যত্ব সেখানে লাঞ্ছিত। কারণ সেদেশে ধনসম্পদ ও শক্তি সৃষ্টির অন্তরালে হিংস্রতার প্রবাহ রক্ত-ধারার মত দ্রুতগতিতে বয়ে যাচ্ছে। তাই পাশ্চাত্য দেশকে কবি 'উন্মত্ত সভ্যতা', 'দানবের সভ্যতা', 'নব-সভ্যতার' জন্মভূমি বলে পরিগণিত করেন এবং এই সভ্যতার পৃথিবীব্যাপী অন্যায় অধর্মও হিংস্র কাজের জন্য ঐ পাশ্চাত্যদেশকেই দায়ী করেন। এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তাঁর এই উক্তিটি,—"পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে যে সকল বিশ্ব-বিশ্রুত দেশ এই সভ্যতার প্রধান বাহন, তারা পরস্পরের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করবার উদ্দেশ্যে পাশব নখদন্তের অদ্ভুত উৎকর্ষ সাধনে সমস্ত বুদ্ধি ও ঐশ্বর্যকে নিযুক্ত করে।"

কবি স্বীকার করেছেন, বর্তমান যুগের সভ্যতার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে বস্তুগত সম্পদের দ্রুতবৃদ্ধি সাধন ও নানাবিধ শক্তি আবিষ্কারের কার্যে। কিন্তু এই ক্ষমতা অর্জন সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞান সাধনার দ্বারা। তাই, বিজ্ঞানকে কবি তুচ্ছ বলে উপেক্ষা তো করেনই নাই, বরং তার অসীম শক্তির প্রতি আস্থা দেখিয়ে প্রশংসাই করেছেন। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর এই উচ্চ ধারণার কথা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর এই উক্তিতে—"বিজ্ঞান যে বিশুদ্ধ তপস্যার প্রবর্তন করেছে, সে সকল

দেশের, সকল কালের, সকল মানুষের,—ইহারই মানুষকে তাতে দেবতার শক্তি দিয়েছে, সকল রকম দুঃখদৈন্য-পীড়াকে মানবলোক থেকে দূর করবার জন্য সে অস্ত্র গড়েছে, মানুষের অন্তরাবৃত নির্বাণের বিঘ্নকর্মা এই বিজ্ঞান।"

বিজ্ঞানের এই অদ্ভুত শক্তি থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞান-ভিত্তিক বর্তমান যুগের সভ্যতা কবির কাছে 'সভ্যতা-নাগিনী' ও 'উদ্যত সভ্যতা' বলে অভিহিত হয়েছে। ইহার কারণ, বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ। বিজ্ঞানের প্রয়োগ-বিধির উৎকর্ষ সাধনের দ্বারা মানুষের মনের দেবত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখে মানবসভ্যতাকে ধর্মে কর্মে শক্তি ও ঐশ্বর্যসম্পদে মহীয়ান করে তুলতে পারা যায়। কিন্তু তার অপপ্রয়োগ হলে মানুষের শুভবুদ্ধি বিনষ্ট হয়ে যায়, কারণ তাদের মনের প্রবল স্বার্থলোভজনিত বিরাট কামনা বাসনা বিজ্ঞান-লব্ধ ক্ষমতার দ্বারা অতি সহজেই সাফল্যমণ্ডিত হয়, ফলে মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি বিকশিত হবার সুযোগ পায় না, উপরন্তু হিংসাপ্রবৃত্তি সজাগ হয়ে উঠে ও তা' দিন দিন প্রবলতর হয়ে মানবসভ্যতাকে হিংস্রপথে পরিচালিত করতে থাকে। কবির ধারণা, বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ করেই বর্তমান যুগের সভ্যতা গড়ে উঠেছে। তাঁর সেই ধারণার কথা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর এই মন্তব্যে, "কিন্তু এই বিজ্ঞানই কর্মের রূপে যেখানে মানুষের কল্পকামনাকে অতিক্রম করে তুললে, সেখানেই সে হলো যমের বাহন। এই পৃথিবীতে মানুষ যদি একেবারে মরে তবে সে এইজন্যই মরবে—সে সত্যকে জেনেছিল, কিন্তু সত্যের ব্যবহার জানেনি। সে দেবতার শক্তি পেয়েছিল, দেবত্ব পায়নি। বর্তমান যুগে মানুষের মধ্যে সেই দেবতার শক্তি দেখা দিয়েছে য়ুরোপে। কিন্তু সেই শক্তি কি মানুষকে মারবার জন্যেই দেখা দিল?"

কবির এই সন্দেহ দূর হয়ে গেল যখন তিনি নিজেই দেখতে পেলেন—

(কবির ভাষায়) "রক্তমাখা দন্তপঙ্‌ক্তি হিংস্র সংগ্রামের
শত শত নগর গ্রামের
অন্ন আজ ছিন্ন ভিন্ন করে;
ছুটে চলে বিভীষিকা মূর্ছাতুর দিকে
দিগন্তরে!"

বিজ্ঞানবুদ্ধি বলে লব্ধশক্তি ও ঐশ্বর্যের প্রয়োগবিধির সহিত দয়ামায়া প্রভৃতি মনের উদারতা ও আধ্যাত্মিকতার কোন সংস্রব নাই বলেই মানবজগতে যে এইরূপ বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছে, তা' কবি বিশ্বাস করেই উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে বিজ্ঞানবুদ্ধি মানুষকে 'দেবতার শক্তি দিয়েছে', কিন্তু তাতে মানুষ 'দেবত্ব পায়নি'। তিনি মনে করেন, মানব সভ্যতাকে ধর্মে কর্মে শক্তিতে ও মনুষ্যত্বে মহীয়ান্ করে গড়ে তুলতে হলে 'দেবতার শক্তি' ও 'দেবত্ব'—এই দুইএরই প্রয়োজন। কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভব হতে পারে, তা তিনি এক প্রসঙ্গে বলেছেন,—"থামাতে হবে লোভ। সে কি ধর্ম উপদেশ দিয়ে হবে? তাও সম্পূর্ণ হবে না। তার সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগ চাই। যে সাধনায় লোভকে ভিতরের দিক থেকে দমন করে সে সাধনা ধর্মের, কিন্তু যে সাধনায় লোভের কারণকে বাইরের দিক থেকে দূর করে সে সাধনা বিজ্ঞানের। দুইয়ের সম্মিলনে সাধনা সিদ্ধ হয়, বিজ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে ধর্মবুদ্ধি আজ মিলনের অপেক্ষায় আছে।"

কবি নিশ্চয়ই জানতেন, বিজ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে ধর্মবুদ্ধির মিলন সুদূরপরাহত, তাই তিনি একস্থানে মন্তব্য করেছেন, —"এ কথা ঠিক বটে, পাশ্চাত্য সভ্যতার আধুনিক ধর্মশাস্ত্রে পলিটিক্স সর্বোচ্চে, ধর্ম তাহার নিচে।" এই প্রকার 'পলিটিক্সের' উদ্দেশ্য—রাষ্ট্রীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজ নিজ জাতিকে বস্তুগত শক্তি সম্পদে সমৃদ্ধ করা। কিন্তু এই 'পলিটিক্সের' মধ্যে আছে জটিলতা কুটিলতার জটাজাল, ষড়যন্ত্রের সমারোহ, ষড়রিপুর উচ্ছ্বাস, আর তার বাইরে আবরণস্বরূপ আছে 'জাতিপ্রেম' যার সঙ্গে জড়িত আছে অন্যায়ের প্রতিপত্তি, তার সঙ্গে নাই ধর্মের পবিত্রের সংস্রব। তাই কবি বলেছেন,—"লজ্জা সরম তেয়াগি'

জাতিপ্রেম নাম ধরি' প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।"

যেন হতাশ হয়ে কবি উপরোক্ত মন্তব্য ব্যক্ত করলেন।

বর্তমান সভ্যতার কাঠামোকে যে বিজ্ঞানশক্তিসম্পদে সমৃদ্ধ করেছে, সেই বিজ্ঞানকে রবীন্দ্রনাথ স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু সেই বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ করে 'এই সভ্যতার বাহন' পাশ্চাত্য জাতি যে অন্যায় ও অধর্ম পরিবেশ সৃষ্টি করেছে পৃথিবী ব্যাপী, তার জন্য তিনি তাদের ক্ষমা তো করেনই নাই, বরং তাতে এত উত্তেজিত হয়েছিলেন যে, এই অন্যায় ও অধর্মের ইতিহাস পৃথিবী থেকে অবলুপ্তির

কল্পনাও তাঁর মানসপটে ভেসে উঠেছিল। উত্তেজিতভাবে তিনি তাঁর সেই কল্পনার কথাও উল্লেখ করে বলেছেন,—

"ঈর্ষা হিংসা আনি বৃত্যুর শিখা
আকাশে আকাশে বিরাট বিনাশে
জাগাইল বিভীষিকা।
দেবতা যেথায় পাতিবে আসনখানি,
যদি তার ঠাঁই কোনোখানে নাই
অয়ে, হে রুদ্রপাণি,
এ ইতিহাসের শেষ অধ্যায়তলে
রুদ্রের বাণী দিক্ দাঁড়ি টানি
প্রলয়ের রোষানলে।"

এই ভাবে প্রচণ্ড ক্রোধে কবি আধুনিক সভ্যতার গ্লানিময় ইতিহাসের প্রতি কটাক্ষপাত করলেন।

কবির মতে ধর্মবুদ্ধি ও বিজ্ঞানবুদ্ধির সম্মিলনই হবে মানবজাতির সভ্যতার আদর্শ। বিজ্ঞানবুদ্ধি সভ্যতার বহির্ভাগকে বস্তুগত শক্তি ও সম্পদে সমৃদ্ধ করবে এবং ধর্মবুদ্ধি তার অন্তর্ভাগকে মনুষ্যত্বের মহিমায় বিকশিত করে তুলবে মানুষের মনকে মনুষ্যত্বের সাধনায় লিপ্ত রেখে। তাঁর আরও বিশ্বাস, মানুষের চরম সভ্যতা আসতে পারে, যদি সেই সভ্যতা ঐক্যমূলক হয়। এই সম্বন্ধে তিনি এক স্থানে লিখেছেন,—

"ঐক্যমূলক সে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা…"। চরম সভ্যতা যে প্রাচীন ভারতে ছিল, সে কথাও উল্লেখ করে তিনি বললেন,—

"ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে।"

কবির মতে 'সভ্যতার যে মহৎ গঠনকার্য—বিচিত্রকে এক করিয়া তোলা' এবং 'বিচিত্রকে মিলিত করিবার শক্তিই সভ্যতার লক্ষণ'। প্রাচীন ভারত ঐরূপ মহৎ গঠন কার্যে শক্তি নিয়োজিত করেছিল বলেই কবি ভারতীয় সভ্যতাকে চরম সভ্যতা বলে মনে করতেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ঐক্যতত্ত্বের অবতারণা করে বললেন "সভ্যতার অর্থই হচ্ছে মানুষের একত্র হবার অনুশীলন। ঐক্যের অভাবে মানুষ বর্বর হয়,…ঐক্যের বৈশিষ্ট্যে মানুষ ব্যর্থ হয়, তার কারণ সমবায় ধর্ম মানুষের সভ্যধর্ম, তার শ্রেষ্ঠতার হেতু।" বিচিত্রকে এক করে তুলে মানুষের একত্র হবার অনুশীলনের জন্যে চিত্তশুদ্ধি ও উদার হৃদয়ের প্রয়োজন, স্বার্থ লোভ নীচতা সব পরিত্যাগ করার প্রয়োজন অর্থাৎ মনুষ্যত্বের সাধনার প্রয়োজন। এর জন্য ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত করার প্রয়োজন আছে মানুষের মনে। চরম মানবসভ্যতার জন্যে ঐ সবের প্রয়োজন আছে বলে কবি মনে করেন।

চরম মানব সভ্যতা সম্পর্কে কবি যে কোন আদর্শ বা তত্ত্বকথা উপস্থাপিত করুন না কেন, কার্যতঃ যান্ত্রিকতার সভ্যতা আজ মানুষের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ও বুদ্ধিকে স্তম্ভিত করে ইন্দ্রিয়মনকে অভিভূত করে রেখেছে। মানব সমাজ 'সভ্যতানাগিনী'র তীব্র বিষে জর্জরিত, সমস্ত পৃথিবী 'উন্মত্ত সভ্যতার পদভারে কম্পান্বিত'।

কবি সবিশেষ জানতেন, এই 'সভ্যতানাগিনীর' কবল থেকে মানব সমাজকে মুক্ত করবার ক্ষমতা কোন মানুষেরই নাই, সেই ক্ষমতা আছে ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন মহামানবের। তিনি আশাবাদী, তাই তিনি আশা করেছিলেন, আবার মানবের 'নব অভ্যুদয়' হবে। আবার তিনি মহামানববাদী, তাই তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, পৃথিবীতে এমন এক মহামানবের আবির্ভাব হবে যে, তিনি তাঁর অলৌকিক শক্তি, অধ্যাত্মতেজ ও দেবত্বের প্রভাবের দ্বারা মানুষের মন থেকে তার অহমিকতা হিংস্রতা সব দূর করে তার শক্তিকে সংহত ও মঙ্গল কাজে নিয়োজিত করতে সক্ষম হবেন এবং তাঁর প্রেম, করুণা, বরাভয় দিয়ে অন্তদিকে যারা উন্মত্ত সভ্যতার পীড়নে লাঞ্ছিত, নির্যাতিত ও অসম্মৃত, সেই নিরীহ দুর্বল মানুষদের মনে আশার আলো জ্বেলে তাদের জীবন শান্তিময় করে তুলতে পারবেন: এইভাবে হবে মানব অভ্যুদয়, এইভাবে প্রকাশ পাবে আদর্শ সভ্যতার আলো। ভগবান বুদ্ধই কবি-কল্পিত সেই মহামানব। তাঁর প্রতি কবির অগাধ বিশ্বাস। মানব সভ্যতার এই সংকটে কবি ভগবান বুদ্ধকেই পরিত্রাণকর্তা বলে মনে করেন। তাই তিনি সেই মহামানবকে পৃথিবীতে আহ্বান জানিয়ে তাঁর অন্তরের কথা নিবেদন করে বললেন—

"……ভগবান বুদ্ধ তুমি,
নিখিল এ লোকালয়, এ ক্ষেত্রই তব জন্মভূমি।
তবসা হারালো যারা যাহাদের ভেঙেছে বিশ্বাস,
ছোঁয়ার কলুষাচিত্তে ভরুক তাদের সর্বনাশ,
আপনারে ভুলে তারা ভুলুক দুর্গতি। আর যারা
ক্ষীণের নিতুর ধ্বংস করে, রচে দুর্ভাগ্যের কারা
দুর্বলের মুক্তি রুধি, তোলো তাহাদের দুর্গদ্বারে
তপের আসন পাতি; প্রমাদবিহ্বল অহংকারে
লভুক সত্যের দৃষ্টি; তাদের নিঃসীম অসম্মান
হব পুণ্য আলোকেতে লভুক নিঃশেষ অবসান।"

কবির স্থির বিশ্বাস ছিল, এই মহামানব ভগবান বুদ্ধ একদিন এই ভারতে 'সভ্যতার দৈববাণী' নিয়ে আবির্ভূত হবেন এবং বর্তমান যুগের সভ্যতার সংকট মোচন করে সংস্থাপন করবেন আগামী যুগের ধর্মপ্রধান ও মঙ্গলপ্রধান সভ্যতা। এই বিশ্বাসেই, তাঁর জীবনের সায়াহ্নকালে বৃহস্পতিবারের প্রাক্কালে 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক তাঁর শেষ বাণীতে তিনি তাঁর আশার কথা শুনিয়েছিলেন,—"আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের দ্বারে, অপেক্ষা করে থাকবো, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশার কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই।"

এইরূপে বর্তমান সভ্যতার সংকটের পটভূমিতে ভাষা ও ভাবের মাধ্যমে আদর্শপুরুষ রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন কত বিভীষিকার সত্যরূপ, শুনিয়েছেন কত মর্মভেদী নৈরাশ্যের কথা, উত্থাপন করছেন কত তত্ত্ব ও আদর্শের কথা এবং শেষ জীবনে ব্যক্ত করলেন তাঁর আশার কথা। তিনি প্রাচীন ভারতের ধর্মপ্রধান ও মঙ্গলপ্রধান সভ্যতাকে চরম সভ্যতা বলে মনে করতেন। সেই চরম সভ্যতার প্রবাহ একদিন অবাধে বয়ে চলে ছিল মানব-কল্যাণদায়িকা স্রোতস্বিনী নদীর করুণা ধারার মত, কিন্তু তার প্রবাহ আজ স্তব্ধ হয়ে বিলীন হয়ে গেছে বস্তুবাদ জড়বাদ দর্বস্ব নিষ্করুণ নিষ্প্রাণ বর্তমান সভ্যতার মরুপথে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আশাবাদী, তাই এ বিষয়ে তাঁর স্থির বিশ্বাস—(তাঁরই ভাষায়)

"যে নদী মরুপথে হারালো ধারা,
জানি গো, জানি তাও হয়নি হারা।"

কবির সন্ধ্যা

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

নানা কাজে কাটে সারা দিন,—
কবিতার ফুলমুরি ফোটাই সন্ধ্যায়!
এ সন্ধ্যা শাশ্বত হয়ে রবে
আমার জীবনে যদি বেশ থেকে যায়!
এ নিভৃতি, এই অন্ধকার
চিরপ্রিয় কবি-কল্পনার;
এই নিশিগন্ধার সৌরভ
সৃষ্টির উল্লাসসম মর্মে মুরছায়।
দুবিনীত রৌদ্র-দাহদেষে
নামে ক্ষুব্ধ—শ্বেত চন্দনের স্নিগ্ধধারা;—
আপনারে ফিরে পাই সাঁঝে,
দ্বিপ্রহরে—রাজপথে জনস্রোতে হারা।
এত গান কোথা ছিল প্রাণে
সুপ্ত হয়ে,—কেবা তাহা জানে!—
এত ভাব কেন উথলায়
কলোচ্ছল কুহুমুখে জলবিম্বপারা!
কোন্ দাহ শান্তরসাবেশ
নামে চিত্তে কর্মশ্রান্ত দিবসের শেষে,—
ভুল ত্রুটি, মন্দ-পরাজয়
স্রোতে তৃণসম যেন কোথা যায় ভেসে!
জীবনের যত গ্লানি ব্যথা
মনে হয় পূর্বজন্ম কথা;—
দুঃখ তার রুদ্ররোষ ছাড়ি'
শিল্পীর আনন্দ হয়ে দেখা দেয় ছেসে!
দিন—রূঢ়, রক্ত-আঁখি প্রভু;
সন্ধ্যা মোর শ্যামাঙ্গিনী স্বপ্নসহচরী।
সে আসে যূথীর মালা গলে,
কোমল কবিতাগুচ্ছে
চেলাঞ্চল ভরি'
সে আসে তুলসীমঞ্চ'পরে;
বধূর মধুর সখ্যস্বরে
দুঃসহ জীবন তোলে সহনীয় করি'!

বাসন্তী মাঝরাতের স্বপ্ন

শ্রীমতী লীলা বিদ্যান্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

এথেন্স,—থিসিয়াসের প্রাসাদের একটি কক্ষ।

থিসিয়াস, হিপোলাইটা, ফিলস্ট্রেট, অমিদারবর্গ এবং পরিচারকদের প্রবেশ।

হি। থিসিয়াস আমার, এই প্রণয়ীরা যা বলছে সে তো ভারি অদ্ভুত কথা।

থি। এ যতখানি অদ্ভুত তার চেয়ে কমই সত্য। এই সব অদ্ভুত গল্প, এই সব পরী-টরী আমি একটুও বিশ্বাস করিনা। প্রেমিক আর পাগল, এদের মস্তিষ্ক এমনি উর্বর হয়—ওরা কল্পনায় এমন সব জিনিষ গ'ড়ে তুলতে পারে, যে ওরা এমন সব জিনিষ দেখতেপায় যা মানুষ ঠাণ্ডা মাথায় যুক্তি দিয়ে ধারণাই করতে পারে না। পাগল, প্রেমিক আর কবি একেবারে কল্পনায় ভরপুর। একজন এত ভূতপ্রেত দেখতে পায় যত নাকি সারা বিপুল নরকেও ধরে না। সেই হ'ল পাগল। প্রেমিক, সে তারই মতো পাগল, যে একটা কাফ্রীর মুখে হেলেনের সৌন্দর্য্য দেখতে পায়। কবির চোখ সূক্ষ্ম পাগলা খেয়ালে চারদিকে ঘুরতে থাকে, স্বর্গ থেকে মর্ত্ত্য আর মর্ত্ত্য থেকে স্বর্গের পানে সে তাকিয়ে দেখে, আর যেমনি তার কল্পনা অজানা জিনিষকে আকার দান করতে থাকে, তার কলম তাকে ভাষার রূপদান করতে থাকে, আর শূন্য অবাস্তবকে এক দেশকাল ও নামের বাঁধনে বেঁধে দেয়। প্রবল কল্পনার এমনি ধাত যে, সে যদি কোন আনন্দের মানস অনুভূতি লাভ করে, তা হ'লে সে সেই আনন্দের একটি আধার আপন ধারণায় সৃজন ক'রে নেয়।—ঠিক যেমন রাতে মানুষ যখন ভয়ের কল্পনায় মগ্ন থাকে তখন কত সহজেই সে একটা ঝোপকে একটা ভালুক ব'লে ভাবতে পারে।

হিপ—কিন্তু সে রাতের সমস্ত গল্প শুনে আর যেমন ক'রে ওদের সবাইকার মন একই সংগে বদ্‌লে গিয়েছিল, এই থেকে এটাই প্রমাণ হতে চায় যে এ শুধুই কল্পনার ছবি নয়; মনে হয় এর ভেতরে একটা যুক্তিযুক্ত বড় সত্য কিছু আছে। কিন্তু সে যাই হ'ক, গল্পটি কিন্তু ভারি অদ্ভুত এবং চমৎকার।

(লাই, ডিমি, হার্মি ও হেলেনার প্রবেশ)

থি। এই যে প্রেমিকেরা সব খুসী ও আনন্দে ভরপুর হ'য়ে এদিকে আসছেন। বন্ধুরা, আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাই, প্রেমের নিত্য নতুন আনন্দ আপনাদের চিরসাথী হ'ক।

লাই। আমাদের চেয়েও বেশি আনন্দ যেন আপনার রাজপথের দুধারে, আপনার অশনে, আপনার শয়নে, আপনার জন্যে প্রতীক্ষা ক'রে থাকে।

থি। আচ্ছা বলুন দেখি, আমাদের জন্যে কোন মুখোস-উৎসব, কোন নাচের আয়োজন হয়েছে, যাতে করে আমরা খাবার পরে থেকে শোবার সময় পর্য্যন্ত এই যে তিন ঘণ্টার দীর্ঘ দূরত্ব, এই সময়টা কাটাতে পারি। আমাদের উৎসব-ম্যানেজার কোথায়? কী কী উৎসবের আয়োজন হয়েছে, বলুন তো? এই যে সময়টা কাটাতে হ'বে তার ব্যাকুলতা এবং অধৈর্য্য ভুলিয়ে রাখবার জন্যে কোন নাটক ইত্যাদি কিছু তৈরী হয়নি কি? ডাকুন ফিলস্ট্রেটকে।

ফিল। এই যে আমি, মহান থিসিয়াস!

থি। বলুন, আজকের সন্ধ্যা যাপনের জন্যে আপনি কী আয়োজন করেছেন? কোন মুখোস-উৎসব, কোন

গান? যদি কোন আমোদ-প্রমোদের আয়োজন না হয় তা হ'লে এই মধুর গতি সময়টা কেমন ক'রে কাটাব?

ফি। এই যে একটা ফ্রিফ ক'রে রেখেছি যে কতগুলো উৎসব তৈরী হয়ে আছে। এর মধ্যে আপনি প্রথমে কোনটা দেখ্‌বেন তা বেছে নিন। (একটা কাগজ দেবে)

থি। (পড়বে "কিন্নরদের সঙ্গে যুদ্ধ"—একটি এ্যাথেনিয়ান খোজা বীণা সংযোগে গেয়ে শোনাবে। না, এ আমি শুনতে চাই না, ও গল্পটা,—আমার আত্মীয় হারকিউলিসের এই বীর্য্য-গাথা আমি আমার প্রিয়াকে আগেই বলেছি, মাতাল ব্যাকানালদের মাতলামো:—কেমন ক'রে তারা থেসিয়ান গায়ককে নিজেদের মত অবস্থায় মারধোর করেছিল—এ গল্পটা পুরানো, আমি যখন গেলবারে থিবস্ জয় ক'রে ফিরে এসেছিলাম, তখন এই নাটকের অভিনয় হ'য়েছিল।

ফিগুরী—তিন শিল্পাধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের শিল্পীর মৃত্যুতে শোক, যে শিল্পীর জীবন এই সেদিন ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে অবসান হয়েছে। এ একটা ভাটায়ার এতে আছে—একটা তীব্র বিদ্রূপের কশাঘাত, বিবাহ-উৎসবের উপলক্ষ্যে এটা ঠিক সময়োপযোগী নয়।

"তরুণ পিরামুস ও তার প্রণয়িনী থিস্‌বীর একটি একঘেয়ে ছোট্ট দৃশ্য,—একটি দুঃখাত্মক আনন্দ!" আনন্দ অথচ দুঃখাত্মক, একঘেয়ে আর ছোট্ট, তার মানে গরম বরফ, সে যে একেবারে অভূতপূর্ব্ব, বাদুর বরফ,—এই পরস্পর বিরোধী ভাবের মিল কেমন করে খুঁজে পাই?

ফি। একটা নাটক তৈরী হয়েছে, মহানুভব, যা গোটা দশেক কথাতেই শেষ হ'য়েছে। আমি জীবনে যত নাটকের কথা জানি, তাতে এর চেয়ে ছোট নাটক আর কখনো হয়নি। কিন্তু মহানুভব, সেই দশটা কথাতেই এ নাটককে মনে হয় অত্যন্ত দীর্ঘ, আর সেই জন্যেই এটা একঘেয়ে লাগে, কারণ সারা নাটকে এমন একটা শব্দ নেই যেটা ঠিক উপযুক্ত, যার কোন অর্থ আছে। এমন একটি পাত্র নেই যে ঠিক উপযুক্ত। আর মহানুভব, এটা যে একটা ট্রাজেডি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এই নাটকে পিরামুস্ আত্মঘাতী হ'য়েছে। সে দৃশ্যের রিহার্শাল যখন আমি দেখি, তখন, আমি এটা স্বীকার করব যে, আমার চোখে জল এসেছিল, কিন্তু সে এই রকম চোখের জল যার চেয়ে বেশি কান্না কেউ কখনো খুসীর উচ্চহাসির চোটে কাঁদেনি।

থি। এ অভিনয় কারা করছে?

ফি। আমাদের এই এথেন্সের কতকগুলো কড়াপড়া-হাতওয়ালা মজুর, যারা এর আগে কখনো মানসিক পরিশ্রম করেনি। ওরা আজ আপনার এই বিবাহ উৎসব উপলক্ষ্যে ওদের চর্চ্চা বিহীন স্মৃতিশক্তিকে টান্স করে এই প্লে খাড়া ক'রেছে।

থি। এ অভিনয় আমি শুনব।

ফি। না, মহানুভব, এ আপনার যোগ্য নয়, আমি এটা পুরো-পুরি শুনেছি, এর মধ্যে কিছু নেই, একেবারেই কিছু নেই, যদি না আপনি ওদের মনোভাবটা বুঝে এতেই আনন্দ পান। ওরা এ নিয়ে খুব খেটেছে, আপনাকে খুশী করবার জন্যে ওরা প্রাণপাত ক'রে পার্ট মুখস্থ করেছে।

থি। এ প্লে আমি নিশ্চয়ই শুনব। যখন সরল মানুষের কর্ত্তব্যবোধ কোন উপহার নিয়ে আসে, তখন তা মনকে খুশী না ক'রে পারে না।

যাও, ওদের ভেতরে নিয়ে এসো, মহিলারা—নিজের নিজের জায়গায় বসুন। (ফিঃ প্রস্থান)

হিপ। অক্ষম মানুষকে ওভার-টাস্ক করতে আমার ভালো লাগে না। কর্ত্তব্যরত মানুষ সেবা করতে গিয়ে অপদস্থ হচ্ছে, এ আমি দেখ্‌তে পারি না।

থি। সে কি, করুণাময়ী—প্রিয়া—তোমাকে তা দেখ্‌তে হবে না।

হিপ। ভদ্রলোক যে বললেন, ওরা—এসব কিছু জানে না।

থি। তাতেই তো আমরা বেশি ক'রে জানব যে কেমন ক'রে বিনামূল্যে ওদের ধন্যবাদ দিতে হয়। ওদের ভুলের ভেতর থেকে আমরা যে রসগ্রহণ করতে পারব, সেই হবে আমাদের আনন্দ। অক্ষমের কর্ত্তব্য যেটুকু অপূর্ণ রেখে যেয় মহতের করুণা সেটুকু পূর্ণ করে নিয়ে অন্তরে গ্রহণ করে। সে তার গুণাগুণ বিচার করেনা, সে তার নিষ্ঠাটুকুকেই চিনে নেয়। কখনো কখনো, আমি যখন কোথাও গেছি, তখন বড় বড় পণ্ডিতেরা আগে

হ'তে চিন্তা করা সম্ভাষণ দিয়ে আমার অভ্যর্থনা জানাবেন ব'লে প্রস্তুত হয়েছেন তার পরে আমি দেখেছি যে তাঁরা ভয়ে কাঁপছেন, তাঁদের মুখ থেকে রক্ত নেমে গেছে, কথার মাঝখানে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে আছেন, ভয়ের জন্যে তাঁদের মুখস্থ করা কথাগুলো তাঁদের গলায় আটকে গেছে, আর অবশেষে আমাকে অভ্যর্থনা—সম্ভাষণ না জানিয়েই তাঁরা হতবাক্ হ'য়ে চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছেন। আমার বিশ্বাস করো প্রিয়া, তাঁদের এই নীরবতার ভেতর থেকে আমি আমার অভ্যর্থনা গ্রহণ করেছি। ভীরু ভক্তের দীনতার মাঝে আমি ততখানিই "স্বাগত" খুঁজে পাই যতখানি বাচাল দুর্বিনীত মানুষের মুখর রসনায় প্রকাশ পায়। প্রিয়া, সেই জন্যেই মূক-রসনার আন্তরিকতা তার দৈন্য দিয়ে আমার অন্তরকে বেশি ক'রে স্পর্শ করে।

ফিলস্ট্রেটের প্রবেশ

ফি। মহানুভব, যদি আপনি অনুমতি করেন তো—যে লোক নাটকের ভূমিকা পড়বে সে এবার শুরু করতে পারে।

থি। তাকে শুরু করতে বল।

(শিঙা বেজে উঠবে)

সূত্রধারের প্রবেশ

সূ। আমরা যদি আপনাদের কাছে কোন অপরাধ করি, তাহ'লে বুঝবেন যে আমরা মনে মনে শুভেচ্ছা ছাড়া আর কিছুই পোষণ করিনি, আমাদের। অপরাধ ইচ্ছাকৃত নয়। আমরা যে আপনাদের সামনে আমাদের অক্ষমের ক্ষমতা দেখাতে এসেছি, সেই আমাদের। সমাপ্তির সত্যিকারের আরম্ভ। তাই আপনারা বুঝে দেখবেন যে। আমরা যে এসেছি সে শুধুই আমাদের মনের। দুর্ব্বার অনুরাগ নিয়ে। আমরা যে আপনাদের খুশী করতে পারব। সে দুরাশা আমাদের নেই। আমাদের আন্তরিক বাসনা। যে আপনাদের আনন্দদান করব। আপনারা যে আজ এখানে উপস্থিত হবার জন্যে মনে মনে অনুতাপ করবেন। সে জন্যে আজ আমরা এখানে আসিনি। অভিনেতারা সবাই উপস্থিত আছেন, তাদের অভিনয় দেখলেই আপনারা জ্ঞাতব্য বিষয় সমস্তই জানতে পারবেন।

থি। এ লোকটা কোন ঠিক মতো জায়গায় দাঁড়াচ্ছে না।

লা। লোকটা একটা দুরন্ত বাচ্চা ঘোড়ার মতোই যত্রতত্র পা ফেলে ভূমিকাটা কোন মতে উগ্‌লে দিয়ে গেল। কোথায় যে থামতে হবে, ও তা জানে না। এর থেকে একটা সুন্দর উপদেশ পাওয়া যায়, মহানুভব, যে, কথা শুধু বললেই হ'ল না, কিন্তু ঠিক ক'রে বলা চাই।

থিপ। সত্যি সত্যি লোকটা এই ভূমিকা নিয়ে ঠিক সেই কাণ্ড করল যেমন একটা বাচ্চা কোন একটা বায়না নিয়ে করে। একটা শব্দ আছে বটে কিন্তু কোন সংগতি নেই।

থি। ওর এই বক্তৃতা ঠিক যেন একটা জোটলাগানো শিকলি, কোথাও ছিঁড়ে যায়নি কিন্তু সব জড়িয়ে-মড়িয়ে গেছে। এর পরে কে বলবে?

(পিরামুস, থিস্‌বী, দেয়াল, চাঁদের আলো, সিংহ—সবাইর প্রবেশ এবং মূক অভিনয়।)

সূ: ধ:। ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণ, আপনারা হয়ত' এই দৃশ্য দেখে অবাক্ হ'য়ে ভাবছেন। কিন্তু ততক্ষণই আপনারা অবাক্ হতে থাকুন যতক্ষণ না সত্য আপনাদের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে দেখা দেয়। আপনারা যদি জানতে চান তো এই যে লোকটি, এই হ'ল পিরামুস, এই সুন্দরী মেয়েটি নিশ্চয়ই থিস্‌বী। এই যে লোকটি গায়ে চুন আর সিমেন্ট লাগানো, এ হ'ল দেয়াল,—সেই পাজি দেয়াল, যা এই দুই প্রণয়ীকে আলাদা ক'রে রাখত। সে বেচারাদের এই দেয়ালের ফাটলের ভেতর দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে চুপিচুপি কথা ব'লেই সন্তুষ্ট থাকতে হ'ত। এই লোকটি যে লণ্ঠন, কুকুর আর কাঁটাঝাড় নিয়ে আছে, এ হ'ল চাঁদের আলো, কারণ আপনারা যদি জানতে চান তো জানবেন যে এই দুই প্রণয়ীর চাঁদের আলোয় মিনার সমাধির পাশে মিলতে কোন আপত্তি ছিল না। সেই-খানে, সেইখানেই এঁদের কোর্টশিপ চলত। এই বদখত জানোয়ারটা, যাকে লোকে সিংহ এই নামের গৌরব দিয়েছে, একদিন, যখন নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে থিস্‌বী রাতে আগে এসে পৌঁছেছে তখন সেটাকে দেখে থিস্‌বী ভয়ে পালিয়ে যায়। অর্থাৎ কিনা থিস্‌বী ভয়ে এমন দৌড় দৌড়তে লাগল যে

সে তার ম্যান্টল্ অর্থাৎ গায়ের ওপরকার ঢিলে জামাটা ফেলে রেখে গেল। আর নচ্ছার সিংহটা নিজের রক্তমাখা মুখ দিয়ে সেটা কামড়ে তাতে রক্তের দাগ লাগিয়ে রেখে দিল। তার খানিক বাদেই এলো সুন্দর তরুণ পিরামুস, দীর্ঘ তার দেহ, সে এসে দেখল যে তার বিশ্বস্ত থিস্‌বীর গায়ের জামা রক্তাক্ত হ'য়ে প'ড়ে আছে। তাই দেখে সে তার তলোয়ার, সেই পাপিষ্ঠ রক্তলোভী তলোয়ার, বীরের মতো তার উত্তালরক্তের ঢেলা-লাগা বুকে বিঁধিয়ে দিল। থিস্‌বী ততক্ষণ মালবেরি গাছের ছায়ায় প্রতীক্ষা ক'রেছিল। সে ফিরে এসে পিরামুসের বুক থেকে তলোয়ার টেনে বের ক'রে নিয়ে তাই দিয়ে আত্মহত্যা করল। আর যা যা ঘটল, তা এই সিংহ, চাঁদের আলো, দেয়াল এবং এই প্রেমিক যুগল এই ষ্টেজের ওপরে বিস্তারিত রূপে উপস্থাপিত করুক।

(বটমর, থিসবী, সিংহ ও চাঁদের প্রস্থান)

থিসি। আমি অবাক হ'য়ে ভাবছি, এই সিংহ কি কথা বলবে নাকি ?

ডিমি। মহানুভব, এতে অবাক হবার কিছু নেই, যেখানে অনেকগুলো গাধা কথা বলতে পারে সেখানে একটা সিংহও কথা ব'লতে পারে।

দেয়াল। এই গল্পেতে মাঝখানের ভূমিকাটি এই ধরনটি হচ্ছে যে আমি স্নাউট নামে একটি লোক দেয়াল হয়েছি। আপনারা জেনে রাখুন যে এই দেয়ালটি এমনি ছিল যে তার মধ্যে একটা ভাঙ্গা ফুটো অর্থাৎ কিনা একটা ফাটল ছিল। তার মধ্য দিয়ে এই প্রণয়ীরা, পিরামুস এবং থিসবী প্রায়ই একান্ত গোপনে চুপিচুপি কথা বলত। এই যে কাদামাটি, এই সিমেন্ট আর এই খরকি, এদিয়ে বোঝাচ্ছে যে আমিই সেই দেয়াল। আসল ব্যাপারটা ঠিক তাই। আর এই হ'ল ঠিক সেই পাজি ফাটল যার মধ্য দিয়ে প্রেমিকেরা ভয়ে ভয়ে চুপি চুপি কথা বলবে।

থি। চুণ আর চুল এর চেয়ে ভাল ক'রে কথা বলবে এটা কি আপনারা আশা করতে পারেন ?

ডি। মহানুভব,আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা তাতে দেয়ালের মুখে এমন বুদ্ধির কথা আমি আর কখনো শুনিনি।

থি। পিরামুস্ দেয়ালের কাছে আসছে, চুপ, চুপ।

পিরামুসের প্রবেশ

পি। ওগো ভয়ঙ্কর রাত, ওগো মিশ্‌কালো রাত, ওগো রাত, যিনের অনুপস্থিতিতেই যার উপস্থিতি, ওগো রাত, ওগো রাত, হায় হায় হায়, আমার ভয় হচ্ছে বুঝি থিস্‌বী তার প্রতিজ্ঞা ভুলে গেছে আর তুমি, ওগো দেয়াল, ওগো মিষ্টি—ওগো সুন্দর দেয়াল, যে তুমি তার বাপের জমি আর আমার জমির মাঝে দাঁড়িয়ে আছ, আমাকে তোমার ফাটল দেখিয়ে দাও যার মাঝে দিয়ে আমি আমার চোখ দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে পারি।

(দেয়াল তার আঙুল তুলে ধরবে)

ধন্যবাদ, ওগো সৌজন্যশালী দেয়াল, এই কাজের জন্যে ভগবান তোমার রক্ষা ক'রে থাকুন, কিন্তু আমি কী দেখতে পাচ্ছি, থিসবীকে তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না! ওরে পাজি দেয়াল, তোর মধ্য দিয়ে আমি আমার আনন্দকে দেখতে পাচ্ছি না, আমার এমনি ক'রে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে তোর এই পাথরগুলোতে আমার অভিশাপ লাগুক।

থি। আমার মনে হচ্ছে যেহেতু এই দেয়াল সজ্ঞান, তাই সেও গালের জবাবে ফিরে গাল দেবে।

পি। না, মহানুভব, সত্যিই ওর এখন কথা ব'লতে নেই। 'আমার অভিশাপ লাগুক' এই হ'ল থিস্‌বীর কিউ। এই সময়ে সে ষ্টেজে আসবে, আর আমি দেয়ালের মধ্য দিয়ে তাকে দূর থেকে দেখতে পাব। আপনারা দেখতে পাবেন যে ঠিক যেমন আমি বললাম তেমনি হবে। ঐ যে সে আসছে।

থিসবীর প্রবেশ

থি। ওগো দেয়াল, কত না দিন তুমি আমার চাপা কান্না শুনেছ—কারণ তুমিই আমার আর আমার সুন্দর পিরামুসের মধ্যে ব্যবধান রচনা ক'রে রেখেছ। চেরী-ফলের মতো রাঙা এই আমার ঠোঁট দিয়ে আমি তোমার ঐ পাথরে কত না চুমো খেয়েছি, তোমার যে পাথরগুলো চুণ আর লোম দিয়ে তোমার মাঝে বেঁধে দেওয়া হ'য়েছে।

পি। আমি একটা গলার স্বর শুনতে পাচ্ছি—এবার আমি দেখবার জন্যে ঐ ফাটলের কাছে এগিয়ে যাব। এই যে আমি আমার থিসবীর মুখখানি শুনতে পাচ্ছি, থিসবী!

থি। প্রিয়তম, মনে হচ্ছে নিশ্চয় তুমি আমার প্রিয়তম।

পি। তোমার যাই মনে হ'ক না কেন, আমি তোমার প্রিয়তমের প্রেম আর লিয়াণ্ডারের মতোই—আমি তোমার প্রতি চিরদিন বিশ্বস্ত থাকব।

থি। আর আমিও বিশ্বস্ত থাকব, ঠিক হেলেনেরই মতো, যতদিন না দৈব আমাকে মৃত্যুর মধ্যে বিলীন ক'রে দেয়।

পি। সাফালাস ও প্রোক্রুসের প্রতি এর চেয়ে বেশী বিশ্বস্ত ছিল না।

থি। যেমন সাফালাস প্রোক্রুসের তেমনি আমি তোমার।

পি। ওগো, এই পাঁচি দেয়ালের ভেতর দিয়ে আমায় চুমো দাও।

থি। আমি তো এই দেয়ালের ফাটলটাকেই চুমো খাচ্ছি, তোমার ঠোঁটের নাগাল তো একেবারেই পাচ্ছি না।

পি। তুমি এক্ষুণি নিনির সমাধির কাছে আমার সঙ্গে মিলবে?

থি। আমি মরি আর বাঁচি, আমি এক্ষুণি আসছি।

দেয়াল। ব্যাস, আমি দেয়াল, এমনি ক'রে আমার পার্ট করে নিলাম, কাজ শেষ হয়ে গেল, এবার তাই দেয়াল চ'লে যাচ্ছে।

দেয়াল, পিরামুস ও থিসবীর প্রস্থান

থি। এবার দুই প্রতিবেশীর মধ্যেকার সীমানা ভূমি-সাৎ হ'ল।

ডি। মহানুভব, যেখানে দেয়াল এমন ক'রে বিনা-ওয়ারনিং-এ ইচ্ছামতো মানুষের কথাবার্তা শোনে,—সেখানে এর আর কোন প্রতীকার নেই।

হিপ। আমি যত নাটক দেখেছি, এটা তার মধ্যে সব চেয়ে বোকামোতে ভরা।

থিসি। নাটকের মধ্যে যেগুলো সেরা—সেও তো ছায়াছবি ছাড়া আর কিছুই নয় তাই যেগুলো সব চেয়ে নিকৃষ্ট তাও তার চেয়ে খারাপ নয় যদি কল্পনা দিয়ে তার ত্রুটি-বিচ্যুতি পূর্ণ করে নেওয়া যায়।

থি। তা হ'লে সেটা হ'ল তোমার কল্পনা, অভি-নেতাদের নয়।

থি। যদি তারা নিজেদের সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করে আমরা তাদের সম্বন্ধে তার চেয়ে খারাপ কিছু কল্পনা না করি তাহ'লে তারা চমৎকার অভিনেতা বলে চলে যেতে পারে। এই যে দুই মহানুভব প্রাণী ঢুকছে। একটি হ'ল চাঁদ, অন্যটি সিংহ।

সিংহ ও চাঁদের আলোর প্রবেশ

সিংহ। শ্রদ্ধেয়া মহিলাগণ, যেকেতে যখন ছোট ছোট বিদ্‌ঘুটে ইঁদুর ঘুরে বেড়ায় তখনি আপনাদের ভীরু হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়। আর এখন যখন একটা বিকট সিংহ ক্ষেপে গিয়ে গর্জন করবে তখন তো এটা খুবই স্বাভাবিক যে আপনারা এখানে থরথর ক'রে কাঁপতে থাকবেন। তাই আপনাদের কাছে আমার নিবেদন যে, আমি স্নাগ নামে একটি লোক, আমি হচ্ছি মিস্ত্রী, আমিই এই পাজি সিংহ সেজেছি। আসলে আমি কোন সিংহের জননী নই। কারণ আমি যদি সত্যিই সিংহ হতাম আর এখানে এসে আঁচড় কামড় দিতে চেষ্টা করতাম, তাহ'লে আমার নিজের প্রাণ বাঁচানো মুস্কিল হ'ত।

থি। এ জন্তুটি ভারি শান্তশিষ্ট এবং বেশ সুবিবেচক।

ডি। মহানুভব, এ একেবারে একটা জানোয়ারের মতো জানোয়ার, এর জুড়ি আমি আর কখনো দেখিনি।

না। এ সিংহ যে সাহসে একেবারে একটা শেয়াল।

থি। ঠিক ব'লেছেন, আর সুবিবেচনায় একেবারে একটি রাজহাঁস।

ডি। ঠিক হ'ল না মহানুভব, কারণ ওর সাহস ওর বিবেচনাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারে না, কিন্তু শেয়াল তো হাঁসকে বয়ে নিয়ে যেতে পারে।

থি। আমি নিশ্চয় জানি ওর সুবিবেচনা ওর সাহসকে ব'য়ে নিয়ে যেতে পারে না, কারণ হাঁস তো শিয়ালকে পিঠে করে নিয়ে যায় না। তা সে ভালই হয়েছে। ওর সুবিবেচনা যা বলে ও সে রকমই করুক, চলুন এবার চাঁদের কথা শোনা যাক।

চাঁদ। এই লণ্ঠন দুদিকে দুই সিংওয়ালা চাঁদকে বোঝাচ্ছে।

ডিমি। ওর উচিত ছিল মাথায় দুটো শিং লাগিয়ে আসা।

থিসি। ও তো অর্দ্ধচন্দ্র নয়, ওর গোল মাথাটির ভেতরে শিং দুটো অদৃশ্য হ'য়ে আছে।

চাঁদ। এই লণ্ঠন সিংওয়ালা চাঁদকে বোঝাচ্ছে। আমি হচ্ছি চাঁদের ভেতরকার মানুষ।

থিসি। এটা তো অন্য সমস্ত ফুলের চেয়েও একঠাঁই বাড়া। লোকটাকে লণ্ঠনের ভেতরে পুরে দেওয়া উচিত ছিল। তা না হলে এ-মানুষটা চাঁদের ভেতরে হ'ল কী ক'রে?

ডিমি। ও ঐ বাতিটার জন্যে লণ্ঠনের ভেতরে ঢুকতে পাচ্ছে না, কারণ দেখ্‌তে পাচ্ছেন না ওটা, ইতিমধ্যেই ধোঁয়াতে আরম্ভ ক'রেছে।

হিপ। আমি এই চাঁদ দেখে দেখে ক্লান্ত হ'য়ে উঠেছি, একবারে ও যদি বদ্‌লাত তো ভালো ছিল।

থিসি। ওর বুদ্ধির আলোর কীণ দশা থেকে মনে হ'চ্ছে যে চাঁদ ক্ষয় হতে আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু তবু ভদ্রতাবশতঃ এবং যুক্তি সংগত ভাবে আমাদের সময়ের অপেক্ষা ক'রে থাকতেই হবে।

লাই। ওহে চাঁদ, তোমার পার্ট ব'লে যাও।

চাঁদ। আমার বল্‌বার কথা এইমাত্র যে আমি আপনাদের ব'লে দেব যে এই লণ্ঠনটা হ'ল চাঁদ, আমি চাঁদের ভেতরকার মানুষ, এই কাঁটাকাড় হ'ল আমার কাঁটাকাড় আর এই কুকুর আমার কুকুর।

ডিমি। বারে, তা হ'লে তো এই সমস্তই লণ্ঠনের ভেতরে হওয়া উচিত ছিল, কারণ এ সমস্তই চাঁদের ভেতরে থাকে। কিন্তু চুপচুপ, এই যে থিসবী আস্‌ছে।

থিসবীর প্রবেশ

থিস। এই তো সেই পুরানো নিনির সমাধি, কোথায় আমার প্রিয়তম?

সিংহ। ওঃ!

সিংহ গর্জ্জন কর্‌বে, থিসবী দৌড়ে পালাবে

ডিমি। সাবাস্ সিংহ, তুমি চমৎকার গর্জ্জন ক'রেছ।

থিসি। সাবাস্ থিসবী, তুমি চমৎকার দৌড়েছ।

হিপ। সাবাস্ চাঁদ, তুমি চমৎকার আলো দিয়েছ। সত্যি সত্যি চাঁদ বেশ হাসিমুখেই আলো দিচ্ছে।

থিসি। সাবাস্ সিংহ, তুমি ইন্দুরের পার্ট বেশ সুন্দর অভিনয় কর্‌ছ। (সিংহ থিসবীর জামা দাঁত দিয়ে কেটে প্রস্থান কর্‌বে।)

ডিমি। এইবার নিশ্চয় পিরামুস আস্‌বে।

লাই। আর তখন সিংহ চলে যাবে।

পিরামুসের প্রবেশ

পির। মিষ্টি চাঁদ, আমি তোমার তোমার ঐ উজ্জ্বল আলোর জন্যে ধন্যবাদ জানাই। তুমি যে এখন এমন উজ্জ্বল আলো বিকীর্ণ করছ এজন্যে আমি তোমায় ধন্যবাদ দিই, কারণ তোমার ঐ স্নিগ্ধ, সোনালি, ঝল্‌মলে আলোকরশ্মির আশা করছি আমার চির অনুরাগিণী থিসবীর মুখখানা দেখ্‌তে পাব।

কিন্তু এ কী! হায়রে দুর্ভাগা,
এই দেখ্, ওরে হতভাগা প্রেমিক,
তোর ভাগ্যে এ কোন ভয়ঙ্কর অদৃষ্টের
মুষ্টি ভিক্ষা প'ড়ে আছে।
ওরে চোখ, দেখতে কি পাস্?
এ কেমন ক'রে হ'ল?
ওগো ভীরু হংসী, ওগো প্রিয়া!
তোমার সুন্দর গাত্রাবরণ
একী! রক্তমাখা?
ওরে ঘনিয়ে আয়, যত সংহার শক্তি
আয় আয় যত দুর্গ্রহ।
ছিন্ন ক'রে ফেল যেখানে আছে যত বন্ধন
নিভিয়ে দে, ছুটে আয়, শেষ ক'রে দে,
আয় থামিয়ে দে!

থিসি। এই দুর্দ্দম শোকাবেগ, আর এক প্রিয়বান্ধবীর মৃত্যু, লোকটার মুখে একটু দুঃখের চিহ্ন ফুটিয়ে তোলবার কথা ছিল।

হিপো। কিন্তু সত্যি বল্‌ছি, লোকটাকে দেখে আমার মায়া হ'চ্ছে।

পির। ওগো প্রকৃতি, তুমি কী জন্যে সিংহকে সৃষ্টি ক'রেছিলে? কারণ একটা পাজি সিংহই আজ এখানে আমার প্রিয়াতুল্য ফুলটিকে কাঁদিয়ে দিয়েছে। যে প্রিয়া হ'ল—না, না—যে প্রিয়া ছিল, সেই সমস্ত সুন্দরীদের মধ্যে সেরা সুন্দরী, যারা এতকাল বেঁচেছে, যারা ভালোবেসেছে, যাদের ভালো লেগেছে, যারা খুসীভরা চোখে তাকিয়েছে।

আয়রে চোখের জল, আমায় আচ্ছন্ন ক'রে দে। বের হ'য়ে তলোয়ার পিরামুসের বুকে আঘাত হান। হ্যাঁরে ঐ

বাঁ-দিকের বুকে যেখানে প্রাণ ধুকধুক ক'রছে। এই আমি মরছি, এই যে, এই যে,—এই যে।

এবার আমি ম'রে গেছি,
এবার আমি মুক্তি পেয়েছি,
আমার আত্মা এখন আকাশে
ওরে রসনা, তোর আলো এবার নিভে যাক্
ওরে চাঁদ, বিদায় নিয়ে যারে
এবার আমি মরি,—মরি, মরি—
ভাই—ভাই—ভাই।

ম'রে গেল। চাঁদের আলোর প্রস্থান

ডিমি। ভাই নয়, ওকে বলা (acc) এস্ কারণ ও হ'ল অধিভীর।

লাই। ও এখন একটা (acc) এস্ বা এক পয়েন্টের চেয়েও কম ভাই, কারণ ও মরে গেছে, ও এখন একেবারে নেতি।

থিসি। এখন একজন সার্জনের সাহায্য পেলে ও সেরে উঠে অন্ততঃ নিজেকে একটা গাধা ব'লেও প্রমাণ করতে পারে।

হিপ। এটা কী হল? থিসবী ফিরে এসে তার প্রণয়ীকে দেখবার আগেই চাঁদের আলো চ'লে গেল?

থিসি। সে ওকে তারার আলোয় দেখতে পাবে। এই যে সে আসছে, ওর দুঃখাবেগের মধ্যেই নিশ্চয় এই প্রে সমাপ্ত হবে।

থিসবীর প্রবেশ

হিপ। আশা করি এখন পিরামুসের জন্যে ও এক দীর্ঘ বিলাপ জুড়ে দেবে না। আশা করি ওর বিলাপটি ছোটই হবে।

ডিমি। এক কুচি পাথর রাখলেই পাল্লার একদিক ভারী হয়ে উঠবে। এখনি দেখা যাবে কোন পিরামুস কোন থিসবী ভালো।

লাই। সে ঐ যে দূর থেকে ইতিমধ্যেই ওকে নিজের দুটি মিষ্টি চোখ দিয়ে দেখতে পেয়েছে।

ডিমি। এই যে ও বিলাপ শুরু করছে,—যথা—

থিসবী। ঘুমিয়ে প'ড়েছ, প্রিয় গো,
সেকি, ম'রে গেছ.
ঘুঘু পাখীটি আমার!

ওগো পিরামুস ওঠো, কথা বলো, বলো,

তুমি একেবারে নীরব হ'য়ে আছ, তুমি ম'রে গেছ, মরে গেছ, তোমার ঐ মিষ্টি চোখ দুটি কবরের তলায় ঢাকা প'ড়ে যাবে? ঐ যে লিলিফুলের মতো শুভ্র ভ্রূযুগ ঐ যে চেরীফলের মতো লাল নাক ঐ যে হলদে কাউস্‌লিপ ফুলের মতো গাল দুটি—তার আর কিছুই রইলো না।

ওগো প্রেমিকরা, যে যেখানে আছ কাঁদ ওর দুটি চোখ দুটি কোয়াওয়ালা পেঁয়াজের মত নরম ছিল। ওগো তিন বোন!* এসো, এসো আমার কাছে তোমাদের সেই হাত নিয়ে, যে হাত দুধের মতোই পাতুর। তোমাদের হাত রক্তে ডুবিয়ে দাও, কারণ তোমরা ওর জীবনের সুতোটি কেটে ফেলে দিয়েছ। ওগো রসনা, আর একটি কথা বলো না!

এসো বন্ধু অলোয়ার, এসো তরোয়ার, আমার বুকটিকে রক্তসিক্ত করে দাও। বিদায় বন্ধুরা, এমনি ক'রেই থিসবীর জীবনের সমাপ্তি হ'ল। ওগো, বিদায়, বিদায়, বিদায়। (মরে যাবে)

থিসি। চাঁদের আলো আর সিংহ থেকে গেল, মৃত-দেহকে কবর দেবার জন্যে।

ডিমি। হাঁ, আর দেয়ালও।

বট। না, আমি বলছি আপনাদের, ওদের বাপে-দের দুই জমির মাঝখানকার সে দেয়ালটা পড়ে গেছে। আপনারা কি নাটকের উপসংহার দেখতে চান, না আমাদের দলের দুজনার বারগামো দেশের এক লোক-নৃত্য দেখতে চান।

থিসি। কোন উপসংহারের দরকার নেই, কারণ আপনাদের এই প্রের জন্যে কারো কাছে মাপ চাইবার কোন দরকারই নেই। কখখনো মাপ চাইবেন না। কারণ নাটকের পাত্র-পাত্রী সবাই যখন ম'রে গেল, তখন আর দোষ দেবার মতো রইল কে? দেখুন, যদি এই প্রে যে লিখেছে সেই পিরামুসের পার্ট করত, আর থিসবীর মোজার ফিতেতে গলায় দড়ি দিয়ে মরত, তা হ'লে এটা একটা চমৎকার ট্র্যাজেডি হত। আর সত্যিই তাই

* গ্রীক উপাখ্যানের তিন বোন, একজন সুতো বোনে, একজন সুতো ধ'রে থাকে, একজন সুতো কেটে দেয়। অর্থাৎ তিন ভাগ্যদেবী যারা সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় ঘটায়।

হয়েছে, পার্টগুলি খুব সুন্দর হ'য়েছে। যাক্ আপনাদের সেই বারণামো লোকনৃত্য শুরু করুন। উপসংহার থাকুগে থাক্। (ভাঁড়দের নাচ)

থিসি। দুপুর রাতের লোহার জিভ্ বলে দিয়েছে যে রাত বারোটা বাজে। প্রণয়ীরা সব এবার শুতে যান। এখন তো প্রায় পরীদের বেরবার সময় হ'য়ে এল। আমার আশঙ্কা হ'চ্ছে যে কাল আর সকাল বেলা আমরা সময় মতো উঠ্তে পারব না। আজ যে রাত জেগে আমরা এই অমার্জিত অথচ জীবন্ত অভিনয় দেখলাম এতে করে আমাদের সময়টা কিন্তু বেশ কাটল। বুঝ্তেই পারিনি যে কখন এত রাত হ'য়ে গেছে। প্রিয়বন্ধুরা, শুতে যান। একপক্ষ কাল ধরে আমাদের এই উৎসব চল্বে। প্রতি রাতে নিত্যনূতন উৎসব ও আনন্দ কর্ব।

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

পাকের প্রবেশ

পা। এ সময়ে ক্ষুধার্ত সিংহ গর্জ্জন কর্ছে, নেকড়ে বাঘ চাঁদের দিকে তাকিয়ে রাগে গর্জ্জন কর্ছে। এখন হৃষ্ট পুষ্ট দেহ চাষীরা সারাদিনের কাজের ক্লান্তিতে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। এখন নিভন্ত কাঠের আগুন শেষ-বারের মতো জ্বলে উঠ্ছে। এখন পেঁচার তীক্ষ্ণ, তীব্র ডাক শুনে দুঃখী মানুষের মনে পড়্ছে তাদের কথা যাদের তারা একদিন কবর চাপা দিয়ে রেখে এসেছে। এখন রাতের সেই প্রহর এসেছে যখন সমস্ত কবরগুলোর মুখ হাঁ হ'য়ে গেছে আর তাদের প্রত্যেকটির মধ্য-থেকে বেরিয়ে আস্ছে একটি ক'রে প্রেতাত্মা—যে প্রেতাত্মাগুলো কবরখানার পথে পথে তাদের অশরীরী অভিসারে বেরিয়ে প'ড়েছে। আর আমরা পরীরা যারা ত্রিমূর্ত্তি দেবী হেকেটের দলে যোগ দিয়ে দিনের আলোর কাছ থেকে ছুটে পালাই আর স্বপ্নের মতোই অন্ধকারের অনু-সরণ করি, আমাদের পক্ষে এটাই হ'ল খেলে বেড়াবার সময়। এই পবিত্র গৃহে একটা ইঁদুরও উৎপাত করতে পার্বে না। আমাকে আগে হ'তে একটা ক্যাঁটা দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি ঘরদোর পেছনকার সমস্ত ধূলো ক্যাঁট দিয়ে পরিষ্কার ক'রে দেব।

ওবারণ ও টিটানিয়ার সদলে প্রবেশ

ও। এই বাড়ীর সব জায়গা একটা আবছা আলোয় ভরে যাও। ঐ যে কতক নিভে যাওয়া আর কতক নিভু নিভু আগুন, ওর চার পাশে সমস্ত পরীরা হাল্কা পায়ে নাচো যেমন ক'রে ব্যাঙের ওপরে পাখী নাচে। আর আমার শুনে শুনে এই গান গাও আর লঘুছন্দে নাচো।

টিটা। প্রথমে তোমরা গানটা মুখস্থ ক'রে নাও, প্রত্যেকটা কথা যেন সুন্দর, সুরেলা হয়। তারপরে আমরা সবাই হাতে হাত ধ'রে আমাদের অনুপম পরীনাচ নাচ্ব আর এই গৃহকে আশীর্ব্বাদ কর্ব। গান ও নাচ

ও। এবারে যতক্ষণ ভোর না হয়, ততক্ষণ প্রত্যেকটি পরী এই গৃহের সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়াবে। আমরা দুটিতে যাব সর্ব্বোত্তম দম্পতীর বিছানার পাশে, তাদের শয্যাকে আমরা আশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত কর্ব। সেখানে যে সন্ততির জন্ম হবে, তারা চিরসৌভাগ্যের অধিকারী হবে। আর এই তিনটি দম্পতীরই প্রেমের নিষ্ঠা চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে। প্রকৃতির হাতের কোন কুশ্রী দাগ কখনো এদের সন্ততির মধ্যে বর্ত্তাবে না। ওদের সন্ততির গায়ে কখনো কোন আঁচিল, কোন খরগোসের মতো দুভাগে ভাগ করা ওপরকার ঠোঁট, কোন দাগ, কোথাও কোন চোখে পড়ার মতো কুশ্রী চিহ্ন,—নবজাতকের মধ্যে যা লোকে অপছন্দ করে, তা কখনো দেখা দেবে না। এই যে মন্ত্রঃপূত মাঠের শিশির এই নিয়ে প্রত্যেক পরী তার নিজের নিজের ঘরদোর গিয়ে দাঁড়াক্ আর প্রত্যেকে এই প্রাসাদের তিনটি করে শয্যাকে সুমধুর শান্তি আশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত ক'রে দিক্। এই গৃহ যেন চিরদিন নিরাপদে বিরাজ করে। এই গৃহের গৃহস্বামী যেন চিরসুখী হয়।

চপল চরণে এসো চ'লে
থেকো না থেকো না আর
এসে মিলিত হ'য়ে মোর সাথে
যবে রাত্রি হবে প্রভাত।

ওবা, টিটা, ও দলবলের প্রস্থান

পাক। আমরা ছায়াতরী, যদি ক'রে থাকি অপরাধ
এই ভেবে নিয়ো, ঘুচে যাবে সব অবসাদ
যে, তোমরা ঘুমিয়ে ছিলে এইখানে
যতখন খেলা ক'রে গেছে ছায়াগুলি
তোমাদের সামনে।
এই যে অসার তুচ্ছ কাহিনী
কী এর অর্থ, এ শুধু স্বপ্ন, তা জানি।
ওগো সহৃদয়, না মানো অসন্তোষ
ক্ষমা করো যদি, দূর হবে দোষ
আমি অতি সাধু মোর নাম পাক
পাওনার বেশি যদি থাকে ভাগ
যদি বাঁচি আজ সাপের ছোবল হ'তে
ক'রে দেব, এই ক্ষতি পুরো, অচির ভবিষ্যতে
নয় তো ব'লো, পাক এক মিথ্যুক লোক
আচ্ছা, তোমাদের সবার রাত্রি শুভ হ'ক্।
যদি আমরা বন্ধু হই তো, এসো,
দাও হাতে হাত
ঘরিণ ক'রে দেবে ক্ষতিপূরণ
তোমাদের অচিরাৎ।

সমাপ্ত

দুই তীর্থ

অশোককুমার বরাট

বেলুড়। নামটার সাথে কেমন যেন একটা অঙ্গাঙ্গী আবেদন মিশিয়ে আছে। স্বামীজীর স্বপ্নসাধনা, আদর্শের সার্থক রূপায়ণ। উনবিংশশতকে মুমূর্ষু, অন্ধকারাচ্ছন্ন, বিপথগামী ভারতীয়দের ত্রাণকর্তা স্বামীজী সেদিন ভারতের সনাতন আদর্শকে রক্ষা করতেই যেন আবির্ভূত হয়েছিলেন। বজ্রদীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—গুরুদেব রামকৃষ্ণের আদর্শ। গুরুর যোগ্য উত্তরসাধক। বিপথগামী আদর্শ-ভ্রষ্ট ভারতীয় সেদিন সচকিত হয়ে উঠেছিল। ধর্ম-সংস্কারকরা কটাক্ষ হেনেছিলেন।

চিকাগোর ধর্মসভায় পাঁচমিনিটের জন্য করুণাপ্রার্থী বক্তা বিবেকানন্দের "ye my brothers and sisters" এর প্রতিটি অক্ষরে ধর্মের যে গূঢ়তত্ব মিশিয়েছিল, সেদিন ধর্মসভায় সমাগত ধর্মসংস্কারকরা তাতে সচকিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের মনের তারে যেন ধর্মের শাশ্বত সুরটি ঈশ্বরপ্রেরিত এক মহাসাধক নিপুণভাবে বাজিয়ে ছিলেন। পাঁচ মিনিটের বক্তার কাছে সেদিন তথাকথিত ধর্মীয় দিক্‌পালেরা যেন আরও—আরও অনেক কিছু জানতে চেয়েছিলেন। দলে দলে ধর্মানুরাগীরা ছুটেছিলেন অমৃতের সন্ধানে, আশার আলো দেখেছিলেন বীর্যদীপ্ত এই মহা-সন্ন্যাসীর চোখে। ধর্মের সুদৃঢ়গণ্ডী সেদিন প্রসারিত হয়েছিল অসীমের মাঝে। ধর্মের এই সংকীর্ণ গণ্ডীকে ভাঙতেই যেন এই মহামানবের আবির্ভাব। পূর্ব পশ্চিমের এই মহামিলন, সংস্কৃতি, কৃষ্টির সমন্বয়ইতো চিরন্তন ধর্মের আদর্শ। কবিগুরুর সেই মহান আদর্শ "দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে—যাবেনা ফিরে"—সার্থক হয়েছিল।

অহংকারদৃপ্ত, পাশ্চাত্য আদর্শের অন্ধ অনুকরণকারী, মোহাচ্ছন্ন যুবকবৃন্দের এক বিরাট চ্যালেঞ্জ বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের এই চ্যালেঞ্জ সেদিন ভারতীয় তথা বিশ্বের যুবকেরা গ্রহণ করতে পারেনি—আজও না, সর্বদেশের, সর্বকালের যুবকদের কাছে সমাজ আশা করে বহু কিছু। বিবেকানন্দ সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে বিশ্ব-সমাজকে যা দিয়ে-ছেন তা সীমায়িত নয়। রামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজীর যুগ্ম-কুঠারাঘাতে সমাজের কুসংস্কার চূর্ণীভূত হয়েছিল, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মানববাদী ধর্ম। চির-যুগ, চিরযোগী, সমগ্র বিশ্বের বিস্ময় বিবেকানন্দের কর্মসাধনা অনেক যুবকেরই আদর্শ। Universal brotherhood এর মর্মবাণী ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে বেলুড়ের আকাশে বাতাসে, মাটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে। পবিত্রতা, মহান্ আদর্শ চিরন্তন ধর্মীয় মর্মবাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত বেলুড়ের প্রতিটি কীর্তিস্তম্ভ। বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, ক্রাইষ্ট, কনফুসিয়াস আর রামকৃষ্ণের আশীর্বাদধন্য এই মহাতীর্থ। বেলুড়ের মন্দিরের উঁচু চূড়া সত্যসুন্দরের জয়-ধ্বজা তুলে যেন উদার সুরে আহ্বান জানায়—"এসো হে আর্য, এসো অনার্য, এসো হে দ্রাবিড় চীন।" তাই ছুটে আসে মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন কোণ হ'তে অন্তরে অনেক ক্ষুধা নিয়ে, ফিরে যায় পূর্ণতার ছাপ নিয়ে।

নীচে ভাগীরথীর পবিত্র জলস্রোত দু'পাশে উন্নত সংস্কৃতির ছাপ নিয়ে বুকে পবিত্রতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে একদা প্রলুব্ধ করেছিল স্বামীজীকে, গুরুদেবের অন্তরে প্রেমের ঐকতান শুনিয়েছিলেন। গুরুদেব রামকৃষ্ণ যাঁরা পেয়ে-ছিলেন—তাঁরে গিয়েছিলেন গঙ্গাতীরে। পঞ্চবটীতে পেয়ে-ছিলেন সত্যের সন্ধান! এরও অনেক আগে কোন্ এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে রাণী রাসমণিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন এখানে, হয়তো বা পেয়েছিলেন পরমেশ্বরের ইঙ্গিত, প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন মহাতীর্থ দক্ষিণেশ্বর।

দক্ষিণেশ্বর আর বেলুড়—দুই মহাতীর্থ। গুরু-শিষ্যের দুই মহান কীর্তি, একে অন্যের সাথে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে বাঁধা। এ-কূলে বেলুড়, ও-কূলে দক্ষিণেশ্বর। মাঝে চির-কল্যাণময়ী, পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক গঙ্গা। মানুষের স্রোত আসে যায় প্রতিদিন। বেলুড় থেকে কোন এক অজানা টানে কাতারে কাতারে মানুষ আসে গুরুদেবের সাধনাক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বরে। দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলুড়ে। চিরকল্যাণময়ী গঙ্গার পবিত্র জলস্রোত বিশ্বমানবতা, বিশ্বমৈত্রীর আবেদন

আনে। ধর্ম-যাত্রীদের কাছে বেলুড়ের মন্দিরের উঁচু চূড়ায় অহরহ ধ্বনিত হয় সেই এক সুর—বিশ্বমানবতা, বিশ্বমৈত্রীর সুর—

"জীবে প্রেম করে যেই জন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

ধন্য বেলুড় দক্ষিণেশ্বরের আকাশ, বাতাস, মাটি। পৃথিবীর ধর্মের অধ্যায়ের দুই বিস্ময়, দুই দিক্‌পাল রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের স্মৃতিধেরা পবিত্রতম এই মাটিতে কিংবা এর গণ্ডীর বাইরে মানুষ চলিয়ে যায় বিস্মৃতির অতল গহ্বরে, ভুলে যায় সব আদর্শের কথা—আবার ভেসে চলে পাপসমুদ্রে বেপরোয়াভাবে। কিন্তু বড় আশ্চর্যের কথা আমরা তবুও অভিনয় করে চলি। শোক-দুঃখের নাগপাশে জড়িয়ে পড়ি বারবার। তিল তিল করে ক্ষয় করি নিজেদের। সব শেষের অধ্যায়ে মহাকালের কোলে আশ্রয় নিই শোচনীয়ভাবে। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে এক বিরাট ট্র্যাজিডির অভিনয় চলেছে একটানা ভাবে।

ভাগীরথীর ওপারে দিনান্তের রক্তাভ সূর্য জলস্রোতকে রাঙিয়ে দিচ্ছে। দু'পাশের চিমনিগুলো থেকে ক্রমাগত ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। এপার থেকে একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ ভেসে আসছে তীব্রতর হয়ে, আর আমরাও কয়জন প্রাণী অনেক কলঙ্কের বোঝা নিয়ে ভেসে চলেছি দক্ষিণেশ্বরের দিকে—পরমপুরুষের স্পর্শধন্য মাটিতে। নৌকোর একপ্রান্তে কয়েকজন যুবকযুবতীর আধিয়ন-মিশ্রিত আলোচনার কাটা কাটা ভাষা ভেসে আসছে আমাদের কানে। তাঁরাও বেলুড় থেকে দক্ষিণেশ্বরের যাত্রী। তাঁদের হাতে বিবেকানন্দ, নিবেদিতা ও রামকৃষ্ণের জীবনাদর্শের কয়েকখানা মূল্যবান গ্রন্থ। আর আমার পাশে আমার ছাত্রছাত্রী। তাদের কাছে বলে চলেছি দুই মহাপুরুষের জীব-ধর্মের কথা। ওদের উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দে সচকিত হয়ে উঠছি বারবার। আমার পাশে আমার ছাত্রছাত্রী—কিন্তু তবুও ফিরে তাকিয়েছি ওদের দিকে বার বার, কারণ আমি নৌকোর হাল, কাঠ বা দাঁড় নই। একই আদিম প্রবৃত্তি আমার মধ্যেও রয়েছে সুপ্তভাবে।

অন্ধকারের কালো ছায়া ক্রমশঃ নেমে আসছে ভাগীরথীর বুকে। উত্তরের হিমশীতল বাতাস প্রতিক্ষণে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তিসেম্বরের অস্তিত্বকে। র‍্যাপারটা জড়িয়ে নিচ্ছি গায়ে। যাত্রীরাও প্রস্তুত। "বিবেকানন্দ সেতু" ছাড়িয়ে এসেছি আমরা। নৌকাটা দুলে দুলে উঠছে যাত্রীদের চঞ্চলতায়। দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে এবার নামার পালা। আমাদের পিছনে যাত্রীর স্রোত। সিঁড়ি ভেঙে উঠছি আমরা। হঠাৎ ফিরে তাকালাম একটা করুণ আর্তনাদের সুরে। সিঁড়ির নীচে ভীড় জমে উঠছে। দশ বছরের বালক ভিখারী তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে। মাথাটা থেকে ঝিনুকি দিয়ে রক্ত ছড়িয়ে পড়ছে মহাতীর্থের পবিত্রতম মাটিতে। হাতের কৌটোটা পড়ে রয়েছে পাশে। ভিক্ষালব্ধ পয়সাগুলো হয়তো বা ছড়িয়ে পড়েছে গঙ্গার জলে। ওর অপরাধের কথা শুনতে দেরী হয়নি আমাদের। আমাদেরই নৌকার সেই যুবকটির গায়ে হাত দিয়ে পয়সা চেয়েছিল ও। হয়তো বা মলিনতার ছাপ পড়েছিল যুবকটির পরিচ্ছন্ন অঙ্গে। একটা জোর থাপ্পড় পড়েছিল ওর মাথায়। ছিটকিয়ে পড়েছিল নীচের সিঁড়িতে। ওর অন্য সঙ্গীরা বলছিল "বাবু! দু-দিন কিছু খায়নি ও।"

ওর তেলচিটে জামাটা থেকে একটা দুর্গন্ধ ভেসে আসছিল। রক্তে রাঙা হয়ে উঠল ওর তেলচিটে জামা। কেঁপে কেঁপে উঠছিল ওর সমস্ত শরীর। কিন্তু তবুও করুণ দৃষ্টিতে চেয়েছিল শূন্য কৌটোটার দিকে। নৌকোর সেই যুবকটি "নেক্সটাই"টা ঠিক করছিলেন, আর পাশের আধুনিকা হাতের ঘড়িটির দিকে তাকিয়ে ওঁর হাত ধরে ওপরে উঠে গেলেন—পরমহংসদেবের স্পর্শধন্য পুণ্য মাটিতে ওপর থেকে ওদের হালকা হাসির ঢেউ ভেসে আসছিল নীচে, আর ছেলেটা পড়েই রইলো নীচে ওর ভাগ্যহীন, বিড়ম্বিত, অসহায় জীবন নিয়ে। ওকে কেউ তুলে বসায়নি—আমরাও না।

ওপারে বেলুড় আর এপারে দক্ষিণেশ্বরের আকাশ বাতাস আর মাটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই এক সুর—"জীবে প্রেম করে যেইজন"...হয়তো ভেসে চলেছে তখনও।

বেলুড় আর দক্ষিণেশ্বর থেকে কি নিয়ে ফিরেছি জানি না। কিন্তু মাঝে মাঝে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করি মনের মণিকোঠায়। সেই অব্যক্ত যন্ত্রণা আমায় ভাবিয়ে তোলে—সত্যই কি অপরাধী আমি? কলুষিত দুর্বল মন নিয়ে মহাতীর্থে যাওয়ার অধিকার আমার কোথায়?

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এই দুই মহামানবের ছবি আজও আছে আমার ঘরে। মহাতীর্থে যাওয়ার আগে এই দুই মহাপুরুষের চোখে দেখেছি পরম প্রশান্তি, বরাভয়ের আশ্বাস। কিন্তু আজ ঠিক তার বিপরীত। কেন জানি না ওঁদের চোখের পানে যেন চাইতে পারি না। ভাবছি, ছবি দু'টোকে ঘর থেকে সরিয়ে ফেলবো, কারণ শেষ পর্যন্ত আমার সেন্টিমেন্টই হয়তো বাধা করবে আমাকে।

ভারতের বর্তমান ভাষাসমস্যা

অধ্যক্ষ খগেন্দ্রনাথ সেন

গত ২৬শে জানুয়ারী থেকে ভারত সরকার হিন্দীকে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করেছেন। ঐদিন থেকে Official Languages Act চালু করা হয়েছে। এই আইন অনুসারে ভারত সরকারের যাবতীয় কার্যকলাপ হিন্দী ভাষার মাধ্যমে করা হবে। ভারতের অন্তর্গত রাজ্যগুলির সঙ্গে ভারত সরকারের চিঠিপত্র বিনিময়, তাদের আদান প্রদান ইত্যাদি হিন্দীতে হবে, তবে ঐ সঙ্গে সহযোগী ভাষা হিসাবে ইংরাজিও ব্যবহার করা হবে। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে অহিন্দীভাষী জনগণ যতদিন চাইবেন ততদিন সহযোগী ভাষারূপে ইংরাজির ব্যবহার অক্ষুণ্ণ থাকবে। এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন স্বর্গত জওহরলাল নেহরু, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী, রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। অবশ্য এই সঙ্গে রাজ্যসরকারগুলিকে, তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় তাঁদের আঞ্চলিক ভাষাসমূহ সরকারীভাষারূপে ব্যবহার করবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। হিন্দী চালু হবে ভারত সরকারের দলিলপত্রে, চিঠিপত্রে, আলাপ আলোচনায়, প্রয়োজন হলে তার সঙ্গে তর্জমা থাকবে ইংরাজিভাষায়।

২৬শে জানুয়ারী থেকে সরকারীভাবে দিল্লীর দরবারে হিন্দীর এই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে ভারতীয় জনগণের একটা বড়ো অংশ প্রকাশ্যভাবে এই স্বীকৃতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। দক্ষিণভারতে এই নিয়ে রক্তপাত হয়ে গেল, কয়েকজন অহিন্দীভাষী অনশনব্রত অবলম্বনে প্রাণবলি পর্যন্ত দিলেন। সে আন্দোলন এখনও স্তিমিত হয়নি, বরং একটা পাকাপাকি সন্তোষজনক ফয়সালা না হলে ভারতের অন্যান্য অহিন্দীভাষী অঞ্চলেও এই আন্দোলনের ব্যাপ্তি ঘটবে এমন আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও একটা ব্যাপক আন্দোলন দ্রুত গড়ে উঠছে। এই আন্দোলন অদূর ভবিষ্যতে উড়িষ্যা এবং আসামেরও সক্রিয় সহানুভূতি লাভ করবে তারও নিদর্শন পাওয়া গেছে। ভারতবাসীর রাজনৈতিক ও ভাবগত সংহতির দিক দিয়ে এই আন্দোলনের পশ্চাতে কতটা যুক্তি আছে, কতটাই বা ভাবাবেগ আশ্রিত, ধীরভাবে ও সুস্থমস্তিষ্কে এর বিচারের প্রয়োজন হয়েছে।

প্রথমতঃ দেখা যাচ্ছে—১৯৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে হিন্দীকে যে ভারতসরকারের সরকারী-ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হল তার পিছনে আছে ভারতীয় আইনসভা বা পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত এবং তারও পিছনে আছে ভারতীয় সংবিধানের সুস্পষ্ট নির্দেশ। যদি আমরা ভারতীয় সংবিধানের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করি, তা হলে বলতে হবে অহিন্দীভাষীদের এই আন্দোলন সংবিধান-বিরোধী, সুতরাং অবৈধ। যদি পার্লামেন্টের নির্দেশ অমান্য করি তা হলে পার্লামেন্টের জাতির প্রতিনিধিমূলক ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয় এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। পার্লামেন্টের, বিশেষ করে বিধানসভার, সভ্যগণ জাতির নির্বাচিত প্রতিনিধি। তাঁরা সুবিবেচনার পর ভোটাধিক্যে official Languages Act অনুমোদন করেছেন: অতএব যাঁরা এর বিরোধিতা করছেন তাঁরা নিশ্চয়ই সংখ্যালঘু, এবং তাঁদের মতকে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিবর্গের মতের উপরে স্থান দেওয়া গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত নয়। সুতরাং এই সংখ্যালঘু আন্দোলনকারীদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে তাঁদের মতের স্বপক্ষে আনতে হবে। এটাই হল নিয়মতান্ত্রিক উপায়। এই উপায় অবলম্বন করতে গেলে যুক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষকে স্বপক্ষে আনতে হবে, ভয় দেখিয়ে নয়।

দেখা যাক এই যুক্তির সারবত্তা কি? প্রত্যেক দেশেরই সংবিধান হল সেই দেশের সর্বপ্রধান মৌলিক

বিধান বা আইন। সেজন্য এই আইনের সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এ হল অবশ্য আইনের কথা। রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়ে, যে সংস্থা এই আইন প্রণয়ন করেছেন তাকে দেশের জনগণের মতানুগ করতে গেলে তার গণতান্ত্রিক ভিত্তি থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ সংবিধান প্রণয়নকারী গণপরিষদ হবে জনগণের প্রতিনিধিমূলক সংস্থা। যে গণপরিষদ আমাদের সংবিধান প্রণয়ন করেছেন তার সদস্যগণ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন না। ১৯৩৫ সালে বৃটিশ পার্লামেন্টের রচিত ভারত সরকার আইন অনুসারে গঠিত প্রাদেশিক আইন সভার সভ্যদের দ্বারা তাঁরা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আবার এই প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যগণ নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রদেশগুলির মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৪ জন ভোটারের দ্বারা। কাজেই ভারতের সংবিধান-প্রণেতাদের সংস্থাকে গণপরিষদ আখ্যা দেওয়ায় একটু অত্যুক্তির প্রকাশ পাওয়া যায়। আসলে ভারতের সংবিধানের ভিত্তি হল বৃটিশ পার্লামেন্টের রচিত দুটি আইন—১৯৩৫ সালের ভারত গবর্ণমেণ্ট আইন এবং ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন। অতএব ভারতের জনগণ যদি এই সংবিধানের কোনো ধারার বিরোধিতা করেন, সেই বিরোধিতার মূল্য, যারা সংবিধান প্রণয়নে সহায়তা করেছিলেন তাঁদের সেই সমর্থনের মূল্যের চেয়ে কিছু কম নয়, বরং গণতান্ত্রিক নীতির দিক দিয়ে বিরোধিতার মূল্য অধিকতর।

অবশ্য এই যুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা যায়না। ভারতের প্রধান প্রধান জননায়কেরা ভারতীয় গণপরিষদের সদস্যপদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। মুখ্যতঃ তাঁদেরই উদ্যোগে ও সহযোগিতায় সংবিধানের কাঠামো তৈরী হয়। তারপর, উপর্যুপরি তিনটি গণনির্বাচনের মাধ্যমে ভারতের জনগণ এই সংবিধানকে স্বীকার করে নিয়েছেন। কাজেই এখন সংবিধানের গণতান্ত্রিক ভিত্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করা বা সন্দেহ প্রকাশ করা ন্যায়সঙ্গত হবেনা। তবে এ কথা বলা যায় যে সংবিধান একবার রচিত হলে তা হবে একটি অপরিবর্তনীয় বিধান,সে কথাও ঠিক নয়। আমাদের সংবিধান একাধিকবার পরিবর্তিত বা সংশোধিত হয়েছে। প্রয়োজন হলে আবারও হতে পারে এবং যে পার্লামেণ্ট বা রাজ্যসমূহের আইনসভার সদস্যগণ গণভোটের দ্বারা নির্বাচিত, তাঁরা জনগণের মতামত উপেক্ষা করতে পারেন না। এঁরাই হলেন সংবিধানের সংশোধনী সংস্থা। কাজেই আজ যদি আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের একটি শক্তিশালী অংশ সংবিধানের কোনো বিশেষ ধারার পরিবর্তন বা সংশোধন দাবী করেন, তাকে সরাসরি অগ্রাহ্য করা গণতান্ত্রিক নীতিবিরোধী হবে।

ভারতীয় সংবিধানের যে ধারাটি নিয়ে আজ দেশে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে, অর্থাৎ ৩৪৩ সংখ্যক ধারা (যাতে বলা হয়েছে ভারতের একমাত্র সরকারী ভাষা হবে হিন্দী), সেই ধারাটি সম্বন্ধে উপরে উক্ত মন্তব্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। গণপরিষদের সদস্যগণ যখন এই ধারাটি সম্বন্ধে ভোট দেন, দেখা গেল এর সপক্ষে এবং বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা সমান —৭৭; শেষে সভাপতির অতিরিক্ত ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এখানে আমাদের মূল বক্তব্য হল যে হিন্দী ভারতের একমাত্র সরকারী ভাষা (Official Language) হবে—এ প্রস্তাবটি এভাবে গণপরিষদে আনাই ন্যায়সঙ্গত হয়নি এবং আনলেও, যেখানে মতবিভেদ এত প্রবল, তাকে কেবলমাত্র সভাপতির নিজস্ব ভোটে গ্রহণ করা উচিত হয়নি। যেখানে কোনো সংস্থার সভ্যগণ কোনো ব্যাপারে সমান সংখ্যায় বিভক্ত হন সেখানে সাধারণ নীতি অনুসারে সভাপতির কাজ হল status quo বা স্থিতাবস্থাকে সংরক্ষণ করা। এখানে সভাপতি এরূপ নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ না করে মাত্র এক ভোটের ভিত্তিতে একটা সুদূর-প্রসারী সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। আজ যদি এই জাতীয়তাবিরোধী সিদ্ধান্তের প্রকৃত-রূপ বুঝতে পেরে দেশের মধ্যে বিশেষ করে অহিন্দীভাষী জনগণের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তা হলে তার বৈধতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা কি ন্যায়সঙ্গত হবে?

এই প্রসঙ্গে আমরা Official Languages Act বা সরকারী ভাষা-আইনের উল্লেখ করেছি। সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী পার্লামেণ্টে এই আইনটি গৃহীত হয়েছে। নির্দেশ ছিল যে সংবিধান প্রবর্তনের ১৫ বৎসর পরে,অর্থাৎ ১৯৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে, হিন্দী কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারী ভাষারূপে প্রচলিত হবে, তবে ভারতীয় আইনসভা ইচ্ছা করলে এই তারিখের পরেও নূতন আইন

রচনা করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজে ইংরাজীভাষার ব্যবহার চালু রাখতে পারবেন। স্বর্গত জওহরলাল নেহরু যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রিজী বা রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ যে প্রতিশ্রুতির পুনরুক্তি করেছেন, তাও সংবিধান-বিরোধী নয়, এর জন্য না কি সরকারী ভাষা-আইন সংশোধন প্রস্তাব করে একটি সংশোধনী আইনের খসড়াও রচিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে যতদিন না অহিন্দীভাষী রাজ্যসমূহের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ রাজ্যের আইন সভায়, কেন্দ্রীয় সরকারি কাজে ইংরাজি ভাষা ব্যবহার বন্ধ করে দেবার অনুকূলে প্রস্তাব গৃহীত হচ্ছে, ততদিন এই বৈভাষিক ব্যবস্থা কায়েম থাকবে।

এই সংশোধনী আইনের প্রস্তাব করা হয়েছে তার কারণ কোনো কোনো বিরোধীমহল মনে করেন যে কেবল মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিলে যথেষ্ট হবেনা, এই প্রতিশ্রুতিকে আইনের রূপ দিতে হবে। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রতিশ্রুতি বড়, না আইন বড়, এই প্রশ্ন নিরর্থক। এক সরকার আর-এক সরকারের নীতি অনায়াসেই বর্জন করতে পারেন। এমন কি অবস্থার চাপে পড়ে একই রাজনৈতিক দলের মত ও পথের পরিবর্তন হতে পারে। এটা ত সাধারণ কথা যে রাজনীতি জিনিষটা স্থিতিশীল নয়। তেমনি আজকের আইনসভা অবস্থা-বৈগুণ্যে যা করছেন বা করতে বাধ্য হচ্ছেন, কালকের আইনসভা প্রয়োজন বুঝলে তা নাকচ করে দিতে পারেন। আসল কথা হল যাঁদের হাতে আজ বিচারের ভার আছে তাঁদের মধ্যে হিন্দীর অনুরাগীরাই ত সংখ্যাগুরু অংশ। যাঁরা তা নন তারাও কংগ্রেসপার্টির সভ্য হিসাবে সাময়িক দলীয় নীতির বিরুদ্ধে যেতে পারেন না। সাময়িক চাপে পড়ে তাঁরা একটা নীতি গ্রহণ করলেও, শেষ পর্যন্ত দলীয় নীতির কষ্টিপাথরে তার মূল্য যাচাই হবে। নীতিহিসাবে কংগ্রেস হিন্দীকে ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কোনো কোনো দলীয় নেতা হয়ত দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সঙ্কটকালে বিবেক ও যুক্তির ভিত্তিতে তাঁদের কর্মপন্থা ঠিক করবার সাহস রাখেন, তাঁদের কেউ কেউ হয়ত ভারত সরকারের ভাষা নীতির প্রতিবাদও জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা মুষ্টিমেয়। পার্লামেন্টের দিকে তাকিয়ে দেখুন, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান—এই চারিটি রাজ্যের প্রতিনিধিরা পার্লামেন্টে (লোকসভায় এবং রাজ্যসভায়) তাঁদের যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করেছেন তা প্রায় অপরিবর্তনীয়। এঁরা সকলেই হিন্দী চান। অথচ সত্যিকারের হিন্দীভাষা-ভাষীর মোট সংখ্যা অহিন্দী-ভাষীদের তুলনায় অনেক কম। কেউ কেউ বলেন,ভারতের ৪৫ কোটি নরনারীর মধ্যে প্রকৃত হিন্দীভাষীদের সংখ্যা ১৮ কোটির বেশী নয়। কেউ বলেন—হিন্দীভাষীরা ভারতের মোট অধিবাসীদের শতকরা ৩০ কি খুব বেশী হলে ৪০জন মাত্র। আসলে এঁরা যে তথাকথিত হিন্দী ভাষার কথা বলেন তাতে আছে নানা প্রকার আঞ্চলিক ভাষার সংমিশ্রণ। মগধী, ভোজপুরী, মৈথিলী, রাজস্থানী, তা ছাড়া উত্তর প্রদেশের উত্তরাংশের উর্দুবহুল হিন্দী ইত্যাদি ইত্যাদি—মোট কথা হিন্দী একটি একক বা single ভাষা নয়—এটি একটি যৌথপরিবার বিশেষ। নিজেদের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকলেও অহিন্দীভাষীদের সামনে তাঁরা একতাবদ্ধ। অর্থাৎ তাঁরা সকলেই প্রচার করেন যে তাঁরা হিন্দীভাষাভাষী। অতএব হিন্দীর মাধ্যমে দেশকে একতাবদ্ধ করবার ব্রত নিয়েছেন তাঁরা। আজ যদি বিরোধীদলের সমালোচনার উগ্রতায় তাঁরা এই ব্রত পালনের ব্যাপারটা স্থগিত রাখেন, তা সে প্রতিশ্রুতি দিয়েই হোক বা আইন মারফৎ হোক, যতদিন তাঁরা দেশের আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে বিরাজ করবেন ততদিন তাঁদের পশ্চাদপসরণ সাময়িকভাবে নতি স্বীকার ভিন্ন আর কিছুই নয়। তা ছাড়া, কোন্ নীতি অনুসারে প্রস্তাবিত সংশোধনী আইনে, ভারতের তিন-চতুর্থাংশ রাজ্যের আইনসভার মতকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে তাও ত ব্যাখ্যাত হয়নি। যদি একটিমাত্র রাজ্যের আইনসভাও হিন্দীকে কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হবার বিপক্ষে রায় দেন, কেন্দ্রীয় সরকার সেই আইনসভার মতকে উপেক্ষা করতে পারেন না। যুক্ত-রাষ্ট্রের এটি একটি প্রধান নীতি যে এর সংশ্লিষ্ট রাজ্য-গুলির রাষ্ট্রীক মর্যাদা সমান। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্য-প্রদেশ, ও রাজস্থান যদি বলেন যে হিন্দী কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারী ভাষা হিসাবে গণ্য হোক, তার এই অভিমত পশ্চিমবঙ্গের আইন সভা মানতে বাধ্য নন। কারণ এভাবে

যদি একটি রাজ্যেরই কণ্ঠরোধ করা যায় তা হলে আর পাঁচটি রাজ্যেরই বা কণ্ঠরোধ করা যাবেনা কেন। যেখানে অধিকারের প্রশ্ন আসে, সেখানে অনধিকারের প্রশ্নগুলি দৃঢ়ভাবে দমন না করলে শাসনযন্ত্র অচিরেই স্বৈরাচারে পরিণত হয়।

প্রশ্ন হতে পারে, যদি প্রতিশ্রুতিরও কোন মূল্য না থাকে, সংশোধনী আইনেরও কোনো মূল্য না থাকে, তা হলে ইতিকর্তব্য কি? কিসে বিরোধীপক্ষের সন্তুষ্ট হবে? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে দেখা যাক কেন্দ্রীয় সরকারের হিন্দী ভাষাকে একমাত্র সরকারী ভাষারূপে ব্যবহার করবার পিছনে কি কি যুক্তি আছে।

প্রথমেই মূল প্রশ্নে আসা যাক। সে প্রশ্ন হল, সারা ভারতে একটি মাত্র সরকারী ভাষা থাকবে, এই নীতির আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কিনা? ব্যাপকতর অর্থে প্রশ্ন করা যায়, ভারতে একটিমাত্র জাতীয় ভাষার প্রচলন সমর্থনযোগ্য কিনা? সরকারী ভাষা এবং জাতীয় ভাষা, এ দুইএর মধ্যে পার্থক্য আছে। জাতীয় ভাষা হল সমগ্র জাতির ভাষা, সরকারী ভাষা হল—যে ভাষায় সরকার জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন, যে ভাষায় সরকারী নথীপত্র লেখা হয়, চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হয়, আইন-আদালতের কাজ চলে। বৃটিশ আমলে ভারতে কোনো জাতীয় ভাষা ছিল না, কিন্তু সরকারী ভাষা ছিল ইংরাজী। সাধারণতঃ যেখানে জনসাধারণের মাতৃভাষা একই, অর্থাৎ ভাষাবৈষম্য নেই, সেখানে সরকারী ভাষা ও জাতীয় ভাষার মধ্যে পার্থক্য থাকে না। তবে যেখানে ভাষাবৈষম্য আছে, যেখানে একাধিক ভাষাভাষী লোকের সমাবেশ, সেখানে কোনো একটি বিশেষ ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষারূপে গণ্য করা বা কোনো একটি বিশেষ ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে ব্যবহার করা সহজসাধ্য নয়। অতএব তা করতে গেলে বিশেষ যুক্তির প্রয়োজন।

একভাষার সমর্থনকারীরা বলেন—ভারতের জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করতে গেলে একটিমাত্র রাষ্ট্রভাষা থাকবে, বাকি সব হবে প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ভাষা। যেহেতু হিন্দীভাষা ভারতবর্ষের সর্বাধিকসংখ্যক অধিবাসীদের ভাষা এবং সকলেই মোটামুটিভাবে এই ভাষা বুঝতে পারেন, স্বাভাবিক নিয়মে হিন্দীই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলেন, জাতীয়তার যতগুলি উপাদান আছে ভাষার একতা তার মধ্যে অন্যতম। এ ছাড়াও অন্যান্য উপাদানের মধ্যে আছে এক ধর্মীয়তা, বর্ণগাম্য (Common race), আচার অনুষ্ঠানের সমতা, সহাবস্থিতি, একই ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার ইত্যাদি। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এ কথাও বলেন যে—এর কোনোটিই জাতীয়তাবোধের অপরিহার্য অঙ্গ নয়। ভাষাগত ঐক্য থাকলে জাতীয়তাবোধের উদ্ভব অপেক্ষাকৃত সহজ হয় এ ত সহজ কথা। কিন্তু যদি তা না থাকে তা হলে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হবে না এ কথা বলা যায়না। ইতিহাসের নজির তো সম্পূর্ণ বিপরীত। কানাডা বা সুইজারল্যাণ্ডের জনগণ একাধিক ভাষাভাষী। কানাডার রাষ্ট্রভাষা দুটি, সুইজারল্যাণ্ডের তিনটি। এমন কি পাকিস্থানেও দুটি রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃত হয়েছে। অথচ এঁদের জাতীয়তাবোধ সম্বন্ধে কোনো মতবিরোধ নাই। সুতরাং জাতীয়তার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ভাষার একতা যে অপরিহার্য তা আমরা কেন মানবো? তাহলে তো বলা যায় যে ধর্মের একতাও জাতীয়তার একটি অপরিহার্য অঙ্গ এবং যেহেতু ভারতে হিন্দুধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ সংখ্যায় অধিকতম, অতএব হিন্দুধর্মকে রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় ধর্ম হিসাবে অভিহিত করা হোক। কিন্তু এখানে আমরা secularism বা ধর্ম-নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করেছি, সকল ধর্মকেই আমরা সমান চোখে দেখেছি, সরকার কোনো বিশেষ ধর্মকে প্রশ্রয় দেননি। অথচ হাতের কাছেই দেখা যাচ্ছে, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্থান ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র। যদি পাকিস্থানের ধর্মান্ধতা আমরা নিন্দা করি, ভারতবর্ষে ভাষা নিয়ে গোঁড়ামীই বা আমরা বরদাস্ত করব কেন?

আচ্ছা, ধরে নেওয়া গেল ভারতবর্ষে একটিমাত্র রাষ্ট্রভাষা থাকলে তা জাতীয় ঐক্যের অনুকূল হবে। ভারতবর্ষে ১৪টি ভাষা সংবিধানে স্বীকৃতি পেয়েছে। এর মধ্যে কোনটি সরকারী বা রাষ্ট্রীয় ভাষার যোগ্যতা অর্জন করেছে? সংবিধান বলেছেন, হিন্দী। কেন? কারণ, ভারতের অধিবাসীগণের বৃহত্তর অংশ হিন্দী ভাষাভাষী। যাঁরা হিন্দী জানেন না, তাঁরা সংখ্যায় অল্প, তাঁদের হিন্দী শিখে নিতে হবে। অবশ্য, প্রতিশ্রুতিমত, এখনই জোর জবরদস্তি করে অহিন্দীভাষীদের উপর হিন্দী চাপানো

হবে না। এর জন্য যতটা সময় প্রয়োজন তা দেওয়া হবে। সে ক'দিন সহযোগী ভাষা হিসাবে ইংরাজী চালু থাকবে। তবে মনে রাখতে হবে যে ইংরাজি চিরস্থায়ী-ভাবে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করতে পারে না—তার কারণ ইংরাজি জনগণের ভাষা নয়। তাছাড়া ইংরাজী ইংরাজের ভাষা, অর্থাৎ এ শুধু বিদেশী ভাষা নয়, এ আমাদের প্রাক্তন দাসত্বের প্রতীক। হিন্দী জনগণের ভাষা, শিক্ষিত অশিক্ষিত ভারতবাসীদের মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যা এই ভাষায় কথা বলে, এ ভাষা বোঝে। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে অন্য কোনো ভাষা এ ব্যাপারে হিন্দীর সমকক্ষ হতে পারে না।

আমরা এখন ভাষা সমস্যার কেন্দ্রস্থলে এসে পৌঁছেছি। যুক্তি দিয়ে যুক্তির খণ্ডন করা নিয়ম। এই যুক্তি-প্রতি-যুক্তির সংঘাতেই সত্যের পথ খুঁজে পাওয়া যায়। দেখা যাক, হিন্দীর স্বপক্ষে যে সব যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে তা কতদূর যথার্থ। পূর্বেই বলেছি ভারতের জাতীয় ঐক্য সাধনায় হিন্দীভাষার সার্বজনীন ব্যবহার একটা অপরিহার্য উপাদান নয়। কোনো রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ পণ্ডিত কোনোদিন স্বীকার করেননি যে ভাষা জাতীয়তার অপরিহার্য অঙ্গ। কোনো মনীষী কোনদিন বলেন নি যে, ভারতের ঐক্যসাধনা ভাষাভিত্তিক। যদি কোনো ভাষা অতীতে আমাদের এই সাধনার প্রধান উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে সে হল সংস্কৃত, হিন্দী নয়। দ্বিতীয়তঃ, সংখ্যাগরিষ্ঠতার যে যুক্তি, তাও তো সমর্থন-যোগ্য নয়। আমরা বিগত "সেন্সাস" (Census) বা আদমসুমারীর হিসাবে দেখি ভারতে হিন্দী ভাষাভাষীদের সংখ্যা ১৩ কোটি ৩৪ লক্ষ। মোট লোকসংখ্যার অনুপাতে এই সংখ্যার হার হল শতকরা ৩০। অর্থাৎ প্রতি তিনজন হিন্দীভাষীর স্থলে ৭জন অহিন্দীভাষী আছেন। এই অহিন্দীভাষী ভারতীয়দের মধ্যে যদি অর্ধেকসংখ্যক লোকও হিন্দীর বিরোধিতা করেন তা হলে সংখ্যাতত্ত্বের কোন্ হিসাবে হিন্দী ভাষাভাষীদের দাবী সমগ্র ভারত-বাসীদের মেনে নিতে হবে? এমন কি, তথাকথিত হিন্দীভাষী অঞ্চলগুলি থেকেও যদি মগধী, মৈথিলী, ভোজপুরী, ব্রজবুলি ইত্যাদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে হিন্দীর প্রাধান্য কোন্ পর্যায়ে নেমে আসে দেখতে হবে। যদি এই ভাষাগুলিকে হিন্দীভাষার গোত্র-পরিবারভুক্ত বলে মনে করা যায় তা হলে বাঙলা, ওড়িয়া, অসমীয়া —এগুলিকেও এক শ্রেণীভুক্ত বলা যায়। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মোটসংখ্যাও বড় কম নয়।

অবশ্য একথা মনেতেই হবে যে বর্তমান বাস্তব পরি-প্রেক্ষিতে হিন্দীকে বাদ দিলে ইংরাজীই হচ্ছে একমাত্র ভাষা—যা আমরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে সংযোগকারী ভাষা বা link language হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। এখানে ইংরাজীর স্বপক্ষে ও হিন্দীর বিপক্ষে আরেকটি যুক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। ইংরাজী যে আজ শুধু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে তা নয়, এই ভাষার মাধ্যমে আজ ভারতবাসী বিশ্ববাসীর সঙ্গে, বিশ্বের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে এবং দ্বিতীয়তঃ বাইরের জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, এই দুইটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, ইংরাজী ভাষা যদি সাফল্যের সঙ্গে গ্রহণ করে থাকে, তাহলে সে স্থলে ভারতের একটি আঞ্চলিক ভাষাকে অর্থাৎ হিন্দীকে (যাকে ভারতের বেশীর ভাগ লোকই রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করছেন) কেবলমাত্র ভারতের link language, করার সার্থকতা কি! ইংরাজির বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে এটি জনগণের ভাষা নয়। পারিভাষিক শব্দবিড়ম্বিত এবং সংস্কৃতশব্দবহুল হিন্দীভাষাই কি জনগণের ভাষা? এমন কি, সরল লৌকিক হিন্দীভাষাই কি দক্ষিণ ভারতের কোটি কোটি লোকের জনগণের ভাষা? সাধারণ লোকে কথাবার্তা বলে তাদের আঞ্চলিক ভাষায়, এই আঞ্চলিক ভাষাগুলি ভারতীয় রাজ্যগুলির সরকারী ভাষা হিসাবে গৃহীত হয়েছে, দেশের কোথাও কোনো প্রতিবাদ হয়নি। এইগুলিই সাধারণ মানুষের নিজ নিজ এলাকার জনগণের ভাষা। তাদের উপর আরেকটা জনগণের ভাষা সরকারী "হুকুমৎ" এই সাধারণ মানুষগুলির উপর চাপানোর প্রয়োজন কি? এ ক্ষেত্রে যদি সর্বভারতীয় link language হিসাবে ইংরাজির ব্যবহার চলতে থাকে এবং এই ভাষায় প্রকাশিত বিধি ব্যবস্থা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞপ্তি, প্রেসনোট ইত্যাদি প্রয়োজনস্থলে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় অনুদিত করবার ব্যবস্থা থাকে তা হলে ভারতবাসীকে দুটিভাষা—ইংরাজী

ও আঞ্চলিক ভাষা—বিদেশই তার মোটামুটি কাজ চলার পথে কোনো বাধা থাকবেনা। যদি তৃতীয় ভাষা শেখবার দরকার হয় তা হলে সে ভাষা হবে সংস্কৃত, হিন্দী নয়, এবং যদি সুদূর ভবিষ্যতে কোন ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার যোগ্যতা থাকে তা হবে সংস্কৃত ভাষা, কারণ এই দেবভাষাই ভারতের প্রকৃত মাতৃভাষা।

ইংরাজির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আরেকটি কারণ হল—এটি বিদেশী ভাষা। যে দেশের নিজস্ব এতগুলি ভাষা আছে সেখানে এই বিদেশী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা বা সম্মান দেওয়া হাস্যকর। এই প্রস্তাব না কি দাসত্বভাবাপন্ন মনের পরিচায়ক!

ইংরাজিতে একটি কথা আছে: inferiority complex। স্বাধীন ভারতের অধিবাসী আমরা যদি আজ মনে করি, ইংরাজিভাষার ব্যবহার দাসত্বমনোভাবাপন্ন অভ্যাস, তা হলে আমাদের এই inferiority complex-এরই পরিচয় পাওয়া যায়। বহু বিদেশী রাজ্যে আজ ইংরাজিভাষা সেখানকার বিদ্যালয়গুলিতে আবশ্যিক ভাষা হিসাবে শেখানো হয়। রাজা রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত, যাঁরা ভারতের নব-জাগরণের পুরোধা, তাঁরা সকলেই ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। আমাদের সাহিত্যস্রষ্টাদের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। ঊনবিংশ শতকের সাহিত্যরথীরা প্রায় সকলেই ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর মধ্যে কেউ কেউ আবার বিদেশী রাজ সরকারের গোলামী করে গিয়েছেন। আজ কি আমরা বলবো, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, ঈশ্বরচন্দ্র, রমেশচন্দ্র এঁরা দাসত্বমনোভাবাপন্ন ছিলেন? এঁরা সাধারণ ভারতবাসীর কণ্ঠে ফুটিয়েছেন বন্দেমাতরমের ধ্বনি, জাগিয়েছেন সংগ্রামী চেতনা। আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের ভাব ও ভাষা, সংগ্রামের আদর্শ ও টেকনিক—সবই ত ইংরাজদের গণতান্ত্রিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। সাহিত্যে শেক্সপীয়র, মিলটন, মেকলে, বার্ক—এঁরা কি কেবলমাত্র ইংরাজের সম্পত্তি? বিজ্ঞানে নিউটন, কেলভিন, ক্যাথাডে—এঁরা কি স্বাধীন ভারতে অপাংক্তেয়? তাঁদের কি হিন্দীভাষার গঙ্গাজলে শুদ্ধ করে না নিলে তাঁরা হবেন অপাঠ্য? এতো দেখছি স্বাধীনতার নামে নূতন ধরণের ফ্যাসীবাদের উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে! হায় ভারতমাতা, শাশ্বতকাল থেকে তুমি তোমার উদার বক্ষে নানাজাতির নানা ভাবপ্রবাহকে ধারণ করে এসেছ, তাদের একাত্ম করে নিয়েছ, তোমার সেই মাতৃরূপকে বিশ্ববন্দনার মাধ্যমে আমরা দেখতে পেয়েছি, যে ছিল পর সে হয়েছে আপন, যে ছিল শত্রু সে হয়েছে মিত্র, ভেদাভেদের সীমারেখা তুমি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছ, বহুর মধ্যে একের ঐশ্বর্য দেখেছ, আজ তোমার সন্তানেরা তোমাকে বিশ্বের আত্মরণপ্রাঙ্গণে তোমাকেই কি না একঘরে করে দিতে চায়!

শুধু তাই নয়। এই "যে আরেজী হটাও" জিগীর, এর সঙ্গে যদি আমরা আজ কণ্ঠ মেলাই তা হলে তার ফল কি হবে ভেবে দেখা দরকার। দিল্লীর সরকারী মহলের চিন্তাধারায় সর্বভারতীয় ভাষারূপে মাত্র দুটি ভাষা স্থান পেয়েছে: ইংরাজী ও হিন্দী। এই দুটির মধ্যে ইংরাজী যদি দূর হয় তা হলে হিন্দীর পথ হবে নিষ্কণ্টক। হয়ত তাও মেনে নেওয়া সম্ভব হোতো, যদি হিন্দী ভাষার সেই গুণগরিমা, সেই সৃজনী প্রতিভা থাকতো—যা আমরা পাই ইংরাজীতে বা অন্যান্য প্রগতিশীল ভাষাগুলিতে। সারা ভারতে বোধকরি একমাত্র বাঙলাভাষাই এই সব ভাষার সমকক্ষতা দাবী করতে পারে। এটা কি একটা নেহাৎ কাকতালীয় ব্যাপার যে বিশ্বের দরবারে যে ভারতীয় সাহিত্যিক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সঙ্গে একাসনে বসবার অধিকার পেয়েছেন তিনি বাঙালী? অন্যান্য প্রতিভাধর ভারতীয়রা, যাঁরা আন্তর্জাতিক সম্মান পেয়েছেন, তাঁদের সকলেরই ভাষার মাধ্যম ছিল ইংরাজী। আমরা বাঙলা ভাষার প্রতি কোনোপ্রকার পক্ষপাতিত্ব করতে চাইনা তবে একথা বলতে চাই যে, যে ভাষার ভাবসম্পদ নেই, যে ভাষায় প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি কিংবা হয়ে থাকলেও যা অত্যন্তই নগণ্য, যার ব্যাকরণ শিক্ষার্থীর মনে বিভীষিকা না হোক্ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে, যে ভাষার ইংরাজী বা অন্যান্য আধুনিক ভাষা গুলির সঙ্গে শ্রেণীগত পার্থক্য আছে, কি ভরসায় আমরা সেই ভাষাকে অর্থাৎ হিন্দীকে, জাতীয়ভাষা বলে গ্রহণ করবো? কিসের তাড়নায় আমরা এই প্রকার জাতীয় আত্মহত্যার পথ স্ব-ইচ্ছায় বেছে নেব? যখন ইংরাজ-প্রমুখ বহু য়ুরোপীয় জাতিই ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষার

মাধ্যমে সাংস্কৃতিক চর্চা করতেন—আজও তাঁদের ভাষার শব্দসম্ভার বহুল অংশেই গ্রীক এবং ল্যাটিনের কাছে ঋণী—কই, তাঁরা ত তখন মনে করেননি, কেন এই বিদেশীভাষা অবশ্যপাঠ্য হবে, কেন তাঁরা তাঁদের খাঁটি গ্রাম্য ভাষার বিদ্যাচর্চা করবেন না? তাঁরা গ্রীক ও রোমান সভ্যতার এই অবদানকে অকুণ্ঠচিত্তে বরণ করে নিয়েছিলেন। ভাষার এই উদারতা এবং নমনীয়তা থাকলে তবেই তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। এ দিকে হিন্দী আজ নিতান্তই পশ্চাদ্‌পদ।

আমাদের এই আলোচনার সারাংশ হল যে, হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করবার, অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের হিন্দীভাষাকে একমাত্র সরকারী ভাষারূপে ব্যবহার করবার সমর্থনে যে সব যুক্তি দেখানো হয়েছে তার কোনো সারবত্তা নেই। তা সত্ত্বেও আজ যদি হিন্দীকে ভারতের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গণ্য করতে হয় সে হবে গায়ের জোরে। এই গায়ের জোরের খেলায় অংশ নেবেন সুবিধা বাদীর দল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন :

"পার্থক্য যেখানে সত্য, সেখানে সুবিধার খাতিরে, বড়ো দল বাঁধিবার প্রলোভনে, তাহাকে চোখ বুজিয়া লোপ করিবার চেষ্টা করিলে সত্য তাহাতে সম্মতি দিতে চায় না। চাপা দেওয়া পার্থক্য ভয়ানক একটা উৎপাতক পদার্থ, তাহা কোনো না কোনো সময় থাকা পাইলে হঠাৎ ফাটিয়া এবং ফাটাইয়া একটা বিপ্লব বাধাইয়া তোলে।" (রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ৪৭১)

আজ কৃত্রিম উপায়ে ভাষার সমতা আনতে গিয়ে আমরা একটা আত্মঘাতী পলিসি গ্রহণ করবার জন্য উদ্যত হয়েছি। জাতীয় ঐক্যের নামে আমরা যা করতে চলেছি তাতে কেবলমাত্র বিরোধের সৃষ্টি হচ্ছে। এই সেদিনও জাতীয় আন্দোলনের দিনে ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে একাত্মবোধ দেখা দিয়েছিল, আজ সেখানে দেখা দিয়েছে সন্দেহ, অবিশ্বাস, বিভেদমূলক মতের উদ্‌গ্রতা। আজ ভারতবর্ষ আপৎকালীন অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছে। এই অবস্থায় প্রয়োজন সেই হারিয়ে-যাওয়া একাত্মবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, প্রয়োজন জাতীয় সংহতি। ভাষানীতি নিয়ে যে তর্কের ঝড় উঠেছে তাতে মানুষের শুভবুদ্ধি বিভ্রান্তির ধূলিতে সমাচ্ছন্ন।

এই বিভ্রান্তির অপসারণ হবে তখনই—যখন ভারতীয় সংবিধানের সপ্তদশ অধ্যায়টি সম্পূর্ণভাবে সংশোধিত হবে। সংশোধিত সংবিধানে এই কথা থাকবে যে যতদিন না ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে কোনো একটি ভাষা তার নিজস্ব ঐশ্বর্যে এবং পরম্পরাধারায় তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারছে ততদিন সংবিধানের প্রবর্তনকালে যে দ্বিভাষা ছিল তা বজায় রাখা হবে। আমরা পূর্বেই বলেছি যে বর্তমান অবস্থায় মহিসভার বা মুখ্যমন্ত্রীদের প্রতিশ্রুতি, অথবা সরকারী ভাষা আইনের সংশোধন, এই দুই-এর কোনোটিই গ্রহণীয় নয়। ইংরাজি ভাষার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও ভারতীয় ভাষাগুলির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টা—হয়ত বা সবগুলিকেই জাতীয় ভাষার মর্যাদায় উন্নীত করা—এটাই হবে ভারতীয় ভাষা সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। ১৯৪৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর গণপরিষদে শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন তার থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আজ এই প্রবন্ধের উপসংহার করছি।

"India has been a country of many languages. If we dig into the past we will find that it has not been possible for anybody to force the acceptance of one language by all people in this country. Some of my friends spoke eloquently that a day might come when India shall have one language and one language only. Frankly speaking, I do not share that view, and when I say so, I am not ignoring the essential need for creating that national unity of India which must be the foundation stone in our future reconstruction. That unity must be achieved by allowing those elements in the national life of our country, which are to-day vital, to function, with dignity, in harmony and in self-respect. To-day it stands to the glory of India that we have so many languages from the north to the south, from the west to the east, each one of which, in its own way, has made contributions which have made what Indian life and civilization are to day. If it is claimed by anyone that by passing an article in the constitution of India, one language is going to be accepted by all by a process of coercion, I say, Sir, that that will not be possible to achieve." (Constituent Assembly official Report.) vol IX, No 33, p 1389.)

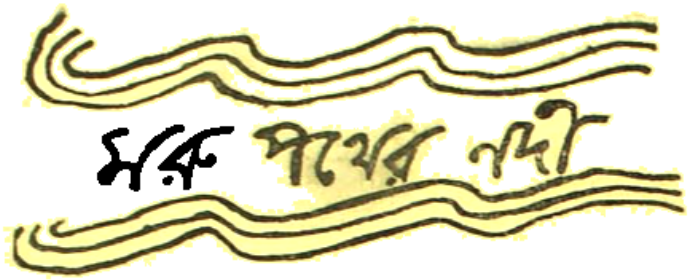

মন্মথ রায়

এই অন্ধকার রাত্রির ঘোরা পৃথিবী যেন তার সামনে একটা ঝাপসা পথ খুলে দিল। বহুদূর বিস্তৃত। দীর্ঘ ছত্রিশ বছরের একটানা পথ। অনেক সুখ দুঃখের অনুভূতি। সময়ের উদাসিন নিঃস্তব্ধতায় গা ডুবিয়ে আছে। পিছন ফিরে তাকালে, আশ্চর্য্য—সেই পথের শেষটুকু তালগোল পাকিয়ে যেন অস্পষ্টতার মধ্যে লেপটে রয়েছে। বিচিত্র আলো অন্ধকার। তার মধ্যে কতকগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনার আলগা বুননিতে গোটা জীবনের কাহিনী। ছোট্ট পরিসরের মধ্যেই তা শেষ হয়ে যায়। স্মৃতি কতটুকু ধরে রাখতে পারে। যেটুকু ধরে রেখেছে, তার মধ্যে সুখ নেই, দুঃখ নেই, বেদনা নেই। যে অভিমানের আগুনে সমাজ সংসারের বিরুদ্ধে ইন্দ্রিয়গুলো হিংস্র হয়ে উঠতো, স্মৃতির মধ্যে ডুব দিয়ে সেই বিষও আর খুঁজে পেলেন না চারুশীলা। বারুণীতলার চৌধুরীদের ছ'আনা সরিকের বাড়ী কুরু-পাণ্ডবের পালা হয়েছিল। রং দেখে পোষাক এঁটে কতকগুলো লোক এসেছিল। তাদের কথা বলে চলে গেছে। তার জীবনেও তেমনি অনেক মানুষ এসেছে—গেছে। তারা কি বলেছে, কি বলেনি, তার কোন প্রয়োজন নেই। যেটুকু স্মৃতিতে খোদাই হয়ে রয়ে গেছে, সেইটুকুই কাহিনী। সেই কাহিনীতেও কে যেন পেন্সিলের মোটা দাঁড়া টেনে অনেকগুলো লাইন মেগে রেখেছে। সেই লাইনের বাইরে বাকী ঘটনাগুলো খুঁজে বের করেও ক্রমবাহিকতায় সাজানো যায় না। আর তাতে কিছু এসেও যায় না। নিঃসঙ্গ শয্যায় শুয়ে শুয়ে জীবনের চল্লিশ বিয়াল্লিশটি বছরের আলো অন্ধকার পথে চারুশীলা দেবী কিসের প্রয়োজনে হেঁটে এলেন সে কথাও তিনি জানলেন না। কেবল এইটুকু মনে হ'ল, এই প্রাচুর্য্যের মধ্যে এসেও তিনি সুখী নন। শান্তি পাচ্ছেন না। কি যেন হারিয়ে গেছে। হিসাবে গরমিল হচ্ছে।

সেই মানুষটার অভাব অনুভব করলেন চারুশীলা। এই সংসার যাকে কেন্দ্র করে গেলেছে—বেঁধেছে। কিন্তু তার চরম অমানুষিকতা? উদর স্বার্থতার দিকে সেই কি তাকে ঠেলে দেয়নি? তারপর যখন দরজার দিকে তাকালেন, চার দেওয়ালের বন্ধনীর মধ্যে চোখের দৃষ্টিতে গোটা ঘরটাকে একবার মেপে নিলেন, ছায়া ছায়া স্মৃতি পথে মনে হল, তার জীবনের প্রত্যাশার তীরে সেই লোকটি অনেককাল বেঁচে ছিল। অবশেষে যখন মরে গেল, কিংবা বেঁচে মরে রইল,—একটি বিষাক্ত বুভুক্ষু নিঃশ্বাস সে রেখে গেল। এবং সেই নিঃশ্বাসে তার জীবনবোধে আকণ্ঠ তৃষ্ণাকে তিনি পরাস্ত করতে পারেন নি! আজন্ম সংস্কার, বুদ্ধি-যুক্তি সমস্তই ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। সেই তৃষ্ণার অতৃপ্তি আজও বেঁচে আছে কিনা তারও কোন নিশ্চিত জবাব তিনি জানেন না।

চারুশীলা পাশ ফিরে শুলেন। নিজের অজান্তেই ডান হাতখানা পাশে বাড়িয়ে দিলেন। এবং হঠাৎ যেন আবিষ্কার করলেন—এই খাটে তার পাশে আরেকজন মানুষ ঘুমোত। সেই মানুষটিকে স্পষ্ট করে ভাবতেও চাইলেন না। শুধু মনে হল, যদি আরেকটি মানুষ ঘুমোত তার বুকের উপর নিজের ডান হাতখানা এই ভাবে এলিয়ে দিতেন।

মহিষের কোলের ছেলে ট্যাঁ ট্যাঁ করে কেঁদে উঠেছে। বাড়ীটার অপর অংশে মহিষের সংসার। এই গৃহ এবং

মহিমকে এক সঙ্গে মিলিয়ে ভাবতেও অস্বস্তি উপস্থিত হয়। চারুশীলার হৃত অধিকারে জবরদখল সূত্রে ওয়ারিশী কায়েম করে মহিম যেন জেঁকে বসেছে। তাকে অস্বীকার করতেও পারেন না। হিংস্র চিত্তবৃত্তি মহিমকে যেন দংশন করতে চায়। আর বহু দিবসের অন্তরাল হতে উপেক্ষার নিঃশব্দ হাসি বাতাসের সঙ্গে মিশে গাছের পাতায় পাতায় সঞ্চারিত হয়ে উঠে। তিনি শঙ্কিত হ'ন। সঙ্কুচিত হ'ন। মনে হয় এখানে তার কোন অধিকার নেই। মাধবনাথ তাঁর সমস্ত দাবী উচ্ছেদ করে দিয়ে গেছেন। আর তিনি নিজেও তা অনেক আগেই চুকিয়ে ফেলেছিলেন।

ভাবতে গিয়ে মাধবনাথ, মহিম, সুদর্শন এবং বিশ্ব সংসারের সমস্ত কিছুর উপর তার ঘৃণা ছড়িয়ে যায়। নিজেকেও এই মুহূর্তে তিনি ঘৃণা করেন। শেওলার মতই যেন ভেসে যাচ্ছিলেন। কোনদিন নিজেকে জানতেও চেষ্টা করেন নি। আজ মনের আরশীতে নিজেকে যখন দেখলেন, এই ঘর, তাঁর পূর্ব্ব পরিচয়, নিষ্ফলতা ও অতীতের মধ্যে নিজেকে জানবার অনুসন্ধিৎসু বুদ্ধি পথ হারালো। মনে হ'ল তিনি যেন আর বেঁচে নেই। তাঁর ইহলৌকিক সত্তা বলতে যেন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। কোন প্রেত-লোকের নির্ব্বাসন থেকে বিধিবহির্ভূত উপায়ে এখানে পৌঁছে গেছেন। এখানকার আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং রুচি-শীলতার নিরিখে তাঁর কোন দাবীই প্রতিষ্ঠিত হয় না। তবু যা তার নয়, অথচ যা কেন্দ্র করে তাঁর বহু দিবসের ব্যর্থতার কোভ নির্গত হয়ে এসেছে, এক ঈর্ষাপীড়িত চরি-তার্থতাবোধ সবলে তাকে জড়িয়ে ধরতে চায়।

চারুশীলা দেবী তৃপ্ত পান না। দীর্ঘ বত্রিশ বছর বাদে নিজের বিয়ের খাটে শুয়েও সান্ত্বনা নেই। পরিচ্ছন্ন শয্যা। এমনটীতে তিনি দীর্ঘকাল অভ্যস্ত নন। প্রতি মুহূর্ত্ত যেন তাকে অস্বস্তির খোচা দিচ্ছে। যেন বেশ আরামে থাকতেন ওয়াগনের নীচে সেই আশ্রয়ে। ন্যাকড়া আর ছিন্ন কাঁথায় গা জড়িয়ে পড়ে থাকতেন। তারা এখনও শুয়ে আছে। অন্ধ গণশা এখনও হয়ত নিজের মনে কথা বলছে। তরুণ আর বাতাসী বোষ্টমী তাদের ছেলেমেয়েদের মেয়ে মেয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে। অন্ধকারে বসে ঘাগুলোয় হয়ত তেল লাগাচ্ছে কৃপানাথ। ঘুলো বৈকুণ্ঠের পাতানো-বৌ তুলসী গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে খোড়া কেষ্টর সঙ্গে ফিসফাস করছে। সময় নেই অসময় নেই দু'জনাতে ফিসফাস করে। বৈকুণ্ঠ তাদের কথা শুনতে পায়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। তার চোখে কাতরতা ফুটে উঠে। যৌবন চারুশীলা পার হয়ে এসেছেন। যৌবনের উত্তাপ আর নেই। কিন্তু গ্লানি থেকে তিনিই কি মুক্ত! সব ভেসে গেল। কত আশা ও সম্ভাবনার মধ্যে তিনি জীবন সুরু করেছিলেন। সাধের মুকুলগুলি দিনে দিনে শুকিয়ে গেল।

সেদিনের কথা এখন ও তার মনে পড়ে। নাকটা বাঁকা হয়ে উঠছে। আংনায় বেশ কিছু দিন লক্ষ্য করে-ছিলেন। তার স্বামী মাধবনাথ ঘোষাল প্রায়ই জিজ্ঞেস করতেন কেন এমন হচ্ছে। কিছুদিন বাদে পায়ের নখের ডগায় চামড়া গোলাপী হয়ে উঠলো। তখনও ভয় ভাবনা আসেনি। চামড়া ঘরে যখন ঘা বেরুল মাধবনাথ ব্যাপারটাকে হেলা করতে পারলেন না। গ্রামের বটুক কবিরাজ নিজে ইঁকি মাপে চুনসুরকি মিশিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে দূরে গেলেন। মাস খানেক বাদে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ-করা রামময় ডাক্তারকে এনে কলে ধরিয়ে রোগটা সবাই জেনে গেছে। জোর দিয়ে ঘোষণাই শুধু বাকী।

সন্দেহাতীত ভাবে রোগের নামটা ঘোষণা করে গেলেন রামময় ডাক্তার।

সেদিনের কথা চারুশীলার মনে আছে। সেকালে একালের মত ছিল না। গুরুজন এবং বাইরের লোকের সামনে বুক অবধি ঘোমটা টেনে বেরুতে হতো। চলতে হতো মাথা হেঁট করে। নিজের পায়ের নখের দিকে তাকিয়ে। কথা বলার রেওয়াজ ছিল না পুরুষমানুষের সামনে। একান্ত প্রয়োজনে যখন বলতেই হ'তো, অনুচ্চ কণ্ঠের আওয়াজ নিজের কানে পৌঁছাত কিনা সন্দেহ।

শোবার ঘরে ডাক্তারে মুখ থেকে মাথা হেঁট করে দালানে পালিয়ে গেলেন চারুশীলা। শাশুড়ী ব্রজবালা ঠাকরুণ ঘরে গেলেন। ডাক্তারের মতামত নিজের কানে শুনে আসবেন বলে হাতে নিয়ে রামময় ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন। আর শোবার ঘরেই শাশুড়ীর আর্ত্তনাদ শোনা গেল।

চারুশীলা শুনতে পেয়েছিলেন শাশুড়ী বিলাপ করছেন।

"তোর যে আমি সর্ব্বনাশ করে ফেলেছি বাবা। পাওটা নয়, পাঁচটা নয়, আমার যে একটাই মাণিক। আবাগীর বেটা ছেলে শুনে এই খাসী হতভাগীকে আমার সোনার টুকরো ছেলেটার কাঁধে চাপালে। আমার যে সর্ব্বনাশ করে ফেলেছে যে……

চারুশীলা শুনলেন। অসুস্থ শরীর নিয়ে মনময়া ভাবনায় এমনিতেই আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। ডাক্তার শাস্ত্রীয়তি কিছু বলে গেছে আশঙ্কায় শিউরে উঠলেন। বাড়ীর বিলাপ আর অভিশাপের মুখে প্রতিবাদ করা দূরে থাক জিজ্ঞেস করবারও সাহস হল না। কিন্তু তিনি বুঝলেন নিয়তির হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে গেছেন। ভগবানের দরবারে এমন কি অপরাধ করেছেন সে দিন ভেবেছিলেন। জবাব পাননি। অসুখ হওয়া মানুষের অপরাধ কিনা সেই সংশয় ও থেকে গেল।

ব্রজবালা ঠাকরুণ কিন্তু পরলোকগত বেহাইএর উদ্দেশ্যে বিশেষণ বর্ষণ করেই ক্ষান্ত হলেন না। দালানে এসে চারুশীলাকে সামনে পেয়ে হাঁচলটা কায়দা করে জড়িয়ে তেড়ে এলেন রণ-চণ্ডী ভঙ্গিমায়। গালে চোনা মারতে গিয়ে চুমু খেয়ে ফেলবেন ভয়ে হঠাৎ হাতটা টেনে নিলেন।

ব্রজবালা ঠাকরুণ সে দিন যে সব বিষ-বাক্য তাঁর উদ্দেশে ছুড়ে ছিলেন চারুশীলার আজকে আর মনে নেই। নেড়ে চুঁদে পাড়া প্রতিবেশীর টনক নড়িয়ে সমস্ত বাড়ীটায় একটা কুরুক্ষেত্র পালা জুড়ে দিয়েছিলেন। চারুশীলার মনে আছে, সে দিন থেকে শোবার ঘরে তাঁর ঠাঁই হয়নি। দালানের উত্তর কোণে তার সম্মুখে গোটা দুই ছেঁড়া কাঁথা ফেলে দিয়েছিলেন ব্রজবালা। তার মধ্যে একা একা মুখ গুজে সেই রাতটা এবং আরেকটা রাত কাটিয়ে ছিলেন চারুশীলা। ভীষণ জ্বর করছিল। অনেক রাত অবধি কেঁদে ছিলেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

চারুশীলা বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। সেই ষড়যন্ত্র থেকে মাধবনাথও নিঃসম্পর্ক নন। তাঁর সতর বৎসরের নব-পুষ্পিত যৌবন। সাধ আশা অপরিসীম। স্বামীকে ভালবেসেও ফেলেছিলেন। অধিকার বোধের অটল বিশ্বাস। মমতা। গৃহ থেকে স্বামী তাকে ঘৃণায় ও উপেক্ষায় বিতাড়িত করবেন এতটা নিষ্ঠুরতা কল্পনায় ঠাঁই পায় নি।

কিন্তু তৃতীয় দিনে সহরে যখন বুধো মোড়লের ছই-ওয়ালা গরুর গাড়ী এসে দাঁড়ালো, ছোটকী কি কাঁচানো দশ গজ থান পরে সমস্ত বাড়ীময় ছুটাছুটি জুড়ে দিলে, আর পরাণ মোদক চারুশীলার বিয়ের লাল তোরঙ্গখানা গাড়ীতে তুলে দিয়ে এলো, আশঙ্কায় ও অভিমানে চারুশীলার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেতে বসেছে। তিনি কিছুতেই যাবেন না, এই অটল সিদ্ধান্তে ছেঁড়া কাঁথাগুলি আকড়ে স্থির হয়ে বসলেন।

ব্যাপারটা শান্তভাবেই সমাধা করে ফেলতে চেয়েছিলেন ব্রজবালা। তাড়া দিয়ে বললেন, "গাড়ীতে গিয়ে উঠে বস বৌমা। এতটা পথ বুধোকে আবার ফিরে আসতে হবে।"

"আমি কোথাও যাব না মা।"

"ছিঃ অবুঝের মত কেন কথা বলছ। মার কাছে গিয়ে থাক। অসুখ সারিয়ে আবার আসবে।"

"অসুখ যদি সারে এখানে থাকলেও সারবে মা।"

"এখানে তোমার সেবা-আত্তি কে করবে। আমি এ সব পারি নে। আর নিজের মার মত কে করে।"

ব্রজবালার মিষ্টি উপদেশ চারুশীলাকে সংকল্প থেকে টলাতে পারেনি। বেশিক্ষণ ধৈর্য বজায় রাখতে পারেন নি ব্রজবালা। জ্বলে উঠেছেন।

"বাবিনে কিলো হাড়-হাভাতের মেয়ে। শ্বশুরের ভিটে উৎসন্নে পাঠাতে এয়েছিস। ভালোয় বলছি গাড়ীতে গিয়ে বস। নইলে মুখে জুতো মেরে তাড়াব।"

দুর্ভাগ্যের ঘেরে পড়ে মনে শক্তি পেয়েছিলেন চারুশীলা। মায়ের একমাত্র মেয়ে। বাপের শেষ বয়সের সমস্ত আদর নিঙড়ে আদায় করেছেন। জাত, তারও কম নয়। ফোঁস করে উঠেছিলেন। "এ্যা, জুতো মেরে তাড়াবেন। দেশে যেন আর মানুষ নেই। এ আমার শ্বশুরের ভিটে। আমার পুরো হক্। তাড়াক দেখি, কে তাড়ায় আমাকে।

"কথার তেজ দেখ না। তোর শ্বশুরের ভিটে, আর আমরা বুঝি বাপের জলে ভেসে এসেছি। এ আমার বাড়ী। আমি তাড়াব।"

"আপনার বাড়ী আমি বেচে আসিনি। শালগ্রাম

সাক্ষী রেখে সারা জীবন ঘোর ঘোর দেবে প্রতিজ্ঞা করে এনেছে। সে এসে বলুক দেখি—কত বড় মুখ।"

বল-প্রয়োগের স্তর পর্যন্ত যেতে ব্রজবালার হয়ত কোন দ্বিধা ছিল না। কিন্তু ছোটকী কি তাকে ডেকে নিয়েছিল। উঠানের একপাশে দাঁড়িয়ে দু'জনে মিলে পরামর্শ করেছিলেন।

ব্রজবালা আর আসেন নি। এসেছিলেন মাধবনাথ। বিদায়ের দৃশ্য দেখবার অভিরুচি হয়ত তার ছিল না। সকালবেলা থেকেই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এসে দাঁড়ালেন। অপরাধীর মত। ভিজে গলায় বললেন, "মাকে নাকি তুমি যা তা বলেছ চারু?"

"অন্যায় কিছুই বলিনি। আমার শ্বশুরের ভিটে,—এখানে কেন আমি থাকতে পারব না।"

কেঁদে ফেলেছিলেন চারুশীলা। মাধবনাথের চোখ দু'টীও ছলছল হয়েছিল। আশ্বাস দিয়েছিলেন মাধবনাথ।

"থাকতে পারবে না কে বলেছে। একটু সেরে উঠলেই নিয়ে আসব।"

"আর যদি না সারে?"

"সারবে না কেন? অসুখ কি আর না সারে। তোমাদের জাতি এতবড় ধন্বন্তরি। তিনি চিকিৎসা করবেন। সারতে ক'দিন।"

"কিন্তু লোকে যে বলে এ ব্যারাম সারে না?"

"তোমাকে মিথ্যে ভয় দেখায়। আমি বলছি সেরে যাবে।"

মাধবনাথকে অবিশ্বাস করতে পারেন নি চারুশীলা। শাশুড়ীর মত তিনি রূঢ় নন। কণ্ঠে কত মমতা। মুখ তুলে পূর্ণ-দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন মাধবনাথের মুখে। সেখানে যেন আশ্বাস পেয়েছিলেন।

"তুমি বলছ সেরে যাবে?"

"হ্যাঁ। নিশ্চয়।"

চারুশীলার মনে আছে, দু'চোখ ভরে দেখেছিলেন মাধবনাথকে। ফর্সা গায়ের রং, উন্নত নাসা, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহখানি। অনুভব করেছিলেন এই মানুষটির জন্য সংসারে এমন কোন কঠিন ক্লেশ স্বীকার নেই, যা তিনি করতে পারেন না। মাধবনাথের চোখের দৃষ্টিতে যেন তিনি সম্মোহিত হয়ে গেছলেন। বলেছিলেন, "বেশ, আমি যাবো। কিন্তু তুমি আমায় ভুলে যাবে না?"

"না, না, কখ্খনো না।"

মাধবনাথের কণ্ঠে আবেগ কেঁপিয়ে উঠেছিল এবং চারুশীলার অন্তরের কোন গভীর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এক-সুরে গিয়ে মিশেছিল।

চারুশীলা বলেছিলেন, 'বল, তুমি আবার বিয়ে করবে না?"

"না।"

"গা ছুঁয়ে বল!"

কুণ্ঠিতভাবে ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়েছিলেন মাধবনাথ। গা ছুঁয়েছিলেন। বলেছিলেন, তোমার জন্য আমি সারাজীবন অপেক্ষা করব চারু। আর বিয়ে করব না।···

এই প্রতিশ্রুতির মধ্যে অন্তহীন সুখ অনুভব করেছিলেন চারুশীলা। মাধবনাথের দৃষ্টি, স্পর্শ, এই সামান্য কয়টি কথা—এতেই যেন তার জীবন পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বিশ্ব সংসারে এর অধিক যেন কেউ পায় না। চারুশীলা আর আপত্তি করেন নি। গাড়ীতে গিয়ে বসেছিলেন।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে গরুর গাড়ী মাঠের কাঁচা রাস্তায় পড়তেই শূন্যতায় বেদনায় মন ভেঙ্গে পড়েছিল। তিনি কেঁদেছিলেন। আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তি আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল। অশ্রু-বেগ অনেক দূর রাস্তা অবধি থামাতে পারেন নি।

সেদিনের স্মৃতি স্মরণ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন চারুশীলা। নিজেকে নিয়ে কোন উচ্চ অনুভব আর অবশিষ্ট নেই।

দূরে কোথায় একটা শঙ্খচিল ডেকে উঠলো। এই সংকেত ধ্বনির সঙ্গে তার আজন্ম পরিচয়। দুইপ্রহর রাত। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ সবে উঠলো। সমস্ত উঠান জুড়ে বাড়ীটার ছায়া। চারুশীলার ঘরে আলো এসে পড়েনি। পশ্চিমের ঘেউড়ির মাথায় বাঁকা হয়ে চাঁদের আলো পড়েছে। চাঁদের আলো নিয়ে চারুশীলার কোন আকুলতা নেই। বহু রাত্রি উন্মুক্ত আকাশের নীচে জ্যোৎস্নায় তিনি ঘুমিয়েছেন। বরং অন্ধকার তিনি ভালবাসেন। আকাশের তলায় দগদগে ঘাগুলো অন্ধকারে

দেখা যায় না। তার অস্তিত্বে যে গ্লানি ও কদর্য্যতা অন্ধকার সেই পরিচয়কে ঢেকে দেয়।

অনেক রাত্রি হল। চোখে ঘুম আসে না। অভ্যস্ত জীবনের ব্যতিক্রমের অস্বস্তি।

এ ঘরে তিনি একা! এ ঘরে নয়—বাড়ীর এই অংশে। বুক উঁচু বাঁশের বেড়া দিয়ে উঠান ভাগ করে এই ঘর সম্বেত তাকে আলাদা করে দিয়েছে! সমান ভাগ নয়। নক্সে চড়ে বেড়াবার মত সামান্য একফালি জায়গা। মহিম বলেছে, সরিকানা বাটোয়ারার মত চুল চিরে ভাগ করবার কি দরকার মা। আমাদের এতগুলো মানুষ, হরদম পা মেলার জায়গা চাই। আপনারও হলো, আমাদেরও হলো। অসুবিধে হয়, আরও দু'হাত বরং বেড়া পিছিয়ে নেব।

না, তার অসুবিধে হয় না। বড় উঠানে কি হবে? শুধু শূন্যতার পরিধি বাড়বে। মানুষের কথা, পায়ে চলার শব্দ থেকে আরও দূরে সরে আসবেন। নির্জ্জনতার নির্কাসনে নিজের অবাঞ্ছিত অস্তিত্বের সচেতনশীলতা প্রত্যক্ষতর হয়ে উঠবে। ঘর দোর জায়গা জমিতে কি আর হবে। জীবন প্রায় কাটিয়েই দিয়েছেন। কাকায়, বে-ওয়ারিশ গাছের তলায়, রাস্তায়, রেল ষ্টেশনে, লাইনের ধারে। জমি জায়গার প্রতি তাঁর আকর্ষণ নেই। বরং, মহিম যে তাঁকে মা বলে ডেকেছে, ঘোষাল বংশের কুলবধূর মর্য্যাদায় পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেছে, আর পাঁচজন স্বজাতির সমকক্ষতার অধিকার ফিরে পেলেন—তাতেই চারুশীলা অনেক পেয়েছেন। কি হবে বিষয় দিয়ে। কাকে দেবেন?—কে আছে তাঁর?

শুয়ে শুয়ে চারুশীলা দেখতে পান, হাতে কেরোসিনের ডিবে নিয়ে মহিমের স্ত্রী নীহার বাইরে এলো। তাকবেন ভেবেও তাকলেন না। এত রাত্রে কি মনে করবে সে। হয়ত সাড়াও দেবে না। বৌটা যেন কেমন। বড় অহংকার, চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে, হাসির লেশ নেই। মোটেই মিশুক নয়। তাকে তাকলেন না। কিন্তু দু'চোখ দিয়ে ঐ আলোটাকেই অনুসরণ করলেন। যতক্ষণ দেখা যায় এবং যতটুকু দেখা যায়। ডিবে হাতে মহিমের বৌ আবার ঘরে ফিরে গেলো।

আবার অন্ধকার। ছেউড়ির উপরে জ্যোৎস্না। আকাশের তারা। কেবল চোখে ঘুম নেই। এই নিরবিচ্ছিন্ন একাকীত্বে চুপ করে বসে থাকাও কষ্টকর। সমস্ত দিনটা একই ভাবে বসে থাকতে হয়। বৌ কথা বলে যতটুকু প্রয়োজন। মহিম সকালে একবার করে খোঁজ নেয়। সাধারণতঃ বেড়ার ওপারে দাঁড়িয়েই। এপারে বড় একটা আসতে চায় না। মহিমের কথা বার্ত্তায় অনেক বিনয়। কিন্তু আন্তরিকতা কতটুকু স্পর্শ বুঝা যায় না। মহিম সবই তার জন্য করছে। বাদলীদের একটা মেয়ে রেখেছে। সকালে ঘরদোর ধুয়ে মুছে রাতের এঁটো বাসন মেজে রেখে যায়। ভাতটা অবশ্য ওদের বাড়ী থেকেই রেঁধে পাঠায়। বৌ বেড়া পার হয়ে বারান্দায় নামিয়ে রাখে। মহিমের মা গত হয়েছে। মায়ের জায়গায় বৌ কিংবা মহিম সংসারে স্থান দিয়েছে, তাদের ব্যবহারে তা প্রকাশ পায় না।

মহিমদের ছেড়ে একসময় বারিক ভটচাযের কথায় এসে গেলেন চারুশীলা। লোকটা ভাল। তিনি নিয়ে না এলে সেই কৈচুর ষ্টেশনেই পড়ে থাকতেন। তিনি কি খবর পেতেন, না আইনের সন্ধি শোলক জানতেন। বারিক ভটচায বললেন, টাকা দিচ্ছি কাশী বৃন্দাবনে গিয়ে পড়ে থাক। পুণ্যের জায়গা। পরকালটা ভাল হবে। শুধু একটা সই দিয়ে যাও। তাঁর বাড়ীতেই এসে উঠলেন। কিন্তু ব্যাপারটি আর এগুতে পারেনি। খবর পেয়ে মহিম যখন মা বলে তাঁর পায়ের কাছে কেঁদে পড়ল, অতটা নির্ম্মম তিনি হতে পারলেন না। তাঁর স্বামীর বিষয়, মহিমেরও বাপের সম্পত্তি। তাঁর ভাগ্য বিড়ম্বনার জন্য সত্যিই তো মহিম দায়ী নয়। যে মানুষটা দায়ী তাঁর অপরাধও এইক্ষণে কোন ক্ষোভ সঞ্চারিত করে না। সেই মানুষটাকে আর কোনদিন দেখতে পেলেন না। তবু তাঁর স্মৃতি যেন এ বাড়ীতে এখনও হেসে বেড়াচ্ছে।

অন্যমনস্ক হয়ে কখন তন্দ্রায় ঢুলে পড়েছিলেন চারুশীলা। হঠাৎ চোখ খুলে গেল। জানালা দিয়ে তাকালেন। বাইরের উঠান ছায়া ছায়া অন্ধকার। ছেউড়ির উপর জ্যোৎস্নার আলো আর নেই। চাঁদ হেলে পড়েছে। অনেকক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার চারুশীলা ঘুমিয়ে পড়লেন।

দুই

ঘুম থেকে উঠলেন খুব সকালে। সকালে উঠা তার অভ্যাস। কৈচোর ষ্টেশনেও তাই। ওয়াগনগুলোর নীচে থেকে ভোরের প্রথম আলোর ছুয়াতেই বেরিয়ে আসতেন। কাঁথাগুলো একপাশে স্তূপীকৃত করে রেখে কাঁট দিতেন। অত সকালে কেউ উঠত না। এখন ট্রেণ সেই লাইনটায়। এত সকালে ষ্টেশন খাঁ খাঁ করে। সাইডিংএর পাশে অশথ গাছটায় গোড়ায় গিয়ে বসতেন। কানা গণশা মানুষের গায়ের গন্ধ শুকে পথ খুঁজে পায়। গুটি গুটি সে হাজির হতো। পায়ের নীচে লাঠিটা চেপে, তার উপর পাশেই বসতো। হাসতো। হয়ত বলতো, "চুপ করে বসে আছিস বামুনদিদি! একটা বিড়ি দেনা ধরাই।" হয়ত চারুশীলা জবাব দিতেন না। গণশা আবার হাসতো। বলতো, "চুপ মেরে গেলেই হল? ভাবছিস আমি দেখতে পাইনে। আমি তোর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি যে। ফাঁকী দিবি কেমন করে?···

দেখতে পেলেই আবার অন্য কেউ হাত পেতে বসবে। সন্তর্পণে চারদিক তাকিয়ে থলে থেকে একখানা বিড়ি বের করতেন চারুশীলা। দিয়াশলাই দরেত এগিয়ে দিয়ে বলতেন, "নে তুই ধরা। শেষ টানটা আমায় দিস।" বিড়িটা ধরিয়ে হয়ত গত রাত্রির ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কাহিনী বলতে লেগে যেতো কানা গণশা। চুলে পাক ধরলে কি হবে, লোকটা অত্যন্ত ভীতু। ঐ কুচকে কপালে তুলে ভূমিকার অবতারণা করত সে।

"জানিস বামুনদিদি, কাল ভর রাত দু' চোখের পাতা এক করতে পারিনি। অশথ গাছের ডালগুলোতে যেন ঝড় উঠেছে। কড়্ কড়্ মড়্ মড়্ শব্দ। মাথার উপর এই পড়ে তো ঐ পড়ে। কত রকমারি শব্দ—"

ভয়ের মধ্যে বাস করে চারুশীলার অভ্যাস হয়ে গেছে। ধমক দিতেন, "নে চুপ কর। যত সব বাজে—

"বাজে বললেই বাজে। তুই তো নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিস।

"এত ভয় তোর, ডাকলি নি কেন হতভাগা।

"ডাকি কি করে। তুই তো আর অন্ধ নস। চোখ খুলে সাঙ্ঘাতিক কিছু দেখে যদি ভিরমী খেয়ে যেতিস তখন? আর ঠিনিরা তো অন্তর্যামী, মনের কথা জানতে পারেন। না দেখেছিস কিছু নয়। দেখতে পেলেই রেহাই দিয়ে যাবেন না।

এখানে অশথ গাছ নেই। কানা গণশা, তুলসী, বাতাসী, খোঁড়া কেষ্ট কেউ নেই। কেউ থাকলে ভাল হতো। কথা বলতে পারতেন।

সাত সকালে উঠে সদর গোড়ায় এসে বসেন চারুশীলা। বিড়ি ধরান। এটা তার শ্বশুর বাড়ীর দেশ। নেশা বিড়ি করলে অপরাধ। খেতে হয় লুকিয়ে। বিড়িটা ধরিয়ে আকাশে ধুঁয়া ছাড়েন। কানা গণশা হয়ত এতক্ষণে অশথ গাছটির নীচে গিয়ে বসেছে। আজ কে ওর দিকে তাকাবে। তুলসী কি তাকে রান্না করে খাওয়াবে। বাতাসীটা আরও মুখরা। খ্যাংরা উঁচিয়ে ঝগড়া করে বৈকুণ্ঠর সঙ্গে। তবু বৈকুণ্ঠকে ছেড়ে যায় না। নুলো হলে কি হবে, বৈকুণ্ঠ সেয়ানার গুরু। তবি দু' তিনের এক খানা হার ছড়া হাতিয়ে এনেছে কোন প্যাসেঞ্জারের গলা থেকে। একদিন ঘণ্টা খানেকের জন্য বাতাসীকে পরতে দিয়েছিল। পরেছে কি কাল হয়েছে। সেদিন থেকেই বাতাসীর সঙ্গে বৈকুণ্ঠর গাট ছড়া বাধা। বাতাসীর হাব-ভাব চারুশীলা স্পষ্ট জানেন। ঐ হার ছড়া কতা করতে পারলেই হতচ্ছাড়ি কেটে পড়বে খোঁড়া কেষ্টের সঙ্গে। বাতাসীর প্রাণে মমতা নেই। কেবল লোভ আছে। হুঁড়ের বাদলা। জিনিষ খেতে চায় না। বসে বসে খায়। গণশার থলে থেকে পয়সা হাতিয়ে নেবে বাতাসী। কিন্তু তাকে দুটো চাল ফুটিয়ে দেবার বেলায় দেবে না। অন্ধ মানুষ, নিজে রেধে খেতে পারবে কেন? গণশার জন্য চারুশীলার মন খারাপ করে। গণশাও বড় একেলা পড়েছে। সেই সঙ্গে অনুভব করেন, তিনিও একান্ত নিঃসঙ্গ। এখানে কেউ তার সঙ্গে কথা বলেনা। হয়ত চেনেও না। তিনি এ গ্রামের বৌ, সেই কোন ছোট বেলায় তের বছর বয়সে এক বুক ঘোমটা টেনে এ বাড়ীতে ঢুকে ছিলেন। আর চারটী বছর ঘোমটার আড়ালে ঘরের কোণে কাটিয়ে গেছেন। কখন কোথায় সকালে পুবে সূর্য্য উঠেছে, আর দিনান্তে পশ্চিমে অস্ত গেছে। দুপুর বেলা মাথার উপর সূর্য্যের সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে: আর খেউড়িতে সকাল সন্ধ্যায় আলোর আসা যাওয়া দেখেছেন। এ

গ্রামের দু' চার জনকে তিনি চিনতেন। তারা হয় ঘরে গেছে, নয় এ পথ মাড়ায় না। ঘরে বসে থেকে দেখতে পান পুকুরের অপর পাড়ে সদর রাস্তা দিয়ে লোক জন আসছে, যাচ্ছে। ছেলেরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ তার পরিচিত নয়। দূর থেকে তাঁর দিকে কৌতুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সবাই যেন ঘাড় ফিরিয়ে নেয়। পথ দিয়ে যেতে যেতে একটা পাকা ছেলে মোড়লী গলায় সঙ্গীদের জ্ঞান বিতরণ করে। জানিস, এই বুড়ির মহাব্যাধি হয়েছে। দেখিস পটে পটে মরবে।'

আচমকা চমক চারুশীলার কানে আসে। উপলব্ধির শেষ সীমানা পর্য্যন্ত সূঁচের মত সূক্ষ্ম হয়ে প্রবেশ করে। ঘৃণা তিনি পেয়েছেন। মানুষের মমতাহীন গঞ্জনার মধ্যে হেসে বেঁচে থাকার অসীম সহনশীলতা চেষ্টার অজ্ঞাতেই তিনি আয়ত্ত করেছেন। কিন্তু তাঁর সহজাত সংস্কার পাপ পুণ্যের অবধারিত কর্ম্মফল আশঙ্কা এড়িয়ে যেতে পারে না। নিজের অজান্তে শিউরে উঠেন।

তখন নিজেকে সান্ত্বনা দিতে বসেন। তার কি অপরাধ। জন্মাবার পরে মুহূর্ত্তে ভগবান ভাগ্যফল লেখেন। তাঁর হাতে খেলার পুতুলের মত মানুষ কি নাচে না? তাঁর ইচ্ছা কি মানুষ খণ্ডন করতে পারে। কোনটা তাঁর নিজের ইচ্ছে হয়েছে। ব্যাধি প্রকাশ পেলো। স্বামী ছাড়িয়ে দিলেন। মাথার উপর আশ্রয় দেবার এক মাত্র মানুষ ছিলেন মা। তিনিও চলে গেলেন। শেষ সম্বল অপহৃত হ'ল। তারপর সকলে ঘৃণায় হাকে আবর্জ্জনার মত দূরে ফেলে দিলে।

সেই বিড়ম্বিত জীবন অধ্যায় মনে আসতেই মার মুখখানা করুণ মমতায় চারুশীলার চোখের উপর ভেসে উঠে। টানা টানা চোখ, পাকা কলার গায়ের রং, টিকালো নাক—যেন কুমোরের তৈরী প্রতিমা। রূপের ঘোরেই দীনহীন বাপের কুঁড়ে ঘর থেকে মৈত্র বাড়ীর ছোট তরফের সংসারে তিনি প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। প্রথম স্ত্রী লোকান্তরিত হবার পর কেউ ভাবেনি বাপের মৈত্র আবার বিয়ে করবেন। বড় ছেলের বয়স বছর চৌদ্দ। পরের ছেলেটির বয়স বছর নয়। সবার ছোট মেয়ে, বয়স বছর সাত। বিয়ের কথায় চটে উঠতেন বাপের মৈত্র। এক বছর কেটে গেল। তারপর কি হ'ল,—ঘন ঘন সদর যেতে লাগলেন। আবাদে যাবার নাম করে বাইরে কাটালেন ক'দিন। দীনবন্ধু ঘটকের দু'বেলা আসা যাওয়া সুরু হ'ল। একদিন বিয়ে করে পুষ্পবালাকে নিয়ে ঘরে ফিরলেন। এই সমস্তই কাহিনী। তরঙ্গিণী ঝির কাছে শুনেছিলেন চারুশীলা। তরঙ্গিণী ঝি সন্ধ্যার পর তাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টায় কত রাজ্যের কত গল্প বলতো। চারুশীলার যখন আট-ন' বছর বয়স সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করতেন। তিনি বুঝতে পারতেন বড়দা নব-কুমারের সঙ্গে মায়ের সম্পর্কটা ভাল নেই। ছোড়দা নগেন্দ্রকুমারও অতি মাত্রায় বড়দার অনুরক্ত হয়ে উঠলেন। সৎ মায়ের ভক্ত হয়ে রইলেন একমাত্র ছবিরাণী।

চারুশীলার মনে পড়ে তাঁর শৈশবের দিনগুলি। দিদির হাত ধরে বেড়াতে বেরুতেন। মেজ-তরফের জোঠাই-মা, নন্দকাকার বিধবা বোন সাবিত্রী—সবাই তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতো। তাঁরা যে সমস্ত কথা বলতেন আগা-মাথা কিছুই বুঝতে পারতেন না চারুশীলা। দুয়েকটা কথা এখনও মনে লেগে রয়েছে। তাঁরা ঠাট্টা করে বলতেন, স্বামী সোহাগিনীর নয়নের মণি। মেজ জোঠাইমা একদিন গাল টিপে আদর করেছিলেন। বলেছিলেন, মায়ের রূপ কেড়ে নিয়েছে হতভাগী। যেন ছাঁচে ঢালা মুখখানা। এই রূপের জৌলুসেই তো ছোটঠাকুরপোর মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছে মাগী। তার মাকে গালি দিয়েছেন বুঝতে পেরে-ছিলেন চারুশীলা। আদর ভাল লাগেনি। কিন্তু তাঁরা যখন অভিযোগ করতেন তার মা সতীন ছেলেদের কষ্ট দিয়েছেন চারুশীলার কেবল মনে হ'ত সংসারে মা না থাকার মত দুঃখ নেই। দাদাদের প্রতি সহানুভূতি হতো। মায়ের প্রতি সশ্রদ্ধ ভালবাসা যেন আর অনুভব করতে পারতেন না। কিন্তু বাড়ী এলেই মনটা অন্য রকম হয়ে যেতো। মাকে জড়িয়ে ধরে তার কোলে মুখ গুঁজতেন।

শৈশবের স্মৃতির মধ্যে অনেকক্ষণ ডুবে রইলেন চারু-শীলা। বাইরে যে জগৎ আলোর প্লাবনে, হাওয়ায় গাছের পাতায় শব্দে বৈচিত্র্যের নৈবিদ্য সাজিয়ে অপেক্ষা করে আছে তার এক কণা ভাগও তিনি পেলেন না। শিশুদের হাসি, কলকণ্ঠ, চঞ্চলতা আনন্দের কোন সাড়া জাগাল না। মাঠে গরু চরে বেড়াচ্ছে, দূরে রাস্তার উপর দিয়ে ঘাচ ঘাচ

শব্দে গরুর গাড়ী যাচ্ছে। কোথায় গাছের পাতার আড়ালে বসে ঘু-ঘু ডাকছে। সমস্তই যেন তার নিঃসঙ্গতার মাঝখানে বে-সুরো। বসে বসে কোমড়ে খিল ধরেছে। মুখের উপর এসে রোদ পড়েছে, বিশ্রী আওয়াজে আমগাছের ডালে একটা কাক ডাকছে। চারুশীলার মানসিক স্নায়ুগুলো যেন সকলে মিলে খোঁচা দিতে সুরু করেছে। বিরক্ত মনেই উঠলেন চারুশীলা। হেঁউড়ি ধরে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকালেন। তাঁর শূন্য মন যেন শূন্য গৃহকোণ অপেক্ষা বাইরের চলমান জীবনযাত্রার মাঝখানে অত্যন্ত সহজভাবে মিশে যেতে চাইছে। অথচ এও তিনি অনুভব করলেন, সেখ নে তাঁর ডাক পড়বে না। সকলের কাছেতিনি অপাঙ্‌ক্তেয়। তবু সন্তর্পণে পাশ হয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। শৈলেশ মুখার্জির দু'তলার চিলেকোঠা দেখা যাচ্ছে। পালেস্তেরা খসে পড়েছে। ইঁট বার করেছে। কেমী কি বলেছে স্বামিক ভট্টাচার্যের এখন উঠতি, আর শৈলেশ মুখার্জির পড়ো অবস্থা। এই চিলেকোঠা চিক্ চিক্ করতো দুপুর রোদ্দুরে। অবশ্য ত্রিশ বছর আগে। যখন ক'নে বৌ সেজে প্রথম এই গ্রামে পা দিয়েছিলেন। এই একটা জিনিসই তাঁর বিশেষ করে মনে আছে। গ্রামের পথ, গাছপালা, সমস্তই বদলে গেছে। চেনাই যায় না। সেই মানুষগুলিও নেই। ছোটকি কি অনেককাল মরেছে। বুধোও বেঁচে নেই। পরাণ মোদক ভিটেমাটী বিক্রী করে আর কোথায় চলে গেছে। ছেলেমেয়ে যে দু'চারজন এদে তাদের অন্দরে ছুটাছুটি করতো, খিড়কির পেয়ারা গাছটায় হৌরাস্থি করে লুটে খেতো, তাদের কেউ আর আসে না। মেয়েরা বড় হয়ে, পরের ঘর করতে চলে গেছে। ছেলেরা গ্রামে থাকলেও তারা গোওয়ান সোমত্ত হয়েছে। চেনা যাবে না। আধাবয়সী যে লোকটা তার কাছ ঘেষে এইমাত্র চলে গেল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। মনের মধ্যে অনেক অনুসন্ধান করেও এ মুখের কোন মিল খুঁজে পেলেন না।

রোদ চড়ে উঠেছে। আমগাছটার নীচে দাঁড়ালেন চারুশীলা। ওদিক থেকে মহিম আসছে। সকালবেলা হয়ত কোথাও কাজে বেরিয়েছিল। চারুশীলা দাঁড়ালেন। বিনম্র করুণ দৃষ্টিতে ভিক্ষার্থী হয়ে যেমনভাবে দাঁড়াতেন যাত্রীদের কাছে, তেমনি প্রেরণা নিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর প্রার্থনা নেই। হাত বাড়াবেন না। কিন্তু মহিম যদি তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসে, দু'টি কথা বলে, তাঁর নিঃসঙ্গ নির্জন জীবনযাত্রায় ভাল লাগার একটু যেন ছোঁয়া লাগে। মাত্র তাই নয়। মানুষ দীর্ঘকাল যেভাবে তাকে দূরে সরিয়ে রেখে ঘৃণা করেছে, তার বিপরীত পরিস্থিতির আকাঙ্ক্ষায় মন যেন মেতে উঠে। নিজেকে নিয়ে অতীতের মূল্যবোধের পরীক্ষায় সুখানুভব।

মহিম কাছে এলো। বিষণ্ণ বুদ্ধি-গ্রস্ত মানুষ। চেহারা। মুখখানা গম্ভীর। ছোট ছোট চোখ দু'টি স্বার্থপর দৃষ্টি। কণ্ঠে অযাচিত দরদ ঢেলে শুধালে, "কারে খুঁজছেন?"

"ভাল লাগছে না বাবা। তাই হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম।"

"সুবাবা ভালে এসেছে?"

"সে তো বেলা করেই আসে বাবা।"

"লোক কি পাওয়া যায়। ব্যারামটার জন্ত কেউ আসতে চায়না।"

চারুশীলার মুখ কালো হয়ে উঠে।

"গ্রামের মানুষ কি কারো ভাল সইতে পারে? কাজে যাও ভাংচি দেবে। রোগ ব্যারাম যার তার যা আছে হবেই। তোমার কেন হ'ল? তুমি কার ঘর কিরিরি করতে গেছলে?"

অতি কষ্টে চারুশীলা চোখের জল সংবরণ করে মিনতির কণ্ঠে বলেন, "অনেক দুঃখ পেয়ে আবার যা ভিটেয় ঠাঁই পেয়েছি। তোমাদের পাঁচজনের দয়ায় এখা যেন চোখ বুঁজতে পারি।"

এগিয়ে যাচ্ছিল মহিম। আবার দু'পা পিছিয়ে এলো।

"আমাদের শিবু তর্করত্ন বলছিলেন, স্থানে অস্থানে থুথু ফেলা করেছ, পাঁচ জাতের ছুয়া খেয়েছ, একটা প্রায়শ্চিত্ত করে নিতে!"

মহিমের অভিরুচিই যেন এই ব্যাপারে চারুশীলার কাছে অলঙ্ঘনীয় মনে হয়। বলেন, "তোমার যা ভাল মনে হয়, আমি অমত করব না বাবা।"

"তর্করত্ন তো আর বাজে কথা বলেন নি। সত্যিই তো, ভিক্ষুকের আবার জাত থাকে নাকি। আমার ছেলে-

মেয়ের বিয়ের সময় এই সমস্ত কথা উঠবে। তোমাকে ঠাঁই দিয়ে ভুগতে কি আমাকেই কষ্ট হবে।"

চারুশীলা বাধা দিতেও না পেলেন, তার চেয়েও বেশী পেলেন লজ্জা। নিজেকে নিয়ে অপরাধবোধে। মাথা নীচু হল তাঁর।

মহিম চলে গেল। আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন চারুশীলা। যুক্তি দিয়ে নিজেকে বুঝাতে চাইলেন। অদৃষ্টের ফেরে একদিন পথে নেমেছিলেন। তবু ঘোমটা বংশের কুল-বধূ তিনি। এই ভিটের সংস্কার, মর্যাদা তাঁকে অক্ষুণ্ণ রেখে চলতেই হবে। মহিম অন্যায় বলেনি। ভাগ্যের ঢেউ খেয়ে আবার যখন গৌরবান্বিত মর্যাদাসহ ফিরে এসেছেন, আত্মশুদ্ধির কৃচ্ছ্র সাধনায় অতীতের পাপ ক্ষালন করে নেওয়াই ভাল। এ জন্য অপচয়ের মধ্যেই কেটে গেল। সুস্থ সুন্দর পরজন্মের জন্য এখন থেকেই কিছু সঞ্চয় হোক।

মহিম চলে গেলেও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন চারুশীলা। তারপর ধীরে ধীরে ভিতরে এলেন। অজস্র ফুল ছড়িয়ে আছে শিউলি গাছটির নীচে। মৃদু-মিষ্টি গন্ধ আসছে। গাছটার ছায়ায় দাঁড়ালেন। মনের মধ্যে স্মৃতি খুঁটে দেখলেন, এ গাছ এখানে ছিল না। কিন্তু বেশ বড় হয়েছে গাছটা। কাণ্ডের গোড়ার দিকের ছাল বয়সের কৌলিন্যে শুকিয়ে মরে গেছে। কত বছর ধরে গাছটা বড় হয়েছে। কে পুঁতে ছিল?—মহিমের মা? সেই ঝগড়ী এসেই তার সবস্ব অধিকার জুড়ে বসেছিল এক দিন।

ভাবনার ছেদ পড়লো। সদরের বাইরে একটা শিশু তার ঘরে কাঁদছে। ক্ষেমীর মা ঐখানে চারা জাম গাছটার গোড়ার সঙ্গে দু-আড়াই বছরের ছেলেটাকে পাড় দিয়ে বেঁধে রেখে মহিমের সংসারে কাজ করে। আহা, কি ভাগ্য ছেলেটার। টানা টানা চোখ, শ্যামবর্ণ কুটফুটে ছেলেটা। দেখলেও মায়া হয়। চারুশীলা সদরে এলেন। গাছের গোড়ার সঙ্গে শাড়ীর পাড়টা জড়াচ্ছে ক্ষেমীর মা। গত দু'চার দিন ধরেই চারুশীলা দেখছেন। কিন্তু বলেন নি। আর না বলে পারলেন না।

"একরত্তি ছেলেটাকে অমন করে বাঁধে কে?"

"কি করব মা! এমন লক্ষীছাড়া ছেলে, কাজ করব, না তাকে সামলাবো।

"কেন, ভিতরের উঠানে ছেড়ে দিলেই তো পারিস। দিব্যি খেলা করবে।"

"বলতে নেই মা। নিজের ছেলেকে খেতে দিতে পে দিদিমণি। বাচ্চা ছেলে অজ্ঞান, সে কি বুঝে? এর হাতেও এক-কণা দে। কখনো দেবে না। আর এই হাতাতে রাক্ষসটাও কিছুতেই খাবেনা। মাটিতে গড়াগড়ি যাবে। বলুন কত সওয়া যায়।…

"আমার ঘরে বাতাসা রয়েছে, এনে দেব দু'খানা."

রোগ যে ছুঁয়াছুঁয়িতে এক দেহ থেকে অন্যদেহে প্রবেশের সুযোগ পায় চাষার মেয়ে হয়ত এত তত্ত্ব জানে না। কিংবা মায়ের মন রক্ষিত ছেলের প্রতি মমতায় তত্ত্ব কথা ভুলে থাকে। বলে, 'দিন না মা। এই ফাঁকে রাক্ষস চুপ করুক। এমন করে খেঁকিয়ে কাঁদলে কাজ করতেই কি ভাল লাগে।"

চারুশীলা ভিতর থেকে বাতাসার ঠোঙা এনে খান কয় ছেলে দেন ক্ষেমীর মার হাতে। এতগুলি সে প্রত্যাশা করেনি। খান দুই ছেলের হাতে গুঁজে দিয়ে বাকী আচলে বেঁধে রাখে।

ক্ষেমীর মা কাজ করতে খিড়কির পুকুরে চলে যায়। চারুশীলা ঐ দুষ্টু ছেলেটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। গাছের গোড়ার সঙ্গে তেমনি বাঁধা রয়েছে। আর কাঁদছেনা। পরম তৃপ্তিতে চেটে চেটে বাতাসা খাচ্ছে।

এতক্ষণে সুধামো বুড়ি কাজে আসে। চারুশীলা প্রসন্ন হন না। মেয়েছেলেটাকে গোড়া থেকেই সহ্য করতে পারছেন না। খটাং খটাং কথা। প্রথম দিন কাজে এসেই সুর তুলে প্রশ্ন করেছিল, "হ্যাগা, তুমি নাকি রেল গাড়ীতে ভিক্ষে করে বেড়াতে?"

চারুশীলা চটে উঠেছিলেন। দু'টি চোখ শাণিত করে জবাব দিয়েছিলেন, "আমি কি করেছি তার নিকেশ নিতে তোকে কে এনেছে? মরণ হয় না! কি গিরি করতে এসেছিস, মুখে এত লম্বা চওড়া কথা কেন?"

ঘা খেয়ে খেয়ে বার্দ্ধক্যের শেষ প্রান্তে এসে অপরের মনের দিকে তাকিয়ে চলার স্থির বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। বয়স মানুষকে চেতনার এমন এক অন্ধ স্তরে পৌঁছে দেয়,কোন কথা তলিয়েবে বুঝবার চেষ্টা আর থাকে না। ফোকলা দাঁত বের করে হেসেছিল সুধামার মা।

বলেছে, "তুমি রাগছ কেন বৌমা? জিনিষে বেঁচে থাকতে কোন দিন কি গিরি করেছি? ঘাঁড়ের মত দু' দুটো ছেলে। না ভাবাই কি গিরি করতে দিয়েছে? সবাই স্বপ্নে গেল। আর তিন কুড়ি চার বছর বয়সে পা বেরুলাম গন্তর খাটাতে। তাই তো বলছি। অদৃষ্টের মার কে রুখবে! তুমি দিন-ভিখেরি, তুমি এসে বসলে সুখের পালঙ্কে। আর আমি সোনার সংসার পুড়ে খেয়ে হাড় কালা করতে বেরুলাম।

বুড়ির দুঃখের কাহিনীতে যে টুকু সমবেদনা দেখা দিয়েছিল, সেখানে তাকে খোঁচা দিয়েছে মন সেখানেই বেঁকেছে। পাছে সে রাগ করে চলে যায় সেদিন তাকে ঘাটাতে সাহস পাননি চারুশীলা।

আজকেও সুধাময়ী বুড়ি গায়ে পড়ে কথা বলে।

"সেই যখন এলেই বৌমা, বোয়ামী বেঁচে থাকতে এলে না কেন? তোমার সতীন মরে যাবার পর অনেক ক' বছরই তো বেঁচে ছিল মানুষটা।"

চারুশীলা আজকেও বিগড়ে গেলেন। এ বাড়ীতে কেন তার স্থান হ'ল না সেই ভাগ্য বিড়ম্বনার ইতিবৃত্ত আবার নূতন করে শুনতে চায় নাকি? ধমক দিয়ে বলেন, "বক বক রেখে বাসন গুলো আগে মেজে নিয়ে আয় না।"

"তাই তো যাচ্ছি গো। অত হড়বড় করে আমি পারব কেন।" তার পর যেন আপন মনেই বলে, "কাজ কি করব। পাড়ার যে দেখে বলে, যাসনি বুড়ি। খারাপ ব্যামো, মরবি। মরবার জন্যই তো বসে রয়েছি হতভাগারা। না মলে আলা জুড়োবে কিসে।"

মহিমও এই ভয়ই দেখিয়ে গেল। নিরুত্তর রইলেন চারুশীলা। ধীরে ধীরে আবার সদরে গিয়ে দাঁড়োলেন।

তিন

আরও একটা সপ্তাহ এ বাড়ীতেই কাটিয়ে দিলেন চারুশীলা। নিয়তি যেন তাকে নির্বাসনে ঠেলে দিয়েছে। সঙ্গী নেই। কথা বলার জন্য ছটফট করেন। বেড়ার ওধারে মহিমের স্ত্রী চলা ফেরা করে। সর্ব্বদা ব্যস্ত। তিন হিনতে কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে কচি বৌটা। কতই বা বয়স। বাইশ তেইশ। চোখে চোখে পড়লে দু' একটা কথাও বলে। সুশীল প্রশ্ন। হাবভাব দেখলেই বোঝা যায় সে এড়িয়ে যায়। হয়ত মহিমের ভয়েই এড়িয়ে যায়। সকালে ঘুম থেকে উঠে গ্রামের দিকে নয়তো মাঠের দিকে বেরিয়ে যায় মহিম। তখন হয়ত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গোড়ায় দেখা হয়। কখন সে বেরিয়ে যায় কখন ঘরে থাকে বাড়ীর এই অংশ থেকে কিছু বুঝা যায় না।

সুধাময়ী ঝির সঙ্গেও বনিবনা হয় না। জীবনে তিক্ত বিরক্ত হয়ে সুধাময়ীর কথা কাঠ কাঠ। অবস্থা বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়ে চারুশীলাকেও কম যেতে হয় নি। তবু সুধাময়ী কাজ করতে এলে মানুষের সঙ্গ পেয়ে আরাম বোধ করেন। কাজ সেরে যখন সে চলে যায় সমস্ত বাড়ীটাই নিঃঝুম। বারান্দায় তখন ছায়া পড়ে। আলো ছায়ার নিরিখে সময় আন্দাজ করে স্নানে যান। মহিমের বৌ বেড়ার মাঝখানে ঝাঁপ খুলে খাবারের থালাটা নামিয়ে রাখে। খেতে বেশ লাগে। ভালমন্দ পরিপাটী রান্নার আস্বাদ প্রায় ভুলে গেছলেন। থালা চেটে হাত চেটে ঘণ্টা খানেক ধরে বসে বেশ তৃপ্তি সহকারে আহার করেন। আবার সেই নিস্তব্ধ অলস দুপুর। দিনে ঘুমিয়ে অভ্যাস নেই। নিদ্রা আসেনা।

নিঃসঙ্গ দিন আর রাত্রির পথে দিনগুলি চলে যাচ্ছে। অভাব নেই। উঞ্ছবৃত্তি নেই। তবুও চারুশীলার ভাল লাগেনা। কি যেন তিনি ফেলে এসেছেন। যেমন করে পথে পথে রিক্ত নিঃসম্বল তিনটা বছর কেটেছে তাকেও যেমন মেনে নিতে পারেন নি, কিন্তু সেই হতভাগ্য দিনগুলি থেকে মুক্তি পেয়েও আনন্দ নেই। স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রাচুর্য্যের সান্ত্বনায়ও সুখ নেই। উঠানের মাঝখান দিয়ে বাঁশের বেড়াটা এখানকার জগৎ থেকে যেন তাকে দূরে রেখেছে। তার পৃথিবী—ঘর বারান্দা উঠান আর সদর। এক বৃহৎ পরিবেশ থেকে ক্ষুদ্র গণ্ডিতে এসে আটকে পড়ে গেছেন। এখানে উন্মুক্ত শুধু আকাশ। বারান্দায় বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা।

রাত্রেও বারান্দায় এসে বসেন। কৃষ্ণ পক্ষ অতীত হয়ে সবে শুক্ল পক্ষের সুরু। এক ফালি চাঁদ কখন ডুবে গেছে। ছোপ ছোপ অন্ধকার। অন্ধকারেই তো থেকে অভ্যাস। অন্ধকার চারুশীলার ভাল লাগে। ওয়াগনের নীচে অন্ধকারেও তারা পরস্পরকে দেখতে পেতেন।

কাছাকাছি চিনতে পারতেন। বৈশাখের খর রৌদ্রে এ পথটা তেতে থাকতো। সন্ধ্যার পর অশথ গাছটার নীচে বিছানা পাততেন। সেখানেও অন্ধকার। পৃথিবীকে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে চারুশীলা বহু রাত্রি দেখেছেন। দূরে দিকে উঁচু কালোর দেওয়াল। কিছুই স্পষ্ট নয়। শুধু একটী মাত্র রূপ। সে রূপের আড়ালে সমস্ত বহির্জগৎ লুপ্ত হয়ে যায়। সেই অন্ধকারে খালি নিজের মনকে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। আর কিছুই দেখা যায় না। তুলসীর ই উপর খোঁড়া লোকের হাত এসে পড়লে—বৈকুণ্ঠ চাটুজ্যেও পারে না।

অন্ধকারের মধ্যেই চুপিসারে যাবিক ভট্টাচার্য এসে ার ঘরের ভিতর গিয়ে বসলেন। মহিম জানতে না। কিন্তু চারুশীলা অস্বস্তিতে পড়লেন।

ক ভটচার্য এলেই কুণ্ঠায় পড়েন চারুশীলা। বোধে নিজেকে নিজের মধ্যে আত্মরক্ষার গুটিয়ে চেষ্টা করেন। সে কি চায় জানেন। কিন্তু তিনি দেবেন তাই জানেন না। চারুশীলা আরও বারান্দায় অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকেন, প্রতীক্ষায় ঘরের মধ্যে বসে থাকেন যাবিক ।

কক্ষণ বাদে চারুশীলা ঘরে আসেন। দু'জনেই ।

নীচু গলায় কথা বলেন যাবিক ভটচার্য।

বলবার স্পষ্ট বলে ফেল। আশা দিয়ে কেন ঠোঁটান?

ি কি আদতে বলি। তুমিই তো আস।"

দিয়েছিলে বলেই আসি। ভাব দেখি, কৈচুর অবস্থা। মাধবদা, মহিম কোন দিন তোমায় নিয়েছে। বাপ মারা গেলে লোক দিয়ে মুখের খবর পারত না কি?"

কথাটা সত্যি, সেই অশথ গাছের নীচে যখন তাকে বের করেছিলেন, যাবিক ভটচাযকে চারুশীলা পারেন নি। তিনি মাধব ঘোষালের প্রথমা স্ত্রী অস্বীকার করেন নি।

যাবিক ভটচায বলেছিলেন, "মাধব ঘোষাল মারা গেছেন, বোধ হয় তুমি শুনতে পাওনি।

চারুশীলার যেন মনে ছিল না তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তাঁর স্বামী বেঁচে ছিলেন। তিনি এয়োতি। তবু সংসারে আঘাত লেগেছিল। কণ্ঠ কেঁপে উঠেছিল। বলেছিলেন, "না।"

চারুশীলার জবাব কানে তোলেন নি যাবিক ভটচায, বলেছিলেন, 'শোনা না শোনা, দুই-ই তোমার পক্ষে সমান। বেঁচে থাকতেই কি দু'টো এঁটো কাঁটা দিয়ে তোমাকে জিজ্ঞেস করেছে? পাপিষ্ঠ লোক। নিরপরাধ স্ত্রীকে কি কেউ কখনও রাস্তায় ভাসিয়ে দেয়!

চারুশীলা চুপ থেকে ছিলেন।

দরদ দেখিয়ে ছিলেন যাবিক ভটচায।

"কত বড় একটা অন্যায় করে গেলেন মাধব ঘোষাল। ভাবতেই পারি না। কতবার বলেছি একটা যাহোক হারা করে দাও। পরে আস্তোকুঁড়ে কেন পড়ে থাকে। ভগবান তো তোমায় কম দেন নি। কি বলতো জান? ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।"

ক্ষোভে চারুশীলা আর্তনাদ করে উঠেছিলেন।

"ঘর আমার ছিল কোথায়। চার বছরের মধ্যে আট কুঁড়ের ব্যাটা এক খানা নেকড়া দিয়ে খোঁজ করেছিল।"

"সংসারটা এরকমই বৌঠান। আজ সুখেই সব ডুবে আছে।"

চারুশীলা হাত দিয়ে কপালটা দেখিয়ে বলেছিলেন, "কপাল কে নেবে ভটচায ঠাকুর, বাপেরও কম ছিল না, শ্বশুরের সংসারেও কম কি ছিল। কপালে আছে ভিক্ষে বৃত্তি—"

"ভগবানও একজন দেখবার জন্য রয়েছে। সুখ চাইলেই কি সুখ আসে। মাধব ঘোষাল সুখ পেয়েছে? মুখরা দজ্জাল মেয়ের পাল্লায় পড়ে জলে পুড়ে মরে নি। পনর ষোল বছরের ছেলে আর দশ বছরের মেয়ে রেখে সেই বৌও গেল। ভগবান তাঁর বিচার ঠিক করে যাচ্ছেন।"

মাধব ঘোষাল জীবনে সুখ পান নি শুনে অন্ততঃ চারুশীলা দুঃখিত হ'ন নি। হঠাৎ যেন তাঁর মধ্যে একজন হিংস্র মানুষ জেগে উঠেছিল। অধীর আবেগে বলেছিলেন, "পচে গলে মরতো! পচে গলে মরতো হতভাগা, আর আমি দু'চোখ ভরে দেখে হাতে তালি বাজাতাম।"

অথচ লোকটা আর বেঁচে নেই। এরূপ নিষ্ঠুর অভিশাপ

কামনা কোন মানুষের জন্য কেউ করে যারিক ভটচায কল্পনাও করতে পারতেন না। পরমুহূর্তে বীভৎস উচ্চরোলে হেসে উঠেছিলেন চারুশীলা। অকস্মাৎ সে হাসিও কণ্ঠে অবরুদ্ধ হয়ে গেল। অপলক দৃষ্টি। পাথরের মূর্তির মত নিস্পন্দ। হতবাক হয়ে চারুশীলার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন যারিক ভটচায।

সে দিন মনের কথা মনেতেই চেপে চলে এসেছিলেন যারিক ভটচায। পরদিন হাজির হয়ে ছিলেন প্রয়োজন নিয়ে। কিন্তু দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন, তিক্ষণী মেয়ে-ছেলেটা হাতের দু'গাছা পেতলের চুড়ি খুলে ফেলেছে। সিথির সিঁদুর ঘষে প্রায় নিশ্চিহ্ন করেছে। তাঁর দেহে মুখশ্রীতে বৈধব্যের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। যারিক ভটচাযের চোখে অন্তত এইটুকু প্রীতিকর ঠেকেছিল।

চারুশীলা কিন্তু বিশ্বাস করেন নি। সমস্ত জীবন স্বামী পৌঁছ নেন নি। চোখের সামনে দেখে অপরিচয়ের উপেক্ষায় নাক সিঁটকে চলে গেছেন। তার কাছ থেকে মহানুভবতার লেশ মাত্র প্রত্যাশা চারুশীলা মনে স্থান দিতে পারেন নি। যারিক ভটচায অবস্থিযোধ করেছিলেন ছিন্ন বস্ত্র, অনাহারে শীর্ণ, গাছের নীচে শুয়ে যারা জীবন কাটায়,—মানুষের দয়ার উপর নির্ভর করে জীবন মৃত অবস্থায় প্রাণ ধারণ করে, তাদের লোভের সীমা শ'য়ের অঙ্কে জ্ঞান হারাবে, এ বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট ভরসা ছিল। তিনি জানতেন না সংসারে যে যত বেশী নিঃস্ব ঐশ্বর্যের প্রতি তার নিরাসক্তিও তেমনি। যা কল্পনার অগোচরে, সেই জিনিস যখন হাতের একান্ত কাছে চলে আসে, আসক্তির চেয়ে আশঙ্কাও কম হয় না। লোভ অপেক্ষা অবিশ্বাসই চারুশীলার চিন্তায় প্রাধান্য লাভ করেছিল। হেসে উঠে বলেছিলেন, "তোমার মাথার ঠিক নেই ভটচায মশায়। স্বামী মরে গেলে স্ত্রী সম্পত্তি থেকে খোরপোষ পায় বড় জোর। মিনসে আমাকে জমি দিয়ে মরেছে এও আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন।"

যারিক ভটচায খুলে বলতে চাননি। বলেছিলেন, স্বামীর ওয়ারিশী দাবীতে দু'চার বিঘে তুমিও পাবে। আজকাল তাই আইন হয়েছে।

আকাশে চাঁদ পেলেও মানুষ এতটা আনন্দিত হয় না। নিজস্ব বলতে এক ফালি জমি, একটুকু আশ্রয় কোন দিন তাঁর নেই। অথচ জন্ম থেকে মরণের মৃত্যু পর্যন্ত যে ধ্যানজ্ঞানের মধ্যে জীবনের একুশটি বছর কেটেছে, মানুষের আশা কামনার সব সার্থক পরিণামে গৃহ ও সম্পত্তির অধিক কাম্য কোন ঐশী অনৈশী বস্তুও তাঁর জানা নেই। যোলহয় তখন যেই যেই করে নাচতে পারলে খুশি হতেন চারুশীলা। তাঁর বাহ্য তুমি-তুচ্ছকার মার্জিত প্রকাশের কোন চেষ্টাই করেন নি। অধীর কণ্ঠে বলেছিলেন, "আপনার পায়ে পড়ি ভটচায মশাই, সত্যি বলছ স্বামীর সম্পত্তিতে আমি ওয়ারিশী পাব।"

যারিক ভটচায হেসে বলেছিলেন, "গাড়ী ভাড়া খরচা করে তাহলে কি তোমার সঙ্গে আমি আড্ডা দিতে এলাম। নূতন আইনে সামান্য ওয়ারিশ তোমার পাওয়ার কথা। কিন্তু যখন পাচ্ছ কি করে?"

"আইনে গেলে এই আটকুড়ের ব্যাটা দখল দেবে না কেন?"

"দেবে না। সে ছেলেই নয় মাধব ঘোষালের। লোক ঠকাতে বাপের এক কাঠি উপরে যায়। পারবে তুমি মামলা মোকদ্দমা করে আদায় করতে?"

আচমকা যেমন আনন্দের জোয়ার এসেছিল চারুশীলার তেমনি প্রচণ্ড জোরে ভাটার ধাক্কাও এলো। চোখ দুটো মিইয়ে গিয়েছিল তাঁর। চুপ করে ছিলেন।

যারিক ভটচায বলেছিলেন, "মামলা করে আদায় করা তোমার কম্ম নয়। যার খাব খেকে কিছুই পাবেনা বুড়ী। ভাল কথা বলছি, বিক্রী করে দাও, টাকা নিয়ে তীর্থ ধর্ম-ক্ষেত্রে বাস কর।"

চারুশীলা কোন জবাব দিতে পারেন নি। চুপ করে মনের মধ্যে তাম্রদার সেই বাড়ীটা যেন দেখতে পেয়ে ছিলেন। সামনে পিছনে পুকুর, উঠান, কোঠাঘর, দালান। তাঁর নিজের ঘরটি। দেওয়াল ঘেঁষে বিয়ের পালঙ্ক পাতা। বা-হাতে দেওয়ালে গা-আলমারি। পাশের একটা কাঠ কাটা। সেই ঘরটার ছবি স্মৃতির পাতায় নিখুঁত দেখতে পেলেন। আর সেই সঙ্গে মনে হ'ল তাঁর জীবনের ব্যর্থতা ও মানুষের অবহেলার শুরু হয়েছে ঐ ঘর থেকেই। ওখান থেকে বিতাড়িত হয়ে যদি চলে আসতে না হতো! জায়া ও জননীর সম্মানে আজ তাঁর সংসার হাসি খুশিতে ঝলমল করতো!

চারুশীলা ভাবছিলেন। ধারিক ভট্টাচার্যও ভাবছিলেন। চারুশীলা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ছিলেন। বঞ্চিত জীবনের গ্লানিতে তার শরীর অবশ হয়ে এসেছিল। ধারিক ভট্টাচার্য মিনিট খানেক নীরব থেকে হেসে ছিলেন। চোখে মুখে চাতুর্য্যের ভঙ্গিতা। বলে ছিলেন, "তাহলেও একটা লোকও তোমার চেনা নেই। হুজ্জৎ হাঙ্গামা করে পারবে না। কে তোমার পিছনে দাঁড়াবে? তোমার কোন দিন পাবার কথা নয়। যা পেলে, তাই মনে কর বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে পড়া। ভদ্রলোকের মেয়ে, গাছ তলায় পড়ে থাকছ। তা না হ'লে আর কি।—তোমাকে আমি ঠকাব না।"

বহু পুরাতন একটা ব্যথা চারুশীলার মনে ভগ্ন ক্ষণে প্রতিশোধের রূপ নিয়েছে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেছিলেন, "ওরা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ওখানে, ঐ ঘরেই আমি গিয়ে তাদের বুকের উপর বসতে চাই। তা যদি করতে পার, সম্পত্তি আমি তোমার কাছে বেচে তীর্থস্থানে চলে যাব।"

প্রতিশ্রুতির কথাটা চারুশীলা ভুলেন নি এবং স্মরণ করিয়ে দিতে ধারিক ভট্টাচার্য্য এই নিয়ে তিন দিন এলেন। চারুশীলা সহসা তার কথার কোন জবাব ভেবে পেলেন না। লণ্ঠনের ডিম্ করা শিখাও চোখে লাগছে। দেওয়ালে বড় হয়ে পড়েছে ধারিক ভট্টাচার্যের ছায়াটা। এবং ধারিক ভট্টাচার্যের জিজ্ঞাসু দু'চোখের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারলেন না চারুশীলা। কি জবাব দেবেন? এখানে ঘরের আশ্রয়, ক্ষুধার অন্ন এর জন্য কোন দুর্ভাবনা নেই। বাকী জীবন এই নিশ্চিন্ততার মধ্যে কাটিয়ে যাবার লোভও কম নয়। একদিন এই বাড়ীটার উপর ছিল প্রচণ্ড লোভ। আজ এই বাড়ীটাই পরম আকর্ষণ। আত্মস্থ। যে সম্মান জীবনে কোন দিন তিনি পান নি, তাই দিয়েছে মহিম। তাঁকে মা বলেছে। মা ডাক শুনতে ভাল লাগে। কিন্তু মহিমের কণ্ঠস্বর তার চিরকালের পিপাসিত মাতৃত্বে মমতার শীতলতা সিঞ্চন করতে পারে না কেন? কেমন যেন মহিম। তার হাব ভাব কথাবার্ত্তা চাহনি কিছুই যেন স্পষ্ট নয়। অন্ততঃ ধারিক ভট্টাচার্যের মতও স্বচ্ছ নয়।

অনেকক্ষণ ভেবেও চারুশীলা ধারিক ভট্টাচার্যের প্রশ্নের সঠিক উত্তর নিজের মনে খুঁজে পেলেন না। অপেক্ষা করে ধৈর্য্যহারা হয়ে ধারিক ভট্টাচার্যের কণ্ঠ যেন একটু বেশি খরখরে হ'ল। বললেন, "তোমার যা পাবার, ভাবছ তুমি পেয়ে গেছ। কথা না রাখলেই কি হবে। মহিমকে তুমি চেন না। আমরা চিনি। ভাল মানুষীর মুখোস বজায় রাখবে ক'দিন?"

"সে কথা কি আমি ভাবিনে ঠাকুর পো। কথা আমি রাখব। কম হোক, বেশী হোক তোমাকে দেব। এত চট করে হবে না। দু'একটা মাস তোমাকে সবুর করতে হবে।

ধারিক ভট্টাচার্য হেসে বলেন, "আমার সবুর সইবে। তবে কি জানো, অনর্থং কালহরণং, সময় হারালে পস্তাতে হয়। মহিমকে দেখছো ছেলে মানুষ। ও একটা শুকনো ডাব। ঝুনো নারকেলকে বলে পিছিয়ে থাক। কোনদিক দিয়ে কি করে বসবে কিছুই বুঝতে পারবে না।"

"আমার অদৃষ্ট কি আর কেড়ে নিতে পারবে?"

"অদৃষ্ট যে আপনার ভাল নয় বৌঠান। তাইতো বলি। এক মাস তো হতে চলল। আমরা অমি নগদ টাকা কি রেখে গেছেন মাধবদা, স্পষ্টাস্পষ্টি কিছুই বলেছে মহিম?

চারুশীলা বলেন, "চিরকাল পথে পথে কাটিয়ে এতদিনে যা হোক একটু আশ্রয় পেয়েছি ভট্টচায মশায়। দু'চারটে দিন আমাকে শান্তিতে থাকতে দিন।" এইটুকু বলেই থামেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন "এখানে আমি থাকব না। এখানে আমার ভাল লাগে না। মনে হয় যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। যে দিকে দু'চোখ যায়, আমার হয়ত একদিন চলে যাব। যে কটা দিন বাকি পাওনা গণ্ডার হিসেব না তুলে সুখ বুঝেই থাকতে চাই।"

ধারিক ভট্টচায হেসে উপদেশচ্ছলে বলেন, "এ সংসার তোমার নয়। কেউ তোমাকে কোন দিন চায় নি। ডাকে নি। কার দিকে চেয়ে তুমি মায়ায় পড়েছ।"

"মায়া আমার প্রাণে নেই। এরাও আমাকে ঘৃণা করে। আমি সবই বুঝতে পারি ঠাকুর মশায়।"

চার

ধারিক ভট্টচায চলে গেলেন। চারুশীলা তর্কে হার

মানেন নি। বলেননি দেবেন না। কিন্তু স্থির করে কিছুই বলতে পারলেন না।

চারুশীলার নিজের মনও স্থির নেই। এই সংসারে কোন মানুষের সঙ্গে তার আত্মিক সম্পর্ক নেই। যেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম একটা হিসাবের টানাপোড়েন চলছে। মূল সংখ্যা থেকে কিছুই যেন বাদ না পড়ে। কোথাও না বিকৃতি ঘটে। অথচ লেনদেনের ক্রিয়া এর মধ্যে অব্যাহত রাখতে হবে। এবং সেই আঙ্কিক প্রক্রিয়ার শেষ পরিণাম নিজের মনকে যখন প্রশ্ন করলেন, কোন জবাব এলো না। অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে অতৃপ্তি ফোঁস ফোঁস করে উঠলো। তবে পেলেন না, এই ঘরের মধ্যে, প্রাচীর আর বাঁশের বেড়ার বন্ধনীর মধ্যে বেঁচে থাকা ভোগ না নির্বাসন। অথচ এই পর্যাপ্তির লীলা থেকে যে মানুষগুলি বাইরে আছে, বৈকুণ্ঠ ষ্টেশনে ভাঙা ওয়াগনের নীচে, বুড়ো অশথগাছের তলায়, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তারা এসেছে। তবু পরস্পরকে ভালবাসতে শিখেছে। বাতাসী যখন শিমুল গাছটার আড়ালে খোঁড়া ক্ষেত্রর সঙ্গে গল্প জমায় বৈকুণ্ঠ দু'টি তীক্ষ্ণ শাণিত দৃষ্টিতে তাকে সন্ধান করে। আবার সেই ক্ষেত্রকে ডেকেই ছোট কল্কেটা নিবেদন করে। সমস্তদিন ভিক্ষে করে এনে তখন তুলসীর ছেলেগুলিকে খাওয়ায়। বড় দু'টীকে কোলে নিয়ে তুলসী এসেছিল বৈকুণ্ঠে। আরেকজন লোকের সঙ্গে। সেই লোকটা চলে গেল। তখনের কাছে থেকে গেল তুলসী। তখন তো সেই ছেলে গুলোকে ঘৃণা করে না। সমাজ বলবে এরা অবাঞ্ছা, অবৈধ, পাপ। তা হোক, ঘৃণা নেই।

চারুশীলা আবার অন্ধকার বারান্দায় এসে বসলেন। বৈকুণ্ঠের সেই নোংরা সর্দ্দারা মানুষগুলোর প্রীতি যেন অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তার কাছে এসে পৌঁছায়। আসবার সময় কানা গণপা বলেছিল, বামুনদিদি তুই তো চললি। তোর কি? তুই এখন বড়লোক। ঘর দু'ল, বিষয় হ'ল। আর কি চাস? অনেকটা দূর। তা না হলে তোর বাড়ী একদিন ঘুরে আসতাম। তবু গ্রাম আর ষ্টেশনের নামটা জেনে রেখেছে কানা গণপা। ও কি আসবে! কোন দিন আসবে না। গণপাও জানে, সে ভিক্ষুক। গেরস্তর সঙ্গে এরকম নয়। গেরস্ত তাড়িয়ে দেয়। এড়িয়ে চলে। বলেছিল, "বামুনদিদি, তুই হয়ত আর চিনতেই পারবি নে!

গণপা আসবেনা। যদি আসতো। ঐখানে বসতো। এই সঙ্গীহীন নির্জ্জনতা আর লোভের নিঃশ্বাসের মধ্যে ই ক ছেড়ে দু'টি কথা বলতে পারতেন।

গণপা নয় মহিম এলো। হয়ত এতক্ষণ বাড়ী ছিল না মহিম। বারান্দায় ফিরে এসে সন্ধ্যার পর থেকে প্রথম তার গলার স্বর শুনতে পেলেন।

খানিক পরে ঘরে বারান্দার নীচে এসে দাঁড়াল মহিম।

"বারিক কাকা এসেছিলেন?

"হ্যাঁ এসেছিল।"

"কি মতলব দিয়ে গেল?'

"খোঁজ খবর নিতে মানুষের কাছে কি মানুষ আসে না।"

"খবর নিতে আসে বারিক কটচায়! আমার ধর্ম্ম পুত্তুর যুধিষ্টির রে! মতলব না থাকলে অন্ধকারে লুকিয়ে আসে কেন? কপাল ভাল দারোয়ানদার। বাড়ী থাকলে ঠ্যাং ভেঙ্গে দিতাম।"

"আমার কাছে কেউ আসে, তুমি তা চাওনা।"

"ঐ মতলববাজ জোচ্চোরটা কেন আসে?"

চারুশীলা মৌন থেকে যান। তিনি তো কারো কথাই নিচ্ছেন না। এমন কি মহিম যে তাকে সাবধান করে দিতে এসেছে, এর প্রয়োজনের প্রশ্নটাও করতে পারতেন। কিন্তু চুপ করেই রইলেন।

মহিম বলে, "এখানে তোমার কষ্ট কি বল? খাওয়া শোওয়া যত্ন জিজ্ঞেসা এমনটি আর কোথায় পেয়েছ? কোন জিনিস চাই, কি দরকার দু' একটা টাকা খরচ করতে ইচ্ছে যায় বললেই পার।"

চারুশীলা ক্ষুব্ধ হলেন।

"আমার সুখ দুঃখের খবর কবে তোমরা নিয়েছ মহিম। চব্বিশ পঁচিশটে বছর ভিক্ষে করেই কাটিয়ে দিলাম। তবু তোমাদের কাছে হাত পাততে আসিনি। অদৃষ্টের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে রাস্তায় বেরিয়েছিলাম। অদৃষ্টই এখানে এনেছে। যদি আর কোথাও নিয়ে যায়, সেখানেই চলে যাব।"

চারুশীলা দেখতে পেলেন না, অন্ধকারে মহিমের চোখ

দুটি কত তীব্র হয়ে উঠেছে। তবু কণ্ঠে মোলায়েম ভাব প্রকাশে অব্যাহত রাখে মহিম। বলে, "তখন ছিল আরেক আমল। সংসারের কর্তা ছিলেন বাবা। তাঁর সঙ্গে তোমার কি ব্যাপার ঘটেছিল আমার জানবার কথা নয়। তোমাকে চিনতামও না। শুধু জানতাম আমার একজন বৌদি ছিলেন। বাপের বাড়ী থাকতেন। সেখান থেকে কোথায় চলে গেছেন কেউ জানে না।

"জানবে না কেন? এ গ্রামের অনেকেই জানতো। তোমার বাবাও জানতেন। কৈচুর ষ্টেশনে দেখেনি আমাকে? ঘরের বৌ ভিক্ষে করছে। পারতেন না দু'টো উচ্ছিষ্ট দিয়ে তাকে প্রতিপালন করতে।

কথাগুলি বেশ চেপে চেপেই ছাড়েন চারুশীলা। মহিমও নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। শ্লেষের কণ্ঠে বলে, "কৈচুরে তুমি ছিলে সেটা বাবা জানতেন কিনা জানিনে। তবে এটা জানতেন তুমি বেরিয়ে গেছলে। ঘরের বৌ একবার বেরিয়ে গেলে স্বামীর সংসারে তার আর কোন দাবী থাকে না।"

চোঁস করে উঠলেন চারুশীলা। "খুব বড় বড় বাক্যি ছুড়ছিস যে। কোন ঘরে তোর বাপ আমাকে আগলে রেখেছিল যে আমি বেরিয়ে গেছলাম? স্বামীর প্রতি নিজে কর্তব্য কতটা করেছিস? মনুষ্যত্ব থাকলে আমার নামে অপবাদ দিতে না।"

সদ্য মৃত পিতার প্রতি স্পর্শকাতর মমতা এখনও মহিম কাটিয়ে উঠতে পারেনি। চারুশীলার রূঢ় কণ্ঠের অভিযোগে চটে যায়। বলে, "অপবাদ বাবা দিতে যাবেন কেন? সত্যি ঘটনা কে না জানে? তুমিই বল, বাপের বাড়ীর দেশের এক বৈরাগীর সঙ্গে বেরিয়ে যাওনি?

এই স্পষ্ট অভিযোগে নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল মনে হয় চারুশীলার, তবু কর্কশ কণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠেন।

"মুখে ন্যাংরা মারব আট-কুঁড়ের ব্যাটা! বেরিয়ে গেছলাম? সোড়া রোগের জ্বালায় তীর্থস্থানে হত্যা দিতে গেছি।"

চারুশীলার মতই জিহ্বায় শান দিয়ে মহিম বলে, "কোথায় গেছলে, কেন গেছলে তার সাক্ষী সাবুদ কি নিতে গেছি। যখন ফিরে এসে এগ্রামে উঠলে, কই আমি তো জাত বেজাত বিচার না করেই তোমাকে নিয়ে এলাম। তার মানে নয়, তুমি শত্রুদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বাপের ভিটায় ঘুঘু চড়াবে। এতটা বাড়াবাড়ি আর কেউ সহ্য করবে না।

জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে ঘরের ভিতর চলে গেলেন চারুশীলা। ব্যর্থক্রোধে দু'একবার হাঁক ডাক পেড়ে মহিম চলে গেল।

ঘরের ভিতর এসে চারুশীলা কেঁদে ফেললেন। তিনি অপরাধ করেছিলেন তার অনুতাপে নয়। মহিমের রূঢ়তার অপমান বোধেও নয়। যারা নানা ছাওনা থেকে তাকে বঞ্চিত করে নিষ্ঠুর অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল, আর সেই অন্ধকারে যখন তিনি পথ হারিয়ে ফেললেন, বহু আঘাতে নিঃশেষিত হয়ে গেলেন, তার চরম বিকৃতার অপরিহার্য্য পরিণামের জন্য দোষী সাব্যস্ত করতে তারাই বিচারকের আসনে বসেছে। মাধবনাথ না হোক, তার সুযোগ্য বংশধর। চারুশীলার মনে হল, মহিমের দেহেও মাধবনাথের রক্ত প্রবাহিত বলে সে এত নিষ্ঠুর।

মহিমের উপর ক্রোধে অন্ধ হয়ে তাকে লাঞ্ছিত করাই একমাত্র কাম্য হয়ে উঠলো। মানিক ভটচাযের প্রস্তাবে এতদিন কেন রাজী হন নি ক্ষোভে দুঃখে সে জন্য। শতানের ছেলে শত্রু। মানিক ভট্টাচার্যকে সমস্ত দিয়ে চলে যাবেন এখান থেকে।

বিছানায় এসে শয়ন করলেন চারুশীলা। ঘুম এলো না। মহিমের মধ্যে মাধব ঘোষালকে আজ দেখতে পেয়েছেন। সেই রুক্ষ। তারই ফল। সে তাঁকে তাড়িয়ে দেবে নিজের কোন উদ্দেশ্য হাসিল করে। যেমন ফিরেছিলেন মাধবনাথ। যখন বুঝতে পারলেন তাকে দিয়ে তাঁর কোন উদ্দেশ্য সাধিত হবার নয়।

চারুশীলা সত্যি অনুভব করলেন, মহিমের বয়ঃ মমতার বাহ্যিক খোলস খসে পড়তে সুরু করেছে। সে তাঁকে অস্বীকার করতে সুরু করেছে। সে কি তাহ'লে জেনেছে, এই ঘরের উপর তার কোন অধিকার নেই। চারুশীলার অন্তর থেকে কে যেন বলে উঠলো—নেই। যদি থাকতো কৈচুর ষ্টেশনে একপাড়া লোকের সামনে যখন তাঁকে অস্বীকার করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন মাধবনাথ, আর গাড়ী ভর্তি লোক তাকে পাগল মনে করে হেসেছিল—সেদিন মাথা নীচু করে কেন তিনি চলে এসেছিলেন।

*

মধ্য দিনে

*

প্রান্তর প্রান্তের কোণে

*

*

...ণে : বিনেন নাগ

কেন পারেননি, মাধব ঘোষালের সঙ্গে এসে জোর করে এ বাড়ীতে প্রবেশ করতে।

শাশুড়ী কর্তৃক বিতাড়িত হবার প্রায় সাত বছর বাদে কৈচোর ষ্টেশনে ট্রেণের কামরায় দৈবক্রমে মাধবঘোষালের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছিল। চারুশীলা মাত্র ক'মাস আগে কৈচোরে এসেছেন। প্রথম নজরেই মাধব ঘোষালকে চিনেছিলেন চারুশীলা। সঙ্গের বৌটীকে আগে খেয়াল করেননি। কাছে এসে অনুমান করেছিলেন তাঁর সতীন। কোলে দু'তিন বছরের একটা ছেলে। চারুশীলার অন্তরে কেউ যেন আগুন ঢেলে দিয়েছিল। তার তীব্র জ্বালায় লজ্জা অপরাধবোধের বালাই ভেসে গিয়েছিল। সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অন্ধকার হয়ে উঠেছিল মাধবনাথের মুখ। ঘাড় ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। চারুশীলা যেন ক্ষেপে গেছলেন। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলেন, "কী আমাকে চিনতেই পারছেন না?" মাধবনাথ সামনের বেঞ্চির ভদ্রলোকটীকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, "দেখুন তো পাগোলের জ্বালাতন মশাই। ভাগ্ এখান থেকে ভাগ্।"

চারুশীলা এক পা নড়েন নি। প্রশ্ন করেছিলেন, "ভাস্থর্যার কেষ্ট ঠাকুরের নাম ঘোষাল নয় আপনি?"

"কি বকছিস? ট্রেণ থেকে নাববি, না গুতিয়ে নামাতে হবে?"—ধমকে উঠেছিলেন মাধব ঘোষাল।

এই রূঢ় নিষ্ঠুর ব্যবহারে জ্ঞান হারিয়ে ছিলেন চারুশীলা। ইচ্ছে হয়েছিল টুটি কামড়ে ধরে জ্বালা জুড়োবেন। কিন্তু গাড়ীশুদ্ধলোক চেঁচামেচি শুরু করেছে। নেমে যেতে বলছে তাঁকে। নেমে আসবার আগে অগ্নিস্রাবী দৃষ্টিতে আরেকবার তাকিয়েছিলেন মাধবনাথ এবং সেই মেয়েছেলেটার দিকে। চিৎকার করে গালি দিয়েছিলেন, নির্বংশ হ'। নির্বংশ হ'। তোর মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়ুক। গলে পচে মর। কাক শকুন তোকে নিয়ে টানাটানি করুক।"

মাধব ঘোষালের সেই ঘৃণা ও কুৎসিত দৃষ্টি চারুশীলা যেন আবার নূতন করে দেখলেন মহিমের চোখে আর কুঞ্চিত নাসিকায়। অন্তরে আবার আগুন জ্বলে উঠলো। গত একমাসকাল জীবন থেকে মুছে ফেলতে হচ্ছে দু'দণ। মহিমের ধরণ, সযত্ন ব্যবহার, মিষ্টি হাসি একদিনের তিক্ততায় ধুয়ে গেল। সেদিন মাধবনাথের পাশে যে বৌটা বসেছিল তার কোলের ছেলেটীকে হাঁচকা টানে তুলে আছাড় মেরে গুড়িয়ে দিতে ইচ্ছে হয়েছিল। সেই ছেলেই মহিম। তার অবজ্ঞাতীক্ষ্ণ চোখ দু'টি উপড়ে ফেলতে পারলে আজকেও শান্তি পেতেন চারুশীলা।

ক্লান্ত ভাবনায় রাত্তিরে চোখের পাতা এক সময় জুড়ে গেল এবং সকাল এলো। আবার রোদ উঠলো। শরতের নীল পাথরের আকাশখানিতে আবার সাদা মেঘগুলি ভেসে যেতে লাগলো। সকালের আলো রাত্রির সমস্ত ঘটনার গ্লানি থেকে যেন মুক্তি এনে দিল। আবার সদরে এসে বসলেন চারুশীলা। গয়লাপাড়ার একটা বৌ দুধ নিয়ে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে অকারণে তাকে জিজ্ঞেস করলেন। সকালবেলা মহিম খামারের দিকে যায়। সদরে চারুশীলাকে বসে থাকতে দেখে দু' একটি কথাবার্তা বলে। অন্যদিন মহিমের জন্য উৎসুক প্রত্যাশায় বসে থাকতেন চারুশীলা। সে এদিক দিয়ে যাবে, এই আশঙ্কায় চারুশীলার মন আজ চঞ্চল হয়ে উঠে। ঘৃণা ও বিরূপতায়। মহিম যখন পাশের সরু দিয়ে বেরোয়, তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যাবার ভয়ে ঘাড় ফিরিয়ে রাখেন।

মহিম তাঁকে এড়িয়ে যায় না। বরং কাছে আসে। মুখে চেষ্টাকৃত হাসি টেনে এনে সামনে দাঁড়ায়।

"কাল তোমাকে অনেক কটু কথা শুনিয়ে দিলুম। আমার অন্যায় হয়েছে।"

চারুশীলা গম্ভীর মুখ গম্ভীরতর করেন।

"কটু কথা আমাকে সবাই শোনায় বাবা। আমি যে পোড়া অদৃষ্ট নিয়ে জন্মেছি।"

"একসঙ্গে বাস করলে অমন এক আধবার হয়েই থাকে। একবার যখন আশ্রয় দিয়েছি, তোমার অন্নবস্ত্রের দায়িত্ব চিরকাল আমি বহন করব। তার জন্য ভেব না।"

"তোমার মহত্ব মহিম। তুমি এ দায়িত্ব বহন না করলেও কেউ কিছু বলবে না। এ বাড়ীতে আমার অধিকার কেউ স্বীকার করেনি। তুমি যদি অস্বীকার কর আমার কাছে নূতন কথা নয়।"

মহিম মুখে সারল্যের হাসি এনে বলে, "এই সংসারে বৌ হয়ে একদিন এসেছিলে, এর মধ্যে তো মিথ্যে নেই।

তারপর কী ঘটেছে না ঘটেছে, তুমি কি অপরাধ করেছিলে, বাবা তার দায়িত্ব কতটা পালন করেছেন, আমার পক্ষে সে বিচার করা ধৃষ্টতা। আর ক'দিন বা বাঁচবে। শেষের ক'টা দিন এখানেই শান্তিতে বাস করো।

এক মিনিটকাল নীরব থাকেন চারুশীলা। ঔদাসীন্যের কণ্ঠে বলেন, "আমি এখানে বেশীদিন থাকতে পারব না মহিম। আমার মন বোধ হয় এ বাড়ীর জন্য তৈরী নয়। তুমিই বল, পারে কি, একটা মানুষ সমস্ত দিন মুখ বুজে ঘর আর বার, শুয়ে বসে গতকথা চিন্তা করে কাটাতে?'

"সব অবস্থাই ধীরে ধীরে সহ্য হয়ে যায়," মহিম বলে, "হরকালীর মামার বলছিলেন, দেবস্থানের মাহাত্ম্যই আলাদা। তোর মাকে কাশী বৃন্দাবন কোথাও রাখ। শান্তি পাবে। পরলোকের কাজও হবে।"

চারুশীলার মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। বলেন, তিনি আমার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়েছিলেন না? তাঁকে বলো, এখন থাক।

"তাকে যে আমি আসতে বলেছি।"

চারুশীলা কোন জবাব দেন না। মহিম চলে গেল। দোরগোড়ায় বসে শ্যাম-সবুজ প্রান্তিত মাঠের উপর দিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর যখন বাঁদিকে ঘাড় ফিরালেন—শৈলেশ মুখার্জির টিনেরকোঠা রোদ্দুরে চিক্‌চিক্ করছে। শৈলেশ মুখার্জির বাড়ী পার হয়ে সোটা দুই পড়ো জমি। তারপর ধারিক ভটচাযের আটচালা। তারপাশে নূতন একখানা পাকাকোঠা করেছে ধারিক ভটাচার্য্য।

শাড়ী বাড়িয়ে তার পাশ দিয়ে সুধাময়ী বুড়ি ভিতরে চলে গেল। মুখটা এমন বিকৃত করে তাঁর দিকে তাকিয়ে গেল, জ্বলে উঠলেন চারুশীলা। গালি দিতে গিয়েও রসনার রাশ টেনে ধরলেন। কে না তাকে ঘৃণা করেছে। এখানেই বা কে চাইছে তাঁকে। কার সঙ্গে ঝগড়া করে শেষে উঠছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই কোঠাঘর, খাট-পালঙ্ক, আরাম নিশ্চিন্ততা সমস্তর উপর বিষদুষ্ট ঘৃণায় মন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। চারুশীলা উঠলেন। সদর পার হয়ে রাস্তায় এলেন। শৈলেশ মুখার্জীর বাড়ীটার দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। ভাবলেন ঘুরে আসবেন ধারিক ভট্টাচার্য্যের বাড়ী থেকে। কিন্তু যখন নিজেকে প্রশ্ন করলেন, গিয়ে কি বলবেন; নিজের কাছ থেকে কোন নিশ্চিত জবাব পেলেন না! কোন সংকল্পই তার মনে স্থির নেই। ভাবনা কেবলই ভেসে বেড়াচ্ছে। কতকগুলি উপসংহারহীন খেয়ালী ভাবনা।

ধারিক ভটচাযের বাড়ী আর যাওয়া হ'ল না। বারান্দার ছায়ায় এসে বসে রইলেন চারুশীলা। অনেকক্ষণ বসে রইলেন। ঘেউড়ির বাইরে ক্ষেমীর মার ছেলেটা কেঁদে সারা হচ্ছে। কান্নার শব্দ অনেকক্ষণ ধরে শুনলেন। এই অলস নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে শিশুর কান্নাও সুন্দর শোনাল। অনুভব করলেন জীবনের কোন পরম সার্থকতা শিশুর কান্নার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। তার হাসি কান্নার ভেতর দিয়ে স্নিগ্ধ আলোর আবির্ভাব সম্ভব হয়। চারুশীলার অন্তরেও যেন একজন উন্মুখ শ্রোতা শিশুর কান্নার জন্য আকণ্ঠ পিপাসায় অপেক্ষা করে আছে। বহু বৎসরের অন্ধকার পার হয়ে একটি শিশুমুখ বুকের মধ্যে খুঁজে দেখলেন। না, তার আর কোন চিহ্ন নেই। সম্পূর্ণ মুছে গেছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বসে রইলেন স্থাণুর মত।

বসেও থাকতে পারলেন না চারুশীলা। ক্ষেমীর মার ছেলেটির কান্না তার সহ্য হ'ল না। উঠে গেলেন। চারা জামগাছটায় গোড়ার সঙ্গে ছেলেটি বাঁধা রয়েছে। ধারে কাছে তার মা কিংবা অন্য কোন লোক নেই। ক্ষেমীর মার উপর রেগে গেলেন চারুশীলা। দু'হাতে, বাহুতে একটা ছোট্ট শিশুর স্পর্শ অনুভব করলেন। সেই শিশু কোনদিন কাঁদেনি, হাসে নি, পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলে তাকায় নি। তার ইচ্ছে হ'ল ক্ষেমীর মার ছেলেটিকে কোলে তুলে নিতে। কিন্তু সাহস হ'ল না। ভয় হ'ল হয়ত কেউ বলে দেবে। কেউ গালি দিয়ে উঠবে। তখনই যেন বিতৃষ্ণায় মন বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। সংসারে সবাই তাকে ঘৃণা করে, তিনিই বা পরের ছেলেকে কেন এত মায়া দেখাতে যাচ্ছেন।

নিষ্ঠুর মনোবিকারে বেশ জোরে জোরে হেঁটে বারান্দায় ফিরে এলেন চারুশীলা। ছেলেটার কান্না এখানেও ভেসে আসছে। ইচ্ছে হ'ল কানে আঙুল দিয়ে শব্দ

ঠেকিয়ে রাখেন। কিন্তু তা করলেন না। একটি ছেলে কাঁদছে। বুভুক্ষু একটি ছেলে। নিজের জীবনে তিনি যে অবহেলা ভোগ করেছেন, এই শিশুটির কান্নার ভিতর দিয়ে তারই বিচিত্র অভিব্যক্তি যেন অনুভব করলেন। যেন কিছুটা সান্ত্বনা পেলেন। তবু তিনি বলতে পারলেন না। সদর গোড়ায় এলেন। অপর দিক থেকে ক্ষেমীর মা বেরিয়ে এসেছে। চুপ করে চলে আসতেও পারলেন না।

"ছেলেটা কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছে। তুই কি কানের মাথাও খেয়েছিস ক্ষেমীর মা?"

"হাত জোড়া রয়েছে, কি করব মা।"

"তাই বলে কি ছেলেটা মাথা খুঁড়ে মরবে? দু'টো শুকনো মুড়ি ফেলে দিয়ে গেলেও হয়।"

ক্ষেমীর মা জবাব দিলে না। শুধু একবার চোখ তুলে তাকালো। তার দৃষ্টির অর্থ উঞ্ছবৃত্তি-জীবনের অভিজ্ঞতায় চারুশীলা সহজেই বুঝে নিলেন।

বলেন, "পারিস নে, বলতেও তো পারিস।"

দিন তিনেক আগে মহিমের কাছ থেকে একটা খুচরো টাকা চেয়ে নিয়েছিলেন চারুশীলা। আঁচলে বেঁধে রেখেছিলেন। আঁচলের গেরো খুলে একটা পাঁচ নয়া পয়সা ক্ষেমীর মার সামনে ফেলে দিলেন।

পাঁচ

রাত্রে আবার সেই নিঃস্তব্ধতা। চারুশীলার চোখে ঘুম আসে না। সন্ধ্যা থেকে মুখ বুজে বসে থাকা বড়ই অস্বস্তিকর। এখানকার পরিপাটি ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছেন না। মনে হয় কি যেন নেই। ওধারে মহিমদের অংশে যতক্ষণ লোকজনের সাড়া পান, বাইরে বারান্দায় চুপ করে বসে থাকেন। রাত বাড়ে। গোটা বাড়ীটা নিঃঝুম মেরে যায়। বারান্দায় বসতে সাহস হয় না। মনে পড়ে গণশা বলতো, বাতাসের মধ্যে তিনিরা চলাফেরা করেন। বাতাসের মধ্যে তাদের চোখ খোলা থাকে। তিনিরা অন্তর্যামী। মানুষ জেগে থাকলে তাঁদের লীলাখেলায় বাধা পড়ে। তখন তিনিরা রেগে যান। চারুশীলা শুয়ে পড়েন, চেয়ে থাকেন। ঘুম আসে না। মনে হয় উন্মুক্ত আকাশটা তার দৃষ্টি থেকে পালিয়ে গেছে। আর ঘরের চারটা দেওয়াল তাকে চেপে ধরতে এগিয়ে আসছে। ভয়ে চোখের পাতা জোর করে বন্ধ করেন।

সকালে তবু কিছুটা স্বস্তি। সকাল থেকেই সদর গোড়ায় বসে থাকেন চারুশীলা। ক্ষেমীর মা ছেলেটাকে জামগাছের গোড়ায় বেঁধে রেখে গেছে। তিনি পাহারা দেন। গত রাত্রে খৈ-দুধ খেতে দিয়েছিল নীহার। দুপুরে ভাত বেশী হয়েছিল, ফেলতে পারেন নি। জোর করে খেয়ে নিয়েছিলেন। রাত্রে আহারের প্রবৃত্তি ছিল না। দুধটা চুমুক দিয়ে খেয়ে খৈগুলি ধারার চালা দিয়েছিলেন। ছেলেটাকে তাই এনে দিলেন। ছেলেটা খাচ্ছে, ছড়াচ্ছে, খুশিতে হেসে নেচে নেচে পড়ছে। চারুশীলা বসে বসে ছেলেটার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। ওর মুখে দু' একটা মাত্র ভাষা ফুটেছে। চারুশীলা কি বলেন বুঝে না। তবু উৎকর্ণ হয়ে যেন শোনে। দুষ্টুমিভরা চোখে তাকায়। তারপর হেসে উঠে। চারুশীলার ভাল লাগে। সমস্ত দুঃখ দৈন্য ভুলে যান। রৌদ্রের তাপ খরতর হচ্ছে। দেওয়ালের ছায়া ভিতরের দিকে। সুধাময়ী কি এতক্ষণে কাজে এল। এখন সে রাত্রের এঁটো বাসন নিয়ে খিড়কির পুকুরে গিয়ে বসবে। অভ্যস্ত বুড়িয়ে গেছে মাগীটা। এক পা রাস্তা যেতে তিন কদম ফেলে। আধ ঘণ্টার কাজে এক প্রহর বেলা বয়ে যায়। চারুশীলা সুধাময়ীর সঙ্গে আর ভিতরে গেলেন না। ছেলেটাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। কতক্ষণে ক্ষেমীর মা এলো। পায়ের বাঁধন খুলে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিলে।

আপনি বসে থাকেন তাই খোকাটাকে নিতাইদার বাইরে ফেলে রেখে যেতে পারি মা।

"ছেলেটা তোর বড্ড দুষ্টু ক্ষেমীর মা।"

"বড্ড সোহাগ কুড়াতে জানে। দু'মুঠো পেটে পড়লে ভাল ছেলে। কান্না নেই, আব্দার নেই, নিজের মনেই আছে।"

"ছেলেটা বুদ্ধিমান হবে। ভাল ছেলে হবে। ইস্কুলে ভর্তি করে দিস।"

"গরীবের ছেলে ইস্কুলে পড়বে কি মা। আশীর্বাদ করুন গায়ে গতরে বেড়ে উঠুক।"

"আশীর্বাদ করছি বৌ। সকল সুখে ছাই দিয়ে খোকা বেঁচে থাক।"

ছেলের প্রতি চারুশীলার মমতার কৃতজ্ঞতার পাশে বাঁধা পড়ে আছে ক্ষেমীর মা। তার এই মঙ্গল কামনার ঋণ যেন আরও বেড়ে যায়। মহিমদের সদর গোড়ায় গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে। নীহার কোথায় আছে নিশ্চিত হয়ে নেয় সে।

চারুশীলার একান্ত কাছে সরে এসে চাপা গলায় বলে, "বাবু কলকাতা কেন গেলেন জানেন মা?"

গতকাল সকাল থেকেই মহিমকে দেখতে পান নি চারুশীলা। সে কলকাতা গেছে জানতেন না।

ক্ষেমির মা বলে, "বড় উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে গেছেন। বৌদিদিমণির সঙ্গে বলছিলেন আমি সব শুনতে পেলাম। বুড়ো কর্তা আপনাকে ত্যাগ করেছিলেন, আপনিও কুল ছেড়ে ভিক্ষে করে বেরিয়েছিলে। বিশ্বাস উকিল নাকি বলেছে, এখানকার কোন কিছুর উপর আপনার হক্ দাবী নেই।"

কোঁস করে উঠলেন চারুশীলা।

"দুঃখে হাসি অন্তরে বিঁধে। সতীনের ছেলের এত মিঠে ব্যবহার তখনই কি আমি বুঝিনি ক্ষেমীর মা। ও আমার করবেটা কি? গাছতলায় যার আশ্রয়, তার আর কত চোরের ভয়। বেখিস ছোঁড়ার হাড় জালিয়ে আমি শিক্ষা দিয়ে যাব।"

ক্ষেমীর মা ভয় পেয়ে বলে, "তোমার পায়ে পড়ি মা'ঠান। আমার নাম বলো না। গরীব মানুষ পাঁচ দোর ঘুরিয়ে খাই।"

"তোর নাম কেন বলব। আমাকে এতই বোকা ভাবিস। তার বাপ আমার জীবনটা বরবাদ করেছে। তারই ছেলে আমার চিতায় মুঠ তুলে দেবে? আমিও বাপেশ্বর মুখুজ্জের মেয়ে। চুপ করে শুধু দেখে যা। হারামজাদার দশায় দশা না করে যদি ছাড়ি।"

পাছে মহিমের স্ত্রী বেরিয়ে আসে, তোড়ের মুখে ওখানে আর দাঁড়ায় না ক্ষেমীর মা। ছেলে কোলে নিয়ে চলে যায়।

রোদে মাথা তেতে উঠে। বারান্দায় এসে বসেন চারুশীলা। পুকুরের কাজ সেরে ঘরে এসেছে সুধাময়ী বুড়ি। কাট দিচ্ছে আর আপন মনেই বলে যাচ্ছে। ধুলো উড়ে আসছে বারান্দায়। অন্যদিন সুধাময়ী বুড়ির কোন কথার তাল-পালা ধরে বকর বকর থেকে বকাবকি করে একটানা চুপ করে থাকার অস্বস্তি থেকে ছুটি নেন চারুশীলা। আজ বুড়ির কোন কথাই তার কানে যায় না। তিনি শুধু রেগে নেই, দুশ্চিন্তায়ও পড়েছেন। কিছু থাকার এবং নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটিয়ে যাবার মত কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় যে মাদকতা,চারুশীলা তার উর্দ্ধে যেতে পারলেন না। সংঘাত সেখানেই। উঠান জুড়া ঘরের ছায়া ক্রমে ক্রমে বারান্দার মাঝামাঝি এসেছে। স্নান করতে যাবার জন্য উঠি উঠি করেও উঠতে পারছেন না। চিন্তার আলস্যে পা দু'টি চলতে নারাজ। কাঁ কাঁ রোদদুর। আকাশের দিকে তাকান যায় না। সদরের বাইরে কয়েকটি শিশু কণ্ঠের কথাবার্ত্তা। সঙ্গে একটি মোটা গলার আওয়াজ। সদরের দিকে তাকালেন। বিস্ময়ে তাকিয়েই রইলেন। দশ এগার বছরের দু'টি ছেলের পিছনে দাঁড়িয়ে কানা গণশা।

"গণশা!!!"

"এই তো হয়েছে বামুনদিদি। উঃ, অচেনা পথ কি আন্দাজে চলা যায়। তার উপর কি রোদটাই না উঠেছে।"

"তুমি তাহ'লে সত্যি এলে গণেশ?"

চারুশীলার কণ্ঠে উৎগ্রীবতা ফুটে উঠে, যেন তিনি প্রতীক্ষা করে ছিলেন।

"কাল গাড়ী চেপে বর্দ্ধমান পর্যন্ত চলে গেছলাম বামুন-দিদি। বাবুরা তীর্থ করে কলকাতায় ফিরছেন। গিন্নিটির বড় দয়া। বাসি পরোটা যে ক'খানা ছিল আমাকে দিয়ে দিলেন। সাতখানা পরোটা। সঙ্গে বেগুন ভাজা, আলুর শুকনো দম। খাসা খাওয়া হ'ল। খিদে আর রইল না। রাতটা বর্দ্ধমান ষ্টেশনেই কাটিয়ে দিলাম। সকালে গাড়ী চেপেছি। প্যাসেঞ্জার চলছে চামারদিঘি। নেমে পড়লাম।

"বেশ করেছিস, আমারও একা একা ভাল লাগে না। সোজা এগিয়ে যা।"

লাঠি ঠুকে এগিয়ে এসে বারান্দায় উঠে বসল গণেশ। দু' অংশের মাঝখানে বেড়ার দোরে গিয়ে দাঁড়ালেন চারুশীলা।

"একজন অন্ধলোক যাবে বৌমা। তার জন্যেও দু'টি ভাত ফুটিও।"

নীহার আপত্তি করেন নি। বেড়ার ওধার থেকেই

ভাত ঢেলে দিলেন দুপুর বেলা। কিন্তু বিকেলবেলা আপত্তি জানালেন।

"উনি বাড়ী নেই, একটা উটকো লোক থাকবে, সেটা কি ভাল ?"

চারুশীলা বিনীত হাসিতে বলেন, "ওতো কাণা। ওকে ভয় কি বৌমা ?"

"তবু অচেনা লোক তো ?"

"অচেনা কেন ? ও তো আমাদের কাণা গণশা। চিরকাল তো থাকবে না বৌমা। আজকাল থেকে চলে যাবে।"

"কি জানি আমার ভাল লাগছে না। যাহোক বাইরের লোক তো।"

চুপ করে ছিল কাণা গণশা। মিনতি জানিয়ে বলে, "অন্ধ মানুষ, এই রাত-বেরাতে কোথায় যাব মা। সকালেই চলে যাব। একটু শোবার আশ্রয় পেলেই হবে। খাওয়ার জন্য এতখানি ভাবনা নেই। দুপুরে ঢের খেয়েছি। কি চমৎকার রান্না। অনেকদিন মুখে আস্বাদ লেগে থাকবে।"

প্রশংসায় নীহার হয়ত একটু বিগলিত হলেন।

"তা হলে কি বলছেন। রাত্রে এখানেই থাকবে।"

"তাই থাকুক মা। অন্ধ মানুষ রাতে কি করে যাবে।"

নীহার ঘরের ভিতর চলে গেলেন। প্রসন্ন মনে গেলেন—তাও মনে হ'ল না। উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন চারুশীলা, বারান্দায় উঠলেন।

"দেখলি তো ? খারিক ওটচায বলে নূতন আইনে আমি আটআনা হিস্যার মালীক। দেখলি বৌয়ের ব্যাভার। তোরা এতগুলি পেট। খাচ্ছিস, খেলছিস, ছড়াচ্ছিস, তার হিসেব নেই। আর আমার বেলায় কড়া হিসেব নিকেষ।"

"আমার জন্য ওদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে কাজ নেই বামুনদিদি। হিস্যা নিয়ে কি করবি। পরকালে কি সঙ্গে যাবে। এখানে ভাল খাচ্ছিস, পরছিস, বেশ তো আছিস।

চারুশীলা ঝাঁকালো কণ্ঠে জবাব দেন, "ঝগড়া তোর জন্য হতে যাবে কেন ? তুই কি ভেবেছিস এরা আমাকে থাকতে দেবে ? শুনলি নে, উনি বাড়ী নেই। গেছেন তো কোলকাতায় আমাকে বুড়ো আঙুল দেখাবার জন্য উকিলের মতলব নিতে। শত্রু···শত্রু···। সতীনপোই কখনও আপন নয়, বাকী রইল কে ?"

গণশা আশ্বাস দিয়ে বলে, "না, না, তাড়াবে না। তাড়াবেই যদি তাহলে ঘরে ঠাঁই দিয়েছে কেন। যেমন করেই হোক এদের মন জুগিয়ে থেকে যা। কৈচোর ষ্টেশনে ঝড় জলে ভিজে বেঁচে থাকার দুর্গতির সঙ্গে একবার তুলনা করে দেখ দিকিন !"

চারুশীলা আকাশের দিকে তাকিয়ে কতক্ষণ চুপ করে ভাবেন। বলেন, "না, আমি চলে যাব গণশা। কেউ আমার সঙ্গে মুখের কথাও বলতে চায় না। এখানকার মানুষ বড় ঘেন্না করে।

কাণা গণশা হাসে।

"ঘেন্না আমাদের করবে না কেন বামুনদিদি। আমরা যে ভিখেরী।

চারুশীলা জবাব দেন না। অন্যমনস্কের মত দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

ছয়

সন্ধ্যার পর গণশার সঙ্গে চাঁদের আলোয় বারান্দায় বসলেন চারুশীলা। গণশা অনেকদিনের খবর জমা করে এনেছে। কৈচোর সংবাদ। খোড়া ক্ষেত্র কোথায় পালিয়ে গেছে। বৈকুণ্ঠের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ঘুচিয়ে ফেলেছে বাতাসী। সুযোগ বৈকুণ্ঠর কোমরের বটুয়া থেকে হাত-ছড়াটা কৌশলে সরিয়ে ফেলেছিল বাতাসী। তার মাথায় হাত বুলিয়ে কেটে পড়েছে ক্ষেত্র। বাতাসী অজ্ঞতার ভাণ করেছিল। কিন্তু কথা বেরিয়ে পড়েছে। রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে হাতের লাঠি গাছা দিয়ে বাতাসীর মাথায় সজোরে এক ঘা বসিয়েছিল বৈকুণ্ঠ। ঠিকমত লাগেনি। তাতেও কপালের উপর ইঞ্চি ছেড় কেটে ফিনকী দিয়ে রক্ত পড়েছে। একটা গোটা দিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনি বাতাসী। যখন উঠেছে আছাড় দিয়ে হাঁড়ি ভেঙে বৈকুণ্ঠের সঙ্গে পৃথক হয়ে এসেছে। বৈকুণ্ঠ দিনরাত কাঁদে। বাতাসীর জন্য নয়। হৃত সম্পদের শোকে।

শুনতে শুনতে চারুশীলা অন্যমনস্ক হয়ে উঠেন। গণশা জানতে পারে না।

গণশা হেসে বলে, "বৈকুণ্ঠকে বলেছিলাম বামুনদিদি; বেইমানির ধন বেইমানির পথেই গেছে। শোক করে কি হবে। হারামজাদার বাচ্চা আমার উপর খেঁকিয়ে উঠলো।"

চারুশীলা বলেন, "এমনই হয় গণশা। এরা আমাকে চিরকাল বঞ্চিত করে রেখেছে। কিন্তু তা কি কখনও ভাববে! আমার একমুঠো কুধার অন্ন, মনে করছে তাদের কাছ থেকে কেড়ে খাচ্ছি।"

"তুই মিছে ভাবছিস বামুনদিদি। তোর মত একটা লোকের অন্ন এদের সংসারে কুকুর বেড়ালে খেয়ে যায়। তার জন্ত তোকে তাড়াবে না। কি মাগী মুখ্যু মেয়ে-ছেলে। কি শুনতে আর কি শুনেছে।"

মহিমের ছোট ছেলেটা পরিত্রাহি কণ্ঠে কাঁদছে। চারুশীলা সেই কান্নার শব্দে কান পাতেন।

"কি চেঁচিয়ে কাঁদছে ছেলেটা। মা-মাগী কি একটু ধরতেও পারে না।"

"ধরেনি কি আর। অবোধ শিশু। একবার রোখ চাপলে থামানো কি সহজ।"

চারুশীলার কানে গণশার কথাগুলি প্রবেশ করেছে কিনা বুঝা যায় না। বলেন, "আচ্ছা, তোর কি কোন-দিন ছেলেপিলেতে সাধ যায়নি গণশা?"

"কত দিনিসেই সাধ যায় দিদি। অতের জন্ত তো এ সংসার নয়। মরিনে তাই বেঁচে আছি।"

চারুশীলা আর কথা বলেন না।

কতক্ষণ মৌন থেকে গণশা বলে, "তুই তো তিন বছর শোয়ামীর ঘর করেছিলি। ভগবান তখন তোর কোলে একটা ছেলে দিতে পারল না? তাহলে কি এমনভাবে তাড়াতে পারত?···

"আমার ছেলে হয়েছিল।"

"হয়েছিল?"

"হাঁ মরা ছেলে।"

"আহা-হা। বেঁচে থাকলে আজ কত বড়টি হ'তো।"

চারুশীলা জবাব দেন না। মিনিটখানেক নীরব থেকে বলেন, "সে কাহিনী তোর শুনে কাজ নেই।"

"তোর যদি কষ্ট হয়, তো থাক।"

রাত্রে গণশা মেঝেতে শোয়। গণশার চিরকালের অভ্যাস অনেক রাত অবধি বকবক করে ঘুমিয়ে পড়া। আজ চারুশীলাই বেশী কথা বলেন। দীর্ঘদিনের অনেক গুমোট মনে রুদ্ধ হয়েছিল। লোক লজ্জার ভয়ে মুখে আনতে পারেন নি। আজ বিমুক্ত না করে স্বস্তি পান না। ভাবাবেগের স্রোতে সমস্ত দ্বিধা সংকোচ আলগা হয়ে আসে। দুঃখের গোটা জীবনটা গণশার কাছে মেলে ধরেন।

মা মুহ্যমান শয্যায়। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি। নিকষ অন্ধ-কার। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠছে। শিয়রে বসে মায়ের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন চারুশীলা। ঘরে আর কেউ নেই। পাশেই সিঁড়িঘর। মাঝখানে দরজা খোলা। তরঙ্গিনী কি সিঁড়ি ঘরে ঘুমোচ্ছে। এ ঘর থেকে তাকে দেখা যায়। বুড়ী হয়েছে তরঙ্গিনী। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। গত তিনরাত সেও সকল সহ্য করেছে। আর পারছে না। সন্ধ্যা থেকেই মরার মত ঘুমোচ্ছে। এ ঘর থেকে মেঝের বিছানার মানুষটার অস্তিত্ব সহসা ঠাহর করা যায় না।

চারুশীলার জীবন ভয় করছে। আজন্ম কাল শুনেছেন মৃত্যুকালে যম দূতেরা এসে দেহ থেকে প্রাণটা কেড়ে নিয়ে যায়। তারা হয়ত ঘুরে বেড়াচ্ছে এই ঘরের চারপাশে। বৃষ্টির জলের সঙ্গে তাদের পায়ের শব্দ। অসহ্যকষ্ট হচ্ছে চারুশীলার। তার নিঃশ্বাসও যেন আটকে আসবে। সংসারে তাঁর একমাত্র ভরসাস্থল মা। তিনিও চললেন। তাঁর দিকে ফিরে তাকাবার কেউ নেই। বারে বারে চোখে জল আসছে। কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। এই জল মুছে ফেলবার শক্তিও নেই। অন্তরে রুগ্ন,দেহে অবসাদ। দু'দিন ধরে স্নানাহার এক রকম হচ্ছেই না। মাথা ছিঁড়ে পড়ছে যন্ত্রণায়। আচ্ছন্নের মত শিয়রে বসে আছেন তবু। রোগে ভুগে মায়ের শরীর বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে। বেঁচে আছেন কিনা বুঝা যায় না। নিষ্পলক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখের পাতা কিংবা ঠোঁট ঈষৎ নড়ে। বুকের উপর হাত রাখলে পাঁজরার শুষ্ক হাড় ক'খানার নীচে ক্ষীণ দ্রুত দ্রুত স্পন্দন অনুভব করা যায়। এক সময় মার ঠোঁট দু'টী বিকৃত হ'ল। নাসা রন্ধ্র বিস্ফারিত। বড় বড় চোখ করে তাকালেন। অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। যেন প্রাণপণ

চেষ্টায়ও কথা বলতে পারছেন না। কয়েক মুহূর্ত। তারপর চোখ বন্ধ হয়ে গেল। ঠোঁট, চোখের পাতা নিষ্কম্প। মানুষের মৃত্যু চারুশীলা দেখেন নি। মরবার সময় কেমন হয় জানেন না। হাতের স্পর্শে বুকের স্পন্দন পরীক্ষা করতে সাহস হল না। দেহ থেকে প্রাণটা যদি বেরিয়ে গিয়ে থাকে। অশরীরী আত্মা হয়ত ঘরেতেই রয়ে গেছে। অনেক অপেক্ষা করে স্পন্দন বা কম্পন দেখতে না পেয়ে সাহস করে মার বুকের উপর আলতো হাতখানা রাখলেন। ধুক ধুকানি থেমে গেছে।

আর্তনাদ করে উঠলেন চারুশীলা। তরঙ্গিণী ঝি ছুটে এলো। বড়দা ছোড়দা মায়ের ঘরের বাইরে থেকে চুপি দিয়ে চলে যেতেন, আজ ভিতরে এলেন। ছোট বৌদিও এলেন। এলেন না বড়বৌদি। তিনি অন্তঃসত্ত্বা। মৃতের ঘরে আসতে নেই।

শেষ রাত্রে বৃষ্টি থেমে গেল। পাড়ার লোক জড় হ'ল। দাহ করবার জন্য মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গেল। দুর্দ্ধার আকর্ষণে চারুশীলাও শ্মশানে গেলেন।

চারুশীলার চেতনা ছিল না। আঁচল থেকে চাবিটা কখন উধাও হয়েছে কিছুই বুঝতে পারলেন না।

দিন দুই বাদে উঠান ঝাট দিতে গিয়ে তরঙ্গিণী বুড়ি কুড়িয়ে পেল চাবি গোছা। পরদিন তিনটি তালা খুলে যখন কাঠের সিন্দুকের তালা তোলা হ'ল, চারুশীলা দেখলেন সমস্ত জিনিস ঠিক আছে। নেই কেবল গয়নার বাক্সটা। চারুশীলা আবার মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়লেন। ঐ বাক্সেই মায়ের গয়না তার বিয়ের গয়না এক সঙ্গে তোলা ছিল।

কিন্তু একেবারে নিঃসম্বল হলেন না চারুশীলা। হাতে দু'গাছি মোটা বালা, গলায় সরু বিছে হার, বিয়ের আংটী কানফুল আর দেওয়ালের গর্তে লুকানো মায়ের কয়েক শ' টাকা। তাঁদের খাওয়া পরার ভাবনা যখন নেই, তাঁর একেলা জীবনের পক্ষে এই যথেষ্ট।

কয়েক মাস না যেতেই ঘরখানা ছেড়ে দিতে হ'ল। একখানা ঘর এবং কয়েক বিঘে জমি স্ত্রীকে ভোগোত্তর লিখে দিয়েছিলেন বাণেশ্বর মুখার্জি। জমি দু'ভাই ভাগ করে নিলে। ঘরখানাও তাদের প্রয়োজন। ভাইয়েরা তাকে একেবারে আশ্রয়চ্যুত করলেন না। সামনের পুকুরের ধারের ছোট একখানা টালির চালাঘর তুলে দিলেন। ধান চাল ইচ্ছে হ'লে সামান্য দিতেন। তাতে জীবিকা নির্ব্বাহ হ'তো না। গ্রামের জ্ঞাতি স্বজনদের কাছে হাত পাততে হতো।

দীর্ঘ চার বৎসরের মধ্যে মাধব ঘোষাল ভুলেও চারুশীলার খোঁজ নেন নি। আবার বিয়ে করেছেন। তবু এই দুঃখের দিনে মাধবনাথকে পাঁচ ছ'খানা চিঠি লিখেছিলেন চারুশীলা। লিখেছিলেন, সুখ সম্পদের আশা নেই। তবু জীবন তো যাচ্ছে না। মাথার উপর এক ফালি চাল আর দু'মুঠো অন্ন—এর অধিক তাঁর দাবী নেই। কিন্তু কোন চিঠির জবাব আসে নি।

তাঁর কুঁড়ে ঘরখানিতে আসতো সুদর্শন আর শ্যামদাসী বোষ্টমী। তাঁদের পাশের গ্রাম উদিতপুরে ডেরা। গান শোনাত।

সুদর্শন খেদ করে বলতো,…রাজার মেয়ে হ'ল ঘুটেকুড়ানি। আহা-হা। দেখলেও বুক ফেটে যায়।

শ্যামাদাসী বলতো, "স্বামীর সংসারেই বা কম কি। আমরা তো জানি।"

চারুশীলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলতেন, "আমার যে সাগর শুকানো ভাগ্য শ্যামাদাসী।"

সুদর্শন বলতো, "সবই কেষ্টর লীলা। কাকে যে কোন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে মুক্তি দেন, কে বুঝবে।"

কথাটা শ্যামদাসীই পেড়েছিল।

"ডাক্তার বদ্যি তোমার মা কম করেননি দিদি। তোমার এ অসুখ ওষুধে সারবে না। দেবতার কোপ পড়েছে। তার কাছে ধর্ণা দাও।"

"দেবতার কাছে মন্তি মানত কম করিনি শ্যামাদাসী। ভাগ্য দেবতাই কিসে?

"যিনি ভাগ্য লিখে দেন, তিনি ছাড়া সে লেখা কেউ মুছতে পারে না দিদি। অসুখটা সেই পায়ের আঙুলেই রয়ে গেছে। ছাড়েনি। আমার মনে হয় রাধানাথ তোমাকে বেশী ভুগাতে চান না।"

সুদর্শন বলেছিল, "থান মাহাত্ম্য ও আছে দিদি। গ্রামের চরণ ধুলো ব্রজের মাটী। সেখানে গড়াগড়ি দিয়ে কত রোগ সন্তাপ থেকে মানুষ মুক্তি পেয়ে যায়। লালা-

বাবুর মত পাপী লোকও কৃষ্ণপ্রেমের চোখের জলে ঠাকুরকে পেলেন।

সেই কাহিনীটাই বলেছিল সুদর্শন। আশ্চর্য নিবিষ্টতায় চারুশীলা শুনেছিলেন।

এখানে এসেই সুদর্শন বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য বলতো। সাধু সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তির দৃষ্টান্ত শোনাত।

চারুশীলা বলতেন, তিনি মেয়েছেলে। এই বয়স। যাবেন কার সঙ্গে।

সুদর্শন বলেছিল, "বহুদিন ধরে আমাদেরও যাবার সাধ দিদি। শ্রীকৃষ্ণের দয়ায় সেখানে কেউ উপোস থাকে না। ভিক্ষে করেই চলে যায়। কিন্তু রেলভাড়া তো চাই। তিনি না টানলে জোগাড় হবে না।"

চারুশীলা এক পিঠের ভাড়া দিতে সম্মত হয়েছিলেন।

আশ্বিনের এক রৌদ্র ধোওয়া দিনে শ্যামাদাসী সুদর্শনের সঙ্গে তীর্থে বেরুলেন চারুশীলা। একগাছি বালা বাঁধা দিলেন। কারুরো মানা করলেন না। দুখ ফুটে মতও দিলেন না। বোধহয় তারা খুশিই হয়েছিলেন। বর্দ্ধমানে গাড়ী বদল করে পশ্চিমের গাড়ীতে বসলেন। কাশীতে কাটালেন দু' রাত্রি।

এলেন বৃন্দাবনে। সনাতন গোস্বামীর মন্দিরের কাছে ঘর নিলেন। সুদর্শন শ্যামাদাসী ভিক্ষায় বেরোত। সুরেলা কণ্ঠ সুদর্শনের। ছিমছাম চেহারা শ্যামদাসীর। ভিক্ষের আশে তিনটে মানুষের চলে যেতো। সুদর্শন বলতো, রাইরাজীর রাজ্যে এসেছি, দু'টো দিন শান্তিতে থেকে যাই দিদি। রাসোৎসব না দেখে ফিরছি নে।

তারপর যেন কেমন ধারা হতে লাগলো। ছলছুতো করে প্রায় দিনই ভিক্ষের বেরোত না সুদর্শন। শ্যামদাসী যেতো একেলা। ঘরে বসে কৃষ্ণপ্রেমের লীলা মাধুরীর কত কাহিনী শোনাত সুদর্শন। বলতো কলঙ্ক ভঞ্জনের পালা। মীরাবাইয়ের সাধনা।

সুদর্শন বলতো, "রাধামাধব আমার প্রেমের দেবতা। প্রেমের ভিতর তাকে যে পেয়েছে, সেই পেয়েছে। প্রেমের চেয়ে মহৎ আর কিছু নেই। তোমার হৃদয়ে যখন তার প্রেমের বাঁশী বেজে উঠবে, তখন আর কোন কলঙ্ককালিমা দেহে লাগবে না। যেমন লাগেনি আমার রাইবিনোদিনীর। কলঙ্ক লাগেনি রাসী গোপীনীর।

চারুশীলা তন্ময় দৃষ্টিতে সুদর্শনের মুখের দিকে তাকিয়ে শুনতেন। চল্লিশ বছরের সুদর্শনের দৃষ্টি অসীম বিস্ময়ে উজ্জ্বল। নিবিষ্টতায় তীক্ষ্ণ। আর চারুশীলা যেন বুকের মধ্যে তার বাইশটি বছরের ধুকধুক স্পন্দন শুনতে পেতেন।

বাইশ বছরের কাছেই তার পরাজয় হ'ল। বিশ্বাস, সংস্কার সংযম ভেসে গেল।

শ্যামাদাসীর চোখে তারা ধরা পড়ে গেলেন। কাঁদলো শ্যামাদাসী। চিৎকার করে, গালাগালি পেড়ে লোক হাসালো। দিনকয় বাদে অপর এক বোষ্টমের সঙ্গে কোথায় চলে গেল।

সুখ সবে যখন বুঝতে শিখেছেন, সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছলো চারুশীলার। এখানে মুক্তস্বাধীন স্বেচ্ছাগত জীবন। এতদিনে সুখ পেলেন। গভীর রাত্রে গোপীনাথের মন্দিরে বিগ্রহ সাক্ষী রেখে কণ্ঠি বদল করে তিনি হলেন শ্যামপথের পথিক।

সেই দিনগুলি মধুর সুরের মত এখনও মনে লেগে রয়েছে। চোখ বুঁজে স্মৃতির ছায়া ছায়া বেলাভূমিতে এখনও বুঝি তাদের স্পর্শ করা যায়।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন চারুশীলা।

কয়েকটা মাস স্বপ্নের মত কেটে গেল। তারপর এল দুঃখের দিন। শরীর ভেঙ্গে পড়লো। তবু পরিতৃপ্তি সমস্ত অঙ্গ স্পর্শ করে লেগে রয়েছে। চরম সার্থকতা তাঁর রক্তের মধ্যে উন্মেষের প্রতীক্ষায় দিন গুনছে। দেহ ভারী হয়ে উঠেছে। নানাপ্রকার উপসর্গ। শেষ পর্যন্ত শয্যা নিলেন চারুশীলা। উঠতে পারতেন না। অবশিষ্ট এক-গাছি বালা, গলার হার, কানের দুল, বিয়ের আংটি সেই দুর্যোগের টানে ভেসে গেল। সেই দুর্দশার মধ্যে তার কোলে এল ছেলে। মরা ছেলে। তিনি শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য সেই মরা মুখখানি দেখলেন। কালিন্দীর বালুচরে তাকে পুঁতে রেখে এল সুদর্শন।

এতদিন ছিল বুক ভরা আগ্রহ। একটি পরম সফল স্বপ্ন। বাঁচবার আশা। সেও গেল। আরও ভেঙ্গে পড়লেন চারুশীলা। হোমিওপ্যাথ ডাক্তার জবাব দিয়ে গেল। অর্থ নেই, সম্বল নেই। বাঁচবার কোন আশাই নেই। মৃত্যুকে সামনে রেখে যেন অপেক্ষা করছেন। বারে বারে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। ঠিক এই অবস্থায়

এক গভীর রাত্রে লালাবাবুর মন্দিরের নাটশালায় তাকে শুইয়ে দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সুদর্শন।

পোড়া জীবন তবুও গেল না। পূজারীদের দয়ায় তীর্থযাত্রীদের অনুকম্পায় ঠাকুরের প্রসাদ খেয়ে আবার বেঁচে উঠলেন চারুশীলা। ধীরে ধীরে শক্তি ফিরে এল। ভিক্ষাই হ'ল একমাত্র উপজীবিকা।

অনেক তীর্থ অনেক দেশ ঘুরে তিন বছর বাদে বাপের ভিটায় ফিরে এলেন চারুশীলা। কুঁড়ে ঘর খানার চিহ্নও অবশিষ্ট নেই। শ্যামদাসী নবদ্বীপে নূতন গোঁসাইর কাছে আছে। গ্রামে এসে অনেক কেচ্ছা রটিয়ে গেছে। দু' ভাই খেঁকিয়ে তাড়ালেন। সংসারে আর কোন আশ্রয় মিলল না।

সেদিন অনেক কেঁদেছিলেন চারুশীলা। মনের খেদে শাসিয়ে এসেছিলেন, গ্রামের ষ্টেশনেই আমি ভিক্ষে করব। দেখি বাপেশ্বর মুখার্জীর ছেলেদের মান মর্য্যাদা কত বাড়ে।"

সেই ষ্টেশনে অবশ্য থাকেন নি। দু'টী ষ্টেশন পার হয়ে এসেছিলেন কৈচুরে।

চারুশীলা তার কাহিনী শেষ করলেন।

গণশা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

সজোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন চারুশীলা।

সাত

সকালে ঘুম থেকে উঠে গণশা বলে, "একটা বিড়ি দে বামুনদিদি। ওখানে কারো কাছে আর বিড়ি পাইনে। সব শালা নিজ স্বার্থপর।"

রাত্রি আর দিনের মধ্যে পার্থক্য ব্যাপক। রাত্রে শ্রুতি সমুদ্র অবগাহন করে যে সান্ত্বনা তিনি পেয়েছিলেন, সকাল যেন সেই কোমল অনুভূতিকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। মনে হল, এখানে সমস্তই ফাঁকা। তার মন যেন বহুদূরের পথের পানে তাকিয়ে আছে। এই অবরোধের মধ্যে যেন তিনি বাঁচবেন না। গণশা আজ চলে যাবে। চারুশীলার ইচ্ছে হয় আরও দু'চারটে দিন সে থাকুক না। মাসাবধিকাল ধরে নিস্তব্ধতার অনেক বোঝা চেপে বসেছে তাঁর বুকে। সে চলে গেলে কার কাছে তিনি ভার নামাবেন।

কাল যে রকম মুখিয়ে উঠেছিল নীহার, গণশার থাকা না থাকার ব্যাপারে নিজের ইচ্ছার উপর জোর দেবার সাহস আর চারুশীলার নেই। তবু সে কিছু না খেয়ে চলে যাবে ভাবতে কষ্ট হয়। উঠানের বেড়ার ধোরে গিয়ে দাঁড়ালেন চারুশীলা। ঝাঁপটা বন্ধ। খুললেন না।

ডাকলেন "বৌমা।"

নীহারের পরিবর্ত্তে বেরিয়ে এল মহিম। অনেক রাত্রে কখন সে ফিরেছে চারুশীলা টের পান নি।

"কিছু বলবে?"

চারুশীলা ইতস্তত করে বলেন, "বৌমাকে একটু ডেকেছিলাম।"

কেন, মহিম সে প্রশ্ন করে না। তার আগেই কৈফিয়ৎ চায়।

"বাড়ীতে একটা বাইরের লোককে আশ্রয় দেওয়া কি তোমার উচিত হয়েছে?"

"একজন অন্ধ। আজকেই চলে যাবে বাবা।"

"এক্ষুনি বেরিয়ে যাক। আশ্চর্য্য বলি তোমার সাহস। শোবার ঘরে একটা বাইরের পুরুষ মানুষকে রাখলে। একটু দ্বিধা সংকোচও হ'ল না।"

চারুশীলার মুখ শুকিয়ে গেল। গণশা আবার শুনতে পায় কিনা আড় চোখে দেখলেন। জোর করে মুখে বিদ্রূপের হাসি টেনে এনে গলা খাট করে বললেন, "ছিঃ বাবা। আমার বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে।"

মহিম লজ্জা পেয়েছে বলে মনে হল না। স্নেহের কণ্ঠে বলে, "পঞ্চাশ বছর তোমার চিরকাল ছিলনা। স্থানে অস্থানে ঘুরে বেড়িয়েছ। কার সঙ্গে তোমার কি আছে লোকে কি করে জানবে?"

অসহ্য অপমানে জ্বলে উঠলেন চারুশীলা। নিজেকে সংবৃত রাখবার একটুও চেষ্টা করলেন না। গলা ছেড়ে বলেন—

"আটকুড়ির ব্যাটার কথা শোন একবার। আমাকে তাড়াতে চাস মুখে বললেই হয়। লাথি মেরে চলে যাব। আমি কি তোর তোয়াক্কা রেখে আছি। ত্রিশটা বছর যে হালে গেছে বাকী দিনও সেই হালে যাবে।"

মুখ কালো হয়ে উঠে মহিমের।

"এর মধ্যে তাড়াবার কথাটা কোথায় পেলে?"

"আর কি বলবি। এরপরে গলা ধাক্কা দিবি।"

"এখানে সমাজ আছে, স্বজন আছে, পাঁচজনে পাঁচ কথা চাওর করবে, তাই না বললাম। তোমাকে বুঝে চলতে হবে। বাড়ীতে একটা ভিখিরির আড্ডা জমালে লোকে গলা কাটিয়ে নিন্দে করতে ছাড়বে।"

"কাটা মারি তোর পাঁচ জনের মুখে। ঘরের বৌকে যখন তাড়িয়ে দিয়েছিল তখন গ্রামের পাঁচজন ছিল কোথায়?"

চুপ করে বারান্দায় বসেছিল গণশা। লাঠি ঠুকে মাক উঠানে এসে দাঁড়াল।

"কেন দাঙে মকাকে লাগতে গেলি বামুনদিদি। বাবু ঠিক কথাই বলেছেন। মানুষের মুখ তুই কি করে বন্ধ করবি।"

আরও দু'কদম এগিয়ে এসে গণশা হেসে বলে, "বামুন-দিদি আমার মায়ের মত। এক জায়গা থেকে মায়া পড়ে গেছে। দিদির মনটা খুব উঁচু দাদাবাবু। বেয়াল হল তাই দেখতে এলাম। আমি এখুনি চলে যাব।"

যার জন্যে চুরি সেই কিনা পথে বসায়।

"এখুনি যাবি কি?" ধমক দিয়ে উঠলেন চারুশীলা। "আমি বলছি না খেয়ে যাবনে।"

"কেন এমন করছিস? আমরা ভিখিরি। এক দোরে না পেলে অন্য দোরে যাই। ভগবান যখন মুখ দিয়েছেন অন্নও দেবেন। যদি না দেন বুঝব তাঁর ইচ্ছে।"

দোরটা আস্তে আস্তে বন্ধ করে দেয় মহিম।

চারুশীলা বিকৃত কণ্ঠে বলেন, "দেখলি গণশা। দেখলি কত নীচ এরা। কেমন ইতরের মত কথাবার্তা।"

"চুপ কর বামুনদিদি। সুখে আছিস, যে কদিন হয় থাকনা।"

"না থাকবনি। চলেই যাব এখান থেকে। কি সুখটা আছে বল। ওরা তো ঘৃণাই করে। একটা মানুষ আছে কথা বলবার।"

"না না থাক। ষ্টেশন থেকে তো মোটে এক মাইল। মাসে দু' চারবার আসব। ঘণ্টা দু' ঘণ্টা দোরে বসে কথা বলে চলে যাব। এমন সুখের অন্ন কোথাও পাবিনে। একি হেলায় হারাতে আছে।"

কাণা গণশাকে রাস্তায় তুলে দিয়ে বারান্দায় এসে বসলেন চারুশীলা। সমরে আজ আর বললেন না। গণশাকে কেন্দ্র করে মহিমের সঙ্গে যে কথা কাটাকাটি হয়েছে কেবল সে জন্যই নয়, গণশা চলে গেছে বলেও মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। এখানে অন্ন বস্ত্রের অভাব নেই এ যেমন সত্যি, কিন্তু প্রতিটি ব্যবহার যে ভাবে পেয়ে এসেছেন এবং দীর্ঘকালের অভ্যাসে যে পরিবেশের সঙ্গে তিনি মিশে গেছেন তার সঙ্গে বর্ত্তমানের কোন সঙ্গতি নেই এ সত্যও অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে তাকে মানসিক সংঘাতের মাঝখানে এনে দাঁড় করিয়ে দিল। সিদ্ধান্তের দিকে তিনি এগোলেন না। মহিমের কোন কথাটা কত তীক্ষ্ণ, কাণা গণশা এখন কতদূর রাস্তা চলে গেছে; খোঁড়া ক্ষেত্রর হদিশ আর কোনদিন পাওয়া যাবে কিনা এবং বাতাসী নুলো বৈকুণ্ঠকে ত্যাগ করে গিয়ে কী পরিমাণ অন্যায় করেছে এই সমস্ত এলোমেলো ভাবনা তার শুন্যে থাকা অন্যমনস্ক মনে ভেসে বেড়াতে লাগলো। বারান্দায় বসে থেকেই দেখতে পেলেন ভাল কাপড় জামা পড়ে বেশ পরিপাটি বাবুটি সেজে মহিম বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। ষ্টেশনের দিকে যাচ্ছে। হয়ত কলকাতা যাবে, বড় উকিলের কাছ থেকে আরও ভাল পরামর্শ নিতে। মহিমের প্রতি বিন্দুমাত্র মমতাও আর অবশিষ্ট রইল না। কি ভাবে তাকে বঞ্চিত করবেন, আঘাত দেবেন, এক ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসা পরাধীনতায় অস্থির হয়ে উঠলেন। কিছুই ঠিক পেলেন না। চুপ করে বারান্দায় বসে রইলেন অনেকক্ষণ। আম গাছটার নীচে থেকে যখন ক্ষেমির মার ছেলের কান্নার শব্দ ভেসে এল, চারুশীলা রেগে গেলেন। কেবল ক্ষেমির মার উপরে নয়। ছেলেটার উপরও। তার কাছ থেকে উপরি আদায়ের লোভে সুখে শয়তানটা যেন চালাকী করে কাঁদছে। রাত্রির ভুক্তাবশিষ্ট গোটা তিন রুটি এবং খানিকটা আখের গুড় রেখেছিলেন। রাস্তায় খাবার জন্য গণশাকে দিয়ে দিয়েছেন। দেবার মত আর কিছু নেই। তবু চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না চারুশীলা। দরজা দিয়ে বাইরে এলেন। ছেলেটি তার প্রতি তাকালো। কান্নার চোখে উজ্জ্বল খুশিতে এমন মিষ্টি হেসে উঠলো ছেলেটি। চারুশীলা অনুভব করলেন তাঁর অন্তরের গভীরতম কোন পর্যন্ত যেন সেই হাসির ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। চারু-শীলাও হাসলেন। মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসলেন।

"বড্ড দুষ্টু হয়েছিল। কিন্তু তোকে কি দিই বল দিকিন ?"

ভিতর বাড়ী দিয়ে খিড়কির পুকুরে গিয়ে হাজির হলেন চারুশীলা। একটাল এঁটো বাসন নিয়ে বসেছে ক্ষেমীর মা। ছাইমাটি দিয়ে রগড়াচ্ছে। রাগ আর ছিল না। তবু কণ্ঠে স্নেহ জড়িত তীক্ষ্ণতা এনে বললেন, "বলি তোর আক্কেলখানা কি ক্ষেমীর মা। তোর বাবা কি আমার কাছে জমিদারী গচ্ছিত রেখে গেছে, রোজ সকালে আমি তোর ছেলেকে খাওয়াব ?"

ক্ষেমীর মা জিভ কেটে বলে, "এ তুমি কি বলছ মা। আমরা গরীব কাঙাল। বাবু-ভদ্র লোকেদের দোরে খেয়েই আমাদের ছেলেমেয়ে মানুষ।

"চারঘরে একটা দুধের বাচ্চা যদি দোর গোড়ায় চেঁচায়, মানুষ কি কানে তুলো দিয়ে থাকবে।"

"এতো একটা মানুষেরই বাচ্চা মা। রাঁ্যা বন্ধ করব কেমন করে! বল পিঠে না হয় দু'ঘা দিতে পারি। তাতে কি চুপ করবে ?"

"পিঠে তো বেশ দু'ঘা দিতে পারিস। হাতে কিছু নিয়ে এলিনে ক্যান ?"

"পাব কোথায় মা। আমার মনিবকে তো জান। হাত দিয়ে জল গলে না।

"জল গলে না, এমন মনিবের কাজ করতে আসিস কেন। মরণ হয় না।" ভিক্ত কণ্ঠে সুর করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উচ্চারণ করেন চারুশীলা। আঁচল থেকে একটা সিকি ফেলে বলেন, "নিধু ময়রার দোকান থেকে এক বাণ্ডিল বিড়ি নিয়ে যায়। অমনি ছেলেটার জন্যও দু' পয়সার কিছু কিনে আনিস।"

যেতে হবে মা, লুকিয়ে। মাগী দেখতে পেলে চেঁচাবে।

পুকুর পাড়ের জঙ্গল ভেঙে দ্রুত চলে যায় ক্ষেমীর মা। চারুশীলা আবার সদরে আসেন। ছেলেটা আবার কাঁদছে। চারুশীলাকে দেখে আবার থেমে গেল। হাসে। কথা ফুটেনি। তবু কথা বলতে চায়।

"ও···ও···ও-মা···"

শব্দ গুলির আবেদন উপেক্ষা করতে পারেন না চারুশীলা। কাছে যান। নিজেকে সংবৃত রাখা অসম্ভব হয়ে উঠে। বাঁধন খুলে ছেলেটাকে কোলে তুলে নেন। চারুশীলার সমস্ত দেহে শিহরণ উঠে। বুকের মধ্যে এই ছোট্ট শিশুটির স্পর্শ উত্তপ্ত তৃষ্ণাকে যেন আরাম করে দিচ্ছে। একেই যেন চেয়েছিলেন। তার বহু বছরের উন্মুখ মাতৃত্ব এর জন্য যেন নিঃশব্দ প্রতীক্ষায় কাটিয়েছে। বিষয় বৈভবের সমস্ত লোভের চেয়ে এই শিশুটিকে পাবার আকাঙ্ক্ষা তীব্র। চারুশীলা চারিদিকে তাকান। মাঠের কাঁচা রাস্তা দিয়ে সোজা এক মাইল হেটে গেলে ষ্টেশন। নিধু ময়রার দোকান ও পথে নয়। চঞ্চল হয়ে উঠেন চারুশীলা। আঁচল দিয়ে শিশুটির সমস্ত দেহ ঢেকে ফেলেন। ছুটতে সুরু করেন। ষ্টেশনের দিকে প্রাণপণে ছুটেন। শিশুটি ভয় পায়, কেঁদে উঠে। আঁচলের একটা প্রান্ত ঠেসে দেন তার মুখে। যাতে আওয়াজ না বেরোয়। ছেলেটা ছটফট করছে। দু' পা সজোরে ছুড়ে মারছে।

ছেলেটা থেমে গেছে। তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না। কিন্তু যে আর্তনাদ থেমে গেছে, চারুশীলার স্নায়ুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন প্রবেশ করেছে তা। পাক খাচ্ছে। থমকে দাঁড়ান চারুশীলা। হঠাৎ মন যেন বাধা হয়ে উঠে। তিনি তো মা নন। এর তো মা আছে। চারুশীলার ভয় হচ্ছে। আবার ব্যস্তভাবে জামের চারাটার নীচে ফিরে আসেন। বাগদীদের দু'টি বাচ্চা মেয়ে ছাড়া কেউ দেখেনি। স্বস্তি বোধ করেন। ওধারের সদরে এসে উঁকি দেন। নীহারের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।

ছেলেটা কাঁদছে! প্রাণপণে কাঁদছে। নিজের সদরে এসে চোরের মত দাঁড়ান চারুশীলা। ক্ষেমীর মা দোকান থেকে ফিরছে দেখে ভয় আরও বেড়ে যায়। ক্ষেমীর মা কাছে আসতেই ছেলেটা মাকে জড়িয়ে ধরে।

ধীরে ধীরে ভিতরে সরে আসেন চারুশীলা।

সমস্ত দিন চারুশীলা চুপ করে ভাবেন। জীবনের শেষ প্রান্তে হাজির হয়েছেন। মাতৃত্বের রোগাতা অন্তর্হিত। তার কেউ নেই। বিষয় ?—জীবন শেষ হয়ে এসেছে, আর কি হবে। শান্তি ?—নেই। বহু মানুষের আশা যাওয়ার পথের ধারে তিনি বসেছিলেন। বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার রসে দারিদ্র্যের পীড়া তিনি ভুলতে পেরেছিলেন। এখানে তার কিছু নেই। এখানে তিনি একান্ত রিক্ত।

বৃন্দাবনের পথ। গোপীনাথ মাধবজীর মন্দির, কালীদহন ঘাট, নিধুবন, যমুনার দীর্ঘ জলরেখা ঘুরে ফিরে বার বার মনে ভীড় করে আসে। সেদিন অন্তরে ভক্তির দীপ জ্বালাতে পারেননি। বাইশ বছরের দেহের তপ্ত দাহন দেবতাকে অন্তরের মন্দির থেকে সরিয়ে রেখেছে। চারুশীলার মনে হয় গ্লানি ছাড়া কিছুই তিনি সঞ্চয় করতে পারেননি।

বিকেলে আবার সদরে বসে থাকেন চারুশীলা। কিছুই আজ ভাল লাগছে না। অন্ধকার ধীরে ধীরে নেমে আসছে। তার চেয়েও অন্ধকার যেন মনের নিভৃতে স্তরে স্তরে সাজানো। অনিশ্চয়তা। নিজেকে নিয়ে অসহায়। কাজ সেরে ওধারের সদর দিয়ে বেরিয়ে ক্ষেমীর মা কাছে এল।

পলা খাট করে বললে, "বাবু আজকেও কোথায় যেন গেছে। বোধহয় তোমার ব্যাপারেই গেছে। কি করে তোমাকে ঠকাবে ভেবে ভেবে মানুষটা যেন ক্ষেপে গেছে।"

"তোকে কে বলে?"

"বৌদিদিমণি। তুমি নাকি একটা কাণা ভিখিরীকে সারা রাত শোবার ঘরে রেখেছিলে। বলে—কি ঘেন্না। বুড়ির লজ্জা সরমও নেই।"

রাগে চারুশীলার কান দু'টী গরম হয়ে উঠলো। জবাব দিলেন না।

ক্ষেমীর মা বলে, "জান, বলেছে তুমি নাকি এখানে কিছুই পাও না। বড়বড় উকিল তাই বলছে। আর দু'-চারটা দিন। তারপর নাকি তোমাকে ভদ্রি গুটাতে হবে।"

"বকিসনে," ক্ষেপে গিয়ে চীৎকার করে উঠেন চারুশীলা।

ভয় পেয়ে ক্ষেমীর মা চলে যায়। আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে চারুশীলা উঠেন। ভিতরে যান না। গ্রামের রাস্তা ধরে এগিয়ে যান।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। হালকা অন্ধকার। মহিম বাড়ী নেই। চারুশীলা নিশ্চিন্ত। তবু কেউ যদি দেখে ফেলে, সন্তর্পণে পথ হাঁটেন।

ভিতর দালানে ডাকে খাতির করে বসালেন যারিক ভটচায।

"তাহলে মনস্থির করেছ বৌঠান।"

"হ্যাঁ ভাই। গোপীনাথ আমাকে টানছেন। আমি বৃন্দাবন চলে যাব। আপনি ব্যবস্থা করে দিন।"

"নিশ্চয়। নিশ্চয়! তার আগে তোমাকে একবার বর্দ্ধমানে সদর রেজেষ্ট্রী অফিসে যেতে হবে।"

"যাব।"

"কবে।"

"কাল বল কাল। কিন্তু কি দেবেন?"

"শুনছি বিষয়ে নাকি তোমার লব হয় না। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে হিঁদুর ঘরের বৌর কোন দাবী অধিকার থাকে না। তবু যখন তুমি দেবস্থানে গিয়ে মরতে চাও কিছু ধরে দেব।"

"একেবারে ঠকিয়ো না—"

"সামান্যই দেব—"

সামান্যই চান চারুশীলা। পাথেয় এবং কিঞ্চিৎ সম্বল। বিষয়ে লোভ নেই। অর্থের আসক্তিও যেন আর নেই। ভিক্ষা সাধনমার্গের অঙ্গ। ভিক্ষা করেই কাটিয়ে দেবেন।

যারিক ভটচাযের গৃহে অধিককাল বসেন না চারুশীলা। বৃন্দাবনের ছবি মনে মনে ভেবে, ভবিষ্যতের কল্পনায় অন্যমনস্কভাবে আবার বাড়ীর পথে ফিরে আসেন। শীতের আমেজ পড়েছে। গ্রামের পথ নির্জ্জন। ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে।

মহিমের সদর পার হতে গিয়ে বাধা পেলেন। ভাবতে পারেন নি, সদরের ভিতরের দিকে অন্ধকারে মোড়া পেতে বসে আছে মহিম।

"কোথায় গেছলে?" রূঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন এলো।

"পুব পাড়ায়।"

"যারিক খুড়োর বাড়ী। আমি সব টের পাই।"

"আমি তার কাছে ঋণী মহিম।"

"আমার সর্ব্বনাশ করবার পরামর্শ যখন দিচ্ছে ঋণী তো অবশ্যই।"

"তোমার ক্ষতি করবার পরামর্শ তো দেয় নি।"

"ন্যাকামী রাখ, কত টাকার লোভ দেখিয়েছে।"

"সে কেন টাকা দেবে।"

"সম্পত্তি লিখে দিচ্ছো, টাকা দেবে না?"

"সম্পত্তি কোথায় আমার ?"

"এ কথা স্বীকার করছো তাহলে ?"

"আমাকে তাড়াবার মতলব করেই তো উকিলের বাড়ী ঘুরে বেড়াচ্ছ। তাই তাড়িয়ো। ভিক্ষের ঝুলি তো কেড়ে নিতে পারবে না।"

"সুদর্শন বৈরাগীর বোষ্টমী হয়ে তীর্থে তীর্থে তুমি ঘুরে বেড়াও নি ? ভুল বলছিনী স্ত্রীর স্বামীর সম্পত্তিতে হক থাকে না।"

"সুদর্শন বৈরাগীর বোষ্টমী হতে যাব কেন ? ঠাকুরের কাছে ধর্ণা দিতে তীর্থে গেছলাম।"

"তোমার বাপের বাড়ীর দেশে কে না জানে। শ্যামদাসী বোষ্টমী এসে রটায় নি সব ?"

"ভাইয়েরা আমাকে ঠাঁই দিতে হবে বলে শ্যামদাসীকে দিয়ে মিথ্যে রটিয়েছে।"

"তুমি বললেই মিথ্যে ? ভাবছ আদালতে একথা প্রমাণ হবে না ?"

"আমাকে ভয় দেখিও না মহিম। শ্যামদাসী ছ' সাত বছর আগে মরেছে। নবদ্বীপে মাধু গোসাঞির কাছে থাকতো।"

মহিমের চোখ দু'টি অন্ধকারে জ্বলে উঠলো।

"সাক্ষী প্রমাণের দরকার নেই। সম্পত্তিতে অধিকার এ জন্মে পাবে না।"

কথা না বলে চুপ করে চলে এলেন চারুশীলা। মহিমের কথাগুলি মোটেই ভাল লাগেনি তার। রুক্ষ উদ্ধত কণ্ঠ, কথায়, চোখের দৃষ্টিতে এরূপ বিদ্বেষ ও হিংস্র তীক্ষ্ণতা আর কখনও প্রকাশ পায় নি।

চারুশীলা বিষণ্ণ হলেন। ভয়ও পেলেন। বঞ্চনা করবার সমস্ত আয়োজন তাহলে সম্পূর্ণ করে এনেছে মহিম। আশা কল্পনা সমস্তই নিষ্ফল।

অন্ধকার বারান্দায় এসে বসলেন চারুশীলা। চাঁদ উঠেনি। অগুন্তি নক্ষত্র। দেউড়ির ভিতরে অন্ধকার জমাটবাঁধা। আম গাছের ডাল থেকে একটা বাদুর ডানার ঝাপটায় সচকিত করে কোথায় উড়ে গেল। ভাবতে চাইলেন। অস্বস্তিতে সুশৃঙ্খলভাবে কিছুই ভাবতে পারলেন না। বাল্যের শুচিশান্ত গৃহ, কেশীর মার ছেলে, বৃন্দাবনে কালিন্দীর চর, গোপীনাথের মন্দির, কাশী গঙ্গা, মহিমের ভীতি প্রদর্শন, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে মন ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে।

বিশৃঙ্খল ভাবনাগুলির ভেতর দিয়ে আগামী দিনের পথ খুঁজে বের করতে চেষ্টা করলেন চারুশীলা। সুমুখের পথ চিরকালের মতই অন্ধকার। তবু মনে হ'ল বর্তমান একান্ত অসহনীয়। এই ঘর, পাচিল ঘেরা উঠান, মহিমের সন্দিগ্ধ আক্রোশ, এর কিছুই তার কাম্য নয়। এর মধ্যে কোন শান্তি নেই। এ ছাড়া কি চান সে কথা জানতে গিয়ে বহু সুপ্ত দীর্ঘশ্বাস অন্ধকারের গায়ে কেঁপে উঠলো। এবং নিজেকে কেন্দ্র করে তন্ময় হয়ে গেলেন চারুশীলা।

চারুশীলা দেখতে পাননি চাপ চাপ অন্ধকারে ছায়া ছায়া একটি মানুষ তার দিকে এগিয়ে আসছে। যে মুহূর্তে মানুষটি তার পিছনে এসে দাঁড়াল, চারুশীলা অনুভব করলেন। ঘাড় ফিরিয়ে এক পলক তাকালেন। মানুষটির খালি গা। পরিধানে এক কালি গামছা। চোখ দু'টি আগুনের মত জ্বলছে। ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলেন চারুশীলা। পালাতে গিয়ে উঁচু বারান্দা থেকে হুমড়ি খেয়ে নীচে পড়ে গেলেন। বারান্দা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল অন্ধকারের সেই লোকটি। তার কণ্ঠ চেপে ধরবার চেষ্টা করছে। চারুশীলা জীবন পণ শক্তিতে প্রতিরোধ করতে চান। আর্তনাদ করে ওঠার চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেন না। কালো হাত দু'খানা নির্মমভাবে গলায় চেপে বসেছে।

চারুশীলার সব সুখ দুঃখ, আলো অন্ধকারবোধ দেখতে দেখতে অবলুপ্ত হয়ে গেল। দু'খানি হাত পাঁজাকোলে মৃতদেহটা তুলে সন্তর্পণে পুকুরের জলে নামিয়ে দিলে।

জলের ঢেউ অন্ধকারে দেখা গেল না।

শেষ

---

* এই গল্পের লেখক নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় নন। —সম্পাদক

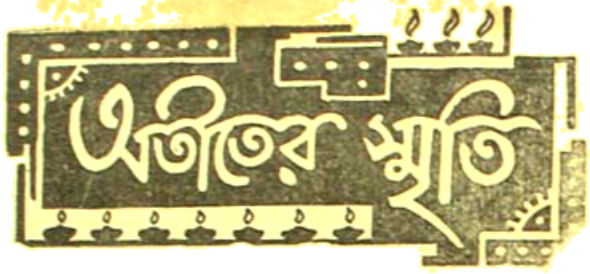

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আজ থেকে প্রায় পৌনে তিনশো বছর আগে, ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে শুভ-তিথিতে বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিয়াল জব চার্ণক সাহেব যেদিন সুতানুটি গোবিন্দপুর আর কলিকাতা—এই তিনটি গ্রাম নিয়ে তাঁদের বাণিজ্য-কেন্দ্র পত্তন করলেন, তখন থেকে শুরু হলো—শহর কলিকাতার শ্রী-সম্পদ-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির ইতিহাস। কোম্পানীর আমলের আগেই ভাগীরথী-নদীর কূলে এ-অঞ্চলটি ছিল সেকালের একটি বিশিষ্ট ব্যবসা-বাণিজ্যের হাট-বাজার। কাজেই শুধু ইংরাজরাই নয়, পর্ত্তুগীজ, দিনেমার, ফরাসী, আর্ম্মানী প্রভৃতি বিদেশের আরো নানা শ্রেণীর বণিক-ব্যবসায়ীরা পরমাগ্রহে তখনকার আমলের এই দেশী হাট বাজারে এসে হরেক রকমের জিনিষপত্র কেনা-বেচা করতেন। ইংরাজদের বাণিজ্য-কেন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত হবার আগে, দেশী সমাজের যে সব লোকজন ব্যবসা-সূত্রে এ অঞ্চলে বাস করতেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বণিক-সম্প্রদায়ভুক্ত—সুবর্ণবণিক, কাংস্যবণিক, শঙ্খবণিক, প্রভৃতি নানান শ্রেণীর ব্যবসায়ীর দল। তারপর ক্রমশঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারতা এবং বাণিজ্য কেন্দ্র কলিকাতার প্রতিপত্তি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ সুযোগ সুবিধা লাভ ও জীবিকার্জ্জনের উদ্দেশ্যে বাঙলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি আরো নানা শ্রেণীর লোকজন এসে এখানকার সাবেকী বণিক-বাসিন্দাদের সমাজে যোগদান করলেন। এদেরই যাতায়াত এবং স্থায়ী-বসবাসের ফলে, সেকালের বাণিজ্য শহর কলিকাতায় উত্তরোত্তর গড়ে উঠলো—বুদ্ধিজীবী ইংরাজী-নবীশ জমীদার, আমলা ও চাকুরীজীবী কেরানী-কর্ম্মচারীর ভীড়ে ভরপুর মধ্যবিত্ত-সমাজ। একত্র বসবাসের দৌলতেই ক্রমে সাবেকী বণিক-সমাজ আর নবীন মধ্যবিত্ত সমাজের নিবিড়-ঘনিষ্ঠতার সূত্র থেকে সৃষ্টি হলো—ইংরাজের হাতে গড়া শহর কলিকাতার বিচিত্র অপরূপ সার্ব্বজনীন সভ্যতা-সংস্কৃতি—যেটি আমাদের সনাতনী-ধারার প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ, সারাক্ষণ পাশাপাশি একত্র বসবাস, কাজ-কারবার, মেলা মেশার দৌলতে দুনিয়ার নানান্ দেশের, নানান জাতি-ধর্ম্ম-শ্রেণী আর শিক্ষা-সভ্যতা ভাবধারার লোকজনের সঙ্গে পারস্পরিক সংযোগের সম্পর্ক সহজ হয়ে আসার ফলে, শহর কলিকাতার এই সার্ব্বজনীন সংস্কৃতি কালে কালে এমন অভিনব-আজব রূপধারণ করেছে যে ভারতের অন্যত্র আর কোথাও তার বিশেষ তুলনা মেলে না। এক কথায়, শহর কলিকাতার এই বিচিত্র-আজব সভ্যতা সাংস্কৃতিক কৌলিন্যটি আসলে কিন্তু সম্পূর্ণ মৌলিক ধরণের…খাঁটি দেশী ধরণেরও নয়, আবার পুরোপুরি বিলাতী-ছাঁদেরও বলা চলে না…বরং প্রয়াগের গঙ্গা যমুনার মতো প্রাচ্য-প্রতীচ্য—এ দুই বিভিন্ন কালো-শাদা কৃষ্টি-ধারার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে কালে কালে কেমন স্বতন্ত্র অদ্ভুত একটি ইঙ্গ-ভারতীয় ছাঁচের হয়ে

দাঁড়িয়েছে। সম্ভবতঃ, এই কারণেই এ শহরের মানুষ-জনের শিক্ষা-সভ্যতা, আচার-ব্যবহার, খানা-পিনা, সাজ-পোষাক, উৎসব-অনুষ্ঠান, আমোদ প্রমোদ···এমন কি দৃষ্টিভঙ্গীটি পর্য্যন্তও সম্পূর্ণ আজব-ধরণের···সব কিছুতেই যেন মোহিনী মায়ার মায়কতার ভরা অভিনব বৈচিত্র্যময় ইঙ্গ-ভারতীয় ভাব মিশে রয়েছে কলিকাতার অপরূপ জগা-খিচুড়ী আবহাওয়ার স্তরে স্তরে। ভাগীরথী নদীর একদিকে পুরাতন তটভূমি যেমন প্রবাহ স্রোতের আঘাতে নিয়ত ভেঙে গুঁড়িয়ে জলগর্ভে বিলীন হয়ে যায় এবং সেই ভাঙনের সঙ্গে তাল রেখে অপরদিকে ক্রমান্বয়ে বাহিত পলি-মাটির স্তর জমে নতুন-ডাঙার উদ্ভব ঘটে, ঠিক তেমনিভাবেই আদিকাল অবিরাম-গতিতে চলেছে এ শহরের কৃষ্টি সভ্যতা-সামাজিক জীবনের ভাঙন-গড়নের লীলা···নতুন আর পুরাতনের অপরূপ সমন্বয়···প্রাচ্য-প্রতীচ্য সমাজের বিচিত্র ভাব বিনিময়। শহরের দেশী ও বিলাতী সমাজের মধ্যে অসদ্ভাবের দৃষ্টান্ত যে আদৌ ঘটেনি এমন কথা জোর গলায় বলা যায় না বটে, তবে এ দুই সমাজের লোকজনের মনে পারস্পরিক সদ্ভাবও যে যথেষ্ট ছিল, পুরানো আমলের পুঁথি-পত্রে তার বহু নজীর নজরে পড়ে। কিন্তু সে সব কথা পরে যথাসময়ে আলোচনা করা যাবে···আপাততঃ সেকালের দেশী বিলাতী সমাজের বিত্ত-প্রতিপত্তিশালী বিলাসী-সৌখিন সম্ভ্রান্ত-ব্যক্তিরা জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, পাল-পার্ব্বণ, প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে অকাতরে অর্থব্যয় করে সাড়ম্বরে অতিথি অভ্যাগতদের যৌতুক তৃপ্যতাং ব্যাপারে যেভাবে আপ্যায়িত করতেন, একালের অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাঠিকাদের কৌতূহল নিবারণের উদ্দেশ্যে, প্রাচীন সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠা থেকে তারই কয়েকটি বিচিত্র নমুনা তুলে দিচ্ছি।

* *

সমাচার দর্পণ

(২৩শে মাঘ, ১২৩২। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৮২৬)

শুভজন্ম।—১২ মাঘ মঙ্গলবার শ্রীযুত দেওয়ান প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের এক নবকুমার ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন তাহাতে আহ্লাদিত হইয়া বাবুজী মহাশয় সবিবেচনা করিয়া বহুবিত্ত ব্যয়দ্বারা অনেক দীন দুঃখি লোকদের ক্লেশ দূর করিয়াছেন এবং সাধারণ বান্ধবকে ধনদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিয়াছেন তাহাতে যাবদ্ভূত দীনাদি কেহ ক্ষুণ্ণমনা হইয়া গমন করে নাই।

সমাচার দর্পণ

(২৪শ শ্রাবণ, ১২৩৩। ১৮ই জুলাই, ১৮২৬)

শুভজন্ম।—আমরা পরমাপ্যায়িত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে গত ১০ জুন শুক্রবার আন্দুলের ভূপত্যালয়ে শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুরের এক নবকুমার শুভজন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ এই শুভবার্ত্তা বহুসংখ্যক তোপধ্বনিদ্বারা উক্ত রাজধানীতে সুপ্রকাশ করা গেল। পরে এই আনন্দজনক সম্বাদ শ্রবণে রাজবাটীস্থ এবং ভিন্ন ২ গ্রামস্থ সর্ব্বসাধারণ লোক আনন্দার্ণবে নিমগ্ন হইলেন। কথিত আছে যে তদবধি নিরন্তর রাজকোষ হইতে বদান্যতা প্রকাশ দ্বারা দীন দরিদ্রগণকে সন্তোষিত করিতেছেন এবং ইদানীং ঐ কুমারের শুভজন্মোপলক্ষে উক্ত শ্রীলমহারাজ স্বীয় দলস্থ ও মহানগর কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের ভিন্ন ২ দলস্থ কবি ২ লোকদিগকে সামাজিক দ্রব্য প্রদানার্থ নিদল নির্ম্মিত কদলি ও স্থান ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী আনয়ন করত বৃন্দানারম্ভ করিয়াছেন তদ্দান মহোৎসবে প্রতিগ্রাহকগণ অত্যন্তাপ্যায়িত হইতেছেন।

সমাচার দর্পণ

(২৩শে মাঘ, ১২৬৩। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৭)

শুভযন্ত্র।—সোমবারের ৩০ জানুআরী তারিখে কলিকাতার শোভাবাজারস্থ রাজবাটীতে শ্রীযুমহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের দ্বিতীয়া রানী এক নবকুমারী প্রসূতা হইয়াছেন এতদুপলক্ষে যথা হিন্দু রাজধর্ম্মক্রমে তৈল মাষকলায় এবং মৎস্য ঘনাদি মাঙ্গল্য কর্ম্ম সমাধা হইল। আমরা অবগত হইলাম যে এই নৃপকন্যা মহারাজার প্রথম অপত্যা।

সমাচার দর্পণ

(২৬শে চৈত্র, ১২৩৩। ৭ই এপ্রিল, ১৮২৭)

মরণ।—আমরা অতিশয় খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে দৌলৎ রাও সিন্ধিয়া বাহাদুর ৬৮ বৎসর বয়স্ক হইয়া সংপ্রতি কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন সেই হেতুক সত্ত সপ্তাহে কলিকাতার গড়ে ৪৮ তোপ হইয়াছে। তাঁহার উত্তরাধিকারির বিষয়ে যে কোন বিভ্রাট ঘটিবেক এমত সম্ভাবনা নাই।

সমাচার দর্পণ

(১লা শ্রাবণ, ১২৪৪। ২৯শে আগষ্ট, ১৮৩৭)

রূপলাল মল্লিক।—১ তারিখে অতিপ্রসিদ্ধ ধনি বাবু রূপলাল মল্লিক ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন কথিত আছে তিনি অন্যূন কোটি মুদ্রা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চারি পুত্র প্রত্যেকে ১৫ লক্ষ টাকা করিয়া পাইবেন এবং স্ত্রী কন্যা গুরু পুরোহিত প্রভৃতিকে অবশিষ্ট টাকা বিতরণ হইবে এবং গঙ্গাতীরে ধর্ম্মার্থ ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। কথিত হইয়াছে শ্রাদ্ধার্থও লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি আছে।

* * *

সমাচার দর্পণ

(২১শে মাঘ, ১২৪৫। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৯)

পত্রলেখক নিকট প্রাপ্ত।...গত বুধবার অপরাহ্নে ৫ ঘণ্টা সময়ে মহারানী অর্থাৎ শোভাবাজারস্থ শ্রীযুমহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের পিতামহী ঠাকুরানী দেহ পরিত্যাগ করিলেন তৎকালে রাজবাটীস্থ গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ স্বজন চরমকালীন হরি এবং রাম নাম শ্রবণ করাইতে লাগিলেন এবং বৈরাগিগণ খোল করতাল দ্বারা শোকসূচক গান কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান হিন্দু বংশদিগের মধ্যে অতি প্রচলিত আছে।

ঐ মহারানীর আশী বৎসর বয়ঃ পূর্ণ হইয়াছিল। উক্ত মহারাজ এবং তদভ্রাতৃবর্গ ৺প্রাপ্ত রানীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রায় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করণের উদ্যুক্ত আছেন।

* * *

সংবাদ প্রভাকর

(২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৬১। ৭ই জুন, ১৮৫৪)

সংবাদ।—মৃত বাবু মতিলাল শীলের পুত্রেরা অতি সমারোহ পূর্ব্বক তাঁহার শ্রাদ্ধ করিবার মানস করিয়াছেন, শ্রাদ্ধ দিবসে আহূত অনাহূত কাঙ্গালি ইত্যাদি বহুলোকের সমাগম হইবেক, একারণ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সাহেবেরা মতিবাবুর পুত্রদিগের প্রতি এ প্রকার অনুমতি করিয়াছেন যে ঐ লোক সমারোহ জন্য নগরবাসিদিগের কিছু কোন ক্ষতি হয় তবে তাহা পূরণ করণার্থ তাঁহারদিগকে অগ্রে এক লক্ষ টাকা কোর্টে জমা দিতে হইবেক, যে হেতু মৃত বাবু গোপাল কৃষ্ণ মল্লিকের মাতৃ শ্রাদ্ধ সময়ে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ কাঙ্গালি বিদায় করণে অক্ষম হওয়াতে কাঙ্গালিরা আহারাভাবে নগরের বাজার সকল লুট করিয়াছিল, এই বিষয় মতিলালবাবুর পুত্রেরা কি উত্তর করিয়াছেন তাহা জানা যায় নাই।

সংবাদ প্রভাকর

(২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৬১। ১লা জুলাই, ১৮৫৪)

সংবাদ।—বাঙ্গাল হরকরা সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে "মৃত বাবু মতিলাল শীলের পুত্রেরা তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন, ঐ টাকায় অনায়াসে এক চিরস্থায়ি কালেজ স্থাপিত হইতে পারে···অদ্য শ্রাদ্ধে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইলে মহা সমারোহ হইবেক এবং শীলবাবুর শ্রীমান পুত্রেরা যশোলাভ করিবেন তাঁহার সন্দেহ নাই কিন্তু শ্রাদ্ধের ধনাংশ যাহারা পাইবেন তাঁহাদিগের বিশেষোপকার কিছুই হইবেক না অতএব শ্রাদ্ধের ব্যয় ন্যূন করিয়া কোন সাধারণ হিতজনক বিষয়ে অর্থ দান করা শীলবাবুর, সুশীল পুত্রদিগের কর্ত্তব্য হয়।" হরকরা সম্পাদক মহাশয়ের এই উপদেশ অতি উত্তম বটে, কিন্তু এদেশে শ্রাদ্ধে বহুব্যয় বিধান করণের বিধি থাকাতে ধনবান লোকেরা পিতা মাতার শ্রাদ্ধে অর্থব্যয় করা আপনার-দিগের কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া গণনা করেন···অতএব মৃত শীল বাবুর পুত্রেরা তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন ইহার বিচিত্র কি ?

• • •

জন্ম এবং মৃত্যুর কারণে যেমন রেওয়াজ ছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই সেকালে কলিকাতা শহরের হিন্দু-সমাজে বোনেদী বড়লোকদের বাড়ীতে বিবাহাদি উপলক্ষে কি বিচিত্র-ধরণের ধুমধাম-আড়ম্বর আর বিপুল অর্থব্যয়ে পর্য্যাপ্ত-প্রথায় দীর্ঘতার ভূরিভোজ ব্যাপারের উৎসব-সমারোহ চলতো, তার নিখুঁত-অঙ্কন একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ মেলে খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে রচিত বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ কথাশিল্পী ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা" গ্রন্থে। আধুনিক কালের সাহিত্যানুরাগী পাঠক পাঠিকাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে, আপাততঃ সেকালের সেই অভিনব-বিবরণের কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা

(কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত—১৮৬২)

···ক্রমে বড় বাবুর বিয়ের উদ্যুগ হতে লাগলো, ঘটক ও ঘটকীরা বাড়ি বাড়ি মেয়ে দেখে বেড়াতে লাগ্‌লেন—"কুলীনের মেয়ে, দেখতে পরম সুন্দরী হবে, দশ টাকা যৌতুক থাকবে" এমনটি শীগ্‌গির জুটে ওঠা সোজা কথা নয়; শেষে অনেক বাছা গোছা ও স্বাধা সোনার পর সহরের আগড়োম ভোঁদ সিদ্ধির লেনের আত্মারাম মিত্তিরের পৌত্তুরীরই কুল হুট্‌লো! আত্মারাম বাবু খাস হিঁদু, কাপ্তেনির কর্ম্মে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় করেছিলেন, আত্মারাম বাবুর সংসারও রাবণের সংসার বল্লে হয়—সাত সাতটি রোজগেরে ব্যাটা, পাঁচ মত পাঁচ মেয়ে আর গড়ে ওটি চল্লিশ পৌত্তুর পৌত্তুরী, এ সওয়ায় ভাগ্নে জামাই কুটুম্ব সাক্ষাৎ বাড়ীতে 'পরিপূর্ণ করে—সুতরাং সমস্তগুণাক্রান্ত আত্মারাম পরলোকের যাবার উপযুক্ত স্থির হলেন; শুভ লগ্নে মহা আড়ম্বর করে লগ্নপত্রে বিবাহের স্থির হলো, দলস্থ সমুদায় ব্রাহ্মণরা মর্য্যাদা মত পত্রের বিদেয় পেলেন, রাজভাট ও ঘটকেরা ধন্যবাদ দিতে দিতে চল্লো; বিয়ের ভারী ধুম! সহরে হুজুক উঠলো পদ্মলোচন বাবুর ছেলের বিয়ের পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ—গোপাল মল্লিক ছেলের বিয়েতে খরচ করেছিলেন বটে, কিন্তু এত নয়!

দিন আসতে; দেখতে দেখতেই এসে পড়ে, ক্রমে বিবাহের দিন ঘুনিয়ে এলো—ক্রিধেবাড়িতে নহবত বসে গালো। অধ্যক্ষ বট্টাচার্য্য ও দলস্থদের ঘোট বাদান সুরু হলো—তিন হাজার জোড়া শাল, সোনার দোয়া, ও চাকাই সাড়িওয়ালা দু লক্ষ সামাজিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বলে বিবেচনা হলো, বড়ম দুবরেদ বা ভূতেও শাল ও সে নাওয়ালা লোহা, চাকাই কাপড়, গাদড়া কম্বল, মোসাব ও আতর, ও এক এক জোড়া শাল সওগাত পাঠান হলো; কেউ কেউ আদর করে গ্রহণ কল্লেন, কেউ কেউ বলে পাঠালেন যে আমরা চুলী বা বাইনাচে নই যে শাল নেবো! কিন্তু পদ্মলোচন হঠাৎ অবতার হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের মত আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন সুতরাং সে কথা গ্রাহ্য করেন

না! পরিবেদ, মোসাহেব ও বিবাহের অধ্যক্ষেরা বলে উঠলেন—দাতার অদৃষ্টে নাই!

এদিকে বিয়ের বাইনাচ আরম্ভ হলো, কোথাও রূপোর বালা, লাল কাপড়ের তক্‌মা ও উর্দীপরা চাকরেরা ঘুরে বেড়াচ্চে, কোথাও অধ্যক্ষরা গড়ের বাজনা আনবার পরামর্শ কচ্চেন—কোথাও বরের সজ্জা তৈরির জন্য দর্জীরা একমনে কাজ কচ্চে—চার দিকেই হৈ হৈ ও রৈ রৈ শব্দ—বাইর দেওয়া শালে সহরের রাস্তার অর্দ্ধেক লোকই নালে লাল হয়ে গ্যালো, চুলী ও বাজন্দরেরা তো অনেকের বিয়েতেই পুরনো শাল পেয়ে থাকে কিন্তু পদ্মলোচনের ছেলের বিয়েয় ভদ্দর লোকেও শাল পেয়ে লাল হয়ে গ্যালেন।

১২ই পৌষ শনিবার বিবাহের লগ্ন স্থির হয়েছিল, আজ ১২ পৌষ; আজ বিবাহ। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি যে সহরে টি টি হয়ে গিয়েছিল যে "পদ্মলোচনের ছেলের বিয়েয় পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ" সুতরাং বিবাহের দিন বৈকাল হতে রাস্তায় ভয়ানক লোকারণ্য হতে লাগলো, পাহারাওয়ালারা অতি কষ্টে গাড়ি ঘোড়া চলবার পথ করে দিতে লাগলো। ক্রমে সন্ধ্যার সময় বর বেরুলো—প্রথমে কাগজের ও অব্বরের হাত ঝাড়, পাঙ্খা ও সিঁড়ি ঝাড়, রাস্তার দু পাশে চল্লো, ঐ রোশনাইর আগে আগে দুটি চন্দ্রমল্লিক ছিল, তার পেছনে গেট—বালাম ও কাগজের পাহাড়—পাহাড়ের ওপর হর পার্ব্বতী, নন্দী, ষাঁড়, ভৃঙ্গী, সাপ ও নানা রকম গাছ—তার পেছনে ঘোড়াপঙ্খী, হাতীপঙ্খী, উটপঙ্খী ও ময়ূরপঙ্খী; পঙ্খীগুলির ওপরে বারো জন করে দাঁড়ি, মেয়ে ও পুরুষ সওয়ার সাজা ও দুটি করে ঢোল। তার আশে পাশে উড়নাদার ওপর "নগের নাচ" "কিরিঙ্গীর নাচ" প্রভৃতি নানা প্রকার সাজা সং। তার পশ্চাৎ এক শ ঢোল, চল্লিশটি ডগবল্প ও ষাটি বাইটেক্ চাক, মাঝ রোশনচৌকি—শানাই ভোড়ং ও ভেঁপু—তার কিছু অন্তরে এক দল নিরশ্বাস একদের চুনোগলির ইংরিজি বাজনা। মধ্যে বাবুর মোসাহেব, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, পারিষদ আত্মীয় ও কুটুম্বরা। সকলেরই একরকম শাল, বাঁধার রুমাল ঝুলান, হাতে একগাছি ইষ্টিক; হঠাৎ বোধ হলো যেন এক কোম্পানি ডিফার্ন্ড, সেপাই। এই দলের দুই ধারে লাল বনাতের খাসগোদাপ, ও রূপোর ডাণ্ডিতে রেশমের নিশেন ধরা একশপরা ঘুটে ও কুড়ে ছুড়ে দৌড়ারা, মধ্যে খোদ বরকর্ত্তা গুরু পুরোহিত বাছাবো বাছাবো ভুঁড়ে ভুঁড়ে ভট্টচায্যি ও আত্মীয় অন্তরঙ্গরা; এর পেছনে রাঙ্গামুখো ইংরিজি বাজনা, সাঙ্গা সাহেব তুরুকসওয়ার, বরের ইয়ারবক্স, খাস দরওয়ানরা, হেড খানসামা ও রূপোর সুখাসনে বর; সুখাসনখানির চার দিকে মার বাতি বেলোচন চাদান, সামনে রূপোর ধল-ভেলে বলা ঝাড়, দুই পাশে চামরধরা দুটো ছোঁড়া; শেষে বরের ভোরঙ্গ, প্যাটরা, বাড়ির পরামানিক, সোনার দানা গলায় বুড়ি বুড়ি গুটি কত দাসী ও বাজে লোক, তার পেছনে বরযাত্রীর গাড়ির সার—প্রায় সকলগুলির উপরে এক এক চাকর, ডবল বাতি দেওয়া হাতলণ্ঠন ধরে বসে আছে।

বাদ্য, চাক, ঢোল ও নাগরার শব্দে লোকের রহা ও অধ্যক্ষদের মিছিলের চীৎকারে কলকেতা কাঁপতে লাগলো, অপর পাড়ার লোকেরা হাড়াহাড়ি কাঁপতে লাগলো, অপর পাড়ার লোকেরা তাড়াতাড়ি ছাতে উঠে মনে কল্লে ওদিকে বুঝি ভয়ানক আগুন লেগে থাকবে, রাস্তার দুধারি বাড়ীর জানালা ও বারাণ্ডা লোকে পুরে গ্যালো, মেয়ারা "আহা কিবি ছেলেটি যেন চাঁদ!" বলে প্রশংসা কত্তে লাগলো, হতোম প্যাচা অন্তরীক্ষ থেকে নক্সা নিতে লাগলেন—ক্রমে বর কনেবাড়ি পৌঁছিল। কন্যাকর্ত্তারা আদর ও সম্ভাষণ করে বরযাত্রেরদের অভ্যর্থনা কল্লেন—পাড়ার মোতাতী বুড়ো ও বওয়াটে ছোঁড়ারা গ্রামভাটির জন্য বরকর্ত্তাকে ঘিরে দাঁড়ালো—বর সভায় গিয়ে বসলেন, ভাটেরা ছড়া পড়তে লাগ্‌লো, মেয়েরা বারাণ্ডা থেকে উঁকি মাত্তে লাগলো—ঘটকরা মিত্তিরবাবু ও দত্তবাবুর কুলজী আউড়ে দিলে; মিত্তিরবাবু কুলীন সুতরাং বঙ্গালী রেজেষ্টরীতে তাঁর বংশাবলি রেজেষ্টরী হয়ে আছে, কেবল দত্তবাবুর বংশাবলিটি বানিয়ে নিতে হয়!

ক্রমে বরযাত্র ও কন্যাযাত্রেরা সাপ্টা জলপান করে বিদেয় হলেন, বর স্ত্রী আচারের জন্য বাড়ীর ভিতর গেলেন। ছাঁদনাতলায় চারটি কলাগাছের মধ্যে আলপনা দিয়ে একটি পিঁড়ে রাখা হয়েছিল, বর চোরের মত হয়ে সেইখানে দাঁড়ালেন, মেয়েরা দাড়া ওয়া পান, বরণডালা, মঙ্গলের ভাঁড়ওয়ালা কুলো ও সিদ্ধি দিয়ে বরণ কল্লেন, শাঁক বাজানো ও উলু উলুর চোটে বাড়ি সরগরম হয়ে উঠলো, ক্রমে মার শাশুড়ী এয়োরা সাত বার বরকে প্রদক্ষিণ করেন—শাশুড়ী বরের হাতে মাকু দিয়ে বল্লেন "হাতে ছিল ম মাকু একবার ত্যা কর ত বাপু"! বর বল্লেন বর, আড়-চক্ষে এয়োদের পানে তাকাচ্ছিলেন ও মনে মনে লজ্জা ত্যাগ করছিলেন; সুতরাং "মনে মনে কারয়" বল্লেন—অমনি শালাজরা কাণ মলে দিলে, শালীরা গালে ঠোনা মাত্তে; শেষে গুড় চাল, তুকতাক্ ও ওষুদ বিষুদ ফুরুলে, উচ্ছুগণ্ড করবার জন্য কনেকে দালানে নিয়ে যাওয়া হলো, শ্রুবত মন্ত্র পড়ে কনে উচ্ছুগণ্ড হলেন, পুরুত ও ভট্টাচার্য্যরা সন্দেশের সরা নিয়ে সরলেন, বরকে বাসরে নে যাওয়া হলো। বাসরটিতে আমোদের চূড়ান্ত হয়। আমরা তো অ্যাদ্দো বুড়ো হয়েচি, তবুও এখনও বাসরের আমোদটি মনে পড়লে মুখ যে লাল পড়ে ও আবার বিয়ে কত্তে ইচ্ছে হয়।

ক্রমে বাসরের আমোদের সঙ্গেই কুঞ্জবনাথ অস্ত গেলেন কমলিনীর হৃদয়রঞ্জন প্রফুল্ল তেজীয়ান্ হয়েও যেন তাঁর মানভঞ্জনের জন্যই কোমল ভাব ধারণ করে উদয় হলেন. কমলিনী কামাতুর নাথের তাদৃশ দুর্দশা দেখেই যেন সরোবরের মধ্যে লুকাতে লাগলেন, পাখিরা "ছি ছি কামোন্মত্তদের কিছু মাত্র বাহ্যজ্ঞান থাকে না" বলে চেঁচিয়ে উঠলো, বায়ু মুচকে মুচকে হাসতে লাগলেন—দেখে ক্রোধে সূর্য্যদেব নিজ মূর্ত্তি ধারণ কল্লেন; তাই দেখে পাখিরা ভয়ে দূরদূরান্তরে পালিয়ে গ্যালো—বিয়ে বাড়ি বাসি বিয়ের উদ্যুগ হতে লাগলো। হলুদ ও তেল মাখিয়ে বরকে কলাতলায় কনের সঙ্গে নাওয়ান হলো, বরণডালায় বরণ ও কতক কতক তুক্‌তাকের পর, বর-কনের পাটছড়া কিছুক্ষণের পর খুলে দেওয়া হয়।

এদিকে ক্রমে বরযাত্র ও বরের আত্মীয় কুটুম্বরা ছুটতে লাগলেন, বৈকালে পুনরায় সেই রকম মহাসমারোহে বর কনেকে বাটী নে যাওয়া হলো, বরের মা বর কনেকে বরণ করে ঘরে তুল্লেন, এক কড়া দুধ দরজার কাছে আগুনের ওপর বসান ছিল, কনেকে সেই দুধের কড়াটি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে, "মা! কি দেখচো? বল যে আমার সংসার উথলে পড়চে দেখচি" কনেও মনে মনে তাই বল্লেন। এ সওয়ায় পাঁচ গিন্নিতে নানা রকম তুক্‌তাক্ কল্লে পর বর কনে জিরুতে পেলেন, বিয়েবাড়ির কথঞ্চিৎ গোল চুক্‌লো—চুলীরা খেনো মদ খেয়ে আমোদ কত্তে লাগলো, অন্যেরা প্রায় হিন্দু সুতরাং একটা একটা আগাতোলা দুর্গোৎসবা ও আধ ঘটি গঙ্গাজল খেয়ে বিদ্যানাথ আড় হলেন, বর কনে আলাদা শুলেন—আজ একত্রে শুতে নাই, যে বাড়ির বড়গিন্নির মতে আজকের রাত—কালরাত্রির।

শীতকালের রাত্তির শিগগির যায় না। এক ঘুম, দু ঘুম, আবার প্রস্রাব করে শুলেও বিলক্ষণ এক ঘুম হয়; ক্রমে গুড়ুম করে তোপ পড়ে গ্যালো—প্রাতঃস্নানে মেয়েগুলো বক্‌তে বক্‌তে রাস্তা মাথায় করে যাচ্ছে,—বুড়ো বুড়ো ভট্টাচার্য্যিরা স্নান করে "মহিম্নঃ পারন্তে" মহিম্নস্তব আওড়াতে আওড়াতে চল্লেন। এদিকে পদ্মলোচন রাঁড়ের বাড়ি হতে বাড়ি এলেন, আজ তাঁর নানা কাজ! পদ্মলোচন প্রত্যহ সাত আটটার সময় বেশ্যালয় থেকে উঠে আসেন, কিন্তু আজ কিছু সকালে আসতে হয়েছিল—সহরের অনেক প্রকৃত হিন্দু বুড়ো দলপতির এক একটি রাঁড় আছে এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলেচি, এদের মধ্যে কেউ রাত্তির দশটার পর শ্রীমন্দিরে যান একেবারে সকালবেলা প্রাতঃস্নান করে টিপ তেলক ও ছাপা কোটে শ্রীগোবিন্দ ও তদন্তর পরে হরিনাম কত্তে কত্তে বাড়ি ফিরেন—হঠাৎ লোকে মনে কত্তে পারে শ্রীযুত গঙ্গাস্নান করে এলেন, কেউ কেউ বাড়িতেই প্রিয়তমাকে আনান সমস্ত রাত্তির অতিবাহিত হলে ভোরের সময় বিয়ের জিনে স্নান করে পুজো কত্তে বসেন—যেন রাত্তিরের তিনি নন—পদ্মলোচনও সেই চাল ধরেছিলেন।

ক্রমে আত্মীয় কুটুম্বেরাও এসে জমলেন—মোসাহেবরা "হুজুর! কল্‌কেতায় আমন বিয়ে হয় নি হবে না" বলে বাবুর ন্যাজ ফোলাতে লাগলেন। ক্রমে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ফুলশয্যার তত্ত্ব এলো, পদ্মলোচন মহাসমারোহে কনের বাড়ির চাকর চাকরানীদের অভ্যর্থনা কল্লেন, প্রত্যেককে একটি করে টাকা ও একখানি করে কাপড় বিদেয় দিলেন। দলস্থ ও আত্মীয়রা কিছু কিছু করে অংশ পেলেন, ঢাকী ঢুলী ও বেলোয়ার লোকেরা বক্‌সিস পেয়ে বিদেয় হলো; মহাসমারোহে পাঁচ লক্ষ টাকার বিবাহ শেষ হয়ে গ্যালো; কোন কোন বাড়ির গিন্নিরা সামগ্রী পেয়ে হাঁড়ি পুরে পুরে শিকেয় টাঙ্গিয়ে রাখলেন, অধিক অংশ পচে গ্যাল, কতক বেরালে ও ইঁদুরে খেয়ে গ্যাল, তবু পেট ভরে খাওয়া কি কারেও বুক বেঁধে দিতে পাল্লেন না—বড়মানুষদের বাড়ির গিন্নিরা প্রায়ই এই রকম হয়ে থাকেন, ঘরে জিনিষ পচে গেলেও লোককে হাতে তুলে দিতে মায়া হয়। শেষে পচে গেলে মহারানীর গোবর ফেলে দেওয়া হবে সেও ভাল। কোন কোন বাবুরও এ স্বভাবটি আছে—সহরের এক বড়মানুষের বাড়িতে পূজার সময় নবমীর দিন গুটি ষাইটেক্ পাঁঠা বলিদান হয়ে থাকে; পূর্ব্বপরম্পরায় সেগুলি সেই দিনেই দলস্থ ও আত্মীয়দের বাড়ি বিতরিত হয়ে আসচে, কিন্তু আজকাল সেই পাঁঠাগুলি নবমীর দিন বলিদান হলেই গুদোমজাত হয়; পূজোর গোল চুকে গেলে পূর্ণিমার পর সেইগুলি বাড়ি বাড়ি বিতরণ হয়ে থাকে; সুতরাং ছয় সাত দিনের বরা পচা পাঁঠা ক্যামন উপাদেয় তা পাঠক! আপনিই বিবেচনা করুন। শেষে গ্রহীতাদের সেই পাঁঠা বিদেয় কত্তে ঘর হতে পয়সা বার কত্তে হয়।···

এদিকে ক্রমে বিবাহের গোল চুকে গ্যালো. পদ্মলোচন বিষয় কর্ম্ম কত্তে লাগলেন। তিনি নিত্য নৈমিত্তিক ঘোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ ফাঁক দিতেন না; ষেঁটপুজোতেও তিনির নৈবিদ্দি ও সকের যাত্রা বরাদ্দ ছিল ও আপনার বাড়িতে যে রকম ধুম করে পুজো আচ্চা কত্তেন, রক্ষিত মেয়েমানুষ ও অনুগত দশ বারো জন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদেরো সেমনি ঘুমে পুজো করাতেন। নিজের ছেলের বিবাহের সময় তিনি আগে চল্লিশ জন আইবুড়ো বংশজের বিবাহ দিয়ে স্থান। ইংরিজি লেখাপড়ার প্রাদুর্ভাবে, রামমোহন রায়ের জন্মগ্রহণে ও সত্যের জ্যোতিতে হিন্দুধর্ম্মের যে কিছু দুরবস্থা দাঁড়িয়েছিল, তিনি কায়মনে পুনরায় তার অপনয়নে কৃতসংকল্প হলেন।···

[ক্রমশঃ

দক্ষিণ ভ্যাং

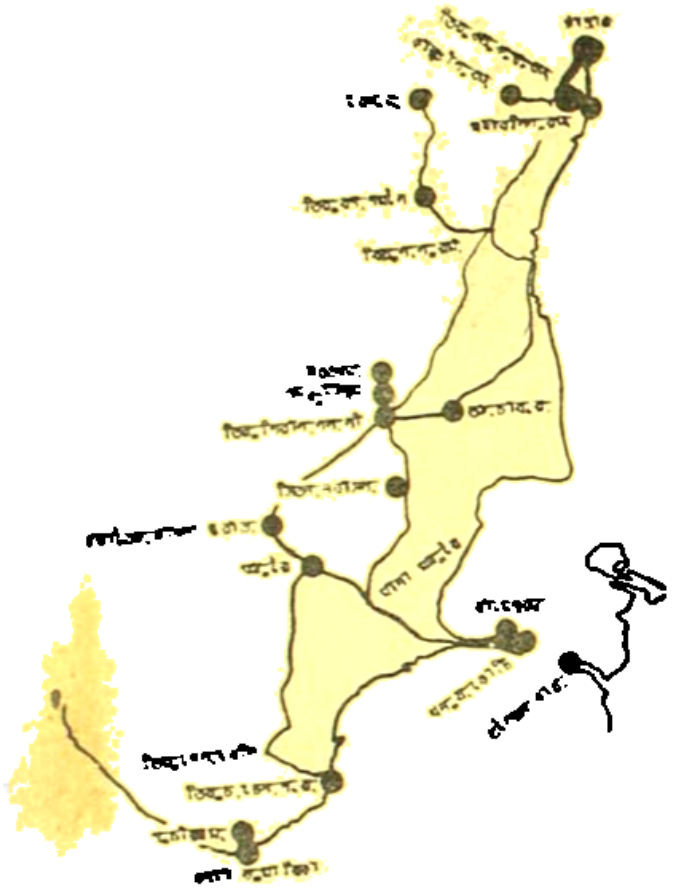

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

। ৮ ।

কন্যা কুমারিকা থেকে নাগর্ কোয়িল্ যাওয়ার পথে শুচীন্দ্রম্। আমরা বাস্ থেকে নামলাম বেলা ন'টায়।

বাস্ স্ট্যাণ্ড্-এর অনতিদূরেই উদ্দিষ্ট দেবালয়। মন্দিরে বিরাজ করছেন ত্রিমূর্তি—থাণুমালায়ন্। থাণু অর্থে শিব, মাল্—বিষ্ণুর তামিল্ নামান্তর, এবং অয়ন্—ব্রহ্মা।

পুরোভাগে গোপুরম্ ইত্যাদি সবই অন্যান্য মন্দিরের মত। পবিত্র তলাগ তেপ্পুকুলমটি মন্দিরের বাইরে।

বর্তমানে শুচীন্দ্রম্ তামিল নাড়ুর অন্তর্গত হলেও পূর্বে ত্রিবাঙ্কুর কোচিন রাজ্যের অধীন ছিল। তাই ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী দেবদর্শনার্থী পুরুষদের উর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ করে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়।

সত্যযুগে শুচীন্দ্রম্ এর নাম ছিল—জ্ঞানারণ্য।

জ্ঞানারণ্যে বাস করতেন মহর্ষি অত্রি ও তাঁর সহধর্মিণী অনসূয়া। সম্পূর্ণরূপে অসূয়া (হিংসা) হীন বলেই তাঁর নাম ছিল অনসূয়া। তাপসী অনসূয়ার পাতিব্রত্য ছিল অতুলনীয়।

এক সময়ে দারুণ অনাবৃষ্টিতে জ্ঞানারণ্যের জীবকুল ক্লিষ্ট হলে অত্রি হিমালয়ে যান এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে। স্বর্গের দেবতা ইন্দ্র সেই সময়ে ঋষি গৌতমের অভিশাপে দারুণ কুৎসিত ব্যাধিতে ভুগছিলেন। তিনি অত্রির যজ্ঞের ফল দানের জন্য আত্মপ্রকাশ করতে পারলেন না।

অত্রি তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের দর্শনের জন্য যজ্ঞ করতে লাগলেন।

ব্রহ্মাদি দেবগণ ঐ যজ্ঞ বন্ধ করবার জন্য নিয়োগ করলেন নারদকে।

এক কূট কৌশলে নারদ যজ্ঞ বন্ধ করবার চেষ্টা করলেন। তাঁর পরামর্শে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তিন ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে জ্ঞানারণ্যে অনসূয়ার কাছে ভিক্ষার জন্য উপস্থিত হলেন। অতিথিবৎসলা অনসূয়া ভিক্ষা দিতে এলে তিন দেবতা এক অদ্ভুত প্রস্তাব করলেন। তাঁরা বললেন যে, দাতা বা দাত্রী সম্পূর্ণরূপে বিবস্ত্র হয়ে ভিক্ষা না দিলে তাঁরা ভিক্ষা গ্রহণ করেন না। অতএব অনসূয়া যদি ভিক্ষা দিতে সত্যই ইচ্ছুক হন তো তিনি অনুরূপ অবস্থায় আসুন। একদিকে দারুণ লজ্জা ও অপমান, আবার অন্যদিকে অতিথির অবমাননায় গার্হস্থ্য-ধর্মের বিচ্যুতির আশঙ্কাতে অনসূয়া অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

শেষ পর্যন্ত পতি-নিষ্ঠা এবং সত্যানুসরণ অর্জিত শক্তির বলে, তিনি ঐ ছদ্মবেশী তিন দেব প্রধানকে তিনটি শিশুতে পরিণত করে ফেললেন ও তাঁদের উৎকট অনুরোধ রক্ষা করলেন।

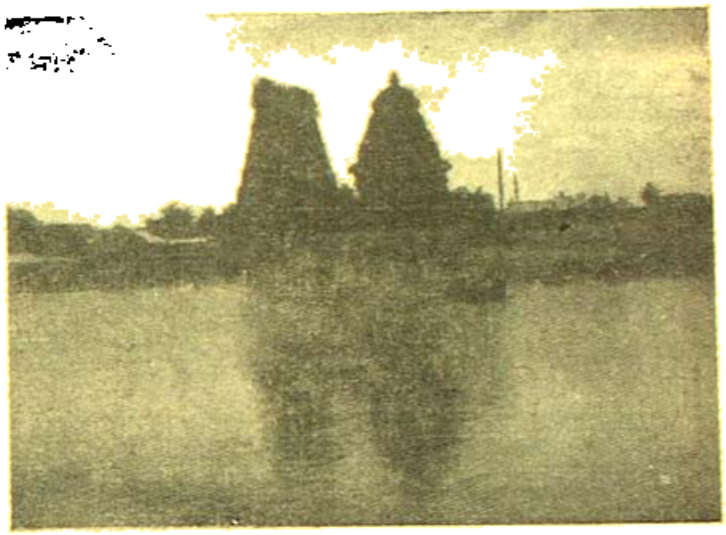

ত্রিমূর্তি মন্দির—শুচীন্দ্রম্

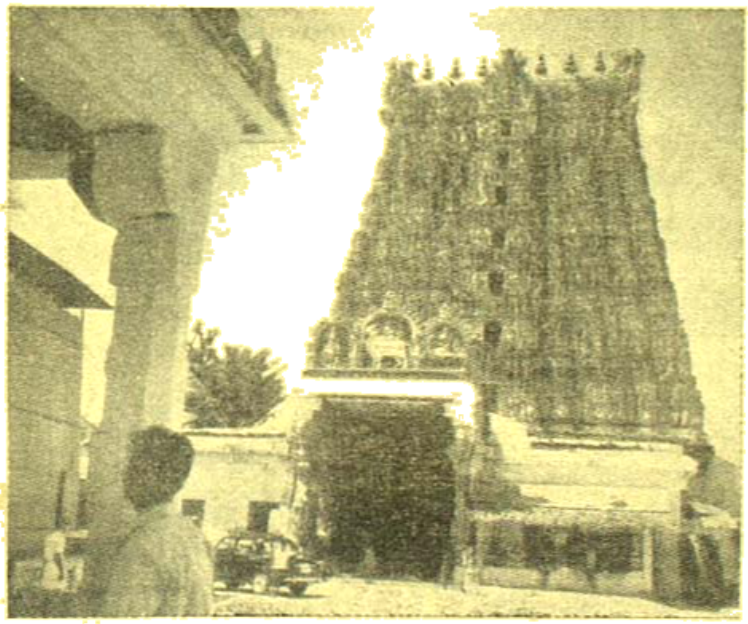

থানুমালায়ন্ মন্দিরের প্রবেশ পথ
—শুচীন্দ্রম্

ভিক্ষুকরা অসহায় শিশুতে পরিণত হওয়ায় অনসূয়া তাদের অপত্য স্নেহে পালন করতে লাগলেন।

এদিকে নারদ হিমালয়ে গিয়ে অত্রিকে তাঁর অনুপস্থিতিতে অনসূয়ার তিনটি পুত্র লাভের খবর দিয়ে, ঋষির শান্তি বিঘ্নিত করে তুললেন।

অত্রি যজ্ঞ বন্ধ করে আশ্রমে ফিরে এলেন। অনসূয়ার কাছে আদ্যোপান্ত ঘটনাগুলি শুনে তাঁর যজ্ঞ পণ্ড করবার জন্য নারদকৃত কৌশলটি অত্রি বুঝতে পারলেন!

ওদিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের নিরুদ্দেশ হওয়ায় স্বর্গে দারুণ হুলুস্থুল পড়ে গেলো।

অবশেষে নারদের কাছে সংবাদ পেয়ে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের শক্তিস্বরূপা লক্ষ্মী, সরস্বতী ও দুর্গা অনসূয়ার

কাছে এসে তাঁদের অর্ঘ্যগ্রহণের মুক্তি প্রার্থনা করতে লাগলেন।

অনসূয়া তখন শিশু তিনটিকে তাদের প্রকৃত রূপ অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপে রূপান্তরিত করে দিলেন।

মানবের সত্তা-নিষ্ঠার কাছে ত্রি-জগতের স্রষ্টা, পালক এবং সংহারক হলেন পরাভূত।

ব্রহ্মর্ষি অনসূয়াকে বর দিতে চাইলেন। অত্রিপত্নী দেবত্রয়কেই পুত্ররূপে কামনা করলেন।

তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছিল।

কালক্রমে অনসূয়া সোম, দত্তাত্রেয় ও দুর্বাসা নামে তিন পুত্রের জননী হন। ব্রহ্মার অংশে সোম, বিষ্ণুর অংশে দত্তাত্রেয় এবং মহেশ্বরের অংশে জন্মান দুর্বাসা।

দেবরাজ ইন্দ্র, গৌতম পত্নী অহল্যার সঙ্গে অন্যায় সম্মিলনের কারণে, গৌতম কর্তৃক অভিশপ্ত হন। তাঁর সর্বশরীরে বীভৎস যোনি চিহ্ন দেখা দেয়।

দুঃসহ ব্যাধিটির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দেবরাজের বহু চেষ্টাই বিফল হয়। শেষে, জানারণ্যের প্রজাতীর্থে উক্ত পূতে স্নান করে উক্ত পাপ হতে শুচি হন ও আরোগ্য লাভ করেন ইন্দ্র।

ইন্দ্রকে শুচিতা দান করেছিল তাই জানারণ্য হয়েছে শুচি-ইন্দ্রম্ বা শুচীন্দ্রম্।

শুচীন্দ্রম্-এর পৌরাণিক পরিচয়টি আগে থাকতেই জানা ছিল। মন্দিরের কর্মচারী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীটি আলোচনা করতে তিনি বললেন যে, মন্দিরের স্থল-পুরাণেও ঠিক ঐ কাহিনীটিই আছে। তমিল্ ভাষায় স্থল-পুরাণ সংস্কৃত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ-এরই নামান্তর মনে হয়।

দর্শনাদি শেষ করে আমরা ফিরছি ঠিক সেই সময় এলেন একদল শোভা-যাত্রাকারী। তাঁরা কোনও এক ধনীর গৃহ দেবতাকে থাণুমালায়ন্ মন্দিরের তেপ্পকুলম্-এ স্নান করাতে নিয়ে চলেছেন। রৌপ্য দেহী বিগ্রহটি যেন সদ্যো নির্মিত। এত উজ্জ্বল এবং পরিচ্ছন্ন মূর্তিটি।

বেলা সাড়ে এগারোটা বেজে গিয়েছিল।

এক গৃহ-দেবতার স্নান যাত্রা—শুচীন্দ্রম্

নাগরকোয়িল্ থেকে তিরুনেল্‌বেলির এক্সপ্রেস বাসটা ছাড়বে বেলা সাড়ে বারোটায়। তাই বাস্ স্ট্যাণ্ড-এর পথ ধরলাম।

আমরা স্ট্যাণ্ড-এ পৌঁছবার পাঁচ মিনিট পরে নাগর্-কোয়িল্ গামী বাস্ এলো।

বিশ মিনিটের মধ্যেই নাগরকোয়িল পৌঁছে উদ্দিষ্ট এক্সপ্রেস্ বাস্‌টা ধরা গেলো।

উত্তর ভারতে এখন শীতের প্রকোপ চলেছে কিন্তু সুদূর এই দক্ষিণে গ্রীষ্ম।

দুপুরে রোদের উত্তাপ যথেষ্ট। তবু, আমাদের যাত্রা মোটেই কষ্টকর ছিল না। কারণ, মাদ্রাজ প্রদেশের এই

দক্ষিণ প্রান্তিক জেলা তিরুনেলভেলির প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেকটা কেরল প্রদেশের মত। গাছ-পালা ও নানা উদ্ভিজ্জের প্রাচুর্যে চিরহরিৎ,—আর না রকেল গাছের ঝুরু ও বীথিতে মনোহারিণী এই জেলাটির অনেকাংশ। মিষ্টি মৃদুঠাণ্ডা হাওয়ায় দুপুরের খর রোদ স্নিগ্ধ হয়েছিল।

বেলা তিনটে নাগাত বাস পৌছলো তিরুনেলভেলি। মাদ্রাজগামী এক্সপ্রেসটা ধরতে হবে তাই আর বিলম্ব সমীচীন নয়। অথচ, বাস্ স্ট্যাণ্ড-এর কাছেই কফিখানা দেখে সহযাত্রী অজিতবাবুর প্রস্তাব হলো—এক পাত্র কফি হলে কেমন হয়?

অপর সঙ্গী শ্রীদাসও প্রতিধ্বনি তুললেন অজিতবাবুর কথার।

সুতরাং, আমিও তাঁদেরই পথের অনুগামী হয়ে পড়লাম। সকাল থেকে তখনও কলা এবং বিস্কুট ছাড়া আর বিশেষ কিছুই পেটে পড়েনি। তাই শুধু কফির নাম করে দোকানে ঢুকে বেশ কিছু উপ্‌পুমা, বড়ৈ ইত্যাদিরও সদ্ব্যবহার হলো।

উপ্‌পুমা অর্থে নোনতা-সুজি। তমিল্‌এ উপ্‌পু কথাটির অর্থ নুন, আর মা শব্দের অর্থ সুজি। দু'য়ে মিলে উপ্‌পুমা। উপ্‌পুমা উপমাহীন!

উদরপূর্তি করে যখন কাফে থেকে বেরোলাম তখন ট্রেন ছাড়ার আর আধ ঘণ্টা বাকী।

শ্রীদাস ও অজিতবাবু বাস্-এ চলে গেলেন তুত্‌-তুকুড়ি। যে স্থানটি ইংরেজী বানানে পরিচিত তুতি-কোরিন্ নামে। আমি ছুটলাম লজিঙ্ হাউস্-এর দিকে।

গলদ্‌ঘর্ম হয়ে যখন স্টেশনে পৌছলাম তখন ট্রেন্ ছাড়তে মাত্র তিন মিনিট।

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় পৌছলাম মদুরৈ।

নেমে পড়লাম রাত কাটানোর উদ্দেশ্যে। এখান-থেকেই যেতে হবে ধনুষ্কোটি। তোরে ধরতে হবে কোয়ম্‌বত্তুর—ধনুষ্কোটি প্যাসেঞ্জার।

[ক্রমশঃ

প্রেমের স্বপ্ন

সুনন্দা দাস

নীল নয়, নীল নয় সমুদ্রের রং
কখনও সবুজ হয় কখনও বা লাল—
চোখের সমুদ্রে শুধু স্বচ্ছতার মন
হৃদয় সমুদ্রে বয় যৌবন সাঁওতাল।
জানি আমি পুরুরবা হবোনা কখনও
তবু রক্তে আহ্বান মত্ত করে তারে—
সর্বদেহে নন্দনের রোমাঞ্চ জড়িয়ে
উর্বশীরা পৃথিবীতে আসে বারে বারে।
যদিও উন্মাদ করে দিতে চেয়েছিলে
সর্বনাশা চৈত্র মাস ছিল না সেদিন—
কেন তবে ভুল করে প্রিয়া হয়েছিলে
ইতিহাস ব্যাকরণে মানে কোনদিন?
স্বপ্ন দেখ, স্বপ্ন দেখ, নীলোৎপল চোখ
সেখানে সন্দেহস্রোত অন্তঃসলিলা—
ধ্যানমগ্ন চক্ষুদুটি তথাগত লোক
সুজাতার পরমান্নে হবে কি উতলা?
প্রেমের জোয়ার আসে নয়নে গোপনে
সাগরের লক্ষ ঢেউ করিছে প্রার্থনা—
ভালবাসা ভালবাসা মনের জীবনে
আগামীকে এত শীঘ্র এনোনা এনোনা।

তিলোত্তমা

মন্মথ রায়

আমি চারুকলার সাধক না হলেও চারুকলার ভক্ত—এ ছাড়া আর আমার কোন যোগ্যতা নেই। সারা জীবন নাট্যসাধনা করতে গিয়ে চারুকলার সেবা করেছি নিশ্চয়, এবং তাই কলাগঙ্গার শতাব্দীব্যাপী পীঠস্থানে দাঁড়িয়ে আজ আমি যা বলবো তা' আমার প্রত্যক্ষসিদ্ধরূপে গণ্য হলে আমি হব ধন্য।

Keats বলেছেন Truth is beauty, beauty truth. রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে সত্যকে আমরা 'হৃদয় মনীষা মনসা' উপলব্ধি করি তাই সুন্দর। তাতেই আমরা আপনাকে পাই। এই কথাই যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, যে কোনো জিনিস আমার প্রিয় তার মধ্যে আমি আপনাকেই সত্য করে পাই বলেই তা প্রিয়, তাই সুন্দর।

Art and Craft, চারুকলা ও কারিগরী শিল্প তখনি মন ভরিয়ে দেবে যখন তাতে প্রতিফলিত হবে জীবনসত্য।

এটা ভাঙাগড়ার যুগ। ব্যষ্টির যুগ গিয়ে আসছে সমষ্টির যুগ। ব্যক্তিতন্ত্রের জায়গায় আসছে সমাজতন্ত্র। সারা দুনিয়ায় এই ভাঙাগড়া চলছে, চলছে আমাদের দেশেও। প্রচুরতম লোকের প্রভূততম হিতসাধনই আজ গণতন্ত্রের লক্ষ্য। সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই আজ আমাদের সংবিধানের মোক্ষ। সৌন্দর্যবোধ ও রসোপলব্ধির আজ তাই নতুন দিকদর্শন, নতুন মূল্যায়ন অপরিহার্য্য। নন্দন-তত্ত্ব আজ তাই নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে উদ্ভাসিত। Art for Art's Sake-এর জায়গায় Art for social sake এসে যাচ্ছে। আজ এই নতুন যুগে সেইটেই সুন্দর, যা গোটা সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে, অনুপ্রাণিত করে। সেইটেই আনন্দ যাতে গোটা সমাজের কল্যাণ। আবার যাজ্ঞবল্ক্যকে স্মরণ করি। তিনি বলেছেন, যে কোনো জিনিস আমার প্রিয় তার মধ্যে আমি আপনাকেই সত্য করে পাই বলেই তা' প্রিয়, তাই সুন্দর। তাঁরই কথার প্রতিধ্বনি করে বলি—আমি চাই সেই চারুকলা, সেই কারিগরী শিল্প, যাতে যার আত্মাতে প্রতিফলিত হয় শুধু আমার নয়, আমার সমগ্র সমাজের আত্মিকচেতনা—তবেই আমি তাতে পাবো জীবনসত্য, তবেই আমি তাতে পাবো রসানন্দ।

আজ আমাদের গড়বার যুগ। গড়তে হবে নিজের ভাগ্য নয়, গোটা সমাজের ভাগ্য। সমাজকে বাদ দিয়ে আজ আমার অস্তিত্ব নেই। সমাজকে বাদ দিয়ে আমার অস্তিত্বই নেই আজ। আজ 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' শুধু চারুকলা বা কারুকলা নয়, আজ আমাদের সাহিত্য, আমাদের সঙ্গীত, আমাদের চিন্তা, আমাদের কল্পনা, আমাদের স্বপ্ন সবকেই গড়ে উঠতে হবে সমাজের কল্যাণে, সমাজতান্ত্রিক সুরে। তবেই তাতে খুঁজে পাবো আমি আমাকে, যে-আমি আত্মকেন্দ্রিক নয়, সমাজকেন্দ্রিক। সমাজতন্ত্রের সেই তিলোত্তমাকে গড়ে তুলতে হবে আমাদের; তার জন্য চাই অবিচলিত সঙ্কল্প, অনলস প্রেম, অক্ষয় নিষ্ঠা, অজেয় বীর্য। হে কবি, হে সাহিত্যিক, হে গায়ক হে শিল্পী, হে চিত্রকর, তোমাদের প্রতিটি সৃষ্টি তিলে তিলে সঞ্জীবিত করুক জাতির এই মহাসাধনা। এই মহাবিদ্যালয়ের শতাব্দী ব্যাপী ঐতিহ্য মণ্ডিত সাধনা জাতিকে ঘিরেছে সুন্দরের প্রেরণা—এখন দেবে শক্তির সঙ্কেত। তাতেই গড়ে উঠবে সমাজ জীবনে সেই তিলোত্তমা, যার আর এক নাম আনন্দ—যে আনন্দ আজ আমাদের নেই—যে আনন্দ আমরা চাই।

সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের শতবার্ষিক-উৎসবে প্রধান অতিথির ভাষণ

বিদায় পুরাতন ঃ স্বাগত নতুন

শ্রীজ্ঞান

নতুন একটা বছরের হ'ল সুরু এই বৈশাখ মাস থেকে, আর ১৩৭১ সালের কাজ হল সারা—মিলিয়ে গেল সে মহাকালের বক্ষে। নতুনের হল আরম্ভ, পুরাতনের হল অবসান। যে বছর চলে গেল তার মধ্যে রয়ে গেল কত আশা ও আকাঙ্ক্ষা, কত ব্যর্থতা ও বিফলতা, কত হাসি ও আনন্দ, কত অশ্রু ও বিষাদ! গত দিনের মধ্যে থেকে যে সাফল্য, যে আনন্দ, যে সার্থকতা লাভ করেছ, তাকেই বড় করে দেখ এবং আরও সাফল্য লাভের আশায় উদ্যোগী হও—চেষ্টা কর আরও উন্নতির আরও সার্থকতার। আর যে দিন চলে গেল, যার মধ্যে থেকে পাওয়া গেল না কিছুই, যে দিয়ে গেল শুধুই ব্যর্থতা ও বিষাদ, রইল শুধু অকৃতকার্যতার ও অকর্মণ্যতার সাক্ষী হয়ে, তার জন্যে কর না দুঃখ, কর না শোক। ইংরাজ কবির "Ring out the Old and Ring in the New"—এই কথাটা স্মরণ করে সানন্দে বিদায় দাও পুরাণ বছরকে, আর স্বাগত জানাও নতুনকে।

'গতস্য শোচনা নাস্তি'—বিজ্ঞ ব্যক্তিদের এই কথাটা মনে রেখে বিগত ব্যর্থতার জন্যে শোক কর না, দুঃখিত হও না। শুধু চেষ্টা করে যাও, পরিশ্রম করে যাও সাফল্য লাভের জন্যে—সফল তোমরা হবেই হবে। আর আনন্দে-আহ্লাদে, সাফল্যে-সার্থকতায় আগামী দিনগুলি তোমাদের ভরে উঠবে—উদ্যোগে, উদ্যমে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

বৎসরের এই প্রথম মাস, এই বৈশাখ মাস বাংলারই শুধু নয়, সমস্তভারতের বিশেষ উল্লেখযোগ্য মাস। এই পবিত্র মাসেই পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলে ছিলেন ভারত তথা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক পুরুষ মহামানব গৌতম বুদ্ধ। এই মাসেই মহাগুরু শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব হয়েছিল ভারতের মাটিতে। এই মাসেই ভারত-পথিক মহামনীষী রাজা রামমোহন এসেছিলেন বাংলা মায়ের কোলে। এই মাসেই বাঙ্গালীর ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও মনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৎসরের এই প্রথম মাসে আরও বহু মনীষী ও সাধকের জন্ম হয়েছিল। তোমরা এই পুণ্য মাসে তাঁদের স্মরণ কর, তাঁদের জীবনী আলোচনা কর এবং তাঁদের মহাজীবনের আদর্শকে অনুসরণ করে চলবার চেষ্টা কর। আর সেই সঙ্গে কবি-গুরুর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গাও—

"আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার।
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক,
ফিরব না গো আর—
তোমারে করি নমস্কার।"

বউঠাকুরাণীর হাট

রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

এক যে ছিল রাজা। রাজার মস্ত রাজ্য, অনেক দাস দাসী। রাজার মেয়ের নাম বিন্দুমতী। বিন্দুমতীর যেমন রূপ তেমনি গুণ। দেখলে চোখ ফেরান যায়, অমন রূপ দেখা যায় না। যেন চোরের গোলাপ, গন্ধে ভুবন মাতে আলা নাইকো তাতে। চোখ জুড়ায় মন ভরায়। সেই যে বিন্দুমতী রাজা তার বিয়ে দিয়েছেন চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্পনারায়ণের ছেলে রামচন্দ্রের সঙ্গে। বিয়ের পর কত দিন কত রাত কত মিনিট কতঘণ্টা কত মাস কত বছর কেটে গেছে। রামচন্দ্রের আর শ্বশুর বাড়ী যাওয়াও হয় না, বিন্দুমতীকে আনাও হয় না। রাজা কন্দর্পনারায়ণ মারা যাওয়ার পর রামচন্দ্র রাজা হলেন।

বিন্দুমতী জানলার ধারে বসে থাকে, চোখের পলক পড়ে কি পড়েনা, ঠোঁট নড়েকি নড়েনা। বাতাস এসে দাঁড়িয়ে থাকে জানলার ধারে, অলির দল গান করে শুন শুন করে। কোথায় রাজপুত্তুর সে কত দূর, বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর দেশ, হট্টমালার ঘাট, কাঁকনডলার মাঠ পেরিয়ে অনেক অনেক দূরে! বিন্দুমতী বসে ভাবে—ভাবে আর ভাবে। বাতাসের মুখে খবর পাঠায় রাজা রামচন্দ্রকে। যে খবর যায় কি যায় না। রামচন্দ্র খবর পায় কি পায় না। ওদিকে রামচন্দ্রও চেয়ে থাকে মেঘের দিকে, আর সেই মেঘের মেলায় করে পাঠিয়ে দেয় খবর।

সেদিন সখীরা বলে—রাজকন্যে গো, সই গো, আজ আমাদের ডান চোখ নাচে কেন? তাই তো ডান চোখ নাচে কেন? সখী ছুটে আসে পড়িকি মরি, মরি কি পড়ি করতে করতে। দাসী ছুটে এল দুপদাপ করে পা ফেলতে ফেলতে। বিন্দুমতী বসে আছে চক্ষু বুজে, সখীরা, দাসীরা এল সেজে গুজে। রাজবাড়ীর ঘরে ঘরে পড়ে গেল আনন্দের সাড়া। কি ব্যাপার, কি খবর? না,—জামাই আসছে। রাজার মুখে ফুটল হাসি, রাণীর মুখে ফুটল হাসি। আহা-এতদিন পরে মেয়ে শ্বশুর বাড়ী যাবে।

৬৪ দাঁড়ের নাও চলেছে, ঐরবের ঢেউ কেটে। নাও চলেছে ঠেলে তুলে, নাওের মাঝি পাল তুলেছে হাল দিয়েছে খুলে। নাও চলেছে তো চলেছে, এ ঘাট সে ঘাট পেরিয়ে এ দেশ সে দেশ পার হয়ে। ৬৪ মাঝি শক্ত হাতে বৈঠা ধরেছে। তাদের কালো শক্ত হাতগুলো দুলে উঠছে, বুকের খাঁচা গুলো নামছে উঠছে, উঠছে নামছে। কালো জল আর কালো ঢেউ। নৌকার উপর বসে রাজা রাম-চন্দ্র, রসাই ভাঁড়, আরো কত লোক, বন্ধু বান্ধব সৈন্য সামন্ত। রাজার ছেলে রাজা সে যাচ্ছে শ্বশুর বাড়ী রাণীকে আনতে। ব্যবস্থার শেষ নেই। নৌকা ভরে গেছে। নাও দুলছে। নাও দুলছে মাঝি মাল্লা দুলছে। চলতে চলতে চলতে শেষে নাও এসে ভিড়ল যশোরে। মস্ত রাজা যশোর, রাজা যেমন বীর তেমনি শক্তি তার। হাতী শালে হাতী, ঘোড়া শালে ঘোড়া, নেইকো তাদের জোড়া, রাজার ক্ষেতে ফলে সোনা, তার ফসল যায় না গোনা। রাজধানীর কাছেই এক খাল, নাও এসে নোঙর করল সেই খালে। ঘরে ঘরে উঠল বেজে শাঁক, পড়ল হাঁকডাক। উঠল বাজনা বেজে, যত পুরনারী এল সেজে, তারা করল হুলুধ্বনি। রাজা প্রতাপাদিত্য মন্ত্রী, পাত্রী পাত্রমিত্র সবাই নিয়ে আদর করে জামাইকে বাড়ী নিয়ে এল।

দাসী এল ছুটে, রাজকন্যে গো, রাজকন্যে সর্বনাশ হয়েছে। জামাই বুঝি আর বাঁচে না। বিন্দুমতী পড়ে চলে, সখীরা সব বলে, বল লো দাসী কি হল? রাজকন্যে, কি বল। বল? মহারাজ বলেছেন জামাইকে কেটে ফেলতে। জামায়ের ভাঁড় রসাই অন্দরে ঢুকেছিল, আর রাণীমাকে করেছে অপমান। রাজকন্যা চোখের জলে ভাসে, সখীরও চোখে জল আসে, বাতাস বুঝি কাঁদে, অশ্রু নাহি বাধে, কি গো কি হবে। রাজকন্যে চলে তাদের কাছে, দাদা গো কি হবে! পরামর্শ চলে, কি করা যায়, কি করে রাজ রোষ থেকে জামাইকে বাঁচান যায়; অল্প বয়েসী রাজা রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের এক ভৃত্য ছিল তার নাম রামমোহন। এমন তার দেহ যা দেখেনিকো কেহ। তেমনি তার শক্তি তেমনি প্রভুভক্তি। সে করল কি···

গভীর রাত্রি, ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে ঝিঁ ঝিঁ করে, নিঃঝুম চারিদার জেগে নাহি কেহ আর। সেই সময় রামচন্দ্রকে নাপিঠে বেঁধে রাজবাড়ীর ছাদ থেকে ঝুলাল এক দড়ি, তারপর সেই দড়ি বেয়ে নেমে এল। খালের ধারে উদয় আগেই নৌকার যোগাড় করে রেখেছিল। নৌকা চলল মনের বেগে তরতর করে।

রাজা প্রতাপাদিত্য তো সব শুনে রেগে আগুন। একে বাইরের লোক অন্দরে এসে অন্দরের অপমান করা, তারপর নাকি রামচন্দ্র তারই জ্ঞাতিশত্রু বসন্ত রায়ের সঙ্গে করেছিল পরামর্শ। সেই রামচন্দ্রের পালানোর সাহায্য করল কিনা তাঁরই ছেলে উদয়। কয়েদ করো তাকে। সেপাই ছুটল রাজপুত্রকে কয়েদ করতে।

• • •

রাজ্যে ফিরে রামচন্দ্রের কিন্তু রাগ পড়ল না। রামমোহন কত বুঝায়—মহারাজ রাণীমাকে আন; কিন্তু রাজার মন গলে না। অনেক বলার পর তার মন নরম হল। রামমোহন তো তৈরী, সে অমনি ছুটল। যশোরে এসে রাণীর পায়ে প্রণাম করল। মায়ের মন তো, হু হু করে উঠল। রাজারও মন গলে গেল। বড় শক্ত ছিল তাঁর মন। প্রাণের চেয়েও বড় মান। অপমানের কাজ করলে ছেলেও রেহাই পায় না। একে রামচন্দ্র করেছিল গুরুতর অপমান, তার উপর তার কানে কথাটা গিয়েছিল অতদূর বাড়িয়ে। কি আর উপায়, রাজার বিচার!

রাজবাড়ীতে হৈ হৈ পড়ে গেল। রাজার মেয়ে যাবে শ্বশুর বাড়ী। নাপতিনী এসে আলতা পরায়, তাঁতি বৌ দিয়ে যায় তার সেরা কাপড়। এক সখী চুল বাঁধে, আরেকজন চন্দন ঘষে। আয়োজনের আর শেষ নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাজগোজ মাটি হল। রাজকন্যার যাওয়া হল না। কেন,—কেন? আর কেন, তাই থাকবে কয়েদখানায়, আর সে যাবে শ্বশুর বাড়ী! রামমোহন ফিরে গেল।

রামমোহন তো ফিরে এল, রামচন্দ্র তো তাকে উঠতে বসতে দেয় বকুনি। কি আর করে বেচারা রামমোহন। মনের দুঃখে তার দিন কাটে।

• •

রাজা রামচন্দ্র ঠিক করলেন আবার বিয়ে করবে। ভৃত্য ছিল নয়নচাঁদ—তাকে দিয়ে যশোরে খবর পাঠিয়েছিল, যশোরের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক থাকবে না। বাখরগঞ্জের শম্ভু ঘোষ, এই শম্ভু ঘোষের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে। অনেক নাম ডাক শম্ভু ঘোষের।

যশোরের রাজার মনে দুঃখ, রাণীর মুখ ভার। আদরের কন্যা বিন্দু—তার এই দশা! রাণী রাজার মুখের পানে চান, রাজা রাণীর মুখের পানে চান। শেষে বিন্দুকে পাঠানোই স্থির হল। রাজা রামচন্দ্রের বিয়ের আগের দিন বিন্দুমতী চড়ল বজরায়, সঙ্গে লোকজন, দাসদাসী, মাঝিমাল্লা, আর চলল প্রাণের ভাই উদয়। বিরাট বজরা চলেছে হেলে দুলে। চলতে চলতে হোসেনপুরের খালে এসে বজরা থামে, লোকজন সব নামে, একজন যায় শহরে খবর নিতে। খবর নিয়ে জানল রামচন্দ্র মাধবপাশায় চলে গেছে। আবার চলে নাও, যেথা আছে রামচন্দ্র সেথায় চলে যাও। নাও চলল। মাধবপাশা আর কালীজিড়ার মুখে এসে নৌকা নঙ্গর করা হল। দূর থেকে ভেসে আসছে সানায়ের সুর। তাইতো? সানাই বাজে কেন? রাজপুত্র উদয় ছদ্মবেশ ধরে চলল খবর নিতে। খবর আর কি নেবেন? যা ভেবেছেন তাই, ভাবার কিছু নাই। রামচন্দ্রের বিয়ে হয়ে গেছে। বিন্দুমতী আর নামলো না, বজরাতেই রয়ে গেল। তার সঙ্গে লোক তো কম নয়—তাদের হাট বাজার জিনিষ পত্তর চাই তো। সেখানে একটা হাটই বসে গেল। আর হাটের নাম হল "বউ-ঠাকুরাণীর হাট"। চার মাস সেখানে থেকে রাণী আবার বজরা খুললেন। বজরা গিয়ে ভিড়ল সারদী গ্রামে।

চন্দ্রদ্বীপের রাণী রামচন্দ্রের মা সব শুনলেন, শুনে পালকী সাজিয়ে লোকলস্কর দাসদাসী নিয়ে বউরাণীকে নিয়ে এলেন। কিছুদিন রামচন্দ্রের রাগ পড়েনা। তারপর একদিন তাঁর মন নরম হল। তারপর? তারপর?—রাজা রাণী মনের সুখে রাজত্ব করতে লাগলো।

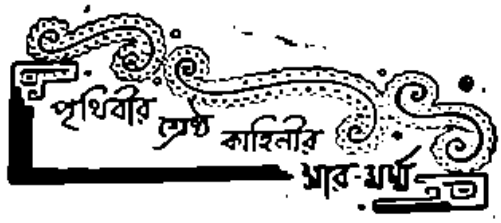

চার্লস্ ডিকেন্স্

রচিত

অলিভার্ টুইষ্ট্

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বইয়ের দোকানের সন্ধানে বাজারে বেরিয়ে বেচারী অলিভার যখন পথ হারিয়ে নিতান্তই অসহায়ভাবে শহরের এ-গলিতে সে-গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে এসে তাকে সজোরে জাপটে ধরলে··· চমকে উঠে অলিভার তাকিয়ে দেখে—ছাপ্পী নামে তারই সমবয়সী ফ্যাগিনের দলেরই একটি কিশোরী মেয়ে তাকে পাকড়াও করে ফেলেছে। অলিভারকে খুঁজে পেয়েই ছাপ্পী সোৎসাহে বললে,—আরে, অলিভার যে!···কোথায় ছটকে ছিলি এ্যাদ্দিন?···তোকে খুঁজে খুঁজে আমরা তো সবাই হায়রাণ হয়ে গেছি!···চল্ ভাই, চল্···ফিরে যাই এবার আমাদের আড্ডায়—দর্দারের হেপাজতে। আবার সেই ফ্যাগিনের আড্ডায় ফিরে যাবার কথা শুনেই ভয়-আতঙ্কে অলিভারের শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল···শিউরে উঠে চীৎকার করে সে বললে,—না···না···আমায় ছেড়ে দাও!···আমি সেখানে যাবো না···যাবো না!

ছাপ্পী কিন্তু ছাড়বার পাত্রীটি নয়···ফ্যাগিনের আড্ডার পুরোনো-ঘাগী পাকরেদ সে···শীকার হাতের মুঠোয় এসে এত সহজে ফাঁকি দিয়ে ফস্‌কে পালাবে—এমন কাণ্ড সে ঘটতেই দেবে না কোনোমতে। তাইতেই সে অলিভারকে আরো জোরে আঁকড়ে রইলো। এদিকে পথের মোড়ে অসহায় অলিভারের কাতর চীৎকার শুনে নিমেষের মধ্যেই তাদের আশেপাশে লোকজনের ভীড় জমে গেল···ব্যাপার কি জানবার জন্য সকলেই উৎসুক! বয়সে কিশোরী হলেও, ফ্যাগিনের সাকরেদ ছাপ্পীও কম যেয়ানা নয়··· অলিভারকে আরো কষে জড়িয়ে ধরে কান্নার ভাণ করে করুণ-কণ্ঠে পথের লোকজনদের সে বললে,—দেখুন তো কি দুষ্টু ছেলে!···তুচ্ছ কারণে মা'র সঙ্গে ঝগড়া করে রাগের চোঁকে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে! মা আমার চোখের জল ফেলছে সারাক্ষণ!···তাই আমার এই ছোট্ট ভাইটিকে বাড়ী ফিরে যেতে বলছি!···কিন্তু এমনই বেয়াড়া জেদী যে কিছুতেই সে কথা শুনছে না!···উপরন্তু, মিছা-মিছি সোরগোল বাধিয়ে লোক জড় করছে!

চতুর ছাপ্পীর কপট-কান্না আর নিপুণ অভিনয়ের ছলনায় ভুলে পথের লোকজন সবাই নিরীহ অলিভার বেচারীকে দোষী সাব্যস্ত করে ধমকে উঠলো,—বটে! ভারী বেয়াড়া ছেলে তো!···মা'র মনে কষ্ট দিয়ে পালিয়ে এসেছে হতভাগা!···এখনি কান পাকড়ে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে যাও ওকে বাড়ীতে!···

বেচারী অলিভার···পথের লোকজন কেউই তার কথায় কর্ণপাত করলো না···সকলেই ঠাউরে নিলো যে সে একটা বেয়াড়া-বদমায়েস ছেলে···মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে এসেছে! ছাপ্পীও সেয়ানা মেয়ে··· কপট কান্নায় লোকজনের মন ভিজিয়ে ঠিক এমনি সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল। কাজেই সে প্রায় এক মুহূর্ত্তে সময় নষ্ট না করে, তাদেরই দলেরই এক বদমায়েস সাকরেদের সহায়তায় অসহায় অলিভারকে টেনে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে শহরের এঁদো বস্তীর কোণে ফ্যাগিনের সেই পুরোনো আড্ডায়।

ওদিকে বাজারের বইয়ের দোকান থেকে অলিভার ফিরলো না দেখে, ব্রিমউইগ তাঁর বন্ধু ব্রাউনলোকে ব্যস্ত করে বললেন,—দেখলে তো হে!···তোমার ঐ ছোকরা যে ফিরবে না, সে আমি জানতুম!

ব্রাউনলো কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করলেন না! তাঁর মনে ভাবনা জাগলো···সত্যিই তো, ছেলেটা কি তাহলে হঠাৎ কোনো বিপদে পড়লো নাকি!

ফ্যাগিনের আড্ডায় অলিভারকে এবার খুব কড়া-নজর-বন্দীতে রাখা হলো···যাতে আর সে সহজে চোখে ধুলো

দিয়ে আড্ডা ছেড়ে অন্য কোথাও পালাতে না পারে! এ ব্যবস্থার ফলে, অলিভার বেচারী পড়লো ভারী মুস্কিলে··· ছুতোনাতায় সর্দার ফ্যাগিন থেকে শুরু করে আড্ডার সবাই তার উপর জুলুম চালায়···নির্মম মার খেয়—পান থেকে চুণটুকু খসলেই।···এমনি পীড়ন অত্যাচার সহেই ফ্যাগিনের আড্ডায় অসহায় অলিভারের দিন কাটে···মুক্তির সম্ভাবনাও নিতান্ত সুদূর পরাহত!

কিছুদিন পরে ফ্যাগিনের আড্ডায় হঠাৎ এসে হাজির বিলাতী সৌখিন এক তরুণ ধনী ভদ্রলোক···তাঁর নাম মহস্। মহস্ ছিল আসলে ফ্যাগিনের শাঁসালো একজন পুরোনো মক্কেল···কোনো বড়-মতলব কিম্বা জন্মীবাজী কাজকর্ম হাসিল করবার দরকার হলেই, মহস্ সটান এসে জুটতো কানু-ওস্তাদ ফ্যাগিন সর্দারের আড্ডায়। কাজেই অন্যান্যবারের মতো সেদিনও মহস্ এসে ফ্যাগিনের কানের কাছে মুখটি এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললে,—শোনো হে, ওস্তাদ···জরুরী একটা ব্যাপার আছে!··· তোমার আড্ডায় ঐ যে অলিভার নামে ছোকরাটা রয়েছে ওটাকে চটপট রীতিমত দাগী আসামী বানিয়ে তুলতে হবে ···মোটা বকশিস দেবো!

ফ্যাগিন ঘুঘু-বদমায়েস···মহসের প্রস্তাব শুনেই বুঝলো —এর মতলব আছে!···মোটা দাওয়ের ব্যাপার!···মুচকে হেসে সে বললে,—কারণ?··

আশেপাশে চারিদিকে চট করে এক ঝলক নজর বুলিয়ে নিয়ে মহস্ ফিস্‌ফিস্ করে বললে,—কথাটা গোপন রেখো···ব্যাপারটা সব খুলে বলছি তোমাকে।

মহসের কথা শুনে মুরুব্বী-ভঙ্গীতে ফ্যাগিন জবাব দিলে, —ভয় নেই, ভায়া···তোমার এ মতলবের আভাস কাক-পক্ষীতেও জানতে পারবে না—মানুষ তো দূরের কথা!··· নির্ভাবনায় খুলে বলতে পারো তোমার মনের কথা সব।

মহস্ তখন ফ্যাগিনকে জানালো যে অলিভার আসলে অনাথ নয়···তারই বৈমাত্রেয় ভাই। অলিভার জন্মাবার আগেই নানা রকম পারিবারিক চক্রান্ত আর নির্মম পীড়নের ফলে, অলিভারের মা নিতান্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে আসন্ন প্রসববাবস্থাতেই বাড়ী ছেড়ে···তাঁর স্বামীর আশ্রয় ছেড়ে চলে আসেন। বহু খোঁজাখুঁজি করেও শেষ পর্যন্ত নিরুদ্দিষ্ট স্ত্রী আর শিশু-সন্তানের কোনো সন্ধান না পেয়ে বাবার মন দুঃখে অনুতাপে ভরে ওঠে। তাই তিনি মারা যাবার সময় উইল লিখে তাঁর বিপুল বিষয়-সম্পত্তির বিচিত্র বিলি ব্যবস্থা করে গেছেন। অর্থাৎ, নিরুদ্দিষ্ট অলিভারকে যদি কখনও খুঁজে পাওয়া যায় এবং অনাথ অসহায় অবস্থায় দুঃখে-দুর্দশায় এবং কুসংসর্গে মানুষ হয়ে ওঠার ফলে সে যদি চুরি-ডাকাতি বা জাল-জালিয়াতী করে জেল-কয়েদী দাগী আসামী হয়ে ওঠে, তাহলে বাপের সম্পত্তি কিছুই পাবে না···সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে তখন প্রথম-পক্ষের স্ত্রীর ছেলে মহস্। তবে, অলিভার যদি দাগী না হয়ে, বরাবর সৎ পথেই থাকে এবং সৎভাবে জীবনযাপন করে, তাহলে বড়ছেলে মহসের বদলে ছোটছেলে অলিভারই পাবে পিতার বিপুল সম্পত্তির সব কিছুই। কাজেই পৈত্রিক সম্পত্তি লাভ করতে হলে, অলিভারকে দাগী আসামী বানানো চাই।—মহসের এই হলো মতলব।

কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে! কাজেই এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটলো না। ফ্যাগিনের সঙ্গে মহসের এই ফন্দী-ফিকিরের চক্রান্ত আলোচনার সবই কথা আড্ডা-খানার দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে কান পেতে শুনলো কিশোরী স্যালী। চক্রান্তের আভাস পেয়েই স্যালীর মনে জাগলো—অসহায় অলিভারকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করার একান্ত বাসনা। আড্ডাখানায় থেকে চোর-বাটপাড় বদমায়েসদের কুসংসর্গে মিশেও কিশোরী স্যালীর মনে স্নেহ মায়া-মমতা তখনও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি···তাছাড়া নিতান্ত অসহায় নিরীহ নাবালক অলিভারের উপর এমন নির্মম অন্যায় আচরণ ঘটতে দেখে স্যালী তাকে নিজের ছোট-ভাইয়ের মতোই ভালবেসে বিপদ থেকে রক্ষা করবে বলে এগিয়ে এলো···ছলে বলে কৌশলে এমন অন্যায়ভাবে কেউ যেন অলিভারের কোনো ক্ষতি করতে না পারে—এই হলো কিশোরী স্যালীর একমাত্র লক্ষ্য। এমন কি অসহায় অলিভারকে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য যদি নিজের প্রাণ দেবার প্রয়োজন হয় তো স্যালীর তাতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। বয়স অল্প হলেও, স্যালী কেবলই খুঁজে বেড়ায় সুবিধামতো সুযোগ···কি উপায়ে সে তারই সম-বয়সী অনাথ অলিভারকে নিরাপদে এই বিপদ চক্রান্ত থেকে উদ্ধার করতে পারবে! [ক্রমশঃ

——

চিত্রগুপ্ত

জাহাজ, নৌকা, গামলা, হাঁড়ি প্রভৃতির ছাঁদে-বানানো ছোট্ট, লোহার তৈরী অন্ত সব জিনিষগুলি জলে ফেললে, সড়াৎ করে সেটি নিমেষের মধ্যেই টুপ্ করে ডুবে তলিয়ে যায়—এমনটি ঘটতে তোমরা নিত্যই দেখছো। কারণ, বিজ্ঞানীদের মতে, লৌহ-ধাতুটি হলো—ওজনে জলের চেয়ে প্রায় আট-গুণ বেশী ভারী। কিন্তু এ নিয়ম সত্ত্বেও বিজ্ঞানের আয়ত্তে এমন একটি বিচিত্র কৌশল আছে, যার কৌশলে আট-গুণ বেশী ভারী লোহাকেও অনায়াসেই জলের বুকে ভাসিয়ে রাখা সম্ভব হতে পারে। কথাটা শুনে তোমরা হয় তো অবাক হচ্ছো!···তাহলে শোনো—বিজ্ঞানের সেই অভিনব-কৌশলের আসল-রহস্যটির পরিচয় দিই।

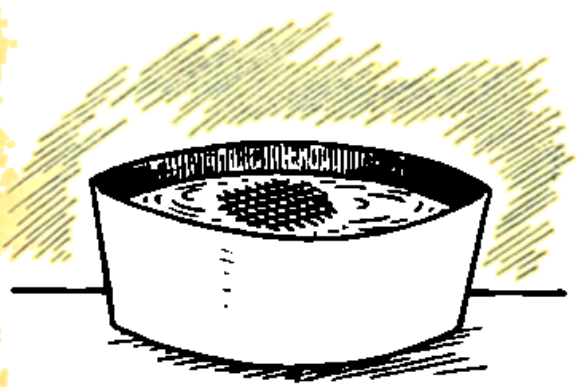

তবে এ কৌশলের আসল-রহস্যের সন্ধান পেতে হলে, গোড়াতেই অতি-সাধারণ টুকিটাকি কয়েকটি ঘরোয়া-সামগ্রী জোগাড় করে নেওয়া দরকার। অর্থাৎ, এজন্য চাই—উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি ধরণের একটি জল-ভরা গামলা, বাসতি বা ডেকচির মতো পাত্র, এবং সেই সঙ্গে এক টুকরো হাল্কা-ধরণের লোহার তারের জাল কিম্বা একটি সেফটি-ক্ষুরের ব্লেড (Safety-Razor Blade) অথবা সেলাইয়ের ছুঁচ। এ সব জিনিষ সংগ্রহ হবার পর বিজ্ঞানের আজব কলা-কৌশলগুলি পরখ করে দেখবার পালা।

তবে সাজ-সরঞ্জামের মতো, বিজ্ঞানের কলা-কৌশল-গুলি আয়ত্ত করাও নিতান্তই সহজ-সরল ব্যাপার। অর্থাৎ বিজ্ঞানের এই বিচিত্র কারসাজিটি হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখার সময়, প্রথমেই সমতল মেজেতে কিম্বা টেবিলের উপর জল-ভরা পাত্রটিকে কিছুক্ষণ রেখে রাখো। তাহলেই দেখবে—পাত্রটি নাড়াচাড়া করার ফলে, পাত্রের জলের বুকে যে সব ঢেউয়ের আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, সেগুলি ক্রমশঃই মিলিয়ে গিয়ে জলটুকু আগা-গোড়া স্থির-অচঞ্চল অবস্থা ধারণ করেছে।

জলটি যখন বেশ স্থির-অচঞ্চল অবস্থা ধারণ করবে, তখন খুব সন্তর্পণে এবং সযত্নে হাতের আঙুলের সাহায্যে আলতোভাবে ধরে, সটান্ শোয়ানো-ছাঁদে···অর্থাৎ, 'Flat' অবস্থায় রেখে, পাত্রের জলে ধীরে ধীরে ভাসিয়ে দাও—ঐ লোহার তারের জালের টুকরো কিম্বা সেফটি-ক্ষুরের ব্লেড অথবা সেলাইয়ের ছুঁচটিকে। তবে হুঁশিয়ার, এ সব জিনিষ পাত্রের জলে ভাসিয়ে দেবার সময় যেন আহা হাতের আঙুলের বেশী-চাপ না পড়ে কিম্বা জিনিষগুলির কোনোটিকে যেন বাকাবাঁকি বা ঝাড়াঝাড়ি ধরণে জলে ভাসানো না হয়। তাহলেই সব মজা মাটি···জিনিষটি সঙ্গে সঙ্গেই পাত্রের জলের তলায় তলিয়ে যাবে···জলের উপরে ভাসবার সুযোগ পাবে না আর। সুতরাং, জিনিষটিকে জলের বুকে ভাসানোর সময় এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। যাই হোক, জিনিষটিকে যদি যথাযথভাবে জলের 'উপরের স্তর' অর্থাৎ, 'Surface'-এ 'সমতল' বা 'Flat' অবস্থায় শুইয়ে রাখতে পারো, তাহলেই দেখবে,—বিজ্ঞানের বিচিত্র বিধানে ভারী লোহার তৈরী জিনিষটি জলের তলায় ডুবে তলিয়ে যাবার বদলে, দিব্যি সহজ-সুন্দর-ভঙ্গীতে জলের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে।

আরো মজা যদি দেখতে চাও, তো ভাসন্ত লোহার-

সামগ্রীটিকে আদৌ স্পর্শ না করে, ছোট এক-টুকরো সাবান নিয়ে পাত্রের তলে চুনিয়ে দাও···তাহলেই দেখবে —লোহার যে সামগ্রীটি এতক্ষণ জলের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছিল, সেটি সঙ্গে সঙ্গেই টুপ্ করে জলের তলায় ডুবে মুহূর্তেই তলিয়ে যাবে!

এই হলো—এবারের মজার খেলাটির আসল রহস্য। জলের বুকে লোহার ভারী-সামগ্রীকে এমনিভাবে ভাসিয়ে রাখার কারণ হলো—জলের উপরের-স্তরের আকর্ষণ-শক্তি ···অর্থাৎ, বিজ্ঞানীদের ভাষায় যাকে বলা হয়—'Surface Tension'।

যাই হোক, কলা-কৌশল তো শিখলে, এবারে নিজের হাতে পরখ করে দ্যাখো—বিজ্ঞানের এই মজার খেলাটি।

মনোহর মৈত্র

১। জমি-ভাগের হেঁয়ালী ঃ

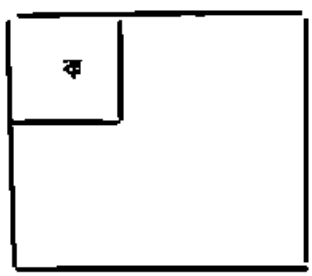

উপরের নক্সার মতো আকারে রামবাবুর একখণ্ড জমি আছে। সেই জমি হইতে উপরের নক্সার 'ক'-চিহ্নিত অংশটি তিনি সম্প্রতি বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। জমির এই অংশটি বিক্রয় হইয়া যাইবার কিছুদিন পরেই রামবাবুর মৃত্যু হয়। রামবাবুর মৃত্যুর পর, তাঁহার চার পুত্রের মধ্যে একটি সমস্যার সৃষ্টি হইল। অর্থাৎ, বাকী জমিটি তাঁহার ঐ চার পুত্রের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করিয়া দিতে হইবে, যাহাতে প্রত্যেকেই সমান-অংশ পায়।··· তোমরা কি পারো—এই সমস্যার সমাধান করিতে?

রচনা: চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর)

২। মাছের নামের ধাঁধা:

পাঁচ-অক্ষরে রচিত এমন একটি মাছের নাম করো:— যার প্রথম তিন-অক্ষরে 'এক-ধরণের পাখীর নাম' বোঝায় এবং শেষ দুই-অক্ষরে অন্য আরেক-ধরণের মাছ কিম্বা বাংলাদেশী উৎসব-অনুষ্ঠানের সময় বিশেষভাবে সংগ্রহের বস্তু বোঝায়। তাছাড়া প্রথম ও তৃতীয় অক্ষর পাশা-পাশি সাজিয়ে রাখলে, বিশেষ ধরণের একটি রাসায়নিক পদার্থ বোঝায়।···বলো তো তাহলে—সেই মাছের আসল নামটি কি?

রচনা: গৌতম ঘোষ (কলিকাতা)

গতমাসের ধাঁধা ও হেঁয়ালীর উত্তর:

১নং উপায়

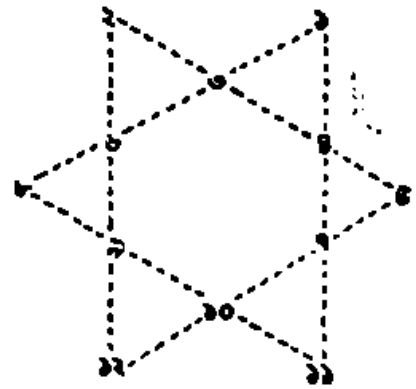

২নং উপায়

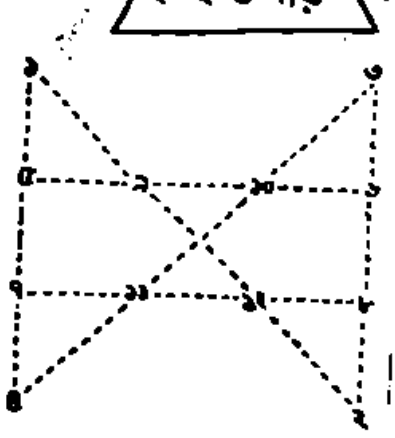

১। উপরের নক্সা দুটি দেখলেই বুঝতে পারবে যে এ সমস্যার সমাধান কত সহজেই করা যেতে পারে।

২। মিশাইল
৩। রোমেল

গতমাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বুলু মিত্র (কলিকাতা), পিন্টু হালদার (বালী), সৌম্যেন্দুকান্ত ও বিজয়া আঢ্য (কলিকাতা), পাপু, ছোটন ও অস্তি (কলিকাতা), ভুটন ও পুপু মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), মিনি ও রবি (কাইয়ো), বুবু ও মিঠু গুপ্ত (কলিকাতা), পুতুল, সুমা, হারেনু ও টারেনু (হাওড়া), শর্মিষ্ঠা ও মধুমিতা রায় (কলিকাতা), জ্ঞানদাস দেবশর্মা (উত্তরপাড়া), কানু ও বেনু ঘোষাল (কলিকাতা), বান্না ও শিবাজী রায় (কৃষ্ণনগর), বুড়ো, লিপু, অতু, পিন্টু, লাভু, লুলু, ও খোকা (রাঁচী), রাণা ও বুনা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), গৌর, বেণু, দুর্গা, ক্ষেপী ও বভু (কলিকাতা), সন্তোষ, সঞ্জয়, সুনীল ও মুন্নারী (ভিলাই), বাপি ও তিলক রায় (কৃষ্ণনগর)

গত মাসের ছুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

প্রশান্ত, অমিয়, অতীন্দ্র ও অমৃত (রায়পুর), কল্যাণ, শচীন, রজত, ইন্দ্র, বিশ্বতোষ, অমিয়কুমার, রঞ্জিত, (কলিকাতা), বিজয়েন্দ্র ও বিনয়েন্দ্র সিংহ (হাজারীবাগ), হিমাংশু, সুধাংশু, ঈশাংশু ও হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সন্তোষপুর), পৃথ্বীশ ও মনতোষ মজুমদার (বর্দ্ধমান), শেফালিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), বুবু, কটু, জর্জ, মিন্টু ও অনামিকা গুপ্ত (মুসৌরি), মীরা ও লীনা (নিউ দিল্লী), নির্ম্মল রায়চৌধুরী (বর্দ্ধমান), স্বপ্না, চুপ্পা, কেতকী, মন্টা ও ভন্টা বিশ্বাস (নাগপুর), দীনবন্ধু ও কালীনাথ সাহা (চুঁচুড়া), শিবাজী ও বান্না রায় (কলিকাতা)

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

দেবকীকুমার ও বিশ্বনাথ সিংহ (গয়া), বাপি, তুতাই ও পিন্টু গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই), হরিদাস, অজয়, সত্যেন, রাজেন, পশুপতি, সমীর, বিকৃতি ও নিতাই (আসানসোল), বৈকুণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (ইছাপুর), রবি ও তনু দাশগুপ্ত (কলিকাতা), জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম গোস্বামী (শ্রীরামপুর), পরিমল দাশগুপ্ত (কালনা), সুলেখা পোদ্দার (কলিকাতা), পবিত্রশঙ্কর গুহ (কলিকাতা), শ্যামাপ্রসাদ, পদ্মা, প্রতিমা, গুরুদাস, অমরেন্দ্র ও অর্চ্চনা কর (কল্যাণী), অমরলাল, পান্নালাল ও চুনীলাল রায় (আমোদপুর), বুবু, আবু ও ববু (ভরুয়াবাড়ী), সোমনাথ পালিত (মজঃফরপুর), শিশির, যামিনী, রঞ্জন, সুশীল, বিপুল, কমল ও পরিমল (পতিরাম), বাচ্চু ও বাপী (তাতাড়), গৌতম, অশোক ও নীতা ঘোষ (কলিকাতা), সুশান্ত, সুমন্ত, সুকান্ত, বনানী সিংহ, সিউলী, কাকলী ও দেবীপ্রসাদ মিত্র (মনমপুর), অঞ্জন-কুমার মিত্র (কলিকাতা), সুজিত সিংহ (কলিকাতা) ;

আসবে সেদিন

শ্রীমঞ্জুর দাশগুপ্ত

আজকে ধরায় জেগেছে হিংসা-বিদ্বেষ-প্রতারণা
বজ্রসম কালো মিথ্যার মেঘে সত্যসূর্য্য ঢাকা।
দিকে দিকে ওঠে মারণাস্ত্রের চকল ঝঞ্ঝনা
কুটিলতাকলে ভরে গেছে আজ ভ্রাতৃবৃক্ষের শাখা।
শান্তিপ্রেমের ললিত বাণীর মূল্য তো কিছু নেই
অর্থের কাছে কলুষে সবাই মানবতা বিক্রয়,
অসাম্য নীতি হচ্ছে ঘোষিত মৃত্যুকণ্ঠেতেই
কূটচক্রীরা আজ মহাধনী হচ্ছে তাদেরি জয়।
তবু জানি ঠিক এ'দিন রবেনা—আসবে সেদিন তাই
যেদিন প্রেমের রঙীন রাখীতে বাঁধা হবে মানুষেরা
হানাহানি গ্লানি হেয়নীতি আর দূর হয়ে যাবে তাই
জানবে সবাই এই পৃথিবীতে মৈত্রী মন্ত্র দেয়া।
দুর্বল বুকে আসবে সাহস নির্ভীক হবে তারা
চেতনার বীজ হবে তো রোপিত সব মানুষের মনে,
দুঃখীর মাথে ঝরবে নিত্য সুখের স্বর্ণধারা,
আসবে স্বর্গ—আসবে সেদিন ধরণীর অঙ্গনে।

বাদ্যযন্ত্রের কথা

দেবশর্মা পরিচিত

চীন দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল অধিবাসী 'মিয়াও' জাতির পুরুষদের বেশীর ভাগই এমনি বিচিত্র ছাঁদের বাঁশের বাঁশী বাজিয়ে লোক-সঙ্গীতের মুমধুর সুর সৃষ্টি করার ব্যাপারে রীতিমত সিদ্ধহস্ত। চৈনিক-ভাষায় এ-ধরণের বাঁশীর নাম দেওয়া হয়েছে — "লু-চি" (LU-TI) — পাখীর মুখনিঃসৃত কলকাকলীর মতোই অভিনব-অপরূপ এই বাঁশীর আওয়াজ। এ বাঁশী ছোট-বড় নানান আকারের হয়... সব চেয়ে বড় সাইজের বাঁশীগুলি প্রায় পাঁচ-ছুট লম্বা মাপেরও হয়। চৈনিক-ভাষায় এ-ধরণের বাঁশীর অপর নাম হলো — "লু-সেঙ্" (LU-SHENG)।

আর এই যে বিচিত্র ছাঁদের তার-যন্ত্র — এমনটি দেখতে পাওয়া যায় প্রাচ্য-ভূখণ্ডের কাম্বোদিয়া বা কাম্বোজ দেশে...'খ্যমার্' (KHMERS) জাতীয় অধিবাসীদের সমাজে — তাঁদের লোক-সঙ্গীতের আসরে আর নৌকা-ভাসান দেবার পর্ব্ব-উপলক্ষ্যে। 'খ্যমার্' জাতির লোকজনের ধারণা নৌকা-ভাসানোর সময় এ তার-যন্ত্রে সুর-সৃষ্টি না করলে, তরী জলে তলিয়ে যেতে পারে।

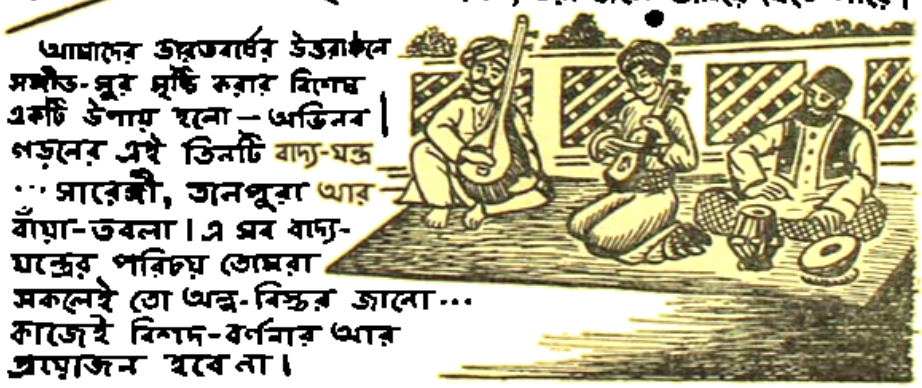

আমাদের ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে সঙ্গীত-সুর সৃষ্টি করার বিশেষ একটি উপায় হলো — অভিনব গড়নের এই তিনটি বাদ্য-যন্ত্র ... সারেঙ্গী, তানপুরা আর বাঁয়া-তবলা। এ সব বাদ্য-যন্ত্রের পরিচয় তোমরা সকলেই তো অল্প-বিস্তর জানো... কাজেই বিশদ-বর্ণনার আর প্রয়োজন হবে না।

নূতন মেয়র ও ডেপুটী মেয়র—

গত ২৪শে এপ্রিল সোমবার কলিকাতা কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ১০০ কাউন্সিলার, ৪জন অলডারম্যান ও ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান লইয়া ১০৬জনের সভায় ডাঃ প্রীতিকুমার রায়চৌধুরী নূতন মেয়র ও শ্রীমিহিরলাল গাঙ্গুলী নূতন ডেপুটী মেয়র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন। কয়জন নির্বাচিত কাউন্সিলর ভারত রক্ষা আইনে আটক থাকায় তাহার প্রতিবাদে বিরোধী দলের কয়েকজন কাউন্সিলার সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ডাঃ প্রতিকুমার টাকী শ্রীপুর গ্রামের লোক ও প্রসিদ্ধ উকীল স্বরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরীর পুত্র। তিনি চিকিৎসক, তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর—ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের পর তিনি দ্বিতীয় চিকিৎসক—মেয়র হইলেন। শ্রীগাঙ্গুলীও এম-এ, বিএল, তাঁহার বয়স ৬৯ বৎসর—উভয়েই পুরাতন কাউন্সিলার। ডাক্তার প্রীতিকুমারের ইচ্ছা—তিনি সর্ব-প্রথমে প্রাথমিক শিক্ষা সর্বস্তরে অবৈতনিক করিয়া দিবেন।

শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ—

২৪পরগণা জেলা সম্মিলনে ২৭ই এপ্রিল শনিবার পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—ধনী শিল্পপতিরা অন্যায় কাজ করায় সরকার তাহাদের বহু লোককে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার ও আটক করিয়াছিলেন। তাহার ফলে কোন কোন শিল্পপতি তাহাদের কারখানা পশ্চিমবঙ্গ হইতে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত করিতেছেন এবং নিজেরাও কলিকাতা ছাড়িয়া অন্য রাজ্যে যাইয়া বাস করিবার ব্যবস্থা করিতে-ছেন। দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ীরা পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করিলে পশ্চিমবঙ্গের কোন ক্ষতি হইবে না—বরং তাহা দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ লাভবান হইবে। তিনি শ্রীঅতুল্য ঘোষের কথার সহিত সুর মিলাইয়া বলেন—শিল্পপতিরা কংগ্রেসকে যতই অর্থসাহায্য দান করুন না কেন, কংগ্রেস তাহাদের দুর্নীতি কোনদিন সহ্য করিবে না—দুর্নীতিপরায়ণ শিল্পপতি-দের শাস্তিদানের ব্যবস্থা না করিলে কংগ্রেস নীতিভ্রষ্ট হইবে।

বারাকপুর গান্ধীঘাটে চৈত্র মেলা—

গত চৈত্রসংক্রান্তিতে বারাকপুরে গান্ধীঘাটে কলিকাতা সাহিত্যবাসরের উদ্যোগে চৈত্রমেলায় এক সাহিত্য সভায় সুকবি শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য তাঁহার স্বরচিত গান্ধীজীবন মহাকাব্য পাঠ করিয়াছিলেন। কালীপদবাবু তাঁহার আলামাবাদের বৃদ্ধ মহাকাব্য রচনা করিয়া পূর্বেই খ্যাতি-লাভ করিয়াছেন। ঐদিন সভায় বাসরের সভাপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সকলকে গান্ধীঘাট তীর্থে সাদর অভ্যর্থনা করেন ও গান্ধীজির প্রিয় গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করেন। তৎপরে সভার সভাপতি সুকবি শ্রীকৃষ্ণধন দে, প্রধান অতিথি বারাকপুরের শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমবায় কর্মী শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, আরিয়াদহের শ্রীসুবোধকুমার রায় প্রভৃতি গান্ধীজীবন মহাকাব্য লইয়া আলোচনা করেন। সভায় ষড়দহের শ্রীতারাপতি ভট্টাচার্য, সুলেখক শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, সোদপুরের অধ্যাপক শ্রীনিমাই রায়, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি বহু সুধী উপস্থিত ছিলেন।

দেশাত্মবোধক সাহিত্য সম্মিলন—

গত ২৪শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট মিউনিসিপাল মিউজিয়াম হলে দেশাত্মবোধক সাহিত্য-সভার উদ্যোগে এক জনসভায় আলামাবাদের বৃদ্ধ স্মরণ করিয়া এক দেশাত্মবোধক সাহিত্য সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। প্রবীণ কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব সভায় সভাপতিত্ব করেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন, প্রবীণ বিপ্লবী নেতা ও সাংবাদিক শ্রীনলিনীকিশোর গুহ সভীর বেদীতে মাল্যদান করেন, ডাঃ মতিলাল দাস অনুষ্ঠানের

উদ্বোধন করেন—সকলেই সময়োপযোগী ভাষণ দিয়া বর্তমান সময়ে নূতন করিয়া দেশাত্মবোধক কাব্য ও সাহিত্যের আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝাইয়া দেন। সভায় উদ্বোক্তা শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাপরত্ন প্রভৃতি অনেকে সভায় ভাষণদান করিয়াছিলেন। গীতিচারণ শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় সভায় প্রথমে ও শেষে কয়েকটি দেশাত্মবোধক সঙ্গীত গান করিয়া সকলকে আনন্দদান করেন। দেশাত্মবোধক কবিতা ও সঙ্গীত রচনার জন্য (১) প্রবীণ কবি ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত (২) সুকবি শ্রীকৃষ্ণধন দে ও (৩) গীতিচারণ শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়কে অভিনন্দন পত্র দান করিয়া সম্মানিত করা হয়। সভায় সুকবি শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য রচিত আলালাবাদের যুদ্ধ মহাকাব্যের একাংশ আবৃত্তি করা হইয়াছিল। সভায় বহু লোক সমাগম হইয়াছিল এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের সমাগমে সভা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

সাহিত্যতীর্থে নববর্ষ উৎসব—

সাহিত্যতীর্থ কলিকাতার একটি সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান—কবি শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক ৬৭ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটে ঐতিহাসিক মল্লিকবাড়ী নিজগৃহে তাহা পরিচালনা করেন। গত ১লা বৈশাখ তথায় তীর্থের একাদশ নববর্ষ উৎসব হইয়া গিয়াছে। উৎসব জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল অর্থাৎ ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, হরীতকৃষ্ণ দেব প্রভৃতির উপস্থিতিতে ও বহু বিদ্বজ্জন সমাগমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সকলেই উপযুক্ত ভাষণ দ্বারা তীর্থের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন ও কার্যের প্রশংসা করেন। নববর্ষের প্রথম দিন সন্ধ্যায় রমেন্দ্রনাথ সকলকে একত্র করিয়া মেলামেশার সুযোগদান করিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন

গত ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার দক্ষিণ কলিকাতার বেহালায় ২৪ পরগণা জেলা রাজনীতিক সম্মিলনের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও সভাপতিত্ব করেন কংগ্রেস-নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ। যে স্থানে সম্মিলন হইয়াছিল সে স্থানটি ২৪পরগণার নেতা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর নামে 'বিপিনবিহারী নগর' নাম দেওয়া হইয়াছিল। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুলকুমার মুখোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন, আসামের মন্ত্রী শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়া ও কেন্দ্রের উপমন্ত্রী শ্রীরামেশ্বর ঠাকুর প্রধান অতিথি রূপে সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। বহু বর্ষ পরে ২৪পরগণা জেলায় জেলা রাজনীতিক সম্মিলন হইল। সাতশত প্রতিনিধি সমবেত হইয়া জেলার বিবিধ উন্নতি ও কংগ্রেস সংগঠন দৃঢ়তর করার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

আমেরিকা ও ভারতরাষ্ট্র—

ভারতরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ আমেরিকা কর্তৃক উত্তর ভিয়েৎনামে গুলী বর্ষণের নিন্দা করায় মার্কিণ প্রেসিডেন্ট জনসন ভারতের প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন এবং সেজন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রীজীর শান্তীয় আমেরিকা ভ্রমণের ব্যবস্থা বাতিল করা হইয়াছে। আমেরিকা ভারতের বন্ধুরাষ্ট্র বলিয়া পরিচিত এবং নানা বিষয়ে ভারত আমেরিকা হইতে সাহায্য লাভ করিয়া থাকে। আমেরিকার গম না পাইলে ভারতের খাদ্যাভাব হয়, মার্কিণ সামরিক সাহায্য ভারতকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে, আমেরিকার অর্থ ও যন্ত্রপাতি পাইয়া ভারত তাহার শিল্পোন্নয়ন ব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতেছে—এইরূপ বহু সাহায্য আমেরিকা হইতে লাভ করিয়া থাকে। সেজন্য কি ভারত আমেরিকার সকল অন্যায় কার্য সমর্থন করিবে? আমেরিকা উত্তর ভিয়েৎনামে অন্যায়ভাবে গোলাবর্ষণ করিলে ভারত আমেরিকার সে কার্যের প্রতিবাদ করিয়াছে। তাহার ফলে ভারতকে যদি অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, ভারত তাহা করিতে সর্বদা প্রস্তুত আছে।

দিল্লীতে সমর প্রস্তুতি—

চীন ও পাকিস্তান কর্তৃক ভারতবর্ষ চারিদিক দিয়া আক্রান্ত হইয়াছে—সেজন্য দিল্লীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা যুদ্ধ চালাইবার জন্য নূতন মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করিয়াছেন—দিল্লীতে প্রত্যহ কয়েকবার করিয়া সেই কমিটির সভা ডাকিয়া অবস্থার আলোচনা ও আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা হইতেছে। গত

২৯শে ও ৩০শে এপ্রিল সেজন্য সারাদিন প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রীকে উদ্বিগ্ন হইয়া কাজ করিতে দেখা গিয়াছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচ্যবন কচ্ছ সীমান্তে যাইয়া সেখানে সৈন্য পরিচালন ব্যবস্থা দেখিয়া আসিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গেও খুলনা, নদীয়া ও ২৪পরগণা সীমান্ত যে কোন সময়ে পাকিস্তান কর্তৃক আক্রান্ত হইতে পারে। সেজন্য সীমান্তে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সমাবেশ করা হইয়াছে। এ সময়ে গুপ্তচর ও অন্যান্য শত্রুর হাত হইতে বাংলাকে কঠোরভাবে রক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

২৪পরগণা জেলা সম্মেলন—

গত ১৬ই ও ১৭ই এপ্রিল দক্ষিণ কলিকাতার বেহালায় 'বিপিন বিহারী নগরে' ২৪ পরগণা জেলা রাজনীতিক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। ১৭ই তারিখে সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতি কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলিয়াছেন—কলিকাতায় কংগ্রেস নেতাদের সহিত বিশিষ্ট শিল্পপতিদের মতভেদ হওয়ায় তাহা মিটাইবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী শ্রীনন্দ, শ্রীপাতিল ও শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। শিল্পপতিরা তাঁহাদের নিজেদের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কংগ্রেসকে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন—তাই বলিয়া অনাচারী শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসী সরকার কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন না—এ কথা মনে করা ভুল। কংগ্রেস আদর্শবাদী, আদর্শ রক্ষায় যে কেহ বাধা দান করিবে, শক্তিমত্ত নির্বিশেষে কংগ্রেস তাহার শাস্তিদানের ব্যবস্থা করিবে। এ বিষয় লইয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা যদি হস্তক্ষেপ করেন, তবে কংগ্রেস-কর্মীরা তাহা সহ্য করিবে না। শিল্পপতিদের মনে রাখা উচিত, তাঁহারা বিনা স্বার্থে কংগ্রেসকে অর্থ দান করেন না।

অমিয়নাথ চৌধুরী—

খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার অমিয়নাথ চৌধুরী গত ২৪শে এপ্রিল শনিবার সকালে তাঁহার কলিকাতা সার্ট স্ট্রীটস্থ বাড়ীতে ৮৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ৫০ বৎসরেরও অধিককাল কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র (১) ভরতনাথ চৌধুরী বর্তমানে ভারত রাষ্ট্রের শাসনবিভাগের সর্বাধিনায়ক ও (২) দিলীপ চৌধুরী সৈন্য বিভাগে ব্রিগেডিয়ার। তিনি স্যার আশুতোষ চৌধুরী, ব্যারিষ্টার যোগেশ চৌধুরী, সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ছেলেরা বিদেশে থাকায় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ব্যারিষ্টার শ্রীরণদেব চৌধুরী তাঁহার শেষকৃত্য সম্পাদন করেন। অমিয়নাথ দীর্ঘকাল কলিকাতার নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত ছিলেন এবং তাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলায় ব্যারিষ্টার ছিলেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগ স্মরণে

প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে পাঞ্জাবের অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালা বাগ নামক পার্কে তৎকালীন ইংরাজ সরকার বিনা অপরাধে শত শত ভারতীয়কে হত্যা করিয়াছিল—গত ১৩ই এপ্রিল ঐ দিন স্মরণ করিয়া তথায় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরামকিষণ সিং প্রমুখ প্রায় ১৫ হাজার লোক ঐ দিন তথায় সমবেত হইয়া স্মৃতিবেদীতে মাল্য দান করেন। ঐ পার্কে ৪৫ ফিট দীর্ঘ এক স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে। জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ড একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ঐ ঘটনার ফলে মহাত্মা গান্ধী নূতন আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং তাহার ফলে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। আজ ভারতবাসীকে ঐদিন স্মরণ করিয়া নূতন করিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিতে হইবে—সে আন্দোলন যেন ভারতবাসীকে স্বাধীনতা উপলব্ধি ও রক্ষার জন্য উপযুক্ত শক্তি ও বুদ্ধি দান করে। তবেই ঐ দিবসকে স্মরণ করা সার্থক হইবে।

অলৌকিক কাণ্ড—

বিকানীর জেলার লক্ষরণপুর তহশীলে জলাভাব ছিল—সেখানকার অধিবাসীদের জন্য ১২ মাস রেলযোগে জল সরবরাহ করা হয়। কয় মাস পূর্বে ৩০ ফিট মাটীর নীচে জলের সন্ধান পাওয়া যায়—কিন্তু সে জল লোনা ও পানীয় জল হইবার অযোগ্য। গত ২১শে এপ্রিল ৮৫০ ফিট নীচে মিঠা জল পাওয়া গিয়াছে। সে জল পাইয়া ঐ তহশীলের অধিবাসীদের আনন্দের সীমা নাই।

লোকসভায় অস্ত্রাঘাত ব্যবহার—

দিল্লীতে লোকসভায় বর্তমান অধিবেশনে অশিষ্ট ব্যবহারের জন্য ২ জন সদস্যকে অধ্যক্ষ সর্দার হুকুম সিং সাসপেণ্ড করিতে বাধ্য হন। সদস্য যদু লিমায়া এক পক্ষ

কাজের জন্য এবং সদস্য হেম বড়ুয়া এক সপ্তাহের জন্য সাসপেণ্ড হইয়াছেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাই লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তাহাদের অশিষ্ট ব্যবহার প্রকৃতই লজ্জার কথা।

২৪পরগণা ও নদীয়া সীমান্ত—

পাকিস্থানের প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ গত ২৭শে এপ্রিল ২৪পরগণা ও নদীয়া জেলার পাকিস্তান সীমান্ত পরিদর্শন করিয়াছেন। ভারতের পশ্চিমে কচ্ছ সীমান্তে পাকিস্তানী আক্রমণ চলিতেছে—উত্তরপূর্ব সীমান্তে জলপাইগুড়ি জেলারও আক্রমণ হইতেছে। পাকিস্তান এখন কলিকাতা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। নদীয়া ও ২৪পরগণার বিরাট পাকিস্তান সীমান্তে পাকিস্তানী সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সমাবেশ করা হইয়াছে। আয়ুব খাঁ নাকি হেলিকপ্টারে করিয়া ঐ সীমান্তের সমরসজ্জা দেখিয়া গিয়াছেন। ভারত আজ সকল দিক দিয়া আক্রমণের আশঙ্কা করিতেছে। প্রত্যেক ভারতবাসীকে সর্বদা একথা স্মরণ করিয়া দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। তবে সুখের কথা ভারতও সর্বত্র পাকিস্তানী ও চীনা আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।

আজকের দিনে

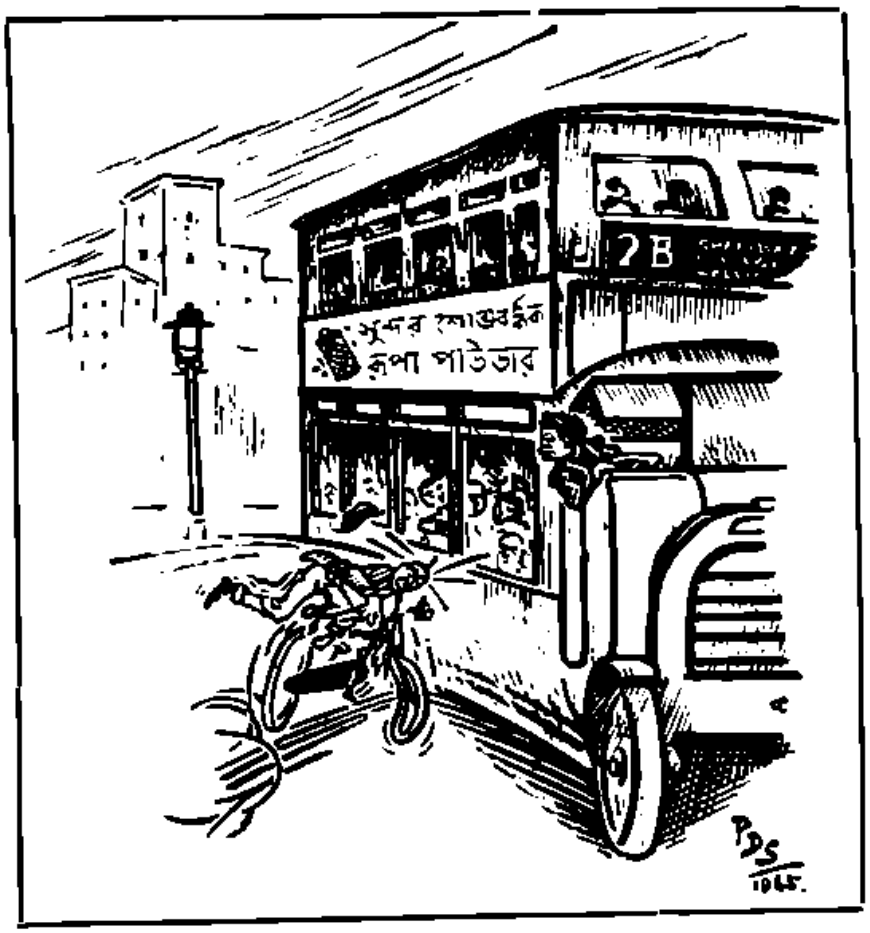

বাস-চালক : আচ্ছা বেকুব !···যে পথে সরকারী-বাস চলে, সে পথে সাইকেল চালাতে এসেছো !
-- ধাক্কা খেয়ে মরবেই তো !···

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্মা

পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দীপেন স্তম্ভিত। স্তম্ভিতই নয়, ভীত এবং বিমূঢ়ও। আরেকবার যে কড়া নাড়বে, তেমন দুঃসাহস নিজের প্রাণের কোন প্রান্ত থেকেই আর সংগ্রহ করে উঠতে পারে নি সে। সুতরাং নিঃস্বহারার মত কিছুক্ষণ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থেকে স্খলিত পায়ে তাকে ফিরে আসতে হয়েছিল।

পরের দিনও সোনারপুরের সেই বাড়িটায় হানা দিয়েছিল দীপেন। সেদিনও একই অভ্যর্থনা। ব্যর্থ দীপেন সেদিনও ফিরে এসেছিল।

তার পর অর্থাৎ তৃতীয় দিন সে প্রতিজ্ঞা করে গিয়েছিল যেমন করেই হোক সোনারপুরের সেই বন্ধ দুয়ারটা খুলবে। সে জন্য যে লাঞ্ছনা যে অপমানই আসুক, দীপেন পিছু হটবে না।

সোনারপুরের ঐ দুয়ারটা খুলতে পারলে বিচিত্র এক মানবীর রহস্যই শুধু আবিষ্কৃত হবে না; ওটা খোলা-না-খোলার সঙ্গে তার সমস্ত ভবিষ্যৎ একটা সূক্ষ্ম সুতোয় ঝুলছে।

যাই হোক, লাঞ্ছিত বা অপমানিত—কিছুই হতে হয় নি। নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তৃতীয় দিন সেই বাড়িটার অন্তঃপুরে ঢুকতে পেরেছিল দীপেন।

মনে পড়ে সেদিন শরীর এবং মনের সমস্ত শক্তি একত্র করে রুদ্ধশ্বাসে বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। দরজার কড়ায় হাতও রেখেছিল কিন্তু সে দুটো নেড়ে নিজের উপস্থিতি জানাবার প্রয়োজন হয় নি। তার আগেই অতি সতর্ক চাপা গলার ডাক কানে এসেছিল, 'শুনুন—'

এখানে কে তাকে ডাকতে পারে! চকিত দীপেন এদিক-সেদিক তাকাতেই দেখতে পেয়েছিল, যে-দরজাটার সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে সেটা ছাড়াও ডান দিকে একটু দূরে ঝোপঝাড় আর ছাইগাদার স্তূপের পাশে ভেতরে যাবার আরেকটি ছোট দরজা। প্রথম দরজাটা অর্থাৎ যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল, সেটাকে যদি সদর বলা যায়। অনতিদূরের দ্বিতীয় দুয়ারটা অবশ্যই খিড়কি।

বিস্মিত দীপেন লক্ষ্য করেছিল খিড়কির দরজাটার কাছে আট দশ বছরের একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই সে হাতছানি দিয়েছিল।

স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল দীপেন। তারপর কখন যে পায়ে পায়ে নিজের অজ্ঞাতসারে মেয়েটির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, মনে নেই।

মেয়েটি ফিস ফিস করে বলেছিল, 'ভেতরে আসুন।'

দীপেন যেন শুনতেই পায়নি। একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়েই থেকেছে। মেয়েটির মুখে অতি পরিচিত একটা চেহারার ছাপ বসানো। সেটা যে কার, তা আবিষ্কার

করতে ঘুসঘুসাস্ত পার করতে হয় নি। বিদ্যুৎ-চমকের মত নীলা চৌধুরীর মুখ মনে পড়ে গেছে তার।

নীলা চৌধুরীকে তখনও আগে নি দীপেন—এখনও দেখেছে কি! নীলাকে খুঁজে বার করবে বলেই তো এত দূরে বার শ মাইল পাড়ি দিয়ে আরব সাগরের তটে এই শহরে তার আসা। নীলাকে না দেখলেও তার ছবি দেখেছে দীপেন। বহুবারেই দেখিয়েছেন। মোট সাতখানা ছবি। সবগুলিই নীলার চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়সের। ছবির সেই তরুণীটির বয়স অলৌকিক কোন কিছুর প্রভাবে বছর পনের কমে গেলে যা দাঁড়ায় সামনের ছোট মেয়েটি যেন তা-ই।

মেয়েটি আবার বলেছিল, 'আসুন।'

দীপেন লক্ষ্য করেছে, তার সমস্ত ভঙ্গিটাই কেমন যেন সন্ত্রস্ত। চাহনি অতি সতর্ক এবং খর। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মাঝে মাঝেই চমকে চমকে উঠছিল মেয়েটি।

আরো একটা ব্যাপার দীপেনের নজরে পড়েছে। তার উদ্দেশে মাত্র পাঁচটি কি ছ'টি শব্দ উচ্চারণ করেছে মেয়েটি কিন্তু প্রতিবারই গলাটা অতিরিক্ত চাপা। স্বরটাকে একবারও ফিসফিসানির চাইতে উঁচুতে তোলেনি সে। এটা যে ইচ্ছাকৃত সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নেই।

দীপেন বুঝতে পারছিল, গোপনে খুব সম্ভব কারোকে লুকিয়ে তাকে বাড়ির ভেতর ডাকা হচ্ছে। গোপনতা না থাকলে সদর দেউড়িই তো খুলে যেত। খিড়কির পথে এমন চুপিসাড়ে যেতে হত না।

মেয়েটি এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। আগের মতই ফিসফিসিয়ে বলেছে, 'তাড়াতাড়ি আসুন। মা কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।'

দীপেন অবাক হয়ে গিয়েছিল, 'মা!'

'হ্যাঁ, আমার মা।' মেয়েটা বাড়ির ভেতর দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলেছিল, 'ঐখানে, বাগানের ওধারে দাঁড়িয়ে আছে।'

কী করবে, প্রথমটা স্থির করে উঠতে পারেনি দীপেন। এ-ভাবে, এমন লুকোচুরির মধ্যে অজ্ঞাত-পরিচয় কোন লোকের বাড়িতে ঢোকা শোভন কি অশোভন,—এই ভাবনাটা তাকে বিচলিত করে ফেলেছিল। ভেতরে যাবে কি যাবে না—এই দুয়ের মাঝখানে তার সমস্ত অস্তিত্ব দোল খেতে শুরু করেছিল।

কয়েকটা মাত্র মুহূর্ত। তারপরেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিল দীপেন। এই বাড়িটার অন্তঃপুরে যাবার জন্য তিনদিন ধরে ক্রমাগত এখানে হানা দিচ্ছে সে। আজ নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে যদি তার ডাক পড়েছে, শোভনতা অশোভনতার প্রশ্ন তুলে ভেতরে যাবার পথটাকে কণ্টকিত করে তোলা কেন? যে কোন উপায়ে বাড়ির ভেতরে যাওয়াই আসল। আর সব গৌণ। নিজের সত্তার অতল থেকে সেই মুহূর্তে বাবার মুখ ভেসে উঠেছিল যেন। নিঃশব্দ ভ্রূকুটিতে দীপেনের দিকে তাকিয়ে তিনি নির্দেশ দিচ্ছিলেন, 'ভেতরে যা। সুযোগ যখন হাতের কাছে এসেছে তখন ছাড়িস না।'

শুধু কি সুযোগটাকেই হাতের মুঠোয় পোরা? এই বাড়িটা সম্বন্ধে বিস্ময়, উত্তেজনা আর অসীম কৌতূহল—সব মিলিয়ে অদৃশ্য একটা স্রোত পেছন দিক থেকে অস্থির-ভাবে ধাক্কা দিতে শুরু করেছিল যেন! সেটাও ভেতরে যাবারই নির্দেশ দিচ্ছিল।

ভেতরে গিয়ে কী দেখবে সে? কোন অভ্যর্থনা তার জন্য অপেক্ষা করছে? যা-ই থাক, তা নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করেনি দীপেন। যে স্রোতটা পেছন থেকে অবিরত ঠেলছিল এক সময় তার কাছেই নিজেকে সঁপে দিয়েছিল সে। বিচিত্র ঘোরের মধ্যে মেয়েটির উদ্দেশে বলেছিল, 'কোথায় যেতে হবে, চল।'

'আসুন।'

মেয়েটির পিছু পিছু খিড়কি দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল দীপেন। তারপর তাকে অনুসরণ করে মন্ত্রাচ্ছন্নের মত এগিয়ে গিয়েছিল। ছোট্ট মেয়েটা যেন অমোঘ নিয়তি; তার পেছনে অন্ধের মত হেঁটে যাওয়া ছাড়া আর যেন কোন পথ নেই!

দীপেনরা যেখান দিয়ে যাচ্ছিল, সহজেই অনুমান করা যায় সেটা বাড়ির পেছন দিক। বাড়িটার ভেতরে যে এতখানি জায়গা রয়েছে, বাইরে থেকে ভাবাই যায়নি। জায়গাটা জঙ্গলময়। আম-জাম-লিচু-কাঁঠাল—ইতস্তত কিছু ফলের গাছ চোখে পড়েছিল দীপেনের। তবে প্রয়োজনের চাইতে অপ্রয়োজনের কিছুই বেশি। ঝোপ-

ঝাড় আর আগাছায় চারদিক ছেয়ে আছে। সব চাইতে বেশি করে যা চোখে পড়েছিল তা হল বনতুলসী আর চীনাঘাসের উদ্ভিদতা।

অনুমান করা গেছে, এককালে বাগানটার পেছনে সুদূর পরিকল্পনা ছিল। তারপর অনাদরে আর অবহেলায় এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। অযত্ন-বর্ধিত বাগানটা এখন পুরোপুরি জঙ্গলের দখলে।

একপাশে মাঝারি একটা পুকুরও দেখতে পেয়েছিল দীপেন। পুকুরটা টোপা পানা আর কাঁকিতে বাসরুদ্ধ। জল তার নীলাভ। এমন জলই বোধহয় মশাদের সূতিকাগার। কথাটা যে মিথ্যে নয় তা প্রমাণ করার জন্যই সম্ভবত কোটি কোটি রোগবাহী মৃত্যুদূত সারা পুকুর জুড়ে ভনভনিয়ে উড়ছিল।

সময়টা ছিল দুপুর। জায়গাটা গাছপালার ঘন ছায়ায় এমন আচ্ছন্ন যে রোদের তাপ অনুভব করতে পারেনি দীপেন। মেয়েটির পিছু পিছু চলতে চলতে শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছিল তার।

গাছের মাথা থেকে পাখিদের চিৎকার ভেসে আসছিল। সেখানে লড়াই চলছিল। জায়গার দখল নিয়ে কি নারী-ঘটিত ব্যাপারে অথবা অন্য কোন কারণে পাখিদের রাজ্যে এই যুদ্ধঘোষণা, ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। তবে এটুকু টের পাওয়া যাচ্ছিল, খুব তাড়াতাড়ি শান্তি হবার আশা নেই। সেই দুপুরেও বনতুলসীর জঙ্গলে ঝিঁঝি আর ব্যাঙেদের কনসার্ট চলছিল।

যাই হোক মেয়েটার পিছু পিছু চলতে চলতে গাছ-পালা, পুকুর, বাগানের শীতল ছায়া বা পাখিদের অবিশ্রান্ত চেঁচামেচি—কিছুই দীপেনের চেতনায় রেখাপাত করতে পারছিল না। কখন চলার শেষ হবে, কখন মেয়েটির মায়ের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াবে—সে জন্য তার সমস্ত সত্তা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। বিচিত্র এক উত্তেজনায়, না কি উৎকণ্ঠায় তার শ্বাস আটকে আটকে আসছিল।

অবশেষে চলার শেষ হয়েছিল। পুকুরটার দক্ষিণ প্রান্তে বহুকালের পুরনো স্নান-বাঁধানো ঘাট যেখানে ভেঙে-চুরে রয়েছে সেখানে এসে মেয়েটি থেমে গিয়েছিল। অতএব দীপেনকেও থামতে হয়েছে।

ঘাটটা ছায়াচ্ছন্ন। কেননা, কাছের একটা আমরুল গাছ তার ওপর ছাতা ধরে আছে।

ঘাটের ছায়ায় একটি মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন। মহিলা মধ্যবয়সিনী; রুপসী। পরনে মিলের লালপাড় শাড়ি। হাতে একগাছি করে লোহা ছাড়া সারা শরীরে ধাতুর চিহ্নমাত্র নেই। সিঁথির সীমান্ত পর্যন্ত ঘোমটা টানা।

সব চাইতে আশ্চর্য মহিলার মুখখানি। পৃথিবীর সমস্ত বিষাদ আর হতাশা সেখানে পুঞ্জীভূত। দেখা মাত্রই সংশয় হয়েছিল, ঐ মুখটিতে কোনদিন হাসি ফুটেছে কি-না!

হাসিবর্জিত বিষণ্ণ করুণ মুখ। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দীপেনের মনে হয়েছিল, হুবহু সেই চেহারা। নীলা চৌধুরীর ফোটোতে যে প্রাণোচ্ছলা তরুণীটিকে দেখা গেছে তার মধ্য থেকে সমস্ত সজীবতা মুছে কুড়ি বছর বয়স বাড়িয়ে দিলে যা দাঁড়ায় মহিলাটি তা-ই।

তখনও কেউ দীপেনকে মহিলাটির পরিচয় জানায়নি। তবু অনায়াসেই সে বুঝতে পেরেছিল, তিনি নীলা চৌধুরীর মা।

ভাঙা ঘাটটার ঠিক ওপরেই এককালে বসবার জন্য বাঁধানো একটা বেদী ছিল। সেটা এখন আর অটুট নেই। তবু বসার পক্ষে একেবারে অযোগ্য নয়।

মহিলা বেদীটা দেখিয়ে বলেছিল, 'বসুন।'

নির্দেশমত দীপেন বসেছিল।

মহিলা কাছে আসেন নি। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখান থেকেই একদৃষ্টে নিষ্পলকে দীপেনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর চোখদুটি দূরগামী। দীপেনের বুকের অতল পর্যন্ত তিনি যেন দেখতে পাচ্ছিলেন। কী জন্য বার বার সোনারপুরের এই বাড়িটিতে দীপেন হানা দিচ্ছে তা যেন তাঁর কাছে আর গোপন নেই।

মহিলার স্থির অপলক দৃষ্টির সামনে খুবই অস্বস্তি বোধ করছিল দীপেন।

কতক্ষণ মহিলা তাকিয়ে ছিলেন, মনে নেই। একসময় নিদারুণ, অস্বস্তির অবসান হয়েছিল। হঠাৎ মহিলাটি বলে উঠেছিলেন, 'কী চান আপনি?' স্বরটা তীব্র বা তীক্ষ্ণ নয়। তবে স্পষ্ট।

দীপেন হকচকিয়ে গিয়েছিল, 'আজ্ঞে—'

মহিলা আবার বলেছিলেন, 'তিন দিন ধরে দেখছি, আপনি আসছেন। কিন্তু কেন?'

সবিস্ময়ে দীপেন বলেছিল, 'আপনি আমাকে দেখেছেন!'

'না দেখলে তিন দিন যে আসছেন বলবার কী করে?'

'দেখেও দরজা খোলেন নি তো।'

দীপেনের সুরে ঈষৎ অভিযোগ বা ক্ষোভ ছিল। মহিলা তা গ্রাহ্যই করেন নি। বলেছিলেন, 'দরজা খোলার উপায় ছিল না; তাই খুলিনি।'

দীপেন লক্ষ্য করেছিল, মহিলা আশ্চর্য সাবলীলা। প্রথম আলাপের কোন আড়ষ্টতাই তাঁর মধ্যে নেই। মহিলার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চকিতে আরেকটা কথা মনে পড়ে গিয়েছিল দীপেনের। ব্যস্তভাবে দীপেন বলে উঠেছিল, 'উনি কে?'

মহিলা প্রশ্ন করেছিলেন, 'কার কথা বলছেন?'

'আপনাদের সদরে কড়া নাড়লে যিনি বলেন দরজা খোলা হবে না।'

'উনি আমার স্বামী।'

একটুক্ষণ কি ভেবে দীপেন বলেছিল, 'আপনাদের বাড়ির ভেতর যাই, আপনার স্বামী বোধ হয় তা অপছন্দ করেন। তাই না?'

মহিলা মাথা নেড়েছিলেন, 'হ্যাঁ। শুধু আপনি কেন, এ বাড়িতে কেউ আসুক উনি তা চান না।'

'কেন?'

'তাতে আমাদের পারিবারিক শান্তির ব্যাঘাত হতে পারে বলে উনি মনে করেন।'

দীপেন হতবাক। রীতিমত বিস্ময়ের সুরেই সে বলেছিল 'আশ্চর্যের কথা।' একটু থেমে আবার শুরু করেছিল, 'সেই জন্যেই বুঝি খিড়কি দিয়ে আমাকে এখানে ডেকে এনেছেন?'

মহিলা বলেছিলেন, 'সে কথা থাক। এখন বলুন কেন বার বার আপনি আসছেন।'

কী বলবে দীপেন ভেবে পায়নি। যে উদ্দেশ্যে বার বার তার এখানে আসা—সরাসরি সেটা বলতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ফল তাতে প্রত্যাশার চাইতে অনেক বেশি স্বপক্ষে আসতে পারে। নতুবা এমন বিপরীত হয়ে দাঁড়াবে যাতে সমস্ত উদ্যমই যাবে ব্যর্থ হয়ে। ও-রকম একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে হাতের সব তাস মেলে ধরতে তার মন সায় দেয় নি। কাজেই একটুক্ষণ থতিয়ে থেকে সে শুধু বলতে পেরেছিল, 'আজ্ঞে মানে—'

মহিলার মুখচোখ এবার সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল। গলার স্বরে ঈষৎ তীক্ষ্ণতা মিশিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'কী আশ্চর্য! কী জন্যে এসেছেন সেটাই ভুলে গেছেন নাকি?'

দীপেন হকচকিয়ে গেছে প্রথমটা। তারপরেই ব্যস্তভাবে দ্রুত বলে উঠেছে 'না-না, ভুলব কেন?'

'তা হলে তাড়াতাড়ি সেটা বলে ফেলুন। রাস্তাঘাটে ফেলে অনেকক্ষণ এখানে এসেছি। আর তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।'

একমুহূর্ত ইতস্তত: করেছে দীপেন। তারপরেই সোনারপুরের এই বাড়িটার হানা দেবার ব্যাপারে চমৎকার একখানা অজুহাত তার মাথায় খেলে গিয়েছিল আস্তে আস্তে খুব সতর্ক ভঙ্গিতে সে বলতে শুরু করেছিল। 'দেখুন, এ-পাড়ায় আমরা জমি কিনেছি। শিগ্‌গিরই বাড়ি করব। নিজে কাছে দাঁড়িয়ে বাড়িটা করাতে চাই।'

'সে তো খুব ভাল কথা।'

'কিন্তু—'

'কী?'

দীপেন বলেছিল, আমরা থাকি হাওড়া লাইনে উত্তরপাড়ার কাছে। সেখান থেকে রোজ এসে বাড়ির তদারক করা তো সম্ভব নয়। যাতায়াতে বেশ সময় নষ্ট হয়। তা ছাড়া গাড়িতে আজকাল যা ভিড় তাতে অনেকগুলো দা ছেড়ে দিলে ওঠা যায় না। ট্রামে-বাসে যাদের চলতে হয়, তারা জোর করে কেউ বলতে পারে না ঠিক সময়ে অমুক জায়গায় পৌঁছব। উত্তরপাড়া থেকে ভোর বেলা বেরিয়ে হয়তো দুপুরবেলা সোনারপুর এলাম। এসে দেখব মিস্তিরিরা হাত গুটিয়ে বসে আছে। তাতে কত ক্ষতি আপনিই বলুন। কাজে ফাঁকি দেবে, অথচ মজুরিটা আমাদের গুণে যেতে হবে।'

'তা তো বুঝলাম। মহিলা বলেছেন 'কিন্তু এ-সব কথা

আমাকে শুনিয়ে কী লাভ? এ ব্যাপারে আমরা কী করতে পারি?'

উঠু বেঞ্চীটা থেকে উঠে সামনে এগিয়ে এসেছিল দীপেন। মুখখানা কাতুমাতু করে বলেছিল 'আমাকে সাহায্য করতে পারেন।'

মহিলা বিমূঢ়। সংশিত স্বরে বলেছেন 'আমরা সাহায্য করতে পারি!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কি ভাবে?'

'আগে বলুন 'না' বলবেন না।' আদুরে জেদী ছেলের মত দীপেন বলেছে—'অবশ্য 'না' বললেও আমি শুনব না।' জোরে জোরে মাথা নেড়েছে সে। যেন মহিলার সঙ্গে তার বহুকালের পরিচয়, আর তাঁর স্নেহে চিরদিনের জন্মসঙ্গত দাবী।

মহিলা বলেছিলেন, আপনার কথা না শুনে আগে থেকে 'হ্যাঁ' বলি কী করে? তা ছাড়া—'

'কী?'

'আপনি আমার কাছে যা আশা করছেন তা যদি আমাদের পক্ষে সাধ্যাতীত হয়?'

'না-না তা হবে না আমি বলছি আপনি শুনুন।'

'বেশ, বলুন—'

'আমি শুনেছি, আপনাদের বাড়িতে দু-খানা খালি ঘর নাকি আছে?'

'খালি ঘর! আমাদের বাড়িতে!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কার কাছে এ-খবর পেয়েছেন?'

এতটুকু দ্বিধা নেই। স্বর বিন্দুমাত্র কাঁপে নি। চোখ কান বুজে নির্ভেজাল মিথ্যে বলে গেছে দীপেন, 'এ পাড়ারই এক ভদ্রলোকের কাছে।' এমনভাবে কথাগুলো সে বলেছে যাতে মনে হয় কোন দেবশিশুর মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। সেই দেবশিশু, যে কোনরকম চাতুরি বা কপটতা জানে না।

মহিলা বলেছেন, 'যে ভদ্রলোকের কাছে খবরটা পেয়েছেন খুব সম্ভব তিনি না জেনেই আন্দাজে বলে দিয়েছেন। এ বাড়ীতে কোন খালি ঘর নেই।'

অন্ধকারে তীর ছুঁড়েছিল দীপেন। সেটা লক্ষ্যভেদ করতে পারে নি। হতাশ স্বরে সে বলেছে, 'খালি ঘর তাহলে নেই?'

'না।' মহিলা মাথা নেড়েছেন।

'থাকলে বড় ভাল হত। ভাড়া করার মতন ঘর কোথাও পাচ্ছি না।'

একটু চুপচাপ। তারপর মহিলা বলে উঠেছেন, 'আমাকে এবার বাড়ি ফিরতে হবে বাবা। চলুন, আপনাকে খিড়কি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।' বলেই সামনের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

নিঃশব্দে দীপেন তাঁকে অনুসরণ করেছিল। মহিলার পিছু পিছু যেতে যেতে সে ভেবেছে, এ বাড়িতে আসার মোটামুটি একটা অজুহাত খাড়া করেছিল। ঘর ভাড়া পাওয়া গেলে সুবিধেই হত। আবার এখানে আসতে হলে কোন কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে—সেই মুহূর্তে সে বুঝে উঠতে পারছিল না। তা ছাড়া কোন কৌশল নিয়ে এলেও যে সেটা কাজে লাগবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। অথচ এ বাড়িতে ঢুকতে না পারলে নীলা চৌধুরীর কোন খবরই পাওয়া যাবে না। বিচিত্র এক ব্যর্থতা দীপেনকে একটু একটু করে বেষ্টন করতে শুরু করেছিল। নাঃ, নীলা চৌধুরী সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য ঘরের ভেতর পুরে রেখে এ বাড়িটা চিরদিনই দরজা বন্ধ করে রাখবে। হাজার মাথাকুটেও রুদ্ধ দুয়ার সে খুলতে পারবে না।

যাই হোক, খিড়কি পর্যন্ত এসে মহিলা দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। আর দীপেন বাইরের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এবার বিদায় নেবার পালা। দুই হাত জোড় করে দীপেন বলেছিল' 'তা হলে আসি। আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়ে গেলাম।'

মহিলার হাত দুটিও যুক্ত হয়ে বুকের কাছে উঠে এসেছিল। আস্তে আস্তে তিনি বলেছিলেন,'না, কষ্ট আর কি।'

এলোমেলো বিথিল পদক্ষেপে সরু গলিটা ধরে দীপেন খানিকটা এগিয়েছে, হঠাৎ সেই মহিলাটি ডেকে উঠেছিলেন, 'শুনুন—'

চকিত দীপেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ফিরে দাঁড়িয়েছিল। খিড়কির ছোট দরজা পার হয়ে মহিলা বাইরের ছাইগাদায় বেরিয়ে এসেছেন।

পায়ে পায়ে দীপেন ফিরে গিয়েছিল। বলেছিল, 'আমাকে কিছু বলবেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কী ?'

একটু আগে দীপেন লক্ষ্য করেছে, মহিলার মুখ পৃথিবীর সবটুকু বিষণ্ণতা দিয়ে ঘেরা। ঐ মুখে কোনদিন হাসি ফুটেছে কি-না, সে সম্বন্ধে সন্দিহান হবার যথেষ্ট কারণ আছে। শুধু কি হাসি, বিষাদ ছাড়া সেখানে আর কিছুই ফোটে নি।

আশ্চর্য, সেই বিমর্ষ মহিলাটির মধ্যে এবার সীমাহীন চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। চোখের তারা দুটো অস্থির হয়ে উঠেছিল। ব্যগ্র মুষ্টিতে দীপেনের একখানা হাত ধরে কাঁপা উৎসুক স্বরে তিনি বলেছিলেন, 'আমার একটা উপকার করবেন বাবা ?'

ব্যাপারটা প্রায় নাটকীয়ই। বিস্মিত দীপেন স্খলিত স্বরে বলেছিল, 'উপকার !'

'হ্যাঁ বাবা !'

'কী করতে হবে ?'

'আজকে না, কাল বলব। দয়া করে কাল একবার আসবেন ?'

বিচিত্র এক আকর্ষণ বোধ করছিল দীপেন। নিজের অজ্ঞাতসারে তার সম্মোহিত চেতনার মধ্য থেকে অতর্কিতে জবাবটা উঠে এসেছিল, 'আসব।' একটু থেমে আবার বলেছিল, 'কখন আসতে হবে ?'

মহিলা বলেছিলেন, 'ঠিক এই সময় আসবেন। সদরে না, এই খিড়কিতেই আসবেন। আপনার জন্যে আমি অপেক্ষা করব।'

'বেশ।'

'আমি কিন্তু আপনার আশায় থাকব।'

'কথা যখন দিয়েছি নিশ্চয়ই আসব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

[ক্রমশঃ

আত্মানুসন্ধান.

শ্রীঅরুণেন্দু নন্দী

নীরব গম্ভীর হও হিমাদ্রির মত,
বিষাদের কালো মেঘে মনের আকাশ
কোরোনা আঁধার। বয়ে দুরন্ত বাতাস
এখনি হবে যে দেখা অশান্তিতে রত।
অচল অটল হও ; মান-অপমান
স্তুতি-নিন্দা, স্বর্গ আর অনন্ত গৌরব,
পুতিগন্ধ শব আর পুষ্পের সৌরভ
হয়ে যাক তব কাছে সকলি সমান।
তোমারে পাবে গো তুমি স্থিরতার মাঝে
নতুবা তুমিতো শুধু বাতাহত নীর,
পঙ্কিল আবর্তে যার অদৃষ্ট বিরাজে
নিম্নমুখী স্রোত হ'য়ে উন্মত্ত অধীর।

তোমার মাঝারে হিমগিরি-পারাবার
লভুক মিলিত রূপে গৌরব অপার।

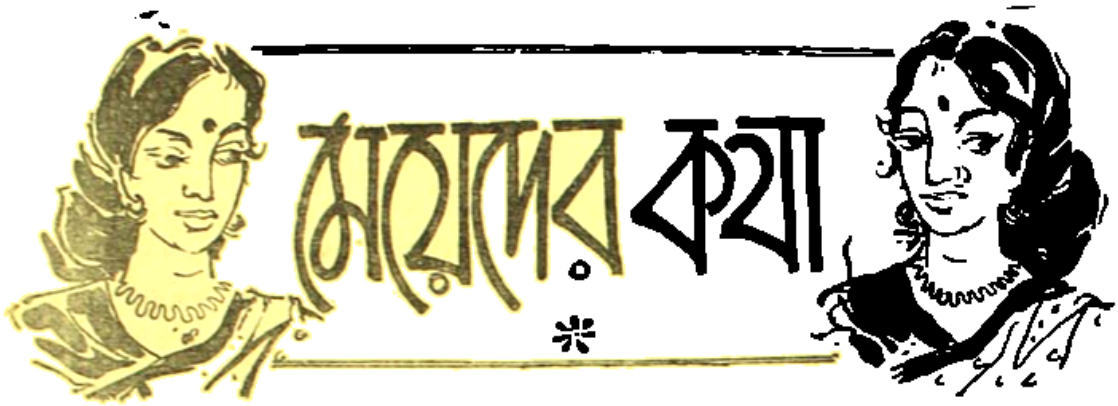

রবীন্দ্রনাথের চোখে বিলেতের মেয়ে

স্বর্ণলতা ঠাকুর

কুসংস্কার-আচ্ছন্ন পরাধীন ভারতে স্ত্রী স্বাধীনতার কোন চিহ্নই ছিল না। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সতীদাহ প্রথার নামে ভারতের পণ্ডিত আর নীতিবাগীশেরা উদ্বেল হয়ে উঠতেন। স্ত্রীশিক্ষার বিন্দুমাত্র উদ্যোগে তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'খাতা' নামক ছোট গল্পে সেই ক্ষিপ্ততার প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেছেন। স্ত্রীশিক্ষা-বিরোধী নীতিবাগীশ প্যারীমোহনের মতবাদকে তিনি রূপ দিয়েছেন বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ ভাষায়—

"সে বলিত, স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তি দুইটি শক্তির সম্মিলনে পরিবার দাম্পত্য শক্তির উদ্ভব হয়; কিন্তু লেখাপড়া শিক্ষার দ্বারা যদি স্ত্রীশক্তি পরাভূত হইয়া একান্ত পুংশক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, তবে পুংশক্তির সহিত পুংশক্তির প্রতিঘাতে এমন একটি প্রলয় শক্তির উৎপত্তি হয়, যদ্দ্বারা দাম্পত্য শক্তি বিনাশ শক্তির মধ্যে বিলীন হয়া লাভ করে, সুতরাং রমণী বিধবা হয়। এ পর্যন্ত এ তত্ত্বের কেহ প্রতিবাদ করিতে পারে নাই।"

রবীন্দ্রনাথ সহজ দুঃখে 'খাতার' মত ছোট গল্প লেখেন নি। স্বদেশে নারীর শিক্ষার অভাব, স্বাধীনতার অভাব যে তাঁকে পীড়িত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তাই বিলাতে গিয়ে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট হয়েছেন তিনি স্ত্রী জাতির স্বাধীনতায়—জীবন যাত্রায়, ভাবের দেশে, ভাবের স্তরে। তাঁর 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' তাই লণ্ডনের মেয়েদের বর্ণনায় ভরপুর। তাদের মধ্যে ভালোমন্দ যা দেখতে পেয়েছেন সবই তিনি লিখেছেন। তাঁর দ্বিতীয় পত্রে আছে :—

"এদের মেয়েতে মেয়েতে যে-সব গল্প চলে তা শুনলে তোমার ভারি মজা মনে হবে, একটি কুশ্রী বালিকার সঙ্গে একটি ধনী ব্যারিষ্টারের বিয়ে হওয়াতে তাই নিয়ে একটি সভায় যে সমালোচনাটা চলছিল, তা শুনে আমার চক্ষু স্থির হোয়ে গিয়েছিল। কুশ্রী মেয়ের বিয়ে হোয়ে গেলে এ দেশের মেয়েদের প্রাণে বোধ হয় বড় আঘাত লাগে। মাতৃশ্রেণীর মধ্যে ভারি চোখ টেপাটেপি পোড়ে যায়, তাঁরা মনের যন্ত্রণায় আর কিছু কোরতে না পেয়ে আড়ালে আবডালে সে বেচারীর প্রতি যথাসাধ্য বিদ্রূপের বাণ বর্ষণ কোরতে থাকেন। মাতৃদলের মধ্যে যাদের কুশ্রী মেয়ে আছে, তাঁরা মনে করেন অমুক মেয়েটার যদি অমন ভাল বিয়ে হোয়ে গেল তবে আমার মেয়েরা কি অপরাধ কোরলে? যাদের কুশ্রী মেয়ে আছে তাঁরা মনে করেন, অমুক মেয়েটার বিয়ে হোয়ে গেল আর আমার মেয়েদের হোল না? আর সাধারণ মিড্ শ্রেণীদের তো রাগে, ঘৃণায়, অভিমানে বুক ফেটে যায়। যে বেচারীর দৌভাগ্যক্রমে বিয়ে হয়ে গেছে তার যেন কত অপরাধ। যাঁরা কুশ্রী মেয়ের রূপ নিয়ে সমালোচনা কচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে একটি মেয়েও কুশ্রী ছিলেন না, পরের কুরূপ নিয়ে বিদ্রূপ করার অধিকার তাঁদের একতিলও নেই। কাপড় চোপড়, গয়না পত্র, কার চোখ টেরা, কার নাক মোটা, কার ঠোঁট পুরু,

কার বা হাতের কোড়ে আঙুলের নখের কোণ বাঁকা—এই সব নিয়ে এখানকার মেয়েতে মেয়েতে ভারি হাসি তামাসা চ'লে থাকে ; আমার যতখানি অভিজ্ঞতা (যদিও খুব কম) তাতে তো আমি এই রকম দেখেছি। এ দেশের মেয়েরা পিয়ানো বাজায়, গান গায়, আগুনের ধারে আগুন পোয়ায়, সোফায় ঠেসান দিয়ে নভেল পড়ে, ভিজিটারদের সঙ্গে আলাপচারি করে ও আবশ্যক ও অনাবশ্যক মত যুবকদের সঙ্গে flirt করে। এই তো আমার অভিজ্ঞতা।

কিন্তু এদেশের old maid শ্রেণীরা ভয়ঙ্কর কাজের লোক। Temperance meeting, working men's society প্রভৃতি যতপ্রকার অনুষ্ঠানের কোলাহল আছে, সমুদয়ের মূলে তাঁরা আছেন। পুরুষদের মত তাঁদের আপিস যেতে হয় না, মেয়েদের মত তাঁদের ছেলে-পিলে মানুষ করতে হয় না, এদিকে হয়ত এত বয়স হয়েছে যে 'বলে' গিয়ে নাচলে বা flirt করে সময় কাটালে দশজন হাসবে। হাতে তাঁদের সময় অগাধ প'ড়ে রোয়েছে, সে জন্যে তাঁরা অনেক কাজ কোরতে পারেন, বাস্তবিক তাতে অনেক উপকার হয়। বিদেশ থেকে আমরা এই মেয়েদেরই নাম বেশী শুনতে পাই—কিন্তু এদের থেকেই যদি বিলিতি মেয়েদের বিচার কোরতে যাও, তবে হয়ত ভ্রমে পোড়বে। এখানকার বিবিরা দরজি শ্রেণীর জীবিকা, ফ্যাসান রাজ্যের বিধাতা ও যুবকদলের খেলানা স্বরূপ, খেলানা আমি এই অর্থে বলচি,—যে, যখনি কারো সন্ধ্যের সময় একটু সময় কাটাবার আবশ্যক হোল, দুই একটি বিবির সঙ্গে হয়ত তিনি sentimental অভিনয় কোরে এলেন। পুরুষদের মনভোলানই মেয়েদের জীবনের একমাত্র ব্রত, যদি একজন পুরুষের মন ভোলাতে পারেন তবে মনে কোরলেন জীবনের একটা মহান্ লক্ষ্য সিদ্ধ হ'ল, মনভোলানো-যজ্ঞে তাঁদের নিজের সুখ স্বাস্থ্য বলিদান দিতে তাঁরা কুণ্ঠিত নন, কোমর এঁটে এঁটে তাঁরা বোলতার মত কোমর করে তুলবেন—তার জন্যে তাঁরা সকল প্রকার যন্ত্রণা সহ্য কোরতে ও সকল প্রকার রোগ সঞ্চয় কোরতেও রাজি আছেন। বাহারে কাপড় পোরে, মাথায় গোটাকতক পালক গুঁজে দিনরাত্রি তাঁরা পুতুলটি সেজে আছেন। অভিনয় কোরে কোরে এমন তাঁদের অভ্যেস হয়ে গেছে যে অস্বাভাবিকও তাঁদের স্বাভাবিক হয়ে গেছে। যে মেয়ের সাজসজ্জা সৌন্দর্য বাইরে থেকে খুব স্বাভাবিক ও অযত্নসাধ্য বোলে মনে হয়, যাদের কথাবার্তার মাধুরীতে আয়াসের লক্ষণ দেখা যায় না, মনে হয় affectation আদৌ জানে না, তারাই হয়ত পাকা affectation জানে। এমন হোতে পারে যে, একজন মেয়ে হয়ত পুরুষের প্রেমে পড়েছে। সেই পুরুষের হৃদয় অধিকার করাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু তাই বোলেই যে তিনি নিশ্চিন্ত হোয়ে বসে থাকেন তা প্রায় দেখা যায় না,—যেমন অনেক শিকারী খাবার জন্যে পাখী মারতে যায় না, তাদের বন্দুকের লক্ষ্য সিদ্ধি হোল বলে আরাম পায়, হৃদয় অধিকার কোরতে এঁরাও সেই আরাম পান। আমি তো মন ভোলাবার জন্য এরকম হাব ভাব, হাত পা নাড়া, গলা সেধে সরু করা, মিষ্ট ভাবের হাসি বের করা চক্ষে দেখতে পারি নে। হাবভাবে আমার মন বোধ হয় কেউ ভোলাতে পারে না। পুরুষদের মনভোলানো যাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য সেই মেয়েদের দেখলে আমার বড় মায়া হয়—যেন তাদের নিজেদের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। আমাদের দেশের মেয়েদের চেয়ে এদেশের মেয়েদের কি বেশী উন্নতি দেখছি জান ? না, এঁরা সাজগোজের শাস্ত্রে আমাদের চেয়ে বেশী ব্যুৎপত্তি লাভ কোরেছেন, আর লেখাপড়া শিখেছেন অর্থে এখানে এই রকম বোঝাচ্ছে যে নভেল পড়বার সময় এঁদের কখনো ডিক্সনারী খোলবার আবশ্যক হয় না !"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অষ্টম পত্রে flirt করার মানে বুঝিয়ে বলেছেন। 'Flirt করা কি জান ? ভালবাসার অভিনয় করা। দুই পক্ষেই জানচেন যে কেউ ভালবাসচেন না, অথচ মিষ্টি হাসি ও মিষ্টি কথার অজস্র আদান প্রদান চলচে ; অভিনেত্রী হয়ত একটা অলীক ছুঁতো নিয়ে একটু অলীক অভিমান করলেন, অভিনেতা অমনি একটু সান্ত্বনার অভিনয় করলেন, একটু হয়ত রসিকতার কথা বল্লেন 'oh you naughty, wicked provoking man !' Naughty man অত্যন্ত তৃপ্তিসূচক হাস্য করলেন। এই রকম রসিকতা হাসি তামাসা ও মিষ্টি কথার ক্ষণস্থায়ী গোলাবর্ষণের নাম flirt করা। এতে

অনেকটা সময় বেশ আমোদে কেটে যায়, তাছাড়া (ইংরিজি miss হল) love making আছে। flirt করার সঙ্গে হয়ত তার অল্প তফাৎ আছে। তবে এটা flirt করার চেয়ে আর একটু গভীর ও স্থায়ী পদার্থ (যদিও সকল সময়ে স্থায়ী হয় কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত বলতে পারিনে)। অনেক চোখের জলও নিষ্প্রয়োজন খরচ কতে হয়, সহচরীদের কাছ থেকে অনেক রহস্যপূর্ণ ঠাট্টা ও চোখ টেপাটেপি খেতে হয় ও দিনের মধ্যে দশবার করে blush কোর্তে হয়। অমনি নভেল পড়ে মনটা এমন রোমান্টিক হয়ে দাঁড়ায় যে, একটু অবসর পেলেই ভালবাসায় পড়তে ইচ্ছে করে, খাঁটি heroine এত বড় লম্বাচৌড়া কাজ কোর্তে ও লম্বাচৌড়া কথা কইতে দাস যায়। সুতরাং নভেল-পড়া মেয়েদের ভালবাসায় পড়া অত্যন্ত আয়োসের অবস্থা···এইরকম visitor অভ্যর্থনা করা, visit প্রত্যর্পণ করা, নতুন নভেল পড়া, নতুন fashion সৃষ্টি ও নতুন fashionএর অনুবর্তন করা, flirt এবং love করা হোচ্ছে তাদের কাজ। এই রকম ফড়িঙের মত ঘাসে ঘাসে লাফালাফি কোরে তাঁদের জীবনের বসন্তকাল কাটে। এঁরাই হোচ্ছেন fashionable মেয়ের দল। আমি দেশে থাকতে এখানকার মেয়েদের যে রকম মনে করেছিলুম এখানে এসে তার সঙ্গে ঢের তফাৎ দেখছি। আমাদের দেশে যেমন ছেলেবেলা থেকে মেয়েদের বিয়ের জন্যে প্রস্তুত করে, লেখাপড়া শেখায় না, কেননা মেয়েদের অফিসে যেতে হবে না। এখানেও তেমনি মাথি ঘরে বিক্রোবার জন্য মেয়েদের ছেলেবেলা থেকে পালিশ করে থাকে, বিয়ের জন্য যতদূর লেখাপড়া শেখা দরকার ততদূর শেখায়, তার বেশী শেখায় না, কেননা তাদের আপিসে যেতে হবে না। একটু গান গাওয়া, একটু পিয়ানো বাজানো, তাল কোরে নাচা, খানিকটা French, একটু বোনা ও সেলাই করা জানলেই একটি মেয়েকে বিয়ের দোকানের জানালায় সাজিয়ে রাখবার উপযুক্ত বেশ একটি রং চোঙে পুতুল গড়ে তোলা হয়। এ বিষয়ে একটা সিপি পুতুল ও একটা বিলিতি পুতুলের যতটুকু তফাৎ আমাদের দেশে ও এদেশের মেয়েদের মধ্যে ঠিক ততটুকু তফাৎ মাত্র।···

এখানে পুরুষেরাই হর্তা কর্তা, স্ত্রীরা তাদেরই সম্পত্তি, যেমন গাড়ী চালাবার জন্যে ঘোড়া আবশ্যক করে, তেমনি সংসার চালাবার জন্যে একটা স্ত্রীর দরকার, স্ত্রী একটি আবশ্যক জিনিস পত্রের মধ্যে। স্ত্রীকে আজ্ঞা করা, স্ত্রীর মনের মুখে লাগাম লাগিয়ে, নিজের ইচ্ছে মত চালিয়ে বেড়ানো স্বামীরা ঈশ্বর নিদিষ্ট অধিকার মনে করেন। Fashionable মেয়ে ছাড়া বিলেতে আরো অনেক রকম মেয়ে আছে, নইলে বিলেতের সংসার চলত না।"

রবীন্দ্রনাথ ঐ সব মেয়েদের সংসারের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রমের বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনার ভঙ্গি থেকেই বোঝা যায় কী রকম ঈষৎ ব্যঙ্গোক্তি ও বিদ্রূপের দৃষ্টি দিয়ে তিনি তাঁদের দেখেছেন। ভারতের মেয়েদের সরল সৌন্দর্যের জন্যে তাঁর মনের গভীরে নিবিড় টান লুকিয়েছিল তা পরিষ্কার অনুভব করা যায় ইটালীর মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর উক্তি থেকে,—

'ইটালির মেয়েরা বড় সুন্দর দেখতে। অনেকটা আমাদের দেশের মেয়ের ভাব আছে, সুন্দর রং, কালো চুল, কালো ভুরু, কালো চোখ, আর মুখের গড়ন অতি চমৎকার।' রবীন্দ্রনাথ ইটালির যে সব মেয়ের কথা বলেছেন, তারা অবশ্যই কেউই মোরাভিয়ার উপন্যাসের নায়িকা নন। হলে তাঁর চোখে যে ভালো লাগত না, তা না বলেই বলা চলে। ইংরেজ মেয়েরা দুদিন আগে যে-ধরনের জীবন যাপন করেছেন আজকে ভারতের সহর-গুলিতে সে ধরণের fashion আসছে। সেই সব মিথ্যা fashionএর মায়ায় ভুলে আমাদের কি নিজেদের তবু বিয়ের পণ্যে পরিণত করার দিন রয়েছে? সমগ্র ভারতের fashionable নারীদের কাছে এ জিজ্ঞাসা রইল।

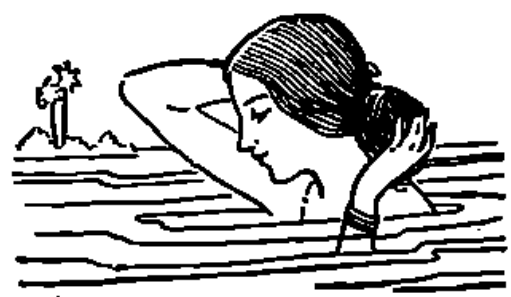

প্রসূতি-পরিচর্য্যা ও শিশুমঙ্গল

ডাঃ কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম,বি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

গামছা—নবজাত-শিশুদের জন্যে নরম মলমলের গামছাই ভাল। তবে সেই সঙ্গে গা মোছাবার জন্য বাড়তি-হিসাবে আরো দুখানি নরম 'টার্কিশ' তোয়ালে (Turkish towel) রাখাও দরকার। শিশুর মুখ ও পাছা মোছানোর জন্য পৃথক গামছা রাখা উচিত। কারণ মলমূত্র পরিষ্কার করে সে গামছা কখনও শিশুর মুখ মোছানোর জন্য ব্যবহার করা ঠিক নয় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই একথা আমরা বিশেষ চিন্তা করি না, বিশেষ যখন এখনো অনেক বাড়ীতে সকলকেই একগামছা ব্যবহার করতে দেখতে পাওয়া যায়।

সাবান—নব-জাত শিশুকে ঘন-ঘন খুব বেশী সাবান মাখানোও উচিত নয়, মাঝে মাঝে সাবান মাখালেই চলে। তবে শিশুর ব্যবহারোপযোগী যে সাবান বেশ চর্বিযুক্ত হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা একান্ত দরকার। পাশ্চাত্য দেশে ক্যাস্টাইল (Castile) বা "অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত সাবান" ব্যবহার করা হয়। গ্লিসারিন-সাবানও ব্যবহার করা ভাল।

পাউডার—অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে শিশুদের দেহে ঘন-ঘন পাউডার দেওয়া খারাপ। কারণ ঘন-ঘন পাউডার দেবার ফলে—লোমকূপ বন্ধ হয়ে যায় এবং স্বাভাবিক ভাবে দেহের ঘাম বেরুনোর অসুবিধা ঘটে তবে দেখা যায় যে আমাদের দেশে শিশুদের দেহে পাউডার দেবার রীতি আজকাল খুবই বেড়ে গেছে···এমনকি, বিশিষ্ট চিকিৎসকেরাও এ ব্যাপারে সবিশেষ উৎসাহদানও করে থাকেন। শিশুদের শরীরে পাউডার মাখানোর রীতি অনুসরণ করলেও, সে পাউডার স্নানের সময় ভাল করে পরিষ্কার করে না দিলে, বহু সময়ে নানা রকমের চর্মরোগেরও উদ্ভব হবার সম্ভাবনা থাকে। তবে জিঙ্ক অক্সাইড, হার্ট বোরিক এসিড (zinc-oxide, boric acid and starch in equal parts) সম-পরিমাণে মিশিয়ে সেই ...টিকে একটি পরিষ্কার মোটাকাপড় দিয়ে ... ব্যবহার করা যেতে পারে—অবশ্য পাউডার ব্যবহার করা যদি দরকার হয়··· বিশেষতঃ নবজাত-শিশুর নাড়ী যতদিন না শুকিয়ে সম্পূর্ণ সেরে যায়।

মলম—অনেক সময়ে নবজাত শিশুর বস্তীদেশে কিম্বা মলদ্বারের আশেপাশে দেহাংশ লাল হয়ে ওঠে। এমনটি ঘটলেই, সে জায়গাটিতে অল্প একটু মলমের প্রলেপ দেওয়া প্রয়োজন এবং যে মলম দিলে এ রোগের আশু উপশম হবে, সে সম্বন্ধেও মোটামুটি ইঙ্গিত দিয়ে রাখি। ইঙ্গিত মতো মলমটি অনায়াসেই যে কোনো ভালো এ্যালোপ্যাথিক ওষুধের দোকান থেকে কিনিয়ে এনে বাড়ীতে মজুত রাখা যেতে পারে। মলমটি বানানোর জন্য দরকার :—

১। জিঙ্ক অক্সাইড (zinc oxide) ½ ড্রাম ;

২। আমণ্ড বা বাদাম তেল (Almond oil) ½ড্রাম ; অভাবে, জলপাই তেলও (olive oil) ব্যবহার করা চলে।

৩। ল্যানোলিন (lanoline) ভেড়ার লোমের চর্বি ½ ড্রাম ;

৪। সাদা ভেসলিন (white vaseline) ½ আউন্স ; এ সব সামগ্রী বাড়ীতে চায়ের চামচ দিয়েও হিসাবমতো মেপে নেওয়া যেতে পারে এবং এক ড্রামের পরিমাণ হিসাব করতে হবে-এক চামচ আর এক আউন্সের হিসাব হবে—আট চামচ।

চেম্বার পট্ বা (মলমূত্র রাখার) পাত্র—শিশুর মলমূত্র ধারণের জন্য চীনে মাটির পাত্র ব্যবহার করা মন্দ নয়, তবে এনামেলের হাতলওয়ালা ও ঢাকনী দেওয়া পাত্রই বেশী কাজের—হাল্কা, সহজে কাজে নেয় এবং দামেও সস্তা। এগুলি আট ইঞ্চি ব্যাসের পাত্র হওয়াই ভাল।

বাথ্ টব বা স্নানের পাত্র—শিশু জলের মধ্যে হাত-পা ছুড়ে খেলা করতে পারে, এমন একটি স্নানের পাত্র বা বাথ্ টব ব্যবহার করা উচিত। পাত্রটিকে জমি থেকে ঈষৎ উঁচুতে রাখার ব্যবস্থা করলে বিশেষ সুবিধা হবে। কারণ,

তাহলে শিশুকে স্নান করানোর সময় নীচু হয়ে, ঝুঁকতে হয়না—অনায়াসেই বসে শিশুকে স্নান করানো চলে বিশেষ-ভাবে শীতের দেশে এবং শীতের দিনে। সচরাচর বাজারে যেমন মেলে, জলচৌকীর উপর তেমনি ধরণের টিনের (Galvanised) গ্যাল্‌ভানাইজড্ পাত্রেও শিশুকে সহজ উপায়েই স্নান করানো যেতে পারে।

দেরাজ বা আলমারী—শিশুদের কাপড়, জামা প্রভৃতি ব্যবহার্য্য সামগ্রীগুলি স্বতন্ত্র রাখবার ব্যবস্থা করাই ভাল। এজন্য আলাদা একটি আলমারী হলেই ভাল হয়···তবে, সুটকেশ বা ট্রাঙ্কেও কাজ চালানো যায়। শিশুদের ব্যবহার্য্য সামগ্রী স্বতন্ত্র রাখার উদ্দেশ্যে, বিলাতে অনেক সময় কাঠের বাক্স, এমন কি, পিপেও ব্যবহার করা হয়। প্যাকিং বাক্স থেকে শিশুদের জিনিষপত্র রাখার উপযোগী বেশ সুন্দর আলমারী বানানো চলে।

আসন: আলমারী ছাড়াও শিশুদের তোয়ালে প্রভৃতি শুখাতে দেবার জন্য এমনি ধরণের সুন্দর আসনও বানিয়ে নেওয়া যায়।

জলচৌকী—শিশুকে স্নান করানো এবং দুধ খাওয়ানোর সময় জলচৌকীর উপর বসেও এ কাজ করা যায়। বিলাতী সমাজে অনেকেই হাতলহীন চেয়ার ব্যবহার করেন। আমাদের দেশের মেয়েরা বহুক্ষেত্রে শিশু পরিচর্য্যাকালে মাদুরও ব্যবহার করেন।

অগ্নিকুণ্ড বা 'ফায়ার-প্লেস্' (Fire place) কিম্বা 'হীটার্' (Heater)—শীতপ্রধান দেশে ঘরের মধ্যে আগুন জেলে রাখা প্রয়োজন হয় বলে, শিশুরা হামা দিতে বা চলতে শিখলে জননী ও পরিচর্য্যাকারিণীদের সবিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। অর্থাৎ, শিশুরা যেন কোন কারণে 'ফায়ার-প্লেস', 'হীটার' প্রভৃতির কাছে জলন্ত আগুনের দিকে না যেতে পারে তার জন্যে তাঁরা সদা-সচেতন থাকেন ও যথাযথভাবে ঘরের 'অগ্নিকুণ্ড' সতর্কভাবে ঘিরে রাখেন। রান্নাঘরেও শিশুদের নিয়ে যাওয়া কিম্বা রাখা ঠিক নয়। জলন্ত উনানের সংস্পর্শে এসে আকস্মিক বিপদ ও গরম জলে পড়ে আর কাপড় জামায় আগুন লেগে প্রতি বৎসর বহু দুর্ঘটনার খবর নিত্যই দৈনিক খবরের কাগজে দেখা যায়। আমাদের দেশে বিহার, কাশ্মীর, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি এমন কি বাঙ্গলা দেশেও ঘর গরম রাখার জন্যও প্রসূতিকে সেক তাপ দেবার উদ্দেশ্যে অনেক সময় বন্ধ ঘরের মধ্যে কোথায় বা মাটির পাত্রে আগুন জেলে রাখা হয়। তার ফলে বন্ধ-ঘরের ভিতরে বিষাক্ত গ্যাস বা বাষ্প জমাট বাঁধার ফলে, শ্বাসরোধ হয়ে বহু শিশু ও প্রসূতির অকালে মৃত্যু ঘটে—এমন দৃষ্টান্তও হামেশাই নজরে পড়ে। তাছাড়া বন্ধ ঘরে শিশু বা প্রসূতি থাকলে তাঁদের রক্তশূন্যতা ও স্বাস্থ্যহীন হবারও রীতিমত আশঙ্কা আছে। আলোবাতাসে রাখার পরও যদি প্রসূতি তাঁর শিশুকে নিয়ে দরজা জানালা আগাগোড়া বন্ধ করে ঘরের মধ্যে ঘুমান, তাহলেও দিন-দিন ক্রমশঃ দুজনেরই স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে। শীতের দেশেও চারু চলাচলের যথাযথ ব্যবস্থা করার জন্য প্রত্যেক ঘরেই জানালা বা (ventilatore) বায়ুপ্রবেশ পথ থাকে। অহেতুক ঠাণ্ডা লাগবার আশঙ্কা করাও ঠিক নয়, জননীকে শুধু নজর রাখতে হয় যে কোনো কারণে দমকা হাওয়া বা ঠাণ্ডা যেন শিশুর দেহে না লাগে। সেজন্য শিশুর ঘরের দরজা জানালায় উপযুক্ত ধরণের পরদার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। শিশু ও জননীর পক্ষে একই বিছানায় শয়নগ্রহণ করা অনুচিত। কারণ, এতে চাপা পড়ার সম্ভাবনা ছাড়াও, জননীর শ্বাসপ্রশ্বাসের দূষিত বায়ু শিশুর শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে মিশে যায়। একালের বিশিষ্ট চিকিৎসকের মতে অবরুদ্ধ ঘরের হাওয়া যে কোনও বস্তীর অভ্যন্তরের আবহাওয়ার চেয়েও খারাপ ও বিষাক্ত তা সেই ঘর সমুদ্রের ধারেই হউক আর সবুজ গাছপালা ভর্ত্তি বাগানের পাশেই হউক।"

প্যারাম্বুলেটার—অবস্থাপন্ন ঘরে বায়ু সেবনের উদ্দেশ্যে শিশুদের বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্যে বিশেষ-ধরণের বিবিধ ঠেলা param' গাড়ীর ব্যবহার প্রচলিত আছে। চারিদিক বন্ধ এই 'প্যারাম' গাড়ী কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তার চেয়ে শিশুদের ব্যবহারোপযোগী হেতের বোনা হোলনার মত গাড়ী বহু অভিজ্ঞ ধাত্রী বিশারদের মতে, অনেকাংশে ভাল। কারণ, এসব গাড়ীতে আলো বাতাস খেলবার সুবিধা আছে। তবে, সচরাচর এ গাড়ীর চল খুবই কম দেখবার আমাদের দেশে সাধারণতঃ গদী-আঁটা, ছুচাকার হাতল দিয়ে ঠেলা দোলনার মত

দেখতে লোহার বা কাঠের তৈরী ঠেলা গাড়ীর প্রচলন আমাদের গ্রামে সহরে দেখা যায়। খুব চাপাচুপি দিয়ে শিশুদের আবদ্ধ-গাড়ীতে বেড়াতে নিয়ে যাওয়াও বড় আধুনিক বিশেষজ্ঞদের মতে যথাযথ নয়। বরং তার বদলে বেশ প্রশস্ত খেওয়া সহজে আমান যায় এমন গাড়ী ভাল। রোদ-জল আটকাবার জন্যে এ সব গাড়ীতে 'হুড' (Hood) বা আচ্ছাদন থাকে···সেগুলি পাশে থেকে নামান উঠান যায় প্রয়োজন মত। রঙীণ বল বা খেলনা-পুতুল সামনে ঝুলিয়ে দিতে বারণ করেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ, এ ব্যবস্থার ফলে অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের চোখের দোষ এবং শারীরিক কষ্টেরও উদ্ভব হয়। তা ছাড়া জন্ম গ্রহণের পরেই নবজাত শিশুকে খুব প্রখর আলোর তেজের সামনে আনা ঠিক নয়, কারণ ভূমিষ্ঠ হবার পর সাতদিন শিশুর নব-বিকশিত কোমল-চোখ কোনও রকম প্রখর তেজের আলো সহ্য করতে পারে না। লক্ষ্য করলে দেখলেই বোঝা যায় যে জন্মের কয়েক ঘণ্টা পরেই নবজাত-শিশু আলোতে চোখ পুরোপুরি মেলে তাকাতে পারে না—কোনো মতে পিট পিট করে তাকায়। প্রায় তিন সপ্তাহ বয়েসের হলে, তবেই শিশুরা ভালো করে চোখ মেলে আশপাশের সব কিছু দেখে। আমাদের দেশে সচরাচর প্রখর-রোদে শিশুদের রেখে দেবার রীতি প্রচলিত আছে—অনেকে ধারণা পোষণ করেন যে বোধ হয় তার ফলেই আমাদের সমাজে অল্প বয়সেই বহু ছোট ছেলেমেয়েদের চোখ খারাপ হয়। তাছাড়া বহু ধাত্রীবিদ্যাবিশারদই অভিমত প্রকাশ করেন যে শিশুদের রোদে দেবার সময় তাদের মুখে ও চোখে যেন রোদ না লাগে, সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। প্রায় মাসখানেক বয়সের সময় নবজাত শিশুরা যখনই কিনিস দেখলে কৌতূহল ভরে সেদিকে তাকানোর ক্ষমতা লাভ করে। তবে অনেক সময় বাঁকা বা তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে···কারণ এ সময় তাদের চোখের পেশী কোনল ও নিজের আয়ত্বাধীন থাকে না অর্থাৎ যথাযথভাবে যে কোনোদিকে ঘোরানো ফেরানোর শক্তি তখনও তাদের জন্মায় না বলেই এমনটি ঘটে। পরে ধীরে ধীরে ক্রমশঃ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যতই বড় হয়ে ওঠে ততই এ ভাব কমে যায়। তবে ছ বছর বয়স পর্যন্ত যদি কোনো শিশুর চোখের দৃষ্টি তির্যক বা ট্যারা ভাব থাকে তাহলে অবশ্য অবিলম্বে ডাক্তার দেখান উচিত। নবজাত শিশু জন্মের পরেই শব্দ শুনতে পায় এবং সামান্য কোনো রকম কর্কশ শব্দে ভয়ে চমকে ওঠে। তাছাড়া নবজাত শিশুর স্পর্শানুভূতিও থাকে···সে ব্যথা পেলে কাঁদে ও ছুঁলে বুঝতে পারে। তবে শিশুর বুদ্ধি-বৃত্তির উন্মেষ হতে সময় লাগে। শিশু জন্মাবার পর ধীরে ধীরে যেমন করে বড় হয় তার কথা ছড়ায় লেখে দিতে হলে বলা যায়—

হাওড়া জেলা সেন্ট জন এম্বুলেন্স এসোসিয়েসান ও ব্রিগেডের বাৎসরিক স্মারক গ্রন্থে (১৯৬২) প্রকাশিত।

বাড়ে শিশু দিন দিন যেমন করিয়া,
একে একে বলি তাহা, শুন মন দিয়া।
নয় মাস দশ দিন (দুইশত আশি দিন)
গর্ভেতে থাকিয়া,
মাতৃক্রোড়ে বাড়ে শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া।
দিন রাত নাহি মানে, শিশু যে ঘুমায়,
ধীরে ধীরে যত ভাব ফুটে উঠে তায়।
সাত দিন পরে শিশু চায় আশ পাশ,
মাস গেলে স্পর্শ, দেখা, প্রীতির প্রকাশ।
শব্দ, রূপ, ঘ্রাণে হয় দ্বিতীয় মাসেতে,
পাইবে প্রমাণ তার রসবোধ হতে।
হাসি-হাসি ভরা ছয়সপ্তাহে সে মুখ,
আটে চেনে মাকে দেয় কতই না সুখ।
ঘাড় তুলি দেখে শিশু চার মাস হলে,
পঞ্চম মাসেতে সে হাসি খুশী খেলে।
ছয় মাসে ওজনে সে হয় যে দ্বিগুণ,
পাঁচ হতে সাত মাসে খেলা তার গুণ।
চুষিকাঠি অন্য কিছু খেলনা যা পায়,
সব কিছু ধরে নিয়ে মুখে পুরে দেয়।
প্রথম দাঁতটি হবে উঠে মাড়ী ঠেলে,
ছয় হতে আট মাস যায় ধরে চলে।
দাঁত উঠা দেরী দেখে না পাইবে ভয়,
ডাক্তার আসিয়া যে 'ক্যালসিয়াম ডি' দেয়।
স্তন্যপান ছাড়ি শিশু আটমাসে বসে,
হাসি কান্না থাকে মুখ লালায়ত ভাসে।
নয় দশে হামা দিয়া শিশু যে বেড়ায়,

এটা সেটা ধরে সে যে উঠিয়া দাঁড়ায়।
এগারো পেরিয়ে যবে বারোতে সে আসে,
হেসে দুলে, টলে টলে হাঁটে অবশেষে।
ছয় দাঁত উঠে তার এই মাস এলে,
সতেরো মাসেতে চলে সোজা পা ফেলে।
দুগ্ধভাত্ত কন্ধ হয় আঠার মাসেতে,
ওজনে ত্রিগুণ হয় দুই বৎসরেতে।
অথবা (ওজন তিনগুণ হয় দু'বৎসরেতে)।
ধীরে ধীরে দুধে দাঁত কুড়িটি গজায়,
দাঁতে যত্ন না করিলে স্বাস্থ্যহানি হয়।
ছাড়া ছাড়া কথা ফুটে এক বৎসর হলে,
দ্বিতীয়ে, তৃতীয়ে পড়ে কত কথা বলে।
মা বাপের আনন্দ মাঝে বাড়ে নিত্য যথা,
বিজ্ঞানে সম্মত যেন এই সত্য কথা।
অথবা কুমারেশ বলে এ সব সত্য কথা। [ক্রমশঃ

—

সুপর্ণা দেবী

রমণীর রূপ-বর্ণনা প্রসঙ্গে আমাদের দেশের কবিরা রমণীর মুখকে বলেছেন—'মুখ-পদ্ম' এবং চরণকে বলেছেন—'চরণ-পদ্ম'। অর্থাৎ, পদ্মের মাধুরী যেমন নয়ন-মনের তৃপ্তিকর, নারীর সুন্দর মুখ এবং সুশ্রী ছাঁদে গঠিত চরণ-যুগল বা পদশোভা দেখে পুরুষ সমান তৃপ্তিলাভ করে। এমন কি, আধুনিক কালের পাশ্চাত্য-রমণীর রূপচর্চ্চা বিশেষজ্ঞরাও অভিমত প্রকাশ করেন যে,—"Legs really have personality. They give either a good or bad impression to the observer."

আধুনিক বিশেষজ্ঞদের এই সুনিশ্চিত অভিমতের অর্থ হলো—পায়ের গঠন ভালো কি মন্দ, তারই যথাযথ বিচার করে নরনারীর ব্যক্তিত্বের পরিচয় মেলে। কারণ পায়ের গড়ন সুন্দর হলে আমাদের মনে যেমন প্রীতির সঞ্চার হয়, তেমনি বিরাগ সৃষ্টি করে তোলে অসুন্দর পায়ের গঠন। সম্ভবতঃ, এজন্যই সেকালে আমাদের দেশে বধূ নির্ব্বাচনের সময়ে লোকে মেয়ের মুখ ও রূপশ্রী যেমন বিচার করতেন, মেয়ের পদ লালিত্য অর্থাৎ, পায়ের গড়ন সুশ্রী সুন্দর ও ভালো কিনা, সেটিও বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পরখ করে নিতেন। কাজেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মতো আমাদের ...বিশেষভাবে রমণীর সুশ্রী সুন্দর সুডৌল পায়ের গঠনেরও রীতিমত মূল্য আছে—ব্যক্তিগত রূপ-লাবণ্য শোভা বিচার করে দেখার সময়। অথচ, আমাদের দেশের সাধারণ গৃহস্থ সংসারে ক'জনেরই বা রূপ-চর্চ্চার এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা বা নিত্য নিয়মিতভাবে ব্যায়াম-অনুশীলন করবার সুযোগ সুবিধা বা অবকাশ মেলে। পাশ্চাত্য সমাজের রমণীরা কিন্তু রূপ-চর্চ্চার এ বিষয়টি সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ সচেতন। তাছাড়া পাশ্চাত্য সমাজে নৃত্য লীলার যে রীতি সুপ্রচলিত আছে, তার ফলেও, ওদেশের রমণীদের পক্ষে পায়ের গঠন সুশ্রী রাখার উপযোগী ব্যায়াম চর্চ্চার প্রচুর সুযোগ মেলে। কিন্তু তাই বলে, এদেশে গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা যে নিত্য নৃত্য চর্চ্চা করে তাঁদের পায়ের স্বাস্থ্য ও শ্রী ভালো রাখবেন, এমন কথাও বলা চলে না। কাজেই নিত্য-নিয়মিতভাবে নৃত্য চর্চ্চার অসুবিধা ঘটলেও, আমাদের দেশের সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের মহিলাদের পদ-লালিত্য সাধনের উপযোগী নিতান্ত ঘরোয়া ধরণের কয়েকটি সহজ-সরল ব্যায়াম পদ্ধতির হদিশ দিয়ে রাখছি।

৬৪৩ পৃষ্ঠার ৭নং ছবিতে মহিলাদের উরু, হাঁটু, পায়ের পাতা ও পেশীর স্বাস্থ্য ও শ্রী সুঠাম সুন্দর করে তোলার উপযোগী ব্যায়াম ভঙ্গীর যে নমুনাটি দেখানো হয়েছে, সেটি নিত্য নিয়মিতভাবে অন্ততঃপক্ষে দশবার অনুশীলন করা প্রয়োজন। ব্যায়ামের এই বিশেষ ভঙ্গীটি অভ্যাসের

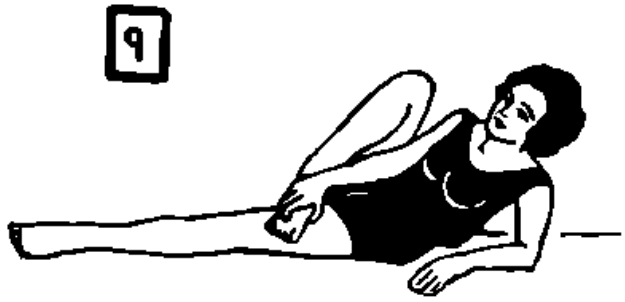

রীতি হলো—ঘরের সমতল মেঝের উপর দেহটিকে বাঁ-দিকে কাৎ করে বাঁ-হাতের কনুইয়ে দেহ-ভার ন্যস্ত রেখে আধ শোয়া অবস্থায় থাকুন। এমনি আধ-শোয়া অবস্থায় থেকে এবারে ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের সাহায্যে ডান পায়ের পাতাটিকে টেপে ধরে ঊর্ধ্বে তুলুন—নীচের ৮ নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে—অবিকল তেমনি ভঙ্গীতে।

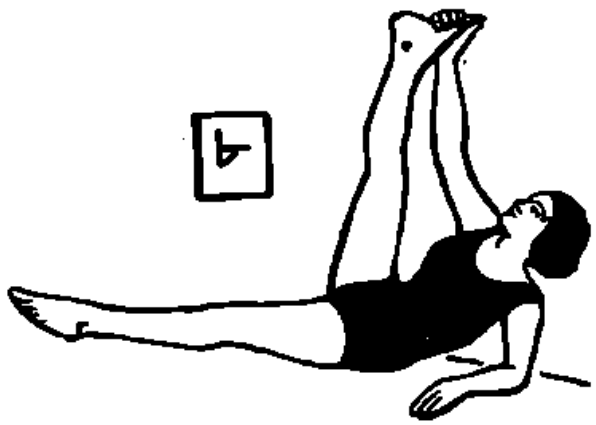

এমনি ভঙ্গীতে ডান-পাটিকে ঊর্ধ্বে তুলে রেখে কয়েক-বার সামনে পিছনে চক্রাকারে জোরে জোরে দোলাতে থাকুন। তবে মনে রাখবেন—ডান পা ঊর্ধ্বে তুলে এমনি-ভাবে দোলানোর সময়, বাঁ-পাটি কিন্তু বরাবর ঘরের সমতল মেঝের উপর সটান সিধাভাবে ছড়ানো থাকবে। অন্ততঃপক্ষে, দশবার সযত্নে এ ব্যায়াম-ভঙ্গীটি অভ্যাস করবার পর, অপর পাশে ফিরে···অর্থাৎ, দেহটিকে ডানদিকে কাৎ করে ডান হাতের কনুইয়ের উপর দেহ-ভার ন্যস্ত রেখে পূর্বোক্ত প্রথায় পুনরায় বার দশেক ব্যায়ামানুশীলন করবেন।

স্থানাভাবের কারণে, আপাততঃ এই দুইটি ব্যায়াম ভঙ্গীর পরিচয় দেওয়া হলো। আগামী সংখ্যায় পায়ের স্বাস্থ্য-শ্রী ভাল করে তোলার উপযোগী এমনি সহজ-সরল নিতান্ত ঘরোয়া ধরণের আরো কয়েকটি ব্যায়াম-ভঙ্গীর আভাস দেবার ইচ্ছা রইলো।

——

হাতের কাজ

কাদা-মাটির কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

গত সংখ্যায় তার, খড় আর কাপড়ের টুকরো জড়িয়ে রচিত খেলনা পুতুলের কাঠামোর উপর কাদা-মাটি চাপিয়ে মূর্তি গড়বার পদ্ধতি প্রসঙ্গে মোটামুটি যে সব হদিশ দিয়েছি, এবারে সেই সম্বন্ধেই আরো কয়েকটি দরকারী কথা জানিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এ পদ্ধতিতে কাদা-মাটি দিয়ে মূর্তি রচনাকার্যে যেমন কতকগুলি সুবিধা উপভোগ করা যায়, তেমনি অসুবিধাও ভুগতে হয় নানা ধরণের। সচরাচর তার বা কাঠের গায়ে ঘাস-খড় কিম্বা কাপড়ের পটি জড়িয়ে বানানো মজবুত কাঠামোর উপর ভিজা-নরম কাদা-মাটির তাল চাপিয়ে মৃৎ-শিল্পীর হাতের আঙুলের কম বেশী চাপ এবং মৃৎশিল্পকাজের উপযোগী বিভিন্ন হাতিয়ার ব্যবহার করে মূর্তি রচনা অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে অপেক্ষাকৃত পাকাপোক্ত ধরণের ও পরিপাটিভাবে কাজ করার পক্ষেও অনেক বেশী সহজসাধ্য এবং সুবিধাজনক হলেও, এ উপায়ে বানানো মাটির শিল্পসামগ্রীগুলিকে কাঠামো-বিহীন প্রথায় গড়া মৃৎশিল্প সামগ্রীর মতো আগুনের তপ্ত আঁচে 'পোড়ানো' (Baking) সম্ভবপর নয়। কারণ এ ধরণের মাটির মূর্তিতে কাদা-মাটির

আস্তরণের নীচে ঘাস-খড়-কাপড় প্রভৃতি সহজ-দাহ্য উপকরণাদি জড়ানো কাঠামো থাকে বলেই, আগুনের আঁচে রেখে পোড়ানোর সময় এ সব মৃৎশিল্পসামগ্রীগুলি অনেক ক্ষেত্রেই জ্বলে অথবা ফেটে গিয়ে সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত···এমন কি, সম্পূর্ণ নষ্টও হয়ে যায়। কাজেই কাঠামোর উপর কাদা-মাটি চাপিয়ে যে সব মৃৎশিল্প-সামগ্রী গড়া হয়, সেগুলিকে সাধারণতঃ আগুনের আঁচে রেখে পোড়ানোর রীতি নেই···বরং তার বদলে মৃৎশিল্পীর গঠন-কার্য্য পুরোপুরি শেষ হলেই কাদা-মাটির ভিজা-নরম সামগ্রীগুলিকে ছায়া-শীতল জায়গায় রেখে সরাসরি রোদ-বাতাসে শুকিয়ে আগাগোড়া পাকাপোক্ত করে নেওয়া হয়। এই কারণেই কাঠামোর উপর কাদা-মাটির আস্তরণ চাপিয়ে গড়া মাটির সামগ্রী, রোদ-বাতাসে শুকিয়ে পাকাপোক্ত করে নেওয়া সত্ত্বেও, কাঠামোবিহীনভাবে রচিত মাটির সামগ্রীর (অর্থাৎ যেগুলিকে সহজেই আগুনের আঁচে রেখে আগাগোড়া সেঁকে পুড়িয়ে পাকা করে তোলা যায়) চেয়ে অনেকখানি কম মজবুত, স্বল্পস্থায়ী এবং সহজ-ভঙ্গুর হয়ে ওঠে। তাই অভিজ্ঞ মৃৎশিল্পীরা সচরাচর কাঠামোর উপর মাটির আস্তরণ চাপানো মৃৎশিল্প সামগ্রীগুলিকে আগাগোড়া পাকা-মজবুত এবং দীর্ঘস্থায়ী করে তোলার উদ্দেশ্যে অভিনব একটি রীতি অনুসরণ করে থাকেন। সে রীতিটি হলো—কাঠামোর উপর কাদা-মাটির আস্তরণ চাপানো রোদে বাতাসে শুকানো মাটির সামগ্রীটিকে ছাঁচ (Dice বা Mould) হিসাবে ব্যবহার করে, তার আরেকটি নিখুঁত অবিকল 'প্রতিলিপি' (Mould or Dice Cast Image) বা 'নকল' (Duplicate) তুলে নিয়ে, কাঠামো বিহীনভাবে ছাঁচে-তোলা 'আসল মূর্ত্তির' (Original image) সেই 'অবিকল প্রতিলিপিটিকে' (Mould cast Image) রোদ বাতাসে শুকিয়ে এবং আগুনের আঁচে রেখে সেঁকে পুড়িয়ে আগাগোড়া পাকাপোক্ত, মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী বানিয়ে তোলা।

ইতিপূর্ব্বে যে সব বিভিন্ন পদ্ধতির কথা বলেছি, সেগুলি ছাড়াও কাদা-মাটি দিয়ে বিবিধ সৌখিন সুন্দর শিল্পসামগ্রী রচনার আরো একটি সহজ সরল অভিনব উপায় আছে। এবারে সে পদ্ধতিটির মোটামুটি হদিশ দিই। তবে এ পদ্ধতিতে মৃৎশিল্প সামগ্রী রচনা নিতান্তই সহজসাধ্য কাজ এমন কি, সামান্য চেষ্টা করলেই ছোট ছেলেমেয়েরাও অনায়াসে এ পদ্ধতি অনুসরণ করে সৌখিন ও নিত্য-ব্যবহার্য্য নানা রকমের বিচিত্র সুন্দর কাদা-মাটির জিনিষ-পত্র গড়ে তুলতে পারবে।

সরল ও সহজ-সাধ্য এই নতুন পদ্ধতিতে কাদা-মাটির শিল্প-সামগ্রী বানাতে হলে, প্রথমেই সমতল মেঝে, কিম্বা একখানি কাঠের পাটা বা পিঁড়ে, অথবা এক টুকরো পুরু কার্ডবোর্ডের উপর প্রয়োজনমতো পরিমাণে একতাল ভিজা নরম কাদা-মাটি রেখে, হাতের চাপ অথবা বেলুনী দিয়ে লুচি-পরোটা বেলার মতো ভঙ্গীতে সযত্নে সেই কাদা-মাটির তালটিকে আগাগোড়া সমান ছাঁদে (Flat and plain) বেলে নিন।

এবারে লুচি বা পরোটার ছাঁদে বেলে-নেওয়া ভিজা-নরম ঐ সমতল কাদামাটির 'চাক্তি' (Dice) বা 'পাটা' (plaque) অথবা 'টালির' (Tile) উপর উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি ধরণে অশ্বত্থ পাতাটিকে সমানভাবে বিছিয়ে রেখে, পরিষ্কার এক টুকরো পুরু কার্ড-বোর্ড অথবা টিনের পাত কিম্বা কাঠের পাটা চাপা দিন।

পাতাটিকে এভাবে চাপা দিয়ে রাখার পর ঐ কার্ডবোর্ড, টিনের পাত কিম্বা কাঠের পাটার উপর ভারী ওজনের কোনো বাঁধানো বই বা পাথর অথবা হাতের তালুর জোর চাপ দিন। তাহলেই দেখবেন কেমন সহজ সুন্দর উপায়ে ভিজা নরম কাদামাটির উপর অশথ পাতার 'ছাঁচ' বা 'প্রতিচিহ্নটি'র অবিকল ছাপ তোলা সম্ভব হয়েছে—এমন কি পাতার প্রত্যেকটি 'শিরা-রেখাগুলিরও' হুবহু চেহারা সুস্পষ্টভাবে ছাপা হয়ে গেছে···এতটুকু খুঁৎ নেই কোথাও।

এমনিভাবে অশথ পাতার হুবহু ছাঁচ তুলে নেবার পর, ধারালো একখানি ছুরির ফলার সাহায্যে বরফি সন্দেশ কেটে ভাগ করার ভঙ্গীতে কাদা-মাটির 'পাটা' বা 'টালি' অথবা 'চাক্তির' কিনারার চারিদিকে অযথা বেয়াড়াভাবে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় যেটুকু বাড়তি কাদা-মাটি রয়েছে, সেটুকু আগাগোড়া চেঁচে সাফ্ করে বাদ দিতে হবে। তাহলেই বেশ সহজ উপায়ে কাদা-মাটির 'চাক্তি, পাটা' বা 'টালির' উপর মনোরম সুন্দর ছাঁদে অশথ পাতার নিখুঁত প্রতিলিপি সুস্পষ্টভাবে মুদ্রিত হয়ে যাবে।

এ কাজ সারা হলে, অশথ পাতার ছাঁচ তোলা কাদা-মাটির ভিজা নরম চাক্তি, টালি বা পাটাখানিকে প্রথমে রোদ-বাতাসে রেখে আগাগোড়া ভালোভাবে শুকিয়ে নেবার পর, সেই শুকনো সামগ্রীটিকে আগুনের আঁচে সেঁকে পুড়িয়ে পাকাপোক্ত, মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী করে তোলা প্রয়োজন। এ পর্ব্ব চুকলে, সযত্নে রঙ-তুলির পরশ বুলিয়ে পোড়ামাটির পাটার উপরের ঐ অশথ পাতার প্রতিলিপিটিকে বর্ণোজ্জ্বল অপরূপ করে তুলুন এবং সেই রঙীণ প্রতিলিপির উপরে হালকাভাবে অল্প এক পোঁচ 'বার্নিশ' (varnish) কিম্বা গঁদের আঠার হলেপ দিয়ে মৃৎশিল্প সামগ্রীটিকে আগাগোড়া ঝক্‌ঝকে সুন্দর 'পালিশ' করে তুলুন।

পাতার ছাঁচ তোলা ছাড়াও এমনি উপায়ে আরো নানা রকমের যে সব বিচিত্র অভিনব মৃৎশিল্প সামগ্রী রচনা করা যায়। আগামী সংখ্যায় তার মোটামুটি পরিচয় দেবার ইচ্ছা রইলো। [ক্রমশঃ

——

এমব্রয়ডারীর নক্সাদার নমুনা

হিরণ্ময়ী দেবী

নববর্ষের সূচনায় আমাদের সূচীশিল্পানুরাগী পাঠিকাদের এবারে ঘর-গৃহস্থালীর দৈনন্দিন কাজকর্মের অবসরে, নিজের হাতে এমব্রয়ডারী সেলাই করে সৌখিন সুন্দর 'টেবিল ক্লথ', টি-কোজি', 'ট্রে-ক্লথার' বালিশের ওয়াড়, পর্দ্দা, 'কুশন-কভার' প্রভৃতি বিবিধ ধরণের নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী রচনার উপযোগী অভিনব আলঙ্কারিক ছাঁদের একটি বিচিত্র মনোরম ফুল পাতার ডিজা 'আপোনিকা' গাছের নক্সা নমুনা সাদরে উপহার দেওয়া হলো।

উপরের নমুনা অনুসারে, এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পের কাজ করে রঙীণ সুতী, রেশমী বা পশমী কাপড়ের তৈরী

সামগ্রীতে 'জাপোনিকা' গাছের এই আলঙ্কারিক নক্সাটি ফুটিয়ে তুলতে হলে, টুকটুকে লাল (Cherry-Red), সোনালী আভাময় হলদে (Golden yellow), ফিকে সবুজ (light Green), গাঢ় সবুজ (Dark Green) এবং গাঢ় বাদামী (Dark Brown)—এই পাঁচ রঙের সুতো ব্যবহার করা আবশ্যক। অর্থাৎ, ফুলের পাপড়ি রচনার জন্য টুকটুকে লাল রঙের সুতো—৪ লচ্ছি ফুলের ভিতরের পরাগ পুট রচনার জন্য, সোনালী আভাময় হলদে রঙের সুতো—২ লচ্ছি, পাতা রচনার জন্য, ফিকে সবুজ রঙের সুতো—২ লচ্ছি, পাতার শিরা রেখা রচনার জন্য, গাঢ় সবুজ রঙের সুতো—২ লচ্ছি এবং গাছের ডাল-পালা রচনার জন্য, গাঢ় বাদামী রঙের সুতো—৩ লচ্ছি··· একান্তই প্রয়োজন।

সূচী শিল্পের কাজের সময়, প্রথমেই প্রয়োজনমতো ছোট, বড় বা মাঝারি আকারে ফুল পাতা ডালপালা সমেত 'জাপোনিকা' গাছের নক্সাটিকে যথাযথ মাপে ও আগাগোড়া পরিপাটি ছাঁদে পছন্দমতোরী সুতী, রেশমী অথবা পশমী কাপড়ের উপর এঁকে বা ছাপ তুলে (Tracing) নেবেন। নক্সাটি যে কাপড়ে সেলাই করবেন, তার রঙ যদি মাখনের মতো হয় তো সুতোর রঙগুলিও বেশ মানানসই সুন্দর ও মনোরম দেখাবে।

'জাপোনিকা' গাছের নক্সাটিকে আগাগোড়া 'সাটিন ষ্টিচ্' (Satin Stitch) ও 'ব্লাঙ্কেট ষ্টিচের (Blanket Stitch) সাহায্যে এমব্রয়ডারী কাজ করে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

টুকটুকে-লাল সুতো দিয়ে 'সাটিন ষ্টিচের' ফোঁড় তুলে ফুলের পাপড়িগুলি রচনা করবেন। তারপর সোনালী আভাময় হলদে রঙের সুতো দিয়ে সেলাই করবেন ফুলের ভিতরের পরাগ পুট। এ সেলাইও হবে 'সাটিন ষ্টিচের' ফোঁড় তুলে।

এবারে সেলাই করবেন—গাছের ডালপালা। গাছের ডালপালা এমব্রয়ডারীর জন্য গাঢ় বাদামী রঙের সুতো ব্যবহার করবেন এবং সেলাইয়ের ফোঁড় তুলবেন 'সাটিন ষ্টিচ' পদ্ধতিতে।

গাছের ডালপালার পর পাতা রচনার পালা। পাতাগুলির জমির জন্য ব্যবহার করবেন—ফিকে সবুজ রঙের সুতো এবং শিরা রেখা রচনার জন্য বেছে নেবেন—গাঢ় সবুজ রঙের সুতো। পাতাগুলি এমব্রয়ডারী করতে হবে—'ব্লাঙ্কেট ষ্টিচ্' পদ্ধতিতে সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে।

এ কাজ সারা হলে, গাঢ় সবুজ রঙের সুতোর সাহায্যে 'ব্লাঙ্কেট ষ্টিচ্' পদ্ধতিতে সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে গাছের নীচেকার জমির লাইনটি এমব্রয়ডারী করবেন।

তাহলেই বেশ সহজ উপায়ে রঙীণ কাপড়ের বুকে এমব্রয়ডারী সূচী-শিল্পের কাজ করে আগাগোড়া পরিপাটি সুন্দর ছাঁদে উপরের নমুনা অনুসারে ফুল পাতা ডালপালা সমেত 'জাপোনিকা' গাছের নক্সাটিকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন।

সুধীরা হালদার

এবারে বলছি—দক্ষিণ-ভারতীয় প্রথায় মাছ দিয়ে রান্না করা বিচিত্র মুখরোচক একটি আমিষ-জাতীয় খাবারের কথা। সাগর-কূলের অধিবাসী দক্ষিণ-ভারতীয়দের বিশেষ প্রিয় এই মাছের খাবারটির নাম হলো—"সোথী"। বৈচিত্র্যের দিক থেকে এটি যেমন অভিনব, খেতেও তেমনি অপরূপ সুস্বাদু।

প্রায় চার পাঁচজন লোকের আহারের উপযোগী "সোথী" খাবার রান্নার জন্য উপকরণ দরকার—আধসের মাছ, একটি নারিকেল, পাঁচ-ছয়টি পেঁয়াজ, গোটা চার পাঁচ কাঁচা লঙ্কা, চায়ের চামচের আধ চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো, প্রয়োজনমতো পরিমাণে অল্প একটু নুন। গোটাকয়েক তেজপাতা এবং চায়ের চামচের এক চামচ পরিমাণে ঘী।

উপরোক্ত উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, রান্নার কাজে হাত দেবার আগে, উদ্যোগ পর্বের কয়েকটি ব্যাপার সুষ্ঠুভাবে চুকিয়ে নেওয়া দরকার। অর্থাৎ, প্রথমেই বঁটি বা ছুরির সাহায্যে একটি পেঁয়াজ খুব মিহি টুকরো টুকরো এবং বাকীগুলিকে চার-ফালি করে কুটে নিন। তারপর কাঁচা লঙ্কাগুলি দু'ফালি করে চিরে রাখুন এবং নারিকেলটিকে কুরে আগাগোড়া সেই নারিকেল-কোরা নিঙড়ে চারের পেয়ালার প্রায় আড়াই-পেয়ালা পরিমাণ 'দুধ' বা 'Coconnut-milk বার করে নিন।

এবারে উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সেই পাত্রে অল্প একটু ঘী গরম করে নিয়ে পেঁয়াজকুচিগুলিকে আগাগোড়া বেশ বাদামী রঙীণ ধরণে ভেজে পরিষ্কার একটি পাত্রে তুলে পরে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আলাদাভাবে সরিয়ে রাখুন। তারপর পুনরায় উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, ইতিপূর্বেই ভেজে-রাখা বাদামী রঙীণ পেঁয়াজকুচি আর চায়ের পেয়ালার আধ-পেয়ালা পরিমাণ নারিকেল-দুধ বাদ রেখে, উপরের ফর্দমতো রান্নার বাকী সব উপকরণ রন্ধনপাত্রে দিয়ে, 'মিশ্রণটিকে' কিছুক্ষণ আগুনের তাপে বসিয়ে রেখে আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে ফুটিয়ে নিন।

এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সারা হলে, উনানের তপ্ত-আঁচে বসানো রন্ধনপাত্রে বাকী নারিকেলদুধটুকু মিশিয়ে দিয়ে, 'মিশ্রণটিকে' পুনরায় আরো কিছুক্ষণ ফুটিয়ে খাবারটি আগাগোড়া সুসিদ্ধ করে নিন। তাহলে দক্ষিণ ভারতীয় প্রথায় বিচিত্র মুখরোচক "সোথী" খাবার রান্নার পালা শেষ হবে। এবারে প্রিয়জনদের পাতে পরিবেষণের আগে, "সোথী" খাবারটির উপর সযত্নে বাদামী-রঙীণ করে ভাজা পেঁয়াজকুচিগুলি ছড়িয়ে নিন। তার ফলে, দক্ষিণ ভারতীয় পদ্ধতিতে রান্না করা অভিনব সুস্বাদু মাছের খাবারটি খেতে যে আরো অনেক বেশী উপাদেয়-মনোরম হয়ে উঠবে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি ভারতীয় খাবার রান্নার পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করবার বাসনা রইলো।

দেবদত্ত

সাধারণভাবে লগ্ন ও রাশি থেকে মাসফল লেখা হ'ল। এর অনেক ফল মিলবে যে কিছু ফল হয়তো নাও মিলতে পারে। তার কারণ এই যে আপনার জন্মকুণ্ডলীতে অন্যান্য গ্রহের স্থানে থেকে বিচার না করলে সব ফল নির্ভুল ভাবে বলা যায় না। তা ছাড়া দশা হিসাবে বিচার করলেও ফলের অনেক তারতম্য হতে পারে। সাধারণ ভাবে মোটামুটি এই ফল কতকটা মিলবে। এই মাসফল দেখে হয়তো আপনি কতকটা সচেতন বা সতর্ক হতে পারেন। এমন কি চেষ্টা, অধ্যবসায় এবং পুরুষকার দিয়ে অনেক মন্দ ফলের হাত থেকে অব্যাহতিও পেতে পারেন। এই খানেই জ্যোতিষশাস্ত্রের সার্থকতা। জ্যোতিষশাস্ত্র বলে না গ্রহের ফল অকাট্য। পুরুষকার, দৈব, চিকিৎসা, রত্নধারণ ও গ্রহশান্তি দ্বারা অনেক কুগ্রহের প্রভাব থেকে নিজেকে বাঁচানো যায়। তা ছাড়া, ভগবান বা দেবতার কাছে প্রার্থনার দ্বারা কুগ্রহের প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করাও সম্ভব। ভগবান সকল গ্রহের উপরে—তাঁর ইচ্ছা ও করুণায় যে অঘটনও ঘটে।

এইখানে যে মাসফল লেখা হল তা জন্ম রাশি ও লগ্ন হিসাবে বিবাহিত গৃহস্থ ভদ্রলোক ও মহিলাদের লক্ষ্য করে। তবে সাধারণভাবে এই ফল সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য, কেবল মহিলারা—যেখানে "স্ত্রী" লেখা আছে সেখানে "স্বামীকে" বুঝবেন।

মেষ রাশি—এই মাসে আপনার স্বাস্থ্য খুব ভাল যাবে না। মাঝে মাঝে শরীর নিয়ে কিছু বিব্রত হতে পারেন। এই মাসে আপনার কাজ কর্মে এবং ব্যবসা বাণিজ্যে কিছু ভাল হতে পারে। কোন পরীক্ষা বা প্রতিযোগিতামূলক কোন ব্যাপারে কিছু শুভ ফল আশা করতে পারেন। এই মাসে কোন কলহ বিবাদের সম্ভাবনা আছে। সেই বিষয়ে একটু সাবধান থাকবেন। চোর প্রতারক বা শত্রু দ্বারা কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াও এই মাসে অসম্ভব নয়। আপনার গৃহে কোন মঙ্গল বা শুভ অনুষ্ঠান হওয়া বিচিত্র নয়। আর্থিক দিক দিয়ে খুব বেশী লাভের আশা করবেন না। যদি বা সামান্য কিছু আর্থিক অগ্রগতি হয়, তা হয়তো অন্য কোন অপ্রত্যাশিত খরচের ধাক্কায় বেরিয়ে যাবে। আর্থিক দিক দিয়ে এই মাসকে আপনার পক্ষে খুব ভাল বলা যায় না। কোন সম্মানের কিছু সাফল্য ও উন্নতি এই মাসে হলেও কোন সম্মানের ব্যাপারে কিছু চিন্তা হতে পারে। আপনার বাসস্থান বা গৃহভূমির ব্যাপার নিয়ে কিছু ঝঞ্ঝাট হতে পারে। ভাল মন্দ সকল দিক বিচার করে দেখলে এই কথা বলা যেতে পারে এই মাসটি আপনার পক্ষে মন্দ নয়।

বৃষ রাশি—আপনার নিজের শরীর এবং স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে একটু চিন্তিত হতে পারেন। কাজকর্ম এবং ব্যবসা-বাণিজ্য এ মাসে ভালই চলবে। কোন গুপ্তশত্রু এই মাসে আপনার ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে। কোন অপবাদ বা বদনাম প্রচার করতে দ্বিধা করবে না। কোন আত্মীয় বা বন্ধুর সঙ্গে মতবিরোধ বা মনোমালিন্য হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। পেটের অসুখ বা হজমের গোলমালে এই মাসে আপনি মাঝে মাঝে ভুগতে পারেন। খাওয়া খাওয়ার ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকবেন। আর্থিক দিক দিয়ে এই মাস ভাল যাবে বলে মনে হয় না। বন্ধু বান্ধব, পরিচিত লোকজনের সঙ্গে টাকা কড়ি লেন-দেনের

ব্যাপারে, একটু সাবধান হবেন। সতর্কতা অবলম্বন করলে অর্থ-অর্থ থেকে কিছু লাভ আশা করতে পারেন। যদিও অর্থের দিক দিয়ে এই সময়টি আপনার পক্ষে খুব শুভ নয়।

মিথুন রাশি—এই সময়ে আপনার স্বাস্থ্য ভালই যাবে। শরীরের জন্য বিশেষ চিন্তার কিছু কারণ নেই। মাতা বা মাতৃস্থানীয়া কারো পীড়ার জন্য চিন্তিত হতে পারেন। গৃহভূমি বা বাসস্থানের ব্যাপারে কিছু গোলমাল উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা। এই সময়ে ছেলে মেয়েদের উন্নতি ও সাফল্য লাভ দৃষ্ট হয়। কাজ-কর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে ভাল ফল আশা করতে পারেন। এই সময়ে কিছু আর্থিক অগ্রগতি হবে এবং শত্রু বশ্যতা স্বীকার করবে। সব দিক দিয়ে বিচার করলে এই সময়টি আপনার ভালই চলবে। তবে কোন বন্ধু, পরিচিত ব্যক্তি বা আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ আপনাকে ব্যথিত করতে পারে।

কর্কট রাশি—এই সময়ে আপনার ফল ভাল মন্দ মেশানো। কোঁড়া, বিস্ফোটক বা ঐ জাতীয় রোগের প্রবণতা এই মাসে দৃষ্ট হয়। কোনরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনা বা রক্তপাতের যোগও এই সময়ে আছে। সেইজন্য সতর্কতার সঙ্গে পথে ঘাটে চলাফেরা করবেন। আর্থিক দিক দিয়ে এই মাস আপনার পক্ষে খুব ভাল না হলেও কিছু লাভ বা আকস্মিক অর্থ প্রাপ্তি ঘটতে পারে। মনের কোন গোপন আশা পূর্ণ হওয়ার যোগ এই সময়ে দৃষ্ট হয়। ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য এই মাসে খুব ভাল যাবে না। আপনার গৃহে কোন শুভ অনুষ্ঠান বা উৎসব হতে পারে। শত্রু আপনাকে খুব ব্যতিব্যস্ত করলেও শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করবে।

সিংহ রাশি—এই সময়ে আপনার স্বাস্থ্য খুব ভাল যাবে না। পরিবারের কারো কারো শরীর নিয়ে একটু চিন্তিত হতে পারেন। গৃহস্থানীয় ব্যাপারে একটু ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হতে পারে। স্ত্রীর শরীরও বিশেষ ভাল যাবে না। কোনরূপ আঘাত বা রক্তপাতের সম্ভাবনা আছে। সে বিষয়ে খুব সতর্ক থাকবেন। ছোট খাটো ভ্রমণের যোগ আছে তবে তা খুব আরামপ্রদ হবে না। নানান ঝামেলা থাকলেও আর্থিক দিক দিয়ে সময়টি খুব মন্দ নয়। গৃহভূমি বা বাসস্থানের ব্যাপারে কিছু গোলমাল এই সময়ে দৃষ্ট হয়। কোন সন্তানের সাফল্য এই সময়ের অন্যতম শুভফল। সন্তান, পিতা বা পিতৃস্থানীয় কারো পীড়া আপনাকে উদ্বিগ্ন করে তুলতে পারে। কাজ কর্ম এবং ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ কোন পরিবর্তন নেই। আর্থিক দিক দিয়ে এই সময়টি আপনার পক্ষে মন্দ নয়। তবে ব্যয়ের চাপে একটু অস্থির হয়ে উঠতে পারেন।

কন্যা রাশি—এই সময়ে আপনার স্বাস্থ্য ভালই যাবে। তবে চোখ ওঠা, চোখ দিয়ে জল পড়া বা চোখে কোন রকম আঘাত লাগা প্রভৃতি ছোট খাটো অসুখের প্রবণতা এই সময়ে দৃষ্ট হয়। এই সময়টি আপনার কাজ-কর্ম এবং ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতির ব্যাপারে বিশেষ শুভ। শিল্প, কলা, সাহিত্য প্রভৃতির ব্যাপারে এই সময়ে অগ্রগতি হতে পারে। সেই দিক দিয়ে কোন রকম প্রশংসা পাওয়া বা প্রতিষ্ঠা লাভ করাও অসম্ভব নয়। মামলা-মোকর্দমায় জয়লাভ এবং শত্রুর পরাজয় এই সময়ের বিশেষ শুভ ফল। এই সময়ে স্ত্রীর তরফ থেকে আপনার কোন রকম আনন্দ আসতে পারে। তাঁর কোন রকম সাফল্য আপনাকে বিশেষ ভাবে সুখী করবে। গৃহে কোন শুভ অনুষ্ঠান বা মঙ্গল উৎসবের জন্য কিছু ব্যয় বাহুল্য হতে পারে। বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মত বিরোধ বা মনোমালিন্য এই সময়ের একটি অশুভ ফল। ছেলে মেয়েদের জন্য কিছু ঝামেলা এই সময়ে আসতে পারে। তাদের অসাফল্য ও স্বাস্থ্যহানি আপনাকে কিছুটা চিন্তিত করে তুলতে পারে। পিতা-মাতা বা তাঁদের স্থানীয় ও স্থানীয়াদের জন্যও কিছু উদ্বেগ হতে পারে।

তুলা রাশি—এই সময়টি, আপনার পক্ষে মামুলী ধরণের—খুব ভালও নয় মন্দও নয়। আর্থিক হিসাবে কিছু অগ্রগতি দেখা গেলেও খুব আর্থিক স্বচ্ছলতা আশা করবেন না। এক দিক দিয়ে টাকা এলেও অন্য দিক দিয়ে তা বেরিয়ে যাবে। ব্যয় বাহুল্যের চাপে কিছুই হয়তো রাখতে পারবেন না। আপনার নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগের কোন কারণ নেই। আপনার স্ত্রীর শরীর হয়তো ভাল যাবে না। ছেলে মেয়েদেরও কিছু কিছু অসুস্থতা যেতে পারে। কোন ভ্রাতা বা ভ্রাতৃস্থানীয় কারো বিশেষ অসুখের যোগ দৃষ্ট হয়। কাজ-কর্ম ও ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে সময়টি ভালই যাবে। কোন

প্রতিযোগিতায় আপনার সাফল্য এই সময়ের একটি শুভ ফল। শত্রু আপনার বশ্যতা স্বীকার করবে। ছোট-খাটো ভ্রান্তিকর ভ্রমণও হতে পারে। কোন রকম ফাট্‌কা বা স্পেকুলেশনে না যাওয়াই ভাল। লাভের চেয়ে লোকসানের সম্ভাবনাই বেশী। ছোট খাটো সামান্য কিছু অশান্তি ঘটলেও পরিবারের ও গৃহের সমাবেশ ভালই থাকবে।

বৃশ্চিক রাশি—এই সময়টি আপনার সকল দিক দিয়ে ভাল যাবে বলে আশা করতে পারেন। যদি না আপনার কোষ্টীতে অন্যান্য গ্রহ বিশেষ বিরুদ্ধ হয়। সকল দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে মনে হয় এই সময়টি আপনার পক্ষে বিশেষ শুভ। আর্থিক, শারীরিক কি মানসিক সকল দিক দিয়ে শুভ ফল দৃষ্ট হয়। গৃহে কোন মঙ্গল অনুষ্ঠান বা শুভ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। আপনার নিজের স্বাস্থ্য ভালই যাবে তবে অতিরিক্ত পরিশ্রম বা মাথার কাজের জন্য ক্লান্তি বা অবসাদ আসতে পারে। তার জন্য বিশ্রাম এই সময়ে আপনার একান্ত প্রয়োজন। স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েদের কারো একটু স্বাস্থ্যহানির যোগ দৃষ্ট হয়। তবে তা নিয়ে বিশেষ চিন্তার কোন কারণ নেই। যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং সুনামের যোগ এই সময়েই দৃষ্ট হলেও মাঝে মাঝে মনোমালিন্য, কলহ এবং বিবাদ যে হবে না তা মনে করবেন না। স্বাস্থ্য, সৌভাগ্য এবং সমৃদ্ধি লাভ এই সময়ে ঘটবে। তাই বলে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবেন না পুরুষকার দিয়ে ভাগ্যকে ফলবতী করে তোলা সে আপনার নিজের হাতে।

ধনু রাশি—এই সময়ে আপনি খুব বেশী ভাল ফল আশা করবেন না। সময়টি আপনার পক্ষে ভাল মন্দ মেশানো। কোন বিষয়ে বেশ ভালই হবে আবার কোন বিষয়ে তেমন ভাল নয়। আপনার স্বাস্থ্য ভালই যাবে বলে আশা করতে পারেন তবে কোন রকম শারীরিক দুর্বলতা বা মানসিক দুশ্চিন্তা যে থাকবে না তা নয়। ছোট খাটো আকস্মিক দুর্ঘটনা ও রক্তপাত সম্বন্ধে সতর্ক থাকবেন। পথে ঘাটে চলা ফেরার সময় একটু সাবধানে চলবেন। তবে সে বিষয়ে খুব আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না। গুরু ভোজন এবং অতি ভোজন আপনার স্বাস্থ্যহানির অন্যতম কারণ হতে পারে। খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে একটু সংযম আপনার পালন করা উচিত। ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য হয়তো আপনার ভাবনার কারণ হতে পারে। তবে তা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। স্ত্রীর শরীর ভাল যাবে বলে মনে হয়। ভ্রাতা বা প্রাতৃস্থানীয় কারো সম্বন্ধে একটু উদ্বিগ্ন হতে পারেন। তাদের সঙ্গে মনোমালিন্য, কলহ বা বিবাদ হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং পরিচিত লোক জনের সঙ্গে খুব হিসাব করে কথা-বার্তা কইবেন। কিছু অর্থিক সুবিধা হতে পারে। এই মাসে আপনার গৃহে কোন আনন্দ উৎসব বা শুভ অনুষ্ঠান হতে পারে। ব্যয় বাহুল্যের চাপে আপনি বিব্রত হতে পারেন।

মকর রাশি—এই সময়টি আপনার মোটামুটি ভালই যাবে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিন্তার বিশেষ কারণ নেই। রক্ত-পাত বা আকস্মিক দুর্ঘটনা সম্বন্ধে একটু সতর্ক থাকবেন। পথে ঘাটে চলা ফেরার সময় একটু সাবধান হবেন। ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খুব বেশী চিন্তার কারণ নেই। টাকা কড়ির ব্যাপার খুব আশাপ্রদ নয়। তবে কিছু আবদ্ধ অর্থ এই সময়ে উদ্ধার হতে পারে। পাওনা টাকা কিছু আদায় হতে পারে। যশ, খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি লাভ এই সময়ের আপনার অন্যতম শুভ ফল। কোন সৎ কাজে কিছু ব্যয় এ সময়ে হতে পার। সাহিত্য বা লেখা-পড়ার ব্যাপারে কিছু কৃতকার্য হতে পারেন। কোন সংসদ, পরিষদ বা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে সাফল্য বা প্রতিষ্ঠা লাভ হতে পারে। আপনার গৃহ বা বাসস্থান নিয়ে একটু ঝঞ্ঝাট যেতে পারে। এই সময়ে গোপন শত্রুতার যোগ দৃষ্ট হয়। কাজ কর্ম এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে কিছু শুভ সূচনা লক্ষণীয়।

কুম্ভ রাশি—এই সময়ে গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে খুব শুভ নয়। তবে কিছু ভাল ফল আশা করতে পারেন। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খুব অশুভ না হলেও হজমের গোলমাল, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে মাঝে মাঝে কষ্ট পেতে পারেন। চোখের অসুখের প্রবণতা এই সময় দৃষ্ট হয়, সে সম্বন্ধে একটু সতর্ক থাকবেন। স্ত্রীর শরীর নিয়ে একটু চিন্তিত হতে পারেন। এই সময় স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় পরিচিতের সঙ্গে ব্যবহারে একটু সংযম ও সতর্কতা অবলম্বন

করবেন। তাঁদের সঙ্গে কলহ-বিবাদ যাতে না হয় সে বিষয়ে একটু সচেতন থাকবেন। এই সময় খরচের চাপে বিব্রত হতে পারেন। চোর বা প্রতারকের দ্বারা কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া মোটেই বিচিত্র হয়। সে বিষয়ে একটু সজাগ থাকবেন। কাজ-কর্ম এবং ব্যবসা-বাণিজ্য এই সময় চলন-সই গোছের চলবে। ওদিক থেকে এই সময়ে খুব বেশী আশা করবেন না। তবে মাসের গোড়ার দিকে সাফল্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ প্রভৃতি আশা করতে পারেন। বিলাস-ব্যসনে কিছু ব্যয় এবং কিছু প্রাপ্তিযোগও এই সময় ঘটতে পারে।

মীন রাশি—এই সময় আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে বিশেষ চিন্তার কারণ নেই। সামান্য অবসাদ, দুর্বলতা প্রভৃতিতে একটু আধটু ভুগতে পারেন। এই সময় আপনার কাজ কর্ম এবং ব্যবসা বাণিজ্য সাধারণ ভাবে চললেও কিছু আর্থিক অগ্রগতি ও অপ্রত্যাশিত লাভ আশা করতে পারেন। ভ্রাতা, বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। সে সম্বন্ধে একটু সতর্ক থাকবেন। ফাটকা বা স্পেকুলেশান্ থেকে এ সময় বিশেষ কিছু আশা করবেন না, লাভের চেয়ে লোকসানের সম্ভাবনা বেশী। এই সময়ে কোন ভাল মুরুব্বি বা বন্ধুলাভ ঘটতে পারে। সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য এবং বিলাসিতার জন্য অপ্রত্যাশিত কিছু ব্যয় হবে। ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য মাঝে মাঝে ভাল যাবে না। তবে তা নিয়ে বিশেষ ভাবনার কিছু নেই। স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।

——

লগ্ন হিসাবে মাসফল

(১৬ই বৈশাখ হইতে ১৫ই জ্যৈষ্ঠ)

মেষ লগ্ন—এই সময়ে পিতা মাতার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বেগ যেতে পারে। নিজের স্বাস্থ্য এবং ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্যও খুব ভাল যাবে না। তবে চিন্তার বিশেষ কারণ নেই। এই সময়ে আপনার আয়ের যোগ যেমন আছে তেমনি ব্যয়াধিক্যও দৃষ্ট হয়। সৎ কাজে যেমন ব্যয় হবে তেমনি চোর বা প্রতারকের দ্বারাও কিছু ক্ষতি হতে পারে। অপ্রত্যাশিত কিছু অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। তীর্থ-ভ্রমণ বা দূর দেশে গমন প্রভৃতির যোগ এসময়ে দৃষ্ট হয়। ভ্রাতা ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মন কষাকষি চলতে পারে। তাঁদের সঙ্গে কলহ ও বিবাদ বিসম্বাদ হওয়াও মোটেই অসম্ভব নয়। সম্ভাব্য স্থানে পুত্র লাভের যোগ ও পুত্রের বিবাহের যোগ এবং যান বাহন লাভের যোগ দৃষ্ট হয়। এই সময়ে আপনার আধ্যাত্মিক অগ্রগতি এবং ধর্ম-কর্মে মতি হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। কাজ-কর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে এই সময়টি বিশেষ শুভ।

বৃষ লগ্ন—এই সময়টি আপনার পক্ষে কাজ-কর্ম ও ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়ে ভালই যাবে বলে আশা করতে পারেন। তবে যে একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট যাবে বলে আশা করবেন না। আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খুব বেশী চিন্তার কারণ নেই। তবে পেটের অসুখ, আমাশয়, অর্শ প্রভৃতি রোগের প্রবণতা দৃষ্ট হয়। টাকা কড়ির ব্যাপারে সময়টি খুব অশুভ নয়। তবে অর্থ উপার্জন ও অর্থ প্রাপ্তিতে রীতিমত বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াও বিচিত্র নয়। গৃহকর্মের ব্যাপারে সময়টি খুব অশুভ নয়। তবে গৃহ ও বাসস্থান নিয়ে কিছু ঝামেলা ও গণ্ডগোল হওয়া অসম্ভব নয়। গৃহস্থালীর পরিবেশ সকল দিক দিয়ে বিচার করলে ভালই তবে কিছু ছোট খাটো অশান্তি হয় তো আসতে পারে। ছেলেদের সাফল্য এবং সম্ভাব্যস্থানে যান বাহন লাভও ঘটতে পারে।

মিথুন লগ্ন—এই সময়ে আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে বিশেষ চিন্তার কারণ নেই। সামান্য ছোট খাটো অসুখ—মাথাধরা, ঠাণ্ডা লাগা, পেটের গোলমাল প্রভৃতিতে হয়তো কখনও কখনও ভুগতে পারেন তবে কোন কঠিন পীড়ার যোগ দেখা যায় না। যশ, কর্মোন্নতি, সুখ, সমৃদ্ধি প্রভৃতি আপনার এই সময়ে ঘটবে। মামলা মোকর্দ্দমায় জয়, শত্রুনাশ, প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাজয় অবশ্য ঘটবে। তবে ঐ সব দিক দিয়ে কিছু কিছু অশান্তি, হাঙ্গামা বা ঝামেলা আপনাকে ভোগ করতে হবে। অর্থ আপনার আসবে তবুও ব্যয়ের চাপে আপনি অস্থির হয়ে উঠবেন। মাঝে মাঝে অর্থ চিন্তা আপনাকে উদ্বিগ্ন করে তুলবে।

কর্কট লগ্ন—এই সময়ে আপনার আর্থিক দিক দিয়ে বিশেষ চিন্তার কারণ নেই। টাকা আপনার আসবেই তবে কখন কখন বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হতে পারে।

আপনার কর্ম উন্নতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতি ঘটতে পারে স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য বা সাময়িক বিচ্ছেদ হতে পারে। স্ত্রীর অসুস্থতাও অসম্ভব নয়। গৃহস্থালীর ব্যাপারে বা পারিবারিক পরিবেশে একটু বিশৃঙ্খলার লক্ষণ দৃষ্ট হয়। বাত বা বায়ুরোগের প্রবণতা আপনাকে মাঝে মাঝে কষ্ট দিতে পারে। সামান্য আঘাত ও রক্তপাতের সম্ভাবনাও দৃষ্ট হয়।

সিংহ লগ্ন—এই সময়টি আপনার পক্ষে অত্যন্ত ঝামেলার মাস। নানান অবাঞ্ছিত ঝামেলা এসে উপস্থিত হলেও তা থেকে আপনি কিছু লাভবান যে হবেন না তা বলা যায়। নতুন কোন কর্ম প্রচেষ্টা এই সময়ে হতে পারে। তবে তা থেকে খুব বেশী আর্থিক লাভ আশা করবেন না। নিজের অস্বাস্থ্য ও পরিবার বর্গের অসুখ বিসুখ আপনাকে অত্যন্ত চিন্তিত করে তুলবে। গৃহভূমি সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে বা যান বাহনের ব্যাপার নিয়ে কিছু অশান্তি পেলেও সম্ভাব্যস্থানে ভূমিলাভ, গৃহপত্তন বা বাস পরিবর্তন অসম্ভব নয়। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার তরফ থেকে এই বিষয়ে কিছু প্রাপ্তিযোগও ঘটতে পারে। বিলাসিতার জন্য কিছু ব্যয় হওয়ার যোগও দৃষ্ট হয়। কোন সন্তানের কর্ম প্রাপ্তি বা উন্নতিও হতে পারে। ছোট খাটো ভ্রমণ বা তীর্থদর্শন হতে পারে। আয়-ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকার সম্ভাবনা কম। বাজা-ধিকোর জন্য মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগ এই সময়ে আপনাকে অস্থির করে তুলতে পারে।

কন্যা লগ্ন—এই সময়টিতে স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে চিন্তার খুব কারণ নেই। তবে ছোট খাটো অসুখের যোগ কিছু দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ পেটের অসুখ, মূত্রাশয়ের পীড়া এবং চোখের কোন রকম অসুখে একটু আধটু ভুগতে পারেন। সে বিষয়ে একটু সাবধান থাকবেন। ভ্রাতা-ভগ্নী বা আত্মীয়-স্বজন নিয়ে কিছু ঝামেলা বা গোলমাল উপস্থিত হতে পারে সে সম্বন্ধে একটু সতর্ক থাকবেন। আর্থিক দিক দিয়ে সময়টি খারাপ নয় তবে ব্যয় বাহুল্যের যোগ আছে। গৃহভূমি বা গৃহস্থালীর ব্যাপারে সময়টি মোটা-মুটি শুভ। তবে ঐ ব্যাপারে কিছু ঝামেলা দেখা দিতে পারে। গৃহে কোন রকম শুভ অনুষ্ঠান বা মঙ্গল উৎসব হতে পারে। ছেলে মেয়েদের ব্যাপার নিয়ে কিছু উদ্বেগ যেতে পারে। তাদের অস্বাস্থ্য বা অসাফল্য এই উদ্বেগের কারণ হতে পারে। বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের অশিষ্ট ব্যবহার হয়ত আপনাকে ক্ষুব্ধ করতে পারে। এই সময়ে তাদের কাছ থেকে দূরে থাকাই আপনার পক্ষে মঙ্গল। টাকা কড়ি লক্ষ্মীর ব্যাপারে সময়টি ভালই। লক্ষ্মী অর্থ থেকে ভাল লাভ আশা করতে পারেন। তবে তা পেতে কিছু বিলম্ব হতে পারে। কাজ-কর্ম বা ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে সময়টি শুভ। তবে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের উপর তার সাফল্য নির্ভর করবে। এই-সময়ে কাজ-কর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রগতি নিশ্চয়ই হবে। স্ত্রীর দিক থেকে কিছু প্রাপ্তি ও আনন্দ লাভ হতে পারে। আধ্যাত্মিক অগ্রগতি এবং কোন সৎ বা ধর্ম অনুষ্ঠানে কিছু ব্যয় হতে পারে। এই সময়ে কোন ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা দৃষ্ট হয়।

তুলা লগ্ন—এই সময়টিতে মানসিক দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ আপনাকে রীতিমত অস্থির করে তুলবে। যদিও তা বাস্তব দিক দিয়ে খুব সমীচীন নয়। কাল্পনিক বা অবাস্তব বিপদের আশঙ্কায় আপনি নিজেকে মুহ্যমান করে তুলবেন না। আপনার ভাল-মন্দ ফলের বিচার করলে দেখা যায় যে সময়টি সমান সমান। ফুটবল খেলার ভাষায় বলা যেতে পারে গোলশূন্য "ড্র"। আপনার স্বাস্থ্য খুব ভাল না গেলেও তা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত হবেন না। সামান্য জ্বর জ্বাড়ি, মাথা ধরা বা হজমের গোলমাল কিম্বা ঐ জাতীয় ছোট খাটো অসুখে মাঝে মাঝে কষ্ট পেতে পারেন। তবে তার জন্য আপনার নিয়মিত কাজের বিশেষ ব্যাঘাত হবে না। অর্থপ্রাপ্তিতে বাধা বিঘ্ন ও ঝঞ্ঝাট এলেও টাকা কড়ি আপনার আসবে এবং হঠাৎ অপ্রত্যাশিত কিছু টাকা পাওয়াও অসম্ভব নয়। ভ্রাতা-ভগ্নী বা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মনোমালিন্য বা বিচ্ছেদ হতে পারে। সে বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। তাদের কারো পীড়া বা মৃত্যু আপনাকে বাধিত করতে পারে। গৃহ বা বাসস্থানের ব্যাপারে কিছু গোলমাল বা ঝামেলা হতে পারে। গৃহস্থালীর ব্যাপারে ছোট খাটো অশান্তি বা অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটলেও গৃহের পরিবেশ ভালই থাকবে। ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য খুব ভাল যাবে না। তাদের নিয়ে হয়তো একটু বিব্রত হতে পারেন। স্ত্রীর

শরীরও খুব ভাল না যেতে পারে তবে তা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। এই সময়ে কর্ম উপলক্ষ্যে ক্লান্তিকর ভ্রমণ হতে পারে এবং তা থেকে কিছু লাভও আশা করতে পারেন। কাজ-কর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য মামুলি ধারাবাহিক ভাবে চলবে। এই সময়ে জমিজমা থেকে কিছু লাভ আশা করতে পারেন। কোন নতুন কাজের সূচনা বা কোন বড় কাজে হাত না দেওয়াই ভাল।

বৃশ্চিক লগ্ন—এই সময়টি আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ নয়। স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হতে পারে। তবে শ্লেষ্মা ও বাতের প্রকোপ কিছু বৃদ্ধি পেতে পারে, সে বিষয়ে একটু সতর্ক থাকবেন। অতিরিক্ত পরিশ্রম ও ক্লান্তি-জনিত অবসাদও আপনার অস্বাস্থ্যের অন্যতম কারণ হতে পারে। সেইজন্য বিশ্রাম আপনার একান্ত প্রয়োজন। টাকা কড়ির এবং আয়ের ব্যাপারে সময়টি শুভ বলা যেতে পারে। টাকা কড়ির লেন-দেন, কাটকা বা স্পেকুলেশনের ব্যাপার থেকেও কিছু অর্থ প্রাপ্তি ঘটতে পারে। কাজ-কর্ম বা ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ ভালই চলবে। তা থেকে অর্থপ্রাপ্তি এবং উন্নতি হওয়ার যোগ দৃষ্ট হয়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং ভ্রাতাভগ্নীর ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকবেন তাদের দ্বারা ক্ষতি এবং তাদের সঙ্গে মনো-মালিন্য ও কলহ বিরোধ হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার পীড়া এই সময়ের অন্যতম অশুভ ফল। গৃহ বা গৃহস্থালীর ব্যাপার নিয়ে ছোট খাটো ঝামেলা বা অশান্তি পেলেও গৃহের পরিবেশ ভালই আশা করতে পারেন। ছেলে মেয়েদের উন্নতি, অগ্রগতি ও সাফল্য এই সময়ের আর একটি শুভ ফল। শত্রুর বিনাশ বা পরাজয় আশা করতে পারেন, যদিও তারা মাঝে মাঝে আপনাকে বিব্রত করবার চেষ্টা করবে। গৃহে কোন শুভ অনুষ্ঠান হতে পারে। এই সময়ে আপনার গৃহে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন বা বিবাহ প্রভৃতি শুভ অনুষ্ঠান হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। কর্ম উপলক্ষ্যে ভ্রমণ হতে পারে এবং তা থেকে কিছু অর্থপ্রাপ্তিও ঘটতে পারে।

ধনু লগ্ন—এই সময়ে আপনার স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল যাবে বলে আশা করতে পারেন। তবে ছোট খাটো অসুখ, রক্তপাত বা কোন রকম আকস্মিক দুর্ঘটনা সম্বন্ধে একটু সতর্ক থাকবেন। আর্থিক অবস্থা সাধারণ ভাবে চলবে। খুব বেশী লাভ বা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আশা করবেন না। লোকসানের দিক দিয়েও খুব বেশী কিছু ভয় নেই। কোন ভ্রাতা বা ভ্রাতৃস্থানীয়ের তরফ থেকে কিছু উপকৃত হতে পারেন। তেমনি কোন ভ্রাতা বা ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে মন কষাকষি বা কলহ-বিবাদ হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। গৃহভূমি, বাসস্থান বা গৃহ-স্থানীয় ব্যাপার নিয়ে খুব বেশী চিন্তিত হবার কিছু নেই, সাধারণ ভাবেই চলবে। তবে ছেলে মেয়েদের অস্বাস্থ্য বা তাদের কোন অসুবিধা আপনাকে কিছু চিন্তিত করতে পারে। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার পীড়া হয়তো আপনার মানসিক উদ্বেগের কারণ হতে পারে। কাজ-কর্ম বা ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে এই সময়ের গোড়ার দিকে খুব সুবিধা আশা করবেন না। তবে মাঝামাঝি থেকে কিছু অগ্রগতি এবং সুবিধা আশা করতে পারেন। আপনার মাতুল বা মাতুল স্থানীয় কোন ব্যক্তির কঠিন পীড়া বা মৃত্যু আপনাকে একটু চিন্তিত ও ব্যথিত করতে পরে। স্ত্রীর দিক দিয়ে কিছু আনন্দ আসতে পারে। তাঁর সাফল্য এবং সম্ভাব্য স্থলে সন্তান লাভের যোগ দৃষ্ট হয়। এই সময়ে আপনার কিছু ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে। তবে তা খুব আরামপ্রদ না হওয়াই সম্ভব। এই সময়ে সম্মান, প্রতিপত্তি বা জনপ্রিয়তা লাভ কিছু ঘটলেও শত্রুর বৈরিতায় আপনার অসম্মান, অখ্যাতি বা অপমানের যোগও দেখা যায়। আপনার শত্রুর মধ্যে কোন উচ্চ-শিক্ষিত প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিও থাকতে পারেন এবং তাদের কূটনৈতিক চাল আপনাকে অনেক সময় বেকায়দায় ফেলতে পারে। ধর্ম বা আধ্যাত্মিক ব্যাপারে কিছু অগ্রগতি দেখা যায়। কোন সদ্গুরু লাভ হওয়াও মোটেই বিচিত্র নয়। আয়-ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকারই সম্ভাবনা বেশী। এই সময়ে কোনরূপ প্রতারণার দ্বারা ক্ষতি বা অসদ্ব্যয়ের যোগও দৃষ্ট হয়।

মকর লগ্ন—এই সময়ে আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে খুব বেশী চিন্তার কারণ দেখা যায় না। মানসিক বা শারীরিক অবসাদ বা ক্লান্তিই আপনার অসুস্থতার কারণ হবে। সামান্য রক্তপাত বা দুর্ঘটনা সম্বন্ধে এই সময়ে একটু সতর্ক থাকবেন। আর্থিক প্রাচুর্য্য খুব না থাকলেও অবস্থা খুব অস্বচ্ছলও হবে না। হঠাৎ কিছু প্রাপ্তিও হতে পারে।

কাজ-কর্ম বা ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে কিছু বাধা-বিঘ্ন দৃষ্ট হয়। তবে কোন বড় ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু অগ্রগতি বা উন্নতি নিশ্চয়ই হবে। ছোট খাটো অশান্তি বা কামেলা থাকলেও গৃহের পরিবেশ মোটামুটি ভালই থাকবে। সস্তাবাসস্থানে গৃহভূমি লাভ বা বাস পরিবর্তন অসম্ভব নয়। উত্তরাধিকার সূত্রে বা দান হিসাবে কিছু সম্পত্তি লাভও এই সময়ে হতে পারে। কোন ভ্রাতার কিছু উন্নতিও দৃষ্ট হয়। তবে তাদের কারো অসুস্থতা বা তাদের কারো সঙ্গে মনোমালিন্যও হতে পারে। ছেলে মেয়েদের তরফ থেকে কিছু ভাল ফল আশা করতে পারেন কিন্তু তাদের কারো অস্বাস্থ্যও আপনার মানসিক উদ্বেগের কারণ হতে পারে। শত্রু থাকিও আপনাকে নানান ভাবে উৎপীড়ন করতে পারে এবং তাদের প্রকাশ্য ও গুপ্ত অভিব্যক্তি নানা দিকে বাড়তেও পারে তবুও একথা জোরের সঙ্গে বলা যায় যে আপনার জয় সুনিশ্চিত। শত্রু-নিপাত অবশ্যম্ভাবী। স্ত্রীর শরীর ভালই যাবে বলে আশা করতে পারেন। ঐদিক থেকে কোন ভাবনার কারণ নেই। ছোট-খাটো ভ্রমণ বা কার্য-উপলক্ষে বিদেশ যাত্রা এই সময়ে অসম্ভব নয়। ধর্ম-কর্ম সম্বন্ধে কিছু ভাল যোগ দেখা যায়। আধ্যাত্মিক অগ্রগতি সময়ের একটি শুভ ফল।

কুম্ভলগ্ন—এই সময়টি আপনার সকল দিক দিয়ে একটু কামেলার। বড় কোন অসুখের যোগ না থাকলেও ছোট খাটো অসুস্থতা হয়তো লেগেই থাকবে। সেইজন্য কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অর্থ উপার্জন সব দিকেই একটু বাধা-বিঘ্ন হতে পারে। কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য বা চাকরীর ব্যাপারে এই সময়টিকে খুব শুভ বলা যায় না। গতানুগতিক ভাবেই চলবে। এই সময়ে উপরওয়ালা বা মুরুব্বির সঙ্গে কিছু মনোমালিন্য বা তাদের বিরাগ ভাজন হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। গৃহের পরিবেশ বা পারিবারিক আবহাওয়া খুব শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল না হওয়াই সম্ভব। ভ্রাতার দিক থেকে এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের তরফ থেকে কিছু কামেলা ও অশান্তিও আসতে পারে। তাদের কারো কঠিন পীড়া বা মৃত্যু জনিত শোক পাওয়াও অসম্ভব নয়। আপনার বিরুদ্ধে কোন মিথ্যা বদনাম বা কোন দুর্নাম রটনা হতে পারে। তবে তা থেকে আপনার বিশেষ ক্ষতি না হওয়াই সম্ভব। স্ত্রীর সঙ্গে মন কষাকষি বা মনোমালিন্য সম্বন্ধে সতর্ক থাকবেন। তাঁর সঙ্গে ব্যবহারে বা কথা-বার্তায় একটু সংযম পালন করলে অনেক অশান্তির হাত থেকে রক্ষা পাবেন। এই সময়ে হয়তো আপনার ভ্রমণ হতে পারে তবে তা খুব সুখকর হবে না।

মীন লগ্ন—এই সময়ে আপনার শরীর নিয়ে চিন্তার বিশেষ কারণ নেই। মানসিক অবসাদ এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম জনিত শারীরিক ক্লান্তি হয়তো কিছু আসতে পারে। তবে তা নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। আর্থিক দিক থেকে সময় খুব খারাপ বলা যায় না। যদিও আশানুরূপ আর্থিক অগ্রগতি এবং উপার্জন এই সময়ে না হওয়াই সম্ভব। আয়-ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আশা করবেন না। খরচের ধাক্কায় মাঝে মধ্যে অস্থির হলেও চেষ্টা করলে কিছু অতিরিক্ত ব্যয় বা বাজে খরচের হাত থেকে নিস্তার পেতে পারেন। এই বিষয়ে একটু সতর্ক হবেন। এই সময়ে কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চাকরীর ব্যাপারে খুব শুভ না হলেও কিছু লাভ, উন্নতি এবং অগ্রগতি হতে পারে। কোন ভ্রাতা বা আত্মীয় বন্ধুর দ্বারা কিছু উপকৃত বা লাভবান হতে পারেন। গৃহের পরিবেশ ও গৃহস্থালীর আবহাওয়া ভাল থাকবে বলেই মনে হয়। স্ত্রীর দিক থেকে চিন্তার বিশেষ কারণ নেই। ছেলে মেয়েদের সামান্য অস্বাস্থ্য বা তাদের তরফ থেকে কিছু কামেলা এলেও মোটামুটি এই ব্যাপারে সময়টি বিশেষ অশুভ নয়। নিয়ম নিষ্ঠা, শারীরিক শুচিতা, সংযম প্রভৃতি কঠোর ধর্ম-অনুষ্ঠানের দিকে আপনার আকর্ষণ আসা এই সময়ে সম্ভব।

পাট ও পাঠ

শ্রীশ—

॥ কাপুরুষ ও মহাপুরুষ ॥

পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের আর একটি অভিনব সৃষ্টি এই "কাপুরুষ ও মহাপুরুষ" চিত্রটি। আর, ডি, বন্‌শল্ প্রযোজিত এই চিত্রে সত্যজিৎ রায় তাঁর পরিচালনা কৃতিত্বের আর একটি স্বাক্ষর রাখলেন। সাধারণ ছোট গল্পও পরিচালনার গুণে কি সুন্দর ভাবে চিত্রায়িত হতে পারে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ "কাপুরুষ" চিত্রটি। আর বহু পঠিত "বিরিঞ্চিবাবা" গল্পটিও অভিনব আঙ্গিকে অপরূপ হয়ে "মহাপুরুষ"-এ পরিণতি লাভ করেছে।

সু-সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের "তৈনিক কাপুরুষের কাহিনী" ও স্বনামধন্য কথাশিল্পী রাজশেখর বসুর (পরশুরাম) "বিরিঞ্চিবাবা" গল্প অবলম্বনে এই "কাপুরুষ ও মহাপুরুষ" চিত্রটি নির্মিত হয়েছে। দুটি কাহিনীই কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। একটি ব্যর্থ প্রেমের কাহিনীতে দুর্বল নায়ক প্রেমাস্পদাকে গ্রহণে দ্বিধা ও সংশয়তায় পরিচয় দিয়ে কাপুরুষ আখ্যা লাভ করেছে। সেই ব্যর্থ প্রেম ও পরে নায়ক ও পরস্ত্রী নায়িকার অকস্মাৎ সাক্ষাৎ লাভের কাহিনী নিয়েই গঠিত হয়েছে এই "কাপুরুষ" চিত্র। আর 'মহাপুরুষ' চিত্রটি তো সম্পূর্ণই একটি কৌতুক কাহিনী। বাবাজী বিরিঞ্চিবাবা জরা-মৃত্যুহরণী ত্রিকালজ্ঞ পুরুষরূপে অর্থবান শিষ্যের ওপর ভর করে, বাকচাতুর্যে মুগ্ধ তরুণদের হৃদয় হরণ করে মহা-পুরুষ রূপেই প্রতিষ্ঠা হতে চেয়েছিলেন। তাঁর সেই কৌতুক কাহিনী এবং শেষকালে তিনি কি ধরণের মহাপুরুষ তার উদ্‌ঘাটনই এই "মহাপুরুষ" চিত্রের বিষয়-বস্তু।

এর আগে সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের "তিন কন্যা" দেখিয়েছিলেন। এবারে "কাপুরুষ ও মহাপুরুষ"—এই দুই পুরুষকে চিত্রামোদীদের উপহার দিলেন।

"কাপুরুষ ও মহাপুরুষ" চিত্রটিতে প্রথমে দেখান হচ্ছে "মহাপুরুষ" চিত্রটি। ছবিটির প্রধান ভূমিকায় অর্থাৎ বিরিঞ্চি বাবারূপে সার্থক অভিনয় করেছেন চারুপ্রকাশ ঘোষ। সভা-সাধক, যদিও কপট, সন্ন্যাসীর সৌম্য, শান্ত, বিনম্র ও তেজস্বী ভাবকে যেমন ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি ভক্ত আকর্ষণের জন্য তত্ত্ব সাধুর নিজের সম্বন্ধে অদ্ভুত, অবাস্তব ও অসম্ভব কথাগুলিও, যেমন বুদ্ধ-যিশু-শঙ্কর-প্লেটো সবাইকেই তিনি জ্ঞান বিতরণ করেছেন, আর প্রস্তর যুগে জলহস্তির মাংসও খেয়েছেন, ইত্যাদি অবলীলাক্রমে বলবার অপূর্ব নৈপুণ্যও প্রদর্শন করেছেন। অন্যান্য ভূমিকাগুলির অভিনয়ও চরিত্রানুযায়ী হয়েছে। কয়েকটি নতুন মুখের দেখা পাওয়া গেছে এবং তাঁদের অভিনয়ও ভালই হয়েছে বলতে হবে।

"কাপুরুষ" ছবিটি "মহাপুরুষ" থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের এবং এর আবেদনও গভীর। আর এই চিত্রটিতেই পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনার বৈশিষ্ট্য মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। তরুণ চিত্রনাট্যকার অমিতাভ রায় জলপাই-গুড়ি অঞ্চলে ভ্রমণ করতে করতে গাড়ী অচল হয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে এক চা বাগানের মালিক বিমল গুপ্তর আতিথ্য গ্রহণ করে এবং তারই বাংলোয় সাক্ষাৎ হয় অমিতাভের কলেজজীবনের প্রণয়িনী করুণার সঙ্গে, কিন্তু সে এখন বিমলের স্ত্রী! দুজনেই পূর্বপরিচয়ের কথা প্রকাশ করল না বটে, কিন্তু অমিতাভর মনে জাগল এক বিষম দ্বন্দ্ব। যে অশ্রু-সিক্তা নারীকে দুর্বল অমিতাভ একদা ফিরিয়ে দিয়েছিল—আশ্রয় দিতে পারে নি, গ্রহণ করতে পারে নি তার অসহায় অবস্থার জন্য, সেই পূর্বপ্রণয়িনীকে আজ পরস্ত্রীরূপে দেখে অমিতাভ বিচলিত হয়ে পড়ল। সে জানতে চাইল করুণা বিবাহিত জীবনে সুখী কি না—কিন্তু সে উত্তর সে পেল না। সে তাকে তার কাছে ফিরে আসতে অনুরোধ জানাল, কিন্তু সে আশাও তার পূর্ণ হল না।

ছোট্ট কাহিনী, সামান্য ঘটনাও সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনা গুণে অনবদ্য হয়ে ফুটে উঠেছে পর্দার গায়ে। চিত্রাঙ্কিত অমিতাভর চিন্তার মধ্যে দিয়ে তার পূর্বপ্রণয়ের টুকরো টুকরো ঘটনার ছোট ছোট ফ্লাশ্ ব্যাক' সমগ্র কাহিনীটিকে সুন্দর রূপে তুলে ধরেছেন তিনি দর্শক চক্ষুতে। নায়িকা করুণার ভূমিকায় মাধবী মুখোপাধ্যায়ের স্বচ্ছন্দ, সাবলীল, হৃদয়স্পর্শী অভিনয় মনে রাখবার মতন। নায়ক অমিতাভর ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় ভূমিকানুযায়ী হয়েছে বলা চলে। আর বিমলের ভূমিকায় হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ও কৃতিত্বপূর্ণ হয়েছে বলতে হবে।

তবে বাংলা চলচ্চিত্রের রীতি অনুযায়ী "কাপুরুষ ও মহাপুরুষ"-এর গতিও কিছু মন্থর। সংলাপ বাহুল্যই এর কারণ বলে মনে হয়। সংলাপ অংশ কিছুটা সংক্ষিপ্ত হলে

*

আর. ডি. বনশল প্রযোজিত ও অজয় কর পরিচালিত "কাঁচ কাটা হীরে" ছবিতে লিলি চক্রবর্তী।

●

চিত্রের গতিও দ্রুততর হত বলে মনে হয়। কোটোগ্রাফী বা চিত্রগ্রহণ ভালই হয়েছে বলা চলে। বিশেষ করে বহির্দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ প্রশংসার যোগ্য হয়েছে। তবে অন্তর্দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ কয়েকস্থলে আশানুরূপ হয় নি—আরও পরিষ্কার হওয়া উচিত ছিল।

যাই হোক, "কাপুরুষ ও মহাপুরুষ" চিত্রটি যে বাংলা চিত্র জগতে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান তাতে কোনও সন্দেহই নেই। বিশেষ করে 'কাপুরুষ' ছবিটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও প্রশংসা লাভ করতে পারবে বলেও মনে হয়।

●●●

অবন্তীপ্রসাদের ঃ

চিত্র-প্রযোজক আর, ডি, বনশল এবার একটি হিন্দী চিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন। বোম্বাইয়ের কারদার ষ্টুডিওতে চিত্রটি নির্মিত হবে। ছবিটি পরিচালনা করবেন লেখ টাণ্ডন এবং প্রধান ভূমিকাগুলিতে দেখা যাবে দারা সিং, রাজেন্দ্রকুমার, রাজেন্দ্রনাথ, ডেভিড ও কিশোর সাহনকে। শঙ্কর জয়কিষণ সুর রচনার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং এটি একটি রঙীন চিত্র হবে।

বাংলা চিত্র-প্রযোজনায় বিশেষ সাফল্য অর্জন করবার পরও হিন্দী চিত্র নির্মাণে কেন তিনি উদ্যোগী হচ্ছেন, সেই বক্তব্য শ্রীবনশল স্পষ্ট করেই চিত্র-সাংবাদিকদের এক বৈঠকে জানান। বাংলা চিত্র যথেষ্ট উন্নত হলেও তার বাজার

সীমাবদ্ধ। তাই তাঁর চিত্র-প্রযোজনা সংস্থাকে সক্রিয় রাখতে গেলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা বাংলা চিত্রের সঙ্কীর্ণ ব্যবসায়িক ক্ষেত্র থেকে লাভ করা সম্ভব হচ্ছে না বলেই তিনি হিন্দী চিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন। তবে তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে মাঝে মাঝে দু'একটি হিন্দী চিত্র তিনি নির্মাণ করবেন এবং তার থেকে লব্ধ অর্থের প্রধান অংশ তিনি বাংলা চিত্র নির্মাণেই নিয়োগ করবেন। তিনি বলেছেন বাংলা চিত্র নির্মাণই তাঁর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য এবং তাই তিনি করতে চান এবং করবেনও, শুধু অর্থ-নৈতিক কারণেই মাঝে মাঝে হিন্দী চিত্র নির্মাণ করবেন।

• • •

১৯৬৯ সালের রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতার জন্য আঞ্চলিক কমিটি এবারে দুটি ছবি সুপারিশ করেছেন। ছবি দুটি হোল : 'চারুলতা' ও 'আরোহী'।

তাছাড়া আঞ্চলিক ভাষার চিত্রের পুরস্কারের জন্য কমিটি মোট চারটি ছবি সুপারিশ করেছেন। ছবিগুলি হচ্ছে —'অনুষ্টুপ ছন্দ' (বাংলা), 'সাধনা' ও 'নবজন্ম' (ওড়িয়া) এবং 'প্রতিধ্বনি' (অসমীয়া)। চিত্রনাট্য রচনার জন্য এই কমিটি সর্ব-ভারতীয় পুরস্কারের জন্য তিনটি ছবির নাম করেছেন। ছবি তিনটি হল 'চারুলতা', 'অনুষ্টুপ ছন্দ' ও 'সাধনা'। কেন্দ্রীয় অ্যাওয়ার্ড কমিটি মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিত্র নির্বাচনের কাজ সমাপ্ত করবেন বলে জানা গেছে এবং ৩১-এ মে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। এবারের এই অনুষ্ঠান দিল্লীতে না হয়ে বোম্বাইয়ে হবে এবং এই প্রথম দিল্লীর বাইরে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

• • •

রাজেন্দ্রপ্রসাদ মেমোরিয়াল কমিটি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের জীবনী অবলম্বনে একটি চিত্র নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। পরিচালক তপন সিংহ ছবিটি পরিচালনা করবেন বলে জানা গেছে। এই চিত্রটি নির্মাণের জন্য কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য কোন অনুরোধ করেননি বলেও জানা গেছে।

• • •

নিউ-ইণ্ডিয়া পিকচার্সের 'পাড়ি' ছবির কয়েকটি বিশেষ দৃশ্যের শুটিং সম্প্রতি পলাশীতে সম্পন্ন হয়েছে। এই 'পাড়ি' ছবিটিই হবে প্রথম বাংলা ছবি যাতে বোম্বাইয়ের দুই জন-প্রিয় অভিনেতা, দিলীপকুমার ও ধর্মেন্দ্রকে অভিনয়াংশে দেখা যাবে।

এই চিত্রটি পরিচালনা ও সুরযোজনা করছেন সলীল চৌধুরী।

• • •

উত্তমকুমার ফিল্মসের শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে নির্মীয়মান 'পুরদাহ' ছবিখানির মুখ্য ভূমিকালিপিতে বড় রকমের একটি পরিবর্তন ঘটেছে।

এই চিত্রের মহিম, অচলা ও সুরেশের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য যথাক্রমে উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বদলে ওই ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন বাংলা ও বোম্বাইয়ের জনপ্রিয় নট প্রদীপকুমার।

• • •

চারুচিত্রের বায়বহুল ইষ্টম্যান কলারের হিন্দী ছবি-খানির নামকরণ করা হয়েছে 'মমতা'। ডঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তর বাংলা সফল চিত্র 'উত্তর ফাল্গুনী'র এই হিন্দীরূপে মাতা ও কন্যার দ্বৈত-ভূমিকায় অভিনয় করছেন এই চিত্রেই অভিনয়ের জন্য মস্কো চিত্রোৎসবে (১৯৬২) সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর গৌরবে ভূষিতা সুচিত্রা সেন। প্রখ্যাত অভিনেতা অশোককুমার ও ধর্মেন্দ্র এই চিত্রের অপর দুটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে।

• • •

টেক্‌নো ফিচার্স :

এ-বছরের কান্ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ১২ই মে শুরু হয়ে ২৭ তারিখ পর্যন্ত চলবে। ২৬টি দেশের ছবি এই উৎসবে দেখানো হবে। ভারত থেকে সরকারী-ভাবে তপন সিংহ-কৃত 'আরোহী' ছবিটি পাঠানোর চেষ্টা চলছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ইতিপূর্বে ভারতের ছবি হিসাবে ওখানে সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা' পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু ছবিটি ওই উৎসবে দেখানো হচ্ছে না বলে জানা গেল।

কম্যুনিষ্ট চীনের একটি ছবি এই উৎসবের চিত্র তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কান্ চলচ্চিত্র উৎসবে কম্যুনিস্ট চীনের এই প্রথম যোগদান।

• • •

বার্লিন্ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভারত থেকে দু'খানি কাহিনী-চিত্র পাঠানো হবে বলে জানা যাচ্ছে। ছবি দুটি হচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের 'কাপুরুষ' এবং সুনীল দত্ত-কৃত পরীক্ষামূলক হিন্দী চিত্র 'ইয়াদে'। পঁচিশে জুন এই চলচ্চিত্র উৎসব আরম্ভ হবে।

• • •

মহাকবি শেক্সপীয়রের 'কমেডি অব এরর' নাটকটিকে হিন্দী ছবিতে রূপদানের পরিকল্পনা করেছেন প্রখ্যাত প্রযোজক-পরিচালক বিমল রায়। 'কমেডি অব এরর'-এর হিন্দীরূপের নামকরণ করা হয়েছে 'দো দুনি চার'।

এই ছবির দুই মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন কিশোর-কুমার ও অসিত সেন। দুজনই এই চিত্রে দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করবেন।

সম্পাদনা : শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা :

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ১৯৬৫ সালের ৩৩তম জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে পাঞ্জাব ৩—০ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত করেছে : পাঞ্জাবের পক্ষে এই নিয়ে ৪বার হয়। সেমি-ফাইনালে পাঞ্জাব ২—১ গোলে গত দু'বছরের রানার্স-আপ সার্ভিসেস দলকে পরাজিত করেছিল এবং অন্যদিকের সেমি-ফাইনালে বোম্বাই ১—০ গোলে গত দু'বছরের (১৯৬৩-৬৪) রঙ্গদাবী কাপ বিজয়ী রেলওয়ে দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছিল। বাংলা কোয়ার্টার-ফাইনালের দ্বিতীয় দিনের খেলায় ০—১ গোলে সার্ভিসেস দলের কাছে পরাজিত হয়েছিল। প্রথম দিন এই খেলাটি গোলশূন্য ছিল।

অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ :

কিংস্টনের সাবিনা পার্কে অনুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম টেস্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১৭২ রানে জয়ী হয়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেটে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের এই প্রথম জয় এবং দুই দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত ২১টি টেস্টে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের এই চতুর্থ জয়।

চতুর্থ দিনে ৩৭৩ রানের মাথায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ হলে খেলায় জয়লাভের জন্যে অস্ট্রেলিয়ার ৩২৬ রানের প্রয়োজন হয় এবং হাতে ছিল পর্যাপ্ত সময়—পুরো দু'দিনের খেলা। কিন্তু পঞ্চম দিনেই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়—২১৬ রানের মাথায় অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ হয়।

সোবার্সের বিশ্বরেকর্ড :

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ফিলপটকে আউট করলে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর মত উইকেট পূর্ণ হয়; ফলে তিনিই সর্বপ্রথম সরকারী টেস্ট খেলায় ৩০০০ রান এবং ১০০ উইকেট পাওয়ার বিশ্বরেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। আলোচ্য প্রথম টেস্ট খেলার শেষে টেস্টে তাঁর পরিসংখ্যান দাঁড়ায় : ৬৮টি টেস্ট খেলায় মোট ৪১৫৪ রান, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নট আউট ৩৬৫ (বিশ্বরেকর্ড), সেঞ্চুরী ১৪টি এবং ৩৪২৭ রানে ১০০ উইকেট।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ২৩৯ রান (টনি হোয়াইট নট আউট ৫১, কনরাড হাণ্ট ৪১ রান। লরী মেইন ৪৩ রানে ৪ উইকেট) ও ৩৭৩ রান (হাণ্ট ৮১, জো সোলমন ৭৬ এবং ষেবিল বুচার ৭১ রান। মেইন ৫৬ রানে ৪ এবং ফিলপট ১০৯ রানে ৪ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ২১৭ রান (নীল হক নটআউট ৪৬ এবং নর্ম্যান ও'নীল ৪০ রান। হল ৬০ রানে ৫ উইকেট) ও ২১৬ রান (ব্রায়ান বুথ ৫৬ রান। হল ৪৫ রানে ৪ উইকেট)। দ্বিতীয় টেস্ট :

পোর্ট অব্ স্পেনে প্রখ্যাত কুইন্স পার্ক ওভালে

অনুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়া-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা ড্র যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ৪২৯ রান (বেসিল বুচার ১১৭, কনরাড হাণ্ট ৮৯, গারফিল্ড সোবার্স ৬৯ এবং ব্রায়ান ডেভিস ৫৪ রান। ও'নীল ৪১ রানে ৪ এবং ম্যাথেজী ৯৪ রানে ২ উইকেট)

ও ৩৮৬ রান (ডেভিস ৫৮, হাণ্ট ৫৩ এবং কানহাই ৫৩। ফিলপট ৫৭ রানে ৩, সিম্পসন ৮৩ রানে ৩ এবং হক ৪২ রানে ২ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ৫১৬ রান (বব কাউপার ১৪৩, ব্রায়ান বুথ ১১৭ এবং জি টমাস ৬১ রান। গ্রিফিথ ৮১ রানে ৩, সোবার্স ৭৫ রানে ৩ এবং হল ১০৪ রানে ২ উইকেট)

পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যাণ্ড :

প্রথম টেস্ট :

রাওয়ালপিণ্ডিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান-নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম টেস্ট খেলায় পাকিস্তান এক ইনিংস ও ৬৬ রানে জয়ী হয়। নির্দিষ্ট চারিদিন পর্য্যন্ত খেলা গড়ায়নি, তৃতীয় দিনেই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

নিউজিল্যাণ্ড : ১৭৫ রান (ব্রুস টেলর ৭৬ রান। সাজ্জাদ ৪২ রানে ৪ উইকেট) ও ৭৯ রান (সিনক্লেয়ার ২১ রান। সাজ্জাদ ৫ রানে ৪ উইকেট)

পাকিস্তান : ৩১৮ রান (সৈয়দ আহমেদ ৬৮, ইলাহেস মহম্মদ ৫৬ এবং আসিফ ইকবাল ৫১ রান। টেলর ৩৮ ও, রীড ৭৬ রানে ৩ এবং কলিন্স ৩৭ রানে ২ উইকেট)

অক্সফোর্ড বনাম কেম্ব্রিজ :

অক্সফোর্ড বনাম কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১১তম বার্ষিক বাইচ প্রতিযোগিতায় (১৯৬৫ সাল) অক্সফোর্ড চার লেংথে গত বছরের (১৯৬৪) বিজয়ী কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করে।

এই ঐতিহাসিক বাইচ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে ১৮২৯ সালে। দুটি মহাযুদ্ধের দরুণ কয়েক বছর প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল। বর্ত্তমানে ফলাফল দাঁড়িয়েছে : কেম্ব্রিজের জয় ৬১ বার এবং অক্সফোর্ডের জয় ৫৯ বার এবং একবার 'ডেডহিট অর্থাৎ ফলাফল অমীমাংসিত(১৮৭৭)

রঞ্জি ট্রফি ফাইনাল :

১৯৬৪-৬৫ সালের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাই এক ইনিংস ও ১২৬ রানে হায়দ্রাবাদকে পরাজিত ক'রে উপর্য্যুপরি সাত বছর রঞ্জি ট্রফি জয়ের রেকর্ড করেছে। এই নিয়ে বোম্বাই মোট ১৬ বার রঞ্জি ট্রফি পেল ; সর্ব্বাধিক বার ট্রফি জয়ের রেকর্ডও বোম্বাইয়ের।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

বোম্বাই : ৫২৬ রান (বাপু নাদকার্ণি ১২৩, দিলীপ সরদেশাই ৭৯, ফারুক ইঞ্জিনীয়ার ৭১, অজিত ওয়াদেকার ৭৬ এবং এম ভি মোরে ৫৭ রান। আবিদ আলী ১৫২ রানে ৩, জয়রাম ১৪০ রানে ৩ এবং আব্বাস আলী বেগ ২৬ রানে ৩ উইকেট)

হায়দ্রাবাদ : ২৩৫ রান (ওয়াহিদ ইয়ার খাঁ ৭৮ রান। বালু গুপ্তে ৬২ রানে ৫ এবং নাদকার্ণী ৩৯ রানে ২ উইকেট) ও ২৩৪ রান (হাবিব আমেদ ৬৬ রান। দেশাই ৩০ রানে ৩ এবং হার্দিকার ৪০ রানে ২ উইকেট)

দ্বিতীয় টেস্ট :

লাহোরে অনুষ্ঠিত নিউজিল্যাণ্ড পাকিস্তানের দ্বিতীয় টেস্ট অমীমাংসিত থেকে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান : ৫৮৭ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। হানিফ মহম্মদ নটআউট ২০৩ এবং মজিদ জাহাঙ্গীর ৮০ রান। কায়েম্বন ২০ রানে ৬ উইকেট)

ও ১৯৯ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। মজিদ জাহাঙ্গীর ৪৪ এবং আসিফ ইকবাল ৬৩ রান। কায়েম্বন ১৫ রানে ২, সিনক্লেয়ার ৩২ রানে ২ এবং মাটস্কিক ৩৮ রানে ১ উইকেট)

নিউজিল্যাণ্ড : ৪৮২ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। বেরী সিনক্লেয়ার ১৩০, রীড ৮৮, ডাউলিং ৮৩, ডাভিস ৫৫ এবং মর্গান ৫০ রান। ফারুক ৭১ রানে ২ উইকেট)

ডেভিস কাপ :

১৯৬৪ সালের আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের দ্বিতীয় রাউণ্ডে ভারতবর্ষ ৫—০ খেলায় কলম্বোকে এবং 'বি' গ্রুপের ফাইনালে ৩ • খেলায় ভিয়েৎনামকে পরাজিত ক'রে পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনালে জাপানের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

তৃতীয় টেষ্ট :

করাচীর তৃতীয় অর্থাৎ শেষ টেস্টে পাকিস্তান ৮ উইকেটে নিউজিল্যাণ্ডকে পরাজিত ক'রে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৬২ সালের টেস্ট সিরিজে ২-০ খেলায় (ড্র ১) 'রাবার' জয়ী হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

নিউজিল্যাণ্ড : ২৮১ রান (জন রীড ১২৮ রান। আশিফ ইকবাল ৩২ রানে ৩ এবং ইন্তিখাব আলম ৫৩ রানে ৩ উইকেট) ও ২২৩ রান (রীড ৭৬ এবং কাউন্স ৫৭ রান। ইন্তিখাব ৩৯ রানে ৬ উইকেট)

পাকিস্তান : ৩০৭ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। নৈয়দ আবেদ ১১২ রান। মজ ৩১ রানে ২ উইকেট) ও ২০২ রান (২ উইকেটে। মহম্মদ ইলাহেস ১২৬ রান)

তৃতীয় টেষ্ট :

ডক্ক টাউনের তৃতীয় টেস্টে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ২১২ রানে অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত ক'রে ২—০ খেলায় (ড্র ১) অগ্রগামী হয়েছে। এখনো দুটো টেস্ট বাকি।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ৫৪৫ (রোহন কানহাই ৮৯, বেসিল বুচার ১৯ এবং গারফিল্ড সোবার্স ৬৪ রান। নীল হক ৭২ রানে ৬ উইকেট)

ও ১৮০ রান (সোবার্স ৬২ রান। হক ৪৩ রানে ৬ এবং ম্যিলমট ৪৯ রানে ৩ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া : ১৭৮ রান (কাউপার ৭১ রান। গিবস ৭১ রানে ৩, সোবার্স ৩৮ রানে ২ এবং হল ৪৩ রানে ২ উইকেট।

ও ১৬৬ রান (কাউপার ৫০ রান। গিবস ২৯ রানে ৬ এবং সোবার্স ৪০ রানে ২ উইকেট)

বিশ্বটেবিল টেনিস :

২৮তম বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় মোট সাতটি খেতাব এশিয়া মহাদেশের দুই দেশ জাপান এবং প্রজাতন্ত্রী চীন ভাগাভাগি ক'রে নিয়েছে ; প্রজাতন্ত্রী চীন পেয়েছে পাঁচটি এবং জাপান পেয়েছে দুটি খেতাব। প্রজাতন্ত্রী চীন পুরুষ এবং মহিলাদের দলগত বিভাগের পুরস্কার সোয়েথলিং এবং কোবিলোন কাপ জয়ী হয়েছে। এই ভাবে একই বছরে এই দুটি কাপ ইতিপূর্বে পেয়েছে মাত্র দুটি দেশ—আমেরিকা একবার (১৯৩৭ সালে) এবং জাপান তিনবার (১৯৫৪, ১৯৫৭ ও ১৯৫৯ সালে)।

ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনাল

পুরুষদের সিঙ্গলস : গত দু'বারের বিজয়ী চুয়াং সে-তুং (প্রজাতন্ত্রী চীন) ২১-১৮, ১৪ ২১, ২৩-২১, ১৯-২১, ও ২১-১৫ পয়েন্টে গত দু'বারের রানার-আপ লি দু-দুংকে (প্রজাতন্ত্রী চীন) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : নাওোকো ফু-কাদু (জাপান) ২১-১২, ২১-১৭, ১৪-২১, ১৩-২১ ও ২২-১৬ পয়েন্টে লিন হুই-চিংকে (প্রজাতন্ত্রী চীন) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : চুয়াং সে-তুং এবং এইচ ইনসেং (প্রজাতন্ত্রী চীন) ২১-১৫, ২১-১৩ ও ২১-১২ পয়েন্টে গতবারের (১৯৬০) বিজয়ী চ্যাং শি-লিন এবং ওয়াং চিহলিয়াংকে (প্রজাতন্ত্রী চীন) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : লিন য়ু-চিং এবং চেং মিন-চীন (প্রজাতন্ত্রী চীন) ২১-১৫, ৬-২১, ২১-১১, ১৬-২১ ও ২১-১৯ পয়েন্টে গতবারের (১৯৬১) বিজয়ী মাসাকো পেকী এবং নোবিকো ইয়ামানাকাকে (জাপান) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : কোজি কিমুরা এবং মাসাকো পেকী (জাপান) ২১-১৩, ১৮ ২১, ২১-২৩, ২১-১২ ও ২১-১৮ পয়েন্টে চ্যাং শি-লিন এবং লিন হুই-চিংকে (প্রজাতন্ত্রী চীন) পরাজিত করেন।

দলগত বিভাগের ফাইনাল

পুরুষ বিভাগ (সোয়েথলিং কাপ) : প্রজাতন্ত্রী চীন ৫-২ খেলায় জাপানকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি তৃতীয়বার সোয়েথলিং কাপ জয়ী হয়েছে।

মহিলা বিভাগ (করবিলন কাপ) : প্রজাতন্ত্রী চীন ৩—০ খেলায় গত চারবারের (উপর্যুপরি) করবিলন কাপ বিজয়ী জাপানকে পরাজিত করে।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ১৩।৫।৬৫ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সকল ঋতুর সৌন্দর্য্য প্রসাধন

হিমানী

স্নো

নিয়মিত ব্যবহারে আপনার ... উঠবে। চামড়ার মসৃণতা ভাব নষ্ট হবে, ... যে কোন ... মনোরম হয়ে উঠবে।

এই জনপ্রিয় স্নো এখন থেকে বড় সাইজে (ডিলুক্স সাইজ) ও নতুন ডিজাইনের সুন্দর কার্টুনে বাজারে পাবেন।

হিমানী প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-২

Price—Single Copy—Re. 1/25. Subscriptions—Annual—Rs. 15/-. Half-yearly—Rs. 7/50.

—নূতন প্রকাশিত চারখানি বই—

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পিপাসা

[illegible] মধুকর তরুণ অধ্যাপক—আর বিদিশা একজন কলেজ-পড়া ছাত্রী। অনেক মিল, কাছুক আর মেধাবী—কিন্তু বিদিশা মুখরা, নির্ভীক আর উগ্র আধুনিকা। তারপর কবির ভাষায় ব'লতে গেলে—"না জানি কী করিয়া ছিলেন চাঁদ সেথা, কী ছিল বিধাতার মনে!" এর পরে যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হ'ল, তা কক্ষচ্যুত উল্কার মত টেনে নিলে দু'জনকে জীবনের দু'প্রান্তে। কিন্তু তাদের কলঙ্ক-কালির রক্তেও কি বিদিশারই যৌবনের উত্তাপ?

দাম—৩'২৫

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

শতীশঙ্কর উপাখ্যান

শতীশঙ্কর রায়ের সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলে। কেউ বলে, তিনি ছিলেন পরোপকারী, পরের জন্যে অনেক কিছু করেছেন, বাড়ির চাকরকে অফিসের বেয়ারা ক'রে দিয়েছেন। কেউ বলে তিনি ছিলেন একজন ডাকাত, পরের ধন লুটেপুটে খাওয়াটাই ছিল তাঁর কাজ। লোকে তাঁকে ভয় ক'রতো যেন সাপ বা বাঘের চেয়েও বেশি। আবার কেউ বলে মেয়েদের নিয়ে তিনি অনেক ঘাঁটা-ঘাঁটি ক'রেছেন—ব'লতে গেলে একেবারে পোকা ছিলেন।

উৎপলের কাছে শতীশঙ্কর এক বিষম সমস্যা। কার কথা শুনে সে তাঁর জীবনী লিখবে? যে লোক প্রথম জীবনে দেশের জন্যে জেল খেটেছেন, পরবর্তী জীবনে অধিষ্ঠিত হ'য়েছেন যশ ও প্রতিষ্ঠার উচ্চ আসনে, তিনি আবার সহসা আততায়ীর হস্তে নিহতই বা হ'লেন কেন? এই "কেন" সম্বন্ধে তাঁর সুন্দরী তরুণী বিধবা স্ত্রী-ই বা বলেন কি? দাম—পাঁচ টাকা

শক্তিপদ রাজগুরুর

জীবন-কাহিনী

মানুষের জীবনে সমস্যাও যেমন—কৌতুকও তত কম নয়। এই সমস্যা ও কৌতুকের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্যে গড়ে ওঠা দু'টি ভাগ্য-বিড়ম্বিত যুবক-যুবতীর মধুর প্রেমের কাহিনী।

ছায়াচিত্রে রূপায়িত।

দাম—৪'৫০

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

মজার মজার খেলা

বিজ্ঞানের নানা রকম কল-কৌশলের সাহায্যে মজাদার খেলা দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত করার মত বই। দেখা ও খেলার কাজ একই সঙ্গে চ'লবে।

কিশোরদিকে উপহার দেওয়ার পরম উপযোগী।

নূতন ধরনের সাইজ। অসংখ্য ছবিতে ভরপুর।

দাম—৩

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

REG. NO. C. 679—BHARATVARSHA. 21 MAY 1965 APRIL 1965.

ভারতবর্ষ

দ্বিজেন্দ্র লাল রায়
প্রতিষ্ঠিত

জ্যৈষ্ঠ

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY

১৩৭২

৫২-তম বর্ষ
দ্বিতীয় খণ্ড
১ম সংখ্যা

সবার সেরা
কোলে
বিস্কুট, লজেন্স ও টফি
KOLAY
THIN ARROWROOT BISCUIT
Glucose
KOLAY TOFFEE

হলা পিয় সহি--

হলা পিয় সহি

তালতমালের তপোবনে নয়,

মৃগশাবকের আদরে আহ্লাদে নয়

—গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে

এ কালের বরবর্ণিনী শকুন্তলা আজও

'হলা পিয় সহি।' 'হলা পিয় সহি।' ব'লে

সঙ্গিনীদের খুঁজছে সৌন্দর্যের বরণডালায়

আজ তার না হলেই নয়

বোরো ক্রীম

সকল কাজে সবার সাজে

বোরোলীন

বোরোলীন হাউস,— কলিকাতা-৩

পুষ্পপল্লব

চিত্র—দীপক চন্দ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY.

জ্যৈষ্ঠ—১৩৭২

দ্বিতীয় খণ্ড | দ্বিপঞ্চাশত্তম বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

হিন্দুধর্ম ও দর্শন ঃ স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীকমলানন্দ ভট্টাচার্য

১৮৯৬ সালে নিউইয়র্ক সহরে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু-ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে কয়েকটি ভাষণ দেন। সেই ভাষণ কয়টিতে তিনি সাংখ্য, বৈত, বৈতাবৈত ও অবৈতমতের ব্যাখ্যা করেন। সেই সকল ব্যাখ্যা অতীব মনোরম। ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

"আমাদের এই জগৎ—এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ—এই জগৎ যাহার তত্ত্ব আমরা যুক্তি ও বুদ্ধিবলে বুঝিতে পারি—উহার উভয় দিকেই অনন্ত। উভয় দিকেই অজ্ঞেয়, চির-অজ্ঞাত বিরাজমান। যে জ্ঞানালোকে জগতে ধর্ম নামে পরিচিত, তাহার তত্ত্ব এই জগতেই অনুসন্ধান করিতে হয়, যে সকল বিষয়ের আলোচনায় মন শান্ত হয়, সেগুলি এই জগতেরই ঘটনা। স্বরূপতঃ কিন্তু ধর্ম অতীন্দ্রিয় ভূমির অধিকারভুক্ত, ইন্দ্রিয় রাজ্যের নহে। উহা সর্বপ্রকার যুক্তিরও অতীত; সুতরাং উহা যুক্তির রাজ্যেরও অধিকারভুক্ত নহে। উহা নিত্য দর্শন স্বরূপ, উহা মানব-মনে ঈশ্বরীয় অলৌকিক প্রভাব স্বরূপ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়ের সমুদ্রে কল্পপ্রধান, উহাতে অজ্ঞেয়কে জ্ঞাত অপেক্ষা, আমাদের অধিক পরিচিত করিয়া দেয়, কারণ উহা কখন জ্ঞাত হইতে পারে না। আমার বিশ্বাস, মানব-সমাজের প্রারম্ভ হইতেই মানব-মনে এই ধর্মতত্ত্বের

অনুসন্ধান চলিয়াছে। জগতের ইতিহাসে এমন সময় কখনই হয় নাই, যখন মানব-যুক্তি ও মানব-বুদ্ধি এই জগতের পারের বস্তুর চরম অনুসন্ধান, উহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা না করিয়াছে।

ধর্ম মানুষের ভিতর হইতেই উৎপন্ন; উহা বাহিরের কিছু হইতে হয় নাই। আমার বিশ্বাস ধর্মচিন্তা মানবের প্রকৃতিগত; উহা মানুষের স্বভাবের সহিত এমন অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত যে যতদিন না সে নিজ দেহমনকে ত্যাগ করিতে পারে, ততদিন তাহার পক্ষে ধর্ম ত্যাগ অসম্ভব। যতদিন মানবের চিন্তাশক্তি থাকিবে, ততদিন এই চেষ্টাও চলিবে এবং ততদিন কোন না কোন আকারে তাহার ধর্ম থাকিবেই থাকিবে। এই জন্যেই আমরা নানা প্রকারের ধর্ম দেখিতে পাই।

ধর্ম প্রচুর অন্নপানে নাই, অথবা সুরম্য হর্ম্যেও নাই। বারম্বার ধর্মের বিরুদ্ধে আপনারা এই আপত্তি শুনিতে পাইবেন, ধর্মের দ্বারা কি উপকার হইতে পারে? ইহা কি দরিদ্রের দারিদ্র্য দূর করিতে পারে? মনে করুন, উহা যেন পারে না, তাহা হইলে কি ধর্ম অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল? মনে করুন আপনি একটি জ্যোতিষিক সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন—একটি শিশু দাঁড়াইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসিল, ইহাতে কি মিঠাই পাওয়া যায়? আপনি উত্তর দিলেন—না, ইহাতে মিঠাই পাওয়া যায় না। তখন শিশুটি বলিয়া উঠিল, 'তবে উহা কোন কাজের নয়। শিশুরা তাহাদের নিজেদের দৃষ্টি হইতে অর্থাৎ কোন জিনিষে কত মিঠাই পাওয়া যায় এই হিসাবে সমগ্র জগৎকে বিচার করিয়া থাকে। যাহারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন বলিয়া শিশুসদৃশ, জগতে সেই সকল শিশুদের বিচারও তদ্রূপ। নিম্ন জিনিসের দৃষ্টিতে উচ্চতর জিনিসের বিচার করা কখনই কর্তব্য নহে। প্রত্যেক বিষয়েই নিজ নিজ ওজনে বিচার করিতে হইবে। অনন্তকে অনন্তের ওজনে বিচার করিতে হইবে। ধর্ম মানব-জীবনের সর্বাংশ, শুধু বর্তমান নহে, ভূত ভবিষ্যৎ—বর্তমান—সর্বাংশে ব্যাপী। অতএব ইহা অনন্ত আত্মা ও অনন্ত ঈশ্বরের ভিতর অনন্ত সম্বন্ধস্বরূপ। অতএব ক্ষণিক মানব জীবনের উপর উহার কার্য দেখিয়া উহার মূল্য বিচার করা কি ন্যায় সঙ্গত?"

সাংখ্য ধর্ম ও দর্শনের বিকাশ কিভাবে হইয়াছিল তাহা বুঝাইয়া তিনি কপিল দর্শনের ব্যাখ্যা করেন—"বেদ ও উপনিষদে আমরা হিন্দুদের অতি প্রাচীনতম ধর্মভাবের কয়েকটির বর্ণনা পাইয়া থাকি। আর মহর্ষি কপিল খুব প্রাচীন বটে, কিন্তু এই সকল ভাব তাঁহা হইতেও প্রাচীনতর। কপিলের সাংখ্যদর্শন তদুদ্ভাবিত নূতন মতবাদ বিশেষ নহে। তাঁহার সময় ধর্ম সম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত ছিল, তিনি নিজের অপূর্ব প্রতিভাবলে তাহা হইতে একটি যুক্তিসঙ্গত ও সামঞ্জস্যময় প্রণালী গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। এই কপিল দর্শনই জগতের মধ্যে যুক্তি বিচার দ্বারা জগৎতত্ত্ব ব্যাখ্যার সর্বপ্রথম চেষ্টা।

সাংখ্য দর্শনের মতে প্রকৃতি হইতেই চিন্তা, বুদ্ধি, বিচার, রাগ, দ্বেষ, স্পর্শ, রস—এক কথায় সমুদয় বিকাশ হইতেছে। এই প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক তিন প্রকার উপাদানে গঠিত। এই গুলি গুণ নহে, জগতের উপাদান কারণ—এই গুলি হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইতেছে আর যুগ প্রারম্ভে এই গুলি সাম্যাবস্থায় থাকে। সৃষ্টি আরম্ভ হইলেই এই সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হয়, তখন এই দ্রব্যগুলি পরস্পর নানারূপ মিলিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে। ইহাদের প্রথম বিকাশকে সাংখ্যেরা মহৎ (অর্থাৎ সর্বব্যাপী বুদ্ধি) বলেন। আর তাহা হইতে অহংজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। অহংজ্ঞান হইতে মন অর্থাৎ সর্বব্যাপী মনস্তত্ত্বের উদ্ভব হয়। ঐ অহংজ্ঞান বা অহঙ্কার হইতেই জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয় এবং তন্মাত্রা অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রস প্রভৃতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণুর উৎপত্তি হয়। এই অহঙ্কার হইতেই সমুদয় সূক্ষ্ম পরমাণুর উদ্ভব, আর ঐ সূক্ষ্ম পরমাণু সমূহ হইতেই স্থূলপরমাণু সকলের উৎপত্তি—যাহাদিগকে আমরা অনুভব ও ইন্দ্রিয় গোচর করিতে পারি। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন এই ত্রিবিধ কার্যসম্বলিত চিত্ত, প্রাণ নামক শক্তি সমূহকে সৃষ্টি করিয়া উহাদিগকে পরিচালিত করিতেছে।

কপিলের প্রধান মত পরিণাম। তিনি বলেন, এক বস্তু অপর বস্তুর পরিণাম বা বিকার স্বরূপ, কারণ তাঁহার মতে কার্য কারণ ভাবের লক্ষণ এই যে—কার্য অন্যরূপে পরিণত কারণ মাত্র; আর যেহেতু আমরা যতদূর দেখিতে

পাইতেছি, তাহাতে সমগ্র জগৎই ক্রমাগত পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড নিশ্চিত কোন উপাদান হইতে অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণামে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং উহার কারণ হইতে স্বরূপতঃ কখন বিভিন্ন হইতে পারে না, কেবল যখন উহা বিশিষ্ট আকার ধারণ করে তখন উহা সীমাবিশিষ্ট হয়। ঐ উপাদানটি স্বয়ং নিরাকার। কিন্তু কপিলের মতে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে বৈষম্য প্রাপ্তির শেষ সোপান পর্যন্ত কোনটিই পুরুষ অর্থাৎ ভোক্তা বা প্রকাশকের সহিত সমান নহে। একটা কাদার তাল যেমন সমষ্টিও তদ্রূপ সমগ্র জগৎও সেইরূপ। স্বরূপতঃ উহাদের চৈতন্য নাই, কিন্তু উহাদের মধ্যে আমরা বিচার-বুদ্ধি ও জ্ঞান দেখিতে পাই, অতএব উহাদের পশ্চাতে—সমগ্র প্রকৃতির পশ্চাতে—নিশ্চিত এমন কোন সত্তা আছে যাহার আলোক উহার উপর পড়িয়া, মহৎ, অহংজ্ঞান ও এই সব নানা বস্তুরূপে প্রতীত হইতেছে। আর এই সত্তাকেই কপিল পুরুষ বা আত্মা বলেন, বেদান্তীরাও উহাকে আত্মা বলিয়া থাকেন। কপিলের মতে পুরুষ অমিশ্র পদার্থ—উহা যৌগিক পদার্থ নহে। উহাই একমাত্র অজ্ঞাত পদার্থ, আর সমুদয় প্রপঞ্চবিকারই জড়। পুরুষই একমাত্র জ্ঞাতা। পুরুষই ভোক্তা, ভোক্তা, সত্তা, যথার্থ সিংহাসনোপবিষ্ট রাজা, মানবের আত্মা আর তিনি অজড়। যেহেতু তিনি অজড়, সেহেতু তিনি অবশ্যই অনন্ত, তাঁহার কোন সীমা থাকিতে পারে না। সুতরাং ঐ পুরুষগণের প্রত্যেকেই সর্বব্যাপী, তবে কেবল সূক্ষ্ম ও স্থূল জড় পদার্থের দ্বারা দিয়া কার্য করিতে পারেন। মন অহংজ্ঞান মস্তিষ্ককেন্দ্র বা ইন্দ্রিয় গণ এবং প্রাণ এই কয়েকটি লইয়া সূক্ষ্ম শরীর অথবা খৃষ্টীয় দর্শনে যাহাকে মানবের আধ্যাত্মিকদেহ বলে তাহা গঠিত। এই দেহেরই পুরস্কার বা দণ্ড হয়, ইহাই বিভিন্ন স্বর্গে যাইয়া থাকে। ইহারই বার বার জন্ম হয়। কারণ আমরা দেখিয়াছি পুরুষ বা আত্মার পক্ষে আসা যাওয়া অসম্ভব। গতি অর্থে যাওয়া আসা, আর যাহা এক স্থান হইতে অপর স্থানে গমন করে, তাহা কখন সর্বব্যাপী হইতে পারে না, এই লিঙ্গ শরীর বা সূক্ষ্ম শরীরই আসে যায়। এই পর্যন্ত আমরা কপিলের দর্শন হইতে দেখিলাম যে, আত্মা অনন্ত আর একমাত্র উহাই প্রকৃতির পরিণাম নহে। একমাত্র উহাই প্রকৃতির বাহিরে, কিন্তু প্রকৃতিতে বদ্ধ হইয়া আছে বলিয়া প্রতীত হইতেছে। প্রকৃতি পুরুষকে বেড়িয়া আছে, সেই জন্য পুরুষ আপনাকে প্রকৃতির সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিয়াছেন। পুরুষ ভাবিতেছেন, আমি লিঙ্গ শরীর। আমি স্থূল শরীর। আর সেই জন্যই তিনি সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুখ দুঃখ আত্মার নহে, উহা লিঙ্গ শরীরের ও স্থূল শরীরের। আত্মার সুখ দুঃখ কিছুই নাই, উহা সকল বিষয়ের সাক্ষিস্বরূপ যাহা কিছু হইতেছে, তাহারই নিত্য সাক্ষিস্বরূপ, পরিণাম উহা কোন কর্মের কোনরূপ ফল গ্রহণ করে না।

তারপর সাংখ্যেরা আরও বলেন যে, প্রকৃতির এই সকল বিকার আত্মার জন্য, উহার বিভিন্ন উপাদানের সন্নিবেশাদি সমস্তই উহা হইতে স্বতন্ত্র, অপর কাহারও জন্য। সুতরাং এই যে নানাবিধ মিশ্রণকে আমরা প্রকৃতি বা জগৎপ্রপঞ্চ বলি—এই যে আমাদের ভিতরে এবং চতুর্দিকে ক্রমাগত পরিবর্তন পরম্পরা হইতেছে, তাহা আত্মার ভোগ ও অপবর্গ বা মুক্তির জন্য। আত্মা সর্বনিম্ন অবস্থা হইতে সর্বোচ্চ অবস্থা পর্যন্ত স্বয়ং ভোগ করিয়া তাহা হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারেন। আর যখন আত্মা এই অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, তিনি কোনকালেই প্রকৃতিতে বদ্ধ ছিলেন না, তিনি সর্বদাই উহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন—তখন তিনি আরও দেখিতে পান যে, তিনি অবিনাশী, তাঁহার আসা যাওয়া নাই, স্বর্গে যাওয়া আবার এখানে আসিয়া জন্মান—সমুদয়ই প্রকৃতির, তাঁহার নিজের নহে। তখনই আত্মা মুক্ত হইয়া যান। এই রূপে সমুদয় প্রকৃতি আত্মার ভোগ বা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য কার্য করিয়া যাইতেছে। আর আত্মা সেই চরম লক্ষ্যে যাইবার জন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছেন। আর মুক্তিই এই চরম লক্ষ্য। সাংখ্য দর্শনের মতে এই আত্মার সংখ্যা বহু। অনন্তসংখ্যক আত্মা রহিয়াছেন। উহার আর একটি সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বর নাই, জগতের সৃষ্টিকর্তা কেহ নাই। সাংখ্যেরা বলেন, প্রকৃতিই যখন এই সকল বিভিন্ন রূপ সৃজন করিতে সমর্থ, তখন ঈশ্বর স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই।"

স্বামীজী বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিলেন : বেদান্তদর্শনের মতে প্রকৃতি দুইটি বস্তুতে গঠিত—

একটিকে তাঁহারা আকাশ বলেন, ইহা অতি সূক্ষ্ম জড়, আর অপরটিকে তাঁহারা প্রাণ বলেন। আকাশের ন্যায় প্রাণও সর্বব্যাপী, সর্ববস্তুতে অনুস্যূত। আকাশ যেন জলের মত, আর জগতে আর যাহা কিছু আছে সমুদয়ই বরফখণ্ডের ন্যায়, ঐগুলি হইতে উৎপন্ন হইয়া জলেই ভাসিতেছে, আর প্রাণই সেই শক্তি—যাহা আকাশকে এই বিভিন্নরূপে পরিণত করিতেছে।

লক্ষ লক্ষ প্রকার আকারে বিভিন্ন এই সমগ্র প্রকৃতি ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ ও নিরাকার এবং তিনি নিয়মরূপে এই প্রকৃতিকে পরিচালিত করিতেছেন। সমগ্র প্রকৃতিই তাঁহার শাসনাধীনে রহিয়াছে। কোন প্রাণীর স্বাধীনতা নাই, তাহা থাকিতেই পারেনা। ইহাই বৈতবাদাত্মক বেদান্তের উপদেশ।

এই মানবদেহেই মানুষ উন্নতি সাধনের বিশেষ সুযোগ পায়। এই মানবদেহকে কর্মদেহ বলে, এই মানবদেহেই আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট স্থির করিয়া থাকি। আমরা একটি বৃহৎ বৃত্তাকারে ভ্রমণ করিতেছি, আর মানব দেহই সেই বৃত্তের মধ্যে এক বিন্দু, যেখানে আমাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা স্থির হয়। এই কারণেই অন্যান্য সংপ্রকার দেহ অপেক্ষা মানবদেহই শ্রেষ্ঠতম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। মানব দেবগণ হইতেও শ্রেষ্ঠতর। দেবগণও মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। বৈত বেদান্ত এ পর্যন্ত বলেন।

তারপর—যাঁহার মতে ঈশ্বর, আত্মা ও প্রকৃতি আছেন, আর আত্মা ও প্রকৃতি ঈশ্বরের দেহস্বরূপ—আর ঐ তিনে মিলিয়া এক—ইহাকে বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত বলে।

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মত অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদী —'ঈশ্বর আত্মা স্বরূপ আর জগৎ যেন তাঁহার দেহস্বরূপ আর সেই দেহের পরিণাম হইতেছে—ইহা স্বীকার করেন না।

অদ্বৈতবাদী বলেন, তিনি কোন কালেই বদ্ধ হন নাই, তিনি নিত্য মুক্ত। এই যে সব ধারণা, যে—আমি অপূর্ণ, আমি নর, আমি নারী, আমি পাপী, আমি মন, আমি চিন্তা করিয়াছি, আমি চিন্তা করিব—এই সমুদয়ই ভ্রমমাত্র। আপনি কোন কালে দেহ ছিলেন না, আপনি কোন কালে অপূর্ণ ছিলেন না। আপনি এই ব্রহ্মাণ্ডের আনন্দময় প্রভু। যাহা কিছু আছে বা হইবে, আপনি তৎসমুদয়ের সর্বশক্তিমান নিয়ন্তা—এই সূর্য চন্দ্র তারা পৃথিবী উদ্ভিদ এই আমাদের জগতের প্রত্যেক অংশের মহান শাস্তা। আপনার শক্তিতেই সূর্য কিরণ দিতেছে, তারাগণ তাহাদের প্রভা বিকীরণ করিতেছে, পৃথিবী সুন্দর হইয়াছে। আপনার আনন্দের শক্তিতেই সকলে পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিতেছে ও পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। আপনি সকলের মধ্যে রহিয়াছেন, আপনিই সর্বস্বরূপ। কাহাকে ত্যাগ করিবেন, কাহাকেই বা গ্রহণ করিবেন? আপনিই সমুদয়। যখন এই জ্ঞানের উদয় হয়, তখন মায়া মোহ তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যায়।

মৃত্যুর দ্বারে, ঘোরতর বিপদে, রণক্ষেত্রে, সমুদ্রতলে, উচ্চতম পর্বত শিখরে, গভীরতম অরণ্যে যেখানেই পড়ুন না কেন, সর্বদা আপনি বলিতে থাকুন,—আমিই সেই-আমিই সেই। দিবারাত্রি বলিতে থাকুন—আমিই সেই। ইহা শ্রেষ্ঠতম ভেরের পরিচয়, ইহাই ধর্ম।

আমার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। আমার পিতাও নাই, মাতাও নাই; আমার শত্রুও নাই, মিত্রও নাই, কারণ তাহারা সকলেই আমি। আমিই আমার বন্ধু, আমিই আমার শত্রু, আমিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ; আমিই সেই, আমিই সেই।

ন মে মৃত্যুশঙ্কা, ন মে জাতিভেদঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধু র্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যঃ
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।

(নির্বাণ ষটক)

কখনই বলিবেন না, হে প্রভো, আমি অতি অধম পাপী। কে আপনাকে সাহায্য করিবে? আপনি জগতের সাহায্য কর্তা। আপনি জগতের ঈশ্বর—আপনি আবার কোথায় সাহায্য অন্বেষণ করিবেন? যাহা কিছু পাইয়াছেন, আপনার নিজের নিকট ব্যতীত আর কাহারও নিকট পান নাই। আপনি প্রার্থনা করিয়া যাহার উত্তর পাইয়াছেন, অজ্ঞতাবশতঃ আপনি মনে করিয়াছেন, অপর কোন পুরুষ তাহার উত্তর দিয়াছে, কিন্তু অজ্ঞাত

মাঝে আপনি স্বয়ংই সেই প্রার্থনার উত্তর দিয়াছেন। আপনার বাহিরে আপনার সাহায্য কর্তা কেহ নাই—আপনিই জগতের স্রষ্টা।"

স্বামী বিবেকানন্দ যে অমিত-তেজের, অসীম-বিক্রমের অধিকারী ছিলেন, অদ্বৈত মতের সাধনায় সিদ্ধিই যে তাঁহাকে সেই তেজের অধিকারী করিয়াছিল, উপরোক্ত ভাষণ থেকেই তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যাইবে।

তিনি অদ্বৈত মতের সাধনার প্রণালীও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—বিশ্লেষণ করিয়াছেন—শ্রবণ, মনন, নিদি-ধ্যাসনের পদ্ধতি অদ্বৈতজ্ঞান লাভের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। ইহা মুক্তফল ভোগ, বিরাগ, শম ও তিতিক্ষার ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। উপদেশ করিয়াছেন :—

পৃথিবীকে ধ্যান করিতে থাকুন, পৃথিবীকে চিন্তা করুন, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভাবুন যে পৃথিবীতে যাহা আছে, আমাদের দেহেও তাহাই আছে। চিন্তাবলে পৃথিবী ও দেহে এক করিয়া ফেলুন আর দেহ আত্মার সহিত পৃথিবীর অন্তাভ্যন্তরবর্তী আত্মার অভিন্নভাব সাধন করুন। বায়ুকে বায়ুর অভ্যন্তরবর্তী আত্মার সহিত অভিন্নভাবে চিন্তা করুন। এইরূপে এই সকল ধ্যান করিতে হয়। এই সবই এক, বিভিন্নভাবে প্রকাশ পাইতেছে মাত্র।

এই ক্ষুদ্র জগতের সুখ দুঃখ গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন কেন? যদি সাহস থাকে, উহাদের বাহিরে চলিয়া যান। সমুদয় নিয়মের বাহিরে চলিয়া যান, সমগ্র জগৎ উড়িয়া যাক, আপনি একলা আসিয়া দাঁড়ান। আমি নিরপেক্ষ সত্তা, নিরপেক্ষ জ্ঞান ও নিরপেক্ষ আনন্দস্বরূপ—সোঽহং, সোঽহম্।"

একটি সঙ্গীত *

শিশির মুখোপাধ্যায়

শস্যক্ষেত্রে হাইল্যাণ্ডবাসী
একটি বালিকা একা
শস্য কাটিতে, গান গাহিতেও
যায় তারে দেখা দেখা।
একাকিনী কাটে শস্য বালিকা
সারি সারি বাঁধে আঁটি
কণ্ঠে ধ্বনিত করুন গানের
সুরের মূর্চ্ছনাটি।
আরব মরুর ছায়াঘেরা ঐ
শীতল মরুদ্যানে
শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন
যাত্রীগণের কানে,
কোনদিন কোন নাইটিঙ্গেল
পাখী শোনায় নি তান
এমন মধুর কণ্ঠে গায়নি
কভু আগমনী গান।
বসন্ত যখন এসে পড়ে তার
আপন মহিমা নিয়ে
তখন বিশাল মহাসাগরের
স্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে,
দূর হতে দূরে অতি দূরে ঐ
সাগরের দ্বীপপুঞ্জে
এমন মিষ্টি সুরে কোনদিন
কোকিলও ওঠেনি গুঞ্জে।
জানিনা কি গান গাহিছে বালিকা
অর্থটা তার বুঝিনি
হয়ত বা সেই বিগত দিনের
বেদনার কোন কাহিনী
কিম্বা কোন সে যুদ্ধের কথা
ঝরিছে গীতি ধারায়
অথবা এমন ব্যাপার ঘটেছে
ঘটনা পরম্পরায়।
বালিকার সেই গানের অর্থ
যাই হোক না কেন
শুধু মনে হয় তার সে গানের
শেষ নেই বুঝি যেন।
কাস্তেটা হাতে নীচু হয়ে সে
কাজ করে অবিশ্রাম
আপন মনে সে গুণ গুণ করে
গায় গান অবিরাম।
তার সে মোহন সুর ঝংকার
অন্তর মাঝে নিয়ে
পাথরের পরে পথ বেয়ে আমি
চলে যাই এগিয়ে।
বহুদিন পর শুনি সেই সুর
সে সুরের ইঙ্গিত
কানের মধ্যে বেজে ওঠে সেই
অশ্রুত সঙ্গীত।

* William wordsworth রচিত The "Solitary Reaper" কবিতার রূপান্তর।

সূর্যাস্তের রং

শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী

"জামাইবাবু এসেছে, জামাইবাবু এসেছে"—কে একজন চীৎকার করতে করতে বাড়ির ভেতর ছুটে গেল, দোতলায় দেখা দিল বিনতার প্রত্যাশাভরা গভীর কালো চোখ দুটি, তার দু' পাশে ফোটা ফুলের মতো দুটি ছেলে-মেয়ে।

চোখাচোখি হতেই হাসির খিলিক খেলে গেল বিনতার দু'চোখে,পড়ি কি মরি করে ছুটে আসা কাছ বিছু, সুবীরের হাত দুটো চেপে ধরে ঝুলতে থাকে। ততক্ষণে দোতলার সবগুলি জানালাতেই দেখা দিয়েছে অনেকগুলি কাঁচা, ডাঁসা আর পুরন্ত মুখ,—কেউ চেনা, কেউ বা অচেনা।

কাড়াকাড়ি করে কাছ ছিনিয়ে নিল সুবীরের ছোটো সুটকেশটা, বিছু অগত্যা তার কাঁধে থেকে ঝোলাটা টেনে নিয়ে দাদার আগেই মার কাছে পৌঁছে যাবার জন্ম প্রাণ-পণে ছুটল।

দশ ঘণ্টার ট্রেণ জার্নির ক্লান্তি, হাওড়া ষ্টেশনে ট্যাক্সি পাবার দুর্ভোগ—সব কিছু মিলিয়ে গেল সুবীরের মন থেকে, নহবত মঞ্চটির দিকে একবার তাকিয়ে ভেতরে যাবার জন্ম পা বাড়াল।

দোতলায় পৌঁছে সামনে বিনতাকে দেখতে পেয়ে সুবীর বলল,—"সুরেন কোথায় ?"

মুখ টিপে হেসে বিনতা বলে,—"তোমাকে আনতে, ষ্টেশনে—"

"সে কি ! আমি তো দেখলাম না তাকে—"

"তা হলে বোধ হয় বালী গেছে—"

"বালী হঠাৎ ?"

"বা, অনিন্দিতা আছে না ওখানে ? বালি-গার্লস্ স্কুলের পাশেই তো ওর কোয়ার্টার্স—"

"ও, তা মা কোথায় ?

"ঐ তো, রান্নাঘরে—"

বিনতার মা হেমলতা তখন রান্নাঘরে বাঁধুনীকে মাছ-গুলো কড়া করে ভেজেছে বলে বকাবকা করছিলেন, সুবীর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে।

রসরসে ভরা মনে চট করে বাৎসল্যরস আনতে পারেন না হেমলতা, গলা তাঁর তেমনি উচ্চগ্রামেই থাকে, কোনোমতে রুক্ষতাটুকু বাঁচিয়ে বলেন,—"বেঁচে থাকো বাবা, শরীর ভালো তো তোমার ?"

"হ্যাঁ, আপনি কেমন আছেন মা ?"

"আমার আর ভালোমন্দ, যাও বাবা, ঘরে গিয়ে বোসো—" বলে তিনি আবার বাঁধুনীকে নিয়ে পড়লেন।

বিয়ে বাড়ি।

বারান্দা, ঘর সব গিসগিস করছে লোকে। কোত্থেকে একটি মেয়ে এসে টিপ করে প্রণাম করে বলল,—"কী জামাইবাবু, চিনতে পারেন ?"

তথী যুবতীর কূলে কূলে ভরা শরীরের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামায় সুবীর। আঁট-সাঁট, বাঁধুনী, আঁচলটা মোটা করে বুকের ওপর ফেলে রাখলেও দুবার যৌবনকে ঢাকা দিয়ে রাখতে পারে নি।

চিনতে না পেরে আমতা আমতা করতে থাকে সুবীর।

পাশে দাঁড়ানো বিনতা ঝংকার দিয়ে বলে ওঠে,—"ওমা, ওকে চিনলে না ? ও যে মাকুল,—আমার চিনি-মাসীর ছোটো মেয়ে, ভিনসুকিয়াতে থাকে, বি-এ পড়ে। ময়মনসিংএর বাসায় পানের ভেতর আরশোলা ভরে তোমাকে খেতে দিয়েছিল, মনে নেই ?"

একমুখ হেসে তার কাঁধে হাত দিয়ে সুবীর বলে,—"ও,

তাই বলো, তুমি মাকুন্দ? কী করে চিনবো বলো? দিলে গুটিপোকা, আর এখন হয়েছো প্রজাপতি—

চিনি মাসী আর আড়ালে থাকেন না, সুমুখে এসে দাঁড়ান। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে সুবীর।

বিনতার কুচি মাসী এসে বলেন,—"ওমা, জামাই যে ধুলো পায়ে দাঁড়িয়ে রইল। কী যে তোদের আক্কেল বাপু, এই চিনু, মিনু, মাকুন্দ,—যা, তোদের জামাইবাবুকে ঘরে নিয়ে বসা, চা-টা দে—"

তিনটি বালিকা সুবীরের হাত ধরে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে যায়।

হৈ-চৈ হাঁক ডাকে ঝিয়ে বাড়ি মুখর। তবলার বোলের মতো বাচ্চাদের দৌড়-ঝাঁপের দড়ু দড়ু দুদ্দুর শব্দ যেন বাড়িটার ভিত পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। বীণার মীড়ের মতো কিশোরীদের গলার গুঞ্জন আর সেতারের ঝংকারের মতো, যুবতীদের সম্মিলিত কলহাস্যে অনন্ত সরকার লেনের এই বুড়ি থুথুরি বাড়িটায় যৌবন যেন ফিরে এসেছে,—যেন শীতের শেষে বসন্ত এসে দেখা দিয়েছে।

সন্ধ্যার মুখে অনিন্দিতাকে নিয়ে সুরেন ফিরল। মিষ্টি শেষ করে সবে চা-এর পেয়ালায় হাতলের ফাঁকে আঙুল গলিয়েছে সুবীর, ঘরে ঢুকেই অনিন্দিতা বলে,—"জামাই-বাবু যে,—কখন এলেন?"

চোখ তুলে তাকালো সুবীর। এক বছরে আরও লম্বা, আরও দীর্ঘ হয়েছে অনিন্দিতা, তখন যে ক্লান্তির ছাপের আভার মাত্র দেখেছিল আজ তা-ই তার সারা মুখে পরিব্যাপ্ত।

কয়েক সেকেণ্ড সুবীরের চোখে চোখ রেখে চোখ নামিয়ে নেয় অনিন্দিতা, নীচু গলায় ক্লান্ত পাখির কূজনের মতো স্বরে বলে,—"কি, কথাই বলছেন না যে, চিনতে কষ্ট হচ্ছে?"

পেয়ালায় একটা লম্বা চুমুক দিয়ে সুবীর বলে,—"তা, একটু হচ্ছে বৈ কি—"

"কেন? আরও রোগা হয়েছি বলে?"

"শুধু রোগা হওয়ার জন্যই নয়, তোমার মুখে একটা মায়াবিনী—মায়াবিনী—ছাপ পড়েছে বলে—"

"উঁহু—"

"না না, উঁহু-ফিহু নয়, সত্যি বলছি। শরীরটাকে যে একেবারে আমের ছিবড়ে করে তুলেছে,—কতো করে বললাম যে একটা শীত কানপুরে এসে কাটিয়ে যাও, মনও ভালো হবে, শরীরও সারবে, এমন কি"—বলে থেমে যায় সুবীর।

"এমন কি—কী? বলুন, থামলেন কেন?"

গলা নামিয়ে সুবীর বলে—"এমন কি একটি বরও জুটিয়ে দিতাম—"

"যান—" বলে ঈষৎ রেগে উঠে সেখান থেকে বারান্দার ছিটকে সরে যায় অনিন্দিতা।

সেখানে রাঙাপিসি গ্রেপ্তার করেন তাকে,—"কিরে অনি, কখন এলি?"

ঘর থেকে সুবীর শুনতে পায় অনিন্দিতার নিষ্পাপ গলা,—"এই একটু আগে রাঙাপিসি,—বড়ো পিসি কোথায়?

"ঐ তো রান্নাঘরে,—জামাইর জন্য নিজের হাতে পায়েস রান্না করতে বসেছে—"

সুরেন ঘরে ঢোকে, বিয়ের আনন্দে তার চোখের নীচে গাঢ় হয়ে কালি জমেছে।

ভাবী পত্নী সম্বন্ধে নানা মুখরোচক তথ্য পরিবেশন করতে থাকে সুরেন, মন দিয়ে শুনতে চেষ্টা করে সুবীর, কিন্তু তার অবাধ্য মন বার বার অনিন্দিতার পেছনে পেছনে ছোটে। কতো কথাই মনে ভেসে আসে!

বিয়ের পর বিনতা বেশ কিছুদিন তার মামা ডক্টর শশীকান্ত চৌধুরীর কাছে রাজশাহীতে ছিল। কাজে কাজেই চাকা ইউনিভার্সিটির বিশাচত্বরায় সুবীর সান্তালকে প্রায়ই ছুটতে হত সেখানে।

ঘোড়ামারার কাছে বেশ একটা বড়ো বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন ডক্টর চৌধুরী, কাছেই বরদাসুন্দরী কলেজে অধ্যাপনা করতেন তিনি। অনিন্দিতা তাঁরই মেয়ে।

সুবীরের বিয়ের সময়ে অনিন্দিতা ছিল চতুর্দশী। কথা বলত কম, তার সেটা পুষিয়ে নিত গভীর কালো চোখ দুটির সবাক দৃষ্টি দিয়ে। ওর অভিমান ছিল খুব বেশী। কথায় কথায় না খেয়ে ঘরজার খিল দিয়ে শুয়ে পড়ত। কৌতুক অনুভব করত সুবীর।

শাশুড়ীর গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, তা ছাড়া অবসরও ছিল তাঁর কম। স্বামী চিরকগ্ন, বিছানার বাইরে তাঁকে দেখাই যেত না। বিনতার সঙ্গে গল্প করে করে ক্লান্ত সুধীর তখন অনিন্দিতার অন্বেষণে বেরিয়ে পড়তো। ক্লাস এইটের ছাত্রী অনিন্দিতা, হয়তো তখন ছাতের ছোট চিলেকুঠরীতে বসে একমনে ইতিহাসের সন তারিখ মুখস্থ করছে। পেছন থেকে গিয়ে তার চোখ চেপে ধরতো সুধীর, বিকৃত স্বরে খোনা গলায় বলতো—বলো তো আমি কে?

অনিন্দিতা কিছুই বলতো না, কিছুই করতো না, এমন কি ছটফট করে চোখ থেকে সুধীরের হাতটাও সরাবার চেষ্টা করত না। চুপ করে বসে থাকতো। শেষটায় হাল ছেড়ে, নিজে থেকেই হাত নামিয়ে নিত সুধীর, ওর পাশে বসে ওর লেখা বাংলা রচনার খাতাটা তুলে নিয়ে সুর করে পড়তে শুরু করতো—"বর্ষার ঘনঘটা যখন আকাশ ছাইয়া ফেলে তখন—"

ব্যাকুল হয়ে অনিন্দিতা ওর হাত চেপে ধরত, বলত, ···না, জামাইবাবু না—"

"কী না?"

"ও খাতা আপনি পড়তে পারবেন না—"

"কেন? এতো তোমার প্রেমপত্র নয় যে অন্যের পড়া নিষেধ—"

"না না,—আপনি খাতা দিন আগে। কই—দিন না—বারে—

তার চোখে জল আসবার আগেই খাতাটা দিয়ে দিত সুধীর।

হয়তো অপরাহ্নের শান্ত ছায়ায় তার শোবার ঘরে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে একটা গল্পের বই পড়ছে অনিন্দিতা, সুধীর এসে তার গা ঘেঁষে বসত, বলত,—"কী পড়ছ এমন একমনে, দেখি—"

কিন্তু দেখাবে না অনিন্দিতা, কিছুতেই না, বইখানা চোখের পলকে যে কোথায় লুকিয়ে ফেলত, অনেক হড়াহড়ি করেও তার হদিশ পেত না সুধীর।

তার মনোজগতের কোনো খবরই সুধীরকে জানতে না দেবার ব্যাপারে ঐ অতটুকু বয়সেই পরম পারদর্শিতা লাভ করেছিল অনিন্দিতা।

তাই বলে ঠাট্টা বিদ্রূপে কিছু কম যেত না অনিন্দিতা, সুধীরের অসংখ্য ঠাট্টা ইয়ার্কির উত্তরে এমন এক একটি মোক্ষম ব্যঙ্গ বিদ্রূপের তীর ছুঁড়ে মারত যে হেসে গড়িয়ে পড়ত বিনতা, বলতো,—"কেমন, হল তো? নাও, এবার কি জবাব দেবে দাও—

সন্ধ্যার দিকে সুধীর বিনতা আর অনিন্দিতা এক-সঙ্গে বেড়াতে বার হ'ত। এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরে শেষে পদ্মার ধারে এসে হাজির হ'ত। পদ্মার বিস্তীর্ণ জলরাশীর ওপারে সূর্যাস্ত হ'ত, বেগবান স্রোতে যেন লাল আবির ছড়িয়ে পড়ত, মেঘে মেঘে দিনাবসানের গভীর সুর অবিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছটায় আঁকা হয়ে যেত, তারপর কালো হয়ে আসা পদ্মার গভীর বুকে ভেসে যাওয়া নৌকার শুভ্র পালগুলো তাদের সাদা রং হারিয়ে কেমন ধূসর হয়ে উঠতো। চারদিক একটা করুণ বিষণ্ণতায় ছেয়ে যেত।

উঁচু পথ থেকে সরু পাড় চালু হয়ে নেমে গেছে নীচের দিকে, সেই চালু ঘাসে পাশাপাশি বসত ওরা,—মাঝে সুধীর, আর তার দু' দিকে বিনতা ও অনিন্দিতা। অনিন্দিতা চিরকালই রোগাটে, তবু স্বাভাবিক নিয়মে যৌবনের প্রথম ঢেউ লেগে ছলছল করত তার শরীর। সুধীরের পাশে বসে অন্ধকারে পদ্মার পাক খাওয়া তীব্র স্রোত দেখতে দেখতে নিজের মনের গভীরে ডুবে যেতো সে।

একদিনের কথা মনে পড়ে সুধীরের। খবর না দিয়ে হঠাৎ রাজশাহী গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল সে। উদ্দেশ্য ছিল বিনতাকে একেবারে চমকে দেবে। কিন্তু শাশুড়ীর বাড়ি পৌঁছে নিজেই চমকে উঠেছিল সুধীর। শাশুড়ী বা বিনতা কেউ বাড়িতে নেই, সবাই নাটোরে গেছে কোন এক আত্মীয়ের বিয়ে কি পৈতার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। বাড়িতে আছে শুধু অনিন্দিতা আর তার ছোটো ভাই আনন্দ।

প্রায় দু'বছর পরে এলো সুধীর, এই দুবছরে গায়ে মাথায় বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে অনিন্দিতা, তার শরীরে এসেছে যৌবনের জোয়ার।

হাত পা ধোবার জল এগিয়ে দিয়ে অনিন্দিতা মুখ টিপে হেসে বলেছিল,—"আহা, অতদূর থেকে এলেন, দিদিই নেই এখানে, সে দুঃখ রাখবার ঠাঁই পাচ্ছেন না বোধ হয়?"

"সে দুঃখে তো আজ রাত্রেই আমি সাতকাণ্ড বিনতায়ন রচনা করে ফেলব—"

"কিন্তু দিদি নেই বলে ভাববেন না যে আদর যত্নের কোনো অভাব হবে, আপনি আসার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দকে মাংস আনতে পাঠিয়েছি বাজারে—

মুচকি হেসে দুষ্টুমি করে সুবীর বলেছিল,—"শালিকা কি আর স্ত্রীর সবগুলো অভাব পূর্ণ করতে পারে অনি ?"

তেরছা চোখে তাকিয়ে সুবীর লক্ষ্য করেছিল যে অনিন্দিতার নাতিগৌর মুখখানা চোখের পলকে টকটকে লাল হয়ে গেল। সুপ্রযুক্ত কোনো জবাব দিতে পারে নি সে, শুধু সুবীরের গামছাটা তার গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে সেখান থেকে ছুটে পালিয়েছিল।

হৈ হৈ করে উঠেছিল সুবীর—আরে আরে পালাচ্ছ কোথায়, ওগো ছন্দনিপুণা মৃগনয়না সুবচনী,—এই কি তোমার আতিথেয়তার নমুনা ?"

কিন্তু অনিন্দিতা ততক্ষণে রান্না ঘরে বসে পাটা চেপে ধরেছে।

চা খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে সুবীর প্রশ্ন করেছিল—"তা তুমি ওদের সঙ্গে গেলে না যে অনিন্দিতা ?"

একটু হেসে অনিন্দিতা বলেছিল,—"দিদি আপনার চোখ দুটো এমনি ভাবেই বাঁধিয়ে দিয়েছে যে আমার কোনো কিছুই চোখে পড়ে না আপনার—

"কেন পড়বে না ? এই তো দিব্যি দেখতে পাচ্ছি তোমার যৌবন ভরা তরী খানি নিরাপদ বন্দরে ভিড়বার আশায় দিন গুনছে, ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা শেষ হলেই—"

"ঐ তরীই শুধু দেখতে থাকুন—তরীর হালের যে কী হাল হয়েছে তা চোখে পড়বে কেন ?"

"দেখ, হাল তো থাকবে জলের নীচে, তোমার জীবন তরীর মাঝিরই থাকবে শুধু তার দেখা শোনার ভার—আমি যেখানে অবাঞ্ছিত—"

"থাম, তাই বললাম বুঝি ? দেখছেন না কেমন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কতো কষ্টে হাঁটছি—"অনিন্দিতার মুখে যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠেছিল।

পরিহাসের রেশটা কেটে গেল, ব্যস্ত হয়ে সুবীর বলে উঠেছিল—তাই তো বলি মরাল গমনে ছন্দ পতন ঘটল কেন—কী হয়েছে তোমার পায়ে অনি ?"

"সে দিন কলঘরে পড়ে গিয়ে মুচকে গিয়েছে ডান পা-টা। দিদি থাকার দিনে তো ভালো করে হাঁটতেই পারছিলাম না—"

চট করে চেয়ার থেকে উঠে অনিন্দিতার প্রবল আপত্তি উপেক্ষা করে তার ডান পা-টা পরীক্ষা করে দেখেছিল সুবীর, বলেছিল—"তাই তো, এখনো বেশ ফুলে আছে দেখছি, উঁহুঁ, জামাইবাবুর না হয় একটু অনাদরই হবে, কিন্তু তোমাকে আর বিছানা থেকে উঠতে দিচ্ছি না আমি, ঐ ঠাকুরই যা হোক রান্না করে নেবে 'খন'—এখন চলো, তোমাকে দোতলার শোবার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি। না না, কোনো কথা আমি শুনব না, চলো এক্ষুণি চলো।"

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে অনিন্দিতার বেশ কষ্ট হচ্ছিল, লক্ষ্য করল সুবীর। হঠাৎ বিনা বাক্যব্যয়ে অনিন্দিতার লঘু দেহখানা পাঁজাকোলে তুলে নিল, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। প্রথমটায় ভয়ানক চমকে উঠেছিল অনিন্দিতা, তার পর রাঙা মুখে চোখ বুজে রইল।

সিঁড়ি বাওয়া শেষ হলে সুবীর লক্ষ্য করল যে গুরু পরিশ্রমে তার নাক দিয়ে যেমন ঝড়ের বেগে নিশ্বাস পড়ছে, তেমনি ঝড় বইছে অনিন্দিতার নাক দিয়ে, ওর টান হয়ে থাকা বুক ফুলে ফুলে উঠছে।

হঠাৎ একটা উন্মাদনায় সুবীরের শরীরের রক্ত চন্ চন্ করে উঠেছিল, অনিন্দিতাকে নামিয়ে দিয়েই ছুটে চলে গিয়েছিল নীচে।

সে রাতে আর দেখা হয়নি অনিন্দিতার সঙ্গে।

বিছানায় শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত ছটফট করেছিল সুবীর। অনিন্দিতার রক্তজমা মুখ, তার ভূধরসম বুকের সঘন উত্থান পতন, তার এলিয়ে থাকা হাত দুটি, পায়ের অনাবৃত অংশ তাকে উন্মনা করে রাখলো, স্বপ্নে এসে হানা দিল।

পরদিনই বিনতা, বিনতার মামা আর মামী এসে পড়লেন নাগৈর থেকে।

মুহূর্তের সেই দুর্বলতাটুকু কাটিয়ে নিতে বেশী দেরী হয়নি সুবীরের, হাসি ঠাট্টায় তেমনি মশগুল হয়ে রইল সে, কিন্তু অনিন্দিতার চলনে বলনে কেমন একটা সুদূর নির্লিপ্ততা দেখা দিল।

সুবীর ভাবলো যে যৌবনবতী শালিকাকে ও ভাবে

বুকের কাছে তুলে নেওয়াটাকে বুঝি অপরাধ বলে ভেবেছে অনিন্দিতা, তাই মনে মনে তাকে ক্ষমা করতে পারছে না।

এর কিছু দিন পরেই ভক্টরেট ডিগ্রী পেয়ে কানপুরে ভালো চাকরী জোগাড় করে সুবীর। বিনতাকে নিয়ে গেল সেখানে।

মাঝে মাঝে চিঠি পত্র লিখত অনিন্দিতা, লিখত তার দিদিকে। তার চিঠির শেষের দিকে "জামাইবাবু কেমন আছেন"র মধ্যে সীমিত হয়ে গেল সুবীর।

এরপর এলো দুঃখীদের কাল্পবৈশাখী। বাংলা দেশ ভেঙে দু টুকরো হল, ভারত স্বাধীন হল, রাজপাটের পাট তুলে দিয়ে সপরিবারে কলকাতায় চলে এলেন ভক্টর চৌধুরী। কলকাতার কলেজ থেকেই বি-এ পাশ করল অনিন্দিতা, পাশ করল বি-টি। সেই থেকেই বালী গার্লস্ স্কুলের শিক্ষিকা হয়ে আছে সে।

অনেক ভালো ভালো সম্বন্ধ এলেও বিয়ে করেনি অনিন্দিতা, বাপ মার সঙ্গে ঝগড়া করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে সে।

কতো ঘটনা, কতো কথা, কিন্তু কী আশ্চর্য! ভাবতে কতটুকু সময়ই বা লাগে।

অতীত থেকে মনটাকে ফিরিয়ে আনতে সুবীরের যেটুকু সময় লাগে, তার মধ্যে বিয়ে বাড়িতে আসা এক ঝলক মেয়ে পুরুষের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ শেষ করে সুবীর যে ঘরে বসেছিল সে ঘরে আবার পা দেয় অনিন্দিতা। সুবীরের কাছে ঘন হয়ে বসে পড়ে হাসিমুখে বলে,—"এবার আর ফাঁকি দিলে চলবে না কিন্তু জামাইবাবু, সব শালীদের নিয়ে বিয়েটার দেখাতে হবে একদিন—"

হাসীমুখে সুবীর বলে,—"আমি মন্ত্রী, কিন্তু এমন বিরাট তালিকাবাহিনী সামলে নিয়ে যাবার মতো সেনানী তো আমি নই অনি—"

সুরেন বলে ওঠে,—"শালীদের প্রতি পক্ষপাত চলবে না কিন্তু জামাইবাবু, এটা সাম্যের যুগ, তাপকথাও কিছু কালনা নয়—"

অনিন্দিতা বাঁকা চোখে সুরেনের দিকে তাকিয়ে বলে, "আহা, তুমি নতুন বৌএর আশেপাশে ঘুর ঘুর করবে, না আমাদের সঙ্গে বিয়েটার দেখবে শুনি? কোথায় আমরা সবাই বাড়ি থেকে চলে গিয়ে তোমাদের একটু সুবিধে করে দিচ্ছি—তা না—"

"তাখ অনি, ভালো হবে না বলছি—"

এমন সময়ে হেমলতা সেখানে এসে পড়ায় ভাই-বোনের যুদ্ধটা স্থগিত হয়ে গেল। তিনি বললেন,—"ওরে অনি, কাপড় ছেড়ে তুই একবার রান্নাঘরে চোক তো, বাঁধুনীর আবার হাত পুড়ে গেছে,—আমার হয়েছে যতো জ্বালা,—বাবা সুবীর তুমি চাকরটাকে নিয়ে খুব ভোরে উঠে তার-বাজার থেকে ফলকর্মে যা যা জিনিষ লাগবে তা কিনে নিয়ে এসো, কেমন? উঃ, এখনো সোনা-বা এসে পৌঁছুল না, কোনদিকে যে যাই—"

বিয়ে বাড়ির কাজের ভীড়ে হট্টগোলে আর নানা অনিয়মে কয়েকটা দিন যে কোন দিক দিয়ে কেটে গেল তা টেরই পাওয়া গেল না। বউ-ভাতের পরদিন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সুবীর।

আত্মীয় স্বজনের ভীড় কিছু কমেছে। ভেতালায় ঠিলে কুঠুরীটা বেশ নিরিবিলি। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর পানের ঘরে ঠোঁট রাঙা করে সিঁড়ি দিয়ে ছাতে উঠে গেল সুবীর।

ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে সুবীর বলে—"এ কী, অনিন্দিতা, তুমি এখানে? আমার আবিষ্কারটা এক-চেটিয়া নয় দেখছি—"

চিৎ হয়ে শুয়ে বুকের ওপর একখানা সিনেমা পত্রিকা সোজা করে ধরে এক মনে ছবি দেখছিল অনিন্দিতা, সুবীরের কণ্ঠস্বরে চমকে তাকায়, উঠে বসে, হাই তুলে আলস্য ভেঙে বলে,—কাল রাতে আদৌ ঘুমতে গিয়ে আর ঘুম হয়নি একদম, তাই ঘুমুতে এসেছি এখানে—"

"বাঃ, আমি যে এখানে শোবো বলে এলাম—"

ভঙ্গী করে অনিন্দিতা বলে,—"আর আমি যে অনেক্ষণ শুয়ে আছি, মধ্যিখানে তো আমার—"

"নির্ঘুঁচ স্বপ্ন কিন্তু আমার,—আর তারই জোরে এই—এই—এ-ই, শুয়ে পড়লাম আমি তোমার পাশে···ওকী, পালাচ্ছ কোথায়? এই অনি, শোনো শোনো—"

দোরগোড়ায় গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় অনিন্দিতা, বলে, "কী ?"

"এসো না, একটু গল্প করি, নিরিবিলিতে তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলি—"

অনেকক্ষণ ইতস্তত: করে অনিন্দিতা, একবার ছাদের দিকে তাকায়।

বাইরের কাঁ কাঁ রোদ প্রতিফলিত হয়ে অনিন্দিতার পাণ্ডুর মুখে পড়ে, তার টান-টান ভুরু দুটি চিকচিক করে ওঠে, ঘরের ভেতর কোমল অন্ধকার।

একটু দূরত্ব রেখে বিছানার প্রান্ত ঘেঁষে বসে অনিন্দিতা।

ডান হাতটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে সুবীর বলে,—"দাও, আঙুলগুলো মটকে দাও একবার—"

মুখ নীচু করে অল্প অল্প হাসে অনিন্দিতা, কিন্তু সুবীরের হাত ছোঁয় না—"

"কী হ'ল ? প্র্যাকটিস করে রাখা ভালো, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে—"

এবার সুবীরের হাতখানা তুলে নিয়ে আঙুলগুলো টেনে টেনে মট্ মট্ করে আওয়াজ তুলতে থাকে অনিন্দিতা, বলে,—"আমার প্র্যাক্‌টিসের দরকার নেই,—কোনো কাজে আসবে না—"

পাশ ফিরে শুয়ে অনিন্দিতার মুখে তাকিয়ে সুবীর বলে —কেন ? তোমার মনের বনভূমি কি কোনো পথিকের পদধ্বনিতে মুখর হয়নি এখনো ?

"না—"

"যাঃ, মিছে কথা—"

"না না সত্যি—"

"এতো বড়ো হয়েছ, এত দেশ ঘুরেছ, এত লোকের সঙ্গে মিশেছ, তবু বলছ যে কোনো পুরুষ তোমার মনে দাগ কাটতে পারে নি। আমাকে লজ্জা কি অনি, বলো তাহ'লে আমি যাই, এক বিয়েতে এসে আর একটা বিয়ের ঘটকালী করে যাই—"

"ঘটকালী করবার দরকার নেই, বরং বন্ধ করতে পারেন তো বলুন—"

"বন্ধ ! সে আবার কি কথা ?"

"বাবা এরি উঠে পড়ে লেগেছেন, নিরাপনপুর কার-খানার কোন এক ফোরম্যানের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করেছেন, এ বিয়ে ভেঙে দেবার ক্ষমতা আছে তো বলুন—"

"সে কি ! তুমি কি সত্যিই বিয়ে করতে চাওনা অনি ?

"না, সত্যিই চাই না—"

"চিরটা কালই কি স্কুল মাষ্টারী করে কাটাবে—"

"তা মন্দ কি ? এই তো ভালো, স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন জীবন—"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সুবীর, ঈষৎ উত্তেজনায় রং লাগা অনিন্দিতার মুখে তাকিয়ে কী যেন ভাবে। একটু ইতস্তত: করে বলে,—"আচ্ছা অনি, একটা কথা বলব ? রাগ করতে পারবে না কিন্তু—"

ভণিতা শুনে আরক্ত হয়ে ওঠে অনিন্দিতা, হয়তো সুবীর কি বলতে চায় তার একটা আঁচ পায়, তবু শান্ত সুরে বলে,—"ঠিক আছে বলুন—"

মুখ থেকে চোখ নামিয়ে তার দেহের বিলীয়মান যৌবনের শেষ ধারাটি লক্ষ্য করে সুবীর, দৃঢ় কণ্ঠে বলে,—"এখন তুমিও বেশ বড়ো হয়েছ, প্রচুর লেখাপড়া শিখেছ, আমিও প্রায় প্রৌঢ়ত্বের দুয়ারে হাজির হয়েছি। আচ্ছা সত্যি বলোতো, যা পাওনি তার জন্য মাঝে মাঝে তোমার মন হু হু করে ওঠে না ? সৃষ্টিধারা অব্যাহত রাখবার জন্য নর-নারীর মনে প্রকৃতি যে দুর্নিবার কামনার আগুন জেলে রেখেছে তার আঁচে তোমার মন পোড়ে না ?"

লাল টকটকে মুখে ঠোঁট দুটো শক্ত করে এঁটে অনিন্দিতা বলে,—"না—"

কনুইটা বালিসে ঠেস দিয়ে উঁচু হয়ে হাতের তালুতে গাল চেপে আধশোওয়া হয়ে সুবীর বলে,—"তোমার এই মুখের 'না'কে মনের "না" বলে মেনে নিতে পারছি না অনি। প্রকৃতি যে নিয়মের গণ্ডী বেঁধে দিয়েছে তার বাইরে কি করে যাবে তুমি ? বলো না অনি, গভীর রাত্রির স্তব্ধ প্রহরে কিংবা মৌদ্রোজ্জ্বল কোনো নির্জন দুপুরে পুরুষ সঙ্গের জন্য তোমার মনে ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা জাগে না ! আমার কাছে লুকিও না অনি, সত্যি করে বলো—"

হঠাৎ কোথা থেকে কী হয়ে যায়, সহসা সুবীরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনিন্দিতা, দুহাতে তাকে কঠিন বাঁধনে

হেসে কম্পমানে বলে ওঠে,—"জাগে জামাইবাবু, জাগে, কিন্তু তখন শুধু তোমাকেই মনে পড়ে, আর কাউকে নয়, আর কাউকে নয়—"

অনিন্দিতার দু' বাহুর কঠিন পেষণে সুধীরের দম বন্ধ হয়ে আসে। ঘটনার আকস্মিকতায় এমন চমকে ওঠে সে যে বাধা দেবার কি কোনো কথা বলবার সুযোগই পায় না। অনিন্দিতার বিপুল আবেগের আবর্তে পড়ে অভিভূত হয়ে যায় সে।

নিঃশব্দে কেটে যায় আবেগ মথিত কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর হঠাৎ যেন নিজেকে ফিরে পায় অনিন্দিতা, চোখের পলকে সুধীরকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, বিস্রস্ত বেশবাস ঠিক করতে করতে সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বিছানায় স্তব্ধভাবে শুয়ে শুয়ে সিঁড়িতে অনিন্দিতার দ্রুত বিলীয়মান পদশব্দ শুনতে পায় সুধীর।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে ছাতের কড়িকাঠের ওপর বিকেলের পড়ন্ত রোদটুকু দেখতে থাকে সে। একটু পরেই এই রোদটুকু মিলিয়ে যাবে, নেমে আসবে অন্ধকার,—শাশ্বত, সত্য, চিরন্তন।

তুমি আজো গান গাও

শ্রীসুধীরচন্দ্র বাগচী

চলে গেছ তবু ভাবের ভুবনে যুগে যুগে আছ কবি
দেশে দেশে মোরা নিতি নিতি তোমা নব নব রূপে লভি।
ব্যথা পেলে হিয়া সে ব্যথা ধরাতে তুমি আজো গান গাও
ভাষা খুঁজে মরে প্রণয়ী যখন তুমি তারে ভাষা দাও।
যবে সুন্দরে উপাসনা করে শিল্পী সাধক কবি
সেথা এনে দাও ভাব ও ভাষার আলোয় উজল ছবি।
যেদিকে তাকাই তব দেখা পাই ভাবের ভুবন ভরে
প্রাণে প্রাণে তব জীবনেরে দিলে সুন্দরতর ক'রে।
তব গানে কবি আপনারে জানে দেশে দেশে জনে জনে
আপন হিয়ার অজানা কাহিনী অকথিত বাণী শোনে।
কবি তুমি তাই বিশ্বজনের বিশ্বাসীর প্রিয়
বিশ্বের হিয়া তোমারে লভিয়া হ'তে চায় আত্মীয়।
আত্মীয় মোরা তরুলতা হ'তে বিপুলা বসুন্ধরা
মহাসঙ্গীতে জাগে স্পন্দন—তব গানে দিল ধরা।
তব গানে তাই মিলেছে সবাই কেহ রহে নাই দূরে
মহামানবের মিলন রাগিণী বাজে বিচিত্র সুরে।
জানি না যে কবে কোন শৈশবে হে কবি তোমার গানে
আমার হিয়ার নির্ঝর জাগে সঙ্গীতে কলতানে
আকাশ বাতাস আলোক ভূলোক তরুলতা ফুল পাখী
গানে গানে তব হে মহাশিল্পী রঙে রঙে দিলে আঁকি।
বিশ্বপ্রকৃতি হল বাঙ্ময় আমারি কাব্যলোকে
রূপে রসে ভাষা বর্ণে গন্ধে ধরা দিল মোর চোখে।
গানে গানে তব হৃদয় আমার ছন্দে ছন্দে ধায়
বিশ্বের সাথে মহাসঙ্গীতে বিশ্বকবির পায়।

ভয় থেকে তব অভয় মাঝে

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

বিশ্বকবি তাঁর এক জন্মদিনে গান করেছিলেন 'ভয় থেকে তব অভয় মাঝে নবীন জন্ম দাও হে।' ভয় মানুষের নিত্য সহচর। ভয় জয় করার সাধনাও মানুষের নিত্য।

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্য মেতৎ পশুভির্নরাণাম্। (ভর্তৃপ্রকাশ) আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন মনুষ্য পশু সকলেরই স্বাভাবিক ক্রিয়া। ভয় মানুষের জন্মের পরে ধরিত্রীর বুকে প্রথম উপলব্ধ অনুভূতি। ভয় আর দুশ্চিন্তা মানুষের বংশপরম্পরাগত ব্যাধি। অবশ্য ভয় মাত্রকেই ব্যাধি বলা চলে না। কারণ ভয়ের প্রবৃত্তি আমাদের রক্তের ধারায় বয়ে এসেছে আমাদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই। বাঘ দেখলে অন্য সব প্রাণী ভয় পায়,—ভয় পেয়ে তারা পালায়, তারা রক্ষা পায়। আত্মরক্ষার নিমিত্ত মানুষের পক্ষেও একান্ত প্রয়োজনীয় প্রক্ষোভ (emotion)। ভয় মানুষকে সাবধান করে দেয় বিপদের মুখে। সে হয়ত পলায়ন করে বাঘের মুখ থেকে, অথবা বন্দুক নিয়ে এগিয়ে আসে, বাঘকে সে হত্যা করে। ডারুইনের মত অনুযায়ী ভয় যে দৈহিক পরিবর্তনাদির সৃষ্টি করে তার কারণ হচ্ছে আদিম মানবের কাছে অবস্থার উপযোগী দৈহিক ক্রিয়া। ভয়ের সময় এড্রিন্যাল গ্রন্থি থেকে এড্রিনেলিন প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত হয়। তাতে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায়। রক্ত সঞ্চালন বেড়ে যায়। অধিক পরিশ্রমেও অবসাদ আসে না। ভয় হলেই যে পলায়নের বা প্রতিরোধের প্রবৃত্তি জাগে, তাতে সাহায্য করে এই রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি। ভয়ে আমরা এমন জোরে দৌড়াতে পারি—স্পোর্টিংএর বেসে তত জোরে দৌড়ান সম্ভব হয় না। বিপরীতক্রমে যদি প্রতিরোধের সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ ক্রোধ আসে তবে বাঘের সঙ্গে সংগ্রাম করার শক্তিও আসে। অবশ্যই বাঘের সঙ্গে সংগ্রাম করার মত অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হাতে থাকা চাই। নইলে ভয়ের প্রক্ষোভ আমাদের পালিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতেই বাধ্য করবে।

ভয় মানুষকে পীড়িত করে তুলে—যদি যুক্তি বিচারের ক্ষমতাকে হারিয়ে যায়। হৃৎস্পন্দন হঠাৎ বন্ধ হয়ে পড়ে বা দ্রুত হয়। চোখের তারা বড় হয়। শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত বইতে থাকে। পাকস্থলীর ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, গলা শুকিয়ে যায়, অনেক সময় মলমূত্রের বেগ আসে। শীতল ঘাম দেখা দেয়। যুক্তি বিচার-বিরহিত ভয় রোগস্বরূপ। দুশ্চিন্তা-বায়ু সেই ভয় থেকেই জন্মে। মনোবৈজ্ঞানিক ষ্টানলী হল অনেক রকমের ভয়ের বর্ণনা করেছেন। অন্ধকারের ভয়, মুক্ত বায়ু, মুক্ত স্থান, বিড়াল, চড়ুই, সাপ, ইঁদুর, বজ্র, রক্ত, তীক্ষ্ণাগ্র, আবদ্ধ স্থান, ভিড়, পুল পার হওয়া, জল পথে ভ্রমণ, সমুদ্র ভ্রমণ প্রভৃতি কত রকমের ভয়ে মানুষ কষ্ট পায়। কারণ কিছু নেই জেনেও ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকে কতজন। যুক্তি বিচারের সঙ্গে যোগ থাকে না বলেই ভয় রোগ সৃষ্টি করে। গোলাবরয় বাজপেয়ী ভয়ের অনিষ্টকারিতা বর্ণনা করেছেন—

"ভয় মানব শরীরে মারাত্মক ব্যাধির সৃষ্টি করিয়া থাকে। যদি আপনি শ্মশানের চিতাভস্ম হাতে করিয়া দিব্যচক্ষুর দ্বারা দেখেন, দেখিবেন অধিকাংশ ভস্মকণার সহিত ভয়ের কৃত নিদারুণ পূর্বক পৈশাচিক অট্টহাস্য করিতেছে।

ভয় আমার জীবনের সুখ, সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য ও মানসিক শক্তিগুলিকে ক্ষুধার্ত রাক্ষসের ন্যায় গ্রাস করিয়া থাকে। উহা আমার অন্তরে শঙ্কা, দ্বেষ ও প্রতিশোধ বহ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া দেয়। বিবেকের বীরত্ব রক্তের ন্যায় শোষণ করিয়া ফেলে। হায়, হায়—আজ সংসারে কোটী কোটী ব্যক্তিকে স্বর্ণময় সিংহাসনে দেখা যাইত, যদি উহাদের মনে ভয়ের কৃত আশ্রয় না লইত। জীবন পরিপূর্ণ করিতে অনেক

ব্যক্তি এই কারণে অকৃতকার্য হইয়া গিয়াছেন। প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে সুদর্শন চক্রের ন্যায় ভয়ের ভয় তাঁহাদের অন্তর মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিল।

ভয়, জীবনে তীব্র বিষের ন্যায়। ইহা মনুষ্য জাতির প্রেম সম্বন্ধে বাধা উপস্থিত করে। আমাদিগের সমস্ত শক্তি হরণ করিয়া লয়। সফলতার পথে অসফলতার কণ্টক বিছাইয়া দেয় এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব চূর্ণ করিয়া আমাদের সুদর্শনীয় জীবন পঙ্গিল করিয়া তোলে, ইহার কুসংসর্গে পড়িয়া মানব লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাগ্যাধীন বন্দীর দশা প্রাপ্ত হয়, যে বন্দী মৃত্যুকে আহ্বান করে, মৃত্যুও শিহরিয়া তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়—"

গোলাপরত্নবাবু ভয়ের বিষ নিয়ে যে কবিত্ব করেছেন তাতে বাড়াবাড়ি আছে বটে, কিন্তু এ কথা সত্য যে ভয় থেকে যে দুশ্চিন্তা বায়ু জন্ম নেয়, তা মানুষকে ভয়ঙ্কর কষ্ট দেয়। তার উপর দুশ্চিন্তা-রোগ থেকে মুক্তি লাভ করা সহজ ব্যাপার নয়। মনীষী হ্যাভেলক দুশ্চিন্তা রোগের হেতু হিসাবে অসম্পূর্ণ সঙ্গমকে (coitas interruptus) দায়ী করেছেন। তিনি চিকিৎসকদের উপদেশ দিয়েছেন, দুশ্চিন্তা রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে যেন তাঁরা রোগীর সঙ্গম-বিকৃতির ইতিহাস আছে কিনা তার খবর নেন। কারণ তিনি অসংখ্য ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছেন যৌন বিকৃতি দূরীকরণের সঙ্গে সঙ্গে দুশ্চিন্তারোগ দূর হয়েছে। তাঁর মতে স্বাভাবিক দেহমিলন যেখানে যত বিস্তৃত, দুশ্চিন্তা বায়ু-রোগের সম্ভাবনা সেখানে তত বেশী।

ভয় আর দুশ্চিন্তা দূর করার জন্যে মনুষ্য মাত্রের সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য। কারণ ভয় আমাদের জীবন বিকাশে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। স্বাভাবিক জীবন যাপন, আর যুক্তি বিচার মেনে চলার মধ্যে তাকে জয় করার মন্ত্র নিহিত। গোলাপ-রত্নবাবু এ বিষয়ে যে উপদেশ দিয়েছেন তা সকলের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করছি:—

"আপনি নির্ভীকতার সাধনা করিতে থাকুন। ভয় হইতে জ্ঞান শুষ্ক নির্বল হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। যদি আপনি ভয়ে শঙ্কিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমোদ-প্রমোদে নিজেকে নিমগ্ন রাখিতে চেষ্টা করিবেন। আগামী-কল্য দুঃখ আসিবে বলিয়া দুশ্চিন্তায় বিমর্ষ হইয়া অদ্যকার মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিয়া দেওয়া মূর্খতা ভিন্ন কিছুই নয়।

ইহা সত্য যে মানব শক্তিতে দৈব শক্তির প্রকাশ। দৈবশক্তির বলে সংসার সৃষ্টি ও লয় প্রাপ্ত হইতেছে। মানব যদি এই দৈবশক্তি ভালরূপে জ্ঞাত হইতে পারে, তাহা হইলে সে সৃষ্টি ও সংহার দুই করিতে পারে। আমা-দিগের অন্তরে যে ভয়ের সংকীর্ণতা ও ব্যর্থতা রহিয়াছে, তাহার বিনাশ সাধন করিবার ক্ষমতা আমাদেরই হাতে রহিয়াছে, কেননা আমরা অমরত্বের অধিকারী। হীন হইয়া থাকিবার জন্য জগতে জন্মগ্রহণ করি নাই।"

ভয় দূর করবার অমোঘ ঔষধ ব্রহ্মচিন্তা। ব্রহ্মচিন্তায়, পরম শিবের চিন্তায় যদি মনকে জগদাত্মার অসীমত্বে মগ্ন করা যায়, তখন সকল ভয় অপসৃত হবে। আমাদের ঋষি সত্যি বলেছেন—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।"

বাহিরে ও ভিতরে

এ-গান দুটির সুর একটি বিখ্যাত গির্জাস্তোত্র থেকে নেওয়া। স্তোত্রটির প্রথম চরণ :
The Lord is my Shepherd, I never shall want এ-গানটিতে ঈশ্বরকল্যাণের নানা তানাদি দিয়ে গাইলে চমৎকার শোনায়। ইংরাজী গানটি ও বাংলা গানটি একই সুরে তালে গাইলে রসের তারতম্য হয়। ইতি

শ্রীদিলীপকুমার রায়

নাথ, বাহিরে তোমাকে দেখি না যে!
তবু অন্তরে শুনি বাঁশি বাজে :
"তোমি প্রাণে প্রিয়তম আছে আছে
সে যে যুগে যুগে বুকে বুকে রাজে।

আমি শুনি কানে, শুনি না তো তবু,
বুঝি তাই ডেকে ল'য়ে যাও প্রভু!
আমি জড়ায়ে আছি যে শত কাজে
তাই পাই না তোমার মনোমাঝে।

আজ বাসাও ভালো গো ভালোবেসে,
কালো ঘুচাও ঘুচাও আলো হেসে :
তুমি আছ যদি বঁধু, এত কাছে,
দেখা না দিলে যে ব্যথা মরি লাজে।

I yearn for the boon of the vision in vain ;
Yet sings, lo, the Flame-Flute again
and again :
"He dwells in all all hearts in joy and
in pain,
The Eternal Beloved whose Love cannot
wane

I hear, Lord, thy call, yet I doubt, disbelieve
And so the compassion I fail to perceive.
I hail my deep bondage and so cry pain :
When wilt thou my old scorch redeem with
thy rain ?"

O make me aspire, disclaiming my Night,
And girdled with the Bounty's Light of
Delight
If thou dost abide in my soul, heal my pain
With the Beauty's blue Grace, O Brindaban's
Swain !

কথা সুর ও স্বরলিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায়

ধা		I	ণধা	ধা	পা	I	মা	রা	গা	I	গা	মা	পা	I	ধা
এ			ধ	ঠি	ধে		তো	ম'	ধে		ধে	ঠি	না		ধে
ক'			ন	ঁি	ক'		নে	ত	নি		না	তো	ত		ধু
ক'			ধ	ম	ও		ভা	গো	গে		ভা	গো	বে		সে
I			years	for	the		boon	of	thy		vi	sion	and		vain
I			hear	lord	thy		call	yet	I		doubt	dis	be		lieve
O			make	me	as		pi	re	dis		claim	ing	my		Night
ধা		I	ধধা	সা	না	I	ণধা	ণমা	রা	I	গা	পা	ধা	I	ণমা
ত	ধু				ত		ধে	ত	নি		রা	শি	বা		জে
ধু	ঠি				ঠে		কে	স'	ধে		ধা	ও	প্র		ভু
'	গো				ও		মু	ভা	ও		ভা	গো	বে		সে
					thy		Flame	flute	a		gain	and	a		gain
And					Com		pas	sion	I		fail	to	per		ceive
ধা	ধা	I	পা		ধা	I	পা	গা	সা	I	না	ধা	না	I	সা
তো	ঠি		প্র		ঠি		ম	ত	ম		আ	ছে	আ		ছে
আ	নি		ভ		ছে		আ	ছি	যে		শ	ত	কা		জে
ধু	নি		ক'	ছ	ং		নি	র	ধ্		এ	ত	কা		ছে
He			dwells	in	all		all	hearts	in		joy	and	in		pain
I			hail	my	deep		bon	dage	and		so	cry	in		pain
If			thou	dost	a		bide	in	my		soul	heal	my		pain
সা	সা	I	র্সা	সা	ধা	I	ণধা	ণমা	পা	I	ধা	ণধা	পা	I	মা
সে	যে		র	গে	ন		গে	বু	কে		বু	কে	রা		জে
ভা	ই		প	ই	না		তো	মা	য়		ম	নো	মা		ঝে
সে	য		না	নি	সে		যে	হা	য়		ম	রি	লা		জে
The	E		ter	nal	Be		lov	ed	whose		Love	can	not		wane
Wh	en		wilt	thou	my		old	scorch	re		deem	with	thy		rain
wi	th		thy	Beau	ty's		blue	grace	O		Brin	da	bans		Swain

বসন্ত বৌরী

আভা পাকড়াশী

তুই এখনো তেমনি আছিস জয়ন্তী, একটুও বদলাস নিতো? অন্যমনস্কে জয়ন্তী বলে—অ্যাঁ, কিরকম?

—সেই কল্পনার কানুস ওড়াচ্ছিস মনে মনে।

—আঃ চুপ কর না, কান পেতে শোন, দেখ সেই পাখীটা ডাকছে—তুক্ তুক্ করে। কি সুন্দর জায়গায় তুই থাকিস রে। রোদে ভরা কি সুন্দর গাঢ় দুপুর। নারকোলের গাছ—গাছের পাতার ফাঁকে রোদের কিলি-মিলি—বনতুলসীর ঝাড়—কাঁকড়া অশ্বত্থ গাছ—নীচেটা কেমন ছায়াছায়া, গাব গাছের সার—কেমন সুন্দর সোঁদা গন্ধ মাটিতে, ইচ্ছে করে বুক ভরে নিশ্বাস নেই। মাঠ, কত বড় মাঠ—খানিকটা সবুজ—খানিকটা লালচে—কিছুটা সাদা, আমি জানিরে কেন ওখানটা লালচে—ওখানটা চোরকাঁটায় ভরা—সাদা জায়গাটা কাশফুলে ভরে রয়েছে। ঐ দেখ কেমন হাওয়ার দোলা লেগেছে কাশের বুকে। ভাঙ্গা পুকুরের পারে সিমেণ্ট ওঠা জায়গাগুলোতে ছাওলা ধরেছে, কি নরম সবুজ পুরু ভেলভেটের মত ছাওলা। পা রাখতে কি আরাম লাগছে। কিন্তু একটু জল পড়লেই সাংঘাতিক পিছল হবে। ওপাশের ঐ ভাঙ্গা মন্দিরটা ঠিক যেন সেই আমাদের দেশের বিলের ধারের বুড়ো-শিবের মন্দিরের মত। সেই মন্দিরটারও গা বেয়ে বটের ঝুরি নেবেছিল এমনি করে। মন্দিরটা বাইরে থেকে দেখাই যেতনা পুরোপুরি। পাশেই ছিল মস্ত একটা তেঁতুল গাছ। ঝুরি বেয়ে তেঁতুল গাছে উঠে কাঁচা তেঁতুল পেড়ে খেতে কী ভালই লাগত। দূরে বিলের বুকে ছোট ছোট নৌকো ভাসত। দু একটা জেলে ডিঙ্গি চলত, খেপলা জাল ফেলে মাছ ধরত জেলেদের ছেলেরা। ইস্! কী ভীষণ ইচ্ছে করত অমনি করে বিলের বুকে নৌকো বাইতে। মনে পড়ছে; আজ সব মনে পড়ছে! ঐ রোদ বিছান দিনান্তে হারিয়ে যাওয়া মাঠটার শেষ প্রান্তের দূরের ছায়া দেখতে দেখতে তারও জীবনের অতীতের কুয়াসা যেন একটু একটু করে সরে যাচ্ছে। কেন এসব এতদিন মনে পড়তনা? মনে করতে চায়নি যে সে খালি চাপা দিয়েছে, ঠেলে রেখেছে। নিজের কোন উৎসাহ, সখ,ইচ্ছে যে তার প্রকাশ করার অধিকার ছিলনা, করলে পাছে সেই আকুলতার অপমান হয় তাই ঠেলেছে। কিন্তু কেউ কি তা বুঝেছে? না, সবাই দেখেছে তার হাসিখুশী স্বভাব, আনন্দ উছল ব্যবহার, আর অফুরন্ত স্বাস্থ্য, শত অত্যাচারেও যা ভাঙ্গেনা, এই সবুজ নিটোল ঝকঝকে গাছগুলোর মত। দুটো ডাল কেটে নিলেও গাছ তার ব্যথা প্রকাশ করেনা, তাবে বৈদ্য প্রকাশ করে নীচু হব কেন? কেন লোকের কাছে দয়া ভিক্ষা করব! কিন্তু বিনিময়ে পায় আরও অত্যাচার—মানুষে নির্দ্বিবাদে তাকে আঘাতের পর আঘাত হেনেই চলে, তার সহন-শীলতার সুযোগ নেয়। মিল আছে, সত্যি দারুণ মিল আছে তো এদের সঙ্গে তার। সেও তো ঠিক এমনি করে মিথ্যে হাসির মাটি ফেলে দুঃখের গর্ত্ত বুজিয়ে চলেছে আজীবন। ও-ও তেমনি হাওয়ার তরে হিল্লোলে দুলছে। যেন কিছুই হয়নি।

—জয়ন্তী! তুই এতদূরে এসি. আমার সঙ্গ দেখা করতে, গল্প করতে—আর এখানে এসে কিনা তুই নিজের সঙ্গেই কথা বলে চলেছিস? কী! হাসছিস যে অমনি করে? অমন চুপি চুপি হাসি তোকে মানায় না, সেই হাসিতে খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়বি তবে তো তুই! মনে আছে ভুলে, সেই আমাদের কিংকিং খেলা? উঃ! কী দারুণ জোর ছিল তোর গায়—আর কী দমটাই রাখতে পারতিস। গাল দুটো তোর সিঁদুর হয়ে উঠত……

—দম—দম তো আজও টেনে চলেছে। হায় মানব

না, ফুরিয়ে যাব না, না পাও কিছু, জোর করে আদায় করে নেব—যেটুকু পাব তাতেই সন্তুষ্ট থাকব, তোমাদের ছলনা, মিথ্যে, অবিশ্বাস, সব আমি আমার বিশ্বাসের জোরে সত্যি করে নেব। কর অত্যাচার; ব্যথায় তারে তবু লুটিয়ে পড়ব না—আন্তরিকতা দিয়ে সবাইকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে মোড় করে নেব। নয়তো নিজের সত্যের কোটে টেনে আনব। কেউ তার মুখে হাসি ফোটে, একটা ক্লান্ত করুণ হাসি। কিন্তু আজ যে সে নিজেই মোড় হয়ে গেছে।

ও···ই। চল ঘরে চল, বাড়ীর মধ্যে চল, যতক্ষণ ওখানে থাকবি তুই আমার সঙ্গে একটিও কথা বলবিনা? জানিতো তোর এই রোগ। স্কুলের বাগানে গেলেও তুই সব ভুলে গিয়ে হাঁ করে প্রজাপতি ওড়া দেখতিস—গাঁদা ফুলের হলুদের ছোপ লাগত তোর চোখে, ঘণ্টা পড়ে যেত তবু ক্লাসে যেতিস না, শাস্তি পেয়ে ওপের অঙ্ক কষতিস বসে বসে ছুটির পর-আমরা হাসলে বলতিস, যা যা সব লক্ষ্মী মেয়ের দল বাড়ী যা—আরে এই না করলে আর আমি আমি কেন?" কে জানে কী করে তাস নখর পেয়ে পাস করতিস তুই। ক্লাসে বসে তো খালি আমাদের হাসাতিস, টিচারদের বিশেষ করে মাসতীদির গলা নকল করতিস, গোলমাল কানে যেতে যেই উনি কিছু প্রশ্ন করতেন—তুই ঠিক উত্তর দিতিস। কি করে পারতিস কে জানে। আমরা তো পারতাম না। জিজ্ঞেস করলে অমনি হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে বলতিস হু হু—জানিস নাতো, আমার মধ্যে যে দুটো আমি আছে।

—ঠিক, দুটো আমিই আছে তার মধ্যে। নাহলে যখন মনে প্রাণে সে কবীন্দ্রকে ভাল বাসে, সারাদিন রাত ঘড়ি মিলিয়ে সে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকে, তখন কি করে সে ওঁর প্রতি একটার পর একটা কর্তব্য করে চলে? ফাঁকি তো দেয়না। ছেদও তো পড়ে না তার সেবায়। সারা দিনের পরিশ্রমে ঘুমে চোখ ভেঙ্গে এলেও সেই ওঁর মাথায় হাত বুলিয়ে পা টিপে দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে মশারী ফেলে দিয়ে, তবে নিশ্চিন্ত হয়। কেমন করে পারে? একি তার আবাল্যের অভ্যাস তাই! মোটেও না, আগে তো ওঁর নিজেরই একজন আর বেয়ারা থাকত, সেই করত। কিন্তু আজ বেয়ারা নেই। অভ্যাসটা তো আছে—আহা! ওঁর কষ্ট হবে! সত্যিই তাই, এই আহা আর হিঃহিঃ, এই দুটো আমি আছে তার মধ্যে। সে আহাই করল, অন্যে তাকে হিঃ হিঃই বলল। কিন্তু কি করে সে সব বরদাস্ত করে? ঐ যে ঐ বসন্ত বৌরী পাখীটা বোধহয় তার মনের মধ্যে অহরহ তুম্ তুম্ করে ডেকে চলে, এমনি একটি রোদ ঝলা, পরিচ্ছন্ন নিস্তব্ধ, পরিশুদ্ধ দুপুরের ইসারা দেয়, আর সেই বিশালতার মাঝে সব বিশ্রী, ক্ষুদ্র বোধগুলো হারিয়ে যায়।

মনে পড়ছে তার সেই দিনটা। কত আর বয়েস তার, বছর চোদ্দ হবে? খিড়কীর দরজায় তালা দিয়ে শাশুড়ী শুয়েছেন। রামায়ণ পড়ে শোনাচ্ছিল তাঁকে। ভরা দুপুর—ঠাকুর বাড়ীর ছাদের কার্নিশে বসে বসে এক জোড়া ঘুঘু-নাগাড়ে ঘুঘু করে চলেছে। উঠোনের চন্দ্রমল্লিকা আর ম্যাগনোলিয়া গাছের সেই হাল্কা সবুজ পাতাগুলো যেন তাদের রোদের কাজে সাদা হয়ে গেছে। একটা কাঠবিড়ালী তার মোটা লেজটা পিঠে নিয়ে ছুটে গিয়ে ম্যাগনোলিয়ার ডালে উঠল—তারপর খিড়কীর দরজা পেরিয়ে গিয়ে একেবারে ওপাশের লিচু গাছে পড়ল। সেও অজানতে রামায়ণ বন্ধ করেছে। পড়ছিল সীতার সেই লক্ষ্মণের গণ্ডি লঙ্ঘনের কথা। নাক ডাকছে ওঁর হাতটা এলিয়ে পড়েছে—নিশ্চিন্ত ভাবা যিয়েছেন পালাবে কোথায় বউ? কিন্তু ওকে যে পথ দেখিয়েছে কাঠবিড়ালী! দুম করে টিনের চালে শব্দ হল। ভয় লাগাল। কী সুন্দর আওয়াজ ঐ তালের গায়। ভূমিকম্প হত প্রায়ই, তাই পাকা বাড়ী হলেও টিনের ছাদ—তলায় কাঠের সিলিং, মাঝের ফাঁকটুকুতে তার বাসা বেঁধেছে। রাতে একা ঘরে শুয়ে ছাদের ওপর অমনি ছটোপাটির শব্দে প্রথম প্রথম ভয়ে কাঠ হয়ে থেকেছে। তারপর সয়ে গেছে। কার কাছে বলবে? কে তার ভয়ে ভরসা দেবে? তাঁর কাজ নেই? মহালে যেতে হবেনা? বাটিতে শুয়ে বুড়ি কি অকাতরে ঘুমোত। আর সে বড় বড় চোখ করে নিবদ্ধ সেজটা আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে ছাদের দিকে চেয়ে থাকত। কই তার আহ্বানের শব্দেও তো ঘুম ভাঙ্গল না? এবার গাছের ডাল বেয়ে পাঁচিলে উঠতে দেখতে পেল, পাগলী বেণী এক পাঁজা বাসন নিয়ে কুয়োতলায় বসেছে। কাক, কোকিল, গাছ পালা,

কুয়োর জল, দড়ি, সবাইকে সব কিছুকে নির্বিবাদে গাল দিয়ে চলেছে—আর বাসন গুলো আছড়াচ্ছে—কিন্তু বাসন মাজে ও চমৎকার—কাঁসার বাসন সোনা, আর লোহার বাসন যেন রূপো হয়ে চমকায় ওর হাতে। হবেনা কেন? এক কড়া, তাই বোধহয় সাতবার মাজে। একবার মাজবে আবার ধুয়ে দেখবে দাগ আছে কিনা—আবার মাজবে। আর গাল দেবে,—পালার কড়ার পোড়ামুখ ব্যাতাই যবোনা কেনে, সাধ্য হবেক নাই।

আর একটা দৃশ্য চোখে পড়ল, কাছারী বাড়ীর উঠোনে—উঃ কী ভীষণ মারছে লোকটাকে কাদার, আহা কেন মারছে। না, না, মেরোনা ওকে ওমনি করে। সেই চওড়া পাঁচিলের ওপর একটার পর একটা পা রেখে রেখে চলছিল সে বার বাড়ীর দিকে। শাড়ীর আঁচল শক্ত করে কোমরে জড়ান—এইটুকু পাঁচিল থেকে পড়ে যাবে বলে ভয় পাবে সে? হাই জাম্প আর লঙ জাম্পে ফার্ষ্ট হতনা সে স্কুলে? প্রাইজ আনত না একবার!

—হেই বউরানী-হে—ই কুথাকে যাইছস্? কোর্ত্তী ভাইবলে যাইবা ভালাইব যে, আস, আস, লাইয়া আস। ছুটে এসেছে পাঁচিলের ধারে ধারে পাগলী ঝেণী। জিজ্ঞেস করেছিল ওকে অমনি করে মারছে কেন। দুচো ছাই মাথা হাত নাড়িয়ে রুক্ষ মাথাটা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলে—উঠেছিল বেশ করবা খুব করবা, আরো মারবা, খাজনা দায় নাই কান? কান গরীব হইছে। খাতি দিতি পারেনা আবার কের পোলাপান হইছে, মরুক, মরুক ক্যানে ওলাউঠা হইয়া, শকুনে খাউক। ধমকে উঠেছিল আঃ থামবি কিনা! চোখ গুলো ওর ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল রাগে, মুখে বিড়ির গন্ধ—তবু ওর কানে কানে কথাটা বলেছিল শুনে বলল; কান উয়ার বাকি খাজনার টাকা তু দিবি জান? কের মোরেও দিবি? ট্যাকা! হুঁ ট্যাকা মিলা কি করম? ধ্যাৎ, উয়ানে পুশী হবানে। বিচিত্র এক হাসি ফুটেছিল ওর সেই রেখাঙ্কিত মুখে। সেই গাঁজা খাওয়া জুয়াড়ী পাজী লোকটার জন্যও ওর এত দরদ? পায়ে উল্কি, মুখে বিড়ি, মুখের ভাষাও বিচিত্র, সমস্ত সংসারের ওপর যার বিতৃষ্ণা এসে গেছে সেই লোকটার রুক্ষ কর্কশ ব্যবহারে তখনো কিনা ভাবছে, সে খুশী হবে! এসব কথা তখন তার কিছুই মনে পড়েনি। ছুটে গিয়ে টাকা এনে দিয়েছিল বেণীর হাতে।

এক কিশোরী আর এক পাগলীতে মিলে সেদিন জমিদার বাড়ীর মান মর্য্যাদা সব নষ্ট করেছিল। অসূর্য্যম্পশ্যা জমিদার-বধূকে পাঁচিলকড়া দেখেছে কাছারি বাড়ীর লোক। বড় পা বেরিয়েছে না? দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা! বাঁধো বউকে, হাত পায়ে শিক পুঁতিয়ে ছেঁকা। হাঁটু পর্য্যন্ত কোঁকড়া চুলের গাল বেঁধে হাত বেড়ার সঙ্গে, থাক বাঁধা, দেখি কে খুলে দেয়, কার কত আস্পর্ধা! দিওনা খেতে! ওঃ বড় দরদ? ছিঃ ছিঃ ঘরের বৌ কিনা দিন দুপুরে গাছ বাইবে, পাঁচিলে চড়বে? একটু চোখ বুজেছি কি একটা কাণ্ড বাধাবে? ছিঃ। সেই ছিঃ ছিঃ, আর আহা।

গোয়াল ঘরে গরুর দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল, পেছনের বেড়ার ফাঁক দিয়ে একটা বঁটি এগিয়ে দেয় পাগলী। দড়ি তো কাটল, চুল যে ছাড়ায় যায়না, এখন পেছনে বাঁধা, দিন চুল কেটে তারপর একটু বেড়া ডিঙ্গুতে যাবানে; বাস সব ভুলে গেল, সভয় বোধ তখনো গাছের গায়—বর্ষা গেছে মাটি শুকোচ্ছে—ভিজে মাটির মিষ্টি সোঁদা গন্ধ। ঐ আম গাছের ফাঁক থেকে যেন শব্দও আসছেনা! ঐ তুঙ্গ তুঙ্গ ডাকটা! কি পাখী ওটা! কি নাম ঐ পাখীটার! চেঁচি ঘরে পাড় পড়ছে, চিঁড়ে কুটুনিরা চিঁড়ে কুটছে—চাল কুটছে আগুনা ঝাঁকা হবে উঠোন ভরে, আর কদিন পরেই ভাদ্র মাসের শুক্লা পুজো। ওদের দলে যারা আছে সেই ছোট মেয়েরা পোয়ালের গাদার চড়ে লাফাচ্ছে। খড়ের কেমন সোঁদা গন্ধ! এরা বলে পোয়াল, পাটকে বলে কোষ্ট, বাতাবী লেবুকে বলে জম্বুরা, সেদিনের কথাটা মনে পড়ে হাসি পায়, তাঁড়ার ঘর থেকে জম্বুরা আনতে বলেছেন শাশুড়ী—সে আর খুঁজে পায়না, জম্বুরা জানে থাকনা, তেমনি কিছু হবে বোধ হয়। কিন্তু কই নেই তো? বেরুলেই তো না-আনার জন্য বকুনি খাবে। চুপ করে বসে বসে ঘামছিল—শেষে বামুনদি এসে উদ্ধার করল—ঐ বাতাবী লেবু দেখিয়ে বলল, ঐতো "জম্বুরা"।

কিন্তু ঐ পাখীটা কি পাখী; ওদের জিজ্ঞেস করল, ওরা বলতে পারলনা, নিজেই চড়ল নিচু গাছে—তখন

সেটা নিচু গাছে। এদিকে বৌয়ের খোঁজ পড়েছে—খোঁজ খোঁজ কোথায় গেল—অ্যাঁ! এত বড় আস্পর্ধা বাড়ী থেকে পালান। উনি নিচু গাছের নীচে, ধপ করে নেমেছে তার গায়ের কাছে, চমকে উঠেছেন তিনি, ও হেসে ফেলেছে, কিন্তু তিনি ঠাস করে তার গালে এক চড় মেরে বলেছেন —হাবামজাদী! সধবা মেয়ে চুল কেটেছ তুমি! আমার ছেলে খাবি তুই! সে তখন মুখে আঙুল দিয়ে তাঁকে ইসারায় চুপ করতে বলেছে, বলেছে আস্তে বকুন, পাখীটা উড়ে যাবে। ফের জিজ্ঞেস করেছে—ঐ যে ডাকছে, ওটা কী পাখী। সদ্য কাটা কাঁধ পর্য্যন্ত কোঁকড়া চুলের রাশ রোদের তাতে সিঁদুর বর্ণ গা—হঠাৎ তিনি তার দুপাশের চুলগুলো মুঠো করে ধরে তার মুখটা উঁচু করেছেন, ও দেখেছে সেই বড় বড় লালের ছিটে দেওয়া ভাঁটার মত চোখে রাগ নিভে গেছে, বদলে একটা চাপা হাসি ফুটেছে, বলেছেন, তোকে নিয়ে কি করব বলত? তুই কি কপালপুড়ী? যা ঘরে যা। আবার তার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে চেয়ে উত্তর দিয়েছেন—ওটা 'বসন্ত-বৌরী' পাখী। বাস, তার হয়ে গেছে, এর পর কত নীচতা, শঠতা, দেখেছে ওঁর, কিন্তু মনে হয়েছে না, এটাই তো সব নয়। এই রাগের আড়ালে আছে সেই চাপা হাসি। সেই পাখীটা মনের আড়ালে বসে ডেকেছে। তুচ্ছ তুচ্ছ করে।

জয়ন্তী! তোর মনে পড়ে আমাদের স্কুলের সেই পান্না কি-কে? সেই যে আমরা ধাত্রী পান্না বলতাম যাকে? সেই সামনের দাঁতটা একটু উঁচু তাই ঢাকা পড়তনা পুরোটা, মনে হত যেন সব সময় হাসছে। সত্যিই কিন্তু ভারী হাসিখুশী ছিল মানুষটা। আমাদের কত আবার রাখত—মনে করে দেখ। তোর তো আবার রাজ্যের পুন্নি ছিল-যত নীচু ক্লাসের ছোট বাচ্চাগুলো, তোকে কী ভালই বাসত। তাদের জন্য তুই পান্নাকে খাটিয়ে মারতিস। মনে আছে সেই ইঁট দিয়ে পুতুলের বাড়ী তৈরী করে দিতিস, পুকুর কেটে তাতে জল ঢালতিস পান্নাকে দিয়ে—আবার কালিঘাট থেকে তাকেই পুকুরের জন্য রবারের লালনীল মাছ, বাড়ীতে থাকবার জন্য কাঠের পুতুল, এই সব এনে দিতে হত। তাড়াড়া তেঁতুলের আচার আর নুন মাখান শশা তো সে নিজেই লাগাই করত। কিন্তু তুই বেশ নাম কিনেছিলি—ও তোকে বলত, "মা যশোদার অংশ। তারপর সেই যেদিন আমাদের ধাত্রীপান্না শেষ হল! প্রাইজ ডিস্ট্রীবিউসনের দিন। তুই পান্না সেজেছিলি মনে পড়ে? আমাদের পান্নার কি কান্না! বড় দিদিমণিকে গিয়ে বলেছিল—ঐটুকু কচি মেয়েরে দিয়ে তুমি এমন কাজটা করালে? ওর মা যশোদার অংশে জন্ম, তাই বলে ওর এই শাস্তি। আপন ছেলেরে কাটতে দিতি হল?

—ঠিক তো? এই পান্নার সঙ্গেই কোথায় যেন একটা মিল ছিল ঐ পাগলী বেণীর। সেও তার হয়ে শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করত। একমাত্র সে ছাড়া এতটা সাহস কারুর ছিল না! বলত—তুমরা না ভদ্দর লোক। বাপ-মা ছাইড়্যা দুধের মাইয়াটা আইছে। তারে কিনা মার! ক্যান! কি কইরছে উয়ায়? তাকে চুপি চুপি বলত, রাতের বেলা বাবুরে কইয়া দিতি পার না। কিন্তু সে তো আর জানত না 'কইয়া' দেবার ফল? হয় বলবে—মায়ের কথা শুনলেই পার। না হয় মাকে বলবে,—তুমি কেন আমার বৌকে এই সব বলেছ। বলে দিয়ে তিনি তো বেরিয়ে যাবেন—যত তাল তখন পড়বে তার ওপর। তাই চেপেছে, রাগ, দুঃখ, কান্না অভিমান, সব চাপা দিয়েছে ছেলেমানুষির অভিনয় করে? সব বুঝেও না বোঝার ভান করেছে। ওদের ঠকিয়ে আনন্দ পেয়েছে। কিন্তু এখন সে বুঝছে, নিজেও তাতে কিছু কম ঠকেনি। নিজেই নিজেকে ফাঁকি দিয়েছে।

আকাশে চাঁদ উঠলেই বেণী নাচতে শুরু করত। ছেঁড়া শাড়ীখানা ঘাগরার মত করে পরত, পায়ে বাঁধত চাবির গোছা। হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচত—আর গাইত —বাঁশের বাঁশি তুয়া তুয়া বাজে।

পরাণ মাঝে, হিয়া মাঝে

আহা! বাজে, ক্যাবল বাজে, ক্যাবল বাজে। হাততালি দিত ঘুরে ঘুরে, আর পায়ের চাবিগুলো করত ঝনঝন। চাকর দাসী সবাই এসে জড় হত। আঁস ঘর থেকে ঠাকুর বেরিয়ে একবার দেখে যেত। নিষিমিষ ঘরের জানলা দিয়ে বামুনদি উঁকি মারত। ঘর থেকে বেরুলেই সব যে ছোঁয়া যাবে, শাশুড়ী তাহলে আর খাবেন না কিছু, শুধু বকুনি দিয়ে সকলের মাথা খাবেন। জপের মালা হাতে, বারান্দায় বসে বসে বলতেন—এই! ওসব

গান ছাড়—মনসামঙ্গল গা—হ্যাঁ জানত বেণী—পুরো বেহুলার পালা গাইত কেঁদে কেঁদে, পায়ের চাবির গোছা বাজত রুম ঝম। ও নাকি বেদেনী ছিল। তাদের মুনিব ঐ গেঁজেল লোকটাকে ভালবেসে পালিয়ে এসেছিল দল ছেড়ে। শ্বশুরের ঘরের মেয়ে ঘর বেঁধেছিল ঐ লোকটাকে নিয়ে। বড় সাধের ছেলেটা হঠাৎ কলেরা হয়ে মরে যেতে, অমন সা জোয়ান মানুষটি খাটাখাটুনি ছেড়ে দিয়ে কেবল গাঁজা খেয়ে খেয়ে অমন পাকিয়ে গেল। আর স্বাস্থ্যবতী, রঙ্গপ্রিয়া কাঁজর হয়ে গেল অমন ঝগড়াটে দজ্জি পাকান, পাগলি বেণী। ওর মরদ নাকি খাসা বাঁশী বাজাত, আর তার সঙ্গে ও অমনি করে নাচত। চাঁদ উঠলে আজও বেণী নাচে। বিজান হয়ত বলবে, লুনেটী, শক্তিকায়ের লুনেটিক বোধ হয় ওর স্বামীটা। নাহলে সেদিন···

শিবরাত্রির দিন—রাত্তির বেলা প্রহরে প্রহরে শিব-পুজো করেছে সে, তারপর ভোরে পুজো সেরে বিলে তাপান দিতে গেছে—গিয়ে দেখে সেই কাপসা কুয়াসা মাখা বীণা কনকনে জলে ডুসডুস করে ডুব দিচ্ছে কে। তাকে দেখেই—খল খল করে হেসে উঠে বলেছিল—আলো, আলো, মিতিন, তুমারেই তো চাইছিলাম মনে মনে। আদর করে তাকে মিতিন বলেই ডাকত বেণী। বৌরাণীর দুরন্তটা ঘুচিয়ে দিয়ে টেনে নিত সখীত্বে। সেই সেদিন যেদিন বাসনের পাঁজা নিয়ে বসে বসে কাঁদছিল, কাছে যেতে বলেছিল, কইতে পার—পাগল হয়া সব ভোলন যায়, পোড়া প্যাটের জ্বলুনী ক্যান ভোলন যায়না। সেদিন সে চুরি করেছিল ওর জন্য। বাগানের দিকের চালার জাল কেটে তাড়ার ঘরে ঢুকে চিঁড়ে আর গুড় বার করে এনেছিল। উঃ কী সাংঘাতিক খিদে পেয়েছিল ওর, তিজাল না ধুলো না, অমনি অমনি চিবিয়ে নিল। কিন্তু একটু গুড় খেলনা আর বেণীর ভাগ চিঁড়ে বেঁধে রাখল আঁচলে—জিজ্ঞেস করতে ছেলেছিল মুখ নীচু করে, কী মিষ্টি হয়ে ফুটেছিল সেই হাসি ঐ ভাঙ্গা মুখেও, বলেছিল—বোকনা ক্যানে মিতিন! বেণীর সেই যৌবনের গল্প শুনে শুনে অবাক লাগত তার। সেই স্বাদ, সেই উন্মাদনা, তাকে নিয়ে যেত অন্য এক লোকে। সেই মধুর অজানা উপলব্ধি তখন তার ছিলনা, কখনই ছিলনা, কিন্তু আজ! আজ তার সেই অনুভূতিতে মন কানায় কানায় ভরা। কিন্তু বেদনার পিয়ালায় ডুবিয়ে ডুবিয়ে সে রসাস্বাদন করছে এ রসভরা আঙ্গুর ফলির। কবীন্দ্রের কটু কথা যে বড় বাজে। এত সয়েছে তবু তার ছিঃ ছিঃ কেন যায়না? চোখের জল মনে চেপে মুখে হাসি ফুটিয়েছে তার জন্য আমিটা।

শিবরাত্রির সেই অমাবস্যার ভোরে সেও কাঁপিয়ে পড়েছিল বিলের জলে, আর বেণীতে আর তাতে মিলে মনের আনন্দে সাঁতার কেটেছিল পাল্লা দিয়ে। জল তোলপাড় করেছিল দুজনে। মাছের মত সাঁতার দিতে পারত সেই বেদের মেয়ে। সেও কম যেতনা। ওর কাছেই যে শিখেছিল। ঐ চিঁড়ে কুটুনীর মোটা সোটা বাচ্চা ছেলেটাকে কোলে নিয়ে আদর করত, চুমু খেত দুজনে। ওদের ঐ বড় মেয়ে গুলোর সঙ্গে সারা দুপুর লুকোচুরি খেলত। পোয়ালের গাদায় লুকোত। মাথা গা ভরে যেত খড়ের কুচিতে আর ধুলোয়। কাঁঠাল গাছে দোলনা বেঁধে দুলত। বেণী দোল দিত। আর ঝগড়া ভুলে হেসে লুটোত। বলত মিতিন, তুমারে দেইখ্যা দেইখ্যা আমার যৈবনের কাঁজরের মনে পইড়্যা যায়। এমনি করে পরাণভরে খুইল্যা রাইখো মিতিন; বন্ধ কইরা না, অন্ন পরাস্তা হইও না কখখনো। বাড়ীর কারুর সাড়া পেলে বা তার শাশুড়ীকে আসতে দেখলে চং চং করে বাসন বাজিয়ে গান জুড়ত বেণী। তখন সে লুকোত, হয়ত পালাত। ছোট জাতের মত সব ছোট লোকের সঙ্গে মেশা। ছিঃ ছিঃ। তবে বার ব্রত বা পুজোর সময় এদেরই উনি পেট পুরে খাওয়াতেন, কাপড় দিতেন। তখন ভারী ভাল লাগত, খুব আনন্দ হত তার।

কিন্তু কোন মন্ত্রে এখনো ওদের ঐ দগ্ধ হৃদয়ের তন্ত্রিতেও অমনি সুর বাজে? কেন তার মনে অমনি রং এর ছোঁয়া লাগল না। কেন সে পেলনা ওর মধ্যে সেই প্রিয়র স্বাদ? শুধু উপদেশ, অনুকম্পা আর শাসন, এই কেন তার সম্বল রইল? কেন তাকে ঘর ছেড়ে পরে মন দিতে হল।

সেদিনও ছিল চাঁদনী রাত। গাছ-পালা, মাঠ চাঁদের আলোয় হাসছিল, নাচছিল বেণী, গাইছিল বেহুলা পালার গান,—

তাইকা তাইকা মোর কত তাইকাছে
দুই গাহির কারমে ?

হঠাৎ সেই নেপালের লোকটা ছুটে এসে ওর চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে চলল—বলছে চং, কোন নাগরে তাকতা ছিলিস ঐদিন ভোরে ? কারে নিয়া বিলের জলে সাতরাইতা ছিলিস ? কা ! কারে মিতিন কইতাছিলিস ? সবাই মিলে বকে ছাড়াতে পারেনা। নেপালের মানুষের রাগ ! অত মার খেল কেলী, তবু কিন্তু কিছু বললনা, কিছুতেই তার নাম করল না। পরদিন দুপুরে অবাক হয়ে দেখে কেলীর সেই মার-খাওয়া ফোলা ঠোঁটে হাসি আর ধরেনা, কত রঙের কথা, চোখ নাচিয়ে বলল, স্যাখলা মিতিন ! জলনটা ! এখনো জ্বলে। পীরবাবার থানে গিয়েছিলাম কইছে অমাবস্যার ভোরে ডুব দিয়া স্নান করলে ছাওয়াল হইবে। কিন্তু মরদে যান জানেনা। ক্যামনে কই কও। আবার হেসে হেসে তার হাত ধরে বলেছে—আহা ! মোর সোন্দর মিতিন রে !

এমনি হয় তো। তারও তো বুকের মধ্যেটা কেমন যেন জ্বলে যখন তাকে কবীন্দ্র তাকে ভুলে গেছে, অন্য কারুর সঙ্গে হেসে কথা বলছে, কী ভীষণ একটা কষ্ট হয়, গলার মধ্যে কী যেন একটা ঠেলে ওঠে, কান মাথা সব জ্বালা করে। তাড়াতাড়ি সাবানের প্রলেপ লাগায়, লাগায় সাহিত্যের পালিশ, বলে, ও সূর্যের কিরণ কোথায় কোন গাছে কোন ফুলে পড়ল, সে বিচার তার নয় ; সে সূর্যমুখী, ফুল, ওর আলোতেই তো বিকশিত হয়েছে এতেই সে কৃতার্থ। কিন্তু কই ওঁর সম্বন্ধে তখনি কোন কথা তো কই মনে আসেনা ? কেন আসেনা ? তবে কী ভালবাসলেই একান্ত আপনার করে পাবার একটা আসক্তি জন্মায়, আর সেইখান থেকেই কী আসে ঐ হিংসা, দ্বেষ ? হবেও বা।

ঝরণা ! চমৎকার, দাদা এই জায়গাটায় বসতে বড় ভালবাসত। তক্ষুণি জিজ্ঞেস করে—কই তোর বরকে তো আমায় দেখালিনা ! শুনেছি খুব সুন্দর দেখতে ? এবার কলকাতায় গেলে, আলাপ করিয়ে দিস, কেমন ? আচ্ছা তোর ছেলেকে তুই কাছে রাখলি না কেন ? কেন বোর্ডিংএ দিলি ? তুই তো অতটুকুন বয়েসেই বাচ্চাদের কত ভালবাসতিস।

—বাসত তো ভাল, ভাল বাসত বলেই তখন মায়ের আদরে ছেলে খারাপ হয়ে যায়। তুমি নিজেই ছেলে মানুষ, ছেলেমানুষ করার কি জান ? উত্তর দিতে গেল—আমার বরকে তো ঠিক তোর দাদার মতই দেখতে—নতুন করে আর কি দেখবি ? চমকে উঠল নিজের মনে ! তবে কি তাই ? ওঁর মত দেখতে বলেই কি সে এমনি করে কবীন্দ্রকে কাছে পাবার জন্য, তার একটু স্বীকৃতি পাবার জন্য এমন করে পাগল হয়েছিল ? নাহলে কত তো লোকের সঙ্গে মিশেছে কেউতো তাকে কখন এমন করে আকর্ষণ করেনি ? তবে কি তার অবচেতন মনে অমনি ধরণের কামনাগুলো লুকিয়ে ছিল ? ওঁর কাছে যা পায় নি অথচ পাবার আশা করেছিল—তা ওঁর মত দেখতে কবীন্দ্রকে পেয়ে পল্লবে পাখা বিস্তার করল ? তার সারা অন্তর তাইকী আকুল হয়ে তাকে আমন্ত্রণ জানাত ? কিন্তু তার সেই বাঁধ ভাঙা বন্যার মত ভালবাসাকে কোনই স্বীকৃতি দিলনা কবীন্দ্র। বলল, ছি ! যা তুচ্ছ, যা দুদিন বাদেই ঝরে যাবে, তার জন্য অত ব্যাকুল হয়ে লাভ ! কিন্তু কি করে সে তাকে বোঝাবে যে ওর কাছে যা তুচ্ছ, তার কাছে তা অমূল্য, ফুলের জীবন, মেঘের লালিমা সবই হয়ত ক্ষণিকের, তা বলে কি তারা তুচ্ছ ? ফুল কি চিরকাল ফোটেনা ? ঐ আকাশের লালিমা কি অনাদি কালের ছবি নয় ? তারও অন্তর তাই প্রত্যাখ্যানের আর উপেক্ষার আঘাতের ব্যথায় লালাভ ক্ষতে পরিণত হয়েছে, কিন্তু তবুও তার ওপরে অবুঝ ধারায় ঝরে পড়ছে তার প্রথম উন্মেষের আর উপলব্ধির আনন্দের ফুলগুলি। তা তুচ্ছ নয় ; ক্ষণিকের নয়, নয়। এইখানে সে বসতে ভালবাসত। এই বিরাট উন্মুক্ত পরিবেশে সে বড় হয়েছে—এইখানকার বাতাসে রয়েছে তার নিঃশ্বাস, ঐ নদীর জলে রয়েছে তার শরীরের স্পর্শ। ঐ ঘর, ঐ বড় বাড়ী, দরদালান এসব তার পায়ের ছাপে ভরা। এমনি উদার প্রকৃতি যাকে গড়েছে সেকি অত সঙ্কীর্ণ হতে পারে ? কলকাতার সেই ছোট বাড়ীর ছোট ঘর কি তাকে ছোট করতে পারে ? না, কখন নয় ! এ তার বিশ্বাস হয় না। হয়ত পূর্বাভাস পূরুতার রূপ দেখিয়েছে ইচ্ছে করে। ঐ মাঠের প্রান্তে আকাশের বুকে যেমন কালো মেঘ জমেছে মাঝে মাঝে হানছে বিদ্যুতের বিলিক, ঠিক অমনিই হয়ত সে তার অকল্যাণের কালোর বুকে কল্যাণের আলোর ইসারা দিয়েছে !

কিন্তু সেও তো তাকে ছিঃ ছিঃ-ই করে গেল। আর তার আছাই রইল ওর জন্য। এবার ও বলবে—পাত্তা ! তুমি তাকে বোলো, যেন বেঁচে থাকে ও, বাঁচতেই যে হবে ওকে, আমার জন্য বাঁচতে হবে। আমি যে প্রতীক্ষার প্রহর গুণছি, সেকি মিথ্যে হবে। না না তাকে আমি পাবই পাব। দিনের কাজ শেষ করে আমরা রাত্রে গিয়ে মিলব। দুঃখের এই আঁধারই আধার শুদ্ধ করে দেবে। একত্রে নিয়ে যাবে যবনিকার ওপারে এমনি করে ঐ বসন্ত বৌরী পাখী হয়ে আমার মনের মধ্যে বসে তুমি তুমি ডেকে বলুক। আমি তার সঙ্গে চিরকাল একাত্মা হয়ে কর্তব্যের নদী পেরিয়ে যাই। সম্বল থাক শুধু আশা, স্বপ্ন, আর কল্পনা।

"বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম"

শ্রীভিক্ষু রাহুল, নালন্দা (পাটনা)

তরঙ্গায়িত হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তুনামনগরে শাক্যদের রাজধানী। সর্বজনপূজিত ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভূত মহাপুণ্যবান নৃপতি শুদ্ধোধন রাজনায়ক রূপে নির্বাচিত হয়ে সকলের সহযোগে রাজকার্য পালনকরতেছিলেন। তাঁর পত্নী মায়াদেবী মৃণালের ন্যায় সুন্দর এবং পদ্মের ন্যায় বিমল বিত্তশালিনী। কিন্তু পুত্রমুখ সন্দর্শনে বঞ্চিত থাকায় তাঁদের জীবনে ব্যর্থতার বেদনা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল। একদিন রাণী বৈশাখী পূর্ণিমায় রাজধানীর অদূরে লুম্বিনী উদ্যানের পার্শ্ব দিয়ে শিবালয়ে যেতেছেন, এমনসময় উদীয়মান সূর্যের ন্যায় সর্বাঙ্গসুন্দর দিব্য একটি পুত্ররত্ন প্রসব করে সপ্তমদিনে ইহজগৎ হতে বিদায় নিলেন। আনন্দবিষাদের তরঙ্গাভিঘাতে আকুল রাজা শুদ্ধোধন শিশুকে তুলেদিলেন তাঁর বিমাতা ও মাতৃসমা গৌতমীর অঙ্কে। কুমারের জন্মে সকলেরই ইচ্ছা পূর্ণ হলো, তাই নবাগত শিশুর নামদিলেন সর্বার্থসিদ্ধ বা সিদ্ধার্থ। প্রচুর ভোগসম্পদের মধ্যদিয়ে শিশু ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলেন। কিন্তু বালসুলভ চাপল্যের পরিবর্তে এক গাম্ভীর্য তাঁকে ঘিরে বসল।

রাজকুমার ক্রমশ নানা বিদ্যা শিক্ষা করে জ্ঞানসংগ্রহ করতে লাগলেন। ক্রমে অশ্বারোহণ হতে আরম্ভ করে কোন বিদ্যাও বাদ গেলনা তাঁর। একদিনের একটি ঘটনায় সিদ্ধার্থের ভাবীজীবনের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। নির্মল বসন্তপ্রভাতে কুমার উদ্যানে বসে আছেন এমন সময় একঝাঁক হংস মধুর কলরবে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তাঁর মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। এমন সময় বাণবিদ্ধ হয়ে একটি হংস সিদ্ধার্থের সামনে এসে পড়ল। শুভ্র হংসটির বক্ষঃ হতে বাণমুক্ত করে তিনি তাকে কোলে তুলে নিলেন, এবং তার গায়ে স্নেহশীতল হাত বুলাতে লাগলেন। ভাষাহীন প্রাণী প্রেমের ভাষা বুঝতে পেরে নির্ভয়ে তার বিলম্বিত গলদেশ কুমারের অঙ্কে স্থাপন করে নিশ্চিন্ত হল। কিন্তু ক্ষণকাল পর পাশও দেবদত্ত এসে পাখীটি দাবী করলেন। কারণ তারই অব্যর্থ সন্ধানে পাখী হতসর্বস্বা। সিদ্ধার্থ শান্তকণ্ঠে তাকে বুঝিয়ে বললেন, ভাই, পাখী কার? যে তাকে বাণবিদ্ধ করেছে তার, না যে তাকে বাণমুক্ত করে নবজীবন দান করেছে তার?

আর একদিন মহাসমারোহে হলকর্ষণোৎসব সম্পন্ন হচ্ছে। রাজপুরবাসী প্রত্যেকে আনন্দকোলাহলে উন্মত্ত। কিন্তু সিদ্ধার্থ দেখলেন—উদ্যানের অঙ্গে কৃষকগণ ঘর্মাক্ত-কলেবরে কি কঠোর সংগ্রাম করছে এবং কি নিষ্ঠুর ভাবে বলদগুলাকে প্রহার করছে! আবার বলদের পদ-পীড়নে কতপ্রাণী নিহত হচ্ছে। জন্ম-জীবন-মৃত্যুর রথ-চক্রের কথা ভাবতে ভাবতে চিন্তান্বিত বালক সিদ্ধার্থ জম্বুবৃক্ষমূলে ধ্যানমগ্ন। শাক্যশিরোমণি পুত্রের ধ্যানমগ্ন অবস্থা দেখে চিন্তা করলেন, কি করে পুত্রকে সংসারাভিমুখী করা যায়! সকলের পরামর্শে পুত্রের মন সর্বকামনার নীড়সদৃশ গৃহে আকৃষ্ট রাখবার জন্যে যৌবনের প্রারম্ভে ষোল বৎসর বয়সে গৌতীয়রাজ সুপ্রবুদ্ধের রূপলাবণ্য-বতী কন্যা যশোধরার সাথে তাঁকে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ করে প্রাসাদ মধ্যে নৃত্যগীত আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করলেন এবং নগর মধ্যে জানিয়ে দিলেন—রাজপথে যেন কোন দুঃখদায়ক দৃশ্য কুমারের চোখে না পড়ে।

প্রাসাদের আনন্দকাননে বন্দী রাজকুমার একদিন সারথি ছন্দককে সঙ্গে নিয়ে সুবর্ণ অশ্বাভরণ সজ্জিত রথারো-হণে বাহির হলেন। পথমধ্যে এক জরাভিভূত বৃদ্ধ কুঞ্চিত-মুখমণ্ডল, লোলচর্ম, মস্তক শুভ্র, চক্ষু দৃষ্টিহীন, এবং দেহ বিশুষ্ক যষ্টি নির্ভরকরে কম্পিত পদে রাস্তা পার হচ্ছে। কুমার সিদ্ধার্থের ইতি পূর্বে কখনও এরূপ দৃশ্য নয়ন গোচর হয়নি, তাই বিস্মিত হয়ে সারথিকে জিজ্ঞাসা করলেন

—কে এ? কেন তাঁর এরূপ দুর্দশা? সারথি বুঝিয়ে বলেন—এসমুদয় বার্দ্ধক্যের চিহ্ন। এব্যক্তিই এক সময় সুগঠনাঙ্গী শিশু এবং যৌবনে আমোদপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু এখন কালের গতিতে তার সেই সৌন্দর্য আর নেই। তার জীবনী শক্তি বিনষ্ট হয়েগেছে। সারথির উত্তরে কুমারের মন বিচলিত হল। বার্দ্ধক্যের ক্লেশের জন্যে তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। কুমার মনে মনে ভাবলেন—মানুষ যখন জানে যে, তাকে শীঘ্রই শুষ্ক ও বিনষ্ট হতে হবে তখন কি আনন্দ, কি সুখ তার পক্ষে পাওয়া সম্ভব?

দ্বিতীয়দিন ভ্রমণকালে দেখলেন পথপার্শ্বে এক সর্বজন-পরিত্যক্ত পীড়িত মানুষ মলমূত্রলিপ্ত। বিকলাঙ্গ তার দেহ, স্নায়বিক আক্ষেপক্লিষ্ট এবং যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে। কুমার সিদ্ধার্থ তাকে দেখে সারথিকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ কি প্রকার লোক? সারথি কুমারকে বুঝিয়ে বলেন—এ-ব্যক্তি পীড়িত, দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত। তার দেহের চারি উপাদান শৃঙ্খলাচ্যুত ও বিকল হয়েছে। মৃত্যুর অপেক্ষায় প্রহর গুনতেছেন।

তৃতীয় দিন ভ্রমণকালে আর এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে বিস্মিত অন্তরে তিনি সারথিকে জিজ্ঞাসা করলেন—সারথি এ কে? এতগুলি লোকজন ইহাকে ঘাড়ে করে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? কেন পিছনে মর্মন্তুদভাবে কতকগুলি লোক কাঁদছে? সারথি কি আর বলবেন? রাজ নির্দেশে যে আজ পর্যন্ত মানবের মরণদৃশ্য পর্যন্ত দেখেনি তাঁকে আর তিনি কি বুঝাবেন? শুধু বললেন—এ-ব্যক্তির ভবলীলা শেষ হয়ে গেছে। জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে, সকলে তার মৃতদেহ শ্মশানে দগ্ধ করবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছে এবং পিছনে ওর মিত্রবর্গ স্বার্থের লোভে কাঁদছে। রাজপুত্রের শ্বাস রুদ্ধ হল। তাঁর বাক্যস্ফূর্তি স্পষ্ট হলনা। তিনি সেই দিনও দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে উদ্যান হতে ফিরলেন।

ইহারই কিছুদিন পর আবার চলেন রথযোগে উদ্যান ভ্রমণে—এবার আর জরাজীর্ণ বৃদ্ধ নয়, দেখলেন শান্ত সৌম্য পীতবসনধারী স্থির পদবিক্ষেপে পথ চলছে। কি শান্ত তাঁর দৃষ্টি, কি উজ্জ্বল তাঁর মুখমণ্ডলী! সারথি, কে ওই সূর্যসম প্রভাব পুরুষ আমার জীবনের রাস্তা আলো করে চলেছে। বল বল সারথি ও কে? সারথি আনত নয়নে বললেন—কুমার, উনি সন্ন্যাসী সংসারের সমস্ত মায়া মমতা ছিন্ন করে চরম মুক্তি লাভের ভেদ করে তিনি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। তাই তিনি শান্ত, তাই তিনি নির্ভীক।

পুলকিত মনে কুমার উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, পেয়েছি, পেয়েছি সত্যের সন্ধান। জীবগণ যখন দুঃখের অধীন তখন সুখলাভের ক্ষমতাও তাদের অধিকারে। দুঃখের মূল সুখের বিকাশের সূচনা করে। কারণ সুখ ও দুঃখ পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট। এরূপে দুঃসহ ক্লেশ হতে স্বর্গীয় আনন্দ উদ্ভূত হতে পারে। কেবলমাত্র মানুষকে আয়াস সহকারে ঐ আনন্দ অন্বেষণ করতে হয়। পঙ্কে পতিত মানুষ যেমন নিকটস্থ পদ্মাবৃত জলাশয় অন্বেষণ করে, সেরূপ ভূমিও পাপের মলিনতা ধৌত করবার জন্যে নির্বাণের অক্ষয় জলাশয় অন্বেষণ কর। কুমারের নির্দেশে সারথি রথ ফিরালেন।

বিবাহের প্রায় তের বৎসর পর ২৯ বৎসর বয়সে সিদ্ধার্থের ঔরসজাত যশোধরার গর্ভে একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হল। পৌত্রের জন্ম হলে পর রাজা শুদ্ধোধন ভেবেছিলেন, সিদ্ধার্থের মন আর সন্ন্যাসের দিকে ঝুঁকে পড়বেনা। তিনি পূর্বহতে সংসারাভিমুখে আকৃষ্ট হয়ে পড়বেন। কিন্তু রাজা শুদ্ধোধনের ভাবিজীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা বিফল হয়ে গেল।

আষাঢ়ী পূর্ণিমার মধ্যরাত্রি কুমার সিদ্ধার্থ মনে মনে ভাবলেন—কত কোটি কোটি গোপা, কত কোটি কোটি শিশু কোলে করে জন্ম-মৃত্যুর ঘাত প্রতিঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দুঃখময় এ সংসারে জরাব্যাধি মৃত্যু অহরহ জীবকে গ্রাস করছে। এখানে কোথা সুখ কোথা শান্তি, কোথা শেষ। যদি কোন দিন দুঃখের শেষ দেখতে পাই, যদি কোন দিন শান্তির সন্ধান পাই, তবে আবার ফিরব। তোমারই মত কত কোটি কোটি নরনারীর জন্যে আমি তোমাদের ছেড়ে চললাম। এ ভেবে সারথি ছন্দককে ডেকে বললেন—যাও ভাই আমার অশ্ব কন্থককে নিয়ে আস। সুখ স্বপ্নে বিভোরা গোপা নিদ্রারই মধ্যে চমকিয়ে উঠলেন। রাজপুত্র অন্তঃপুরী হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে কোন এক অনির্দেশের পথে পা বাড়ালেন।

চন্দ্রালোকিত নিস্তব্ধ রজনী। রাজধানী হতে বহু দূরে এসে কুমার সিদ্ধার্থ সারথিকে বললেন—বন্ধু তুমি আমাকে

বহু দূর আগায়ে দিয়েছ। অনেক কিছু নূতন শিখায়েছ। এবার তাই আমাকে তোমার মায়াও ত্যাগ করতে হবে। যাও তাই বাবাকে যাহা বলবার বলবে। আমি কোথায় চলছি আমি নিজেই জানিনা। যদি কোন দিন পথের সন্ধান পাই নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট ফিরবো—এই বলে দুইজনে দুই দিকে চললেন। পথ ঘাট কিছুই জানা নেই কুমার সিদ্ধার্থের। শুধু হৃদয়ের এক অদম্য উৎসাহ নিয়ে কোটি কোটি জীবের জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিজাত দুঃখ হতে মুক্তির পথ আবিষ্কার করতে। পথ মধ্যে রাজপুত্রোচিত কেশরাশি ছিন্ন করে কাষায় বস্ত্র ধারণ করে ভিখারি হয়ে চলেন ভাবি মুক্তির সন্ধানে।

কত ঋষি, কত মুনি সাধক পণ্ডিতের আশ্রমে তিনি হৃদয়ের প্রশ্ন নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন। নানা মুনির প্রচলিত নানা মত কুমার অকপটে সাধনা করলেন। কিন্তু কিছুতেই পিপাসা মিটেনি তাঁর। বহুদিন ঘুরে অনেক দেখে শুনে সিদ্ধার্থ বুঝলেন—কেবলমাত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে সত্যবস্তু লাভ হয় না। সত্য লাভ করতে হলে কঠোর তপশ্চর্যা প্রয়োজন। সিদ্ধার্থ মনে মনে ভাবলেন—মানব নিজেই নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা, নিজেই নিজের উদ্ধারকর্তা, নিজের মুক্তিলাভের জন্য দ্বিতীয় কাহারো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। হৃদয়ের এই অখণ্ড বিশ্বাস নিয়ে সিদ্ধার্থ বুদ্ধগয়ার বোধিমূলে ধ্যানে বসলেন।

কত গ্রীষ্ম, কত শীত সাধকের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল, তাঁর দিব্য দেহকান্তি বিলুপ্ত প্রায়, দৃঢ় বলিষ্ঠ শরীর কঙ্কালে পরিণত হয়ে গেল। কিন্তু কোথায় তাঁর সেই চিরবাঞ্ছিত বহুকল্পদুর্লভা বোধি। কৃচ্ছ্রসাধনার শেষে সাধক বুঝলেন ইহা সত্য লাভের পথ নয়। ইহা দ্বারা বাসনার অগ্নি নির্বাপিত হয় না। পুনরায় পানাহার দ্বারা শরীর সুস্থ ও সবল করে সাধনা করতে হবে। এমন সময় নিকটবর্তী গ্রামের বণিক দুহিতা সুজাতা পুত্রলাভে পূর্ণ মনস্কাম হয়ে বনদেবতাকে পায়স দিতে এসে ভাবি বুদ্ধের নিকট উপস্থিত। বণিক-দুহিতা ভক্তি সহকারে ঐ পায়স নিবেদন করলেন। পায়সান্ন খেয়ে সিদ্ধার্থের ক্ষীণ শরীরে বলের সঞ্চার করে মধুর কণ্ঠে তিনি সুজাতাকে বললেন, আমি দেবতা নহি—তোমারি মত মানুষ। তোমার এই মহৎ দান আমার প্রাণরক্ষা করে নূতন উৎসাহের সঞ্চার করেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি নিশ্চয়ই সত্য লাভ করে বুদ্ধ হব। তোমার এই দান সেই সত্যলাভের সহায় হউক। তোমার যেমন মনস্কাম পূর্ণ হলো—প্রার্থনা কর, যেন আমার মনস্কামও পূর্ণ হয়।

সিদ্ধার্থের মন আজ কি এক অপার আনন্দে ভরে উঠেছে। তিনি ধীরে ধীরে বোধিদ্রুমের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। তাঁর সর্বাঙ্গ আজ শিহরিয়া উঠল। তিনি আষাঢ় বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রে বুদ্ধগয়া বোধি-মূলে ধ্যানে বসে মনে মনে সংকল্প করলেন—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং
প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং নৈবাসনাৎ
কায়মতশ্চলিষ্যতে।"

নির্বাণের পূর্বে যেমন দীপশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে ঠিক সেইরূপ সাধকের মনে জেগে উঠলো সঞ্চিত রক্ষিত শত শত কামনা বাসনা। মার এসে নানা প্রলোভন দেখালেন। কিন্তু কিছুতেই পারলেন না সিদ্ধার্থের মন টলাতে। দৃঢ়কণ্ঠে সাধক বলে উঠলেন—যদি সুমেরু পর্বত স্থানচ্যুত হয়, জগৎ শূন্যে মিশিয়ে যায়, আকাশ হতে নক্ষত্ররাজি ভূপতিত হয়, তথাপি আমি এই আসন হতে উঠব না। "মরহে সাধন কিম্বা শরীর পাতন"। আরও বহুবিধ পরীক্ষার পর দুষ্ট মার পরাস্ত হয়ে পলায়ন করলেন। সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করে বুদ্ধ হলেন। বোধি-জ্ঞান লাভ করে তিনি বুঝলেন—কামনা হতে দুঃখের জন্ম। কামনা বিলোপ করতে না পারলে নির্বাণ, মুক্তি বা শান্তি নেই। কামনার ফলে কর্ম, কর্মের ফলে শুভা-শুভ সুখ দুঃখ। তিনি বুঝলেন দুঃখ আছে, দুঃখের হেতু আছে, দুঃখের নিবৃত্তি আছে, দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ও আছে। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ দুঃখ নিবৃত্তির পথ। সংদৃষ্টি, সংসংকল্প, সংবাক্য, সংকর্ম, সংজীবিকা, সৎ-প্রচেষ্টা, সংস্মৃতি এবং সংসমাধি।

এসব নিগূঢ় তথ্য তিনি সর্বপ্রথম সারনাথে তাঁর প্রসিদ্ধ ভিক্ষু পঞ্চককে ধর্মচক্র প্রবর্তন সময়ে ঘোষণা করেছিলেন। নিজের দৃষ্ট ও নিজের উপলব্ধ এ-সব তথ্য শ্রবণ করিয়া তিনি সেই প্রসিদ্ধ ভিক্ষু পঞ্চককে সর্বপ্রথম উপসমপদা

যা দীক্ষা দিয়ে প্রথম বৌদ্ধসংঘের বীজ বপন করলেন। তৎপর রাজগৃহ বেণুবনবিহারে নালন্দার সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা দিয়ে বলেছিলেন—সকল প্রকার কুকার্য পরিত্যাগ করা, কুশল কর্ম সম্পাদন করা, চিত্তের পবিত্রতা আনয়ন করা—সংক্ষেপে ইহাই তথাগত বুদ্ধের অনুশাসন। মা যেমন আপন প্রাণ দিয়ে পুত্রকে রক্ষা করেন, বিশ্বমাত্রেই সেইরূপ সকল জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করেন।

তথাগতের এ-সব মধুর বাণী শ্রবণ করে মগধাধিপতি বিম্বিসার বুদ্ধ অন্তরে বুদ্ধের চরণে প্রণত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন এবং তাঁর বাসের জন্যে বেণুবন নামক একটি বিহার দান করলেন।

কপিলাবস্তুর শাক্যগণ এ সংবাদ পেয়ে রাজা শুদ্ধোদনকে অনুরোধ করলেন—যেন তিনি সর্বোত্তম বুদ্ধের নিকট দূত পাঠিয়ে স্বরাজ্যে আনয়ন করেন।

ভগবান বুদ্ধ যখন রাজগৃহে তখন রাজা শুদ্ধোদন একবার দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করে দূত মুখে বুদ্ধকে বার্তা প্রেরণ করলেন—আমি বৃদ্ধ হয়েছি। শীঘ্রই ইহলোক ত্যাগ করব, মৃত্যুর পূর্বে তোমাকে একবার দেখতে চাই। কত শত শত নরনারী তোমার কথা শুনে মুক্তি পাচ্ছে, আমরা কেন বঞ্চিত হব? দূত মুখে পিতার আমন্ত্রণ পেয়ে বুদ্ধ শীঘ্রই কপিলাবস্তুর দিকে যাত্রা করে নগরের একটি উদ্যানে সশিষ্যে আশ্রয় নিলেন। সুদীর্ঘ সাত বৎসর পর এবার পিতাপুত্রের মিলন হল। শাক্যকুলধ্বজ পুত্রকে দেখে একটি উদাহরণ দ্বারা বুদ্ধকে বললেন—"সাধুপোষেত" তোমার মত উত্তম পুত্র পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। চক্রবর্তী-রাজ্য এবং জ্ঞাতি পরিজনবর্গ পরিত্যাগ করে তোমার সেই অভিনিষ্ক্রমণ সফল হয়েছে। দেব ও মনুষ্যলোকে তোমা-সদৃশ ব্যক্তি আর নেই। সর্বলোকের প্রতি তুমি অনুকম্পাবান। পিতা পুত্রকে কয়েক দিনের জন্যে থাকবার অনুরোধ জানালে স্নেহান্ধ পিতার স্নেহ-প্রীতি সবকিছু মধ্যে প্রসারিত করে নূতন অনুভূতি দিয়ে সেই দিনের মত পুত্র পিতাকে বিদায় দিলেন।

পরদিন প্রাতে বুদ্ধকে কপিলাবস্তুর রাজধানীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে দেখে রাজা শুদ্ধোদন বুদ্ধকে বললেন—বৎস, কেন তুমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতেছ? আমি কি তোমায় দুটি খেতে দিতে পারব না? আমাদের বংশে কখনও কেহ ভিক্ষা করেনি। তদুত্তরে বুদ্ধ বললেন—কিন্তু আমার বংশের বোধিসত্ত্বদের এই প্রথা। তাই আমি প্রথানুসারে কর্ম করতেছি। বুদ্ধ নানা প্রকারে পিতৃসন্নিধানে নবধর্ম প্রচার করলেন। মাতা প্রজাপতি, গৌতমীপুত্র নন্দ, দেবদত্ত, উপালি, আনন্দ—একে একে প্রত্যেকে বুদ্ধের আশ্রয়ে আসলেন। আনন্দ বুদ্ধের অন্তরঙ্গ-ভাবে ছায়ার ন্যায় তাঁর অনুগমন করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রভু বুদ্ধের সেবায় রত ছিলেন; গোপা একদিন বাতায়ন হতে বুদ্ধকে দেখে পুত্র রাহুলকে বললেন—ঐ সৌম্য মূর্তি পুরুষসিংহ তোমার পিতা, যাও উঁহার নিকট পিতৃধন যাচ্ঞা কর। মাতৃ নির্দেশে রাহুল পিতৃধন যাচ্ঞা করলে বুদ্ধ বললেন—বৎস, আমার ত পার্থিব ধন কিছুই নেই। জ্ঞান সম্পদ আছে। তাই আমি তোমাকে দেব। তখন বুদ্ধ আয়ুষ্মান শারিপুত্রকে ডেকে সাত বৎসর বয়সেই তনয় রাহুলকে প্রব্রজ্যা বা দীক্ষা দেওয়াইলেন।

পিতামহ পৌত্রের দীক্ষার কথা শুনে বুদ্ধকে বললেন—"প্রভো!" আপনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলে, পরে নন্দকে প্রব্রজিত করালে আমার কম দুঃখ হয়নি। রাহুল প্রব্রজ্যা গ্রহণ করায় আমার সর্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ হয়েছে। অতএব আমি প্রার্থনা করতেছি—যেন, আর্যগণ মাতাপিতা কর্তৃক অননুজ্ঞাত পুত্রকে প্রব্রজ্যা প্রদান না করেন।

এরূপে তিনি বুদ্ধত্ব লাভের পর ত্রিতাপদগ্ধ জীবগণের দুঃখ মোচনার্থে পঞ্চচত্বারিংশ বৎসর ব্যাপী বিভিন্ন দেশে তাঁর নবাবিষ্কৃত ধর্ম প্রচার করলেন। এখন বুদ্ধ অশীতিবর্ষে পদার্পণ করেছেন। বার্ধক্য তাঁর বলিষ্ঠ দেহ ভেঙ্গে দিয়েছে। শিষ্যদের কেহ কেহ ইহলোক ছাড়িয়ে গিয়েছেন। অতঃপর বুদ্ধের আদেশে বৈশালীর নিকটে ভিক্ষুরা সমবেত হলে বুদ্ধ তাঁদের বলেছিলেন—ভিক্ষুগণ—আমি তোমাদের নিকট যে ধর্ম প্রচার করেছি তোমরা তা অকপটে আয়ত্ত কর। প্রচার কর। সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ কর। যাহা অবিনশ্বর তার অন্বেষণ কর, নির্বাণপদ লাভ কর। পরিশেষে বুদ্ধ দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন—সংযোগ উৎপন্ন দ্রব্যমাত্রেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তোমরা অবিচলিত অধ্যবসায়ে নির্বাণপদ লাভ কর। ইহাই মহামানব বুদ্ধের অন্তিমবাণী। এ কথা বলতে বলতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। সেই নিঃশ্বাস আর ফিরল না।

সবুজের স্বপ্ন

হরিসাধন গোস্বামী

দিগন্ত-প্রসারী ক্ষেত্র—
তারি মাঝে সর্বত্র
ভ'রে গেছে সবুজ ধানের শিষে,
যেন অনন্ত সমুদ্র এক পড়ে আছে
সবুজ আবরণে মিশে।
মাঝে মাঝে বাতাসের দোলা লাগে,
সে দোলায় পরম সোহাগে
ছোট ছোট শিষগুলি
খুশীতে মাতিয়া যেন করে কোলাকুলি
পরস্পর জড়ায়ে ধরে।
দুটি অতৃপ্ত আঁখি ভ'রে
চাষী হারাণ চেয়ে চেয়ে থাকে
আপন কাজের ফাঁকে ফাঁকে—
যেন ক্রীড়ামত্ত সন্তানের পানে
চেয়ে আছে জননী কোন্ বিমুগ্ধ নয়নে!
সে সবুজ সাগর মাঝে
দুরন্ত বাতাসের দোলা লাগে তরঙ্গের সাজে;
ও দোলা তো দোলা নয়—ওযে হারাণের
মনের কবিতা
ও দোলায় দোলে কত আশা আর
নিরাশার কথা,
তরঙ্গের দোলনা-পথে সবুজ মিছিল
চোখে তার আঁকে ছবি কত স্বপ্নিল :—
আসন্ন নবান্নের উৎসবে
আবার মুখর হবে
তার ছোট্ট কুটিরখানা;
ঝকঝকে নিকানো আঙিনা
বিচিত্র আলিপনে
হবে মনে
যেন কোন শিল্পীর চিত্র-পটে আঁকা!
খুশীর আবেশ-মাখা
সদ্যস্নাতা বধূদের শুভ-শঙ্খগানে
আর সোঁদাগী ধানের সুমিষ্ট আঘ্রাণে
আকাশ বাতাস ঘিরে ছড়াবে সে আনন্দের রেশ—
মুছে দেবে একটানা বৎসরের কর্ম ক্লান্তি-ক্লেশ!
সহসা যেন কোন স্বপ্নের কবি
আঁখিপাতে আঁকে তার বধূর ছবি—
একখানি ডুরে শাড়ি—ডুরিদার পাড়
বধূ তার চেয়েছে কতবার
সদাহাসে সোহাগ ভ'রে
মনের সে সাধ তার মনেই গেছে ঝরে!
সে ব্যথা হারাণের মনে
তীক্ষ্ণ কাঁটার মত বেঁধে প্রতিক্ষণে।
এবার শারদ-উৎসবে
বধূর সে মনের সাধ পূর্ণ করে দেবে!
এমনি কত স্বপ্ন-স্রোতে ভেসে চলে হারাণের মন—
হঠাৎ কখন
স্বপ্নের ঘোর কেটে যায়
এক ঝাঁক সবুজ শিষের ছোঁয়ায়!
চেয়ে দেখে এক গুচ্ছ ধানের চারা
বাতাসের দোলায় মেতে করে নড়াচড়া
হারি বক্ষ প'রে—
পরম সোহাগে তাদের জড়ায়ে ধরে
নিবিড় আলিঙ্গনে!
তাদের পরশে যেন আবেশ লাগে মনে,
মনে হয় স্বপ্ন তার সত্যি হয়ে ঘোরে
সারা হৃদয় জুড়ে!
বক্ষ-মাঝে পায় তাদের প্রাণের স্পন্দন
ও সবুজ গুচ্ছ বুকে রাখে যতক্ষণ!
অকস্মাৎ ভেঙ্গে যায় সেই স্বপ্নের প্রাসাদ
ক্ষণিক-আবেগে-ভোলা নিষ্ঠুর স্মৃতির আঘাত
মনে পড়ে জমিদারী হারিয়ে, পুঞ্জীভূত ঋণ
ও জমির মালিকানা কেড়েছে অনেকদিন!
মুহূর্তে শিথিল হয় গুচ্ছ-ঘেরা বাহু-আলিঙ্গন
যেন পরশিত জড়ায়ে সে ছিল এতক্ষণ!
সহসা এক বুক-ভাঙা করুণ দীর্ঘশ্বাসে
তার যত স্বপ্ন যেন কেঁদে কেঁদে
মিলায় বাতাসে!!

সঙ্গ-দোষী

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

দার্জিলিঙেই কেহ জানতো না যে শ্রীমতী অমিতা দত্ত কলিকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের সব-ইনস্পেক্টর, বেলভিউ হোটেলের তো কথাই ওঠেনা। হোটেলের অভিথি খাতায় তার নাম লেখা ছিল—শ্রীমতী চকলা দত্ত। পেশা—টাইপিষ্ট।

অবশ্য শ্রীমতী অমিতার অভিজ্ঞতা ছিল অত্যল্প। যে হেতু সে নবীনা। কিন্তু হিমাদ্রিপ্রসাদ ছিল তার ভাগ্যে। কারণ হিমালয়ের অঙ্ক দুটি সহরে দুটি চাঞ্চল্যকর অপরাধের রহস্য উদ্‌ঘাটনের সাথে জড়িত ছিল তার বুদ্ধিমত্তা এবং অপরাধ সন্ধানের নিবিড় ঐকান্তিকতা। লালবাজারকে যখন যুবতী জীবনের কর্মক্ষেত্ররূপে নির্বাচন করেছে, কেন না সে আইন-ভাঙ্গা দোষীদের ক্রীড়াঙ্গনে নিজের খেলার কৃতিত্বের পরিচয় না দেবে। সে কর্ম জীবিকার আশ্রয় তার সাধনায় আত্মনিয়োগ অবশ্য কর্তব্য। শ্রীমতী অমিতা দত্তের এই ছিল জীবনের চলার পথের নীতি।

১৯৮০ সালের গ্রীষ্মের দিনে শ্রীমতী গিয়েছিল দার্জিলিঙে একটি মহিলা অপরাধিনীর ক্রিয়া-কলাপ অনুসন্ধান করতে। কিন্তু সে কাহিনী এ গল্পের আখ্যানবস্তু নয়।

বেলভিউ হোটেলের অপর এক ঘরে অস্থায়ী বাসা বেঁধেছিল সদা-সুহাসিনী মনোরমা তরুণী শ্রীমতী ইন্দিরা রায়। যোগ্য মেলে যোগ্যের সাথে—হাসির সঙ্গী হাসি। শ্রীমতী রায়ও এসেছিল ছুটির দিনে বিশ্রামের সন্ধানে। সহজেই দুটি তরুণীর জীবনের তরল গতি বহিল এক প্রণালীতে। ঈর্ষা বলতো—হেসে নাও দুদিন বইতো নয়। এদের সাবলীল মিলন গ্রাহ্য করতনা ভ্রুকুটি হীনপ্রাণ হোটেলবাসিনীদের।

মাত্র তিন দিনের মিতালী। কিন্তু পরিবেশের সহায়তা মিলনের ব্যাপারে সামান্য উপকরণ নয়। বসেছিল তারা বেলভিউ হোটেলের প্রফুল্লকুসুমিত উপবনের প্রান্তে মেঘের রাজ্যের বেকে। কী উজ্জ্বলতা। সার্থক নাম তাকনজঙ্ঘা। কবিত-কাঞ্চন বরণ, তার ওপর পড়েছে বালারুণের আলোর ঝলক। তার পাষাণ প্রাণ উচ্ছলিত সুষমায় প্রীত করছিল শৈল দর্শককে। কী কাণ্ড! এ শোভায় যদি দু'জন তরুণী হাততালি দেয়, শ্রীমুখে হাসে তো, লজ্জায় সাধ্য কি তাদের আনন্দোৎসবকে ম্লান করে।

ইন্দিরা বলে—দেখ দেখ চকলা দিদি।

চকলা বলে—আঃ কি শোভা ইন্দিরা।

ইন্দিরা হাততালি দিয়ে বলে—এই তো স্বর্গ। যেন জন্মছে। কী বল চকলা দিদি। বেঁচে থাক্ বড়ুয়া, আর লামা। তাদেরই প্রসাদে আজ ভাগ্যে জুটলো এ দৃশ্য দর্শন। গরীব শিক্ষয়িত্রী পয়সা কোথায় পেতাম!

'স্বভাব যায়না মোলে, ইজ্জত যায়না ধুলে।' প্রতিদিনের কাজ মানস-সরোবরের গভীরে সেনে পলী। তার স্পর্শ রূপ দেয় আবেগকে। শ্রীমতী অমিতা হৃদয়-গুহায় অমিয়ে রেখেছে—গোয়েন্দা বৃত্তি। কবি যেমন সুরে, ছন্দে, রূপে, গন্ধে প্রত্যক্ষ করে অরূপের রূপ, রহস্য উদ্‌ঘাটন ব্রতী তেমনি চোরাইমাল দেখে অল্প শোকনে, স্বীকারোক্তি শোনে উচ্ছ্বাসের মধুর ভাষায়। কাঞ্চনজঙ্ঘার সাধ্য কি শ্রীমতীর প্রাণের তোষক গোয়েন্দা প্রবৃত্তিকে রোধে।

বড়ুয়া বড়ুয়া? লামা? তাদের অর্থে দার্জিলিং ভ্রমণ, হাত লাভের মূলের উৎস অন্ত লোকের অর্থ। আর যোগও মহেন্দ্র বড়ুয়ার সাথে লামা। ভারতের সাথে তিব্বত।

তার মন বলে হুঁ!

মুখ বলে—বড়ুয়া, লামা। উভয়েই বৌদ্ধ! ইন্দিরা তুমি কি বৌদ্ধ?

—হ্যাঁ? লামা? বড়ুয়া? আচ্ছা চকলাদি দেখতো পাহাড়ের ঐ ভাঁজের ছায়াটুকু। তার মলিনতা কি সোনার বরণকে আরও মনোরম করছেনা?

শ্রীমতী অমিতা বুঝলে। শৈলশোভা যখন মনের কথা প্রচার করেছে তাকে আবার স্বখাত সলিলে বহাতে গেলে আবশ্যক কথা ওল্টানো। কিন্তু শাক দিয়ে কী মাছ ঢাকা যায়? তার কর্মস্থলও—লালবাজার কালা-বাজার নয়।

ঘটনা-চক্রের প্যাচও খায় খেয়ালী। কারণ ঠিক সেই সময় তাদের নিচে রাজপথে দেখা দিলে এক লামা। হাতে প্রার্থনা চক্র, মৃদুমন্দ গতি, দেহ ঢাকা আলখাল্লায়। মুখের বুলি তারা পেলেনা শুনতে। হলদে মোটা ঠোঁটের কাঁপন দেখে বুঝলে সাধু মন্ত্র বলছে—ওম্ মণিপদ্ম হোম্।

এবার শ্রীমতী ইন্দিরার চমক ভাঙলো। বল্লে, হাসি থামিয়ে—আশা করি আমারই সাধু। চিরদিন আমি ওদের পবিত্র পুঁটলীটিতো আর রাখতে পারিনা। চার দিন বাদেই আমাকে ফিরে যেতে হবে সেই সুপাকার জঞ্জাল-ভরা পবিত্র তীর্থে—যার নাম কলিকাতা, সত্যিই আমাদের সহরের দেবতা—মণি।

সমানে আলো ছায়ার অভিনয় দেখাতে লাগলো বালারুণরঞ্জিত শৈল—হিমাচলের শিখর। লামা কিন্তু হোটেলের গড়ানো পথে না উঠে সটান গেল মলের দিকে—মালা জপতে জপতে চাকা ঘোরানোর সঙ্গে তাল রেখে।

শ্রীমতী ইন্দিরা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। তাই তার কথার স্রোত বয় ধীরে ধীরে। এক এক বার উচ্ছ্বাসে ওঠে তার প্রাণের গভীর হতে হিমালয়ের দৃশ্যে। আবার প্রতীক্ষার উপেক্ষায় প্রকাশ পায় তার শৈল ভ্রমণের গোপন কথা।

তার এ হোটেলে বাস করবার সৌভাগ্য এসেছিল অকস্মাৎ। তার ফলে এক সপ্তাহ কাল এই সুন্দর পার্বত্য নিবাসে কাল কাটাবার সুযোগ লাভ করেছিল তার ভাগ্য। গ্রীষ্মের ছুটির প্রারম্ভে দার্জিলিং বাসের বাসনা গুমরে উঠেছিল তার চিত্তে। কিন্তু 'অর্থমনর্থম' তৃষ্ণার্ত সুখের প্রধান উপকরণ। সে বাজারে চাঁদমারীতে এক সুলভ পান্থশালায় বাস করবার বন্দোবস্ত করেছিল, কিন্তু শ্রীবড়ুয়ার ধর্ম পিপাসা ছদ্মবেশ ছুঁড়ে বর্ষণ করলে তার উপর সৌভাগ্য। ধর্মপ্রাণ একটি পবিত্র উপহার পাঠাতে চেয়েছিল লামাকে। সেইটি তার হাতে দিল, সাথে এলো বেলভিউ হোটেলে বাসের সাত দিনের খরচের টাকা। সাধু-সঙ্গ তাই স্বর্গবাস। অবশ্য লামার আশীর্বাদ বর্ষিত হবে বড়ুয়া-শিরে—যার ফলে কে জানে তার কী হবে।

গল্পটায় ভাববার কথা আছে। গোয়েন্দা বুত্তিকে শুদ্ধ-করবার উপাদান বিদ্যমান এর অন্তরে। প্রথম বয়স্ক রূপ নিলে প্রেমের। তাই শ্রীমতী অমিতা ওরফে চকলা বল্লে—বুঝেছি বোন্। অন্ধ দেবতার আশীর্বাদ লামার চক্রের ঘোরণ পাকে। ভালো। বড়ুয়া করে কি? নিশ্চয় স্বপুরুষ!

এবার শ্রীমতী ইন্দিরার হাসির উচ্ছ্বাস তাকে করলে কম্পমান, স্পন্দন-সুন্দর, মুখর।

—আরে না না! বড়ুয়া বয়স্ক ব্যবসায়ী—আমার বাবার বয়সী। ধর্ম পাগল, লামার আশীর্বাদে ব্যবসায়ে তোর লাভ হবে—এই নিশ্চয়তার আকাঙ্ক্ষা। লামার কৃপায় কৃপার পাহাড় পাবে এই ভাব। তবে কালা-বাজারে কিনা কে জানে।

শ্রীমতী অমিতা হাসির স্পর্শে নিয়ে হল হাস্যোজ্জ্বল। কিন্তু কালাবাজারের উল্লেখে ঠিক করলে—ব্যাপারটা গড়াবে লালবাজারে।

সকল কথা স্বীকার করলে শ্রীমতী ইন্দিরা রায়। সঙ্ঘের পটভূমিতে ছিল রোমান্স। শিক্ষা-ব্রতী শিক্ষয়িত্রী প্রাণকে পুষ্ট করতে চায় জ্ঞানার্জনে। সেখানে সভা হয় জ্ঞান-বিতরণের শ্রীমতী সুবিধা পেলে যার সেবা সকয়িত্রী-রূপে। সেদিন মহাবোধি সোসাইটিতে এক বৌদ্ধ পণ্ডিত দিলেন পঞ্চশীল সম্বন্ধে বক্তৃতা। শ্রীমতী ইন্দিরা শিখলেন বৌদ্ধ-নীতি। যখন তুই চিত্তে দরজার কাছে এলেন ভিড়ের মধ্যে সাক্ষাৎ পেলেন এক মহিলা-বন্ধুর। অল্পের পর শৈল ভ্রমণ আবশ্যক—সে কথা তাকে বল্লেন শ্রীমতী। যাবে দার্জিলিং, পয়সা নাই। থাকবে চাঁদমারিতে, তবু তো হিমাচল। কেটে যাবে মেঘ—নবীন গরিমা ভাতিবে আবার দেহেতে তার। ভিড় সরছে ধীরে ধীরে।

পিছনে ছিল এক বয়স্ক ভক্ত। সে বুদ্ধ, ধর্ম, শরণ সব ব'লে ক্ষমা চাইলে তরুণীর সাথে কথা কহিবার দুইবার জন্য। অবশ্য সে তার পিতৃতুল্য। বল্লে সে স্বপ্নে আদেশ পেয়েছে তার লামা-গুরুকে উপঢৌকন পাঠাবার দার্জিলিং সহরে।

—লোকটি অমায়িক, জান চকলা দিদি। আমাকে বল্লে—মা ভোর নিয়ো না বুড়ার। তুমি আমার খরচায় সাতদিন থেকো বেলভিউ হোটেলে আর আমার পবিত্র উপহারের প্যাকেটটা দিও ভিক্ষুণী লামাকে। এ পবিত্র জিনিষ তোমার শুভ হাতে পাঠালে তোমারও কল্যাণ হবে—আর আমারও।

শ্রীমতী অমিতা অন্তরের সন্দেহ-স্রোতকে দমন করে বলে—তা' তাই ইন্ডিয়া, দার্জিলিং তো নামার তরা। বাজারে তো ধামা ধামা লামা। তুমি জানবে কিসে কে সেই পবিত্র ধর্ম-প্রাণ ?

আর একবার হাসির স্রোত উৎফুল্ল ইন্দিরাকে কাঁপালে। সে সুহাসিনী। কিন্তু এ হাসির স্রোত যারাস্থক হ'ত যদি নিকটে কোনও অন্য যুবক থাকতো।

সবারই শেষ আছে। লাভেরও। সে বলে—লামা হোটেলের এই বেয়ে আমার কাছে আসবে। সে বলবে—ত্রাণ। আমি তখন বলব—চেন্ পিয়ং। তখন হাতের প্রার্থনা-চক্রটা ঘুরিয়ে লামা বলবে—ওম্ মণিপদ্মে হোম্। আমি তখন বলব—নলজোপ্‌রা।

তিব্বতী কথাগুলো বলে শ্রীমতী তার হ্যাণ্ডব্যাগ হতে একটুকরা কাগজ বার করে দেবে। অবশ্য কথার তালে তালে ছিল প্রাণ-মাতানো হাস্য। এদিকে সুড়সুড়ি-বাক্যের ইন্দিরা উত্তেজিত করছিল তার নতুন বন্ধুকে।

শ্রীমতী ইন্দিরা বলে—নলজোপরা শুনে লামার মুখে হিজি বুলি ফুটবে। তখন সে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করবে আমি উপঢৌকন এনেছি কিনা। আমি তখন নিঃসন্দেহে তার হাতে দেব—পুলিন্দা।

এরপর চিকচিকি তরুণীর চকল ঔৎসুক্য দেখতে চাইল প্যাকেট। বন্ধু অমায়িক। সে দেখালে মোড়ক। বেশ সুন্দর সরস কাগজে মোড়া—উত্তম সেলাই। বোধহয় টিনের বাক্সে রক্ষিত উপহার। কিন্তু উপরে গুঁড়া চন্দনের ছিটা।

সব্ ইনস্‌পেক্টর শ্রীমতী হত বুঝলে—ওজনের আন্দাজে পুলিন্দা হবে তারি। তার পর পাঠাবার পদ্ধতি। ইন্দিরা রাশীয় তিব্বতী বার্ষী—ইত্যাদি, ইত্যাদি। সে তো আর লালবাজারে বৃথা কাল কাটায় নি। তার অন্তরাত্মা বলে—হুঁ! বুঝেছি।

কিন্তু এ লাস্যময়ী হাসিরাশি কী দোষী? হয়তো নিরপরাধ। সে তথ্য প্রকাশ পাবে আসছে দিনে। আপাতত শ্রীমতী অমিতার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বলে—বাক্সে আছে সোনা—বা ধর্মপ্রাণ শ্রীযুতা পবিত্রচিত্ত লামার হাতে পাচার করতে সচেষ্ট বিনা শুল্কে তিব্বতে।

শ্রীমতী অমিতা দত্ত বি-এ নিশ্চয়ই অবগত ছিল সংযুক্ত ভাষার প্রচারিত নির্দেশ—দুর্জনকে দূরে পরিত্যাগ করবে, সেরূপীয়রের বচনও জানতো—চোর এবং দুষ্টের জন্য কটক রাখবে বন্ধ। কিন্তু তার উপজীবিকার মূলে ছিল ছিদ্রান্বেষণ। চোর, ডাকাত, খুনে, ধর্মযাজ, জুয়াচোর, বিশ্বাসঘাতক প্রভৃতির কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা ছিল তার সাধনা। নব-পরিচিতা বাগ্‌মিতা ছিল এক আইন-ভাঙ্গা কাজে। অন্য কেহ হলে যান্‌তো নীতি—দুর্জনং দূরে পরিহারেৎ। কিন্তু লালবাজারের কর্মচারী সে। দৃঢ় করলে বন্ধুত্ব—আটার মত লেগে রইল তার চলা-ফেরার সঙ্গে। মনে মনেও বল্লে—হে মা কালী, পবিত্র লামাকে পাঠিয়ে দাও। হাতেনাতে দুজনকে বাগাল ধরি। দেখাই পুরুষ পুলিসকে যে আমরা কম নই—বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্মকুশলতায়।

বুঝলে আর দুদিনের মধ্যে যদি না শুল্ক-মারা লামা আসে—পুলিন্দা যাবে চলে কলিকাতায়—শ্রীনিরঞ্জন বড়ুয়ার গৃহে।

(২)

যা অবশ্যম্ভাবী ঘটলো তাই। এলোনা লামা। কাজেই দার্জিলিঙের পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট এবং অগ্নি-শুল্ক বিভাগের সহকারী সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট অভিযান করলে শ্রীমতী ইন্দিরা রায়ের কক্ষে। হোটেলের সুখ্যাতি এড়াবার জন্য তাদের কার্য্য-কলাপ গোপনে এবং সংযত ভাবে সাধিত হল। শ্রীমতী অমিতা গোপন করলে সেদিনও আত্ম-পরিচয়। বন্ধুর পক্ষ নিয়ে অভিযানকারীদের কাছে তার নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করতে ব্যস্ত হ'ল। শিক্ষয়িত্রী কিন্তু হাসলে অমায়িক হাসি, আর মাঝে মাঝে মৃদুপাত করলে শুধু বড়ুয়ার সে তার সঙ্গে পরিচয় করেছিল পঞ্চশীলের বক্তৃতার শুভানুষ্ঠানের পর। কী জঞ্জাল!

শান্তিরক্ষীরা ধীরে ধীরে কাপড় খুলে মোড়কের। বাহির হ'ল বড় চকলেটের বাক্স। জাল দিয়ে বন্ধ। ছুরি দিয়ে কাটলে চাকা। আত্মপ্রকাশ করলে দুইল হাতঘড়ি দুটি! অবশ্য অল্প মূল্যের।

এবার সুন্দরীর হাসি গেল উবে, গাল হ'ল লাল। মুখে প্রকাশ পেল আতঙ্ক আর তার সাথে ঘৃণা। সে কাতরে বল্লে—

—হিঃ হিঃ কী ভণ্ড! মিথ্যা-কথা-ধর্মধ্বজী লামার

শুভাশীর্ব্বাদ সকলের। আমি ভয় করিনা জেলে যেতে। কিন্তু কী অত্যাচার। চোরের সাক্ষী! নিশ্চয় নির্দোষ। আচ্ছা চকলাদি—এঁদের জিজ্ঞেস করনা—এগুলো কী চোরাই ঘড়ি?

তারপর কাঁদলে। বল্লে—হায়ভগবান কপালে ছিল—চোরাই কারবারে। হা ভগবান।

অমিতা তাকে শান্ত হতে পরামর্শ দিয়ে বল্লে—এরা নিশ্চয় বিচার করবেন। আচ্ছা বড় সাহেব! এগুলো কী বিনা শুল্কে বিদেশ যাচ্ছিল? এইটাই না মামলা?

তারা হাসলে। বল্লে পুলিস প্রধান—শ্রীমতী রায় সব সত্য কথা বল্লে, ওঁর ভয় অল্প। উনি হতে পারেন নির্দ্দোষ বাহন। আমরা পরে আপনাদের কথা শুনব।

মাল ধরার ফিরিস্তি হল। স্বাক্ষর হ'ল। সাক্ষী হ'ল তিনজন—কুমারী দত্ত আর দু'জন হোটেল কর্ম্মচারী। তারপর শ্রীমতী রায়ের জবানবন্দী হ'ল। সে স্পষ্ট পরিচয় দিলে শ্রীজিনবন্ধু বড়ুয়ার। কেমন মহাবোধি সভার বক্তৃতায় শেষে সে তাকে মিথ্যা প্রলোভনে নাগার হাতে দিতে বলেছিল মোড়া বাক্স চন্দনের গুঁড়ায় সিক্তিত। অপরাধী ভবানীপুরে। চিওন বস্ত্রালয়ে বস্ত্রব্যবসায়ী। সকল বিবরণ হ'ল লিপিবদ্ধ।

শুল্ক বিভাগের ইন্‌স্‌পেক্টর শ্রীপ্রধান কর ফাঁকি দিয়ে মাল-চালানোর অপরাধ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছিল—হিমাচল প্রদেশে। সে নিজের মনে বিচার করলে অবশ্য খোস্‌কুরা নেপালী ভাষায়।

ছটা ঘড়ি। ধর কলিকাতায় পাঁচশত টাকা দাম। মহিলার হোটেল খরচ ৩০০৲ টাকা। ৮০০, লাভ ২০০, এক হাজার। ভিয়েতে ছটা ঘড়ির দাম ১২০০ টাকা। খরচ হাজার টাকা। লাভ মাত্র ২০০। কিস্তোতা হন্‌চ? কেমন করে হবে? আরতো রামরু বাক্সটাই। অন্য কথা আছে।

সে নিজের সন্দেহের কথা প্রকাশ করলে। সত্যই তো। ব্যাপার কী!

কিন্তু সব সন্দেহ দূরে গেল যখন তার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী শ্রীরামবন্ধু জ্যোতি চকলেট আধারের নীচের কাগজের তলায় পেলে টাইপ ছাপা ইংরাজি পত্র—

"প্রিয় ভূপে রীসা—নমুনা পাঠাচ্ছি। এর মূল্য ১২০০ টাকা শীঘ্র পাঠিও। আরও ঘড়ি প্রস্তুত। ছটা, ছটা পাঠাব। আমার পুরাতন ঠিকানায় দু' হাজার টাকা পাঠিও। জে বী।"

এবার শ্রীপ্রধানের সংশয় গেল দূরে। সে বল্লে হ্যাঁ। বুঝতী কেন এমন হলে? সবই তো মানুষ চেনায়। ভেরা ভেরা সড্ বকরা বকরা সড্। বিস্‌তো দেশ ভিন্তো ভেশ। দেখা যাক্ কী হয়। একটা পাচার তো বন্ধ হল, যা হয়, মামা ভাল্লা কানা মামানিকো। নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

(৩)

শীত শৈলে ভরাসের সঙ্গে সঙ্গে দোকান ভরাশ হ'ল ভবানীপুর চিওন বস্ত্রালয়। এ ব্যাপার যেন অভিনয়। যেমন উত্তেজক তেমনি হৃদয়ের উচ্ছ্বাস গগনস্পর্শী। শ্রীজিনবন্ধু বড়ুয়া বয়স্থ ব্যক্তি। সে সর্ব্বনাশ দেখলে, দোকানে পুলিস ও শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারীদের অশুভ আগমনে। হ্যাঁ! একা রামে রক্ষা নাই, আবার সুগ্রীব সহায়, সে লাফালাফি করলে—উচ্চকণ্ঠে বল্লে—একটা দারুণ ষড়যন্ত্রের হাড়িকাঠে সে নির্দ্দোষ বলি। ইন্দিরা রায়? হা ভগবান! সে কোনো ইন্দিরা কিন্নিরাকে চেনেনা। হাতঘড়ি! সে মাত্র ছুটির অধিকারী, একটি সে দেখালে। অন্যটি তার পুত্রের মণিবন্ধে। সে গেছে আশুতোষ কলেজে।

মামার কথায় সে বিস্মিত হ'ল। মামা? সে খেরাবাদী। মামাদের অলৌকিক ভেলকীবাজি সে মানে না। আছে এদের মধ্যে ধার্ম্মিক। কিন্তু সে তো একজনকেও চেনে না। হ্যাঁ মহাবোধি ধর্ম্মরাজিক বিহারে যায় সে ভগবানের উপাসনায়। কিন্তু ইন্দিরা? ঘড়ি পাচার? কী সর্ব্বনাশ! এবার সে কাঁদলে।

কান্নার ছন্দে কিন্তু সে মাথা চাপড়ালে যখন তৃতীয় ধাক্কে শান্তিপুরের সাড়ি-সারির পিছন হতে আত্মপ্রকাশ করলে রঙ্গমঞ্চে মোড়া চকলেট বাক্স—যার অন্তর ভেদ করে পুলিশ ও শুল্ক কর্ম্মচারী বার করলে ছয়টি ঘড়ি। কিছুদিন পরে শ্রীমতী অমিতা প্রমাণ করলে পুতিগন্ধময় কলিকাতার ঘড়ি, ধ্যান-গম্ভীর হিমালয়ে প্রাপ্ত ঘড়ি একরকম আকারেও প্রকারে।

কলিকাতার কাষ্টমহাউসে ভূমি-শুল্ক-বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্মকক্ষ যে কাছারী বসলো তার

কার্য্য কলাপের ছায়া ছবি প্রস্তুত হলে কাতারে কাতারে দর্শকের সমাবেশ হত। সে গৃহে ছিল কর্ম্মচারীরা আর দুটি সহ অপরাধী—ইন্দ্রিনভঙ্গ বড়ুয়া এবং শ্রীমতী ইন্দিরা রায়। নবীন শিক্ষয়িত্রী বালিকা বিদ্যালয়ের। সদা-প্রসন্না, হাস্য-মুখী ছিল সে শৈল-বিহারের সপ্তাহে। আর আজ দুদিনে তার শ্রীমুখ যাতে বিবর্ণ নয়, ভিন্ন ধরণের। কী দুষ্টুমী। ধর্ম্মের নামে তার নিষ্কোষ হাত কলুষিত, আইন ভাঙ্গা, শুধু ফাঁকির কথা ঘড়ির আবার স্পর্শে। ছি! মানুষ নামতে পারে জীবনের এতো নিম্নস্তরে। তার চিত্তের ভাব প্রকটিত হচ্ছিল প্রতি অক্ষরে, চাহনীতে, অঙ্গুলি সঞ্চালনে।

কী কাণ্ড! বয়োজ্যেষ্ঠ বহু ব্যবসায়ী। চিরদিন সরল পথে চলেছে, অহিংসার মন্ত্র জপেছে, তার নামে মিথ্যা মামলা। ভারতের গগনা চলতে পারে এমন পথে—যার অঙ্গশ্রী মনোরম। আর সে মিথ্যা বাদিনীর সহায়ক কে সে দুর্ব্বৃত্ত—যে ফাঁক তাহার তার চিত্তন বস্ত্রালয়ের পণ্য বস্ত্রের পিছনে রেখে ছিল একটা নয়, দুটো নয়—ছটা ঘড়ি। ঘৃণা, রহস্য, বিভ্রম ও বিস্ময়তা প্রকাশ পাচ্ছিল তার মাথার টাক হতে পায়ের অঙ্গুলির সঞ্চালনে একবার তার ভাব দেখে মনে হল সে শ্রীমতীর গলা টিপে দেবে। কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দ তাকে হত্যাপরাধে সহায়তা করলে না।

উভয় পক্ষের অভিনয় চল চিত্তাকর্ষক। অথচ এদের মধ্যে এক পক্ষ নিশ্চয় দোষী। এ-সভা হতে কর্ম্মচারীরা স্থির করতে পারলে না কে দোষী। মামলা মুলতুবী করে তারা বিদায় দিলে উভয় পক্ষকে। দেখে অবাক শ্রীযুধোপাধ্যায় বল্লেন—মতো আজ পৌঁছতে পারলাম না। যদি এ ব্যাপারটাকে প্রতিযোগিতা ভাবা যায় অভিনয়ের, আমি তো পারিনা সিদ্ধান্ত করতে যে পক্ষ কার প্রাপ্য। আপনারা কী বুঝলেন?

সকলে এক বাক্যে বল্লে—সমান অভিনয় উভয়ের। দুজনই পক্ষের দাবী করতে পারে।

(৪)

সে দিন কাইম ও পুলিস উভয় বিভাগের যৌথ সভা বসলো—অনেক তর্কের পর স্থির হ'ল—হয়তো উভয়েই দোষী, হয়তো কেহ নয়। মহিলা মিথ্যা কথা বলেও, প্রমাণ নেই যে সে জানতো বাক্সিলের আভ্যন্তরীণ পদার্থের স্বরূপ। আর পথের ধারের দোকান—কোনো কর্ম্মচারীর দ্বারা বা যার খরিদ্দারবেশীর হাতে কাপড়ের সিল্কনে মোড়ক রাখা খুব বেশী ব্যয়সাপেক্ষ নয়। শ্রীবড়ুয়া একথাও বলে—যে খরিদ্দারেরাও সময়ে সময়ে খাম থেকে পছন্দসহি কাপড় পাড়ে। সম্ভব।

—কিন্তু কোন্ শত্রুতা, এমন ব্যয়সাধ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করলে ইন্দিরাকে। আর কেন?—জিজ্ঞাসিলেন পুলিসের ডেপুটি কমিশনার।

কাষ্টমস কর্ম্মকর্ত্তা বল্লেন—এ বিষয়ে বড়ুয়ার ব্যবহার তার পক্ষে এবং বিপক্ষে। সে বলে, না জেনে শুনে কার নাম বলবে যখন তার শত্রুর অভাব নাই। সত্য হলে এ কথা তার চরিত্রের নির্ম্মলতার প্রমাণ। আবার হতে পারে মিথ্যা প্রমাণ হবে এই ভেবে শত্রুর নাম বলছেনা চালাকী করে।

কিন্তু সভার শেষে একমত হ'ল কর্ম্মচারীবৃন্দ যে আইনে কোনো অপরাধ হয়নি। লাঘার হাতে বাক্স দিলে অপরাধের চেষ্টার মামলা হ'তে পারত।

সুতরাং স্থির হ'ল গোয়েন্দা লাগিয়ে উভয়ের চলাফেরা কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করা ব্যতীত আপাততঃ করবার কিছু নাই।

সেদিন শনিবার। সূর্য্যদেবতা প্রমাণ দিয়েছেন তাঁর প্রভাবের। প্রায় পশ্চিমে-গরম—শুকনো তাপ।

লালবাজারে কর্ম্মকক্ষে বসে গল্প করছিল সবইন্‌স্পেক্টর শ্রীমতী অমিতা দত্ত আর ইন্‌স্পেক্টর শ্রীহর্ষ মৈত্র।

শ্রীমৈত্র বল্লে—কী বল মিস্ দত্ত, আজ সূর্য্যদেব সেলুসিয়র ওপর একটা ওভার বাউণ্ডারী করেছেন। তাপ মাত্রা কম-সে-কম ১০৬°।

শ্রীমতী বল্লে—তা হ'তেও বেশী। আহা দার্জ্জিলিঙ—

উভয়ে খুব হাসলে। দশদিন হ'ল সে ফিরেছে। আজ মামলার একটা হেস্তনেস্ত হবে।

শ্রীমৈত্র বল্লে—দেখ অমিত, রহস্য উপন্যাস লেখা হয় লেখক ও পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তির তৃপ্তির জন্য। গণিত শাস্ত্র, মনস্তত্ত্ব, দেহতত্ত্ব ওটা সন্ধানে কাজ করেনা তা বলছি না। কিন্তু প্রধান চাবিকাঠি জোটে ভাগ্যে। অপরাধী আর

গোয়েন্দা উভয়ের পক্ষেই সত্য—'যতই কর অস্বা ঘটান্ জগদম্বা।'

শ্রীমতী অমিতা এ কথা স্বীকার করলে না। শার্লক হোম্‌স্, ফাদার ব্রাউন, পোয়রো প্রভৃতির গল্পে যথেষ্ট প্রমাণ —বিচার শক্তির প্রাধান্যের।

শ্রীমৈত্র বল্লে—দুয়ে দুয়ে চার হয়—এ গণনা গণিত শাস্ত্রের। কিন্তু যাদের যোগ করতে হবে তারা ২ কি ৪ কি ৯—এ ঘটনার রূপ।

শ্রীমতী হাসলে—যার মাঝে স্পষ্ট ছিল বিদ্রূপ। সে বল্লে তাহ'লে আমাদের গোয়েন্দা বিভাগে জন কতক গণৎকার রাখা কর্ত্তব্য।

শ্রীমৈত্র বোকালে শ্রীমতীর নিজের মামলা হতে। শ্রীমতী রায় জেনেছিল অমিতার পেশা। সে অভিনন্দন করে তার মাঝে সমাচার দিয়েছিল—ঘড়ির প্যাকেটের। তার কাজ ছিল পুলিসের কাছে এ সংবাদ দেওয়া, বড়ুয়াকে ধরাবার জন্য। কপাল গুণে এ যোগাযোগ না হলে শ্রীমতী রায়ের ভাগ্যে এ তদন্ত জুটতোনা।

এবার মহিলা সব-ইন্‌স্‌পেক্টরের মুখ হ'ল হর্ষোৎফুল্ল। সে বল্লে—আমার আর যশ হ'ল কোথায়? আসল যশ লাভ করলে তুমি।

সে বল্লে—তা যদি সত্য হয় তো ষোলো আনা ভাগ্যের কথা। আমি প্রচ্ছন্নভাবে অনুসরণ করছিলাম তোমার সুন্দরী বন্ধুকে আর তার তরুণ বন্ধুকে। গঙ্গার ধারে প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে। সুন্দরী সত্য কথা বলে ফেল্লে রসিকতার ছলে। বন্ধুর রসিকতার পিপাসা বেচারা বড়ুয়াকে বিপন্ন করেছিল—ইন্দিরাকেও লালবাজার দেখতে হয়েছিল। নিছক ভাগ্যের সমাবেশ তাদের উভয়ের। প্রসঙ্গের শেষ আলোচনা বন্ধ হল—যখন ডেপুটি কমিশনারের কক্ষে তাদের ডাক পড়ল।

মাঝে বিচারকের মত গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট অবর পুলিশ কমিশনার। তার এক পাশে শ্রীমতী ইন্দিরা রায় অপরদিকে শ্রীজিনবন্ধু বড়ুয়া।

শ্রীমৈত্র এবং কুমারী দত্ত সম্মুখে স্থান পেলে।

শান্তিরক্ষক অবর প্রধান বল্লেন—শুনুন। আমাদের প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কর্ম্মচারীদের সশ্রম অনুসন্ধানের ফলে সব কথা জেনেছি। কুমারী রায় অবগত ছিলেন যে কুমারী দত্ত পুলিশ কর্ম্মচারিণী। সেটা যোগাযোগ। তা না হলেও ওর ওপর নির্দ্দেশ ছিল যে কথার ছলে ঘুরিয়ে কোনো পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট ঐ বাক্তিদের ও মালার সমাচার দেবে। ওর মনিব—

—মনিব!—কক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করলে শ্রীমতী রায়।

—অর্থাৎ এই নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্রের উদ্যোক্তা আগরওয়ালা—

—আগরওয়ালা?—সমস্বরে চীৎকার করলে শ্রীবড়ুয়া ও শ্রীমতী ইন্দিরা রায়।

জিনবন্ধুবাবু বল্লেন—এখন বুঝেছি। ওঃ! ওর সাথে আমার মামলা চলছে। চায় আমার উচ্ছেদ। আমি চেয়েছি দশ হাজার টাকা দোকান স্থানান্তরে নিয়ে যাবার খেসারত। ধনী শয়তান। মুখে মিষ্টি হাড়ে টক।

শ্রীমতী বল্লে—আমি আজ এই প্রথম শুনলাম তার নাম।

অবর প্রধান বল্লেন—হ'তে পারে—বদ্‌মায়েস হীরালাল তোমার কাছে নাম বলেনি।

শ্রীমতী বল্লে—মোটেই বদ্‌মায়েস নয়। একটা পহেলা এপ্রেলের কৌতুক করবার জন্য তাকে দিয়েছিল তার জানা লোক। এখন বুঝছি সেই লোকটা আগরবালার দূত।

—হাঁ। মহিম বোস। সে আগরবালার কর্ম্মচারী। সবারই যথাযোগ্য শাস্তি বিধান করা হবে।

কিন্তু মিস্ রায় জানতেন যে তার মিথ্যা সংবাদে বড়ুয়া মশায়ের সর্ব্বনাশ হবে।

—আমি দিব্য করছি মোটেই তা ভাবিনি। ভেবেছিলাম মজা হবে। পুলিশ ছুটাছুটি করবে। বড়ুয়া মশায় হাসবেন বেকুফ বনবেন। জানতাম প্যাকেটে আছে চকলেট। চকলেট কে খাবে জানতাম না।

পুলিশ কর্ম্মচারী বল্লে—বড়ুয়া নির্য্যাতনে মিস্ রায়কে নির্দ্দোষ হাতিয়ার ধরাবার চেষ্টা ছিল এ কর্ম্মের, মালা অবশ্য অলীক। আমার সব ইন্‌স্‌পেক্টরও ঠকেছে।

শ্রীমতী দত্তের মুখে অপ্রস্তুতের লক্ষণ দেখে অবর পুলিশ প্রধান সান্ত্বনে নিয়ে বল্লে—যে কোনো অভিজ্ঞ পুলিশ কর্ম্মচারীও ধাপ্পায় ভুলতো।

শ্রীমতী অমিতা দত্তের কর্ম্মতৎপরতা ও বুদ্ধি প্রশংসনীয়। ওর ভাবী-কাল উজ্জ্বল।

বাহিরে ছুটো মোটরের শব্দ হল। একটা কার তারস্বরে চিৎকার করলে। শ্রীমতী পরিতৃপ্তা হ'ল। মিস রায় তার দিকে তাকিয়ে হাসলে।

আবার বক্তৃতা।

পুলিশের—বিশেষ শ্রীমৈত্রের কুশলতার সব রহস্য ধরা পড়লো। বেচারা বড়ুয়া সর্বনাশের হাত হ'তে মুক্ত হল।

শ্রীদিনবন্ধু বড়ুয়া এবার ক্রন্দনের সুরে বলে—জয় ভগবান বুদ্ধ।

তারপর অভিনয় বিভিন্নরূপ পরিগ্রহণ করলে। শ্রীমতী ইন্দিরা রায় বড়ুয়া মহাশয়ের পদস্পর্শ করলে। সে গদগদ কণ্ঠে বলে—আপনি আমার পিতার তুল্য। আমি না জেনে রসিকতা করতে গিয়ে আপনার সর্বনাশে রত হ'য়ে ছিলাম। ক্ষমা করুন বাবা। ক্ষমা কর চঞ্চলা দিদি।

বৌদ্ধ বড়ুয়া। ধর্মপদ পড়েছে। চিরদিন চেষ্টা করেছে নীতি মানতে—

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলীকবাদিনং।

সে ক্রোধ সামলালো—সত্যের দ্বারা মিথ্যাপবাদ বিস্মৃতির চেষ্টা করলে। বলে—পুলিশ সাহেব! আমার কন্যাকে ক্ষমা করুন। যদি জেনেছেন আমি নির্দোষ, আমি কারও শাস্তি চাহিনা। কর্মফলই শাস্তি দিবে। ক'দিন বড় কষ্ট পেয়েছি পুলিশ সাহেব!

কিন্তু লালবাজার তো মহাবোধি সভা নয়। অবর প্রধান আজ্ঞা দিলেন রামরূপ আগরওয়ালা এবং হীরালাল বিশ্বাসকে ধরে আনতে।

ধনী আগরওয়ালা বিনয়ের অবতার। মৃদু হাসি মুখে শান্ত-শিষ্ট। দু'হাত জোড় করে প্রণাম করলে ডেপুটি কমিশনারকে।

শ্রীহীরালাল যেন কাঁচের মত স্বচ্ছ-সুন্দর। ভীত, ত্রস্ত।

বিচারকের ভঙ্গীতে পুলিশ কর্মচারী বলেন—আগরওয়ালা! তোমার জুয়াচুরির আমরা সব প্রমাণ পেয়েছি। বন্ধুকে ফাঁসাবার জন্য মিথ্যা দোষারোপ করেছিলে। চিওল বস্তাপর উচ্ছেদ করতে চাও।

এবার হাসলে ধনী ব্যবসায়ী। সে বলে—হাঁ, ঘরের দখল চাই। তার জন্য আলিপুরে মামলা চলছে তিন নম্বর সব-জজের এজলাসে। আর তো কিছু জানিনা। এসব কী শুনছি ইন্সপেক্টর সাহেব!

সে জানতো এক সহ অপরাধিনীর কথা ছাড়া তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নাই। সে মহিলাও তো তাকে চেনে না। কোনো অপরাধও হয়নি। দুজন কৃতী ব্যবহারাজীবী শ্রীপার্শ্বতী সরকার ও শ্রীশিবু সরকার বলেছে সরকার তার কিছু করতে পারবে না।

অবশ্য শ্রীহীরালালও তাকে জানে না। এসব কথা অবর পুলিশ প্রধান বিশেষভাবে অবগত ছিল।

কর্মচারী বলে—শোন। তোমাকে আমি সচেতন করছি। আমরা তোমার কালাবাজারি ও হুংকং থেকে বিনা শুল্কে মাল আনার সব সমাচার জানি। হুঁসিয়ার। খবরদার। পুলিশ এবার সজাগ থাকবে।

খুব বড় একটা সেলাম করে শ্রীরামরূপ আগরওয়ালা বাহিরে গিয়ে হিসাব করলে—ঘড়ির দাম, মেয়েটার হোটেল খরচা, উকীলদের মেহনতানা প্রভৃতি নিয়ে দু' হাজার টাকা। লাভ লোকসান তো ব্যবসার দুটো অঙ্গ। সেই দিনই কাটরা বাজারে সে তিন হাজার টাকা লাভ করেছিল।

অবশ্য ঘড়িগুলো সে দাবী করতে পারলে না। রাজকোষ পুলিশ মারফত কিছু লাভবান হ'ল। শ্রীমতী ইন্দিরা রায় প্রাচীন কথার মর্ম বুঝলে—দম্ভ মোহে গ্রাস নষ্ট।

দক্ষিণের ট্রেন

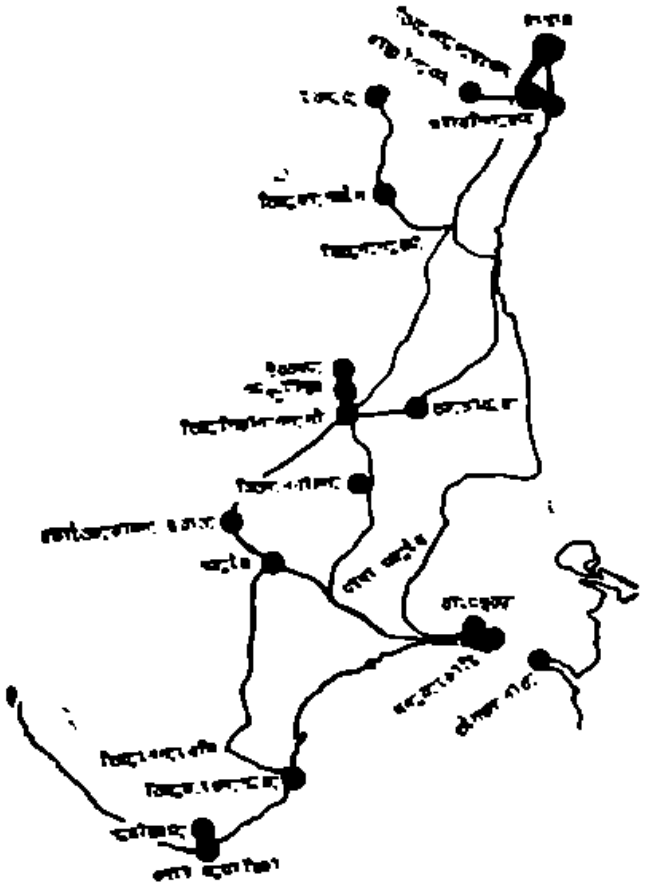

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৯

হেমন্তের দিন।

বেলা দশটার রোদে ঝলমল করছে আকাশ, মাটি, পথ, প্রান্তর, গাছ-পালা।

মণ্ডপম্ স্টেশন্-এর পর, ধনুষ্কোটিগামী আমাদের ট্রেন্‌টা যতই এগোতে লাগলো। ততই, দু'পাশের আদিগন্ত বিস্তৃত ভূমি সঙ্কুচিত হয়ে আসতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাঁ দিকে দেখা দিলো সমুদ্র।

চলমান ট্রেন-এর গায়ে সূর্যালোক প্রতিহত হয়ে স্থানে স্থানে চোখ ঝলসানো দ্যুতির সৃষ্টি করেছে। মনে হচ্ছে, যেন মুঠো মুঠো সূর্য-চূর্ণ ট্রেন-এর মাথায় ভাসছে। হঠাৎ দেখা গেলো ট্রেন্-এর ডান দিকেও সমুদ্র!

গাড়ী আরও কিছুটা যাওয়ার পর দু'পাশের সমুদ্র ট্রেন্-এর কাছে দ্রুত সরে আসতে লাগলো। যেন ছুটে আসছে নীলাম্বু—আমাদের বাষ্পরথকে গ্রহণ করতে। বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে, ভারতের ভূ-খণ্ড শেষ হয়ে আসছে।

একটু পরেই আমাদের গাড়ী ও দুপাশের সমুদ্রের মাঝে মাটির চিহ্নমাত্র রইলো না। আমরা সমুদ্রে পড়লাম।

অবশ্য জলে পড়িনি। আমাদের ট্রেনটা ভারতের মাটি ছেড়ে উঠে পড়লো Pamban Bridge-এ,—রামেশ্বরম্ দ্বীপের পথে।

প্রায় ৭০০০ ফিট্ লম্বা এই ব্রিজটি ১৯১০ সালে নির্মিত হয়েছিল। ব্রিজটির মাঝের অংশটির নির্মাণ কৌশল চমৎকার। বড় বড় জাহাজ যাতায়াতের সময়ে উপরে ওঠানোর ব্যবস্থা যুক্ত ঐ (Bascule Lift)

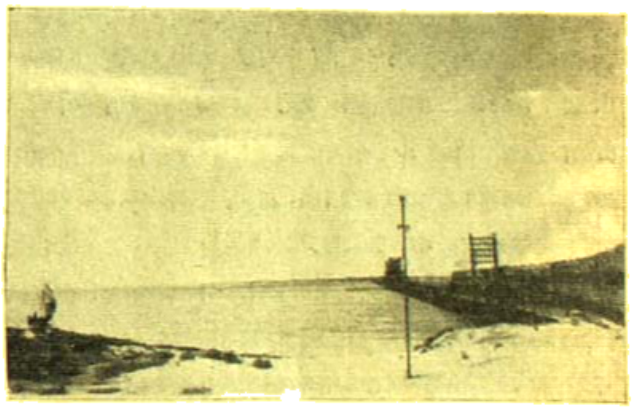

পাম্বন্ ব্রিজ্

অংশটি নির্মাণ করেছিলেন আমেরিকার Scherzer Co.। তাই ব্রিজ্-এর সামগ্রিক নাম পাম্বন্ ব্রিজ্ হলেও ঐ অংশটুকুর নাম Scherzer Bridge।

ভারতের মূল ভূ-খণ্ডের অদূরে দ্বীপ, রামেশ্বরম্।

সমুদ্রের যে অংশ রামেশ্বরম্‌কে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে তার নাম—পাম্‌বন্ প্রণালী। তমিল পাম্‌বু কথাটির অর্থ সাপ। সর্পিল আকার বলেই প্রণালীটির ওরূপ নামকরণ।

প্রণালীর স্বচ্ছ জলের তলায় দেখা যায় বালি এবং শিলাখণ্ড রচিত একটি পথ। পথটি এপারের মণ্ডপম্ হতে ওপারের রামেশ্বরম্ দ্বীপ পর্যন্ত গেছে। আবার রামেশ্বরম্ দ্বীপের ধনুষ্কোটি হতে সিংহল উপকূলের তলৈ মন্নার পর্যন্ত গেছে।

এই পথটিই রামচন্দ্রের সেতু।

তমিল ভাষীরা বলেন—তিরু বরনম্। তিরু অর্থে পবিত্র, আর বরনম্ কথাটির অর্থ পথ।

ইংরাজীতে পথটির নাম Adam's Bridge।

প্রাচীন আরব ঐতিহাসিকরাই ওরূপ নামকরণ করেছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল, নন্দন কানন হতে বহিষ্কৃত হয়ে আদম সিংহলে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

ইভ্‌কে মক্কায় রেখে সারা পৃথিবীতে আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে সিংহলে বসতি স্থাপন করতে মনস্থ করে তিনি উক্ত সেতু পথে ভারতে আসেন এবং ভারতের ভিতর দিয়ে মক্কায় ফিরে যান। তারপর ভারতের মধ্য দিয়ে আবার ঐ সেতু পথে উপনীত হন সিংহলে।

মণ্ডপম্ ও পাম্‌বন্-এর মধ্যবর্তী ঐ উপল-পথের কিছুটা ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে এক ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাত্যায় বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ফলে একটি খাড়ির সৃষ্টি হয়। ওই খাড়ি পথে দক্ষিণ হতে উত্তরে তথা উত্তর হতে দক্ষিণে নৌকা চলাচল করতো। ১৮২৮ সালে খাড়ির দুধারের কিছু অংশ অপসারণ করে প্রণালীটিকে বড় বড় জাহাজ যাতায়াতের উপযোগী করে তোলা হয়।

রামচন্দ্রের সেতুটির ধ্বংসের প্রায় সাড়ে চারশ বছর পরে, ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে পাম্‌বন্ ব্রিজ্ রচনা করে রামেশ্বরম্ দ্বীপ ভারতের মূল ভূ-খণ্ডের সঙ্গে সংযোজিত হয়।

রামেশ্বরম্ দ্বীপের প্রথম রেল স্টেশন—পাম্‌বন্। এটি একটি জংশন। এখান থেকে রেলপথের একটি শাখা গেছে রামেশ্বরম্ ও অপরটি ধনুষ্কোটি অভিমুখে।

বেলা পৌনে এগারোটায় পাম্‌বন্ ছেড়ে চললাম ধনুষ্কোটি।

ঘু ঘু বালিয়াড়ির মাঝ দিয়ে ট্রেনটি মন্থর গতিতে এগিয়ে চললো ধনুষ্কোটির দিকে।

পথে বাবলা গাছ ও ফণি-মনসা ছাড়া অন্য গাছ-পালা নেই। নেই কোনও লোকালয়ের চিহ্ন।

মাঝে মাঝে আছে দু চারটে আকন্দ ও দুধে-আলতা ফুলের গাছ। আকন্দ ও দুধে-আলতার ফুল ফুটেছে।

উপকূলের ঝড়ো হাওয়া ছটোপাটি করছে। দুলছে দুধে-আলতার ফুল। গায়ে তাদের এসে পড়ছে উড়ন্ত বালি। চারাগাছগুলি বালির ভারে নুয়ে পড়ছে। দুলে দুলে মাথা নেড়ে যেন ক্ষুব্ধস্বরে উড়ন্ত বালিগুলোকে অনুরোধ করছে,—অমন করে গায়ে পড়ো না।

পথে পড়লো রামেশ্বরম্ রোড্ স্টেশন। স্টেশনটির কাছে জনবসতি আছে। অতীতে ধনুষ্কোটি ও রামেশ্বরম্-এর মধ্যে যাওয়া আসার জন্য এই বসতিটির ভিতর দিয়ে পথ ছিল।

মিনিট পঁয়তাল্লিশ পরে আমরা পার হলাম ধনুষ্কোটি খিয়ার। এখান থেকে সিংহল যাওয়ার জাহাজ ছাড়ে। ধনুষ্কোটিতে পৌঁছলাম ঠিক বারোটায়।

স্টেশনটিতে বা তার আশে পাশে কোনও দোকান

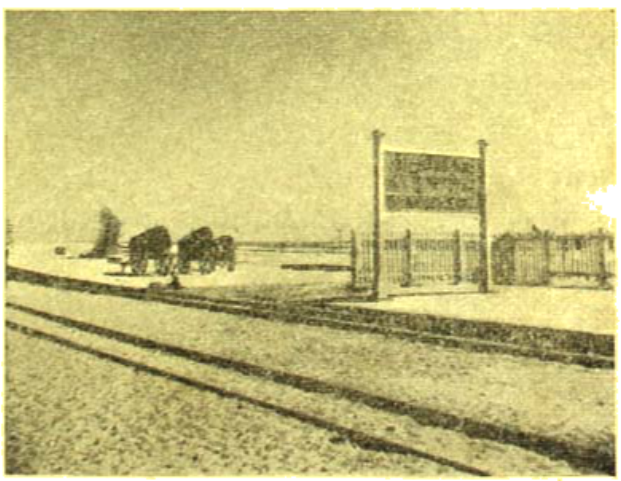

ষ্টেশন—ধনুষ্কোটি

পসার নেই। ফেরিওয়ালা নেই,—নেই যাত্রীদের চীৎকার।

গাড়ী থেকে নামতেই কানে ভেসে এলো সমুদ্র-গর্জন

মেশানো বাতাসের স্বগতম্ ধ্বনি। নিশ্চয় আমাদেরই উদ্দেশে,—আমরা যারা যারা নব আগন্তুক।

কোথাও খড়ের ছাউনি। ঘড়ের চাল দেওয়া ওয়েটিং রুমও আছে।

এক বৃদ্ধ কুলি এগিয়ে এলো। মালপত্র নামিয়ে ওয়েটিং রুম-এ রেখে দিয়ে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলো: সঙ্গম যাত্রা?

উত্তর ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে শেখা তার ঐ হিন্দী ভাষণ শুনে খুব স্বস্তি বোধ করলাম।

বললাম: হাঁ, হাঁ।

উত্তরে সে চমৎকার ভাষায় বললো: শীঘ্রীরম্ চলো। সঙ্গম সাড়ে এক মাইল। বহুত্ ডি সাড়ে দো কো যাত্রা। অর্থাৎ তাড়াতাড়ি চলো। সঙ্গম দেড় মাইল দূরে। গাড়ী আড়াইটেয় ছেড়ে যাবে।

ধনুষ্কোটিতে থাকবার সুব্যবস্থা নেই। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছতে হবে রামেশ্বরম্। তাই তাড়াতাড়ি পা চালালাম সঙ্গম তীর্থের দিকে।

কোথাও ভিজে, কোথাও শুকনো,—শীতল ও তপ্ত বালির উপর দিয়ে মিনিট পঁচিশ হাঁটবার পর ঈপ্সিত স্থানে পৌঁছলাম।

রত্নাকর ও মহোদধির অর্থাৎ, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের মিলন স্থলে ধনুষ্কোটি তীর্থ। বাঁধানো ঘাট নেই। স্নানের নির্দিষ্ট স্থানটির কাছে তালপাতার ছাউনি দেওয়া খানতিনেক দোকান। ভজন ও ভোজনের ব্যবস্থা রয়েছে। পূজার সামগ্রী আছে আর আছে কফি ইত্যাদি।

জলের ধারে বসে ছিলেন এক দ্রবিড় ব্রাহ্মণ। আমাদের কয়েকজনকে দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি বালি দিয়ে একটি লিঙ্গ মূর্তি গড়ে ফেললেন। স্নানান্তে ভক্তজন পূজা করবেন ওই লিঙ্গমূর্তির,—বিশ্বেশ্বরের।

রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের জন্য লঙ্কা অভিযানের প্রাক্কালে নির্মাণ করেছিলেন ভারতের মণ্ডপম্ হতে লঙ্কার তীর পর্যন্ত যে সেতু তা প্রকৃতপক্ষে দুটি সেতু ছিল। মণ্ডপম্ হতে রামেশ্বর দ্বীপ সংযোগকারী একটি এবং রামেশ্বর দ্বীপ হতে সিংহলের তীর পর্যন্ত একটি।

সীতা উদ্ধারের পর, অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের সময়, ভারত হতে লঙ্কার উপর এই সেতুপথে পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা নির্মূল করার জন্য শ্রীরাম এই সঙ্গম ক্ষেত্রে সেতুর যে প্রান্ত ছিল তা স্বীয় ধনু দ্বারা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। তাই নাম হয়েছে ধনুষ্কোটি।

রামায়ণে হনুমানের সাগর উল্লঙ্ঘনের মধ্য-পথে তাঁর বিশ্রামের জন্য সমুদ্র গর্ভ হতে মৈনাক পর্বতের উত্থানের কাহিনী আছে। বর্তমান ধনুষ্কোটি হতে সিংহলের উপকূল তলৈ মন্নার্-এর দূরত্ব ৩২ কিলো মিটার। আবার ভারতীয় মূল ভূ-খণ্ডের শেষ প্রান্ত মণ্ডপম্ হতে ধনুষ্কোটি পর্যন্তও ঠিক ৩২ কিলো মিটার। অর্থাৎ ধনুষ্কোটি সমন্বিত এই দ্বীপটি সিংহল ও ভারতের মূল ভূ-খণ্ডের ঠিক মধ্যপথে।

উক্ত হিসাব হতে, হনুমানের সাগর অতিক্রমের কাহিনীতে মধ্য পথে মৈনাকের অবস্থিতির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়। প্রাচীন মৈনাকই বর্তমান রামেশ্বর দ্বীপ। যার এক প্রান্তে—ধনুষ্কোটি।

ধনুষ্কোটির অপর পারে সিংহলের তলৈ মন্নার্। তলৈ মন্নার্ নামটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তমিল্ মন্নার্ শব্দের অর্থ শত্রু। আর তলৈ অর্থে ক্ষেত্র। সুতরাং তলৈ মন্নার্ হলো শত্রুদের স্থান। কারণ, লঙ্কা দ্বীপের আরম্ভ ঐখানে। নামটি অবশ্যই পৌরাণিক যুগের রাক্ষস অধ্যুষিত লঙ্কাকে চিহ্নিত করে প্রদত্ত।

সঙ্গম তীর্থে পৌঁছে জলের ধারে গিয়ে স্বর্ণাভ বালুকা-রাশির ওপর দাঁড়ালাম।

ডাইনে, বাঁয়ে, দু'দিকেই অর্ধবৃত্তাকারে নীল জলের অনন্ত প্রবাহ। মাথার উপর নীলের শামিয়ানা। জল তরঙ্গে পরিবেশিত হচ্ছে সাগর সঙ্গীত।

মনে হলো এ সব আয়োজনই আমার জন্য। আমি যেন আজ ক্ষণিকের ভূপতি!

সাগর কন্যারা ব্যজন করছে,—ছুটে আসছে কত দেখা-অদেখার স্পর্শমাখা বায়ু হিল্লোল। সে হাওয়ায় কোন সুদূরের গন্ধ!

উড়ে গেলো আমার মন। উড়ে গেলো হরীনাথের সান্নিধ্যে, হিমালয়ের এক নিভৃত চূড়ায়। ছুটে গেলো

দ্বারকার সাগর বেলাতে দ্বারকাধীশ সমীপে,—পুষ্কোত্তম ক্ষেত্রের ব্রহ্মকুণ্ডের মন্দির দ্বারে। ঘুরে এলো কামাখ্যার যোনি পীঠ,—গড়াগড়ি দিয়ে এলো কন্যাকুমারীর অঙ্গনে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ওই চরম লীলাভূমিগুলিতে যারা দেবস্থান স্থাপনা করে গেছেন তাঁদের ক্ষুদ্র-বোধকে আমার ক্ষুদ্র কণ্ঠে প্রশস্তি জানাবার স্পর্ধা করবো না। তাঁদের স্তুতির উপযুক্ত ভাষা আমার জানা নেই। শুধু তাঁদের গভীর মানব-মন সমীক্ষণের জ্ঞানকে প্রণতি জানাই।

এমন অসাধারণ ও অপূর্ব সব প্রাকৃতিক পরিবেশে তাঁরা দেবস্থান নির্দিষ্ট করে গেছেন যেখানে মানুষের অবাধ্য দুরন্ত মন আপনা হতেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় বিস্ময়ে, আনন্দে। সেই বিস্ময় আনে জানার মাঝে অজানার অনুভূতি। মন খোঁজে বিস্ময়ের স্রষ্টাকে, অজানাকে।

সে আনন্দের স্পর্শ মনকে টেনে নিয়ে যায় সকল আনন্দের উৎসটির দিকে,—সচ্চিদানন্দের পদমূলে।

সঙ্গম তীর্থে জলের গভীরতা অল্প। মাত্র কোমর পর্যন্ত। জল স্বচ্ছ।

ডুব দিয়ে উঠতেই এক আশ্চর্য মানসিক প্রশান্তি ঘটলো। বোধ হলো, এত দিনের কি যেন একটা না করার অতৃপ্তি শেষ হলো। যেন একটা অপূর্তির বিষাদ-ছায়া আমায় ছেড়ে গেলো।

রামচন্দ্রেরও তাই হলো।

অর্থাৎ রামচন্দ্রেরও তাই হয়েছিল। ধনুষ্কোটিতে স্নান করে উঠতেই দেখলেন বিষাদ-ছায়াটি অন্তর্হিত হয়েছে। এতদিন তাঁর দেহের যে দ্বিতীয় ছায়াটি তাঁকে বিষাদগ্রস্ত করে রেখে ছিলো তা আর দেখা যাচ্ছেনা।

সীতা উদ্ধারের জন্য তিনি রাবণকে বধ করেছিলেন। রাবণ ছিলেন ব্রাহ্মণ বিশ্রবা মুনির ঔরস জাত। তাই রাবণ নিধনে শ্রীরামের ব্রহ্ম-হত্যার পাপ হয়েছিল। সেই পাপ তাঁর শরীরের দ্বিতীয় ছায়া হয়ে সর্বত্র তাঁর অনুসরণ করছিল।

ধনুষ্কোটির সমুদ্রে স্নান মাত্র সেই পাপের মোচন হলো। রামচন্দ্র দ্বিতীয় ছায়া হতে মুক্তি পেলেন।

কয়েকজন যাত্রী স্নান সেরে উঠতেই দ্রবিড় ব্রাহ্মণটি শিবপূজার প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হলেন।

গৃহিণী সাবিত্রী অম্বল্-এর ইচ্ছায় সহযাত্রী নারায়ণ-স্বামী বসলেন শিবার্চনায়।

ওঁরা গরুর গাড়ীতে ফিরবেন।

সুতরাং ওঁদের জন্য অপেক্ষা না করে স্টেশনের পথ ধরলাম। নারায়ণস্বামী তখন আবৃত্তি করছিলেন :

রামস্য ধনুষঃ কোট্যা কৃত রেখাবগাহনাৎ।
পঞ্চপাতক কোটীনাং নাশঃ স্যাত্তৎক্ষণে ধ্রুবম্॥
শ্রীরাম ধনুষঃ কোট্যা রেখাং যঃ পশ্যতে কৃতাম্।
অনেক-ক্লেশ-সম্পূর্ণং গর্ভ-বাসং ন পশ্যতি॥

[ক্রমশঃ

"বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হতে..."

অধ্যাপিকা মায়াঞ্জনা গোস্বামী

পরিবার-কেন্দ্রিক বাঙ্গালী গৃহে নারী সংসার চক্রের কেন্দ্রস্থলে অধিষ্ঠিতা। বিবিধ শাস্ত্রীয়, সামাজিক ও আনুশাসনিক নিষ্ঠা নিয়মের পাকচক্রে নারী এদেশে নানাভাবে নির্যাতিত হলেও বাস্তে। কেন্দ্রে নারীর একান্ত মূল্য কেউই অস্বীকার করতে পারেন নি। সংসারস্থ বিভিন্ন একক ব্যক্তি ও ঘটনাকে একটি গুচ্ছে ধারণ করেন নারীই। তিনি একটি পুরুষ তথা একটি সংসার সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সাম্রাজ্ঞী। স্বভাব সন্ন্যাসী ও স্বভাব চঞ্চল পুরুষকে গৃহাভিমুখী করতে পারেন একমাত্র তিনিই।

সেইজন্য কোনো আকস্মিক অভিঘাতে সংসার তথা জীবন কেন্দ্রের এই সজীবনী সত্তার আকস্মিক অন্তর্ধান ঘটলে পুরুষ হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ অসহায়। বহু ক্ষেত্রেই সে দ্বিতীয় সঙ্গিনীর অনুসন্ধান করে বটে কিন্তু সেটা যতটা তার একান্ত নিজস্ব প্রয়োজনে, তার চেয়ে বেশী ব্যবহারিক জীবনের অসহায়তা ঘোচাতে। তার ব্যক্তি-জীবনের যন্ত্রণা ব্যক্ত হয় সাহিত্যে। উনবিংশ শতকে শোকের ধূসর মেদুরতা বাংলা সাহিত্যে বেশ কয়েকজন মহিলাকবিকে চিহ্নিত করেছে। স্বভাবগম্ভীর পুরুষ-চিত্তেও মৃত্যুশোক একই ভাবে অনুভূত হয়, এবং অনেক ক্ষেত্রে তার প্রকাশও দুর্লক্ষ্য নয়।

ভারতীয় জীবন দর্শনের বিশিষ্ট ভঙ্গি ও ঐতিহ্য মৃত্যুকে স্বীকৃতি দেয়নি। এই দৃষ্টি ভঙ্গি অনুযায়ী মৃত্যু লোক থেকে লোকান্তরে, জন্ম থেকে জন্মান্তরে, দেহ থেকে দেহান্তরে যাত্রার পথ মাত্র। মৃত্যুর বিলুপ্তিরূপ ধারণাটি তাই আদৌ তাঁদের কাছে গ্রাহ্য নয়। কিন্তু উনিশ শতকে পাশ্চাত্য জীবন দর্শন প্রভাবিত যে বিদেশী সাহিত্যের ভাব প্রবাহ আমাদের বাংলা সাহিত্যে নব-মর্ত্যবাদ সঞ্চারিত করলো তার প্রভাবে আমাদের চেতনা পূর্বরূপেই মর্ত্যমুখীন হল। মৃত্যুর বিনাশনত্ব সম্বন্ধে এই বোধ কিন্তু আমাদের সাহিত্যে নূতন নয়। রঘুবংশে ইন্দুমতীর মৃত্যুতে অজবিলাপ, রামায়ণে সীতাহারা রামচন্দ্রের কাতরতা আমাদের পরিচিত। দেশীয় সাহিত্য বৈষ্ণবদিগ গীতিকার মধ্যে করুণ পালাতেও এই মৃত্যুজনিত কাতরতা লক্ষ্য করব। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে সতীহারা শিবের উন্মত্ত তাণ্ডব দেবতাকে লৌকিক মোহ তথা শোকাধীন রূপেই চিত্রিত করেছে। কাজেই অতি স্বাভাবিক শোকানুভূতির যে তীব্রতা গভীরভাবে উপলব্ধ হয়েও সংস্কারানুগতির জন্য সহজ মুক্তির পথ খুঁজে পায়নি, উনিশ শতকের নূতন দৃষ্টিভঙ্গি সেই নিরুদ্ধ শোককে প্রকাশের পথ খুলে দিয়েছে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পুরুষের লেখা শোক কাব্য বেশ কিছু সংখ্যায় পাওয়া যায়। উনিশ শতকে নূতন দৃষ্টি ভঙ্গিই পুরুষকে অস্বাভাবিক আনন্দের মুখোশ থেকে শোককে মুক্তি দিয়ে তার স্বাভাবিক রূপকে চাহাকারে ব্যক্তিত করতে প্রেরণা দিয়েছে। সমপুস্তিকার তালিকায় এই শ্রেণীর কিছু গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। অঘোর নাথ ঘোষের "বৌ-কথক" (১৮৭৭ খৃঃ), বিজয়কৃষ্ণ বসুর "বিলাপ সিন্ধু" (১৮৭৩ খ্রীঃ) লক্ষ্মীনারায়ণ ঘিষের "বনিতা বিলাপ" (১৮৭৬ খৃঃ), চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" (১২৮২ বঙ্গাব্দ, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ), রাজকৃষ্ণ রায়ের "নিভৃত নিবাস" (১৮৭৮ খ্রীঃ), অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সুধা বিলয়" (১৮৭৮ খ্রীঃ) মুকুন্দবিহারী হালদারের "বিলাপী বিলাস" (১৮৭৮) এই জাতীয় গ্রন্থ। "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" ও "নিভৃত নিবাস" ছাড়া অন্য গ্রন্থ গুলির কোনো সাহিত্যিক অবদান নেই, মৃত্যুর তত্ত্বাবহতাকে স্বীকার করে শোককে কোনো অস্বাভাবিক দৈবী সাধনা ও আনন্দে আবৃত না করে মর্ত্যমানুষের হাহাকারকে ফুটিয়ে তুলেছে—এই গ্রন্থগুলির মূল্য এইটুকুই। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রশেখর

মুখোপাধ্যায়ের প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এই শোকোচ্ছ্বাসে সম্পূর্ণ গদ্যকাব্য 'ভগ্নহৃদয়' প্রেমে দীর্ঘ তিন বছরের গভীর মর্ম বেদনাকে প্রকাশিত করে লেখককে সমকালীন পাঠক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই গ্রন্থের ৬ষ্ঠ প্রস্তাবে লেখক তাঁর জীবনযন্ত্রণা ব্যক্ত করেছেন —"প্রাণ করে ধূ ধূ ধূ। যে দিকে তাকাই আগুন জ্বলিতেছে—ধূ ধূ ধূ। ধমনীতে ধমনীতে অনল জ্বলিতেছে—ধূ ধূ ধূ। প্রতি লোমকূপে, প্রতি ইন্দ্রিয়ে, প্রতি শোণিত-বিন্দুতে অনল জ্বলিতেছে ধূ ধূ ধূ। আর এ পাপ হৃদয়ের ভিতর কি যে হইতেছে, তাহা আর কি বলিব? কালানল প্রলয়ানল, নরকানল অনলের অনলত্ব রচিত অনল জ্বলিতেছে ধূ ধূ ধূ।" একটি মাত্র নারীর মৃত্যুতে এই সর্বগ্রাসী হাহাকারের বাঙ্ময় রূপ বাংলা সাহিত্যে এর আগে দেখা যায় নি। "সেই মুখখানির" প্রতি গভীর কাতরতা প্রকাশ করে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় নারীকে একটি বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত রাজকৃষ্ণ রায়ের 'নিভৃত নিবাস' কাব্যটিতে অনেক অর্থহীন বাগ্‌বাহুল্য ও চিন্তাবিস্তার থাকলেও ঈশ্বরের পরমকারুণিক সত্তায় সুতীব্র অবিশ্বাস ঘোষণা গ্রন্থটিকে বিশিষ্ট করেছে—

হায় অসম্পূর্ণ বিধি।
অসম্পূর্ণ সৃষ্টি মাঝে তব
অসম্পূর্ণ হয়ে আমি আজ
অসম্পূর্ণ সৃষ্টির তোমায়
অপূর্ণতা কহি কাজে কাজে।
... ...
নলিনী যে হারাল জীবন,
কার দোষে?—নলিনীর দোষে?
বিজয় নলিনী-শোকে কাঁদে
কার দোষে? বিজয়ের দোষে?
বিজয় নলিনী দোষী নয়,
তুমি দোষী বিধি দয়াময়!

শেষ কালে বিজয় নলিনীর বিয়োগ ব্যথা সহ্য করতে না পেরে প্রিয়ার মৃতদেহ বুকে জড়িয়ে গঙ্গায় আত্ম বিসর্জন করেছে। এই আত্মবিসর্জন আমাদের কাছে অতি-নাটকীয় বলে মনে হলেও মরদেহের বিনাশে এই ব্যাকুলতা আমাদের ঐতিহ্যাশ্রয়ী ও পরলোকে বিশ্বাসী মনের দিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে।

বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রথমা স্ত্রী অভয়া দেবী অতি অল্প বয়সে মারা যান। শোকসন্তপ্ত কবি তাঁর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বন্ধু বিয়োগ কাব্যের 'সারদা' শীর্ষক অধ্যায়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। সমকালবর্তী রীতি এবং বিহারীলালের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যানুযায়ী কবিতাটির মধ্যে সুপ্রচুর বাগ্‌বাহুল্য থাকলেও কবি চিত্তের বেদনা এখানে অনাবিলভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। এই অনতিকালজীবিতা মুগ্ধা বালিকা সন্তানসম্ভব কবি চিত্তের সুগোপন বেদনার মূলে অধিষ্ঠিতা হয়ে অন্ততঃ একটি কবিতার মাধ্যমেও সাহিত্যে স্মরণীয়া হয়ে আছেন।

নারী সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত এবং একান্ত বাস্তবানুগ-ময় চিন্তাধারা ছিল গোবিন্দচন্দ্র দাসের। নারীদেহকে অস্বীকার করে প্রেমের ও প্রেমাস্পদার প্রতি রোমান্টিক আকৃতির অবাস্তব দুর্বলতা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন এবং সেইজন্য ছিলেন দুর্দান্ত রকমের বিদ্রোহী আধুনিক চিন্তার মানুষ। তাঁর প্রথমাপত্নী সারদাদেবীর মৃত্যু ঘটেছিল ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর। এই মৃত্যুর আকস্মিকতা কবির স্বভাবে যথেষ্ট সন্দেহের সৃষ্টি করেছিল। শোক সন্তপ্ত কবির হাহাকার প্রেম ও ফুল এবং কুসুম কাব্যের প্রতিটি কবিতায় ব্যঞ্জিত হয়েছে। দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেও কবি সারদাকে ভুলতে পারেননি। একটি সামান্য নারী বারবার তাঁর বহিঃ ও অন্তর্ভুবনকে আচ্ছাদিত করেছে, সমগ্র দেহমন দিয়ে তিনি এই অপরাকে পেতে চেয়েছেন, প্রেমদার মধ্যে খুঁজেছেন এবং ব্যর্থতায় হাহাকার করেছেন। কোনো ঐশ্বরিক শক্তিতে বিশ্বাস ও আত্মার অমরত্বে আস্থা তাঁকে আশ্বস্ত করেনি।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর দ্বিজেন্দ্রলাল-পত্নী সুরবালাদেবীর লোকান্তর ঘটে। একটি সুখী, পরিতৃপ্ত গার্হস্থ্য পরিবেশের এই আকস্মিক তিরোধানে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন কবি। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাতে, নির্মম সমালোচনায় যিনি সমকালীন সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান অর্জন করেছিলেন, সেই দ্বিজেন্দ্রলাল এই আঘাত

হেসে ওড়াতে পারেননি। জীবনের এই আকস্মিক শূন্যতা সকরুণভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে আলেখ্য কাব্যে—

ক্লান্তদেহে, সন্ধ্যাকালে ফিরে এসে যখন
আপন ঘরে যাবো
কাহার কাছে বসবো এসে তখন আমি? কাহার
মুখের পানে চাবো?
ক্ষুদ্র দুঃখ সুখের কথা কইব আমি এখন
কাহার কাছে এসে?
যাহার কাছে কইতাম নিত্য গৃহ আঁধার করে
চলে গিয়েছে সে।

'আলেখ্য' কাব্যখানি নিঃসঙ্গ বিরহ গৃহস্থের হাহাকারে পূর্ণ—বিপত্নীক (২) কবিতায় সান্ত্বনাহীন লোক চ্যালেঞ্জ করেছে—

এই ত ছিল দেবী মূর্তি, আলাপ বিলাপ হাস্যরোদন
কচ্ছিল তো কাছে
কোথায় গেল, ফিরিয়ে দাও হে বিশ্বপতি
দাবী কর্চ্ছি, বল কোথায় আছে?
এই ত ছিল, গেল কোথায়, দেখা হবে আবার
কিম্বা এ চির বিচ্ছেদ?

শোকের তীব্রতম মুহূর্তে, মৃত্যুর চরম অন্ধতার লগ্নে তার মধ্যে জন্মান্তরীণ অমরত্বের সন্ধান ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র। সেই অস্বাভাবিকত্ব আলেখ্য কাব্যে নেই, মানবিক বেদনায় তা জীবন্ত হয়েছে।

এই পর্যায়ের দুখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' ও অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা'। ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ৭ই অগ্রহায়ণ কবিজায়ার দেহান্তর ঘটে। কবিচিত্তের বেদনা বিধৃত হয়েছে 'স্মরণ' কাব্যের কবিতাগুচ্ছে। ঔপনিষদিক তত্ত্ব ও ভারতীয় আদর্শের আনন্দবাদে একান্ত বিশ্বাসী রবীন্দ্র-মানসে "কোথাও মৃত্যু, কোথাও দুঃখ, কোথাও বিচ্ছেদ নাই।" কেননা 'হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে, যাহা কিছু সব আছে, আছে আছে।" এই শান্ত আনন্দবাদ 'স্মরণ' কাব্যকে সকরুণ করলেও স্বাভাবিক করেনি। "স্মরণ" কাব্য অনেকের কাছেই নিঃসঙ্গতার কাব্য, তা শোককাব্য নয়। ব্যক্তিশোককে বিশ্বের মাঝে আনতে কবি একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন, একথা সত্যি। কিন্তু জীবনের ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক এবং দ্বিতীয় আত্মার সম্পর্ক যেখানে, সেখানে কিভাবে শান্ত নির্বেদের সান্ত্বনা লাভ করা সম্ভব? সন্তান সংসার পরিবৃত গৃহী কবি কি এই আকস্মিক অন্তর্ধানে একটুও বিচলিত হন নি? স্মরণ কাব্য যেন বহুদিন পরে লেখা স্মৃতিচারণ মাত্র, শোকের অব্যবহিত পরবর্তী মনের হাহাকার কোথায়?—

"আজ তুমি বিশ্ব মাঝে চলে গেলে ঘরে
বিশ্ব মাঝে ডাকো মোরে সে করুণ রবে।
* * *
আজি বিশ্ব দেবতার চরণ আশ্রয়ে
গৃহলক্ষ্মী দেখা দাও বিশ্বলক্ষ্মী হয়ে"

(স্মরণ, কবিতা ৬, পৃঃ ১৪)

কিম্বা,—

মৃত্যু মাঝে আপনারে করিয়া হরণ
আমার জীবনে তুমি ধরেছ জীবন,
আমার নয়নে তুমি পেতেছ আলোক—
এই কথা মনে জানি নাই মোর শোক।

(কবিতা ১৭)

এই বিশ্বাত্মকতা বা সান্ত্বনা লাভ যতই রবীন্দ্রমানসকে বিগত শোক করে তুলুক, শাশ্বত আনন্দের সন্ধান দিক,—স্বাভাবিক মানবিক অনুভূতি ও বেদনাবোধের অভাবই যেন সূচিত করে। কবি যেন সযত্নে শোকজাত দুর্বলতাকে অস্বীকার করেছেন। রবীন্দ্র মানস ও চেতনার দুঃখ জয়ের অসাধারণ শক্তিকে সশ্রদ্ধায় স্বীকৃতি জানিয়েও বলব, স্মরণ কাব্য নির্বেদের কাব্য হয়েছে, শোকগাথা হয়েছে, মহাকাব্যীয় লাভ করেছে, কিন্তু ঠিক যেন স্বাভাবিক হয়নি, মানবিক আবেদন যেন পূর্ণরূপে ফোটে নি। রবীন্দ্র জীবনে নতুন বৌঠানের মৃত্যু জীবনের মর্মান্তিকটি সম্বন্ধে কবিকে প্রথম পূর্ণভাবে সচেতন করে। 'পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থটি সেই শোকের ফসল। সেখানে কবিহৃদয় একান্ত অনাবৃতভাবে প্রকাশিত হয়েছে, মরমী সেখানে বাধা মানে নি; এই প্রকাশকে যতই ভাবপ্যোরেচিমেণ্ট বলা যাক না কেন, এটিই শোকাহত মানুষের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। পরবর্তী জীবনে 'পুষ্পাঞ্জলি'কে কবি অনেক মার্জিত পরিশুদ্ধ করে লিপিকায় রূপায়িত করলেও এই লোকচক্ষুর আড়ালে রেখে দেওয়া গ্রন্থটির মূল্য যথেষ্ট বেশী, অন্ততঃ লিপিকা বা স্মরণের চেয়ে ব্যথাকাতর একটি মানুষকে জানতে তা

অনেকখানি সাহায্য করবে। এইখানেই রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে স্বাভাবিক হয়েছেন। "স্মরণ" আর যাই হোক, সর্বহারা মানুষের কাব্য নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আলেখ্য' কাব্য 'স্মরণের' সঙ্গে তুলনায় যতই নিকৃষ্ট হোক, তা স্মরণের চেয়ে বেদনার মূলো অনেক বেশী সত্য, অনেক বেশী স্বাভাবিক এবং অকুণ্ঠ। দুঃসাহসিক হলেও এ কথা বোধহয় খুব অসত্য নয়, যে একমাত্র নতুন যৌবনের মৃত্যুই কবিকে মানবিক ভাবে বিচলিত করেছিল, এবং সেই মৃত্যু-জনিত নির্বেদই কবিকে সমস্ত সাংসারিক বন্ধন থেকে খানিকটা নির্লিপ্ত করেছে, যার ফলে কবিজায়ার মৃত্যুও খানিকটা দূরেই রয়ে গেছে।

অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা' এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠতম কাব্য। ১৩১০ বঙ্গাব্দের ১৯এ মাঘ তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হয়। মৃতা সহধর্মিণীকে কেন্দ্র করে অক্ষয়কুমার এই কাব্যটি রচনা করেন। মৃত্যু, অশৌচ, শোক ও সান্ত্বনা,—এই চারটি পর্বে কাব্যটির কবিতাগুলি বিভক্ত হয়েছে। শোক বিমূঢ়তা বিহ্বলতা, সংশয়, প্রশ্ন এবং সাময়িক দৈবী আশ্বাস সংগ্রহ, —সব কিছুই এই কাব্যে আছে। কিন্তু এ কাব্যের সব চেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য এর স্বাভাবিকতা। দুর্বলতাকে ঢাকবার নির্বেদের মুখোশের অন্তরালে বেদনাকে লুকিয়ে রাখবার কোনো চেষ্টাই কবি করেন নি। কবি এখানে কথা গেঁথে গেঁথে নিটোল যৌক্তিক যুক্তি-সম্পন্ন এক একটি কবিতা রচনার চেষ্টা করেন নি, সাধারণ মানুষের মত হাহাকার করেছেন—তাই আমাদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের সঙ্গে এ কাব্যের সঙ্গতি এত বেশী।

পিতা নাই, মাতা নাই, পতি-পুত্র নাই
অতি অসহায়—
সকল বন্ধন ছিঁড়ে, একাকিনী কোথা ফিরে
অনলে, অনিলে, শূন্যে কোথায়—কোথায়।

(এষা, অশৌচ)

বা—

বলি নি, বলিতে ছিল কত।
লুকাইতে ছিলাম বিব্রত
লয়ে অভিমান রাশি রাশি,
মন খুলে, প্রাণ খুলে তারে
বলি নাই কেন বারে বারে
"ভালবাসি—বড় ভালবাসি।"

(এষা, শোক)

বা—

এ রুদ্ধ কুটীরে মোর এসেছিল কোন জনা ?
এখনো আঁধারে যেন ভাসে তার রূপ-কণা।
মুরছিয়া পড়ে দেহ, আকুলিয়া ওঠে মন—
শয়নে স্বপনে বাসে কাঁপে তার পরশন।

(এষা, শোক)

চরণগুলির মধ্যে দিয়ে তীব্র মানসিক হাহাকার ব্যক্তিত হয়েছে,—এবং সেটাই একান্ত স্বাভাবিক। স্মরণ কাব্যের মধ্যে আমরা কবি কবিকে পাই, মরজার উর্ধ্বে একটি আশ্চর্য সুন্দর অমর আনন্দের স্পন্দন পাই, নিটোল কবিতাগুচ্ছ পাই, কিন্তু কবি জায়ার একটি বাস্তব চিত্র পাই না। সেই রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন অক্ষয়কুমার তাঁর এষা কাব্যে নানা-রূপে, নানা ভাবে, বিশেষ করে মাতৃহারা সন্তানদের চিত্রের মধ্যে দিয়ে। সর্বশেষে 'এষা' কাব্যের উৎসর্গপত্রের আকৃতিটি একান্ত স্মরণীয়।

—নহে কল্পনার লীলা,—স্বরগ নরক ;
বাস্তব জগৎ এই, মর্মান্তিক ব্যথা।
নহে ছন্দ, ভাব বন্ধ, বাক্য রসাত্মক ;
মানবীর তরে কাঁদি, যাচি না দেবতা।

এইখানেই 'স্মরণ' ও 'এষা' কাব্যের পার্থক্য ; সাধারণ মানুষের সঙ্গে অসাধারণ রবীন্দ্রনাথের,—যা তাঁকে অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে একটু অমানবোচিত করে তুলেছে।

পরিশেষে একটি জিনিষ লক্ষ্য না করে পারা যায় না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জায়া কাদম্বরী দেবী সহকালীন কবি-গোষ্ঠীর প্রেরণাদাত্রী ছিলেন, বিহারীলালের 'সাধের আসন' তো বটেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের বেশ কয়েকটি কাব্য এই অনন্যপ্রভাবশালিনী নারীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এবং সমগ্র রবীন্দ্র জীবনে তথা রবীন্দ্রকাব্য মানসে এই নারী ধ্রুবতারকার জ্যোতিতে ভাস্বর ছিলেন। কিন্তু তাঁর বিয়োগ তাঁর তীব্র সংবেদনশীল স্বামীর জীবনে তেমন গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়নি। অন্ততঃ তাঁর অজস্র লেখার মধ্যে কোথাও এই অকাল লোকান্তরিতা নারীর পরিচয় নেই। কেন ? এই নীরব নির্মম উপেক্ষার কারণ কি ? অনেকেই কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক আত্মহত্যার অনেক রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু সে সব ব্যাখ্যায় অতৃপ্ত আমাদের মনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই উপেক্ষাজনিত নীরবতাও সপ্রশ্ন বিস্ময় জাগাবে।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কথামত পরের দিন আবার এসেছিল দীপেন। আগের দিন সেই মহিলাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিল, উপকার করবে। উপকারটা কী ধরণের, আদৌ সেটা তার সাধ্যের মধ্যে কি-না—এসব কোনদিনই সে বিশ্লেষণ করে দেখে নি। কিছু না জেনে শুনে বেভাবে মানুষ সাগরে ঝাঁপ তার প্রায় সেইভাবেই মহিলাকে কথা দিয়েছিল।

অবশ্য দীপেনের প্রতিশ্রুতির পেছনে উপকারের প্রেরণা কতখানি, সেটা সে-ই জানে। তবে সোনারপুরের সেই নিষিদ্ধ অন্তঃপুরে দ্বিতীয়বার ঢুকতে পারার যে অভাবনীয় সুযোগ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল তা অবহেলা করেনি দীপেন। সুযোগ আসা মাত্র মাথায় তুলে নিয়েছে সে।

যাই হোক পরের দিন আর সামনে গিয়ে দাঁড়ায় নি। মহিলার নির্দেশ অনুযায়ী খিড়কির দরজায় গিয়ে কড়া নেড়েছিল দীপেন।

কড়া নাড়াটুকুর শুধু অপেক্ষা। আরব্য রজনীর 'চিচিং ফাঁক' মন্ত্রের মত মুহূর্তে দরজাটা খুলে গিয়েছিল। পরক্ষণেই কালকের সেই মেয়েটির মুখ দেখা গিয়েছিল। সেই মেয়েটি যার মুখে নীলা চৌধুরীর আঁচল বসানো।

মহিলাটি যদিও নিজের গরজেই আসতে বলেছিলেন তবু এত অনায়াসে এ বাড়ির দুয়ার খুলে যাবে—এতটা ভাবেনি দীপেন। মেয়েটির উদ্দেশে বলেছিল, তুমি বুঝি আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলে?

'হ্যাঁ।' মেয়েটি মাথা নেড়েছিল।

'কতক্ষণ?'

'অনেকক্ষণ।'

একটু চুপ করে থেকে দীপেন আবার প্রশ্ন করেছিল, 'তোমার মা কোথায়?'

'কালকে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল'—

'সেই পুকুরটার পারে?'

'হ্যাঁ; আসুন।'

আর কিছু না বলে নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকেছিল দীপেন। মেয়েটি খিড়কির দরজায় খিল তুলে বলেছিল, 'চলুন।' বলেই পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করেছিল। অতএব দীপেন আর কি করে! মেয়েটিকে অনুসরণ করতে হয়েছিল তার।

আগের দিনের মতই বাগানের ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল ঠেলে দু-জনে এগিয়ে যাচ্ছিল। যেতে যেতে দীপেন বলেছিল, 'তোমার কী নাম?'

মুখ না ফিরিয়েই মেয়েটি নাম বলেছে, 'নীলা।'

চেহারায় শুধু নয়, নামেও মিল আছে। নীলার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে হয়েছে নীলা। মেয়েটা যে নীলা চৌধুরীর বোন সে ব্যাপারে প্রায় নিঃসংশয় হতে পেরেছিল দীপেন।

একটু চুপচাপ। তারপর হঠাৎ কি মনে হতেই দ্রুত পা চালিয়ে পেছন থেকে শীলার পাশে চলে এসেছে দীপেন। তার কাঁধে হাত রেখে অন্তরঙ্গ সুরে বলেছে, 'আচ্ছা শীলা—'

'কী বলছেন?'

'তুমি পড় তো?'

'হ্যাঁ।'

'কোন ক্লাসে?'

'কাইতে।'

'কোন স্কুলে?'

'কোন স্কুলে না। বাড়িতে পড়ি।'

'স্কুলে পড় না কেন?' দীপেন প্রশ্ন করেছে, এদিকে মেয়েদের ভাল স্কুল নেই বুঝি।'

শীলা ব্যস্তভাবে বলেছে, 'কে বললে, নেই! খুব ভাল স্কুল আছে। আমি সেখানে ভর্তিও হয়েছিলাম।'

'তবে?'

'বাবা জোর করে স্কুল থেকে আমাকে ছাড়িয়ে এনেছে।'

কিছুটা বিস্ময়ই বোধ করেছে দীপেন। বলেছে, 'ছাড়িয়ে এনেছেন! কেন?'

কি যেন উত্তর দিতে গিয়ে থমকে গেছে শীলা। শুধু বলেছে, 'আমি জানি না। মাকে জিজ্ঞেস করবেন।'

নীরবে কিছুক্ষণ চলার পর দীপেন আবার শীলাকে ডেকেছে।'

চলতে চলতে শীলা সাড়া দিয়েছে, 'কী?'

'তোমরা ক' ভাইবোন?'

প্রশ্নটা শেষ হয়েছে কি হয় নি। চকিত দৃষ্টিতে দীপেনের দিকে তাকিয়েছে শীলা। কেমন একটা সন্ত্রাসের ছায়া তার মুখের ওপর নেমে এসেছে। ঊষিগ্ন সুরে সে বলেছে, 'আমি জানি না।'

'দীপেন চমকে উঠেছে, 'সে কি!'

শীলা নিশ্চুপ।

অবাক সুরে দীপেন আবার বলেছে, 'নিজেরা ক' ভাইবোন, তা-ই জান না! আশ্চর্য!'

শীলা এবার বলেছে, 'আপনি মাকে জিজ্ঞেস করবেন।'

দীপেন বলেছে, 'মাকে জিজ্ঞেস করতে হবে! এ তো তোমারই জানা উচিত। সব ছেলে মেয়েই তাদের ভাই-বোনের খবর রাখে।'

শীলা উত্তর দেয় নি।

একটুক্ষণ কি চিন্তা করে দীপেন আবার শুরু করেছে, 'ভাইবোনদের খবর রাখো না। তা বাবার নামটা জান তো?'

'জানি।' শীলা ঘাড় কাত করেছে।

'কী?'

'শ্রীশশাঙ্কনাথ চৌধুরী।'

'কী করেন?'

'আপনি মাকে জিজ্ঞেস করবেন।'

অতএব শীলার বাবার প্রসঙ্গে আর কোন প্রশ্ন করেনি দীপেন। একটু চুপ করে থেকে একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গ শুরু করেছে, 'আচ্ছা শীলা—'

পাশাপাশি চলতে চলতে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েছে শীলা।

দীপেন বলেছে, 'তোমাদের বাড়ি আজকে নিয়ে ক'দিন আসছি, জান?'

'জানি। চারদিন।'

'প্রথম দু-দিন তোমাদের সদরে কড়া নাড়তেই এক ভদ্রলোক খেপে উঠে বলেছিলেন, দরজা খোলা হবে না। উনি কে?'

'আপনি মাকে জিজ্ঞেস করবেন।'

এবার স্থির নিষ্পলকে শীলার দিকে তাকিয়েছে দীপেন। ভাই-বোন-বাবা অথবা অদৃশ্যবর্তী সেই তীক্ষ্ণভাষী মানুষটি—যার সম্বন্ধেই প্রশ্ন করা গেছে শীলা এই কথারই পুনরাবৃত্তি করেছে। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তার মায়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিতে হবে।

প্রথম প্রথম দীপেন ভেবেছিল, অজ্ঞতাবশতই হয়তো মায়ের নাম করেছে শীলা। কিন্তু সেই মুহূর্তে তার মনে হয়েছে, তা নয়—সমস্ত প্রশ্নের উত্তর জানা সত্ত্বেও কৌশলে শীলা এড়িয়ে যাচ্ছে। আসলে মেয়েটি খুবই চতুরা।

শুধু চতুরাই না, অত্যন্ত মজবুত ধাতুতে তার স্বভাবটি গড়া। সে যদি নিজের থেকে কিছু না বলে এ বাড়ি

সম্পর্কে তার কাছ থেকে কোন গোপন খবরই বার করা যাবে না।

সম্ভবত মেয়েটির চারপাশে কতকগুলো নিষেধের গণ্ডি টানা আছে। সেগুলি সম্বন্ধে সে খুবই সচেতন। যে চাতুরালির আশ্রয়ই নেওয়া যাক, সেই গণ্ডিগুলোর বাইরে কিছুতেই তাকে টেনে আনা যাবে না।

যাই হোক নীলাকে আর কিছু বলেনি দীপেন। বলার মত উৎসাহই বোধ করেনি। বাকি পথটুকু নিঃশব্দে তার পাশে পাশে হেঁটে একসময় পুকুরপাড়ের সেই ভাঙা ঘাটলায় পৌঁছে গিয়েছিল।

আগের দিনের মতই দাঁড়িয়ে ছিলেন মহিলা! তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু অবাকই হয়েছে দীপেন। অবাক, কেন না আগের দিন মহিলার মুখে পৃথিবীর সবটুকু বিষাদ ঘনীভূত হয়েছিল। আজ সেখানে তার চিহ্নমাত্র নেই। বিষাদের বদলে উৎসুক ব্যাকুল প্রতীক্ষা ফুটে রয়েছে।

কাছাকাছি আসতেই মহিলার চোখ দুটি চকচকিয়ে উঠেছে। সারা মুখে স্বস্তির আলো ছড়িয়ে পড়েছে। হাতে যেন চাঁদ পেয়েছেন—এমন ভঙ্গিতে বলেছেন, যাক, আপনি এসেছেন!'

দীপেন হেসেছে, 'আসারই তো কথা ছিল।'

'তা তো ছিলই। তবু—'

'কি?'

'বড় ভাবনা হচ্ছিল, যদি না আসেন? যদি আমার কথা ভুলে যান?'

দীপেনের ঠোঁটের প্রান্তে সেই হাসিটা আরেকটু বিস্তৃত হয়েছে, 'তা-ই কখনো হয়! আপনাকে কথা দিয়ে গেছি। না এসে পারি!'

মহিলা এবার আর কিছু বলেন নি।

একটু চুপচাপ। তারপর দীপেনই আবার শুরু করেছে, 'আমাকে কী জন্যে যেন আসতে বলেছিলেন—' এই পর্যন্ত বলে উৎসুক দৃষ্টিতে মহিলার দিকে তাকিয়েছে সে। উদ্বেগটা অকারণে নয়। মহিলা তার কাছে কিছু উপকার প্রত্যাশা করেন। উপকারটা কী ধরণের এবং সে জন্য স্বর্গমর্ত চষে ফেলতে হবে কি-না, এ সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই দীপেনের।

মহিলা কী বলবেন, তার জানা নেই। তাঁর জন্য সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হবে, না দুস্তর মরুভূমিতে পাড়ি জমাতে হবে—কে বলবে। যাই হোক নিদারুণ এক অনিশ্চিয়তার মধ্যে দীপেনের সবটুকু অস্তিত্ব যেন সেই মুহূর্তে দোল খাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সমস্ত সত্তা একটা সূক্ষ্ম শীর্ষবিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছে।

মহিলা নীরব। নিজের অতল গভীরে ডুব দিয়ে আত্মবিস্মৃতের মত কি যেন ভাবছিলেন তিনি।

অনেকক্ষণ পরও মহিলার সেই আত্মবিস্মৃত ভাবনার ঘোরটা যখন কাটেনি, তখন খুব আস্তে দীপেন ডেকে উঠেছে, শুনছেন?'

ডাকটা কানে যেতেই মহিলা চকিত হয়ে উঠেছেন।

দীপেন আবার সেই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, 'কী যেন একটা দরকারে আজ আমাকে আসতে বলেছিলেন—'

'হ্যাঁ—' ধীরে ধীরে মাথা নেড়েছেন মহিলা। তারপর বলেছেন, 'কিন্তু—'

'কী?'

মহিলার মুখে এবার সীমাহীন উৎকণ্ঠার ছাপ পড়েছে। দীপেনের চোখের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তিনি বলেছেন, 'যে জন্যে আপনাকে আসতে বলেছি, তা বলতে সাহস পাচ্ছি না।

একটুক্ষণ থতিয়ে থেকেছে দীপেন। মহিলা যেরকম ভণিতা শুরু করেছিলেন তাতে মনে হয়েছিল, ব্যাপারটা একটা বিশেষ দিকেই ধাবিত হচ্ছে এবং সেই দিকটা রীতিমত ইঙ্গিতময়।

যে পরিবেশে এঁদের বাস, আর যে দীনতার ছাপ চারপাশে ছড়ানো তাতে যে কথাটা সবার আগে মনে পড়েছে তা এইরকম। মহিলা কি কিছু অর্থ সাহায্য চান? প্রশ্নটা মনের কোণে ছায়া ফেলতে না ফেলতেই নাকচ করে দিয়েছে দীপেন।

প্রথমত, ভদ্রমহিলার সঙ্গে সেটা তার দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার। যদিও নীলা চৌধুরীর আসল তাঁর চেহারায় বসানো তবু মহিলার সঠিক পরিচয় তখনও দীপেনের অজ্ঞাত। চেহারার মিল দেখে নীলার সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্কটা সে ধরে নিয়েছে সেটা আদৌ প্রমাণ-সিদ্ধ নয়। অনুমান-নির্ভর। দ্বিতীয়ত জগৎ সম্বন্ধে দীপেনের অভিজ্ঞতা

বিপুল না হলেও এটুকু অন্তত তার জানা ছিল—বাঙালী-মেয়ের মেয়েরা ঘরে গেলেও কারো কাছে সহজে হাত পাততে চায় না। সঙ্কোচ, লজ্জা বা মানের বালাই—যে কোনই হাত এটুকু আবরণ যেন তাদের প্রাণের বন্ধুবন্ধের সঙ্গে নিয়ত লেগেই থাকে। এই দুটো দিক বিবেচনা করে মহিলার টাকা চাওয়ার কল্পনাটা তার খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নি। তবে—

তবে টাকার জন্ত মহিলা যদি হাত পাতেন, দীপেন খুশীই হবে। অর্থের বিনিময়ে তখন অনায়াসেই নীলা চৌধুরী সম্বন্ধে সব তথ্য কেনা যাবে। সেই প্রত্যাশায় সে উৎসাহ দিয়ে বলেছে, 'সাহস না পাবার কি আছে। আমি আপনার ছেলের মতন। বলুন—'

তবু যেন দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি মহিলা। বলেছেন, 'বলতে সঙ্কোচে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। তবু না বলেই পারছি না। একজনের বাঁচা-মরা আমার বলা না-বলার ওপর নির্ভর করছে।'

দীপেন কাছে এগিয়ে এসেছে। ঈষৎ ঝুঁকে আবার অভয় দিয়েছে, 'বলুন। সঙ্কোচের কিছু নেই।'

মহিলার ঠোঁট দুটি কাঁপতে শুরু করেছিল। কাঁপুনিটা সেখানেই স্থির থাকে নি; সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিচিত্র এক চাঞ্চল্য কয়েকটা মুহূর্ত তাঁকে অস্থির করে রেখেছে। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে প্রায় ফরাসীর মত বলেছেন, 'আপনাকে একটা অভিনয় করতে হবে।'

মহিলার উপকারের ব্যাপারে তার মন নানা দিকে ঘোড়া ছুটিয়েছে। সম্ভব-অসম্ভব অনেক কিছুই কল্পনা করেছে সে। কিন্তু এটা ভাবে নি। বিস্ময়ের মত দীপেন শুধু বলতে পেরেছে, 'অভিনয়!'

'হ্যাঁ, একটা মিথ্যের অভিনয়।'

দীপেনের বিস্ময়তা আরো বেড়েছে। অভিনয় ব্যাপারটাই তো পুরোপুরি ছলনা। সেটুকু করলেই চলবে না। ছলনাটাই মিথ্যে হওয়া চাই।

মহিলা আবার বলেছেন, 'এটুকু যদি করেন দয়া করে, একটা মানুষকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারি। আপনি কি আমার মুখ রাখবেন বাবা?' বলতে বলতে দু-চোখে পৃথিবীর সবটুকু ব্যাকুলতা ফুটিয়ে দীপেনের দিকে তাকিয়েছেন তিনি। বাম মুষ্টিতে তার একটা হাত জড়িয়ে ধরেছেন।

মহিলা টাকা চাননি। তাতে একেবারে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে নি দীপেন। টাকা চাইলে অবশ্য সুবিধেই হত। যে প্রত্যাশায় তার এখানে আসা সেটা অনায়াসেই করায়ত্ত করা যেত। অভিনয়ে রাজী হলেও, মনে হয়েছে, বিফল হতে হবে না। তাতেও কাজ হবে। কৃতজ্ঞতায় মহিলা কেনা হয়ে থাকবেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে দীপেন বলেছে, 'আমি একটু ছলনা করলে একটি লোক যদি বেঁচে যায়, কেন করব না?'

যা প্রত্যাশিত, তা-ই ঘটেছে। মহিলার দৃষ্টিতে যা ফুটেছে তার নাম কৃতজ্ঞতাই।

দীপেন আবার বলেছে, 'আমাকে কী করতে হবে?'

'বলছি।' বলতে গিয়েও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকেছেন মহিলা। নিজের গভীরে হারিয়ে গিয়ে কি যেন ভেবেছেন। তারপর হঠাৎ কি মনে পড়তে বলে উঠেছেন, 'দু-দিন আপনি আসছেন। কত কথা বলেছি। অথচ আপনার নামটা এখনও জানা হয়নি।'

দীপেন নাম বলেছে।

মহিলা আবার বলেছেন, 'আপনি কখনও বোম্বাই গেছেন?

একটু অবাক হয়েছে দীপেন। তারপর মাথা নেড়ে জানিয়েছে, যায় নি।

মহিলার মুখে মুহূর্তের জন্ত বিষের ছায়া পড়েই অদৃশ্য হয়ে গেছে। বলেছেন, 'তাতে কিছু আসে যায় না। বোম্বাইয়ের একটা জায়গার নাম বলছি। সেটা আপনাকে মনে রাখতে হবে।'

'বলুন।' দীপেন উৎসুক হয়েছে।

'জায়গাটার নাম আন্ধেরী।'

আন্ধেরী। আন্ধেরী! আন্ধেরী। মনে মনে বার-কয়েক জপ করে দীপেন জানিয়েছে, নামটা সে ভুলবে না।

মহিলা বলেছেন, 'এবার আপনাকে একটি মেয়ের নাম বলব।'

'বলুন।'

'নীলা—নীলা চৌধুরী। এ নামটাও আপনাকে মনে রাখতে হবে।'

দীপেন এবার চকিত। তার সমস্ত স্নায়ু প্রবল এক ঝাঁকুনি খেয়ে অস্থির উৎকণ্ঠ হয়ে উঠেছে। গাঢ় ফিস ফিস স্বরে নামটার প্রতিধ্বনি করেছে সে, 'নীলা চৌধুরী।'

'হ্যাঁ বাবা, নীলা চৌধুরী।' মহিলা তাড়াতাড়ি বলে উঠেছেন, 'ছোট্ট নাম, মনে রাখা যাবে না?' তাঁর গলায় শঙ্কার ছায়া পড়েছে যেন। শুধু গলায় কেন, চোখেমুখেও।

কী জন্য শঙ্কা, দীপেন জানত না। যাই হোক মহিলাকে আশ্বস্ত করে সে বলেছে, 'কি আশ্চর্য, ঐটুকু তো নাম। মনে থাকবে না কেন? খুব থাকবে। আমার স্মৃতিশক্তি খুব খারাপ নয়।'

ভরসা পেয়ে মহিলার চোখমুখে আলো ফুটেছে।

দীপেন আবার জিজ্ঞেস করেছে, 'দুটো নাম তো বললেন। এবার আমায় কী করতে হবে?'

একটু ইতস্তত করে মহিলা বলেছেন, 'আমি আপনাকে একটি লোকের কাছে নিয়ে যাব। তাঁকে বলবেন, আপনি বোম্বাইয়ের আন্ধেরী থেকে আসছেন। আর—'

'আর কী?'

উত্তর দিতে গিয়ে ঠোঁটের প্রান্ত দুটো কুঁকড়ে গেছে মহিলার। গলার কাছটা কি এক অসহ্য যন্ত্রণায় কাঁপতে শুরু করেছিল। শ্বাসরুদ্ধের মত তিনি বলেছেন, 'নীলা চৌধুরী মারা গেছে।'

সোনারপুরের এই বাড়ি, চারদিকের জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশ, বর্ষীয়সী এই মহিলা—সব কিছু বিস্মৃত হয়ে আঁতকেই উঠতে যাচ্ছিল দীপেন। ওঠারই কথা। যে মেয়েটির সঙ্গে তার ভবিষ্যতের সমস্ত স্বপ্ন একটা অনিশ্চিত সুতোয় বাঁধা, যাকে খুঁজে বার করতে চোখ-কান বুজে অজানা সাগরে ঝাঁপ দিয়েছে সে, হঠাৎ যদি সেই মেয়েটার মৃত্যু-সংবাদ শোনা যায় তখন বিচলিত হওয়াই তো স্বাভাবিক। তখন মানসিক ভারসাম্য থাকার কথা নয়।

অস্থিরভাবে কিছু বলতে যাচ্ছিল দীপেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে অস্তিত্বের গহন কেন্দ্র থেকে বাবা স্বধাময় লাহিড়ীর কণ্ঠস্বর শোনা গেছে, 'এত তাড়াতাড়ি অস্থির হয়ো না। ধৈর্য ধর।'

অতএব আঁৎকে উঠে কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেছে দীপেন। বুকে নিঃশ্বাস চেপে উৎকণ্ঠের মত একদৃষ্টে মহিলার দিকে তাকিয়ে থেকেছে শুধু।

মহিলা এবার বলেছেন, 'আসুন আমার সঙ্গে।' বলেই জঙ্গল ভেদ করে পুব দিকে হাঁটতে শুরু করেছেন।

দীপেন আর কি করে, সম্মোহিতের মত তাঁকে অনুসরণ করে গেছে। যেতে যেতে দুর্জ্ঞেয় এক অনুভূতির মধ্যে তার সমস্ত চেতনা লোপ পেয়েছে যেন। মনে হয়েছে, বিচিত্র এক নাটকে—যে নাটকের প্রথম দিক বা উপসংহার সবই অজ্ঞাত—তাকে অভিনয় করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পরিচালক শুধু তার পার্টটুকুই মুখস্ত করিয়ে দিয়েছেন। কোন অঙ্কের কোন দৃশ্যে তার ভূমিকা, সে জানে না।

যেতে যেতে দীপেন উত্তেজনা বোধ করেছে। সেই সঙ্গে শ্বাসটাও আসছিল রুদ্ধ হয়ে। দুর্বোধ্য এক আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা দুরু দুরু করছিল যেন। মহিলার পিছু পিছু যে অজানা স্টেজটায় সে উঠতে যাচ্ছিল সেটা সম্বন্ধেই ছিল তার অপরিমিত ভয়। সেখানে গিয়ে যথাযথ অভিনয় করতে পারবে কি? না হাত-পা কাঁপবে? গলার স্বর থেকে স্বরই হয়তো বেরুবে না। যার সামনে দাঁড়িয়ে শেখানো পার্টটুকু আবৃত্তি করতে হবে তার কাছে যদি ধরা পড়ে যায়! যতই ভাবছিল স্নায়ুপৌত্তিতে হাত-পাগুলো যেন শিথিল হয়ে আসছিল দীপেনের।

চলতে চলতে মহিলা হঠাৎ ডেকে উঠেছেন, 'শুনছেন—'

চকিত দীপেন তাড়াতাড়ি সাড়া দিয়েছে, 'আজ্ঞে—'

'একটা কথা বলব।'

'কী?'

'যাঁর কাছে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি তিনি আমার স্বামী।'

দীপেন কিছু বলে নি। কান দুটি সজাগ রেখে মহিলার পিছু পিছু শুধু হেঁটে গেছে।

মহিলা আবার বলেছেন, 'আমার স্বামী অসুস্থ মানুষ। পক্ষাঘাতে বছর তিনেক শয্যাশায়ী হয়ে আছেন।'

এবার কিছু বলতে চেষ্টা করেছে দীপেন; সম্ভবত এক-আধটা সহানুভূতির কথা। কিন্তু বলে নি। নিজেকে উৎকর্ণ রেখে আগের মতই মহিলাকে অনুসরণ করে গেছে সে।

মহিলা কি ভেবে বলেছেন, 'অনেকদিন অসুখে ভুগে ভুগে ওঁর মাথার ঠিক নেই। মেজাজটা সাঙ্ঘাতিক খিট-খিটে হয়ে গেছে। কার সঙ্গে কী ব্যবহার করতে হয়, সেটা সবসময় খেয়াল থাকে না। তাই বলছিলাম—'

এবার দীপেনের গলায় স্বর ফুটেছে, 'কী ?'

তৎক্ষণাৎ উত্তর যেন দিলে মহিলা। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে কুণ্ঠিতমুখে বলেছেন, 'আমার একান্ত অনুরোধ, উনি যদি আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে বসেন, ক্ষমা করে নেবেন।'

দীপেন ব্যস্তভাবে বলে উঠেছে, 'ছি-ছি। অসুস্থ রুগ্ন মানুষ উনি। যদি কিছু বলেনই, তা-ই নিয়ে রাগ করে বসতে হবে। আপনি আমাকে এতই অভদ্র ভাবেন নাকি !'

বলেছে বটে কিন্তু বুকের ভেতর স্নায়বিক সেই ভয়টা দুর্দম হয়ে উঠেছে। কিছুতেই সেটাকে বশ মানানো যায় নি। এই বিচিত্র রহস্যময় নাটকে তার ভূমিকাটাই এক অদ্ভুত ব্যাপার। তার ওপর মহিলাটি যে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিটির কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন সেখানে কি ভাবে সে গৃহীত হবে সেটাও নিদারুণ দুশ্চিন্তার কথা।

আবার কৌতূহলও বোধ করেছে দীপেন। একটি পক্ষাঘাত-পঙ্গু অসুস্থ মানুষ তাকে হাতছানি দিয়ে যাচ্ছিল যেন। মাধ্যাকর্ষণের মত সেই অদম্য আহ্বানকে প্রতিরোধ করার শক্তি তার ছিল না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

এর মধ্যে পুকুর-বাগান পার হয়ে দোতলা বাড়িটার সামনে এসে পড়েছে দীপেনরা। যে সময়ে কড়া নেড়ে প্রথম দু-দিন সে ফিরে গেছে সেটা যদি খুলত তা হলে ভেতরে পা দিয়েই দীপেন বুঝতে পারত ওদিকটা বাইরের মহল। দ্বিরুক্তির পথে মহিলা তাকে যেখানে নিয়ে এসেছেন সেটাকে অন্তঃপুর বলাই সঙ্গত।

বাড়ির কাছে এসে মহিলা দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। দীপেনের দিকে ফিরে বলেছিলেন, 'আরেকটা কথা বলব।'

'বেশ তো বলুন।' উৎসুক চোখে তাকিয়েছে দীপেন।

'আপনি হয়তো একটা ব্যাপারে খুব অবাক হয়েছেন—'

'কী ব্যাপারে বলুন তো ?'

'আপনার সঙ্গে আলাপ, নেই পরিচয় নেই তবু এমন একটা অন্যায় অনুরোধ করলাম কেন ? নিশ্চয়ই এ রকম একটা প্রশ্ন আপনার মনে দেখা দিয়েছে—'

দীপেনকে স্বীকার করতে হয়েছে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, অবাক যে না হয়েছি তা নয়। তবে এ-ও বুঝেছি, নিতান্ত নিরুপায় না হলে অজানা-অচেনা একটি লোককে কেউ এমন অনুরোধ করে না।'

'আপনি ঠিকই বুঝেছেন।' মহিলার চোখ দুটি চক চক করে উঠেছে। বলেছেন, 'এবার বলি কেন আপনাকে এতখানি ভার দিচ্ছি। পরিচিত কাউকে নিয়ে গিয়ে যদি আমার স্বামীর কাছে দাঁড় করাই আর সে যদি বলে নীলা মারা গেছে, উনি বিশ্বাস করবেন না। সেই জন্যেই আপনাকে অনুরোধ করা। আমার ধারণা, যে কষ্ট আপনাকে দিলাম সে জন্যে এবার আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন।'

তাঁর শেষ কথাগুলো দীপেন যেন শুনছিল না। আত্ম-বিস্মৃত এক ঘোরের মধ্য থেকে সে বলে উঠেছে, 'আচ্ছা, নীলা মানে নীলা চৌধুরী আপনাদের কেউ হয় না কি ? কোন আত্মীয়-টাত্মীয় ?'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছে মহিলা, 'হ্যাঁ।'

দীপেন লক্ষ্য করেছেন, মুহূর্তের জন্য কালকের সেই অপরিসীম বিষাদ তাঁর ওপর নেমে এসেছে। চোখ দুটি কেমন যেন ছায়াচ্ছন্ন। গাঢ় গভীর এক অবসাদ তাঁকে বেষ্টন করতে শুরু করেছে। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করেছে, 'কী হয় নীলা চৌধুরী ?'

'আমাদের মেয়ে।'

কাল মহিলাকে দেখেই তা অনুমান করেছে দীপেন। তবু শিহরিত হবার ভঙ্গি করে বলেছে, 'মেয়ের মৃত্যুর খবর পেলে আপনার স্বামী খুশী হবেন ?'

'হ্যাঁ।' অবরুদ্ধ গলায় উত্তর দিয়েছেন মহিলা।

মনে মনে দীপেন বলেছে, 'আশ্চর্য !' মুখে বলেছে, 'সন্তানের মৃত্যু-সংবাদে বাপ সুখী হয়, এমন ভয়ঙ্কর কথা আগে আর আমি শুনি নি।'

মহিলা নিশ্চুপ।

দীপেন এবার কিছুটা উত্তেজিতই হয়ে উঠেছে, 'কিন্তু কেন ? নীলা মানে আপনাদের মেয়ে—কী এমন অপরাধ করেছে যাতে তার মৃত্যুকে বাঞ্ছিত মনে করতে হবে।'

মহিলা এবার মুখ খুলেছেন। বিষণ্ণ সুরে বলেছেন, 'সে কথা না শুনলেই কি নয় ?

'দেখুন, একটা সাঙ্ঘাতিক দুঃসংবাদের মুখে হয়ে

আপনার স্বামীর কাছে আমি যাচ্ছি। অথচ কেন যাচ্ছি, কিছুই জানি না। জানার জন্যে কৌতূহল হয় কি-না, আপনিই বিবেচনা করুন।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মহিলা বললেন, 'বেশ, আপনার কৌতূহল মিটবে। তার আগে আমার স্বামীর কাছে চলুন।'

দীপেন বলেছে, 'তাঁর কাছে যাবার আগে শুধু একটা প্রশ্ন করব।'

'কী?'

'নীলা চৌধুরী সত্যিই কি মারা গেছে?' কথা ক'টি উচ্চারণ করেই দীপেন অনুভব করেছিল, বুকের ভেতর স্তূপিণ্ডটা জমাট বেঁধে যাচ্ছে। আর শ্বাসটা আসছে রুদ্ধ হয়ে। নীলা চৌধুরী তো একটা মেয়ে মাত্র নয়, দীপেনের সমস্ত ভবিষ্যৎটা যে তার সঙ্গেই জড়ানো। নীলার মৃত্যু মানেই তো সেই ভবিষ্যৎটার চিরদিনের মত সমাধি।

মহিলা বললেন, 'না, সে মরে নি। বেঁচেই আছে।'

দীপেন আর কোন প্রশ্ন করে নি। বুকের ভেতরকার আবদ্ধ বাতাস সহজ নিঃশ্বাসে বেরিয়ে এসেছে। এবার সে আশ্বস্ত।

মহিলা বাড়ির দিকে ফিরে বলেছেন, 'আসুন।'

[ক্রমশঃ

জলে-ডাঙ্গায়

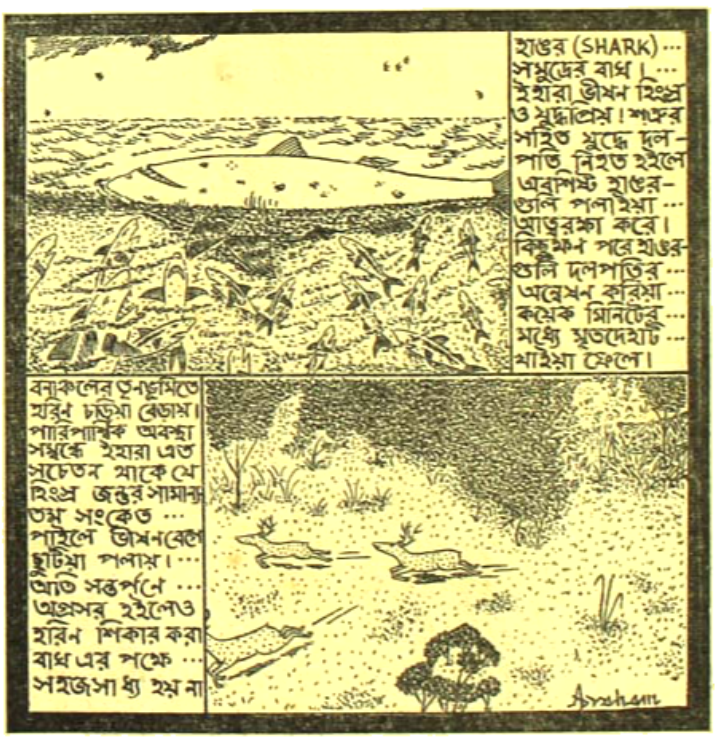

—আব্রাহাম রচিত

ছোটগল্পের ভূমিকা ও রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

শ্রীবারিদবরণ চক্রবর্তী

বিশ্বসাহিত্যে ছোটগল্প The peculiar product of the nineteenth century' রূপেই চিহ্নিত। এ অ-পূর্ব সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য শুধু রূপকল্প কিংবা রসসৃষ্টিতে নয়, সৃষ্টির ভূমিতেই এর স্বরূপ নিহিত। এক হিসেবে প্রত্যেক যুগকেই বা শতকের মধ্যেই বিশিষ্ট চেতনালক্ষ্য করা যায় প্রত্যেক শতাব্দীই নিজস্ব ধারীতে মুখর হয়ে ওঠে, প্রয়োজনানুযায়ী চেতনা থেকেই রস সংগ্রহ করে। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীকে বিশিষ্টভাবনায় ভাবিত বললে সহজেই অর্থগ্রহণে কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি করে। কিন্তু এ ভিন্ন কোন গতিও নেই। অথচ সৃষ্টিপ্রবাহের ধারার দিকে লক্ষ্য রাখলেও বলা যায় বিগত উনিশ শতকে এবং দুটো যুদ্ধোত্তর আজকের বিংশ-শতকের পরমাণবিক বৃহত্তীভিগ্রস্ত সমাজের বুকে এমন অনেক চিন্তা-চেতনা ভাব-ভাবনার আমদানী ঘটেছে যাতে পৃথিবীকে এক নবসৃষ্টি বা অনাসৃষ্টি বললেও বোধ হয় বিশেষ ভাষ্য করা হয় না।

নিছক গদ্য করে উনিশ শতকের স্বরূপ নির্ধারণ প্রসঙ্গে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়,এটা অবক্ষয়ের যুগ, পুরাতন মূল্যবোধ এক্ষণে অচল, সে যে কারণেই হোক। মানুষ এক্ষণে ব্যাধিগ্রস্ত, সর্বত্রই একটা যন্ত্রণা, জীবন মৃত্যুর কাছে তাড়া খাওয়া একটা জীব—মধ্যে মধ্যে সে ভুলে যায় যে, সে মানবজীব, তাই সভ্যতার পোষাক পরিচ্ছদ, সংস্কার প্রথানুগত্যের জটিলতা হতে সে তার বাঘনখ বার করে। সর্বত্র একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন—তীব্র অনুসন্ধিৎসা, নূতন মূল্যায়নের সচেতন প্রচেষ্টা। এ যুগের কিছুতেই কিছুর স্থায়িত্ব নেই—নানাবিধ বিচ্ছিন্নতাতেই এ যুগ আচ্ছন্ন। তাঁদি-নিয়া উলফ্ আক্ষেপ করেছেন,—'We are living in age of pregments' এই বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ততার গর্ভেই ছোটগল্পের বাস। ক্ষিপ্রকুতার বুক হতেই (যন্ত্রণার কাটল থেকেই) ছোটগল্পের সৃষ্টি।

সে আসে জিজ্ঞাসা নিয়ে, আসে বিদ্রোহ-বিপ্লব-বিক্রম নিয়ে। যেন একটি শাণিত সুতীক্ষ্ণ তীরের ফলা। অব্যর্থ নিশানা। প্রতিপক্ষ শুধু বিদ্ধ হয় না, বিষের জ্বালায় জ্বলে ওঠে। সে আঘাতে জর্জরিত হয়ে মন্তব্য করে 'He is an enemy of Russia and should be sent in Siberia in chain (জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মন্তব্য গোগোলের প্রতি)।

আশ্চর্য! পীড়ন করা অপরাধ নয়, পীড়িত মানবাত্মার আর্তনাদই অপরাধ। যার জন্যে স্রষ্টাকে নির্বাসিত করবার প্রশ্ন আসে। কিন্তু স্রষ্টারা তো রক্তবীজের বংশ—এক গোগোল যাবে, চেকভ্-গোর্কী-তুর্গেনিভ্-পুশ্‌কিন সপার্ষদের হেনস্থা—আসবে রবীন্দ্র-মাণিক-প্রেমেন্দ্র।

ছোটগল্পের মূল ভিত্তিভূমি ও প্রথম বিস্তার ফ্রান্সে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের ফরাসী, পূর্বেই বহুআকাঙ্ক্ষিত ফরাসী বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে—কিন্তু আশাভঙ্গ জীবনে তখনও রক্তে এনসাইক্লোপীডিষ্টদের অগ্নিগর্ভবাণী,—সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার রক্তকেতন তখনও ব্যাষ্টিলের দুর্গে উড্ডীন। এদিকে ক্রান্তোক্লীয় যুদ্ধে প্যারীর পতন ঘটেছে, সেই আঘাতের দুরন্ত উত্তেজনা চরম নৈরাশ্যে ক্লোবারের কণ্ঠ-ভাঙ্গা বাঁশীর মত বেজে উঠেছে—'poor france ! হায়! যে ফরাসী শতাব্দী পরিক্রমায় আমেরিকা, গ্রীস, তুরস্ক, স্পেন, ইতালী, বেলজিয়ামকে রক্ষা করেছে, সে কি না ক্রান্তের দুঃসময়ে—'They all stand coldly by and watch her die এই রাজনৈতিক ও মানসিক যন্ত্রণা-ব্যাধির মধ্যেই মপাসাঁর অভ্যুদয়।

জারতন্ত্রের অরাজক-দুর্নীতি, রুশীয় বুরোক্রেসির ঘুণ-কাঠে নিষ্পেষিত সমাজের বুকেই The master' চেকভের আবির্ভাব; অজস্রাধ দিনে, আগাছার জঙ্গলে সে আসে সত্যের প্রতি সুধা নিয়ে, আদর্শহীন অব্যবস্থায় সমাজে,

মানুষে, বিশ্বনীতিতে নানা প্রশ্ন আনে,—বাড়িয়ে নেয় সত্যমিথ্যা।

বস্তুতঃ তাগিদের যুগেই সাহিত্যে আসে ছোট গল্পের রূপে। আদর্শহীন দুর্নীতি দৌরাত্ম্যে অস্থির সমাজে, নৈরাশ্য তাড়াক্রান্ত ক্ষোভলাঞ্ছন জীবনে সে আনে অঘটন ছন্দে,—যেন বন্ধ অন্ধ ঘরে আচমকা আলো, যেন শুষ্ক পাষাণের কাটলে কাটলে সোনার জলের রেখা, যেন রাতের কালো শ্রাবণাকাশে বিদ্যুতের আলো।

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প আসে ১২৯৮ সালে। সে এক যুগ! সে এক সময়! য়ুরোপের চিত্তদূত হৃদয়ের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে ভারতবাসীর সরল হৃদয়ে যে দাগ দিয়েছিলো অচিরেই তা মিলিয়ে গেল যেন একটা জলের রেখা। মানুষ কোন ছিদ্রকেই ভিক্ষার দান হিসেবে গ্রহণ করতে পারেনা— চিত্ত জাগলে বোঝে স্বরূপ! আর স্বপ্নের রঙীন রং চটে যায়, স্নান নেয় দুভাগার কালো কালিমা। এখন বোঝে জ্ঞানের আলো প্রদীপ হয়ে আমাদের ঘরে আলো জ্বালাতে আসে নি, এসেছে মশাল হয়ে ঘরে আগুন লাগাতে;—ইংরাজ ভেবেছিলো জ্ঞানের কিছু এঁটো কাঁটা দিয়ে মধ্যবিত্ত কেরাণী শ্রেণীর সৃষ্টি করে ভারতবর্ষের পাঞ্জর-গুলোকে ঐশ্বর্য রূপে ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি করবে। চাল ভুল হয়। অসহ্য যন্ত্রণায় ভারতবাসী ছটফট্ করে ওঠে—মোহ ভঙ্গ হয়। দেখে, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নগ্নরূপ। যে রূপ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে বসেই মার্কস্ দেখেছিলেন। তারই উল্লেখ আছে Letters of Marx and Englan. প্রতি-ক্রিয়া সৃষ্টি হয়। দেশপ্রেমের যন্ত্রণায় ভারতবাসীর বুক অসহ্য বেদনায় ভরে আসে—বিদেশের ঠাকুরকে ফেলে স্বদেশের কুকুরকে গ্রহণ করতেও দ্বিধা কেটে যায়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভারতবাসীর সে এক উন্মাদনা—শান্ত ভারতবাসীর মধ্যে আরব-বেদুইনের প্রাণোচ্ছ্বাস, রামায়ণ-মহাভারতের দেশে নায়গ্রার জলপ্রপাত। ক্রমে ক্রমে রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত গড়ে ওঠে। ত্রয়ী মূর্তি আসে ভেসে,—ডাকরিন ও হিউম পরিকল্পিত নরমপন্থী জাতীয় কংগ্রেস, চরমপন্থী বাংলা-মহারাষ্ট্র-পাঞ্জাবের পাল-বাল-লাল ও আপোষপন্থী অরবিন্দচন্দ্র দত্তের দল সচেষ্ট হয়ে ওঠে, ঘাঁটি গেড়ে বসে।

চিরনিঃসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের সে এক দিন কেটেছে। কেউ বোঝে না, কেউ শোনে না, অথচ সৃষ্টির, প্রকাশের অনন্ত ব্যাকুলতা। আদর্শে স্থির বিশ্বাস, হিমাদ্রির অটলতা। গরম বা নরম কোন পন্থাতেই আস্থা নেই, কোনটিই রুচিকর বা যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয় না। ফলে, দু'দলের কারো সঙ্গেই সখ্য-সম্বন্ধ ঘটে না, অবশেষে তাঁকাবনে চলে যান রাজনৈতিক আন্দোলনের বহুদূরে। পরবর্তী কালে গল্পগুচ্ছের 'একটি কুদ্র পুরাতন গল্প'তে এই চিত্তক্ষোভ ও বিদ্বেষের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়,—"চিত্তও সেই নিরালা বাসরা-টুকুর জন্য সর্বদাই উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। কিন্তু পিতামহ অদৃষ্ট পরিহাস করিয়াই হউক অথবা ভুল বুঝিয়াই হউক, আমাকে একটি বিপুল জনসমাজের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া একলে মুখে কাপড় দিয়া হাস্য করিতেছেন; আমি তাঁহার সেই হাস্যে যোগ দিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিতেছি না। পলায়ন করাও আমার কর্তব্য বলিয়া মনে হয় না।"—ইত্যাদি।

সাংবাদিকতার হট্টগোলে শিল্পীমন কোন দিনই তৃপ্তি পায় না। রাজনীতিক মেষাড়ম্বরের মধ্যে অন্তর-যন্ত্রণা এবং সামাজিক আত্মজিজ্ঞাসার কোন মীমাংসা কোন দিনই হয় না। শিল্পী চিরদিনই থাকে চির অতৃপ্ত, চির ব্যথিত। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত চক্রবর্তীর বেদনার মধ্যে তারই সংকেত। শিল্পী হোমের 'The Honourable Magistrate in the meadow'তে কর্মক্লান্তি এক পিরিকের সৃষ্টি করেছে। ধ্যানীমন বিচারপতির ক্লান্তিময় কর্মচিন্তা তাঁবোলেটের ফুলে আলো ওকগাছের ছায়া কোমল সবুজ মাঠের বুকে শান্তি আর স্বপ্নের মধ্যে যায় হারিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার বৃহত্তর মুক্তির আদর্শ। এ মুক্তি মূলতঃ চিত্তের মুক্তি, অজ্ঞতা-অন্ধতা কুসংস্কার হতে মুক্তি। যে মুক্তি ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে মানুষকে এগিয়ে দেবে চিরন্তন মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে। সেদিনের আন্দোলনে এ অভিযান ছিলো না। ধ্যানীমন সমকালীন কর্মপদ্ধতির মধ্যে অনেক ফাঁকি, অনেক মিথ্যে দেখেছিলো। কবি কর্মী নন, ধ্যানী। কর্মেতে আপোষ চলে, ধ্যানে তো আপোষ চলে না। তাই রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যে থেকেও—থেকে গেলেন সেকালের অনেক দূরে। অথচ মানব প্রেমিকের কাছে সমকালীন গভীর চেতনার কোন মূল্যই ছিল না। চিরন্তনই

ছিল আদর্শ, পূর্ণতাই ছিল লক্ষ্য। Sachin Sen তাঁর 'The political thought of Tagore" এ সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা কোন বিচ্ছিন্ন চেতনা নয়, মানবপ্রেমের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবেই জড়িত; এখানে টলস্টয়ের সঙ্গে আত্মিক যোগ। উভয়েরই যেন মূল কথা,—"you shall know the truth and the truth make you free"—সত্যকে জানো, সত্যই মুক্তি দেবে। 'Fear not them that kill the body, but are not able to kill the soul; but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell :—"যারা দেহ হত্যা করে, আত্মাকে হত্যা করতে পারে না—তাদের ভয় করো না, বরং তাদের ভয় করো যারা দেহ ও আত্মা উভয়কেই হত্যা করে নরকগামী করতে পারে।" উনিশ শতকের প্রথমের রাশিয়া আর উনিশ শতকের শেষের ভারত। টলস্টয় আর রবীন্দ্রনাথ। আত্মিক মুক্তি আর বিশ্বমৈত্রীবোধে এক ও অভিন্ন।

রবীন্দ্রনাথ আর পাঁচজন রাষ্ট্রনেতার মত লোকহিত-ব্রতে মানুষকে হাতিয়াররূপে ব্যবহার করতে প্রয়াসী ছিলেন না। মুক্তি বলতে শুধু ভোলবদলে রাজী হন নি। চেয়ে ছিলেন মানুষকে গড়ে পিটে মানুষ করে তুলতে, মানুষকে মানুষের পূর্ণ অধিকার সমর্পণ করতে। বৌদ্ধদের ত্রিশরণ মন্ত্রের মত জীবনময়—ব্যক্তির আত্মবোধ, মুক্তি ও মুক্তি।

ঋষি ধ্যানী যোগী রবীন্দ্রনাথের এত বড় কথা সেদিন কর্ণকুহরে, নৈরাজ্যকাতর কংগ্রেস বোঝেনি, লাল-বাল-পালও শোনে নি, সমগ্র ভারতবর্ষ নির্মম অপবাদে আপন ক্ষুদ্রতাকে আপনই ব্যঙ্গ করেছে। পরম আশাবাদী মানুষটি সেদিন চরম অপমানে ক্ষোভে বেদনায় কাতর হয়ে শিলাইদহে যাত্রা করে। শাপে বর। নগরের বদলে নাক—ভাষার বদলে ভাব, চিন্তার পরিবর্তে চেতনা। নগরের রাজনৈতিক ব্যভিচার, উন্মত্ত সাংবাদিকতার স্বেচ্ছাচারের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে পদ্মার তীরে অখণ্ড প্রকৃতির বুকে দিগন্ত বিলীন সজীবতার সবুজে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিলেন; রাতের রজনীগন্ধার মধুর পরশ প্রাণের মতো, ভোরের সবুজ লেবুপাতার নরম আলোর ছিকে গোলাপী আভার মতো জীবন সুধাময়ীর নাচ গানের নেশায় কবি পাগল হয়ে গেলেন। নূতন করে কবির নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটলো—সমগ্র জীবন ও জগৎ নূতন করে কোলাকুলি করে উঠলো,—'ভাবের মানুষ'টির সঙ্গে 'অভাবের মানুষ'টির ভাব হয়ে উঠলো, সকল অভাব গেল ঘুচে। কবি শুধু পদ্মার দিগন্ত বিস্তৃত, জ্যোৎস্নাস্নাত বিস্তৃত চর, হাওয়ায় দোলখাওয়া বনকাউই শুধু দেখলেন না, তারই বুকে বেড়ে ওঠা অপরূপ জীবন ছন্দটিও অতি সহজে উপলব্ধি করলেন;—"আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্রে, এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখ দুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই সমস্ত দরিদ্র মর্তহৃদয়ের অজস্র ধন-গুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে।"

এখনই মনে আসে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য,—'রবীন্দ্রনাথ বারংবার চেষ্টা করেও সাধারণ জীবনের গভীরে প্রবেশ করতে পারেননি—এখানেই রবীন্দ্র প্রতিভার ট্রাজেডি। জীবনের সিংহদুয়ারে বসেই তিনি জীবন সঙ্গীত গেয়েছেন।' বুঝতে পারি না তাঁর মত রসিক-কবি-সমালোচকও কি করে এ আবিষ্কার করলেন। মনে হয়, বিচারকালীন অবস্থায় রবীন্দ্র-ছোট গল্পের কথা তিনি ভুলে বসেছিলেন।

জীবনের গভীরে প্রবেশ আর কাকে বলা যায়? মেয়েদের কাঠের মাস্তলকে গড়িয়ে গড়িয়ে খেলা মনে দোলা দিয়ে সৃষ্টি করছে ফটিক চক্রবর্তীর ছুটির বেদনা। দুরন্ত ছেলের ভঙ্গিতে যে পুরুষালি ধরণের চুল ছাঁটা মেয়েটি শুভর বাড়ীতে যায়, তারই ছন্দে শুনতে পান একটি অপূর্ব জীবনের সহজ সুর—'সমাপ্তি'র মৃন্ময়ী রূপ পাচ্ছে হৃদয়ে। পোষ্ট-মাষ্টারের গল্প শুনানোতে তৈরী হচ্ছে 'পোষ্ট মাষ্টার'এর প্লট। প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে কবি জীবনের চিরকালীন ছন্দটি শুনতে পেলেন,—"ঘাটের চাষা গান গাচ্ছে, ছেলেডিঙ্গি বেয়ে বেড়াচ্ছে, খেলা যাচ্ছে, রৌদ্র ক্রমেই বেড়ে উঠছে, ঘাটে কেউ স্নান করছে কেউ জল নিয়ে যাচ্ছে—এমনি করে এই শান্তিময়ী নদীর দুই তীরে, গ্রামের মধ্যে, গাছের ছায়ায়, শত শত বৎসর গুন্ গুন্ শব্দ করতে করতে ছুটে চলেছে।"

এমন সময় উপস্থিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, 'সাপ্তাহিক

হিতবাদী'র নতুন আহ্বানে,—'কিছু গল্প চাই।' কবি সেই আহ্বানে সাড়া দিলেন—ছোট প্রাণ ছোট ব্যথার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে দেবার এমন সুযোগ ছাড়লেন না। আমেরিকান, রুশীয় ও ফরাসী ছোট গল্পের মত বাংলা ছোট গল্পও পত্রিকার প্রয়োজনে একটি নূতন রীতি সৃষ্টি করে চললো। পদ্মা ধান দিয়েছে, পাট দিয়েছে, ইলিশ মাছ দিয়েছে; এবার দিলো ছোট গল্প—সোনার ফসল, কাঁচা সোনার মতনই রঙ, জীবনের সহজ সুর। চোখের সামনে ভিড় করে এসে দাঁড়ালো তারাপদ, ফটিক, রতন, মৃন্ময়ী, চারুশশী, আর সেই বোবা মেয়েটি নাম যার শুভা,—বোবার মুখে বুলি ফুটলো—সে বুলি উদাস বিধুর বিষণ্ণ, বিজয়া দশমীর অপরাহ্নে জল ভরা চোখের ভাষা,-তার পরম অনির্দ্দেশ্য আবেগের মত, তার ভাষা অনভিব্যক্ত এক সুখদুঃখানুভূতি। চেতন অচেতনের বোধধারা—আনন্দ-বেদনার বাঁধন-ভাঙ্গা এক উচ্ছ্বাস। শুভার অশ্রুতে পাঠকের অশ্রুর মেশামেশি। কীটস্ আর পাঠক একাত্ম। নাইটিংগেলের সুরবেদনা আর শুভার জীবন যন্ত্রণা:—

"My heart aches, and a drowsy numbness pains
My sense, as though of hemlock I had drunk,
Or emptied some dull opiate to the drains
One minute past, and lethe-wards had sunk"

এবং সর্বশেষে 'Do I wake or sleep'—'সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা প্রবোধো নিদ্রা বা।'

ঠিক এই সময়েই ভল্গারতীর হতে গোর্কীও একইভাবে মস্কোকে নতুন প্রাণমন্ত্রে দীক্ষিত করতে থাকেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গোর্কী নন। চেকভের মত তাঁরও ছোট গল্পের জগৎ একান্ত করেই নিজের,—'created his own world' উপেক্ষিত পল্লীবাংলার মর্মলোকেই তাঁর অমরাবতী। তবুও কিন্তু এ সৃষ্টির রহস্য-কারুকার্য বিদেশীর গল্প হতে স্বতন্ত্র। ছোটগল্পের বিক্রম এখানে মৃদু-মন্থর, জীবন রহস্য ভেদে ধ্যানস্থ যেন একটা অন্ত সুর;—অসুস্থ সন্তানের অ-সুখের সন্ধানে মায়ের কাতরাণি, ভাবের আলোকে মানুষের ভাবনার গ্রন্থি মোচনের প্রচেষ্টা। সমাজ জিজ্ঞাসায় জীবন জিজ্ঞাসার প্রতিচ্ছবি। এখানেই রবীন্দ্র জীবনচেতনার বিশিষ্টতা। গোর্কীর কলাবিমুক্ত পাখীর গানে যে সুর বাজে, মপাসাঁর 'চর্বির গোলা' কিংবা 'বুড়ো খোড়ার মৃত্যু'তে শোক প্রকাশের যে শব্দচূর্ণ বিক্ষিপ্ত হয়, গোগোলের 'ওভারকোট'এ যে জিজ্ঞাসা যুগ-আবেগচেতনার বিস্ফোরণ ঘটে; রবীন্দ্রনাথের কোথাও সেই প্রকাশ নেই, কিন্তু সমাজ-জিজ্ঞাসা হয়তো ফুটেছে—'তারাপ্রসন্নের কীর্তি', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'বিচারক', 'দিদি', 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রভৃতিতে,—'দেনা-পাওনা'তে বংশপ্রথার হৃদয়হীনতায় এবং 'মেঘ ও রৌদ্র' 'দুর্বুদ্ধি' প্রভৃতিতে পরাধীনতার বেদনা ও পুলিশী সমালোচনার 'pointing finger' অনেকটা উদ্যত হয়ে উঠলেও তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ। কোন পাঠকই গল্প-গুচ্ছের কোন গল্প পাঠান্তে কিছুতেই বলতে পারেন না,—'I have toothache in my heart,'

এমন কেন হলো? যুগের উপযুক্ত পটভূমিকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কেন তাকে ব্যবহার করেন নি? এখানেই কি রবীন্দ্র প্রতিভার ট্রাজেডি?

উত্তর জানি না। সদুত্তর না পেয়ে অনেকবার অভিমানে কাতর হয়ে উঠেছি, ভেবেছি কবির সৃষ্টিতে এ অসম্পূর্ণতা কেন? অতঃপর অনেক চিন্তা ভাবনার পরিশেষে একটা ব্যাখ্যা করেছি। সে ব্যাখ্যায় পরীক্ষার সহায় হয়তো হয়—কিন্তু মন মানে না, মনচেতনায় একটা খুঁতখুঁতানি জাগে,—যেন বাঁশীর ফুটো। তাই অনুশোচনায় অভিমানে বেদনার সুর বাজে।

রবীন্দ্রনাথ কবি, সত্যদ্রষ্টা ঋষি। মানুষের মূল রূপ ও স্বরূপ ছিলো একান্তই অনুভূতির গভীরে, বিনা ভূমিকায় বিবাহীন চিত্তে সেখানেই করেছিলেন আঘাত,—মুহূর্তেই ললিতে-হৃষনে, কেদারে-বেহারে-বেহাগে-মল্লারে, ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণীতে ঝংকৃত হয়েছিলো জীবন। নাগরিক জীবনের উত্তপ্ত বিষাক্ত নিঃশ্বাস তখনও পল্লীর তীরের সহজ সবল মানুষগুলির মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি করেনি, সমস্যাসঙ্কটিকতার উচ্চ ও উগ্র কোলাহলের ভিতর থেকে, তাদের জীবনের গভীর হতে কবি চিরদিনের

অপরিবর্তনীয় জীবন ছন্দটি আবিষ্কার করেন। রবীন্দ্রনাথ জানতেন,—

'ইতিহাসের গ্রন্থে আরো খুলবে নতুন পাতা,
নতুন রীতির সূত্রে হবে নতুন জীবন গাঁথা।'

সুতরাং অপরিবর্তনীয় সুরেই কবির আসক্তি,—

'এখনো সেই রাগিণী কানে যখন যুগান্তর
এপারে গঙ্গা ওপারে গঙ্গা মধ্যিখানে চর।'

আমাদের কবি যুগান্তরের। সত্যিই! বহুযৎ, তারাপদ, শুভা, রতন—চিরকালের সৃষ্টি। সর্বহৃদয়ের অক্ষয় ধন। পল্লী জীবনের সঙ্গে নাড়ীর অচ্ছেদ বন্ধন। মহাবিদ্রোহী শ'এক স্থানে বলেছিলেন, শ'কে দেখলেই ইংলণ্ডকে দেখা হয়ে থাকে, সোভিয়েটেও প্রচলিত,—'If you want to understand our people, read krilov', —তেমন আমরাও বলতে পারি গল্পগুচ্ছই পল্লীজীবনের মর্মস্পন্দন, খেটে খাওয়া মানুষের যন্ত্রণা বেদনার ঘনীভূত-রূপ,—'গুচ্ছে গুচ্ছে ধরিয়াছে ফল।'

নিতান্তই সহজ সরল ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখ কথা, আর তার উপদেশহীন তাৎপর্যময় দু-চারটে অশ্রুবিন্দু,—এই তো রবীন্দ্র ছোট গল্পের মূলধন। এক একটি মুহূর্তে চিরন্তনের মূর্তি, ক্ষুদ্র চিত্র-পটে মহাজীবনের ছবি, গোপনে আকাশের প্রকাশ, একখণ্ড বালুকাকণাতে রবিরশ্মির বিচ্ছুরণ—আমাদের রবীন্দ্রনাথ:—গীতিময় রবীন্দ্রনাথ, চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ, মানবশিল্পী রবীন্দ্রনাথ, অখণ্ড-পূর্ণ রবীন্দ্রনাথ, কবি রবীন্দ্রনাথ।

গীতিসুর, চিত্ররস ও চরিত্রায়ণের ত্রিবেণীসঙ্গমেই গল্প-গুচ্ছের পূর্ণস্নান। লিরিক আর নাটকের কেন্দ্র আস্বাদ-লিপ্সাতেই ছোটগল্পের কুমারসম্ভব।

সৃষ্টির স্থায়িত্বের প্রধান কারণ ছন্দ, সুর। সুরই শব্দকে অর্থের বন্ধন হতে ভাবের স্বাধীনলোকে লয়ে যায়। মুক্তির আর চিরন্তনের ভিতরের যাতায়াতের পথটি হয় উন্মুক্ত। ছন্দে বাঁধলেই কথা ফুরিয়েও ফুরোয় না। বাস্তবে যাকে খবর বলে মনে হয় তাই হয়ে ওঠে বাণী। এই বাণীর বাসেই যুগযুগান্তরের মর্ম যায় বিঁধে, হয় অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ। বিজয়ী শেক্সপীয়রের চারশো বছর একাধিপত্য রাজত্বের ত্রিত্রিকূলে দাঁড়িয়ে আছে এই সুর, সুরক্ষিত হয়ে আছে জীবনছন্দ। কমলাকান্তও এই সুরে জগৎ জয় করার প্রয়াসী ছিলেন। আর আমাদের রবীন্দ্রনাথ? মূর্তিমান একটি সুর। জন্মান্তরের গভীর হাতের বেহালা, তাই এ জনমের কারাবাসিতে পূর্বজনমেরই বেহালা। সুর সহজাত কবচকুণ্ডল। প্রতি পদক্ষেপে তাই জীবনানন্দ, কথায় সুরের ছোঁয়া, গানের আবেশ। লিরিক কবির এই বিশিষ্ট প্রতিভাই গল্পগুচ্ছের প্রায় প্রতিটি শব্দপ্রয়োগের মধ্যেই স্পন্দিত,—'তিমির', 'নিভৃত', 'নিলয়', 'নিলীন', 'বিপুল', 'মেদুর', 'রতন', 'বিদিন', 'বিতান', 'তন', 'নিবিড়', 'গহন', 'মধুযামিনী'—এ তো শুধু কথা নয়, যেন এক একটা ঝঙ্কার,—নূপুরের নিক্কণ অথবা সেতারের মীড়।

পোস্টমাস্টারের শেষ বিদায় দৃশ্যে কবির বর্ণনায় অনুভূতির অরুণালোকে জীবন-সত্যের পদ্মটি বিকশিত। কত সত্য, অথচ কত সুন্দর। গল্পের পাপড়িগুলো আস্তে আস্তে যেন দল মেলে দেয়। মনে হয় এ যেন এক সুকণ্ঠীর মূর্ছনায় সঙ্গীত। শুধু সঙ্গীতই বলি কি করে—চিত্র ও তো বটে। একই সঙ্গে গানও শুনি, ছবিও দেখি, মন শুধু আকৃষ্টই করে না, আনন্দে বেদনায় পাগল করে তোলে।

'ক্ষুধিত পাষাণ', 'অতিথি' কিংবা 'এক রাত্রি' জাতীয় গল্পে তো সম্পূর্ণভাবেই কবিকল্পনার ঝংকার,—"Perfect projection of personality, (ছোটগল্পের অন্যতম আকৃষ্টেণ)—ক্ষুধিত পাষাণের সেই অতীত মুগ্ধতা রোমান্টিক বিষণ্ণতা, 'অতিথি'তে তারাপদর পলাতক হৃদিপাত্রের চেতনা,—'দেখা নয়, দেখা নয়, অন্য কোন-খানে', আর 'একরাত্রি'তে সেই রাবীন্দ্রিক রোমান্টিক তৃপ্তি, বাঁশির সুরের সেই আনন্দময় মুক্তি,—

"আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্ত রাত্রির উদয় হইয়াছিল—আমার পরমায়ুর সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটিমাত্র রাত্রিই আমার মুক্ত জীবনের সার্থকতা।"—পাশেই মনে আসে ব্রাউনিঙের The last ride together'এর বীর্যদীপ্ত উক্তি,—'So one day more I am defied'—'এইক্ষণটুকু হোক তবে চিরকাল'—'This night made me eternal'—ছোট গল্প গীতি কবিতার এক কাছেই দাঁড়িয়ে—এখানে

চেকভের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়তা। মনে আছে (চেকভের 'The kiss') অনাহুত চুম্বন-আঘ্রাণ দুর্ঘর্ষন ও অসামাজিক বিস্ফোরিতের অন্ধকার নদীর ধারে বিষণ্ণ ঔদাসিন্যে সত্যোপলব্ধি। নাটকীয় চমক আর লিরিক মূর্ছনা।

কিন্তু শুধু সুরেই তো মানুষের মন ভরে না। কিছু কথাও তো দরকার। সে কথা, জীবনের কথা, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনের সহজ সুরের কথা। প্রাণের সজীব ছবির কথা। রবীন্দ্রনাথের মত পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর কবিও বুঝতেন সুরের সীমা। অসীমতার মধ্যে যেতে হলে ছবিও দরকার। সুর যতই সুদূর হোক তা কখনো চিরকালের হতে পারে না,—'যুগে যুগে লোকের মুখে এই রসের স্বাদ সমান থাকে না, তার আদরের তারতম্য ঘটে।' যুগভেদে পাত্র ভেদে ভূপতির মত মানুষও বলতে পারে—'আমি সংসারের লোক, আমি মানুষ বুঝি' তখন চারুর মত কাব্যরসিক কেবল ক্লান্ত উত্তরই করতে পারে,—'মানুষের কথা বুঝি সাহিত্যে থাকে না।' কিন্তু তা নিছকই অরণ্যে রোদন।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা একাধারে মানবমুখী, অপরধারে সঙ্গীতানুসারী, তাই তাঁর ঘারোয়াঘাটিত মানব চরিত্রের চিত্রশালায় যুগে যুগে মানুষের ভিড়।

রবীন্দ্রনাথ সমগ্র চেতনায় উপলব্ধি করেছিলেন—'সবার উপরে মানুষ সত্য'—তাই স্পষ্ট স্বীকারোক্তি,—"সাহিত্যের ভিতর দিয়ে আমরা মানুষের ভাবের আকৃতি অনেক পেয়ে থাকি এবং তা ভুলতেও বেশি সময় লাগে না। কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে মানুষের মূর্তি যেখানে উজ্জ্বল রেখায় ফুটে ওঠে সেখানে ভোলবার পথ থাকে না।"

এখানেই রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ পরিচয়। ঋষি হয়েও রাজা, সন্ন্যাসী হয়েও গৃহী, ভগবৎপ্রেমাসক্ত হয়েও মানবপ্রেমময়। এ অংশেই রবীন্দ্রনাথের যথার্থ বৈদিক-প্রাণতা। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের অভিন্নতা। এই জন্যই কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে য়ুরোপীয় জীবনের এত ঘনিষ্ঠতা।

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রাঙ্কনের নৈপুণ্য বিচার পাঠকের বুদ্ধি ও বোধের কাছেই ছেড়ে দিলাম, শুধু একটি কথা স্মরণ রাখতে বলি—শরৎচন্দ্রের প্রিয় ছিল গল্পগুচ্ছেরই রবীন্দ্রনাথ। শোনা যায় শয্যাস্থানে বালিশের তলায় সর্বঅবস্থায় থাকতো একখণ্ড 'গল্পগুচ্ছ'।

একদিন কবে

অনিলকুমার মোদক

কল্পনায় গড়া ছিল যতদিন দেখিনি কো তাকে
সে মূর্তি চিরদিন-ই কামনার অসীম আদর—
হৃদয়ের প্রত্যন্ত প্রকোষ্ঠে তার প্রতিষ্ঠার গাঁথে
ধুলো-কাদা দিইনি লাগতে, তার তুলিনি কবর।

একদিন দেখা গেল সেই মূর্তি বাজারের পথে
গেল না সনাক্ত করা ; এ কী সে-ই, নাকি—অন্য কেউ ?
বিস্মৃত পত্রের 'পরে বসে ছিল একদিন তবে—
আজ আর তাকে দেখে রক্তস্রোতে জাগেই না ঢেউ !

মনে হোক, লাভ-ক্ষতি আর আর কোনো কথা নয়,
নিজেকে নিজেই আমি ঠকায়েছি; এ-ই বিস্ময় !

মরুমায়া

শ্রীঅনিলকুমার মজুমদার

১৯৪৩ এর মাঝামাঝি।

ঘুরে ফিরে আবার আসি মরুভূমিতে, সেই অশান্ত অস্থির পুরাতন বন্ধুটির কাছে, তারই প্রশস্ত বুকে স্থান খুঁজে পাই আবার। বালি, বালি আর বালি, যেদিকে তাকানো যায় সেই দিকেই বালি, সবুজের চিহ্ন নেই কোথাও, দিগন্ত জোড়া শুধু বালির স্তূপ, চিক্ চিক করে, ঝিক ঝিক করে আলোর সাথে মিশে হয় মরীচিকা, চোখকেও বিভ্রান্ত করে, মনকেও।

ভোরের আলো পূবের আকাশ রাঙিয়ে তোলে, তারপরই শুরু হয় মরুভূমির প্রলয় লীলাখেলা, প্রলয়ের বিষাণ বাজিয়ে মাতিয়ে তোলে সে দশদিক, আকাশ ছেয়ে ওঠে ধূলোর ঝড়, মত্ত উল্লাসে সে ছুটে বেড়ায় এধার থেকে ওধারে, তার সাথে আগুনের হল্কা, পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় সব কিছু।

দিনান্তে সূর্য অস্ত যান।

মরুভূমির বিশাল বুকেই হয়ত তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখেন, আকাশের রঙ্ তখনও গাঢ় লাল, দূরে আগুন লাগার মত দেখায়, বাতাসেও সেই আগুনের পরশ।

রাত্রি নামে,

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি,

মরুভূমির বুকেও নামে শান্তি।

চেয়ে দেখি তার এক অন্যরূপ—শান্ত, স্নিগ্ধ, সুন্দর। জ্যোৎস্নাকীর্ণ গগনের অসীম আকাশ, নীচে আলোকোজ্জ্বল বিস্তীর্ণ বালুভূমি বাতাসেও মধুর স্নিগ্ধতা।

অপূর্ব সে দৃশ্য।

মনে মনে ভাবি আশ্চর্য সেই প্রকৃতির লীলাখেলা, যেখানে ধ্বংস, সেইখানেই সৃষ্টি, যেখানে মৃত্যুর বিভীষিকা, সেইখানেই জীবনের মধুর আস্বাদন।

তবু ভাল লাগেনা আর,

বড় এক ঘেয়ে হয়ে গেছে সব,

মন ঘুরে বেড়ায় নতুন কিছুর সন্ধানে।

বহুদিন দেশছাড়া, ঘরছাড়া, ঘরের টানও আল্গা হয়ে পড়েছে ক্রমে ক্রমে।

ভুলতে বসেছি সব,

ভুলতে বসেছি বাংলা দেশের সেই দিগন্ত ছোঁয়া ধান-ক্ষেত, সেই ঘন সবুজের সমারোহ, আর কাঁঠালের গন্ধ, বটের ছায়া, ভাঙা বধা পুকুর পাড়, নিস্তব্ধ দুপুরের অক্লান্ত ঘুঘুর ডাক।

মনে হয় স্বপ্ন,

মনে হয় আর কোনদিন দেখবনা তাদের। এই বালির মধ্যেই শেষ হবে জীবন, এই বালির সাথেই হয়ত মিশে থাকব একদিন।

মন ভেঙ্গে পড়েছে একেবারে।

যুদ্ধ চলেছেই ত চলেছে।

জগৎ জুড়ে তারই প্রস্তুতি, তারই উল্লাস,

আগুন নিভছে জ্বলছে, পুড়িয়ে দিচ্ছে জ্বালিয়ে দিচ্ছে, ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে—গ্রাম নগর দেশ মহাদেশ ভেঙ্গে পড়ছে মানুষের ঘর বাড়ী, সুখের নীড়, সর্বহারা হয়ে তারা এসে দাঁড়াচ্ছে পথে, মুখে আর্তনাদ, বুকে হতাশা। তবু তার শেষ নেই,

আঘাতের পর আঘাত আসছে ফিরে, প্রতিঘাতের পর প্রতিঘাত, হিংসার বিনিময়ে প্রতিহিংসা।

ঘুনিবার মানুষের মন, দুনিবার কালের গতি।

শেষ পরিণতি কি?

ধ্বংস

সেই ধ্বংসের মধ্যেই জয়ের উল্লাস,

সেই ধ্বংসের মধ্যেই নতুনের সৃষ্টি,

নতুন মানুষের নতুন জীবনের,

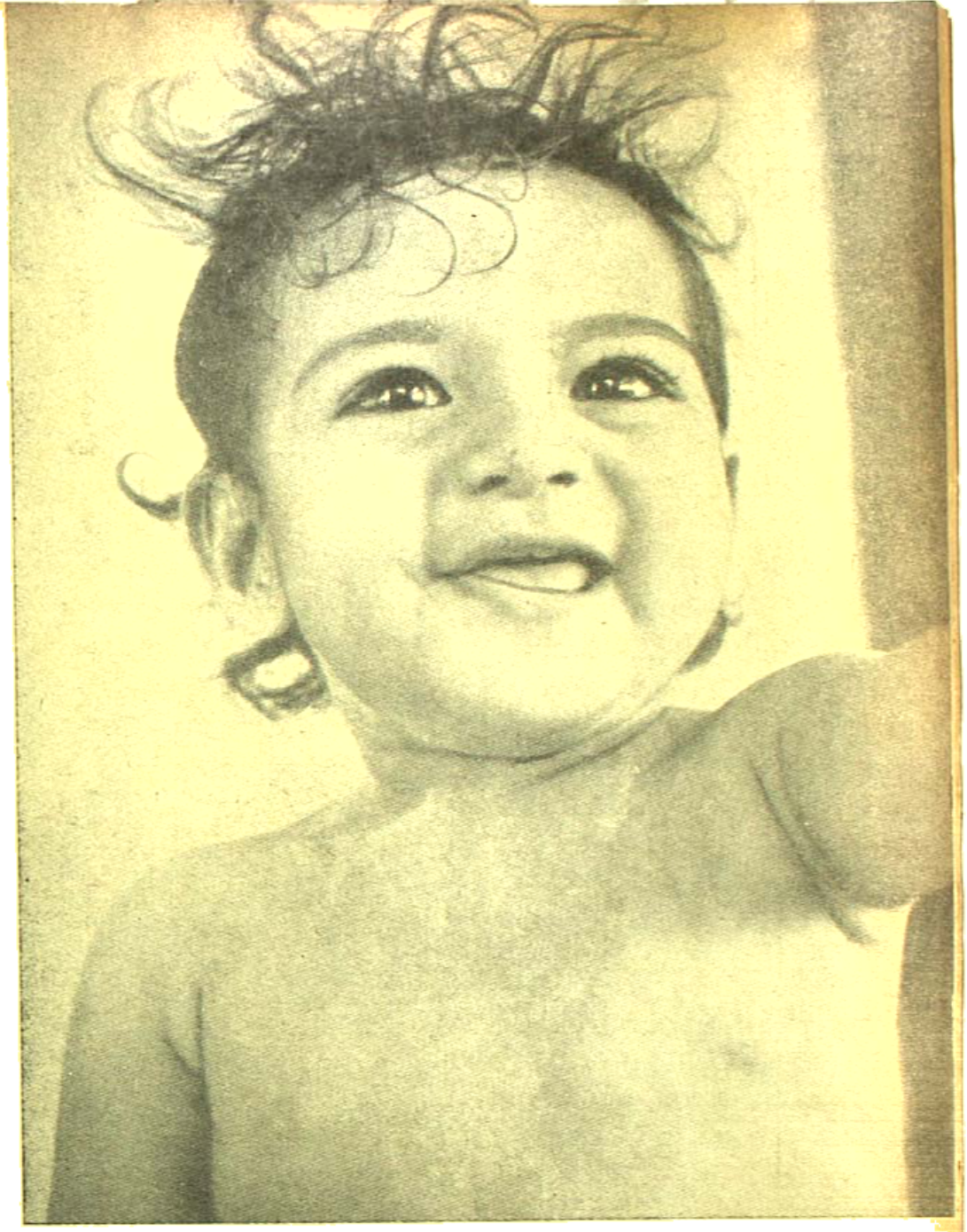

সহাস্য

ফটো : বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফটো : আনন্দ মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ধ্বংস, সৃষ্টি, আবার ধ্বংস,

কালের চাকা ঘুরছে।

তার গতিরোধ করে কার সাধ্য।

এক এক সময় ভাবি এই সব কথাগুলো।

কদিন হল ঘুরম শহরে এসেছি। ঘুরম সহর ইরাণের ছোটখাট এক বন্দর বিশেষ। কারুণ ও শাত্তিল আরব নদীর সঙ্গমস্থলে। বহু অতীতে এ ছিল এক মহাপরাক্রান্ত শেখের রাজত্ব—সেদিনের সে শেখও নেই, তার রাজত্বও নেই, কালের স্রোতে ভেসে গেছে তারা।

ইরাণের শাহই সব,

ভাগ্য বিপর্যয়ে এখন তিনিও পলাতক,

সেখানে ঘাঁটি গেড়েছে আমেরিকানরা, আর এক বিরাট ভারতীয় বাহিনী। সহরের বাইরে উন্মুক্ত মরুভূমিতে গড়ে উঠেছে তাদের বিশাল ঘাঁটি। ক্যাম্পে ক্যাম্পে ছেয়ে গেছে সারা মরুভূমি।

তারই এক প্রান্তে পোষ্ট অফিস, তারই পোষ্ট মাষ্টার আমি। অসম্ভব কাজের চাপ, আর তেমনি মানুষের ভীড়, নিশ্বাস নেবারও সময় দেয়না একটু।

কাজের মধ্যেই ডুবে থাকি।

সেদিনও ছিলাম, হঠাৎ কাউন্টারে কার এক চীৎকার 'এই তরার'

চমকে উঠি,

এমন মধুর সম্ভাষণে কার না ধৈর্যচ্যুতি হয়, চেয়ে দেখি কাউন্টারে দাঁড়িয়ে এক তিন-তারা-ধারী দেশী ক্যাপ্টেন সাহেব।

মুখ খানা চেনা চেনা, গলার স্বরও, তবু সন্দেহ হয় মনে। ঠিক করতে পারিনা কিছু। গোলাম নয়ত? কিন্তু সে আসবে কোথেকে?

দোনা-মনার মধ্যেই থাকি।

—কিরে হতভাগা, চিনতে বুঝি কষ্ট হচ্ছে?

আবার সেই চিৎকার।

সন্দেহ ঘুচে যায় আমার। এ গোলাম ছাড়া আর কেউ নয়, একমাত্র সেইই পারে এমন ভাবে কথা বলতে।

—গোলাম। তুই আবার কবে এলি এখানে?

উঠে গিয়ে ডেকে এনে বসাই তাকে।

গোলাম আমার ছেলে বেলাকার বন্ধু, এক গ্রাম্য স্কুলে পড়তাম দুজনে। তার পর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। আর দেখা হয়নি। সেত অনেক দিনের কথা, প্রায় এক যুগ হতে চলল। অনেক বদলে গেছে গোলাম। অনেক-খানি লম্বা হয়েছে, শরীরে বেশ একটু মাংস লেগেছে। চেহারাটা তার ভালই ছিল—এখন আরও খোলতাই হয়েছে, আমি অফিসার হিসেবে তাকে মানিয়েছেও ভাল।

—ঘুরম সহরেই আছিস? কই দেখিনিত কোনদিন।

—এখানে ত নেই।

—তবে?

ঠিক ঘুরম সহরে থাকেনা গোলাম। সে থাকে এখান থেকে মাইল কয়েক দূরে শাত্তিল আরব নদীর ধারে। তার আসল রেজিমেন্টটাও সেখানে নেই, একটি মাত্র কোম্পানী আছে, তারই কমান্ডিং অফিসার সে।

আমার কথার জবাবে বলে সে।

বহুদিন বাদে দেখা। যা হয় কথায় কথায় নানান কথা ওঠে। তার বাবা মার খবর জানতে চাই। শুনি বাবা গত হয়েছেন, তার মা এখনও আছেন, কিন্তু তাঁরও শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছেনা—কদিন টেকে কে জানে। দুঃখ করেই বলে গোলাম।

সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে।

মনে পড়ে গোলামের বাবাকে—তার সেই স্নেহময়ী মাকে। কতদিন না কেটেছে তাঁদের সঙ্গে! বড় মধুর সে শৈশবের দিনগুলো ভাবতেও যেন ভাল লাগে।

গোলামের বাবা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। চাকরীর জন্য বেশীর ভাগ সময়ই তাঁকে গ্রামের বাইরে বাইরে কাটাতে হত। ছুটিছাটাপেলেই কিন্তুতিনি গ্রামে আসতেন। চমৎকার মানুষটি আর তেমনি ছিলেন সঙ্গীতপ্রিয়। এমন গানের সমঝদার লোক খুব কম পেয়েছি জীবনে। ছেলেবেলায় আমারও একটু গানের গলা ছিল, গোলামের বাবা দেশে ফিরলেই আমার ডাক পড়তো তাঁর কাছে, কত গান যে শুনিয়েছি তাঁকে মনে পড়েনা এখন। শ্যামা সঙ্গীত ছিল তাঁর সবার চেয়ে প্রিয়, ধ্যানমগ্ন হয়ে তিনি সে সব গান শুনতেন মাঝে মাঝে অজান্তে চোখের জলও ফেলতেন তিনি। একখানা শেষ করতেই তিনি বলতেন—আর একখানা গাও, বলা করতেন গোলামের মা। সেই

স্নেহময়ী মহিলাটিকে কোনদিনও ভুলতে পারবো না জীবনে। যেমন ছিল তাঁর রূপ, তেমনি ছিল তাঁর মিষ্টি ব্যবহার। আমার ছিল তার কাছে অবারিত দ্বার। ঘরেই থাকতেন। তিনি, বাড়ীর বাইরেও বেরুতেন না কোনদিন। ঘর সংসারের কাজ করে আর রান্না বান্না করেই দিন কাটত তাঁর—হাতের রান্নাও ছিল অপূর্ব, তাঁর হাতের তৈরী কত যত্ন মিঠাই যে খেয়েছি তার আর কোন হিসেব রাখিনি কোনদিন। তাঁর অসুস্থতার খবর শুনে সত্যিই দুঃখ হয় মনে।

দু কাপ চায়ের অর্ডার দিই।

—তুই আমায় অবাক করেছিস, সিধু।

চায়ে গলা ভিজিয়ে বলে গোলাম।

—কেন বলত?

—তোর মত বেহদ্দ কুঁড়েও যে কোনদিন যুদ্ধে আসবে ধারণাও করতে পারিনি কোনদিন।

তেমনি হেসেই বলে সে।

কুঁড়ে!

সত্যিই বলেছে, গোলাম একটুও অন্যায় বলেনি, কুঁড়েমিটা আমার মজ্জাগত। নড়ে বসতেই আমার দিন কেটে যায়, ছেলেবেলাতেই তার প্রকাশ পেয়েছিল। ভোলেনি সে। গোলাম ছিল অত্যন্ত দুরন্ত, ডন্সিপনায় কোনদিন তার সঙ্গে পেরে উঠিনি আমি। কুঁড়ে আখ্যাটা তারই দেওয়া। সে কথা মনে রেখেছে সে।

—ভাগ্য মানিস?

কুঁড়েমির কথাটা চেপে বলি তাকে।

—তা অনেক সময় মানি।

—সেইই আমায় টেনে এনেছে এখানে।

—ভাগ্যের দোহাই দিয়ে কুঁড়েমিটাকে কদিন বজায় রাখবি?

—যদ্দিন চলে।

হেসেই উত্তর দিই তার।

গোলামও হাসে।

এম, এ পাশ করার পর গোলামও তার বাপের মতই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হয়, কিন্তু, সে চাকরী তার বেশীদিন ভাল লাগেনা। হঠাৎ একদিন ছেড়ে দেয়। ইতিমধ্যে লাগে যুদ্ধ, তখনই সে একটা কমিশন জোগাড় করে যুদ্ধে যোগ দেয়। তারপর অনেক জায়গা ঘুরে শেষ পর্যন্ত আসে খুরম সহরে।

কথায় কথায় সব বলে গোলাম।

—তুই ও তো দেখছি একটুও বদলাসনি।

তার চাকরী ছাড়ার ব্যাপারটাকে উল্লেখ করেই বলি আমি। কি আর করি বল, স্বভাব যায়না মলে।

হেসেই জবাব দেয় গোলাম।

কথাবার্ত্তায় প্রায়ই বাধা পড়ে। পোষ্ট-অফিসের কাজ নানান কামেলায়। এ আসে সে আসে, এ ডাকে সে ডাকে, বারবার উঠে যেতে হয় সেই সব সামলাতে।

—তুই দেখছি মহাব্যস্ত এখন।

আমার অবস্থাটা লক্ষ্য করেই বলে গোলাম।

—আর বলিস না, জ্বালিয়ে মারে একেবারে।

—সন্ধ্যার পর কি একটু ফাঁক পাবি? তাহলে আমার ওখানে নিয়ে যাব, একটু নিশ্চিন্তি হয়ে কথা বলতে পারবি।

—তা পাব।

সেই কথাই হয়। গোলাম এসে নিয়ে যাবে আমাকে। উঠে পড়ে সে।

আমি আমার কাজে আবার মন দি।

সন্ধ্যের পরই গোলাম এসে হাজির হয়।

দু জনে বেরিয়ে পড়ি।

ক্লান্ত সন্ধ্যা ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে, অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে দশদিক, আকাশে আলো নেই, কয়েকটা মিটমিটে তারাই জ্বলছে, তারই আবছা আলোতে যা কিছু নজরে পড়ে।

গাড়ী চালাচ্ছে গোলাম।

জনশূন্য পিচঢালা রাস্তা ঝকঝক করছে, চকচক করছে, মরুভূমির বক্ষ ভেদ করেই চলে গেছে, মরুভূমিও তখন শুষ্ক, শান্ত, প্রাণহীন, বাতাসে কিন্তু সেই আগুনের হল্কা।

দু জনেই চুপচাপ।

তোর সঙ্গে যে আবার কোনদিন দেখা হবে ভাবতেও পারিনি একেবারে।

মৌনতা ভঙ্গ করে বলে গোলাম।

—তাও আবার দেশ ছেড়ে বিদেশে।

—সেটা আরও বিস্ময়কর।

—যুদ্ধই এর মূলে। কোথাকার মাটি যে কোথায় এনে ফেলেছে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

—সত্যিই তাই।

কথাবার্তায় ছেদ পড়ে।

মরুভূমি ছেড়ে আমরা এসে ঢুকি এক খেজুর বনে। অন্ধকার আরও ঘন হয়ে ওঠে। গাড়ীর হেড লাইট জ্বালায় গোলাম। কাঁচা রাস্তা খেজুর বনের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে, তবে ঘোটেই এবড়ো খেবড়ো নয়, দিব্যি আরামেই বসে যাওয়া চলে। ঘুট ঘুটে অন্ধকার, আশে পাশে আছে জলের নালা, তাই একটু সাবধানেই গাড়ী চালায় গোলাম। মশারও উপদ্রব হয়, জামার হাত দুটোকে নামিয়ে দিতে হয় তাদের ভয়ে।

ক্রমেই পাতলা হয়ে আসে খেজুর বন, সামনে দেখি এক বিরাট মাঠ, ঘন তাঁবুর সারি, কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। গেটের কাছে আসতেই সেনট্রি সেলাম ঠুকে গেট খুলে দেয়। আরও এগিয়ে চলি। তারপরই আসে শাত্তিল আরব নদী, তারই কোল ঘেঁসে গোলামের তাঁবু, সেইখানেই গাড়ী দাঁড় করায় গোলাম।

ভারী সুন্দর জায়গাটি, নির্জন, নিরিবিলি।

পাশেই শাত্তিল আরব নদী, তর তর করে বয়ে চলেছে, অপর পারের ঘন খেজুর বনও অন্ধকারের সাথে মিশে আছে। আকাশে উঠেছে ক্ষীণ চন্দ্র।

তারই আবছা আলো পড়েছে নদীর জলে, তরঙ্গের সাথে সাথে সে দুলছে, নিজের মনেই লুকোচুরি খেলছে। ভারী মিষ্টি সেই নীরব চলাফেরাটুকু।

বেশ ভাল লাগে।

কিন্তু কদিন। দুদিন, পাঁচদিন দশদিন। তারপরই মনে হয় এ যেন বিষ, বিষের মতই জ্বালা ধরায় মনে, ইচ্ছে হয় ছুটে পালাই সেখান থেকে।

সে অভিজ্ঞতাও হয়েছে আমার। যুদ্ধে এসেই সেটা বুঝেছি, বেশ ভাল রকমই বুঝেছি।

যাক্ সে কথা।

বহুদিন বাদে আবার বসেছি দুই বন্ধুতে, এক নতুন দেশে, এক নতুন পরিবেশে।

বিয়ার চলেছে,

তার সাথে গরম গরম পকৌড়ি।

ফুরিয়ে গেলেই গোলামের ব্যাটম্যান ত্রিভুজা এসে প্লেটে ভর্তি করে দিচ্ছে।

মনের সঙ্গে চলেছে মুখ।

কত পুরাণো কথাই না তোলে গোলাম। কত ছোটখাট কাহিনী, কত লোকের কথা।

অনেককেই ভুলে গেছি আমি। কারও নাম মনে পড়ে ত মুখ মনে পড়ে না, মুখ মনে পড়ে ত নাম মনে পড়ে না, কাউকে কাউকে আদৌ মনে পড়ে না।

—তুই দেখছি সব ভুলে গেছিস?

বিরক্ত হয়ে বলে গোলাম।

—বাধ্য হয়েই ভুলতে হয়েছে অনেককে। নতুন-গুলোকে জায়গা দিতে হবে ত।

হাসে সে, বড় মিষ্টি সে হাসি।

—দুঃখের কি বুঝছিস্?

অতীত ছেড়ে তখন সে আসে বর্তমানে।

—মনে ত হচ্ছে এ যাত্রা বেঁচে গেলাম।

—বাঁচা?

হো হো করে হেসে ওঠে গোলাম।

—ওর মতন সহজ জিনিষ কিছু আছে নাকি জগতে?

—বলিস কি?

—আমার ত তাই মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে সে একটা গল্প শোনায় আমাকে।

বসরার কাছে জুবের, সেইখানেই ছিল গোলাম। বসরার যুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে, যদিও চুরি ডাকাতি আর চোরাগোপ্তা খুনখারাপিটা তখনও মাঝে মাঝে হয়। একদিন রাত্রে সে তাঁবুর বাইরে শুয়ে ঘুমুচ্ছে, হঠাৎ একটু খুসখাস আওয়াজে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়, চোখ চেয়ে দেখে তার পাশে দাঁড়িয়ে এক বিরাটকায় আরব, হাতের খঞ্জরটা তার সেই রাতের অন্ধকারেও জল জল করে জ্বলছে। দেখে ত তার মাথা ঘুরে যায়, কিন্তু কিছু করবারও নেই, সে মরার মতই পড়ে থাকে। এমনি করেই কাটে কিছুক্ষণ। রিভলভারটা তার বালিশের তলাতেই রয়েছে কিন্তু নিতে সাহস হয় না। নিতে গেলেই হয়ত আরবটা তাকে তার আগেই শেষ করে দেবে। শুয়ে শুয়ে কি করা যায় সেই চিন্তাই করতে থাকে সে। একটু বাদে ঈষৎ চোখ চেয়ে সে দেখে

আরবটা তখন সেখান থেকে একটু দূরে সরে গেছে, ইতাবসরে সে হাতদুটো তখনই তার বালিশের তলায় ঢুকিয়ে দেয় এবং দ্বিতলভারটা আর টর্চটা বেশ ভাল করে হাতের মুঠোয় চেপে ধরে। কিন্তু যেই সে একটু নড়াচড়া করেছে আরবটা তা লক্ষ্য করেছে, তখনই সে ছুটে এসে তার সামনে দাঁড়ায়—আর খঞ্জরটাও একেবারে তার বুকের ওপর উঁচিয়ে ধরে। চুপ করে থাকে গোলাম, একটুও নড়ে না, মরার মত পড়ে থাকে শুধু সে সময়ের অপেক্ষা করে। তারপর হঠাৎ সে উঠে পড়ে এক সাথে টর্চটা জেলে তার মুখে ফেলে, আর সেই সঙ্গে পরপর ছুটো গুলি। ব্যস, আরবটাও মুখ থুবড়ে নীচে পড়ে তখনই।

—আর উঠবে না সে?

—না।

—তাহলে একটা ভয়ঙ্কর রাত্রি।

ভয়ে গলা প্রায় শুকিয়ে গেছলো একেবারে।

—খুব ভয় পেয়ে গেলে বুঝি?

—তা একটু পেলাম বই কি।

আর একদিনও ঠিক এমনি ভয়ই পেয়েছিলাম।

তখন আমরা সবে বসরায় এসেছি। আশে পাশে তখনও ছোটখাট যুদ্ধ বিগ্রহ চলেছে। একটা ছোট ইয়াকী পোষ্ট অফিস দখল করে সেইখানেই আমরা কাজ আরম্ভ করি। বাড়ীটা প্রয়োজনের তুলনায় ছোট হলেও কাজ চলে যেত মোটামুটি। অফিসটা ক্যাম্প থেকে খানিকটা দূরে। সকাল হতেই অফিসে এসে ঢুকি, মাকে দুবার খেতে যাই, সব শেষ করে যখন ক্যাম্পে ফিরি তখন রাত্রি অনেক। তাতেও শেষ হয়না—এর ওপর পড়ে অফিস পাহারার ডিউটি। একদিন আমারও পড়ল। যথাসময়ে জলের বোতল আর একটা লাঠি হাতে করে অফিস পাহারা দিতে এলাম। অফিস তখন বন্ধ, চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, আশে পাশে পড়ে আছে ব্যাগের স্তূপ, আসলে সেইগুলোর ওপর লক্ষ্য রাখাই আমার কাজ। আত্মরক্ষার জন্য আছে হাতে একখানা লাঠি—যা দিয়ে মুরুব ঠেকানো যায়, কিন্তু গুলি ঠেকানো যায় না। তা ছাড়া আরবগুলো হচ্ছে যেমনি ভাকাত, আর তেমনি খুনী। চোরাগোপ্তা—খুন করতে তারা একেবারে সিদ্ধ হস্ত। আশে পাশে যদিও মিলিটারী পুলিশ থাকে, বলতে গেলে তারাই রক্ষী, আমি নিমিত্ত মাত্র। যাকগে, আমার সেখানে আসতে দেখে একজন মিলিটারী পুলিশ আমার কাছে এগিয়ে আসে—তারপর চারপাশ একবার ভাল করে ঘুরে ফিরে দেখে নিয়ে আমায় বলে, ভয় পেয়োনা কিছু, আমরা কাছাকাছি আছি, দরকার হলেই ডাক দিও। এই অভয় মন্ত্র দিয়েই সে সেখান থেকে চলে যায়। মনে মনে বলি, তুমি ত বন্ধুআমার অভয় দিয়ে গেলে, কিন্তু তুমি ছাড়াও তো আর একজন আছে, সে ত আমায় ছাড়বে না—তোমায় ডাক দেবার আগেই সে হয়ত আমায় পরপারের ডাক পৌঁছে দেবে। কি আর করি, সেই স্তূপাকার ব্যাগের পাহাড়ে উঠে ব্যাগগুলো একটু এধার ওধার করে নিয়ে শোবার মত একটু জায়গা করে নি। কিন্তু শুয়েও ঘুম আসেনা চোখে। মন জুড়ে আছে ভয় ও সন্ত্রাস—ভূত, প্রেত, দস্যু, জানোয়ারের। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম, গাঢ় অন্ধকারসমাচ্ছন্ন ওপরের নক্ষত্রবিহীন আকাশ, সামনের খেজুর গাছ দুটোকেও মনে হয় যেন প্রহরীসমান দুই যমদূত, তরুমর্মরেও শুনি আসন্ন মৃত্যুর মৃদু চরণ ধ্বনি। দুঃসময়ের একমাত্র অবলম্বন ভগবান, তাঁরই নাম নি তখন। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীকেও স্মরণ করে বলি—হে পৃথিবী, তোমার আলো হাওয়ায় অনেকদিন কাটিয়েছি, আজ বোধহয় আমার শেষ রাত্রি। কাল সকালে হয়ত আর তোমার বুকে সূর্যোদয় দেখা হবেনা, তার আগেই হয়ত আমার দেহখানা আরব দস্যুর খঞ্জরাঘাতে শতচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে থাকবে, তাই আগে থাকতেই তোমার কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় সেই আরব দস্যুটিকে, তাকেও মনে মনে ডেকে বলি, রাতের অন্ধকারে চুপিসারে কখন যে তুমি আসবে তা আর আমি জানতে পারবনা, তাই আগে ভাগেই একটু জানিয়ে রাখি তোমায়, আসলে আমি তোমার শত্রু নই, নেহাতই পেটের দায়ে আজ অনেকটা তোমার শত্রুর মতন হয়ে দাঁড়িয়েছি, ক্ষমা যদি করতে পার ভালই, আর নেহাতই যদি না পার তবে দোহাই তোমার, কাজটি তোমার এমন ভাবে করো যাতে আমি আর কিছু বুঝতে না পারি।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানিনা, ভোরের আলোয় চোখ মেলে দেখি, না মরিনি—বেঁচেই আছি।

গল্পটা যখন শেষ করি, গোলাম ত হেসেই খুন। হেসেই বলে, 'বাহাদুর বেটা, নে, এবার এক রাউণ্ড হইস্‌কি। সব সেরে যখন অফিস ফিরি, তখন রাত্রি অনেক। গোলামই আমায় পৌঁছে দিয়ে যায়।

দিনের পর দিন এমনি করেই কেটে যায়।

গোলাম রোজই আসে, রোজই তার ওখানে আড্ডা জমে। সন্ধ্যার অন্ধকারে দুজনে বেরিয়ে পড়ি, ফিরি গভীর রাতে—কখনও জানে কখনও অজানে। বেশ চলছিল। হঠাৎ একদিন সে এল না, তারপর আরও কদিন কাটল, তবু তার দেখা নেই।

চিন্তায় পড়ি।

কি আবার হল তার? অসুখ করল নাকি কিছু? কে জানে, কোথায় ও চলে গেল? বলা যায়না কিছু। আমির জীবনে সম্ভব অসম্ভব বলে কিছু নেই।

সাত পাঁচ ভাবি।

একটু খোঁজ খবর নেওয়া দরকার।

নেব নেব করছি, হঠাৎ একদিন গোলামের ব্যাচম্যান ভিসুজা এসে হাজির।

—কি রে তোর সাহেবের খবর কি?

শুনি—সে অসুস্থ তাই সে আসতে পারছে না। সেই দিনই তার কাছে যেতে বলেছে, সন্ধ্যের পর গাড়ীও পাঠিয়ে দেবে।

—নিশ্চয়ই যাব।

কথা দিয়ে বিদেয় করি ভিসুজাকে।

সন্ধ্যের পরই গোলামের ওখানে গিয়ে হাজির হই। দেখি সে তাঁবুর বাইরে একখানা ইজি চেয়ারে শুয়ে রয়েছে। দেখলেই মনে হয় সে বেশ অসুস্থ, মুখখানা শুকনো শুকনো, চোখের কোল বসা, চুলগুলোও সব উস্‌কো খুস্‌কো।

—কি হলরে তোর?

কি জানি কি হয়েছে, কদিন ধরে শরীরটা মোটেই ভাল যাচ্ছেনা—কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না, এইখানেই পড়ে থাকি। তোরই বা খবর কি? আচ্ছা লোক ত তুই, কদিন যাচ্ছিনা একটু খোঁজ খবর নিবি ত?

একটু অভিমান ভরেই বলে গোলাম।

অন্যায় না, সে অভিমান তার হতেই পারে।

সত্যিই তার কোন খোঁজ খবর নিইনি আমি। কুঁড়ের মরণ। নেব নিচ্ছি করতে করতেই দিন কেটে গেছে।

লজ্জা পাই একটু।

সব বুঝিয়ে বলি তাকে! সেও আর সে নিয়ে কোন কথা তোলেনা, ব্যাপারটা সেইখানেই মিটে যায়। এক-খানা চেয়ার টেনে বসি তার কাছে।

সন্ধ্যে হয়েছে অনেকক্ষণ। আকাশে জ্বলছে অসংখ্য তারা, একধারে পূর্ণচন্দ্র হাসছেন। নদীর অপর পারে ঘন খেজুর বনও আকাশের গায়ে আরও সজীব হয়ে ফুটে উঠেছে। চারিধার নিস্তব্ধতায় ঘেরা, শান্তির আরব নদীর বুকেই বইছে আনন্দোচ্ছ্বাস—জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দই শুধু সে গভীর নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করছে মাঝে মাঝে।

ইতিমধ্যে ভিসুজা মদ্যপানের সব সরঞ্জামই দিয়ে গেছে। লেমন কোয়াসের সাথে ড্রাই জিন। তার সঙ্গে গরম আলু ভাজা। মন্দ লাগে না।

নেশাটাও একটুতেই জমে ওঠে।

গোলামের সেদিন তেমন স্ফূর্তি নেই, বড় মনমরা ভাব। কথাও যা বলছে তাও সব খাপছাড়া গোছের। মনও গিলছে অসম্ভব।

—তুই কখনও প্রেমে পড়েছিস, সিধু? হঠাৎ প্রশ্ন করে গোলাম। ঘাবড়ে যাই একটু। হঠাৎ এ হেন প্রশ্ন? মনে সন্দেহ হয় একটু। তবু সে ভাবটা মনের মধ্যে চেপে রাখি। উল্টে প্রশ্ন করি তাকে, পেটের জিন কি মাথায় উঠল তোর? কোন সাড়া দেয় না সে। চুপ করেই থাকে। আপন মনেই পেগের পর পেগ জিন উড়িয়ে চলে সে।

সময়ও বয়ে চলে।

জিনটা একটু কড়া গোছের। একটুখানি খেয়েই বেশ আমি বুঝতে পারি। মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে, পা দুটোও যেন ক্রমেই অবশ হয়ে আসে। বাধ্য হয়েই খাওয়াটা বন্ধ রাখি তখনকার মত। গ্লাস ভর্তি থাকলেও মুখে দিতে আর ভরসা হয়না। সেদিকে কোন লক্ষ্য নেই গোলামের সেদিন যেন তাকে মদেই পেয়েছে। নির্বিচারে সে গ্লাসের পর গ্লাস শেষ করে যায়। দেখে আমি অবাক হই। তবু চুপচাপই থাকি।

রাত্রি ক্রমেই ঘন হয়ে আসে। নিস্তব্ধতা আরও

প্রখর হয়ে ওঠে। দূরে ক্যাম্পের আলো নিবে যায়। আকাশেই শুধু আলো জ্বলে, আর তারই তলে আমরা তিনটি প্রাণী, গোলাম, আমি আর ভিক্টুরা। আমাদের যাইয়ে যাইয়েই তবে ভিক্টুরার ছুটি।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় গোলাম।

কি হল আবার?

চল, কোথাও খানিকটা ঘুরে আসি।

—বলিস্ কি? এতরাতে আবার কোথায় যাবি।

—চল তো! দেখি কোথায় যাওয়া যায়।

অদ্ভুত ঠেকে। এ পাগলের মাথায় আবার কি চেপেছে কে জানে। একেই ত মন গলছে ভীষণভাবে, তার ওপর আবার গাড়ী চালিয়ে না কোন খানা ভোবায় নিয়ে গিয়ে ফেলে। মহা চিন্তায় পড়ি, কিন্তু গোলাম নাছোড়বান্দা। উঠতেই হয় শেষ পর্যন্ত।

বেরিয়ে পড়ি দুজনে।

যথারীতি গোলামই গাড়ী চালাচ্ছে।

আশ্চর্য, এত খেয়েও সে একটুও বেসামাল হয়নি, ষ্টীয়ারিং সে ঠিক চেপে ধরে রেখেছে হাতের মুঠোর মধ্যে। মুখে যদিও কোন কথা নেই।

আমিও নির্বাক।

খেজুর বন শেষ করে আমরা আবার আসি মরুভূমিতে, স্তব্ধ, শান্ত, নিঃসাড় মরুভূমিতে। ধূ ধূ করছে, খাঁ খাঁ, করছে, জন মানবের চিহ্ন নেই কোথাও। গভীর নিস্তব্ধতা ফুটে উঠেছে দিকে দিকে। আলোর ঝলমল করছে ওপরের অসীম আকাশ, আলোর বন্যা বইছে নীচের বিস্তীর্ণ বালুভূমিতে, বাতাসেও মধুর স্নিগ্ধতা। নিঃশব্দে চলেছি দুজনে। গাড়ীর ইঞ্জিনের আওয়াজটাই কানে আসছে মাঝে মাঝে।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে গাড়ী দাঁড় করায় গোলাম।

—চল, বালির ওপর গিয়ে খানিকটা বসি। বড় পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে—গাড়ী থেকে নামতে নামতে বলে গোলাম। কোন দ্বিরুক্তি করিনা, নিঃশব্দে তাকেই অনুসরণ করে চলি। কিছুদূর গিয়ে সেই শুভ্র বালির ওপরই সটান শুয়ে পড়ে গোলাম। আমিও তারই কাছাকাছি এক জায়গায় বসে একটা সিগারেট ধরাই।

—আজকের রাতটা বড় চমৎকার, না?

আকাশের পানে সুদূরদৃষ্টিতে তাকিয়েই প্রশ্ন করে গোলাম। সত্যিই তাই।

এত স্নিগ্ধ, এত শান্ত, এত আলো-ঝলমলে রাত্রি অনেকদিন চোখে পড়েনি। আলো, আলো আর আলো! যেদিকে তাকানো যায় সেইদিকেই আলোর সমারোহ, ধূ ধূ করা মরুভূমিতে বইছে আলোর বন্যা, আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে দশদিক। তার সাথে মিশেছে নিস্তব্ধতা, দুইয়ে মিলে সৃষ্টি করেছে এক অপরূপের রূপ, মুগ্ধদৃষ্টিতে সেই দিকেই চেয়েছিলাম। চমক ভাঙল গোলামের প্রশ্নে—

—আয়েসাকে তোর মনে পড়ে, সিধু?

—আয়েসা? সে আবার কে?

ঘুরিয়ে প্রশ্ন করি তাকে।

—বঙ্গল মিঞার মেয়ে আয়েসা। তাকে তোর মনে পড়েনা?

—আয়েসা! হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়ে সেই নাক টিকোলো, রঙ করসা মেয়েটি, আমাদের সঙ্গে খেলে বেড়াত। হঠাৎ তার কথা এখন! কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি তাকে।

—তার সঙ্গে পরে কখনও দেখা হয়েছিল তোর?

—কি করে হবে? সেই যে দেশ ছেড়েছি, আর তো যাইনি কোনদিন। কে জানে হয়ত তোর মতই তার সঙ্গে দেখা হবে একদিন।

—আর কোনদিনও হবেনা, সে এখন মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস টেনে বলে গোলাম।

—বলিস কি তুই? আয়েসা মরে গেছে?

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি তাকে।

—হ্যাঁ, আজই সেই রাত্রি। চার বছর আগে ঠিক এমনি এক রাতে তাকে আমি মাটি দিয়েছি। সেদিনও ঠিক এমনি করেই চাঁদ উঠেছিল, এমনি করেই আলোয় আলো হয়েছিল দশদিক, শুধু আমার মুখের হাসিই মিলিয়ে গেল চিরতরে। তাকে আমি ভালবেসেছিলাম, সিধু এমন ভালবাসা আর কেউ কাউকে বেসেছে কিনা জানিনা।

—তার সে যৌবনের রূপ তুই দেখিস নি, সিধু, দেখলে হয়ত তোর চোখ ঠিকরে যেত। তার টানা টানা চোখ দুটো যেন কথা বলত, মুখের হাসিতে ছড়িয়ে পড়ত হাজার হাজার মুক্তো, তার সামান্য একটি কথায়, একটুখানি

চোখের দৃষ্টিতে আমার মনে যেন সে আনন্দের তুফান তুলে দিত।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলে যায় গোলাম।

মূক হয়ে বসে থাকি আমি।

—আমাদের সে প্রণয়ের খবর শুধু একজন জানতেন—তিনি আমার মা। আমাদের বিয়ের সব ব্যবস্থাই করেছিলেন—তিনি কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, হঠাৎ একদিন কলেরায় তুগে সে মারা গেল। বাপজান বোধহয় সে শোক বেশীদিন সইতে পা লেন না, কিছুদিন বাদে তিনিও মাটি নিলেন, আমিও সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে এখানে পালিয়ে এলাম, মাও এখন রাঁচির পাগলা-গারদে।

—চুপ করে গোলাম।

আমি বিস্মিত, স্তম্ভিত, মর্মাহত।

মুখ দিয়ে কোন কথা সরেনা, হাতের সিগারেটটা হাতেই পুড়ে ছাই হয়।

স্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকে গোলাম। হাত দুটো দিয়ে চোখ দুটোকে ঢেকে রাখে সে। অত আলো বোধহয় আর সহ্য হয়না তার। তার পানে তাকাতেও মায়া হয়, দুঃখ হয়, মনও সমবেদনায় ভরে ওঠে।

—চুপ করেই বসে থাকি।

মানুষের দুর্ভাগ্য আসে জানি—কিন্তু এমন ভাবে কারও আসে তা আগে কখনও শুনিনি। আয়েশাকেও আমি জানি, ছেলেবেলায় তার সঙ্গে আমিও খেলে বেড়িয়েছি, কিন্তু তার মধ্যে ছিল না কোন প্রাণের সম্পর্ক। তবু গোলামের স্নেহময়ী মাকে কোনদিন ভুলতে পারবোনা। গোলামের সব দুঃখের মধ্যে সেদিন তাঁর কথাটাই আমার প্রাণে বেশী করে বাজে।

সেদিন তিনি কোথায় জানি না। পাগলা-গারদের রেলিং ধরেই হয়ত তিনি সেই ওপরের শূন্য আকাশটার পানে তাকিয়ে ছিলেন।

চাঁদ হাসছে, আলো হাসছে, তিনিও হাসছেন। কোন দুঃখ নেই, কোন বেদনা নেই।

আশা নিরাশা, ভোগ পিপাসা, স্নেহ মমতা, সব কিছুরই বাইরে তিনি।

বসে বসে ভাবি।

কতক্ষণ কে জানে।

চাঁদ কখন চুপিসাড়ে সরে পড়েছে জানতেও পারিনা, একবার আকাশটার পানে তাকিয়ে দেখি সেখানকার রঙ অনেকখানি ফিকে হয়ে উঠেছে। ভোর হতেও আর তেমন দেরী নেই। দুজনেই উঠে পড়ি।

নিঃশব্দে গাড়ীতে এসে বসি।

যথারীতি গোলামই আমাকে অফিসে পৌঁছে দিয়ে যায়। বেচারা ভিন্নজা!

সারা রাত্রি সে আমাদের ডিনার আগলে বসে থাকে।

গোলাম আর আসেনি, আমিও যাইনি তার কাছে, ইচ্ছে করেই যাইনি, ভয় হয়েছে, সংকোচ হয়েছে, পাছে সে আমায় দেখে লজ্জা পায়। অনুমান মিথ্যে নয়, নিজেকে নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করার যা আনন্দ, তার লজ্জাও অপরিসীম, গোলাম হয়ত নিজেও বুঝেছে পরে, তাই সেও আসেনি। তবু তাকে ভুলতে পারিনা, খুবই ইচ্ছে হয় তার কাছে যেতে, কিন্তু জোর করেই সে ইচ্ছাকে দমন করে রাখি।

এমনি করেই কদিন কাটে।

সেদিন সন্ধ্যা হয় হয়, ঘনায়মান সন্ধ্যার ঘন অন্ধকার এগিয়ে আসছে ক্রমে ক্রমে, অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্যটুকুই একমনে উপভোগ করছিলাম, হঠাৎ গোলাম এসে হাজির। অত্যন্ত ব্যস্ত ভাব, গাড়ী থেকে নেমে একরকম ছুটে আসে সে আমার কাছে।

—ব্যাপার কি?

—এখান থেকে চলে যাচ্ছি, তাই তোর সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

কথায় ব্যস্ততা—হাবভাবেও তাই।

—কোথায় যাচ্ছিস? প্রশ্ন করি তাকে।

—আপাতত মক্কল, তারপরই বোধহয় মিসর ইই, চলি।

ফিরে দাঁড়ায় গোলাম।

—সে কি! এরই মধ্যে। একটু চা খেয়ে যা।

—সময় নেইরে একটুও। আমার জন্য সবাই অপেক্ষা করছে, চলি আজকে, আবার হয়ত দেখা হবে পরে।

চলে যায় সে। যেমনি এসেছিল তেমনি ঝড়ের মতই ছুটে পালায় সে। মুহূর্তে তার গাড়ীখানাও মরুভূমির সেই বিশাল বক্ষেই অন্তর্হিত হয়।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাই দেখি।

অন্ধকার আরও যেন গাঢ় হয়ে ওঠে।

পোলামের সঙ্গে দেখা হওয়াটাও যেমন অপ্রত্যাশিত, তার চলে যাওয়াটাও অনেকটা সেই রকমের। সে ছিল মাত্র কয়েক সপ্তাহ; তবু তাকে নিয়ে দিনগুলো আমার কাটে ভাল। শৈশবে তাকে দেখেছিলাম—আবার তাকে দেখলাম তার পূর্ণ যৌবনে। কয়েক বছরের ব্যবধান মাত্র, কিন্তু তার মধ্যেই কত কি হয়ে গেছে তার। বাবা মারা গেছেন, মা হয়েছেন পাগল, নিজেও সে অনেকটা তাই, সে সবের মূলে হচ্ছে আয়েসার আকস্মিক মৃত্যু, যার ওপর কারও কোন হাত নেই। আয়েসাকে ভালবেসেছিল গোলাম, বিনিময়ে তারও ভালবাসা সে পেয়েছিল, তবু তাকেই সে পায়নি। পাবেও না কোনদিন, এ কথা গোলাম জানে, বোঝেও বেশ, তবু তাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাটা তার যায়নি তখনও। পাওয়ার যা আনন্দ—তার চেয়ে না পাওয়ার দুঃখটা যে অনেক বেশী, কবির থেকে সেইটুকুই সে বার বার জানিয়ে যায় আমাকে।

মধুমতীকে

চুণীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

চলেছ কোথায় প্রাণবাতনার হারায়ে অভাগা যাত্রী,
অস্তগিরিতে লুকাল তপন নামিল ধরায় রাত্রি।
বিহগ-বিহগী কাকলী কূজনে
কুলায় ফিরিছে পুলকিত মনে
যত জীবকুল আলয়ে আসিছে সবে ফিরে এই বেলা;
কাটায়ে দুনীতে একটি দিনের সাধের ক্ষণিক খেলা।

কারে খুঁজে পেতে পথিক তোমার অবিরাম অভিযান,
বল মুসাফির মাগিছ সে কোন মানসীর সন্ধান।
আজিকেও তুমি কাহার আশায়
ঘোরো ঘুরিবে ঘোর সন্ধ্যায়
ধর ঘোর হাত হে স্বভাবকবি ভাবের তীর্থে আসি;
রাধার কুঞ্জে মহাউল্লাসে বাজাও শ্যামের বাঁশী।

আমি মরমীর কথাগুলি শুনে কহিলাম—অনুপমা,
সর্বরিক্ত জীবন বাউল গেল আজি প্রিয়তমা।
চিরন্তনের আকাশের তলে
মৈবের ঘরে আমরা যুগলে
চপল চরণে চক্রবালেতে মিলিনু আজিকে আসি;
দেখি দশদিকে তোমার-আমার দুজনার সুখরাশি।

পরমা পৃথিবী তব প্রতি ঘোর নাহি আর অভিমান,
মনের মরুতে শ্রান্ত পায় সেলায় মরুদ্যান।

অভিযান ও অভিযাত্রী

শ্রীস্থান

"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজ:"—মহাকবি কালিদাস তাঁর কালজয়ী কাব্য "কুমারসম্ভব"-এ গিরিরাজ হিমালয় সম্বন্ধে এই কথা বলে গেছেন। ভারতের মহাকাব্য "মহাভারত"-এ যুধিষ্ঠির-আদি পঞ্চ পাণ্ডবের পৃথিবী থেকে মহাপ্রস্থান করে স্বর্গে গমন এই নগাধিরাজ হিমালয়ের ওপর দিয়েই হয়েছিল। ভারতের কাব্যে, গল্পে, চিত্রে, ইতিহাসে—এই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে। যারা দার্জ্জিলিং গেছ তারা হিমালয়ের অন্যতম শৃঙ্গ "কাঞ্চন-জঙ্ঘা"র অপূর্ব্ব কাঞ্চনআভা দর্শন করেছ। আর যারা বিমান পথে যাবার সুযোগ পেয়েছ তারা এই ধ্যান গম্ভীর পর্ব্বতমালার বিশাল বিস্তার, বিপুল উচ্চতা ও বিচিত্র রূপের কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছ।

এই যে বিশ্বের বিস্ময় বিরাট পর্ব্বতমালা, এর অনেক সুউচ্চ শৃঙ্গ আছে এবং তাদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ "এভারেষ্ট"-এর নাম তোমরা সবাই জান। এই 'এভারেষ্ট' শৃঙ্গ বা "মাউণ্ট এভারেষ্ট"-এর উচ্চতা হচ্ছে ২৯০২৮ ফুট্ এবং এই শৃঙ্গই হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান। প্রাচীন কাল থেকেই এই তুষারাবৃত দুর্গম শৃঙ্গের সম্বন্ধে নানা ধারণা প্রচলিত আছে। দেবতাত্মা হিমালয়ের এই সুউচ্চ শৃঙ্গ দেবতার আবাস বলেই অনেকের ধারণা। কিন্তু আধুনিক কালের মানুষ—যারা পৃথিবীর দুই প্রান্তের তুষারাচ্ছন্ন মেরুপ্রদেশ জয় করেছে, বহু দুর্গমকে সুগম করেছে, তারা এই অগম্য, অজেয় শৃঙ্গকে জয় করবার জন্যে বারে বারে চেষ্টা করে এসেছে এবং অবশেষে ১৯৫৩ সালে সর্ব্বপ্রথম এই বিশ্বের সর্ব্বোচ্চ স্থানে মানুষের পদার্পণ ঘটেছে। ১৯২৩ সালের ২৯শে মে তারিখের ডেনজিং নোরগে ও নিউজিল্যাণ্ডের এডমণ্ড হিলারী 'এভারেষ্ট' শৃঙ্গে আরোহণ করেন। এর আগে আর কোনও মানুষ 'এভারেষ্ট' শৃঙ্গে পদক্ষেপ করতে পারে নি, যদিও ১৯২১ সাল থেকে এই এভারেষ্ট অভিযান চলে আসছে। ১৯২১ সালে কর্ণেল হাওয়ার্ড বারী সর্ব্বপ্রথম অভিযান করে উত্তর 'কল্' জয় করেন। তারপর ঐ সালেই জে, সি, রুলের অভিযান ২৬৯২৫ ফুট অবধি উঠতে পেরেছিল। ১৯২৪ সালে লেফ্‌টন্যাণ্ট-কর্ণেল এ, এফ, মর্টনের অভিযান ২৮১২৬ ফুট পর্য্যন্ত পৌঁছেছিল। ১৯৩৩ সালে হিউ রাট্‌লেজ-এর অভিযান ২৭৪০০ ফুটের বেশী পৌঁছাতে পারে নি। ১৯৩৬ সালে এম, উইল্‌সন্ ব্যক্তিগত ভাবে অভিযান করেন এবং এতে তিনি প্রাণ হারান। ১৯৩৫ সালে এরিক্ শিপ্‌টন-এর অভিযান উত্তর 'কল্'-এতেই শেষ হয়। ১৯৩৬ সালের হিউ রাট্‌লেজ-অভিযান খারাপ আবহাওয়ার জন্যে বাতিল হয়ে যায়। ১৯৩৮ এও টিব্‌ম্যানের অভিযান ২৭৩২০ ফুট ওঠবার পর খারাপ আবহাওয়ার জন্য বাতিল হয়। এরপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের

জন্য আর কোনও অভিযান সঙ্গঠনের হয় নি। ১৯৪১ সালে শিপটন দক্ষিণ 'কল্' থেকে নতুন পথ আবিষ্কার করে চেষ্টা করেন। তারপর ১৯৪২ সালে ডঃ উইম-ডুনাট এর নেতৃত্বে যে সুইস্ অভিযান হয়, ত শৃঙ্গ উঠতে না পারলেও অন্য অভিযানের চেয়ে সব চেয়ে উঁচুতে পৌঁছায়। এই অভিযানের দুই অভিযাত্রী তেনজিং ও লাম্বার্ট ২৮২১০ ফুট পর্য্যন্ত উঠতে পেরেছিলেন। ঐ সালেই আর একটা সুইস্ অভিযান হয়, কিন্তু তা ২৬৪৬০ ফুটের বেশী উঠতে পারে নি।

এর পর ১৯৫০ সালে সেই ঐতিহাসিক অভিযান হয়—যা এভারেষ্ট শৃঙ্গ জয় করে। কর্ণেল চন্ হান্টের নেতৃত্বে এই বৃটিশ অভিযান পরিচালিত হয় এবং এই অভিযানের দুই অভিযাত্রী তেনজিং নোরগে ও এডমণ্ড হিলারী ২৯শে মে ২৯০২৮ ফুট উচ্চ এই বিশ্ববিশ্রুত এভারেষ্ট শৃঙ্গ জয় করেন। ১৯৫৬ সালে একটি আমেরিকান-সুইস অভিযানও সাফল্য লাভ করে। ২৩শে ও ২৪শে মে এই অভিযানের পর্ব্বতারোহীরা দুইবার শীর্ষে আরোহণ করেন। ১৯৫২ সালে ভারতীয় অভিযাত্রী মেজর জে, ডায়াস ৩০শে জুন ২৮২০০ ফুট পর্য্যন্ত ওঠেন, কিন্তু শেষ পর্য্যায়ে সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। ১৯৫৩ সালের মার্চিন অভিযান কিন্তু সকলকে চমক লাগিয়ে দেয়। এই অভিযানের অভিযাত্রীরা তিন দফায় এভারেষ্ট শৃঙ্গে আরোহণ করে এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। ১লা মে দক্ষিণ 'কল্' থেকে জে, রবাট্স ও শেরপা নওরাং গোম্বু শীর্ষে ওঠেন। তারপর ২২শে মে বি সি, বিশপ্ ও এল জেরোটাড্ শৃঙ্গারোহণ করেন এবং ঐ দিনই পশ্চিম দিক থেকে ডব্লিউ, এফ, আন্সোল্ড্ ও টি, এফ, বর্ডিলন্ও এভারেষ্ট শৃঙ্গে আরোহণ করেন।

তারপর অবশেষে এই ১৯৫৩ সালের ২০শে মে ভারতীয় অভিযাত্রী দল এভারেষ্ট শৃঙ্গ জয় করলেন। লেফ্টেনাণ্ট-কর্ণেল এম, এস, কোহলীর নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয় এবং ক্যাপ্টেন এ, এস, চিমা ও নওরাং গোম্বু ২০শে মে তারিখে এভারেষ্ট শৃঙ্গে ভারতের বিজয় পতাকা উত্তোলিত করেন। উল্লেখযোগ্য যে নওরাং গোম্বুর এটি দ্বিতীয় বিজয়। কিন্তু এখানেই এই অভিযানের শেষ হয়নি। এরপর অল্প সময়ের ব্যবধানে উপর্য্যুপরী আরও তিন বার ভারতীয় পর্ব্বতারোহী দল এভারেষ্ট শৃঙ্গে আরোহণ করে পর্ব্বতারোহণের ইতিহাসে এক মহাবিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। ভারতীয় দলের এই অভূতপূর্ব সাফল্যের গর্ব্বে আজ সারা দেশ গর্বিত, সারা পৃথিবী বিস্মিত! দেশের তরুণ দল তোমরাও নিশ্চয়ই এই 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনা হীন পর্ব্বতারোহী দলের এই বিস্ময়ের কৃতিত্বে আজ অভিভূত।

এই সূত্রে একটা কথা তোমাদের মনে করিয়ে দি। এই যে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ, যার নামকরণ করা হয়েছে "এভারেষ্ট" বলে, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক বাঙ্গালী যুবকের কৃতিত্ব। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলার এই কৃতী সন্তানটিকে আজ সবাই ভুলতে বসেছে—তার কৃতিত্ব ও স্মৃতি আজ আমাদের কাছে যেন ম্লান হয়ে আসছে। এই বাঙ্গালী যুবকের নাম রাধানাথ শিকদার। তোমরা অনেকেই হয়ত এঁর নাম শুনে থাকবে। এই রাধানাথ শিকদার ভারতীয় জরিপ বিভাগে কর্ম্ম করতেন এবং ইনিই পৃথিবীর এই সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ জরিপ করে এর প্রকৃত উচ্চতা নির্দ্ধারণ করেন। কিন্তু তখন ভারত ছিল পরাধীন। তদানীন্তন সার্ভেয়ার-জেনারেল স্যার জর্জ্জ এভারেষ্ট তখন ছিলেন বিলাতে, কিন্তু তাঁর সুপ্রসন্ন ভাগ্য তাঁর নামকে যুক্ত করে দিল বিশ্বের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের সঙ্গে। আর আসল কর্ত্তা রাধানাথ শিকদার বিস্মৃতির আড়ালে হারিয়ে গেলেন। তখন দেশ স্বাধীন থাকলে এবং সুবিচার হলে এই "মাউণ্ট-এভারেষ্ট" হয়ত "মাউণ্ট রাধানাথ" বা "শিকদার শৃঙ্গ" নামে অভিহিত হত। তবে স্বাধীন ভারতে হয়ত এই নাম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব ও প্রচেষ্টা হতে পারে, কিন্তু তা ফলবতী হবে কি?

যাই হোক, আশা করি তোমাদের কারুর মধ্যেই ঘুমিয়ে আছে ভবিষ্যতের "দুর্গমগিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার" বিজয়ী অভিযাত্রী। হয়ত তোমাদের মধ্য থেকেই কোনও দুঃসাহসী বাঙ্গালী তরুণ অদূর ভবিষ্যতে আরও কঠিন কোনও অভিযানে বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করে বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করবে, বাংলার অভিযাত্রীর সাফল্য বিশ্বের বিস্ময় হয়ে উঠবে, আর বিশ্বের কোনও বিশিষ্ট স্থান হয়ত চিহ্নিত হবে বাংলার কোনও বীর অভিযাত্রীর নামে।

• • •

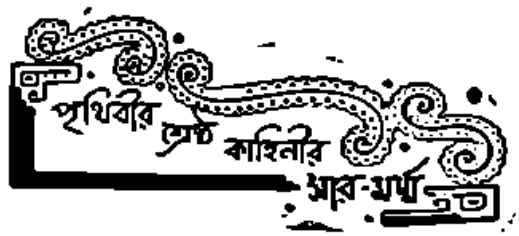

চার্লস্ ডিকেন্স্

রচিত

অলিভার্ টুইষ্ট্

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মকস্ ছিল ফ্যাগিনের শাঁসালো একজন পুরোনো মক্কেল ···কাজেই মকসের পরামর্শমতো ফ্যাগিন্ বিল্ সাইকস্ নামে এক দুঁদে-বাটপাড়কে দিলে—অলিভারকে দাগী-আসামী বানিয়ে তোলার ভার। এ কাজের ভার পেয়ে মোটা টাকা বখশিসের লোভে ফন্দীবাজ বিল সাইকস্ একদিন বেড়াতে যাবার অছিলায় কিশোর অলিভার আর দলের ক'জন কাছু ছোকরাকে সঙ্গে নিয়ে নিশুতি-রাতে ঠিকা-গাড়ী চড়ে বেরিয়ে পড়লো—সহরতলীর নিরালা-অঞ্চলের পানে।

রাত তখন বেশ গভীর···সহরের পথঘাট নির্জ্জন-নিস্তব্ধ···লোকজন সবাই যে যার বাড়ীতে ফিরে খাওয়া দাওয়ার পাঠ চুকিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে বিছানায় দেহ এলিয়ে নিদ্রার ব্যবস্থা করছে।···এমন বেয়াড়া-সময়ে হঠাৎ হুল বেঁধে গাড়ী চড়ে পথে বেড়ানোর সখ!··· অলিভারের কিশোর-মন কেমন যেন অজানা-আতঙ্কে শিউরে উঠলো।

কিন্তু উপায় নেই···মুখ বুজে দুর্ভোগ সইতে হবে তাকে!···যে পাল্লায় পড়েছে সে ···সহজে রেহাই মিলবে না তার।···সহরের পথ মাড়িয়ে গাড়ী চলতে সুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই গুলি-ভরা পিস্তল উঁচিয়ে দুরন্ত-বাটপাড় বিল্ সাইকস্ সে-কথাটা স্পষ্টভাবেই অলিভারকে জানিয়ে রেখেছে গোড়া থেকে। কাজেই অলিভারের আর নিষ্কৃতি নেই ···মুখ বুজে বিল্ সাইকসের সব অত্যাচার···সব অন্যায়···সব কথা মুখ চেয়ে সইতে হবে তাকে ···এইটুকু বুঝিয়ে বলেছে, বিল্ সাইকসের পাকা-হাতের নিপুণতার গুণেতে নিমেষের মধ্যে মানুষ পুলিশ কেসে চালান হয়ে যায়।···এমনি ভাবনায়, অন্তরে অলিভারের মন ভয়ে-আতঙ্কে শহরের মতো ভারী হয়ে উঠলো···দারুণ দুশ্চিন্তায় মাথাটা চুলবুল-চঞ্চল হয়ে রয়ে রইলো। তবুও বিল্ সাইকস্ আর সমবয়সী ছোকরাদের হাসি-ঠাট্টা বিদ্রূপ বাণ তাকে কিছুমাত্রও বিচলিত করতে পারলো না।

খানিকক্ষণ এ-পথে সে-পথে ঘুরে গাড়ী অবশেষে এসে থামলো—শহরের বাইরে নিরালা-নির্জ্জন প্রান্তরের কিনারায় সুন্দর বাগ-বাগিচায় সাজানো বিরাট এক প্রাসাদের পাঁচিলের পাশে। প্রাসাদের মালিক—শহরের এক নামজাদা সৌখিন ধনী···সোনাদানা, হীরে-জহরৎ আর দামী-দামী আসবাবপত্রে ঠাসা তাঁর প্রাসাদ ভবন··· সেই বাড়ীতেই বাটপাড়ি করবে সে-রাতে—এমনি ছিল বিল্ সাইকসের মতলব।

কাজেই সে মতলব হাসিল করার উদ্দেশ্যে, ফন্দীবাজ বিল সাইকস্ তার দলের দাকরেদ-ছোকরা আর অলিভারকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ীর কঠিন সঙ্গেত নিঃশব্দে গাড়ী থেকে নেমে নিরালা-প্রান্তর পার হয়ে সটানে এসে হাজির হলো সেই বিরাট প্রাসাদের পিছনদিকের পাঁচিলের পাশে।

রাত তখন গভীর···প্রাসাদের লোকজন সবাই নিশ্চিন্ত-আরামে নিদ্রাচ্ছন্ন···বিল্ সাইকসের মন উল্লাসে ভরে উঠলো···সে দেখলে—চুপিচুপি ঘুরন্ত প্রাসাদের ভিতরে সেঁধিয়ে দামী-দামী জিনিষপত্র চুরি করবার এই হলো সুবর্ণ সুযোগ। কাজেই আর তিলমাত্র সময় নষ্ট না করে সে ধমকে শাসিয়ে নিরীহ অলিভারকে নিশুতিরাতে পাঁচিল টপকে প্রাসাদের আঙ্গিনায় নামালো—তারপর শানি ভেঙে বড়লোকের বাড়ীর ভিতরে সেঁধিয়ে জিনিষপত্র চুরি করে আনবার জন্য। কিন্তু অলিভার বেচারী নিতান্তই কাঁচা-অপটু···কাজেই আনাড়ী-হাতে যেমনি সে সজোরে ধাক্কা দিয়ে প্রাসাদের জানলা খুলতে গিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ঝন্‌ঝন্-শব্দে জানলার কাঁচের শার্সি ভেঙে

পড়লো! কাঁচের শার্সি ভাঙার আওয়াজে বাড়ীর লোকজনের ঘুম গেল টুটে···সবাই সন্ত্রাস হয়ে সোরগোল জুড়ে দিলে,—চোর···চোর···পাকড়াও··· আলো জ্বালো··· জল্দি!···নিমেষের মধ্যেই প্রাসাদের ঘরে ঘরে জ্বলে উঠলো নানান্ ধরণের বাতির আলো···সে আলোর চোখ-ধাঁধানো রোশনিতে অলিভার হঠাৎ তাকিয়ে দেখলো যে প্রাসাদের পাহারাদার দারোয়ান বিরাট এক বন্দুক বাগিয়ে আগন্তুক-চোরের সন্ধানে ছটাক্ সেই ভাঙা শার্সিওয়ালা-জানলার দিকে এগিয়ে আসছে!

এ সব ব্যাপার দেখে অলিভার বেচারী পড়লো ঘাবড়ে কাঁপরে!···কলীবাজ বিল্ সাইক্সের কাঁধে পা বাড়িয়ে নিশুতি-রাতে পাঁচিল টপকে প্রাসাদে চুরি করতে সেঁধিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে যে এমন বিপদে পড়তে হবে—এ কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি!···এখন উপায়?··· ভয়ে-আতঙ্কে অলিভারের সারা দেহ-মন হিম হয়ে গেল··· এমন সময় দূর থেকে হঠাৎ তার কানে ভেসে এলো বিল্ সাইক্সের কণ্ঠস্বর···পিছনে প্রাসাদের পাঁচিলের ওপার থেকে চাপা-গলায় বিল সাইক্স্ তাকে বলছে,—হাঁ করে তাকিয়ে বসে থাকিস্নে হতভাগা···পালিয়ে আয় চটপট··· নইলে বন্দুকের গুলিতে শেষে···

সাইক্সের কথায় অলিভারের চমক ভাঙলো··পিছন ফিরে তাকাতেই সে দেখলো—প্রাসাদের পাঁচিলের ওপারে অন্ধকার মাঠ-জঙ্গল পার হয়ে প্রাণের ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে চলেছে—দলের পাণ্ডা বিল্ সাইক্স্ আর তার সাকুরেদ-ছোকরারা···চোখের পলক না ফেলতেই তারা যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, তার আর হদিস মেলে না।

দলের সবাইকে এভাবে চোঁ-চা ভম্পট দিয়ে পালাতে দেখে অলিভারও ভাবলো—আর দেরী নয়···এমনি পালাতে না পারলে, শেষে···এই ভেবে সে যেমনি জানালার কার্নিশ থেকে লাফ্ দিয়ে নেমে পাঁচিল টপকাতে উঠেছে, এমন সময় আচম্কা প্রাসাদের কোথা থেকে সজোরে ছুটে এসে তার পায়ে লাগলো বন্দুকের গুলির চোট্···যন্ত্রণায় কাতর হয়ে অলিভার ছিটকে পড়লো প্রাসাদের পাঁচিলের ওপারে—বাইরের অন্ধকার প্রান্তরের উন্মুক্ত-জমির এক পাশে! বন্দুকের গুলির চোট্ লাগলেও, অলিভার কিন্তু একটুকু দমলো না···বরং পাছে ধরা পড়ে যায়, এই ভয়ে সে কোনোমতে অক্ষমী-পায়ের উপর দেহের ভর রেখে খোঁড়াতে খোঁড়াতে থানা-খন্দ ঝোপঝাড়-জঙ্গল মাড়িয়ে প্রাণপণে অন্ধকার প্রান্তরের মাঝে ছুটতে সুরু করলো। কিছুক্ষণ এমনি মরিয়া হয়ে ছুটে চলার ফলে, পায়ের চোট থেকে অবিরাম রক্ত ঝরে পড়ে যন্ত্রণায়-ক্লান্তিতে অলিভারের দেহ ক্রমশঃ দুর্বল অবশ হয়ে এলো···মাথার মধ্যে যেন হাজার তীর বিঁধছে—এমন অসহ্য জ্বালা··· চোখের সুমুখের সারা দুনিয়া নিমেষের মধ্যেই ঘন-কালো ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল কষ্টে-অবসাদে কাতর হয়ে অসহায় অলিভার শেষে চেতনা হারিয়ে পা ফস্কে আচমকা হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়লো অন্ধকার প্রান্তরের গায়ে এক জংলী নালার গর্ভে!

অজ্ঞান-অচৈতন্য অবস্থায় সেই নালার গর্ভের ভিতরে পড়ে থেকেই সারাটা রাত কাটলো অলিভারের। পরের দিন সকালে রোদের আভা ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চেতনা ফিরে পেতেই অলিভার অনুভব করলে যে তার পায়ের ক্ষতস্থানটি আগাগোড়া জুলে-ফেঁপে রীতিমত সঙ্গীন-যন্ত্রণা-দায়ক হয়ে উঠেছে···ক্লান্তি-অবসাদ-দুর্বলতায় সারা শরীর তার আচ্ছন্ন অবশ···কিদের-তেষ্টায় দেহের ভিতরটাও যেন আগাগোড়া শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে···এমন দুর্ভোগের মাঝেও বরাতক্রমে, তার প্রাণটুকুই যে কোনোমতে বজায় রয়েছে এতক্ষণ—সে বোধহয় সম্ভব হয়েছে শুধু ঈশ্বরের অসীম করুণার ফলে!

শরীর দুর্বল আর যন্ত্রণা অসহ্য বোধ হলেও আশ-পাশে কারো বাড়ীতে গিয়ে এক আঁচলা জল চেয়ে তেষ্টা মেটানোর আশায় শ্রান্ত-অবসন্ন অলিভার কোনো-মতে নালার গর্ভ থেকে উঠে অতিকষ্টে টলতে টলতে পথের দিকে এগিয়ে চললো। কিছুদূর এগুতেই তার নজরে পড়লো—পথের পাশেই সোহার ফটকওয়ালা বিরাট এক প্রাসাদ।···অলিভার আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে কাতর দেহে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সোজা পথের পাশের সেই বিরাট প্রাসাদের দরজার সামনে হাজির হয়ে অধীর আগ্রহে কড়া নাড়তে লাগলো। অত ভোরে বাইরে আচমকা কড়া-নাড়ার শব্দ শুনে প্রাসাদের দরোয়ার্ক দরোয়ান তাড়াতাড়ি ভিতর থেকে

ছুটে এসে দরজা খুলতেই দেখলো—সামনে দামী পাথর-বাঁধানো সিঁড়ির পাশে দেউড়ীর মোটা-থামের গায়ে হেলান দিয়ে জীর্ণ-অবসন্ন ক্ষত-বিক্ষত দেহভার এলিয়ে প্রায় বেহুঁশ অবস্থায় বসে রয়েছে টুইটুকে সুন্দর চেহারার এক অজানা-অচেনা কিশোর! আগন্তুক কিশোরের মুখের পানে তাকাতেই দরোয়ান চমকে চীৎকার করে উঠলো! · আরে, এ তো দেখছি, সেই কাল-রাত্তিরের সেয়ানা-ধেমারেশ চোর-ছোঁড়াটা···জানলার শার্সি ভেঙ্গে চুরির মৎলবে বাড়িতে সেঁধিয়ে ছিল হতভাগা···পায়ে বন্দুকের গুলির চোট খেয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সবার চোখে ধুলো দিয়ে অন্ধকারে কোথায় যে সটকে পালিয়ে নিপাত্তা হয়েছিল, তার আর হদিশ পাইনি তখন!···তা সাহস তো বড় কম নয় হতভাগা ছোঁড়ার···কাল রাত্তিরে গুলির চোটে জখম হয়েও, আজ আবার সাত-সকালেই এ বাড়ীর দেউড়ীতে এসে জুটেছে!···দাঁড়াও তো··· বাছাধনকে এবার এমন শিক্ষা দেবো, যে জীবনে আর ভুলবে না কোনোদিন!···ওরে কে আছিস···শীগগির আয় · চোর ধরেছি···চোর!

এই বলেই দরোয়ান বাড়ীর অন্য সব চাকরবাকরদের ডেকে রীতিমত হৈরগোল বাধিয়ে তুললো। দরোয়ানের চীৎকার শুনে লোকজন সবাই ছুটে এলো দেউড়ীতে ·· এমন কি, বাড়ীর গিন্নি-মা পর্য্যন্ত। গিন্নি মাকে দেখেই নিজের বাহাদুরী জাহির করার উদ্দেশ্যে দরোয়ান সদর্পে লোকজনদের ওপরে হাঁকডাক জুড়ে দিলে,—হাঁ করে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিস কি···দৌড়ে থানায় গিয়ে পুলিস ডেকে আন্···চোর হতভাগা হাতে-নাতে ধরা পড়েছে ···উচিত শাস্তি দিতে হবে বাছাধনকে!···ব্যাটা··· শয়তান কোথাকার!·· এই কচি-বয়সে এত কারসাজি শিখেছিস্!

বলেই ক্ষুধায়-তৃষ্ণায়, পায়ের ঘায়ের যন্ত্রণায়, কাতর-অবসন্ন অলিভার বেচারীকে নির্ম্মমভাবে চড়চাপড় মারতে সুরু করলো সেই বদমায়েস দরোয়ান।···

সকাল হতে না হতেই সদর দেউড়ীতে আচমকা এমন হৈ-হট্টগোল হুলুস্থুল-কাণ্ড দেখে উঠতে দেখে বাড়ীর গিন্নী-মা ব্যস্ত-আকুলভাবে বাইরে বেরিয়ে আসতে তাঁর নজর পড়লো—দরজার সামনে উস্কোখুস্কো, রক্তাক্ত কলেবরে যন্ত্রণায় কাতর, অবসন্ন-অর্দ্ধচেতন অবস্থায় দামী পাথর-বাঁধানো সিঁড়ির প্রান্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে টুইটুকে-সুন্দর চেহারার এক অসহায় কিশোর···তাকেই চোর সাব্যস্ত করে লোকজন সবাই মিলে বেপরোয়া প্রহার লাগাচ্ছে। অসহায় এই কিশোরটিকে দেখে গিন্নী-মার কেমন যেন মমতা জাগলো···মনে হলো—এমন কমবয়সী নিরীহ-সরল-নিষ্পাপ ছেলে কখনোই বাচ্চু-চোর হতে পারে না!···কোঁকের মাথায় দরোয়ান হয় তো ঠিকমতো ঠাওর করতে পারেনি,···তাই অনর্থক এই অসহায় কিশোর বেচারীকে অযথা এত সব দুর্ভোগ-পীড়ন সহ্য করতে হচ্ছে। মনে-মনে এমনি ভাবতে ভাবতে গিন্নী-মা করুণা-ভরে অলিভারের কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁকে কাছে এগিয়ে আসতে দেখে অলিভার কাতর কণ্ঠে আবেদন জানালো,—দোহাই মা আমাকে বাঁচান!···সত্যি বলছি ···আমি চোর নই···চুরি করতেও আসিনি···আমাকে এমন করে···

অলিভারের মুখের কথা শেষ হলো না·· যন্ত্রণায় অবসাদে কাতর হয়ে নিমেষের মধ্যেই সে চেতনা হারিয়ে মাটির বুকে ঢলে পড়লো!

অলিভার বেচারীর দুরবস্থা দেখে গিন্নী-মায়ের মন দুঃখে-সহানুভূতিতে ভরে উঠলো···তিনি তাড়াতাড়ি লোক-জনদের ডেকে অচৈতন্য অলিভারকে সযত্নে দেউড়ী থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রাসাদের সুসজ্জিত শয়ন-কক্ষের শয্যায় শুইয়ে রাখলেন···সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকিয়ে এনে প্রয়োজনমতো চিকিৎসা ওষুধপত্র আর সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করলেন।

গিন্নী-মায়ের সদয়-শুশ্রূষার ফলে, অলিভার ধীরে ধীরে আবার তার চেতনা ফিরে পেলো। জ্ঞান ফিরে আসার পর, অসহায় অলিভারের মুখে ব্রিন্ধীবাজ ক্যাগিন, মহস্ আর বিল্ সাইক্সের আসল-কীর্ত্তিকলাপের পরিচয় পেয়ে গিন্নী-মা এবং প্রাসাদের লোকজন কারো মনেই বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইলো না যে—অলিভার বেচারী সম্পূর্ণ নিরপরাধ নিতান্তই দুর্ভাগ্যের ফলে, বাটপাড়-বদমায়েসদের খপ্পরে পড়ে তাকে এতদিন এত সব মর্ম্মান্তিক দুর্ভোগ-যন্ত্রণা মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছিল। কাজেই অসহায় অলিভারের দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনে সকলেই তাকে স্নেহ-মমতাভরে

শ'কুনা জানালো···সযত্নে সেবা-পরিচর্য্যা করে কয়েক-দিনের মধ্যে সুস্থ করে তুললো।

সেরে উঠে অলিভার গিন্নী-মায়ের কাছে অনুরোধ জানালো—তাকে এবার যাব, আশ্রয়দাতা সহৃদয় মিঃ ব্রাউনলোর বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক·· সেখানে সেই পুরানো-আশ্রয়েই সে ফিরে যাবে আবার।

এতদিন সারাক্ষণ নিজের হাতে সেবা-যত্ন করার ফলে, গিন্নী-মায়ের এমনই মায়া জন্মেছিল অসহায় অলিভারের উপর যে তাকে কাছ-ছাড়া করবার কথায় তাঁর চোখে জল ভরে এলো···মন দুলে উঠলো ব্যথার ভারে।···হবু··· কিশোর-অলিভারের মঙ্গল হবে মিঃ ব্রাউনলোর কাছে গেলে—শুধু এই কথাটুকু চিন্তা করেই তিনি অবশেষে চোখের জল মুছতে মুছতে সযত্নে সাদরে অলিভারকে রেখে দিয়ে এলেন মিঃ ব্রাউনলোর জিম্মায়। [ক্রমশঃ

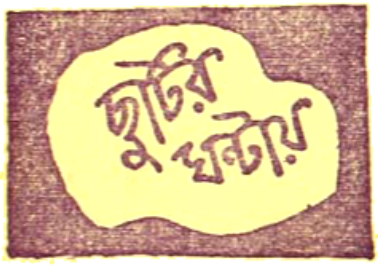

চিত্রগুপ্ত

এবারে তোমাদের আজব-মজার এমন আরেকটি বিজ্ঞানের খেলার কথা বলছি, যেটির কলা-কৌশল ঠিকমত রপ্ত করে নিয়ে তোমরা অনায়াসেই বাড়ীতে আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব-দের আসরে তাঁদের চোখের সুমুখেই সমতল জমি অথবা টেবিলের উপর সাধারণ একটি হাঁসের বা মুরগীর ডিম দাঁড়িয়ে রেখে এবং আদৌ হাত কিম্বা যান্ত্রিক কোনো কিছু সাহায্য দিয়ে না ছুঁয়ে অভিনব উপায়ে ও সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গীতে সেটিকে রীতিমত নৃত্যশীল করে তুলে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে।

এ খেলার কলা-কৌশল আয়ত্ত করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। তবে সে কলা-কৌশলের পরিচয় দেবার আগে, এ কারসাজি দেখানোর জন্য অল্প যে কয়েকটি সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন, আপাততঃ, তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এ খেলা দেখানোর জন্য চাই—হাঁসের কিম্বা মুরগীর একটি ডিম, অল্প একটু পারদ বা পারা (Mercury), এ্যালুমিনিয়ম-ধাতুর তৈরী একটি হাতল-ওয়ালা 'ফ্রাই-প্যান্' (Fry-pan) বা খাপ্পা ও চিম্‌টা-সাঁড়াশি, একটি ছুঁচ, অল্প একটু মৌচাকের মোম এবং জ্বলন্ত একটি ষ্টোভ, উনান, পিদীম, মোমবাতি কিম্বা তেলের আলো (Oil-Lamp)।

ফর্দ্দমতো সাজ-সরঞ্জামগুলি সংগ্রহ হবার পর, আসরে মজার কারসাজি দেখানোর আগে, দর্শকের অগোচরে খেলার উদ্যোগ পর্ব্বের কয়েকটি দরকারী কাজ সেরে নেওয়া চাই। কারণ, এ সব কাজ পূর্ব্বাহ্নেই চুপিচুপি সেরে নিতে না পারলে, দর্শকদের আসরে খেলা দেখানোর সময় নানান্ অসুবিধা ঘটবার সম্ভাবনা আছে। কাজেই এ বিষয়ে সজাগ-দৃষ্টি রাখা এবং সময় থাকতেই খেলার উদ্যোগ পর্ব্বের যথোচিত ব্যবস্থাদি সেরে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। খেলার উদ্যোগ-পর্ব্বের এ সব ব্যবস্থাদি সেরে রাখতে হলে, গোড়াতেই দর্শকদের দৃষ্টির অলক্ষ্যে, হাঁসের বা মুরগীর যে ডিমটি নিয়ে নৃত্যলীলার আজব-কারসাজি দেখানো হবে, সেটির খোলার আবরণের একদিকে সাবধানে ছুঁচ ফুটিয়ে খুব ছোট্ট একটি ফুটো বা গর্ত্ত রচনা করে সযত্নে ডিমের ভিতরকার হলদে-লাল ও সাদা রঙের তরল-অংশটুকু আগাগোড়া নিঃশেষ করে বাইরে ঢেলে

ফেলো। তারপর তরল-পদার্থহীন ডিমের খোলার ঐ ছোট্ট ফুটো বা গর্তের ভিতর দিয়ে অল্প একটু পারদ বা পারা (Mercury) ঢেলে, ডিমের ফাঁপা-খোলাটিকে বেশ খানিকটা ভরাট করে নিয়ে মোমের সাহায্যে ডিমের ফুটো বা গর্তের মুখটিকে আগাগোড়া পরিপাটি ও পাকাপোক্ত ভাবে বন্ধ করে দাও। এভাবে ডিমের খোলার গর্ত বা ফুটোটিকে মোম দিয়ে বুজিয়ে বন্ধ করে দেবার সময়, বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে যে, সেটি যেন ডিমের শক্ত-খোলার আবরণের সঙ্গে বেমালুম মিলে-মিশে যায়। তাহলে, আসরে খেলা দেখানোর সময় দর্শকদের কারো মনে এতটুকু সন্দেহ জাগবে না যে ইতি-পূর্বেই তাঁদের অজান্তে ডিমের ভিতরকার আসল তরল-পদার্থটির পরিবর্তে তোমরা কারচুপি করে পারদ বা পারা ভরে রেখে দিয়েছো।

এমনিভাবে আয়োজন-পর্বের খুঁটিনাটি-ব্যবস্থা কাজগুলি সেরে নেবার পর, আসরে দর্শকদের সামনে খেলা দেখানোর সময়, পারা-ভরি ঐ হাঁসের বা মুরগীর ডিমটিকে কিছুক্ষণ 'ফ্রাই-প্যানের' বা খাপার উপরে বসিয়ে রেখে কিছুক্ষণ জলন্ত-উনান, তেলের আলো বা মোমবাতির শিখার আগুনে উত্তপ্ত করে নিলেই, দেখবে—বিজ্ঞানের বিচিত্র বিধানে সেটি নিজে-নিজেই ঘিরিয়ে নড়ে-চড়ে স্বচ্ছন্দ-ভঙ্গীতে নাচতে সুরু করে দিয়েছে।

এবারের মজার-খেলাটির এই হলো আসল রহস্য। তবে এ খেলায় কলা-কৌশল প্রদর্শন করার সময় হুঁশিয়ার থেকো—মনে রেখো,—জলন্ত আগুনের শিখা আর পারদ বা পারা পদার্থ—এ দুটি নিয়েই খুব সাবধানে কাজ করা দরকার। কারণ এ দুটিই হলো—প্রীতিমত বিপজ্জনক··· এতটুকু অসাবধানে চট করে বিপদ ঘটে যেতে পারে। কাজেই এ খেলার কায়দা-কানুন শিখে করে দেখার সময় সর্বদা বাড়ীর বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ লোকজনের পরামর্শমতো কাজ করাই উচিত।

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি অভিনব-মজার বিজ্ঞানের কারসাজির কথা আলোচনা করার বাসনা রইলো।

মনোহর মৈত্র

১। হিসাবের হেঁয়ালী :

মফঃস্বল-শহরের এক স্কুলে ২০০ ছেলে লেখাপড়া করে। সে শহরের মোট ১০০টি বাড়ী থেকে এই ২০০ ছেলে আসে স্কুলে—কোনো বাড়ী থেকে আসে ১টি ছেলে, কোনো বাড়ী থেকে ২টি, কোনো বাড়ী থেকে আসে টি। মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে হিসাব কষে বলতে পারো,—ঐ ১০০ বাড়ীর মধ্যে কতগুলি থেকে ৩টি, কতগুলি থেকে ২টি আর কতগুলি থেকেই বা ১টি ছেলে ঐ স্কুলে পড়তে আসে? বৈকুণ্ঠ শর্মা

কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের প্রতিভ প্রাঁধা :

২।

একজন ওজনের একখণ্ড পাথরকে এমন উপায়ে ৪টি টুকরোয় ভাঙিতে হইবে যে সেই টুকরোগুলির সাহায্যে সহজেই একসের থেকে ৫'সের সের পর্যন্ত ওজন করা যাবে বটে, কিন্তু পোয়া, ছটাক প্রভৃতিতে আদৌ ওজন করা চলিবে না। বলো তো—কিভাবে পাথরের খণ্ডটিকে চারভাগে ভাগ করিতে হইবে?

রচনা : গোপালচন্দ্র পাঁজা (কলিকাতা)

৩।

অতি ক্ষুদ্র···তিক্ত সে,
বন মাঝে রয়,

উল্টিয়ে দিলে তাকে,
বহুমূল্য হয়।

রচনা : বীরেন্দ্রনাথ মোদক (হুগলী)

গতমাসের ধাঁধা ও হেঁয়ালীর উত্তর :

১। নীচের চতুষ্কোণো ছাদে বাকী জমিটুকে সমান-মাপের চার ভাগে বিভক্ত করা যাবে।

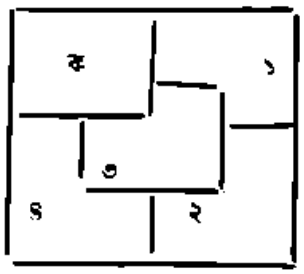

২। পাইয়া টাকা

গত মাসের ছুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

পুপু ও টুটন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), পাপু, ছোটন ও অচ্চি (বোলপুর), বুলু মিত্র (কলিকাতা), হাবলু, টাবলু, সুমা ও পুতুল (হাওড়া), সৌরাংশুকান্ত ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), রবি ও রিনি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), অমিত হালদার (পানাগড়), পিন্টু ও ঝন্টী সাহা (কলিকাতা), বাপি, বুতাম ও পিন্টু সন্ধোপাধ্যায় (বোম্বাই), বুবু ও মিঠু গুপ্ত (কলিকাতা), সুনীরা ও সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় (লক্ষ্ণৌ), দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (দিল্লী), শর্ম্মিষ্ঠা ও সত্যমিত্রা রায় (কলিকাতা), সন্তোষ, মুরারি, সঞ্জয়, সুনীল ও অমিয় (শিলাই), কল্যাণী ও কুমার দেবশর্ম্মা (মাদ্রাজ), সুধাংশু, হিমাংশু, হারাণ, নীহারাংশু ও সুষমা (সন্তোষপুর), লাড্ডু ও কবি হালদার (দিল্লী), রবি ও কড়ু দাশগুপ্ত (কলিকাতা), বিশ্বজিৎ ও বিনয়েন্দ্র সিংহ (শালবিহা), চণ্ডীচরণ দাস (বাকুলাড়া),

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বিশ্বনাথ ও দেবকীকুমার সিংহ (গয়া), শচীন, কল্যাণ, ইন্দ্রজিত, রজত, বিশ্বতোষ ও বিমান (কলিকাতা), বাপ্পা ও শিবাজী রায় (কৃষ্ণনগর), অমিয়, প্রশান্ত, অভীন্দ্র, রাণা, অমৃত, মণি ও মানস (কলিকাতা), বুনা ও রাণা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), কামিনী, যামিনী, মধুবালা, সুকান্ত, ইন্দ্রজিৎ ও বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় (ভাগলপুর), লোকেশ, রাজেশ ও পরমেশ (রাঁচী)।

ময়নার মান

শ্রীপ্রবাস দত্ত

রাজকুমারীর ময়না পাখী
কহনা কথা আর ;
চোখ দুটি তার ছল ছল
মুখটি ভোলা, ভার।
ময়না কথা কইবেনা,
সোনার খাঁচায় রইবে না.
পাখনা মেলে যাবেই সে ঠিক
গহন বনের পার।
সন্ধ্যেবেলা রাজকুমারী
বললে তাকে এসে :
পাখি, শোন, বিয়ে আমার
এই এ-মাসের শেষে।—
কাল সকালে আসিনি তাই,
রাগ করো না লক্ষ্মীটি, ভাই,
ময়না শুনে স্থির করে না
হঠাৎ দিলে হেসে।

বাদ্যযন্ত্রের কথা

দেবশর্মা বিরচিত

এই ধরণের তার-যন্ত্রে সঙ্গীতের সুরঝঙ্কার সৃষ্টি করে লোকের মন মাতিয়ে তোলেন পাশ্চাত্য-দেশের বাদ্য-যন্ত্রীরা। এ বাদ্য-যন্ত্রের নাম — 'গীটার' (Guitar)। সরু থেকে মোটা — ছয়টি বিভিন্ন তারের মাধ্যমে এ বাদ্যযন্ত্রে বিচিত্র সুর-ধ্বনি ফুটিয়ে তোলা যায়। সাধারণতঃ, দুই ধরণের 'গীটার' বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে — তাদের একটির নাম — 'স্প্যানিশ্ গীটার' এবং অপরটির নাম — 'হাওয়াইয়ান্-গীটার'।

আমাদের বাঙলা-দেশের আরেকটি প্রিয়-সনাতন বাদ্য-যন্ত্র হলো — এই 'খ্রী-খোল'। কীর্ত্তন-গীতের আসরে এ বাদ্য-যন্ত্রটির ব্যবহার একান্তই অপরিহার্য্য। 'খ্রীখোল' বাদ্য সহযোগে কীর্ত্তন-গানের রেওয়াজ বাঙলা-দেশে অতি-প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে।

আর বাঙলার বাউল-সম্প্রদায়ের পরম-প্রিয় বিচিত্র-অপরূপ তার-যন্ত্র এমনি-ধরণের এই 'একতারা' বাদ্য তো তোমাদের সকলেরই বিশেষ পরিচিত। বাউলদের হাতের একতারা-যন্ত্রের ঝুনঝুর সুর-লহরীতে পল্লী-বাঙলার নীড়-নিলয় মুখরিত হয়ে আসছে বহু যুগ-যুগান্তকাল ধরে — অতিথির-সমাদরে।

পোষাক পরিচ্ছদে বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধ

শ্রীনলিনাক্ষ সিংহ

ভূমিকা :—মানুষের পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বলতে গেলেই আমাদের ভাবতে হবে পোষাক পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তার কথা। উপকারিতাই বা কি? কেনই বা আমরা আমাদের ভগবানের দেওয়া শরীরের উপর আবার একটা আবরণ চড়াই? একটু চিন্তা করে দেখলে বুঝা যায় যে তিনটি কারণে আমাদের পোষাক পরিচ্ছদের প্রয়োজন হোয়ে থাকে। প্রথমতঃ—লজ্জা নিবারণ, দ্বিতীয়তঃ—প্রকৃতির খাম খেয়ালী অত্যাচারের হাত থেকে আমাদের দেহকে রক্ষা, আর তৃতীয়তঃ—আমাদের মনের সাধ বা লাবী পূরণ।

যখন মানুষের মধ্যে সভ্যতার আলো প্রবেশ করেনি, মানুষ বন্য পশুপক্ষীর মতই বর্বর ছিল তখন মানুষও বন্য জীবজন্তুর মতই নগ্নকায়ে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াত, প্রয়োজন মত জীবজন্তু ও গাছপালা রন্ধন না করে কাচা অবস্থাতেই খেয়ে ফেলতে অভ্যস্ত ছিল,সেই আদিম যুগের মানুষ, বাইবেলের মতে এ্যাডম্ ও ইভ, মানুষের আদি পিতা মাতা, উলঙ্গ অবস্থায় বৃক্ষ বনে জঙ্গলেই বসবাস করতেন, বহুদিন পরে তাঁদের মনে লজ্জা প্রবেশ করল ও তাঁরা গাছের ছাল পরে লজ্জা নিবারণ করলেন। ক্রমে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের সাজ পোষাকে পরিবর্তন দেখা গেল। ছালের আঁশ, তুলা, পশুর লোম, বন্য জীব জন্তুর চামড়া থেকে মানুষ পোষাক পরিচ্ছদ তৈরী করে নেবল।

পোষাক পরিচ্ছদের উপকারিতা :—আগেই বলা হয়েছে প্রকৃতির নানা প্রকার উৎপাত থেকে আমাদের শরীর না ঢাকলে নানা রকমের ব্যাধি এসে আমাদের আক্রমণ করে শরীর পাত করে দেয়, তাই দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রকমের পোষাক প্রবর্তন হোল। শীতপ্রধান দেশের বা পার্বত্য অঞ্চলের পোষাক ও গরম দেশের পোষাকে আকাশ-পাতাল তফাৎ। শীতের হাপট থেকে শরীরকে বাঁচাতে হোলে চাই গরম কাপড়, ভেড়া বা ছাগলের লোম, পাট শণ প্রভৃতির ছালের আঁশ থেকে তৈরী গরম পোষাক—আর গরম দেশের জন্য হালকা ধরণের কাপাস তুলা বা অন্য কোন গাছের ছালের আঁশ থেকে তৈরী কাপড় চোপড়।

মনের খেয়াল বা সখ :—মনের খেয়াল বা সখ মেটাতে দেশকালপাত্র ভেদে ও রুচি হিসেবে নানা রকমের 'রং চঙ্গে' 'চিত্রি বিচিত্রি' করা পোষাক পরিচ্ছদ যুগে যুগে আবিষ্কৃত হোতে থাকল। মানুষ যতই শিক্ষা দীক্ষায় সভ্যতায় অগ্রসর হোতে থাকলো। ততই তার হৃদয় মন ভরে উঠতে লাগল বিলাসিতায়—তাদের রুচিরও ক্রম-বিবর্তন দেখা গেল। আজকের মানুষের মন যা চাইল পরবর্তী যুগের মানুষের মনে তার বিরুদ্ধ ভাবের সৃষ্টি হোল। এমনই ভাবেই সব বিষয়ের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল—বুঝি পরিবর্তনশীলতাই জগতের রীতি। মনের খেয়াল এই রকমে একের পর আর এক রকমের পোষাক পরিচ্ছদে তৃপ্তি পেতে থাকল।

পোষাক পরিচ্ছদে জাতীয়তা বোধ :—মানুষের পোষাক পরিচ্ছদেই ফুটে ওঠে তার জাতীয়তা। পোষাক পরিচ্ছদের মাধ্যমেই ঘটে তার আসল পরিচিতি, তার জাতির গর্ব দেশের গৌরব। আমি যে বাঙ্গালী আমার পোষাক পরিচ্ছদই তার সাক্ষ্য দিতেছে। সেই পোষাকেই যিনি তৃপ্তি পেয়েছেন, গর্ব অনুভব করেছেন, আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত মানুষ, তিনি সত্যই দেশকে ভাল বেসেছেন।

বাঙ্গালীর বেশ ভূষা : সারা ভারতবর্ষই গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, কিন্তু ভারতের অন্য প্রদেশের তুলনায় বাংলার গ্রীষ্ম অনেকটা কম—শীতও অন্য প্রদেশের তুলনায় কম। তাই বাঙ্গালীর পোষাক পরিচ্ছদ কতকটা হাল্কা ধরণের।

আবার বাংলা দেশ পল্লীপ্রধান। প্রায় আশী হাজার পল্লী-গ্রাম নিয়ে বাংলা প্রদেশ গঠিত। বেশ ভূষায় বাঙ্গালার পল্লী ও সহরে খানিকটা তফাৎ থাকলেও খানিকটা মিলও আছে। পাড়াগাঁয়ের লোক অধিকাংশই কৃষিজীবী, সহরের অধিকাংশ লোক হয় ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত আছে, না হয় চাকরীবাকরী কোরে জীবন যাত্রা নির্বাহ করে থাকে। পাড়াগাঁয়ের অধিকাংশ লোকই খুব গরীব, তাই তাদের বেশ ভূষাও খুব সাধারণ ধরণের। পাড়া-গাঁয়ের ভদ্রতর ছেলেরা আগে পরতো মোটা ধুতি, গ্রীষ্মকালে খালি গা খালি পা, কারো পায়ে থাকতো চটী জুতা, বয়স্ক ব্যক্তিরা পরতেন ধুতি চাদর পায়ে চটি জুতা বা খড়ম—কাহার বা খালি পা, পালে পার্বণে উৎসব বা সামাজিক অনুষ্ঠানে কেউ পরতেন ধুতি একটা মের্জাই বা বুক কাটা গেঞ্জি, আর গায়ে থাকতো উড়ানি বা সুতি চাদর, পায়ে অধিকাংশ স্থলেই চটি জুতা—কেহ বা চামড়ার বা ক্যাম্বিসের জুতা পরতেন। জমিদার অথবা অন্যান্য ধনীরা পরতেন তাঁতের মিহি কাপড়, একটা মিহি পিরান বা পাঞ্জাবি বা সিল্কের পাঞ্জাবি, পায়ে ভাল জুতা, পাঞ্জাবির উপর সিল্কের চাদর শোভা পেত—সে আমলে চাদর পরার রীতি ছিল। এমন কি বাঙ্গালী গণ্য মান্য চিকিৎসকরাও গায়ে কামিজ বা পাঞ্জাবির উপর সিল্কের চাদর পরতেন। সহরাঞ্চলেরও অনুরূপ বেশ ভূষাতেই বাঙ্গালী ভদ্রতর লোকদের দেখা যেত। এই ত গেল গ্রীষ্মকালের বাঙ্গালীর বেশভূষা। শীতকালে ঐ চাদরের পরিবর্তে গরীবদের গায়ে একখানা মোটা চাদর, ছোট ছোট ছেলেদের রং করা ছোলাই বা কমদামী পশম ও সুতা মিশান ছোলাই বা র‍্যাপার। ধনবানেরা পরতেন পশমী জামা পিরান বা পাঞ্জাবী, আর গায়ে কাশ্মিরী শাল বা মুর্শিদাবাদি বালাপোষ। কেহ বা আবার বালাপোষের মতই তুলা দিয়ে তৈরী পাঞ্জাবি ব্যবহার করতেন।

বলা বাহুল্য এই সব গরীবের কাপড় চোপড় বিলাতের তথা মাকেষ্টারের তাঁতিরা খুব সস্তা দামে তৈরী করে এ দেশে পাঠাত। র‍্যাপার আসতো জার্মানী প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশ থেকে। ধনবানেরা এ দেশের তাঁতের কাপড় চাদর কাশ্মীরী শাল খুব বেশী দাম দিয়েই কিনে পরতেন। পাড়াগাঁয়ের সাঁওতাল বাউরীরা এ দেশের জোলাদের তৈরী খুব মোটা কাপড় চোপড় পরতো। তখন দেশের মুসলমানেরাও অধিকাংশ স্থলেই বিলাতী কাপড় চোপড় পরতো, কদাচিৎ কোন ধনবান মুসলমান সিল্কের লুঙ্গি পরতেন। তবে তাদের মাথায় হয় কালটুপী, না হয় লম্বা টুপী (Fez) থাকতো। মেয়েরাও সাদা সিদে সাড়ী, সেমিজ বডি (body) ইত্যাদি পরতেন। ধনবানেরা তাঁতের সাড়ী আর গরীব গৃহস্থরা বিলাতী নানা রকমের সাড়ী ব্যবহার করতেন। এই বেশই ছিল বাঙ্গালীর জাতীয় পরিচ্ছদ। অবশ্য বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর আমাদের দেশের নানাস্থানে কল কারখানা বসল, তাঁতেরও মোটা ধুতি সাড়ী বার হোতে লাগলো। বাঙ্গালী সেই সব পরেই তাদের জাতীয়তা বজায় রাখতো। এই সময়ে যারা সরকারী বা বেসরকারী আপিসে কাজ করতেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ কাপড় জামার বদলে কোট প্যাণ্ট হ্যাট (কোলার টুপী) নেক টাই (গলা বন্ধ) সাহেব-দের অনুকরণে পরতেন কিন্তু সে পোষাক মাত্র আপিসেই ব্যবহৃত হোত, বাড়ীতে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে জাতীয় পরিচ্ছদেই সকলে সজ্জিত হোত এবং তাতেই তৃপ্তিও পেত। এই পরিচ্ছদ ব্যাপারে বড় বড় শিক্ষিত বাঙ্গালীরা খুবই গর্ব অনুভব করতেন। তাঁরা যে বাঙ্গালী বাংলা-দেশেই যে তাঁদের মাতৃভূমি তাঁরা কথা বার্তায় হাব ভাবে বিশেষ করে পরিচ্ছদেই তা ব্যক্ত করতেন।

প্রথমেই কলকাতা হাইকোর্টের স্বনামধন্য বিচারপতি ও কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ উপাচার্য স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করছি। ইনি ছিলেন ভারি গোঁড়া হিন্দু। প্রতিদিন গঙ্গাস্নানে আসতেন খালি গায়ে, খালি পায়ে। বাড়ীতেও ধুতি চাদর বা একটা গেঞ্জি বা মের্জাই গায়ে বৈঠকখানায় বসতেন। এখানে ও সেখানে যেতেন—সামাজিক অনুষ্ঠানে, পূজা পার্বণের নিমন্ত্রণে ধুতি, চাদর বড় জোর গায়ে একটা পিরান বা মের্জাই আর শীতকালে একটা র‍্যাপার গায়ে থাকতো। সাহেবী বেশ পরতে মোটেই ভাল বাসতেন না. অবশ্য চাকরীর ব্যাপারে পরতে হোত। আমরা বাঙ্গালী, সাহেবী পোষাক পরলে যেন হাঁপিয়ে উঠি, এই কথা তিনি মাঝে মাঝে বলতেন।

স্বর্গীয় বি,বে (ব্রজেন্দ্রনাথ দে,) আই-সি-এস। ইনি প্রথমে

জেলা শাসক পরে বিভাগীয় শাসক পদ লাভ করেছিলেন (commissioner, Burdwan Division) ইনি তাঁর বাঙ্গলোতে ধুতি চাদর সার্ট (শিরান) ও স্লিপার পরে থাকতেন, কদাচিৎ পায়জামা পরতেন, সামাজিক অনুষ্ঠানে পূজা পার্বণ বা বাঙ্গালীর উৎসবাদির ভোজের নিমন্ত্রণে জামা কাপড় পরে যেতেন। কোন সময়ে কোনও ভদ্রলোক এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন—এ তো আর আমার এজলাস বা আফিস নয় বা বিলাতও নয়, তবে কেন শুধু শুধু ঘাড়ে বোঝাগুলো বয়ে মরি। বিলাতী সাজ পরে জাত ভাঁড়াবার ইচ্ছা আমার মন চায় না।

তাঁহার সুযোগ্য জামাতা স্বর্গীয় গুরুপদন্ন দত্ত, আই-সি-এস, ইনি ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক—ইনিও বাঙ্গালীর ধুতি চাদর শিরান পরতে ভাল বাসতেন—আপিস, আদালত বা সরকারী কাজ কর্ম ছাড়া তাঁকে সাহেবী পোষাকে কমই দেখা যেত। তিনি ছিলেন মনে প্রাণে বাঙ্গালী, বাংলার সব কিছুই তিনি ভালবাসতেন।

স্বর্গীয় সার আশুতোষও আপিস আদালত ও সরকারী কায কর্ম ছাড়া কদাচিৎ বিদেশীয় পরিচ্ছদ পরতেন এবং ইহা ভালও বাসতেন না। বাড়ীতে আট হাতি বা নয় হাতি ধুতি পরে থাকতেন-গ্রীষ্মকালে খালি গায়ে থাকতেন। এই বেশেই তিনি দেশী বিদেশী অতিথিঅভ্যাগতদের আহ্বান, ও আলাপ আলোচনা করতেন। তিনি বলতেন বিদেশী বেশে আমি বড় অস্বস্তি বোধ করি। ও-সব পরিচ্ছদ বদলে আমার নিজের বেশ পরলে আমার ধড়ে প্রাণ ফিরে আসে। কাপড় চোপড় আমার জাতীয় সম্পদ, আমরা গরম দেশের লোক-আমাদের পরিচ্ছদেই আমাদের মানায়। চাকরীর খাতিরেই বিদেশী পরিচ্ছদ পরতে হয়।

প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাই জীবনে কখনও সাহেবী পোষাক পরেন নাই। তিনি যখন বাংলাদেশের বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শকের পদ পেলেন (Inspector of schools) তখন বন্ধুমহল তাঁহাকে সাহেবী পোষাক পরতে অনুরোধ করেছিল—তিনি বলেছিলেন আমি বরং ও-চাকরীতে ইস্তফা দেব, তবু ও-বেশে সজ্জিত হোতে পারব না। আমি বাংলার মানুষ হোয়ে যদি আমার জাতীয় পোষাকের অবমাননা করি বিদেশীরেরা আমাদের আরও ঘৃণা করবে। এই পোষাকই আমার বিশেষত্ব—এই পোষাকই আমার গর্ব। আমি পণ্ডিত মানুষ, পণ্ডিতের বেশেই আমি গর্ব অনুভব করি। বস্তুতঃ তিনি সাদা ধুতি, গায়ে একটা শিরাণ বা বের্ডাই, তার উপর ধুতি চাদর পরতেন—পায়ে তালতলার চটি জুতা—এই জুতা অতঃপর বিদ্যাসাগরী চটী জুতা নামে অভিহিত হোয়েছিল। এই বেশেই তিনি স্কুল কলেজ, সভা সমিতি, আপিস, লাট-দরবার সব স্থানেই যাতায়াত করতেন—দেশী পোষাকে নিজেকে কখনও হীন মনে করতেন না। সাহেবসুবোরা অবশ্য তাঁকে হীনবেশে দেখে একজন সামান্য লোক বলেই গণ্য করত।

একবার সরকারি কাযের জন্য তাঁকে এক উচ্চপদস্থ সাহেবের বাড়ী বা আপিসে যেতে হয়। তিনি তাঁর নিত্য-ব্যবহার্য বেশেই তাঁর কাছে হাজির হন। সাহেব তখন টেবিলের উপর তার বুটজুতা সমেত পা দুখানা তুলে দিয়ে চুরুট টানছিল। বিদ্যাসাগরের অভিবাদনে তিনি কোন রকম ভ্রূক্ষেপ করলেন না বা কোনরকম সম্ভাষণও করলেন না। বিদ্যাসাগরমশাই জরুরী কাযকর্ম সেরে বাড়ী ফিরে এলেন এবং লোকটার অভদ্রতার প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। শীঘ্র একটা সুযোগও মিলে গেল। ঐ সাহেবকেই বিশেষ এক জরুরী কাযে বিদ্যাসাগরের বাড়ী আসতে হোল। বিদ্যাসাগরমশাইএর বিশাল বাড়ী, সবার উপর তাঁর সুবৃহৎ পুস্তকাগার (librray) দেখে সাহেব হকচকিয়ে গেল। বিদ্যাসাগরমশাইও প্রতিশোধ লওয়ার জন্য তাঁর তালতলার চটি পরা পা দুখানি টেবিলের উপর রেখে খবরের কাগজ পড়তে সুরু করলেন—সাহেবকে কোনরকম সম্ভাষণ বা অভ্যর্থনা করলেন না। সাহেব কায-কর্ম সেরে বিদায় লওয়ার সময় তিনি হাসতে হাসতে বললেন "সাহেব, আমরা বাঙ্গালী সব বিষয়েই তোমাদের অনুকরণ করে চলি—তাই বলবার কায়দাটার তোমাদের হুবহু অনুকরণ করে ফেলেছি। তোমাদের মতই অভদ্রতা দেখাতেও বাধ্য হয়েছি।

শোনা যায় সাহেব নাকি খুব লজ্জিত হোয়ে বিদ্যাসাগর মশাই এর কাছে মাপ চেয়েছিলেন!

স্বর্গীয় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বেশ একটা বিশেষত্ব ছিল—তিনি কোনদিনই

সাহেবী পোষাক পরেননি—পরবার পক্ষপাতীও ছিলেন না। বাঙ্গালীর গায়ে সাহেবী পোষাক দেখলে রাগে হাড়ে হাড়ে চটে যেতেন। তিনি বলতেন—আমরা বাঙ্গালী আমাদের পোষাক পরিচ্ছদই তার পরিচয় বহন করে—আমরা কেন পরের পোষাক পরে জাত ভাঁড়াবার চেষ্টা করব? আমার ঘরে যা আছে—মোটা ভাত মোটা কাপড়—আমি তাই নিয়েই সন্তুষ্ট। একবার যখন বাংলার তদানীন্তন ছোটলাট সার রিচার্ড টেম্পল সাহেব (Sir Richard Temple) তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান (Indian Association for the Cultivation of Science) পরিদর্শনে আসবার প্রতিশ্রুতি দেন তাঁর বন্ধুবান্ধবও উক্ত প্রতিষ্ঠানের হিতৈষীরা তাঁকে সাহেবী পোষাক পরে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে অনুরোধ করেন—তিনি ঘৃণা ভরে তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন আমি মারা গেলেও এমন অধর্ম করতে পারব না। আমার জাতীয় বেশ দেখে সাহেব যদি অসন্তুষ্ট হন ত ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবেন, আমরা দেশের লোক মিলে বিজ্ঞান মন্দির গড়ে তুলব।

বলা বাহুল্য যে টেম্পল সাহেব তাঁকে দেশীয় পরিচ্ছদে দেখে খুব খুশী হোয়েছিলেন এবং বিজ্ঞান সভার সভাপতির আসন পাঁচ বছরের জন্য গ্রহণ করেছিলেন। এ হোল ১৮৭৬ সালের ঘটনা। তারপর আবার ১৮৮০ সালে বিজ্ঞান সভায় আসেন তদানীন্তন ভারতের বড়লাট (Governor General and Viceroy of India) মার্কুইস্ অফ রিপন (Marquis of Ripon) সে সময়ও মহেন্দ্রলাল জাতীয় পোষাকেই তাঁহাকে আহ্বান করেন। রিপন সাহেবও তাঁর সৎসাহস ও দৃঢ়তায় মুগ্ধ হোয়ে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে পেট্রনের (patron) পদ সানন্দে গ্রহণ করেন।

স্বর্গীয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সর্বদাই ছাত্রদের বলতেন—সাদাসিদেভাবে জীবন যাপন কর—কিন্তু তোমাদের চিন্তার বিষয় খুব মহৎ হোক ও উচ্চ আশা পোষণ কর (plain living and high thinking) তিনি নিজে সেইরূপ শ্রেণীরই মানুষ ছিলেন। পরতেন একখানা সাধারণ ধরণের ধুতি, এক পিরাণ—নয়ত গলাবন্ধ কোট—পায়ে সাধারণ ধরণের চটী। সভাসমিতিতে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় যেতেন একখানা সাদা মোটা ধুতি, একটা কামিজ, চাদর —শীতকালে একখানা র‍্যাপার। পায়ে থাকতো শ্লিপার বা ক্যাম্বিসের জুতা। ছাত্র বা অভ্যাগত অতিথিদের খেতে দিতেন মুড়ি আর নারকেল—নিজেও এই সব জিনিস পছন্দ করতেন—মুখে বলতেন আমরা বাঙ্গালী—এই বেশেই আমাদের সুন্দর দেখায়—চোগা চাপকান আমাদের জন্য নয়। ছাত্রদের বলতেন দেশী জিনিষ খাবি, দেশী জিনিস পরবি—তবে ত দেশের মান বাড়বে। দেশের উন্নতি হবে।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমণ বাড়ীতে একখানা মাদ্রাজী লুঙ্গি, একটা পিরাণ আর খালি পায়ে থাকতেন, মাথার সুমুখ দিকটা কামাতেন, পিছু দিকে থাকতো ঝুঁটি বাঁধা—বাহিরে কাজ কর্মে কোট প্যান্ট পরতেন বটে তবে মাথায় থাকতো সিল্কের পাগড়ী। তিনি বলতেন আমার জাতীয় বেশেই আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। আমি মাদ্রাজী আমার পোষাক পরিচ্ছদ সেই রকম হওয়াই উচিত বলে মনে করি। কাজই আমার কাম্য, পোষাক নয়—আমাকে লোকে চিনবে কাজের মাধ্যমে পোষাকের মাধ্যমে নয়।

এই সমস্ত মনীষীদের দেশীয় সাদাসিদে পোষাকের উপর ছিল পরম শ্রদ্ধা। যাঁরা কাজের মানুষ তাঁরা কাজকেই বড় দেখেন, পোষাক তাঁদের কাছে কিছুই নয়। দেশীয় পোষাকে আমার অঙ্গে হেয় প্রতিপন্ন করবে, একথা কখনও তাঁদের মনে উদয় হোত না।

পোষাক পরিচ্ছদ আমাদের জাতির প্রতীক, জাতির দেশের সম্মান। সুতরাং সকলেরই উচিত সে সম্মান বজায় রাখা।

পোষাক পরিচ্ছদে ধর্মের প্রভাব: পোষাক পরিচ্ছদের উপর ধর্মেরও বেশ খানিকটা প্রভাব দেখা যায়। কেন না আমাদের পোষাক পরিচ্ছদের যত পরিপাট্য বাড়বে, মনেরও তত পরিবর্তন ঘটবে, মনে গর্ব আসবে, অন্যের উপর ঘৃণা আসবে, দেশের প্রতি দশের প্রতি অশ্রদ্ধা বাড়বে—ধর্ম বিশ্বাস লোপ পাবে। সাধুরা লজ্জা নিবারণের জন্য কৌপিন কি গাছের ছাল পরে থাকেন, শীত নিবারণের জন্য সারা দেহে ছাই মাখেন। বেশের দিকে তাঁরা একবারও চেয়ে দেখেন না।

উপসংহার:—উপসংহারে আমি এই কথাই বলতে

চাই যে আধুনিক যুগে বাঙ্গালীর (তথা বাঙ্গালী হিন্দুর) জাতীয়তা বোধ নাই বললেও অত্যুক্তি হয় না, শুধু পোষাক পরিচ্ছদে কেন, আচার ব্যবহার, খাওয়া দাওয়া সব কিছুতেই বাঙ্গালী হিন্দুস্থান অনেক পিছে। দু'শ বছর ধরে ইংরাজ জাতির গোলামী করে বাঙ্গালীর বিশেষ বাঙ্গালী হিন্দুর সবা খোওয়া গেছে, বাঙ্গালীর মন ঠিক যেন 'আবদেরে ছেলের' মতই সে যা চাইবে তাই দিতে হবে তাকে রোখবার ক্ষমতা নেই, আজকাল ছোট ছোট ছেলেরা পরে হাফপ্যাণ্ট,ছোট মেয়েরা 'ইজের'। পুরুষদের অধিকাংশেরই পোষাক বাড়ীতে মুসলমানদের মত লুঙ্গি, পিরান, গেঞ্জি, পাঞ্জাবি, পায়ে স্যাণ্ডেল। আজকাল চটী জুতা ও চাদর দেশ থেকে বিদায় নিয়েছে, গণ্যমান্য যাত্রাজীরা বা ব্যারিষ্টারি সাট বা কোটের উপর আজও চাদর ব্যবহার করে থাকেন। বাঙ্গালী হিন্দুর বাহিরের পোষাক পুরা প্যাণ্ট একটা সার্ট বা হাফ্ সার্ট সার্ট সার্ট গলফ্ সার্ট্ বা কোট,পায়ে 'বু' জুতা কেহ কেহ টাই বা বো গলায় পরে থাকেন কেহ বা সোলার টুপী (hat) বা ফেল্ট হাট মাথায় দেন। এ বিষয়ে কম বেতনের কেরানী থেকে পদস্থ কেরানী পর্যন্ত সকলেই সাহেবদের অনুকরণ করে থাকেন। আজকাল কেহ কেহ বাড়ীতেও পুরা প্যাণ্ট গেঞ্জি বা হাফ্ সার্ট ব্যবহার করেন বা মুসলমানদের অনুকরণে পায়জামা ও ঢিলা পাঞ্জাবী পরে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করেন। এই পোষাক পরিচ্ছদের ব্যাপারের অবশ্য একটা অর্থনৈতিক দিকও আছে। অবশ্য সে দিক থেকে বিচার করলে আমরা অনেকটা রেহাই পেতে পারি। তবুও আমি বলতে বাধ্য যে where there is a wll there is a way কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে পোষাক পরিচ্ছদ কেন অনেক বিষয়েই বাঙ্গালী দিশেহারা। নিজেদের পোষাকে নিজেদের হেয় মনে করেন। 'জাতির জনক' মহাত্মা গান্ধী আট হাতি খদ্দরের ধুতি, খদ্দরের পাঞ্জাবী, শীতকালে এক খানা খদ্দরের মোটা চাদর—এই জাতীয় পরিচ্ছদে তিনি নিজেকে খুবই গৌরবান্বিত মনে করতেন।

যাহাই হোক সব দিক থেকে বিচার করলে মনে হয় বাঙ্গালী হিন্দুদের মনের বিকার ঘটেছে—এর মূল কারণ আমার মনে হয়, ধর্মের অনুশাসন আর আমরা মানতে চাইনা। আমরা ভুলে যাই ধর্মনীতি—ধর্ম মানুষকে ধরে থাকে বলেই সে ধর্ম। কিন্তু মানুষ তাকে অবলম্বন না করলেই মানুষের দুঃখ দেখা দেয়—পরমহংসদেব বলতেন—তুমি গুঁড়ি ছুঁয়ে থাক সংসারের কোন ঘূর্ণী হাওয়া তোমায় স্থানচ্যুত করিতে পারবেনা। আমরা ধর্মের ধারেও যাইনা, তাই আমাদের এত দুর্দশা। সুখ যেমন মনের প্রতীক—তেমনি পোষাক পরিচ্ছদ মানুষের জাতীয়তার নিদর্শন। আমরা এ বিষয়ে লক্ষ্যহীন। তবে এখনও অনেকে আছেন যারা এ বিষয়ে সচেতন—যদিও তাঁদের সংখ্যা বিরল।

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শুধু যে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ উপলক্ষ্যেই সেকালে কলিকাতা শহরের দেশী ও বিলাতী সমাজের বিলাসী-সৌখিন বোনেদী-বড়লোকেরা বিপুল অর্থব্যয়ে এবং বিরাট ঘুমধাম-আড়ম্বরে নানা রকম বিচিত্র উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতেন তাই নয়, উপরন্তু, নতুন গৃহ-নির্ম্মাণ, প্রমোদাগার-প্রতিষ্ঠা, নৃত্য-গীত-সঙ্গীতের আসর, আর সখের খেলাধূলা, আনন্দ-মজলিস ভুলিয়ে তুলে চিত্ত-বিনোদনের খোশ্-খেয়াল মেটানো প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের হুজুক-হিড়িকে লিপ্ত হয়ে পর্য্যাপ্ত-সমারোহ চালাতেন হামেশাই। তাঁদের এই উদ্ভট ক্রিয়া-কাণ্ড আর বিচিত্র লীলার নানান্ কৌতূহলোদ্দীপক সমাচারের সন্ধান মেলে সেকালের বিভিন্ন কেতাব-পুঁথি ও সংবাদপত্রের পাতায়···একালের অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির উদ্দেশ্যে আপাততঃ পুরোনো-আমলের সেই সব অভিনব তথ্য-বিবরণের কিছু কিছু নমুনা নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

সমাচার দর্পণ

(৪ঠা আষাঢ়, ১২৩৩।১৭ই জুন, ১৮২৬)

মিত্রের প্রতি।—১২২৪ সালে জঙ্গীপুরের দেওয়ান কীর্ত্তিচন্দ্র দত্তের পরলোকপ্রাপ্তি হইলে তাঁহার প্রথম পুত্র শ্রীযুতবাবু মহানন্দ দত্ত অপ্রাপ্তব্যবহারপ্রযুক্ত তৎকালে তাঁহার তাবৎ বিষয় ও জমিদারী কোর্ট আফ ওয়ার্ডসের তাবে ছিল এক্ষণে ১২৩৩ সালের প্রথম বৈশাখ অবধি বাবু মৌসুফ বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়াতে শ্রীযুত সাহেবান্ আলিসানের হুকুমানুসারে আপন পৈতৃক তাবৎ বিষয়ের অধিকারী হইয়া ২৮ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার আপন পৈতৃক মসনদে বসিয়াছেন এবং তদুপলক্ষে বাবুজী নানা দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগকে অনেক ধনদান করিয়াছেন ও দীন দুঃখিরদিগকেও আপ্যায়িত করিয়াছেন। আরো শুনা যাইতেছে যে এই আনন্দোৎসবে মাস'বধি মজলিস ও নৃত্যগীতাদির বাহুল্য হইয়াছিল।

• •

সমাচার দর্পণ

(২৯শে আশ্বিন, ১২৩০।৪ঠা অক্টোবর, ১৮২৩)

বড় খানা।—বড় আদালতের কৌশিলি শ্রীযুত ফারগিসন সাহেব অতি ত্বরায় বিলাত গমন করিবেন তৎপ্রযুক্ত তাঁহার প্রীত্যর্থে শ্রীযুতবাবু কালীনাথ মল্লিক আপন বাটীতে ফারগিসন সাহেবকে এবং উভয়ের আত্মীয় শ্রীযুত পেষ্টন ও শ্রীযুত টয়টন ও শ্রীযুত হইটলি ও শ্রীযুত ওডোডা সাহেব প্রভৃতি কএক জন বড় আদালতের কৌশিলি এবং শ্রীযুত ইস্মর্ট সাহেব প্রভৃতি কএক জন

উকিল সাহেবেরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া অতি উপাদেয় চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য ও নানাপ্রকার পেয় দ্রব্যের বড় খানা দিয়াছেন। সাহেব লোক খানা খাইয়া মহানন্দে আনন্দিত হইয়া গান এবং উৎসাহজনক ধ্বনি করিলেন এবং কএক বার করতালি দিলেন। পরে মেং কারগিসন সাহেব বাবুর গুণ বর্ণন করিয়া অনেক বক্তৃতা করিলেন পরে খানাঘর হইতে সাহেবেরা নাচঘরে গিয়া অপূর্ব্ব ২ নর্ত্তকীর নৃত্য গীতাদি দর্শন শ্রবণান্তর সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।...

* * *

সমাচার দর্পণ

(১৬ই চৈত্র, ১২৩০।২৭শে মার্চ্চ, ১৮২৪)

খানা।—১৮ মার্চ বৃহস্পতিবার বৈকালে শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ মল্লিক কলিকাতার বড়বাজারের বাটীতে অনেক সাহেব লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া নানাপ্রকার উত্তম ২ দ্রব্য ভোজন পান করাইয়াছেন ও ভোজনান্তে উত্তম বাইয়ের নাচ দেখাইয়া বাদশাহী ইংলণ্ডীয় বাদ্য শ্রবণ করাইয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন।

* *

সমাচার দর্পণ

(২৮শে আশ্বিন, ১২৪৫। ১৬ই অক্টোবর, ১৮৩৮)

কোন দর্শক দ্বারাপ্রাপ্ত। অসাধারণ নাচ।—গত ৬ তারিখে বর্ত্তমান মাসে শ্রীলশ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর স্বীয় শোভাবাজারস্থ রাজবাটীতে নৃত্যগীতাদির আমোদ করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনাবলোকন কারণ শ্রীযুত রাজা আপন বিশেষ বৈত্রীভাবাপন্ন জনগণ অর্থাৎ ইংরাজ ও আরমানী ও হিন্দু এবং মুসলমান প্রধান ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করেন। ইঁহারা শ্রীযুত মহারাজার নৃত্যাগারে প্রবেশ করিলে ভূপকর্ত্তৃক আদৃত হইলেন এবং প্রত্যাগমন কালে রাজদ্বারা আতর গুলাপ তোর্রা প্রাপ্তানন্তর সকলে কুতূহলে স্বস্বালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন।

সংবাদ প্রভাকর

(৬ই মাঘ, ১২৬৯।১৮ই জানুয়ারী, ১৮৬৩)

গত দিবস আমরা বুলবুলি যুদ্ধের সংবাদ অতি সংক্ষেপে লিখিয়াছি; অদ্য কোন সম্ভ্রান্ত বন্ধু তদ্বিস্তারিত বর্ণনা করত অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রেরণ করাতে সানন্দচিত্তে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম; পাঠকগণ অবলোকন করুন।

"সিমুলিয়াস্থ শ্রীযুতবাবু দয়ালচাঁদ মিত্র মহাশয় এবং বোড়াসাঁকো নিবাসি শ্রীযুত রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর উভয়ে শীতকালে বুলবুলি পক্ষি সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহারদিগের যুদ্ধ দ্বারা আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন, তাহাতে উভয়েই বিশেষ উদ্যোগী হইয়া দেশ বিদেশ হইতে পক্ষী আনয়ন করত সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন এবং তদুপলক্ষে অনেকানেক মনুষ্য প্রতিপালন করিয়া থাকেন। এই আমোদের এই এক মহা সুখ যাহা আমরা প্রতি বৎসর প্রাপ্ত হইয়া থাকি তাহা অপর কোন কাণ্ডে দৃষ্টি-গোচর হয় না, অর্থাৎ এই সামান্য সংগ্রাম সন্দর্শনার্থ কলিকাতাস্থ যাবতীয় ধনাঢ্যব্যক্তি একত্রীভূত হইয়া স্বীয় পুত্র পৌত্র দৌহিত্র অমাত্যবর্গকে সমভিব্যাহারে লইয়া উপস্থিত হইয়া থাকেন, অন্য নিমন্ত্রণে সম্ভ্রান্ত লোকের এতদ্রূপ সমারোহ হওয়া অতি সুকঠিন, কেননা দেবদর্শন ও নৃত্য গীতাদি উপলক্ষে ধনাঢ্যব্যক্তিকে আহ্বান করিলে কেহ বা স্বয়ং, কেহ বা প্রতিনিধি দ্বারা সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন; কিন্তু এই সূত্রে সংবাদ করিবামাত্র সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলে অতি প্রভূষে প্রাণপণ যত্নে প্রাত্যহিক ক্রিয়া সমাধা করিয়া সভায় কিঞ্চিৎ স্থান প্রাপ্ত হওনাভিলাষে সত্বর হইয়া আগমন করেন এবং ইহাতে কেহ উপযুক্ত অনুপযুক্ত স্থান বিবেচনা করেন না। অতএব জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, উক্ত মহাশয়দিগকে যেমত দৃষ্টা সৎক্রিয়ায় লিপ্ত করিয়াছেন, এই আমোদকেও তাহার সহিত সংযুক্ত করুন।"

"শ্রীযুক্তবাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের সিমুলিয়াস্থ সদনের সম্মুখে যে পক্ষিশালা শ্রীযুক্তবাবু দয়ালচাঁদ মিত্র মহাশয় প্রস্তুত করিয়াছেন সেই পক্ষিশালায় রাজা ব্রজেন্দ্র-নারায়ণ রায়ের পক্ষে সমস্ত অষ্টাহ হইতে আনীত হইয়া-

ছিল, পরে গত ৩ঠা মাঘ রবিবার বেলা দশ ঘটিকা হইতে দুই প্রহর আড়াই ঘণ্টা পর্য্যন্ত উভয় দলের বুলবুলির যুদ্ধ বিক্রম হয়; ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৭ যোড়া পক্ষির সংগ্রাম হইয়াছিল তন্মধ্যে মিত্রবাবুর পক্ষীয় ২৭ পক্ষি এবং রাজপক্ষীয় ১০ পক্ষি জিত হয়, এ বিষয়ের মধ্যবর্ত্তি স্বরূপ শ্রীযুত হরিনারায়ণ গোস্বামী মহাশয় ব্রতী হইয়াছিলেন, ঐ মহাশয় এ বিষয়ে অতি সদ্বিবেচক এবং সুমীমাংসক বটেন, ইঁহার মীমাংসায় উভয় পক্ষিদলের পক্ষি পক্ষের পক্ষগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আমরাও সন্তুষ্ট হইয়াছি; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, রাজা বাহাদুর তিন বৎসরাবধি আহার নিদ্রা পরিহার পূর্ব্বক নানা স্থান হইতে পাখি সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতেছেন, ফলে কোন বৎসর তিনি জয়ী হইতে পারেন নাই, ইহাতে কি নির্দ্দয় মিত্র বাবুর দয়া হয় না? তিনি কোন্ বিবেচনায় রাজাকে হেট মুণ্ড এবং সজলনেত্র করিয়া বিদায় করিলেন? ভাগ্যে রাজা বুদ্ধিমান, এই কারণে তিনি পূর্ব্বেই সাবধান হইয়া স্বীয় রথে চতুরশ্ব সংযুক্ত করিয়া পক্ষিদিগ্যে আনিয়াছিলেন, সেই জন্য তিনি অতি দ্রুত চম্পট পূর্ব্বক অশ্রুধারা নিক্ষেপ করিয়া আক্ষেপ দূর করিলেন।"

• • •

সমাচার দর্পণ

(৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৪১।১৭ই মে, ১৮৩৪)

প্রাসাদারম্ভ।—বর্ত্তমান সনের ১ মে অর্থাৎ ২০ বৈশাখ বৃহস্পতিবার বেলা নয় ঘণ্টার সময়ে আঁড়ুলাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহাদুরের রাজধানীতে আনন্দধাম নামক এক বৃহদট্টালিকা আরম্ভ হওনকালে প্রথম যথাশাস্ত্র পত্তন গ্রন্থিত হইল এই আনন্দজনক শুভকর্ম্মোপলক্ষে শ্রীযুক্ত মহারাজের আজ্ঞানুসারে পূর্ব্বোক্ত রাজধানী হইতে পুনঃ২ বহুসংখ্যক তোপধ্বনি হইয়াছিল কথিত আছে যে উক্ত অট্টালিকা প্রায় এতদ্গ্রহনগর কলিকাতার টৌনহালের ন্যায় নির্ম্মাণ হইবেক যদ্যপি প্রাক্তন বৃহদ্ব্যাপার সুসম্পন্ন হইতে দীর্ঘকাল প্রয়োজন করে কিন্তু মহারাজ বাহাদুরের বিশেষ মনোযোগ থাকিলে আমরা অনুমান করি বরায় সুসম্পন্নস্বরূপ বিচিত্র নহে।—চন্দ্রিকা।

• • • •

(সমাচার দর্পণ, ২০শে ডিসেম্বর, ১৮২৩)

নূতনগৃহ সকার।—যোং কলিকাতা ১১ ডিসেম্বর ২৭ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে শ্রীযুতবাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর স্বীয় নবীন বাটীতে অনেক২ ভাগ্যবান্ সাহেব ও বিবীরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া চতুর্ব্বিধ ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন এবং ভোজনাবসানে ঐ ভবনে উত্তম গানে ও ইংলণ্ডীয় বাদ্য শ্রবণে ও বাদ্য শ্রবণে ও নৃত্য দর্শনে সাহেবগণে অত্যন্ত আমোদ করিয়াছিলেন। পরে তাঁড়েরা নানা২ করিয়াছিল কিন্তু তাহার মধ্যে একজন গো বেশ ধারণপূর্ব্বক ঘাস চর্ব্বণাদি করিল।

• •

[ক্রমশঃ

অবহৃত

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

তোমার সঙ্গে দেখা জীবনের পড়ন্ত বেলায়।
নিশ্চিন্ত তফাতে থাকো, গণ্ডীর বাইরে যা'ব না—
ক্লান্তিভরা এই শেষ দিনের মেলায়
ছুরিবিদ্ধ বেপথু ভাবনা।

স্বর্গ নই, তবু আমি অবক্ষয়ী কক্ষপথে রয়ে যা'ব, আর
ঘোলাটে চিন্তার ঠোঁটে অভিমান খুঁটে নিয়ে এই
যোগাযোগে তৃপ্ত হ'বো না'ক। চোখে নিয়ে করুণা অপার

নিশ্চিন্ত তফাতে থাকো, জীবনের পড়ন্ত বেলায়
উত্তেজনায় তাতে রক্তের অনাথ মড়কে
অবহৃত হয়ে গেছি অসঙ্গত আশার খেলায়।

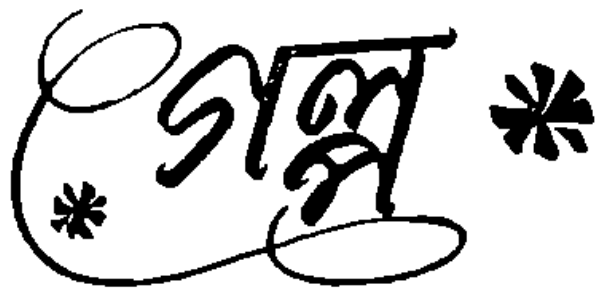

শাল্মলী

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

সবুজের দিনে ছ'টার ছবি দেখে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মিষ্টি পরিবেশকে এড়িয়ে বেরিয়ে আসতে সত্যিই কষ্ট লাগে। মন বলে—আর একটু সময় থাকলে হয় না।

তবুও এক সময়ে চিমনিবাস থেকে নেমে আসতে হয়;—আসতে হয় জনযাত্রার উষ্ণ-সমুদ্রপথে। ভিড়ের ঢেউ এসে ক্রমেই মিশে যাচ্ছে ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি-মোটরের তটে। কতক মেয়ে-পুরুষের ভিড় জমলো কাছের কোনো কোনো রেস্তোরাঁয়, আবার কতক হয়ত ছুই-ছুই করে চলে গেল। দেশী-বিদেশী সব রকমের মেয়ে-পুরুষেরই জোড় লেগেছে। মনটাকে এমনি এক সময়ে ফিরিয়ে এনেও চোখকে ফেরানো গেল না।

অপরিচিতের সমুদ্রে চোখ যেন খুঁজে পেল পরিচিতির এক উজ্জ্বল চিহ্ন। মেঘে ঢাকা দিনের মাঝে এক ঝলক রোদ।

মনে হলো সেই চেনা মুখ, চেনা চোখ, চেনা হাসি আর অল্প কথা। বিদেশী ছবির রুপালী পর্দার পর এলো দেশী এক কাহিনী মনের পর্দায়। ক'বছর আগের পুরোন স্মৃতিগুলো যেন বেশি মাত্রায় ঝলমল করতে লাগলো।

এই তো সেই শ্যামলী যাকে নেহাতই একক মনের খেয়ালে বলেছি শাল্মলী।

স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠতে লাগলো একটি ছোট শহর, নাম যার মিহিজাম। শ্যামলীকে চিনতো না এমন লোক বোধ হয় সে অঞ্চলে খুব কমই ছিল। তার ছিপ-ছিপে চেহারা। মেয়েদের দিকে কটাক্ষ করে অনেকে যেমন বলে 'কুমড়ো'—শ্যামলীর ক্ষেত্রে অবশ্য সে কথাও যেমন বলা যায় না, তেমনি আবার 'ছাংলা' অর্থাৎ রোগা, ঢ্যাঙা—সে কথাও বলতে পারি না। দেহের গড়ন বেশ,—হ্যাঁ, বেশই বলছি; মেয়েদের গড়নটা যতখানি হলে পুরুষরা সুখী হয়। তার সব দিক দিয়েই সুন্দর সামঞ্জস্য আছে। শ্যামলীর বয়স এখন ষোড়শ কি বিংশোত্তর সে কথা চট্ করে বলা যায় না। মেয়েদের বয়স তো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

রঙ্—সুন্দর গায়ের রঙ্ যেন দুধে আলতা গোলা না হলেও আধুনিক প্রসাধনে উজ্জ্বল। যখন সে তার টকটকে লাল রঙের সিল্কের শাড়ি ব্লাউস পরে হেঁটে যেত চট্‌চট্ করে গোলালী রঙের চটি জুতো পায় দিয়ে—মনে হত যেন মা-লক্ষ্মীর বিশে শতাব্দীর নতুন সংস্করণ। ভালো লাগতো—ভারী ভালো লাগত। শ্যামলীরও বোধ হয় এটা খুব পছন্দসই পোশাকের মধ্যে একটা, দেখেছি প্রায়ই ঘুরে ফিরে তাকে এ পোশাকটা পরতে, ভারী মানায় এ সাজে। আরও একটা দেখেছি তার বড় চোখ ধাধানো সাজ। বিকেলে সেই পোষাকে অনেকদিন দেখেছি। বাসন্তী রঙের তার পাঞ্জাবী, গাঢ় সবুজ রঙের সালোয়ার, আর দু' কাঁধের ওপর দিয়ে বুকে ঝুলিয়ে দিতো রুচি কলাপাতা রঙের ওড়নার মত। কোনো দিন বা দিতো ওড়না বিনুনি ঝুলিয়ে, কোনো দিনবা সিংগেল বিনুনি। তাতে আবার রঙ বেরঙের ফিতে থাকতো সুন্দর করে বাঁধা। পায়ে ছিল ছিল উঁচু সবুজ শোয়েডের জুতো।—এ-পোশাকেও মানাতো, বড় সুন্দর মানাতো। দেখেছি তাকে—অনেক, অনেকবার দেখেছি।

দেখেছি তাকে যখন সে হেঁটে যেতো তার নরম বুক দুলিয়ে এই পথ দিয়ে বাড়ির পাশ দিয়ে। লজ্জা,—লজ্জা করেনি সে কোনো দিন। বোধ হয় কখনও 'লজ্জা পাবার পাইনি অবকাশ'। অথবা প্রকৃতিতে তার যেন বাধা দেবার কিছু নেই, সবই তার আত্মগরিমায় পরাস্ত

বিক্ষিপ্ত—পর্যুদস্ত। সে যেন আধুনিক নারীর অত্যাধুনিক সংস্করণ।

বাড়ির পাশ দিয়ে পথ চলে গেছে অনেক দূরে সেই বৃষাই পাহাড়ের দিকে। সাঁওতাল-পাড়া ছাড়িয়ে অনেক অনেক দূরে। কত মাঠ গ্রাম পাশে রেখে চলে গেছে এই পথ। দেখেছি সেখানে হেঁটে যেতে। তাই মনে হয় তার চপলতা চলাফেরার চটকদারীতে, তার যৌবন-জ্যোতি অঙ্গসজ্জার কারিকুরিতে; নতুন দামের বাহারে; প্রসাধন কলার বাহারী রঙিন বিচিত্র প্রলেপে; এরই মধ্যে দেখি যেন সব মিলে মিশে ঘিরে রয়েছে আশ্চর্যভাবে পুরুষের দৃষ্টি সথেই নিওন আলোর রঙের জেল্লা। শাল্মলীকে এড়িয়ে যায় নি কারো চোখ, বৃথা ফিরিয়ে নেয়নি কেউ কোনো দিন তার চোখের মত দুটো ক্যামেরার লেন্সকে। এই সেই শাল্মলী, প্রেমের চাউনিতে চেয়ে, কত—কতবার লজ্জায় আমার দৃষ্টিপথ থেকে দূরে যেতে চেয়েছে;—কেন, কি জানি? কি তার মনে আছে কেবল সেই জানে।

আমি যখন আপন মনে বসে গাছের তলায় ছায়ার চাদরে বসে লিখছি কিছু, কিম্বা কোনো নতুন উপন্যাস পড়ছি, শাল্মলীকে দেখেছি কাপড়ের চোর-কাঁটা ছাড়াবার ছুতোয় বারবার দেরি করেছে পথ চলতে, নয়তো বা কোনো সুদূরে উড়োপাখির মৃদু-মধুর স্বর শুনে থমকে থমকে থেমে তাকিয়েছে এ-গাছ সে-গাছের আবডালে। চোখের চাউনিতে যেন হাস্যমধুর কবি-সুলভ ব্যঞ্জনা। বোধ হয় রসিক মনে এ তার রসের আবেদন।

পশ্চিমের ধান খেতের ওপাশে সাঁওতাল গ্রামের থেকে কত সাঁওতালী ছেলে আসে এটা সেটা নিয়ে, আমাদের যদি পছন্দ হয় তাই। সেদিন একটা সাঁওতাল ছেলে একজোড়া ছোট সাদা কুকুরের বাচ্চা নিয়ে আমার কাছে এলো যদি কিনি। আমি বললুম, 'না, চাই না'। সে চলে গেল। শাল্মলী সেটা লক্ষ্য করেছিল পথে যেতে যেতে, ছেলেটাকে কুকুরের বাচ্চা দুটো কিনবে বলে ডেকে নিয়ে গেল বাড়ি। কিছুক্ষণ পরে দেখি সাঁওতাল ছেলেটা একা একা চলে যাচ্ছে, কুকুর বাচ্চা দুটো আর নেই।

আর একদিন মুরগী নিয়ে এলো ছেলেটা। আমি বললুম 'হুঁ' আমার মিথি একটা?

বড় সরল, তাই বলে ফেললো, 'না বাবু অত কম দামে হৈবেক না। ও বাড়ির দিদিমণি বলেছে আপনার চেয়ে বেশি দামে সব কিনবেক।'

আমি বললুম, 'তবে তাই যাও।' মনে হলো একবার মেয়েটা বুঝি বড় অহঙ্কারী।

মিহিজাম থেকে বৈদ্যনাথধাম কতটুকুই বা পথ। রোজই তো ঐদিকে দেখি কত ট্রেণ যায়। তাই একদিন চেপে বসলুম ট্রেণে। বৈদ্যনাথ এসে স্টেশন থেকে বেরিয়েছি। পেছন থেকে যেন আমাকে লক্ষ্য করেই কে ডাকছে বলে মনে হচ্ছিল। ফিরে দেখি—শাল্মলী আসছে আমারই দিকে।

কাছে এসেই বললে, 'বাঃ ষ্টেশন থেকে নেবেই ছুট দিয়েছেন, খুব লোক যা হোক। আমি কোথায় যাবে আপনার সঙ্গে যাচ্ছি বলে বাড়ি থেকে এলুম, আর আপনি একা ফেলেই…'

আমি বড় অপ্রস্তুত বোধ করেও বললুম, 'না, না, এই চলুন যাওয়া যাক্ এগিয়ে মন্দিরের দিকে।'

সারাদিন ঘোরাঘুরি আর অল্প সল্প কত মান-অভিমান; একদিনেই মনে হল কত দিনের কত কিছুর সব সুখ বুঝি এসে গেছে ভিড় করে। ভীরু মন, তাই ভেবেছি কখন কি হয়।

বালানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে পুকুরের ধারে আমি বলতে যাচ্ছিলুম তার থেকে একটু তফাতে। সে হঠাৎ হাত ধরে টেনে বসাল তার পাশে;—তার স্পর্শের অনুভূতি বেশ একটা দোলা দিয়ে গেল মনে মনে। মনে হল এইতো বেশ।

আমি ডাকলুম 'শাল্মলী' বলে। সে চমকে উঠলো, বললে, 'নামতো শ্যামলী, বেশ তাই শাল্মলীই। আপনার কাছে ঐ নামই থাক আমার!'

কি জানি কি মনে হল সেদিন,—মিষ্টি আমেজে মনটা ভরে ছিল; তবু সন্ধ্যার সময়েই মিহিজামে ফিরে এলুম। পাশে পাশে টেনে বসে কত কথায় মন ভরে রইল মধুর নাম্নিধ্যে। বুঝলুম এটাই তার হবে বোধ হয় খাঁটি মনের পরিচয়।

রোদের দিকে অরুণ প্রান্তের তরুণ আলোয় বেরোবার বাড়িক হয়েছিল কিছু দিন। যদিও সে বাড়িক আমার মজ্জায় মজ্জায় মিশে যাতে পরিণত হয়নি। হেতুম, প্রায়ই হেতুম আল পথ দিয়ে; কখনো চড়াই, কখনো উৎরাই পথ বেয়ে বেয়ে। যেতে যেতে এক সময় মাথার ঘিলুটা চড় চড় করে উঠতো রোদের তেজে। তখন খেয়াল হত ফিরতি পথের পথিক হতে। শাল্মলী বোধ হয় দেখেছে কোনো কোনো দিন এপথে আমায় একা একা হেঁটে যেতে। মনে নিশ্চয় সন্দেহ তার হয়েছিল—যৌবনের লাবিণ্য নিয়ে কোন হাটে তবে বোধ হয় বিকোতে চলেছি। এ তার কাছে অসহ্য—সহ্য সে আর করবে না।

অন্যদিনের মত একই গানের কলি ফিরে ফিরে গুণ-গুণিয়ে গুণ-গুণিয়ে গেয়ে চলছি,—শিশির ভেজা ঘাসে ঢাকা সবুজ আলের পথে। মনে মনে ভেসে ওঠে শাল্মলীর আরক্ত মুখ। হেমন্তের শিশিরে ছায়ল হয়েছে ভিজে দুর্বাদল। পায়ে পায়ে মনে হলো পাচ্ছি একটুখানি মিষ্টি স্পর্শ। খানিকটা এগিয়ে এসে পেলুম যেন কার পায়ের শব্দ—তারপর ধপাস করে গড়িয়ে পড়ায়। ব্যস এইটুকু। তবু কানকে আমার বিশ্বাস না করেও একবার পেছনে ফিরে তাকালুম। তবে কি চোখও আমার অবিশ্বাসী! এগিয়ে গেলুম—পেছন পথে। আমায় দেখে শাল্মলীর সে কি লজ্জা—বোধ হয়, লজ্জা পাওয়ার যে কি সুখ—আজ যেন সে মেয়ে জন্মে এই প্রথম তা বুঝলে।

ধড়ফড়িয়ে উঠতে গেল আমায় দেখে, নীচের মাটি ছিল আল্‌গা আবার তার পা গেল পিছলে। বেশ কিছু ধুলো কাদা মেখে উঠতে চেষ্টা করলে লজ্জানত চোখে। চাইলো হাত বাড়িয়ে সে আমার হাত দুটো। নির্জন নীল দিগন্ত-ছোয়া মাঠের মাঝে ঠাণ্ডা হাত ধরে উঠে আমার বুকে লুটিয়ে দিলে রাঙা লজ্জায় আঁচল-ঢাকা তার নরম মুখ। নীল আকাশের নীচে আর সবুজ মাঠের বুকে আমাদের জীবনের এমন রমণীয় মুহূর্তের আর কোনো সাক্ষী রইল না। অসীম আকাশের নীলের মতই মন হলো প্রীতিতে প্রগাঢ়।

তারপর সে বললে, খুব ফুর্তলয়ে, 'নমস্কার আপনাকে, আচ্ছা পথই বেছে নিয়েছেন যা হোক, একটু অন্য মনস্কতার ফল—পদচ্যুতি। আজ ফিরি, যাবেন একদিন বাড়ি।

'বেশ তো যাবো'—ছোট একটু উত্তর দিলুম বিস্ময়-বিমুগ্ধভাবে তার মিষ্টি কথার তৃপ্তিতে।

ফিরে গেলো বাড়ির দিকে ধমকে ধমকে চকল পায়ে। লজ্জা যত তার হুড়মুড়িয়ে ঘাড়ে চেপে বসেছে—সে যেন লজ্জাবতী লাবণ্যলতা। আমিও পেছু পেছু ফিরে এলুম বাড়িতে। সেদিনের মত শেষ করলুম ভোরের ঘোরাঘুরি—আর ওপথে কোনোদিন যাইনি।

ক'দিন কেটে গেছে। একদিন শাল্মলীর বাড়ির সামনে দিয়ে হাঁটছি, মনে হলো যাই তবে শাল্মলীদের বাড়ি। ইটের পাঁচিল ঘেরা ছোট বাগান বাড়ি। সামনে আছে দেখলুম লোহার বড় ফটক। কাছে যেতে চোখে পড়লো তালায় চাবি বন্ধ গেট। শাল্মলী যে এখানে আর নেই সে কথা বুঝতে দেরি হলো না। আরো কাঁক কাঁক কথা মনে হলো,···কিন্তু বুঝলুম না তবে কেন, কি জন্যেই বা যেতে বলেছিল যদি চলেই যাবে।

অত্যাধুনিকা শাল্মলী আমায় দেখেই শুধু লজ্জা পেত কেন? সে অত প্রগতিবাদী হয়ে আজ গতি হারালো কেন? তবে বোধ হয় তার উগ্র নারীত্ব পরাজিত হয়েছে লজ্জানত নারীত্বের কাছে। এ কথা সে-কথায় রোমন্থনে মন ভরে রইল ঔদাসীন্যে। আমি তাদের বাগানের শুধু শিমুলের বড় গাছটা—আগে যেমন ছিল আজও তেমনি দাঁড়িয়ে আছে—দেখে ফিরে এলুম।

ভ্রমরের পাখায় ভর-করা মনের ভ্রমর-আকাঙ্ক্ষায় আবার পরের বছরেই এসেছি এই বিদেশ বিভূঁইয়ে। সাঁওতাল পরগণার ছোট শহর। গুটিকতক শৌখিন বাঙালী বাবুদের একতলা পাকা বাড়ি বেশ কিছু তফাতে তফাতে। আনন্দ মাতাল হয়ে ঘুরেছি সকালে তেজি রোদের তাপে মাথা পুড়িয়ে, বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে ফিরেছি সন্ধ্যের অন্ধকারে। পরদিন ভোরের ঝিলমিলে আলোয় যেন দাঁড়িয়ে গেলুম থমকে, শিমুলের গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দেখি সেই এক বছর আগের শাল্মলী—তবু যেন নতুন লাগলো। চলে যেতে দেখলুম তাদের বাড়ির দিকে, কিন্তু আমার চোখকে অবিশ্বাস করতে পারি না। স্পষ্ট দেখেছি তার সিঁথির সিঁদুর।

পলাশ ফুলের লালে তার মনের লালিমা। সেদিনই সন্ধ্যের ট্রেণে ফিরলুম কলকাতায়।

সে-সব দিনের বিস্ময় ও বিরহের স্মৃতিটুকু ক'বছর পরে আজ চৌরঙ্গীর পথে পথে একটি শুধু হাল্কা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। সিনেমা-ভাঙা ভিড়ের মধ্যে এমন সময় কোন ফাঁকে চোখে চোখে চাওয়া-চাওয়ি হয়ে গেছে, বোধহয় সেই রঙিন শাড়ির টানেই আমরা অজান্তেই বড় কাছাকাছি এসে পড়লুম। একটু না হেসে আর পারা গেল না। তখনি শাশ্বতী—খুড়ি এখন-কার শ্রীমতী শ্রাবণী দেবী নমস্কার করে আমার লেখার বাতিক আছে আর মিহিজামের পরিচয়টুকু এক নিশ্বাসে দিয়ে আলাপ করিয়ে দিলেন সঙ্গী ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু লজ্জায় লজ্জায়—'ইনি আমার।'

আমি হাতজোড় করেই বললুম, 'বুঝেছি আর বলতে হবে না'—অত ভিড়ে বেশি কথা হল না, তবু মুখ থেকে বেরিয়ে গেল 'কত বছর যেন পরে আপনি তবু যে চিনতে পেরেছেন, বড় আশ্চর্য!'

তখনই হঠাৎ প্রশ্ন—'একি একা একা সিনেমা এসেছেন। মিসেস্ কই…'

উত্তর দেবো না দেবো না করেও দেওয়া হয়ে গেল—'এখনও 'আমি'-ই আছি 'শেষ' বুঝি হইনি।'

সেই আগের আবার একটুখানির দুষ্টু মিষ্টি হাসির রেখা পেলব লিপ্‌স্টিক-মাখা ঠোঁটের ফাঁকে—আর নিটোল শরীর চোখে পড়লো লাল সিল্কের শাড়ি ব্লাউজের ভাঁজে ভাঁজে।

ভদ্রলোক নাম-ঠিকানার কার্ড দিয়ে বললেন, 'বাড়িতে আসবেন কিন্তু—'

আমি তার বদলে শুধু ঘাড় নেড়ে প্রতি নমস্কার জানালুম।

হাল ফ্যাশনের গাড়িতে বসে চলে গেলেন দু'জনে—একটুখানি ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে মিষ্টি চোখে চেয়ে চেয়ে।

আমার বুকের মধ্যেটা কেবলই যেন খর খর করতে লাগলো। সেই কথাটি বারবার মনে মনে ফিরতে লাগলো, 'একি একা একা সিনেমায় এসেছেন…মিসেস্ কই?'

আশ্চর্য আজ আর কোনো কিছুই যেন ভালো লাগলো না। সিনেমা হলের বাইরে এসেই ভাবছিলুম একটা সিগারেট জ্বালাব তাও আর ভালো লাগলো না এখন। মনে হলো বুকের মধ্যে, মনের মধ্যে একি জ্বালা ধরিয়ে দিলে…আশ্চর্য, আশ্চর্য লাগছে ভাবতে; শুধু এ এ মায়ায় বুঝি বা নেশা ধরিয়ে দেয়, বাস এ ছলনা ছাড়া আর কিছুই তো নয়! মনে হচ্ছে তার কথায় কোনো গন্ধ নেই তবু রঙ আছে,…আবার শুধু রঙই বা কেন, বোধ হয় রস আছে।

মনের আকাশে মুহূর্তের বিদ্যুৎ ঝলকের পরেই মনে হলো—যা গেছে, তা যাক। নিওন লাইটে মনে হলো কার্জন পার্কের ধারেই বুঝি এবার শিমুলের লাল ফুল ধরেছে,…কিন্তু যা দেখছি তাতো দূরের কৃষ্ণচূড়া।

কৃষ্ণাঙ্গনা

দুর্গাদাস সরকার

কালো রঙের ছন্দে গড়া কল্পনারই মৌতাতে
লম্বা চুলের গন্ধে পাগল আনন্দে এই মন মাতে।
মুখের হাসি, চোখের ভাষায়
অঙ্গনা কোন্ রঙ্গে হাসায়,
অন্ধ আশায় সঙ্গ খোঁজে, কে বোঝে
কোন্ সংগোতে!

অনেক ফেলে আমি যে সেই কালো আলোর সন্ধানী;
আমি কী চাই সে জানে না,
আমিও কি তার মন জানি?
নীল আকাশের অন্ধকারে
ছুটি তারার অভিসারে
তোমার আমার মিলন হবে নীল চোখে নীল সন্ধ্যাতে।

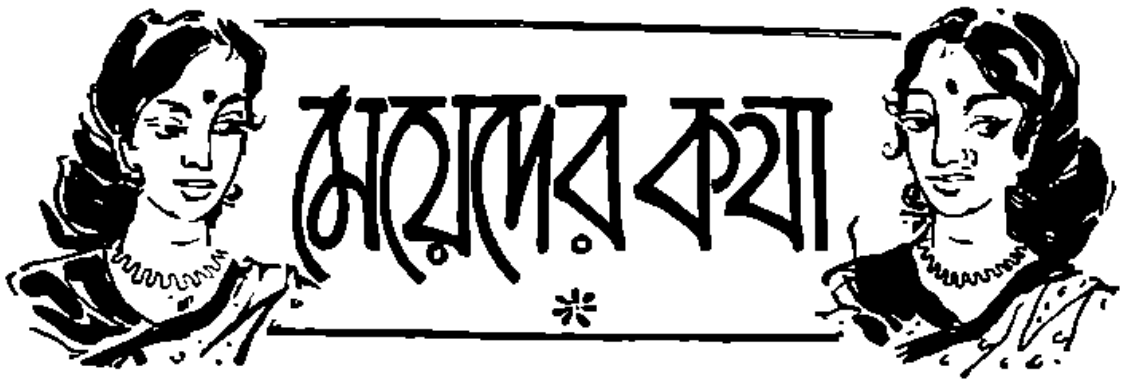

যত সাধ ছিল

কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়

তুমি পাখার নীচে খাটের উপর শুয়ে আছ, কাবেরী। তুমি এ বিছানায় কত কাল শুয়ে কাটিয়েছ, এ তোমার বাপের বিছানা, এত বড় হয়েছ তুমি তবু তোমার মার পাশে শোও। তোমার মার কাছ থেকে দূরে যেতে ভয় পাও। মা কাছে না থাকলে তোমার ভয় আসে—তুমি দুঃস্বপ্ন দেখ—স্বপ্নের ঘোরে চীৎকার করে ওঠ, তোমার বুক ধড়ফড় করে।

তোমার বড়দির মেয়ে নর্মদার সঙ্গে একবার তুমি শ্যামবাজারে গিয়েছিল। গড়িয়াহাট থেকে শ্যামবাজার। বেশীদূর নয়। তবু সারাদিন খেলাধূলা—খাওয়া-দাওয়া নাচ-গানের শেষে যখন রাত্রে তুমি শুতে গেলে একা একটা খাটে তোমার খুব খারাপ লাগল, কিন্তু লাজে তা প্রকাশ করলে না। নর্মদা কি ভাববে? সেও তোমার সমবয়সী। কিন্তু পাঁচ বছর বয়স থেকে সে একা একটা খাটে শোয়—তার মা-বাপের কাছ থেকে দূরে। তুমি লজ্জায় কিছু বলো নি। একা খাটে শুয়ে শুয়ে সারারাত তোমার ঘুম হয়নি। পরের দিন তুমি গড়িয়াহাটের বাড়ীতে জোর করে চলে এসেছিলে। শ্যামবাজারের দিদি আর জামাই-বাবুর আদর তোমায় ভুলিয়ে রাখতে পারে নি।

তোমাদের বাড়ীতে ঘরের অভাব নেই। বিছানারও অভাব নেই। তবু তুমি মার সাথে ঘুমাও কেন? এ তোমার অভ্যাস। তোমার অল্প বয়সে বাবা মারা যান। তুমি বাড়ীর সকলের ছোট মেয়ে। তোমাকে বুকে করে তোমার মা, তাঁর স্বামী বিয়োগের দুঃখ সহ্য করেছিলেন। সেই থেকে তুমি তাঁর নিত্য সাথী। তুমি তাঁর আঁচলের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে বেড়ে উঠেছ। বড় ভাইবোনদের স্নেহের পাত্রী হয়ে বেড়ে উঠেছ। বস্তুতঃ তোমার মার স্নেহ তোমার মত কেউ ভোগ করতে পায় নি। তুমি তোমার মায়ের কোলের চিরকালের শিশু।

সেদিন তুমি বি-এ পাশ করলে। কিন্তু তবু তুমি এখনও মায়ের কোলে উঠে বস। তোমার মা তোমাকে কোলে বসিয়ে মুখ পানে নিশ্চিত। তোমাকে পাশে নিয়ে শুয়ে তোমার মারও যে কত সুখ। কিন্তু তোমার কথা ভেবে ভেবে যে তিনি উদ্বিগ্ন হচ্ছেন দিন দিন।

আজ তুমি একা শুয়ে আছ তোমার বিছানায়—অর্থাৎ তোমার মায়ের বিছানায়। তোমার মা গিয়েছেন তোমার ছোটদির বাড়ীতে—তোমার ছোট জামাইবাবুর অসুখ শুনে ব্যস্ত হয়ে তিনি গেছেন। রাত্রে বাড়ী ফেরেননি। রাত দশটায় টেলিফোন করে জানিয়েছেন—তিনি রাত্রে আর আসবেন না। মা পাশে নেই। তাই তুমি আলো নিবাওনি। ঘুম নেই বলে তুমি ঘূর্ণায়মান পাখার দিকে তাকিয়ে আছ। ভাবছ। ভাবতে ভাবতে তোমার নিদ্রা এল—নিদ্রা নয়—স্বপ্ন। স্বপ্ন নয় দুঃস্বপ্ন। তুমি দেখলে একটা কালো বিড়াল এলো। হলো বিড়াল। এসে সে

তোমার পাশে ঘুমল। তোমায় সে নিয়ে যেতে চাইলো। তুমি যাবে না। সেও তোমায় ছাড়বে না। তোমায় নিয়ে সে যাবেই। তোমার ভয় জাগল, সে যখন তোমার ঘাড় কামড়ে নিয়ে চলল তুমি তখন একটা ধবধবে সাদা বিড়াল। তোমার ঘুম ভেঙে গেল। আর জানলার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলে। পাখার শব্দ যেন ক্রমে রাত্রির স্তব্ধতায় বেড়ে উঠল। তুমি পাখার শব্দে আঁৎকে উঠছ। বিছানা ছেড়ে পাখা বন্ধ করতে যাবে, দেওয়ালে নিজের ছায়া দেখে শিহরিত হচ্ছ। তুমি কি রোগা? কি জোয়ান সেই কালো ছেলেটি—সেদিন যে তোমায় দেখতে এসেছিল। তোমার ভয় হয়েছিল—এমন জোয়ান ছেলের পাশে কি এত শীর্ণ এত রোগা কাবেরীকে মানাবে? বস্তুতঃ তোমার ভয় হয়েছিল। মায়ের পাশে ছেড়ে ঐ কালো জোয়ানটার পাশে শুতে হবে বলে ভয় হয়েছিল। তোমার কম স্বাস্থ্য যদি তার পছন্দ না হয়?

কিন্তু জান কাবেরী তোমাকে ছেলেটির ভালো লেগেছে। তোমার মত চমৎকার রঙ, সুন্দর নাক, চোখ, জোড়া ধনুকের মত ভ্রু কয়টা মেয়ের আছে? তুমি রোগা? কিন্তু মোটা হতে কদিন লাগে? ভিটামিনের দল রয়েছে কি করতে, দুধ, ঘি, মাখন, মাংস, মাছ ডিম, কি করতে রয়েছে? তোমার খেতে ভয় হয়। অসুখ করবে। চলতে ভয় হয় লোকে কি বলবে। তুমি একা থাকতে চাও মায়ের কোলটি আশ্রয় করে। তুমি হাসতে সাহস পাও না? কেন? সেদিনি তোমার মেজদির বড় মেয়ে মেঘনা কেমন কেঁদেছিল প্রসব বেদনায়, কিন্তু লালটুকটুকে ছেলের মুখ যখন সে দেখল—তার আনন্দের অবধি রইল না। তুমি সব দেখেছ। তুমি শুধু ভেবেছ, আমি কি পারব দাম্পত্য জীবনের ভার বইতে? তাই তোমার বিয়ের আলাপ যখন করেন দাদা, কিংবা দিদি অথবা আর কেউ তুমি ভয় পাও, তোমার শরীর খারাপ হয়, তোমার জ্বিদে চলে যায়,—তোমার ঘুম দূর হয়। মা মাথায় হাত না বুলিয়ে দিলে তোমার চোখে ঘুম আসে না। এলেও তুমি দুঃস্বপ্ন দেখ। ঐ যে উত্তরপাড়ার মুখুজ্যেদের ছয় ফুট লম্বা আড়াই মণ ওজনের একমাত্র ছেলে লঘোদর তোমায় দেখে গেল, সেদিনই তো স্বপ্ন দেখলে একটা মস্ত সাদা হাতী তোমায় শুড় দিয়ে জড়িয়ে তোমার মার পাশ থেকে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। তুমি চীৎকার করলে, তোমার মা তোমায় জড়িয়ে ধরলেন, বললেন, 'কী রে কাবেরী, কী হয়েছে? এই যে আমি রয়েছি পাশে।"

কিন্তু তুমি বড় হয়েছ। তোমার মায়ের কর্তব্য তোমার দায়িত্ব একজন ভাল ছেলের হাতে তুলে দেওয়া। যাতে তোমরা দুজনে একটা পরিবার গড়তে পারো, তোমার মায়ের মত তুমিও তোমার ছেলেমেয়ের যত্ন করতে পারো। মায়ের ঋণ যে তোমায় শোধ করতে হবে ঐভাবে। তুমি বলবে তোমার সাধ আছে কিন্তু সাধ্য নেই। কিন্তু এ ধারণা তোমার ভুল। তুমি সুন্দরী, স্বাস্থ্য খারাপ বলতে পারো না—যদিও তুমি ভেবে ভেবে তাকে খারাপ করছ। যত্ন করলে তুমি মোটাও হতে পার। আর নাইবা হ'লে? তোমার এ তন্বী দেহের কি যে শক্তি তা তুমি জান?

জীবনকে তুমি ভয় পাও, দুর্বহ মনে করো। কিন্তু সে কত বড় ভুল। জানো, জানো তুমি দুর্গম পথে অভিযাত্রীর মন নিয়ে চলতে পারো আনন্দে—নূতন কিছু দেখবার, বোঝবার অদীম আগ্রহে। আবার ভারবাহী গাধার মন নিয়েও চলতে পারো—জীবনের ভার বইতে হবে তাই বইছ—দুঃখ ছাড়া গতি নেই তাই সইছ। তাই দৃষ্টিভঙ্গী বদলাও দেখবে জীবন দুঃখের নয়, জীবনে আনন্দ আছে স্বাস্থ্য আছে, রোগ শোক দুঃখও যে নেই তা নয়, তারা স্বাস্থ্য, সম্পদ আনন্দকে আরও স্পষ্ট করে দেয়। তুমি ভাবছ সাধ তো ছিল। আমি বলছি সাধ্যও আছে। বিশ্বাস কর, তুমি সব পারবে। তোমার মায়ের কোল থেকে দূরে দাঁড়িয়ে তোমার মায়ের মত বড় হয়ে মা হয়ে উঠতে তুমি পারবে। এখন শুধু চাই তোমার ভয়হীন ভাবনাহীন জীবনের দায়িত্ব সম্বন্ধে মাথায় তুলে নেওয়ার দৃঢ় সংকল্প, বিশ্বপ্রকৃতির ক্রোড়ে তোমার নারীত্বকে সার্থক করে তোলার সাহসিক মনোবল। আমি জানি কাবেরী, সেই মনোবলও তোমার আসবে।

প্রসূতি-পরিচর্য্যা ও শিশুমঙ্গল

ডাঃ কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম,বি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রসবের সময় প্রসূতি ও নবজাত সন্তানের উপর দিয়ে জীবন-মরণ সংগ্রাম চলে···তাই প্রসবান্তে উভয়েরই পর্য্যাপ্ত বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন। নবজাত শিশুকে শোয়ানোর জন্য ধাত্রী চিকিৎসক বা বাড়ীর অভিজ্ঞা মহিলাদের পরামর্শানুসারে যথোপযুক্ত শয্যার ব্যবস্থা আগেই ঠিক করে রাখা দরকার। তাছাড়া নিয়মানুযায়ীভাবে প্রসূতি ও নবজাত শিশুর নাড়ী বাঁধা ও কাটা হলে, ধাত্রী বা চিকিৎসক নবজাতকের চক্ষু পরীক্ষার পর, তার সারা দেহে বিশুদ্ধ 'অলিভ-অয়েল' (Olive oil) বা জলপাইয়ের তেল কিম্বা পরিশোধিত নারিকেল তেল মাখিয়ে, শিশুকে সযত্নে সাবধানে বেশ ভালোভাবে কোমল কাপড়ে ঢাকা দিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেবেন। শীতের সময় বা ঝড়-বাদলের দিনে, অসাবধানতার ফলে, শিশুর গায়ে যেন ঠাণ্ডা না লাগে, সেদিকেও বিশেষ নজর রাখা দরকার। প্রসূতি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ বোধ করলে, ধাত্রী অথবা চিকিৎসক—যিনিই প্রসব ব্যবস্থাকার্য্যের সময় উপস্থিত থাকবেন, তাঁর অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য হলো—পুনরায় নবজাত-শিশুকে এবং প্রসূতিকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখা।

প্রথমেই নব-জাতকের চক্ষু পরীক্ষা করে 'প্রোটারগ্যাল্' (Protargol Lotion 1%) অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ-মতো ঐ জাতীয় অন্য কোনো চোখে ব্যবহারের উপযোগী বিশেষ ধরণের ওষুধ দিয়ে শিশুর দুই চোখ বেশ সযত্নে ও সাবধানে পরিপাটিভাবে সাফ্ করে নিতে হবে। তাছাড়া শিশুর জন্মগ্রহণের পর, প্রথম সাতদিন প্রত্যহ নিয়মিত-ভাবে তার চক্ষু পরীক্ষা করে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। এদিকে সবিশেষ নজর দেওয়া হয় না বলে, আমাদের দেশে অনেকেই পরে দৃষ্টিহীনতায় কষ্ট পান। সুতরাং নবজাতকের মাতা-পিতা ও ধাত্রীর অন্য সকলেরই কর্ত্তব্য হলো—শিশুর চোখ লাল হয়ে ওঠা বা পিচুটিতে ভরে যাওয়া অথবা জুড়ে বন্ধ হওয়া কিম্বা চোখ থেকে কোনো রকম ক্লেদ-নির্গমন হতে দেখলেই, অবিলম্বে অভিজ্ঞ ধাত্রী ও চিকিৎসকের পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করা। নবজাত শিশুর চক্ষু পরীক্ষার সময়, তার চোখে যাতে খুব বেশীক্ষণ কড়া আলোক রশ্মির ঝলক না লাগে—সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। কারণ, নবজাত শিশু সাধারণতঃ ছায়া-শীতল স্বল্পালোকিত কক্ষেই সর্ব্বপ্রথম চোখ মেলে দেখে এবং ক্রমশঃ অল্প বা নরম আলো সহ্য করতে শিখে ধীরে ধীরে প্রখর আলোয় দেখতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এমন কি, নবজাত শিশুকে তেল মাখিয়ে মৃদু রোদে শুইয়ে রাখার সময়েও, তার নব প্রস্ফুটিত নয়নে যেন সূর্য্যের প্রখর আলো না লাগে, সেদিকেও সবিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। তাই নবজাত শিশুকে রোদে রাখার সময়, রঙীন কাপড়ের ঢাকনী অথবা পর্দার আড়ালে তার মুখমণ্ডল ঢাকা দিয়ে প্রখর আলো নিরোধক ছায়া রচনা করে শুইয়ে দেওয়াই হলো সচরাচর-অনুসৃত রীতি।

চক্ষু-পরীক্ষা ছাড়াও, প্রত্যহ নিয়মিতভাবে নবজাত শিশুর মলদ্বার ও মূত্রনালী পরীক্ষা করে দেখা এবং সযত্নে সাবধানে পরিপাটিভাবে পরিষ্কার রাখা একান্ত আবশ্যক। এ বিষয়ে যথোচিত দৃষ্টিদান না করলে, পরে নানা রকমের অসুবিধা, এমন কি, শিশুর স্বাস্থ্যেরও সবিশেষ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সুতরাং নবজাত শিশুকে যাঁরা লালন-পালন করবেন, তাঁদের প্রত্যেকের উচিত—এ কাজের দায়িত্বভার গ্রহণের আগেই অভিজ্ঞ ধাত্রী ও চিকিৎসকের কাছে যথোচিত পরামর্শ উপদেশ নিয়ে রাখা।

অনেক সময় কোনো কোনো নবজাত শিশুর স্তন জন্ম-গ্রহণের কয়েকদিনের মধ্যেই ফুলে-স্ফীত হয়ে ওঠে এবং সেটি থেকে তরল রস বা লালা বেরুতে দেখা যায়। এই ধরণের লক্ষণ দেখা দিলে শিশুর স্তন অথবা টেপাটেপি না করে, বরং 'অলিভ-অয়েল' (Olive oil) বা জল-পাইয়ের তেল গরম করে, সেই ঈষৎ-উষ্ণ তেল তুলায় ভিজিয়ে নবজাতকের স্ফীত-স্তনের উপরে এক টুকরো কাপড়ের পটি দিয়ে সযত্নে বেঁধে রাখলে, আশু উপকার পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া এমন অবস্থায় শিশুর মঙ্গলার্থে অবিলম্বেই সুবিজ্ঞ চিকিৎসক ও ধাত্রীর পরামর্শ

এবং সহায়তা গ্রহণ করা যে একান্ত আবশ্যক—সে কথা বলাই বাহুল্য।

অভিজ্ঞ ধাত্রী ও চিকিৎসকের পরামর্শমতো নবজাত শিশুকে নিয়মিতভাবে স্নান করানোর দিকেও সবিশেষ নজর দেওয়া দরকার। তাঁরা যেমন নির্দেশ দেবেন, সেইমতো শিশুকে স্নান করানোর ব্যবস্থা রাখা উচিত। নবজাত শিশুকে স্নান করানোর সময়, স্নানের আবশ্যকীয় যাবতীয় সাজসরঞ্জাম···অর্থাৎ, প্রয়োজনানুযায়ী গরম ও ঠাণ্ডা জল, জলের গামলা, সাবান, দুটি তোয়ালে, নাড়ীতে দেবার জন্য বিশুদ্ধ পাউডার, 'ড্রেসিং'-করবার 'ব্যাণ্ডেজ' (Dressing Bandages) বা 'বন্ধনী', চোখ ধোয়ানোর জন্য পরিস্রুত 'বোরিক লোশান' (Boric Lotion) ও 'প্রোটারগাল্ লোশান' (Protergol lotion), পরিষ্কার তুলোর বাণ্ডিল, 'অলিভ-অয়েল' (Olive Oil), শিশুর পরিধানোপযোগী পোষাক পরিচ্ছদ, কাঁচি, ছুঁচ, সুতোর বাণ্ডিল, ছোট-বড় সেফ্‌টিপিন প্রভৃতি সব কিছুই হাতের কাছে যথারীতি মজুত রাখতে হবে।

ভূমিষ্ঠ হবার ঘণ্টাখানেক পরেই নবজাত-শিশুকে স্নান করানোই হলো—সচরাচর অনুসৃত রীতি। শিশুকে স্নান করানোর সময়—বিশেষভাবে শীতকালে ও ঝড়-বাদলের দিনে, ঘর বেশ গরম—অর্থাৎ, ভিতরের তাপমাত্রা যথোচিত রয়েছে কিনা পূর্ব্বাহ্নেই ভালোভাবে দেখে নেওয়া দরকার। অসাবধানতার ফলে, স্নানের সময় বাইরের এলোমেলো ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করে আচমকা নবজাত শিশুর সর্দ্দি-কাশি বা অসুস্থতা বাধিয়ে তোলে, সেজন্য শীতকালে এবং ঝড়-বাদলের দিনে সর্ব্বদাই ঘরের দরজা-জানলাগুলি যথাযথভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে কিনা, তার সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। তবে আমাদের দেশে অনেকের আবার শিশুর গায়ে ঠাণ্ডা লাগার অদ্ভুত ধরণের যে অহেতুক আশঙ্কার বাতিক আছে, সেটির প্রশ্রয় দেওয়াও যুক্তিসঙ্গত নয়। আবহাওয়ার অবস্থা বিবেচনা করে, নবজাত-শিশুর ঘরের দরজা জানলা খোলা বা বন্ধ রাখার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করাই হলো সমীচীন কাজ।

নবজাত শিশুকে স্নান করিয়ে দেবার সময়, ধাত্রী বা পালিকা ঈষৎ উঁচু একটি টুল বা জলচৌকির উপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে নিজের হাঁটুর বা কোলের উপর পরিচ্ছন্ন একখানি নরম তোয়ালে বিছিয়ে নিয়ে শিশুকে সযত্নে সাবধানে সেখানে শুইয়ে রাখবেন। শিশুকে এমনি ভাবে কোলে শুইয়ে রেখে, ধাত্রী বা পালিকা প্রথমেই নিজের হাত পরিপাটিভাবে ধুয়ে সাফ্ করে নেবার পর অল্প একটু 'বোরিক-লোশনে' তুলো ভিজিয়ে নবজাতকের চোখ দুটি পরিষ্কার করে নেবেন। অতঃপর উপরোক্ত পদ্ধতিতে জীবাণু-নাশক 'প্রোটারগাল্ লোশানের'সাহায্যে পুনরায় নবজাতকের চোখ দুটিকে সাফ করে দিতে হবে। এ কাজ সারা হলে, পাশ্চাত্য-সমাজের রীতি-অনুসারে সামান্য একটু তপ্ত 'ভ্যাসেলিন' মলম (Worm vaseline ointment) অথবা 'অলিভ-অয়েল' বা জলপাইয়ের তেলে তুলো ভিজিয়ে সযত্নে-সাবধানে নবজাত-শিশুর নাক প্রভৃতি পরিষ্কার করে দেবেন; তার পর ক্রমশঃ শিশুর মাথার কেশ, মুখমণ্ডল, হাত পা প্রভৃতিও সোড়াতে তেল ও পরে সাবান আর জলের সাহায্যে সযত্নে পরিষ্কার করে দিতে হবে। নবজাত শিশুর মুখমণ্ডল পরিষ্কার করার সময় কিন্তু সাবান বা সাবান-জল আদৌ ব্যবহার করা বিধেয় নয়···কারণ, তার ফলে, সুবিধার চেয়ে শিশুর পক্ষে অসুবিধাই সৃষ্টি করে তোলা হবে অনর্থক। এভাবে তেল বা 'ভ্যাসেলিন' ব্যবহারের ফলে জন্মকালে নবজাত-শিশুর দেহে 'ভারনিক্স কেসিয়োসা' (Vernix Caseosa) নামে আঠালো-চর্ব্বির মতো যে চটচটে-পদার্থ লেগে থাকে, সে সব বেশ সহজেই মুছে সাফ করা সম্ভব হয়। নবজাত-শিশুর দেহ সাবান দিয়ে সাফ করার মোটামুটি নীতি হলো—ধাত্রী বা পালিকা প্রথমেই নিজের হাতের তালুতে সাবান-জলের সফেন-তরল মিশ্রণ বানিয়ে নিয়ে, তারই সাহায্যে ক্রমে শিশুর হাত-পা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে একে একে খুব সাবধানে—সযত্নে পরিপাটিরূপে পরিষ্কার করে দেবেন এবং সামান্য অসাবধানতার ফলে, নবজাতকের শরীরে যেন কোনো কারণে ঠাণ্ডা না লাগে, সেদিকেও সবিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। শীতকালে বা বৃষ্টি-বাদলার দিনে নবজাত শিশুকে স্নান করানোর সময়, শিশুর শরীরের আবরণী ঠিক রেখে, প্রতি অঙ্গ পরিপাটিভাবে ধোয়ার পর, কোমল-শুকনো একখানি তোয়ালের সাহায্যে মুছিয়ে সযত্নে

আচ্ছাদিত করে দিতে হবে। শিশুকে যদি গরম জলে স্নান করানো হয়, তাহলে সে জলের উষ্ণতামাত্রা ৩৭°-৩৮° সেন্টিগ্রেড অথবা ৯৮°-১০০° ফারেনহিট···অর্থাৎ, মোটামুটিভাবে 'কুসুম-কুসুম গরম' বা মানুষের সাধারণ দৈহিক-উত্তাপের চেয়ে ঈষৎ-উষ্ণ রাখাই বিধেয়। তাছাড়া শিশুর স্নানোপযোগী জল যেন খুব বেশী গরম-উত্তপ্ত না হয় এবং নবজাতকের কোমল-নাড়ী বা নাভিদেশ জলতলে ডুবে না যায়, সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। এ সব কারণ বিবেচনা করে, আধুনিক যুগের বহু অভিজ্ঞ-বিচক্ষণ ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ চিকিৎসকের অভিমত হলো—নবজাত-শিশুদের জলে ডুবিয়ে অবগাহন-স্নান না করানোই মঙ্গল ও যুক্তিযুক্ত। এছাড়া আরেকটি বিষয়েও সবিশেষ দৃষ্টিদান করা আবশ্যক···সেটি হলো—শিশুদের স্নান করানোর সময় সর্বদা নিয়মিতভাবে তাদের জঘনদেশ, বস্তী, উরু, কানের পিছনদিকের অংশ, বগল প্রভৃতি দেহের যে সব জায়গায় সচরাচর অল্প-বিস্তর 'ভাঁজ' বা 'খাঁজ' পড়তে দেখা যায়, সে সব স্থানগুলিও বেশ যত্নে সাবধানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা। শিশুকে স্নান করিয়ে দেবার সময়টুকু যেন পনেরো থেকে বিশ মিনিটের বেশী না হয়—সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। স্নানের পর শিশুর নাভিতে ধাত্রী-চিকিৎসকদের অনুমোদিত ও স্বাস্থ্যসম্মত-উপায়ে বিশেষভাবে পরিশোধিত 'ডাস্টিং-পাউডার' (Dusting powder) দিয়ে 'ড্রেসিং' বা 'সেবা-যত্ন' করে পরিপাটি ধরণে পরিচ্ছন্ন কাপড়ের পটি বা 'ব্যাণ্ডেজ' (Bandage) জড়িয়ে বেঁধে রাখা দরকার। এছাড়া স্নানান্তে শিশুকে সময়োপযোগী পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়ে মাতৃ-স্তন্য দান করা উচিত। আমাদের দেশে সচরাচর নবজাত-শিশুদের মুখে বিশুদ্ধ মধুর ফোঁটা খাইয়ে দেবার যে চিরাচরিত-রীতি অনুসৃত হয়ে থাকে, সেটিরও সবিশেষ উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা আছে। এভাবে মধুদানের ফলে, নবজাত-শিশুর মুখের ভিতরের অপরিচ্ছন্নতা দূর হয় এবং সহজ-উপায়েই সাফ্ করা ও পরিষ্কার রাখা চলে।

তবে অসময়ে-জাত বা অপরিপুষ্ট শিশুকে জল ব্যবহারে স্নান না করিয়ে, সামান্য পরিমাণে ঈষৎ-উষ্ণ ও বিশুদ্ধ অলিভ-অয়েল কিম্বা সরিষার তেল তুলোয় ভিজিয়ে পরিষ্কার করে দিতে হয়। এভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেবার সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে—নবজাত-শিশুর ব্যবহারোপযোগী তেল যেন কখনো খুব বেশী উষ্ণ না হয় এবং শিশুর দেহে পর্যাপ্ত-পরিমাণে লেপে-ঘসে না থাকে। প্রসঙ্গক্রমে, আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে···অর্থাৎ, অসময়ে-জাত বা অপরিপুষ্ট শিশু যতদিন না বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে, ততদিন পর্যন্ত এমনিভাবেই তাকে নিয়মিত ঈষৎ-উষ্ণ তেল মালিশ ও মোছানোর ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন—সরম-জলে স্নান করানো উচিত নয়। [ক্রমশঃ

সুপর্ণা দেবী

ইতিপূর্বে মহিলাদের পদ-শোভা অর্থাৎ, উরু, হাঁটু, পায়ের পাতা ও গোড়ালির পেশীর সুঠাম সুন্দর গঠনে ও স্বাস্থ্য-শ্রী সুস্থ সবল ও লাবণ্যময় মনোরম করে তোলার উদ্দেশ্যে আধুনিক রূপচর্চা বিশারদদের অনুমোদিত সহজ সরল যে সব ঘরোয়া ও বিশেষ ধরণের ব্যায়াম পদ্ধতির হদিশ দিয়েছি, আপাততঃ তেমনি ধরণের আরো কয়েকটি ব্যায়াম ভঙ্গীর পরিচয় দিই।

৭৫১ পৃঃ ১নং চিত্রে যে ব্যায়াম ভঙ্গীটির নমুনা দেখানো হয়েছে, সেটি নিত্য নিয়মিতভাবে অন্ততঃপক্ষে দশ-বারোবার সযত্নে অনুশীলন করা দরকার। প্রত্যহ নিয়মিতভাবে এই ব্যায়াম ভঙ্গীটি অনুশীলনের ফলে, মহিলাদের পায়ের ডিম

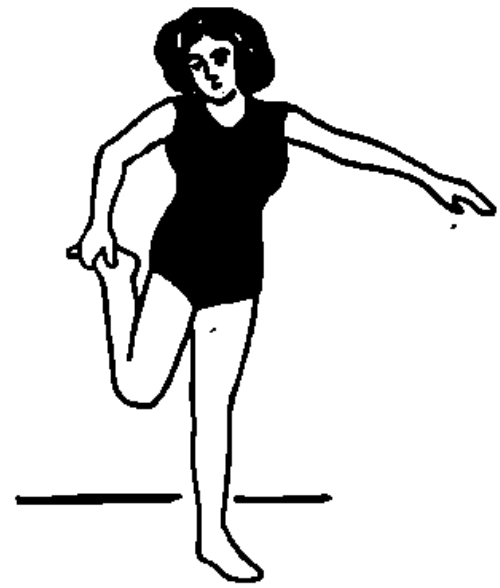

(calf) ও সমগ্র পায়ের গঠন শুধু যে সুঠাম সাবলীল হয়ে উঠবে তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটবে সবিশেষ। পায়ের ব্যায়ামের এই বিশেষ ভঙ্গীটি অভ্যাসের রীতি হলো ঘরের সমতল মেঝের উপর সারা দেহটিকে সিধা খাড়া সটান রেখে এমনভাবে দাঁড়াবেন যে ঈষৎ প্রসারিত দুই পায়ের মধ্যে যেন অন্ততঃপক্ষে ১৬″ ইঞ্চি ব্যবধান থাকে। এভাবে দাঁড়ানোর পর, দুই পায়ের আঙুলগুলির উপর মাত্র ভর রেখে ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের তালে তালে দেহটিকে ক্রমশঃ সমতল জমি থেকে উর্ধ্বে তুলুন এবং সেই অবস্থায় ধীরে ধীরে নিশ্বাস ত্যাগ করে স্থির অবিচলভাবে অন্ততঃপক্ষে পাঁচ-ছয় সেকেণ্ড সটান খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন। তারপর পুনরায় ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের (Inhale) সঙ্গে সঙ্গে দুই পায়ের আঙুল সমতল জমিতে ঠেকিয়ে সারা দেহের ভার পায়ের গোড়ালির উপর রেখে পূর্বোক্ত ধরণে নিশ্বাসটুকু ত্যাগ করে (Exhale) স্তব্ধ অবিচলভাবে আরো পাঁচ-ছয় সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকবেন। পায়ের আঙুলের উপর এবং গোড়ালির উপর দেহের ভার রেখে দাঁড়ানোর সময় উপরের ৯নং ছবির ভঙ্গীতে দুই হাত কাঁধের সঙ্গে সমরেখায় রেখে যথাসাধ্য দুইদিকে প্রসারিত করবেন। এই হলো উপরোক্ত ভঙ্গীতে ব্যায়াম অনুশীলনের মোটামুটি নিয়ম।

উপরোক্ত ব্যায়াম ভঙ্গী অনুশীলনের পর, অনুরূপ ধরণের আরেকটি ব্যায়াম ভঙ্গীও নিয়মিতভাবে অভ্যাস করা আবশ্যক। এ ভঙ্গীটি অভ্যাসের ফলে, মহিলাদের পদ-লালিত্য মনোরম এবং সারা দেহের গঠন-শ্রী ও সুঠাম-সুন্দর হয়ে উঠবে উত্তরোত্তর। উপরের ছবিতে এই ব্যায়াম ভঙ্গীটির যে নমুনা দেখানো হয়েছে,সেটি অনুশীলনের রীতি হলো—পূর্বোক্ত ব্যায়ামাভ্যাসের সময় যেমন ভঙ্গীতে সমতল জমির উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবারেও ঠিক তেমনি ভঙ্গীতে দেহটিকে সটান সিধা খাড়া রেখে দাঁড়াবেন। তারপর ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের (Inhale) সঙ্গে সঙ্গে ডান পায়ের হাঁটু মুড়ে ডান হাতে ডান পায়ের পাতা তুলে ধরে, ডান পায়ের আঙুলগুলি ধরে ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করবেন। এভাবে স্পর্শ করার পর, ধীরে ধীরে নিশ্বাস ত্যাগের (Exhale) সঙ্গে সঙ্গে ডান পায়ের পাতা থেকে ডান হাত সরিয়ে এনে ডান পায়ের মুড়ে রাখা হাঁটুটিকে ক্রমশঃ সোজা করে পুনরায় সমতল জমিতে নামিয়ে রাখবেন। অতঃপর, অনুরূপ ভঙ্গীতে বাঁ-পায়ের হাঁটু মুড়ে বাঁ-হাতে বাঁ-পায়ের পাতা তুলে ধরে বাঁ-পায়ের আঙুলগুলি ধরে ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করতে হবে এবং তারপর ডান পায়ের ব্যায়াম-অভ্যাসের একে একে যে সব কাজ করেছিলেন, সেগুলির প্রত্যেকটি সযত্নে পুনরনুশীলন করবেন। এমনি পদ্ধতিতে ক্রমান্বয়ে একবার ডান-পায়ের এবং আরেকবার বাঁ-পায়ের

হাঁটু মুড়ে অন্ততঃপক্ষে দশ-বারোবার ব্যায়ামের এই বিশেষ ভঙ্গীটি নিয়মিতভাবে অভ্যাস করা চাই।

আগামী সংখ্যায় রূপচর্চ্চার আরো কয়েকটি প্রসঙ্গ আলোচনা করবার বাসনা রইলো।

——

হাতের কাজ

কাদা-মাটির কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ইতিপূর্ব্বে গত সংখ্যায় কাদা-মাটির নরম-তাল থেকে সমতল ছাঁদের 'চাক্তি' (Disc), 'পাটা' (plaque) অথবা 'টালি' (Tile) রচনা করে, তার উপরে অভিনব উপায়ে পাতা, ফুল প্রভৃতি বিবিধ সামগ্রীর অবিকল 'ছাচ' বা 'প্রতিলিপি' (Mould-cast Image) তোলার যে সহজ সরল পদ্ধতির মোটামুটি পরিচয় দিয়েছি, এবারে অনেকটা ঠিক তেমনি ধরণের আরেকটি কায়দার কথা বলছি। এ কায়দাটি আয়ত্ত করা খুবই সোজা কাজ··· এমন কি, সামান্য চেষ্টা করলেই ছোট ছেলেমেয়েরাও অনায়াসে এ পদ্ধতি অনুসরণে কাদা-মাটির তাল দিয়ে নানা রকমের সৌখিন সুন্দর ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী গড়ে তুলতে পারবে।

ধরুন, আপনার বাসনা—নীচের নক্সা-নমুনায় যেমন দেখানো হয়েছে, কাদা-মাটির তাল দিয়ে ঠিক তেমনি ছাঁদের একটি পাতার 'প্রতিলিপি' রচনা করা। এ ধরণের পাতার 'প্রতিলিপি' বা 'ছাঁচ' তুলতে হলে, ইতিপূর্ব্বে গত সংখ্যার প্রবন্ধে যেমন বলেছি, অবিকল তেমনি পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে। অর্থাৎ, গোড়াতেই ঘরের সমতল মেঝে কিম্বা একখানি কাঠের পিঁড়ে বা পাটা (Wooden Slab), অথবা একটুকরো পুরু কার্ড-বোর্ডের উপর প্রয়োজনমতো পরিমাণে একতাল ভিজা-নরম কাদা-মাটি রেখে, হাতের তালুর চাপ অথবা বেলুনী দিয়ে লুচি-পরোটা বানানোর মতো ভঙ্গীতে সযত্নে সেটিকে আগাগোড়া সমান ছাঁদে (Flat and smooth) বেলে নিন। তারপর ঐ ভিজা নরম ও আগা-গোড়া সমানভাবে বেলে-নেওয়া কাদা মাটির 'চাক্তি' বা 'পাটা' অথবা 'টালির' উপর, 'ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত' প্রথায়, আসল পাতাটিকে সরাসরি বিছিয়ে রেখে, পরিষ্কার একটুকরো কার্ডবোর্ড কিম্বা টিনের পাত অথবা কাঠের পাটা চাপা দিয়ে, ভারী ওজনের কোনো বাঁধানো বই, পাথর, ইট কিম্বা হাতের তালুর সজোর চাপ দিন। তাহলেই দেখবেন—কেমন সহজ-সরল অথচ সুন্দর উপায়ে ভিজা নরম কাদা মাটির 'চাক্তি', 'পাটা' অথবা 'টালির' উপর আসল পাতাটির 'ছাঁচ' বা 'প্রতিলিপিটি' আগাগোড়া

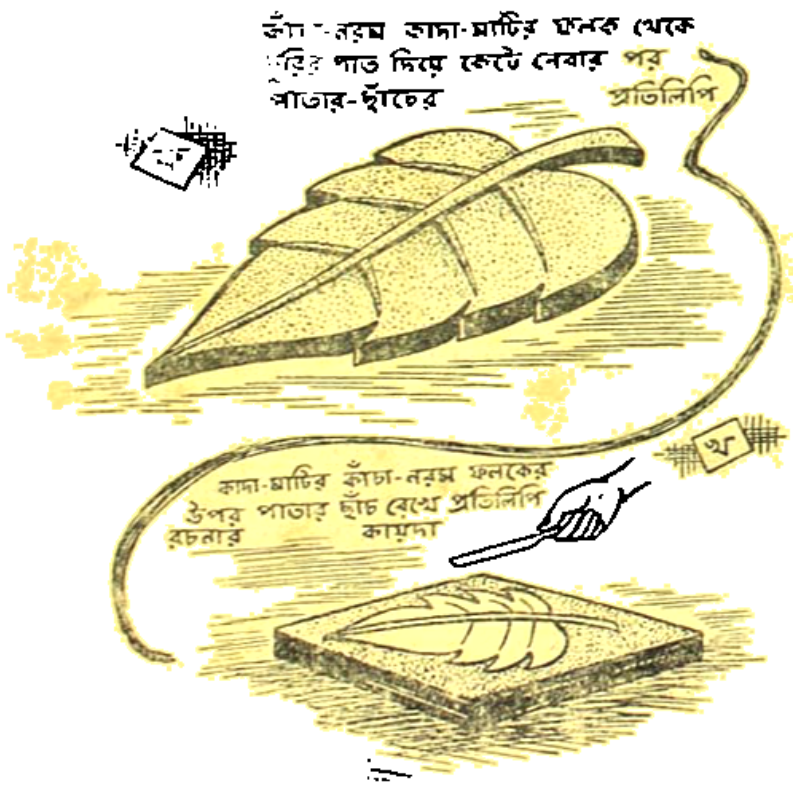

অবিকল-ছাঁদে দিব্যি সুস্পষ্টভাবে মুদ্রিত হয়ে গেছে··· শুধু পাতার হুবহু চেহারাটিই নয়, উপরন্তু পাতার সূক্ষ্ম শিরা-রেখাগুলির প্রত্যেকটির ছাপ তোলা পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে নিখুঁত পরিপাটিভাবে।

এভাবে পাতার হুবহু ছাঁচ তুলে নেবার পর, উপরের ছবির দৃষ্টান্ত অনুসরণে ধারালো একখানি টিনের পাত বা ছুরির ফলার সাহায্যে মিঠাইওয়ালার দোকানে বরফি-সন্দেশ কেটে ভাগ করার ভঙ্গীতে, পাতার প্রতি-লিপি-মুদ্রিত কাদা-মাটির ঐ 'চাক্তি', 'পাতা' বা 'টালির' চারপাশের কিনারার 'বাড়তি' বা 'অপ্রয়োজনীয়' (unwanted) যে মাটি রয়েছে, সেটুকু আগাগোড়া চেঁচে-ছুলে বাদ দিয়ে দিলেই খুব সহজ উপায়ে নিখুঁত-একটি পাতার ছাঁদের কাদা-মাটির কারুশিল্প-সামগ্রী বানিয়ে তোলা যাবে।

এ কাজ সারা হলে, সদ্যরচিত কাঁচা মাটির কারু-শিল্প সামগ্রীটিকে প্রথমেই রোদ বাতাসে রেখে আগা-গোড়া ভালোভাবে শুকিয়ে নেওয়া দরকার। তারপর সেই শুকনো কারুশিল্প সামগ্রীকে আগুনের আঁচে সেঁকে পুড়িয়ে নিলেই, সেটি বেশ পাকাপোক্ত, মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠবে।

এবারে রঙ-তুলির পরশ বুলিয়ে পোড়া-মাটির পাতাটিকে আগাগোড়া বর্ণোজ্জ্বল—অপরূপ করে তুলে, সমগ্র-প্রতি-লিপিটির উপর হাল্কাভাবে একপোঁচ 'বার্নিশ' কিম্বা গঁদের আঠার প্রলেপ লাগিয়ে শিল্প-সামগ্রীটিকে ঝকঝকে-সুন্দর ও 'পালিশ'-মণ্ডিত করে তুলুন। তাহলেই কাদা-মাটির এই বিচিত্র কারুশিল্প-সামগ্রী রচনার কাজ সুষ্ঠুভাবে শেষ হবে।

আগামী সংখ্যায় কাদা-মাটির কারু-শিল্পের আরো কয়েকটি অভিনব কলা-কৌশল সম্বন্ধে হদিশ দেবার চেষ্টা করবো। [ক্রমশঃ

ব্লাউশের প্যাটার্ন

হেমাঙ্গিনী দেবী

গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশের মেয়েরা সচরাচর মিহি-মোলায়েম এবং বেশ পাৎলা-ধরণের সুতী কিম্বা রেশমী কাপড় দিয়ে বানানো হাতা ও খোলামেলা-ছাঁদের পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করতে ভালোবাসেন। তাই তাঁদের সুবিধার্থে, এবারে কয়েকটি গ্রীষ্মকালে নিত্য ব্যবহারোপযোগী হাল্কা-ধরণের ও সাদাসিধা-সৌখিন ছাঁদের ছুটি ব্লাউশের প্যাটার্ণ বা নমুনা-চিত্র প্রকাশ করা হলো।

৭৫৪ পৃঃ ১নং ছবিতে বিচিত্র ছাঁদের যে ব্লাউশের নমুনাটি দেখানো হয়েছে, সেটির ছাঁট-কাট-সেলাইয়ের পদ্ধতি বেশ সহজ ও সাদাসিধা ধরণের। তাছাড়া এ ধরণের ব্লাউশের গলা আর কাঁধের অনেকখানি অংশ উন্মুক্ত থাকে বলেই গরমের দিনে ব্যবহারকালে জামাটি পরে আরাম মেলে প্রচুর। উপরন্তু এই প্যাটার্ণের ব্লাউশের ছাঁটছাট গড়ন বেশ ছিমছাম আধুনিক ও সৌখিন পরিপাটি ছাঁদের, তাই অনায়াসে আটপৌরে বা পোষাকী উভয়বিধ প্রকারের অঙ্গাবরণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ধরণের ব্লাউশ বানানোর জন্য, ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দ অনুসারে নমুনামতো নক্সাদার রঙীণ অথবা একরঙা সুতী বা রেশমী কাপড় বেছে নিলেই চলবে। মোটকথা সুষ্ঠুভাবে রচিত এই ধরণের ব্লাউশ, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা—সকল শ্রেণীর মহিলারই সজ্জা ভূষণের শ্রী পারিপাট্য যে অনেক

বেশী বাড়িয়ে তুলবে—সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

গ্রীষ্মকালে ব্যবহারোপযোগী বিচিত্র নৌথিন ছাঁদের আরেকটি ব্লাউশের নক্সা নমুনাও নীচে প্রকাশিত হলো। এ নমুনাটি অবশ্য পূর্ব্ব বর্ণিত ব্লাউশের প্যাটার্ণেরই অল্প

বিস্তর রূপান্তরিত সংস্করণ মাত্র। কাজেই পূর্ব্বোক্ত প্যাটার্ণের পোষাক ব্যবহারে যে সব সুখ সুবিধা উপভোগ বা নৌথিনতা প্রকাশের সুযোগ মেলে, এক্ষেত্রেও তার কোনো অভাব ঘটবার সম্ভাবনা নেই। আগেরটির মতোই এ প্যাটার্ণের ব্লাউশটিও নক্সাদার রঙীন এবং সাদাসিধা, একরঙা সুতা বা রেশমী কাপড়ে সহজে এবং সুন্দরভাবেই রচনা করা যাবে।

আপাততঃ, গ্রীষ্মকালে পরিধানোপযোগী এই দুই ধরণের ব্লাউশের নক্সা-নমুনার পরিচয় দেওয়া হলো—পরে এমনি ধরণের আরো কয়েকটি অভিনব ছাঁদের পোষাক-পরিচ্ছদ রচনা এবং সেগুলির নক্সা নমুনা প্রকাশের বাসনা রইলো।

— —

সুধীরা হালদার

এবারে বাঙলা দেশেরই বিচিত্র-সুস্বাদু মিষ্টান্ন-জাতীয় একটি নৌখিন-খাবার রান্নার কথা বলছি। অভিনব-উপাদেয় এই খাবারটির নাম—'ছানার লুচি।'

বাড়ীতে কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নিজের হাতে রান্না করে প্রিয়জনদের পাতে পরিবেষণের উদ্দেশ্যে এ খাবারটি বানাতে হলে, যে সব উপকরণ দরকার—গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, 'ছানার লুচি' খাবারটি রান্নার জন্য উপকরণ চাই—আধসের ময়দা, একপোয়া জল-ঝরানো ছানা, আধ-ছটাক খুব মিহি-দানাওয়ালা চিনি, কয়েক ফোঁটা গোলাপী আতর অল্প-একটু এলাচের গুঁড়ো এবং আন্দাজমতো পরিমাণে খানিকটা ঘি।

এ সব উপকরণ সংগ্রহ হবার পর, রান্নার কাজ সুরু করবার আগেই সামান্য একটু মসলা দিয়ে ময়দাটুকু মেখে নিন। তারপর ঐ জল-ঝরানো ছানায় তালটিকে হাতের

তালুর চাপ দিয়ে আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে ঠেসে নিয়ে, ময়ান-দিয়ে মেখে নেওয়া ময়দার তালের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলুন এবং মিশ্রণটিকে পুনরায় হাতের তালুর চাপ দিয়ে ঠেসেঠুসে কিছুক্ষণ মাখুন। এভাবে ময়দা এবং ছানা একত্রে মিশিয়ে মাখবার সময়, অল্প একটু দুধ দিলে, লুচির ময়দার তালের মতো নরম-মোলায়েম ছাঁদে মেখে নেবার পক্ষে, খুবই সুবিধা হবে। দুধ ছাড়াও, ছানা ও ময়দার তালটিকে ঠেসেঠুসে একত্রে মেখে নেবার সময়—চিনি, গোলাপী আতর এবং এলাচের গুঁড়োও মিশিয়ে দেবেন।

লুচি তৈরীর সময় যেমন করেন, এ কাজ সারা হলে, ঠিক তেমনিভাবে ছানা ও ময়দার তালটি থেকে ছোট-ছোট আকারে লেচির টুকরো বানিয়ে নিন। তারপর উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সেই পাত্রে আন্দাজ মতো পরিমাণে ঘি দিয়ে মিটুসু গলিয়ে বেশ তপ্ত-তরল করে তুলুন। এবারে ঐ ছানা ময়দার তাল থেকে ছোট-ছোট যে লেচি গুলি বানিয়ে রেখেছেন, সেগুলিকে চাকী ও বেলুনীর সাহায্যে ঈষৎ মোটা-মোটা ধরণে ফুলকো-লুচির আকারে বেলে নিয়ে, উনানের আঁচে-বসানো রন্ধন পাত্রের তপ্ত তরল ঘিয়ে ভেজে ফেলুন—সাধারণতঃ যে-প্রথায় লুচি ভাজা হয়, অবিকল তেমনি পদ্ধতিতে।

এই হলো-'ছানার লুচি' মিষ্টান্ন পাক করার মোটামুটি রীতি। পরের সংখ্যায় এমনি অভিনব ধরণের আরেকটি সুস্বাদু-সুখরোচক ভারতীয় খাবারের রন্ধন পদ্ধতির হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

"পঞ্চ ভাব" সাধনা

শ্রীগোপালদাস কাব্যভারতী

তথাগত ভগবান,
বৈশালীতে শিষ্য সহ করেন অধিষ্ঠান।
প্রিয় শিষ্য আনন্দের অকুণ্ঠ জিজ্ঞাসা,—
অশান্তি করিতে দূর চাই নব আশা।
ভজন পূজনেতে অতৃপ্তি থাকে মনে,
ভেদ ও অশান্তি দূর হইবে কেমনে।
দাও ভগবান, দাও বিশ্ব-শান্তি বাণী,
প্রচার করিয়া আমি নব মুক্তি আনি।
স্মিত হাস্যে ভগবান বুদ্ধ দিবাকর,
শান্তির ললিত বাণী দেন অতঃপর।
পূজা হোম উপবাস যাগ যজ্ঞ বিনা,
বিশ্ব শান্তি তরে চাই ভাবের সাধনা।
'পঞ্চভাব' সাধনার সহ উপদেশ,
"মৈত্রী সাধনায়" সত্য পথের নির্দ্দেশ।
মৈত্রীভাব সাধনায় এই চিন্তা মনে,
সর্ব্বজীবের কল্যাণ করিবে কেমনে।
"করুণা সাধনা" হলো দুঃখ করো দূর,
দুঃখী জনে সান্ত্বনা দাও আনন্দ মধুর।
"মুদিত সাধনা" হলো যারা ভাগ্যবান,
তাদের সৌভাগ্যে সুখী হও মতিমান।
চিরস্থায়ী হোক তাদের সুখ সৌভাগ্য,
এই চিন্তা করি সদা হও জ্ঞানী যোগ্য।
"অশুভ সাধনা" হলো দেহ যে নশ্বর,
ব্যাধির মন্দির এই দিব্য কলেবর।
ক্ষণ-স্থায়ী দেহ বয় রূপ ও লাবণ্য,
এই চিন্তা "অশুভ সাধনা" বলি হয় গণ্য।
"উপেক্ষা সাধনা" হলো সাম্য ভাব মনে,
উচ্চ নীচ ধনী জ্ঞানী বোসী ভোসী জনে।
সমান দেখিবে সবে যশ অপযশ,
ভেদ না রাখিবে মনে গাহিবে সুযশ।
এই পঞ্চ সাধনায় হলে সিদ্ধকাম,
অশান্তি অতৃপ্তি দূর পূর্ণ মনস্কাম।
জীবের কল্যাণে ইহা করহ প্রচার,
"পঞ্চভাব" নীতি এই সত্য কর্ণধার।
এই পঞ্চ ভাব নীতি সাধকের বাণী,
বিশ্বের শান্তির পথে আনিবে কল্যাণী।

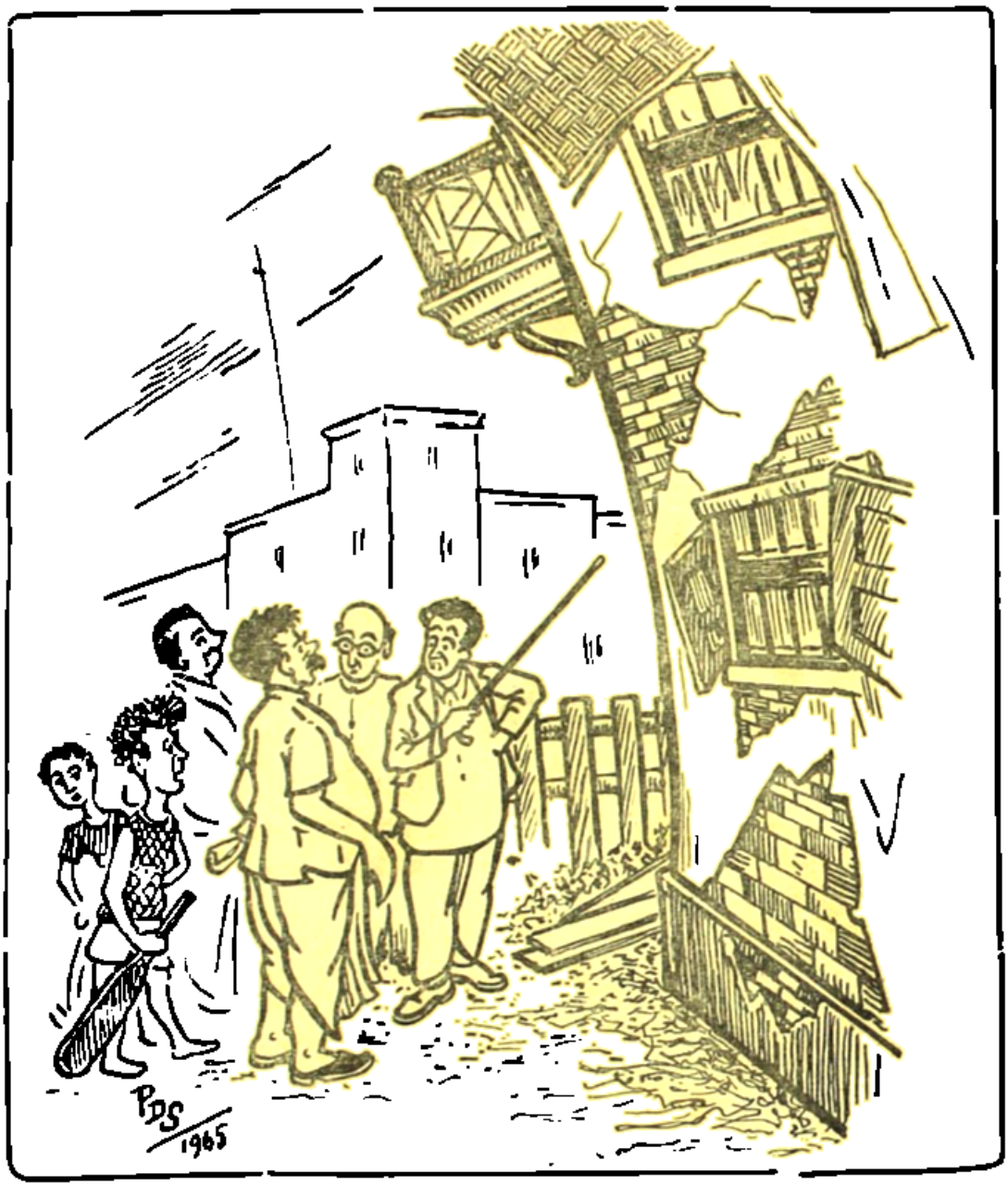

পৌর-প্রতিষ্ঠান কর্মচারী :—এ বাড়ী ভাঙতে হবে···হুকুম হ'য়েছে !···
না হলে আপনারা সগোষ্ঠি চাপা প'ড়ে
মরবেন !

বাড়ীর মালিক :— জানি মশাই !···কিন্তু বাড়ী ছেড়ে কোথায়
আশ্রয় নেবো ! পথে দাঁড়ালে তো গাড়ী
চাপা প'ড়ে মরবো ! ঘরে বাইরে দু'
জায়গাতেই তো মৃত্যু নিশ্চিত ! কাজেই
স্ব-গৃহেই নিধনং শ্রেয়ঃ !···

শিল্পী—পূরী দেবশর্মা

পূর্ব্বাঞ্চলে ঝড়—

সম্প্রতি সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে ভীষণ ঝড় ও সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম জেলার ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে। কত লোক যে মারা গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। এ পর্য্যন্ত পাকিস্থান সরকার যে হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে শুধু বরিশাল জেলায় সমুদ্রের জল বাড়িয়া ৩০ হাজার লোক মারা গিয়াছে। তাহা ছাড়া অন্যান্য জেলায়ও মৃত্যুর সংখ্যা ১০ হাজারেরও অধিক। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। এরূপ ভীষণ ঝড় ইতিপূর্ব্বে আর দেখা যায় নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে পাকিস্থানকে সাহায্য করা হইতেছে।

ভারতের বিপদ—

ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে নানা ভাবে বিপন্ন হইতেছে। উত্তর দিকে চীনারা কয়েকশত বর্গমাইল জমি দখল করিয়া বসিয়াছে। সেখানে ভারতকে বহু সৈন্য মোতায়েন রাখিয়া চীনের আক্রমণকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইতেছে। শুধু লোক বল নহে, প্রচুর অর্থও সেজন্য অপব্যয় হইতেছে। পাকিস্থান তাহার ১৩৫০ মাইল সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিয়া ভারতকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে এবং সুবিধা পাইলে কোন না কোন ছোট খাট এলাকায় আক্রমণ করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিরাট পাকিস্থানী এলাকা সর্ব্বদা আক্রমণের সম্মুখীন হইয়া আছে। কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি সীমান্তে ছোট খাট যুদ্ধ লাগিয়া আছে তাহার উপর সম্প্রতি কচ্ছে পাকিস্থান ভারতীয় এলাকা আক্রমণ করায় সেখানে ভারতকে বহু সৈন্য মোতায়েন রাখিতে হইয়াছে। বর্ত্তমানে ব্রিটেন কচ্ছ সীমান্তে বিবাদ মিটাইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে কিন্তু ব্রিটেনের চেষ্টার গতি এত ধীর যে কোন দিন সে মীমাংসার চেষ্টা সফল হইবে কিনা সন্দেহ। চীন আক্রমণের পর প্রায় তিন বৎসর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতের উত্তর প্রান্তের সীমান্ত সমস্যা আজও কোনরূপ মীমাংসা হয় নাই। এই সকল বিপদের মধ্যে থাকায় ভারতের আভ্যন্তরীণ উন্নতির চেষ্টা ব্যাহত হইতেছে। বিনা যুদ্ধে ভারত-পাকিস্থান বা ভারত-চীন সমস্যা সমাধান হইবে না। কাজেই ভারতকে এখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি চালাইতে হইবে। যুদ্ধ হইবে কিনা কেহই তাহা জানে না।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলমাল—

গত এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রধানতঃ মুসলমান ছাত্রদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তথায় একদল মুসলমান অধ্যাপক ও ছাত্র সেখানে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করিয়া গত কয়েক বৎসর তথায় মুসলমান প্রভুত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা যে মাসে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিচালনা লইয়া এরূপ কার্য্য করিয়াছে যে ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন আইন নাকচ করিয়া দিয়া নিজেদের হাতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছে। বলা বাহুল্য ভারতবাসী একদল শিক্ষিত মুসলমান ভারতের মধ্যে থাকিয়াও সাম্প্রদায়িক মনোভাব লইয়া কাজ করিয়া থাকেন, ভারত সরকারের দুর্ব্বলতা তাহাদের সেই কার্য্যে প্রয়োজনীয় বাধা দান করে না। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীত্যাগী আলিগড়ে কঠোর হস্তে অপরাধীদিগকে দমন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ফলে নূতন আইন জারি হইলে ভবিষ্যতে আর কোন গণ্ডগোলের সম্ভাবনা থাকিবে না।

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কাহিনী চিত্র—

গত ১৩ই মে দিল্লী হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে শ্রীসত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা' ১৯৬৪ সালের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কাহিনী চিত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কবি-

গুরু রবীন্দ্রনাথের 'নষ্ট নীড়' গল্প অবলম্বনে রচিত এই বাংলা ছায়াচিত্র রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক পাইয়াছে। শ্রীতপন সিংহের 'আরোহী' শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যের সম্মান লাভ করিয়া প্রশংসাপত্র পাইয়াছে। সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে কাহিনী-চিত্রের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে হিন্দী ছবি হকীকত। শ্রীঋত্বিকনানন্দ ছবিটির প্রযোজক-পরিচালক।

এবার আবার এভারেষ্ট বিজয়—

এবার মে মাসের শেষভাগে আবার একদল ভারতীয় এভারেষ্ট অর্থাৎ গৌরীশঙ্কর গিরিশৃঙ্গের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহারা ২৯,০২৮ ফুট উচ্চে গমন করেন। ২০শে মে সকাল ৯টার সময় অভিযাত্রীদলের ক্যাপ্টেন এ, এস, টীমা ও শ্রীনোরাউ, গোম্বু সর্ব্বোচ্চ স্থানে গমন করিয়া ভারতীয় ও নেপালের পতাকা প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা সঙ্গে দুইটি দেবমূর্ত্তি লইয়া গিয়াছিলেন সেই দুটিকে সেখানে রাখিয়া আসিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে বহ দল সর্ব্বোচ্চ চূড়ার কাছাকাছি পর্য্যন্ত যাইয়া বিফল হইয়া ফিরিয়া আসেন। দলের নেতা ছিলেন লেঃ কঃ কোহলি।

ভারত এবং রুশ মৈত্রী—

গত মে মাসের প্রথমদিকে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী রাশিয়ায় যাইয়া কয়েকদিন তথায় বাস করিয়া আসিয়াছেন। সেখানে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের সহিত তাঁহার দীর্ঘকাল উভয় দেশের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। যোজনা কমিশনের ডেপুটি সভাপতি শ্রীঅশোক মেটা শাস্ত্রীজীর সঙ্গে ছিলেন। এই আলোচনার ফলে ভারতের বহু ব্যবস্থা উন্নতিলাভ করিবে। ভারতে সিমেন্ট ও এলুমিনিয়মের কারখানা আরও অধিক হইবে এবং ভারত হইতে রাশিয়ায় কাপড়ের রপ্তানি বাড়িবে। যাহাতে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হয় এবং বড় রকমের যুদ্ধ না বাধে সে জন্য ভারত ও রুশ একযোগে কাজ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

নেতাজী সংবাদ—

কয়েকদিন জাপান ঘুরিয়া আসিয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন গত ৬ই মে কলিকাতায় বলিয়াছেন—তিনি যখন জাপানে রেনকোজি মন্দির পরিদর্শন করেন তখন তাঁকে এক ব্যক্তি জানান যে সেখানে যে চিতাভস্ম আছে তাহা নেতাজীর নহে। শ্রীসেন আরও জানান যে নেতাজী জীবিত আছেন কিনা তাহা জানেন না, তবে 'তাইপে' বিমান দুর্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। একজন বাঙ্গালী বহুদিন জাপানে বাস করিতেছেন তাঁহার নামও শ্রীসেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে এই খবর জানাইয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন জাপানীদের পাঁচটি বিশেষ গুণের জন্য জাপান এত শীঘ্র উন্নতিলাভ করিয়াছে। তাহা হইল (১) জনসাধারণের কাজে একাগ্রচিত্ততা। (২) শিক্ষা ব্যবস্থা, (৩) নিয়মানুবর্ত্তিতা, (৪) দেশপ্রেম এবং (৫) অনুসন্ধিৎসা।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শতবার্ষিকী—

গত ৩১শে মে ভারতের সর্ব্বত্র খ্যাতনামা নির্ভীক সাংবাদিক স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম শতবার্ষিক উৎসব পালিত হইয়াছে। সাংবাদিক জগতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহা আজিকার দিনের মানুষকে বুঝান কঠিন। এম-এ পাশ করিয়া তিনি অধ্যাপক জীবন ত্যাগের পর সারাজীবন বিপদসঙ্কুল পথে সাংবাদিকতা করিয়া গিয়াছেন। তখনকার দিনে সাংবাদিকতা অত্যন্ত কঠিন কার্য্য ছিল। ইংরাজ সরকারের প্রশংসা করিলে দেশের লোক ঘৃণা করিত। আর ইংরাজ সরকারের নিন্দা করিলে সর্ব্বদা রাজরোষে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইত। এই অবস্থার মধ্যে রামানন্দবাবু সারাজীবন অসাধারণ নিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা ও দেশপ্রেমের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথা আজ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিলে ও আলোচনা করিলে দেশবাসী উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

আমরা বিশ্বাস করি আগামী এক বৎসরকাল সারা ভারতবর্ষের লোক বিশেষ করিয়া বাঙলার লোক রামানন্দবাবুর কথা স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান দুর্নীতিপূর্ণ আবহাওয়ার নূতন পথের সন্ধান পাইবে, আমরা তাঁহার জন্মশতবার্ষিক দিবসে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রণাম জানাইয়া তাঁহার স্বর্গত আত্মার আশীর্ব্বাদ কামনা করি।

খড়দহে সাহিত্যবাসর—

গত ১৬ই মে রবিবার খড়দহ নিবাসী শ্রীতারাপতি ভট্টাচার্য্যের আহ্বানে খড়দহে শ্যামসুন্দর মন্দিরে সাহিত্যবাসরের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। সকাল ৯টায় কলিকাতা হইতে বহু কবি ও সাহিত্যিক খড়দহে গমন

করিয়া কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া কাব্য ও বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা করিয়াছিলেন। প্রবীণ কবি শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং আসরের সভাপতি শ্রীহরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সহসভাপতি কবি শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য, নূতন সম্পাদক শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিকঙ্কণ শ্রীহেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন। সুকণ্ঠ গায়ক শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুদেব কুমার মুখোপাধ্যায় কয়েকটি সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া সকলকে আনন্দদান করেন। সভার শেষে সকলকে শ্যামসুন্দরের প্রসাদে পরিতৃপ্ত করা হয়।

শ্রীনিভৃতকুমার সরকার—

ফরিদপুর জেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের ৺রামলাল সরকারের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীনিভৃতকুমার সরকার সম্প্রতি ডাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-কম পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে

শ্রীনিভৃতকুমার সরকার

প্রথম স্থান অধিকার করিয়া রাষ্ট্রপালের স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন। তিনি চাকরী করিবার সময় উচ্চশিক্ষালাভ করেন—ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। বর্ত্তমানে তিনি সোদপুর পল্লীশ্রীর অধিবাসী—আমরা তাঁহার জীবনের সাফল্য কামনা করি।

ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—

২৪ পরগণা জেলার গোবরডাঙ্গা গ্রামের প্রখ্যাত চিকিৎসক এবং সাহিত্যিক ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সম্প্রতি বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাদের কলিকাতা ৭৯ বালিগঞ্জ প্লেসস্থ ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ এ্যালোপাথিক ডাক্তার ছিলেন। স্বগ্রামে

ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

সুদীর্ঘকাল বসবাস করিয়া তিনি দরিদ্র জনসাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি পরহিতব্রতী, সমাজ সেবী এবং হৃদয়বান পুরুষ ছিলেন।

তিনি আজীবন বাংলা সাহিত্য সেবায় রত ছিলেন। তাঁহার লিখিত "ব্যাধি ও তাহার প্রতিষেধ" পুস্তক চিকিৎসক এবং সাধারণ পাঠক মহলে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। অধুনালুপ্ত 'আর্য্যাবর্ত্ত' 'জন্মভূমি' 'অর্চনা' 'বঙ্গবাসী' 'হিতবাদী' প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় সুরেন্দ্রনাথ নিয়মিত ভাবে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা লিখিতেন। ভারতবর্ষে তাঁহার বহুমূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। জ্যোতিষশাস্ত্রেও তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল।

সুরেন্দ্রনাথের সাহিত্য রচনায় প্রীত হইয়া কাশীধামস্থ বেদোদ্ধোধিনী সমিতির পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে 'সাহিত্য-বিশারদ' উপাধি প্রদান করেন।

সুরেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান এবং বিপত্নীক। সাহিত্যিক এবং কবি অনিলকুমার ভট্টাচার্য তাঁহার অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র।

সাহিত্যিকদের পুরস্কার—

১৩৭১ সালের বার্ষিক আনন্দ পুরস্কার লাভ করিয়াছেন অধ্যাপক ড: সুশীলকুমার দে এবং লেখক শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র

নাথ নন্দী। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার পাইয়াছেন বিশ্বভারতীর পণ্ডিত সুখময় সান্যাল, সরস্বতীর্থ এবং মতিলাল ঘোষ পুরস্কার পাইয়াছেন তরুণ লেখক শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শিশু সাহিত্যের জন্য যৌথক পুরস্কার পাইয়াছেন শ্রীবীরেন্দ্রলাল ধর। বিশিষ্ট কবি হিসাবে উত্তরীয় পুরস্কার পাইয়াছেন শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। আমরা সকলকে আমাদের অন্তরের অভিনন্দন জানাই।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংঘ—

সম্প্রতি কলিকাতা ২৮ মলঙ্গা লেনস্থ শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংঘের বার্ষিক রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব গণেশচন্দ্র এভেনিউস্থ এ-বি-টি-এ হলে হইয়া গিয়াছে। ঐ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আবৃত্তি, সংগীত ও রচনা প্রতিযোগিতায় বহু প্রতিযোগী পুরস্কার লাভ করেন। সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শ্রীতারাচরণ মুখোপাধ্যায় সংঘের আদর্শ বর্ণনা করিলে সভাপতি শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথি কবি শ্রীগোপাল ভৌমিক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সর্বশেষে তথায় কবিগুরুর ডাকঘর নাটক অভিনীত হইয়াছিল।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংঘের বার্ষিক রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবে উপস্থিত সুধীবৃন্দ

কোশি বাঁধের উদ্বোধন—

গত ২৪শে এপ্রিল নেপালের রাজা মহেন্দ্র বীরপুরের নিকটে ভীমনগরে কুশি নদীর বাঁধের উদ্বোধন করিয়া ভারত ও নেপাল উভয় দেশের জনগণের কল্যাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐ অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায়, বিহারের সেচমন্ত্রী শ্রীকে. পি. সিংহ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। কোশি বাঁধ নির্মাণের ফলে ভারতের সহিত নেপালের মৈত্রী বৃদ্ধি পাইবে।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—

প্রথম যুগে I. C. S-দের অন্যতম সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গত ১লা মে ৯৩ বৎসর বয়সে তাঁহার বালিগঞ্জের বাসগৃহে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার দুই পুত্র এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জী ও রেলওয়ে বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রশান্ত মুখার্জী তাঁহার পূর্বেই পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায় পিতার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার জামাতা শ্রীএস. এন. রায় I. C. S-পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি ভাগলপুরের ব্রাহ্মনেতা নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ছিলেন এবং তাঁহার একভ্রাতা কলিকাতা কর্পোরেশনের জে, সি, মুখার্জী বাংলাদেশে সর্বজন পরিচিত ছিলেন। সতীশচন্দ্র বহুদিনের অধিকারী ছিলেন এবং হাওড়ার জেলাম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করিবার সময় প্রায় ৩৬ বৎসর পূর্বে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়—

প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৬ই মে সন্ধ্যায় ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

তিনি সাংবাদিকশ্রেষ্ঠ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং ডাঃ স্যার নীলরতন সরকারের জামাতা ছিলেন। যৌবনে বিলাতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া পিতার মৃত্যুর পর হইতে তিনি সম্পাদকের কাজ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দক্ষতার সহিত জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই কাজ করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার বিধবা পত্নী, চার কন্যা, ভ্রাতা শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় ও ভগিনীদ্বয় শ্রীযুক্তা শান্তা ও সীতা দেবী প্রভৃতিকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

আশুবলাল সেন—

বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও সংবাদ-পত্র জগতে খ্যাতনামা আশুবলাল সেন গত ১০ই মে সোমবার সন্ধ্যায় তাঁহার দক্ষিণ কলিকাতার কেয়াতলা লেনের বাড়ীতে ৮৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল আনন্দ বাজার পত্রিকার সহিত যুক্ত ছিলেন। তাঁহার পত্নী ও একমাত্র কন্যা (সন্ন্যাসিনী প্রব্রজিকা বেদপ্রাণা), চার ভাই ও পাঁচ ভগিনী রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ঢাকা জেলার বিক্রমপুর-দোলারচর গ্রামে বিশারদ বংশে ১৮৮২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা চট্টগ্রামের ডাক্তার ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে B. A. পাশ করিয়া M. A. পড়ার সময় তিনি বিপ্লব আন্দোলনে যোগদান করেন ও অনুশীলন সমিতির নেতা হন। ১৯১৪ সালে বর্দ্ধমান বন্যায় তিনি স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা হইয়া সাহায্য দান করিতে গিয়াছিলেন। ১৯২০ সালে জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন ও আনন্দ-বাজার পত্রিকা নূতন করিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার অসাধারণ কর্ম্মশক্তি ও প্রমশীলতা আনন্দবাজার পত্রিকাকে সাফল্য দান করিয়াছে। তাহার পর কিছু দিন তিনি 'ভারত' নামক দৈনিক পত্র চালাইয়া ছিলেন। 'ভারত' উঠিয়া গেলে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার মত সহৃদয়, পরোপকারী মানুষ খুব কম দেখা যায়।

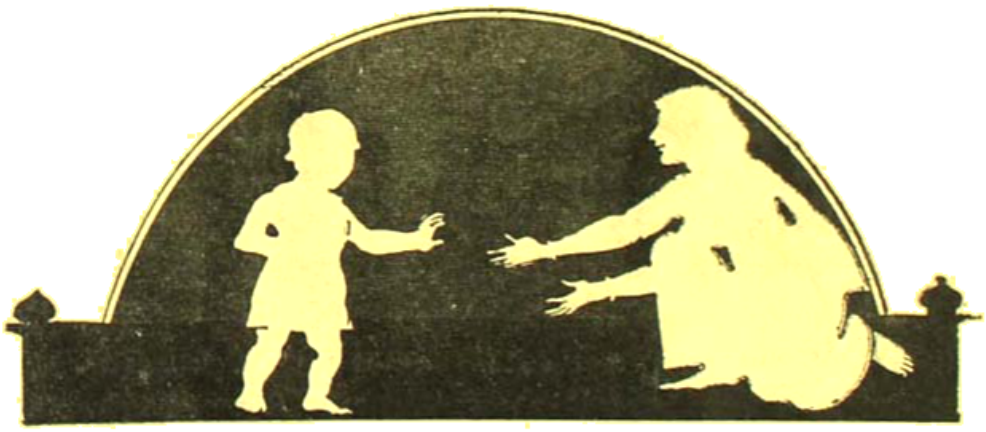

দেবদত্ত

রাশিফল

(১৬ই জৈষ্ঠ থেকে ১৭ই আষাঢ় পর্যন্ত।)

মেষরাশি—এই সময়ে আপনার গ্রহ সংস্থান অপেক্ষাকৃত ভালই। আপনার স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল যাবে বলে আশা করতে পারেন। সামান্য জ্বর-জাড়ি বা আঘাতপ্রাপ্তি এই সময়ের গোড়ার দিকে যদিও ঘটতে পারে তাহলেও শরীর নিয়ে বিশেষ বিব্রত হবার কিছু নেই। অর্থাগম বা রোজগার ভালই হবে। তবে এই সময়ের গোড়ার দিকে কোন অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারা কিছু ক্ষতি এবং প্রতারণার যোগ দেখা যায়। সে বিষয়ে একটু সতর্ক থাকবেন। কর্মস্থানে বা ব্যবসায়ে নিজের বুদ্ধি বিচক্ষণতার দ্বারা আশাতীত যশ ও অর্থ লাভের যোগ দেখা যায়। সন্তানের ব্যাপারে একটু উদ্বেগ গেলেও কোন সন্তানের আশাতীত সাফল্য ও যশ লাভ সম্ভব। গৃহের পরিবেশ ভালই থাকবে। আত্মীয় স্বজনের দিক থেকে এবং ভায়েদের দিক থেকে বিশেষ ঝামেলা না আসাই সম্ভব। আসবাব পত্র এবং বিলাসিতার জন্য কিছু ব্যয় হতে পারে এবং গৃহে কোন শুভানুষ্ঠানের জন্য ব্যয় হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। মাতুলের দিক থেকে কিছু প্রাপ্তি যোগ এই সময়ে দেখা যায়।

বৃষরাশি—এই সময়টি আপনার অত্যন্ত ঝামেলার সময়। সকল দিক থেকেই ঝামেলা আসতে পারে। বিশেষতঃ এই সময়ের গোড়ার দিকে আপনাকে নানা অশান্তিতে বিব্রত করে তুলতে পারে। আপনার স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল যাবে না। পেটের অসুখ ও হজমের গোলমাল হতে পারে। গৃহের ও পারিবারিক পরিবেশ বিশেষ ভাল যাবে না। কলহ, মনোমালিন্য ও গুপ্তশত্রুতা এই সময়ের একটি অশুভ ফল। টাকাকড়ি লেন-দেনের ব্যাপারেও খুব সাবধান থাকবেন। ফাট্‌কা বা স্পেকু-লেশনে লোকসান সুনিশ্চিত। গৃহ ভূমির ব্যাপারে বিশেষ অশুভ। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার কঠিন পীড়া এই সময়ের অন্যতম অশুভ ফল। গৃহভূমির ব্যাপারে কোন অপরিচিত লোকের সঙ্গে কোন কাজ-কর্ম করবেন না। প্রতারিত হবার সম্ভাবনা। সন্তানের জন্য অশান্তি হতে পারে। তাদের কারো অসুখ আপনার মানসিক উদ্বেগের কারণ হতে পারে।

মিথুনরাশি—স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তিত হবার কিছু না থাকলেও পেটের অসুখ, আমাশয় ও অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের প্রবণতা এই সময়ে দৃষ্ট হয়। শ্লেষ্মার ধাত হলে এই সময়ে তা নিয়ে একটু ভুগতে পারেন। আর্থিক দিক থেকে খুব স্বাচ্ছল্য বা অগ্রগতি আশা করবেন না। কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য মোটামুটি মামুলী ভাবেই চলবে। তবে অপ্রত্যাশিত ও অভাবনীয় ভাবে কিছু ক্ষতি বা লোকসানের যোগ আছে। বিশেষতঃ বন্ধু বান্ধব বা পরিচিত ব্যক্তির দ্বারা কিছু আর্থিক ক্ষতি এই সময়ে দৃষ্ট হয়। এই সময় কারো জামিনদার হবেন না। সতর্কতার সঙ্গে ফাট্‌কা বা স্পেকুলেশনের কাজ করলে তা থেকে কিছু লাভ আশা করতে পারেন। জমি-জমার ব্যাপারে কিছু ভাল যোগ দেখা যায়। ওদিক থেকে কিছু

আর্থিক সুবিধা হতে পারে। লেখা পড়ার ব্যাপারে কিছু অগ্রগতি হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে বিস্তার ও অগ্রগতির যোগ এই সময় দৃষ্ট হয়। তেমনি উপরওয়ালার বিরাগ ভাজন হওয়া, কাজে বাধা বিঘ্ন, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মন কষাকষি ও মনোমালিন্য প্রভৃতি অশুভ ফল এই সময়ে হতে পারে। গৃহের পরিবেশ গোড়ার দিকে ভালই থাকবে। তবে এই সময়ের শেষের দিকে কিছু কিছু অশান্তি ও ঝামেলা গৃহের শান্তিভঙ্গ করতে পারে।

কর্কটরাশি—এই সময়টি আপনার ভাল মন্দ মেশানো। কোন কোন বিষয়ে বেশ ভালই যাবে। স্বাস্থ্য মাঝামাঝি। তবে গোড়ার দিকে বায়ু পিত্ত এবং ওজের আধিক্য জনিত অসুস্থতায় কিছু ভুগতে পারেন। তা ছাড়া শারীরিক দুর্বলতা ও অবসাদও কিছু আসতে পারে তবে তা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। আকস্মিক দুর্ঘটনা বা রক্তপাত সম্বন্ধে একটু সতর্ক থাকবেন। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ আপনার পারিবারিক ব্যাপারে ও গৃহস্থালীর ব্যাপারে বিশেষ অশুভ। ৫ই আষাঢ় আর্থিক, শারীরিক সকল বিষয়েই বিশেষ শুভ। টাকা লক্ষ্মী, কাটকা প্রভৃতি থেকে কিছু অর্থপ্রাপ্তির যোগ ঐ দিন দৃষ্ট হয়। পরিশ্রমের অনুপাতে অর্থপ্রাপ্তি হবে না তবে অসঙ্গত উপায়ে বা নীতি বিরুদ্ধভাবে অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। চোর বা প্রতারকের দ্বারা অর্থক্ষতির যোগও এই সময়ের একটি অশুভ ফল।

সিংহরাশি—এই সময়টি আপনার ভাল মন্দ মেশানো। যদিও মন্দ গ্রহের প্রভাব বেশী তাহলেও ভাল ফলও কিছু আশা করতে পারেন। স্বাস্থ্য নিয়ে খুব চিন্তার কিছু নেই। তবে শ্লেষ্মা পিত্ত ও বায়ুর প্রবণতায় একটু আধটু ভুগতে পারেন। রক্তদুষ্টি ও বাতের ব্যথায় মাঝে মাঝে কষ্ট পেতে পারেন। এই সময়ে স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে কম বেশী চিন্তিত হতে পারেন। তাঁর কোন রকম আকস্মিক দুর্ঘটনা বা রক্তপাত সম্বন্ধে একটু সতর্ক থাকবেন। ছেলে মেয়েদের ব্যাপার নিয়ে কিছু ঝামেলা যেতে পারে। বিশেষ করে তাদের কারো স্বাস্থ্য ও অসাবধানতা আপনার মানসিক দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে। গৃহের পরিবেশ ও গৃহস্থালীর ব্যাপারেও খুব সুশৃঙ্খলা আশা করবেন না। ছোট-খাটো কলহ ও অশান্তি আপনার পারিবারিক শান্তিভঙ্গ করতে পারে। আত্মীয়-স্বজন ও ভায়েদের সঙ্গে সদ্ভাব না থাকারই সম্ভাবনা। ছোট-খাটো ভ্রমণ হলেও তা থেকে কোন বিপত্তি হতে পারে। আর্থিক অগ্রগতি কিছু হলেও প্রতারণা বা ছলনার দ্বারা লোকসানেরও যোগ দৃষ্ট হয়। সে বিষয়ে সতর্ক থাকবেন। কর্মস্থানে উন্নতি ও ব্যবসায়ে লাভ এই সময়ের একটি শুভ ফল। ৬ঠা জ্যৈষ্ঠ গৃহস্থালী ও পারিবারিক ব্যাপারে বিশেষ অশুভ।

কন্যা রাশি—এই সময়ের গোড়ার দিকে আপনার সকল দিকে কিছু ঝামেলা যাবে। তবে তা নিয়ে বিশেষ চিন্তার কিছু নেই। কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য বা চাকরীর ব্যাপারে ভালই যাবে। স্বাস্থ্য নিয়ে বিশেষ চিন্তার কারণ নেই। চোখের অসুখের প্রবণতা এই সময়ে দেখা যায়। যেমন কলহ, মনোমালিন্য ও শত্রুতার যোগ এই সময়ে দেখা যায় তেমনি শেষের দিকে সাফল্য, কৃতকার্যতা, শত্রুর পরাজয় ও মামলা-মোকদ্দমায় জয় প্রভৃতি শুভ ফলেরও আশা করতে পারেন। এই সময়ে কোন মুরুব্বি লাভ হওয়াও অসম্ভব নয়। গৃহের পরিবেশ ও পারিবারিক আবহাওয়া ভাল থাকবে বলে আশা করতে পারেন। স্ত্রীর সঙ্গে মতবিরোধ বা মনোমালিন্য হতে পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকবেন। ছেলে মেয়েদের ব্যাপারেও আপনার কিছু অশান্তি আসতে পারে। ২৬শে জ্যৈষ্ঠ ও ৫ই আষাঢ় আর্থিক ব্যাপারে বিশেষ ভাল। কাটকা বা স্পেকুলেশনে বিশেষ লাভ আশা করতে পারেন।

তুলা রাশি—স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালই যাবে। তবে মানসিক দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ আপনার অস্বাস্থ্যের কিছু কারণ হতে পারে। চর্ম রোগ এবং রক্তদুষ্টির প্রবণতা এই সময়ে দেখা যায়। গোড়ার দিকে আর্থিক অগ্রগতি দৃষ্ট হয়। কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরীর ব্যাপারে মোটামুটি ভালই যাবে। তবে কোন মুরুব্বি বা উপরওয়ালার বিরাগ-ভাজন হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। শেষের দিকে ব্যয় বাহুল্যের জন্য একটু বিব্রত হতে পারেন। কোন মৌলিক গবেষণার জন্য কিম্বা কোন সাহিত্য রচনার জন্য যশ বা খ্যাতিলাভ ঘটতে পারে। বিশেষ করে ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ৬ই ও ৭ই আষাঢ় লক্ষণীয়। গৃহের ও পারিবারিক আবহাওয়া মোটামুটি ভালই থাকবে। তবে সামান্য কলহ-বিবাদ, মন কষাকষি প্রভৃতি অশান্তি কিছু থাকতে পারে। সন্তানের ব্যাপারে কিছু উদ্বেগ বা অশান্তি যেতে পারে। তবে ১৬ই আষাঢ় তাদের দিক থেকে বিশেষ শুভফল আশা করতে পারেন। ঐ সময়ে কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও মাথার কাজের জন্য আপনার কিছু যশ বা আর্থিক লাভ ঘটতে পারে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে শেষের দিকে একটু চিন্তিত হতে পারেন। চিঠিপত্র লেখার ব্যাপারে একটু সতর্ক হবেন। তা নিয়ে কোন মামলা-মোকদ্দমা বা অশান্তি ঘটতে পারে। বিশেষতঃ ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ও ২৭শে জ্যৈষ্ঠ এই সম্বন্ধে একটু সতর্ক থাকবেন।

বৃশ্চিক রাশি—এই সময়টি আপনার ভাল যাবে বলে আশা করতে পারেন। শরীর বা স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। তবে অজীর্ণ, হৃদ্রোগের গোলমাল বা ঐ জাতীয় ছোট-খাটো অসুখের যোগ কিছু কিছু দৃষ্ট হয়। অতি ভোজন এবং গুরুভোজন আপনার অস্বাস্থ্যের অন্যতম কারণ হতে পারে। সে বিষয়ে একটু সতর্ক থাকবেন। গৃহস্থালী ও গৃহের পরিবেশ ভালই থাকবে। তবে ৩১শে জ্যৈষ্ঠ

দিনটি বিশেষ অশুভ। এই সময়ে গৃহের শান্তি হয়তো বজায় থাকবে না। কলহ, মনোমালিন্য এবং হঠাৎ কোন পরিবর্তন এই সময়ে হতে পারে। সে বিষয়ে সতর্ক থাকবেন। স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে খুব কাবেলা না গেলেও স্ত্রীর ব্যাপারে একটু চিন্তা থাকবে। শেষের দিকে সন্তানের জন্য একটু উদ্বেগ যাবে। ২৩শে ও ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ও ৭ই আষাঢ় সন্তানের ব্যাপারে, কাজ-কর্মের ব্যাপারে এবং স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে বিশেষ অশুভ। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ ও ৪ঠা আষাঢ় আপনার পক্ষে অত্যন্ত শুভদিন। এই দুই দিন সকল বিষয়েই ভাল ফল আশা করতে পারেন।

প্রভু রাশি—এই সময়টি আপনার মামুলী ধরণের। এই সময় কিছু ভাল ফল আশা করবেন না। কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চাকরীর ব্যাপারে কিছু ভাল গেলেও তেমন আশাপ্রদ কিছু ফল না পাওয়াই সম্ভব। হজমের গোলমাল ও অজীর্ণ আপনার স্বাস্থ্যহানির কারণ হবে। ছোটখাটো আঘাত বা রক্তপাতের সম্ভাবনাও এই সময়ে দেখা যায়। এই বিষয়ে একটু সতর্ক থাকবেন। কোন গুপ্ত শত্রুর দ্বারা অভাবনীয় বা অদ্ভুতভাবে কিছু আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। স্ত্রীর সঙ্গে মন কষাকষি ও মনোমালিন্য হতে পারে সে সম্বন্ধে একটু সতর্ক থাকবেন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও ভায়েদের সঙ্গে অশান্তি ও বিবাদ-বিসম্বাদ হবার সম্ভাবনা দেখা যায়। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ও ৩০শে জ্যৈষ্ঠ এই বিষয়ে সতর্ক থাকবেন। গৃহভূমির ব্যাপারে সময়টি খুব খারাপ নয়। ভূমি লাভ কি গৃহলাভ হওয়ার যোগ দৃষ্ট হয়। সন্তানের ব্যাপারে খুব খারাপ নয়। তবে তাদের তরফ থেকে কিছু কাবেলা যে আসবে না তা বলা যায় না। ২রা ও ১২ই আষাঢ় আপনার সন্তানের ব্যাপারে কোন প্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে।

অক্রূর রাশি—এই সময়টি আপনার খুব শুভ নয়। নানান দিক দিয়ে কাবেলা আসতে পারে তবে তাতে তেমন কিছু ক্ষতি হয়তো হবে না। স্বাস্থ্য খুব ভাল না গেলেও বিশেষ কিছু চিন্তার নেই। কোনরকম আঘাত, রক্তপাত ও দুর্ঘটনার যোগ এই সময়ে দৃষ্ট হয়। সে বিষয়ে একটু সতর্ক থাকবেন। বিশেষতঃ ২৩শে, ২৪শে ও ২৭শে জ্যৈষ্ঠ এই বিষয়ে একটু সচেতন থাকবেন। গৃহের পরিবেশ ও গৃহস্থালীর আবহাওয়া খুব ভাল থাকবে না। স্ত্রী ও অন্যান্য পরিবারবর্গের সহিত মনোমালিন্য ও মন কষাকষি চলতে পারে। এই সময়ের গোড়ার দিকে অশুভ ফলের আধিক্য দেখা যায়। কিন্তু শেষার্ধে ক্রমশই শুভ ফল আশা করতে পারেন। আয়-ব্যয়ের হিসাবে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হবার যোগ দেখা যায় এবং বন্ধু বা আত্মীয়ের মৃত্যুজনিত শোক পাওয়া এই সময়ে সম্ভব। আর্থিক ক্ষতি, কলহ, বিবাদ, মামলা-মোকদ্দমা ও ক্লান্তিকর ভ্রমণ প্রভৃতি এই সময়ে ঘটতে পারে। শেষার্ধে শত্রুর পরাজয়, কাজ-কর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রগতি প্রভৃতি কিছু শুভ ফল আশা করতে পারেন। বিশেষতঃ ২৪শে জ্যৈষ্ঠ ও ৪ঠা আষাঢ় কোন শুভ ফলের আশা করতে পারেন।

কৃষ্ণ রাশি—এই সময়ের গৃহসংস্থান আপনার পক্ষে খুব শুভ নয়। এই সময়ে খুব ভাল ফলের আশা করবেন না। আপনার নিজের স্বাস্থ্য ও ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য নিয়ে একটু বিব্রত হতে পারেন। এই সময়ে রক্তপাত, দুর্ঘটনা ও আঘাতের যোগ দৃষ্ট হয়। অজীর্ণ, হজমের গোলমাল ও চোখের অসুখের প্রবণতা এই সময়ে বৃদ্ধি পেতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন। গৃহের পরিবেশ ও গৃহস্থালীর ব্যাপারে খুব সুশৃঙ্খলা আশা করবেন না। ছোটখাটো বিরোধ ও কলহ মাঝে মাঝে দেখা দিতে পারে। আর্থিক দিক থেকে খুব ভাল নয়। কিছু লোকসান ও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। কারো জামীনদার হবেন না তাতে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। ঠগ, বা প্রতারকের দ্বারা কিছু ক্ষতির যোগ দেখা যায়। ১৮ই, ২৬শে ও ৩১শে জ্যৈষ্ঠ এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকবেন। কাজ-কর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য মোটামুটি সাধারণভাবেই চলবে। এই সময়ে কোন নতুন কাজে হাত দেবেন না। তবে ২৪শে জ্যৈষ্ঠ ও ৪ঠা আষাঢ় আর্থিক ব্যাপারে কিছু ভাল ফল আশা করতে পারেন।

শ্বেত রাশি—এই সময়টি আপনার পক্ষে ভালমন্দ মেশানো। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালই থাকবে। তবে অতিরিক্ত পরিশ্রম জনিত ক্লান্তি ও অবসাদে আপনার অস্বাস্থ্যের কারণ হতে পারে। অতিভোজন ও গুরু ভোজনের জন্য আপনার শরীর একটু অসুস্থ হতে পারে সে বিষয়ে একটু সতর্ক থাকবেন। চোখের অসুখেও কিছু বিব্রত হতে পারেন। স্ত্রীর সঙ্গে সাধারণ মনকষাকষি ছাড়া গৃহের পরিবেশ মোটামুটি ভালই থাকবে। তবে কোন আত্মীয় বা বন্ধুর মৃত্যু গৃহের শান্তি বিঘ্নিত করবে। আর্থিক ব্যাপারে প্রথমার্ধে ভাল গেলেও শেষার্ধে রীতিমত সঙ্কট দেখা দিতে পারে। এমন কি পাওনাদারের চেঁচায় আপনি বিব্রত হতে পারেন। এই সময়ে বিলাস-ব্যসনে কিছু ব্যয় হতে পারে এবং শত্রু আপনার বশ্যতা স্বীকার করতে পারে। কিন্তু গুপ্ত শত্রুর জন্য আপনি রীতিমত বিব্রত হবেন। বিশেষতঃ ২৬শে জ্যৈষ্ঠ ও ৩১ জ্যৈষ্ঠ এই দুই দিন এই বিষয়ে বিশেষ অশুভ। ২০ই আষাঢ় আর্থিক ব্যাপারে আপনার বিশেষ শুভ।

≡আকর্ষণীয় আগামী 'আষাঢ়'≡

এই সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে ঃ

দিলীপকুমার রায়ের সত্য-ভিত্তি উপন্যাস

... অঘটনের পূর্ব্বরাগ ...

ও

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাস

জল মাটির গন্ধ

এবং

লীলা বিদ্যান্তের প্রবন্ধ

রবীন্দ্র-জীবনের অনন্যা

আরও থাকবে :—

অখিল নিয়োগীর কৌতুক নাটিকা

প্রতিবেশিনী

এবং

ছোট গল্প, উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ও রম্যরচনার সম্ভার

তার সঙ্গে রয়েছে—

প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাস

অচিন বনের পাখি

ও

কমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সচিত্র ভ্রমণ কাহিনী

দক্ষিণস্যাং

পাট ও পাঠ

শ্রী'শ'—

॥ বিদেশী বাজার ॥

বিশ্বের চলচ্চিত্র নির্মাণকারী দেশগুলির মধ্যে ভারত অধিকার করে আছে দ্বিতীয় স্থান। অবশ্য বিশ্ব-বাজারে এই যে দ্বিতীয় স্থান ভারত অধিকার করে আছে তা গুণগতমানে নয়, সংখ্যার দিক দিয়ে। গুণে না হলেও চলচ্চিত্র নির্মাণের সংখ্যাতেও যে ভারত অনেক প্রগতিশীল দেশের চেয়ে এগিয়ে আছে, সেটাও বিশেষ আশা ও আনন্দের কথা এবং এর থেকে বোঝা যায় যে চলচ্চিত্র শিল্প ভারতের একটি বলিষ্ঠ শিল্প এবং এর প্রভাব ও প্রচার প্রায় সারা দেশব্যাপি। শুধু স্বদেশেই নয়, স্বদেশের বাইরেও বিশ্ব বাজারে বিশ্বের এই দ্বিতীয় বৃহত্তম চলচ্চিত্র নির্মাণকারী দেশের চিত্র সগৌরবেই প্রদর্শিত হয়ে থাকে। তবে ভারতীয় চিত্রের বাজার মধ্য প্রাচ্য, পূর্ব আফ্রিকা ও কিছু আশপাশের দেশগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পশ্চিম দেশগুলিতে ও পশ্চিম গোলার্ধের আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভারতীয় চিত্রের চাহিদা নেই। এর প্রধান কারণ হচ্ছে ভাষার বাধা। এই ভাষার বাধা কাটাতে হলে উৎকৃষ্ট ভারতীয় চিত্রগুলিকে ইংরাজী ও ইউরোপীয় কয়েকটি ভাষায় 'ডাবিং' করে বা সাব্‌টাইটেল যুক্ত করে বিদেশের বাজারে প্রচার করতে হবে। পরিচালনার কৃতিত্ব, অভিনয়ের নৈপুণ্য ও গল্পের বৈশিষ্ট্য থাকলে 'ডাবিং' করা বা সাব্‌টাইটেল্ যুক্ত চিত্র নিশ্চয়ই বিদেশী চিত্র-রসিকদের হৃদয় জয় করতে পারবে। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত কয়েকটি বাংলা চিত্রই তার প্রমাণ। তবে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দু'একখানা ছবি পাঠিয়ে পুরস্কার জয় করে নিশ্চিন্ত থাকলে চলবে না—বৃহত্তর বাজারে স্থান লাভ করতে হলে ব্যাপক প্রস্তুতি ও ব্যয়বহুল প্রচেষ্টাও থাকা চাই।

সুখের কথা, বিদেশের বাজারে ভারতীয় ছবির ব্যাপক ভাবে প্রদর্শনের একটা সুবিধা ও সুযোগ ঘটবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। বিলাত দেশটিতে এখন প্রচুর ভারতীয় গমন করছেন, তাই কয়েকটি চিত্র-প্রযোজক প্রতিষ্ঠান বিলাতের শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র গুলিতে বেশী করে ভারতীয় চিত্র দেখাবার ব্যবস্থা করছেন। কিছুদিন আগেও লণ্ডন, বার্মিংহাম্, ব্র্যাডফোর্ড ম্যাঞ্চেষ্টার, সাউথহল্ প্রভৃতি স্থানে শুধু রবিবারে ভারতীয় ছবি দেখান হত এবং তাও ভারতে প্রদর্শিত পুরাণ ছবি। একেবারে অনেকেরা নতুন ছবির দেখা পাওয়া যেত না। কিন্তু এখন একজন ভারতীয় চিত্র-প্রযোজক বোম্বাই ও লণ্ডনে একই সঙ্গে নতুন ভারতীয় চিত্র দেখাবার ব্যবস্থা করছেন। তাছাড়া এই ব্যবস্থায় আর একটা লাভ হবে এই যে, আজকাল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, মিডল ইষ্ট, ইষ্ট আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে যেখানে ভারতীয় চিত্র প্রদর্শিত হয়, সেখান থেকে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা আজকাল প্রায়ই বিলাতে আসছেন। তাঁরা এই নতুন ভারতীয় চিত্রগুলি দেখে তাঁদের দেশে প্রদর্শনের জন্য চিত্র নির্বাচন করতে পারবেন। শুধু তাই নয়, ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ থেকেও বহু চিত্র-ব্যবসায়ী বিলাতে আগমন করেন। তাঁদেরও ইংরাজীতে সাব-টাইটেল যুক্ত এই ভারতীয় চিত্রগুলি দেখে ভাল লাগতে পারে এবং নিজেদের দেশে প্রদর্শনের জন্য তাঁরা চিত্র নির্বাচন করতে পারেন। আরও আশার কথা এই যে ওদেশের চিত্রামোদীরা যাঁরা কখনও ভারতীয় ছবি দেখেন নি প্রধানতঃ ভাষার অবোধ্যতার জন্য, তাঁরাও অনেকে ইংরাজী সাব-টাইটেল দেওয়া ভারতীয় চিত্র আজকাল দেখতে আরম্ভ করেছেন।

ভারতীয় ছবিকে দূর বিদেশের বাজারে চালু করতে হলে লণ্ডনকেই এখন প্রধান কেন্দ্র করতে হবে। ভারতীয় চিত্র ব্যাপকভাবে এখানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে পারলে, অবশ্য 'সাব-টাইটেল্' দিয়ে বা 'ডাবিং' করে, বিদেশী চিত্র-ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণের সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া যাবে এবং ভারতীয় চিত্রের ব্যাপকভাবে বিদেশী বাজারে প্রচার

বিস্তারেরও সম্ভাবনা দেখা যাবে। তবে চিত্রের গুণ যেন ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে চিত্র-নির্মাতাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। বাংলার চিত্র নির্মাতারা কি এই সুযোগের অপচয় করবেন? বাংলা চিত্রের যা গুণ ও সুনাম আছে তাতে একটু খরচা করে লণ্ডনের বাজারে দাম-টাইটেল যুক্ত করে বা 'ডাবিং' করে বাংলা চিত্র প্রদর্শন করতে পারলে বিদেশের বাজারে বাংলা চিত্রেরও ব্যাপকভাবে প্রদর্শনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। আশা করি বাংলার চিত্র-নির্মাতারা এই বিষয়ে দৃষ্টি দেবেন।

*

আর-ডি, বনশাল প্রযোজিত ও অজয় কর পরিচালিত "কাচ কাঁচা হীরে" ছবিতে লিলি চক্রবর্তী ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

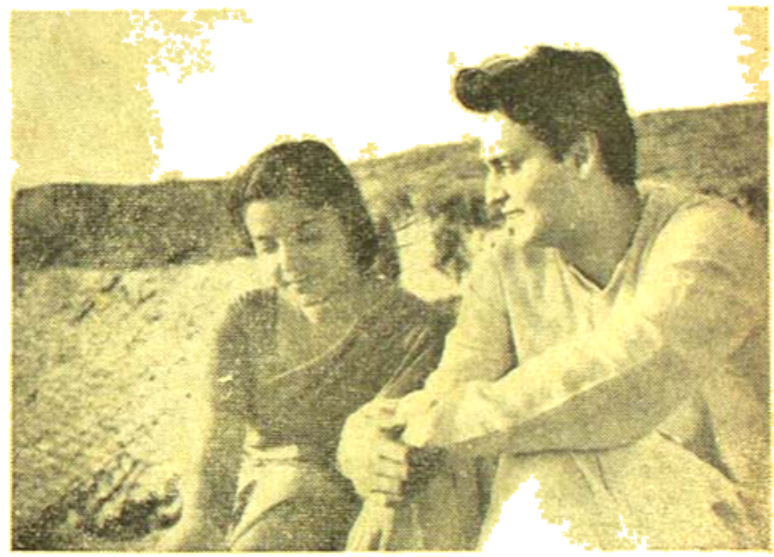

*

প্রবন্ধাখবর :

সত্যজিৎ রায়ের নূতন চিত্র 'নায়ক'এর প্রধান তিনটি স্ত্রী-চরিত্রে খুব সম্ভব দেখা যাবে মাধবী মুখোপাধ্যায়, সুমিতা সান্যাল ও ভারতী দেবীকে।

ছবিটির একটি বড় অংশ তোলা হবে চলন্ত ট্রেনের মধ্যে। সেখানে নায়ক এমন কয়েকটি বিচিত্র মানুষের দেখা পাবেন যাদের চিন্তা ও কাজে সমকালীন জীবনের ধারাটি প্রতিফলিত।

নায়কের চরিত্রটির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন উত্তমকুমার। শীঘ্রই এই চিত্রের সুটিং সুরু হবে। ছবিটি প্রযোজনা করছেন আর, ডি, বনশাল।

• • •

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস 'কাল, তুমি আলেয়া' অবলম্বনে একটি ছবি নির্মিত হচ্ছে। ছবির চিত্রনাট্য লেখক স্বয়ং রচনা করছেন।

ছবিটির বিশেষ আকর্ষণ নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন উত্তমকুমার এবং নায়িকা ডাক্তার লাবণ্য সরকারের ভূমিকায় অভিনয় করবেন সুপ্রিয়া চৌধুরী। কাহিনীর দ্বিতীয় নায়িকা 'সোনা-বউদি' চরিত্রের শিল্পী অবশ্য এখনও নির্বাচিত হয় নি।

• • •

'ওলমোহর' চিত্রের কয়েকটি দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ দার্জিলিং-এ করা হয়েছে। ওখানে যাঁরা বিভিন্ন দৃশ্যে অভিনয় করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন নবাগতা শিল্পী অমৃতা রায়, বিশ্বজিৎ, বসন্ত চৌধুরী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও ভারতী দেবী। ছবিটি পরিচালনা করছেন কালিক চট্টোপাধ্যায়। বিমল মিত্রের ওই নামের উপন্যাস অবলম্বনে "ওলমোহর" চিত্রটি নির্মিত হচ্ছে।

• • •

উত্তমকুমার ফিল্মসের 'গৃহদাহ' চিত্রের নিয়মিত সুটিং শুরু হয়েছে। গৃহদাহের মহিমের ঘরে আগুন লাগার দৃশ্যটি ইতিমধ্যে তোলা হয়েছে। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন উত্তমকুমার (মহিম), সুচিত্রা সেন (অচলা), ও প্রদীপ-কুমার (সুরেশ)। আর মৃণালের ভূমিকায় সাবিত্রী

চট্টোপাধ্যায় অভিনয় করবেন। সুবোধ মিত্র ছবিটি পরিচালনা করছেন।

• • •

মালা সিংহ ও বিশ্বজিৎ নিউ থিয়েটার্সের একটি চিত্রে অভিনয় করছেন। বোম্বাইয়ের ফেমাস ল্যাবরেটরীতে ছবিটির প্রথম গান দুটি রেকর্ড করা হয়ে গেছে। গান দুটিতে নেপথ্য কণ্ঠদান করেন লতা মঙ্গেশকর ও মুকেশ।

নিউ থিয়েটার্সের এই ছবিটির এখনও নামকরণ করা হয়নি।

• • •

বোম্বাইয়ের অভিনেত্রী লীলা নাইডুকে এবার একখানি বাংলা ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে। এই ছবিতে তিনি মা ও মেয়ের দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করবেন। তাঁর বিপরীতে এই ছবির দুই মুখ্য পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করবেন অনিল চট্টোপাধ্যায় এবং অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিটির নাম হবে "রূপরেখা"।

• • •

বাংলা "ও কে ?" ছবিতে বম্বের নৃত্যনিপুণা শিল্পী মধুমতীকে দেখা যাবে। বাংলা ছবিতে এই হবে তাঁর সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ। ছবিটির একটি আকর্ষণীয় নৃত্য দৃশ্য সম্প্রতি বোম্বাইয়ে গৃহীত হয়েছে। এই ছবিটির অন্যান্য প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন বিকাশ রায়, তরুণকুমার, লিলি চক্রবর্তী, কমল মিত্র, গীতা দে এবং নবাগতা শকুন্তলা গুহ প্রভৃতি। হি, বালসারা সুর সংযোজন করছেন এবং কণ্ঠদান করছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, উৎপলা সেন, ইলা বসু, তরুণ ব্যানার্জি, নির্মলা মিশ্র ও আরতি মুখার্জি।

• • •

বাংলা ছবি "বাদশা"কে হিন্দীতে রূপদানের আয়োজন করেছেন এম, এস, চিত্রমন্দির নামে কলকাতার একটি প্রযোজক সংস্থা। বোম্বাইয়ের রঞ্জিৎ ষ্টুডিওতে এই ছবির শুটিং সুরু হয়েছে। হিন্দীতে এই চিত্রের নামকরণ করা হয়েছে "মেরে লাল"। চিত্রটি পরিচালনা করছেন সত্যেন বসু এবং প্রধান চরিত্রটিতে অবতীর্ণ হবেন দেবকুমার নামে এক নবাগত শিল্পী।

• • •

প্রযোজক-পরিচালক এম, ডি, রমণ তাঁর দ্বিভাষী চিত্র (ইংরেজী ও হিন্দী) 'জোয়ালা'র শুটিং দীর্ঘ সাত বছর পর সম্প্রতি আবার শুরু করেছেন। ছবিটিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছেন সুনীল দত্ত এবং নায়িকার ভূমিকায় মধুবালা। কিন্তু মধুবালা অসুস্থ হয়ে পড়ায় শ্রীরমণ এই চিত্রের শুটিং স্থগিত রাখতে বাধ্য হন। সম্প্রতি মধুবালা তাঁর অসুস্থতা সত্ত্বেও শুটিং করতে রাজী হওয়ায় এই পুনরারম্ভ। ছবিটিতে সুর সংযোজন করছেন শংকর জয়কিষণ।

• • •

শেখ মামুদ নামে জনৈক চলচ্চিত্র অভিনেতা লাহোরের এক ফিল্ম ষ্টুডিওতে গোক্ষুরা সাপের দংশনে মারা গিয়েছেন। এক সাপুড়ের ভূমিকায় অভিনয় করবার সময় সাপের খেলা দেখাতে গিয়েই মামুদের মৃত্যু ঘটে।

• • •

শিশুদের চলচ্চিত্র সম্বন্ধে এক এশিয়ান সম্মেলন এই বৎসরের শেষে অথবা আগামী বৎসরের প্রথম ভাগে ভারতে অনুষ্ঠিত হবে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

এই সম্মেলনে শিশুদের উপযোগী চিত্র প্রযোজনা সম্পর্কে নানারূপ আলাপ আলোচনা হবে।

• • •

গত ১০ই জুন বেলা ১১টায় বাংলা চিত্র ও মঞ্চ জগতের শক্তিমান নট নীতীশ মুখোপাধ্যায় হাজরা রোডস্থ নিউল্যাণ্ড নার্সিংহোমে উদরী রোগে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৮ বৎসর।

নীতীশ মুখোপাধ্যায় সর্বপ্রথম চিত্রাবতরণ করেন প্রফুল্ল রায় পরিচালিত 'পরশমণি'তে এবং 'কপাল-কুণ্ডলা' নাটকে তাঁর সর্বপ্রথম মঞ্চাভিনয়। সঙ্গীতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন।

• •

দেশে দেশে শ্রীনেহরুর মূর্তি স্থাপিত হোক—এই হচ্ছে ভারতীয় চিত্র ভারকাদের বাসনা এবং এই মূর্তি স্থাপনের যাবতীয় ব্যয়ভার তাঁরা বহন করতে প্রস্তুত বলেও জানা গেছে।

রাশিয়ার কোনও শিশু-উদ্যানে নেহরু-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাজকাপুর টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। রাজেন্দ্রকুমার বৃটেনকে ওইরূপ মূর্ত্তি উপহার দিতে চান। মালো সিংহ নেপালকে, ধর্মেন্দ্র চেকোশ্লোভাকিয়াকে, সাধনা ফ্রান্সকে, মীনাকুমারী জাপানকে, কিশোরকুমার কৃষ্ণা-নিয়াকে, শশিকলা পূর্ব-জার্মানিকে এবং পরিচালক রাজ খোসলা ইতালিকে। আর সুনীল দত্ত পাকিস্তানকে এই উপহার দিতে চান, যদি অবশ্য তাতে পাকিস্তান সরকারের আপত্তি না থাকে।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ভারতের তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সময়েই এই প্রস্তাবটি করা হয়েছিল। পরিকল্পনাটি শীঘ্রই রূপায়িত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

• • •

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতের ছবি হিসাবে সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা'কে পাঠান হবে। আগষ্ট মাসে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

• • •

পঞ্চদশ আন্তর্জাতিক "পশ্চিম বার্লিন্ চলচ্চিত্র উৎসব" আগামী ২৪শে জুন থেকে ৬ই জুলাই পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে এবং অন্যান্য বৎসরের মত এইবারেও এই উৎসবে ভারত, জাপান এবং অনেকগুলি এশিয়ান ও আফ্রিকান্ দেশ অংশ গ্রহণ করবে।

উল্লেখযোগ্য যে ভারত এবং জাপানই হ'ল এই আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। ১৯৫০ সাল থেকেই এই চলচ্চিত্র উৎসবে ভারত এবং জাপান তাদের ছবি প্রদর্শনীর জন্য পাঠিয়ে আসছে।

এ বৎসরের এই উৎসবে শুধু শিল্পকলা নৈপুণ্যের ভিত্তিতেই ছবির বিচার হবে না—ব্যবসায়ভিত্তিক ছবিরও বিচার করা হবে। এর উদ্দেশ্য হ'ল জার্মাণ বাজারে বিভিন্ন দেশের ছবির জনপ্রিয়তা অর্জনে সাহায্য করা।

এই বছরের উৎসবে 'ফিচার' ও 'শর্ট' ছবির সংখ্যা কম হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু অতীতে এই বার্লিন উৎসবেই সবচেয়ে বেশী সংখ্যক চিত্রের প্রদর্শনী হ'ত।

• • •

বৃটেনের আগামী কমনওয়েলথ্ আর্ট ফেষ্টিভ্যালে ভারতের পক্ষ থেকে যোগদান করছেন তিনজন শীর্ষস্থানীয় সঙ্গীত-শিল্পী এবং কথাকলি নৃত্যের ১৪ জনের একটি দল। লণ্ডনের এক সাংবাদিক বৈঠকে এ-কথা জানান ফেষ্টিভ্যালের ডিরেক্টর জেনারেল আইভান্ হাণ্টার।

এই সঙ্গীতশিল্পী তিনজন হলেন—রবিশঙ্কর (সেতার), বিসমিল্লা খান (শানাই) এবং পালঘাট মানি আয়ার (মৃদঙ্গবাদক)।

আগামী ১৬ই সেপ্টেম্বর লণ্ডনে এই ফেষ্টিভ্যালের উদ্বোধন করবেন ডিউক অব এডিনবার্গ।

• • •

"দি গ্রেট ট্রেন্ রবারী ইন্ দি ওয়ার্ল্ড" নামে একটি ছবি তৈরী করার সংকল্প করেছেন বিশ্বখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীদ্বয় রিচার্ড বার্টন ও এলিজাবেথ টেলর। এই শিল্পী-দম্পতির দ্বারা গঠিত চিত্রসংস্থার এইটিই হবে প্রথম চিত্র-নিবেদন। মেট্রো গোল্ড্উইন মেয়ার-এর সহযোগিতায় এই চিত্রটি নির্ম্মিত হবে।

বছর দুই পূর্বে লণ্ডনের ব্যাঙ্কিংহামে যে বড় রকমের ট্রেন্ ডাকাতির ঘটনাটি ঘটেছিল, তারই ভিত্তিতে ছবিখানি নির্ম্মিত হবে। তবে চরিত্রগুলি সবই হবে কল্পিত।

• • •

গত ২রা জুন নিউ ইয়র্কের এক হাসপাতালে হলিউডের প্রখ্যাতা অভিনেত্রী জুডি হলিডে ক্যানসার রোগে মারা গিয়েছেন। মৃত্যুকালে শ্রীমতী হলিডের বয়স হয়েছিল ৪২ বৎসর। "বর্ণ ইয়েস্টারডে" চিত্রে অনবদ্য অভিনয়ের জন্য তিনি অস্কার পুরস্কার লাভ করেন।

॥ আকাশ কুসুম ॥

স্বপ্ন দেখতো অজয়—ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন। জীবনে আসবে প্রতিষ্ঠা—আসবে স্বাচ্ছন্দ্য। আর সেই সাথে বাড়ী-গাড়ী-রেফ্রিজারেটার আরও অনেক কিছু। জীবন তার মধুময় হয়ে উঠবে মনিকার সাহচর্যে—পত্র পুষ্পে পল্লবিত হয়ে উঠবে তার গৃহের পরিবেশ। বিধবা জননীর একমাত্র আশ্রয় অজয়। তাকে সে সান্ত্বনা দেবে—সুখ স্বপ্নের রঙীন কল্পনায় তার দেহ মন আজ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে।

বন্ধু সত্যেন কিন্তু অজয়কে সতর্ক করে দিতে চায়। বর্তমানের অর্থনৈতিক সমস্যায় ছোট ব্যবসায়ীর কোন স্থান নেই। কিন্তু অজয় তা স্বীকার করতে রাজী নয়। দালাল কণ্টীবাবুর প্ররোচণায় সরকারী ডিসপোজাল থেকে যন্ত্রপাতি কিনে অজয় তার অফিস খুলে বসে। মনে তার অদম্য আগ্রহ—তার অফিসও একদিন বড় হয়ে উঠবে—আসবে প্রচুর অর্থ—জীবন যুদ্ধে ভাগ্যলক্ষ্মী জয়-মাল্য নিয়ে বরণ করবে।

মনিকার সঙ্গে পরিচয় আকস্মিক ভাবেই, কিন্তু সেই পরিচয়ের সূত্রে উভয়ের মাঝেই যেন অচ্ছেদ্য বন্ধন গড়ে ওঠে। ধনীর দুলালী মনিকার অন্তরে অধিকার লাভ করে অজয়। মনিকার পিতামাতাও তাকে সাগ্রহে গ্রহণ করে। অজয়ের সংগীত—মধুর ব্যবহার তাদের আকৃষ্ট করে। সর্বোপরি অজয়ের আর্থিক প্রাচুর্য—জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনিকা ও তার অভিভাবকদের কাছে একটা স্থায়ী আসনের ভিত্তি স্থাপন করে। কিন্তু এও কি সম্ভব? জীবন সংগ্রামে বিপর্যস্ত অজয়ের পক্ষে মনিকার কথা চিন্তা করা কি বাতুলতা নয়? বন্ধু বৎসল সত্যেন অজয়কে বলে—সব কথা পরিষ্কার করে নিতে। কিন্তু অজয় তা পারেনা। তাই একে একে মিথ্যার পাহাড় জমে ওঠে। মনিকা জানে অজয়ের গাড়ী—বাড়ী—সামাজিক মর্যাদা তাদের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। কিন্তু সে সবই সত্যেনের। অজয় এ সব কিছু নিজের বলে প্রচার করেছে। অজয় বিশ্বাস করে সেও বড় হবে তারও জীবনে দেখা দেবে পরিপূর্ণ আনন্দ। কিন্তু, তারপর?

মৃণাল সেন পরিচালিত ও আর, ডি, বি এণ্ড কোং পরিবেশিত পূর্বাচল ফিল্মসের "আকাশ কুসুম" এই কাহিনীকেই কেন্দ্র করে মুক্তিলাভের অপেক্ষা করছে। অজয় ও মনিকার চরিত্রে রূপদান করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা দাশগুপ্ত। সত্যেনের ভূমিকায় রয়েছেন নবাগত শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। এ ছাড়া অন্যান্য মুখ্য চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন শোভা সেন, প্রফুল্ল-বালা, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, জানেশ মুখোপাধ্যায়, শোভেন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। আলোচ্য ছবিতে সুধা-রোপ করেছেন সুধীন দাশগুপ্ত।

—শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদনা : শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

সি এ বি ক্রিকেট লীগ ঃ

বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়েশন কর্তৃক পরিচালিত প্রথম বিভাগের ক্রিকেট লীগ খেলার ফাইনালে মোহন বাগান ২৩৬ রানে স্পোর্টিং ইউনিয়নকে পরাজিত করলে মোহনবাগান উপর্যুপরি তিনবার এবং মোট ছয় বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব লাভ করে।

সি এ বি নক আউট ক্রিকেট ঃ

১৯৬৫ সালের প্রতিযোগিতার ফাইনালে মোহন-বাগান প্রথম ইনিংসে বেশী রান করার জন্যে বি এন আর দলকে পরাজিত করে। ফলে মোহনবাগান একই বছরে এই নিয়ে সি এ বি'র লীগ এবং নক আউট ট্রফি পেল চারবার (১৯৫৩-৫৪, ১৯৬১-৬২, ১৯৬৩-৬৪ ও ১৯৬৪-৬৫)। এই বছর ধরে মোহনবাগান ৯ বার নকআউট প্রতি-যোগিতার পুরস্কার মেহতা ট্রফি জয়ী হয়ে সর্বাধিকবার এই ট্রফি জয়ের রেকর্ড করলো।

বেটন কাপ ফাইনাল ঃ

১৯৬৫ সালের বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতায় মোহন বাগান এবং কাষ্টমস যুগ্ম বিজয়ী হয়েছে। ফাইনালে কোন দলই গোল দিতে পারেনি। এই নিয়ে পাঁচটি ফাইনাল খেলায় যুগ্ম বিজয়ী হল—১৯৪১ সালে কৃপাল ওয়ারিয়ার্স ও ভদাবন্ধু ক্লাব, ১৯৪৮ সালে ইউপি একাদশ ও পোর্ট কমিশনার্স, ১৯৫৫ সালে ইউপি একাদশ ও ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে, ১৯৬৩ সালে মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল এবং ১৯৬৫ সালে মোহনবাগান ও কাষ্টমস।

এই নিয়ে কাষ্টমস দল বেটন কাপ পেল ১২ বার (সর্বাধিকবার জয়ের রেকর্ড) এবং মোহনবাগান ৫ বার। কাষ্টমস দল শেষ বেটন কাপ পেয়েছিল ১৯৩৮ সালে (বড়গপুরের বি এন আর দলের বিপক্ষে) এবং শেষ খেলেছিল ১৯৩৯ সালে। সুতরাং দীর্ঘ ২৬ বছর পর বি এন আর পুনরায় বেটন কাপের ফাইনালে খেলে জয়ী হ'ল।

এশীয় যুব ফুটবল :

জাপানের টোকিও শহরে কোমাজাওয়া ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সপ্তম এশীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইস্রায়েল ৫—০ গোলে ব্রহ্মদেশকে পরাজিত ক'রে এই জয়লাভের পুরস্কার বহুমন ট্রফি জয় করেছে। গত বছরে এই প্রতিযোগিতায় যুগ্মবিজয়ী হয়েছিল ইস্রায়েল এবং ব্রহ্মদেশ।

ভারতবর্ষ আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিল, কিন্তু মূল প্রতিযোগিতায় উঠতে পারেনি। লীগের চারটে খেলায় ভারতবর্ষ ৩ পয়েন্ট পেয়েছিল; ব্রহ্মদেশ ২—১ গোলে এবং দক্ষিণ কোরিয়া ৪—১ গোলে ভারতবর্ষকে পরাজিত করেছিল। তাইল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের খেলা গোলশূন্য ড্র যায়। ভারতবর্ষের একমাত্র জয় ১—০ গোলে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে।

অর্জুন পুরস্কার :

১৯৬৯ সালের ক্রীড়াকৃতীর ভিত্তিতে এই সাতজন সরকারী অর্জুন পুরস্কার লাভ করেছেন : এ্যাথলীট নাথন সিং, ক্রিকেট খেলোয়াড় পাতৌদির নবাব, ফুটবল খেলোয়াড় জার্নেল সিং, হকি খেলোয়াড় শঙ্কর লক্ষ্মণ, পোলো খেলোয়াড় রাওরাজা হনুৎ সিং, টেবল টেনিস খেলোয়াড় গৌতম দিওয়ান এবং কুস্তিগীর বিষম্ভর সিং।

অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ :

চতুর্থ টেষ্ট

অষ্ট্রেলিয়া : ৬৫০ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। বিল লরী ২১০, রবি সিম্পসন ২০১, বব্ কাউপার ১০২ এবং নর্ম্যান ও'নীল ৫১ রান। হল ১১৭ রানে ২ এবং গিবস ১৮৮ রানে ২ উইকেট) ও ১৭০ রান (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। লরী ৫৮ রান (অবসর) এবং ও'নীল নট আউট ৭৪ রান। গিবস ৬১ রানে ২ উইকেট)।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ৫৭৩ রান (নার্স ২০১, কানহাই ১২২, হাণ্ট ৭১, সোবার্স ৫৫ এবং গ্রিফিথ ৪৪ রান। ম্যাকেঞ্জী ১১৪ রানে ৪ এবং হক ১৩৫ রানে ৩ উইকেট) ও ২৪২ রান (৭ উইকেটে। হাণ্ট ৮১, ভেডিস ৬৮ এবং সোবার্স নটআউট ৩৪ রান। ম্যাকেঞ্জি ৬০ রানে ২ এবং কিলপট ৭৪ রানে ২ উইকেট)।

বার্বাডোজে অনুষ্ঠিত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বনাম অষ্ট্রেলিয়ার এই চতুর্থ টেষ্ট খেলাটি অমীমাংসিত থাকলেও খেলার শেষ সময় পর্যন্ত যথেষ্ট উত্তেজনা ছিল। এই খেলা ড্র যাওয়ার ফলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ২-০ খেলায় অগ্রগামী হয়ে (ড্র ২) ওয়েল ট্রফি জয় করে। এই ট্রফিটি হ'ল অষ্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের টেষ্ট সিরিজে বিজয়ী দলের পুরস্কার, সূচনা ১৯৬০-৬১ সালের টেষ্ট সিরিজ থেকে। ঐ বছরে অষ্ট্রেলিয়া ওয়েল ট্রফি পেয়েছিল।

অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের খেলায় বিল লরী (২১০ রান) এবং রবি সিম্পসন (২০১ রান) প্রথম উইকেটের জুটিতে ৩৭২ রান তুলেছিলেন—এই রান যে-কোন দেশের বিপক্ষে সরকারী টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড। পূর্ব্ব রেকর্ড—৩৩৩ রান (দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জ্যাক ফিঙ্গলটন এবং বিল ব্রাউন, ভেপ টাউন, ১৯৩৫-৩৬)। সরকারী টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় প্রথম উইকেট জুটির বিশ্ব-রেকর্ড রান—৪১০ (১৯৩৫-৩৬ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে মাদ্রাজের ৫ম টেষ্ট খেলায় ভিন্থ মানকাদ এবং পঙ্কজ রায় এই বিশ্ব রেকর্ড করেন)। মাত্র ৩২ রানের জন্যে আলোচ্য খেলায় লরী এবং সিম্পসন প্রথম উইকেট জুটির বিশ্ব রেকর্ড রান না তাকতে পারলেও এক বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন—টেষ্টের একই ইনিংসে প্রথম উইকেট জুটির দুই খেলোয়াড়ের ডাবল সেঞ্চুরী করার রেকর্ড।

পঞ্চম টেষ্ট :

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ২২৪ রান (রোহন কানহাই ১২১ রান। হক ৪২ রানে ৩, সিনকক ৭৯ রানে ২ এবং কিলপট ২৫ রানে ২ উইকেট) ও ১৩১ রান (হাণ্ট নট-আউট ৬০ রান। ম্যাকেঞ্জী ৩৩ রানে ৫, হক ৩১ রানে ৩ এবং সিনকক ৬৬ রানে ২ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া : ২৯৪ রান (রবি সিম্পসন ৭২ এবং কাউপার ৬৯ রান। গ্রিফিথ ৪৬ রানে ৬ এবং গিবস ৭১ রানে ৩ উইকেট) ও ৬৩ রান (কোন উইকেট না পড়ে। সিম্পসন নট আউট ৩১ এবং লরী নটআউট ১৮ রান)।

পোর্ট অব্ স্পেনে অনুষ্ঠিত এই পঞ্চম টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ১০ উইকেটে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে পরাজিত করলে ১৯৬৯ সালের সিরিজের ফলাফল দাঁড়ায়—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জয় ২, অষ্ট্রেলিয়ার জয় ১ এবং খেলা ড্র ২। অষ্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের পাঁচটি টেষ্ট সিরিজের ফলাফল দাঁড়াল : অষ্ট্রেলিয়ার 'রাবার' জয় ৪ বার এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের মাত্র একবার, ১৯৬১ সালে। টেষ্ট খেলার ফলাফল : খেলা ২৫, অষ্ট্রেলিয়ার জয় ১৭, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জয় ৫, ড্র ৪ এবং টাই ১।

একমাত্র জয়লাভের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ছাড়া ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের কাছে ১৯৬৯ সালের এই পঞ্চম অর্থাৎ শেষ টেষ্ট খেলাটির বিশেষ কোন গুরুত্ব ছিল না। কারণ এই পঞ্চম টেষ্ট খেলা আরম্ভের আগেই ১৯৬৯ সালের টেষ্ট সিরিজে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ 'রাবার' জয় করেছিল। আলোচ্য পঞ্চম টেষ্টে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ওপনিং ব্যাটসম্যান কনরাড হাণ্টের নটআউট ৬০ রান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাণ্টকে নিয়ে সরকারী টেষ্টে সম্পূর্ণ এক ইনিংসের খেলায় ১৪ জন ওপনিং ব্যাটসম্যান অপরাজিত থাকার রেকর্ড করলেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের পক্ষে এইটি হ'ল দ্বিতীয় রেকর্ড ; প্রথম করেন ফ্র্যাঙ্ক ওরেল—১৯৫৭ সালের নটিংহাম টেষ্টে, ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ১৬।৩।৭৫ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সকল ঋতুর সৌন্দর্য্য প্রসাধন

হিমানী

স্নো

এই জনপ্রিয় স্নো এখন থেকে বড় সাইজে (ডিলুক্স সাইজ) ও নতুন ডিজাইনের সুন্দর কার্টুনে বাজারে পাবেন

হিমানী প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-২

REG. NO. C. 679—BHARATVARSHA. Phone—34-1741. Grams—Publicasun, Cal.
Price—Single Copy—Re. 1/25. Subscriptions—Annual—Rs. 15/-. Half-yearly—Rs. 7/50.

—নূতন প্রকাশিত ভারতবর্ষের বই—

শ্রীপঞ্চানন ঘোষালের

অধস্তন পৃথিবী

পৃথিবী বলে কি শুধুই নীচের তলার—সেখানে যারা বাস করে তারা কি মানবতা বোধের ধার ধারে

অনুপ্রাণিত নয় ?

নানা-কেন্দ্রিক জীবনের যে জটিলতা ও রহস্যময়তা প্রতিটি মানুষের মনে শুধু কৌতূহলই সঞ্চার ক'রেছে, বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে পঞ্চাননবাবু অগ্রসর হ'য়েছেন তাদেই রূঢ় উদ্ঘাটন ক'রতে। প্রেম ও ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব ও দুর্বলতা, মহত্ত্ব ও ক্ষুদ্রতার সংঘাতে আবর্তনীল কতক-গুলি মানব নরনারীর উত্থান ও পতনের জীবন্ত কাহিনী

—সংবেদনশীল লেখনীর স্পর্শে অপরূপ।

দাম—পাঁচ টাকা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

সতীশঙ্কর

সতীশঙ্কর রায়ের সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলে। কেউ বলে, তিনি ছিলেন পরোপকারী, পরের জন্যে অনেক কিছু ক'রেছেন, বাড়ির চাকরকে অফিসের বেয়ারা ক'রে দিয়েছেন। কেউ বলে তিনি ছিলেন একজন জাকাত, পরের ধন লুটেপুটে খাওয়াটাই ছিল তাঁর কাজ। লোকে তাঁকে ভয় ক'রতো যেন বাঘ বা বাঘের চেয়েও বেশি। আবার কেউ বলে মেয়েদের নিয়ে তিনি অনেক ঘাঁটা-ঘাঁটি ক'রেছেন—ব'লতে গেলে একেবারে পোকা ছিলেন।

উৎপলের কাছে সতীশঙ্কর এক বিষম সমস্যা। কার কথা শুনে সে তাঁর জীবনী লিখবে? যে লোক প্রথম জীবনে দেশের জন্যে জেল খেটেছেন, পরবর্তী জীবনে অভিহিত হ'য়েছেন দস্যু ও প্রতিষ্ঠার উচ্চ আসনে, তিনি আবার মহৎ আততায়ীর হাতে নিহতই বা হ'লেন কেন? এই "কেন" সম্বন্ধে তাঁর একদল ভক্তই বিধবা স্ত্রী-ই বা বলেন কি? দাম—পাঁচ টাকা

শক্তিপদ রাজগুরুর

জীবন-কাহিনী

মানুষের জীবনে সমস্যাও যেমন—কৌতূকও তত কম নয়। এই সমস্যা ও কৌতুকের যুগ-সমন্বয়ের মধ্যে গড়ে ওঠা দু'টি জাগা-বিভ্রান্ত যুবক-যুবতীর মধুর প্রেমের কাহিনী।

ছায়াচিত্রে রূপায়িত।

দাম—৪'৫০

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

মজার মজার খেলা

বিজ্ঞানের নানা রকম কল-কৌশলের সাহায্যে মজাদার খেলা দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত করার মত বই। দেখা ও খেলার কাজ একই সঙ্গে চ'লবে।

কিশোরদিকে উপহার দেওয়ার পরম উপযোগী।

নূতন ধরনের মাইজ। অন্যথা হইবে তরপুর।

দাম—৩৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬